শনিবারের চিঠি

ষাণ্মাসিক সূচী

বৈশাখ ১৩৭০—আশ্বিন ১৩৭০

সম্পাদক ঃ শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শনিবারের চিঠি

৩৫শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭০

সম্পাদক :
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

বিবেকানন্দ ও বাঙালী জীবন

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

জগতের ধর্মনেতৃসংঘের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিশেষতঃ হিন্দুধর্মগুরুদের সহিত তুলনায় এই ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্ভাবনাভূয়িষ্ঠ। উপনিষদের যুগ হইতেই হিন্দুধর্ম সংসারবিবিক্ত অধ্যাত্মসাধনাকেই নিজ চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদিক যুগে, বৌদ্ধ যুগে ও চৈতন্য যুগে এই সংসার-ঔদাসীন্যের সাময়িক ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু মোটের উপর নির্জন সাধনার দ্বারা ভগবৎ-উপলব্ধিই এই ধর্মের সর্বকালীন সত্য। বৈদিক যুগের সরল, কৃষিনির্ভর যৌথ জীবনস্রোতের সমান্তরাল ধারায় উহার ধর্মচর্চা—যাগযজ্ঞ, বেদমন্ত্র রচনা ও সঙ্গীত-ছন্দে উহার আবৃত্তি, গোষ্ঠীজীবনের সমবেত আরাধনা, এমন কি উহার তত্ত্বালোচনা—প্রবাহিত হইয়াছে। সমস্ত জাতির কলমুখরিত আনন্দময় প্রাণধারা উহার ধর্মাচরণের মধ্যে জীবনাবেগ সঞ্চার করিয়াছে। বৈদিক দেব-দেবীর সহিত উহার ঋষি-সংঘের সম্পর্ক যেন প্রতিবেশীসুলভ সহৃদয়তায় স্নিগ্ধ ও মধুর—উহার স্তবস্তুতির মধ্যেও অব্যবহিত নৈকট্যবোধের সুরটি শোনা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম সমকালীন জনসাধারণের জীবনসমস্যার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবৃন্দ সংসারবন্ধনমুক্ত, মোক্ষকামী সাধক, কিন্তু আর কোন ধর্মে সংসারের শত-কোলাহল মুখরিত, মায়ামোহদ্বন্দ্বে উন্মথিত, ছোট ছোট সমস্যায় বিব্রত জীবনযাত্রার সহিত এরূপ একাত্ম সংযোগ দেখা যায় না। বৌদ্ধ মঠবিহারের, ত্যাগ-বৈরাগ্যের পটভূমিকায় প্রাকৃত জীবনের এই বর্ণোজ্জ্বল রূপ এই উদ্বেলিত কলোলধ্বনি পরিপূরকরূপে অধিষ্ঠিত আছে। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের সাম্যবাদ ও গণসংযোগ আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাঁহার দিব্যকল্পনাবিভোর ও অপ্রাকৃত প্রেমের আবেশে মুগ্ধ অন্তর-কন্দর হইতে যে সার্বজনীন প্রেমের স্রোত উৎসারিত হইয়াছিল তাহা আপামর সাধারণ জনচিত্তকে ভাসাইয়া লইয়া এক অপূর্ব অনুভূতির তীরভূমিতে আরূঢ় করিয়াছিল।

এই কয়েকটি ব্যতিক্রমস্থানীয় দৃষ্টান্ত বাদ দিলে হিন্দু-ধর্ম মুখ্যতঃ জীবনবিমুখ ও আত্মসাধনালীন ছিল ইহা বলা যায়। ইহার কারণও তৎকালীন সমাজবিন্যাস ও কর্তব্যবোধের মধ্যে নিহিত ছিল। পরাধীন ও অদৃষ্টনির্ভর জাতির জীবনপরিধি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধই ছিল—তাহার বিচিত্র, দিক্ হইতে দিগন্তরে প্রসারিত আহ্বান কাহাকেও বিশেষ কর্ম-চঞ্চল করিয়া তোলে নাই। জীবনের মূল্য ছিল কেবল সাধনাক্ষেত্ররূপে ও কতকগুলি অতি-নিরূপিত কর্তব্যের নিরুদ্বেগ পালনে। কাহারও সৌভাগ্যক্রমে বৈষয়িক উন্নতি ঘটিলে সে শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে তাহার অর্জিত সম্পদ দানপ্রাচুর্য, সামাজিক উৎসবের উদ্‌যাপননিষ্ঠা ও জনহিতকর কার্যের

জন্যই নিয়োগ করিত। কিন্তু সমাজসেবা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্তব্যরূপে, জীবনের সামগ্রিক সার্থকতার অপরিহার্য পথরূপে মানুষের পূর্ণ শক্তির দাবি করিত না। সমাজের বিশিষ্ট সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দ দেবপূজা ও অন্যান্য ধ্যানধারণাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ জীবনসাধনা বলিয়া মনে করিতেন। যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতেন তাঁহারা হয় শিষ্যমণ্ডলীকে দীক্ষা দান দ্বারা বা প্রতিবেশীদের ধর্মোপদেশ ও মানসসমস্যার সমাধানের পথ দেখাইয়া বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিতেন। সমাজপতি পূজা-উৎসবের সুব্যবস্থা করিয়া, লৌকিক আচার-আচরণের অবশ্যপালনীয়তার নির্দেশ দিয়া, কুলধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া ও উহাদের লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তিবিধান করিয়া তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক নেতৃত্বের পরিচয় দিতেন। রাজনৈতিক পরাধীনতা ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন লইয়া কেহই মাথা ঘামাইত না—বড়জোর অত্যাচার আসিলে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইত। কিন্তু চিরন্তন নীতি হিসাবে ইহার কোন স্বীকৃতি ছিল না। মোট কথা ধর্মশাসিত সমাজে স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবনস্পৃহার কোন স্বতন্ত্র মূল্য ছিল না। যে সমস্ত লৌকিক কর্তব্য ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যেই নিহিত, পুণ্যফলের দিকে লক্ষ রাখিয়াই তাহাদের প্রতি কম-বেশী নিষ্ঠানুগত্য দেখানো হইত মাত্র।

এই ভগবৎ-সমর্পিত ও লৌকিক কর্তব্যকে ঐশী প্রত্যয়ের অনিবার্য উপজাতরূপে দেখিতে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা আধুনিক দৃষ্টিতে যেরূপ সঙ্কীর্ণ ও বাস্তববিমুখ মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল না। বিরাটকে জানিলেই তাহার অংশীভূত সমস্ত খণ্ড বিভাগকেই জানা হয়. ভগবৎপ্রেম মানবপ্রেমের নিশ্চিত আশ্বাস ও উৎস এই সত্য যাঁহারা ভগবানের প্রেমস্বরূপ স্বীকার করেন তাঁহাদের সহজেই বোধগম্য হয়। এই জীবনাদর্শের আসল বিপদ হইল যে ভগবদুপলব্ধির প্রয়াস যদি ব্যর্থ হয়, নির্জন সাধনা যদি শূন্যলোক বিচরণে পর্যবসিত হয়, আত্মপ্রবঞ্চনা ও ভণ্ডামি যদি ধর্মানুশীলনকে বিকৃত পথে পরিচালনা করে তবে দুই কূলই গেল—ভগবানকেও পাওয়া গেল না ও মানবসেবাও হইল না। এই বহিরঙ্গমূলক, বিধিনিষেধ-বিড়ম্বিত, শূন্যগর্ভ ধর্মানুষ্ঠানই ব মনে প্রকৃত ধর্মসাধনার প্রতি বিরূপতা ও জাগাইয়াছে। ভগবানকে ভালবাসার ফল ও অপ্রত্যক্ষ; মানুষকে ভালবাসার ফল প্রত্যক্ষগোচর। কাজেই একশ্রেণীর যুক্তিবা হিতৈষীর মনে ভগবানের মূর্তি অস্পষ্ট হইয় দেশপ্রেম ও মানবসেবার আদর্শই উজ্জ্বলতর হই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃ সাহচর্যে নবশিক্ষিত বাঙালী দেশপ্রেম ও জনহি প্রতি তীব্রভাবে সচেতন হইল। দুঃখীর দুঃখ দূ দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন প্রয়াসে, জা প্রতিষ্ঠায় ভগবানের মধ্যবর্তিতা ছাড়াই আত্মকর্তৃত্ব যথেষ্ট—এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইল। জীবনের এক ধর্মনিরপেক্ষ তাৎপর্য অনুভব করি কর্মশক্তি, হৃদয়াবেগ ও আত্মোৎসর্গের এ ক্ষেত্রে আবিষ্কার করিয়া নিজের সমগ্র সত্তা নূতন ব্রত উদযাপন করিতে উৎসুক হইল, এক মন্ত্রসাধনায় অভিনব সিদ্ধির পথে অগ্রসর হই এই নবজাগ্রত জীবনপিপাসার পরোক্ষ সহায়তা করিয়া নিজ সর্বময় কর্তৃত্ব স্বেচ্ছায় করিল।

২

এই ভাঙন-লাগা, কাঁপন-জাগা, নব ভাবকে অস্থির যুগ-প্রতিবেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীন সাধনার ঐতিহ্যই করিয়াছিলেন। অতীত যুগের ঋষির ন্য তপোবনের নিঃসঙ্গ পরিবেশে তন্ত্রশাস্ত্রবিহি ধ্যানতন্ময়তার মাধ্যমে পরম সিদ্ধি লাভ করে একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে তিনি যুগচেতন অস্পৃষ্ট ছিলেন না। কলিকাতার উপকণ্ঠে বা তিনি জনসমাগম, ভক্তমণ্ডলীর সংস্পর্শ ও যু সাহায্যে স্বীয় অনুভূতির প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস এড়াইতে নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে রামকৃষ্ণের নিষ্ঠাবান শিষ্যবৃন্দের নিকট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-আ

দ্বারাই সম্পূর্ণতার প্রতীক্ষা করিয়াছিল। দীপের যেমন আলোক বিকিরণেই সার্থকতা তেমনি সিদ্ধপুরুষের অনুভূতি-মহিমা বৃহত্তর আধারে বিকীর্ণ হইয়াই সার্থক। রামকৃষ্ণ যদি নিজ ধ্যানে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন থাকিতেন, শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া ধর্মতত্ত্ব পরিস্ফুটনে ব্রতী না হইতেন, তবে বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার মিলন ঘটিত কি না সন্দেহ। বিবেকানন্দ ব্যতিরেকে রামকৃষ্ণ-সাধনা অসম্পূর্ণ ও অংশতঃ অকৃতার্থ থাকিত। তাঁহার অর্ধোচ্চারিত, ভাবরুদ্ধ বাণী, তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দীপ্তিমান অনুভূতি-কণিকা, তাঁহার স্বল্পসংখ্যক শিষ্যের কানে কানে বলা অন্তরনির্যাস সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িত না, মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে জগৎবাসীর হৃদয়ে অনুরণিত হইত না, গঙ্গার মৃদু কুলুকুলু গুঞ্জরণ সমুদ্র-তরঙ্গের বজ্রনিঃস্বনে মিশাইয়া যাইত না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যুগচেতনা আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুচি ও মানসবৈশিষ্ট্য বিষয়ে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তাঁহার শিষ্য ও অনুরাগীগোষ্ঠীর সাহচর্যপ্রিয়তা, বৈঠকী মনোভাব, সামাজিক দুঃখকষ্টের প্রতি সচেতনতা,—এ সবই তাঁহার আধুনিকতার পরিচয়। তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দকে তিনি যে আত্মসিদ্ধির সাধনায় ধ্যানমগ্ন না থাকিয়া আধিব্যাধি-পীড়িত সাধারণ মানুষের দুঃখ মোচনের ব্রত গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা কোন অনাধুনিক যুগের ধর্মগুরুর পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। স্বামীজীর জনসেবার সঙ্কল্প বীজাকারে তাঁহার গুরুর মনে সুপ্ত ছিল, ধর্মসাধনার সহিত লোকহিতমূলক নিষ্কাম কর্মের সংযোগ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরগুহাশায়ী ভাবাঙ্কুর হইতে শিষ্যে সংক্রামিত হইয়া পত্র-পুষ্পসম্পন্ন ফলবান তরুর রূপ গ্রহণ করিয়াছিল—এরূপ মনে করিবার হেতু আছে।

৩

এই পটভূমিকায় বিবেকানন্দের যুগনায়কের ভূমিকা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিনিচয়কে যদি অর্ঘ্যরূপে ভগবচ্চরণে নিবেদন করাই ধর্মের নির্দেশ হয়, তবে স্বামীজী ঊনবিংশ শতকে নবোন্মেষিত স্বদেশপ্রেম ও দরিদ্রসেবার পরিকল্পনাকে তাঁহার ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া সুস্থ ও পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ধর্মবোধেরই পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রকৃত ভক্ত সংসার-বৃক্ষের স্বাদুতম ফলটিকেই দেবচরণে সমর্পণ করিয়া দেবপ্রসাদধন্য হয়। বিবেকানন্দও সেইরূপ আধুনিক যুগের মহত্তম স্ফুরণটিকে নিজ ইষ্টপূজার নৈবেদ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম-সংস্পর্শহীন ধ্যানের ভাববিলাসের মধ্যে তামসিকতার নিষ্ক্রিয়তা ও জীবন বিষয়ে ঔদাসীন্য সাধকের অজ্ঞাতসারে তাহার অধোমুখিতার কারণ হয়। তপঃক্লিষ্ট দেহের নিষ্ফল অনুষ্ঠানাবর্তনের রন্ধ্রপথে অশুভ পরিণতির শনি প্রবিষ্ট হইতে পারে। সেইজন্য বিবেকানন্দ সাত্ত্বিকতার সহিত ক্ষাত্রতেজোদীপ্ত রজঃগুণের মিশ্রণ ঘটাইয়া এক নূতন শক্তির উদ্বোধন করিতে খুঁজিয়াছিলেন। সমকালীন জীবনবোধের সহিত ধর্মের ব্যবধান যতই বাড়িবে, ধর্ম ততই রক্তহীন পাণ্ডুরতায় স্বপ্নপ্রতিচ্ছবির ছায়ামূর্তি ধারণ করিবে। জীবন-উপাদান ধর্মে অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ নয়, তথাপি জীবন-সমর্থনের উপরই উহার দৃঢ়তা ও কার্যকারিতাশক্তি নির্ভর করে। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনা অপার্থিব লোকে সঞ্চরণশীল, কিন্তু কোন না কোন অদৃশ্য সূত্রে সমকালীন জীবনস্ফূর্তির সহিত বাঁধা। বিবেকানন্দ এই দুর্লক্ষ্য বন্ধনের উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যক্ষভাবে জীবনস্রোতের আবর্তসংকুল তরঙ্গে ধর্ম-তরণীকে ভাসাইয়াছেন। প্রশস্ত রাজপথে জনতার উদ্বেল গতিবেগ ঠেলিয়া যদি ভগবানের দর্শন মিলে তবে নর-নারায়ণের পবিত্র সঙ্গমতীর্থে এই মিলন কি এক অপূর্ব মহিমামণ্ডিত হয় না? প্রাত্যহিক প্রেরণার শানযন্ত্রে ভগবৎ-সাধনার অস্ত্র অহরহ ঘর্ষিত হইয়া এক অসাধারণ দীপ্তি ও শাণিত তীক্ষ্ণতায় ঝলমল করিয়া উঠে না কি?

এই কারণেই বিবেকানন্দের জনমানসের উপর এত গভীর ও সর্বব্যাপী প্রভাব লক্ষিত হয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধৃবৃন্দ বিবেকানন্দের বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সন্ত্রাসবাদের যজ্ঞে আত্মাহুতি দেয়। রামকৃষ্ণ-আশ্রমের সন্ন্যাসী সংঘ আর্তসেবাকে ধর্মসাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে এক দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানমর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক প্রসারের যুগে, জনসাধারণের নিকট ক্ষমতার ব্যাপক হস্তান্তরের

আয়োজনের পটভূমিকায় বিবেকানন্দের বাণী ও নির্দিষ্ট কার্যপন্থা এক নূতন ও যুগোপযোগী তাৎপর্য অর্জন করিয়াছে। তিনি সেই একক ধর্মগুরু যিনি পুরাতন হইয়া যান নাই। তাঁহার জলন্ত দেশপ্রেম, তাঁহার উদ্দীপনাময়, [illegible] সহানুভূতি আজ শাসক-গোষ্ঠীর বাস্তব কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম বাণী যাঁহাদের জানা নাই, তাঁহারাও তাঁহার জনসেবা সম্বন্ধে নর ও নারায়ণের অভিন্নত্বে তাঁহার স্থির প্রত্যয় সম্বন্ধে অবলীলাক্রমে তাঁহার বচন উদ্ধার করেন। মনে হয় এই চিন্তাধারা আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক হইলে বিবেকানন্দের পরিচয় ধর্মবেত্তা অপেক্ষা রাজনীতিবিদ্ হিসাবেই বেশী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৪

কিন্তু জনপ্রিয় ও বহুজনাশ্রিত উপায়ে ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টার বিপদের দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। এই পথে চলমান ব্যক্তির উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধি ও কর্মের অকৃত্রিমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। আর্তত্রাণের এমন একটি স্বতন্ত্র মানবিক মূল্য আছে যে বহু লোকে ইহাতেই তৃপ্ত হইয়া আর সূক্ষ্মতর ভগবৎ-সংযোগের কথা মনে রাখে না। অবিরল ধারায় নিঃসৃত সুলভ হৃদয়াবেগ মহত্তর ও দুরূহতর সিদ্ধির কথা ভুলাইয়া দেয়। খানিকটা শারীরিক দুঃখের বিনিময়ে কার্যসিদ্ধির আনন্দ বিরলতর আধ্যাত্মিক সিদ্ধির পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। ইহার উপর সূক্ষ্ম অহংকারবোধ ও আত্মপ্রসাদ, রোগার্ত মানুষের যন্ত্রণা উপশম ও উপবাসক্লিষ্ট নর-নারীর ক্ষুন্নিবৃত্তি তাহারা যে নারায়ণের স্বলাভিষিক্ত ও তাহাদের সেবা যে ভগবৎ-পূজার প্রকারভেদ মাত্র, এই অধ্যাত্ম সত্যকে আবৃত ও অস্বচ্ছ করে। তাই দুর্গম পথের দুর্গমতম অংশ অতিক্রম করিয়াই ভগবানের মন্দিরে পৌঁছানো যায়। তাই শুধু ভৌগোলিক অবস্থানে নয়, সাধনাসত্যের দিক দিয়াও হিমাচলের তুঙ্গতম, চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গেই ভগবানের বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় সত্তা স্বেচ্ছা-বন্দী। এই দুর্গম পথ চলিতে চলিতে অনেক মোহ টুটে, অনেক গর্বের অবসান

হয়, অনেক ভ্রান্তি নিরসিত হয়, সঙ্কল্প অনে
পদে আত্মবিশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানের পূর্ণ
বিকাশ ঘটে, জ্যোতিঃ সমুদ্রে অবগাহন
দিব্যানুভূতিতে ভাস্বর হইয়া উঠে।

বিবেকানন্দ আমাদিগকে সেবামন্ত্রে দীক্ষি
বটে, কিন্তু সকলে সে মন্ত্রের অধিকারী নয়।
শিব ও কণায় বিরাটকে প্রত্যক্ষ করিয়া
মধ্যে ব্রহ্মানুভূতি ও ভগবানের বিশ্বব্যাপ্তি
রূপে প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহারাই এই ব্র
বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণশিষ্যরূপে ভগবদ্দর্শন কা
সাধনায় দিব্যনেত্র উন্মোচন করিয়াই তবে
প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মানস কল্পন
বিশ্বরূপচ্ছবি ক্লিষ্ট অসহায় নরনারীর মু
হইয়াছিল বলিয়াই তিনি বহুরূপী ঈশ্বরে
পূজাবিধি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম
ব্যতীত সেবাধর্মের কোন বৃহত্তর তাৎপর্য না
দেশজননীর ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে তিনি জগৎজ
অবলোকন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি
মোচনের জন্য সকলকে এরূপ উদাত্ত আহ্বা
ছিলেন। শুধু সাময়িক রাজনৈতিক বা
প্রয়োজনে নয়, একটা শাশ্বত সাধনাবিধি ও
তিনি এই চিত্তশুদ্ধিকর কর্মযজ্ঞের জন্য স
কর্তব্যের উপর জোর দিয়াছিলেন। তাঁহার
বিচ্ছিন্ন উক্তি হইতে হয়তো তাঁহাকে ভুল বে
আছে। তিনি যখন বলিয়াছিলেন যে,
অনাথার দুঃখে উদাসীন ও অনাহারী মা
করার ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট তাহাকে তাঁহার
তখন ইহা ভগবানের অস্বীকৃতি নয়,
অভিমান। এই অভিমান সাধনা-পরিণতি
ভগবৎ-বিশ্বাসের প্রোজ্জ্বল দীপশিখার
বায়ুসংস্পর্শ-কম্পন। যখন তিনি দেশের তরু
আগামী পঞ্চাশ বৎসর তেত্রিশ কোটি দে
উপাসনা ছাড়িয়া পরাধীনা মাতৃভূমির এ
আত্মনিয়োগ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন,
প্রচলিত পূজার ব্যর্থতার কথাটাই বড়
নাই। মৈত্রী প্রত্যয়হীন, উগ্র রাজনৈতিক

রুণ সম্প্রদায় যে দেবপূজায় যোগ দিত তাহা সম্পূর্ণ হিরঙ্গমূলক, অন্তরাবেগহীন অনুষ্ঠান। এইরূপ লোক-দখানো পূজা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ই ছিল। কিন্তু জাগ্রত দেশাত্মবোধ তাহাদের মনের একটি প্রজ্বলন্ত অনুভূতি, একটি অন্তরের গভীর হইতে উৎক্ষিপ্ত আবেগ। এই হৃদয়বৃন্ত-প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মকে যদি পূজার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করা হয়, দেশের মুক্তিসাধনার একান্ত প্রয়াসকে যদি ধর্মসাধনার পবিত্রতায় মণ্ডিত করা যায়, তবে সেই পূজা যে প্রাণহীন শুষ্ক বিধিপালন অপেক্ষা অনেক বেশী সার্থক ও পূজকের কল্যাণকর হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর দেশমাতৃকার পায়ে আত্মবলিদান যে অধ্যাত্ম মূল্যের দিক দিয়াও সাধারণ রাজসিক আড়ম্বরপূর্ণ, উপচারবহুল, কিন্তু ভাবদৈন্যক্ষীণ পূজার সহিত তুলনায় শ্রেষ্ঠ তাহা কে অস্বীকার করিবে?

৫

লোকোত্তর প্রতিভার আবির্ভাবের আসল সার্থকতা হইল জাতীয় জীবনসংলগ্নতা। তাঁহাকে যদি জাতির অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া জাতির জীবননিয়ন্তার মর্যাদা দিতে না পারি তবে তাঁহার সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখিয়া, স্মারক গ্রন্থ সংকলন করিয়া, দেশব্যাপী শত-বার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার বিরাট মনীষার কতটুকু ধারণা করিতে পারি? বিবেকানন্দের মহত্ত্বের যে প্রকৃত উৎস তাহার সহিত জাতীয় চেতনার জীবন্ত সংযোগ না হইলে তাঁহার সম্বন্ধে বুদ্ধিগত আলোচনায় কতটুকু সার্থকভাবে তাঁহার মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব? কার্যে তাঁহার বাণীকে রূপায়িত না করিতে পারিলে তাঁহার বাণীর প্রচুর উদ্ধৃতি, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও উচ্ছ্বসিত বাগ্মিতানিঃসার সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগ্‌বিস্তার মননশীলতার অনুশীলন যোগাইতে পারে, কিন্তু অন্তরে প্রত্যয়ের দীপশিখা প্রজ্বলিত করিতে সহায়তা করিতে পারে না। রাজনীতি ও সমাজসেবার সঙ্গে ধর্মের আত্মিক সম্বন্ধ যদি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তবে ধর্মসম্পর্কহীন মানবতা-বাদ কি বিবেকানন্দের যথার্থ প্রভাবস্বীকৃতি বলিয়া গণ্য হইবে? যে সমাজ বিবেকানন্দের আদর্শকে যথাযথ মূল্য না দিয়া এই আদর্শের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কর্ম-পন্থাকেই একমাত্র অনুসরণের বিষয় বলিয়া মনে করে, সে সমাজে স্বামীজীর প্রভাব কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছে? স্বামীজীর উদার মানসিকতায় পরস্পরবিরোধী মতবাদের সহজ সমন্বয় হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী হইয়াও তিনি মায়াবাদে জড়িত হইয়া পড়েন নাই; ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাব স্বীকার করিয়াও তিনি মানবিক কর্মবাদকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়াছেন। নিগূঢ় অধ্যাত্ম অনুভূতিকেও তিনি যুক্তিশৃঙ্খলায় গ্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; জড়বাদী যন্ত্রসভ্যতার মানুষকেও তিনি হিন্দুধর্মের জন্মান্তর রহস্য ও ভগবৎ-সাধনার কথা শোনাইয়াছেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে এই বৈজ্ঞানিক ও ইহসর্বস্ব যুগেও ভারতবর্ষে ধর্মকেন্দ্রিক জীবন-ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে ও ভারত সমস্ত বিশ্বজগৎকে ত্যাগ ও ভোগ, জ্ঞানকর্ম ও ভক্তি, ঐহিক ও পারত্রিকের এক মহামিলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাইবে। এই প্রত্যাশা এখনও পূর্ণ হয় নাই ও পূর্ণ হইবার আশাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে তাঁহার বাণীর এই মহত্তম অংশটি যদি আমাদের জীবন-চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে এক অধ্যাত্ম-আদর্শপূত কর্মসাধনায় নিয়োজিত করে, তবেই এই উৎসবটি সার্থকভাবে উদ্‌যাপিত হইবে। কর্মচাঞ্চল্য ও ঐহিক শক্তি অর্জনের মধ্যে যদি ধর্মের শাশ্বত অনুপ্রেরণা ক্রিয়াশীল হয়, তবেই আমাদের ধর্ম জীবনের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে ও কোন আপাতরমণীয় লক্ষ্যের আকর্ষণে উহার চিরন্তন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারত-ধর্ম

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

এক

তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের নূতন সহকারী প্রধান শিক্ষক আসিয়াছেন। লম্বা দোহারা চেহারা, মুখমণ্ডল তেজোদীপ্ত, মস্তকে উষ্ণীষ। দেড় কি দুই মাইল দূর হইতে আসিতেন, কিন্তু দেহে ক্লান্তির লেশমাত্র নাই। স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র দেখিয়াছি। মনে প্রশ্ন জাগিত, ইনি তাঁহার মত উষ্ণীষ পরেন কেন? এই শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল একত্র বাস করি, তখন বুঝিতে পারি, ইনি স্বামীজীর দ্বারা কত অনুপ্রাণিত। স্কুল-লাইব্রেরীতে 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইখানি ছিল। তিনি লাইব্রেরীতে বিবেকানন্দের লেখা বাংলা বই আরও কিছু আনাইলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'কর্মযোগ,' 'জ্ঞানযোগ,' 'বীরবাণী' এই রকম আরও কিছু কিছু নূতন বই। শিক্ষক মহাশয় এই সকল হইতে অনেক অংশ আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন, সাধারণতঃ অপরাহ্ণেই তাঁহার নিকট আমরা গিয়া বসিতাম।

দুই বৎসরের মধ্যেই অসহযোগের বান আসিল। আমরা এই বানে গা ভাসাইলাম। তখন আমাদের মনে কত আত্মপ্রত্যয়! আত্মশক্তির কি অভূতপূর্ব বিকাশ! মহাত্মা গান্ধী আমাদের সম্মুখে। কিন্তু এই পরিণতির জন্ম প্রস্তুতি তো চাই। আর ইহা সময়সাপেক্ষও বটে। আমরা তখন পরিণতি দেখিয়াই মুগ্ধ হই। পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভাবিয়া দেখি নাই ইহার মূলে পূর্ববর্তী বহু বৎসর যাবৎ কি কি শক্তি কার্য করিয়াছে, আর ইহার মূলাধার কে বা কাহারা। আট নয় বৎসর পরের কথা। মনে হইতেছে ১৯২৭ সন। বিবেকানন্দের স্মৃতিসভায় গিয়াছি। প্রধান বক্তা দুইজনের কথা মনে আছে, রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং মনীষীপ্রধান বিপিনচন্দ্র পাল। দুইজনেই স্বামীজীর সমসাময়িক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন। বিপিনচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় স্বামীজীর মার্কিন বিজয়ের কথা ব্যক্ত করেন। তখন এ বিষয়টি শুনিতে ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ব্যঞ্জনা আদৌ হৃদ্গত হয় নাই। দীর্ঘকাল পরে বিপিনচন্দ্রের আত্মজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়টি পড়িয়া ইহা কতকটা বুঝিতে পারি। তিনি শতাব্দীর শেষে চারি মাস কাল আমেরিকায় কাটান। সেখানকার ধর্মপিপাসু ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মনে বিবেকানন্দের প্রভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন এবং পরাধীন ভারতবাসী সম্বন্ধে ওদেশবাসীরা যে নূতন করিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছেন তাহাতেও বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তিনি বলেন শেষোক্ত বিষয়টির মধ্যেও ছিল বিবেকানন্দের মঙ্গল হস্ত।

আর একজন সমসাময়িকের কথাও এখানে একটু বলি। তখন ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে আমি লিখিব স্থির করিয়াছি। তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি হইতে তথ্য আহরণে প্রবৃত্ত হইলাম। নিবেদিতার *The Master as I saw him* ("স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি"), যত দূর মনে হইতেছে, ইতিপূর্বেই পড়িয়া ফেলি। স্বামীজীর জীবন-দর্শনের এমন সুনিপুণ বিশ্লেষণ দ্বিতীয়টি দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। আমার উদ্দেশ্য নিবেদিতা সম্বন্ধে কিছু লেখা। একদিন লেডী অবলা বসুর সঙ্গে দেখা করিলাম। জানিতাম নিবেদিতা শেষজীবনে বসু-দম্পতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন এবং মারাও যান তাঁহাদেরই দার্জিলিংস্থ বাসভবনে। নিবেদিতা, সারদামণি দেবী (শ্রীশ্রীমা) এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ওইদিন এবং পরেও, লেডী বসু আমাকে অনেক কথা বলেন। স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে যে কটি কথা বলেন, তাহার মর্ম এই :—১৯০০ সালে প্যারিসে

বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। যেমন নানাদেশ থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র আমদানী হয়েছে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারীরাও বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদানের জন্য সমবেত হয়েছেন। আচার্য বসুর সঙ্গে আমিও সেখানে যাই, দেখি বিবেকানন্দ দলবল সমেত সেখানে উপস্থিত। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করতেন। একদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। দু'চার কথা হবার পরই তিনি আমাকে বললেন তাঁকে গান গেয়ে শোনাতে হবে। তাঁর কথা কি অমান্য করতে পারি? আমি সসঙ্কোচে তাঁকে গান গেয়ে শোনাই। পরে যখন শুনি তিনি নিজেও একজন সুগায়ক, তখন আমি লজ্জায় মরে গেলাম। আচার্য বসুকে তিনি *Indian Scientist* বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন।"

এইরূপে যাঁহারা স্বামীজীর সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং যাঁহারা মঠ মিশনের বাহিরে থাকিয়াও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, এমন কয়েকজনের কথা শুনিয়া এবং সঙ্গলাভ করিয়া আজিও নিজেকে ধন্য মনে করি।

আট নয় বৎসর পূর্বে চুঁচুড়ায় সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলন হয়। পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বহুদেশ পর্যটন করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি বিদেশীয়দের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব দেখিয়া তিনিও কম বিস্মিত হন নাই। তিনি বলেন—মেক্সিকো পর্যটন কালে মেক্সিকান ভাষায় গীতার এবং স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন বইয়ের অনুবাদ দেখিয়াছেন। সুইডেনেও এই ধরনের অনুবাদ-পুস্তক তাঁহার নজরে আসিয়াছে। এই সকল অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা প্রচাররত ব্যক্তিবিশেষ বা মণ্ডলী বিশেষ দ্বারা করা হয় নাই। ওই ওই দেশের বিদগ্ধ জনেরা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই স্বেচ্ছায় নিজ নিজ দেশবাসীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার-কল্পে ইহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি বিদেশীয় ও বিধর্মীয়দের দীর্ঘকাল পোষিত প্রতিকূল মনোভাবের এরূপ পরিবর্তন সম্ভব হইল কিরূপে? উত্তরে বক্তা যাহা বলেন তাহার মর্ম এই: স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও মার্কিন মুলুকে হিন্দুধর্মের যে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছেন, তাহার ফলেই এমনটি সম্ভব হয়। এখন আর হিন্দুর ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে খ্রীষ্টানেরা নাসিকা কুঞ্চিত করিতে ভরসা পান না। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া হিন্দুদের কতকগুলি রীতিপদ্ধতি—যেমন সংকীর্তন, গেরুয়া পরিধান প্রভৃতিও অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র এবং ডঃ সুনীতিকুমারের মুখে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে প্রায় একই কথা শুনি। বিদেশ-বিভুঁইয়ে অজানা অচেনা লোকেদের প্রাণে বিবেকানন্দ যে সাড়া জাগাইয়াছেন তাহা ক্রমে নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিরূপে এমনটি সম্ভব হইল তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি! আজকাল ধর্ম সমন্বয়ের কথা আকচার শুনি। জনৈক বন্ধু বলিলেন, সেদিন বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের এক অধিবেশনে বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী নেতাদের লইয়া ধর্মসমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক বসিয়াছিল। বিবেকানন্দ-জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতেও এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়া থাকিবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু স্বামীজী কর্তৃক অনুশীলিত ও প্রচারিত ভারতধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকিলে ধর্মসমন্বয়ের সাড়ম্বর আলোচনার হয়তো আবশ্যকতাই থাকিত না। বিদেশে তিনি যে ভারতধর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং যাহা শুনিয়া বিদেশীরা বিমোহিত হন সে সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই বিষয়টি জানিতে পারিলে বিবেকানন্দের সুকৃতি কোথায় তাহা বুঝিতে পারিব।

দুই

এই প্রসঙ্গে কিছু বলিতে গেলে ঐতিহাসিক পারম্পর্যের কথাও আমাদের জানা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টান ধর্মবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রায় সমকালেই তিনি হিন্দুধর্ম আলোচনা শুরু করিয়া দেন। ইহার ফলস্বরূপ আমরা পাইলাম তৎসম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থনিচয়। উপনিষদ আগেও ছিল, কিন্তু ইঁহার যুক্তিনিষ্ঠ টিকাটিপ্পনী সমেত সাধারণগ্রাহ্য করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করার প্রথম কৃতিত্ব রামমোহনের। এই উপনিষদ আবিষ্কার তাঁহার একটি অপূর্ব কীর্তি। হিন্দুধর্মের সার ইহাতে বিধৃত। গত

শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তাহার মূলে রহিয়াছে রামমোহনের এই আবিষ্কার। তিনি উপনিষদ তথা বেদান্তের ভিত্তিতে একেশ্বরবাদের আলোচনা 'আত্মীয় সভা'র মাধ্যমে আরম্ভ করেন। এই সভার পরিণতি ঘটে তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে (১৮২৮)। দুই বৎসর পরে ইহার জন্য যে মন্দির স্থাপিত হয় তাহার ন্যাসপত্রে রামমোহন এই মর্মে লেখেন যে, এই মন্দিরের দ্বার সকল লোকের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনায় যোগ দিতে পারিবেন।

রামমোহনের সমসময়ে খ্রীষ্টান মিশনরীরা হিন্দুধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং দেশ-বিদেশে ইহা প্রচার করিতে থাকেন। রামমোহন কিন্তু আদৌ ইহা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দু-ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ একেশ্বরবাদের গুণকীর্তন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, নিম্নাধিকারীর পক্ষে সা-কার অর্থাৎ দেবদেবীর পূজার প্রয়োজন আছে। তিনি অতঃপর আরও লেখেন যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা পরাধীন ভারতবাসীর ধর্মের বিরুদ্ধে উক্তি করিয়া রেহাই পাইতেছেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব নাই। তাঁহারা একবার স্বাধীন পারস্যে বা তুরস্কে গিয়া ধর্মপ্রচার করুন না, তাহাতে তাঁহারা যে কত বীরপুরুষ তাহা প্রমাণিত হইবার সুযোগ মিলিবে। ওই ওই দেশে বসিয়া ধর্মের গ্লানিকর উক্তি করিলে কি ফল হয় তাহাও বুঝিতে পারিবেন। রাম-মোহনের প্রতিবাদের পর তাঁহার স্বদেশবাসীরা সংঘবদ্ধ ভাবে খ্রীষ্টানী প্রচারের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থাদি প্রকাশে ও অনুবাদে কেহ কেহ তৎপর হইয়া উঠিলেন।

পরবর্তী চতুর্থ দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে মহর্ষি) রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনে মন দিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার কর্তৃত্বাধীনে। সুষ্ঠুরূপে বেদ-বেদান্ত অনুশীলনের নিমিত্ত চারিজন ব্রাহ্মণ যুবককে কাশীধামে পাঠানো হইল। সভার মুখপত্র "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় শাস্ত্র-গ্রন্থাদির 'চূর্ণক' বাহির হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে দিয়া উপনিষদের অনুবাদ করান ও ইহা ক্রমশঃ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি স্বয়ং ঋগবেদের অনুবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু এত করিয়াও দেবেন্দ্রনাথ মনে স্বস্তি পাইলেন না। তিনি ব্রাহ্মধর্মের বীজ অন্যত্র খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহারই ভাষায়—"তন্ত্র, পুরাণ বেদান্ত উপনিষদ, কোথাও ব্রাহ্ম-দিগের ঐক্যস্থল, ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে, ব্রাহ্মধর্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে। ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম; বলিলাম, 'আমার আঁধার হৃদয় আলো কর।' তাঁহার কৃপায় তখনি আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্মধর্মের একটি বীজ দেখিতে পাইলাম, অমনি একটি পেন্সিল দিয়া সম্মুখের কাগজখণ্ডে তাহা লিখিলাম এবং সেই কাগজ তখনি একটি বাক্সে ফেলিয়া দিলাম, ও সেই বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম। তখন ১৭৭০ শক ; আমার বয়স ৩১ বৎসর।" (আত্মজীবনী, পৃঃ ১৩১, চতুর্থ সংস্করণ)।

দেবেন্দ্রনাথ দুই খণ্ডে "ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থঃ" প্রচার করিলেন। ইহাই হইল ব্রাহ্মদিগের অনুসরণীয় একমাত্র ধর্মগ্রন্থ; রামমোহনের উপনিষদ-ভিত্তিক একেশ্বরবাদ হইতে দেবেন্দ্রনাথ সমাজকে একটি স্বতন্ত্র পথে চালনা করিলেন। হিন্দুসমাজ হইতে আলাদা নূতন মণ্ডলী গঠিত হইল। তবে ইহার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, আচারনিষ্ঠ হিন্দুরাও একেশ্বরবাদ তথা পরব্রহ্মে বিশ্বাসী হইলে এই মণ্ডলীভুক্ত হইতে পারিতেন। সাধারণের নিকট ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দুসমাজের অঙ্গ বলিয়াই প্রতিভাত হইল। দেবেন্দ্রনাথের বহু জনহিতকর প্রচেষ্টা, যেমন খ্রীষ্টান-বিরোধী আন্দোলন, হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি রাজা রাধাকান্ত দেবের ন্যায় রক্ষণশীল হিন্দু নেতার নিকট হইতেও আন্তরিক ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করে।

পঞ্চম দশকের শেষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশব-চন্দ্রের সংযোগ একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেশবচন্দ্র যুবক, যুবজনোচিত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইলেন। তিনি ক্রমে কেশবচন্দ্রের উপর বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিলেন। ষষ্ঠ দশকে বহু কৃতবিদ্য যুবক দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সংস্রবে আসেন ও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজ নূতন বল পাইল। এই

সকল যুবকের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), অঘোরনাথ গুপ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং কিছু পরে আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ ভট্টাচার্যের (শাস্ত্রী) নাম উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্রের সংস্কারমুখী মনোভাব ও কার্যকলাপে দেবেন্দ্রনাথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এই দশকের মধ্যভাগেই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল।

উৎসাহী যুবক অনুবর্তীদের লইয়া কেশবচন্দ্র ১৮৬৬, ১১ই নবেম্বর নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, আর ইহার নাম দিলেন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"। পূর্ব সমাজ "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে অতঃপর পরিচিত হইল। এই সনে কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় "ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ" সংকলিত ও প্রচারিত হয়। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, অগ্নি-উপাসক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে সার শ্লোকনিচয় এই পুস্তকে সংগৃহীত হয়। ক্রমে ক্রমে শ্লোকসংখ্যা খুবই বাড়িয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে'র পরিবর্তে এই শ্লোক সংগ্রহের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের ধর্মাদর্শ। যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী সম্পর্কে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই নূতন সমাজের সভ্যেরা কেশবচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় হিন্দুশাস্ত্রের মধ্য হইতে গৃহীত সার তথ্যের উপর নির্ভর মাত্র না করিয়া বিভিন্ন ধর্মের ভিতর হইতেই আদর্শ খুঁজিতে তৎপর হইলেন।

কেশবপন্থীরা বিবিধ উপায়ে সমাজের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৭২ সনের তিন আইনের (বিবাহ আইন) মধ্যে তাঁহাদের সংস্কার প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটিল। এইরূপে হিন্দুত্ব বর্জন পুরাপুরি সংসাধিত হইল। নূতন সমাজের ব্রাহ্মেরা বিরাট হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেকেরই অশেষ নির্যাতন, ক্লেশ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিতে হয়। কিন্তু ইঁহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ইঁহারা নিজদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, হিন্দু হইতে তাঁহারা যে আলাদা এ কথাও তাঁহারা কথায় এবং কার্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিক দিয়া পরবর্তী দশকে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরাও কেশবপন্থীদেরই অনুবর্তী ও অনুকারী। ১৮৯১ সনের সেন্সাসে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, অপরেরা কিন্তু ব্রাহ্ম লিখাইতেই লাগিয়া যান। ইহা অবশ্য পরের কথা। কেশবচন্দ্র বিলাতে একবার ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইউরোপে ও আমেরিকায় কয়েক বার নূতন ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রচারকল্পে গমন করেন। তাঁহাদের মুখে বিদেশীরা উপনিষদে বিবৃত শাশ্বত হিন্দুধর্মের কথা শুনিতে পাইলেন না। হিন্দুদের সা-কার উপাসনা অর্থাৎ বহু দেবদেবী পূজায় গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা যে নূতন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যত, এই ধরনের কথাই তাঁহারা স্পষ্টতঃ প্রচার করিলেন। তবে বিলাতে প্রদত্ত কেশবচন্দ্রের স্বদেশহিতকারক ধর্মাতিরিক্ত বক্তৃতাদিও এখানে স্মরণীয়।

একদিকে যেমন উৎসাহী কর্মকুশল ব্রাহ্মদের মুখে নিছক হিন্দুধর্মের কথা শোনা যায় না, অন্যদিকে বিপরীত কথাই আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বহুভাষাবিদ্ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি উপনিষদ্-বেদান্ত, ষড়্দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার একটি সকলকেই ছাড়াইয়া যায়। তাঁহার মতে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাদিতে প্রকটিত উচ্চ ভাবধারার পরিসমাপ্তি ঘটে যীশুখ্রীষ্ট প্রচারিত বাইবেলের মধ্যে। বেদ-চর্চার নিমিত্ত ম্যাক্সমূলরকে তখন আমরা কত আপন করিয়া ভাবিয়াছি। তাঁহার আত্মজীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার একটি উক্তিতে বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। হিন্দুগণকে তিনি 'হীদেন্' ও 'প্যাগান' বলিয়া উল্লেখ করেন। উপরন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টানের মত তিনিও বিশ্বাস করিতেন—বাইবেলই সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ, হিন্দুর বেদ-বেদান্ত নহে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সার্ উইলিয়ম জোন্সও ইহার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে হিন্দু দেবদেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেন।

এই সময় তৃতীয় বিপদ দেখা দিল উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, পশ্চিমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ স্বদেশীয়দের নিকট হইতে। তখন কোন কোন নেতার মুখে এমন কথাও শুনি, ইংরেজী ভাষা এবং য়ুরোপীয় আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ

গ্রহণ না করিলে জাতির মুক্তি নাই। নব্য শিক্ষিতেরা ইংরেজী ভাষায় গল্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থাদিও লিখিতে অভ্যস্ত হন। বাংলা ভাষা সাহিত্য তাঁহাদের নিকট যেন অস্পৃশ্য। মহামতি সি. এফ. এণ্ড্রুজ বলিয়াছেন, ব্রিটিশ শাসনের দাসত্ব অপেক্ষা, পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির বিজয় তথা প্রাধান্যলাভ ভারতীয় সমাজের পক্ষে ঘোরতর মারাত্মক হইয়া ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সময়কার একটি উক্তির মধ্যেও ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তিনি বলেন—"হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি!" (সীতারাম) সত্য বটে, রাজনারায়ণ বসু উদ্ভাবিত এবং নবগোপাল মিত্র প্রবর্তিত হিন্দুমেলার ন্যায় স্বাজাতিক প্রতিষ্ঠান এই সময়কার বিজাতীয় মনোবৃত্তির স্রোত রোধ করিতে খুবই তৎপর হইয়াছিল। স্বদেশীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ও সংস্কার সাধনে এই মেলার বিশেষ প্রযত্ন লক্ষ্য করি। কিন্তু দিশাহারা বিভ্রান্ত জাতির পক্ষে ইহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

হিন্দুমেলারই অঙ্গ জাতীয় সভার একটি অধিবেশনে (১৮৭২) রাজনারায়ণ বসু "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। তিনি একেশ্বরবাদী হিন্দু, আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, কাজেই বক্তৃতায় সা-কার বা বহু দেবদেবীর পূজার যে তিনি প্রশস্তি করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ চিন্তা যে উপনিষদে বিধৃত তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া 'বহুনন্দিত' হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা তিনি প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হন। হিন্দু-ধর্মের বিশ্বজনীন তথা সর্বজনীন মঙ্গলময় রূপটি ইহাতে ফুটিয়া ওঠে। কিন্তু তখন এই বক্তৃতায় কত আপত্তি। কেশবপন্থী ব্রাহ্মগণ এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীরা প্রতিবাদ সভা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে নামিলেন। প্রথমোক্তদের একটি প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং এবং বক্তৃতা দেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়)। কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৮৭০ সনের শেষে বিবিধ উপায়ে স্বদেশীয়দের সেবা, সংস্কার ও উন্নতি-সাধনকল্পে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারত-সংস্কার সভা গঠন করেন। হিন্দুমেলার মত ইহা দ্বারাও সমাজের কল্যাণ খানিকটা সাধিত হয়। কিন্তু মূলে যে হা-ভাত! হীনমন্যতা আত্মপ্রত্যয় আনে না; আত্ম-চেতনাই আত্মপ্রত্যয়ের দ্যোতক। এই চেতনা কিরূপে আসিবে? সন্তরণ শিক্ষার্থী ঠাঁই হারাইয়া জলে যেমন হাবুডুবু খায়, আমরাও তেমনি ধর্মীয় ভিত্তির অভাবে কেমন যেন বিভ্রান্তির মধ্যে গা ভাসাই। বিভ্রান্তি দূরকরতঃ আত্মচেতনা দান করিবে কে?

তিন

এই সময়ে আবির্ভূত হইলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার অবস্থিতি, মন্দিরের পূজারী ছিলেন তিনি। ধর্মবিষয়ে তিনি কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন, তাঁহার মুখে কিরূপ তত্ত্বকথা! ধর্মপ্রাণ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে প্রথমে সাধারণের গোচরে আনেন। পরমহংসদেবের উক্তিসমূহ লইয়া একখানি চটি বইও তিনি প্রচারিত করেন। এই 'পূজারী' ব্রাহ্মণের (অবশ্য তিনি প্রচলিত অর্থে তখন আর 'পূজারী' নন) নিকট বিভিন্ন স্তরের ও ধর্মাশ্রয়ী লোকের আনাগোনা শুরু হইল। ব্রাহ্মেরা শুধু নন, খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং উচ্চশিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরাও তাঁহার নিকট তত্ত্বকথা শুনিতে যাইতেন এবং শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। একজন পূজারী ব্রাহ্মণ, অপরিচ্ছন্ন, কোনরকমে নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন মাত্র; তিনি এমন উন্নতমনা সাধক হইলেন কিরূপে—জিজ্ঞাসুনেত্রে সকলেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীরাও যে তাঁহার মুখে তাঁহাদেরই কথা শুনিতে পাইতেছেন!

পরমহংসদেব উচ্চকোটির সাধক, তাঁহার ঈশ্বর যাঁহাকে তিনি 'মা' বলিতেন, মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ নয়; কোন একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও নয়, তাঁহার অস্তিত্ব সর্বজীবে, সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া। তিনি ইতিপূর্বে বিভিন্ন ধর্মমত অনুসারে ঈশ্বরের সাধনভজন করিয়াছেন; খ্রীষ্টানরূপে, মুসলমানরূপে, অন্যান্য ধর্মীয় শাখা বা সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর ভজনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির

মধ্যেই জগন্মাতার সন্ধান পাইয়াছেন। হিন্দু হইয়াও খ্রীষ্টান বা মুসলমানরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করা যে সম্ভব তাহা তিনি দীর্ঘকাল আচরণ দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক ভাষায় বলিতে পারি, দক্ষিণেশ্বরকে তিনি পরিণত করেন একটি ধর্মের লেবরেটরি বা পরীক্ষণাগারে। তিনি এইখানে এক একটি ধর্মকে ও ধর্মীয় শাখাকে পরখ করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই সার সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে, ঈশ্বর সকল দেশ, জাতি ও ধর্মের মধ্যে—এককথায় সর্বত্র বিদ্যমান। হিন্দু ছাড়া আর কেহ কি এমন ভাবে ভাবিতে সক্ষম? খ্রীষ্টানরা মনে করেন যীশুখ্রীষ্ট তাঁহাদের ত্রাণকর্তা, তাঁহাকে না মানিলে জীবের আদপে মুক্তি ও কল্যাণ নাই। মুসলমানদের ধারণা মহম্মদীয় ধর্ম অনুসরণ না করিলে জীবের অনন্ত নরক। এই রকম ইহুদীই বলুন, ইরাণীই বলুন প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মুক্তিপথ আলাদা। খ্রীষ্টান কি কখনও হিন্দুভাবে দেবতার ভজনা করিতে পারেন? মুসলমানও কি কখনও এরূপ কল্পনা মনে স্থান দেন! অন্যদের সম্বন্ধে কিছু নাই বলিলাম। পরমহংসদেব দেখাইলেন হিন্দু হইয়াও খ্রীষ্টান বা মুসলমানরূপে জগন্মাতার আরাধনা করা যায়। তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ বা তন্ত্রের ধার ধারেন না। কিন্তু তিনি অবিরাম সাধন ভজন ও সাধুসঙ্গ দ্বারা যে সত্যে পৌঁছিয়াছেন তাহা উক্ত উন্নতশাস্ত্র গ্রন্থাদির নির্যাস। 'যত্র জীব তত্র শিব' এই তাঁহার বাণী। মানুষের ধর্ম কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নয়। মানুষমাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান। মানুষের ধর্ম—পরস্পরের কল্যাণসাধন। পরমহংসদেবের মুখে সরল সহজ ভাষায় ধর্মের এই মূল কথাগুলি শুনিয়া সকলেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বিষয় জানাজানি হইবার অল্পকালের মধ্যেই আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী, নিরাকার ও সা-কার উপাসক—যুবক বৃদ্ধ সকলেই জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ভিড় করিতে আরম্ভ করেন।

বিবেকানন্দের পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত, দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুগায়ক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত খুবই সংশয়পূর্ণ। এরূপ একজন যুবক কিরূপে পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন সে সম্বন্ধে অনেক কৌতুককর কাহিনী রহিয়াছে, পুনরুক্তি এখানে অনাবশ্যক। তাঁহার মত শিক্ষাভিমানী সন্দিগ্ধচিত্ত যুবক পরমহংসদেবের সহজ সরল তত্ত্বকথা শুনিয়া ক্রমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া পড়েন। পরমহংসদেব যে ধর্মের কথা বলেন, তাহা দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই ধর্ম সর্বদেশের, সর্বকালের এবং সর্বলোকের। এই ধর্মই তো উপনিষদ-ব্যাখ্যাত ধর্ম। ইহা একটি জাতির মুখে উচ্চারিত এবং একটি দেশের মধ্যে ইহা সঞ্জাত; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা শুদ্ধমাত্র একটি জাতির বা একটি দেশের ধর্ম নয়। ইহার মূল মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র, ইহার বাণী বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন অর্থাৎ এককথায় ইহা মনুষ্যমাত্রেরই ধর্ম। নরেন্দ্রনাথ তদীয় আচার্য পরমহংসদেবের মধ্যে উপনিষদে ব্যাখ্যাত বিশ্বজনীন ধর্মের অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয় বিকাশ দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া তিনি আচার্যের জীবনদর্শন আলোচনা ও অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। যতই এই কার্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ বিশ্বজনীন রূপ প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহা জাতি ও দেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সকল জাতির ও সকল দেশের মানুষেরই ধর্ম—এই সারসত্য তিনি উপলব্ধি করিলেন। পরমহংসদেবের জীবনে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে; তিনি এই পরীক্ষিত তত্ত্বকে কার্যে রূপ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করেন। সর্বত্র স্বদেশবাসীর সহজাত ধর্মবোধ দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপ্লুত হন। উপনিষদ ও বেদান্ত চর্চায় তিনি অভিনিবিষ্ট হইলেন। ইহার সর্বজনীন রূপ তাঁহার হৃদ্গত হইল। সকল মানুষের কল্যাণ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যেই যে ইহার সার্থকতা তাহাও তিনি উপলব্ধি করেন। এই দিক হইতে বিবেকানন্দ রাজা রামমোহন রায়ের সত্যকার উত্তর সাধক। উচ্চ-নীচ, উত্তম-অধম, অগ্রসর-অনগ্রসর কেহই এই ধর্মের আওতা হইতে বাদ যান না। ইহার কল্যাণমন্ত্রে সকলেই উদ্বোধিত হইতে পারেন।

বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে "ভ্রাতা ও ভগিনীগণ" বলিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করেন। ইহাতে কি করতালি ও হর্ষধ্বনি। অপরের নিকট এইরূপ সম্বোধন বাস্তবিকই বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল, কারণ বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তিরা পরস্পরকে তো আর ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া মনে করেন না। নিজ নিজ ধর্মের তথা জাতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্তই তো তাঁহারা সেখানে উপস্থিত; পরস্পরকে আপন বলিয়া গণ্য করিবেন কিরূপে? ভারতবাসীর পক্ষে মনুষ্যমাত্রকেই ভ্রাতা-ভগিনী মনে করা নিতান্তই স্বাভাবিক। হিন্দুরা মনে করেন সকল মানুষের মধ্যেই 'নারায়ণ' বিদ্যমান, এবং নরনারীমাত্রেই এক জগদীশ্বরের সন্তান; কাজেই ভ্রাতা ও ভগিনী। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সম্বোধন আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নহে। বিবেকানন্দ প্রথম হইতেই সকলের চিত্তে বেশ একটা স্থান করিয়া লইলেন।

বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হিন্দু তথা ভারত-ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্ত্যের সুধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পরখ করিয়া দেখিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিলেন—এই ধর্ম উদার ও প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা মানবজাতির অর্থাৎ বিশ্ববাসীর মুক্তি ও কল্যাণ চাহে, কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মাশ্রয়ী সম্প্রদায়ের নহে। ধর্মের এই উদার আদর্শ অপরাপরকেও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল এবং তাহারা নিজেদের সঙ্কীর্ণতা কথঞ্চিৎও পরিহার করিতে উদ্যত হইলেন। ভারতবর্ষ স্মরণাতীতকাল হইতে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" আখ্যাদানের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীদেরও মিলনক্ষেত্র এই দেশ। হিন্দুধর্মের উচ্চাদর্শে সঞ্জীবিত হইয়াই ভারতবাসীরা স্বদেশকে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দ এই ভারতধর্মেরই প্রতিনিধি। তাঁহার মুখে হিন্দুধর্মের সর্বজনীন মঙ্গলময় প্রকৃতির ব্যাখ্যান শুনিয়া বিশ্ববাসী বিমোহিত হইলেন। ধর্মমহাসম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীর প্রতিনিধিবর্গ এবং বাহিরের অগণিত জনসমষ্টি হিন্দুধর্মের এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে আর কখনও শোনেন নাই। ইতিপূর্বে যাঁহারা য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিক্রমা করিয়াছেন তাঁহারা হিন্দুধর্মের এই সর্বজনীন রূপের কথা না বলিয়া নিজ নিজ বিশিষ্ট মণ্ডলী বা মতবাদের আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। এই সর্বপ্রথম তাঁহারা হিন্দুধর্মের প্রকৃত এবং সর্বোচ্চ রূপের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন। পাশ্চাত্ত্যবাসীরা তাঁহাদের পূর্বমত ও ধারণা পরিহার করিতে বাধ্য হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মুখে হিন্দুধর্ম তথা ভারতধর্মের কথা শুনিয়া তাঁহাদের মনোভাবের যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে কয়েক বৎসর পরে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাহা লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইয়া যান। পশ্চিমের, বিশেষ করিয়া মার্কিনবাসীদের নিকট ভারতবাসীরা অতঃপর হিন্দু নামেই পরিচিত হইতে লাগিলেন। হিন্দু শুধু ভৌগোলিক নামই নহে, উপনিষদে বর্ণিত ও বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত সর্বজনীন কল্যাণধর্মে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারাই হিন্দু—এইরূপ মনে করাও অযৌক্তিক নহে। মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শি, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম—তাঁহাদের নিকট ভারতের অধিবাসী মাত্রই হিন্দু। বিদেশে ভারতধর্মের কুৎসা প্রচার বন্ধ হইল, স্বদেশে হীনমন্যতা দূর হইয়া ভারতবাসীদের আত্মচেতনা ও আত্মপ্রত্যয় দেখা দিল। ইহার ফলেই বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিককার "নিউ স্পিরিট" বা নব ভাবনার অভ্যুদয় আমাদের জাতীয়তার পাকাপোক্ত ভিত্তি রচনাও ইহা দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আমরা যাঁহাদিগকে মহামানব বলি, তাঁহারা একই সঙ্গে যুগ-প্রবর্তক ও যুগ-প্রতিনিধি। একটা সমগ্র দেশের ও যুগের বিচ্ছিন্ন, এমন কি, পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারাও তাঁহাদের অন্তরে পরম ঐক্য লাভ করে। সাধারণ মানুষ যেখানে গতানুগতিক, তাঁহারা সেখানে যুক্তি বা প্রজ্ঞার, বুদ্ধি বা বোধির আলোকে পথ চলেন। তাঁহাদিগকে আমরা বলি লোকোত্তর পুরুষ, 'হিরো' বা 'সুপার-ম্যান', তাঁহারা প্রয়োজনমত প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া মানুষের চৈতন্য বা শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তোলেন। ধর্মের গ্লানিকে দূরীভূত করিয়া তাঁহারাই ধর্ম সংস্থাপন করেন। কিন্তু কোন মহামানব বা মহান্ পুরুষ দেশ-কালের প্রভাবকে একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন না। আমরা কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের মহাপুরুষের সঙ্গে ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন কালের আর একজন মহাপুরুষের তুলনা করিতে পারি, আবার যাঁহারা একই কালে ও একই জাতির মধ্যে আবির্ভূত হন, এইরূপ দুইজন লোকোত্তর পুরুষের জীবনী ও বাণীর তুলনা করিতে পারি। আমরা আজ বাংলাদেশের এইরূপ দুইজন যুগমানবের চরিত-কথা আলোচনা করিব,—ইঁহাদের একজন নরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি উত্তর কালে স্বামী বিবেকানন্দরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ও আর একজন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পরবর্তী জীবনে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। বাংলার এই দুইজন বীর সন্ন্যাসী একদিন বাঙালীর জাতীয় জীবনে কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ইঁহাদের উদাত্ত আহ্বানে বাংলার তরুণদল একদিন কি ভাবে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল এবং দুর্বর্ষ ও মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিল, এ কালের বাঙালী তাহা সম্যক্‌রূপে ধারণাও করিতে পারিবে না। দুঃখের বিষয়, বাঙালী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের শতবার্ষিকী ব্যাপক ভাবে উদ্‌যাপন করে নাই বা তাঁহার সঞ্জীবনী বাণীর স্মরণ ও অনুধ্যান করিয়া নবজন্ম লাভ করে নাই;—যদি করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, ব্রহ্মবান্ধব স্বামীজীর অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও কোনও কোন ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্বামীজীরই উত্তরসাধক।

স্বামী বিবেকানন্দ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। বাংলার এই দুইজন বীর সন্ন্যাসীর মধ্যেই আমরা দেখিয়াছি পৌরুষের দৃপ্ত মহিমা, প্রবল বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধ, তীব্র স্বদেশপ্রেম এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা। উভয়েই নিজ প্রজ্ঞার আলোকে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও পাশ্চাত্ত্য দেশে বেদান্তের প্রচার করিয়াছিলেন। উভয়ের প্রকৃতিতেই ছিল একটা দুর্দমনীয় চাঞ্চল্য কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের ফলে বিবেকানন্দ অধ্যাত্ম জগতের সত্যসকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—তাঁহার মধ্যে যে গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধবের মধ্যেও তীব্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল। এবং সেই সঙ্গে দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের স্বপ্নও তিনি দেখিয়াছিলেন। কিশোর ব্রহ্মবান্ধব ভারত উদ্ধারের সংকল্প লইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্রায় বিনা সম্বলে চারিজন বন্ধুর সহিত গোয়ালিয়র যাত্রা করিয়াছিলেন,—ইহার কৌতুককর কাহিনী তিনি 'আমার ভারত উদ্ধার' নামক আত্মকথায় বিবৃত করিয়াছেন। আবার পরিণত বয়সে, যখন তিনি নর্মদাতীরে আশ্রম নির্মাণ করিয়া ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন এক দৈববাণী শুনিয়া তিনি লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং 'সংসারের রণরঙ্গে' মত্ত হইলেন। ব্রহ্মবান্ধব স্বয়ং লিখিয়াছেন:

"আমার ঘর নাই—পুত্রকলত্র কেহ নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত

হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম। কত চেষ্টা করিলাম কথাটা ভুলিয়া যাইতে কিন্তু যত ভুলিতে যাই তত ওই কথাটি প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

কথাটা কি। ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জনে ধ্যান-ধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে।"

ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় জ্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। 'সন্ধ্যা'র ভাষা শুধু সর্বজনবোধ্যই ছিল না, সে ভাষায় ছিল একটা তীব্রতা, একটা 'ফেনিল উন্মত্ততা', একটা কঠোর রূঢ়তা,—শরের মতই সে ভাষা পাঠকের অন্তর বিদ্ধ করিত। প্রবন্ধের শিরোনামা অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের মনে চমক লাগাইত। পরলোকগত সজনীকান্ত দাস মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—"বাংলা গদ্য সাহিত্যে নিজেই ব্রহ্মবান্ধব একটা স্টাইল এবং সে স্টাইল অননুকরণীয়।"

সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব নিজে রণরঙ্গে মাতিয়া বাংলার তরুণ দলকে মাতাইয়া তুলিলেন। নিজের মুক্তি চাহিলেন না, চাহিলেন দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তি। ধ্যানধারণা, সাধনভজন সকলই তাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী হইতে পারিলেন না।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও স্বদেশপ্রেম ছিল তীব্র, যদিও সে স্বদেশপ্রীতির সহিত বিশ্বমৈত্রীর কোন বিরোধ ছিল না। বিবেকানন্দের মধ্যেও একটা দ্বৈত সত্তা ছিল, এই জন্য যদিও তিনি ধ্যান বা সমাধির মধ্যে মগ্ন হইয়া এমন একটি অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন যাহা অবাঙ্‌মনসোঃগোচর, তথাপি দেশের অগণিত নরনারীর দুর্গতি মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসীকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। আর এই জন্যই তো উজ্জ্বল প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্বামীজী, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত স্বামীজী বাংলার যুবশক্তির উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। স্বামীজী লিখিয়াছেন—

"দেশের দশা দেখে আর পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারি নে। সমাধি-ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়, 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং' হয়ে যায়।"

বাস্তবিকই মনে সন্দেহ জাগে, ইহা কি স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা?

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব উভয়েরই ভাষায় সময়ে সময়ে যথেষ্ট উগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু স্বামীজী প্রধানতঃ তাঁহার দেশবাসীদিগকে কশাঘাত করিয়া তাঁহাদের চৈতন্য জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন, আর 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক দেশের তরুণদের মনে জাতিবৈরের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে 'ফিরিঙ্গি'দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চাহিয়াছেন। বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব উভয়েরই ভাষায় তাঁহাদের প্রবল ব্যক্তিত্বের নিদর্শন সুস্পষ্ট। তথাপি বিবেকানন্দের গদ্যরীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের এবং ব্রহ্মবান্ধবের গদ্যরীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ আত্মপ্রত্যয়হীন, ঘোরতর তমোগুণে আচ্ছন্ন, দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাপরায়ণ, স্বদেশবাসীর অন্তরে তীব্র রজোগুণ জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন আমরা অনেক সময়ে তমোগুণকে সত্ত্বগুণ বলিয়া ভুল করি এবং মনে করি, আমরা বুঝি আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হইতেছি। ব্রহ্মবান্ধবের কণ্ঠেও স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবান্ধব বলিতেছেন—

"তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রজোভাবের দ্বারা উহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। আর রজোগুণটা স্বভাবতঃ কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নরম প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের ঐ কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাবকাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না। তাই বলিয়া কি সেই আফিমখোরের আর চাবকানো ভাল লাগে। রজোগুণের দ্বারা তমোভাব দূর হইলে সত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে। তমঃতে সত্ত্ব বসে না, তাই রজঃ চাই। শেষে সত্ত্ব। সত্ত্বই বা শেষ কেন? তিন গুণের অতীত হওয়াই শেষ—নির্ব্বাণ মুক্তি।" (পরলোকগত সজনীকান্ত দাস রচিত 'ব্রহ্মবান্ধবের সন্ধ্যা' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতিটি গৃহীত হইয়াছে।)

ব্রহ্মবান্ধব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে আমাদের রজোগুণের চর্চা করা প্রয়োজন। স্বামীজী অনাগত যুগের উজ্জ্বলতর ও মহত্তর ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তিনিও বিশ্বাস করিয়াছেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে জয়ী হইতে হইলে আমাদিগকে রজোগুণকে জাগ্রত করিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না. তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন, সমাজে খাঁটি মানুষ তৈয়ার হইলে, বীর্যবান, প্রজ্ঞাবান, শ্রদ্ধাবান, চরিত্রবান মানুষের আবির্ভাব হইলে সমাজ-দেহের সকল বিকৃতি আপনিই দূরীভূত হইবে। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমি চাই আমূল পরিবর্তন (I want root and branch reform)। আমি এমন ধর্ম প্রচার করিতে চাই যাহাতে যথার্থ মানুষ গড়িয়া ওঠে (I want to preach a man-making religion)।" যথার্থ জাতিভেদ ও অধিকারবাদের মধ্যে যে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, এ কথাও স্বামীজী স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি সমাজে যেখানে স্বামীজী অনাচার, অত্যাচার ও কদাচার দেখিয়াছেন, সেখানে তিনি নির্মম ভাবেই আঘাত করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা, অবনত পুরোহিত-সম্প্রদায়ের বৃথা আভিজাত্য গর্ব, মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমারূপিণী নারীজাতির উপর পুরুষের অত্যাচার এবং নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি অনাগত শূদ্র যুগের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, অননুকরণীয় ভাষায় তিনি সমাজের অভিজাত শ্রেণীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক।" স্বামীজী এই শ্রেণীকে 'অতীতের কঙ্কালচয়' ও 'হাজার বছরের মমি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন আর শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে বলিয়াছেন 'রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন'। কিন্তু স্বামীজীর সমাজ-চিন্তা বৈপ্লবিক হইলেও ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন এ বিষয়ে রক্ষণশীল। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কল্যাণের যে আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে, তিনি শুধু সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, ধর্মে রোমান ক্যাথলিক হইয়াও ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন আর সকলকে ব্রাহ্মণের শিষ্য হইবার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি নিজেকে 'ঈশাপন্থী হিন্দু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাই মনে হয়, তাঁহার জীবনে ধর্ম ও জাতীয়তার আদর্শ এক হইয়া গিয়াছে।

অবশ্য, ব্যাপক অর্থে 'হিন্দু' বলিতে বুঝায় 'ভারতীয়', ভারতভূমিকে যিনি মাতৃভূমি বলিয়া মনে করেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যিনি শ্রদ্ধাবান, তিনিই ছিলেন ব্রহ্মবান্ধবের নিকট হিন্দু। অপরের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াও আমাদের 'হিন্দু' অর্থাৎ সনাতন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া গৌরববোধ করা উচিত। স্বামীজীর মধ্যেও এই গর্ববোধ ছিল প্রবল। স্বামীজীও ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—

"If there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed *Punyabhumi*, to be the land to which souls on this earth must come to account for Karma, the land to which every soul that is wending its way Godward must come to attain its last home, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, towards generosity towards purity, towards calmness, above all, the land of introspection and of spirituality."

ব্রহ্মবান্ধবও আমাদিগকে উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন—

"Whatever you are, be proud that you are a Bengalee, that you are a Hindu."

যাঁহারা এই সকল উক্তির মধ্যে সংকীর্ণতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় পান, তাঁহাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত।

রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মত স্বামী বিবেকানন্দও প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন, আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে পাশ্চাত্যের উদ্যমশীলতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আর পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে আমাদের অধ্যাত্মবাদ, আমাদের বেদান্তদর্শন। বেদান্তকে কি ভাবে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার নির্দেশও স্বামীজী আমাদিগকে দিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব এই মিলনের কথা বলেন নাই কিন্তু ভারতের বেদান্ত ও সমাজদর্শন (Social Philosophy) প্রতীচ্য দেশে প্রচার করিয়াছেন।

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব উভয়েই স্বধর্মভ্রষ্ট, পরানুচিকীর্ষু বাঙালী জাতিকে আত্ম-সম্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা যদি বাংলার এই দুইজন বীর সন্ন্যাসীর নিকট হইতে নবজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আবার আমরা উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতে পারিব এবং অচিরেই সকল যুগসংকট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব।

—

বিবেকানন্দ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আনন্দ তব নিবিড় গভীর, বিবেক বিশুদ্ধ,
গুরুর কৃপায় কৃচ্ছ্রসাধনে হইয়াছ সিদ্ধ।
তোমার চিন্তা একাকী কেবল ভারতের লাগি নয়,—
তুমি চাহিয়াছ গোটা বিশ্বের ধর্ম সমন্বয়।
তুমি দেখাইলে গণ্ডীমাঝেও মিলেন জগন্নাথ
গৃহদেবতাই বিশ্বদেবতা হয়ে দেন সাক্ষাৎ।
তব তপস্যা ভবনে করিল ভুবন প্রতিষ্ঠা,
সকল জাতিরে আত্মীয় তব করিয়াছে নিষ্ঠা।
সমতল ভূমি উজলি সহসা মহা বিস্ময়বৎ—
এলে তুমি যেন সুদূর শীর্ষ রজতের পর্বত।
জড়ের দেশেও চেতনা দানিলে নাহি তাহে সন্দ—
সকল জীবকে শিব করে নিলে আনন্দ কন্দ
আধ্যাত্মিক আমেরিকা—সে তো তোমারি আবিষ্কার
সীমা সম্পদ বাড়াইলে তুমি ভারতের মহিমার।

বিবেকানন্দ

শ্রীকালিদাস রায়

যে অনল তুমি জ্বালিয়া গিয়াছ
উদীরণ করি শ্রুতি,
আহিতাগ্নিক, সে অনলে তুমি
দিয়াছ আত্মাহুতি।
নিভে নি আজিও সেই যাগানল
লভিছে নিত্য সমিধের বল
জড়তা-শৈত্যে প্রাণে পাই তার
প্রতাপের অনুভূতি॥
ভারত তনুর অণুতে রেণুতে
তারি তেজ আজও জ্বলে।
তারি তাপ করে কল্পতরুকে
মণ্ডিত ফুলে ফলে।

গন্ধ তাহার শ্বাসের বায়ুতে
দেয় শুচি ওজঃ স্নায়ুতে স্নায়ুতে,
এই ভারতের জাতীয় জীবনে
লভেছে অমৃতদ্যুতি॥
যে হোমানলের ভস্মতিলক
ভারত-ললাটে আঁকা,
স্বপ্নচিন্তা সবই হল তার
হবির্গন্ধ মাখা।
সে অনল আজ এ ভুবনময়
সাত্ত্বিকালোকে তমঃ করে ক্ষয়
সেই অনলের প্রতিটি আহুতি
হল অসীমের দূতী॥

স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে

বনফুল

১

পাথরের বুকে হাতুড়ি হেনেছ সারাটা জীবন প্রভু,
পাথর ফাটিয়া ঝরনার ধারা বাহির হয় নি তবু
পাথর পাথরই আছে,
ফুলকি উড়েছে দু'চারটি শুধু, রচিয়াছে ইতিহাস,
উষর মরুতে কিন্তু, দেবতা, গজায় নি আজও ঘাস
এক ফোঁটা জল আসে নি এখনও
তৃষিত ঠোঁটের কাছে।

২

মঞ্চে মঞ্চে সভা আর সভা,—মিথ্যা মহোৎসব
দেবতার নয় মানুষের নয় মুখোশের কলরব!
হাসে তারা খল খল
পিশাচের হাসি, ভণ্ডের হাসি, আত্মপ্রচার করে
দেশের বুকের ক্ষত থেকে, দেব, আজও যে রক্ত ঝরে,
এখনও বাঙালী বাঙালীই আছে
ভিক্ষাই সম্বল।

৩

দানবেরা আজও জয়ী হ'য়ে আছে, দেবতারা পলাতক
সমাজে আজিকে পূজ্য যাহারা, তারা চোর প্রতারক,
অসতীরা আজ দেবী
ইন্দ্রের পূজা করি না আমরা ইন্দ্রিয়-পূজা করি
রাবণের ঘরে বন্দিনী আজও সীতা পরমেশ্বরী
ভীষ্ম বিদুর দ্রোণেরা হৃষ্ট
কৌরব-পদ সেবি'।

৪

তোমার নামের মহিমা লইয়া ব্যবসায়ে মোরা মাতি
নাম-নামাবলী জড়াইয়া গায়ে তারই শিরে ধরি ছাতি
নমি তাহাদেরই পায়
যারা অতি নীচ পাপী নরাধম টাকা-সম্বল যারা
যাদের পীড়নে ঘরে ঘরে আজ বহে দুঃখের ধারা
দীনের অশ্রু উচ্ছ্রিত হয়
বিলাসের ফোয়ারায়।

৫

হে প্রভু, তোমার আশার কাননে ফোটে নি
আজও কুসুম
জাতির নয়নে জড়ায়ে রয়েছে মহাজড়তার ঘুম;
অহং মদের ঝোঁকে
মাঝে মাঝে যারা চিৎকার করি' কাঁপায় ঘরের ছাদ
জীবনের গান নহে তাহা, প্রভু,—তা শুধু আর্তনাদ,
দুর্যোধনের আক্ষেপ তাহা
সমন্ত-পঞ্চকে।

৬

তবু আশা করি—আশাই এখন জপমালা আমাদের—
তপস্যা-পূত তোমার সাধের আসিবে সুদিন ফের,
তোমার বহ্নি-জ্বালা
সব জঞ্জাল দগ্ধ করিবে, প্রতিভা জ্যোতির্ময়ী
আকাশে আনিবে নবীন প্রভাত, মানুষই হইবে জয়ী—
সত্য শিব ও সুন্দর গলে
আবার দুলিবে মালা।

—

বিবেকানন্দ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে কানে যেন অনেক দূরের কথা শুনি কার,
সে দূরত্ব মাটী মাপা নয় ; কাল থেকে কালান্তর পার
হয়ে আসে ; হয়তো বা অনেক হাজার বছর অতীত
হতে ধ্বনি আসে—হিংসা মিথ্যা মৃত্যু মিথ্যা জীবন অমৃত।

আকাশে জিজ্ঞাসা করি তুমি কে ? ধ্বনি বলে আমি বুদ্ধ।
সে বাণীতে ওই মাঝে—এ জগতে অন্ধকারে অবরুদ্ধ
মানুষের মৃত্যুভীত আর্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায় ;
আলো জ্বলে ওঠে—মানুষ মিছিলে খোঁজে অমৃত কোথায়।
পথ চলে পথভ্রান্ত মানুষেরা আবার আঁধার খোঁজে।
অরণ্যে গুহায় ঢুকে হতাশে এলায়ে দেহ চোখ বোজে।

অন্ধকারে মৃত্যুভয় জাগে, ভয়ার্ত মানুষ মৃত্যু স্থির
জেনে, আকণ্ঠ আসব পানে হয়ে ওঠে প্রমত্ত অধীর।
আবার নতুন কণ্ঠ শুনি, ভয় নাই—ওরে ভয় নাই—
অমৃতের পথযাত্রী মোরা অমৃত সন্তান আমরাই—।
শত শত বৎসরের গাঢ় অন্ধকারে উঠেছিল বাণী—
মানুষেরা পেয়েছিল—অপরূপ একজন অমৃতসন্ধানী
মানুষকে। দীপ্তকান্তি দৃপ্তদৃষ্টি নির্ভয় ভাস্বর—
ক্লিষ্ট মানুষের বক্ষোমাঝে সম্মুখে সে দেখালো ঈশ্বর।
আজি তার বাণী ভেসে আসে শতবর্ষ অতীতের পার
হতে, অন্ধকারে নিদ্রাঘোরে। প্রশ্ন করি কণ্ঠস্বর কার ?
দিগন্ত উত্তর দেয়, ভারতের তপস্যায় জাগরণ ছন্দ
সঞ্জীবনী হোম, ঋষি রামকৃষ্ণ—হোতা সে বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ স্মরণে

শিবদাস চক্রবর্তী

আরও বিবেক চাই, প্রতি কাজে জাগ্রত বিবেক,
মনোরাজ্যে মর্ত্যপ্রিয় মানুষের পুণ্য অভিষেক।
চাই না জ্ঞানের মাঝে প্রীতিহীন নীতির ছলনা,
অক্ষম ক্লীবের মত স্বার্থপর ভণ্ডের বন্দনা।
আরও আনন্দ চাই—যে আনন্দ বীর্যে বলীয়ান,
মাটির পৃথিবী করে যে আনন্দে নিত্য স্বর্গস্নান,
অকারণ হাসি হয়ে যে আনন্দ ফোটে শিশুমুখে,
জাগায় বাঁচার আশা বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতের বুকে।

তুমি ছিলে সে বিবেক, সে আনন্দ মর্তে মূর্তিমান,
রিক্তবিত্ত অনাদৃত যারা এই মাটির সন্তান,—
দেখেছ তাদেরি মাঝে বহুরূপে ঈপ্সিত ঈশ্বরে,
জীব-প্রেমে শিব-সেবা—এ প্রত্যয় জাগ্রত অন্তরে।
সে বিবেক অন্তর্হিত, সে আনন্দ অতীত স্বপন
নিঃশব্দ শতাব্দী অন্তে আজ তাই সোচ্চার স্মরণ।

স্বামী বিবেকানন্দ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার যতটুকু জ্ঞান তাতে মনে হয়—হিন্দু জাতি হিসাবে আমাদের কতকগুলি জন্মগত অভ্যাস আছে। সেই অভ্যাসগুলি আমরা কোনও কিছু না জেনে, না ভেবে, বিচার বিবেচনা না করেও করে থাকি। যেমন কোনও জটাজুটধারী সাধুসন্ন্যাসী দেখলেই আমরা তাঁর পায়ে মাথাটা নুইয়ে ফেলি। যেমন বাপ-মা মারা গেলে তাঁদের শ্রাদ্ধের সময় আমরা যেরকম হোক একজন পুরুত ডাকি, চালকলা, তিল-তুলসী ইত্যাদি অনেক কিছু সংগ্রহ করি, তারপর পুরুত হয়তো একবর্ণ সংস্কৃত জানেন না, তিনিও তাঁর অভ্যাসমত কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র অবিশুদ্ধ উচ্চারণে বলে যান, আমরা ততোধিক অবিশুদ্ধ ভাবে সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করে আমাদের কর্তব্য শেষ করে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করি। এবং শ্রাদ্ধান্তে হবিষ্যান্ন পরিত্যাগ করে মাছ ভাত খেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকীতে বিবেকানন্দকেও তেমনি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, না একটি সভার আয়োজন করে পুরুতের বদলে একজন সভাপতি ডেকে তাঁর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করছি কে জানে!

আমরা ভারতবাসী। শ্রদ্ধাশীল জাতি বলে আমাদের খ্যাতি আছে। আমরা অকৃতজ্ঞ নই, আমরা পরম সহিষ্ণু, তাই বোধ হয় জন্মজয়ন্তী মৃত্যুবার্ষিকী এই সব কাজ আমরা আমাদের জন্মগত অভ্যাসের দোষে হোক গুণে হোক, করে থাকি। যেমন ধরুন, একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হল কদাকার কুৎসিত জন্তুর মত একটা মানুষের সঙ্গে। দেখা গেল মেয়েটি সারাজীবন তার পতিকে পরমগুরু মনে করে সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা অম্লানবদনে সহ্য করে পাঁচ ছেলের মা হয়ে মাথায় ডগডগে সিঁদুর পরে পায়ে লাল আলতার ছোপ দিয়ে একদিন স্বর্গবাস করলে। আবার ঠিক তার উল্টোটাও দেখলাম। পরম সুন্দর একজন সুপুরুষ বিয়ে করলে একটি কুৎসিত বগড়াটে কুঁদুলী মেয়েকে। সেখানেও তাই। জীবন চলল অপ্রতিহত গতিতে। পুরুষ প্রবল প্রতিপক্ষ, তাই খিটিমিটি হয়তো বাধল, কিন্তু সেইখানেই শেষ। আদালত পর্যন্ত ঝগড়াটা গড়াল না। বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরেই আবদ্ধ রইল। এবং সেই অসম দম্পতি তাদের অবাঞ্ছিত অনাহূত পুত্রকন্যাদের নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিলে। এ শুধু আমাদের এই দেশেই সম্ভব। এ যেন একটা জন্মগত সংস্কার।

শুধু সংস্কারের মোহাচ্ছন্ন তন্দ্রার আবেশে ভারতের আপামর সাধারণের জীবনগুলো যদি যাপিত হয়, কোথাও যদি জীবন্ত প্রাণের সাড়া না থাকে, হচ্ছে হোক চলছে চলুক এই ভাবেই সবকিছু চলে, তাহলে জীবন্ত মানুষের একটা সমাজ কখনও উন্নতি করতে পারে না। বুঝতে হবে হৃদয়াকাশের মেঘ সেখানে কাটে নি। সব যেন ঘটে যাচ্ছে যন্ত্রের মত। মনোবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন স্ফূর্তি সেখানে নেই। হৃদয়ের বিকাশ নেই, প্রাণের স্পন্দন নেই, আশার তরঙ্গ নেই। ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা—কোথাও কিছু নেই। তীব্র সুখের অনুভূতি নেই, বিরাট একটা দুঃখের দহনজ্বালাও নেই। উদ্দীপনা, উত্তেজনা, এগিয়ে যাবার প্রস্ফুটিত হবার কোনও বাসনা পর্যন্ত নেই।

এর চেয়ে ভাল অবস্থা মানুষের হতে পারে কি না, মানুষ চিরজীবন সুখে এবং আনন্দে বাস করতে পারে কি না সে-কথা চিন্তাও করে না কেউ। চিন্তা করলেও বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করলেও একবার উদ্যোগী হয়ে চেষ্টাও করে না।

এই যে চেষ্টা—চেষ্টা করলেই হবে? না, হবে না। এইবার দেখা যাক কেন হবে না। এগুলি বিবেকানন্দেরই কথা। তিনিই বলে গেছেন। কোনও বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের মনে খুব ভাল করে বিদ্যাশিক্ষার বাসনা জাগল। খুব পড়তে লাগল সে। টপ টপ করে পাস করল, পড়া শেষ হয়ে গেল। অনেকগুলো ডিগ্রি পেল।
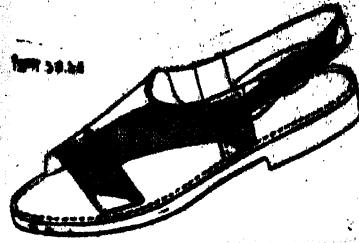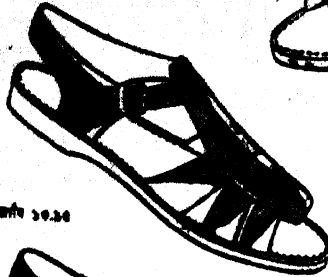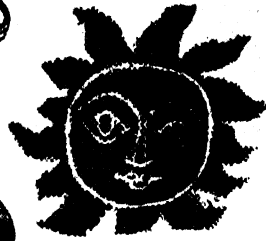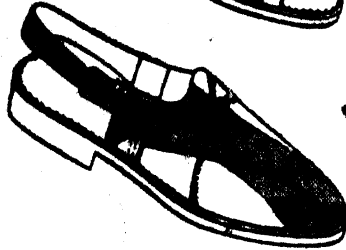
কিন্তু তবু যেন ঠিক মানুষের মত মানুষ হতে পারল না। চেষ্টা করেছিল, তবু হল না। যাকে ঠিক হওয়ার মত হওয়া বলে তা হল না।

কিন্তু কেন হল না?

এই কেন হল না—এই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু তাঁর দেশবাসীর জন্য নয়, সসাগরা ধরিত্রীর সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি বীজমন্ত্র দিয়ে গেছেন। যে বীজমন্ত্র তিনি পেয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নরদেহধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

তিনি বলে গেছেন—মানুষের সব জ্ঞান, বুদ্ধি, চেষ্টা—সব কিছুর পশ্চাতে আছে অনন্তশক্তির আধারস্বরূপ পরমাশ্চর্য এক অপরূপ বস্তু—যার নাম আত্মা। সেই অন্তর্নিহিত আত্মার আলোকচ্ছটা যদি আমাদের সর্ব কর্মপ্রচেষ্টার ওপর প্রতিফলিত না হয়, তাহলে কর্মের পরিণাম কখনও রমণীয় হবে না।

এই আত্মাকে অনুভব করতে হবে। দর্শন করতে হবে। জাগাতে হবে বললে ভুল বলা হবে। কারণ আত্মা সদাজাগ্রত। সর্বশক্তিমান।

একটা কথা আছে—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। বলহীন যে, সে কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না, অর্থাৎ তার আত্মদর্শন হয় না।

বল মানে কোন্ বল? খুব শক্তিমান? তাহলে তো সার্কাসের খেলা যারা দেখায়, যারা কুস্তিগীর, তাদের আত্মদর্শন হয়ে যেত। না, তা নয়। বল মানে সে বল নয়। সত্যাশ্রয়ী, ব্রহ্মচারী, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষ হয় অনন্ত বলশালী। হয় বীর্যবান।

সেই পরম পবিত্র মানুষ যদি স্থিতধি হয়, অর্থাৎ রিপুদ্বারা বিচলিত না হয়ে যদি হয় ধীর স্থির শান্ত সমাহিত, যদি হয় যোগযুক্ত, তাহলেই হবে আত্মার উদ্বোধন।

সেই আত্মাই আমাদের অন্তর্যামী আচার্য। বাইরের আচার্য—যিনি শিক্ষাগুরু, যিনি দীক্ষাগুরু। তিনি শুধু পথপ্রদর্শক। তিনি উদ্দীপক কারণ মাত্র। আসলে কাজ হবে অন্তরের ভেতরে—তোমার নিজের দ্বারা। তুমি যখন তোমার আত্মার ভেতর প্রকৃতির তত্ত্বগুলি অনুভব করবে, তখনই সেই অনুভূতি প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে আবির্ভূত হবে তোমার মনের মধ্যে। সেই ইচ্ছাশক্তিই কাজ করবে বাইরে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছা, তারপর কর্ম।

সুতরাং সবই হবে ভেতর থেকে বাইরে। বাইরে থেকে ভেতরে নয়।

Stand up, assert yourself, proclaim the God in you. Do not deny him. It is a manmaking religion that we want, man-making theories that we want. And here is the test of the truth—anything that makes you weak physically, spiritually, reject it as poison. Truth is strengthening, truth is purity. Have faith, faith in yourself. Do you feel? Do you feel that millions and millions have become brutes? Do you feel that millions are starving. Millions have been starving for ages. Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Does it make you also mad?

এই কথা বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন কখন? ইংরেজ তখন জেঁকে বসেছে ভারতবর্ষের বুকে। ভারতবর্ষ তখন পরাধীনতায় বেদনাজর্জর। তখন সমাজের রাষ্ট্রের যে অবস্থা ছিল, এখন তার চেয়ে খুব বেশি উন্নত হয়েছে বলে তো মনে হয় না। এখন আমরা স্বাধীন। এখন আমাদের দেশের কল্যাণের ভার আমাদের দেশবাসীরই হাতে। সুতরাং এ কথা আর বলবার উপায় নেই যে কি করব, আমরা পরাধীন, আমরা নিরুপায়!

কিন্তু হায় রে হতভাগ্য জীব! তোমরা তখনও যেমন পরাধীন ছিলে, এখনও তেমনি পরাধীন। তখন ছিলে ইংরেজের দাস, এখন তোমরা রিপুর দাস। নিজের ভিতরেই পাঁচ-পাঁচটি রাজাকে খাড়া করে সারা জীবন ধরে তাদের পূজো করে চলেছ। তারা যা বলছে তাই

করছ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আর মাৎসর্যের দাসানুদাস তোমরা।

বীর হও। খুব খানিকটা কসরত করে বলবান হয়ে অপরকে ডাণ্ডা মেরে বীর হতে হবে না। শরীরটা ব্যাধিমুক্ত নীরোগ রাখবার জন্যে যতটুকু ব্যায়ামের প্রয়োজন শুধু ততটুকুই কর, তারপর তোমার নিজের মধ্যে এই পাঁচটা শত্রুর মাথায় ডাণ্ডা মারবার মত শক্তি যদি সঞ্চয় করতে পার, তাহলে তোমাকে বলব বীর। বীরশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেই বীরত্ব অর্জন না করেই যদি ফুল বেলপাতা নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে নানান দেবতার কাছে পুজো দিয়ে কেঁদে কেঁদে ভগবানকে খুঁজে বেড়াও, সে সবই হবে তোমার পণ্ডশ্রম। অনেক দিন ধরে অনেক তো ভেবেছ, অনেক বিপদের দিনে হা ভগবান, হা ভগবান বলে অনেক কান্না কেঁদেছ, কিন্তু তিনি শুনেছেন কি? তিনি তোমার অজ্ঞতা দেখে হেসেছেন আর তোমার দুঃখ দেখে কেঁদেছেন। ভগবান বলেছেন—একটা অদৃষ্ট নিয়মশৃঙ্খলায় আমি বেঁধে দিয়েছি সমস্ত বিশ্বচরাচরকে। এখানে আমি নিজেই নিরুপায়। তোমাকে পশুত্ব থেকে মানবতায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছি, জ্ঞান দিয়েছি, বুদ্ধি দিয়েছি, ভালমন্দ বিচারের জন্য দিব্যচক্ষুও দিয়েছি। তবু তুমি আবার ফিরে যেতে চাচ্ছ সেই পশুজন্মে। যাও, আগে তুমি তোমার নিজের মন্দিরে প্রবেশ কর। দেখবে সদাজাগ্রত তোমারই আত্মচৈতন্যে আমিই শুধু নিঃসঙ্গ একাকী। বিনিদ্র বসে আছি তোমারই মধ্যে। একবার ফিরেও তাকাও না আমার দিকে। আগে তোমার শরীররক্ষীদের সরিয়ে দাও। ওরা তোমাকে সহজে আসতে দেবে না আমার কাছে। মানবত্ব অর্জন না করলে অপবিত্র দেহে দেবদর্শন সম্ভব নয়। তোমার মধ্যে যে পশু আছে তাকে বলি দিতে হবে সর্বাগ্রে। রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। এই তোমার জীবনসংগ্রাম। সেই সংগ্রামে জয়ী হয়ে বিজয়ী বীরের মত এস আমার কাছে। তখন দেখবে তোমার চোখের সুমুখ থেকে অন্ধকার যবনিকা সরে গেছে। তখন আর শুধু মন্দিরে মন্দিরে নয়—সর্বত্র দেখবে তোমার দেবতাকে—সর্বজীবে, সর্বচৈতন্যময় সত্তায়। রূপান্তর ঘটবে। তোমার নবজন্ম হবে। দ্বিজ হবে তখন। তখন মন এবং কায়— একাকার হয়ে যাবে। যে রিপুকে তোমার শত্রু মনে হয়েছিল তারাই হবে তোমার বন্ধু। তোমার একমাত্র প্রিয় সাথী হবে তোমার রিপু, তোমার ইন্দ্রিয়। তোমার শরীর হবে তখন দেবমন্দির।

নিজে এই সংগ্রাম করে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষকে। পাঁচটি রিপুর রাশ বজ্রমুষ্টিতে ধরেও যখন তিনি মন্দিরের দেবীকে দেখতে পেলেন না, তখন বলেছিলেন, আমি কি এখনও পশুই রয়ে গেলাম? তাহলে এই খড়্গ দিয়ে সে পশুকে আমি বধ করে ফেলব। তখন লীলাচঞ্চলা ভবতারিণীর দর্শন পেয়েছিলেন তিনি।

শ্রীরামচন্দ্রও যখন নিজের মানবধর্মকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করে পরনারী অপহরণকারী কামার্ত পশুবধে উদ্যত হয়েছিলেন, অকস্মাৎ তাঁরও মনে এই সংশয় জেগেছিল— 'আমি আমার মানবতাকে প্রজ্বলিত ক্রোধরিপুর হুতাশনে আহুতি দিচ্ছি না তো?' লীলাচঞ্চলা বহিঃপ্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী দশভুজাকে দেখতে চেয়েছিলেন চোখের সুমুখে। প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন।

নীলপদ্মের অভাবে নিজের চোখ উপড়ে শ্রীরামচন্দ্র দেবীর পুজো করেছিলেন—কথাটা উপমামাত্র। আসলে তিনি বলেছিলেন, আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সুমুখে এসে দাঁড়াও মাতৃরূপা তুমি দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা! দু চোখ ভরে দেখি তোমার জীবন্ত রূপ, তা যদি না দেখতে পাই, তাহলে বৃথাই আমার এই চক্ষু। এই চোখ আমি দিলাম উপড়ে তোমার পায়ের তলায়।

কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের মনেও ঠিক এই প্রশ্ন। পরমবন্ধু তাঁর দেহরথের সারথি অন্তর্যামী হৃদয়স্থিত হৃষীকেশকে জানিয়েছিলেন সঙ্কটমুহূর্তে তাঁর জীবনের জিজ্ঞাসা।

আমাদের সত্যদ্রষ্টা ভারতবন্ধু স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথাই বলে গেছেন আমাদের। বলে গেছেন মানুষ হয়ে জন্মেছ—আগে বীর্যবান মানুষ হও। বলবান হও। রিপুর বল্গা কষে ধরবার মত সামর্থ্য অর্জন কর তারপর পরম পবিত্র চিত্তে, পবিত্র দেহে, মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত মানুষের মর্যাদা নিয়ে নিজেরই মনোমন্দিরে প্রবেশ কর। অন্তর্যামী হৃদয়স্থিত হৃষীকেশের সঙ্গে যোগযুক্ত হও। তারপর তাকাও বাইরের দিকে— দেখবে তখন তোমার ওই মন্দিরের মাটির পুতুল জীবন্ত

দীপ্ত-পৌরুষ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
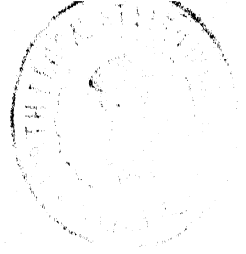
কল্যাণবরেষু,

"আমার জীবনে বিবেকানন্দ" এই শীর্ষকে একটি লেখা দিতে বলেছ। এতে মনে হয় তুমি এই কথাটা সত্য বলে ধরে নিয়েছ যে বাংলার লেখকমাত্রেরই মনে বিবেকানন্দের প্রভাব বর্তমান। আশা করতে অবশ্য কোন বাধা নেই, কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে কি কথাটা অতখানি সত্য ?

আমি নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, আমার মধ্যে এ প্রস্তাব সত্য হয়ে ওঠে নি, হলে এইরকম এক কর্মহীন নগণ্য জীবন যাপন করতাম না। কথাটা একটু স্পষ্ট করি—

প্রত্যেক মনীষীর জীবনের ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দেখা যায় এমন একটি ঘটনা আর সবের চেয়ে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে যা আর সবকেই খানিকটা নিপ্রভ করে দিয়ে যেন তাঁর বিশেষ পরিচয়পত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা হচ্ছে শিকাগোর Parliament of Religions-এ তাঁর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সেই বিস্ময়কর ভাষণ—যা তাঁকে কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই বিশ্বের ধর্মচেতনার একেবারে মাঝখানটিতে দাঁড় করিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্মভূমিকেও। চিত্রাঙ্কনের পরিভাষায় বলতে গেলে এইটিই তাঁর ব্যক্তিত্বে সবচেয়ে হয়ে রইল High-lighted বা উজ্জ্বলতম অংশ। এর দ্বারাই বিবেকানন্দ জগতের অন্যতম বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক-রূপে বিশ্বাসী বিশ্বের অন্তরে আসন পেতে নিলেন।

শুনতে বোধ হয় একটু খারাপ লাগবে তোমার, দুঃখের বিষয় তাঁর নিজের দেশেও কেন এই পরিচয়টিই মুখ্য হয়ে রইল, কেন না আমরা নিজের জনকেও নিজের চোখে দেখতে জানি না—অন্যের credentials-এর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিতে হয়।

অথচ বিবেকানন্দের সমস্ত জীবনটা আলোচনা করলে দেখতে পাই নিজের দেশে ধর্মপ্রচার করা নিয়ে তাঁর একেবারেই কোন তাগিদ ছিল না। বরং, এ কথাটাও শুনতে হয়তো খারাপই লাগবে—দেশটাকে অতি-ধার্মিকতার জড়ত্ব থেকে টেনে তোলাই যেন জীবনের ব্রত ছিল তাঁর। অবশ্য, আচার-ধর্মের কথাই বলছি আমি।

এর দুটি কারণ ছিল। যে সত্য-ধর্মকে প্রচার করতে তিনি একাধিকবার বিশ্ব-পরিক্রমা করেছিলেন, তা বাইরের পক্ষেই নূতন, ভারতের পক্ষে একেবারেই নয়। তার ঘরেরই জিনিস তো।

জাগ্রত হয়ে উঠেছে, তখন দেখবে তোমার চারিদিকে যে বিশ্বপ্রকৃতি—যাকে এতদিন জড় অচৈতন্য বলে মনে হয়েছিল তোমার—সেখানেও দেখবে অনন্ত চৈতন্যের খেলা। তখন আর তোমার দ্বারপ্রান্তে অবহেলিত পদদলিত অস্পৃশ্য অশুচি বলে মনে হয়েছিল যাদের—যারা ছিল মুচি, মেথর, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, তারা আর অশুচি থাকবে না। মনে হবে জীব কোথায় ? সবই তো শিব। সর্বত্রই সেই একই আত্মচৈতন্য। তোমার হৃদয়ের অনুভূতির কেন্দ্র হবে জাগ্রত, অপরের দুঃখ মনে হবে তোমার নিজের দুঃখ—সহানুভূতির স্পন্দন অনুভব করবে নিজেরই হৃদয়ে।

পৃথিবীটা স্বর্গ হয়তো কোনদিনই হবে না। তবে এই পৃথিবীর মানুষের অধিকাংশ হবে মনুষ্যত্ববোধে আত্মসচেতন, পরদুঃখ মোচনের আগ্রহ হবে ঐকান্তিক ; দেশের দুঃখ দুর্ভাগ্য অনেকাংশে কমে যাবে। আর তুমি যদি স্বামীজীর অনুবর্তী হও তো তুমি হবে পরম সুন্দর একটি সদানন্দময় মানুষের মত মানুষ।

—

ভাল কফি....
প্রিয়জনের মতই মধুর
এক কাপ ভাল কফির মত আনন্দদায়ক আর কিছু নেই। কফির আমেজ সহজেই লোককে কাছে টানে।
মেজাজ যেমনই থাক
কফি খেলে মজা পাবেন

তবু ঘরের জিনিস হয়েও যেন হারিয়ে বসে আছে। অথবা, আরও বা খারাপ, সেই মহদ্ধর্মের একটা বিকৃত রূপ আঁকড়ে পড়ে আছে সে। এর কারণটা অনুসন্ধান করতে গিয়েই তাঁর জীবনের দিক-পরিবর্তন হয়ে গেল। যুগাচার্য রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগী থেকে কর্মযোগী হয়ে উঠলেন। তিনি দেখলেন যুগ-যুগের পরাভব-পরাধীনতার চাপে জাতির চিত্ত নিষ্পেষিত। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—যে মহাধর্ম আত্মোপলব্ধির উপরই প্রতিষ্ঠিত তাকে ধারণ করবার আধারই কোথায় এ-জাতের? লালন করবার শক্তি কোথায়, সে হৃদয়বত্তা কোথায়? বাইরের জ্ঞানযোগী ভারতে নিলেন শুধু কর্মযোগের সাধনা এই দৈন্য দূর করবার জন্যে।

কন্যাকুমারিকার পুণ্যভূমি। ভারতের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যেখানে শাশ্বতী কন্যা ভারতের আর এক প্রান্তে শাশ্বত পুরুষের উদ্দেশে বরমাল্য হাতে রয়েছেন প্রতীক্ষায়। এখানে দাঁড়ালে দূরত্ব থাকে না। এইখানে তিনটি সাগর-বিধৌত শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আসমুদ্র-হিমাচল সমস্ত ভারতকে এক দিব্যদৃষ্টিতে নিলেন বিবেকানন্দ সেই একটি স্মরণীয় দিনে।

বেদনাতুর সে দৃষ্টি কিন্তু। শুষ্ক আচার-জর্জরিত, খণ্ডিত, দাসত্ব-শৃঙ্খলিত, অবহেলিত ভারত, এর সাধ্য কি গীতার পৌরুষকে অন্তরে গ্রহণ করে, বেদান্তের মর্মকথাকে জীবনে করে প্রতিফলিত।

জগৎকেও এ কথাটা বলা প্রয়োজন ছিল। করুণ আবেদনে নয়। দেশের দুঃখ-দৈন্য যেমন সেদিন তাঁকে বিচলিত করেছিল, তেমনি দেশের অধ্যাত্ম সম্পদে, দেশের ভবিষ্যতে ছিল তার অবিচল আস্থা। তাঁর ভাবটা ছিল, জগতের কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন ভারতের পুনরুজ্জীবন। বেদান্ত-প্রচারের মাঝে মাঝে এই কথাটাই বজ্র-নির্ঘোষে বেরিয়ে এসেছে তাঁর মুখ দিয়ে। আবেদন নয়, একটা দাবি—কতকটা এই মর্মে যে, ভারত গেল তো আর রইল কি?—Who lives if India dies?

শুধু কথা নয়, শুধু দম্ভ নয়। যে ধর্ম তাঁর গুরুর জীবনব্যাপী সাধনার সারবস্তু, তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করবে তাঁর দেশ। তার জন্যে চাই মুক্তি—দাসত্ব থেকে, দারিদ্র্য থেকে, অশুভ ভেদবুদ্ধি থেকে। তারই সাধনায় নিরত হলেন কর্মযোগী বিবেকানন্দ।

তাঁকে ঠিকমত চিনলাম কই? পড়ল কই তাঁর প্রভাব আমার ওপর, বা সমগ্র জাতিটার ওপরই? আমরা ধরে বসে আছি তাঁর সে একটি দিনের ধর্ম—পরিব্রাজী রূপটিকে। অন্যায় বললাম? অন্যায় তো এত কষ্টে স্বাধীনতা অর্জন করবার পর আজ হীনবীর্যের মত এই দুঃসহ অপমান বহন করতে হল কেন জাতিকে?

GOODYEAR
3T a new development.
Here we do not wait for new developments, we make them
GOODYEAR
THE WISE MOTORIST'S ETERNAL
CHOICE
GOODYEAR
'The gifted product is
than the gifted pen'
Philip
For the three gifts of safety, strength and economy in one tyre
GOODYEAR
Rs 10,000
1 2 3 4 5
3T
'THIS IS NO INTOLERABLE WRESTLE WITH WORDS'
Carlysle
IT IS JUST 3-T - THE SAFEST BET ON ANY HIGHWAY
GOODYEAR
'Solitude is Receding' in India at the rate of 2.5 Kilometers a year. Goodyear tyres have a great share in this recession
GOODYEAR
Can you identify a prize tyre? It has the oldest symbol of locomotion upon it
GOODYEAR
'Nine tenths of the work of the world is spent in moving goods from one place to another'
Macaulay
GOODYEAR
JWTG 6219

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন

নারায়ণ চৌধুরী

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের মানসজগতে একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। যতই তাঁর বিষয়ে চিন্তা করা যায় ততই বিস্ময়ে ও বিমূঢ়তায় মন পরিপ্লুত হয়ে যায়। এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব এ দেশের মাটিতে কেমন করে সম্ভব হল? সাধু সন্ন্যাসী সন্ত ফকির শ্রেণীর মানুষ ভারতবর্ষে ভূরি ভূরি জন্মেছেন। তাঁদের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েও তাঁদের সম্পর্কে আমরা বিস্মিত নই, কারণ ভারতবর্ষের এইটেই বৈশিষ্ট্য—এই সাধু-সন্তদের সংখ্যাবহুলতা ও ভারতীয় জনজীবনের উপর তাঁদের অপরিসীম প্রভাব। যা-কিছু ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক পুণ্যচেষ্টার সঙ্গে জড়িত, তার প্রতি এ দেশের মানুষের একটা সহজ টান আছে। সুতরাং ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তে সাধু-সন্ন্যাসী শ্রেণীর মানুষদের সংখ্যাধিক্য ঘটবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আজকের দিনেও জড়বাদ বা তথাকথিত নাস্তিক্যবাদ ভারতের উপর-তলকেই মাত্র স্পর্শ করেছে, যদি আদৌ স্পর্শ করে থাকে; কিন্তু ভারতের অন্তর্লোকে এখনও ধর্মীয় মহিমা অপরিম্লান।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসিত্বের জাত আলাদা। তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের একজন হয়েও তাঁদের যেন কেউ নন। তাঁর আদর্শ স্বতন্ত্র, তাঁর চিন্তার গতি ভিন্নমুখী, তাঁর মুখের বুলি আলাদা। ব্যক্তি-জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যপ্রভাবে দিব্যোন্মাদ হলেও তাঁর এই গভীর আধ্যাত্মিক আকূতি ও ঐশী অভীপ্সা একান্তভাবেই তাঁর নিজের ব্যাপার। এই বস্তুর সঙ্গে সমাজজীবনে তাঁর ভূমিকার কোন সম্পর্ক নেই। জন-জীবনের স্তরে নেমে এসে যখন তিনি কথা বলেছেন তখন তিনি আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভের পথ-নির্দেশ করেন নি, এ দেশের মানুষ কেমন করে খেয়ে-পরে বেঁচে-বর্তে বৈষয়িক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বাবলম্বী হতে পারে তার উপায় বাতলে দিয়েছেন। নির্বীর্যতা ও জড়তাকে তিনি জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় পাপ বলে গণ্য করেছেন, সুতরাং সামাজিক স্তরে তাঁর সমগ্র মনোযোগ গিয়ে পড়েছে এই পাপের মূলোচ্ছেদচেষ্টার উপরে। আমাদের সনাতন সন্ন্যাসীদের পথ ধরে তিনি ইচ্ছা করলেই ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিকতার অমৃতের বাণী শোনাতে পারতেন, কিন্তু আগের কাজ আগে না করে পরবর্তী স্তরের কার্যক্রমকে অগ্রপ্রাধান্য দেবার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। দেশের মানুষের ভাত-কাপড়ের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করে তাদের জোর করে আধ্যাত্মিক চরণামৃত গেলানোর প্রক্রিয়াকে তিনি জুলুমের চরম বলে মনে করতেন এবং এই কঠোর অবস্তবতিমূলক আচরণ থেকে তিনি নিজে সযত্নে দূরে ছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত পদব্রজে পরিক্রমা করে ভারতের নিষ্ঠুর দারিদ্র্যকে প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন এবং আমাদের সকল সমস্যার মূল যে এই দারিদ্র্যের মধ্যে, তা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। কাজেই এই সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের নিরাকরণ চেষ্টার দিকেই তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মের আবেগ প্রধাবিত হয়েছিল। ব্যক্তিজীবনের স্তরে তিনি আধ্যাত্মিক মোক্ষ-সাধনা অবশ্যই করেছেন, কিন্তু তাঁর সে আত্মগত সাধনার সঙ্গে জাতিগত সাধনাকে তিনি মোটেই গুলিয়ে ফেলেন নি। দিব্য সাধনার ক্ষেত্রে তিনি অধিকারী-অনধিকারী ভেদ মানতেন। আর তা মানতেন বলেই নিরন্ন-বুভুক্ষুর মুখে গীতার শ্লোক বা কোরানের বয়েৎ শুনে তিনি উল্লসিত বোধ করেন নি, বরং বিমর্ষ বোধ করেছেন। যে জাতির মানুষের মুখে অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, তাদের আধ্যাত্মিকতার নামে গদগদ হওয়াকে প্রহসন ছাড়া আর কী বলা যায়। খালি পেটে ধর্মচর্চার মত মূঢ়তা আর কিছু নেই। আধ্যাত্মিকতা ও সাত্ত্বিকতার অনুশীলনের নামে তা এক প্রচণ্ড তামসিকতা।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তার এই ঐহিক দিক্‌টি

বিশেষ ভাবে আমাদের অনুধাবন করতে হবে। তা না হলে তাঁকে ঠিক বোঝা যাবে না। তাঁর মহত্ত্বও সে ক্ষেত্রে আমাদের অনধিগম্য হয়ে থাকবে। সন্ন্যাসী-অসন্ন্যাসী নির্বিশেষে ভারতের মহাপুরুষদের ভিতর বিবেকানন্দই প্রথম মানুষ, যিনি তাঁর জীবন-বাণীর মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করে গেছেন। সন্ন্যাসীর মুখে সমাজতন্ত্রের কথা—ভা ও পশ্চিমী ঢাচের সমাজতন্ত্রের কথা—অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু অবিশ্বাসের আর বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি করে জড়তাগ্রস্ত ভারতীয় মনের সম্বিৎ জাগানোর জন্যেই বুঝি বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই কিছুই তাঁতে বেমানান ঠেকে না। আধ্যাত্মিক আদর্শের একজন শ্রেষ্ঠ ধারক-বাহক হয়েও বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের প্রচারক। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের পার্থক্য থাকতে পারে—থাকাই স্বাভাবিক এবং থাকা উচিতও—কিন্তু এ কথা কোনক্রমেই ভোলা চলে না যে, ওই প্রব্রজ্যাগ্রহণকারী গৈরিকধারী আজন্মব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠেই প্রথম আমরা সমাজতন্ত্রী প্রত্যয়ের বলিষ্ঠ ঘোষণা শুনতে পেলাম। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল সাম্যের আদর্শটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর পরবর্তী-কালে-প্রত্যাহৃত 'সাম্য' গ্রন্থ এবং 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র কোন কোন রচনার ভিতর আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের এবংবিধ প্রবণতার পরিচয় পাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই বিশ্বাসের সূত্রটিকে বেশী দূর টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি। শেষ বয়সে সাম্যের আদর্শে সংশয়াকুল হয়ে তিনি 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দেন। পরিণত জীবনের বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় 'নব হিন্দুত্বের'ই জয়জয়কার। সুতরাং প্রতিবাদের শঙ্কা না করেই বোধ করি বলা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায় সাম্যের আদর্শ নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা আইডিয়াটি নিয়ে ক্রীড়াচ্ছলে লোফালুফি করার অতিরিক্ত তাৎপর্য কোন সময়েই সম্ভবতঃ বহন করে নি। যুক্তিবাদী বঙ্কিমের মনে একবার দুর্গতজনের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল, তার পরই আবার মজ্জাগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার আর শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত মানসিকতার তলায় সে সহানুভূতি চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বিবেকানন্দের বেলায় সে রকম কথনও ঘটে নি। একটি স্থায়ী সুরের মত সমাজতন্ত্রী প্রত্যয় তাঁর সকল চিন্তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে ছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলি ঘুরে আসার পর যদিও তাঁর এ প্রত্যয় আরও জোরালো হয়, তবে এর মূল প্রেরণা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এ দেশের অভিজ্ঞতা থেকেই। পরিব্রাজক বেশে সারা ভারত পর্যটন কালে সমাজতন্ত্রী ধারণা ধীরে ধীরে তাঁর মনের মধ্যে দানা বাঁধে। পদব্রজে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমণ কালে তিনি সচকিত হয়ে লক্ষ্য করেন এ দেশের বেশীর ভাগ মানুষই হল তথাকথিত অনার্য বংশোদ্ভূত। সারা দেশ জুড়ে এরা ছেয়ে আছে। আমরা যাঁরা উচ্চ বর্ণের জাঁক করি তাঁরা এদের 'শূদ্র' আখ্যা দিয়ে সর্বপ্রকারে অবনত করে রেখেছি। অসার বংশকৌলীন্যের মোহে অন্ধ হয়ে এদের বেঁচে-বর্তে থাকার ন্যূনতম দাবিটিও আমরা মেনে নিই নি, ফলে এরা কুকুর বেড়ালেরও অধম জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়ে সমগ্র দেশের বুকের ওপর প্রচণ্ড ভারস্বরূপ চেপে আছে।

কিন্তু বিবেকানন্দের চোখে এরাই ভারতীয় জাতির প্রকৃত মেরুদণ্ড। এরা খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষ, এদের পরিশ্রমের অন্নে পরগাছাশ্রেণীর মানুষগুলির পুষ্টি। ভারতের ভবিষ্যৎ উচ্চ বর্ণের লোকদের হাতে নয়; সকল আশা-ভরসার স্থল হল শতাব্দীর পর শতাব্দী সকল অপমান-লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করে আসা এই সব কঠোর পরিশ্রমী নিরন্ন বুভুক্ষুর দল। এদের "মূঢ় মূক ম্লান মুখের" উপর দীর্ঘকালের বিড়ম্বনার ছাপ আঁকা আছে বটে, তা হলেও এদের ভিতর অমিত শক্তি প্রসুপ্ত হয়ে আছে। সেই আপাত-নিষ্ক্রিয় প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগানোই হল আগামী কালের ভারতের আসল কাজ। বিবেকানন্দ যখন কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়ে বলেন, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে চাষীর কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে.

—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি—, ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।"—তখন তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রকৃত মর্মবাণীকেই রূপায়িত করে তোলেন তাঁর ওই উদাত্ত ঘোষণার মধ্যে।

এই হচ্ছেন বিবেকানন্দ, এই বিবেকানন্দকে না জানলে তাঁকে সামান্যই জানা হয়। যাঁরা আধ্যাত্মিকতার ভাবে গদগদ হয়ে বিবেকানন্দকে সব সময় ধর্মের কোঠায় টানবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং বেদান্তের পরিভাষা ছাড়া আর কোন পরিভাষাতেই তাঁকে বুঝতে বা বোঝাতে চান না, তাঁরা বিবেকানন্দের আনুষ্ঠানিক ভক্ত হয়েও তাঁর প্রতি অল্পই সুবিচার করেন। সত্য বটে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের স্রষ্টা, বেলুড় মঠের প্রবর্তক; কিন্তু তাঁর ধ্যানের রামকৃষ্ণ মিশন আর বেলুড় মঠের সঙ্গে বোধ করি প্রকৃত রামকৃষ্ণ মিশন আর বেলুড় মঠের যোজনব্যাপী পার্থক্য। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কোন্ বিবেকানন্দের মূর্তি ধ্যান করে তাঁর পূজারতি করেন? সে কি ভুনাওয়ালা আর মুচি-মেথরের মহিমা উদ্‌ঘোষকারী মহাপ্রেমিক বিবেকানন্দের মূর্তি, না কি প্রাচীন ভারতের বৈদান্তিক আদর্শের নবপ্রচারক শঙ্করভাষ্যের নূতন ব্যাখ্যাতা ধর্মতন্ত্রের ধারক ও বাহক বিবেকানন্দের ভাব-বিগ্রহ? রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ধারা-ধরন, দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনযাত্রা প্রণালী ইত্যাদি অনুধাবন করলে এই ধারণাই বরং মনে বদ্ধমূল হয় যে, এঁরা আসলে এ দেশের সনাতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারেরই অনুগত জীব এবং তথাকথিত ধর্মীয় ভাবনায় গদগদ। এঁদের অধিকাংশ এসেছেন উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের ভোগের সংস্কার এঁদের মজ্জায়, নাগরিক সংস্কারেরও ঊর্ধ্বে এঁরা কেউ নন; পল্লীজীবন বা জেলে মালো মুচি মেথর ভুনাওয়ালার সঙ্গে এঁদের অন্তরের যোগ কতটা সে প্রশ্ন উত্থাপন করলে বোধ করি তা এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

আমরা কথায় কথায় বিবেকানন্দের এই কোটেশন ঝাড়ি—"ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ইত্যাদি।" স্কুলের বালকের পরীক্ষার খাতা থেকে শুরু করে অতিবড় বিজ্ঞ সুধী ও মনীষীর রচনা পর্যন্ত সর্বত্র এই কোটেশনের ছড়াছড়ি। এই বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকীর বৎসরে কত জায়গায় যে এই কোটেশন প্রযুক্ত হতে দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই। এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কিছু হতে পারে না। কথাগুলির আক্ষরিক অর্থ জলের মত পরিষ্কার। কিন্তু এর ভিতরকার তাৎপর্য কজন আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি? আমাদের কথা ছেড়ে দিলাম, আমরা দোষে-গুণে ভরা সাধারণ গৃহী মানুষ, উচ্চ আদর্শের পরীক্ষা আমাদের জীবনে সম্পূর্ণ কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতী সন্ন্যাসীরাই কি উদ্ধৃত কথাগুলির মর্ম অন্তরস্থ করে তাঁদের জীবন তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করবার সাধনায় নিয়োজিত রয়েছেন? তাঁদের দেখে তো সে কথা মনে হয় না। "মুচি মেথর আমার ভাই" কথাটা মেনে নেওয়া সহজ কিন্তু তদনুরূপ আচরণ করাই যা একটু কঠিন। আদর্শের বুদ্ধিগত অনুমোদন এক কথা আর সেই আদর্শকে আচরণে প্রতিফলিত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। অবশ্য ঘোষণা আর আচরণের মধ্যবর্তী বৈষম্যরেখাকে কোন সময়েই একেবারে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়, কিন্তু আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টার তারতম্যের দ্বারাই আচরণের বিচার হওয়া উচিত। এই

মানদণ্ডের পরীক্ষায় বিবেকানন্দ-সৃষ্ট রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা যে খুব বেশী নম্বর পাবেন এমত আমার বোধ হয় না।

কথাটা পরিবাদমূলক, সুতরাং তার আরও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এ রকম ক্ষেত্রে দু-চার কথায় রায় দিয়ে ক্ষান্ত থাকবার চেষ্টা করা অন্যায়। সমালোচনার পক্ষে যুক্তিগুলি, তাই, আরও বিস্তারযোগ্য।

প্রথমতঃ, সমাজসেবা কথাটা নিয়ে আমাদের মনে অনেক ভাবের কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে এ যাবৎ। সমাজ-সেবার নানা স্তরভেদ আছে। মধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষদের নানা অভাব-অভিযোগের প্রতিকারসাধনের চেষ্টাও সমাজসেবা, আবার নিগৃহীত অত্যাচারিতশ্রেণীর মৌলিক দাবিগুলি পূরণের চেষ্টাও সমাজসেবা। কোন্ সংস্থা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে সমাজসেবায় প্রবৃত্ত হয় তারই উপর সেই বিশেষ সংস্থার সমাজসেবার গুণাগুণের তারতম্য নির্ভর করে। গান্ধী বা বিনোবা ভাবের পন্থায় যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং তাঁদের সেই বিশ্বাসকে কার্যতঃ রূপদানে সচেষ্ট তাঁরাও সমাজসেবী, আবার রামকৃষ্ণ মিশন কিংবা ধরা যাক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়—তাঁরাও সমাজসেবী। প্রতিটি সংস্থাই নিজ নিজ জ্ঞানবিশ্বাস রুচি ও প্রবণতা অনুসারে সমাজসেবার আদর্শটিকে তাঁদের কাজের ভিতর রূপদান করে চলেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের বেলায় মুশকিল বাধিয়েছেন ওই বিবেকানন্দ নিজেই। তিনি তাঁর সতীর্থ ও ভবিষ্যদ্‌বংশীয় গুরুভাইদের সামনে এমন এক দুরূহ আদর্শের স্থাপনা করে গেছেন, যাকে সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রূপদান করা বড় সহজ কথা নয়। বিবেকানন্দের আদর্শকে সার্থকভাবে রূপায়িত করে তুলতে হলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতী গুরুভাইদের স্বয়ং সমাজতন্ত্রী প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু সিল্কের গেরুয়া আর পালিশের চেকনাইযুক্ত চকচকে চর্মপাদুকা পরিধানকারী ঘৃতান্নপুষ্ট মিশনের মিশনারীর দল মুচিমুদ্দফরাস আর কামার-কুমোর হাঁড়ি-বাজার সঙ্গে কী পরিমাণ আত্মীয়তার বন্ধনে বা সহানুভূতির যোগে যুক্ত সেটি অবশ্য উত্তরদানযোগ্য একটি সঙ্গত প্রশ্ন। বিবেকানন্দ মুচি মেথরদের কথা বারংবার উচ্চারণ করে তাঁর উচ্চবর্ণাগত শিক্ষিত গুরুভাইদের ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মহাফাঁপরে ফেলে দিয়ে গেছেন। তাঁদের অভ্যস্ত ভোগের জীবন-যাত্রার মনোরম ছবিটির বর্ণপ্রলেপের অন্তরালে একটি স্থায়ী প্রশ্নচিহ্ন গ্রথিত করে দিয়ে গেছেন ওই প্রত্যয়সিদ্ধ সমাজতন্ত্রী ঘোষণার দ্বারা।

সব দেখেশুনে আমার তো এক-একসময় মনে হয়, রামকৃষ্ণ মিশনের এই সব সাধু-সন্ন্যাসীর দল—এঁরা বিবেকানন্দের আদর্শের যথার্থ উত্তরাধিকারী নন। বরং বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে বেশী মিল একালের শ্রমিক ও কৃষককল্যাণকামী বামপন্থী চিন্তানায়কদের। আজকের দিনে যাঁরা বৈপ্লবিক অভীপ্সায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করছেন দেশবাসীর মধ্যে—তা সে গান্ধী-অনুপ্রাণিত সমাজতন্ত্রই হোক আর মার্ক্সবাদী ধ্যান-ধারণার দ্বারা সঞ্চালিত সমাজতন্ত্রই হোক—তাঁরা বিবেকানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক-কর্মীদের অপেক্ষা অধিক আত্মীয়তা দাবি করতে পারেন—আত্মীয়তা মর্মের ও কর্মের। বিবেকানন্দ ভারতীয় জনজীবনের স্তরে স্তরে অনার্যদের সংখ্যাধিক্য দেখেছিলেন। সেই তথাকথিত অনার্যদের ভাগ্যের উন্নয়ন বিধানে মিশনের সাধুরা কতটা কী করেছেন? বামপন্থীদের কার্যকলাপ যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক এবং তাঁদের নেতৃত্বে যতই গলদ থাকুক, তাঁরা অন্ততঃ এই সৎ বিশ্বাস দ্বারা চালিত যে ভারতের অগণিত শোষিত অবহেলিত সাধারণ মানুষের মুক্তির মধ্যেই ভারতের মুক্তি নিহিত। সর্বোদয়ের আদর্শে দীক্ষিত গান্ধীবাদী গঠনমূলক কর্মীরাও যথাসাধ্য এই শ্রেণীর মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন কর্মেই নিয়োজিত। আর মিশনের সাধু-সম্প্রদায়? তাঁরা নিরন্ন শ্রেণীর দুঃখব্যথা বিস্মৃত হয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিকতার মহিমা ব্যাখ্যাতেই মশগুল। বেদান্তের মহত্ত্ব প্রতিপাদনোদ্দেশে তাঁদের মুখে পুরাতন কথার চর্বিত চর্বণের আর বিরাম নেই। বেলুড় থেকে গোলপার্ক, গোলপার্ক থেকে আলমোড়া, আলমোড়া থেকে সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত সর্বত্র একই সুরে ও ভাবে প্রথাবদ্ধ হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনির ঢেউ উঠছে। দু-চারটে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আর সম্পন্ন

বাবুশ্রেণীর ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে অর্থকরী বিদ্যালয় পরিচালনা করে এঁরা 'সমাজসেবা'র পরমার্থ সাধন করে চলেছেন। মুচিমুদ্দফরাসেরা ঔদাসীন্যের অন্তরালে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে রইল, চাষী আর শ্রমিক-শ্রেণীর জাগরণের ভার পেশাদার রাজনীতিকদের হাতে তুলে দিয়ে মিশনারীরা আত্মতৃপ্ত রইলেন। বিবেকানন্দের আদর্শের অবমাননা যদি কারও হাতে সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে তবে তাঁর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত এই রামকৃষ্ণ মিশনের হাতেই তা হচ্ছে।

সত্যিকথা বলতে কি, মিশনের কার্যকলাপদৃষ্টে এক-একসময় এমন কথা পর্যন্ত আমার মনে হয় যে, সরকারী ও বেসরকারী উভয় স্তরে অর্থদোহনের প্রতিষ্ঠান ভিন্ন বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন আর কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী দপ্তরখানায় কার্যোপলক্ষ্যে যান, দেখবেন কোন না কোন সময় কোন না কোন মন্ত্রীর কামরায় এক-একজন গেরুয়াধারী সাধু শোভমান হয়ে আছেন। ধর্মচর্চা যাঁদের ঘোষিত আদর্শ, তাঁদের সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসের এই নিগূঢ় সম্পর্কের মর্ম বোঝা আমাদের পক্ষে ভার। যদি বলা হয় সমাজসেবার কাজের সুকরতার জন্যই তাঁদের সরকারী কর্তাদের দ্বারস্থ হওয়া, তবে বলব, যে সমাজসেবা সরকারী অর্থানুকূল্য ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না, তেমন সমাজ-সেবার দ্বারা জাতীয় জীবনকে খুব বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, অবহেলিতশ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়ন আরও পরের কথা। এ রকম সরকারী দানে দেশব্যাপী দারিদ্র্যের কণামাত্র পূরণ হতে পারে, কোটি কোটি অভাবী মানুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ করে তোলা যায় না। এ কাজের জন্য চাই সুচিন্তিত পরিকল্পনা, এবং সে পরিকল্পনার মধ্যে যত বেশী সমাজবাদী আদর্শের ছাপ থাকে ততই মঙ্গল। আমরা সর্বোদয় আদর্শের ছাঁচে ঢালা সমাজসেবা বুঝি, মার্ক্সীয় তন্ত্রের সমাজসেবাও আমাদের নিকট অবোধ্য নয়; কিন্তু প্রতি পদে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল মোহান্তপরিচালিত সমাজসেবা আমরা বুঝি না।

তদুপরি কথিত মোহান্তদের রাজসিক ঐশ্বর্যের প্রতি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পক্ষপাত আছে বলে মনে হয়। বালীগঞ্জ লেকপার্কে কোটি টাকা ব্যয়ে রাজপ্রাসাদ তুল্য যে সুবিশাল হর্ম্য নির্মিত হয়েছে তার আড়ম্বর, সজ্জা-বহুলতা, আরাম-ব্যবস্থা কি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী পরমহংসদেব বা তাঁর প্রধানতম ভাবশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আমাদের কেমন যেন খটকা লাগে, আমরা ঠিক বুঝতে পারি না।

আসলে, খতিয়ে বিচার করতে গেলে বিবেকানন্দের সাধনার মধ্যেই বোধ করি কিছু অপূর্ণতা ছিল। তিনি প্রচার করেছেন সমাজতন্ত্র, অথচ ধর্মমার্গের মানুষ এই যুক্তিতে রাজনীতি থেকে বরাবর দূরে থেকেছেন। সমাজ-তন্ত্রের ছাঁচে সমাজকে ঢালাই করবার কথা বলব অথচ রাজনীতির স্পর্শ থেকে সর্বপ্রযত্নে গা বাঁচিয়ে চলব—এ হয় না। সমাজতন্ত্রী রাজনীতিচর্চা তো দূরস্থান, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিরই কি তিনি পোষকতা করেছেন কখনও? শাসক ইংরেজের সঙ্গে কোন সময়েই কি তাঁর সংঘর্ষ ঘটেছে? তার উপর, বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় আদর্শের প্রচারের দিকটার উপর যত জোর পড়েছে, আদর্শের রূপায়ণের উপর তত জোর পড়ে নি। তাঁর চিন্তা যে পরিমাণে ঘোষণাভিত্তিক, সে পরিমাণে কর্ম-ভিত্তিক নয়। এই দিক দিয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে পরবর্তী কালের গান্ধীজীর পার্থক্য। গান্ধীজীও বিবেকানন্দের মত জনগণের দুঃখে বিগলিতচিত্ত, তিনিও বিবেকানন্দের চিন্তাকে অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করে বলেছেন, 'ভগবান বুভুক্ষু জনগণের সামনে রুটির আকার ভিন্ন অন্য কোন আকারে আত্মপ্রকাশ করতে ভয় পান'; কিন্তু বিবেকানন্দ যেখানে বাণী প্রচার করে থেমে গিয়েছেন, গান্ধীজী সেখানে সেই বাণীকে কার্যতঃ রূপদানে সচেষ্ট হয়েছেন। গান্ধীজীও একান্তভাবে ধর্মাশ্রিত মানুষ, কিন্তু ভারতের পরাধীনতায় ও ভারতীয় জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্যদুঃখে গভীর বেদনাহত তাঁর চিত্ত কেবলমাত্র ধর্মকেই আঁকড়ে থাকবার কথা ভাবতে পারে নি, তিনি ব্যক্তিমোক্ষের প্রয়োজন ভুলে নেমে এসেছেন জনজীবনের স্তরে। সক্রিয় রাজনীতি ও গঠনমূলক সমাজসেবার পথ অবলম্বন করে তিনি এদেশের জনগণের জীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের চেষ্টা করে গেছেন। ঘোষণা আর আচরণের পার্থক্যের তারতম্যের দ্বারাই যে মূলতঃ কর্মের বিচার হয়ে থাকে এ কথাটি আমাদের সর্বদা [illegible]

গোরা ও বিবেকানন্দ

জগদীশ ভট্টাচার্য

১

আমরা বলেছি, গোরা রবীন্দ্রনাথের নবপুরুষসূক্ত। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার দিব্যজীবনের মানবিক মহাভাষ্য। গোরার সঙ্গে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কের কথা অনেকেরই মনে উদিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার বলেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা সমন্বিত হইয়াছিল; তিনি যে হিন্দু-ভারতকে সুমহান করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহা যে কতখানি বাস্তবতাবর্জিত তাহা তাঁহার অকালমৃত্যুহেতু তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই। তাঁহার আদর্শায়িত হিন্দুসমাজের সাধ্য ছিল না যে আইরিশ মহিলা মিস্ মার্গারেট নোবেলকে 'ভগিনী নিবেদিতা' আখ্যা দিয়া হিন্দুসমাজের কোন পর্যায়ে কণামাত্র স্থান করিয়া দিতে পারে। সনাতন ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার বর্জন না করিয়া কোন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার সহিত পংক্তিভোজন করাও অসম্ভব ছিল। গোরা চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাই বলিলে আশা করি কেহ আঘাত পাইবেন না। নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ যেন আইরিশম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যাসের নায়করূপে সৃষ্টি করিলেন মিস্ নোবেলও জাতিতে আইরিশ।" [রবীন্দ্র-জীবনী-২, তৃতীয় স°, পৃ° ২৩৫]

রবীন্দ্রজীবনীকারের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে হয়তো অনেকেই একমত হতে পারবেন না। বিবেকানন্দ যে হিন্দু-ভারতকে সুমহান করে দেখেছিলেন তা বাস্তবতা-বর্জিত কি না, অথবা নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করেই রবীন্দ্রনাথ আইরিশম্যানের পুত্র গোরাকে নায়করূপে সৃষ্টি করেছিলেন কি না, এ নিয়ে নিশ্চয়ই মতভেদ থাকবে। কিন্তু গোরা চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে দেখবার মত। বস্তুতঃ গোরা-চরিত্র সৃষ্টি-প্রসঙ্গে যাঁরা বিবেকানন্দ-নিবেদিতার কথা চিন্তা করে থাকেন তাঁদের মধ্যেও তিনটি মতবাদ রয়েছে। একদল মনে করেন গোরা বিবেকানন্দ-নিবেদিতার যোগফল। আরেক দল মনে করেন গোরা-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার কথাই বিশেষ ভাবে চিন্তা করেছিলেন। তৃতীয় দলের ধারণা গোরার মূলে রয়েছে বিবেকানন্দের জীবন ও আদর্শ। বর্তমান প্রবন্ধকার শেষোক্ত দলের একজন।

২

যাঁরা মনে করেন গোরা-সৃষ্টির মূলে নিবেদিতার চরিত্র ও জীবনাদর্শই রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বিরাজমান ছিল তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। আমরা বলেছি গোরা রবীন্দ্রনাথের নবপুরুষসূক্ত। বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠে' যেমন স্বদেশভক্ত সন্তান-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে একটি আদর্শ ভারত-সন্তানের সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তরুণ-যৌবনে কবি শিখ জাতির নেতা গুরু-গোবিন্দের মধ্যে তাঁর আদর্শ ভারতপুত্রের ধ্যান করেছিলেন। একাধিক প্রবন্ধে এবং "গুরু গোবিন্দ" কবিতায় তিনি বারবার বলেছেন, আমাদের যিনি নায়ক হবেন তাঁকেও গুরু-গোবিন্দের মত হতে হবে। সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের অবসানে গুরু গোবিন্দের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনিও বলবেন—

> কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
> পেয়েছি আমার শেষ।
> তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
> গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
> আমার জীবনে লভিয়া জীবন
> জাগো রে সকল দেশ॥

গোরার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতপুত্রেরই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন। তারও অন্তরের মূলকথাটি হল:

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ।" রবীন্দ্র-কল্পনার এই নবপুরুষই ভারতপুরুষ। তাই আমরা তাকে বলতে চাই ভারতপুত্র। জাতীয় চরিত্র বা ন্যাশনাল হিরো বলতে যা বোঝায় গোরা তাই। এখন বিচার্য, নিবেদিতাকে এই অর্থে জাতীয় চরিত্র বলা সমীচীন কি না।

নিবেদিতার মৃত্যুর পরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এফ. জে. আলেকজাণ্ডার যে স্মরণাঞ্জলি রচনা করেন তাতে তিনি নিবেদিতাকে বলেছেন 'জাতীয় চরিত্র' বা ন্যাশনাল ক্যারেক্টার। তিনি বলেছেন, "In a national character is witnessed the tempest of the nation for self-expression.

"Day in and day out for more than fourteen years, she had made her spirit one with that of the land, penetrating into every nook and crevice of the Indian experience for evidences of its greatness as fewest have ever done, searching for the powers and the self-recreating spirit of India. The result and the realisation is the idiea and the coinage of the term, the national consciousness." [মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর ১৯১১, পৃ° ৪৯১]

এই প্রবন্ধেই প্রবন্ধকার নিবেদিতার ভারতপ্রেম সম্পর্কে বলেন, "Patriotism with her was religion, and '*Jnana*' to her was that understanding of the land which would inflame the individual to self-sacrifice and spirited endeavour for the masses."...

"With her passes one of those few who have made Hinduism masculine and aggressive"...

"She was the apostle of a gospel which will at no distant time be the *Dharma* of a new national life; for a life such as hers cannot be lived in vain."

নিবেদিতার তিরোধানের পর রবীন্দ্রনাথ নিজে 'প্রবাসী'তে যে প্রবন্ধ রচনা করেন [প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮] তাতে তিনিও নিবেদিতাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অসামান্যের মর্যাদা দান করেছেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলি নিয়ে সংকলিত করা গেল:

"তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত।"...

"তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন..."

"বস্তুত তিনি কী পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ—আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়।"...

"তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন।"...

"ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।"

"দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।"...

"জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড়ো সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়া আমরা শিখিয়াছি।"...

"বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা।...তিনি যখন বলিতেন our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না।"...

"লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না অথবা যেখানে রাজার কোন অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।"...

বলাই বাহুল্য, এই সব উক্তির মধ্য দিয়ে নিবেদিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ নিবেদিতার মধ্যে তিনি নারীত্বের এক সুদুর্লভ মহিমাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছেন, লোকমাতা। বলেছেন শাবকবেষ্টিত বাঘিনী। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণব্রতে তাঁর উৎসর্গিত জীবনকে তিনি সতীর তপস্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু গোরার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ভারতপুরুষের কল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় নিবেদিতা কখনোই সেই স্তরে উন্নীত হতে পারেন নি। নিবেদিতা নারীমহিমার এক অসামান্য দৃষ্টান্ত—রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেই দৃষ্টিতেই দেখেছেন। কমনীয় হৃদয়াবেগের সঙ্গে অনমনীয় চরিত্র-শক্তির মিলনে যে দুর্লভ নারীত্বের উদ্ভব হয় রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে নিবেদিতা ছিলেন তাই।

তা ছাড়া 'গোরা' উপন্যাসের কাহিনীরূপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে 'নিবেদিতাই গোরা'—এই কল্পনার অসঙ্গতিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিবেদিতাই যদি গোরা তবে উপন্যাসে বিবেকানন্দের আসনে কে বসবেন? পরেশবাবু? গোরা আত্মপরিচয় লাভ করবার পর প্রথমেই ছুটে গেল পরেশবাবুর কাছে। কেন না তার ধারণা পরেশবাবুর কাছেই আছে মুক্তির মন্ত্র। পরেশ-বাবুকে গোরা বলছে, "আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ *সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার* কোন জাতির কোন ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

বস্তুতঃ 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবু এক অভিনব আদর্শ পুরুষ। তিনি ব্রাহ্মসমাজের হয়েও সমস্ত সমাজ-বন্ধনের সমস্ত দলাদলি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিজের জীবনকে স্থাপন করেছেন। হিন্দুসমাজকে তার সংকীর্ণতার গণ্ডী পেরিয়ে উদার আমন্ত্রণের মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে বিশ্বমানবের সম্মুখীন হতে হবে—এই আদর্শই পরেশবাবুর আদর্শ। তিনি বলছেন, "এখন পৃথিবীর চারদিকের রাস্তা খুলে গেছে, চারদিক থেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়েছে—এখন শাস্ত্র-সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেঁধে প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংস্রব থেকে কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।" এই মন্তব্যের মধ্যেই 'গোরা' উপন্যাসে সম্প্রসারিত হিন্দুচেতনার সঙ্গে ভারতচেতনার রাখীবন্ধন হয়েছে। কিন্তু পরেশবাবুর চরিত্রকল্পনার সঙ্গে বিবেকানন্দের চরিত্রের আর কোথাও কোনো মিলই নেই। বরং রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে যে মুক্তপ্রাণ 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থে'র আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছিলেন অনেকটা তারই আদলে পরেশবাবুর চরিত্র গড়ে উঠেছে মনে করাই স্বাভাবিক। অথবা পরেশবাবু রবীন্দ্রনাথেরই বিবেক। তাঁরই কল্পিত জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি।

তা ছাড়া 'গোরা' উপন্যাসের সঙ্গে নিবেদিতার কী সম্পর্ক এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্থাপিত হয়েছিল। 'গোরা'র ইংরেজি অনুবাদক উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন গোরার সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক কি ও কোথায়। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্সনকে এক পত্রে লিখেছেন, "You asked me what connection had the writing of Gora with Sister Nivedita. She was our guest in Shilaida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of Gora. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. *You won't find it in Gora as it stands now—but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind.*" [*দ্রষ্টব্য: চিঠিপত্র-৬, পৃ° ২০৬*]

এই চিঠিতে কবির বক্তব্য রহস্যের কুহেলিকায় ঢাকা। তবু এখানে এটুকু পাওয়া যাচ্ছে যে, গোরা ও সুচরিতার

সম্পর্ক গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক। জন্মসূত্রে তাঁরা দুই জাতের বলে তাদের মিলনের পথে দুস্তর বাধা রয়েছে, কল্পিত গল্পে রবীন্দ্রনাথ এই দিকেই নিবেদিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন—"in order to drive the point deep into her mind,"—কিন্তু নিবেদিতা তাতে ক্ষুব্ধ হন। উপন্যাসে গোরা ও সুচরিতার মিলন দিয়েই কাহিনীর সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটেছে। গোরা ও সুচরিতার গুরু-শিষ্যা সম্পর্কটি বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কের আদলে গড়ে উঠেছে কি না সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। সে প্রসঙ্গ যথানিয়মেই যথাকালে আসবে। কিন্তু গোরা যে নিবেদিতা হতে পারে না, তার আরেকটি কারণ এই যে, নিবেদিতা তখনও জীবিতা। উপন্যাস যখন শুরু হয় (১৩১৪) তখন নিবেদিতার বয়স চল্লিশ বৎসর মাত্র। তাঁর জীবনের ইতিহাস তখনও অসমাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ তাঁকে সম্মুখে রেখে গোরার মত একটি আদর্শায়িত চরিত্র সৃষ্টি করার কল্পনা স্বাভাবিক নয়।

৩

আমাদের বিবেচনায় গোরাই বিবেকানন্দ। অবশ্য এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, গোরার চরিত্র ও জীবন অক্ষরে অক্ষরে বিবেকানন্দের চরিত্র ও জীবনের সঙ্গে মিল রেখে চলেছে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, গোরা একটি উপন্যাস। গোরা-চরিত্রটিও সেই উপন্যাসেরই নায়ক-চরিত্র। গোরাই বিবেকানন্দ—এই কথা বলার অর্থ এই যে, বিবেকানন্দের চরিত্র রবীন্দ্র-কবিমানসে যে স্বপ্ন রচনা করেছিল গোরা তারই আদলে রচিত। রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে বিবেকানন্দের যে নবজন্ম হয়েছে তারই সারস্বত বিগ্রহ গোরা।

আমরা বলেছি গোরাকে রবীন্দ্রনাথ ভারতপুরুষরূপেই সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতপুত্র। নিবেদিতাই প্রথম বিবেকানন্দকে বলেছিলেন ভারতপুত্র। স্বামীজীর তিরোধানের অব্যবহিত পরেই তিনি একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, "Swamiji is verily our great national hero." নিবেদিতা আরও বলেন, "He saw before him a great Indian nationality, young, vigorous, fully the equal of any nationality on the face of the earth." ['ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য : উক্ত গ্রন্থের ২৪-২৫ পৃষ্ঠা।]

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস মাত্রই নয়। তা জাতীয় জীবনের মহাকাব্য। কৃষ্ণ কৃপালনির ভাষায় "it is the epic of India in transition..." ভারতীয় নবজাগরণের একটি সন্ধিলগ্নের মহাকাব্য হল 'গোরা'। বস্তুতঃ বঙ্কিমযুগ ও রবীন্দ্রযুগের মধ্যে স্বদেশ-চেতনার যে রূপান্তর ঘটেছে সেই রূপান্তরেরই সাক্ষী 'আনন্দমঠ' ও 'গোরা'। 'আনন্দমঠে' স্বদেশচেতনা হিন্দুধর্ম চেতনার মধ্যেই অনুবিদ্ধ ছিল। 'গোরা'য় স্বদেশচেতনা হিন্দুধর্মকে অতিক্রম করে ভারতধর্মকে আশ্রয় করেছে। এই ভারতধর্ম—এই ইণ্ডিয়ানিজমই গোরার মূলমন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের জীবনে এই ভারতধর্মেরই জয়ধ্বনি শুনেছিলেন। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় নেতা—ভারতপুত্র বা ভারতপুরুষ। এই অর্থেই 'গোরা' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের নবপুরুষসূক্ত।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ভারতধর্মের অর্থটি স্পষ্ট করে অনুধাবন করা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র মূলমন্ত্র যেমন 'বন্দে মাতরম্' সংগীত, তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মূলমন্ত্র 'ভারততীর্থ'। গোরা উপন্যাসের মর্মবাণী কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত হয়েছে "ভারততীর্থ" কবিতায়। "ভারততীর্থে"র কবি তাঁর চিত্তকে 'এই ভারতের মহা-মানবের সাগরতীরে'র পুণ্যতীর্থে জাগ্রত হতে বলেছেন। এই পুণ্যতীর্থের উপাস্য দেবতা হলেন নরদেবতা। কবি বলছেন :

কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কত মানুষের ধারা এসে এই মহামানবের সাগরতীরে মিলিত হয়েছে। পশ্চিম দিগন্তের দ্বারও আজ উন্মুক্ত। কিন্তু ভারত কাউকেই বিমুখ করবে না—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।' তাই কবি এই পুণ্যতীর্থে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর ভারত-বন্দনা সমাপ্ত করেছেন। কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন :

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কবিতাটি রচিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৮ আষাঢ়। 'গোরা'র রচনারম্ভ ১৩১৪ সালে। শেষ হয় ১৩১৬ সালের ফাল্গুনে। '১৬ সালেই 'গোরা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'গোরা' রচনা শেষ করার তিন-চার মাসের মধ্যেই "ভারততীর্থ" কবিতাটি বিরচিত। "ভারততীর্থ" রচনা করে যেন রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'র পূর্ণাহুতি দিলেন।

"ভারততীর্থ" কবিতার ভাবটি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক একাধিক গদ্যপ্রবন্ধে ভাষা পেয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ১৩১৫ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "পূর্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধটি। 'গোরা' রচনা তখন অর্ধপথ অগ্রসর হয়েছে। উপন্যাস লিখতে লিখতে কবির মনে যে ভাবটি ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠেছে তাকেই তিনি ভাষা দিয়েছেন "পূর্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 'পরিচয়' গ্রন্থে সংকলিত। [দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী-১২, পৃ' ২৬১-৭৩।] 'গোরা' উপন্যাস, "পূর্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধ এবং "ভারততীর্থ" কবিতা রবীন্দ্র-মানসলোকে একই চিন্তার বৃন্তে বিকশিত তিনটি বাণীপুষ্প। ভারত-ভাগ্যবিধাতার চরণে নিবেদিত।

"পূর্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধের প্রথম বাক্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস।" উত্তরে তিনি বলছেন :

"ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে ;—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

"...ভারতবর্ষেরও যে-অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। • • • আমরা সর্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব, এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজা-ক্ষেত্রে আর-কেহ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহ-পেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে, বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে,—এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।"

প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্যটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তা হল এই যে, ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করবে ; পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার

দান করে তাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁরা "সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী," তাঁরা ভারতের বুকে মানবের এই ইতিহাস রচনার কাজেই জীবন যাপন করেছেন। দেশে "সকলের চেয়ে বড়ো" এই মনীষিগণের নামও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন রামমোহন, রানাডে ও বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার [স্মরণীয় : ভারততীর্থের পঙ্‌ক্তি—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে], সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "পূর্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" নামে বঙ্গদর্শনে (১৩১৫ ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। তাতে নিজের বক্তব্যকে বিশদতর করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। খণ্ডিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি।

"ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন ; ইঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে ; পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, অজ্ঞতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই আমাদের আপন—তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন—তাঁহাকে লইয়া আমরা মানবমাত্রেই ধন্য।"

এই দুটি রচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এই যে, রবীন্দ্রনাথ মহাভারতবর্ষের স্রষ্টা হিসাবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন যে মনীষিত্রয়ের নাম করেছেন তাঁদের একজন হলেন বিবেকানন্দ। এই মনীষিত্রয়ের মধ্যে দুজন—রামমোহন ও রানাডে—অপেক্ষাকৃত দূরের মানুষ। রামমোহন কালের বিচারে দূরের, রানাডে স্থানের বিচারে দূরের। এই তিনজন মনীষীর মধ্যে কালের ও স্থানের বিচারে সবচেয়ে কাছের মানুষ হলেন বিবেকানন্দ। তা ছাড়া রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের আদিপুরুষ বলে স্বভাবতঃই মহর্ষিপুত্রের পূজনীয় পুরুষ। রানাডেও বম্বের প্রার্থনাসমাজের নেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার পাত্র—কেন না বম্বের প্রার্থনাসমাজ বাংলার ব্রাহ্মসমাজেরই সহোদর প্রতিষ্ঠান। তাঁদের দুজনের সঙ্গে একনিশ্বাসে বিবেকানন্দের উল্লেখ থেকে বুঝতে পারা যায়, বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কী সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু বলেন নি তাঁরা যে কত ভ্রান্ত "পূর্ব ও পশ্চিম" [এবং তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য"] পড়লেই তা বুঝতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দকে শুধু অধুনাতন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষিত্রয়েরই একজন বলে মনে করেন নি ; তাঁকে মহাভারতবর্ষের অন্যতম স্রষ্টা বলেও স্বীকার করে নিয়েছেন। এই অর্থেই বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতপুরুষ। এই অর্থেই 'গোরা' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের নবপুরুষসূক্ত। এই অর্থেই গোরা বিবেকানন্দের সারস্বত বিগ্রহ।

৪

বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব সম্মুখে রেখে গোরাকে বিচার করে দেখা নিষ্ফল হবে না। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনচরিত-রচয়িতা বিশ্বমনীষী রোমাঁ রোলাঁর

'বিবেকানন্দের জীবন' গ্রন্থখানির 'প্রেল্যুড' বা সূচনা-অধ্যায়টিতে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা শ্রীঋষি দাসের সুন্দর অথচ মূলানুগ অনুবাদ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধার করছি :

"রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করিবার এবং তাঁহার চিন্তার বীজ বিশ্বময় বপন করিবার দায়িত্ব তাঁহার যে মহান শিষ্যের উপর পড়িয়াছিল, তিনি ছিলেন দেহ ও মনের দিক হইতে রামকৃষ্ণের ঠিক বিপরীত। ***

"...ভারতীয় রাজহংস পরমহংস ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলির যবনিকা পার হইয়া চিরশাশ্বতের স্বচ্ছ সরোবরে আপনার সুবিশাল শুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন।

"তাঁহাকে অনুসরণ করিবার অধিকার তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যদেরও ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই বিবেকানন্দও তাঁহার সুবিশাল পক্ষে ভর করিয়া চকিতে কখনো কদাচিৎ-মাত্র ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের মধ্যে এই ঊর্ধ্বলোকে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। তাই বিবেকানন্দের কথা ভাবিলে বারে বারে আমার বীঠোফেনের কথা মনে পড়ে। তিনি যে সময়টুকু এই প্রশান্তির বক্ষে বিরাজ করিতেন, তখনও তাঁহার তরণীর পালে সকল দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিয়া লাগিত। পৃথিবীর যুগ-ব্যাপী ক্লেশ-যন্ত্রণা তাঁহার চারিদিকে ক্ষুধিত সামুদ্রিক পক্ষীর মতো অহরহ ডানা ঝাপটাইয়া বেড়াইত। দুর্বলতার নহে—শক্তির—আবেগ তাঁহার সিংহ-হৃদয়ের মধ্যে উদ্বেল হইত। তিনি ছিলেন মূর্তিমান শক্তি ; কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁহার বাণী। * * *

"বিবেকানন্দের দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তাহা রামকৃষ্ণের কোমল ও ক্ষীণ দেহের ছিল ঠিক বিপরীত। বিবেকানন্দের ছিল সুদীর্ঘ দেহ (পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি), প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, কর্মিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কণ ত্বক্‌, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল, আর অপূর্ব আয়ত পল্লবভারে অবনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষু দেখিলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়িত। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায়, পরিহাসে, করুণায় দৃপ্ত প্রখর ছিল সে চক্ষু ; ভাবাবেগে ছিল তন্ময় ; চেতনার গভীরে তাহা অবলীলায় অবগাহন করিত ; রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী ; সে দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার রাজকীয়তা ; তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসেন নাই, যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন। * * *

"তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন, ইহা কল্পনাও করা যায় না। তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। * * * সকলে প্রথম দর্শনেই ইঁহার মধ্যে ভগবৎ-প্রেরিত এক নেতার সাক্ষাৎ পাইতেন—তাঁহার মধ্যে নির্দেশ দিবার, পরিচালিত করিবার যে শক্তি নিহিত ছিল, তাহার চিহ্ন সকলের চোখেই সহজে ধরা পড়িত। হিমালয়ে সহসা এক পর্যটকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পর্যটক তাঁহাকে না চিনিলেও থমকিয়া দাঁড়ান এবং বলিয়া উঠেন :

"'শিব!'...

"তাঁহার স্বনির্বাচিত দেবতা যেন তাঁহার ললাটে নিজের নামটি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

"কিন্তু তাঁহার ললাটের এই বিশাল উপলখণ্ডের উপর দিয়া বহু মানসিক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছিল। যে প্রশান্ত বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছ বিস্তারের উপর রামকৃষ্ণের মৃদু হাস্য চমকিত হইত, বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের জীবনে তাহা কদাচিৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অতিশক্তিশালী দেহ, তাঁহার অতি বিরাট মস্তিষ্ক আগে হইতেই তাঁহার বাত্যাব্যাকুলিত আত্মার রণক্ষেত্ররূপে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানে অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, স্বপ্ন ও কর্ম স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। তাঁহার জ্ঞান ও কর্মশক্তি এতই অধিক ছিল যে, তাঁহার নিজের স্বভাবের এক অংশকে বা সত্যের এক অংশকে বিসর্জন দিয়া কোনোরূপ সংগতি-বিধান তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

এবার বিবেকানন্দের এই চিত্রটি সম্মুখে রেখে গোরার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। গোরার রূপশ্রীকে রবীন্দ্রনাথ মহাদেবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। "

তাহার কালেজের পণ্ডিত মহাশয় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী-৬, পৃ° ১১৯]

"গোরার দিকে নেত্রপাত করিয়াই বরদাসুন্দরী একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এই তো ব্রাহ্মণ বটে! যেন একেবারে হোমের আগুন। যেন শুভ্রকায় মহাদেব।" [তদেব, পৃ° ৪৫২]

গোরার দেহের গঠনের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "মাথায় সে প্রায় ছ ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মত বড়—গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে 'কে রে' বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড় এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত : চোয়াল ও চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মত : চোখের উপর ভ্রূরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা ; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মত ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ : তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মত অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে অথচ একমুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মত আঘাত করিতে পারে।" [পৃ° ১১৯-২০]

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে প্রথম দেখে কিছু বিস্মিত হয়েছিলেন। "এমন ছয় ফুটের চেয়ে লম্বা, হাড়-মোটা, মজবুত মানুষ তিনি বাংলাদেশে পূর্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। * * * গায়ে একখানা খাকি রঙের পাঞ্জাবি জামা, ধুতি মোটা ও মলিন, হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, চাদরখানাকে মাথায় পাগড়ির মত বাঁধিয়াছে।" [পৃ° ২৮৫]

বিনা বিচারে কেবলমাত্র গ্রামকে শাসন করবার জন্যে ঘোষপুরের সাতচল্লিশজন গ্রামবাসীকে হাজতে পুরে রাখা হয়েছিল। গোরা তাদের হয়ে জামিন হবার জন্যে প্রস্তুত হল। পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে জামিন খালাসের দরখাস্ত হল। ম্যাজিস্ট্রেট গতকল্যকার সেই মলিনবস্ত্রধারী পাগড়ি-পড়া বীরমূর্তির দিকে একবার কটাক্ষ নিক্ষেপ করলেন এবং দরখাস্ত অগ্রাহ্য করে দিলেন। [পৃ° ২৮৭]। বলাই বাহুল্য এই "মলিন-বস্ত্রধারী পাগড়ি-পরা বীরমূর্তি" রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে বিবেকানন্দের মূর্তিটি নিশ্চয়ই বিরাজমান ছিল।

বিবেকানন্দের সতীর্থ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিবেকানন্দের তরুণ যৌবনের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বোহেমিয়ান। "ব্রজেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে কলেজে পাঠ্যাবস্থায় দেখিয়াছেন, Artist nature ও Bohemian temperament." [গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ, পৃ° ২০।] রবীন্দ্রনাথ গোরার শৈশব ও তরুণ যৌবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাও অনেকটা বিবেকানন্দের জীবনের অনুরূপ। [দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পৃ° ১৩৬-৩৭।]

গোরার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিনয় বলছে, "প্রচণ্ড গোরা! তাহার প্রবল ইচ্ছা! জীবনের সকল সম্বন্ধের দ্বারা তাহার সেই এক ইচ্ছাকেই মহীয়সী করিয়া সে জয়যাত্রায় চলিবে—বিধাতা গোরার প্রকৃতিতে সেই রাজমহিমা অর্পণ করিয়াছেন।" [তদেব, পৃ° ৩০০] রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দের মধ্যে দেখেছিলেন রাজকীয়তা। "তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট।" বিনয় দেখেছে গোরার সর্ববিজয়ী রাজমহিমা। সতীশকে বিনয় বলেছে, "গোরা যে একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের মাথার উপরে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত প্রদীপ্ত" [পৃ° ১৫০] হয়ে উঠবে এ বিষয়ে তার সন্দেহমাত্র নেই।

বিবেকানন্দ ছিলেন আজন্মযোদ্ধা ক্ষত্রিয়। নির্ভীক অপরাজেয় পুরুষসিংহ। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। "এবার শরীরং বা পাতয়ামি মন্ত্রং বা সাধয়ামি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—কাশীনাথ সহায় হউন।" [পত্রাবলী-১, পৃ° ২৩।]

"আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিনমিনে, ফিনফিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, 'এ বীর!'—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়।" [পত্রাবলী-২, পৃ° ৩০১।]

"আমি কাজ চাই, vigour (উদ্যম) চাই—যে মরে যে বাঁচে ; সন্ন্যাসীর আবার মরা-বাঁচা কি?" [তদেব, পৃ° ৩৫৫।]

"সংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম।" [তদেব, পৃ° ৩৬৮।]

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মে বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে লিখছেন, "ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নহে।" বলাই বাহুল্য, এ আদর্শ গীতোক্ত "যুদ্ধাদ্ধি শ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" আদর্শেরই অনুরূপ।

গোরাও আজন্ম যোদ্ধা। অভীক অপরাজেয়। সেও ক্ষত্রিয়, পুরুষসিংহ। বিনয়কে গোরা বলছে, "ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পূজো নয়, সেখানে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে পূজো করতে হবে—আমার কাছে সেইটেই সবচেয়ে বড়ো আনন্দ মনে হচ্ছে—সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই—সেখানে নিজের জোরে সম্পূর্ণ জাগতে হবে সম্পূর্ণ দিতে হবে—মাধুর্য নয়, এ-একটা দুর্জয় দুঃসহ আবির্ভাব—এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ংকর—এর মধ্যে সেই কঠিন ঝংকার আছে যাতে করে সপ্তসুর এক সঙ্গে বেজে উঠে তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। মনে করলে আমার বুকের মধ্যে উল্লাস জেগে ওঠে—আমার মনে হয় এই আনন্দই পুরুষের আনন্দ—এই হচ্ছে জীবনের তাণ্ডবনৃত্য—পুরাতনের প্রলয়যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্তি দেখবার জন্যই পুরুষের সাধনা।" [রচনাবলী, পৃ° ১২৪]

জীবনের এই তাণ্ডবনৃত্য, এই পুরাতনের প্রলয়যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্তিই বিবেকানন্দ দেখেছিলেন তাঁর "Kali the Mother" কবিতায়। সেখানে তিনি বলেছেন :

> For Terror is Thy name.
> Death is Thy breath.
> And every shaking step
> Destroys a world for e'er.
> Thou 'Time', the All-Destroyer!
> Come, O Mother, come!
> Who dares misery love,
> Dance in destruction's dance,
> And hug the form of death—
> To him the Mother comes.

৫

বিবেকানন্দ দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী। দেশের চিন্তা ছিল তাঁর জীবনের নিঃশ্বাস। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, "...the thougt of India was to him like the air he breathed. * * * Not a sob was heard within her shores that did not find in him a responsive echo." [The Master as I saw him, পৃ° ৪৭।] 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে বিবেকানন্দ যে স্বদেশমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, [হে ভারত,... ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত] তা সর্বজনবিদিত। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দ হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে চিকাগো থেকে এক পত্রে লিখছেন, "আমার চরিত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, আমি আমার দেশকে ভালবাসি, বড় একান্ত ভাবেই ভালবাসি।" [পত্রাবলী-১, পৃ° ১৭৮।]

গোরার কাছেও স্বদেশপ্রেম তার হৃৎস্পন্দনের মতই সত্য। বিনয় জিজ্ঞাসা করছে, "ভারতবর্ষ তোমার কাছে খুব সত্য?" উত্তরে গোরা বলল, "জাহাজের কাপ্তেন যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাজে বিশ্রামে সমুদ্রপারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় আমার ভারতবর্ষকে আমি তেমনি করে মনে রেখেছি।" বিনয় জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় তোমার সেই ভারতবর্ষ?" উত্তরে গোরা বুকে হাত দিয়ে বলল, "আমার এইখানকার কম্পাসটা দিনরাত যেখানে কাঁটা ফিরিয়ে আছে সেইখানে,..."

স্বদেশপ্রেমের প্রথম চেতনা হল স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা। গোরা বলছে, "এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশের, তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া।" বিবেকানন্দও তাই করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক ভারতসন্তানকে ডেকে বলে-

লেন, "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।" [বর্তমান ারত পৃ° ৫২]

'গোরা' উপন্যাসে বিনয় চেয়েছে প্রেমকে, আর ারা চেয়েছে স্বদেশপ্রেমকে। বিনয় যেদিন তার প্রমানুভূতির কথা গোরাকে জানাল সেদিন গোরা ঝতে পারল, প্রেম বিনয়ের সমস্ত জগৎ-চরাচর অধিকার রে বসেছে, কোথাও সে এর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে । গোরা তার এই নবলব্ধ উপলব্ধির প্রতি লক্ষ্য করে লছে, "স্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীণ াবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও আর রক্ষা ই—সেদিন সে আমার ধনপ্রাণ, আমার অস্থিমজ্জারক্ত, ামার আকাশ-আলোক, আমার সমস্তই অনায়াসে াকর্ষণ করে নিতে পারবে,⋯"

যেদিন সত্যসত্যই দেশের ডাক প্রত্যক্ষবৎ সত্য হয়ে ঠল সেদিন গোরা বলছে, "জেলের মধ্যেও মা আমাকে াকিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার দেখা পাইয়াছি—জেলের াহিরেও মা আমাকে ডাকিতেছেন, সেখানে আমি াহাকে দেখিতে চললাম।" মায়ের এই ডাকে গোরার বুক রে উঠল। "ভারতবর্ষের যে-কাজ অন্তহীন, যে-কাজের ল বহু দূরে, তাহার জন্য তাহার প্রকৃতি আনন্দের হিত প্রস্তুত হইল—ভারতবর্ষের যে-মহিমা সে ধ্যানে েখিয়াছে, তাহাকে নিজের চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিবে । বলিয়া তাহার কিছুমাত্র ক্ষোভ রহিল না, সে মনে মনে ার বার করিয়া বলিল—মা আমাকে ডাকিতেছেন—লিলাম যেখানে অন্নপূর্ণা যেখানে জগদ্ধাত্রী বসিয়া াছেন সেই সুদূর কালেই অথচ এই নিমেষেই, সেই ত্যুর পরপ্রান্তেই অথচ এই জীবনের মধ্যেই—সেই যে গামহিমান্বিত ভবিষ্যৎ আজ আমার এই দীনহীন র্তমানকে সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে -আমি চলিলাম সেইখানেই—সেই অতি দূরে সেই তি নিকটে মা আমাকে ডাকিতেছেন।" [রচনাবলী, ° ৪২৭।]

দীনহীন বর্তমানের মধ্যেও সেই মহিমান্বিত শাশ্বত ারতের ধ্যান বিবেকানন্দেরও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য' গ্রন্থের প্রারম্ভ অনুচ্ছেদেই তিনি বলছেন, "সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মর প্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভগ্ন মৃন্ময় প্রাচীর জীর্ণাচ্ছাদ, দৃষ্টবংশকংকাল কুটিরকুল, ইতস্তত শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালক-বালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো মহিষ বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।" তারপরেই বিবেকানন্দ বলছেন, "আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।" [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃ° ৪-৫।] গোরার ভারতচেতনাও অবিকল এক। "গোরা তাহার স্বদেশের সমস্ত দুঃখদুর্গতি-দুর্বলতা ভেদ করিয়াও একটা মহৎ সত্য পদার্থকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইত,—সেইজন্য দেশের দারিদ্র্যকে কিছুমাত্র অস্বীকার না করিয়াও সে দেশের প্রতি এমন একটি বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিল। দেশের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি এমন তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে, তাহার কাছে আসিলে, তাহার দ্বিধাবিহীন দেশভক্তির বাণী শুনিলে সংশয়ীকে হার মানিতে হইত।" [রচনাবলী, পৃ° ১৬৬।]

৬

বিবেকানন্দ বলেছেন, তিনি রামমোহনের কাছে তিনটি বস্তু পেয়েছিলেন: বেদান্ত, স্বদেশপ্রেম ও হিন্দু-মুসলমানে সমান প্রীতি। ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের সঙ্গে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-ভারত ও হিমালয় ভ্রমণের কড়চা তাঁর 'Notes of some wanderings' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। নৈনিতালের একদিনের কথাবার্তা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন: "It was here, too, that we heard a long talk on Ram Mohan Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things, he (Vivekananda)
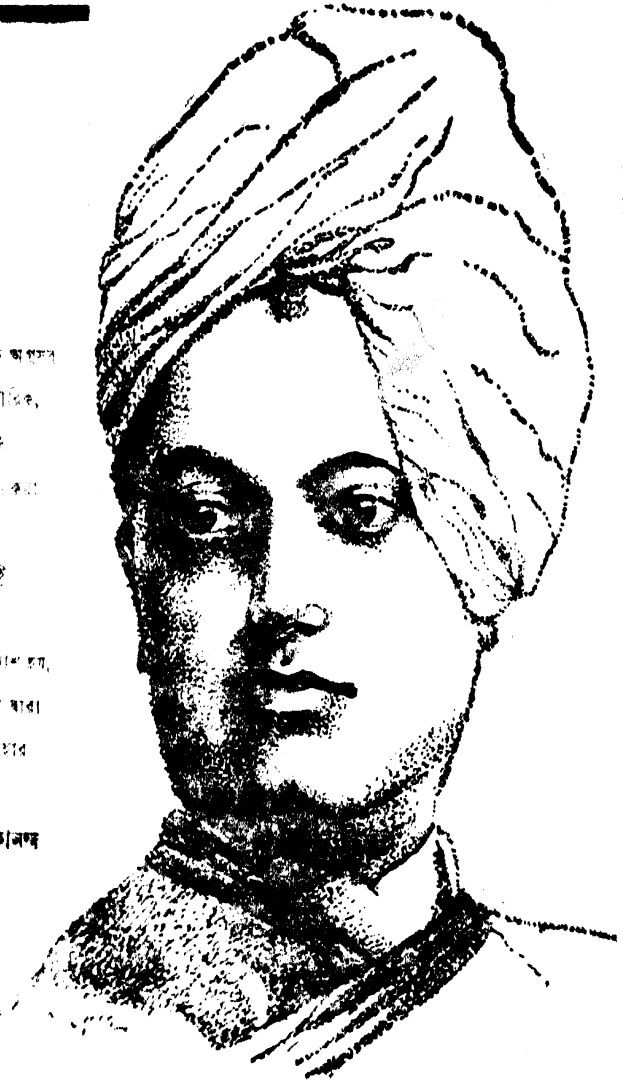
claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohan Roy had mapped out. [পৃ° ১৪]।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুন আলমোড়া থেকে মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে এক পত্রে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'উহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার সব শেষের কথা,এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানবসাধারণের ধর্ম। * * * আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।" [পত্রাবলী-২, পৃ° ৩৩৭-৩৮।]

বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে পুথিপড়া বিদ্যা দিয়ে জানেন নি। জেনেছেন তাঁর দেশদেখা চোখ নিয়ে মাধুকরীবৃত্ত পরিব্রাজক-রূপে সারা ভারত পরিক্রমা করে। গোরাকেও রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতই করেছেন স্বভাবপরিব্রাজক। ভদ্রসমাজ, শিক্ষিতসমাজ ও কলিকাতা-সমাজের বাইরে যে ভারতবর্ষ পড়ে আছে সেই দীনদরিদ্র হিন্দুমুসলমানের মিলিত ভারতবর্ষকে গোরা আবিষ্কার করেছিল পল্লী-ভারতের বুকে। প্রচণ্ড বেদনার সঙ্গে গোরা অনুভব করেছিল সেই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল। ঘোষপুর চরে এসে একদিকে গোরা যেমন এই বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ ও দুর্বল ভারতবর্ষকে দেখতে পেয়েছিল তেমনি আরেক দিকে প্রত্যক্ষ করেছিল একটি দরিদ্র অন্ত্যজ দম্পতির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমের মহিমাকে।

সেবার পল্লীভ্রমণে গোরার শেষ সঙ্গী ছিল রমাপতি। উভয়ে চলতে চলতে একজায়গায় নদীর চরে এক মুসলমান-পাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হল। আতিথ্যগ্রহণের প্রত্যাশায় খুঁজতে খুঁজতে সমস্ত গ্রামের মধ্যে কেবল একটিমাত্র ঘর পাওয়া গেল—একটি হিন্দু নাপিত। দুই ব্রাহ্মণ তারই ঘরে আশ্রয় নিতে গিয়ে দেখল, বৃদ্ধ নাপিত ও তার স্ত্রী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করছে। গোরা নাপিতকে তার অনাচারের জন্যে ভর্ৎসনা করাতে সে বলল, "ঠাকুর আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা, কোনো তফাত নেই।"

কি করে এই অনাথ মুসলমান ছেলেটি নাপিতের গৃহে আশ্রয় পেল তার ইতিহাস হল এই :

"যে-জমিদারিতে ইহারা বাস করিতেছে তাহা নীলকর সাহেবদের ইজারা। চরে নীলের জমি লইয়া প্রজাদের সহিত নীলকুঠির বিরোধের অন্ত নাই। অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে কেবল এই চর-ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবেরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরু সর্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষ্যে দুইবার পুলিসকে ঠেঙাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয় কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ-গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল,—আজ-মাসখানেক হইল নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুঠ করে। সেই উৎপাতের সময় ফরু সর্দার সাহেবের ডান হাতে এমন এক লাঠি বসাইয়াছিল যে ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড় দুঃসাহসিক ব্যাপার এ-অঞ্চলে আর কখনও হয় নাই। ইহার পর হইতে পুলিসের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মত লাগিয়াছে—প্রজাদের কাহারও ঘরে কিছু রাখিল না, ঘরের মেয়েদের ইজ্জত আর থাকে না; ফরু সর্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন, এমন কি, তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালক-পুত্র তমিজ, নাপিতের স্ত্রীকে গ্রাম-সম্পর্কে মাসী বলিয়া ডাকিত; সে খাইতে পায় না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে।"
[রচনাবলী, পৃ° ২৭৮-৭৯।]

এই কাহিনী শুনে গোরা আর উঠতে চায় না। রমাপতির তখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। হিন্দুর পাড়া কতদূরে এই প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল যে ক্রোশ দেড়েক দূরে নীলকুঠির কাছারি আছে, তার তহসিলদার ব্রাহ্মণ, নাম মাধব চাটুজ্যে। মাধব ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু স্বভাবে যমদূত বললেই হয়। মাধবের পরিচয় পেয়ে গোরার এই সম্বিৎ হল যে, ওই ব্রাহ্মণদেহধারী পিশাচের আতিথ্য গ্রহণ করার চেয়ে ওই অনাচারী ম্লেচ্ছের আশ্রয় লওয়া অনেক শ্রেয়স্কর। সে ভাবল :

"পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কি ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে-লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে!" [রচনাবলী, পৃ° ২৮১]

গোরা সেদিন ছিল ধর্মপ্রাণ হিন্দু। কিন্তু এখানে তার হৃদয়বত্তা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক উদার মানবতার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

৭

বিবেকানন্দ দরিদ্রনারায়ণের উপাসক। তিনি ভারতসন্তানকে ডেকে চলেছেন, "ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!" মিস হেলকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন, "আমার সর্বাধিক উপাস্য দেবতা হবেন আমার পাপী-নারায়ণ, আমার তাপী-নারায়ণ, আমার সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্রনারায়ণ!" [পত্রাবলী-২, পৃ° ২৪৭।] 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতের উচ্চ-বর্ণেরা মৃত, নীচবর্ণেরাই যথার্থ জীবিত। তিনি উচ্চ-বর্ণকে সম্বোধন করে বলছেন, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে।" [পরিব্রাজক, পৃ° ৪২।]

গোরাও নিরন্ন ও দরিদ্র জনজীবনের মধ্যেই ভারতের প্রাণপ্রবাহকে খুঁজে পাবার সাধনা করত। সে ত্রিবেণীতে সূর্যগ্রহণের স্নান করবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল। পুণ্য সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে নিগূঢ়তর একটি বাসনা সেখানে ছিল ক্রিয়াশীল। সূর্যগ্রহণের স্নান উপলক্ষে সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী [illegible] হবে। "সেই জন-সাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়। যেখানে গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহার সমস্ত সংকোচ, সমস্ত পূর্বসংস্কার সবলে পরিত্যাগ করিয়া দেশের সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, 'আমি তোমাদের, তোমরা আমার।'" [পৃ° ১৪৩-৪]

গোরার প্রত্যহ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ ছিল : সে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত করত। সে ছিল তাদের দাদাঠাকুর। সামান্য ছুতোরের ছেলে নন্দ ধনুষ্টংকার হয়ে মারা গেল। বাপ ডাক্তার ডাকার প্রস্তাব করেছিল। মা বলল, নন্দকে ভূতে পেয়েছে। অতএব ভূতের ওঝারা এসে সারা রাত তার গায়ে ছেঁকা দিয়েছে, তাকে মেরেছে এবং মন্ত্র পড়েছে। ফলে নন্দর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হয়েছে। জাতির এই মূঢ়তা ও তার নিদারুণ শাস্তি দেখে গোরা বিচলিত না হয়ে পারে নি। সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে—এই দেখে গোরা বিনয়কে বলছে, "নিচের লোকদের নিষ্কৃতি না দিলে কখনোই তোমাদের যথার্থ নিষ্কৃতি নেই। নৌকার খোলে যদি ছিদ্র থাকে তবে নৌকার মাস্তুল কখনোই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারবে না, তা তিনি যতই উচ্চে থাকুন না কেন।" স্বভাবতঃই এই প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির "অপমানিত" কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়। কবিতাটি ১৩১৭ সালের ২০ আষাঢ় রচিত।

৮

বিবেকানন্দের চরিত্রকে সামনে রেখেই যে রবীন্দ্রনাথ গোরার কল্পনা করেছিলেন তার একটি

বড় প্রমাণ পাওয়া যাবে উভয়ের মানস-বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে। তরুণ যৌবনে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন। সে সদস্যপদ থেকে তিনি তাঁর নাম কোনদিনই প্রত্যাহার করেন নি। তিনি বলেছিলেন, "It is for them to say whether I belong to them or not! Unless they have removed it, my name stands on their books to this day!"

জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিবেকানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হলেন 'হিন্দু সন্ন্যাসী'। এবং এই স্তরেই তাঁর অন্তরে ধীরে ধীরে বিশ্ববাণীর বীজ উপ্ত হল।

জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রধানতঃ প্রতীচী দিগন্তের সংস্পর্শে এসে বিবেকানন্দের ধর্মচেতনার পরিপূর্ণ বিবর্তন ঘটে। তাঁর চেতনা হিন্দু-ভারতের সীমানা অতিক্রম করে এক সর্বমানবিক ধর্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই স্তরের চেতনাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতধর্ম। তা বিশ্বধর্মেরই নামান্তর।

দ্বিতীয় স্তরে বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল "to make Hinduism aggressive" [The Master as I saw him, পৃ° ২৩০]। প্রথমবার আমেরিকায় যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন, "I go forth, to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child, and christianity, with all her pretensions, only a distant echo!" [তদেব, পৃ° ২৩১]

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা থেকে তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে এক পত্রে বিবেকানন্দ লেখেন, "হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না।" [পত্রাবলী-১, পৃ ১০৯।]

দু বৎসর পরে, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে তাঁর শিষ্য মিঃ ই. টি. স্টার্ডিকে তিনি লিখছেন, "ভারতকে আমি সত্যসত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশত যাহাদিগকে লোকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণের'ই সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, সে প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই জলসেচন করে না কি?" [পত্রাবলী-১, পৃ° ৪৬০।]

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দেরই সেপ্টেম্বর মাসে বিবেকানন্দ আলাসিঙ্গাকে লিখছেন, "আমি যেমন ভারতের, তেমনি আমি সমগ্র জগতের।" [পত্রাবলী-১, পৃ° ৪৭০]

বিবেকানন্দের ধর্মচেতনার এই অন্তিম স্তরের কথা বিবেচনা করেই মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁর জীবনে 'ইউনিভার্সাল গসপেল' বা বিশ্ববাণীর সন্ধান পেয়েছেন। রোলাঁ তাঁর বিবেকানন্দ-জীবনীর "সর্বজনীন বিজ্ঞান-ধর্ম" অধ্যায়ে লিখছেন, "সত্যই, ধর্ম বলিতে বিবেকানন্দ যাহা বুঝিতেন, তাহার পক্ষগুলি এমন সুবিশাল ছিল যে, তাহা স্থির হইয়া বসিয়া মুক্ত আত্মার সকল ডিম্বগুলির উপরই তা দিতে পারিত। জ্ঞানের অকপট ও প্রকৃতিস্থ রূপগুলির কোনো অংশকেই বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার নিকট ধর্ম ছিল চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতিবেশী এবং ধর্মের একমাত্র শত্রু ছিল অসহিষ্ণুতা।" [ঋষি দাসের অনুবাদ, পৃ° ২৪৫।]

"মানবের মহানগরী" অধ্যায়ে রোলাঁ বলছেন, "ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানসপথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" [তদেব, পৃ° ২৬৮]

এই অধ্যায়েই রোলাঁ বিবেকানন্দের "ভারতের ঋষিগণ" সম্পর্কে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তার অংশবিশেষ উদ্ধার করেছেন। তাতে বিবেকানন্দ বলছেন, "এমন একজনের জন্মের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল, যাহার একই দেহের মধ্যে শংকরের দৃপ্ত বুদ্ধি এবং চৈতন্যের অপূর্ব উদার হৃদয় একত্রিত হইবে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একই মনোভাবকে একই ভগবানকে

যে কাজ করিতে দেখিবে; যে সকলের মধ্যে ভগবানকে, দেখিবে, যে গরিবের জন্য, দুর্বলের জন্য, নির্যাতিতের জন্য ভারতের ভিতরে ও ভারতের বাহিরে জগতের সকলের জন্য কাঁদিবে; সেই সঙ্গে যাহার দৃপ্ত সুমহান বুদ্ধি এমন সকল সুমহৎ চিন্তার জন্ম দিবে, যাহা কেবল ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও সকল বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইবে।" বলাই বাহুল্য, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ঋষি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সেই ভারতঋষির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনে যে-বিশ্ববাণী প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল তারও মূল প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে। সেই প্রেরণাই তাঁর জীবনে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থকতা লাভ করেছিল।

বিবেকানন্দের মানস-বিবর্তনের এই তিন স্তরের মতই গোরার মানস-বিবর্তনেরও তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে গোরাও ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য। কেশববাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে গোরা কলেজ জীবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল। [রচনাবলী, পৃ ১৩৭]। কৃষ্ণদয়াল তখন ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হিন্দু। তাঁর কাছে যে-সব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সমাগম হত তাঁদের মধ্যে বৈদান্তিক হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতি ছিল গোরার প্রভূত শ্রদ্ধা। সে তাঁর কাছে বেদান্তদর্শন পড়তে শুরু করল। এই সময় গোরার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যদিও সে নিজে হিন্দুসংস্কারকে আঘাত করত, কিন্তু বাইরে থেকে কেউ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করলে সে তা কিছুতেই নীরবে সহ্য করতে পারত না। ইংরেজ মিশনারিদের সঙ্গে সে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হত। এই করতে গিয়ে তার মনের পরিবর্তন হতে লাগল। সে বলল, "যে দেশে জন্মিয়াছি সে-দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছু মাত্র সংকুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।" অর্থাৎ গোরার হিন্দুধর্মচেতনার মূলে ছিল স্বদেশচেতনা। এই পর্যায়ে গোরা হয়ে উঠল ঘোরতর হিন্দু। গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক তার নিত্যকৃত্য হল। সে টিকি রাখল। খাওয়া ছোঁওয়া সম্বন্ধে বিচার করে চলতে লাগল। কৃষ্ণদয়াল গোরার এই হিন্দুয়ানির আতিশয্য দেখে চিন্তিত হলেন। তিনি জানতেন এ-পথ গোরার পথ নয়। কিন্তু গোরা তাঁকে বলল, "আমি যে হিন্দু। হিন্দুধর্মের গূঢ় মর্ম আজ না বুঝি তো কাল বুঝব—কোনোকালে যদি না বুঝি তবু এই পথে চলতেই হবে। হিন্দুসমাজের সঙ্গে পূর্বজন্মের সম্বন্ধ কাটাতে পারিনি বলেই তো এ জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি, এ মনে করেই জন্মে জন্মে এই হিন্দু-ধর্মের ও হিন্দুসমাজের ভিতর দিয়েই অবশেষে এর চরমে উত্তীর্ণ হব।" [রচনাবলী, পৃ ১৩৯।]

কিন্তু গোরার ভাগ্যবিধাতা তার জীবনের ভিন্নতর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে বলে সে গর্ব অনুভব করেছিল। কিন্তু যখন তার সত্যকার জন্মপরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল তখন সে দেখতে পেল সে ব্রাহ্মণ-সন্তান তো নয়ই, এমন কি সে হিন্দুও নয়। জাতিতে সে ভারতীয় পর্যন্ত নয়, সে আইরিশ সন্তান। গোরা যখন প্রথম কৃষ্ণদয়ালের কাছে তার অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত শুনতে পেল তখন সেই প্রচণ্ড আঘাতের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তার নিজেকে মনে হল সে সর্বহারা মানুষ। "এক মুহূর্তেই গোরার কাছে তাহার সমস্ত জীবন অত্যন্ত অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মতো হইয়া গেল। শৈশব হইতে এত বৎসর তাহার জীবনের যে ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারেই বিলীন হইয়া গেল। সে যে কী, সে যে কোথায় আছে তাহা যেন বুঝিতেই পারিল না। তাহার পশ্চাতে অতীতকাল বলিয়া যেন কোনো পদার্থই নাই এবং তাহার সম্মুখে তাহার এতকালের এমন একাগ্র লক্ষ্যবর্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেছে। সে যেন কেবল একমুহূর্ত মাত্রের পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো ভাসিতেছে। তাহার মা নাই, বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, দেবতা নাই। * * * এই দিক্‌চক্রহীন অদ্ভুত শূন্যের মধ্যে গোরা নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।" [রচনাবলী, পৃ° ৫৬৬]

এই দিক্‌চক্রহীন অদ্ভুত শূন্যতার মধ্যে সর্বস্ব হারিয়েই গোরা মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় জন্মগ্রহণ করল। পরেশবাবুকে গোরা বলছে, "আমি আজ ভারতবর্ষীয়।

আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। ••• আমি ঠিক যে কল্পনার সামগ্রীটি প্রার্থনা করেছিলুম ঈশ্বর সে-প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি—তিনি তাঁর নিজের সত্য হঠাৎ একেবারে আমার হাতে এনে দিয়ে আমাকে চমকিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে এমন করে আমার অশুচিতাকে একেবারে সমূলে ঘুচিয়ে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আর আমার অপবিত্রতার ভয় রইল না। পরেশবাবু, আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।" [রচনাবলী, পৃ° ৫৭০।]

গোরার এই চেতনাই "ভারততীর্থ" কবিতায় ভাষা পেয়েছে। সেখানে কবি বলছেন :

এ দুখবহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক—
যত লাজভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ—
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

গোরাও দুঃসহ ব্যথার অবসানে বিশাল প্রাণ নিয়ে ভারতজননীর বিপুল নীড়ে নবজন্ম লাভ করল। গোরার ইতিহাস এই নবজন্মেরই ইতিহাস। এ ইতিহাসের মর্মবাণী হল হিন্দুধর্ম থেকে ভারতধর্মে উন্নয়ন। যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা তাঁরই মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সার্বভৌম মানবধর্মই মহাভারতবর্ষের নবধর্ম।

গোরা সব ধর্ম, সব দেশ, সব জাতি হারিয়েই সত্যকার ভারতসন্তান হল—রবীন্দ্রনাথের এ কল্পনা যেমন বলিষ্ঠ তেমনি দুঃসাহসিক। এই দুঃসাহসিক কল্পনাবলেই ভারতপুত্র গোরাকে তিনি করেছেন আইরিশ সন্তান। এখানে অবশ্য ভারতকন্যা নিবেদিতার জীবন তাঁর কল্পনায়ানে প্রেরণা যুগিয়েছে। জন্মসূত্রে আইরিশ সন্তান হয়েও নিবেদিতা আদর্শ হিন্দু আদর্শ ভারতকন্যা হতে পেরেছিলেন। তাঁর সেই পবিত্রসুন্দর জীবনকে চোখের সামনে সত্যরূপে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ ভারতপুত্রকে জন্মসূত্রে আইরিশ বলে কল্পনা করতে পেরেছিলেন। এদিক দিয়ে ভারতের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত ভগিনী নিবেদিতার তপশ্চর্যাপূত জীবন রবীন্দ্রমানসের মহত্তম স্বপ্নরচনায় ক্রিয়াশীল হয়েছিল।

৯

বিবেকানন্দকে সম্মুখে রেখে 'গোরা' উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে স্বভাবতঃই গোরা ও সুচরিতার গুরুশিষ্যা সম্পর্ক-কল্পনায় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার দিব্যজীবনের হোমাগ্নিশিখা রবীন্দ্র-কবিচিত্তকে স্পর্শ করেছিল। আমরা পূর্বে বলেছি, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারত-পুরুষ এবং গোরা বিবেকানন্দের সারস্বত বিগ্রহ। উপন্যাসের শেষে রবীন্দ্রনাথ গোরার সঙ্গে সুচরিতার মিলন ঘটিয়েছেন। তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের সন্ন্যাসধর্মের উপর কটাক্ষ করেছেন এ কথা অনুমান করলে নিতান্তই অবিচার করা হবে। বস্তুতঃ 'গোরা' উপন্যাসে সন্ন্যাসধর্মের প্রসঙ্গ কোথাও উত্থাপিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতধর্মের কল্পনা করেছেন তার সঙ্গে সন্ন্যাসধর্মের যেমন কোন বিরোধ নেই, তেমনি তাতে সন্ন্যাসধর্ম অত্যাবশ্যক ভাবে অপরিহার্যও নয়। আসলে তা পূর্ণমনুষ্যত্বের ধর্ম। এই পূর্ণমনুষ্যত্ব নারীকে বর্জন করে নয়, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় পুরুষ ও নারীর মিলনেই পূর্ণমনুষ্যত্বের বিকাশ। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ গোরা ও সুচরিতার যে মিলনের কল্পনা করেছেন তা একান্তই আত্মিক মিলন। তাঁর মতে, অনুরাগের মধ্য দিয়ে এই আত্মিক মিলনেই আসে জীবনের পরিপূর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথের এ কল্পনার সমর্থন বিবেকানন্দের চিন্তায় রয়েছে কি না তা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw him' গ্রন্থের "Monasticism and Marriage" অধ্যায়ে বলেছেন, "To the conscience of the Swami, his
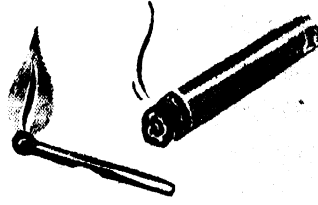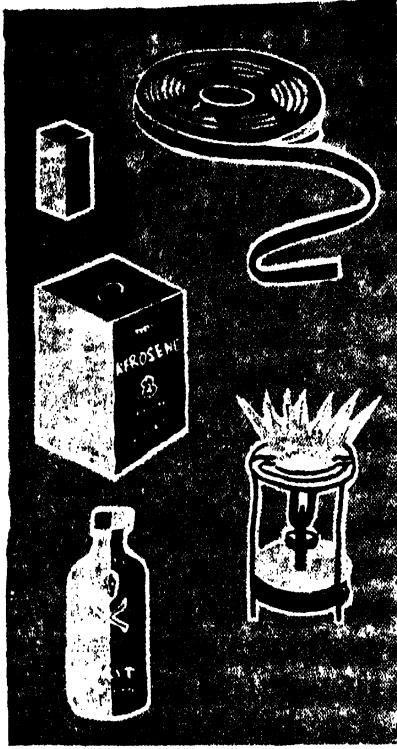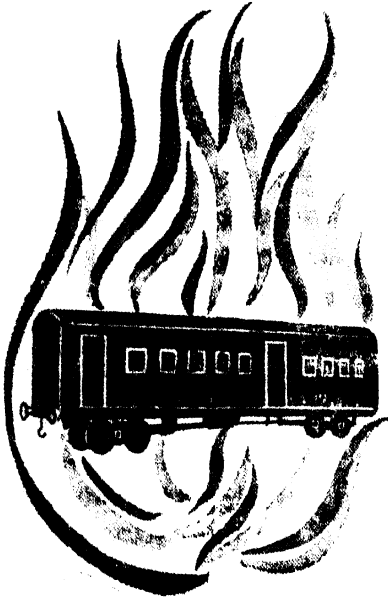
monastic vows were incomparably precious. To him personally—as to any sincere monk—marriage, or any step associated with it, would have been the first of crimes. To rise beyond the very memory of its impulse, was his ideal, and to guard himself and his disciples against the remotest danger of it, his passion." [পৃ° ৩১৫]

কিন্তু তা বলে বিবেকানন্দ নারীকে নরকের দ্বার বলে কখনই মনে করতেন না। নিবেদিতা লিখেছেন, "It must be understood, however, that his dread was not of woman, but of temptation." [পৃ° ৩১৫] বস্তুত: শক্তিসাধক বিবেকানন্দ শক্তিস্বরূপিণী নারীকে কোনদিনই অশ্রদ্ধা করেন নি। কাশ্মীরে মুসলমান-মাঝির মেয়েকেও তিনি উমারূপে উপাসনা করেছেন। নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। নারী-জাগরণ ভিন্ন ভারতের জাগরণ পূর্ণরূপে সার্থক হতে পারে না এ কথা বিবেকানন্দ অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করতেন। নিবেদিতা লিখেছেন, "With five hundred men, he would say, the conquest of India might take fifty years ; with as many women, not more than a few weeks." [পৃ° ৩০৭]

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে লেখা এক চিঠিতে বিবেকানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন :

"জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

"সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু'-গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব-সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব-প্রচার।

"সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।" [পত্রাবলী-২, পৃ° ৩০]

ভারতের নারীসমাজের জাগরণের জন্যেই বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে আহ্বান করেছিলেন। ২৯।৭।১৮৯৭ তারিখে আলমোড়া থেকে তিনি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, "ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারী-সমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বদা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।" [পত্রাবলী-২, পৃ° ২৩৭]

বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের নৈরাশ্যময় মুহূর্তে তাঁর এই প্রিয়শিষ্যার কাছে প্রেরণাও পেয়েছেন। ৫।৫।১৮৯৭ তারিখে লিখিত চিঠিতে তা সুব্যক্ত। "তোমার প্রীতিসিক্ত ও উৎসাহপূর্ণ পত্রখানি আমার হৃদয়ে কত যে বল সঞ্চার করেছে তা তুমি নিজেও জান না। * * তোমার যে মমতা, ভক্তি, বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিতা আছে, তা যদি কেহ পায়, তবে সে জীবনে যত পরিশ্রমই করুক না কেন, ওতেই তার শতগুণ প্রতিদান হয়ে যাবে। * *" [পত্রাবলী-২, পৃ. ২০৮-১০।]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস বিবেকানন্দ নিবেদিতার কাছে তা পেয়েছিলেন। সংগ্রামী কর্মী-পুরুষ নারীর অনুরাগের মধ্যে যে প্রেরণা লাভ করে রবীন্দ্রনাথ তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের "মুক্তরূপ" কবিতায়। প্রেরণাদাত্রী নারীর কণ্ঠে ভাষা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

বিরাজে মানবশৌর্যে স্বর্গের মহিমা,
মর্ত্যে সে তিমিরজয়ী প্রভু,
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি,
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্রধূলি,
নির্দয় সংগ্রাম-অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টিকা,
জানি যেন সে-তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারো জীবনজয়শিখা।

আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো :
মোর দুঃখযজ্ঞের শিখায়
জ্বলিবে মশাল তব, আতঙ্ক দুঃসহ
রাত্রিরে দহি সে যেন যায়।
তোমারে করিনু দান শ্রদ্ধার পাথেয়,
যাত্রা তব ধন্য হ'ক, যাহা কিছু হেয়
ধূলিতলে হ'ক ধূলি, দ্বিধা যাক মরি,
চরিতার্থ হ'ক ব্যর্থতাও,

তোমার বিজয়মাল্য হতে ছিন্ন করি
আমারে একটি পুষ্প দাও।

এই প্রসঙ্গে এই কবিতাটির উল্লেখের একটি বিশেষ হেতু আছে। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে কবিতাটি উদ্ধৃত করে এই সম্পর্কে কবি কি বলেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন। 'মুক্তপ্রেম' বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝতেন তার বিশদ পরিচয় তাতে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"তোমরা যাই বল, মেয়েদের প্রধান কাজ inspire করা। পুরুষ বা মেয়ে উভয়েই অসম্পূর্ণ, উভয়ে মিলিত হলে একটা সম্পূর্ণতা আসে, জীবনে তার গভীর প্রয়োজনীয়তা। • • • পুরুষ তার কর্মক্ষেত্রে সবল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি না নারী তার অমৃত দিয়ে পূর্ণ করে তাকে। দুজনের মিলনে যেন একটা circle সম্পূর্ণ হল, যদি তা না হত তাহলে যে একটা বিশেষ ক্ষতি হত তা হয়তো নয়, কিন্তু সেই হওয়ার দ্বারা একটা বিশেষ পূর্ণতা জীবনের। মেয়েদের সেই কাজ, পুরুষের যথার্থ সঙ্গিনী হওয়া, জীবনের মুক্তক্ষেত্রে। • • তাই বলছিলুম মেয়েদের প্রধান কাজ যদি inspire করা হয়—inspire করা কর্মীকে তার কর্মের মধ্যে, সে কম নয়। সেই শিখা না হলে আলো যে জ্বলত না, তাই হৃদয়ে সে শিখা জ্বালানো চাই। বিবেকানন্দ কি বিবেকানন্দ হতেন যদি না নিবেদিতার আত্মনিবেদন লাভ করতেন। এই সহজ কথাটা কেন লোকে ভোলে তা জানি নে,—কে যে সামনে এলো, কে পিছনে রইল সেটা সামান্য। অসামান্য সেইটাই যেটা সার দান, কি উপায়ে দিল তা নয়,—কি দিল। • • উভয়কে মিলিত হতে হবে এটাই বিধান। কিন্তু সে মিলন তখনই যথার্থ বড় মিলন হয়, যখন সে একটা মহত্তর জীবনের মধ্যে প্রেরণা আনে। গণ্ডিবদ্ধ আঁচল-চাপা-দেওয়া জীবনে সে যেন ব্যর্থ না হয়। যেখানে পুরুষ মহৎ, যেখানে সে কর্মের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে তাকে নিত্য জাগ্রত করে রাখা কম কাজ নয়।" [সংস্করণ ১৩৬৪, পৃ° ১৩২-৩৩]

"বিবেকানন্দ কি বিবেকানন্দ হতেন যদি না নিবেদিতার আত্মনিবেদন লাভ করতেন।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সবার কাছে সমর্থন পাবে না। এ সম্পর্কে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবি বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্ককে কি ভাবে দেখতেন সে সম্পর্কে উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ যখন 'গোরা' লিখছেন তখন নিবেদিতার 'An Indian Study of Love and Death' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। এর Meditationগুলি যে নিবেদিতার অন্তরঙ্গ আত্মকথার সঙ্গে সুরমেলানো তা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। Meditations of Love-এ নিবেদিতা লিখছেন :

"Outwardly, our lives had been different. But inwardly, we saw them for the same. One had led to just that need which only the other could understand. One had led to just that will, in which the other could perfectly accord. That aim which I could worship, embodied itself in him....I had dreamt great dreams, but did he not fulfil them at their hardest ?"

এই হচ্ছে প্রেরণাময় আত্মিক প্রেমের স্বরূপ। এই প্রেমে মিলনের অর্থ হল দুটি হৃদয়-তন্ত্রীতে, সুরে বাঁধা বাদ্যযন্ত্রের দুটি তন্ত্রীর মত, একটি গুণগত সঙ্গতি লাভ করা। ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, "And union is not an act. It is a quality, inherent in the natures that have been attuned"

রবীন্দ্রনাথ গোরা ও সুচরিতার মধ্যে এই প্রেরণাময় প্রেম, এই গুণগত মিলনের কথাই কল্পনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, সুচরিতা নিবেদিতার পূর্ণ-প্রতিমূর্তি নয়। বিবেকানন্দ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিবেদিতা যে-অসামান্যতায় উন্নীত হয়েছিলেন তার পরিচয় সুচরিতা-চরিত্রে নেই। 'গোরা' উপন্যাসে শুধু দীক্ষার কথাই আছে। আর আছে সুমহতী সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তা ছাড়া সুচরিতা নারীমহিমার সেই মূর্তিতেই উদ্ভাসিত যে-মূর্তি কর্মী-পুরুষের প্রেরণাদাত্রী। সুচরিতা 'মহুয়া'র "মুক্তপ্রেমে"র ভাবময়ী কায়া। মহৎ ব্রতে উদ্দীপ্ত পুরুষের প্রেরণারূপিণী নারীসত্তার জীবন্ত প্রতিমা।

গোরা-সুচরিতার প্রথম সাক্ষাৎ বিরোধের মধ্য দিয়ে। পরেশবাবুর গৃহে গোরার প্রথম উপস্থিতি 'বর্তমান কালের

রুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মত।' সুচরিতা পরেশবাবুর কাছে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের যে শিক্ষা পেয়েছে, আক্রমণাত্মক হিন্দুত্বের উগ্র সমর্থক গোরার সমগ্র বিদ্রোহ তারই বিরুদ্ধে। প্রথম দৃষ্টিতেই গোরার প্রতি সুচরিতার একটা আক্রোশ জন্মাল। সুচরিতার অত্যন্ত ইচ্ছা করতে লাগল কেউ এই উদ্ধত যুবককে তর্কে একেবারে পরাস্ত লাঞ্ছিত করে দেয়। হারানবাবুর কথায় জানা গেল গোরা একদা ব্রাহ্মসমাজের একজন খুব উৎসাহী সভ্য ছিল। আজ সে প্রচণ্ড হিন্দু। হারানবাবুর সঙ্গে গোরার তুমুল তর্ক শুরু হল। হারানবাবু শেষ পর্যন্ত রাগের মাথায় তর্ক ছেড়ে গালাগালিতে নেমে গেলেন। হারানবাবুর এই অসহিষ্ণুতায় লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে তখন সুচরিতা গোরার পক্ষ অবলম্বন করেছে। হারানবাবুর সঙ্গে সুচরিতার বিবাহ হবে—এ রকম একটা কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে রয়েছে। গোরার আবির্ভাবে সুচরিতার মনে হারানের প্রতি বিরূপতার আভাস দেখা দিল। ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক মতে গোরার সঙ্গে সুচরিতার মিল ছিল না। কিন্তু স্বদেশের প্রতি মমত্ব, স্বজাতির প্রতি বেদনায় গোরা তার চিত্ত জয় করে নিল।

দ্বিতীয় সাক্ষাতে গোরা সুচরিতাকে বলছে, "ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে, সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে, ভারত রক্ষা পাবে। ইংরেজের ইতিহাস পড়ে এইটে যদি আমরা না শিখে থাকি তবে সমস্তই ভুল শিখেছি। আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভালোমন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান,—যদি বিকৃতি থাকে, তবে ভিতর থেকে সংশোধন করে তুলুন, কিন্তু একে দেখুন, বুঝুন, ভাবুন, এর দিকে মুখ ফেরান, এর সঙ্গে এক হ'ন, এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে, খ্রীস্টানি সংস্কারে বাল্যকাল হতে অস্থিমজ্জায় দীক্ষিত হয়ে একে আপনি বুঝতেই পারবেন না, একে কেবলই আঘাত করতেই থাকবেন, এর কোনো কাজেই লাগবেন না।" [রচনাবলী, পৃ° ২৪০]

গোরা বলল বটে,"আমার অনুরোধ",—কিন্তু এ তো অনুরোধ নয়, সুচরিতার মনে হল, এ যেন আদেশ। ভারতবর্ষ বলে যে একটা বৃহৎ প্রাচীন সত্তা আছে সুচরিতা সে কথা কোনও দিন এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবে নি। গোরার আবেগগর্ভ আবেদনে সে অভিভূত না হয়ে পারল না। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরু বিবেকানন্দকে বলেছেন 'আত্মা-জাগানিয়া'—'The awakener of souls.' তিনি বলেছেন, বিবেকানন্দ প্রাণের শিখা জ্বালিয়ে দিতেন। "...he knew how to light a fire. Where others gave directions, he would show the thing itself." [The Master as I saw him, পৃ° ৯৮]

"সুচরিতা তাহার জীবনে এতদিন পরে এই প্রথম একজনকে একটি বিশেষ মানুষ, একটি বিশেষ পুরুষ বলিয়া যেন দেখিতে পাইল। * * চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কী, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।" [রচনাবলী, পৃ° ২৩৬-৩৭]

গোরার চোখেও সুচরিতা এক অপূর্ব লাবণ্য-প্রতিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "মুখের ডৌলটি কী সুকুমার। ভ্রুযুগলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মত নির্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁট দুটি চুপ করিয়া আছে কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মত রহিয়াছে।" [পৃ° ২৩৮]

গোরার অন্তর এক সূক্ষ্ম সুকুমার আনন্দচেতনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। বার বার সে নিজেকে এই প্রশ্ন করতে লাগল, তার জীবনে এ কিসের আবির্ভাব এবং এর কী প্রয়োজন। যে-সংকল্প দ্বারা সে আপনার জীবনকে আগাগোড়া বিধিবদ্ধ করে মনে মনে সাজিয়ে নিয়েছিল তার মধ্যে এর স্থান কোথায়? এ কি তার বিরুদ্ধ? সংগ্রাম করে কি একে পরাস্ত করতে হবে? "এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনই বদ্ধ করিল অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল, কোন্ দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—কোন্ অনিন্দ্য-

সুন্দর হাতখানির আঙুলগুলি স্পর্শসৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল; গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিল। একাকী অন্ধকারের মধ্যে এই প্রগাঢ় অনুভূতি তাহার সমস্ত প্রশ্নকে সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত করিয়া দিল।" [পৃ° ২৪৬-৪৭]

ধীরে ধীরে এই প্রগাঢ় অনুভূতি গোরার সমগ্র জীবনচেতনার সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে উঠল। জেলের অবরোধের মধ্যে সুচরিতার মূর্তি নবরূপপরিগ্রহ করল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে মার পাশে সুচরিতাকে সে দেখল সেই নূতন ভাবে আবিষ্ট দৃষ্টিতে। "সুচরিতাকে সে তখন একটি ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া দেখিতেছিল না, তাহাকে একটি ভাব বলিয়া দেখিতেছিল। ভারতের নারীপ্রকৃতি সুচরিতা-মূর্তিতে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। ভারতের গৃহকে পুণ্যে সৌন্দর্যে ও প্রেমে মধুর ও পবিত্র করিবার জন্যই ইঁহার আবির্ভাব। যে-লক্ষ্মী ভারতের শিশুকে মানুষ করেন, রোগীকে সেবা করেন, তাপীকে সান্ত্বনা দেন, তুচ্ছকেও প্রেমের গৌরবে প্রতিষ্ঠাদান করেন, যিনি দুঃখে দুর্গতিতেও আমাদের দীনতমকেও ত্যাগ করেন নাই, অবজ্ঞা করেন নাই, যিনি আমাদের পূজার্হা হইয়াও আমাদের অযোগ্যতমকেও একমনে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার নিপুণ সুন্দর হাত দুইখানি আমাদের কাজে উৎসর্গ-করা এবং যাঁহার চিরসহিষ্ণু ক্ষমাপূর্ণ প্রেম অক্ষয় দানরূপে আমরা ঈশ্বরের কাছ হইতে লাভ করিয়াছি সেই লক্ষ্মীরই একটি প্রকাশকে গোরা তাহার মাতার পার্শ্বে প্রত্যক্ষ আসীন দেখিয়া গভীর আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই লক্ষ্মীর দিকে আমরা তাকাই নাই—ইঁহাকেই আমরা সকলের পিছনে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম—আমাদের এমন দুর্গতির লক্ষণ আর কিছুই নাই। গোরার তখন মনে হইল—দেশ বলিতেই ইনি—সমস্ত ভারতের মর্মস্থানে প্রাণের নিকেতনে শতদল পদ্মের উপর ইনি বসিয়া আছেন—আমরা ইঁহারই সেবক। * * গোরা নিজের মনে নিজে আশ্চর্য হইয়া গেছে। যতদিন ভারতবর্ষের নারী তাহার অনুভবগোচর ছিল না ততদিন ভারতবর্ষকে সে যে কিরূপ অসম্পূর্ণ করিয়া উপলব্ধি করিতেছিল ইতিপূর্বে তাহা সে জানিতই না।" [পৃ° ৪২৯-৩০।]

আরেকদিন এই চেতনাকে ভাষা দিয়ে গোরা সুচরিতাকে বলল, "কেবল পুরুষের দৃষ্টিতে তো ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হবেন না। আমাদের মেয়েদের চোখের সামনে যেদিন আবির্ভূত হবেন সেইদিনই তাঁর প্রকাশ পূর্ণ হবে। তোমার সঙ্গে একসঙ্গে একদৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখব এই একটি আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে দগ্ধ করছে।" [পৃ° ৪৭৪।]

"ভারতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে না, তুমি যদি তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক।" গোরার এই আহ্বান সুচরিতার সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জীবনকে এক নূতন পথের সম্মুখে এনে উপস্থিত করল। এই চরম আহ্বানে সুচরিতার যে মানস-প্রতিক্রিয়া হল তাকে রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

"হায়, কোথায় ছিল ভারতবর্ষ। কোন্ সুদূরে ছিল সুচরিতা। কোথা হইতে আসিল ভারতবর্ষের এই সাধক, এই ভাবে-ভোলা তাপস। সকলকে ঠেলিয়া কেন সে তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলকে ছাড়িয়া কেন সে তাকেই আহ্বান করিল। কোনও সংশয় করিল না, বাধা মানিল না। বলিল—তোমাকে নহিলে চলিবে না—তোমাকে লইবার জন্য আসিয়াছি, তুমি নির্বাসিত হইয়া থাকিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না।" [পৃ° ৪৭৪।]

সুচরিতার জীবনে গোরার এই আহ্বানকে নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের আহ্বানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে রবীন্দ্রনাথ গোরা ও সুচরিতার সম্পর্কটি কোন্ জীবন্ত আদর্শ থেকে আহরণ করেছেন। কথাগুলি সুচরিতার কণ্ঠে যতটা সত্য, নিবেদিতার কণ্ঠেও ততটাই সত্য। এই দুটি নামকরণের দিকেও একটু দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। মার্গারেট হয়েছিলেন নিবেদিতা। রাধারাণী হয়েছে সুচরিতা। ধ্বনি এবং অর্থব্যঞ্জনার দিক দিয়েও নিবেদিতা ও সুচরিতা—দুটি নামের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সুচরিতা গোরার এই আহ্বানে সাড়া দিল। তারই নাম মিলন। উপন্যাসের উপসংহারে উপন্যাসসম্মত ভাষাতেই এই মিলনের সার্থক কাহিনী

বিরচিত হয়েছে। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। নিবেদিতার ভাষাতেই বলতে হয়, এ মিলন কোন ক্রিয়া নয়, তা একই ভাবসংগীতে সংগত দুটি হৃদয়তন্ত্রীর গুণগত ধর্ম। 'And union is not an act. It is a quality, inherent in the natures that have been attuned."

বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও যাঁরা 'গোরা' উপন্যাসের বিচার করেছেন তাঁরাও গোরা ও সুচরিতার মিলনকে নরনারীর সাধারণ মিলনের সমকক্ষ করে দেখেন নি। বিদগ্ধ প্রবীণ সমালোচক, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সুচরিতা-চরিত্রের বিশেষত্বই এই যে, আধ্যাত্মিক আত্মজিজ্ঞাসার পথ দিয়াই ইহার পূর্ণ বিকাশ।" গোরা ও সুচরিতার মিলনের নিগূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, "সুচরিতার প্রেমই যেন তাহার বৈদ্যুতিক আকর্ষণের তেজে গোরার অন্তর্নিহিত সারাংশটিকে বাহ্য সংস্কারের কঠিন বহিরাবরণ হইতে মুক্তি দিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকে একাত্ম করিয়া লইয়াছে। তাহাদের বিবাহ দুই প্রজ্বলিত মানবাত্মার একান্ত মিলন।"

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী বলেছেন, "এমনি করিয়া বাহিরের একটি প্রচণ্ড ধাক্কা সুচরিতাকে এক নিমেষে ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে উদার সত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

"ওদিকে আর একটি প্রচণ্ডতর ধাক্কা হিন্দুধর্মের অসংখ্য সংস্কারের কঠিন জাল ছিন্ন করিয়া গোরাকেও সেই একই স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল।

"এমনি করিয়া দুইদিক হইতে দুইটি চিত্তস্রোত আসিয়া একই মহাসাগরে মিলিত হইল।"

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "দুই প্রজ্বলিত মানবাত্মার একান্ত মিলন", আর অধ্যাপক চৌধুরীর ভাষায় "দুইটি চিত্তস্রোত আসিয়া একই মহাসাগরে মিলিত হইল";—এই দুটি উক্তি গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনায় একই অর্থ বহন করছে। আমরা তাকেই বলেছি আত্মিক মিলন। গোরার দৃষ্টিতে সুচরিতা ভারতলক্ষ্মীরই প্রেয়সী-মূর্তি। "দেশ বলিতেই ইনি—সমস্ত ভারতের [illegible] ইনি বসিয়া আছেন—আমরা ইঁহারই সেবক।" আর সুচরিতার দৃষ্টিতে গোরা—ভারতবর্ষের এক সাধক, এক ভাবে-ভোলা তাপস। এই দুটি প্রজ্বলিত মানবাত্মার মিলন এক মহাব্রতে উৎসর্গীকৃত মহামিলনেরই দ্যোতক।

১০

আমরা প্রথমেই বলেছি, গোরার চরিত্র-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের চরিত্র ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে গোরার সঙ্গে বিবেকানন্দের অক্ষরে অক্ষরে মিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে-অর্থে বিবেকানন্দকে ভারতপুরুষ বলে কল্পনা করেছেন সেই অর্থেই গোরার সঙ্গে বিবেকানন্দের মিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গোরা ভারতপুত্র। নিগূঢ়তর বিশ্লেষণে দেখা যাবে গোরা রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র, তাঁরই আত্মার দোসর। রবীন্দ্র-মানসের বিবর্তনটি লক্ষ্য করলেই এ সত্য স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। গোরার আত্মবিকাশের তিনটি স্তরের কথা আমরা বলেছি। প্রথমে গোরা ব্রাহ্মসমাজের অতিউৎসাহী সভ্য। তারপর সে আক্রমণাত্মক হিন্দুধর্মের প্রবক্তা। সর্বশেষে সে ভারতধর্মের উদ্গাতা। রবীন্দ্রনাথের জীবনও তাই। তরুণ যৌবনে ব্রাহ্মধর্মের অনুশাসনেই তাঁর চিন্তা ও কর্ম প্রবুদ্ধ হয়েছিল। এই পর্যায়ে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে নবহিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঘটল তাঁর সংগ্রাম। দ্বিতীয় স্তরে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। সে যুগে তাঁর চিন্তা ও কর্ম প্রাচীন ভারতের আর্যধর্মের ব্রাহ্মণ্য-চেতনায় প্রবুদ্ধ। 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ' ও 'স্বদেশে' তাঁর সে যুগের চিন্তা লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সর্বশেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভারতধর্ম। তখন তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—সেই বিশ্বনীড়ে বসে বিশ্ববাণীর উপাসক। এ-যুগের রবীন্দ্রনাথের বাণী বহন করছে তাঁর ভারততীর্থ। বিশ্বকবি ভারতভূমিতে যে বিশ্বমানবতার ধ্যান করেছেন তার মূলমন্ত্র হল ভারত-ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানকল্পনার এই ভারতধর্মই বিশ্বধর্ম। বিবেকানন্দও এই ভারতধর্মেরই জীবন্ত বিগ্রহ। এই অর্থেই তিনি ভারতপুরুষ। এদিক দিয়ে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যাবে। বস্তুত: ভারতধর্ম-চেতনায় বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথেরই আত্মার দোসর।
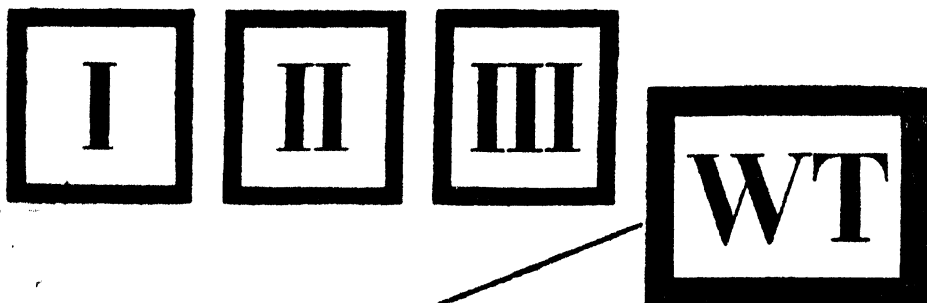
I
II
III
WT

বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা

(আলোচনা)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
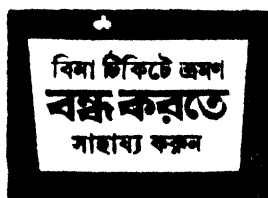
জীবেম শারদং শতং—এই ছিল সেকালের ঋষি পিতামহদের শুভকামনা। আজকালকার ব্যস্ত দিনে সুস্থ শরীরে স্বস্থ হয়ে একশো বছর বাঁচবার ইচ্ছে থাকলেও ঘটে না, তবে ঘটা করে ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজিয়ে মাইকে অমায়িক বক্তৃতা দিয়ে পদ্যে-গদ্যে প্রবন্ধে-নিবন্ধে পুস্তকে-প্রচারে ক্ষণজন্মাদের জন্মলগ্ন স্মরণ করে শতবার্ষিকী করতে আমরা যে ওস্তাদ তার পাথুরে প্রমাণ পথে ঘাটে সভায় সমিতিতে মাসিকে দৈনিকে। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সেই উঁচুঘরের ও উঁচুদরের অর্থাৎ "উচ্চকোটি"র জীব যাঁদের নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত নাচনকোঁদন আরত্রিক আলাপ হয়তো অশোভন নয়। কারণ মরা মরা করেও বল্মীকস্তূপ ভেদ করে কীটদষ্ট আমরা, অনুষ্টুপ ছন্দের কখনও কখনও রসাভাস পাই না যে তা নয়। শ্রদ্ধেয় জগদীশবাবুর প্রবন্ধও অনেকটা সেই জাতের গোত্রান্তরের। তবে একটা কথা যেন আমরা ভুলে না যাই যে আজ রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ কর্মলোকের বৈতরণী পার হয়ে কর্মনাশা মর্মলোকের ভিতর-মহলের শুভ্র চত্বরে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে তাঁরা সমকালীন রক্তমাংসের জীব নন, শুধু নমস্য বরণীয় স্মরণীয় তর্পণীয় নন, তাঁরা "আইডিয়া", "আদর্শ", "ইতিহাস", "কাহিনী", "প্রতীক"। আজ বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রসাদে বহু গজকচ্ছপের যুদ্ধের পর 'চেতন ও অবচেতন' মন নিয়ে 'ডিসেকসন' করে গভীর রহস্যের তল আমরা খুঁজছি কিন্তু আরও গভীরে যে গহ্বরেই গুহাহিত থাকতে পারে তার সন্ধান জানি না, করিও না। 'সাবকনশাস' বা অবচেতন কথাটা এখন চলতি হয়ে আমাদের ভাবভঙ্গীতে বিজড়িত হয়ে গেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'সুপার কনশাস' বা অধিচেতন কথাটা বললেই প্রশ্ন হবে যে লোকটা মোটেই মডার্ন কিনা। অথচ মনের যদি 'সাব' গতি থাকে তাহলে তার উর্ধ্বের দিকে সদ্‌গতি বা 'সুপার' গতিও থাকা আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-লোভ, হিংসা-বিরংসার বিক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে সাইকো-অ্যানালিস্টের দপ্তরে ছুটলেই সমগ্রতার দৃষ্টি আসে না। যোগজ দর্শনের মুক্ত আলম্বের জন্য অন্য অবলম্বনও প্রয়োজন। এই ভূমিকা প্রতিবাদ হিসাবে প্রতিপাদ্য তো নয়ই, শুধু আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে একটা সুসংবদ্ধ সীমানায় নিবদ্ধ রাখার সামান্য ইঙ্গিত মাত্র।

বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস অদ্ভুত। তার গঙ্গার ঘাটে শুধু বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড হয়ে দেখা দেয় নি, পশ্চিমী প্রবল বাত্যারও ঝন্‌ঝন্‌ শুনেছি। সোনার তরীতে ভরা নতুন পসরা এসেছে—জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন রাষ্ট্রবোধের চেতনা। ওই শতাব্দীর শেষ সূর্য যখন রক্তমেঘে অস্ত যাচ্ছে, সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভাবী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মনের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে দুটি প্রভাব আস্তে আস্তে যুবমনকে অধিকার করেছে দুটি লোকোত্তর পুরুষকে ঘিরে। সেখানে পূর্ব ও পশ্চিমের চিন্তাধারা এসে মিলেছে, সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব পড়েছে, রাষ্ট্রচেতনা, শিক্ষা, শিল্পবোধ জেগেছে, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন হচ্ছে, ধর্মের বিচিত্র উন্মাদনা নতুন রূপ নিচ্ছে নানা সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মধ্যে। এই সমাজ-সম্ভাবনার প্রতীক হিসাবে নামকরণ করতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। অবশ্য এঁদের পিছনে ছিলেন রামমোহন রামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র বঙ্কিম মধুসূদন ভূদেব বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ; আর সমসাময়িক কালে ও পরে এলেন শ্রীঅরবিন্দ জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র চিত্তরঞ্জন সুভাষ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রমুখ আরও অনেক মনীষীর দল। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এই দুজন ভাবী ভারত-পুরুষকে আমরা দেখি ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর স্তব্ধ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকতে। ভগিনী নিবেদিতা এই দুই পুরুষোত্তমের মাঝখানে একটি ক্ষীণ সখ্য-সূত্র তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন এ কথাও হয়তো সত্য।

তবে কবি বা সাধককে বাইরে থেকে দেখা যায় না। তাঁরা 'সারফেসে'র লোক নন—যুগচেতনা তাঁদের সৃষ্টি করে, পারিপার্শ্বিক তাঁদের গড়ে তোলে কিন্তু যুগধর্মকে অতিক্রম করাই মহৎ চেতনার লক্ষ্য। ভবিষ্যতের ইতিহাস সে সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে যুগচেতনা উপরতলা থেকে নেমে মাঝের তলা ছুঁয়ে নীচের তলায় পৌঁছেছিল কিনা এবং গণচেতনায় ভাষা ও ভাব পেয়েছিল কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এর বাহ্য। তাঁদের অগ্নিদীপ্ত বচন, অশোক অভয় মন্ত্র, উদাত্ত বাণী, চিন্তার ধারা অনেক মানুষকে অপূর্বভাবে উদ্বোধিত, উদ্বোধিত ও উন্মোচিত করেছে এ কথা অকাট্য ভাবে সত্য। সে জাতীয়তার দ্যোতনা কী, তার ভাবরূপ সমাজে কোন্ স্থিতিরূপ নিল, সেটা কি শুধু একটা নৈর্ব্যক্তিক মানবিক মূল্যবোধ না বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় বিচারবুদ্ধি না বিশিষ্ট জীবনবেদ না করুণাঘন ধর্মকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ না কাউন্টার রিফরমেশন—এ সব নিয়ে তর্ক স্থগিত রেখে দেখা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মাঝে মিলনসূত্রটি কোথায়। শাশ্বত মানবে বিশ্বাসী আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী এই দুজনই উপনিষদের গভীর অতল থেকে শুক্তিমুক্তা তুলে নিজেদের পসরা সাজিয়েছেন—লীলাবাদী কবি, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক, শৈব রবীন্দ্রনাথ, শৈব বিবেকানন্দ, মানবতাবাদী মানবধর্মী এই দুই লোকোত্তর পুরুষ। অস্পৃশ্যতা বিরোধ, স্বদেশপ্রেম, শিব-চেতনায় বিশ্বাস, বুদ্ধপ্রীতি, আত্মশক্তিতে প্রতীতি, পূর্বপশ্চিমের মিলন প্রভৃতি কতদিক দিয়ে তাঁদের মৌলিক মিল, এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি—রবীন্দ্রনাথের কবিবচনসমুচ্চয় তুলে দেখিয়েছি বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই 'বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি সহজেই শুধু বাইরের 'ক্যাপশনে' নয় ভিতরের আলাপ-আলোচনাতেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেটা স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত ভাবে শ্রদ্ধেয় জগদীশবাবুর লেখার আমি একজন ধৈর্যশীল পাঠক। তাঁর বাচনভঙ্গী, তীক্ষ্ণ মনন, তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াস, আর সাহিত্যের গভীর রহস্যকে হৃদয়ের অনুরণনে রঙীন করে দেখবার প্রয়াস আমাদের ভাবিয়ে তোলে—তাঁর মতের সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও। মনীষী অন্নদাশঙ্কর তাঁর এব পুস্তককে উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক বলেছেন। আলো প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি: (১) বিবেকান নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্কের রূপ (২) রবীন্দ্রনাথে মরণ-মিলন কবিতাটি এই আত্মিক সম্পর্কের উপর কো আলোক নিক্ষেপ করে কিনা। লেখকের মত খুবই স্পষ্ট

প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করবার অধিকারী আমরা নই সে কথা পূর্বেই বলেছি, কারণ মানুষের আত্মিক ইতিহাসে কখন যে কি ঘটে, বাইরের প্রকাশে তাকে অনেক সময়ই ধরা যায় না। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে, রূপরসস্পর্শের সাহায্য, ঘটনার পারম্পর্য দিয়ে যুক্তিতর্ক করে বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসে অনেক সময়েই দেখা যায় যে কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক থেকে গেছে। তবু এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে গভীরতম শ্রদ্ধা প্রায় গভীরতম প্রেমের পর্যায়েরই। যখন আমরা গভীরতর ভাবে কাকেও শ্রদ্ধা করি (কি স্ত্রী কি পুরুষ) তখন তার পিছনে একটা (নিবেদিতার নিজের ভাষাতে যা জগদীশবাবু উদ্ধৃত করেছেন) "hidden emotional relationship" গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়, কিন্তু সম্পর্কের এই যে নাটকীয়ত্ব (dramatisation of their relation)—এর মূল কথাই হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা পেরিয়ে "wholly impersonal" এবং সমস্তই পর্যবসিত নিবেদিতার নিজের কথাতেই "in a yearning love of God, in an anguished pursuit of the infinite." নিবেদিতা বিবেকানন্দকে বলেছিলেন—মন-জাগানিয়া (Awakener of Souls)। সেইজন্যই "One holds himself as a servant; another as brother, friend or comrade, a third may even regard the master-personality as that of a beloved child." দাস, বন্ধু, সখা, বালগোপাল থেকে 'পিতাহোনসি,' কান্ত-দয়িত সব ভাবই আরোপ করা যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেহবোধ, লৌকিক লিপ্সা, খণ্ডচেতনা সবই ভগবৎ-প্রেমের অখণ্ড চেতনার মহাসাগরে বিলীন। তাই নিবেদিতা বললেন—"The only claim that I can make is that I was able

to enter sufficiently into the circuit of my master's energy"—আমি আমার গুরুর শক্তিচেতনার চক্রে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে এমন কি ক্রিশ্চিয়ান মিস্‌টিকদের কাহিনীতেও এ অভিজ্ঞতা একেবারে দুর্লভ নয়। রোমাঁ রোঁলা কর্তৃক কথিত সেণ্টক্লারা সেণ্টফ্রান্সিস ছাড়াও বহু বিচিত্র নাম আমাদের মনে পড়ে—সেণ্টজুলিয়ানা, অণ্ডাল, মীরাবাই। কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ক অন্তর্গূঢ় অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। গুরুর পাদপদ্মে সবকিছু আত্মবিসর্জন দেওয়ার দৃষ্টান্তও আমাদের দেশের সাধনার ইতিহাসে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়, কারণ গুরুই ভগবান। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার ও বিবেকানন্দের নিজেদের লিখিত কথা বা চিঠিপত্রগুলিই বেশী প্রামাণিক। নিবেদিতার 'The Master as I saw him' এবং তাঁর 'Notes of Some Wanderings' অপূর্বভাবে উদ্‌ঘাটিত করে গুরু-শিষ্যা সম্পর্কের বা আধ্যাত্মিক পিতাপুত্রীর দিকের আবেগঘন রূপটি। এই বিষয়ে বিবেকানন্দের পত্রই যথেষ্ট, অন্য অনুমানের দরকার কি। নিবেদিতার Notes-এ পড়ি "Beautiful have been days of this year"... মনে রাখতে হবে সেটা লিখছেন ১৮৯৮ সনে এবং বিবেকানন্দ তার পরে আরও চার বছর নরদেহে ছিলেন "In them the ideal has become the real."...সেই দেবশিশু যেন জেগে উঠেছে মহাদেব মহাদেব বলে—রুদ্রের দক্ষিণমুখ সে দেখতে চাইছে—মধুবাতা ঋতায়তে। নিবেদিতার লেখার মধ্যে তাঁর এই সময়ের মানসিক দ্বন্দ্বের একটা আভাস পাওয়া যায় না যে তা নয়। হয়তো সেটা স্বামীজীর তথাকথিত উদাসীনতার দরুন বা প্রিয় শিষ্যাকে শুধু ললিতা কলাবিধিতেই নয়, সব দিক দিয়ে পরীক্ষা করে গ্রহণ করবার জন্য। মিস্ ম্যাকলাউড্‌কে নিবেদিতা বলেছিলেন যে স্বামীজী ছিলেন মূর্তিমান স্নেহ। ৬।৬।৯৮-এর পত্রে (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা—ভগিনী নিবেদিতা, পৃ. ৯৯) দেখেছি তিনি লিখছেন "·· মানুষের জীবন ও সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার অতীত ধারণাগুলিকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই—অথচ দেখিতেছি মহাপুরুষগণ সেগুলি উড়াইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আর তাঁহারা কি একেবারে ভ্রান্ত হইতে পারেন? বর্তমানে আমি কেবল অন্ধকারেই হাতড়াইতেছি, এখানে ওখানে জিজ্ঞাসা করিতেছি ও প্রমাণ খুঁজিতেছি। আশা করি একদিন প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিব, আর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত তাহা অপরকে দান করিতেও পারিব।

একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শরীর এবং আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।···নিজেকে এত সুখী মনে হইতেছে যে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।"

মানবিক দিক থেকে দেখতে গেলে আলাপচারী রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য—"মেয়েদের মধ্যে একটি জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে তাদের ভিতরকার জিনিস। emotion। এ যখন একটা character-এর সঙ্গে মিলে রূপ নেয়, তা অতি আশ্চর্য। এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি সত্যিকারের পুজো করতেন বিবেকানন্দকে। তাই তিনি অনায়াসে গ্রহণ করলেন তাঁর ধর্মকে। নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে এলেন এই দেশে। এই দেশকে, এই দেশের লোককে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর এই ভালোবাসা যে কত সত্যিকারের তা বলবার নয়, সব কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর এই সাহস, এই আত্মত্যাগ অবাক করে দিয়েছিল আমাকে—আমি নিবেদিতার কাছে প্রায়ই যেতুম।" জগদীশবাবুর প্রবন্ধে এই পর্যন্তই উদ্ধৃতি আছে কিন্তু তার পরেও কবি তাঁর বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করে বলেছিলেন—"মেয়েদের যেটা emotion সেটা যদি শুধু emotionই হয় তবে তা অতি সহজেই বিকৃত হয়, কিন্তু তার মধ্যে যদি একটা character থাকে তবেই হয় তার সত্যপ্রতিষ্ঠা।" এই 'ইমোশন' বা ভাবদ্যোতনার সঙ্গে মিলেছিল চারিত্রশক্তি, কর্মচেতনা ও উদ্যম, তাই নিবেদিতার অনুরাগ ভাবের ললিতক্রোড়ে নিলীন প্রেম নয়, সক্ষম স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে সাহচর্য; তাকে সেবা বা পূজা বলাই সঙ্গত—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শেষ বিচারে যা বলেছিলেন। এখানে বৈষ্ণবজনোচিত বিরহমিলন পূর্বরাগ অনুরাগ মাথুর নৌকাবিলাসের ললিত লাস্য নেই, ভাবাতিশয্যে খণ্ডিতা বা মানিনীর চিত্র নয়, এখানে আছে রিক্তভূষণ দীনদরিদ্ররা, 'নাজুকবদন' 'সুখদাইন'রা নয়, এখানে দুরূহ

কর্তব্যতার আছে, দুঃসহ কঠোর বেদনা আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার অনুরাগকে মানুষের মধ্যে যে শিব আছে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ বলেছেন—যে শিব দীনদরিদ্রের জীর্ণকুটিরে হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যে থাকেন। বিবেকানন্দই নিবেদিতাকে শিখিয়েছিলেন যে তাঁর শিব বিবেকানন্দরূপী মানুষ নন, ভাবৈকরসপূর্ণ ব্যক্তিসত্তাশূন্য একটি সমগ্রতার আদর্শ।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরযদয়মাত্মা।

এই সুরে তরুণার্ক রক্তিম বসন নেই, কর্ণে চ্যুত পল্লব নেই, অলকে নব কর্ণিকার নেই, আছে শুধু লাবণ্যপরাক্রান্ত-যৌবনা (অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া কাদম্বরীর মহাশ্বেতা, যাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত) নিরাভরণা পার্বতীর মহিমা—যিনি দুঃখকে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্যও দৃকপাতমাত্র করেন না।

যে ১৯০৪ সনে রমেশ দত্ত ও প্যাট্রিক গেডেসকে উৎসর্গ করে নিবেদিতার "The Web of Indian Life" পুস্তকটি বেরোয়। ১৯১৭ সনের ২১শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ একটি ভূমিকা লিখে দেন—She had won her access to the inmost heart of our society and came to know us by becoming one of our selves. বিবেকানন্দের মৃত্যুর পনেরো বছর পরেও বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্কে কোন উক্তি কবির মুখে নেই। এর কয়েক বছর পরে দিলীপের স্মৃতিচারণে পড়ি যে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে লণ্ডনে এক সভার প্রস্তাবে কবি বলছেন—আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কি ভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্যকীর্তি তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেন নি—আমরা বড় আর্ত, বড় দীনহীন, বলতেন ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও···

জগদীশবাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের মরণ-মিলন কবিতাটি বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্ক লক্ষ্য করেই লেখা। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা উচিত যে শ্রদ্ধেয় জগদীশবাবু কোন external evidence—যেমন রবীন্দ্রনাথের উক্তি বা চিঠিপত্র বা সমসাময়িক কোন সাক্ষীর লেখা বা মন্তব্য এ সব কিছুরই উল্লেখ করেন নি, শুধু internal evidence এবং প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করেই একটা সুষ্ঠু অনুমানে আসবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টা প্রশংসনীয় কিন্তু কতদূর নির্ভরযোগ্য বা বিচারসহ সেইটেই বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। মতানৈক্য প্রবন্ধের গুরুত্ব বা মূল্য কমায় না। বরং কবি তাঁর আত্মপরিচয়ে (পৃঃ ৬১) এই কবিতাটির উল্লেখ করে সৃষ্টির মধ্যে যে খ্যাপা দেবতা আছেন তাঁকেই সাধারণভাবে স্মরণ করেছেন এই কথাই বলেছেন, কোন বিশেষ ঘটনা বা লোককে নয়। এ কবিতার তাৎপর্য যে জীবনে এই দুঃখ বিপদ বিরোধ মৃত্যুর বেশেই অসীমের আবির্ভাব ঘটে। কবির রচনায় বার বার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে।

(১) ১৮৯৫ সনের শীতের সন্ধ্যা, লণ্ডন শহর, তুষারাচ্ছন্ন হিমতুহিন দিন—গৈরিক পরিহিত স্বামী বিবেকানন্দ বসে আছেন সাধারণভাবে আলোচনায়। মেরী মায়ের কোলে শিশু যিশুর মুখের যে অবর্ণনীয় ভাবসারল্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন শিল্পীশ্রেষ্ঠ র‍্যাফেল, তারই প্রতিচ্ছায়া দেখলেন এক বিদেশিনী এক পরদেশী যোগীর মুখে—"···the look that Raphael has painted for us on the brow of the sistine child." প্রথম বীজ রোপিত হল—"Man proceeds from truth to truth, and not from error to truth." মানুষ সত্য থেকেই সত্যে উপনীত হয়, ভ্রান্তি থেকে সত্যে নয় আর সত্যরূপী তিনিই আসেন যখনই দুঃখদৈন্যক্লেশ অনাচার-অবিচারের পসরা ভারী হয়—সম্ভবামি যুগে যুগে। নিবেদিতা নিজেই বলেছেন যে প্রথম দর্শনে তাঁকে অভিভূত করেছিল "the heroric fibre of the man" এবং তাঁর চরিত্র (character)। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'The Web of Indian Life' প্রকাশিত হবার পর ২৬শে জুলাই (মুক্তিপ্রাণা : নিবেদিতা ৩১ পৃ.) তিনি লিখছেন—"মনে কর যদি সে সময়ে স্বামিজী লণ্ডনে না আসতেন ?" ১৮৯৬ সনে স্বামীজী আবার লণ্ডনে এলেন—মিস্ মার্গারেট নোবল্ তাঁর বেদান্ত ক্লাসের নিয়মিত ছাত্রী হলেন।

৭ই জুন এক পত্রে তিনি নিবেদিতাকে প্রিয় মিস্ ...ল্ বলে সম্বোধন করে লিখলেন—আমার আদর্শ ... "অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতি ...র্ব সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা-নির্ধারণ···কার্যপ্রণালী ...নি গড়ে ওঠে ও কার্যসাধন করে। আমি শুধু ...জাগো জাগো। অনন্তকালের জন্য আমার অফুরন্ত ...র্বাদ।" নিবেদিতা যখন এখানে তাঁর কার্যে যোগদান ...বার জন্য আসতে চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন— ...রিদ্র্য, অধঃপতন, আবর্জনা, ছিন্ন মলিনবসন পরিহিত ...নারী যদি দেখিতে সাধ থাকে তবে চলিয়া আইস, ... কিছু প্রত্যাশা করিয়া আসিও না।"

বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ছিল যে সিংহিনীর মত শক্তিময়ী ...টি নারীকে এ দেশের মেয়েদের জন্য খাটাবেন।

১৮৯৬-৯৭ সন পার হয়ে ১৮৯৮ সনে জানুয়ারি ...সে নিবেদিতা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেন। ...দিনে তাঁকে মনস্থির করবার এবং অন্য কিছু প্রত্যাশা করবার নির্দেশ দিয়ে স্বামীজী তাঁকে আহ্বান করলেন— ...have plans for the women of my own ...untry in which you I think could be of ...eat help to me." অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে-লেন যে—"I will stand by you unto death, ...hether you work for India or not, whether ...ou give up Vedanta or remain in it." একজন ...শ্চিমদেশীয়া শিষ্যাকে এ বলিষ্ঠ আশ্বাস দেওয়ার দরকার ...ল। প্লেগের সময় সেবাশুশ্রূষায় নিবেদিতপ্রাণা ...বেদিতার সেবা যাঁরাই স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরাই জানেন ... কী মহীয়সী মহিলাই নিবেদিতা ছিলেন। এর মধ্যে ...রপার্বতীর দ্বৈত অর্ধনারীশ্বররূপ কল্পনা একটু কষ্টকল্পিত ...নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনে emotional crisis আসা ...সম্ভব নয় কিন্তু সেটাকে magnify করার মত কোন ...প্রমাণ নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এবং এই ...কল্পনার উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথের মরণ-মিলন ...কবিতাকে বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে লেখা বলা সঙ্গত কিনা ...জানি না। অবশ্য নিবেদিতার দীক্ষার দিন (২৫শে মার্চ The Day of Anunciation) স্বামীজী নাকি জটা

খ্রীষ্টজন্মের আভাসের পুণ্যতিথিতে, শিবপূজার পর বুদ্ধ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ভগবৎ চরণে তাঁকে নিবেদিত করে-ছিলেন তিনি, এ এক অপূর্ব দীক্ষা। আসলে মিস্ মার্গারেট নোবল্ বিবেকানন্দের মহৎ কার্যে সহায়তা করতে ভারতে আসেন।

(২) রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়ি (রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টাদশ খণ্ড) যে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে এসেছেন। ১৬ই জুন ১৮৯৯ সনে (রবীন্দ্রনাথের চিঠি-পত্র নং ৬) দেখি তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখছেন My Dear Mr. Tagore অভিহিত করে এবং লিখছেন—"I could not help hoping you should be my friend too...." এর পরেও রবীন্দ্রনাথকে তিনি পত্র লিখছেন বিলাত থেকে আচার্য জগদীশ বসু সম্বন্ধে এবং তখনও স্বামীজী জীবিত। কিন্তু কোথাও বিবেকানন্দের কোন reference নেই—না রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে, না নিবেদিতার চিঠিতে। এরও পরে নিবেদিতাকে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অতিথি হতে দেখছি, কাবুলীওয়ালা গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করে প্রিন্স ক্রপ্টকিনকে পড়তে দিচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে পদ্মার চরে বেড়াচ্ছেন, গ্রামের অভ্যন্তরে যাচ্ছেন, গরীব প্রজাদের সঙ্গে মিশছেন, অন্য আলোচনা করছেন, পরে একসঙ্গে বুদ্ধগয়ায় এক সপ্তাহ কাটালেন তাঁরা (আচার্য যদুনাথ: Sister Nivedita as I knew her—Hindusthan Standard) কিন্তু বিবেকানন্দের কোন উল্লেখ নেই। এই বোধিবৃক্ষতলেই স্বামীজী কয়েকদিন কঠোর তপস্যা করেন এবং এই বটদ্রুমের নীচেই রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা প্রভৃতি সন্ধ্যাকালে ধ্যানে বসতেন, অথচ বিবেকানন্দের কোন উল্লেখ পাই না—না নিবেদিতার লেখায়, না রবীন্দ্র-নাথের কথায়। বরং রবীন্দ্রনাথ জাপানী ধীবরের মুখে শোনা একটি বুদ্ধবন্দনাকে অমর করে দিলেন কাব্যে—"নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়, নমো নমো গোতম-চন্দিমায়···"

(৩) রবীন্দ্রচেতনায় প্রাচীন ভারতের রূপরেখা হিসাবে এবং কালিদাসীয় ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে ...[illegible] concept বহুদিন থেকে বর্তমান।

মৃত্যুতত্ত্বকে রুদ্র-শিবতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া ভারতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের লেখার এই যুগে ও এর আগের যুগে এই শিব-উমা প্রতীককে বহু স্থানে পাই। জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে দাঁড়িয়ে কবি দেখছেন—

> অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারংবার
> শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া রয়েছেন বিচিত্র মূরতি
> ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি
> দুর্গম দুঃসহ মৌন জটাপুঞ্জ তুষার সংঘাত

সেইজন্য অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বিবেকানন্দ-নিবেদিতাকে কল্পনার মূলে বসিয়ে স্বামীজীর তিরোধানকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার শোককে এই প্রতীকে রূপ দিতে চেষ্টা করলেন এ ধারণাই বা আমরা করব কেন? অবশ্য কবির অবচেতনে বিবেকানন্দের মৃত্যু-স্মৃতি হয়তো ছিল, বিশেষ করে ওই সময়ে Excelsior Union-এর এক শোকসভায় কবিকে নিবেদিতা সমভিব্যাহারে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

(৪) এ কথা ঠিক যে মরণ-মিলন কবিতাটি মরণ শিরোনামায় ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এ কথাও সত্য যে তার মাত্র মাস দুই পূর্বে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটে। কবিতাটি কবে লেখা হয়েছিল তা আমরা ঠিক জানি না। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু লেখা প্রথম লিখিত হয়ে পড়ে থাকত, পরে একসময় সেগুলি পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। মহর্ষির আদ্যকৃত্য হয় ১৩১১ সালে, সেই উপাসনা সভার প্রার্থনান্তিক ভাষণটি মুদ্রিত হয় ১৩১৩ সালে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড)।

(৫) জগদীশবাবু লিখছেন, ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। 'বিশ্ববাসী যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনেছে বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, বিশ্বকবিও তেমনি বিবেকানন্দকে চিনেছেন নিবেদিতার দৃষ্টিতে।' আমাদের সঙ্গত প্রশ্ন হচ্ছে: কবে—বিবেকানন্দের প্রয়াণের পূর্বে, না পরে? প্রাক্-বিবেকানন্দ মহাপ্রয়াণ যুগে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে উদাসীন না কোন সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন কবি, নিবেদিতার সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও। কেন, তার কারণ অনুসন্ধান আজকের দিনের ইতিকথায় নিষ্ফল। দুই মহাপুরুষই আমাদের বিশেষভাবে নমস্য এবং তাঁদের মাঝখানে সেতুরূপে যিনি এককালে বর্তমান ছিলেন সেই মহীয়সী মহিলাও আমাদের প্রণম্যা। ভারতসাধনা ও ভারতচেতনার উদ্বোধক হিসাবে এই ত্রয়ীই ত্রিকালে কাজ করেছেন। কিন্তু ১৯০২ সনে জুলাই মাসে রবীন্দ্র ভাবনার একটি মূল সূত্র হচ্ছে—

> যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
> মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
> ভাবোন্মাদ মত্ততায় সেই জ্ঞানহারা
> উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল প্রেম ভক্তিমদ ধারা
> নাহি চাহি নাথ।

তারও পূর্বে সাহাজাদপুর থেকে ছিন্নপত্রে (৩০শে আষাঢ় ১৩০৪) তিনি লিখছেন, "সংশয় বজ্ররূপে ভেঙে গেছে, প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধূনার স্থান অধিকার করে। তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।" ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে বসে বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি লীলাবাদী কবির সাধনা নয়—

> একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
> বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে
> ফলে পাষাণ রাশি সহসা গেল টুটি
> গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি
> তখন দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি
> ভিতর আর বাহিরে কোলাকুলি

(৬) রবীন্দ্রনাথের বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যা কিছু প্রশস্তি আছে সবই বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের বহু পরে লিখিত বা কথিত এবং পোস্ট-বিবেকানন্দ যুগেই নিবেদিতার মাধ্যমে রবীন্দ্র-চেতনায় বিবেকানন্দের ছাপ পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথাতে আমরা জানি যে নিবেদিতার কল্পনাকে নিয়েই ভেঙেচুরে গোরার উদ্ভব। গোরার অনেক কথাই বিবেকানন্দের বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেবে। কথিত আছে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন একটি পত্রে—"You asked me what connection had the writing of Gora with Sister Nivedita. She was our guest at Silaidaha and in trying to improvise a story according...

I gave her something which came very near to the plot of Gora. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in Gora as it stands now—but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind." (পিয়ার্সনকে লিখিত পত্র ১৯২২)

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা উচিত যে এই সময়ে কবির মনে মঠাশ্রয়ী (monastic) দীক্ষাশিক্ষা রীতিনীতির প্রতি কিছুটা বিরুদ্ধভাবই ছিল। অবশ্য পরের যুগে নিবেদিতার মাধ্যমে হয়তো বিবেকানন্দ-চেতনা অন্যদিক দিয়ে তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তার প্রমাণ 'গোরা'। কিন্তু 'গোরা'র প্রকাশ ১৩১৪-১৬ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায়, বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পাঁচ বছর পরে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক বলেছিলেন (শনিবারের চিঠি বৈশাখ ১৩৬৭) যে মধ্যযুগ আর রেনাসাঁসের মাঝখানে সেতুবন্ধ গড়েছিলেন দান্তে, রেনাসাঁস ও আমাদের কালের মাঝখানে সেতু গড়েছেন গ্যয়টে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় প্রতিভাবান কবি হয়েও 'ডিভাইন কমেডি' বা 'ফাউস্টে'র মত কবিতা রচনা করেন নি। সব সৎকাব্যের মত তাঁর কাব্যেও নিত্যকালের আবেদন আছে, কিন্তু আমাদের কালের বিশেষ রূপটি তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পড়ল না। কিন্তু রবীন্দ্র-চরিতকার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপালনী লিখছেন—"Gora is more than a novel, it is the epic of India in transition at the most intellectual period of its history." ভারতচেতনার অভিব্যক্তির একটি সংকটময় মুহূর্তের মহাকাব্য হচ্ছে 'গোরা'। অবশ্য "গোরা" চরিত্রের মধ্যে যে resurgent nationalism বা aggressive Hinduism-এর চেহারা দেখি তার সঙ্গে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মতের কতটা মিল—সেটা বিবেচ্য। 'গোরা'র "গৌরমোহন" উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে রবীন্দ্রমতের ধ্বজাই সব সময়েই বহন করছেন না। তবে 'গোরা'র মধ্যে কবি একটা বিরাট তেজীয়ান মানুষ —এই ... ... যার প্রথর ব্যক্তিত্ব অগ্নিতেজের প্রবল প্রাণশক্তি, তীক্ষ্ণ প্রতিভা নিবেদিতা-বিবেকানন্দকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। গোরাকে তিনি শেষ পর্যন্ত আইরিশম্যান কেন করলেন, উপন্যাসের ক্রমবিকাশের পথে তার সার্থকতা কোথায় সে প্রশ্নও অসঙ্গত নয়। হয়তো কবি দেখাতে চেয়েছিলেন যে বাইরে থেকে এসেও জন্মস্বত্ব না পেয়েও ভারতবর্ষকে ভালবাসা যায় কারণ ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া, একটা আদর্শ—সেখানে ঐতিহাসিক অপব্যাখ্যা নেই, ভৌগোলিক অপদেবতা নেই, রক্তগত কৌলীন্য নেই, জাতিগত অভিমান বা ধর্মগত প্রাধান্যের প্রয়াস নেই। রবীন্দ্রনাথ বড় শিল্পী, তাঁর শিল্পচেতনা গোরার মধ্যে didactic ও dialectic হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু সমগ্রভাবে রসসৃষ্টি ও আদর্শসৃষ্টিও করেছে। অবচেতনে বিবেকানন্দ বা নিবেদিতার চরিত্র তাঁকে প্রভাবান্বিত করলেও গোরা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি, বড় জোর বলা যেতে পারে ওই চরিত্রটি একটি syncretic creation। শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত বলেন যে, লোকোত্তর পুরুষদের চেতনা বহুতর পুরুষের চেতনা-সমষ্টি। বিভিন্ন এমন কি বিরোধী ধারা মিলে কি অপরূপ অভিনব ঐকতান সৃষ্টি করতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। 'গোরা'র শেষে কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ফুটে বেরিয়েছেন যখন তিনি অপূর্ব ভাষায় বলছেন—আপনি আমাকে সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ নয়, যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, ভারতবর্ষের দেবতা। এই ভারতচেতনা বা ভারতধর্মের কথা যেমন বিবেকানন্দের, তেমনি রবীন্দ্রনাথের, তবু এর মধ্যে একটা মৌলিক কিন্তু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আদর্শগত বিরোধ না থাকলেও তাঁদের Thought Pattern-এর গঠন অন্য ধরনের। সর্বাঙ্গব বেদান্তের ভাষ্য কবির কাছে একরকম, কর্মীর কাছে আর একরকম, তা ছাড়া একজনের কাছে যেটা awareness সেটা আর একজনের কাছে acceptance। এককালে রবীন্দ্রনাথকেও তপোবনের আদর্শ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ গড়ে তোলার অভীপ্সা, স্বদেশী সমাজের চেতনা উদ্বুদ্ধ করেছিল, কিন্তু এই আদর্শ মূলতঃ ঔপনিষদ ঋষিকুলের আদর্শ। ব্রাহ্মণ কে—না

লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যে পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ, যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত এবং ইতিহাস, তারিখ, সন-সালের সালতামামি করলে দেখা যাবে তাঁর মধ্যে এই চিন্তার ধারা প্রাক্ বিবেকানন্দ-নিবেদিতা যুগ থেকেই শুরু। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়—রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙ্‌ক্তি—

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে দীন-পতিতের ভগবান

এখানে "নারায়ণ" ও "দীন-পতিতের" ভগবান কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাবে আছে "নমি নরদেবতারে" (রোমা রোঁলার ভাষায় Man-Gods ?) শুধু দরিদ্রনারায়ণ নয়। অবশ্য ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে "নারায়ণ" যিনি পতিতপাবন, এই সংজ্ঞাটি রূপে রূপে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বৈঠকে যে প্রশ্নটি ওঠে (Evening talks, First Series—Purani পৃ. ২৮৬) তার কথা মনে পড়ছে। প্রশ্নটি ছিল রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানব বা Universal Man এবং বিবেকানন্দ দরিদ্রনারায়ণ এই সংজ্ঞাই পছন্দ করতেন—"It is not the same as Janasadharan. (জনসাধারণ) In the Viswamanaba all the best people as well as the lowest of humanity are included. Perhaps in the Janasadharana only the lowest remain." তাঁর এক শিষ্য অনুযোগ করেন যে বিবেকানন্দের চিন্তায় অন্ততঃ নারায়ণকে পাওয়া যেত (He at least had the idea of Narayana while serving them) কিন্তু এখন এই প্রোলেটেরিয়াট যুগে শুধু দরিদ্ররাই আছেন, নারায়ণ নেই—দরিদ্রনারায়ণ কথাটির মধ্যে বৌদ্ধপরিভাষার করুণা ও মৈত্রী ভাব এসেছে আর আছে সদ্যজাগ্রৎ ইউরোপীয় মানবতাবাদের প্রোলেটেরিয়াট প্রলেপ। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতাকে সম্যক্ বিচার করতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর যুগচেতনা, পশ্চিমীপ্রভাব, মৌলিক ভারতীয় আদর্শ ও চিন্তার সঙ্গে সংঘাতের প্রতিফলিত রূপ, আধ্যাত্মিক সাধনার মূল্যায়ন, [illegible] অধিকার এবং এই সূত্রে রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ কে[illegible] বঙ্কিম বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পূর্বসূরীদের এবং ব্রাহ্মস[illegible] খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচার প্রভৃতির সার্থকতার প্রশ্নও [illegible] পৌত্তলিকতা, সাকারনিরাকার পূজা তখনকার [illegible] একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন। এমন কি শ্রীঅরবিন্দও [illegible] তুলেছিলেন যে "যত মত তত পথ" এই চিন্তার ধা[illegible] মধ্যে একটা শ্লথচেতনার আভাস পাওয়া যায় [illegible] কারণ যদিও সমস্ত পথই একের পথ—কিন্তু আমা[illegible] উদ্দেশ্য তো perfection, সেই সিদ্ধিতে সব পথই স[illegible] নয়—কোনটা বন্ধুর, কোনটা মসৃণ। রবীন্দ্রনাথ লীলাবা[illegible] কবির দৃষ্টিতে সবকেই জীবনের সঙ্গে জড়িত ক[illegible] দেখলেন—দেখলুম মানব-নাট্যমঞ্চের মাঝখানে [illegible] লীলা তারও অংশ আমি···জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনে[illegible] পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি এই বিচিত্র গভীর ঐক্যবোধই রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনার মূল ভাষ্য। এই ঐক্য ইন্দ্রিয়বোধের অতীত এই ঐক্য সাংখ্যিক সমষ্টির অতীত, এই ঐক্য সমষ্টির ঐক্য নয়, তাকে নিয়ে ও তাকে অতিক্রম করে বহুধা শক্তিযোগে তার প্রকাশ—ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য। এই সীমায় অসীমে মিলিয়ে সম্ভূতি অসম্ভূতিতে প্রকাশ পেয়ে মানুষ দেশেকালে অভিব্যক্ত। সেই তার মহিমা। এরই বীজ রবীন্দ্রকাব্যে ও চেতনায় জীবনের শুরু থেকে তাঁর বিশ্বভুবনেশ্বর মানবদেবতায় [illegible] রূপ নিয়েছে, মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে :

যশ্চায়মস্মিন আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষঃ সর্বানুভূ !

—মানুষ মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকাল ধ্বনিত করে বলতে পারুক—সোঽহম্।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতত্ত্বেও এই evolution বা ক্রম-বিবর্তনের পালা—বারে বারে বস্তু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বদলায় নি। কিশোর কণ্ঠে তাঁর মুখে শুনেছি—

মরণ রে
তুঁহু মম শ্যাম সমান

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কবি বলছেন—

তাপ বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান

আবার পরিণত বয়সে তিনি তার কল্যাণতম রূপ দেখছেন।

শ্রদ্ধেয় নলিনী গুপ্ত মহাশয় দেখিয়েছেন যে মৃত্যুর নানা রূপ—কখনও সে দণ্ডপানি, কখনও সে যমরাজ, কখনও সে নটরাজ, কখনও কালীকরালী, তবু মৃত্যুকে জয় করবে মানুষ এর কল্পনা চিরকালের। শুধু পুরাণকাররা নয়, সাবিত্রী নয়, নচিকেতা নয়, আজকের কবিরাও। রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যুর যে মূর্তি সেটা মূলতঃ দক্ষিণামূর্তি, তিনি বামাচারী নন।

হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্তে।

মৃত্যুর কান্তরূপ বা শিবময় মঙ্গলময় রূপ রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়—

যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুল দল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া।

মৃত্যু প্রসঙ্গে এই গোধূলি বর্ণনাতে মৃত্যুর কান্ত বা শান্ত রূপই প্রকাশিত হয়, এর মধ্যে কোন বিশেষ মৃত্যুর গোধূলি মিলন at the hour of cowdust আরোপ করা চলে কি না জানি না।

তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি চরণ।

সেক্সপীয়রের

After life's fitful fever he sleeps well

বা

As Sweet as balm as soft as air, as gentle.

এই সব কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু তো শেষ নয়, শূন্যতা নয়, রিক্ততা নয়, বিশ্বের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবার পথ; তাই রবীন্দ্র-চেতনায় মৃত্যুর বিরহ গভীরতম বেদনা নিয়ে আসে না এবং মরণ-মিলন কবিতাতেও আসে নি। এখানে মৃত্যুর রুদ্ররূপ নয়, বরং নটরাজ শিবরূপ; এখানে তিনি বিবাহে চলেছেন, শ্মশানবাসীর কলকলের মাঝে গৌরীর আঁখি সুখে ছলছল হচ্ছে এবং তাঁর পুলকিত তনু রজর। যদি কোন বিশেষ শোককে ঘিরেই এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে উদিত হয়ে থাকে তবে সেখানে কি দয়িতার পুলকিত তনু হবার উপমা আসে? জগদীশবাবুর সঙ্গে আমরা একমত যে মরণ-মিলন কবিতায় রূপ ও রীতি, সুর ও স্বাদ আলাদা। কিন্তু কোন বন্ধুচিত্তের দুঃখের প্রতি কবির সমবেদনা এখানে নাট্যরূপ লাভ করেছে এই অনুমান সংশয়াতীত নয়। রবীন্দ্র-চেতনায় শিব 'ভদ্র' ও 'রুদ্র' বহুরূপ নিয়েছে, তার শেষ রূপ কবির দীক্ষা'য়। ১২৯০ সালে 'ভারতী'তে (আষাঢ় ১৩৬৭, শনিবারের চিঠিতে উদ্ধৃত) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর মৃত্যুকে কি আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে বিকট করালদশনা লোল-রসনা মূর্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ওই মৃত্যুই ইঁহার প্রিয়তমা, ওই মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া উনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন।

রবীন্দ্র-চেতনায় এই উমা-গৌরী প্রতীক মূলতঃ কালিদাসীয় ঐতিহ্য অনুসারী ধারাই নিয়েছে, আবার ধ্যানগম্ভীর নিবাত নিষ্কম্প অবন্ধন শিবও তাঁকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু সে শিব হচ্ছেন শিবং মঙ্গলং, শংকর ময়স্কর ময়োভব—সে শিব উমাবিহীন। আবার আর এক শিব তাঁকে বিচলিত করেছে, সে শিবও উমাবিহীন, তিনি নটরাজ, মেঘের বুকে যখন মেঘের মন্দ্র জাগে তখন তিনি জেগে ওঠেন, সন্ন্যাসীর গান ধনায়—গুরু গুরু নাচের ডমরু। আর যখন উমা আসেন তখন ভৈরবের ধ্যান মাঝে তিনি আসীন বা ধূর্জটির মুখের পানে চেয়ে হাসছেন। মৃত্যুকল্পনার যে শিব তিনি নটরাজ—সেখানে শিবানী নেই, অভেদাঙ্গ হর-পার্বতী নেই কারণ সেখানে মরণাতীত একের আসন—মৃত্যু ধাবতি পঞ্চমঃ।

সুপণ্ডিত লেখক নিবেদিতার "An Indian Study of Love and Death" পুস্তক থেকে Meditation of the Soul সম্পর্কে অপূর্ব উক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু ঐগুলি লেখা রবীন্দ্র-কবিতার পরে—অতএব রবীন্দ্রনাথ যে নিবেদিতার ওই লেখাগুলি দ্বারা প্রভাবিত হন নি এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা, কারণ তিনি লিখেছেন আগে—এই সারস্বত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। রবীন্দ্র-কাব্যে ঈশানের কোণে ঘনঘোর মেঘোদয় বা বিদ্যুৎফণি জালাময়ের কল্পনা পূর্বে নেই এ কথা কেউ বলবেন না বা মহাবরষার রাঙাজলে নীরবতরণ শুধু বিবেকানন্দের 'অব শির পার কর মেরে নাইয়া' এই কথাগুলিই কবিচিত্তে ছিল, এ কল্পনা কষ্টকল্পিত কারণ এসব প্রতীক কবি এর পূর্বেই বহুবার ব্যবহার করেছেন।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় আলোচনা একটা বিরাট যুগসন্ধির আলোড়নের ইতিহাস এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের এদিকে চোখ ফিরিয়ে দিয়ে ভারতীয় চেতনার ইতিহাসের একটি অবহেলিত দৃষ্টিকোণের সন্ধান দিয়েছেন, তাঁকে সেজন্য সাধুবাদ জানাই। আর তাঁর সুপাঠ্য প্রবন্ধে অনেক কিছু চিন্তার খোরাক পাওয়া গেছে সেজন্যও ধন্যবাদ দিই। অনুমানসাপেক্ষ গবেষণা-কার্যে ব্যক্তিগত মতামতই বড় নয়, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সত্যানুসন্ধানই কাম্য। জিজ্ঞাসু হিসাবেই এই প্রশ্নগুলি তুললাম, কারণ বহু সাধকের বহু সাধনার দ্বারা যেখানে মিলিত হয়েই অসীমের লীলাপথে নূতন-তীর্থকে রূপ দেয়।

রোজ পরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT
SOAP
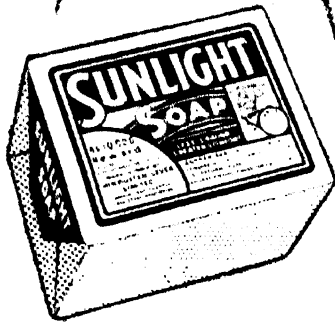
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

মৈত্রেয়ী দেবী

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নূতন করে একটি কথার আলোচনা হচ্ছে যে, সমসাময়িক হয়েও ন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এই দুই বিরাট পুরুষ পরস্পরের ন্ধে নীরব ছিলেন কেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি নাভাব কি ছিল, বলা বাহুল্য এতদিন পরে সে রবতার মর্মভেদ করতে গেলে অনেকটাই কল্পনা ও নুমানের আশ্রয় নিতে হয়, অনেকেই তাই নিয়েছেন। ই নীরবতা যে একটু বিস্ময়কর তাতে সন্দেহ নেই, কারণ হু বিষয়েই তাঁদের কর্ম ও মতের ঐক্য ও সাদৃশ্য আমরা ক্ষ্য করতে পারি।

সমাজচেতনা ও গভীর মানবমূল্য বোধ, দুজনেরই র্মের প্রেরণার মূলে এই দুটি ভাব প্রবল। বিবেকানন্দ ার্মিক, বৈদান্তিক, আবার তিনি একজন প্রবল হিন্দু কিন্তু স ধর্ম, সে হিন্দুত্ব লোকাচার নয়, সংস্কারের বন্ধন নয়। ানব-ভাবনার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব দেশপ্রেমের রসায়নে তিনি যেন সে সমস্তকেই 'হিন্দু' করে নিয়েছেন। তাই তখনকার দিনের আচারবদ্ধ সমাজ তাঁকে বদ্ধ করতে পারে নি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে, পতিতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন "ভাতের হাঁড়ি"র ধর্ম চুরমার করে দিয়ে। ডাক দিয়েছেন ভারতবর্ষের তাঁতি জোলা মুচি চাষী সকলকে।

রবীন্দ্রনাথও ধনী, কবি এবং এক নূতন ধর্ম-অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁর জন্ম, তবু তাঁর ঐশ্বর্য কবিত্ব সুকুমার শিল্পবোধ ও যুক্তিবাদী ধর্ম, কিছুই তাঁকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূঢ় জনসাধারণের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে নি। তিনিও নেমে এসেছেন তাদেরই মধ্যে যাদের কর্মক্ষেত্রে 'ধর্ম পড়ে রয়ে', যোগ দিয়েছেন তাদেরই কাজে যারা 'দীনের অধম দীন'।

জনগণের আপন সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নেহের সঙ্গে জাগিয়ে তোলা, তাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল চেষ্টায় নানা কর্মের সূচনা করা, এ সবই দুই মহাপুরুষের কর্মজীবনের লক্ষ্য। দেশে এবং বিদেশে তাঁদের চিন্তা এবং কর্মের ঐক্যই সহজে লক্ষ্য হবে। দুজনেই সভ্যতাগর্বিত ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভারত-বর্ষের যা শ্রেষ্ঠ চিন্তা, তার সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ ফল তাই হাতে নিয়ে রাজার মত বেশে, দাতার মত বেশে গিয়েছিলেন। সে যুগ ছিল এশিয়ার মানুষের ইয়োরোপের কাছে শিক্ষানবিসীর যুগ, তারা কৃপাপ্রার্থী রূপেই গর্বিত শক্তিমত্ত ইয়োরোপের কাছে নিজেদের দৈন্য প্রকাশ করত, তখন ভারতবর্ষের এই দুই মহাপুরুষ বিস্মিত ইয়োরোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেন বলেছিলেন, 'অয়ম্ অহং ভো'; আমি এসেছি—ভারতের এই স্বরূপ দেখ।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন যে আমাদের যা শ্রেষ্ঠ তা দিতে পারলে তবেই আমরা অন্যের যা শ্রেষ্ঠ তা দাবি করতে পারি, তখন এ কথা পূর্ণরূপে বোঝা সহজ ছিল না।

একজন জাপানী লেখকের কাছে শুনেছিলাম যে সে সময়ে জাপান ও সমগ্র এশিয়াতে ইয়োরোপের প্রভাব এমন ব্যাপক হয়েছিল যে 'পরের অশন পরের ভূষণ' তো বটেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুকরণের প্রবল স্পৃহায় তাড়িত মানুষ নিজেদের বহুদিনের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেছিল। সেই সময়ে ইয়োরোপে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের আচার আচরণ বেশ-ভূষার দিকে তাকিয়ে তাঁরা বুঝেছিলেন যে সভ্য হবার জন্য ইয়োরোপীয় হবার কোন প্রয়োজন নেই। এ কথা বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও একই রকম সত্য। তাই বলে অবশ্য যে কেউ কুর্তা বকু জহর কোট বা প্রিন্স কোট পরে বিলেতে যাবে তার সম্বন্ধেই আর এ কথা প্রযোজ্য নয়, তাঁরা ভারতীয় সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর তাই নিজেদের জীবনে ও কর্মে প্রতিফলিত করেছিলেন বলেই বাহ্য পোশাকও তার সঙ্গতি রক্ষা করেছিল। দেশী কুর্তা পরে বলনৃত্য করলে যে নির্লজ্জ পরানুকরণপ্রিয়তা প্রকাশ পায় সেখানে পোশাকের দ্বারা তার শোধন হতে পারে না। এ কথা আবার আজকের উন্মত্ত অনুকরণের দিনে মনে করার প্রয়োজন হয়েছে।

আরও একটা দিকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও চিন্তার ঐক্য আছে, দুজনেই তখনকার সাধু সংস্কৃতঘেঁষা বাংলার যুগে চলতি ভাষার ব্যবহার শুরু করেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ অগ্রণী। দুজনের ব্যবহৃত কথ্যভাষার মধ্যে অবশ্য অনেক পার্থক্য রয়েছে কিন্তু সর্বসাধারণের ব্যবহৃত ভাষাকেই সর্বরকম চিন্তার বাহন করবার মূলে যে মানবহিতৈষণা সে একই। জনসাধারণের সঙ্গে চিন্তার ভূমিতে মিলিত হবার ইচ্ছা, মানুষের গভীরতম ভাবনার উপর সকলের যে অধিকার ভাষার বাধা দ্বারা ব্যাহত করা হয়, সেই বাঁধ ভেঙে দিয়ে মনের মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

এমনি ছোট বড় বহু বিষয়ে উভয়ের মিল আছে। কিন্তু পার্থক্যও আছে অনেক। সেই পার্থক্য চরিত্রের গভীরে নিহিত। যার ফলে জীবনভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে গেছে বললে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ কেন কখনও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করেন নি, বা কবি রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই লেখেন নি এ কথা অনুমান করা কঠিন নয়। দুজনেই দু-জনের মহত্ত্ব নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন কিন্তু চরিত্রগত ও ভাবগত পার্থক্যের জন্য পরস্পরের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেন নি। এ কথা অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত নয় যে বিবেকানন্দ যদি অত অল্প বয়সে না মারা যেতেন, তাঁর জীবন যদি আরও বহুতর কর্মের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হতে থাকত তাহলে ক্রমে তাঁরা নিশ্চয়ই নিকটে আসতেন যেমন এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। উভয়ের মতানৈক্য তো উভয়েই প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সে মতেরই অনৈক্য মাত্র-তার বেশি নয়।

আজ অনেকে রবীন্দ্রনাথের লিখিত ও উক্ত দু-চারটি কথা উল্লেখ করে বলতে চান যে তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু ওই অকিঞ্চিৎকর উল্লেখগুলির চয়ে নীরবতাই তার অধিকতর প্রমাণ। এ কখনও সম্ভব নয় যে এই প্রাণহীন অর্ধমৃত দেশে দুই জ্যোতিষ্ক পরস্পরকে লক্ষ্যই করেন নি, কিংবা যদি বিরূপতাই পোষণ করতেন তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকত। পরস্পরকে ...ং ও শ্রদ্ধেয় জেনেও একমত না হবার মত যে চরিত্রের ...ষ্ঠ্য তাই এই নীরবতার কারণ। এবং সেই অনৈক্য এত সূক্ষ্ম ও সুকুমার যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে তার উপরে ভর সয় না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ যে তাই মনে করতেন তা তাঁর নিবেদিতার উপর লেখা প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায়।

নিবেদিতাকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন এবং এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে নিবেদিতাকে যিনি জানেন তিনি তাঁর জীবনে তাঁর গুরুর প্রভাব ও অবিচল অস্তিত্বকেও জানেন। ... বিস্ময়ের কথা এই যে, এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে কোথাও রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ ... নি। নিবেদিতার আত্মনিবেদন যে নৈর্ব্যক্তিক এবং হিন্দুজাতির ভাবধারার কাছে নয়, তা যে একটি বিশেষ ব্যক্তির জীবনস্পর্শে উত্থিত হৃদয়োত্তাপ সুগন্ধ-বাষ্পের মত তাঁর চারিদিকের পরিমণ্ডল ব্যাপ্ত করেছিল, এমন হতে পারে না যে কবি তা জানতেন না বা অনুভব করেন নি। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের শত নিরর্থকতার জালে ঘেরা, মানব সম্বন্ধের অনেক সূক্ষ্ম সুকুমার অথচ গভীর সত্যের খবরই রাখে না, তাদের কাছে তাই সাদা ভাষায় ছাপার অক্ষরে বলতে গেলে অনেক গূঢ় সুন্দর সত্যও স্থূল বোধ হয় তাৎপর্য ভ্রষ্ট হয়। যে কথা শুধু কবিতায় বলা চলে সে কথা হয়তো গদ্যে প্রবন্ধে বলা চলে না। তা ছাড়া এ যুগের মানুষ যত সহজে মানবসম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং করা উচিত মনে করে সে সময়ে তা সম্ভব ছিল না। তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক মানুষ পরস্পরের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অতিক্রম করতে পারতেন না।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে 'সতী' বলেছেন সতী শব্দের ধাতুগত অর্থ যাই হোক এর ব্যবহারিক অর্থে নৈর্ব্যক্তিক কোন সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বোঝায় না—যেমন দেশপ্রেম জনকল্যাণ ইত্যাদি কর্মের নিষ্ঠাকে সতীত্ব বলে না। সতী শব্দে নারীর কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রেম ভক্তি নিষ্ঠা ও সমগ্রজীবনের আত্মনিবেদন প্রকাশিত হয়। সতী শব্দের ব্যবহারে তাই রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের অবিচল প্রভুত্বের কথাই বলেছেন।

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে "পথবর্তী" আর "মুক্তরূপ" বলে দুটি কবিতা আছে। ওই কবিতা দুটিতে স্ত্রী ও পুরুষের

চ কর্মজীবনের যে কথাটি আছে সে 'চিত্রাঙ্গদা'
য়র বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন। চিত্রাঙ্গদা পুরুষের
তিনী সহকর্মিণী—উভয়ের কর্মক্ষেত্রও এক। কিন্তু
রূপ" কবিতায় নারী তার জীবনের অর্ঘ্য এনেছে
কেই শক্তি দিতে, তাকে তার নিজ কর্মে প্রতিষ্ঠিত
ত—সে নারী পথবর্তিনী তরুর মত শুধু ছায়া দিয়ে
। হরণ করে না, কঠোরকে মধুর করাই তার
াত্র করণীয় নয়। সে পুরুষের অজেয় আত্মার
ত স্নাত, অকৃপণ মনে কর্মক্ষেত্রে মুক্তি দিচ্ছে, প্রেরণা
হ সেই মানবকে যার শৌর্যে 'স্বর্গের মহিমা' যে মর্তে
বরজয়ী প্রভু'। পূর্ণ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে শক্তি
রণ করবার ক্ষমতার মধ্যে নারীর সার্থক প্রকাশ।
রা শুনেছিলাম যে এই কবিতাটি লেখবার সময়ে
।দিতার জীবনদীপ্তি কবির মনে পড়েছিল। যে দীপ্তি
লে পুরুষের জীবনের আলো পূর্ণ প্রকাশিত হত না,
। একজনের ভক্তি ভালবাসা ও বিশ্বাসের বহ্নিমুখে
প্ত না হলে সে শক্তি হত না পূর্ণ অভিব্যক্ত।

নারীর এই শক্তিরূপ পুরুষের মুক্তরূপেই সার্থক।
কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন,
বেকানন্দ কি বিবেকানন্দ হতেন, যদি না নিবেদিতার
মনিবেদন লাভ করতেন?" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)
ন আমরা নানা কথায় বুঝেছিলাম নিবেদিতার
েনের কী গভীর সার্থকতার রূপ কবির মনে আছে।
্যাসীর জীবনের সঙ্গে যোগ হল নারীর যে আসক্তি-
নহীন অবারিত আত্মোৎসর্গ তখনকার যুগে এ দেশে
র আর কোন দৃষ্টান্ত কি ছিল? কোন যুগেই এমন
না বেশী নেই, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'মোর রক্ততরঙ্গের
।কলরবে বাণী তব মিশে ভেসে যায়।'

বিবেকানন্দ চলে গেলেন কিন্তু নিবেদিতার জীবনে
কাশিত রইলেন তাঁর গুরু। এ কথা বলা কঠিন যে
বেকানন্দ যদি জীবিত থাকতেন তবে স্বাধীনতা
গ্রামের যে পথ নিবেদিতা বেছে নিয়েছিলেন সেই
থেই তিনি অগ্রসর হতেন কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনের পূজা-
ঠ ও দরিদ্রনারায়ণের সেবাকর্মই তাঁর একটি মাত্র পথ
কত কিংবা এ উভয়কেই অতিক্রম করে আরও কোন
ত্যতর পথে, উচ্চতর আদর্শে তিনি দেশকে আহ্বান
করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পুরুষের বিপুল
কর্মোদ্যমের পাশে, রণযাত্রার পথে শ্রদ্ধার পাথেয় নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে নারী—বলছে:

> "আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো,
> মোর দুঃখ যজ্ঞের শিখায়
> জ্বলিবে মশাল তব—"

সেই দুঃখযজ্ঞের আত্মাহুতি কবি দেখেছিলেন, কবির
মন সে সতীর তপস্যা ভুলতে পারে নি। বহুকাল পরে
লেখা 'মহুয়া'য় এই কবিতা সেই স্মৃতির একটি পরিপূর্ণ
ছবি।

রবীন্দ্রনাথ 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ' কথাটা নিয়ে
অনেক কৌতুক করতেন, 'দরিদ্রনারায়ণ' কথাটাও তাঁর
মনঃপূত ছিল না। নারীকে কামিনী বলা তার একটি
বিশেষণ মাত্র, সে বিশেষণ মিথ্যা নয়, কিন্তু খণ্ডিত;
নারীর পূর্ণরূপ কি তা নিবেদিতার জীবননাট্যের
দর্শকরূপে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। ওই প্রবন্ধে তিনি
লিখেছিলেন এবং মুখেও বলতেন নিবেদিতার চরিত্রে
অপরকে অভিভূত করবার ও মতে চালিত করবার
একটি প্রবলতা ছিল তা তাঁর ভাল লাগত না। কবি
চিরদিন প্রত্যেক মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে
দেখতে চাইতেন, স্বাধীন মানুষ যদি তাঁর ভাব গ্রহণ করে
তবে ভাল, নইলে জবরদস্তির পথ তাঁর নয়। নিবেদিতার
জীবন তাঁর গুরুর মতে সম্পূর্ণ অভিভূত—সেই মতের
প্রভাব তাঁর জীবনসীমা পার করে সকলের মধ্যে বিস্তৃত
করে দেওয়াই শিষ্যারূপে তাঁর কর্তব্য—'আমার গুরুকে
আমি যেমন দেখেছি' তেমনি দেখুক সকলেই। আমাদেরও
বিশ্বাস কোন নারীই সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না। যে
মুক্তপ্রেমে যে অচলভক্তিতে যে সতীর নিষ্ঠায় তার
নারীত্বের পূর্ণরূপ, সেগুলি তার পক্ষে একসঙ্গে মুক্তি এবং
বন্ধন। নিজের আত্মায় উদ্বোধিত সেই পরম শক্তিকে
নিজের জীবন থেকে অন্যের জীবনে সঞ্চারিত প্রবাহিত
করে দিতে পারলে তবেই সে উদ্বোধন সার্থক হয় কিন্তু
তাতে একটু জোর লাগে হয়তো। নিবেদিতার
হৃদয়োত্থিত যজ্ঞের আগুন থেকে জ্বলে উঠেছিল যে
স্বাধীনতা যুদ্ধের মশাল, বিবেকানন্দের প্রবল দেশপ্রেমই
তার ইন্ধন ছিল।

এ কথা আমরা বেদনার সঙ্গে মনে না করে পারি না যে কবির আশ্চর্য সঙ্গীতে জেগেছে যত বেদনা, যত সৌন্দর্য, যত ভক্তি ও প্রেম তা কোথাও এমন দৃঢ়মূল হতে পারল না। সত্যকে জীবন থেকে জীবনান্তরে নিয়ে যাবার যে ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের নিজস্ব একটি রূপ তা রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী কারোর জীবনেই সফল হল না। বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা পান নি এবং পান নি বলেই তাঁর আরব্ধ কর্মগুলির মধ্যে কারও চিহ্ন ভাবীকরণঃ হয়ে নেই। তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কোন জীবন থেকে উত্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ, সেই অজেয় আত্মার রশ্মি, পরবর্তী কালের মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারল না।

এ রবীন্দ্রনাথের এবং দেশের একটি বড় ক্ষতি। কিন্তু যে যুগ এসেছে এখানে সূক্ষ্ম সুকুমার জীবন-সঙ্গীত 'তাণ্ডব' নৃত্যে পরিণত হয়ে যায়। প্রেম ভক্তি ও আত্মদানের পরম দীপ্তিকে ঊর্ধ্বমুখে জ্বালিয়ে তোলা অসম্ভব, তাকে যজ্ঞের শিখা না করে উনুনের আগুন করতে হয়—'ভাত অন্ন আর কিছু নয়'—তাই কবির বিজয়মালা থেকে একটি পুষ্প দাবি করতে পারে এমন কোনও কৃতাঞ্জলি এগিয়ে এল না।

*

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী

।বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতার এক বি. এ. পাস-করা দুর্দান্ত তরুণ অন্তরে তীব্র বহ্নি-জ্বালা । কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মত বিভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করে াচ্ছে। কেতাবী শিক্ষায় তার মন বিষিয়ে উঠেছে, বিষয়ে সন্দেহ আর সংশয়, নিরীশ্বরবাদ হয়ে উঠেছে েরর জীবন-দর্শন। একবার ছুটে চলেছে নব্য ব্রাহ্ম-াজের দিকে, যদি কিছু আলো পাওয়া যায় সেখানে ই আশায়, কিন্তু সেখান থেকে গভীর হতাশ্বাসে ফিরে সে সে, তবুও নিরাশ হয় না যুবক, আবার ছুটে চলে ায়ান যাজকদের কাছে কিন্তু সেখানেও অন্ধকার, এক া আলো খুঁজে পায় না সেখানে। তার ওপর গৃহে র্ণনীয় অশান্তি; পিতার মৃত্যু, ঋণ, মকদ্দমা, অন্না-বে—যুবক যেন দিন দিন অন্ধকারের গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে, ার বুঝি কোন আশা নেই; কিন্তু আশ্চর্য, তবুও সে মনে ন বলছে, আলো চাই, আলো চাই, মনকে তার নিজ কেতনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে, নইলে শিক্ষা-দীক্ষা র্থ, জীবন ব্যর্থ। কিন্তু কে তাকে আলো দেখাবে?

হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বরের সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণটির ঙ্গে দেখা হয়ে গেল নরেন দত্তর। নরেনকে দেখে তো াহ্মণ চমকে উঠলেন। এ কে রে! এ যে ভস্মাচ্ছাদিত হ্নি! পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হল। নরেনকে ব্রাহ্মণ লেন, 'আলো দেখবি, আলো?' ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে নরেন ব্রাহ্মণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আলো দেখেছ?' 'দেখেছি।' 'দেখেছ, সত্যি বলছ?' 'হ্যাঁ রে, সত্যি বলছি, দেখেছি; তুই দেখবি তো আয়।' নরেন দত্তর সংশয়-সঙ্কুল মনটা বারকয়েক দুলে উঠল। বলে কি এই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ।

তার পর সিমলার নরেন দত্তর একদিন প্রমোশন হয়ে গেল। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট থেকে অফিসারে প্রমোশন নয়, ডেপুটি সেক্রেটারি থেকে সেক্রেটারি নয়, স্রকচন্দন-বনিতাদি ভোগের প্রমোশন-সে নয়, সে প্রমোশন ভাবের প্রমোশন, আলোর প্রমোশন। নরেন্দ্রনাথের দেহ-মনে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে বেড়াতে লাগল, নরেন্দ্রনাথের পুনর্জন্ম হল।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সামনে এক সমস্যা এসে উপস্থিত হল। তাঁর মন আধ্যাত্মিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, অশান্ত মন শান্ত হয়েছে, তাহলে নরেন্দ্রনাথ ভাবতে লাগলেন কাজ কি এই ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারে থেকে, বেরিয়ে পড়া যাক না সংসার ছেড়ে, আর পিছু-টানই বা কোথায়? সংসার একরকম চলে যাবে ঠাকুরের আশীর্বাদে, ভাইয়েরা রয়েছে, ভাবনা কিসের। কিন্তু হল না, নরেন্দ্রনাথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না, সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ নরেন্দ্রনাথের সামনে এসে বললেন, 'কোথায় যাবি রে নরেন? তোকে দিয়ে যে মা অনেক কাজ করাবে রে, তোর দেশটার দিকে একবার চেয়ে দেখ্, সব যে ঘুমিয়ে রয়েছে রে, এদের জাগা, তোল্, সেবাধর্মে দীক্ষিত কর্, এই তো তোর কাজ আর মা যা তোকে দিয়েছেন তাই দিয়ে তুই নির্জনে সাধন-ভজন করবি। বুঝলি?' ঠাকুরের কাছ থেকে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে দেখলেন, দেখে শিউরে উঠলেন: সত্যই তো, সারা দেশটা তামসিকতায় সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, শত শত বৎসরের পরাধীনতা এ জাতটাকে একেবারে পিষে ফেলেছে, মানুষগুলো অসংখ্য বিধি-নিষেধের জালে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে, 'ভগবান' 'ভগবান' করে সকলে মরছে কিন্তু মানুষকে ভালবাসছে না, ঘৃণা করছে, সেবাধর্ম একেবারে লোপ পেয়েছে, negative values অর্থাৎ যে সব কর্ম মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, মানুষকে জড়পিণ্ড করে রেখে দেয় সেই সব কর্মে ভারতবাসীর তীব্র অনুরাগ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন নরেন্দ্রনাথ। এই চৈতন্যহীন, মনুষ্যত্বহীন, অনড় জাতির পুনরায় প্রাণ-সঞ্চার করতে হবে, বীর রসে, ক্ষাত্র ধর্মে, জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে নইলে এ জাতির মৃত্যু আসন্ন। এই সব ভাবতে ভাবতে নরেন্দ্রনাথের চোখে

জল এল কিন্তু তিনি মরলেন না, তাঁর মনে একটু ভরসা এল, আশা এল। নরেন্দ্রনাথ দেখলেন আর একটি ব্রাহ্মণ দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত সরকারী কাজ করে বাড়ি ফিরে এসে দেশের দুরবস্থা দেখে একা একা রোদন করছেন আর এক একটি করে প্রদীপ জেলে দিচ্ছেন সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে। নরেন্দ্রনাথ ভাল করে লক্ষ্য করলেন, ব্রাহ্মণের পাশে কেউ নেই, সত্যই ব্রাহ্মণ একা তবে অপরিসীম মনোবল তাঁর, জন্মজন্মান্তরার্জিত অপরিমেয় আত্মিক শক্তিকে দোসর করে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ধ্বনি দেশকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলছেন। নরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম করলেন।

নরেন্দ্রনাথ আর অপেক্ষা করলেন না। এইবার তাঁর কাজ শুরু হল। নরেন্দ্রনাথ রণভেরী বাজিয়ে ভারতবাসীদের উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'মাভৈঃ, তোমরা ছোট নও, তোমরা মানুষ, অনন্তশক্তি তোমাদের মধ্যে বিরাজ করছে, ওঠ, জাগ, মানুষকে ভালবাস, দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, তোমাদের ভাই, ভারতের কল্যাণ তোমাদের কল্যাণ, নিঃস্বার্থ হয়ে সেবাধর্মে দীক্ষিত হও, পৃথিবীর আর পাঁচটা স্বাধীন জাতির মানুষের মত বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

সারা ভারতে বিদ্যুৎ খেলে গেল, হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত কেঁপে উঠল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বজ্র-বাণীতে। আর কেউ অনড় হয়ে বসে থাকতে পারল না, উঠে দাঁড়াল, এক নূতন অধ্যায় রচিত হল ভারতবর্ষের ইতিহাসে। দিকে দিকে, সারা ভারতে এই পুরুষসিংহের বাণী ছড়িয়ে পড়ল। এর পরেই তো ভারতে অগ্নিযুগ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতির প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

এই আমাদের নরেন্দ্রনাথ, আমাদের পরমারাধ্য বিবেকানন্দ, যাঁর প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে থাকলে মনে শক্তির জোয়ার খেলে যায়, অনড় ব্যক্তিও সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আজ নরেন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা ভারত, সারা জগৎ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রণাম করবার জন্য মেতে উঠেছে, আমরাও সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, তুমি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রণাম গ্রহণ কর, তুমি আমাদের অনেক দিয়েছ, তুমি আমাদের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছ, জগৎসভায় ভারতকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছ, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য, ভারত তোমাকে কখনও ভুলবে না, ভুলতে পারবে না, তোমাকে ভালবাসবেই, তুমি অপরিমেয় শক্তির আধার ছিলে, মানুষ তোমার কাছে ছুটে যাবেই।

সাহিত্যশিল্পী স্বামী বিবেকানন্দ

অনিল চক্রবর্তী

এমন নয় যে প্রাক-রবীন্দ্রযুগে বিশিষ্ট প্রবন্ধলেখক হিসেবে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই স্মরণযোগ্য। তথাপি উত্তরকালে একা তিনিই বাঙালী পাঠকের কাছে বেঁচে রইলেন। ঘটনাটির পেছনে প্রকৃত সত্য আংশিকভাবে আচ্ছাদিত থাকলেও তার জন্য যে নানা কারণ দায়ী তাও মানতে হবে। উল্লেখ করলে অসঙ্গত হবে না যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা আজ পর্যন্ত অনেকাংশেই ভ্রান্ত। উপন্যাস বা আখ্যায়িকার তুলনায় তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য কিছুমাত্র স্বল্প নয়, অন্যপক্ষে সাহিত্যিক-রূপে তাঁর স্থান যেখানে, বোধ হয় সম্পাদকরূপে তাঁর স্থান সেখান থেকে নীচে নয়। অথচ, প্রথমতঃ আমরা সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রকে একেবারেই ভুলে আছি ; দ্বিতীয়তঃ তাঁকে স্মরণ করি তাঁর গোটাকয়েক উপন্যাসের জন্যই। বঙ্কিমের প্রবন্ধসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আজ বোধ হয় কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর কেউ তেমনভাবে অনুভব করেন না। দুঃখবহ এ দুর্ভাগ্যের ভাগীদার একা বঙ্কিমচন্দ্রই নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করার পরও আমরা তাঁকে শুধুমাত্র কবিগুরু বলে বিশেষিত করতে দ্বিধাবোধ করি না। সমগ্র প্রাচ্যসাহিত্যে যাঁর উপন্যাস শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত, প্রবন্ধসাহিত্যরচনায় যিনি অনন্যসাধারণ, সমালোচনা-সাহিত্যকে যিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যপংক্তিতে উন্নীত করে গেছেন, একাধারে যিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরস্রষ্টা, যাঁর চিত্ররচনা আজও জগতের বিস্ময়, নাট্যরচনায়-প্রযোজনায় যিনি এখনও পর্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম, সর্বোপরি যাঁর হাতে গড়ে উঠেছে প্রাচ্যের একমাত্র সংস্কৃতিতীর্থ বিশ্বভারতী, সেই শতমুখী প্রতিভাকে শুধুমাত্র একটি গুণে চিহ্নিত করে আমরা তাঁকে যোগ্য সম্মান দিয়েছি ভেবে সান্ত্বনা পাই। সুতরাং আত্মবিস্মৃত জাতি বাঙালী আমরা যদি আজ বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্যান্য রচনাকারদের একেবারে ভুলে স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যকর্মের কথাকে ভোলার প্রশ্ন ওঠে না, কেন না সাহিত্যিকরূপে তাঁকে চেনার চেষ্টাই করি নি কখনও। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষকালে তাঁদের নিকট-প্রাক্তন কোন রচনাকারকে অস্বীকার করার কোন উপায়ই ছিল না। শুধু যে বঙ্গদর্শনের প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের জন্যই তা সম্ভব হয় নি তা নয়, নবচেতনায় গড়ে ওঠা বাঙালী সন্তান মাত্রের কাছেই তখন নতুন বাংলাসাহিত্য নতুনতর কোন সম্পদসন্ধানের উপায়স্বরূপ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও তৎকালীন আরও অনেক সাহিত্যশিল্পীর কাছেই বঙ্কিম এবং তৎসাময়িক লেখকেরা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ছিলেন। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বিপিন পাল বা চিত্তরঞ্জন দাশের রচনার একটা তুলনামূলক বিচার করার প্রয়োজন হতে পারে। অনুমান করি, কৌতূহলী পাঠক তার সন্ধান রাখেন। এবং নিশ্চয়ই তাঁদের লক্ষ্য এড়ায় নি যে, প্রভাবের প্রবর্তনায় বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই একক ছিলেন না। তার প্রমাণ সাহিত্য-অভিযানের এই দ্বিতীয় স্তরে এসে প্রবন্ধ-সাহিত্যধারা বহুমুখী প্রস্রবণের মত শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কথা অবশ্যই মানা চলবে না যে রবীন্দ্র-সাময়িক প্রত্যেক লেখকই স্বমহিমায় বিশিষ্ট ছিলেন। তবু যাঁদের রচনা বিশেষ বলেই সেদিন চিহ্নিত হয়েছিল, তাঁরা যে আপন-আপন অভিরুচি অনুসারীই নিজেদের রচনাশৈলীকে তৈরী করে নিয়েছিলেন এমন কথা অনুমান করলে হয়তো ভুলই হবে। কেন না ধারাবিচ্ছিন্ন সাহিত্য-সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব, এমন কি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও।

প্রবন্ধরচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম না হলেও, তিনিই প্রথম তাতে সাহিত্যস্বাদের আমদানি করেছিলেন। এ রচনা সুস্পষ্ট একটি বক্তব্যকে প্রকাশ করে এ কথা তিনি কোনদিন ভোলেন নি, পাঠককেও কখনও ভুলতে দেন নি।

যুক্তিগত সিদ্ধান্তকে লোকপ্রত্যক্ষ করতে, বলা বাহুল্য, যুক্তিকে সাধ্যমত ঋজু ও তীক্ষ্ণ করা প্রয়োজন। বঙ্কিম-সাহিত্য অবশ্যই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পাঠকের মন যদি রচনার বিলাসিতায় মুগ্ধ হয়, যদি অনাবশ্যক বিষয়ান্তরে নিক্ষিপ্ত হয় তার চেতনা, তবে সাহিত্য হিসেবে যদি সে-রচনা একেবারে পতিত নাও হয়, অন্ততঃ লেখকের উদ্দেশ্য যে অংশতঃ ব্যর্থ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। অক্ষয়কুমার দত্তর রচনা নিশ্ছিদ্র শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে, এ মত অসম্ভব অনেকেই স্বীকার করবেন না। বরং মেনে নেওয়া সঙ্গত, ভাষা ব্যবহারে তাঁর এই সংযত শাসনের মূলে ছিল রচনার পদ্ধতিপ্রকরণ সম্পর্কে একটি নিশ্চয় বিশ্বাস। কিন্তু প্রবন্ধ যদি সাহিত্যই, তবে সাহিত্যের মৌল আবেদন থেকে বিযুক্ত করে নিলে তাকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক, এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সে সন্দেহকে বাণীরূপ দিতে অনেকেই সেদিন কুণ্ঠা বোধ করেন নি। তাই একদিকে যেমন প্রবন্ধসাহিত্যকে বিষয় ও যুক্তির অচঞ্চল নিগড়ে বাঁধার সযত্ন প্রয়াস একটি বিশেষ শিল্পশৈলীকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি রসরসিকতায় সিক্ত করে পাঠকের মনের দুয়ারে তাকে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টাও কারও কারও রচনায় অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা দিয়েছে। এদিক থেকে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন বোধ হয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। অবিরাম উচ্ছ্বাসের প্লাবনে তাঁর রচনা যেমন শুধু ভেসে যেতে চেয়েছে, স্বধর্মী অন্যান্য লেখকেরা হয়তো ভাবালুতাকে ততখানি প্রশ্রয় দেন নি। তা হলেও, প্রবন্ধরচনায়ও যে বিষয়বস্তুকে ঠিক পথে চালিত করে মনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার সুযোগ আছে এ কথা তাঁরা মেনেছেন এবং এ মতকে সকল রচনার মারফত প্রতিষ্ঠিত করতেও সমর্থ হয়েছেন। রচনাশৈলীর দিক থেকে এ দুটি ধারা স্পষ্টতঃ পৃথক হলেও, এ দুয়ের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টির বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না, তার প্রমাণ, পরবর্তীকালে যোগ্য রচনাকারের হাতে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বিবিধ ধরনের রচনায় ক্রমশঃ সমৃদ্ধতরই হয়ে উঠেছে।

পৃথক হলেও এ দুই ধারার মধ্যে যে সমন্বয়ের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল তা প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিন যেমন বিদ্যাসাগরী এবং আলালী ভাষার মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি প্রবন্ধ-সাহিত্য রচনায় পূর্বতন দুই ভিন্ন পথকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে এনে মিলিত করে ভাষাকে একদিকে যেমন যুক্তিনির্ভর করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সরস হাস্যমধুরও করে তুলেছেন। কাব্যপথসৃষ্টির মত এও কম বিপ্লবাত্মক কাজ নয়। কিন্তু এ অসাধ্যসাধন করেছেন তিনি এমন ক্রমান্বয় রচনার মধ্য দিয়ে যে হঠাৎ তাকে লক্ষ্য করা সম্ভব হয় নি অপ্রস্তুত পাঠকদের পক্ষে। এ কাজ আরও সহজভাবে সম্পন্ন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি যেহেতু তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, সেহেতু তাঁর রচনাশৈলীর এ অলৌকিক রহস্য[illegible]ক সঠিকভাবে চিনে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি [illegible]আমরা কখনও। বরং এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের থেকেও তাঁর কৃতিত্ব অধিক, কিংবা বলা উচিত হবে, যতটুকু বাংলা রচনা তৈরি করা স্বামীজীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তার সর্বত্রই পাঠকমন-বিমোহন সহজ অথচ সরস স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি প্রবাহিত করে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। দীর্ঘ জীবনে তিনি লিখেছেন অজস্র, এবং এমন অসাধারণ পরিস্থিতির সম্মুখীনও তাঁকে বহুবার হতে হয়েছে, যখন অটুট যুক্তি, দৃঢ় প্রকাশভঙ্গী ছাড়া আপন বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে প্রবন্ধ-সাহিত্যের মত বুদ্ধিনির্ভর রচনাতেও তাঁর আনন্দঘন রসিক মনটিকে তিনি কখনও নির্বাসন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কর্মক্ষেত্রের বিচারে যদিও রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দ চিরকালই ভিন্ন পথের পথিক, তবুও তাঁদের ভেতরের এই সাদৃশ্যটি ভোক্তার মনে হয়তো কিছু কৌতূহলের উদ্রেক করতে পারে। সমবয়স্ক বলেই এ-রকম হওয়া সম্ভব এ কথা বলা সঙ্গত হবে না, কারণ অন্য অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখক তখন অবশ্যই ছিলেন যাঁরা এ সমন্বয়কে উচিত বলে মনে করেন নি। আমার মনে হয় এ দুই অসাধারণ প্রতিভাধরের এই অন্তর্মিলনের একমাত্র কারণ তাঁরা ছিলেন সকল কলুষহর আনন্দঘন

কটিই জীবনচেতনাস্রোতে বিশ্বাসী। তবু সাদৃশ্যটাই ড় নয়, হলে উভয়কে অভিন্ন ভাবতে হত, এবং লেখক হসেবে একজনকে অপরের আশ্রিত ছাড়া অন্য কিছু ল্পনা করা সম্ভব হত না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এবং বীন্দ্রনাথের পার্থক্য এত দুস্তর যে তা আর কাউকে চাখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। াতন্ত্র্য নিয়েই তাঁরা বিশেষ, এবং বলাই বাহুল্য, এ বশিষ্ট্য আপন মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের চনায়। অত্যন্ত কঠিন উক্তিও স্বামীজীর হাতে এমন সময় হয়ে উঠতে পারে:

"ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেন ন, ও কি এখন পাত্রী ফাত্রীর কর্ম!! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী াজাবেন—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয় সরে পড়ো না কেন?—এত বড় দুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়? ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমকহারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি!!"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কিন্তু আমরা কল্পনা করতে পারি, ঠিক এ কথাই রবীন্দ্রনাথের হাতে ঠিক এ ভাবে এমন বৈঠকী মেজাজ নিয়ে, কখনই রূপ পেত না। অথচ নিষ্করুণ সত্যভাষণে তাঁরও লেখনী বহুবার খরখড়্গ হয়ে উঠেছে, আমরা দেখেছি। তাই তাঁর সহাস্য রসিকতাকেও আমরা যখন পরম আনন্দে উপভোগ করি তখনও ভুলে যাই না যে তাঁর বক্তব্য কম গভীর নয়, কম গম্ভীরও নয়। 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণে'র মত প্রবন্ধেও তাঁর কৌতুককে এমন ভাবে ঝলসে উঠতে দেখি:

"...গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলেই গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেরকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব কজন ছেলের আছে আশা করা যায়? শুধু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে আণ্ডামানে চালান যাবার উপযুক্ত? ইংলণ্ডে একদিন চুরির দণ্ড ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না বলেই ফাঁসি। না বুঝে বই মুখস্থ করে পাস করা কি চুরি করে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কি বলব? আস্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়।"—শিক্ষা।

দুটি উক্তিই বেদনাপীড়িত, কিন্তু তুলনায় প্রথম পর্যায়েই ধরা পড়বে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা একেবারেই প্রথম প্রেরণাসঞ্জাত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন একজন পরম অভিজ্ঞ সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ স্বরূপে। সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান শর্তই যদি হয় অন্তর-প্রেরণার দ্বিধাহীন প্রকাশ তাহলে স্বীকার করতেই হবে স্বামীজী তাঁর সামান্য বাংলা রচনায় সে শর্তকে ষোলআনা পূরণ করেছেন। কিন্তু নিখাদ সোনায় অলঙ্কার হয় না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেছেন। স্বামীজী যে কদাপি সাহিত্যযশলিপ্সু ছিলেন না, এ সত্যকে প্রমাণ করার জন্য অনেক কথার অবতারণা করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি আপনার মনকে অসংখ্য বাংলা ভাষাভাষীর মনের দুয়ারে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে আরও অনেক রচনায় হাত দিতে হত, তাহলে জোর-করে বলতে পারি না, সাহিত্যিকসুলভ মার্জনার প্রয়োজন তিনি সত্যিই উপলব্ধি করতেন কি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এ মার্জনার প্রয়োজন ছিল একান্তভাবে। তাই স্বামীজী তাঁর রচনাকে 'শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার' দরকার বোধ না করলেও রবীন্দ্রনাথকে করতে হয়েছিল।

অন্যপক্ষে ভঙ্গীটিই সাহিত্যের সর্বস্ব নয়। বস্তুতঃ বিষয়ের প্রতি রচনাকারের দৃষ্টিভঙ্গীটিও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। স্বামীজী এবং রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার সাগর পাড়ি দিয়েছেন এবং উভয়েই তাঁদের অভিজ্ঞতাকে বাংলা ভাষায় রূপ দিয়ে গেছেন। স্বামীজীর বাংলা রচনার অধিকাংশই তো ধরতে গেলে এই বিদেশ ভ্রমণকাহিনীই। অথচ দৃষ্টিভঙ্গীর অসামান্য পার্থক্য এ দুজন লেখককে যেমন ভাবে আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে তা যে-কোন অন্বেষী পাঠকের পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতেই অনুধাবন করতে পারা অসম্ভব নয়। উভয়েই বিদেশকে দেখেছেন

জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে এবং কখনই ভুলে যান নি নিজের মাতৃভূমিকে যাকে তাঁরা আপন মায়ের চেয়ে কম ভালবাসেন না। স্বভাবতঃই স্বদেশের মঙ্গলকামনায় তাঁদের কণ্ঠস্বর কখনও বা সহানুভূতিতে কোমল হয়েছে, কখনও হয়েছে দুঃখে আর্দ্র। কিন্তু একজন কর্মবীর অস্থির পরিব্রাজক, অন্যজন সৌন্দর্যের একান্ত পূজারী অচঞ্চল স্বপ্নদ্রষ্টা। তাই স্বামীজীর বক্তব্য স্পষ্ট, সহজ, ঋজু—প্রাণের উত্তাপে উষ্ণ। রবীন্দ্রনাথের বাণী স্পষ্ট ও সহজ হয়েও উত্তপ্ত নয়, বরং প্রাণের আনন্দস্পর্শে স্নিগ্ধ। তার কারণ স্বামীজী স্বজাতির পতনে মর্মাহত, তার আশু সংশোধনের জন্য উদ্বেগ-আকুল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাড়া নেই। যা তিনি দেখেছেন তাকে সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করতেও চাইছেন, সেই সঙ্গে তাঁর সে আনন্দের ভাগীদার করতে চাইছেন সমস্ত স্বদেশবাসীদেরও। স্বামীজীর দৃষ্টিকে সাহায্য করেছে তাঁর অনন্যসাধারণ জ্ঞান, আর রবীন্দ্রনাথের সহায় হয়েছে সৌন্দর্যবিলাসী এক হৃদয়চেতনা। বলা বাহুল্য, দৃষ্টিভঙ্গীর এ অনন্যতা দ্রষ্টার রচনায় প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথের দেখা য়ুরোপকে আমরা দ্বিতীয় বার যেন নতুন করে দেখি স্বামী বিবেকানন্দের চোখে।

প্রত্যক্ষ বাস্তবকে তার স্বরূপে দেখারই পক্ষপাতী স্বামী বিবেকানন্দ। অপ্রত্যক্ষ ইতিহাসও তাই তাঁর চেতনায় স্পষ্ট সত্য। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' কিংবা 'বর্তমান ভারতে' বহুবার বহুভাবে আলোচিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাস আর মানবজাতির ক্রম-বিকাশের কাহিনী। কিন্তু ইতিহাসের স্বাভাবিক আবর্জনা তাঁর দৃষ্টিকে কোথাও আচ্ছন্ন করার সুযোগ পায় নি। এমন কি এতবড় স্বদেশপ্রেমিক আপন দেশকে মহিমান্বিত করার প্রলোভনে ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টাও করেন নি কখনও, যার সন্ধান হয়তো পাওয়া যাবে অন্য কোন লেখকের রচনায়। পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে তিনি ইতিহাসকে জেনেছেন, বিচার করেছেন, পৃথিবীর মঙ্গলকে স্পষ্ট চেহারায় উদ্ঘাটিত করেছেন আমাদের সামনে। শুধু শুভকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন, অশুভকে ত্যাগ করতে বলেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। এই দ্ব্যর্থহীন ভাষাই তাঁর একমাত্র অস্ত্র। এ দিয়েই তিনি জয় করে নিয়েছেন আমাদের। [illegible]তে পারি দৃষ্টি এবং বুদ্ধিতে সামান্যমাত্র দ্বিধা ছিল না বলেই কোন কিছুতেই তাঁর সংশয় ছিল না। তাই তাঁর মতামত প্রকাশিত হয়েছে এমন সুস্পষ্ট প্রাঞ্জলতায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

"...একদিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্ছে, আর একদিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন মহাবল জার্মানি মহাবেগে উদয়শিখরাভিমুখে চলেছে। কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানির স্থূল হস্তাবলেপ। প্যারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই; সব সেই প্যারিসের নকল—অন্ততঃ চেষ্টা।... ফরাসীর কলাবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানির রূপবিকাশ চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্যবিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত—কস্তুরীর মত একমুহূর্তে উড়ে ঘরদোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মত—পারার মত ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে; ফরাসীর নরম শরীর—মেয়েমানুষের মত; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।"—পরিব্রাজক

কাউকে কি বলে দেওয়ার দরকার আছে এ বর্ণনার গূঢ় শক্তি কোন্‌খানে? পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অনেকেই তো এ দুটো দেশের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় করেছেন, ফিরে এসে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে, কিন্তু এমন স্বল্প কথায় এমন ব্যাপক তুলনা কি আজ পর্যন্ত কেউ করতে পেরেছেন?

শুধু বিদেশ নয় স্বদেশও। শুধু দেশ নয় সমাজও। মুহূর্তের অবকাশকে নিয়েও বিলাস করার সময় যাঁর নেই, তাঁর মত প্রাণবন্ত পুরুষ কে আছে! পতিত জাতির পুনরভ্যুত্থান ছাড়া অন্য কোন স্বপ্ন যাঁর চোখে নেই, তাঁর মত সমাজসচেতন আর কে হতে পারে! ঊনবিংশ শতাব্দীকে আমরা বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত

করেছি, কিন্তু বাংলা ভারতবর্ষ নয়, আর স্বামী বিবেকানন্দের চোখে সমগ্র ভারতবর্ষই তাঁর স্বদেশ। ভারতবর্ষের কোন খণ্ড অংশের সন্তান তিনি নন। সমস্ত ভারতবর্ষের সমসাময়িক চেহারা তাঁকে মর্মাহত করেছে, সে মর্মান্তিক বেদনাই তাঁকে স্বদেশচিন্তায় উদ্দীপ্ত করেছে। কিন্তু এখানেও তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা আমাদের অবাক করে। সমাজতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত না হয়ে, তুলনায় উপমায় বক্তব্যকে কণ্টকাকীর্ণ না করে, কি ভাবে আসল কথাটিকে অত্যন্ত সরল সাবলীলতায় প্রকাশ করা যায় একমাত্র তাঁর মত অনাড়ম্বর লেখকের পক্ষেই বোধ হয় তা সম্ভব। আমার মনে হয় এতবড় ঘটনাকে যিনি এত সংক্ষেপে বলতে পারেন, তিনি সমাজতাত্ত্বিক, ধর্মপ্রচারক যাই হোন, মূলতঃ তিনি খাঁটি সাহিত্যিকই :

"সমাজ—গৃহের সমষ্টিমাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।"—বর্তমান ভারত

অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী বলে স্বামীজী ভুবন-বিদিত। এ সম্পর্কে সত্যমিথ্যা বহু অলৌকিক কাহিনী জমা হয়ে আছে আমাদের দেশের মানুষদের গোপন ভাণ্ডারে। 'ভাববার কথা' থেকে 'বর্তমান ভারত' পর্যন্ত মাত্র চারখানি বাংলা বইতে তাঁর সেই অগাধ রত্নখনির সামান্যই হয়তো প্রকাশ করেছেন স্বামীজী, কিন্তু তাই আমার মত সাধারণজনের কাছে পর্বতপ্রমাণ। স্বামীজীর জ্ঞানের পরিধি আমি মাপতে চাই না, তাঁকে বিচার করার মত চপল ঔদ্ধত্য আমার নেই। আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি, জ্ঞানবিজ্ঞান—তত্ত্বে ও তথ্যে সম্পূর্ণ হয়ে—কেমন করে এ কটি পাতার মধ্যে আশ্চর্য শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারছে। কোথাও সংশয় নেই, দুর্বোধ বলে বলে মনে হয় নি একটি পঙ্‌ক্তিও, কষ্ট-কল্পনা দিয়ে বক্তব্যকে যুক্তিবদ্ধ করার চেষ্টা আছে কোথাও এমন কথা কল্পনা করাও কষ্টকর। নানা কাজে বাত্যাহতের মত ঘুরে ফিরেছেন স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, এ দ্রুত গতির সঙ্গে তাল রেখে সময়ও বুঝি বা ছুটে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছে বারবার। তারই মধ্যে চলেছে তাঁর বিদ্যাচর্চা। পড়েছেন প্রচুর, কিন্তু সাহিত্যচর্চা করার মত প্রচুর অবসর কোথায়! বাধা আরও আছে। সংস্কৃত কিংবা ইংরেজী-ভাষায় যে শিক্ষা তিনি পেয়েছেন তা হয়তো দৃঢ়ভিত্তিক। কিন্তু, বাংলা? রবীন্দ্রনাথের মত তাঁকেও কি এদিক থেকে প্রচুর দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি? উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কাব্যচর্চা করেছে বাংলাদেশ অঢেল, কিন্তু সে-পর্যন্ত সে গদ্যরচনায় এগিয়েছে কতটুকু? স্বামী বিবেকানন্দকে সাহিত্যশিক্ষা দিতে পারে এমন মনিমুক্তা জমা হয় নি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে, বলতে গেলে প্রথম অনুশীলন পর্বমাত্র চলেছে তখন। অন্ধকার আকাশে প্রথম জ্যোতিষ্ক বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মত অসাধারণ প্রতিভাধরকে সাহিত্যচর্চায় শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে একা বঙ্কিমচন্দ্রই কি যথেষ্ট? অথচ স্বামীজী অর্বাচীন লেখক নন। আবেগের এমন সংযত শাসন, এমন মিতভাষণ, সর্বোপরি ভাষার এমন সুসমঞ্জস প্রয়োগ—কোন অর্বাচীন লেখকের কাছে প্রত্যাশা করা হাস্যকর।

আমাদের লজ্জা, স্বামীজীর বাণীকে আমরা কর্মের প্রেরণা হিসেবেই শুধু গ্রহণ করেছি, সাহিত্য হিসেবে তাকে আমরা চিনে নিই নি। অথচ, সাহিত্যসুলভ কোন গুণেরই অভাব নেই সে রচনায়। এক-একসময় মনে হয়, বাংলা গদ্যসাহিত্য এতদিনে বহু দীর্ঘ পথ এগিয়ে এসেও, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পেয়েও, স্বামীজীর রচনার সেই সহজ-সারল্যকে যেন আয়ত্ত করতে পারে নি। সাহিত্য শিক্ষাগুরু নয়, হৃদয়ে-হৃদয়ে আনন্দকে জাগিয়ে তোলাও তার দায়িত্ব। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক অ্যালোপাথিক চিকিৎসার কাজ করতে পারে, কিন্তু সাহিত্যপাঠে নিরুৎসাহ হতে দেখি নি কোন শিক্ষিতজনকে। সে তো আনন্দের আধার বলেই। স্বামীজীর নির্বিষ কৌতুকপ্রিয়তার কথা আগে উল্লেখ করেছি। সে কৌতুক ক্ষণে-ক্ষণে যে অনাবিল হাস্যরস হয়ে ফেটে পড়েছে তার উল্লেখ না করলে নিশ্চয় অন্যায় হবে। হাস্যরস সাহিত্যে বিরল বটে, কিন্তু ভারসাম্য

রক্ষার জন্যও তার প্রয়োজন, এ কিছু নতুন তত্ত্বকথা নয়। পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ রচনাকার এ সত্যকে চিরকাল প্রমাণ করে এসেছেন। বিচার করে দেখলে স্বামীজীর রচনায় মধুর হাস্যরসকে অনবদ্য বলে মানতে কেউ দ্বিধা করবেন না, যদিও সে হাস্যকৌতুক নিছক ঝিলিকমাত্র নয়, উদ্দেশ্যহীনও না। সমুদ্রবক্ষে তু ভায়ার দুরবস্থা নিয়ে তাঁর যে কৌতুক, গঙ্গাজলের গঙ্গাপ্রাপ্তিতে তাঁর যে মজা, সে সব ছিটেফোঁটা কৌতুকোজ্জ্বল রচনার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করলেও, 'ভাববার কথা'র প্রতিটি অনুচ্ছেদের কথা আমি এখানে স্মরণ না করে পারছি না। শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় এ রচনাংশ নিগূঢ় উদ্দেশ্যেরই বাণীপ্রকাশ এবং স্বামীজীর চিন্তাপ্রসূত এই খণ্ড অংশগুলো আমাদের ভেতরের কৌতুকপ্রবণতাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিলেও, তাদের ভেতরকার মর্মার্থ আমাদের বুদ্ধিকেও একটু নাড়া না দিয়ে কেবল হাস্যরসের মধ্যেই মিইয়ে যায় না। দীর্ঘ হলেও একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না :

"গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড় কুড়ি ছেলে হলে ঐ রকম চেহারাই হয়ে থাকে। যাই হোক, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতিবিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুন দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হতে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণপ্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে !!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠ্‌ছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বল্লে,—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ !! 'বেঁচে থাক কৃষ্ণব্যাল' ব'লে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালদের আদর! 'ভল্ বাবা "অভ্যাস" অল্ মারো' ইত্যাদি।"—ভাববার কথা

উনিশ শতকী সংস্কৃতিপরায়ণতায় যে ব্যভিচার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল ইঙ্গিতটা যে সেখানে, আমাদের তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বিদ্রূপটা লক্ষ্য করবার মত। এ হাস্যরস সৃষ্টি করবার ক্ষমতা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের মত ক্ষমতাবান লেখকদের পক্ষেই সম্ভব।*

---

* প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি তুলনীয় :

'পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা,
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটি যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ শক্তি,
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণবলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মনটা।'—ইত্যাদি

উন্নতি-লক্ষণ—কল্পনা

প্রথম দিকে বহুকাল পর্যন্ত এ রকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে দুর্বল বাংলা ভাষায় সর্বপ্রকার মনের ভাবকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তদুপরি আর একটি বড় সমস্যা ভাষার রূপনির্ণয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা স্বামী বিবেকানন্দের মাত্র চারটি গ্রন্থ থেকেই বোঝা যাবে বাংলা ভাষা কোন কালেই দুর্বল ছিল না, উক্ত ধারণা যাঁদের ব্যথিত করত বস্তুতঃ তাঁরাই ছিলেন দুর্বল লেখক। স্বামীজী কোন্ বিষয় নিয়ে না আলোচনা করেছেন, অথচ ভাষার দুর্বলতার জন্ত কোথাও তাঁকে থমকে যেতে হয়েছে এমন লক্ষণ তো কই নজরে পড়ে না। অন্তপক্ষে তিনি সাধু এবং চলতি উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ ও পত্রসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। জেনেছি, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সব্যসাচী। সাধু এবং চলতি ভাষা নিয়ে কম বাক্‌বিতণ্ডার ঝড় বয় নি বাংলার সাহিত্য-অঙ্গনে। প্রমথ চৌধুরী পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখের ভাষাকে কলমের মুখে আনতে। তিনি জয়ী হয়েছেন। কেমন যেন প্রবাদ বাক্যের মত এ সিদ্ধান্ত প্রচলিত হয়ে গেছে যে, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবর্তন করেন বীরবল। এমন কি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত এদিক থেকে তিনিই অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কথাটা অর্ধসত্য। প্রমথ চৌধুরীর অনেক আগে, খুব সম্ভব স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম চলতি ভাষাকে আশ্রয় করে প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন, যখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ সংশয়হীন হয়ে উঠতে পারেন নি। শুধু তাই-ই নয়, বাংলা সাহিত্যের সেই শৈশবকালেই চলতি ভাষার শক্তিকে ঠিক চিনে নিতে পেরেছিলেন স্বামীজী। তাই এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত দ্বিধাহীন স্পষ্ট :

"স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারে না ; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃত গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—লক্ষণ।"—বাঙ্গালা ভাষা, ভাববার কথা

এ সিদ্ধান্তে যে কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না, স্বামীজীর সমগ্র রচনাই তার প্রমাণ। তাঁর অনেক ভবিষ্যৎবাণী নাকি যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে, অন্ততঃ ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর দূরদৃষ্টি যে সত্য হয়েছে, আজ আর তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা শুধু তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিই নি। যেমন বিশুদ্ধ সাহিত্যিকের সিংহাসনে বসাতে এতকাল সংকোচ অনুভব করেছি।

যে-ভাষা প্রাণহীন নয় অবশ্যই সে গতিশীল। স্বামী বিবেকানন্দ নিজস্ব পন্থায় বাংলা ভাষাকে গতিশীল করেছিলেন। সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই নয়, রচনার গুণের জন্যই আমরা তাঁর সাহিত্যকে মর্যাদা দিতে বাধ্য হচ্ছি। সুতরাং এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে তাঁর রচনা যদি প্রাণবন্তই হয় তবে পরবর্তীকালের লেখকদের ওপর তাঁর প্রভাব অবশ্যম্ভাবী রূপে ধরা পড়েছে কি না। এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজসাধ্য নয়। কেন না স্বামী বিবেকানন্দ ও পরবর্তী যুগের লেখকদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের প্রভাব এতই সুদূরবিস্তারী যে তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সমসাময়িক তো বটেই, পরবর্তীকালের কোন লেখকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। বোধ হয় আজও নেই। তবু এ প্রসঙ্গে অন্ত আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখা চলতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই সমস্ত দেশে যে স্বাদেশিকতার বন্যা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, তাতে সেদিন যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরবর্তীজীবনে সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁরা হয়তো আজও ভোলেন নি, সেই যুগসন্ধিকালে স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত গম্ভীর বাণী কি অমোঘ শক্তিতে তাঁদের সামনের দিকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করেছিল। এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, সে রচনা কর্মে প্রেরণা দেয়, সাহিত্যসৃষ্টিতে তার প্রভাব শূন্য হতে পারে। সুতরাং পরবর্তী দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীতে যাঁরা নিরলসভাবে সাহিত্যকর্মে ব্যাপৃত হয়ে আছেন, কেমন করে বিশ্বাস করব, তাঁদের ধ্যানে-কর্মে-সৃষ্টিতে আজও স্বামী বিবেকানন্দ তেমনি প্রোজ্জ্বল জ্যোতি হয়ে বেঁচে নেই। তাদের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু সে-সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও যে ওতপ্রোত হয়ে মিশে নেই কে তা বলতে পারে। মনে হয় সে নিগূঢ় সত্যসন্ধানের সময় এখন হয়েছে।

—

অতীতের এক প্রদোষ সন্ধ্যা। পরম রূপসী এক রাজকুমারীর সঙ্গে মারোয়াড় রাজকুমারের বিবাহোৎসব। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বর ও বধূ, এমন সময় বিবাহ-সভায় ছুটে প্রবেশ করল রক্তপ্লুত রাজদূত, বলল, 'কুমার, সময় নেই, বাইরে শত্রু...।' বর্শা ও তরবারি নিয়ে অশ্বারূঢ় রাজকুমার যাত্রা করলেন রণক্ষেত্রে।

সেই সন্ধ্যাতেই বীরের মত মৃত্যু বরণ করলেন রাজকুমার। নিহত স্বামীর সমীপে এসে উপস্থিত হলেন রাজকুমারী। প্রিয়তমের নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি অনেক চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর আদেশ দিলেন, "বাঁশি বাজাও, মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ কর, এবার আর লগ্ন পার হবে না।" চিতায় আরোহণ করে স্বামীর শিয়রে এসে বসলেন তিনি। পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে, পুরাঙ্গনাদের হুলুধ্বনিতে, সানাইয়ের সুমধুর সুরে কেঁপে উঠল বাতাস... লেলিহান হ'ল চিতার আগুন...

এই ধরনের অসংখ্য কীর্তিগাথার মধ্যেই রয়েছে রাজস্থানের সত্যকার পরিচয়। মোটরযোগে ভ্রমণের আনন্দ অনেক— স্বদেশের অতীত কীর্তিগাথা ও কিংবদন্তী শোনার অপার সুযোগ এর অন্যতম আকর্ষণ। আপনি যদি মোটরে ভ্রমণ করেন, আরও অনেক নতুন গাথা ও জনশ্রুতির সন্ধান আপনি পাবেন।

ডানলপ ভ্রমণকারীদের সহায়

ভ্রমণ জাতীয় আয় বাড়ায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে

দরিদ্রনারায়ণের সেবক

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী অবশ্যই ছিলেন ; কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসের স্বরূপ ছিল ভিন্নতর। স্বয়ং সংসারচক্রে আবদ্ধ না হলেও সংসারের শুভাশুভের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁর কর্মযোগের বাণী জগৎ-সংসারকে কেন্দ্র করে, তার অধিকতর কল্যাণার্থ ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ জনসেবার মাধ্যমে তাঁর অদ্বৈতবাদকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেম নিষ্ক্রিয় ভাবতন্ময়তা মাত্র ছিল না, শ্রেয়োবোধ আধারিত শুভঙ্করী সাধনায় তা অভিব্যক্ত হয়েছিল। বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী পরমহংসদেব ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ তাই ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি জীবকে দয়া করে স্পর্ধা প্রকাশ করার পরিবর্তে জীবের সেবাই নিজেদের আরাধ্য রূপে গ্রহণ করেন। আর তাই বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের জনজীবনকে প্রভাবিত করার দুটি প্রধান মন্ত্র উচ্চারিত হয় বিবেকানন্দের কণ্ঠে। এর প্রথমটি হল : "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" আর দ্বিতীয়টি "দরিদ্র নারায়ণ"—যাকে মন্ত্রের পরিবর্তে বীজমন্ত্র বলাই অধিকতর সঙ্গত।

ভারতীয় মানসিকতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল স্থূল সাকারের মাত্রাতিরিক্ত ভজনা। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই মহাপুরুষ মাত্রকেই দেবতায় রূপান্তরিত করে কোথাও না কোথাও তাঁদের মূর্তি অথবা প্রতিকৃতি স্থাপনা করে ফুল বেলপাতা ও ধূপধুনা সহযোগে তাঁদের পূজা করা আরম্ভ করি। আর এই অবকাশে তাঁদের জীবন ও কর্মের মূল শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভীম প্রহারে আমাদের এই মোহ ভঙ্গ করার প্রয়াস করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁর নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি উল্লেখযোগ্য :

"আমাদের জাতের কোন ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন ; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হল—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরাজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বেলকোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)—ঘণ্টা ডাইনে বাজাবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা ; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

"যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হবেক মানুষের পূজো করগে,—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম ; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির

বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন ; এ দিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস। আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশময়।…

"যাক, তোদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে তাঁরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন, যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে।…আইডিয়া (ভাব) ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগবিশেষ। ইনডিপেনডেন্ট (স্বাধীন) হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ্।…অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।…যদি কাজ করে দেখাতে পারিস, যদি এক বৎসরের মধ্যে দু-চার লাখ চেলা ভারতে জায়গায় জায়গায় করতে পারিস, তবে বুঝি। তবেই তোদের উপর আমার ভরসা হবে, নইলে ইতি।…" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৭-৪৮)

একই সমস্যাকে আস্তিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দের দেখার একটি সুন্দর নিদর্শন স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত একটি পত্রের শেষাংশ। বিবেকানন্দ বলছেন : "বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোন ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পার। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যাশিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম কর, তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে।…যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তৎক্ষণেই ত্যাগ করিবে, পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্য 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমা[র] দেবতা হউক, ইহাদের [সেবা]ই পরমধর্ম জানিবে।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. [illegible])

২

'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'—এই মন্ত্রকে মূর্ত করার জন্য কি জাতীয় পরিকল্পনা ছিল বিবেকানন্দের? ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির কাছে বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনৈতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ. ৪৭২)

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আমেরিকা থেকে শ্রীযুক্ত আলাসিঙ্গাকে বিবেকানন্দ যে পত্র লেখেন তাতে তাঁর কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত তো ছিলই, এ ছাড়া ছিল ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রের একটি যথার্থ বিশ্লেষণ। আমাদের ব্যাধির মূল কারণ যে পরনির্ভরশীলতা—এ সত্যও বিবেকানন্দ দেশবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একটি সংঘের বিশেষ প্রয়োজন—যা হিন্দুদের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে ও ভাল ভাবগুলির আদর করতে শেখাবে। আমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য কলকাতার সভায় ৫০০০ লোক জড়ো হয়েছিল—অন্যান্য স্থানেও শত শত লোক সভায় মিলিত হয়েছে—বেশ কথা, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে চারটি করে পয়সা সাহায্য করতে বল দেখি—অমনি তারা সরে পড়বে। বালসুলভ নির্ভরতাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয়, তবে তারা খেতে খুব প্রস্তুত ; কারও কারও আবার সেই খাবার

ালিয়ে দিতে পারলে আরও ভাল হয়।...যদি তোমরা জেরা নিজেকে সাহায্য করতে না পারো, তবে তো তামরা বাঁচবারই উপযুক্ত নও।" (স্বামী বিবেকানন্দের াণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭০)

সবার পিছে সবার নীচে যে সব সবহারারা রয়েছে াদের টেনে তোলার জন্য বিবেকানন্দের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার ত্তম নিদর্শন শ্রীযুক্ত আলাসিঙ্গাকে লিখিত তাঁর পত্রের য়োদ্ধৃত অংশ। বিবেকানন্দ বলছেন, "কিন্তু ভারতের রপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? াদের উদ্ধারের উপায় কি?...তারা অন্ধকার থেকে ালোয় আসতে পারছে না, তারা শিক্ষা পাচ্ছে না। তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল?...এরাই ামাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই ামাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য জ করো, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই ামাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা ল যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের বেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—... দিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও জ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় ক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ ত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। দিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মত কবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা জগার করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে আমি তাদের হতভাগা পামর বলি। হে ভ্রাতৃগণ! মরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে।..." (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৫৮)

এ কাজ যে সহজ নয়—এ কথা বলাই বাহুল্য। জড়তায় মোহাচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে আত্মশক্তির আবাহন দুরূহ সাধনা। জড়তা মানুষের ভিতর এমন ছিন্নমস্তা বৃত্তির সঞ্চার করে যে উপকারীকেই উপকারপ্রাপ্ত মানুষ আঘাত করে। প্রেম বিলানোর প্রতিদানে কলসির কানার আঘাত পাওয়া মানব-সমাজে নূতন কথা নয়। বিবেকানন্দ তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, "তোমরা কি এই মৃত জড়পিণ্ডটার ভেতর, যাদের ভেতর ভাল হবার আকাঙ্ক্ষাটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নেই, যারা তাদের হিতৈষীদের ওপরই আক্রমণ করতে সদাপ্রস্তুত, এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে পার? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করতে পার, যিনি একটা ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা করছেন, এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুঁড়ে লাথি মারছে এবং ঔষধ খাব না বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলেছে?" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৫৬)

সমস্যার ভয়াবহতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে চির-আশাবাদী বিবেকানন্দ মাভৈঃ মন্ত্রও শোনাচ্ছেন। তিনি বলছেন, "ও সব নিন্দা-কুৎসার দিকে একদম খেয়াল করো না। ফের তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'।—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। পাহাড়ের মত অটল হয়ে থাকো। সত্যের জয় চিরকালই হয়ে থাকে।...ভারতের পক্ষে প্রয়োজন—তার জাতীয় ধমনীর ভিতর নূতন বিদ্যুদগ্নি-সঞ্চার। এরূপ কাজ চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে; এখন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শুধু কাজ করেই খুশী থাকো; সর্বোপরি পবিত্র ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও—ভাবের ঘরে যেন এতটুকু চুরী না থাকে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।... আমি যদি ভারতে এই রকম একশ জন লোক রেখে যেতে পারি, তাহলে সন্তুষ্ট চিত্তে মরতে পারবো—আমি বুঝব আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে।" (ঐ, ঐ, পৃ. ৫৬)

পৃথিবীর তাবৎ মহাপুরুষের মত বিবেকানন্দেরও আগ্রহ ছিল গুণের প্রতি, সংখ্যাশক্তির উপর নয়। "এক" যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার পাশে যতই শূন্য বসানো যাক, তার মূল্যবৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শূন্যের পাশে শূন্য—তার কোন মূল্যই নেই। সমাজ-সংস্কারকে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী করার জন্য বিবেকানন্দ তাই এত জোর দিতেন। স্বামীজী তাই বলতেন, "জগৎ উচ্চ উচ্চ নীতির

(principles) জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়; তারা চায় ব্যক্তি

(person)। তারা যাকে পছন্দ করে, তার কথা ধৈর্যের সহিত শুনবে, তা যতই অসার হক না কেন—কিন্তু যাকে তারা পছন্দ করে না, তার কথা শুনবেই না।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৪)। অন্যত্র তিনি বলছেন, "আমাকে একটা খাঁটি লোক দাও দেখি, আমি রাশি রাশি বাজে চেলা চাই না।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৫৭)। আবার, "লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হলে জীবন চাই, সেইটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়: ব্যক্তির ভেতর দিয়ে ভাবের আকর্ষণ অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায়।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৬৬)

"মূঢ় বিজ্ঞজন" অথবা অপরাপর বাক্‌সর্বস্ব সমালোচকদের টীকা-টিপ্পনী যাতে কর্মীর উদ্যমের অপক্ষয় ঘটাতে না পারে তার জন্য তাদের সাহস দিয়ে ঈশ্বরের কল্যাণস্বরূপে দৃঢ়বিশ্বাসী বিবেকানন্দ গীতার পুনরুক্তি করে বলতেন, "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না। বিবেকানন্দের কাব্যপ্রেমী সত্তা আশার বাণী খুঁজে পেয়েছিল ভর্তৃহরির রচনা থেকে :

নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

অর্থাৎ নীতিনিপুণগণ নিন্দা বা স্তুতি যাই করুন না কেন, লক্ষ্মী আসুন বা যেখানে ইচ্ছা চলে যান, আজকে অথবা শতবর্ষ পরে—যবেই মৃত্যু হোক না কেন, ধীর ব্যক্তিরা কখনও ন্যায়পথ থেকে বিচলিত হন না।

●

বিবেকানন্দের ভিতর প্রাণবন্যার যে স্ফুরণ দৃষ্টিগোচর হয়, স্বভাবতঃই উত্তরকালের ভারতবর্ষে তার প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে এদেশে জনসেবার যে অমিত প্রভাবশালী প্রবাহের উদ্ভব হয়, তার অন্যতম প্রধান ঋত্বিক্ ছিলেন বিবেকানন্দ। স্বামীজীর ওজস্বিনী বাণী ও তাঁর সেবাময় জীবন সমস্ত ভারতবর্ষে এক নবযৌবনের জলতরঙ্গ সৃষ্টি করল।

জনসেবার এই প্রবাহে স্বামীজীর স্বসৃষ্ট রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট অবদান তো ছিলই, এ ছাড়া সৃষ্টি হয়েছিল বহুতর প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের। বিবেকানন্দের অলোকসামান্য প্রতিভাকে কেবল একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ধারণ করা কঠিন, তা সে প্রতিষ্ঠান যতই বড় হোক না কেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ মঠের মন্ত্রশিষ্যদের পাশাপাশি বিবেকানন্দের অসংখ্য ভাবশিষ্যরাও গত শতাব্দীর শেষ ভাগ ও এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে নবজীবনের আবাহন কার্যে ব্রতী হলেন।

বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণের সেবার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের বিবরণ এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয়। এ এক স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়বস্তু। আমরা তাই কেবল বিবেকানন্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত তাঁর পরবর্তীকালীন তিনটি জন-আন্দোলনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

এর প্রথমটি হল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সকলে প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত না হলেও বিবেকানন্দ যে অন্ততঃ জাতির মনোজগতে এ আন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতি করেছিলেন, এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায়। আর বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে যে তরুণতর নেতৃত্বের জন্ম হল তাদের উপর বিবেকানন্দের প্রভাব অনস্বীকার্য।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এই তরুণ নেতৃত্বই বিশেষতঃ বাংলাদেশ এবং এ ছাড়া মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব প্রমুখ প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পুরোধা হল। বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্রত ও তাঁর রচনাবলী, বিশেষ করে "কর্মযোগ", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য", "ভাববার কথা", "পরিব্রাজক", "বর্তমান ভারত" ইত্যাদি ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান যাঁরা গেয়েছিলেন, তাঁদের প্রেরণার মূল উৎস ছিল। ইংরেজ সরকার সেযুগে বিবেকানন্দের রচনাবলীকে রাজদ্রোহমূলক বিবেচনা করতেন, এমনি ছিল বিপ্লবীদের উপর তাঁর প্রভাব।

অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই অধ্যায় গান্ধীর যুগ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মত এ যুগের একাধিক

শুধুই যে কেবল নৈষ্ঠিক বিবেকানন্দ-ভক্ত ছিলেন তাই-ই নয়, স্বয়ং গান্ধীজীও বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য ছিলেন। বিবেকানন্দেরই চরণ-চিহ্ন অনুসরণ করে তিনি দীনতম ব্যক্তিটির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং বিবেকানন্দেরই মত তাঁর ছিল আত্মশক্তির সাধনা। গান্ধীজী বিবেকানন্দের "দরিদ্রনারায়ণ" শব্দটিকে বীজমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন এবং তাঁর গঠনমূলক কর্মের লক্ষ্যই ছিল দরিদ্রনারায়ণের সেবা। বিবেকানন্দেরই মত গান্ধীজী তাই এই জন্য ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের জন্য সাত লক্ষ সন্ন্যাসী সেবক চেয়েছিলেন।

পরিস্থিতিবশতঃ গান্ধীজীকে তাঁর ভারতবর্ষের দীর্ঘ সাতাশ বৎসরের জনজীবনের অধিকাংশ রাজনীতির পিছনে ব্যয় করতে হলেও তিনি যে মূলতঃ বিবেকানন্দের অনুগামী নিষ্কাম লোকসেবায় বিশ্বাসী ছিলেন, এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। রাজনীতিতে জড়িত থাকলেও গঠনমূলক কাজ গান্ধীজীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি স্বয়ং একবারের বেশী তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—কংগ্রেস সভাপতি পদ গ্রহণ করেন নি। পরবর্তী কালে তিনি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদও ত্যাগ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি ইচ্ছা করলে এ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারতেন। কিন্তু কোন পদ গ্রহণ না করে তিনি কেবল লোকসেবক থাকাই পছন্দ করেন। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাহন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক চারিত্রধর্ম ঘুচিয়ে দিয়ে একে লোকসেবক সংঘে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করেন গান্ধীজী। এ সবই বিবেকানন্দের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের জনজীবন থেকে নিষ্কাম জনসেবার—দরিদ্রনারায়ণের পুনরভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ঐতিহ্য ক্ষীণবল হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা আমাদের ভিতর নূতন কর্মোদ্যমের সৃষ্টি করার পরিবর্তে জাড্য ও আলস্যের প্রশ্রয় দিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পদ ও কর্তৃত্বের জন্য লোলুপতা, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাম কর্মের বদলে প্রচারাকাঙ্ক্ষা আজকের ভারতবর্ষে আর গোপন নেই। সরকারের তরফ থেকে অর্থব্যয়ের ত্রুটি নেই; কিন্তু ব্যয়িত অর্থের সদ্ব্যয় হয় না। দুর্নীতি কেবল সরকারী শাসনযন্ত্রে নেই, বেসরকারী জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রেও দুর্নীতির বেনোজল অনুপ্রবেশ করেছে।

কারণ হয়তো এর অনেক আছে, আর এ পাপে পাপী আমরা সকলেই। এখন তাই একে অপরের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ না করে সকলের সমবেত চেষ্টায় এই মারাত্মক দুষ্টচক্র থেকে বেরোবার পন্থানুসন্ধান করতে হবে এবং এই কার্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের মত আজও বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকবর্তিকার কাজ করবে।

৪

একটু চোখ মেলে যাঁরাই পথে-ঘাটে চলাফেরা করেন, তাঁদের আজকের ভারতবর্ষে দরিদ্রনারায়ণের সেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝানোর দরকার হবার কথা নয়। তবু কয়েকটি পরিসংখ্যান দিয়ে এ প্রসঙ্গের সূত্রপাত করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষের মাথাপিছু গড় আয় আজও বছরে তিন শত টাকার কম। এই "গড়"-এর কারচুপিও আমাদের বোঝা দরকার। এর ভিতর যেমন ভারতবর্ষের ধনকুবেরদের আয় সম্মিলিত, তেমনি আবার দীনতম ব্যক্তিটির আয়ও ধরা হয়েছে। সুতরাং নীচের দিকের লোকেদের সঠিক আয়ের অনুমান এর থেকে করা যাবে না। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত National Sample Survey-এর একটি হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলের মাথাপিছু বার্ষিক আয় এক শত চার টাকা। এ ছাড়া ভারতবর্ষের ৬ কোটি লোকের মাথাপিছু দৈনিক আয় তিশ নয়া পয়সা, ৪ কোটি লোক মাথাপিছু রোজ পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র রোজগার করে আর দু কোটি এমন লোক এ দেশে আছে যাদের দৈনিক কেবল বারো নয়া পয়সা রোজগার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

স্বাধীনতার পনেরো বৎসর পর, পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের ত্রয়োদশ বৎসরে যে দেশের আর্থিক অবস্থা এমন ভয়াবহ সে দেশে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসগৃহ ইত্যাদি অন্যান্য

ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যপ্রাপ্তির কি অবস্থা তা সকলেই অবগত; সুতরাং স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মত এখনও এ দেশে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য নিষ্কাম কর্মযোগীর প্রয়োজন।

কোথা থেকে আসবে এই কর্মযোগীর দল? তরুণ সম্প্রদায়ের উপর বিবেকানন্দের অসীম আস্থা ছিল। তিনি তাই ঘোষণা করেছিলেন, "উদীয়মান যুবসম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্মী পাইব। তাহারাই সিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে। বর্তমানে অদ্বৈত আদর্শটিকে আমি একটি সুনির্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি এবং উহা কার্যতঃ সফল করিবার জন্য আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমি এই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ না করি, তাহা হইলে আমার পরে আমা অপেক্ষা কোন মহত্তর ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া উহা কার্যে পরিণত করিবেন।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩)

কোন্ উপাদানে তৈরী হবেন এই উদীয়মান যুব-সম্প্রদায়? চরিত্রবলে বলীয়ান সেবাময় জীবন এই যথার্থ তরুণরা বেদান্তের ফলিত রূপ হবেন। খুবই কি দুরূহ এইভাবে নিজেকে গড়া? বিবেকানন্দ অন্ততঃ তা বিশ্বাস করতেন না। মানুষ অমৃতের পুত্র, প্রতিটি মানব ব্রহ্মের অংশোদ্ভূত। মায়া ও মোহের অঞ্জন মুছে ফেললেই সে তার সিংহস্বরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারবে। স্বামীজী বলে গেছেন, "আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন—নিজের উপর বিশ্বাসী হওয়া; এমন কি ভগবানে বিশ্বাস করিবারও পূর্বে সকলকে আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে।...বিশ্বাস করিতে হইবে যে আত্মা অবিনাশী, অনন্ত ও সর্বশক্তিমান।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩-৭৪)

হুজুগ নয়, প্রচার নয়, কাজ চাই। সংবাদপত্রের সমর্থন বা বিরোধিতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই, "খবরের কাগজে ঢের হয়ে গেছে, এক্ষণে আর দরকার নাই। এক্ষণে তোমরা কিছু কর দেখি।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৭৩) আবার, "আমাকে বাজে খবরের কাগজ আর পাঠিও না, ও দেখলেই আমার গা ঘাঁতকে ওঠে। আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ করতে দাও—প্রভু আমার সা সর্বদা রয়েছেন।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৬৭) প্রত্যক্ষ কাজ চাই। কারণ "বই আছে কি? জগৎ তো ইতিমধ্যেই নানা বাজে বইয় আবর্জনাস্তূপে ভরে গেছে।" (স্বামী বিবেকানন্দের বা রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৫)

"এখন কাজে লাগো দেখি।...ঝাঁপ দাও—এই তো সবে আরম্ভ।...ধীরে ধীরে কাজ আরম্ভ কর—প্রথ কয়েকজন গৃহস্থ প্রচারক নিয়ে কাজ আরম্ভ করো, ক্রমশ এমন লোক পাবে, যারা এই কাজের জন্য সারা জীব দেবে। কারও ওপর হুকুম চালাবার চেষ্টা করো না—যে অপরের সেবা করতে পারে, সেই যথার্থ সর্দার হ পারে। যতদিন না শরীর যাচ্ছে, অকপট ভাবে কাজে লেগে থাকো। আমরা কাজ চাই—নাম যশ টাকাকড়ি কিছু চাইনা।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৮) "এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পর প্রশংসা-বিনিময় করবার সময় আমাদের নেই। যখন এই জীবনযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তখন প্রাণভরে কে কতদূর কি করলাম, তুলনা করব ও পরস্পরের সুখ্যাতি করব। এখন কথা বন্ধ কর; কেবল কাজ—কাজ—কাজ।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড,পৃ. ৬৭) কর্মযোগের এ আহ্বান বুঝি শাশ্বত।

জগদ্ধিতায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার আহ্বান জানিয়ে শ্রীযুক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলের মারফত বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর মাদ্রাজী ভক্তদের উদ্দেশ্যে যে পত্রটি লেখেন, তা চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা পাবার যোগ্য। বিবেকানন্দ ঐ পত্রে বলেন:

"...জীবনের অর্থ বিস্তার; বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক; স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না, এ কথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

"পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বইজন নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য; কারণ হে

...বকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও, এখনও বলিতেছি এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি—এগিয়ে যাও। এখন একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইও না। উপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে—অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সবই তোমার পদতলে। টাকায় কিছু হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৮-৯)

৫

আলোচনা শেষ করার পূর্বে বিবেকানন্দের দরিদ্র-নারায়ণের সেবার সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ চর্চা করা অনুচিত হবে না। কারণ এই ক্ষেত্রে এখনও অনেকের ভ্রমাত্মক ধারণার অস্তিত্ব আছে।

কেউ কেউ মনে করেন বিবেকানন্দ কথিত দরিদ্র-নারায়ণের সেবার তাৎপর্য হল সমাজে চিরকালই দরিদ্রদের অস্তিত্ব থেকে যাবে এবং তাই তাদের সেবা করার অর্থাৎ উপর থেকে তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করার প্রয়োজনও থাকবে। ঘুরিয়ে বলতে গেলে তাঁরা মনে করেন যে বিবেকানন্দ *status quo* পন্থী, প্রচলিত আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁর কাম্য ছিল না। তাঁদের মতে দারিদ্র্যের মূল কারণ অন্যায় অবিচার ও শোষণ দূর করার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে বিবেকানন্দ কেবল তার বাহ্য উপসর্গের চিকিৎসারূপী relief-এর কাজ করার কথাই বলে গেছেন। সমাজ থেকে দারিদ্র্যের এই সব মূল কারণ দূর করার কোন সজ্ঞান প্রয়াস বা পরিকল্পনা ছিল না বিবেকানন্দের মনে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিবেকানন্দ-সমালোচকেরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন যে দারিদ্র্য অপমানকর ঘৃণাজনক স্থিতি। তাই দরিদ্রকে নারায়ণ আখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক। দারিদ্র্যকে বর্জনীয় জ্ঞানে এর নিরাকরণের প্রচেষ্টা করতে। সুতরাং বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণের সেবার বাণী বিগত দিনের কথা এবং এ কেবল পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে পরাজিত ভারতীয় অহংবোধের নিদর্শন। পরে নিজের ভুল সংশোধন করে নিলেও একদা শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরুর মত ব্যক্তিও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই অভিমত পোষণ করতেন। এক্ষেত্রে জওহরলালজীকে কোন ব্যক্তি-বিশেষ হিসেবে নয়, একটি বিশিষ্ট মানসিকতার প্রতিনিধি মনে করতে হবে।

পূর্বোক্ত ভ্রমাত্মক ধারণার মূল কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ এ কথা সত্য যে একমাত্র ভগিনী নিবেদিতা ও আর দু-চার জনকে বাদ দিলে বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যদের অধিকাংশই কেবল relief-এর কাজের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। বিবেকানন্দ কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন জনসেবার এক মহৎ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সত্য সত্যই relief-এর কাজের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি।

বিবেকানন্দের এই কর্মসূচির সম্বন্ধে ভুল ধারণার দ্বিতীয় কারণ হল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় প্রভাবিত আমাদের বিশিষ্ট মানসিকতা—যে মানসিকতার কারণে শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরুও একদা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভ্রান্ত মন্তব্য করেছিলেন। এরই কারণ আমরা Social Utopia—শব্দটি শুনলে তার ভাব গ্রহণ করতে পারি; অথচ গান্ধীজীর "রাম রাজত্ব" কিংবা বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনের "দান" শব্দটি আমাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমরা ভুলে যাই যে বাস্তব-দৃষ্টিসম্পন্ন বিপ্লবীকে গণমানসকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেই দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসারী ভাবকল্প এবং শব্দ গ্রহণ করতে হয়। তাঁদের কথাবার্তায়

যদি স্বদেশীয় জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য ভাবকল্প ও শব্দাবলি না থাকে তাহলে তাঁদের আবেদন ব্যাপক হতে পারে না, বড় বেশী হলে তা মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে সীমিত থেকে যায়।

বিবেকানন্দ যে মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন তার নিদর্শন তাঁর একাধিক রচনায় পাওয়া যায়। "বর্তমান ভারত" শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন, "তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম-কর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্ত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোসালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪১)

অন্যত্র তিনি বলছেন, "একচেটিয়া ভোগাধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তির কর্তব্য—নিজের সমাধি নিজেই খনন করা, যত শীঘ্র তাঁহারা ইহা করিবেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল, যত বিলম্ব করিবেন ততই পচিবেন এবং সে মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর হইবে।"

এই প্রসঙ্গে "পরিব্রাজকে"র সেই বজ্রনির্ঘোষ, ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর দিব্যদৃষ্টি-প্রসূত বিশ্লেষণের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। স্বামীজী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই বলেছিলেন:

"আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডমম্বম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা।... তোমরা ভূত কাল—লুঙ্, লঙ্, লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরী করছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংস-হীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না?...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।...অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২)

পূর্বোক্ত কথা যিনি বলতে পারেন, তাঁকে *status quo* পন্থী বলার কোন যুক্তিসঙ্গত আধার আছে কি?

স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, "আমি সমাজতন্ত্রবাদী"। সমাজবাদের একটি অন্যতম মূল সত্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে, "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৮)

মূলতঃ ধর্মবিপ্লব—ধর্মের মাধ্যমে বিপ্লব সংসাধন করা বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল বলে আর্থিক সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে বিবেকানন্দের পক্ষে অন্যান্য সমাজবাদীদের মত অত বেশী মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু বেদান্তের যে ব্যাখ্যা বিবেকানন্দ দিয়ে গেছেন, তা সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবাদেরই দ্যোতক বিবেকানন্দের ভাষায়, "বেদান্তের মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরি গুহায় আবদ্ধ থাকিবে না। বিচারালয়ে ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবির গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী প্রত্যেক বালকবালিকা যে যে-কাজই করুক না কেন, যে যে-অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।...

যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে—'তুমিও যেমন আমিও তেমন; তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরেও সেই ঈশ্বর আছেন।' আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।"

তবে পাশ্চাত্ত্য সমাজবাদীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্যের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না এবং এ প্রভেদ মৌলিক। বিবেকানন্দের সমাজবাদ ধর্ম ও নৈতিকতা আধারিত—পাশ্চাত্ত্য সমাজবাদ, বিশেষতঃ মার্কসবাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রত্যুত মার্কসবাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণই হল ধর্ম ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীনতা। কিন্তু এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। পাশ্চাত্ত্য সমাজবাদ—বিশেষতঃ কমিউনিজমের সঙ্গে বিবেকানন্দের আর একটি বিষয়ে পার্থক্য ছিল এবং তা হচ্ছে বৈদান্তিক হিসাবে তাঁর উদগ্র স্বাধীনতাপ্রেম। তাঁর মতে "দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা—যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ওই সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৪) এই রকম স্বাধীনতা-প্রেমিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতার কণ্ঠরোধকারী সর্বহারা বা অপর কারও একনায়কত্বের প্রথাকে আশীর্বাদ করা সম্ভব নয় এবং এক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্য সমাজবাদীদের তুলনায় বিবেকানন্দ অনেক বেশী প্রগতিশীল।

তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে বিবেকানন্দের পন্থায়—ধর্মবিপ্লবের মাধ্যমে কি সমাজের আমূল পরিবর্তন সংসাধন করা যায়? বিশেষ, বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যগণ এবং তাঁর নিজের সৃষ্ট মঠ মিশন ইত্যাদি যখন এ কার্যে হাত দিতে পারেন নি। বিবেকানন্দের আদর্শ যে কবি-কল্পনা নয়, তার দুই প্রবল নিদর্শন তাঁরই ভাবশিষ্য—গান্ধী ও বিনোবার অহিংস পন্থায় সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে আমরা আমাদেরই কালে প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁরা পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নি, এ কথা ঠিক। এ কথাও সত্য যে তাঁদের দৃষ্টান্ত অদ্বিতীয় নয়, ওই জাতীয় বহু ব্যক্তি ও আন্দোলনের সৃষ্টি এবং বিকাশ বিবেকানন্দ কথিত দরিদ্রনারায়ণের সেবার মন্ত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে পারে। আর তা করাই বর্তমান যুগের দাবি। প্রয়োজন কেবল বিশ্বাস ও নিষ্ঠার। বিবেকানন্দের "স্বদেশমন্ত্র" আমাদের ভিতর সেই বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সৃষ্টি করুক:

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ে'র জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'"
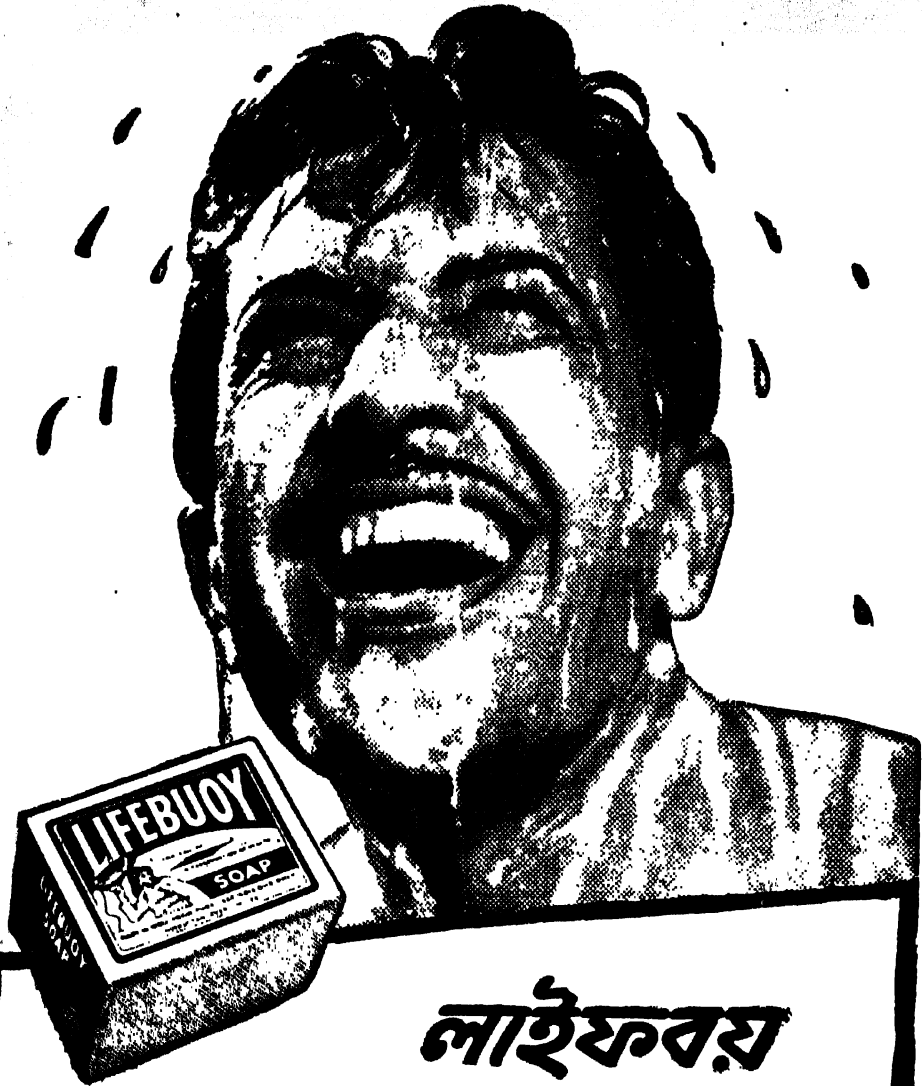
LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে
আঃ! কি তাজা, কি ঝরঝরে লাগছে!
লাইফবয় মেখে স্নান করার কী আনন্দ!
তাছাড়া, লাইফবয়ে ধুলোময়লার রোগ-
বীজাণু পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে যায়।
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রতিদিন পরিবারের
সবাই লাইফবয় মেখে স্নান করুন।
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা-সাহিত্য

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

টেকচাঁদের 'আলালী' ভাষা, কালীপ্রসন্নের 'হুতোমী' ভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখেও প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে'ই বাংলা গদ্যে কথ্যভাষা প্রচলনের প্রথম আন্দোলন সৃষ্টি হয় বলে একটা কথা চালু আছে বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৮৭৯-৮০ সনের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ যে কথ্যভাষায় 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' এবং ১৮৯০ সনে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' লেখেন প্রসঙ্গক্রমে সে কথাও অনুল্লেখিত থাকে না। কারণ পরে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে' কথ্যভাষার সমর্থনে যে আন্দোলন শুরু করেন, তারও প্রধান সমর্থক ও পোষ্টা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই প্রসঙ্গে এমন একটি নাম প্রায়ই অনুল্লেখিত থাকে বা স্বল্পমাত্র উল্লেখিত হয়, যিনি রীতিমত সাহিত্যসেবী না হয়েও বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা ভাষা সম্বন্ধে শুধু গভীর চিন্তাই নয়, 'সবুজপত্রে'র সূচনার বহুপূর্বেই কথ্যভাষার সমর্থনে অত্যন্ত জোরাল এবং যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং সর্বোপরি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই প্রথম কথ্যবাংলায় সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কথাই বলছি। বলা বাহুল্য, নিছক সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে স্বামীজী লেখনী ধারণ করেন নি। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে "উদ্বোধন" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সনের ১৪ই জানুয়ারি। ওই বছরেরই ২০শে জুন স্বামীজী দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ আর ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজীর কাছ থেকে উদ্বোধনের জন্যে লেখা সংগ্রহ করার ভার ছিল তুরীয়ানন্দের উপর। উদ্বোধন-সম্পাদকের অনুরোধে এবং তুরীয়ানন্দের তাগাদাক্রমে স্বামীজী গোলকুণ্ডা জাহাজে বসে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' রূপে এক অতি উপাদেয় এবং মননসমৃদ্ধ ভ্রমণকাহিনী লিখে পাঠাতে থাকেন এবং সেই পত্রগুলি উদ্বোধনের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর পরের বছর, ১৯০০ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি তিনি আমেরিকা থেকে উদ্বোধন সম্পাদককে পত্রাকারে "বাঙ্গালা ভাষা" নামে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। কথ্যভাষায় লেখা এই প্রবন্ধটিতে কথ্যভাষা সম্বন্ধেই স্বামীজীর মূল্যবান মন্তব্য পাওয়া যায়। স্বামীজীর কথায়: "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও,' সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে যায়, দাঁত পড়ে না।" পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরীও কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে তার সরলতা, প্রাণ ও গতির উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে, "কথ্যভাষা হল আটপৌরে সাজ, নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।" কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, সাধুভাষার বিরুদ্ধে সবুজপত্রে প্রমথ চৌধুরী পরিচালিত চলতি ভাষার জেহাদের মধ্যেও চলতি ভাষার উপরোক্ত সব লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয় নি। প্রমথ চৌধুরী তথা সবুজপত্রের কথ্যভাষার জোর দেওয়া হয়েছিল প্রধানতঃ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তির উপর। তাই সমকালীন 'নারায়ণ' পত্রিকায় (১৩২৩ অগ্রহায়ণ) এই খেদোক্তি করা হয়েছিল যে, ভাষার "তৎসম শব্দ প্রধান জমকালো দেহ ও আয়তন বদলালো না, বদলে গেল শুধু সাধুভাষার পূর্ণায়তন ক্রিয়াপদ।" বস্তুতঃ প্রমথ

চৌধুরী তৎসম এবং সমাসবদ্ধ পদ বহু ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসম শব্দ ব্যবহারই প্রধান ত্রুটি নয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষার এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যেটা সাধারণ কথ্যভাষাসুলভ নয়। চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায় ছিল নাগরিক বৈদগ্ধ্যের ছটা, মননাতিরেকের প্রকাশ। তাই তিনিও বলেছেন: "...সাধারণের কথ্যভাষা আমার লেখনীতে ফোটেনি।" অপরপক্ষে স্বামীজীর ভাষা মাঝে মাঝে তৎসম শব্দযুক্ত হলেও সাধারণের কথ্যভাষা হয়ে ওঠে নি—এ কথা বলা চলে না। কারণ সাধারণ মানুষই হল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে এই সাধারণ ভাষা দর্শন-বিজ্ঞান সব কিছুরই প্রকাশক্ষম। এ সম্বন্ধে তাঁর যুক্তিও জোরাল: "যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা করো, দশজনে বিচার করো—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে আর পাঁচজনে ওসব তত্ত্ববিচার কেমন করে করো?"

বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমিয়ে তার বদলে বিশেষণ প্রয়োগ করে ভাষায় ওজস্বিতা আনতে চেয়েছিলেন স্বামীজী, কারণ ক্রিয়াবাহুল্যে তাঁর মতে ভাষার শক্তি নিঃশেষিত হতে থাকে। এখন স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' থেকে রচনাংশ উদ্ধৃত করে দেখা যাক কোথায় এই ভাষার বৈশিষ্ট্য। গঙ্গার শোভা, বাংলার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামীজী এক জায়গায় লিখছেন: "এই অনন্ত শস্যশ্যামলা, সহস্র স্রোতস্বতী মাল্যধারিণী বাংলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার) আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুরপাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। রাশিরাশি তাল-নারকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে ধারাসম্পাত বইছে। চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল, নীল আকাশ, তার কোলে কোলে মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নিচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নিচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেকরকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আম-লিচু-জাম-কাঁঠাল-পাতা? পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নিচে যার কাছে ইয়ারকান্দি, ইরানী, তুর্কিস্থানী গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়। সেই ঘাস, যতদূর চাও—সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন চেঁচেছুঁচে ঠিক করে রেখেছে, জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস, গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোলে যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার পায়ের নিচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা। একটি রঙে এত রকমারি আর কোথাও দেখেছ?"

লক্ষণীয় যে, এই অংশের মধ্যেও স্বামীজী কিছু তৎসম শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও এর আয়তন ও দেহ কোনক্রমেই সাধুভাষাসুলভ হয়ে ওঠে নি। বাংলা দেশের এমন কবিত্বময় রূপবর্ণনা বাংলা-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে সুদুর্লভ। 'পরিব্রাজকে'র অন্যান্য অংশে তৎসম শব্দেরও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার কদাচিৎ চোখে পড়ে। বরং ভাবসমৃদ্ধ এবং তথ্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কৌতুক-নিষিক্ত বাচনভঙ্গী অতি সরল আর মনোরম।

প্রচ্ছন্ন কৌতুক স্বামীজীর রচনাকে যে কি পরিমাণে সরস করে তুলেছে তার নজীর হিসাবে বঙ্গোপসাগরে পড়ার পর স্বামীজীর পত্রাংশ উদ্ধৃত করা হল: "যে-দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া উদ্বোধন সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক করে তুলতেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম 'ভায়া বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, 'বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে'।"

'পরিব্রাজকে'র পরবর্তী অংশগুলিতে স্বামীজী মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ইতিহাস ও সভ্যতার আলোচনা করেছেন গল্পচ্ছলে। ভাষা শুধু যে চিঠির ভাষার মত সরল ও কথ্যরীতিসম্মত তা নয়, এর সঙ্গে আছে স্বামীজীর অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া। স্রোতস্বিনীর মত এ ভাষা সমৃদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে মনের দ্রুত পরিচয় ঘটিয়ে দেয়।

…র মনন ও ভূয়োদর্শনের প্রকাশও যে কত …ী এবং সুখপাঠ্য হতে পারে স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও …' গ্রন্থ তার পরিচয় বহন করছে। প্রাচ্য ও …্য দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বোঝাবার জন্যে স্বামীজী ধর্ম, জাতিতত্ত্ব, পোশাক, আহার-পানীয়, রীতিনীতি, ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে দুই দেশের বৈশিষ্ট্যের …র আলোচনা করেছেন। এ ভাষার নমুনাও …। "ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে বেঁচে থাকব। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। …পের সভ্যতার উপায়—তলোয়ার, আর্যের উপায় …াগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; …বর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা …র জন্য।"

…াধুভাষায় লেখা গদ্যের নিদর্শন হিসাবে স্বামীজীর …ান ভারত' উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে স্বামীজী …জাতির উত্থান-পতনের সামাজিক ইতিহাস রচনা …ছেন। চলিত ভাষায় লেখা না হলেও এই গদ্যরীতি আদৌ জটিল নয় নীচের উদ্ধৃতাংশই তার সাক্ষ্য।

"শূদ্রত্বের সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব …য়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ …তেছে, তাহা নহে, শূদ্র ধর্মকর্মের সহিত সর্বদেশের …রা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে, তাহারই …ভাসচ্ছটা পাশ্চাত্ত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত …তেছে।"

স্বামীজীর আর একটি মৌলিক গদ্যগ্রন্থ হল 'ভাববার …া'। এই গ্রন্থের ভাষা ভাব অনুযায়ী কোথাও চলিত …বার কোথাও বা সাধু তবে সে ভাষা কোথাও বিষয়-…কে আড়াল করে রাখে নি। পরন্তু মাঝে মাঝে মজার …হিনীর সমাবেশে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

স্বামীজীর বাংলা পত্রাবলী পত্রসাহিত্যের সম্পদরূপে …রিগণিত। ভাষাকে তিনি বরাবরই ভাবের বাহন …সাবেই দেখেছেন এবং ভাব ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে বিনা …ধায় যুগপৎ সাধু ও চলিত ভাষাও ব্যবহার করেছেন। …ার ফলে বক্তব্য হয়ে উঠেছে সতেজ এবং সুস্পষ্ট। একটি চিঠির খানিকটা উদ্ধৃত করা হল তাঁর চিঠির ভাষার নমুনা হিসাবে।

"যে বীর সেই ত্যাগ করতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুছছে আর এক হাতে দান করছে; তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্ন করতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হতে পারে।"

এবার স্বামীজীর কবিতার প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলা ছাড়া ইংরেজীতেও কবিতা লিখেছেন তিনি। আমাদের আলোচ্য 'বীরবাণী'র কবিতাগুলি বাংলায় লেখা। স্বামীজীর কবিতা আলোচনার প্রারম্ভে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এগুলিকে সাধারণ কবিতা হিসাবে দেখা চলে না কারণ শুধু কবিতা লেখার তাগিদেই এগুলি রচিত হয় নি। অন্তরের যে গভীর ভাবচিন্তা প্রায়শঃই গদ্যে প্রকাশ পেয়েছে, মাঝে মাঝে তাই উদ্বেলিত হয়েছে ছন্দোবদ্ধ কবিতার আকারে। কাব্যের নামকরণেও এই ইঙ্গিত লক্ষণীয়। এই ধরনের কবিতা হিসাবে 'সখার প্রতি', 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' 'সাগরবক্ষে' প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য। 'সখার প্রতি' কবিতায় স্বামীজী তাঁর জীবন-উপলব্ধি ছন্দে রূপায়িত করেছেন। দুঃখসুখের চিরন্তন আবর্তনের উল্লেখ এবং পরিশেষে জীবসেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরসেবার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই কবিতায়। স্বামীজীর ভাষায়:

"ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সেজন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখসুখ করে আবর্তন।

* * *

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটিতে জীবনের কোমল-কঠিন, ভয়াল-মধুর ভাব-সংঘাতের বলিষ্ঠ রূপায়ণ দেখা যায়। এই কবিতাটির সঙ্গে ইংরেজীতে লেখা 'Kali

Mother' কবিতাটি তুলনীয়। 'সাগরবক্ষে' ত্য সভ্যতার সংঘাতক্ষুব্ধ রূপের তুলনায় ভারতীয় ার শান্ত রূপচিন্তাই প্রতিফলিত। স্বামীজীর ।:

"......ভারত
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন।"

অধীতী স্বামীজী তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে শুধু নানা াস্ত্রই নয়, দেশবিদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। মাঝে মাঝে শিষ্যদের সঙ্গে াচনাকালে তাঁর এই গভীর অধ্যয়নের কিছু কিছু য় পাওয়া গেছে। 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে এই ার আলোচনাসূত্রে স্বামীজীর সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি খুবই মূল্যবান। এই আলোচনা জানা যায়, মধুসূদনের প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ছিল ীর। মধুসূদনকে তিনি বলেছেন 'জিনিয়াস' এবং াদবধ কাব্য' সম্বন্ধে বলেছেন যে, "মেঘনাদবধের মত ীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র রোপেও অমন একখানা কাব্য পাওয়া ইদানীং দুর্লভ।" নাকি আরও বলেন যে, "এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা দের বাংলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে ! 'ছুঁচোবধ কাব্য' লেখা হল! তা যত পারিস্ লেখ্‌ —তাতে কি। সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও াচলের মত অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সেই সব criticদের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে। মাইকেল নতুন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণে কি বুঝবে?"

মেঘনাদবধ কাব্য নিয়ে আলোচনা এখানেই শেষ হয় নি। এই কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ সম্বন্ধে স্বামীজীও স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে "যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে. শোকে মুহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোদ্যত—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা।" মধুসূদনের কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই মন্তব্য শুধু যে মূল্যবান তা নয়, এ থেকে তাঁর সাহিত্যপ্রীতি, সাহিত্যাদর্শ, রসবোধ এবং জীবনাদর্শের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বামীজী বাংলায় অনেক লেখেন নি সত্য, কিন্তু যেটুকু লিখেছেন তার মধ্যে ফুটে উঠেছে গদ্যের বৈচিত্র্যহীনতা, শৈথিল্য এবং অস্পষ্টতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ। তাঁর ভাষা যেন সাফ ইস্পাত—যেদিকে খুশি ফিরিয়ে নিজের ভাব-চিন্তা প্রকাশক্ষম করে তুলেছেন। স্বামীজী যে কথ্যভাষার সমর্থনে বোধ হয় প্রথম জোরাল অভিমত প্রকাশ করেছেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সেই কথ্যভাষাকে সমুন্নতির সুউচ্চ চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন সত্য, তবু সে যুগে কথ্যভাষায় সার্থক সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে স্বামীজীর মর্যাদা বাংলা-সাহিত্যে আজও অম্লান রয়েছে। সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের এমন অভিব্যক্তি শুধু বাংলা কেন, সব দেশের সাহিত্যেই সুলভ নয়।

•
• •

চুলের সৌন্দর্য
তেলের অপচয়ে নয়
— যত্নে
চুলের যৌবনে ভাঁটা পড়লে অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই
আসলে চুল সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেরই একটা প্রচ্ছন্ন ঔদাসীন্য আছে।
কোন রকমে একটু তেল মাথায় দিয়ে চট্ করে স্নানের পাট চোকাবার
দিকেই আগ্রহটা বেশী। এতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চুলের
যত্নের চেয়ে তেলের অপচয়টাই বেশী হয়।
তেল চুলের প্রধান
খাদ্য তাই অন্ততঃ দশ মিনিট
চুলের গোড়াগুলিতে তেল বেশ ভাল
করে মালিশ করা উচিত। সামান্য
একটু যত্নে চুলের সৌন্দর্য যে
কত বর্ধিত হতে পারে, তা কিছুদিন
ধরে নিয়ে জবাকুসুম তেল ব্যবহার
করলেই বুঝতে পারবেন।
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

তারার আলো

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব যথা-সম্ভব ও ক্ষেত্রবিশেষে যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে যাদের নিজের দেশে এবং দেশের বাইরে উদযাপিত চ্ছে। খবরের কাগজে সে সংবাদ পড়ছি, এক-আধটি জিত উৎসব অঙ্গন দূর থেকে যেতে যেতে চোখেও ড়েছে। দূর থেকেই দেখেছি। স্বামী বিবেকানন্দ হান পুরুষ, বিরাট মানুষ; প্রচলিত সংস্কার থেকেই সম্ভ্রম শ্রদ্ধা চিত্তে উদ্রিক্ত হয়েছে। শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে য়, সশ্রদ্ধ হতে হয়, না হলে—না হলে কি হয়? পাপ য়? পাপে তো আজ বিশ্বাস নেই মানুষের। অন্যায় য়। সেই অন্যায় না করবার জন্যেই মনকে সশ্রদ্ধ করে তুলেছি।

এ নিয়ে কখনও ভাবি নি এর আগে। আজ ভাবছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নব-জাগরণের দিনে যে জীবন-প্রবাহ ঈশ্বর-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়েছিল শুধু নয়, ঈশ্বর-বিশ্বাসের গঙ্গোত্রী থেকেই উৎসারিত হয়েছিল তা আজও একশো বছর পরেও দেশের শেষতম মানুষটির জীবনের চিন্তার ও ভাবনার তটপ্রান্তে গিয়ে প্রতিঘাত করতে পারে নি, এ কথা মর্মান্তিক হলেও সত্য। এ প্রবাহ দেশের শিক্ষিত মানুষের জীবনেই সাড়া তুলেছিল। সে সাড়ার পরিমাণ অবশ্য অনুমান করতে পারি না। হয়তো লৌকিক মানুষ, যারা প্রতিদিনের সুখদুঃখের আস্বাদেই পরিতৃপ্ত এবং বিপর্যস্ত, তাদের যতটুকু বিচলিত, চঞ্চল, চিন্তিত ও ভাবিত করে তোলা সম্ভব ততটুকুই করেছিল; তার বেশী করে নি।

কিন্তু এ ভাবনায় একটা মিল ছিল, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমগ্র জাতির মূলে। আজ আমরা যে সংজ্ঞায় শিক্ষিত অশিক্ষিত বলে মানুষকে চিহ্নিত করি সে সংজ্ঞা খুব বেশীদিনের নয়। তার বয়স আর এই নব-জাগরণের বয়স বোধ হয় এক। সেই সংজ্ঞায় দেশের অতি বৃহৎ অংশ, যারা নগর থেকে উৎসারিত প্রায় সমস্ত ভাবনা সম্পর্কে এই সেদিন পর্যন্ত নিরুৎসুক ও উদাসীন ছিল, তারা অশিক্ষিতের বেশী কিছু নয়; যে সাধারণ মান পর্যন্ত পৌঁছলে শিক্ষিত বলে তারা চিহ্নিত হতে পারত সে মানটুকু পর্যন্ত তারা পৌঁছয় নি, পৌঁছতে পারে নি, পৌঁছবার সুযোগ পায় নি; হয়তো বা পৌঁছতে চায় নি। তবু মিল একটা ছিল। যে বন্যায় দক্ষিণেশ্বর ভেসে গিয়ে কলকাতা সেদিন ডুবু-ডুবু হয়েছিল তার ঢেউ সমস্ত দেশে না পৌঁছলেও সেই বন্যার জলধারার আস্বাদ অশিক্ষার ঊষর-প্রান্তবাসী মানুষের অপরিচিত নয়। এ জলকে তারা তাদের বহু প্রাচীন নদীর জলে, পুকুরের জলে, ঝরনার ক্ষীণ ধারায় বার বার আস্বাদ করেছে। সেই চিন্তাই মৃৎপাত্রে সঞ্চিত জলে কুটিরবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ করার মতই অশিক্ষিত ব্রাত্য মানুষের চিত্তপাত্রে সঞ্চিত থেকে তার জীবনে বিশ্বাস সঞ্চার করেছে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রবাহটিকে এই দেশে কালে কালে বার বার ছোট বড় সাধকেরা নিজের মত করে প্রবাহিত করেছেন এ দেশের মানুষের কাছে। সেই থেকেই চিন্তা ও বিশ্বাস গ্রহণ করে তারা নিজের চিত্তকে অচ্ছিন্নভাবে ধ্রুব রাখতে পেরেছে। কাজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর এই নূতন জীবন-প্রবাহকে যদি দেশের অশিক্ষিত শেষতম মানুষটির হৃদয়-প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া যেত তাহলে তারা তা অতি পরিচিত বলেই গ্রহণ করতে পারত অসংশয়ে। কিন্তু—ঊনবিংশ শতাব্দীর নবীন শিক্ষা জাতির জীবনে চলেছিল মন্থর পদক্ষেপে। সেই শিক্ষা তার আলো দিয়ে জাতির অর্ধাংশকেও আজ পর্যন্ত আলোকিত করতে পারে নি।

সেদিন যাঁরা দেশের মধ্যে শিক্ষিত, যাঁরা নবীন বিদ্যার শক্তিতে তখন শক্তিমান, তাঁদের এক অতি বৃহৎ উজ্জ্বল অংশ ওই ঈশ্বর-বিশ্বাস-কেন্দ্রিক জীবনে অবগাহন করে নিজেদের ধন্য মেনেছিলেন, আর এক অংশ অতখানি না হলেও, পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে বুককরে সমাদর জানিয়েছিলেন

নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে মিল পেয়ে, মিলিয়ে দেখে। আর এক অংশ এ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। আজ শিক্ষিতের মধ্যে প্রথম দুই ধারার মানুষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটলেও তাদের পরিমাণ সামান্যই। ওই শেষ ধারার মানুষরাই আজ সংখ্যায় বেড়ে সংখ্যাহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই একশো বছরের মধ্যে যা ধাপে ধাপে শিক্ষিত মানুষের মধ্য থেকে ক্ষয়ে গিয়েছে তা হল ঈশ্বর-বিশ্বাস। কেমন করে গেল তার হিসেব কঠিন এবং জটিল। তবু দু-এক কথায় তার মূল চিহ্নকে একবার দেখা যেতে পারে। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে সর্বযজ্ঞেশ্বর হরিকে তার মধ্যে স্থাপন করা হয় নি। তবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে বাংলাদেশের হৃদয় হতে চিন্ময়ী মাকে বাইরে রূপ ধরে দাঁড়াবার মূর্তিতে আবাহন জানানো হয়েছিল। তার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশের মৃন্ময়ী রূপের মধ্যে চিন্ময়ীকে ধ্যান করেছেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গীতা ও সন্ন্যাস কখনও সূক্ষ্ম কখনও স্থূলভাবে, কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে।

প্রথম ধাক্কা এল প্রথম মহাযুদ্ধে। ব্যাপারটা তখনও ঠিক অনুভব করা যায় নি। কারণ সেই একই সময়ে ঈশ্বরবাদী রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাব্য রচনা করে সমগ্র বিশ্বে সম্মানিত হয়েছেন। এবং তারই এক-দেড় দশক আগে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ভারতীয় আস্তিক্যবাদী বিশ্বাসের জয়ধ্বজা উড়িয়ে এসেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুকাল পরেই গান্ধীজী এসে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের পুরোধা হয়ে একটি বিচিত্র আস্তিক্যবোধকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মর্মমূলে স্থাপন করলেন। সেই আস্তিক্যবাদী নীতিবোধ ভারতের সনাতন সর্বযজ্ঞেশ্বর হরিরই আর এক রূপ মাত্র। সেই বোধই গান্ধীজী পরিচালিত উনিশ শো একুশ থেকে উনিশ শো চৌত্রিশ পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর আন্দোলন কোথাও সে বোধ থেকে ভ্রষ্ট হয় নি।

কিন্তু এই-ই একমাত্র কথা নয়। ভারতে ইংরেজের বাণিজ্যের সম্প্রসারণ কলকারখানা স্থাপনের মারফতে এক শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করে তাকে সম্প্রসারিত করে চলল ধীরে ধীরে। শিল্প-বাণিজ্যের আওতায় নূতন সমৃদ্ধিই শুধু গড়ে উঠল না, তার সঙ্গে এক নূতন বোধ, নূতন বিশ্বাস নবীন কালের শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভারতে প্রাচীন বিশ্বাস ও সনাতন জীবনের উপর ছায়া ফেল[illegible] গান্ধীজীর আন্দোলনের পরোক্ষ ফলস্বরূপ এবং ইতিহাসে অমোঘ বিধানে কলকাতা, বোম্বাই ও আমেদাবাদে নূত[illegible] শিল্প ব্যাপক আকারে গড়ে উঠতে লাগল। তারই স[illegible] গড়ে উঠতে লাগল নূতন বিশ্বাস ও নূতন জীবন। [illegible] জীবন ও বিশ্বাস সনাতন ভারতীয় জীবনের বিরুদ্ধ বিশ্বা[illegible] কি না জানি না, তবে [illegible] বিশ্বাস ও সে বিশ্বাসে আসমা[illegible] জমিন তফাত।

তারপর এই একই কালে বিশ্ববাজারের মন্দার ধা[illegible] ভারতবর্ষের শিল্পজগৎও পেয়েছে। তারই পিছনে পিছ[illegible] এসেছে অর্থনৈতিক সমাজচিন্তা। মানুষ বুঝতে শিখ[illegible] ঈশ্বর জীবনকে পরিচালিত করছেন না, করছে শিল্প[illegible] বাণিজ্য যার পিছনে আছে রজতচক্রের খেলা। ঈশ্বরে[illegible] জায়গায় শিল্প ও মুদ্রা এসে বসল আসর জাঁকিয়ে[illegible] তারই সঙ্গে সঙ্গে এল মার্কস্ আর ফ্রয়েডের যুগান্তকা[illegible] চিন্তা। এই নূতন ধারণা ও চিন্তার ধাক্কায় পুরনো বিশ্বা[illegible] ভেঙে গেল।

ভেঙে গেল বলা বোধ হয় ভুল হল। আজ যাঁর[illegible] বৃদ্ধ, যাঁদের বয়স ষাটের বেশী বা ষাটের কাছাকাছি[illegible] তাঁরা একটা বিশ্বাসের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁদের[illegible] অনেকের হয়তো সে বিশ্বাস ভেঙে গেলেও গিয়ে থাকতে[illegible] পারে। কিন্তু যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশের নীচে তাঁরা যে[illegible] কোন বিশ্বাসই পান নি। কোন প্রত্যয়, তা সে ভুল হোক বা ঠিক হোক, কোন কিছুর উপরেই দাঁড়িয়ে[illegible] জীবনের চিন্তাকে ও ভাবনাকে গড়ন দেবার সুযোগ তো[illegible] তাঁদের আসে নি।

এঁরা কোন্ চোখে দেখবেন স্বামী বিবেকানন্দকে?

একশো বছরের এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ও প্রান্তকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে এ কালের মানুষ? হয়তো এক বিচিত্র উদাসীনতায় সে দৃষ্টি স্তিমিত। হয়তো কিছু শ্রদ্ধা আছে, হয়তো নেই। যদি নাই থাকে তবে নামটি স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে উদাসীন হৃদয় নিজেকে শ্রদ্ধাশীল করবার চেষ্টা করে। হয়তো পারে। সেও একমুহূর্তের জন্য। যদি না পারে সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত অন্য কোন সাময়িক প্রত্যক্ষ কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে সম্পর্কে আবার উদাসীন হয়ে ওঠে।

এই কি ইতিহাসের অমোঘ বিধান?

বিগত কালের ইতিহাসের এক প্রাণপুরুষ পরবর্তীর শুধু কি একটি নাম?

২

নাম ছাড়া আর কি?

আজ সভায় সভায় বক্তারা সশ্রদ্ধভাবে স্বামীজী র্কে বক্তৃতা করছেন, শ্রোতারা শুনছে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প সভায় হাজার হাজার শ্রোতার সঙ্গী হয়ে। বক্তা বলছেন, স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হও তখন ন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি সে কথা উচ্চারণ ন, শ্রোতারাও সে কথা বিশ্বাস করে সেই পথে হবার কল্পনা করছে। কিন্তু সে কল্পনা আকাশ-! সভা থেকে বেরিয়ে এসেই উনিশ শো তেষট্টি র নাগরিক জীবনের অংশীদার বক্তা উনিশ শো ট সালের প্রত্যক্ষ জীবনস্রোতের মধ্যে জলবিন্দুর মত য়ে গিয়ে সে কথা ভুলে গেলেন। শ্রোতারাও তাই। আজ ষাটের উপর যাঁদের বয়স এবং যাঁরা স্বামীজীকে কভাবে দেখেছেন অথবা যাঁরা স্বামীজীর প্রবর্তিত দায়ভুক্ত বা ওই চিন্তায় ও ভাবনায় দীক্ষিত তাঁদের স্বতন্ত্র। স্বামীজীর কথা তাঁদের মস্তিষ্কে চিন্তার ও নার প্রবাহকেই শুধু উদ্দীপ্ততর করে তুলবে না, জীর নাম, বাণী ও আদর্শ তাঁদের চিত্তে বিশিষ্ট বেগের সৃষ্টি করবে। কিন্তু তাঁরা দেশের জনসংখ্যার সামান্য অংশমাত্র। মহৎ মানুষেরা ও তাঁদের চিন্তা ভাবেই পরবর্তীকালের জীবনে সক্রিয় থাকে।

সেই সঙ্গে আর একটু আছে।

উনিশ শো পাঁচ থেকে উনিশ শো পনেরো সনে যাঁরা ছিলেন, কিশোর ছিলেন তাঁদের হৃদয়ের সন্ধান যদি নেন তাহলে জানতে পারবেন স্বামীজী তখন প্রায় টি আদর্শবাদী বাঙালী তরুণের স্বপ্ন ছিলেন, আদর্শ ম। অমনি ধরনের দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী হবার স্বপ্ন ম অনেক তরুণই দেখেছেন।

কিন্তু এইখানেই কি এর শেষ? আর কোথাও তাঁর ও প্রভাব নেই?

আছে। গবেষক যখন উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা, সাধনা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে জানবার জন্যে আগ্রহশীল হয়ে হাত বাড়াবেন তখন রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গেই স্বামীজীর রচনায় হাত দিতে হবে। হাত দিলে তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুভব করবেন এই বিপুল প্রোজ্জ্বল প্রাণটি কতখানি ভালবাসতেন নিজের দেশকে, নিজের সংস্কৃতিকে। নিজের প্রাচীন সংস্কৃতির মর্মার্থ তিনি কেমন ভাবে নিজের বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেছেন। সমস্ত প্রাচীন সংস্কারের জড়ত্বকে তিনি কি প্রবল তেজে ও কি অমিত বিক্রমে আঘাত করেছেন। লৌকিক জীবনের প্রতিটি অন্যায় অবিচারকে কি প্রবল ধিক্কার দিয়েছেন এবং দূর করতে চেয়েছেন। মানুষের প্রতি কি গভীর প্রগাঢ় প্রেম। ভিক্ষুক ও চণ্ডালকে ভাই বলে গ্রহণ করবার জন্যে বজ্র নিনাদ করেছেন।

সাহিত্য-সমালোচক যদি তাঁর রচনার দিকে তাকান তবে দেখতে পাবেন কি আন্তরিক, প্রাণবান, প্রবল, সহজ গদ্য এই সন্ন্যাসীর কলম প্রকাশ করেছে। তাঁর কথ্য-ভাষায় কি গাম্ভীর্য অথচ তা কি বেগবান, সরল। একেবারে সোজা তীরের মত গিয়ে পাঠকের অন্তরে আঘাত করে। পাঠক সেখানে পাঠক থাকে না, বক্তার সম্মুখস্থ শ্রোতার আসনে সে বসে আছে বলে অনুভব করে। যিনি বাংলা গদ্যরীতি আয়ত্ত করতে চান তাঁকে এই রচনার দ্বারস্থ হতে হবেই।

কিন্তু এহ বাহ্য।

এ সব বাইরের কথা। মানুষ—একজন নয়—হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন জীবনে চলতে গিয়ে নিজের অন্তরে অন্তরে অনুভব করে যে স্বপ্ন তার অন্তরে পাখা মেলে ইচ্ছার রূপান্তর গ্রহণ করবার তপস্যা করছিল তার দুটি পাখাই প্রতিকূল পরিবেশের ঝড়ে ও নিজের দুর্বলতার বর্ষণে ভেঙে পড়ল, ডানা-ভাঙা স্বপ্ন লুটিয়ে পড়ল বুকের ভিতরেই; স্বপ্নের মৃত্যু ঘটল। আবার কোথাও যদি বা স্বপ্ন ইচ্ছার পাখা মেলে বুকের মধ্যে পাখসাট মেরে উড়ল সে আর মনের খাঁচা ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে কর্মে রূপান্তরিত হয়ে উড়তে পারল না। মানুষের নিজের ভিতরের সংখ্যাহীন বন্ধন, ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা এবং বাইরের পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তের প্রতিকূলতা স্বপ্নের ডিম থেকে

ইচ্ছার শাবককে প্রকাশিত হতে দিলে না। যদি না দিলে সে চিরকাল ইচ্ছা হয়েই মানুষের মনের খাঁচায় পাখা ঝাপটে ম'ল, বাইরের কর্মের আকাশে আর উড়তে পেলে না। তার জন্তে মানুষের বেদনার কি অন্ত আছে! মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর বোধ হয় নেই।

কিন্তু স্বামীজী ভিন্ন জাতের মানুষ। ওঁর ভিতরে শক্তি যেন যথে কথা বলতে চেয়েছিল। ওঁর জীবনে বস্তু ভিন্ন প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে কোন্ প্রাক্তন জন্মবিদ্যার বলে এক মুহূর্তে তরুণ গরুড়ের মত ইচ্ছার শাবকত্বকে অতিক্রম করে কর্মের উদার আকাশে আপনার আনন্দময় বিচরণ আরম্ভ করত। নিজের ভিতরের কোন বন্ধন কোন দুর্বলতা তাঁর বক্ষকে বোধ হয় বাঁধতে পারে নি। জড়ত্বহীন চিত্তের সব দুর্বলতাকে এক মুহূর্তে তিনি ছেদন করতে পারতেন। বাইরের কোন প্রতিকূলতাই তাঁর কাছে প্রতিকূলতা বলে দাঁড়াত না। মনুষ্য-চরিত্রের এই দ্বিধাহীন নির্মল প্রকাশ ইতিহাসে বড় একটা ঘটে না। তবু ঘটে মধ্যে মধ্যে। সেই আশ্চর্য, বিচিত্র সংঘটনের মত স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র এক শতাব্দীর পারেও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; বহু শতাব্দীর পারেও আজকের মতই দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনার সুনির্মল প্রকাশের পথে দ্বিধা ও বাধার যন্ত্রণায় পীড়িত কোন মানুষ যদি নিজের প্রকাশের পথকে সহজ করতে একটি সুনির্মল দ্বিধাহীন, বাধাবন্ধহীন প্রকাশের স্বরূপ খুঁজে ফেরে তবে এক মুহূর্তে এই মনুষ্য চরিত্রের এই আশ্চর্য প্রোজ্জ্বল প্রকাশটি তার চোখে পড়বে। নিজের অন্তরের দ্বিধা, বাইরের বাধা দুইয়ের সঙ্গেই সংগ্রাম করবার নূতন শক্তি পাবে। অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণকে দেখে সম্পূর্ণ হবার পথে অসংশয় চিত্তে তীর্থযাত্রা করতে পারবে।

এই তো অনেক! কিন্তু এই কি শেষ?

না, শেষ নয়, আরও একটু আছে।

আর যদি কোন মানুষ নিজের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অত্যন্ত অভিজ্ঞতার চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ থাকতে থাকতে একদিন নিশীথ রাত্রিতে বাপ মা স্ত্রী পুত্র ভাই বোন-পরিবৃত সংসারে, তাদের মধ্যেই সুখ-শয্যায় শয়ান থেকে নিজেকে অকস্মাৎ অত্যন্ত একাকী অনুভব করে, যদি সমস্ত অভ্যস্ত অভিজ্ঞতা তার কাছে তুচ্ছ তিক্ত মনে হয়, যদি জীবনের অর্থের তৃষ্ণায় নিজেকে জন্ম-জন্মান্তরের উপবাসী ও তৃষ্ণার্ত মনে হয়, যদি সেই যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে একা সে সেই নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে নিজের সব অভিজ্ঞতা, নিজের পরিচিত পরিবেশ, নিজের আত্মীয় সকলকে পরিত্যাগ করে চার দেওয়ালের বাইরে এসে মধ্যরাত্রির নীরব জনহীন অন্ধকার পৃথিবীতে সেই অর্থ-জিজ্ঞাসার প্রচণ্ড-পীড়ায় পীড়িত হয়ে আকাশের তলায় এসে দাঁড়ায় তখন পথভ্রান্তের বিহ্বলতা নিয়ে সে যখ-জনহীন পৃথিবীতে অন্ধকারের মধ্যে অর্থের ও পথের সঙ্কেত খুঁজবে তখন খুঁজতে খুঁজতে, ফিরতে ফিরতে, হোঁচট খেতে খেতে একসময় সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবে অন্তহীন পরিমাপহীন শূন্যমণ্ডলে কটি তারা সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলোর চোখ মিট মিট করছে। আরও একটু ভাল করে তাকালেই সে দেখতে পাবে ওই আলো শুধু অর্থহীন ভাবে আলোর চোখ বন্ধ করছে আর খুলছে না; ওরই মধ্যে যেন কোন্ ইঙ্গিত আছে। আরও একটু ভাল করে দেখলেই তার বিহ্বলতা কাটবে, ওই আলোর ক্ষীণ দ্যুতির অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হবে। সে বুঝতে পারবে বহু আলোকবর্ষের ওপার থেকে ওই আলো তাকে ডেকে বলছে—এই সামান্য আলোর শিখাকে সম্বল করেই দিকচিহ্নহীন যাত্রায় যাত্রী হতে হবে তোমাকে। এর চেয়ে বেশী আলো কেউ পায় না কোনদিন এ যাত্রায়। যাত্রী, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে যাত্রা কর, চল। চলতে চলতে তুমি দেখতে পাবে নিজের চলার আলো তুমি নিজের মধ্য থেকেই পাচ্ছ। তুমি চল, আমি তোমার সঙ্গে আছি।

এ যাত্রার তৃষ্ণা যতদিন থাকবে, ওই তারার আলো ততদিন অনির্বাণ জ্বলবে। বহু তারার একটি তারা হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ততদিন অপেক্ষা করবেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য

উত্তর-ভারত পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

সাত

গৃধ্রকূট পর্বত থেকে আমরা মনিয়ার মঠে গেলুম। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়ে এই স্থানটি আবিষ্কার করেছে। ইঁটের গাঁথুনি দেওয়া একটি গোলাকার প্রায় ঘর, উপরে করুগেটেড লোহার শীটের ছাদ। আশেপাশে বাঁধানো চত্বর আছে সিঁড়ি-দেওয়া। পুরাকালে এও একটা বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তার প্রমাণ নেই। জানা গেছে যে কিছুদিন পূর্বে এর উপর জৈনদের মনিয়ার মঠ ছিল। সেটা ভেঙে এই সব বার করতে হয়েছে। মাটির নীচে আরও অনেক কিছু এখনও আছে। কালে হয়তো তাও খুঁড়ে বার করা হবে।

মনিয়ার মঠ নাম কেন হল, এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে। একটা সন্তোষজনক অনুমানও করা হয়েছে। মাটি খুঁড়ে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রধান হল নানা আকার ও আকৃতির মাটির পাত্র। কোনটি কলস কোনটি বা ভৃঙ্গারের মত। কিন্তু সবগুলির চারিদিকে অনেকগুলি করে মুখ। এই মুখগুলিও নানা আকৃতির। শঙ্খ প্রদীপ প্রভৃতির আকৃতিই নয়, কোনটি বা সাপের ফনার মত। এমন পাত্রও পাওয়া গেছে যা এখনও বাংলা দেশে মনসা পূজায় ব্যবহৃত হয়। এ সবের কিছু নমুনা নালন্দার জাদুঘরে আছে, তার ভাঙা পাত্রগুলি মঠেরই এক জায়গায় ছড়ানো আছে।

যে মূর্তিগুলি এখানে পাওয়া গিয়েছিল, তা এখনও দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়মে আছে। তার মধ্যে কয়েকটির নীচে ব্রাহ্মীলিপিতে পরিচয় লেখা ছিল। মণিনাগ, ভগিনী সুমাগধী, ইত্যাদি। মণিনাগের উল্লেখ আছে মহাভারতে গিরিব্রজের বর্ণনায়।—

স্বস্তিকস্যালয়শ্চাত্র মণিনাগস্য চোত্তমঃ।

এইখানে ছিল স্বস্তিক নাগ ও মণিনাগের উত্তম আলয়। তারপর পালি গ্রন্থে দেখি মণিভদ্রযক্ষের মন্দির মণিমালা চৈত্য। মনে হয়, এই সমস্ত শব্দ থেকেই মনিয়ার নামের উৎপত্তি হয়েছে।

আমরা যখন পশ্চিমে বৈভার পাহাড়ের গায়ে শোন-ভাণ্ডার গুহা দেখবার জন্য অগ্রসর হলুম, তখন এক্কা-ওয়ালা বলল: এই মনিয়ার মঠের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে, কিন্তু আসল কথাটা কেউ জানে না।

সে কী?

ঠিক কথা বাবু, এই জায়গায় বিম্বিসার রাজার মাটির জিনিস তৈরি হয়ে পোড়ানো হত। রাজার ব্যবহারের জন্যে নানা ফ্যাশনের জিনিস তৈরি হত।

সবাই হেসে উঠেছিল, কিন্তু আমি হাসি নি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল: আমি তো শুধু মূর্খ মানুষ, আপনাদের কথা শুনেই আপনাদের বলি। যে কথাটা আমার মনে ধরেছে, তাই বললাম।

জিজ্ঞাসা করলুম: আর কিছু শোন নি?

শুনেছি। মনিয়ার মঠকে অনেকে নির্মল কূয়া বলেন। পূজার পর নির্মাল্য এখানে ফেলা হত।

বন্ধুরা আবার হেসে উঠল।

শোনভাণ্ডারকে অনেকে বলেন স্বর্ণ ভাণ্ডার। জরাসন্ধের ধনাগার। সাধারণ লোকের ধারণা যে অনেক ধনরত্ন এই গুহার পিছনে এখনও লুকানো আছে। পাহাড়ের ভিতর কোথায় সেই গুপ্তধন, তার সন্ধান কারও জানা নেই, কেউ তা বার করতে পারে নি।

পাহাড়ের নিকটে এসে আমরা এক্কা থেকে নামলুম। সামনেই সেই গুহা। একটা নয়, দুটো। পাশাপাশি। পশ্চিমের গুহায় জানলা আছে, দরজাও আছে, পূর্বেরটার

ম মাটিতে ধ্বসে পড়েছে। একাওয়ালা আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল, বলল : সাহেবরা কামান দেগে পাহাড়ের ধনরত্ন উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল। তাতে ছাদটাই শুধু ভেঙে পড়েছে, কিন্তু ভিতরে ঢোকবার পথ পাওয়া যায় নি।

সত্যি নাকি?

সত্যি নয়! জরাসন্ধ যত রাজাকে জয় করে এইখানে এনে জেল খাটিয়েছে। তাদের ধনরত্ন সব গেল কোথায়! সবই এই পাহাড়ের মধ্যে লুকানো আছে। আর ওইখানে যে পাথরের উপর লেখা দেখলাম, ওতেই সবকিছু লেখা আছে। বত্রিশটা লিপি। যে পড়তে পারবে সে রাজা হয়ে যাবে।

পড়বার চেষ্টা কেউ করে না?

শুনেছি, সাহেবরা খুব চেষ্টা করেছে। আমাদের দেশী পণ্ডিতদের ধরে এনে পড়তে বলেছে। কিন্তু কেউ পারে নি।

গুহার ভিতরে দরজার সামনেই আমরা একটি ত্রিকোণ পাথরের খণ্ড দেখতে পেলুম। এই পাথরের তিন দিকেই তিনটি মূর্তি। মনে হল, জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। দেওয়ালেও কিছু শিলালিপি দেখলুম।

আমার মনে হল যে গুহার ছাদটি আপনা-আপনি ভেঙে পড়েছে। অন্যটার ছাদেও ফাটল আছে। পাহাড়ের এই অংশটি বোধ হয় মূল পাহাড় থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন। তাই তেমন মজবুত নয়। কালের ওজন বেশীদিন বহন করতে পারে নি।

এখানে আমরা আরও অনেক যাত্রীকে দেখলুম। অনেক পুরুষ ও নারী। সবাই বড় আগ্রহ নিয়ে সবকিছু দেখছেন। একজন বললেন : এটি বিম্বিসারের ধনাগার ছিল।

তার প্রমাণ কী?

এর ব্যবস্থা দেখছ না, এ যুগের কাউন্টারের মত ব্যবস্থা। এইখান থেকে লোকে পয়সাকড়ি পেত, কিংবা প্রজারা খাজনা দিত।

তাতে বিম্বিসারের কেন নাম আসছে?

এখানকার সবই তো বিম্বিসারের কীর্তি। তার বংশধরেরা গিয়েছিল পাটলিপুত্র।

আমরা আবার একায় বসলুম। আকাশের সূর্য তখন পশ্চিমে হেলেছে। রৌদ্রে আর উত্তাপ নেই। শুধু আলো আছে। একজন বন্ধু বলল : ফের এবারে।

আমরা যে পথে এসেছিলুম, সেই পথেই ফিরলুম। দুপুরে সে ঘোড়াকে বেশী কষ্ট দেয় নি, আস্তে আস্তেই একা চালিয়েছিল। এবারে সে একা ছুটিয়ে সাতধারার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমরা যে পুলটা পেরলুম, শুনলুম, সেটি সরস্বতী নদীর পুল। শীর্ণ ধারার নদী, বর্ষায় স্ফীত হয়ে প্লাবন আনে বলেও মনে হল না। ধাপে ধাপে উপরে উঠে কুণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেল। যাত্রীরা যাতায়াত করছে। সকলেই স্নানার্থী। যত পুরুষ, মহিলাও তত। পরিবেশটি মনে হল তীর্থস্থানের মত।

আমাদের সঙ্গে কাপড় গামছা ছিল না বলে আমরা স্নান করলুম না। ঠিক হল যে পরে এসে স্নান করব। এই সব কুণ্ডে স্নানের একটা অভিজ্ঞতা আছে। কুণ্ড তো শীতল জলের নয়, জল উষ্ণ। গা সইয়ে স্নান করতে হয়। প্রথম দিনই যারা অনেকক্ষণ ধরে স্নান করবার চেষ্টা করেছে, তাদের অজ্ঞান হতেও দেখা গেছে। আবার যারা কায়দাটি শিখে দেখতে পেরেছে, তারা প্রতিদিন বারে বারে এসেছে স্নান করতে।

ঘুরে ঘুরে আমরা কুণ্ডগুলি দেখলুম। উষ্ণ প্রস্রবণের জল কোথা থেকে এসে জমছে তা দেখতে পাওয়া যায় না। তারপর নালা দিয়ে সেই জল নানা কুণ্ডে বিতরণ করা হচ্ছে। সপ্তর্ষি কুণ্ডেই সাতধারা, পাঁচটি পশ্চিম দিকে ও দক্ষিণ দিকে দুটি। নব্বুই ফুট দীর্ঘ ও আঠারো ফুট চওড়া একটি আয়তক্ষেত্রে জল জমে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয়, কিন্তু উপরে ছাদ নেই।

সপ্তর্ষি কুণ্ডের সামনেই ব্রহ্মকুণ্ড। বর্গক্ষেত্র। জল এখানে লোকের গলা পর্যন্ত। আরও দুটি কুণ্ড দেখলুম— কামাখ্যা কুণ্ড ও অনন্ত ঋষি কুণ্ড। মেয়েরা যেখানে স্নান করছে তার নাম ব্যাস কুণ্ড।

অনুসন্ধান করে জানলুম যে এই সব কুণ্ডের জলে লোহা সালফেট নাইট্রেট ও ক্লোরিন আছে। বাত পক্ষাঘাত ও চর্মরোগে উপকার হয়, পেটের গোলমালও সারে।

হঠাৎ আমার মনে হল, এই কুণ্ডের জলে স্নান করা মারাত্মক। কত চর্মরোগের রুগী যে সারাক্ষণ এই জলে স্নান করছে তার হিসেব নেই। জল নিশ্চয়ই বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে স্নান করলে আর রক্ষা থাকবে না। তবে একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম, কুণ্ডের থেকে উঠে কেউ গা মুছছেন না। আবার তাঁরা ধারার নীচে বসে স্নান করে নিচ্ছেন। চর্মরোগের ভয়েই বোধ হয় এই রীতি হয়েছে।

এইসব কুণ্ডের জল বয়ে গিয়ে সরস্বতী নদীতে পড়ছে।

বৈভার পাহাড়ে উঠবার বাসনা কারও ছিল না। এখন উপরে উঠলে সন্ধ্যার পূর্বে নামা যাবে না। অন্ধকারে উপরে থাকা নাকি নিরাপদ নয়।

শুনলুম উপরে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। প্রথমেই জরাসন্ধকা বৈঠক। অনেকে বলেন, এইটিই বৌদ্ধদের পিপ্পল গুহা বা পিপ্পলীভবন, খণ্ড খণ্ড পাথরে তৈরি প্রায় আশি ফুট লম্বা ও চওড়া একটি স্থান। মার্শাল সাহেব একে একটি প্রাগৈতিহাসিক ওয়াচ-টাওয়ার বলে মনে করেছিলেন।

তারপর জৈনদের কতকগুলি মন্দির। শিব মন্দিরও একটি আছে।

বিখ্যাত সপ্তপর্ণী গুহায় পৌঁছতে হলে অন্য পথে খানিকটা নীচে নামতে হবে। দুটি গুহা। সপ্তপর্ণী মানে ছাতিম গাছ। অনেকে বলে পালি ভাষায় এই সপ্তপর্ণী শব্দের মানে গৌরবময়। সত্যিই এই গুহার একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। বুদ্ধের নির্বাণের পর প্রথম বৌদ্ধধর্ম সভা এইখানে হয়েছিল। এইখানেই ত্রিপিটক রচিত হয়েছে। একটি গুহার ভিতরে নাকি সুড়ঙ্গ পথ আছে। কিন্তু তার শেষ কোথায় কেউ তা জানে না।

পাহাড়ের নীচের দিকে একটি ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে প্রথম বৌদ্ধধর্ম সভা সেইখানেই হয়েছিল। সেই জায়গাটির ইংরেজী নাম সপ্তপর্ণী হল।

হোটেলে ফেরার পথে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করল: রাজগীরে আর বোধ হয় কিছু বাকি রইল না।

পাহাড়ে ওঠাই তো বাকি রয়ে গেল।

থাক। আমি সমতলের কথা জানতে চাইছি। কি বে একাওয়ালা?

একাওয়ালা কোন উত্তর দিল না।

একজন বলল, জরাসন্ধের আখড়া বলে একটা জায়গা আছে শুনেছিলুম।

আখড়া, না বৈঠক? জরাসন্ধের বৈঠক তো ঐ পাহাড়ের উপরে।

একাওয়ালাকে প্রশ্ন করে জানা গেল, জরাসন্ধের আখড়া নামেও আর একটা জায়গা আছে শোনভাণ্ডার থেকে মাইলখানেক পশ্চিমে। তার অপর নাম রণভূমি। জরাসন্ধের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে।

তা সেখানে কেন নিয়ে গেলে না?

ভয়ে ভয়ে একাওয়ালা বলল: পায়ে হাঁটবার পথ আছে, ভাবলাম আপনারা যাবেন না।

আমি তখন জরাসন্ধের কথা ভাবছিলুম। সে যুগে জরাসন্ধের মত বীর মহাভারতে কম ছিলেন। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবার বাসনা করেন, তখন তাঁর অমিতবিক্রম জরাসন্ধের নাম প্রথম মনে আসে। মগধের এই রাজাকে জয় না করলে রাজসূয় যজ্ঞ অসম্ভব। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের শরণ নিলেন। কৃষ্ণ নিজেই জরাসন্ধকে ভয় পেতেন। লোকে বলে, কৃষ্ণ জরাসন্ধের ভয়েই মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকাবাসী হয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর অন্য উপায় ছিল না। জরাসন্ধ [illegible] আঠারো বার মথুরা আক্রমণ করে মথুরাবাসীকে উৎখাত করেছিলেন। এই শত্রুতার সঙ্গত কারণ ছিল।

জরাসন্ধের একটা জন্মবৃত্তান্ত আছে। মগধের রাজা বৃহদ্রথের দুই রানী ছিল, কিন্তু কোন সন্তান ছিল না। কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে তিনি বিবাহ করে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে দুজনের প্রতি তিনি সমান অনুরক্ত থাকবেন। একদিন রাজা সংবাদ পেলেন যে তপঃক্লান্ত ঋষি চণ্ড কৌশিক একটি আমগাছের নীচে বিশ্রাম করছেন। রাজা দুই রানীকে নিয়ে গিয়ে ঋষির সেবা করে তাঁর বর পেলেন। গাছ থেকে একটি আম ঋষির কোলে পড়েছিল। তিনি সেটি রাজার হাতে দিলেন। রাজা দুই স্ত্রীকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন। সেই আম খেয়ে দুই রানীর ছেলে হল, কিন্তু একটি ছেলেরই দুটি অংশ—এক পা, এক হাত, আধখানা করে শরীর। ক্ষুব্ধ দুঃখিত রাজা এই দুই অংশ রাজপ্রাসাদের বাইরে [illegible]

য়ে এক রাক্ষসী সেই দুই অংশ জোড়া দিয়ে জরাসন্ধকে বিত করে রাজার হাতে সমর্পণ করল।

এই জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির বিবাহ হয়েছিল কৃষ্ণের মাতুল কংসের সঙ্গে। কৃষ্ণ কংসকে বধ র জরাসন্ধের শত্রু হয়েছিলেন। জামাতাবধের সংবাদ য়ে জরাসন্ধ তাঁর গদা মাথার উপরে নিরানব্বই বার য়ে মথুরার দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। মথুরার যে নে ওই গদা এসে পড়েছিল তার নাম গদাবসান ক্ষেত্র। রপর তাঁর মথুরা আক্রমণ। একবার-দুবার নয়, চারো বার। কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য ভীম অর্জুনকে য় ব্রাহ্মণ বেশে গিরিব্রজে জরাসন্ধের কাছে এলেন। চক ব্রাহ্মণবেশী এই তিন শত্রুকে জরাসন্ধ সম্মান রছিলেন, কিন্তু সন্দেহ করেছিলেন তাঁদের হাতের চিহ্ন দেখে। তখন কৃষ্ণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে য়েছিলেন, যুদ্ধং দেহি। কিন্তু কার সঙ্গে যুদ্ধ? জরাসন্ধ লেন, যে সবচেয়ে শক্তিমান সেই ভীমের সঙ্গেই যুদ্ধ ক। কৃষ্ণ বললেন, যদি রক্ষা চাও তো বন্দী ক্ষত্রিয় দের তুমি মুক্তি দাও। জরাসন্ধ বললেন, আমি জয় । যাদের বন্দী করেছি ভয় পেয়ে তাদের মুক্ত করব

জরাসন্ধ তাঁর পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকের আদেশ লন। পুরোহিত এলেন রাজার স্বস্ত্যয়নে। তারপর জ্জা। পুরবাসী পুরুষ ও স্ত্রী সকলে সমবেত হল জনে। দুই বীরের মল্লযুদ্ধ শুরু হল। প্রকর্ষণ আকর্ষণ কর্ষণ ও বিকর্ষণে দুজনেই উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। কার্তিক সের প্রথম প্রতিপদ থেকে মাসের শেষ ত্রয়োদশী পর্যন্ত চাশ দিন দিবারাত্র যুদ্ধ হয়েছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধের া মহাভারতের সভাপর্বে লিপিবদ্ধ আছে। যুদ্ধে সন্ধকে ক্লান্ত দেখে কৃষ্ণ ভীমকে উত্তেজিত করলেন, লেন, এইবারে তোমার দৈববল দেখাও। ভীম অমনি সন্ধকে মাথার উপরে তুলে একশো বার ঘোরালেন পর মাটিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করে তাঁর দেহ দ্বিধাবিভক্ত লেন। গিরিব্রজের রণভূমিতে জরাসন্ধের মৃত্যু হল।

আট

সন্ধ্যাবেলায় উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে একটা নূতন অভিজ্ঞতা হল। শীতকালে যাঁরা গরম জলে স্নান করেন, তাঁরাও এত গরম জল ব্যবহার করেন না। এত গরম জল মাথায় ঢালার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এখানে সবাইকে দেখে আমরাও একে একে স্নান করলুম। প্রথমটায় একটু তাপ লেগেছিল, তারপর সয়ে গেল। একরকমের অদ্ভুত তৃপ্তি পেলুম স্নানের পর।

হোটেলে আমরা কোনরকমে রাত কাটালুম। এঁদো ঘর, তার উপর মশার অত্যাচার। এখানে যে ভাল থাকবার জায়গা আছে, পরে সে সংবাদ পেয়েছিলুম। বহু যাত্রীর থাকবার জন্য একটা ডরমিটারি তৈরি হয়েছে। বেণুবনের রেস্ট হাউস দোতলা বাড়ি। নীচের তলায় দুখানা ঘরের সুইট, আর উপর তলায় একখানা করে ঘর। একসঙ্গে এক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবার অনুমতি পাওয়া যায়। অনেকে আবার ইনস্পেকশন বাংলোতেও থাকেন, বিশেষ করে যাঁরা সরকারী কর্মচারী।

নালন্দায় কোন খাবারের ব্যবস্থা নেই। সেই কথা শুনে আমরা কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে নিলুম। সকালের চা খেয়ে বেরলুম নালন্দা দেখতে।

রাজগীর থেকে নালন্দার দূরত্ব মাইল সাতেক। ট্রেন আছে। সরকারী বাসও নিয়মিত যাতায়াত করছে। আমরা সকালের ট্রেনটা পেয়ে গেলুম বলে ট্রেনেই নালন্দায় এসে নামলুম।

বিচিত্র স্টেশন। গাড়ি থেকে নেমে মনে হবে একটা লেভেল ক্রসিংয়ের উপর নামলুম। আর স্টেশনটি কোন গেটম্যানের বাড়ি। রাজগীর থেকে যে সরকারী রাস্তা বক্তিয়ারপুর গেছে, তারই উপর স্টেশন। পা প্ল্যাটফর্মে পড়ে না। প্ল্যাটফর্ম নেই, পড়ে এই বড় রাস্তার উপরেই। সেখানে একার মত অগণিত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। উঠে বসলেই পাকা রাস্তা ধরে টেনে আনবে নালন্দার দরজায়।

এই দু মাইল রাস্তা আমরা দু পাশের ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে এলুম। ডান হাতে একটি তিব্বতী ধর্মশালা দেখলুম। এটি যে ধর্মশালা তা একাওয়ালা বলল, আর

তিব্বতী বুঝলুম গেটের আকৃতি দেখে। দুটো থামের উপর যেন একটি নৌকো বসানো।

অনেকটা এগিয়ে বাঁ হাতে একটা নূতন সৌধ দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম। নালন্দায় আমরা ধ্বংসাবশেষ দেখতে এসেছি, এমন নূতন ধরনের বিরাট বাড়ি দেখব সে আশা করি নি। একাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে সেটা নব নালন্দা মহাবিহার। এই প্রতিষ্ঠানের কথা কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ল। পালি ভাষা বুদ্ধলজি ও বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়নের জন্য বিহার সরকার এই মহাবিহার নির্মাণ করেছেন। বিনয় ও অভিধর্ম বুদ্ধলজির দুটি ভাগ। হীনযান পড়ানো হয় ইণ্টারমিডিয়েট ও বি. এ. ক্লাসে, এম. এ. ক্লাসে মহাযান। একাওয়ালার কাছেই জানতে পারলুম যে এখানকার শিক্ষক ও ছাত্রেরা শুধু ভারতবর্ষেরই অধিবাসী নন, শ্যাম মালয় জাপান তিব্বত সিংহল এমন কি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেরও মানুষ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করছেন।

আমাদের একা এসে যেখানে থামল তার বাঁ দিকে একটি বড় গাছ। গাছের নীচে একটি চালার সামনে বসে জনকয়েক মেয়ে পুরুষ চা খাচ্ছে। চায়ের দোকান সেটি। তারই পাশ দিয়ে পথ গেছে নালন্দার ভিতর। কিন্তু সোজা যাবার উপায় নেই। টিকিট নিতে হবে। সামনেই বুকিং অফিস। একই টিকিটে জাদুঘরও দেখা যায়। জাদুঘরের রাস্তা ডান হাতে। একটুখানি এগিয়ে প্রশস্ত বাগানবাড়ি, তার ভিতরে নালন্দার জাদুঘর।

টিকিট নিয়ে আমরা অন্য ধারে এগিয়ে গেলুম। দু ধারে ফুলের বাগান, মাঝখানে পথ। নানা জাতের নানা রঙের মরসুমী ফুলে বাগান আলো হয়ে আছে।

আমাদের সামনে যে ছোট দলটি ভিতরে ঢুকে গেলেন তাঁরা ভারতীয় নন। অদ্ভুত তাঁদের বেশভূষা। লম্বা ঢিলা আলখাল্লা নয়, পরনে পুরু মোটা কাপড়ের ঘাগরা, গায়ে জামা, তার উপরে ছোট কোট। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের প্রভেদ এত কম যে তাদের চিনতে একটু সময় বেশী লাগে। এক বন্ধু বলল : ওরা তিব্বতী।

আর একজন বলল : ভুটিয়া।

আমার মন তখন অন্য দিকে ছিল। সিংহদ্বারে সামনে দাঁড়িয়ে আমি তখন নালন্দার রূপ দেখছিলু উঁচু প্রাচীরে ঘেরা বিরাট এক ক্ষেত্র। একটা শহর একদা নালন্দা একটি স্বতন্ত্র শহর ছিল। একটি বিশ্ববিদ্যা নিয়ে একটি শহর। তার আইনকানুন আলাদা, জীব ধারণের সমস্ত রীতিনীতিই আলাদা। আজকের যাত্রী ত আনার টিকিট কিনে ভিতরে চলে যাচ্ছে। বি সেদিন পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে কোন মানুষ এখা প্রবেশের অধিকার পায় নি। ঘুষ দিয়েও পারে তদ্বির সুপারিশের জোরেও না। আজকের মত সরকা উর্দিপরা দরোয়ান সেদিন ফটকে ছিল না। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কথা সবাই ভুলে গেছে। শুধু ইতিহাস ভোলে নি।

ভিতরে ঢুকে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। ক অসংখ্য ভগ্নস্তূপে একটি বিরাট প্রান্তর পরিপূর্ণ। রাস্ত ছেড়ে একটা উঁচু স্তূপের উপর গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখা থেকে ভিতরের অনেকটা জায়গা দেখা যায়। সে সাততলা স্তূপ, আর তার উপর উঠবার সারি সারি বাঁধানে সিঁড়ি। কত মানুষ উঠছে, নামছেও কত। অনে ছাদের উপরে দাঁড়িয়েও ছবি [illegible] নীচের ধ্বংসস্তূপের।

এই নালন্দা। এতদি ভাবতুম, শুধু এই তিন অক্ষরই একটা যুগকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একটিম ধ্বনি একটা যুগের ইতিহাসকে নিঃশব্দে ধারণ ক আছে। কিন্তু এইখানে দাঁড়িয়ে এই ভুল আমার ভে গেল। এ তো শুধু অক্ষর নয়, ধ্বনিও নয়। এ একটা ঐশ্বর্যময় অতীতের অমর ইতিহাস, বিস্মৃত দি বিপুল কীর্তির বিরাট স্বাক্ষর। স্তব্ধ বিস্ময়ে অ ভারতের অন্য রূপ দেখলুম—শান্তসমাহিত ধ্যানগম্ভ মৌন রূপ। প্রাচীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় না আমার চোখের সামনে।

নালন্দা নাম কেন হল, এ নিয়ে গবেষণা অ হয়েছে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ন নালক ও নালক গ্রাম নামে একটি স্থানের উল্লেখ আ সারিপুত্রের জন্ম ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত, রাজগৃহ থে তার দূরত্ব অর্ধ যোজন। শুধু জাতক ও মহা বস্তুতে

। করেন যে নাল নালক ও নালক গ্রাম নালন্দারই । নাম।

চীনের বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউএন চাঙ সপ্তম তাব্দীতে এদেশে এসে বলেছিলেন যে নালন্দা নাম য়ছে নালন্দ নাগের নামে, এইখানে একটা পদ্মের রাবরে সেই নাগ থাকত। তিনিই আবার বলেছেন ।, না, কোন এক জন্মে বোধিসত্ব এখানে রাজা ছিলেন। মন দানশীল ছিলেন যে দেব না বলতে পারতেন না— অলং দা, নালন্দা। কেউ বলেন, নাল মানে পদ্ম, দ মানে সন্দহ। এমন পদ্মের দেশ বলেই নাম নালন্দা।

নালন্দা রাজগৃহের মত প্রাচীন নয়, রামায়ণ হাভারতে এই স্থানের কোন পরিচয় নেই। নালন্দার প্রথম উল্লেখ দেখি জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে। খ্রীষ্টের ন্মের পাঁচশো বছর আগে মহাবীর ও বুদ্ধের জীবনকালে নালন্দা বিদ্যমান ছিল।

তারানাথের ইতিহাসে দেখি মৌর্য সম্রাট অশোক এখানে সারিপুত্তের চৈত্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে এসেছিলেন, আর নালন্দায় একটা মন্দির নির্মাণ করে দেন। তাঁর মতে অশোকই নালন্দা বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। এই ঘটনা ঘটেছিল তৃতীয় পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে। তিনি আরও বলেছেন যে বিখ্যাত মহাযান দার্শনিক নাগার্জুন এর পরের শতাব্দীতে নালন্দায় অধ্যয়ন করে এখানেই অধ্যাপক হয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পণ্ডিতেরা আজ মাটি খুঁড়ে কথা সমর্থন করেন না। কেন না মাটির নীচে সে গের কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় নি। সবচেয়ে প্রাচীন যা পাওয়া গেছে, তা সমুদ্রগুপ্তের আমলের একটি কেল তামার প্লেট, আর কুমারগুপ্তের একটি মুদ্রা। হিউএন চাঙের কথাই তাহলে বিশ্বাস করতে হয় যে নালন্দার প্রতিষ্ঠা করেন শক্রাদিত্য, তারপর তাঁর বংশধর বুদ্ধগুপ্ত তথাগতগুপ্ত বালাদিত্য ও বজ্র নালন্দার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করেন। এঁদের অনেকেই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন।

চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন এ দেশে এসেছিলেন পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এই অঞ্চলে এসে তিনি সারিপুত্তের জন্ম ও সমাধিস্থান নাল গ্রাম দেখেছিলেন। সে সময়ে এখানে একটি স্তূপ ছিল, আর কিছু নয়। নালন্দার মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা তখনও হয় নি।

হিউএন চাঙের রচনায় আমরা নালন্দার গৌরবের কথা পড়েছি। তিনি এখানে অনেকদিন ছিলেন, এবং অনেক কথা লিখেছেন যত্ন করে। নালন্দার প্রথম সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন বৌদ্ধরাজা শক্রাদিত্য। তারপর চারটি সংঘারাম তৈরি করেছেন বুদ্ধগুপ্ত তথাগত-গুপ্ত বালাদিত্য ও মহারাজা বজ্র। আর একটি সংঘারাম কোন্ রাজার তৈরি, তাঁর নাম জানা যায় না। এই সংঘারামে অসংখ্য সৌধ আছে। উঁচু ইঁটের প্রাচীর দিয়ে সমস্ত সৌধগুলি বেষ্টিত। অদ্ভুত ভাস্কর্য। অপরূপ কারুকার্যময় অসংখ্য স্তম্ভ, শৈলশিখরের মত সৌধচূড়া সূক্ষ্মাগ্র, সারি সারি সুবিন্যস্ত, স্থানে স্থানে প্রবাল খচিত।

কনৌজের অধিপতি হর্ষবর্ধনের নাম এই মহাবিহারের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। তিনি ছেষট্টি হাত উঁচু একটা বিহার নির্মাণ করে তা পিতলের পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। সবাই তা সোনার বলে ভুল করত। তিনি এই মহাবিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য শতাধিক গ্রাম দান করেছিলেন।

দশ হাজার বিদ্যার্থী এখানে প্রতিদিন অধ্যয়ন করত। অধ্যাপক ও ভিক্ষুরাও ছিলেন কয়েক হাজার। শুধু বৌদ্ধ গ্রন্থই পড়ানো হত না, সমগ্র শাস্ত্রই পড়ানো হত। বেদ সাংখ্য আয়ুর্বেদ হেতু বিদ্যা শব্দ বিদ্যা প্রভৃতি কোন বিদ্যাই বাকি নেই। বৌদ্ধদের আঠারো সম্প্রদায়ের গ্রন্থ, মহাযান, ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের বিচার এখানে সকলে জানতেন। হিউএন চাঙ বলেছেন যে ত্রিপিটক না জানা একটা সাংঘাতিক লজ্জার ব্যাপার ছিল।

নালন্দায় প্রবেশের অধিকার পাওয়া বড় কষ্টসাধ্য ছিল। দ্বার-পণ্ডিতদের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিতে হত। কথোপকথনছলে তাঁদের পরীক্ষা। কিন্তু বিচারের বিষয়গুলি এমনই দুরূহ যে বিদ্যার্থীরা প্রায় সকলেই ফিরে যেত। একশো জনের ভিতর দশ থেকে বিশ জন কোন রকমে প্রবেশ করত। যাদের অধ্যবসায় কম, তারা দ্বিতীয়বার আর আসত না। যাদের মনোবল দৃঢ়, তারাই আসত বার বার। বিশ্ববিশ্রুত

[বো]বার অভিলাষ নিয়ে পণ্ডিতেরাই এখানে বিদ্যার্থী [হ]য়ে আসত।

নালন্দার খাদ্যের কথাও হিউএন চাঙ লিখে গেছেন। চারিদিকের দুশো গ্রাম থেকে এখানে খাদ্য আসত, দুশো মানুষ রোজ আসত খাদ্য দ্রব্যের সম্ভার নিয়ে। প্রত্যেক বিদ্যার্থী পেত শিমের বীচির মত বড় বড় দানার চাল, সাদা চকচকে সুগন্ধী চাল। তার সঙ্গে গম জায়ফল সুপুরি আর কর্পূর—তেল ঘি ও অন্যান্য জিনিস।

শীলভদ্র শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্করের মত বড় বড় পণ্ডিত এখানে ছিলেন। শীলভদ্র যখন নালন্দার অধ্যক্ষ তখন সেখানে দশ হাজার মহা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা সূত্র ও শাস্ত্রগ্রন্থের কুড়িটি সংগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তিরিশটি পারতেন পাঁচশো জন, আর দশজন পঞ্চাশটি। শীলভদ্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন না এমন গ্রন্থ সে যুগে ছিল না।

হিউএন চাঙ যখন নালন্দায় এসেছিলেন, তখন শীলভদ্রের বয়স প্রায় একশো বছর। কুড়ি জন মহাপণ্ডিত হিউএন চাঙকে শীলভদ্রের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের কথা হিউএন চাঙ চীনদেশেই শুনেছিলেন। তাই তিনি সম্মান প্রদর্শনের কোন ত্রুটি রাখলেন না। হাঁটুর উপর ভর করে তাঁর কাছে গেলেন, এবং শীলভদ্রের চরণদ্বয় চুম্বন করে মাটিতে মাথা ঠেকালেন। শীলভদ্র তাঁকে এমন ভাবে গ্রহণ করলেন যেন কতকালের পরিচিত তাঁরা। কাছে বসিয়ে নানা কুশল প্রশ্ন করলেন, তারপর ডাকলেন তাঁর বৃদ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্রকে। তিনিও মহাপণ্ডিত। বয়স সত্তর। বললেন, আমার অসুখের ঘটনা এঁর কাছে বিবৃত কর।

তাঁর আদেশে বুদ্ধভদ্র একটি অলৌকিক ঘটনা শোনালেন। তিন বৎসর আগেকার একটি ঘটনা। কুড়ি বৎসর যাবৎ শীলভদ্র শূলের বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে তিনি মৃত্যু ইচ্ছা করলেন। কিন্তু মৃত্যু হল না। রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন। জ্যোতির্ময় আলোকের ভিতর তিনি স্পষ্টভাবে দেখলেন মঞ্জুশ্রী অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়কে। তাঁরা বললেন, তোমার কার্য এখনও শেষ হয় নি। চীনদেশ থেকে তোমার শিষ্য আসছে, তাকে তোমার জ্ঞানদান করতে বাকি আছে। এই বলে তাঁরা অন্তর্হিত হলেন। স্বপ্ন মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু যা সত্য তা নিদ্রাভঙ্গের পরই জানা গেল। এই ঘটনার পর শীলভদ্র আর কখনও শূলের ব্যথায় কষ্ট পান নি।

হিউএন চাঙ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, দরদর ধারে তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তিনি শীলভদ্রের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিলেন।

নয়

এক বন্ধু আমার হাত ধরে স্তূপের উপর থেকে টেনে নামাল। বলল: পাগল নাকি?

পাগলই বটে! যে অতীতকে ইতিহাস ভাল করে ধরে রাখতে পারে নি, সেই অতীতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম। বন্ধু আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে এখানে আমরা ভাবতে আসি নি, এসেছি দেখতে, চোখ ভরে সবকিছু দেখে ফিরব। যা মনে থাকবে তাই জমা হবে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে। বন্ধুর সঙ্গে আমি ধ্বংস-স্তূপের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

এই সব প্রাচীন স্থানের বিশদ বিবরণ ভারত-সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ সযত্নে প্রকাশ করেছেন। তাতে প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তুর খুঁটিনাটি বিবরণ আছে। চৈত্য ও বিহারগুলির নম্বর দিয়ে তাঁরা যাবতীয় বক্তব্য বিবৃত করেছেন। অত খুঁটিনাটি দেখবার ধৈর্য আমাদের ছিল না। আমরা একটা সামগ্রিক ধারণা করতে পারলেই খুশী হই।

যেখানে আমরা নেমেছিলুম, সে একটা বিহার। পুরু দেওয়ালের সারি সারি কক্ষ, দরজা আছে, জানলা নেই, শয্যা পাথরের। বাঁধানো চত্বরের মাঝখানে কূপ দেখলুম, নালা দিয়ে জলনিকাশের ব্যবস্থা। এগুলি বিদ্যার্থীদের বাসস্থান ছিল।

খানিকটা এগিয়ে আমরা সেই বিরাট স্তূপের পাদদেশে পৌঁছলুম। কয়েক তলা বাড়ির সমান উঁচু, অগণিত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। যাত্রীরা উঠছে, নামছে, কারও ক্লান্তি নেই। আমরা যে তিব্বতী বা সিকিমের পরিবারটি দেখেছিলুম, তাঁরাও উপরে উঠছেন। আমরাও উঠলুম। শুধু উপরে উঠবার জন্য ওঠা, নয়তো উপরে

কিছু দেখবার নেই। শুধু উপর থেকে নীচের দৃশ্যটা দেখতে আশ্চর্য লাগে। কত বিশাল জায়গা জুড়ে এই মহাবিহার ছিল, কত বিচিত্র ব্যবস্থা, কত উদার, কত গম্ভীর।

এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন : একালের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা লাইব্রেরি থাকে, তাও একটা বড় বাড়ির একটা অংশে। অথচ এই নালন্দায় তিনটি লাইব্রেরি ছিল তিনটি আলাদা বাড়িতে।

সত্যি ?

সত্যি মানে। সেই তিনটে বাড়ির নামও পাওয়া যায়—রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক। এদের ধর্মগঞ্জ বলত।

এইসব প্রাচীন নাম আমি হিউএন চাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পড়েছিলুম। শীলভদ্রের নাম ছিল ধর্মরত্ন, আর হিউএন চাঙ প্রথমে ধর্মগুরু ও পরে মোক্ষদেব নাম পেয়েছিলেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গী বলল : কোনটা কোন রাজার সংঘারাম দেখিয়ে দাও।

ভদ্রলোক অবিলম্বে বললেন : পারব না।

কেন ?

যে চেষ্টা পণ্ডিতেরা করেন নি, আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাব না। দেওয়াল যার কয়েক হাত উঁচু, ছাদ নেই, কারুকার্য নেই কোনখানে, এমন জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়েও কোন লাভ নেই।

উপর থেকে নামবার সময় দেখলুম, সেই তিব্বতী পরিবারটি সিঁড়ির উপর অপেক্ষা করছেন। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। পরক্ষণেই দেখতে পেলুম, এক ভদ্রলোক নীচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। তাড়াতাড়ি আমরা নেমে এলুম।

এই ছবি তোলার তাৎপর্য আমি বুঝি। কত দূর দেশ থেকে কত পরিশ্রমে কত অর্থব্যয়ে তাঁরা এখানে এসেছেন। এখানকার স্মৃতি তাঁরা ধরে রাখবেন। নিজের দেশে ঘরে বসে যখন এই ছবি দেখবেন, তখন এই ভ্রমণের বিলাসের কথা মনে পড়বে। যারা আসে নি তারা দেখবে, উত্তরপুরুষ দেখবে পূর্বপুরুষের অভিযান।

এই বিরাট স্তূপ ঘিরে অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে। কারুকার্যমণ্ডিত ছোট ছোট স্তূপ ও চৈত্য। বড় স্তূপ যেমন সাতবার সংস্কৃত ও নির্মিত হয়েছে, তেমনি এ ছোট স্তূপগুলিও দু-তিনবার নির্মিত হয়েছে। এইস্থানে শুধু কারুকার্য নয়, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি খোদিত আছে।

এক বন্ধু বলল : এখানে আমাদের বেশী সময় কাটালে চলবে না।

কেন ?

বাইরে জাদুঘর আছে, তারপরে জৈনতীর্থ পাওয়াপুরী।

একজন সন্দেহ প্রকাশ করে বলল : পাওয়াপুরী কি দেখা হবে ?

কেন হবে না। একটু তাড়াতাড়ি করলে সবই হবে।

আমরা সেই বন্ধুকে অনুসরণ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

জাদুঘর একেবারে সামনাসামনি। শুধু খানিকটা পথ অতিক্রম করতে হয়। গেট দিয়ে ঢুকে একটি প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ডানদিকের একতলা বাড়িতে নালন্দা মিউজিয়ম। নালন্দার ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে বার করবার সময় মূল্যবান যা কিছু পাওয়া গেছে, তাই এখানে রাখা হয়েছে যত্নসহকারে। নানা দেবদেবীর মূর্তি, পাথর ও মাটির নানা তৈজসপত্র।

দেবতাদের মূর্তির মধ্যে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর এইসব মূর্তিই প্রধান। ঐশ্বর্যের দেবতা জম্ভল তারা প্রজ্ঞাপারমিতা সরস্বতী আছেন। এঁরা বৌদ্ধ দেবতা। হিন্দু দেবতা শায়িত শিবপার্বতীর উপর বৌদ্ধদেবতা ত্রৈলোক্যবিজয়। গণেশের উপর অপরাজিতা। বিদ্যুজ্জ্বালা করালিন বাহন ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। ব্রহ্মার ছিন্নমুণ্ড হাতে বৌদ্ধ দেবতার মূর্তিও আছে।

এইসব মূর্তি থেকে ধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। কোন ধর্ম যখন দুর্বল হয়ে আসে, তখন সে আক্রমণ করে অপরের ধর্মকে। হিন্দুরা বৌদ্ধদের আক্রমণ করেছিল অন্যভাবে। তারা বলেছিল, বুদ্ধ আমাদেরই অবতার, বুদ্ধকে মানতে হলে হিন্দুধর্ম পরিহারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু নালন্দার এই মূর্তি দেখে যে আক্রমণ অনুমান করি, তা বোধ হয় তন্ত্রমতের জনপ্রিয়তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল। গুপ্তসাম্রাজ্য শেষ হয়ে তখন পালবংশের

কোর চলছে। দেশে পরিবর্তন আসছে নানাভাবে। ীদের দক্ষতাতেও পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। শুধু র নয়, ব্রঞ্জের মূর্তি তৈরি হয়েছে অপর্যাপ্ত ভাবে। র ছড়াছড়ি দেখে মনে হয় যে এই ধাতুশিল্প নালন্দার ক্ষা বিষয়েরই অন্তর্গত ছিল।

বিষ্ণু বলরাম গণেশ শিব-পার্বতী মহিষমর্দিনী দুর্গা— সব হিন্দু দেবদেবীও পাওয়া গেছে। মনে হয় বিহারে া বাস করতেন, তাঁরা এইসব দেবদেবীর আরাধনা তেন। হয়তো মূর্তি তৈরিও করতেন কেউ কেউ। না হলে এত ছোট ছোট মূর্তির এমন প্রাচুর্য কেন হবে।

প্রথম কক্ষ থেকে দ্বিতীয় কক্ষে এসে দুখানি শিলালিপি খলুম, আর দেখলুম মাটির তৈরি নানা জিনিস। শুধু বদেবী বা পশুপক্ষীর নয়, সংসারের প্রয়োজনীয় নানা তৈজসপত্র পানপাত্র পেয়ালা প্রদীপ প্রভৃতি। অন্যদিকে লোহার জিনিস—ছুরি কাঁচি কাস্তে কোদাল আরও কত কী। চুনবালির কাজ বা স্টাকো ওয়ার্ক পোড়ামাটির কাজ বা টেরা কোট্টা আর্ক। বাইরে পোড়ামাটির একটি বিরাট হাঁড়ি দেখেছিলুম। এতে বোধ হয় শস্য সঞ্চয় হত। এক হাজার বছরের পুরনো এই মাটির হাঁড়ি দেখে অনেকে আশ্চর্য হল।

তৃতীয় কক্ষে ব্রোঞ্জের মূর্তি দেখলুম। দেখলুম পাথরের খড়ম, হাতির দাঁতের চটিজুতো, রাজদণ্ড। অসংখ্য জিনিসের মধ্যে এই কটিই শুধু মনে আছে।

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমরা সেই চায়ের দোকানের সামনে বসলুম। সেই বড় গাছটি এমন ছায়া বিস্তার করেছে যে রোদ্রের উত্তাপ এখানে নেই। চা খেয়ে নিয়ে মধ্যাহ্নের আহার আমরা এইখানে সেরে নিলুম। এখান থেকে পাওয়াপুরী যাব।

একখানা একায় চেপে আমরা স্টেশনের দিকে এলুম। স্টেশন তখন বন্ধ হয়ে গেছে, দরজায় তালা ঝুলছে। আমরা এখানে আসবার পরে আর একখানা গাড়ি বক্তিয়ারপুরের দিকে চলে গেছে, শীঘ্র আর কোন গাড়ি নেই বলে স্টেশনের কর্মচারীরা যে যার বাড়িতে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাদের ঝোলাঝুলি স্টেশনের ঘরের ভিতর রেখে গিয়েছিলুম। তাও সংগ্রহ করে নেবার উপায় রইল না।

নিকটে কয়েকটি খাবার দোকান ছিল। সেখানে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে খানিকক্ষণ পরে মোটর বাস পাওয়া যাবে। রাজগীর থেকে বক্তিয়ারপুর যাচ্ছে বিহার শরিফের উপর দিয়ে। সেই বাসে বিহারে গিয়ে পাওয়াপুরীর বাস পাব। সেখানে ট্যাক্সি আছে, ঘোড়ার গাড়িও আছে। আট মাইল পথ। যাতায়াতে ষোল মাইল। ফিরে এসে বক্তিয়ারপুরের ট্রেন ধরতে অসুবিধা হবে না। ওই ট্রেনখানি আমাদের ধরতেই হবে। সন্ধ্যাবেলায় বক্তিয়ারপুরে বড় লাইনের ট্রেন ধরতে না পারলে সকালবেলায় কলকাতায় পৌঁছতে পারব না। সকলেরই অফিস আছে।

খোঁজ খোঁজ। স্টেশনের লোক কোথায় গেল খুঁজে বার করতে সময় লাগল না।

পাশেই তাদের কোয়ার্টার। আমাদের ডাকাডাকিতে খালি গায়ে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে ঝোলাঝুলি ফিরিয়ে দিল। আমরা তাদের ধন্যবাদ দিলুম।

কিন্তু বাস তাড়াতাড়ি এল না। রাস্তায় পায়চারি করে ক্লান্ত হয়ে দোকানে এসে বসলুম, চা নিয়ে খেলুম। তখনও বাসের দেখা নেই। যখন এল তখন সেই বাসের অবস্থা দেখে চক্ষু স্থির। তিলধারণের জায়গা নেই। তবু তারা আদর করে ভিতরে তুলে নিল। আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম।

দু ধারের দৃশ্য আমাদের দেখা হল না, যাত্রার আনন্দ থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হলুম। ভিড়ের ভিতর মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে শরীরটা সামলাবার চেষ্টাতেই সময়টা কেটে গেল। বিহার শরিফের পথে নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

প্রথমে আমরা বাসের খবর নিয়েছিলুম। সঠিক খবর কেউ জানে না। তবে জানা গেল যে বাস আমাদের যেখানে নামিয়ে দেবে, সেখান থেকে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়, আর ফেরার সময় বাস পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় নেই। ঘোড়ার গাড়িতে গেলে এত সময় লাগবে যে আমাদের হাতে তত সময় নেই। অগত্যা ট্যাক্সি। আমরা ট্যাক্সির চেষ্টায় যত্নবান হলুম। অনেক কষ্টে একটি ট্যাক্সি পাওয়া গেল, কিন্তু তার দাবি শুনে পিছিয়ে গেলুম।

এক বন্ধু বলল : থাক তোমার পাওয়াপুরী। তার চেয়ে কোন হোটেলে গিয়ে বসি।

প্রস্তাবটা অসঙ্গত নয়। খানকয়েক পাঁউরুটি চিবিয়ে পেট ভরেনি, তারপরে বাসের ঝাঁকানি, এখানেও ছুটোছুটি হয়েছে। আর একজন সমর্থন করল : সেই ভাল।

আমি বললুম : পাওয়াপুরীতে কী দেখবার আছে জেনে নেবে না?

কাকে ধরা যায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল হোটেল-ওয়ালাকেই ধরা হবে। কাজেই একটা অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন গোছের হোটেলে ঢুকে হাঁকিয়ে বললুম। পুরি তরকারি পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে রাবড়ি।

পাওয়াপুরীর খবরও পাওয়া গেল। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এখানে নির্বাণ লাভ করেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বাহাত্তর বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয় রাজা হস্তিপালের লেখশালায়। এই মন্দিরটির নাম গাঁও মন্দির। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা রাজা নন্দীবর্ধন এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন।

পাওয়াপুরীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হল জলমন্দির। যেখানে তাঁর দেহ দাহ করা হয়, সেইখানে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। একটি বিশাল জলাশয়ের মাঝখানে এই মন্দিরের আকার বিমানের মত। নীচে শ্বেতপাথরের মেঝে, উপরে সোনার শিখর। মহাবীরের পাদুকা আজও মন্দিরের ভিতর রক্ষিত আছে।

এই মন্দিরে কি নৌকোয় যেতে হয়, না সাঁতার কেটে?

নৌকোয় নয়, সাঁতার কেটেও নয়। তীর থেকে মন্দিরে যাবার জন্য লাল পাথরের সেতু আছে।

হোটেলওয়ালা জিজ্ঞাসা করল : অমৃতসর গেছেন?

না।

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের মত, হিন্দুদের দুর্গিয়ানা মন্দিরেও এই একই ব্যবস্থা।

তারপর সে একটি কিংবদন্তী শোনাল। এই জলাশয় কি করে হল, সেই গল্প। মহাবীরের শেষকৃত্যের সময় তাঁর এত অগণিত ভক্ত এসে উপস্থিত হয়েছিল যে, তা ধারণা করা যায় না। সবাই একটু চিতাভস্ম চায়, একটুখানি মাটি। সবাই একটুখানি মাটি সংগ্রহ করে ফিরল, আর সেখানে সৃষ্টি হল একটি বিশাল গর্ত। সেই গর্ত জলে ভরে জলাশয় হয়েছে।

একজন উচ্চস্বরে হেসে উঠল, কিন্তু সকলে হাসল না; ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কৌতুক করতে সকলে ভালবাসে না।

খেতে খেতেই আমরা বাকি গল্পটুকু শুনলুম। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই অঞ্চলটা সরগরম হয়ে ওঠে। পাওয়াপুরীতে এখন অনেক ধর্মশালা। সে সমস্তই যাত্রীতে ভরে যায়। সেখানকার উৎসব শেষ হলে সেই যাত্রীরাই রাজগীরে যায়। সেখানেও অগণিত জৈন মন্দির। সমস্ত পাহাড়ে পাহাড়ে তাদের মন্দির আছে ছড়িয়ে।

ছোট লাইনের গাড়িতে চড়ে ফেরার পথে আমি দুই মহাপুরুষের কথা ভাবছিলুম। বুদ্ধ ও মহাবীর। প্রায় একই সময় এই দুই মহাপুরুষ একই দেশে জন্মগ্রহণ করে দুটি বিশিষ্ট ধর্মের প্রবর্তন করেন। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁরা তাঁদের শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন পাটনা জেলার এই অঞ্চলে—রাজগীর ও পাওয়াপুরীতে। তাঁদের জীবনে সাদৃশ্য আছে, অভিজ্ঞতায় আছে, এমন কি ধর্মপ্রচারের জন্য স্থান নির্বাচনেও অদ্ভুত সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়েছে।

আজ অনুমান করা হয় যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম খ্রীষ্টের জন্মের ৫৬৭ বৎসর পূর্বে কপিলবাস্তুর নিকট লুম্বিনী বনে, বর্তমানে নেপালের তরাই অঞ্চলে। গৌতমের পিতা শুদ্ধোদন শাক্যজাতির একজন নায়ক ছিলেন। কপিলাবস্তুতে তাঁর রাজধানী। শৈশবেই তাঁর মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। গৌতম বড় চিন্তাশীল, বড় অন্যমনস্ক ছিলেন। পিতা তাই গোপার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন তাঁকে সংসারী করবার জন্য। উনত্রিশ বৎসর বয়সে গৌতমের পুত্র জন্মাল, আর তার পরেই তিনি গৃহত্যাগী হলেন। ছ বছর নানা স্থানে ভ্রমণ করার পর গুরুর কাছে উপদেশ নিলেন। কিন্তু তাতে জগতের দুঃখমোচনের কোন উপায় হল না। গয়ার বোধিদ্রুমমূলে গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে তিনি বুদ্ধ হলেন।

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি নানা স্থানে ঘুরে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়ালেন। এই রাজগীরেই তিনি

াছ বৎসর যাপন করেছেন। তারপর আনুমানিক আশি ়ের বয়সে বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার প্রাচীন কুশি গরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এঁরই সঙ্গে জৈন ধর্মের প্রচার করেন বর্তমান ়াবীর। বর্তমান মজঃফরপুর জেলায় বৈশালী নগরের শকঠে কুণ্ড গ্রামে বর্ধমানের জন্ম হয় বুদ্ধের সাতাশ ়সর পরে। এঁর পিতা সিদ্ধার্থ একজন ক্ষত্রিয় নায়ক লেন, এবং মাতা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবি রাজকন্যা। মান বিবাহ করেন যশোদাকে। এবং তাঁর একটি কন্যা ম। ত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করে বারো সর কঠোর তপস্যা করেন। এঁরও লক্ষ্য ছিল সংসারের খমোচনের উপায় উদ্ভাবন। সিদ্ধিলাভের পর মহাবীর ন নামে খ্যাত হন, এবং তাঁর সম্প্রদায়ের নাম হয় ন। বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে এই পাওয়া ীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের উপর যে বুদ্ধের ধর্মমত তষ্ঠিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিষদের সবটুকু নি গ্রহণ করেন নি। উপনিষদ ব্রহ্মকেই শুধু সত্য ল মেনেছেন, আর জগৎ বলে যা কিছু আমরা দেখছি সবই মিথ্যা। এই দৃশ্যমান জগৎ জীব ও প্রকৃতি যে নত্য ও প্রতিভাস মাত্র, এ কথা বুদ্ধ মেনে নিলেন। লেন, এরা কতকগুলি ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহ মাত্র। ম্ অনিত্যম্ সর্বম্ শূন্যম্'। উপনিষদের ব্রহ্মকে বুদ্ধ ালেন না, বললেন, জীবাত্মা বা পরমাত্মা বলে কোন ছুর অস্তিত্ব নেই। এবং এই সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়া- াপের মূল্যও অস্বীকার করলেন।

সংসার ত্যাগের পূর্বে মানুষের জরা ব্যাধি ও মৃত্যু দেখে বুদ্ধের দুঃখের সীমা ছিল না। বিশ্বের এই দুঃখ দূরীকরণের জন্যই তাঁর দীর্ঘজীবনের সাধনা। শেষে এই দুঃখের রহস্য তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন। দুঃখ দুঃখহেতু দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায় এই হচ্ছে 'চত্বারি আর্য সত্যানি'। এই দুঃখময় জগতে দুঃখের কারণ নির্ণয় করে সেই কারণকে বন্ধ করার উপায়ও তাঁকে বার করতে হল। বুদ্ধ বললেন, প্রবৃত্তির বিনাশে হয় নির্বাণ, আর এই নির্বাণই হল দুঃখের হেতুনিরোধের একমাত্র উপায়। তিনি যে মুক্তিমার্গের সন্ধান দিলেন তা গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাণপ্রস্থ ও যতির মত। বাণপ্রস্থকে সর্বজনীন করার চেষ্টা ছিল বুদ্ধের ধর্মপ্রচারে।

বৌদ্ধদের মত জৈনধর্মের ভিত্তিও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমূহে। জৈনরাও বেদের অপৌরুষেয়তা ও অবিসংবাদিত্ব জাতি-ভেদ ও যাগযজ্ঞের বিরোধী। প্রকৃতি বা এই দৃশ্যমান জীবজগতের পিছনে কোন আত্যন্তিক সত্তা নেই, মানুষ নিজের কর্মফলের জন্যই সংসারে দুঃখভোগ করে। এবং সর্ব জীবে অহিংসা ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন যাপনই মুক্তির একমাত্র উপায়। এই মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। এই সাধনার পদ্ধতিতে জৈনদের চরমপন্থী বলা যেতে পারে। বৌদ্ধদের মত জৈনরা বিলাস ও বৈরাগ্যের মধ্যপথ অবলম্বনে বিশ্বাসী নন। অহিংসা ও সাধনার ব্যাপারে মধ্যপথ নেই, যা পালন করবার তা কঠোর ভাবেই পালন করতে হবে। জৈনদের দিগম্বর সম্প্রদায় বস্ত্র পরিধানেরও বিরোধী।

এই দুই ধর্মের প্রতি তুলনামূলক দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে জৈনদের কিছু সম্পর্ক চিরদিনই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধরা একেবারেই দূরে সরে গিয়েছিলেন। পরিণামেও তাই হল। হিন্দুদের সঙ্গে জৈনরা বেঁচে রইল ভারতবর্ষে। বৌদ্ধদের বিদায় নিতে হল। বুদ্ধ ও মহাবীর এই দুই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়েছে প্রায় একই সময়। তখন তাঁদের ধর্মের প্রতিপত্তি ছিল একই রকম। পাঁচশো বছরের ভিতর বৌদ্ধ ধর্ম সমগ্র এশিয়া আফ্রিকা ও ইয়োরোপের স্থানে স্থানে প্রসার লাভ করে এক মহা ধর্মে পরিণত হল। জৈন ধর্ম ভারতেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। তারপর আজ প্রায় পাঁচশো বছর হল বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর জৈনরা আজ সংখ্যায় ও ঐশ্বর্যে অনেকের ঈর্ষার পাত্র।

মামার কথা আমার মনে পড়ল। দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের সময় তিনি বলেছিলেন, লোকে বলে বুদ্ধ সোস্যালিস্ট ছিলেন, ব্রাহ্মণের প্রভাব ও বর্ণাশ্রম ধর্ম নষ্ট করে বৌদ্ধ সংঘ নামে গণতন্ত্র স্থাপন ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

আমি প্রতিবাদ করেছিলুম, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে নীচ জাতীয় ছিলেন সত্যি, কিন্তু শুধু নীচ জাতীয়ের জন্যই তাঁর ধর্ম নয়। আমাদের বাণপ্রস্থের

। তাঁর ধর্মেও জাতি বা বর্ণের বিচার নেই। শ্রমধর্ম নষ্ট করা তাঁর বড় উদ্দেশ্য ছিল না। আর ণের যে সংজ্ঞা তিনি তাঁর ধম্মপদে দিয়েছেন, সে নিষদের ব্রহ্মদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ, মানবশ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ বিনয় হার ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য ও বাণপ্রস্থ আশ্রমের ইনিষেধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু ব্রহ্মচারীর মত দ্ধ ভিক্ষুও সবাই মুক্তিকামী। কেউ বা মুক্ত। বুদ্ধের নকালে তিনিই গুরু ছিলেন, তাঁর নির্বাণের পর গ্য সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করে ভিক্ষুরাই সংঘনায়ক ন। এই সব সংঘে রাজনীতি কোনদিন আলোচিত নি বলেই আমার বিশ্বাস।

মামা প্রশ্ন করেছিলেন, তবে কি দুঃখবাদই লোকে ল না?

বললুম, দুঃখবাদ তো তাঁর ধর্ম ছিল না। সেটা তাঁর র ভূমিকা। দুঃখকে সম্পূর্ণভাবে জয় করে চির নন্দময় নির্বাণ লাভের চেষ্টাই তাঁর ধর্ম। বৌদ্ধ দায়ের মধ্যে যত গণ্ডগোল বেধেছে সবই এই নির্বাণ টি নিয়ে। দুঃখ জয় করতে যদি মৃত্যুকেই বরণ তে হল, তাহলে আনন্দ কোথায়! কিন্তু নির্বাণ তো নয়, নির্বাণ আনন্দময় চেতনা। ভিক্ষু নাগসেন সের রাজা মিলিন্দকে নির্বাণের যে উপমা দিয়েছিলেন টেই বোধ হয় সবচেয়ে সরল উপমা। রাজ্যরক্ষা গ্যশাসন ও প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাজাকে যে কষ্টভোগ তে হয়, তা রাজ্যসুখের ভূমিকামাত্র। উপসংহারটুকু তোভাবে আনন্দময়। রাজ্যপালনকে যদি দুঃখবাদ , তবে নির্বাণ হল রাজ্যসুখ।

মামা চট করে নিজের মতটি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, দেশে দুঃখ এমন ঘন হয়ে আছে যে দুঃখের আলোচনা াকের ভাল লাগবে কেন! প্রবৃত্তির বিনাশের জন্য দার ত্যাগ কর, রূপেরসে ভরা পৃথিবীটাকে উপেক্ষা একটা কাল্পনিক আনন্দের জন্য—এ কথা সাধারণে বে এ আশা করাই অন্যায়।

আমার কোন উত্তর দিতে ইচ্ছা হল না। বাইরে কার তখন ঘনিয়ে এসেছিল আমার মনেও গেছিল ঘোর। মনে পড়েছিল, ধম্মপদে বুদ্ধের াণের সংজ্ঞা। কী গভীর সেই আনন্দময় চেতনা :—

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো॥
সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা।
আতুরেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনাতুরা॥
সুসুখং বত জীবাম উস্সুকেসু অনুস্সুকা।
উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুকা॥
সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং।
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভস্সরা যথা॥

—বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরিহীন হয়ে সুখে জীবন-যাপন করব, বিদ্বেষভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য হয়ে বিচরণ করব। আতুরগণের মধ্যে আমরা ক্লেশ-রহিত হয়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব। আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হয়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব। আমাদের মধ্যে যাদের কোন আসক্তি নেই তারা ভাস্বর দেবগণের ন্যায় আনন্দভাজ হয়ে সুখে জীবনযাপন করবে।

দশ

মনোরঞ্জনের কথায় আমি আবার চেতনার জগতে ফিরে এলুম। বাথরুম থেকে ফিরে এসে সে বলল : এখনও জানলার ধারে বসে আছ?

আমার জায়গা তো এটি।

তা জানি।

মনোরঞ্জন দেওয়ালের হুকে তার ঝোলাটি টাঙিয়ে রেখে আমার পাশে এসে বসল। বলল : মুখহাতটা ধুয়ে নিলেও তো পারতে।

ধুয়ে নিলেই তো ধোয়া হয়ে গেল, আর কোন কাজ রইল না।

মনোরঞ্জন একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল বাইরের পৃথিবীর দিকে। পূর্বের আকাশে নিশ্চয়ই সূর্য উঠেছে। প্রখর আলোকে ঝলমল করছে চারিদিক। বলল : কতদূর এলুম আমরা?

অনেক দূর।

মনোরঞ্জন আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল : কী ভাবছ বল তো?

উত্তরটা আমি এড়িয়ে গেলুম, বললুম: মধুপুর জসিডি শিমুলতলা সব ছাড়িয়ে এসেছি।

বল কি! অমন স্বাস্থ্যকর স্থানের হাওয়া গায়ে লাগল না!

লেগেছে। তাইতেই তো সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমলে।

মনোরঞ্জন বলল: নাক ডাকা একটা রোগ। নাক ডেকেছে বলেই ভেব না যে ভাল ঘুম হয়েছে। আমার মনে হয়, ঘুম গভীর হলে নাক আর ডাকে না।

নিজের নাকের ডাক তুমি শুনতে পাও?

পাই।

কথাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না দেখে মনোরঞ্জন বলল: সত্যিই পাই। পাতলা ঘুম যেই ভাঙে, সেই মুহূর্তে বুঝতে পারি যে নাক আমার ডাকছিল।

হেসে বললুম: এ তো সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা। আর একটু গভীর ভাবে মনঃসংযোগ কর, তোমার ব্রহ্ম-দর্শন হবে।

আর ব্রহ্ম-দর্শন! এতদিনের চেষ্টাতেও বৈদ্যনাথ দর্শন হল না।

বৈদ্যনাথ দর্শন আবার কঠিন কথা নাকি!

কঠিন কথা নয় বলেই তো আপসোস করছি। যাতায়াতের পথে একবারও জসিডিতে নামতে পারলুম না। এমন গাড়িতে উঠি যে মাঝরাতে ও স্টেশন পেরই। নামবার ইচ্ছা থাকলেও আর সে ক্ষমতা থাকে না।

বললুম: ফেরার সময় কথাটা মনে রেখ, এমন গাড়িতে উঠব যে দিনের আলোতেই জসিডি পৌঁছব। তখন আর আপসোস থাকবে না।

তোমার মত ভাগ্য কি আর আমি করেছি!

আমার ভাগ্য! আমি হাসলুম।

হাসছ কেন! পথে-ঘাটে তোমার তো অনেক পণ্ডিত বন্ধু জোটে, তাদের কাছে শুনে তুমি মহাভারত লিখতে পার।

এ অভিযোগ আমি এর আগেও শুনেছি। শুনেছি দেশের বন্ধুদের কাছে। যাঁরা বই পড়েন—কিন্তু ভ্রমণ করেন না। ট্রেনের কামরায় কিংবা মোটর বাসে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, আলাপ হয় স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে, তাঁরা এ কথা বলেন না। আমাকে তাঁরা আম[illegible] অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমি জানতে [illegible] তাঁদের অভিজ্ঞতার গল্প। জগতের বিরাট [illegible] থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা একটা নিজস্ব ক্ষেত্রে মিলি[illegible] হই। পরস্পরের সুখদুঃখের কাহিনী শুনে আনন্দ[illegible] বেদনা অনুভব করি। দেশের প্রতিবেশীর সঙ্গে হয়[illegible] দুবেলা দেখা হয়, কিন্তু অন্তরের ভাব বিনিময় [illegible] না। অন্তরঙ্গ না হলে আমরা অন্তরটা মেলে ধরি না। দেশের বাইরে আমরা অন্য রকম মানুষ। এক[illegible] নৌকোয় পা দিয়েছি জানলে একমুহূর্তে একাত্ম হ[illegible] যাই। এ আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুতা।

আমার উত্তর না পেয়ে মনোরঞ্জন বলল: কেন[illegible] ঠিক বলি নি?

বললুম: চেষ্টা করলে তোমারও জুটতে পারে।

আমার!

হ্যাঁ তোমার। জসিডি থেকে কেউ উঠেছেন কিন[illegible] জিজ্ঞেস কর না।

শেষের কথাটা আমি একটু জোরে জোরে[illegible] করেছিলুম, তাই উত্তর পেয়ে গেলুম সঙ্গে সঙ্গে। খানিকটা তফাত থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন: কেন[illegible] বলুন তো?

কটাক্ষে একবার মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম: বৈদ্যনাথের কথা কিছু শুনতে চাই।

ভদ্রলোক বললেন: এই ক[illegible]।

আমি একটু সরে বসে বললুম: আসুন না এই দিকে।

ভদ্রলোককে উঠতে দেখে মনোরঞ্জন আরও আশ্চর্য হল। কিন্তু কথা কইল না একটিও। ভদ্রলোক এসে দুজনের মাঝখানে বসলেন।

আমি বললুম: আমরা কলকাতা থেকে কাশী যাচ্ছি।

আমি দুমকা থেকে বিন্ধ্যাচল। আমার নাম রামচন্দ্র ঝা।

মনোরঞ্জন আরও আশ্চর্য হয়ে বলল: আপনি চমৎকার বাংলা বলেন তো!

খুশী হয়ে ভদ্রলোক বললেন: সাঁওতাল পরগনার

অনেকেই ভাল বাংলা জানে। একসময় তো বাংলা দেশই ছিল।

আমি নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললুম: বাবা বৈদ্যনাথেরই কৃপা, তা না হলে আপনার সঙ্গে পরিচয় হবে কেন!

ভদ্রলোক বললেন: কথাটা মিথ্যা বলেন নি। মুমকা থেকে আমি বেরিয়েছিলুম তুফান এক্সপ্রেস ধরব বলে। ট্রেন ফেল করে এই দুর্ভোগ।

তাহলে দেখছি, আমাদের কৃপা করতে গিয়ে আপনাকে ভোগালেন।

রামচন্দ্রবাবুর মুখেই আমরা দেওঘরের গল্প শুনলুম। দেওঘর শহরেরই নাম বৈদ্যনাথ ধাম। শহর বড় নয়, কিন্তু পাড়া আছে অনেকগুলো। তাদের বিচিত্র নাম উইলিয়াম্‌স্‌ টাউন, ক্যাস্টিয়ার্স টাউন, বম্পাস্‌ টাউন, ইত্যাদি। উইলিয়াম্‌স্‌ টাউনে বাড়িঘর কম। রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল আছে বিদ্যাপীঠের মাঠে, খানিকটা দূরে নন্দন পাহাড়ের উপর একটা ছোট মন্দির। কোন দেবতা আছে কিনা ভদ্রলোকের জানা নেই। বম্পাস টাউনে স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড়, একসময় যক্ষ্মা রোগীর একচেটে ছিল এই পাড়াটা। হালের সংবাদ তিনি রাখেন না। ক্যাস্টিয়ার্স টাউনে মূল শহর। হাটবাজার থেকে বৈদ্যনাথের মন্দির পর্যন্ত। সৎসঙ্গ জানেন?

অনুকূল ঠাকুরের প্রতিষ্ঠান?

এই তো জানেন দেখছি। যাবেন সেখানে। দিনে দিনে বেশ বেড়ে উঠল।

মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: আমার কিছু জানা নেই।

উত্তর রামচন্দ্রবাবু দিলেন, বললেন: ঠাকুর ধার্মিক লোক। তাঁর অনেক শিষ্য। আশ্রমটি ভাল করেছেন।

বললুম: আপনি দেখেছেন নাকি?

দেখেছি একবার।

মনোরঞ্জন বলল: তবে তো ভালই হয়েছে, আপনার নিজের মতামত বলুন।

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে বললেন: ধর্ম প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা না করলেই ভাল। তবে একজন বয়স্ক শিষ্য আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে তাঁরা উন্নততর সমাজ তৈরির চেষ্টা করছেন, এবং সেটা নাকি—

বলুন।

আমি হয়তো সঠিক বলতে পারব না, আমাকে মাপ করুন।

যা শুনেছেন, তাই বলুন না।

শুনেছি, বাপ-মায়েরা চেষ্টা করলে ভাল সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। তারাই ভাল সমাজ গড়তে পারবে।

তারপর?

এ প্রসঙ্গটা ভদ্রলোক সুন্দর ভাবে এড়িয়ে গেলেন, বললেন: তারপর দেবসঙ্ঘ দেখুন। বেশ মনোরম আশ্রম। মন্দিরের ভিতর বসে ধর্মের আলোচনা শুনতে মন্দ লাগবে না। সেখান থেকে নওলাখা মন্দিরে যান। ন লাখ টাকা খরচ করে এই সুন্দর মন্দিরটি তৈরি হয়েছে। তার কাছেই বালানন্দ স্বামীর আশ্রম।

ভদ্রলোক কোন প্রশ্ন করবার অবকাশ দিলেন না, বলে চললেন: এই সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর মন্দিরটিও দেখে নেবেন। শহরের বাইরে মস্ত পরিবেশের ভিতর এই মন্দির আপনাদের ভাল লাগবে। বাঙালীরা বলেন, দেবতা বড় জাগ্রত। কোন মানত করে কখনও ব্যর্থ হতে হয় না। ভক্তরা দূর দূর দেশ থেকে পূজার জন্য টাকা পাঠান।

আমি বললুম: আপনি বৈদ্যনাথের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন যে বৈদ্যনাথের মত তীর্থ ভারতবর্ষে কম আছে। একদিকে সতীর হৃদয়পীঠ, অন্যদিকে শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ। দুটোর একটা পেলেই যে কোন স্থান মহাতীর্থ হতে পারে। কলকাতার কালীঘাট দেখুন, কিংবা কামরূপের কামাখ্যা শুধু পীঠস্থান বলেই কত মাহাত্ম্য। আবার সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ দেখুন, কিংবা দক্ষিণের রামেশ্বর— শুধু শিবের জন্যই সারা বছর জমজমাট। বৈদ্যনাথ বাড়ির কাছে বলে এ সব কথা আমরা ভেবে দেখি না। অথচ বসন্ত পঞ্চমী শিবরাত্রি ও ভাদ্র পূর্ণিমায় এখানে লক্ষ লোকের সমাগম হয়। পায়ে হেঁটে কাঁধে করে তারা গঙ্গাজল আনে। আনে গঙ্গোত্রি ও মানস-সরোবরের জলও।

মনোরঞ্জন বলল : খুব খাঁটি কথা।

উৎসাহ পেয়ে ভদ্রলোক বললেন : মন্দির একেবারে শহরের মাঝখানে। শিবগঙ্গায় স্নান করে দর্শন করতে হবেন।

শিবগঙ্গা কী ?

একটা কুণ্ড বলতে পারেন, আসলে সরোবর। পাশাপাশি তিনটে লেক আছে, তার মধ্যে শিবগঙ্গার জলই টলটলে। বাঁধানো ঘাট আছে। অগণিত যাত্রী দিবারাত্রি স্নান করছে। আপনারাও এইখানে স্নান করবেন।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন : সত্যি কিনা জানি না, পাণ্ডারা বলে যে এই শিবগঙ্গার পাড় বাঁধিয়ে দিয়েছেন আকবর বাদশাহর সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ। ষাট ফুট বাই নব্বুই ফুট পাড়। উড়িষ্যা যাবার পথে মানসিংহ বৈদ্যনাথ দর্শন করে যান, পশ্চিমের লেকটির নাম তাঁরই নামে মান সরোবর।

আমি মনোরঞ্জনকে বললুম : খবর কী করে পাওয়া যায় দেখছ !

হুঁ।

রামচন্দ্রবাবু আমার দিকে তাকালেন। আমি বললুম : বলুন আপনি।

ভদ্রলোক বললেন : বাহাত্তর ফুট উঁচু বৈদ্যনাথের মূল মন্দির গিধৌরের প্রথম রাজা পুরণমল নির্মাণ করে দিয়েছেন ১৫৯৬ সনে। সমস্তটা একটা দুর্গের মত মনে হবে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণটা পাথরে বাঁধানো। তার মাঝখানে বৈদ্যনাথ ও জয়দুর্গার মন্দির, তার চারিদিক ঘিরে আর দশটি ছোট মন্দির। কারুকার্যের জন্য একটা মন্দিরও বিখ্যাত নয়। এই মন্দির প্রাচীনত্বের জন্যে বিখ্যাত। শিবপুরাণের গল্প আপনাদের বোধ হয় মনে আছে। ত্রেতাযুগে লঙ্কার রাজা রাবণ কৈলাসে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। শোনা যায় যে তিনি নাকি নিজের নটি মাথা শিবের পায়ে দিয়েছিলেন। শিব দেখলেন, বিপদ। ভক্ত হয়তো এর পরে শেষ মাথাটাও তাঁর পায়ে দেবে। তাড়াতাড়ি বললেন, বর নে। রাবণ বললেন, আমি তো বর চাই নে, আমি তোমাকে চাই। তোমাকে আমি লঙ্কায় নিয়ে যাব। শিবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ তৈরি আছে। একটি যার করে দিয়ে বললেন, এইটে নিয়ে যা। কিন্তু হুঁশিয়ার, পথে এটা মাটিতে নামাবি না। একবার নামালে আর তুলতে পারবি না। রাবণ ভক্তিভরে সেই শিবলিঙ্গ নিয়ে লঙ্কায় চললেন।

দেবতারা দেখলেন বিপদ। শিব একবার লঙ্কায় গিয়ে কায়েম হলে লঙ্কাপুরী অজেয় হবে। দশানন রাবণ তখন বিশ হাতে মাথা কাটবে। কিন্তু উপায় ? বিষ্ণু বললেন, উপায় আছে। বরুণকে বললেন, তুমি রাবণের পেটে প্রবেশ কর। যা বলা তাই কাজ। রাবণ তখন হনহন করে দেওঘরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, বরুণের চাপে অস্থির হয়ে উঠলেন। কী করা যায় ? দূর দিয়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডেকে বললেন, এই শিবলিঙ্গটা একটু ধর, আমি এখুনি আসছি। ব্রাহ্মণ শিবলিঙ্গ হাতে নিয়ে বললেন, ও বাবা, এত ভারি, এ তো আমি বেশীক্ষণ ধরতে পারব না।—বেশীক্ষণ কেন ধরবে, আমি এখুনি ফিরে আসছি। বলে রাবণ রাস্তার পাশে বসলেন।

বসলেন তো বসলেনই, ওঠবার আর নাম নেই। কর্মনাশা নদী বয়ে গেল, তবু রাবণ উঠতে পারলেন না, পেট থেকে বরুণ যতক্ষণ নিঃশেষে না বেরুচ্ছেন ততক্ষণ শান্তি কোথায় ! বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ বললেন, আর আমি পাচ্ছি না, এই রইল তোমার শিবলিঙ্গ। বলে সেই জ্যোতির্লিঙ্গ মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। বাস্, কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে। বরুণ বেরিয়ে গেলেন, ব্রাহ্মণও হলেন অন্তর্হিত। আর রাবণ। বেচারার দুর্দশার অন্ত নেই। এসে শিবলিঙ্গ আর তুলতে পারলেন না। অনেক চেষ্টার পরে রাগ করে আঘাত করলেন, তাতে লিঙ্গের খানিকটা ক্ষতি হল। এখনও লক্ষ্য করলে এই আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়।

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল : এই ব্রাহ্মণই নারায়ণ নাকি ?

শাস্ত্রে সেই কথাই বলে। স্বয়ং নারায়ণ এসেছিলেন ছলনা করতে। আবার অনেকে বলেন, ব্রাহ্মণ নয়, এক গোপের সঙ্গে রাবণের দেখা হয়েছিল, রাবণ শিবলিঙ্গ দিয়েছিলেন তাঁরই হাতে। বৈদ্যনাথ নাম কেন হল,

যে কথা আছে শিবপুরাণের কোটিরুদ্র সংহিতায়। রাবণ তো তাঁর নয়টি মুণ্ড শিবের পায়ে উৎসর্গ করেছিলেন, শিবের প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই মুণ্ডগুলি আবার জোড়া লেগেছিল। এ শুধু কোন বৈদ্যের হাতেই সম্ভব, তাই রাবণেশ্বর শিবের নাম বৈদ্যনাথ।—

অযোজ্যা সুদৃষ্ট্যা বৈ বৈদ্যবদ্ যোজিতানি মে।
শিরাংসি সংস্থিতা তু দৃষ্টানি পরমাত্মনা॥

সাধারণ লোকে অন্য কথাও বলে। ত্রেতা যুগে উনি রাবণেশ্বর শিব নামেই পরিচিত ছিলেন। রাবণই মন্দির নির্মাণ করেন ও চন্দ্রকূপ কুণ্ড খনন করেন। তারপরে লোকে এ সব ভুলে যায়। অনেকদিন পরে বৈজু নামে এক ব্যাধ এই শিবকে আবিষ্কার করে নিত্য পূজা শুরু করে। বৈজুর নামেই বৈদ্যনাথ।

এই বৈজুর সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী আছে। ব্রাহ্মণেরা নাকি বৈদ্যনাথের অনাদর আরম্ভ করেন। তাই দেখে বৈজুর খুব রাগ হয়। সে প্রতিজ্ঞা করে যে প্রতিদিন আহারের পূর্বে শিবের মাথায় একবার লাঠির আঘাত করবে। করতও তাই। একদিন সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে খেতে বসেছিল। হঠাৎ তার সংকল্পের কথা মনে পড়ল। আর তখনি উঠে কোনরকমে গিয়ে শিবের মাথায় আঘাত করল। ভক্ত তাঁকে স্মরণ করেছে, শিব মহা খুশী। জ্যোতির্লিঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বৈজুকে আশীর্বাদ করলেন। সেইদিন থেকে তাঁর নাম হল বৈজনাথ।

রাবণের নামের সঙ্গে অনেকগুলি নাম এখানে জড়িয়ে আছে। পথের ধারে যেখানে তিনি প্রস্রাব করতে বসেছিলেন, সেই স্থানের নাম ছিল হরিতকী বন, এখন বলে হরলাজুড়ি। এরই উত্তরে কর্মনাশা নদী। এই স্থানটি দেওঘর থেকে চার মাইল উত্তর-পূর্বে। তপোবনে রাবণ তপস্যা করেছিলেন। মাইল ছয়েক দূরে আর একটি দর্শনীয় স্থান আছে, তার নাম ত্রিকূট পর্বত। দেওঘরে যখন স্বাস্থ্যান্বেষীরা আসত দলে দলে, তখন তারা ত্রিকূট আর তপোবনে যেত পিকনিক করতে।

একসময় এখানে ধনী নির্ধন নির্বিচারে নানা রোগের রোগী আসত। শিবগঙ্গায় স্নান করে তাঁরা মন্দিরের বারান্দায় ধরনা দিত। তিন দিন তিন রাত্রি একেবারে অনাহারে। তারপর স্বপ্নাদেশ হত। রোগীর রোগ সারত, সন্তান আরোগ্য হত, এমন কি বন্ধ্যা নারীও মা হত। এখনও গরিবেরা আসে, ধনীরা তত আসে না। এ যুগে মানুষের বিশ্বাস বদলে গেছে। অর্থ নিয়েছে দেবতার স্থান। অর্থ থাকলে নাকি সব আছে, অর্থ দিয়ে দেবতাকেও কেনা যায়। তবু—

তবু কী?

মনোরঞ্জনের প্রশ্নের উত্তর দিতে রামচন্দ্রবাবু খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন : তবু দেবতারা বেঁচে আছেন। ধনবান পুরুষেরা যখন যক্ষের সাধনায় উন্মত্ত, বাড়ির গৃহিণীরা তখন লুকিয়ে মানত করছে— স্বামীর মন যেন গৃহাভিমুখী হয়, পুত্রকন্যা যেন বখে না যায়, রাত্রে একটু নিদ্রা, সংসারে একটু শান্তি।

মনোরঞ্জন হেসে উঠল, কিন্তু আমি হাসতে পারলুম না। ভদ্রলোক আমাকে ভাবিয়ে তুললেন। দেবতায় বিশ্বাস হারিয়েই কি আমরা সংসারে শান্তি হারিয়েছি!

বিশেষ কারণবশতঃ এই সংখ্যায় 'সংবাদ-সাহিত্য' এবং 'প্রসঙ্গ কথা'র প্রকাশ বন্ধ রহিল।

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মশাই প্রস্তাব দিয়েছেন যে আমি যেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং সাময়িক হিত্যকে জড়িয়ে কিছু একটা লিখি। প্রস্তাবটি :সন্দেহে একটু অদ্ভুত হলেও আমার সামনে প্রস্তাব নুযায়ী কাজ করার একটা সোজা রাস্তা ছিল। আমি নায়াসে বিবেকানন্দের নিম্নরেখ-যুক্ত কিছু কিছু কথা ল্লেখ করতে পারতাম; তারপর সাম্প্রতিক সাহিত্যের তি-প্রকৃতি সামান্য বিশ্লেষণ করে অত্যন্ত আপসোসের ঙ্গ উপসংহার টেনে বলতে পারতাম—এ যুগের সাহিত্য বেকানন্দের মহান্ আদর্শকে প্রায় ভুলতে বসেছে। লতে গেলে এটা ছিল আমার পক্ষে মহাজন-নির্দেশিত রমুলা—যাকে বলে পাকা পীচ-ঢালা রাস্তা। কিন্তু এমন কটা তৈরী পন্থা আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না ব ছোট্ট একটা কারণে। কারণটা হল এই যে, আমি নজে বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করি না।

কথাটা আমি এমন অকপটে খুব সম্ভব স্বীকার করতে ারতাম না যদি আমি কোন মন্ত্রী বা শাসক পার্টির কোন হোমরাচোমরা নেতা বা নিদেনপক্ষে কোন নামজাদা াহিত্যিক হতাম। এ রকমের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যখনই বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে কিংবা পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ সম্পর্কে (বা আর কোন মহাপুরুষ সম্পর্কে) কিছু বলেন বা লেখেন তখন সেই মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ না করার জন্য জনসাধারণকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেন। সেই সময়ে বোধ করি নিতান্ত অনাবশ্যক বোধেই তিনি নিজে সেই আদর্শ অনুসরণ করেন কিনা সে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেন না। ফলটা হাতে হাতে ভালই হয়; কারণ অধিকাংশ মানুষই ভাবে যিনি অত জোর গলায় গালাগালি দিতে পারেন তিনি নিশ্চয় কোন মহৎ আদর্শ অনুসরণ করে চলেন।

আমাদের আশেপাশে যে-সব ছোট বা বড় মহৎ লোক ঘুরে বেড়ান তাঁদের প্রধান পুঁজিই হচ্ছে সাধারণ লোকের এই সরল বিশ্বাস। সাধারণ মানুষ সব সময় বিশ্বাস করে যে, যে-লোক মন্ত্রী বা নেতা হয়েছে বা কোন প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী হয়েছে, সে লোকের নিশ্চয়ই কিছু অসাধারণ যোগ্যতা আছে। ওই সরল বিশ্বাসের কাজলটুকু মুছে ফেলতে পারলে দেখা যাবে যে বিবেকানন্দ বা অন্যান্য মহাপুরুষদের যদি কোন প্রভাব এখনও কোথাও থেকে থাকে তো তা আছে সাধারণ মানুষের মধ্যেই। কারণ সাধারণ মানুষ তাদের স্বার্থপর প্রয়োজনের খাতিরে অনেক অন্যায় কাজ করে থাকে বটে, কিন্তু সেজন্য তারা লজ্জিত বা অনুতপ্ত বোধ করে। অসাধারণ মানুষেরা অসাধারণ এই জন্যই যে তারা জানে যে ন্যায়-অন্যায় বোধটা সাধারণ মানুষের জন্য, তাদের জন্য তথাকথিত অন্যায় কাজগুলো আসলে বুদ্ধির খেলা মাত্র, যা তাদের উন্নতির সোপান হিসাবে কাজ করে।

আজকে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী বৎসরে এ কথা জোর গলায় বার বার করে শতকণ্ঠে উচ্চারিত হওয়া দরকার যে যাঁরা বিবেকানন্দের আদর্শের ধারক বা বাহক বলে পরিচিত তাঁরাই এই আদর্শকে সবচেয়ে কম জীবনে অনুসরণ করেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীদের কথা বলছি। এই সব ধনিকসঙ্গলোভাতুর স্বামীজীদের যেটুকু সংস্পর্শে এসেছি তাতে আমি দেখেছি যে এঁরা বিশেষ যত্নের সঙ্গে একটি চারিত্রিক গুণের অনুশীলন করে থাকেন—সে গুণটির নাম হল অহঙ্কার। এঁরা ভারতবর্ষের সবচেয়ে অভিজাত এবং ধনী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় এ বোধটি এঁদের মধ্যে একটু বেশী মাত্রায় আছে। এই আরামপ্রিয় বিলাসী কর্মবিমুখ স্বামীজীদের জীবনের আদর্শ যদিও সর্বত্যাগ, তথাপি সর্বভোগী অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিদের সামনে দেখলে এঁরা বিগলিত-হাস্য হয়ে ওঠেন; কিন্তু গরীব মূর্খ জনসাধারণের সঙ্গে এঁরা সাধারণতঃ বাক্যালাপ করেন না, যদি কখনো করতে বাধ্য হন তবে মনের বিরক্তি গোপন করার জন্য অযথা কষ্ট স্বীকার করেন না। এঁরা বেলুড়ে বা নরেন্দ্রপুরে মডেল ইস্কুল কলেজ স্থাপন করেছেন যেখানে শুধু বিশিষ্ট

বিশিষ্ট ছেলেরাই প্রবেশাধিকার পায়। বিবেকানন্দ মূর্খ দরিদ্র চণ্ডাল ভারতবাসীর জন্ম অনেক অশ্রু ন করেছিলেন। সেই সব অজ্ঞ মূর্খের দল আজও ; কিন্তু বিবেকানন্দের শিষ্যের দলের নজর আজ র মাথা ছাড়িয়ে অনেক উপরে চলে গিয়েছে। যে একটিমাত্র শহরে পঞ্চাশ হাজার লোক ফুটপাতে , সেদেশে এই উর্দ্ধদৃষ্টি-সম্পন্ন বিবেকানন্দ-ভক্তরা র হাজার মন্দির-সৌধ-ইমারত তৈরি করছে শুধু ময়ের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম।

আসলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাব্রতের নামে যা কিছু হ তা সবই য়ুরোপীয় মিশনারীদের অন্ধ অনুকরণমাত্র। বেকানন্দ বার বার বলে গিয়েছিলেন, পাশ্চাত্যের অন্ধ করণ করো না। তাঁর শিষ্যরা আজকে গুরুর উপদেশ সমেত গুরুকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

কাজেই বিবেকানন্দের নিজস্ব শিষ্যরাই যখন আজ র্শচ্যুত, তখন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা- তিতে ভি-আই-পিরা যতই তাঁদের উপস্থিতি দিয়ে আলোকিত করে তুলুন, তাঁরাও কিছু একটা আদর্শের গামী নন। অন্যকে কোন উপদেশ পালন করতে নিজে সেই উপদেশ অনুসারে না চলা বা চলতে চেষ্টা করা এক ধরনের ভণ্ডামি। শক্তি ক্ষমতা ও অর্থের নায় মগ্ন ভি-আই-পিদের পক্ষে এ ধরনের ভণ্ডামি ভা পায়। কারণ ভণ্ডামি করে তাঁরা মোটা রকমের স্কার পান। শক্তি ক্ষমতা ও মর্যাদার সাধনায় মগ্ন মকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীদের ক্ষেত্রেও একটু-আধটু ডামি থাকা স্বাভাবিক। কারণ এই ভণ্ডামিটুকু তাঁদের চ্ছে সংঘের অভ্যন্তরে ক্ষমতা এবং সংঘের বাইরে বৃহত্তর মাজিক জীবনে মর্যাদা। এবং তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবে র্থের মালিক হওয়ার অসুবিধা থাকলেও পরের টাকা ড়াচাড়া করার যে সুখ সে সুখও তাঁরা পাচ্ছেন প্রচুর রিমাণে।

তা ছাড়া এই ভণ্ডামি খুব স্বাভাবিক এবং সঙ্গত মাদের স্বনামধন্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পক্ষে। বেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বহু সভা- মিতিতে এই বৈশাখের মেঘের মত বর্ণবৃক্ষ, ঐরাবতের ঠের মত মেদবহুল বহাপুরুষটির বৃহত্ত-নিন্দিত কণ্ঠ অনেক বার শুনতে পেয়েছি এবং পাব। ইতিপূর্বেই তিনি রামকৃষ্ণের জীবনীর উপর রম্যরচনা লিখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছেন। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বইটিতে তিনি রামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান উপদেশ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখেছেন। তা অচিন্ত্যকুমারের মুখে এ উপদেশ সাজে। জননী-জঠর থেকে মুক্তিলাভ করার অল্প পরেই তিনি 'প্রথম প্রেম' লিখেছিলেন, এবং রামকৃষ্ণের জীবনী লেখা শেষ করে যখন কবরের দিকে এক-পা এক-পা করে এগুবার সময় এসেছে তখন লিখেছেন 'প্রথম কদম ফুল' (কদম ফুল মানে রোমাঞ্চ, মানে প্রেম)। কাজেই সতের বছর বয়স থেকে সাতান্ন বছর বয়স পর্যন্ত অগ্রগতির ফলে অচিন্ত্য-কুমারের যে উপমা প্রয়োগের দক্ষতা কিছু বেড়েছে তা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে হয়। কিন্তু উপমার আড়ালে সেই ইঁচড়েপক কিশোরটিকেই দেখতে পাচ্ছি, এবং তার রোমান্টিক কামিনীপ্রীতি। সুতরাং কামিনী ত্যাগের আদর্শ অচিন্ত্যকুমারের চরিত্রের উপর যে কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে। আর কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শের জন্মও বেশী দূর যাওয়ার দরকার নেই। 'পরমপুরুষ' প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর যখন টাকারা দল বেঁধে পায়ে হেঁটে বাড়িতে আসতে লাগল, তখন অনতিবিলম্বে সেই বইয়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল, তার পিছনে এলেন কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি। আরও যাঁরা যাঁরা এসেছেন বা আসছেন তাঁদের মধ্যে যুগন্ধর বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই অন্যতম।

কাজেই ভণ্ডামি উন্নতির সোপান। এ তত্ত্বটি যিনি যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন, তিনি তত তাড়াতাড়ি এক এক লাফে দু-তিন সিঁড়ি করে পেরিয়ে জীবনের সর্বোচ্চ সিঁড়িতে পৌঁছে যেতে পারেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভণ্ডামিকে ভণ্ডামি বলে যাঁরা চিনতে পারেন তাঁরাও অনায়াসে যীশুর মত ক্ষমা-প্রসন্ন হাস্তে এঁদের প্রশ্রয় দেন।

বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিবেকানন্দ সম্পর্কে যত আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে, তা প্রায় সবই—এক

কথায়—ভণ্ডামি সাহিত্য। যাঁরা লিখছেন তাঁরাই ভক্তি-গদগদ ভাষায় বিবেকানন্দের প্রশস্তি গাইছেন এবং সবাইকে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে উপদেশ দিচ্ছেন। অথচ তাঁদের জীবনের ত্রিসীমানাতেও বিবেকানন্দের প্রবেশাধিকার নেই। আমাদের দেশে অনেক জড়বাদী, নিরীশ্বরবাদী, মার্ক্সবাদী বা ভিন্ন আধ্যাত্মিক আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি আছেন। তাঁরা কেউ নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের পর্যালোচনা করছেন না। বিবেকানন্দ সম্পর্কে যত লেখা পড়ছি সে-সবই ভক্তির উচ্ছ্বাস, ভক্তের শ্রদ্ধা নিবেদন। অথচ সত্যি কথা এই যে আজকে ভারতবর্ষে একজনও বিবেকানন্দের প্রকৃত ভক্ত বা আদর্শানুসারী নেই। অন্তত: বিভিন্ন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কর্মে যাঁদের দেখতে পাচ্ছি তাঁদের মধ্যে নেই।

কাজেই আমার তো মনে হয় সে ভণ্ডামি না করে আজকে যদি বিবেকানন্দ সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে হয় তা হলে বিপরীত দিক থেকে শুরু করা ভাল। বিবেকানন্দের আদর্শ কেউ অনুসরণ করছে না বলে আপসোস না করে আমাদের বরং এই প্রশ্ন উত্থাপন করা দরকার—কেন আমরা বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করব? তার মধ্যে এমন কী আছে যা আজকেও আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়? বিবেকানন্দের মহত্ত্ব, বিরাটত্ব, তাঁর প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব—এ-সব সম্পর্কে মতদ্বৈধের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু মহত্ত্ব নানান্ জাতের আছে। এমন মহত্ত্ব আছে যাকে শুধু দূর থেকে প্রণাম জানাতে পারি।

বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণের কথাই ধরুন না। রামকৃষ্ণের চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু উদারতা আর মাধুর্য আছে যে তাঁকে নিজের পিতার মতই আপনার জন বলে মনে হয়। কিন্তু যখন তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার কথা ভাবি তখন তিনি আমার কাছে দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়। ঈশ্বরোপলব্ধি যে কী জিনিস তার কোন আভাস ও ইঙ্গিত আমি আমার অন্তরে কোনদিন অনুভব করি নি। সেটা উপলব্ধির ব্যাপার এবং সে উপলব্ধিও শুধু ইচ্ছা করলে বা চেষ্টা করলে পাওয়া যায় না। কাজেই সে উপলব্ধির যে মূল্য কী তা আমি বুঝতে অক্ষম।

বিবেকানন্দের চরিত্রের সুস্পষ্ট দুটি ভাগ আছে। একটা মিস্টিসিজমের দিক, অপরটি সমাজ-সেবার দি[illegible] যাও বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মত বিবেকানন্দে[illegible] কিছু অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল—যাঁর [illegible] অভিজ্ঞতা না হয়েছে তিনি বুঝতে পারবেন না। সক[illegible] এ-অভিজ্ঞতা হয় না, চেষ্টা করেও হয় না। যাঁদে[illegible] তাঁরাও অপরকে বুঝিয়ে বলতে পারেন না এটা[illegible] জিনিস। তাঁরা যখন সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার [illegible] বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিতে চান তখন তা হয়ে দাঁড়ায় দ[illegible] বিবেকানন্দও তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির যে বুদ্ধি[illegible] ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন তার নাম হল অদ্বৈত[illegible] কিন্তু মুশকিল এই যে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন [illegible] দর্শনশাস্ত্র উদ্ভাবিত হয় নি যাকে কোনরকম যুক্তি দি[illegible] খণ্ডন করা যায় না। তা ছাড়া বিবেকানন্দের দর্শন [illegible] মৌলিক দর্শন নয়; তা আমাদের ভারতবর্ষেরই প্রা[illegible] সম্পদ। এই অতি মূল্যবান দর্শন সম্পর্কে প্রত্যেকে[illegible] কিছু জ্ঞান থাকা উচিত। কিন্তু তা গ্রহণ করা বা না [illegible] ব্যক্তির যুক্তি-বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। [illegible] যদি যথেষ্ট বিবেচনার পর এ দর্শন গ্রহণে অসমর্থ হন [illegible] সেটা অপরাধ নয়।

আমরা যেমন প্রেমকে ব্যাখ্যা করতে পারি না, [illegible] বিবেকানন্দের মিস্টিক অভিজ্ঞতাকেও ব্যাখ্যা করতে [illegible] না। এবং যেহেতু এ অভিজ্ঞতা প্রেমের অভিজ্ঞ[illegible] চেয়ে অনেক বেশী দুর্লভ, সেহেতু এ জিনিস অনেক [illegible] মূল্যবান। কিন্তু ইচ্ছা করে বা চেষ্টা করে এ জি[illegible] লাভ করা যায় না বলে একে আমরা শুধু দূর থেকেই [illegible] দিতে পারি। এমন কোন কার্যক্রম আমরা জানি ন[illegible] বিবেকানন্দ আমাদের জানান নি, যার সাহায্যে[illegible] অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষক পেলে [illegible] যোগ সম্পর্কে শিক্ষা নিতে রাজী আছি; কিন্তু [illegible] শিক্ষার বিকল্প হিসাবে আমি ঈশ্বর নামক জ্ঞান[illegible] অতীত কোন ভদ্রলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে [illegible] নই।

কাজেই বিবেকানন্দের মিস্টিসিজম বা তার দার্[illegible] ভিত্তি আমার বা আমার মত কোন এ-কেলে মা[illegible] কাছে খুব প্রয়োজনীয় নয়। বাকী রইল বিবেকান[illegible] সমাজ-সেবা। তিনি যদি কোন বিশুদ্ধ সেবা[illegible]

প্রতিষ্ঠান গড়ে যেতেন তবে তা খুবই মূল্যবান হত। অনেকে হয়তো বলবেন এই ধরনের সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের কতটুকু উপকার করতে পারবে। এ যুক্তি আমি মানি না এইজন্য যে যদি একজনকেও উপযুক্ত শিক্ষা ও অন্ন দিয়ে মানুষ করে তোলা যায়, তবে তার মূল্য উপেক্ষা করা যায় না। একশো জনের উপকার করতে পারি না বলে একজনের উপকার করে লাভ নেই—এ শুধু দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার যুক্তি। সংখ্যার উপর আমার কোন অনাবশ্যক প্রীতি নেই।

কিন্তু মুশকিল এই যে বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণ মিশনের সৃষ্টি করে গেছেন তা বিশুদ্ধ সেবাব্রতের আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবেকানন্দ ধর্ম আর সেবাব্রত এই দুইকে এক করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় যাকে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়ে গিয়েছেন অচলায়তন। প্রতিষ্ঠাতার নির্দিষ্ট ধর্মমত এবং কার্যক্রমকে অতিক্রম করে যাওয়ার কোন উপায় এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের থাকে না বলে তা সহজেই পরিবর্তনশীল কালের সঙ্গে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্মের কোন স্থান নেই। এখানকার নিয়ম হল কঠোর একনায়কতন্ত্র; অধিকর্তার খেয়ালখুশি এবং পক্ষপাতমূলক আচরণের তলায় 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যা দেখা যায় রামকৃষ্ণ মিশন তার ব্যতিক্রম নয়।

আমার বিশ্বাস সাহিত্যচর্চার মত ধর্মানুশীলনও দল বেঁধে হয় না। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে আমাদের ধর্মচর্চা সব সময় ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত নয়। সমাজে কতকগুলো ধর্মীয় আচার নিয়ম প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সে শুধু সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকদের মধ্যে যোগসূত্র মাত্র; আমরা যে এক সমাজের লোক তারই পরিচয়জ্ঞাপক। কিন্তু বিবাহ, উপনয়ন, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারগুলির সঙ্গে উচ্চতর ধর্মসাধনার কোন সম্পর্ক নেই। প্রাচীন-কালের মুনি-ঋষিরা সবাই নির্জনে বসে একাকী তপস্যা করতেন। এবং তাঁরা যে মিস্টিক অভিজ্ঞতা লাভ করতেন তা যে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এ কথা অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। সেইজন্যই ভারতবর্ষে এত বিভিন্ন ধর্মমত, এত বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব। সেইজন্যই উচ্চতর ধর্মসাধনায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক, যেমন তা অত্যাবশ্যক উচ্চতর সাংস্কৃতিক চর্চায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনে ধর্ম-পিপাসা নিয়ে যে-সব ব্যক্তিরা যান তাঁরা আত্মার স্বাধীনতা লাভের আশায় যান বটে, কিন্তু আত্মবিক্রয়ই সেখানে টিকে থাকার একমাত্র শর্ত। যাঁরা আত্মবিক্রীত (যত মহৎ আদর্শের কাছেই হোক) তাঁদের বিবেক বলে কোন বস্তু থাকে না। সেইজন্যই রোমান ক্যাথলিক চার্চ বা ভারতের বিভিন্ন মঠ মন্দির পাপের বাসা, দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনে দুর্নীতি কী পরিমাণে আছে আমি তা জানি না; কারণ লৌহযবনিকার অন্তরালের খবর জানা সহজ নয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের মত প্রতিষ্ঠানে মানুষের আত্মরক্ষা করার দুটি উপায় আছে—অহঙ্কার এবং ভণ্ডামি। নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে ত্যাগ করে যে আত্মগ্লানি জন্মে, তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে সে লাভ করে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবার অহঙ্কার। আর ভণ্ডামি ছাড়া তো রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। সমানাধিকারের বাণী, সাম্যের বাণী, দরিদ্রের সেবা,—এ সব শুধু সভা-সমিতিতে উচ্চারণ করার জন্য। কার্যতঃ একটি পরগাছা প্রতিষ্ঠানকে বেঁচে থাকতে হলে যাদের দান করার শক্তি আছে সেই বড়লোকদের তোষণ করতেই হবে। বড়লোকদের সঙ্গে মিশতে হলে, বিদেশীদের চোখে সম্ভ্রম বাড়াতে হলে, চলনে বলনে দেহের মেদবাহুল্যে অভিজাত হওয়াটা অত্যাবশ্যক। কাজেই আভিজাত্যের শিক্ষা নিতে হয়। আর আভিজাত্যের স্বভাবই এই যে তা শুধু মুখোশ হিসেবে থাকে না, মনেও সংক্রামিত হয়। আর আভিজাত্যবোধ যত বাড়তে থাকে ততই নোংরা অপরিচ্ছন্ন গরীবের দল মনে বিরক্তি উৎপাদন করবেই।

কাজেই শিক্ষায় সংস্কৃতিতে ধর্মে রামকৃষ্ণ মিশন যে এক নতুন আভিজাত্য সৃষ্টি করছে এটা খুব স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান দেশের গণতান্ত্রিক

চেতনা ও বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ। বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন তখন নিশ্চয়ই তিনি এর এই পরিণতির কথা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু ভাবতে পারাটাই উচিত ছিল।

উপরের এই সামান্য আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিবেকানন্দের মিস্টিসিজম বাংলা সাহিত্যের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। সাহিত্য রূপের সাধনা, আর মিস্টিসিজম হল অরূপের সাধনা। সাহিত্যে অবশ্য কখনও কখনও রূপের মাধ্যমে মিস্টিসিজম দেখা দেয়, কিন্তু ধার করা মিস্টিসিজমে তার চলে না। লেখকের প্রত্যক্ষ মিস্টিক অভিজ্ঞতা থাকা দরকার—যেমন ব্লেক বা ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের ছিল। কাজেই বিবেকানন্দের মিস্টিসিজমের কোন প্রভাব যে বাংলা-সাহিত্যের উপর পড়ে নি সেজন্য বাংলা-সাহিত্যকে দোষী বলে গণ্য করা যায় না। বিবেকানন্দ-সৃষ্ট রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে এমন কিছু নেই যা সাহিত্যের উপর কোন কল্যাণকর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। বরং বাংলা-সাহিত্যের উপর যে মিশনের তেমন কোন প্রভাব পড়ে নি এ ঘটনা আমাদের পক্ষে স্বস্তিদায়ক।

বিবেকানন্দের সমাজ-সেবার আদর্শের প্রভাবও বাংলাদেশের সাহিত্যে খুব কমই অনুভব করা যায়; এবং সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে তা প্রায় সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। একমাত্র তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী'তে ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য বইতে তো আমি সেবামূলক আদর্শ দেখতে পাচ্ছি না। এটাকেও আমি স্বাভাবিক বলে মনে করি। কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান যদি সেবামূলক কাজ করে আমি নিশ্চয়ই তার মূল্য আছে বলে মনে করি। কিন্তু ভাবাদর্শ হিসাবে সমাজ-সেবার আদর্শ এ যুগে অচল। এই রাজনীতি কণ্টকিত পৃথিবীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণের পরিকল্পনা এমন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত যে একটিকে বাদ দিয়ে আর একটির কথা ভাবা যায় না। কাজেই খুব সঙ্গতভাবেই বিবেকানন্দের সমাজ-সেবার আদর্শের বদলে রাজনৈতিক ভাবদ্বন্দ্বের প্রভাব বাংলা-সাহিত্যে অনেক বেশী করে অনুভব করা যাচ্ছে।

বিবেকানন্দের অন্যান্য বাণী—যেমন জাতিভেদের বিরুদ্ধতা, সাম্যবোধ, কর্মযোগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ,—প্রভৃতি খণ্ড আদর্শগুলি নানাবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে বাংলা-সাহিত্যের নানা জায়গায় আজও ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এ সব তো শুধু বিবেকানন্দের একার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতক থেকে শুরু করে জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত অগুনতি মহাপুরুষ আমাদের সামনে এ কথাগুলো বলে গিয়েছেন; এবং তাঁদের সমবেত প্রভাবই বাংলা-সাহিত্যে অনুভব করা যায়।

কিন্তু বিবেকানন্দ যে বলেছিলেন, পাশ্চাত্যের অনুকরণ করো না, ভারতীয় আদর্শের অনুগামী হও, সে বাণী বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হয় নি। যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ পাশ্চাত্য জীবন-যাপন প্রণালী দেশের ভিতরে এসে পড়ছে। এটা খারাপ কি ভাল, সেটা প্রশ্ন নয়; বাস্তব সত্য হল একে ঠেকানোর কোন উপায় নেই। অনুকরণ খারাপ হতে পারে, কিন্তু অনুকরণ যখন প্রয়োজন-জাত তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কাজেই বাস্তবতাবোধ সাহিত্যের বিশেষত্ব বলে বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে পশ্চিমের আংশিক অনুকরণকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করার চেষ্টা আছে। যেটা প্রয়োজন সেটা পশ্চিমকে বর্জন নয়, পশ্চিমের আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের যা শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী ফসল তার সমন্বয়-সাধন বা সামঞ্জস্য-বিধান। বিদ্যাসাগর, রামমোহন এই সমন্বয়ের কথাই বলেছেন এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যেও নানাভাবে এই সমন্বয়ের বা সামঞ্জস্যের আদর্শই প্রাধান্য পেয়েছে। একমাত্র তারাশঙ্কর তাঁর সাম্প্রতিক কালের কোন কোন বইতে প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকের সামনে, কিন্তু বিবেকানন্দের মত তারাশঙ্করকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে।

কাজেই সাম্প্রতিক সাহিত্যের উপর বিবেকানন্দের যে কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব অনুভব করতে পারছি না তার সঙ্গত কারণ আছে। সেজন্য সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ আধুনিক ভারতের কাছে বিবেকানন্দের কর্ম ও বাণীর একমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্য যে নেই এ কথা অকপটে স্বীকার

করা ভাল। সত্যকে স্বীকার না করে মিছিমিছি ভণ্ডামির প্রশ্রয় না দেওয়া ভাল ; বিশেষ করে সেই ভণ্ডামি দ্বারা আমরা যখন মন্ত্রীগিরি বা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্টগিরি লাভ করতে পারব না।

কিন্তু এ আলোচনার পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তবে কি বাংলা-সাহিত্য বিবেকানন্দের মত অতবড় পুরুষসিংহকে রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দেবে? বিবেকানন্দের থেকে কি সাহিত্যিকদের কিছুই শিক্ষণীয় নেই? আমার মনে হয়, আছে; এবং যা আছে তা বিবেকানন্দের কর্ম এবং বাণীর থেকে অনেক বড়,—তাঁর ব্যক্তিত্ব। কালের যাত্রার স্রোতে মানুষের কর্ম এবং বাণী সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করে ফুরিয়ে যায় ; কিন্তু তার পরেও বেঁচে থাকে মানুষটির মৌলিক চরিত্র। তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,—রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলে গিয়েছেন। সাহিত্যের যে কালজয়ী আবেদন তার একটা কারণ অন্ততঃ এই যে কর্ম ও কর্মীর ঊর্ধ্বে যে আসল মানুষটা তাকে ধরে রাখতে পারে। রামায়ণ-মহাভারতের অপরূপ চরিত্রগুলির জন্যই এ দুটি মহাকাব্য আজ এত যুগ পরেও আমাদের মুগ্ধ করে।

আমি এ কথা বলছি না যে বিবেকানন্দের মত চরিত্র বাংলা-সাহিত্যে সৃষ্টি করতে হবে। সেটা সম্ভবপর নয়। আমি এমন কথাও বলছি না যে সাহিত্যিকেরা বিবেকানন্দ-চরিত্রকে অনুকরণ করুন। সেটাও অসম্ভব প্রয়াস হবে। চেষ্টা করে বিবেকানন্দ বা অপর কোন মহাপুরুষ হওয়া যায় না। কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে, যা অর্জন করা, যে-কোন মানুষের পক্ষে, বিশেষ করে সাহিত্যিকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সে জিনিসটা হল সততা ও আন্তরিকতা। মনে মুখে এক হওয়া। একটি অখণ্ড ব্যক্তিত্ব অর্জন করা।

বিবেকানন্দের ভাষা যিনিই পড়েছেন তিনি নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটা আশ্চর্য জোর অনুভব করেছেন। তার কারণ আর কিছুই নয়—বিবেকানন্দ যা বলেছেন সমগ্র সত্তা দিয়ে বলেছেন। দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিত্ব—যা অধিকাংশ মানুষের বিশেষত্ব—বিবেকানন্দের তা ছিল না। এই রকমের Integrated personality অর্জন করা যায়—যদি একটি ছোট্ট গুণ থাকে, সততা। আমি অন্তরে যা অনুভব করব তা বলব। ভয় লজ্জা বা অর্থের পরোয়া করব না।

সত্যি কথা বলতে কি, সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যিকদের (আমি একজনকেও ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করতে চাই না, নিজেকেও না) বড্ড সস্তা মনে হয়। সামান্য টাকা দিয়ে বা সামান্য সম্মান দিয়ে তাদের কিনে নেওয়া যায়। বঙ্কিম বা মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে টাকা দিয়ে বশীভূত করা যেত, তাঁদের দিয়ে তাঁদের শিল্পানুভূতির বিপরীত কিছু লেখানো যেত, এ কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এ যুগের লেখকেরা অনায়াসে সিনেমায় বেশী টাকা পাওয়া যায় বলে নিজের প্রকৃত শৈল্পিক অভিজ্ঞতাকে রূপ না দিয়ে সিনেমার পক্ষে উপযোগী গল্প রচনায় বেশী মন দেন। এ যুগে পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে জনতা-চরিত্র প্রকটিত হয়ে উঠছে। জনতা-চরিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে চটকদার জিনিসের প্রতি আকর্ষণ। আর এই ধরনের পাঠকদের ভুলানোর জন্য চারদিকে আজ রম্যরচনা আর রম্য-রচনা-ধর্মী গল্প-উপন্যাসের ছড়াছড়ি। এমন লেখক প্রায় চোখেই পড়ছে না যিনি এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণা-জর্জরচিত্তে নিজের প্রকৃত উপলব্ধিজাত কোন বক্তব্য বা জিজ্ঞাসা বা প্রতিবাদকে হাজির করছেন পাঠকের সামনে। এ কালের যে সাহিত্য মোটামুটি সার্থক, সেখানেও তা অর্ধেক আন্তরিকতাপূর্ণ অর্ধেক শঠতাপূর্ণ ভাষায় লেখা। কারণ আমরা অধিকাংশ মানুষই আজ জানি না কোন্‌টা সত্যি সত্যি আমাদের বক্তব্য, যা আমাদের মত, যা যে কোন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও প্রকাশ করে বলা যায়।

আমার মনে হয় বাঙালী সাহিত্যিকেরা যদি প্রতিদিন একবার করে বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ করেন তাহলে হয়তো তাঁদের কিছু উপকার হতে পারে।

—

নিন্দুকের প্রতিবেদন

নারায়ণ দাশশর্মা

পাঠকের মার্জনা ভিক্ষা করি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আবার তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছি এ অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করুন তিনি। গত সংখ্যায় স্পষ্ট লিখে দিয়েছিলাম, আমার পার্ট প্লে করা হয়ে গেছে; কেউ 'এনকোর' বলে চেঁচালেও আমি আর ফিরছি না স্টেজের ওপর। তারপর চক্ষুলজ্জার খাতিরেও একটি দুটি সংখ্যা বিরতি দেওয়া কি উচিত ছিল না অন্ততঃ? একটু বিশ্রাম করা উচিত ছিল না গ্রীনরুমে? মহিলাদের লেখা চিঠিতে যেমন 'ইতি' শব্দটি দেখলেই বোঝা যায় এর পরেই 'পুনশ্চ' থাকবে, তেমনতর অস্থিরমতিত্বের লক্ষণ কেন নিন্দুকের?

এর একমাত্র কারণ, আমার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সম্পাদকীয় প্রতিশ্রুতির বিরোধ। চৈত্র সংখ্যা চিঠিতে যুগপৎ দুটি প্রতিশ্রুতিই প্রকাশিত হয়েছিল: সম্পাদকীয় বিভাগ আগে জানতে পারেন নি যে সহসা নিন্দাকর্মে বৈরাগ্য এসেছে আমার তাই তাঁরা পরবর্তী সংখ্যার বিজ্ঞাপনে লেখকতালিকায় এই অধমের নামও উল্লেখ করেছিলেন; এদিকে আমি আবার অবগত ছিলাম না যে ওরকমের কোন বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয়েছে, ফলে আমার বৈরাগ্য স্থগিত রাখার কোন কারণ আমি দেখতে পাই নি। অতএব এই বিপত্তি।

এখন প্রশ্ন হল কোন্ প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে এবং ভঙ্গ হবে কোন্ প্রতিশ্রুতি। সম্পাদক অথবা নিন্দুক, কার সত্যরক্ষা অধিক প্রয়োজন?

এই কথা নিয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করছিলাম— এমন সময় মনে পড়ল রামকৃষ্ণ পরমহংস কী উপদেশ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দকে।

"ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! তোর এত ছোট নজর!...তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস? আর এই যে সব অসংখ্য অসহায় জনগণ, তাদের কি হবে? [illegible] ইত্যাদি।

মনে পড়তেই অমনি আমার সিদ্ধান্ত সহজে এসে গেল। নিজের সত্যরক্ষা করতেই হবে, তাতে করে অপরের সত্যভঙ্গ হল কিনা তার প্রতি দৃক্‌পাত না করে, এত ছোট নজর হবে কেন নিন্দুকের?

অতএব আমি নির্লজ্জ অকুতোভয়ে আবার বসেছি প্রতিবেদন রচনায়, আমার জীবনীগ্রন্থের ভবিষ্যৎ রচয়িতা দয়া করে নোট করে রাখুন। লিখে রাখুন যে ইনি এতবড় উদারহৃদয় ছিলেন যে অপরের অনুরোধে আপন প্রতিশ্রুতি নাকচ করতেও পেছ-পা হতেন না।

আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি একটি দুর্বল রসিকতার প্রয়াস করলাম মাত্র। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এটি পরিহাস নয়।

কৌতুকপ্রিয় ভাগ্যদেবীর খামখেয়ালিতে যদি কোনদিন মাদৃশ ব্যক্তির জীবনীরচনার মত হাস্যকর ঘটনার অবতারণা হয় তাহলে উল্লিখিত ঘটনাটিও আমার মহত্ত্বের প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এদেশীয় জীবনী রচনার রীতিতে এটি খুবই স্বাভাবিক।

একটু বিশদ ব্যাখ্যা করছি আমার বক্তব্যের।

একজন মানুষ যখন আপন চরিত্রে বা সাফল্যে, শৌর্যে বা মনস্বিতায়, কীর্তি বা কর্মফলের কারণে খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করেন তখন তাঁর জীবন-কাহিনী পাঠে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এমন কী স্বতঃসিদ্ধ আছে যে মহৎব্যক্তির জীবনে সংঘটিত প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনার মধ্যেই থাকবে মহত্ত্বের ইঙ্গিত? অসাধারণ মানুষও মানুষ, অসাধারণ তাঁর কীর্তির অভ্রভেদী মিনারের আশেপাশে সাধারণ ক্রিয়াকলাপের তৃণগুল্ম থাকবে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই; সেগুলিকে মহত্ত্বের অর্থে উজ্জ্বল করার প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন।

জীবনী রচনার জন্ম তাই মোটামুটি দুই বিভিন্ন রীতির র কোন একটি অনুসরণ করা চলে। মহাপুরুষের ীবন-কাহিনীর খুঁটিনাটি ক্রিয়া-কলাপের প্রসঙ্গ মোটেই া তুলে আমরা কেবলমাত্র সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ়তে পারি যে-প্রসঙ্গে মহাপুরুষের প্রকৃত মহত্ত্ব, যেখানে তনি অপরের চাইতে পৃথক। তাঁর দৈনন্দিন জীবন-াপনের বিস্তারিত বর্ণনায় আমাদের কৌতূহল থাকতে ারে কিন্তু প্রয়োজন নেই। বিকল্প রীতিতে জীবনী-চনায় মহৎ-প্রসঙ্গের ওপর বরং একটু কম জোর দিয়ে ামরা মহাপুরুষের মানবিক চিত্র—রক্তমাংসে ভালোমন্দে াশানিরাশায় ব্যর্থতা চরিতার্থতায় নিতান্ত আমাদেরই কজন হিসাবে ফুটে ওঠে যে-চিত্র—আঁকতে পারি। ের দেবতাকে করে তুলতে পারি কাছের মানুষ।

দুটি রীতিরই সার্থকতা আছে, যদিও সার্থকতার ক্ষেত্র ন্ন। ভারতীয় ঐতিহ্যে সাধারণতঃ প্রথমোক্ত রীতির ুসরণ ছিল ; দ্বিতীয় রীতিটি এসেছে ইংরেজী সাহিত্য ারফত।

সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় মহৎ ব্যক্তির জীবনের এমন ান কাহিনী, যা তাঁর মহত্ত্বের সূচীপত্রে উল্লেখযোগ্য নয় থচ মানবিক কৌতূহলে বিচিত্র,—অর্থাৎ ইংরেজীতে াকে অ্যানেকডোট বলা হয়ে থাকে—সাধারণতঃ ারতীয় জীবনীকার উপেক্ষা করে যেতেন। ইয়োরোপও াধ হয় রেনেসাঁসের আগে পর্যন্ত, অথবা তারও পরে ই এক শতাব্দী অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, মহাপুরুষের াবনে অ্যানেকডোট অন্বেষণে তেমন কৌতূহলী ছিল া। মনীষীর জীবন থেকে ততটুকুতেই আমরা অধিকারী লাম, আগ্রহীও ছিলাম তার চাইতে বেশি নয়, তটুকুতে মনীষীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকট। জীবনী অর্থই ছিল ালাপ থেকে অন্তরা পর্যন্ত শ্রেয়-রাগের একটানা ধ্রুপদ।

রুচির পরিবর্তনে প্রথমে ইয়োরোপে এবং অচিরেই ারতবর্ষে ধ্রুপদের স্থলে আদৃত হতে আরম্ভ করল ঘুতর সঙ্গীত। এল জীবনীগ্রন্থে খেয়ালের ঢঙ। মূল া থেকে ডাইনে ঝুঁকল বাঁয়ে বাঁকল গায়কের সুর, সৃষ্টি হল অসংলগ্ন ঘটনার চমকিত আবর্ত, বিচ্ছিন্ন চিত্রের চিত্র ঔজ্জ্বল্য। অ্যানেকডোট আমদানি হতে থাকল ীবনীগ্রন্থে।

ক্রমে এমন দিন এল যে খেয়ালেও মন ভরে না প্রাকৃতজনের, সে চায় আরও লঘুসঙ্গীত ; রম্যরীতির প্রাদুর্ভাব হল জীবনী-রচনার আসরে।

তখন জীবনীতে অ্যানেকডোটের প্রাচুর্য জীবনকে স্থানচ্যুত করে ফেলল ক্রমশঃ। নামে বায়োগ্রাফি, স্বভাবে ফিকশন, এই হয়ে দাঁড়াল হালফ্যাশন।

অ্যানেকডোটের আবেদন কৌতূহলের উদ্দীপনায়। আইনস্টাইন কবে একদিন অন্যমনস্কতার কারণে বাসের টিকিট কিনে খুচরো পয়সার হিসেবে বার বার ভুল করছিলেন, এই কাহিনী শুনে আমরা আইনস্টাইনকে বুঝতে চাই না, চাই কৌতুকমিশ্রিত কৌতূহল খুঁজতে। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র যে এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত্রির ক্ষুব্ধ দামোদর সন্তরণে অতিক্রম করেছিলেন, সে কাহিনীর মধ্যে বীরসিংহের বীরশিশুর চরিত্র উপস্থিত ; যদিও এটিও বলতে গেলে অ্যানেকডোট। রম্যরীতি জাতের রম্য-জীবনীগ্রন্থে প্রথম জাতের অ্যানেকডোটের কদর বেশি, কারণ ওগুলো ওজনে হালকা।

তবু অ্যানেকডোটের মধ্য থেকে কি চরিত্রের আভাস ঝিলিক দেয় না? দেয়। যেমন আইনস্টাইনের নামে প্রচলিত অ্যানেকডোটটি থেকে তাঁর অন্যমনস্কতা ও সারল্য প্রতিফলিত হচ্ছে।

মানুষের, মহৎ মানুষও ব্যতিক্রম নয়, চরিত্র অসংখ্য বর্ণচ্ছটায় বিচিত্র ; তার কতকগুলি বর্ণ মিলে একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ তাৎপর্য সৃষ্টি হলে আমরা সেই বর্ণগুলির প্যাটার্ন দিয়ে মানুষটিকে চিহ্নিত করি। বলি, ইনি দেশপ্রেমিক, ইনি বীর, ইনি শিল্পী, ইনি পরোপকারপ্রবণ, ইনি দার্শনিক। কিন্তু সেই বর্ণগুলিই সব নয় চরিত্রের। প্রত্যেকের চরিত্রবর্ণালীতে স্বকীয়তার একটি দুটি দাগ পাওয়া যায়, যেটি বা যেগুলি মূল প্যাটার্নটির সঙ্গে আপাতদৃষ্টে মেলে না। বীরত্বের সঙ্গে স্বার্থপরতা, দেশ-প্রেমের সঙ্গে হয়তো উৎকেন্দ্রিকতার একটা দাগ পড়ে যায় চরিত্রবর্ণালীতে। সার্থক জীবনীগ্রন্থ বলি তাকে, যার মধ্যে আলোচিত ব্যক্তির চারিত্রিক প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য—প্রশংসার ও নিন্দার প্রশ্ন নির্বিশেষে—যথাযথ অনুপাতে ফুটে ওঠে ; যার মধ্যে চরিত্রবর্ণালীর মূল প্যাটার্নটি স্পষ্ট

হয়ে ওঠে কিন্তু সে প্যাটার্নের সঙ্গে না-মেলা দাগগুলোও ঢেকে রাখা হয় না।

এ রকমের সার্থক জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা কম। কেন না এ লেখা শক্ত কাজ। তার বদলে সাধারণতঃ লেখা হয়ে থাকে এমন জীবনীগ্রন্থ যাতে আলোচিত ব্যক্তির প্রশংসার্হ প্যাটার্নটি মাত্র উপস্থাপিত হয়, চরিত্রের অন্যান্য অংশ—যা মূল প্যাটার্নের সঙ্গে মিলছে না—থাকে অনুক্ত। বলে রাখা দরকার, দুর্বল গ্রন্থকারের পক্ষে এটিই প্রকৃষ্ট পন্থা। কারণ শক্তিহীন গ্রন্থকারের পক্ষে যথাযথ অনুপাত রক্ষা কঠিন।

এ কথা অবশ্য পুরনো রীতির জীবনীগ্রন্থের ক্ষেত্রেই সত্য। সেই জাতের জীবনী সম্পর্কে, যার সঙ্গে আমি ধ্রুপদ সঙ্গীতের উপমা দিয়েছি।

অপর প্রকারের, আধুনিকতর, জীবনী—যাতে রম্যরচনার ঢঙে শুধুই অ্যানেকডোটের ছড়াছড়ি, তাতে গ্রন্থকার একেবারে নিরঙ্কুশ। তাঁর তো প্যাটার্ন উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কেবল কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী অন্বেষণ ও উপস্থাপনের। কাহিনীগুলির মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকার প্রয়োজন নেই, কোন তাৎপর্য ভেসে ওঠবার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই কোন পরিমাণজ্ঞানের। কাহিনীগুলো আকর্ষণীয় হলেই হল।

সম্প্রতি এই দুটি রীতি ছাড়াও আর একটি তৃতীয় রীতিতে জীবনী রচনা আমাদের চোখে পড়ছে। সেটি ঠিক নতুন কোন অভিনব রীতি নয়, উল্লিখিত দুটি বিরোধী রীতির সিন্‌থেসিস।

সিন্‌থেটিক পদ্ধতির জীবনীতে ফর্ম থাকে অ্যানেকডোট-কণ্টকিত দায়িত্বহীন রম্যরচনার, কিন্তু ভান থাকে ধ্রুপদী [ঢ]ঙের। শুনতে খুব কঠিন শোনাচ্ছে বটে কিন্তু কাজটা [আ]সলে সবচেয়ে সোজা। কৌশলটা বলছি।

মনে করুন আপনি কাজি নজরুল ইসলামের জীবনী [র]চনা করতে মনস্থ করেছেন। ধ্রুপদী ঢঙে এই কাজ [ক]রতে চাইলে আপনাকে কাজির চরিত্রে প্রশংসনীয় মূল [প্য]াটার্নটি খুঁজে বার করতে হবে; তারপর সেই সব [ঘট]নাগুলি সাজিয়ে যেতে হবে যার মধ্য থেকে সেই প্যাটার্নটি প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে রম্যরীতির ঢঙে য[দি] আপনার অধিকতর রুচি হয় তবে বাছাই করতে হ[বে] গল্প আবেদন যাতে সমধিক সেই জাতের অ্যানে[ক]ডোটগুলি। প্রত্যেকটি অ্যানেকডোট যে সত্য হ[তে] হবে, এমন কোন মাথার দিব্যি নেই; অনায়াসে আপ[নি] সেই সব স্টক কাহিনীগুলি—যা বহু লোকের না[মে] কখনো না কখনো প্রচলিত হয়েছিল—নির্বাচন ক[রতে] পারেন। [‘পান’ শব্দটির উপর pun করে যে মজা[র] কাহিনীটি যুগপৎ নজরুল এবং শিবরাম দুই জীবিত ব্যক্তি[র] নামে প্রচলিত—সেটি বর্জন করা তো অসম্ভব [...] আপনার পক্ষে।]

কিন্তু সিনথেটিক পদ্ধতিতে কাজির জীবনী লিখ[তে] হলে আপনি অ্যানেকডোট সংগ্রহও করবেন [...] প্রত্যেকটি অ্যানেকডোটের শেষে একটি বা দুটি প্যারা[গ্রাফ] সংযুক্ত করে বলে দেবেন যে এই কাহিনীটি থেকে বো[ঝা] যাচ্ছে কাজি নজরুল কতবড় একজন উঁচুদরের [...] (বা কবি, বা সঙ্গীতকার, বা দেশপ্রেমিক, বা সুর[...] বা প্রেমিক, বা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসাধক, বা সার[...] প্রতিমূর্তি, বা অন্য যা হোক কিছু একটা)! সিনথে[টিক] রীতির সুবিধা এই যে ধ্রুপদী রীতির মত এতে একটি নির্দিষ্ট কয়েকটি মহত্ত্বের প্যাটার্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখ[তে] হয় না গ্রন্থটি; এবং রম্যরীতির ম[ত] এতে অ্যানে[ক]ডোটগুলি আগাগোড়া কৌতূহলো[দ্দীপ]ক করতে হয় ন[া,] গল্পের রসে যেটুকু কমতি পড়ে সেটুকু বক্তৃতার রভ[...] চাপা দেওয়া যায়।

এতক্ষণে, এই এতক্ষণ পরে, আমি আমার মূল বক্ত[ব্যে] প্রত্যাবর্তন করছি। বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে গি[য়ে] তাত্ত্বিক কচকচির যে লবণ হ্রদে পড়ে গিয়েছিলাম এতক্ষণে তার ওপার খুঁজে পাওয়া গেল।

বলছিলাম যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনীকার দয়া কর[ে] নোট করে রাখুন আমার পরার্থপরতার একটি অকাট[্য] প্রমাণ। আপন সত্যরক্ষার তুচ্ছ প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে আমি আজ সম্পাদকীয় সত্যরক্ষার জন্য ব্রতী হয়েছি। পত্রের শেষে পুনশ্চের মত, মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের মত, দেবদূতের ভূমিকায় পাগলা দাশুর মত, চাটনির

্শেষে শারদীয়ার মত, চৈত্র সংখ্যায় সর্বশেষ
তিবেদনের পরে আবার বসেছি বৈশাখের নতুন
তিবেদন লিখতে। অহো, কী মহত্ত্ব!

আমার সিনথেটিক পদ্ধতির ভবিষ্যৎ জীবনীকার নোট
র রাখুন। বিলম্বে পস্তাইবেন!

এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

যাঁরা আমার পুরাতন পাঠক, তাঁদের কি এখনও আর
ছু বলে দিতে হবে? তাঁরা কি এতক্ষণে বুঝে ফেলেন
, কেন যে আমি কুস্তির আখড়ায় দাঁড়িয়ে রাউণ্ডের পর
উণ্ড শুধু পাঁয়তারা কশছি; খেলায় নামছি না কিছুতে।
মিকার সুতো ছেড়ে যাচ্ছি কেবল, আসল লেখার
লায় হাত দিচ্ছি না। পুরাতন পাঠকদের কাছে
কথা খুলে বলতে হবে না, জানি।

নতুনদের জন্য চুপিচুপি বলছি—যে বইটি সমালোচনা
রতে বসেছে আপনাদের গলিতনখদন্ত বৃদ্ধ নিন্দুক,
সখানি এখনও তার সম্পূর্ণ পড়া হয় নি।

সমালোচ্য পুস্তক পড়া শেষ হয় নি অথচ লেখা প্রেসে
দবার প্রতিশ্রুত সময় চলে যাচ্ছে, এ বিপত্তির সঙ্গে
ুলনীয় হতে পারত—পরীক্ষা দিতে বসে প্রশ্ন পড়া শেষ
য় নি কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ প্রায়, এমন কাল্পনিক
রবস্থার। সে-অবস্থায় পড়লে আমি যা করতাম,
এখনও তাই করছি; একটি দুটি করে যেটুকু প্রশ্ন পড়া
হচ্ছে বাকি প্রশ্নের দিকে নজর না দিয়ে শুধু সেই
টুকুরই উত্তর লিখে যাচ্ছি উত্তরপত্রে। এতে লজ্জার
কিছু নেই, কেন না আমার পূর্বপুরুষ বিষ্ণুশর্মা বলে
গেছেন,—আয়ু বেকালে কম তথা বিঘ্ন যথায় বহুশঃ,
স স্থলে কেবলমাত্র সার গ্রহণ করিবে। এবং এই
ইটির যেটুকু আমি পড়ে দেখেছি তাতে অন্তত এ বিষয়ে
আমার সন্দেহ নেই যে কেবলমাত্র সার গ্রহণ করতে
গেলে এ পুস্তকটির সম্পূর্ণ যদি বর্জন করি তবে পঞ্চতন্ত্রের
নীতিশাস্ত্রকে পরিপালন করা বই অন্যথা হবে না।

কিংবা অন্যদিক থেকে বলা চলে, এ পুস্তকখানির
কিছু বর্জন করা চলে না—সার গ্রহণ করতে হলে।
ত প্রকার উত্তম জৈব সারের কথা কৃষিবিভাগের প্রচার-
পুস্তিকা পাঠে জানা যায়, এই বইখানি তার মধ্যে
সর্বোত্তম সারের সগোত্র।

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' লেখকের অন্যান্য জীবনী-
গ্রন্থেরই মত সিনথেটিক কায়দায় বায়োগ্রাফি। চেহারায়
রম্য-রচনা, প্রিটেনশনে ক্লাসিকাল।

অ্যানেকডোট এবং বক্তৃতায় শুরু হয়েছে বইটির
একেবারে প্রথম লাইন থেকে:

"'বড় হয়ে কী হবি রে বিলে।' বাবা হঠাৎ
জিগগেস করলেন। বাবার চোখের দিকে তাকাল
একবার বিলে। বললে, 'কোচোয়ান হব।' তার মানে
গাড়ি চালাব। চাবুক মেরে ঘোড়া ছোটাব। কিসের
চাবুক? চেতনার চাবুক। ঘোড়া দুটো কে-কে। ধর্ম
আর কর্ম। আর গাড়ি। গাড়ি হচ্ছে আমাদের এই
অলস দেশ। গাড়ি তো নয় গাধাবোট।"

এ অংশের প্রথম চারটি বাক্য অ্যানেকডোট। এতে
গল্পের মজা আছে। যিনি পরবর্তী জীবনে বিবেকানন্দ
হলেন, তিনিই বাল্যকালে চরম অ্যাম্বিশন বলে
ভেবেছিলেন কোচোয়ান হওয়া।

এটি অ্যানেকডোট বটে কিন্তু পুরোপুরি মজাদার
নয়। যে-কোন পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সী বালককে
জিজ্ঞেস করুন, বড় হয়ে সে কী হবে। বেশীর ভাগ
ছেলে উত্তর দেবে, কোচোয়ান (আজকাল যুগের
পরিবর্তনে ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার এগুলোও শুনতে পাবেন)
অথবা পুলিস অথবা ভোজপুরী দারোয়ান। ছোটদের
চোখে এগুলি বীরত্বের, অতএব বড়ত্বের পরাকাষ্ঠা।
কাজেই বালক বিবেকানন্দ কোচোয়ান হতে চেয়েছিলেন
এ সংবাদে পাঠকের ততটা কৌতূহল উদ্রিক্ত হবে না।
বড়জোর পাঠক বাৎসল্য রসমিশ্রিত ঈষৎ কৌতুককে
মুহূর্তের জন্য মনে করবেন, তাঁর পুত্র বাল্যকালে অনুরূপ
কোন্ উচ্চাভিলাষ পোষণ করত।

কিন্তু অ্যানেকডোটের দাঁড়ে পপুলারিটির নৌকো
যদি না এগোয় তবু ভাবনা কী? বক্তৃতার পাল তুলব।
তাতে মেটাফরের হাওয়া লাগাব। আধ্যাত্মিক
প্রিটেনশনের হাল তো ধরাই আছে। তর তর করে
এগিয়ে যাবে জনপ্রিয়তার নৌকো কম্পিটিশনের উজান
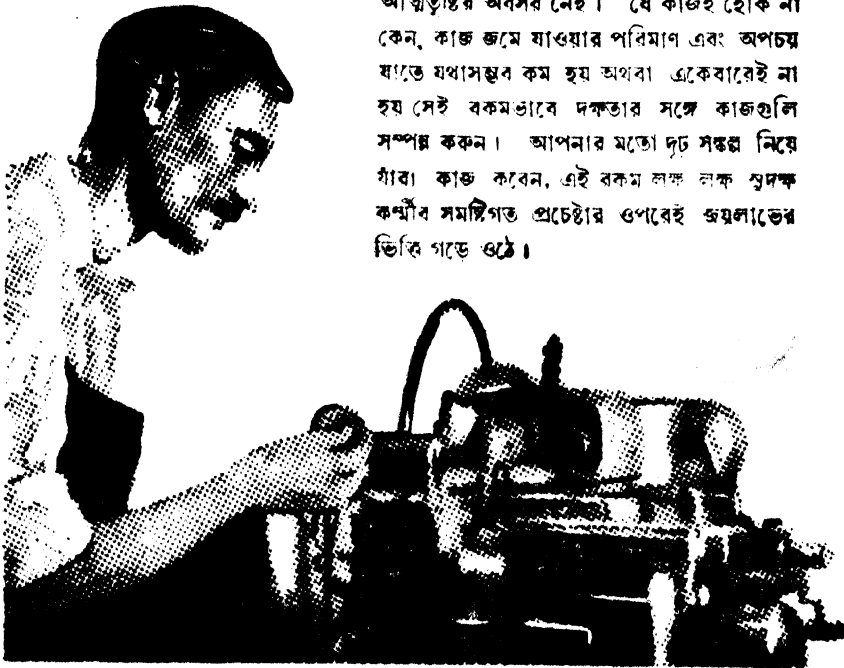
ন। অচিন্ত্যবাবুর পদবী সেনগুপ্ত হলে কী হবে, গলে তো উনি হালদার কিছু কম নন।

এবার বক্তৃতা-অংশটিতে নজর করুন। কথকতার আনবার জন্ত যতিচিহ্নের বিষয়ে যথেচ্ছাচার বিশেষতঃ নীয়। 'ঘোড়া ছুটো কে-কে' এবং 'আর গাড়ি' দুটি প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে '?'-চিহ্ন নেই। কেন ওরকম চিহ্ন লাগাতে তো রামা-শ্যামা সবাই পারে; ন্ত্যবাবু যে ভাবে বিভোর হয়ে বিবেকানন্দের জীবনী ছেন তা বোঝা যাবে কি করে যদি না যতি-চিহ্ন ক্ষে ওঁর ঔদাস্ত দেখিয়ে যান প্রথম থেকে? [অনুরূপ হরণ এ বইটির, এবং এ জাতীয় আরও যে গণ্ডাকয়েক পাগণ্ড রচনা উনি প্রকাশ করেছেন সেগুলিরও, সর্বত্র দগে।] কিন্তু উদ্ধৃত অংশে একটি '?' রয়েছে— সের চাবুক' প্রশ্নটির শেষে। এর কারণ বোধ করি চাবুক শব্দটি। ও-বস্তুর সামনে প্রিটেনশন বজায় খা বড় কঠিন।

এরই একটু পরে আর একটি অ্যানেকডোট। সইস লছে—"কি কুক্ষণেই যে বিয়ে করেছিলুম, বিয়ের থেকেই সার, আর তার থেকেই যত দুঃখ, যত ঝকমারি।" তএব শিশু বিবেকানন্দ রাম-সীতার যুগলমূর্তি ছুঁড়ে লে দিল রাস্তায় [আমার মত গোলা পাঠকদের বুঝিয়ে না দরকার যে রাম-সীতা বিবাহিত দম্পতি হওয়ার বণেই সইস-দর্শন অনুযায়ী এরূপ শাস্তিবিধান] এবং লল, "চলবেনা যুগল মূর্তি। তার চেয়ে শিব ভালো, কাকী শিব।"

অ্যানেকডোটের অথরিটি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তোলে ার মত মূর্খ আর নেই। তাই সে পথ ভুলেও মাড়াব । আমি। এমন কি এ কথাও ভাবব না—যে-শিশু ইসের বিবাহ-জাত দুর্দশা থেকে বিবাহ বস্তুটির সম্বন্ধে তবড় জেনারালাইজেশনের মত বিচক্ষণতার অধিকারী, সই শিশু কী করে শিব-ভক্ত হবার কারণ হিসাবে শবকে অবিবাহিত বলে ঠাওরাল। এ সব কিছু না করে াহিনীটি আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কাহিনীর শেষ ীতিসারটুকুও কি মেনে নিতেই হবে?

"...মূর্তি ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। এতটুকু দ্বিধা করল না। তার আদর্শের সঙ্গে যার মিল নেই তাকে সে এমনি করেই নস্যাৎ করতে পারে।"

উক্ত কাহিনী থেকে এই সিদ্ধান্তে যিনি পৌছতে পারেন তিনিই যথার্থ সিনথেটিক জীবনীকার। ভাগ্যিস রামকৃষ্ণ পরমহংস যে বিবাহিত ছিলেন সে-কথা বিবেকানন্দর মনে পড়ে নি পরবর্তীকালে; তাহলে তো রামকৃষ্ণের হালও হত রামসীতার অনুরূপ!

বস্তুতঃ আমার তো মনে হয় যে কোন মহৎ ব্যক্তিকে ছোট করার সবচেয়ে নিশ্চিত পন্থা হচ্ছে তাঁর সকল প্রকার কার্যকলাপের মধ্যে মহত্ত্ব-আরোপের ভণ্ড প্রয়াস। শৈশবে মহাপুরুষও শিশু বই নন, তাঁর শিশুসুলভ আচরণগুলি বিশেষ করে আলোচনা করা তেমন কিছু অবশ্যকর্তব্য নয়; আর আলোচনা করতে হলে তাতে কোন রকম রঙ না চড়িয়ে শুধুই ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করাই সঙ্গত। মহাপুরুষ শৈশবেও যা কিছু করবেন তারই মধ্যে বিশেষ কিছু অসাধারণ তাৎপর্য থাকবে, এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ নেই।

এবারকার প্রতিবেদন রচনায় প্রথম থেকেই একটি উভয়সঙ্কট আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করছে।

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' পুস্তকটির সমালোচনা করতে গিয়ে এর লেখকের যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার চোখে পড়বে তার নিন্দায় পঞ্চমুখ হতে আমি যতটা আগ্রহী, ততটাই আগ্রহী এ-বিষয়ে সাবধান থাকতে যেন আমার নিন্দাগুলি পাঠক না ভাবেন স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে উদ্যত। না, স্বামীজীকে নিন্দা করতে হলে আমি স্বামীজীর রচনাগুলি সামনে নিয়ে বসতাম; অচিন্ত্যবাবুর লেখা ঘেঁটে হাত ময়লা করতে যাব কেন? তথাপি অনবধানের মুহূর্তে হয়তো এমন বক্তব্য আমার কলম থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, যা অনিন্দ্য সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রকাশ বলে প্রতিভাত হবে। যদি তেমন কোন বাক্য এই প্রবন্ধে এসে পড়ে তবে তার জন্ত অচিন্ত্যবাবু দায়ী, আমি নই।

সত্যি, যে-কোন মানুষের জীবনী যে-কোন মানুষ লিখতে পারবে কেন? এ-সম্বন্ধে একটা আইনকানুন

থাকা উচিত নয়? বোধ হয় মহাপুরুষ হতে হলে শুধু জীবিতকালে অবিকারী থাকাই যথেষ্ট নয়, মৃত্যুর পরেও নির্বিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, পাপ-পুণ্যের জমাখরচ শেষে একুনে সামান্যই মুনাফা থাকে যাদের, আমরা মৃত্যুর পরে কিছুদিনের জন্য প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে থাকি; মহাপুরুষরা সেরকম বখেড়া থেকে মুক্ত, সেইজন্যই বোধ হয় ভৌতিক অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের নামকে বাঁচানো এঁদের পক্ষে অসম্ভব। আধিভৌতিক কায়দায় ভৌতিক অত্যাচার।

বইটি আমি সম্পূর্ণ পড়ি নি বলে যেটুকু সঙ্কোচ ছিল, তা কিন্তু অনর্থক। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যতখানি পড়ে গেছি তার মধ্যে ওই এক কায়দা ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু আমার চোখে পড়ল না। চাল কতদূর সেদ্ধ হয়েছে বুঝতে হলে গোটা হাঁড়ি উজাড় করার কীই বা দরকার, একটি-দুটি ভাত টিপে দেখলেই তো যথেষ্ট। যে-কোন একটি অ্যানেকডোট এবং তার সমাপ্তিতে অবশ্যম্ভাবী সিউডো-দার্শনিক ব্যাখ্যা পড়ে দেখুন; যে-কোন একটি পৃষ্ঠা খুললেই পাবেন সেই একরকম আধসেদ্ধ চাল; যে চাল অচিন্ত্যবাবুর একমাত্র সম্বল।

বইটির এখান-সেখান থেকে এলোপাতাড়ি দেখে যাওয়া যাক। ১০ পৃষ্ঠার অ্যানেকডোটে আছে কিশোর বিবেকানন্দ (বিলে) কী করে দারোয়ানদের ফাঁকি দিয়ে এক জাহাজ কোম্পানির সাহেবের কাছ থেকে জাহাজ দেখবার ছাড়পত্র যোগাড় করেছিল সেই কাহিনী। সামনের সিঁড়ি দিয়ে যেতে দেয় নি দারোয়ান, তাই পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল সে। এ গল্প ঘটতে পারে যে-কোন কিশোরের জীবনে; এবং আমার-আপনার গোচরে এ রকম কাহিনী এলে এইমাত্র বুঝতে পারি যে ছেলেটি সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং একগুঁয়ে। কিন্তু যেহেতু এটি বিবেকানন্দের অ্যানেকডোট এবং যেহেতু লিখছেন অচিন্ত্যকুমার, অতএব এর ব্যাখ্যা হল:

"কি মনে হয় আমাকে দেখে? আমি বাজিকর। ...যা বাঁকা তাকে সোজা করতে পারি। জড়ত্বের মধ্যে আনতে পারি গতিছ্যতি। যা জীবন্মৃত তাকে করতে পারি প্রাণচঞ্চল।"

একটা কথা শুধু বিনয়বশতঃ লেখেন নি অচিন্ত্যবাবু। শেষ বাক্যের শেষে অনায়াসে উনি যোগ করতে পারতেন: খিস্তির গল্প লিখে যে লেখক বুড়ো হয়ে গেল, তার কলম দিয়ে লেখাতে পারি বিবেকানন্দের জীবনী।

এ কথাটা সোজাসুজি লেখা নেই বটে, কিন্তু ওই পৃষ্ঠাতেই এজাতীয় একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে দেখা গেল: "নেংটি ইঁদুর হয়ে হাতি চড়বার সখ!"

১৪ পৃষ্ঠায় আর একটি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেছে নরেন্দ্রনাথ, বাবা তাই পুরস্কার দিলেন একটি ঘড়ি।

তাতে কী হল? এ ঘটনার বিশেষ তাৎপর্য কী? না—"সূর্যের সঙ্গে ঘড়ি মেলাও। জীবনের চলার ছন্দকে মেলাও তেমনি ঈশ্বরের সঙ্গে।"

ঘড়ি না দিয়ে বাবা যদি পুরস্কার দিতেন একটি ঘুড়ি তাতেও কি অচিন্ত্যবাবুর অচিন্তনীয় সিউডো-আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আটকাত? লিখতেন বাতাস বুঝে ঘুড়ি ওড়াও জীবনকে উড়িয়ে দাও ঈশ্বরের পাদপদ্মে।

কিন্তু এসব হাবিজাবি পড়ে কী হবে?

যতটা পড়েছি তাতেই বিরক্তিতে মেজাজ বিগড়ে আছে; লিখতে ইচ্ছে করছে না কিছু। আরও যদি পড়তাম তবে বোধ হয় আর কোনদিন কিছু লেখবার মত ইচ্ছে অবশিষ্ট থাকত না। কোচোয়ানের কাছ থেকে চাবুক চেয়ে নিতাম, কলম ফেলে রেখে। ধর্ম আর কর্ম দুটো ঘোড়া হয়তো পারতাম না জোটাতে, অগত্যা একটা ঘোড়াই খুঁজে বার করতাম ঠিকানা দেখে—ধর্ম আর কর্ম দু লাইনেই যে ঘোড়ার সমান উৎসাহ। সেই বুড়ো ঘোড়ার পিঠেই চাবুক লাগাতাম সপাসপ।

এইখানে আমার প্রতিবেদন শেষ করছি। এটি সম্পূর্ণ প্রতিবেদন হল না তার জন্য আবার পাঠকের কাছে মার্জনা চাইছি।

এবং পাঠকের পাওনা যাতে কম না পড়ে সেই জন্য এ লেখা সম্পাদকের কাছে না পাঠিয়ে পাঠাচ্ছি তাঁদেরকে কাছে, যিনি এ সংখ্যা থেকে প্রতিবেদন রচনায় প্রতিশ্রুত

শনিবারের চিঠি

৩৫শ বর্ষ

৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

সম্পাদক :

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা

[প্রবন্ধকারের নিবেদন]

জগদীশ ভট্টাচার্য

১

শনিবারের চিঠি'র বিগত মাঘ [১৩৬৯] সংখ্যায় আমার 'বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা' র্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশের পর এ-সম্পর্কে বাংলার বিদগ্ধ মাজের অভিমত সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম। অনেকেই নুগ্রহ করে তাঁদের মতামত আমাকে জানিয়েছেন। ধ্যে তিনখানি চিঠি নিয়ে প্রকাশ করলাম।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন লখেছেন :

"...আপনার প্রবন্ধটা পড়ে আপনার অসাধারণ মস্বীকার, তথ্যানুসন্ধান-দক্ষতা ও পরিবেশন-নৈপুণ্যের রিচয় পেলাম। পড়তে পড়তে যতই অগ্রসর হয়েছি তই মুগ্ধ হয়েছি ও আকৃষ্ট হয়েছি। আপনার সব দ্ধান্ত সবাই মেনে নেবে তা আশা করা যায় না। তবে আশা করি লেখাটা নানা মহলে নানাভাবে আলোড়ন লবে। আমার মতে সেটাই বাঞ্ছনীয়, সেটাই লাভ। লখাটা আমাকে ভাবিয়েছে। আশা করি অন্যকেও ভাবাবে। যদি তা হয়, তবে সেটাই হবে এই লেখার রম সার্থকতা।..."

শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

"...তোমার প্রবন্ধে 'মরণ-মিলন' কবিতাটির যে নূতন [illegible] অনুধাবনীয়। এই মৃত্যু-বিষয়ক কবিতাটির মধ্যে কবিদৃষ্টির যে একটি অসাধারণত্বের পরিচয় মিলে তাহা সুনিশ্চিত। এর অর্থগৌরব, চিত্রধর্মিত্ব, সমারোহময় শব্দযোজনা ও কল্পনাবৈশিষ্ট্য একটু নূতন ধরণের ইঙ্গিত বহন করে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য মৃত্যুকবিতার সঙ্গে একে ঠিক সমপর্যায়ে ফেলা যায় না। ব্যক্তিগত শোকও এর উৎস বলে মনে হয় না। এক অভূতপূর্ব মানস-উল্লাস এর ছন্দকল্লোলধ্বনির মধ্যে শ্রুত হয়। মৃত্যুর অভ্যাগম যেন মরণ-লক্ষণ-সজ্জিত বরের বিবাহ-যাত্রার মত বর্ণবৈভবে ও গতিচ্ছন্দে আমাদের অভিভূত করে। এতে কবির স্বভাবসিদ্ধ দার্শনিক মননের প্রকাশ দুর্লক্ষ্য। সুতরাং তোমার অনুমান যে একটি যথার্থ লক্ষ্যাভিমুখী হয়েছে তা যুক্তির কাছে না হলেও অনুভূতির কাছে সমর্থন পায়।

"আমার মনে হয় তোমার প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ আগে উপস্থাপিত করে তার পর ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলে এটা আরও জোরদার হত। কেননা তোমার ব্যাখ্যার সঙ্গতি নির্ভর করছে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্করহস্যের উপর। এই সম্পর্কে গুরুশিষ্যার সম্বন্ধের উপর যে এক দিব্য প্রেমের ব্যাকুলতা ও সৌকুমার্য বিকীর্ণ হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। তোমার যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যে একমাত্র দুর্বল গ্রন্থি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার সহিত এতটা অন্তরঙ্গ ছিলেন কি না, যাতে এই সম্পর্করহস্যটি তাঁর মনের গভীরে

প্রতিফলিত হতে পেরেছিল। নিবেদিতার পত্রে এই অন্তরঙ্গতার সুরটি নিঃসংশয়িত ভাবে শোনা যায় না। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে নিবেদিতার মনোভাব কবি কেমন করে জানলেন? যাই হ'ক তোমার এই ব্যাখ্যা সমস্ত বিষয়টির নূতন পরীক্ষার উদ্রেক করে।...”

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

“...'শনিবারের চিঠি' গত কল্য পঁহুছিয়াছে, আপনার প্রবন্ধ পড়িয়া ফেলিলাম। ভালই লাগিল—দরদের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার অবদান আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ নিবেদিতার অন্তরাত্মার যে প্রকাশ তাঁহার Indian Study of Love and Death বইয়ে তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বিবেকানন্দের যোগের কথা আমার মনে হয় আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। 'মরণ-মিলন' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসম্ভব নহে, কিন্তু প্রমাণিত নহে, অনুমিত—কিন্তু অযৌক্তিক নহে। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা-সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিতেন, আমার মনে হয় আপনি তাহার বিশ্লেষণ ঠিক-মতই করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাকে একাধিকবার বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার মনোভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার নিজের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও আমাকে শুনাইয়াছিলেন, তাহা আপনার 'বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। নিতান্ত সময়াভাব, না হইলে লিখিয়া জানাইতাম। এ বিষয়ে অন্য অনেকের কাছে, মায় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কাছেও বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গ আপনারও শোনা আবশ্যক—যদি একটু সময় করিয়া আসিতে পারেন, ধরুন আগামী শনিবার কিংবা আগামী সোমবার প্রাতঃকালে (৯ই বা ১১ই মার্চ) আপনার কাছে তাহার অবতারণা করিতে পারি।

“আপনি কল্পনার সহিত তথ্যের সমন্বয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সুপাঠ্য হইতেছে, এবং তাহার সম্ভাব্যতাও যথেষ্ট আছে। যেখানে সব কথা জানা যায় না, মানুষের অভিপ্রায় ও অনুভূতি সম্বন্ধে ইতিহাস যেখানে নীরব থাকিতে বাধ্য, সেখানে তথ্যের সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে কল্পনার ও শ্রদ্ধার সমাবেশ, আর কিছু না

বিশেষ ভাবে এই তিনখানি চিঠি নির্বাচন করার একটি ব্যক্তিগত কারণ আছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার পরমশ্রদ্ধেয় গুরুদেব। তাঁর পত্রখানিকে আমি আমার গুরুদেবের বিশেষ আশীর্বাদ বলে মনে করি। শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন আমার প্রত্যক্ষ গুরু না হলেও উভয়েই আমার গুরুপ্রতিম আচার্য। তাঁদের পদতলে বসে আজও আমার অনেক-কিছু শেখার আছে—এ আমি অন্তরে অন্তরে জানি।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিতে লিখিত নির্দেশ অনুসারে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার মনোভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার তাঁকে যে কথা বলেছিলেন তা আমি তাঁর মুখে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, নারীর প্রকৃত গভীর অনুরাগ যদি কেউ পেয়ে থাকে তবে বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন নিবেদিতার কাছে।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যক্তিগত বিশেষ অভিজ্ঞতাটি হল এই :

একদিন নিবেদিতার বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার একটি গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনা কিছুদূর অগ্রসর হবার পর ডাকের চিঠি এল। কথা বলতে বলতে নিবেদিতা চিঠিগুলি একটি একটি করে টেবিলে গুছিয়ে রাখছিলেন। হঠাৎ একখানি চিঠির উপর নজর পড়তেই তাঁর মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি চিঠিখানিকে জামার ভিতর রেখে দিলেন। তারপর পুনরায় তাঁদের আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু নিবেদিতা আর সেদিকে মন দিতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথকে তিনি বললেন, মিস্টার টেগোর, এইমাত্র আমার গুরুদেবের একখানি চিঠি এসেছে। আমার সমস্ত মন তাতে পূর্ণ হয়ে আছে। আমি একান্ত নিভৃতে চিঠিখানি পড়তে চাই। আমাদের আলোচনা আজকের মত এখানেই স্থগিত থাক্।

লিজেল রেমঁর গ্রন্থে, অবিকল এক না হলেও, অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে [দ্রষ্টব্য : নারায়ণী দেবীর

চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিখানিকে আমি আমার গুরুদেবের আশীর্বাদ বলে উল্লেখ করেছি। উপরে উদ্ধৃত ঘটনাটি, এবং তার উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি, আমার 'বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে, এ কথা আমার আচার্যদেব কেন লিখেছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে বলেছেন আমার "যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যে একমাত্র দুর্বল গ্রন্থি", তা এই ঘটনার সাহায্যে অনেকখানি দুর্বলতামুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

২

অধ্যাপক সেন বলেছেন, আমার সব সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেবে তা আশা করা যায় না। তবে, লেখাটা নানা মহলে নানাভাবে আলোড়ন তুলবে। তাঁর মতে সেটাই বাঞ্ছনীয়, সেটাই লাভ। লেখাটি যে নানা মহলে নানা ভাবে আলোড়ন তুলেছে সে কথা হয়তো মিথ্যে নয়। 'শনিবারের চিঠি'র "বিবেকানন্দ"-সংখ্যায় [বৈশাখ ১৩৭০] শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার লেখাটি নিয়ে সুদীর্ঘ 'আলোচনা' করেছেন। সুধাংশুবাবুর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচয় বাংলার পাঠকসমাজ পেয়েছেন বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর সুলিখিত গ্রন্থ 'দুই কবি'তে। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিবেদিতা'-বক্তারূপে নির্বাচিত হয়ে 'বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র রূপে নিবেদিতা'—এই বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। সুতরাং আমার প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত কথা বলার অধিকার তাঁর আছে। সুধাংশুবাবু পরিশীলিতমনা সুধীব্যক্তি। তাঁর আলোচনার সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, আমার সঙ্গে নানা দিক দিয়ে তাঁর মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও আমার বক্তব্যকে তিনি অশ্রদ্ধেয় করে তোলেন নি। অসূয়া ও অসহিষ্ণুতাপূর্ণ সাম্প্রতিক বাংলার চিন্তাজগতে এ গুণ দুর্লভ। আলোচনার উপসংহারে তিনি লিখছেন: "অনুমানসাপেক্ষ গবেষণা-কার্যে ব্যক্তিগত মতামতই বড় নয়, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সত্যানুসন্ধানই কাম্য। জিজ্ঞাসু হিসাবেই এই প্রশ্নগুলি তুললাম, কারণ বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা যেখানে মিলিত হয়েই অসীমের লীলাপথে নূতন-তীর্থকে রূপ দেয়।"

আমার প্রবন্ধের দ্বিতীয় আলোচনা করেছেন আমার কৃতী ছাত্র, অধ্যাপক শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর রচনাটিকে বলেছেন "প্রতিবাদ-প্রবন্ধ"। লেখাটি তিনি প্রথমে 'শনিবারের চিঠি'তে পাঠিয়েছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক লেখাটি প্রকাশ না করায় তিনি 'কথাসাহিত্যে' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০) সেটিকে প্রকাশ করেছেন। শ্রীমানের লেখাটি অত্যন্ত জোরালো ও ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনি বিষয়টি নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, প্রচুর ভেবেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর রচনারীতি। যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যে মধ্যে শ্লেষ ও বক্রোক্তি, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের শাণিত সুপ্রয়োগে লেখাটি সাধারণ পাঠকের কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও উপাদেয় হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, তাঁর 'প্রতিবাদ' গোত্রে ও ধর্মে সুধাংশুবাবুর 'আলোচনা'র সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতিপক্ষের অশ্রদ্ধেয় বক্তব্যকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করাই তাঁর লক্ষ্য। এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে তিনি ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যার বিশেষ বাছবিচার করেন নি। প্রতিবাদ করতে বসে তিনি সুধাংশুবাবুর বৈষ্ণবজনোচিত 'অমানিনা মানদেন' নীতিতে মোটেই বিশ্বাস করেন না ; 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'—এই নীতিই হল তাঁর রণনীতি। সাহিত্যক্ষেত্রে এই শাক্ততান্ত্রিক রণসজ্জা আমাকে অভিভূত করেছে। লেখাটিতে আমি শ্রীমানের ক্ষমতার নূতন পরিচয় পেয়েছি। আশীর্বাদ করি তিনি আয়ু, আরোগ্য ও যশের অধিকারী হোন্।

শ্রীমান্ তাঁর লেখায় আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি, এটি তাঁর রচনা-কুশলতার সবচেয়ে বড় অংশ,—এটি তাঁর রঙের টেক্কা। প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি লিখেছেন : "শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য। তাঁকে অশ্রদ্ধা বা অসম্মান করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধুমাত্র সত্যসন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র প্রবন্ধটিই আলোচনা করেছি—নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে।" প্রবন্ধের আরম্ভেও আমার প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করে বলেছেন : "প্রবন্ধকারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা চিন্তা করে আলোচ্য প্রবন্ধ সমালোচনায় আমি বিব্রত বোধ করছি। অত্যন্ত দুঃখের

সঙ্গেই এই বেদনাদায়ক কর্তব্যভার আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে—শুধু মাত্র সত্যের খাতিরে।"

আদাবতে আমার প্রতি এই অবিচলিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করে শ্রীমান্ তাঁর প্রবন্ধের ভিতরে আমার (১) তথ্য-সমাবেশের ত্রুটি, (২) ব্যাখ্যার অসঙ্গতি ও (৩) বিকৃত ব্যাখ্যার প্রচুর উদাহরণ তুলে ধরে শেষভাগে বলছেন: "সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে এই ধরনের বিকৃত ব্যাখ্যার সবগুলি উদ্ধার করতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বিপুল হয়ে পড়বে···।" আমার লেখায় এই ধরনের ত্রুটি, অসঙ্গতি ও বিকৃত ব্যাখ্যার প্রভূত পরিচয় পেয়েছেন বলেই শ্রীমান্ সত্যের খাতিরে ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতির রক্ষা করতে পারেন নি। এই জন্যেই তিনি "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে" আমাকে প্রতিবাদ করার "বেদনাদায়ক কর্তব্যভার" স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন।···আশা করি পাঠকগণ বুঝতে পারবেন, কেন আমি বলেছি, আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে শ্রীমান্ রঙের টেক্কা হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। যে সত্যাগ্রহ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার সম্পর্ককেও অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে অস্বীকার করতে বাধ্য হয় সে সত্যাগ্রহের মহিমা জনচিত্তে বহুগুণিত হয়ে দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। নলিনীরঞ্জন বুদ্ধিমান। বিতর্কে বিচক্ষণ।

কিন্তু শ্রীমান্‌কে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক নিয়ে আমার মনে কোনও অন্ধ মোহ নেই। আমাদের সকল শিক্ষকই যেমন আমাদের যথার্থ গুরুর আসনে বসতে পারেন না, তেমনি সকল শিক্ষককেই আমরা সমানভাবে শ্রদ্ধাও করতে পারি না। শ্রদ্ধার ইতরবিশেষ থাকবেই। তা ছাড়া শিক্ষক যদি অশ্রদ্ধেয় কোন কাজ করেন, যদি তিনি সত্য ও কল্যাণভ্রষ্ট হন, তাহলে তাঁর কাজের প্রতিবাদ করার, তাঁকে নিন্দা করার অধিকার অন্যান্য দশজনের মতই তাঁর ছাত্রেরও সমানভাবে থাকা উচিত।

আর একটা কথা বলাও প্রয়োজন। প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ নিজ নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধি, বিশ্বাস ও সংস্কার এবং অনুশীলন-সঞ্জাত চিত্তোৎকর্ষ অনুসারে, নিজের মত করে, সত্যকে দেখে। সাধারণ মানুষ প্রচলিত চিন্তা-ভাবনা, সংস্কার ও বিশ্বাসকেই সত্য বলে জানে। আমার নিজের মত করে আমি যা সত্য বলে জেনেছি তা আমি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছি। আমার ছাত্রের মনে হয়েছে আমি সত্যভ্রষ্ট হয়েছি। সুতরাং আমার প্রতিবাদ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসঙ্গত হয় নি। এখন বিচার করে দেখতে হবে, আমরা কে কতটা সত্যকে পেয়েছি, কে কতটা সত্যরক্ষা করতে পেরেছি। এই বিচারে প্রবৃত্ত হতে আমার দিক থেকে একটু অসুবিধা আছে, তা প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল। শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন আমার স্নেহভাজন ছাত্র। সমকক্ষের ন্যায় তাঁর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া আমার সাধ্যাতীত। তিনি তাঁর প্রতিবাদ রচনায় রসনারোচক বক্রোক্তি ও বিদ্রূপ-ভাষণের যেভাবে সদ্ব্যবহার করেছেন আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, করা সমীচীনও নয়। জানি, এক শ্রেণীর পাঠক শিক্ষক-ছাত্রের এই লড়াই কতদূর গড়ায় তা দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। তাঁদের অভদ্র কৌতূহল চরিতার্থ করার কোনও সুযোগ আমি দেব না। কিন্তু শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন সত্যের অভিমান করেছেন। পাঠক-সমাজে কেউ কেউ আমার বক্তব্য ও তাঁর বক্তব্যকে মিলিয়ে সত্যনির্ধারণের জন্য আগ্রহান্বিত থাকতে পারেন। কেবলমাত্র তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি নলিনীরঞ্জনের সত্যাভিমানের পরীক্ষা করব।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। সত্যকে আধখানা করে দেখাই শ্রীমানের স্বভাবধর্ম হয়ে উঠেছে বলে আমার মনে হয়েছে। অথবা, সচেতনভাবে আধখানা ঢেকে আধখানা রেখে, নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষে যতটুকু অনুকূল ততটুকুর উপর জোর দিয়ে, প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে নস্যাৎ করাই তাঁর রণনীতি। কারণ যাই হোক, সত্যগোপন ও সত্যবিকৃতিতে তিনি বিস্ময়কর কুশলতা অর্জন করেছেন। কিন্তু অর্ধসত্য ও মিথ্যাকে কতটুকু বাড়ালে তা সত্যের মত দেখতে হয়, এই মাত্রাজ্ঞান বিষয়ে তিনি চরম দক্ষতা লাভ করতে পারেন নি বলেই তাঁর রণনীতির দৌর্বল্য ধরা পড়ে গেছে। আমি একটি একটি করে তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি।

●

[এক] আমি বলেছি, "গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক যে কত গভীর মধুর অথচ কত পবিত্র হতে পারে প্রাচ্য দিগন্তে

কানন্দ-নিবেদিতার কাহিনী তার চূড়ান্ত উদাহরণ। চর্যের কঠোরতম অনুশাসনে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে তুলেছিলেন।" [শ. চি. মাঘ, পৃ° ২৮৯] লণ্ডনে ম দর্শনের পর বিবেকানন্দের প্রতি "নিবেদিতার চিত্তে ং উদিত হল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ।" সেই আবেগময় রাগ লৌকিক স্তর থেকে কি করে আধ্যাত্মিক স্তরে ত হল তার কথা বলতে গিয়ে আমি বলেছি, ্যাসীকে স্পর্শ করল কুমারীর অনুরাগ। কিন্তু তিনি কে পরিত্যাগ করলেন না · তার চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে কে শিষ্যারূপে গ্রহণ করলেন। তাকে করলেন জীবন-ব্রহ্মচারিণী। শিবের কাছে সর্বস্বনিবেদিতা স্বিনী উমা।" [পৃ° ২৯০]

আমার বক্তব্যকে বিকৃত করে শ্রীমান্ বলছেন: আমার তে "স্বামীজির প্রতি নিবেদিতার প্রথম আকর্ষণ দহিক—একথা জেনেও স্বামীজি তাঁকে গ্রহণ করে- ছলেন।" [কথাসাহিত্য, পৃ° ১০৮৭-৮]

আমি বলেছি: "কি করে মিস মার্গারেট নোবল গিনী নিবেদিতা হলেন, কি করে একটি বিদেশিনী মারীর অন্তরে তপস্বিনী উমার জন্ম হল, কি করে র্ত্যপ্রেম রূপান্তরিত হয়ে দিব্যপ্রেমে পরিণত হল, সে তিহাসও কম চিত্তাকর্ষক নয়।"

শ্রীমান্ বলছেন: "এই চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের উপস্থাপনায় লেখকের বক্তব্য হল 'প্রথম দর্শনে তিনি স্বামীজিকে দয়িতরূপেই কল্পনা করেছিলেন', 'নিবেদিতার প্রেমচেতনাও প্রথমে দৈহিক' এবং 'নিবেদিতা ভগবানকে প্রিয়তম পতিরূপেই উপাসনা করেছেন।'"

প্রবন্ধের প্রথমেই শ্রীমান্ পাঠকসমাজকে দু-দুবার বলে নিলেন যে, আমি বলেছি স্বামীজির প্রতি নিবেদিতার প্রথম আকর্ষণ দৈহিক—"নিবেদিতার প্রেমচেতনাও প্রথমে দৈহিক।" বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পাঠককে আমার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তোলার এই অপচেষ্টায় শ্রীমান্ সার্থক হয়েছেন সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে নিয়ে, আধখানা সত্যকে পূর্ণসত্যরূপে দেখাতে গেলে সত্য যে কত বিকৃত হয়ে ওঠে, এটি তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এখন দেখা যাক, আমি কি প্রসঙ্গে কিভাবে কথাটা বলেছি।

১৮৯৯ সনে নিবেদিতা স্বামীজির সঙ্গে জাহাজে করে বিলেতে গিয়েছিলেন। এই ছয় সপ্তাহের কাহিনী তিনি কড়চাকারে লিখে রেখেছিলেন। 'Reminiscences of Vivekananda' গ্রন্থে সেই কড়চা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আছে, সমুদ্রপথে একদিন স্বামীজি কথায় কথায় প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। স্বামীজি বললেন, সত্যকার প্রেমের পথ অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্রের পথ। ওই দিনের কড়চায় (২৮ জুন) নিবেদিতা লিখছেন, স্বামীজি তাঁকে বললেন:

"It is when half a dozen people learn to love like this that a new religion begins. Not till then. * * Love begins by being brutal, the faith, the body. Then it becomes intellectual, and last of all it reaches the spiritual. Only at the last stage, 'My Lord and my God'."

বলাই বাহুল্য, এখানে স্বামীজি লৌকিক স্তর থেকে প্রেমের আধ্যাত্মিক স্তরে উর্ধ্বায়নের কথাই বলেছেন।— দৈহিক স্তর থেকে আত্মিক স্তরে উর্ধ্বায়নের কথা। আমি স্বামীজির ভাষার অনুসরণ করেই বলেছি, "নিবেদিতার প্রেমচেতনাও প্রথমে দৈহিক, তারপর আত্মিক, তারপর ঐশ্বরিক।"

শ্রীমান্ আমার বক্তব্যকে প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে, আমার বাক্যের আধখানা মাত্র উদ্ধার করে, তাকেই আমার বিরুদ্ধে চরম অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। অপরিশুদ্ধ মন নিয়ে এই ভাবেই সত্যকে কুৎসিত করে দেখা তাঁর সত্যদর্শনের নমুনা।

[দুই] লণ্ডনে স্বামীজির সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ এবং তজ্জনিত তাঁর মানস-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমি যে বিস্তৃত আলোচনা করেছি তার অংশবিশেষ উদ্ধার করে শ্রীমান্ বলছেন: "এই বিশ্লেষণ দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় দুটি প্রণয়ের ব্যর্থতার পর নিবেদিতা যখন তৃতীয় একজনের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন তখন বত্রিশ বছরের তরুণ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। বার বার বয়সের উল্লেখ করে কাহিনীকে 'চিত্তাকর্ষক' করে লেখক যে ইতিহাস উপস্থিত করেছেন তা নিবেদিতার জীবনের একটি

দিক মাত্র। নিবেদিতার জীবনের আরও একটি দিক আছে। * * *

"প্রবন্ধকার শুধু নিবেদিতার বয়সটাই দেখেছেন, তাঁর এই সময়ের চিত্তের প্রকৃত অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষার দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেন নি।"

আমি শুধু নিবেদিতার বয়সটাই দেখেছি কি না, এবং তাঁর সে-সময়ের চিত্তের প্রকৃত অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষার দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দিই নি—এ কথা সত্য কিনা, পরীক্ষা করে দেখা যাক। আমার মূল প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি :

"ভগিনী নিবেদিতা [১৮৬৭-১৯১১] ছিলেন আইরিশ-দুহিতা। জন্মসূত্রে বিপ্লবিনী। তাঁর পিতৃপুরুষেরা আইরিশ বিদ্রোহের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। নিবেদিতার পিতা ও পিতামহ ছিলেন ধর্মযাজক। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই তাঁর বাল্যকৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষা-জীবন সমাপ্ত হবার পর তিনি শিক্ষাদান ব্রতকেই গ্রহণ করেছিলেন জীবিকা হিসাবে। তখন পেস্তালজি ও ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতি শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন আদর্শের পথ দেখাচ্ছে। নিবেদিতা সেই আদর্শে অনুপ্রাণিতা। বিপ্লবাত্মক স্বদেশপ্রেম, ধর্মের দ্বারা অনুশাসিত জীবন এবং আদর্শ শিক্ষাদানব্রত—নিবেদিতার কর্মজীবন ছিল এই পবিত্র ত্রিবেণীধারায় প্রবহমান।

"বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ১৮৯৫ সনে। তখন তিনি একটি কঠিন মানসসংকটে বিক্ষতমনা। একুশ বৎসর বয়সে নিবেদিতা ভালবেসেছিলেন তাঁর চেয়ে দু বছরের বড় একটি আইরিশ যুবককে। মৃত্যুর দ্বারা সে পূর্বরাগ খণ্ডিত হল। সাড়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর অন্তরে জেগেছিল নূতন অনুরাগ। দেড় বৎসর ধরে আলাপ-পরিচয়ের ফলে পূর্বরাগ যখন প্রৌঢ় হয়ে এসেছে, এবং বিবাহের প্রস্তাব আসন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে এল এক নারী। সে জয় করে নিল যুবককে। ব্যর্থতার হতাশায় যখন হৃদয় মুহ্যমান তখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। প্রথম সাক্ষাতের সময় নিবেদিতার বয়স আটাশ, বিবেকানন্দ বত্রিশ।

"শিকাগোর ধর্মক্ষেত্রে বিশ্ববিজয় করে বিবেকানন্দ এসেছেন ইংলণ্ডে। বিজয়গৌরব জ্যোতির্মণ্ডলের মত তাঁর প্রদীপ্ত যৌবনকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। নিবেদিতা স্বামীজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও পরবর্তী জীবনের কাহিনী 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। এই 'হিন্দু যোগী'র বক্তৃতা ও কথাবার্তা তাঁকে উদ্দীপ্ত করত, অথচ তাঁর সংশয়ী মন নির্বিচারে সবকিছু গ্রহণও করতে পারত না। অসামান্য ব্যক্তিত্বশালিনী নিবেদিতা ছিলেন সর্বজয়া; তবু তিনি বলছেন :

'...it had never before fallen to my lot to meet with a thinker who in one short hour had been able to express all that I had hitherto regarded as highest and best' [পৃ° ৯]

"কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্বামীজির ব্রতে ও সেবায় আত্মদানের জন্যে কৃতসংকল্পা হলেন। তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করলেন।"

এই উদ্ধৃতি থেকে আমার মূল বক্তব্য আশা করি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু শ্রীমান নলিনীরঞ্জন আমার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বুঝেছেন যে, আমি শুধু নিবেদিতার বয়সের দিকটাই দেখেছি। তাঁর মতে আমি বলতে চেয়েছি যে, "দুটি প্রণয়ের ব্যর্থতার পর নিবেদিতা যখন তৃতীয় একজনের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন তখন বত্রিশ বছরের তরুণ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব।"... এই ভাবেই আমার বক্তব্যকে বিকৃত করে আমার ছাত্র তাঁর বক্তৃতা সম্পাদন করেছেন।

কিন্তু, শ্রীমান শুনলে বিস্মিত হবেন যে, স্বামী নিখিলানন্দ সম্প্রতি আমেরিকা থেকে বিবেকানন্দের যে জীবনী প্রকাশ করেছেন তাতে এই প্রসঙ্গের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে আমার বর্ণনার কিছু কিছু মিল আছে। স্বামী নিখিলানন্দ লিখছেন : "At this time Margaret suffered a cruel blow. She was deeply in love with a man and had even set the wedding date. But another woman suddenly snatched him away. A few years before, another young man, to whom she was about to be engazed, had died of tuberculosis. These experiences shocked her profoundly, and she began to take a more serious interest in religion." [পৃ° ৯২-৯৩]

:খিলানন্দ অবশ্য রেমঁ-কথিত নিবেদিতার সুকুমার ।-প্রকাশের কাহিনীটির উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ভুর প্রতি নিবেদিতার "আবেগময় অনুরাগে"র ত্বর সম্ভাবনার কথা তিনিও স্বীকার করেছেন। গুরু-র সংঘর্ষের দুটি হেতু উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: :hlessly the Swami crushed her pride in English upbringing. Perhaps, at the same , he wanted to protect her against the ionate adoration she had for him." ১৩৭]

তিন] নিবেদিতার লেখা 'An Indian Study of : and Death' গ্রন্থখানিকে আমি "নিবেদিতার বিনের অমূল্য দলিল" বলেছি। এ সম্পর্কে আমার দব বলেছেন: "নিবেদিতার অন্তরাত্মার যে প্রকাশ র Indian Study of Love and Death বইয়ে দিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বিবেকানন্দের গর কথা আমার মনে হয় আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন।" আমার ছাত্র উক্ত গ্রন্থের "Prayer" কবিতাটি াসলে এটি কবিতাই নয়] উদ্ধার করে বলছেন: "এ নিবেদিতার অন্তর্জীবনের অমূল্য দলিল হয় তবে এ দল করে লেখকের বক্তব্যের পক্ষে ডিক্রীজারী ক্ষপাত বিচারে অসম্ভব।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীমান্ সুনিপুণ সত্যগুপ্তির যে চাতুর্যপূর্ণ ক্ষণতা দেখিয়েছেন তার তুলনা সহজে খুঁজে পাওয়া ব না। বইখানি অধুনা অপ্রচলিত। কাজেই তিনি রেছেন লোকচক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করা খুবই সহজ হবে। ১ বইখানিকে আমি কি অর্থে নিবেদিতার অন্তর্জীবনের ল্য দলিল বলেছি তা বিচার করে দেখা যাক। খানির পাঁচটি ভাগ। ১. An Office for the ead, ২. Meditations, ৩. The Communion of e Soul with the Beloved, ৪. A Litany of ove: Invocation এবং ৫. Some Hindu Rites r the Honoured Dead. প্রথম অধ্যায়টি Written for a little Sister",—ওতে নানা স্থান কে নানা উদ্ধৃতি সংকলন করে ভারতীয় মতে মৃত্যু ও করণীয় তারই উপদেশ রয়েছে। শেষ অধ্যায়ে আছে মৃত্যুর পরে হিন্দুদের পালনীয় রীতিনীতি ও শ্রাদ্ধাদির কথা। বলাই বাহুল্য, আমি যখন গ্রন্থখানিকে নিবেদিতার অন্তর্জীবনের দলিল বলেছি তখন এ দুটি অধ্যায়ের কথা নিশ্চয়ই বলি নি। আমি বলেছি: "এই গ্রন্থের Meditations of the Soul, of love, of the inner perception, of peace, of triumphant union; The Communion of the Soul with the Beloved; এবং A Litany of Love-এর অন্তর্গত গীতিকবিতাগুলি নিবেদিতারই আত্মকথা।" [শ. চি. পৃ° ২৯৬]

শ্রীমান্ আমার বক্তব্যের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি যথারীতি গোপন করেছেন। এবং গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় [An Office for the Dead] থেকে নিজের পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার পরিচয়বাহী নানা তথ্য পরিবেশন করে পরিশেষে প্রথম অধ্যায় থেকেই "Prayer" অংশটি উদ্ধার করে প্রশ্ন তুলেছেন—"এ আত্মনিবেদন কার কাছে? এই যদি···।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৪

উপরে আলোচিত তিনটি উদাহরণ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে তাঁর বক্তব্যের আধখানা ঢেকে আধখানা রেখে নিজের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করারই রণকৌশল। কিন্তু শুধু রণকৌশল হিসাবেই নয়, সত্যকে আধখানা করে দেখাই শ্রীমানের স্বভাবধর্ম হয়ে উঠেছে। দুটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি:

[১] ১৬ই জুন ১৮৯৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার পত্রখানি আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার প্রীতির সম্পর্কের নিদর্শন হিসাবে উদ্ধার করেছি। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "নিবেদিতার পত্রে এই অন্তরঙ্গতার সুরটি নিঃসংশয়িত ভাবে শোনা যায় না।" শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন বলেছেন: "এই পত্রখানিই উভয়ের পরিচয়ের অগভীরতার বড় প্রমাণ।"

পত্রখানি বিশ্লেষণ করলে এর চারটি স্তর লক্ষ্য করা যাবে। প্রথম, নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন যে, স্বামীজির সঙ্গে তাঁর বিলেত যাওয়া স্থির হয়েছে বলে

fascinating invitation তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তার কারণ নিবেদিতাই দীর্ঘদিন ধরে সে সম্পর্কে বার বার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। নিবেদিতার ভাষায়: "Towards which I had been steadily pressing for so long."

দ্বিতীয়: মহান কর্তব্যের আহ্বানেই তিনি বিলেত যাচ্ছেন, সুতরাং এখানে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। কিন্তু ভারত ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে নিবেদিতা মোটেই সুখী নন। আর চলে যাওয়ার জন্যে নৈরাশ্যের যতগুলি কারণ আছে তার মধ্যে একটি হল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আনন্দপ্রদ নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ তিনি হারাবেন। "Long talks with yourself on all sorts of delightful things are amongst the many disappointments of the change of plan."

তৃতীয়: রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি প্রকৃতই বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্যে ইচ্ছুক। তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুর তিনি অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং তিনি [রবীন্দ্রনাথ] তাঁরও [নিবেদিতার] বন্ধু হোন, এই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য।

চতুর্থ: পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে (until we meet again) তাঁকে সাদর বিদায়-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই অংশেই দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গেও নিবেদিতার অন্তরঙ্গতা হয়েছে। কবি-জায়াকে তিনি শ্রদ্ধা আর তাঁদের চিত্তহারী (charming) শিশুদের ভালবাসা জানিয়েছেন। পত্রখানির আরম্ভ হয়েছে 'মাই ডিয়ার মিস্টার টেগোর' বলে। বলাই বাহুল্য, পত্রখানি উভয়ের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতারই পরিচায়ক। কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা কতখানি "অন্তরঙ্গতা" লাভ করেছে সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার অবকাশ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পত্রের আর-সমস্ত দিকের কথা ভুলে গিয়ে শুধু তৃতীয় অংশটির প্রতি দৃষ্টি একাগ্রীভূত করে বলছেন: "এই পত্রখানিই উভয়ের পরিচয়ের অগভীরতার বড় প্রমাণ।" বলছেন, "এই পত্রখানিকে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের একটি সাধারণ শিষ্টাচার

[২] শ্রীমানের আধখানা দেখার বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট হয়ে উঠেছে নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথের সখ্য সম্বন্ধে তাঁর সংশয়ের সমর্থক দ্বিতীয় যুক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক যে শেষ পর্যন্ত অতিশয় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু শ্রীমান্ বলছেন: "তাঁদের সখ্য সম্বন্ধে সংশয়ের আর একটি বড় কারণ হল রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনার মধ্যেও উভয়ের গভীর সৌহার্দ্যের কথা পাওয়া যায় না।" তাঁর এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে তিনি নিবেদিতার তিরোধানের পরে রবীন্দ্রনাথের লেখা বিখ্যাত প্রবন্ধটির অংশ-বিশেষ উদ্ধার করেছেন। ["তাহার পর মাঝে মাঝে······গভীর বাধা অনুভব করিতাম।"]

একচক্ষু হরিণের মত শ্রীমানের দৃষ্টি যে কত একদেশদর্শী তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যাবে। তিনি যে-অনুচ্ছেদটি উদ্ধার করে নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্যহীনতা প্রমাণ করতে চাইছেন তার পরের অনুচ্ছেদেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিন্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।"

বস্তুত:, নিবেদিতার সঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা আর তর্কের খাতিরেও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে, কেউ কেউ সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, উভয়ের সম্পর্কের গভীরতা বিবেকানন্দের তিরোধানের আগেই হয়েছিল কি না। এ সম্পর্কে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বলেছেন: "জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সহিত, বিশেষত: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। প্রথম দর্শনেই রবীন্দ্রনাথের আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে তিনি ডায়েরীতে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন।" প্রথম দর্শনের পরে ধীরে ধীরে

রী থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে বলেই আমার
দ। নিবেদিতার ডায়েরী বেলুড়ে রামকৃষ্ণমঠে
ক্ষত আছে। আমার তা দেখার সৌভাগ্য হয় নি।
রণের সে সুযোগ নেই।

কন্তু এ সম্পর্কে স্বামী তেজসানন্দের উক্তিই সর্বাংশে
যোগ্য বলে মনে করি। স্বামী তেজসানন্দ বেলুড়
ঞ্চ বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের
লন-সমিতির অন্যতম সদস্য। তিনি কলিকাতা
দ্যালয় কর্তৃক প্রথম নিবেদিতা-বক্তারূপে যে
ময় সারগর্ভ ভাষণ দেন তাই গ্রন্থাকারে "ভগিনী
দিতা" নামে প্রকাশিত হয়েছে। তেজসানন্দ উক্ত
লিখছেন: "একদিন স্বামী বিবেকানন্দই নিবেদিতাকে
করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের
জাড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে গিয়াছিলেন। তখন
ই নিবেদিতা ঠাকুর-বাড়ির সাংস্কৃতিক বৈঠকে ঘনঘন
য়াত আরম্ভ করেন এবং ক্রমে সেখানকার একজন
নিত অতিথিরূপেই পরিগণিত হইলেন। এই
প-আলোচনার মাধ্যমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
াপ্রতিভা ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প-
র সঙ্গে পরিচিত হইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।
রের গুণে মুগ্ধ হইয়া এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভ্যবৃন্দ
র এক গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া
লেন। যতই দিন যাইতে লাগিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে
দিতার সম্বন্ধ আরও নিবিড় ও ঘনীভূত হইয়া উঠিল।"
৭১-৭২]

স্বামী তেজসানন্দ সুমিতবাক্ সত্যসন্ধ সন্ন্যাসী।
যোগ্য তথ্য ছাড়া তিনি কোনও কথা বলবেন না।
বিবেকানন্দই নিবেদিতাকে ঠাকুর-বাড়িতে নিয়ে
ছিলেন, এ তথ্য সর্বজনবিদিত। কিন্তু তখন থেকেই
দিতা ঠাকুর-বাড়ির সাংস্কৃতিক বৈঠকে ঘনঘন
য়াত আরম্ভ করেন, এ সংবাদ আমাদের সুস্পষ্টভাবে
ছিল না।

৫

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তবু সংক্ষেপে আরও

ভুল বুঝি নি। বিবেকানন্দের অকলঙ্ক চরিত্রের বিশুদ্ধ
আদর্শ রক্ষার উৎকণ্ঠাবশেই তিনি আমার প্রবন্ধের
প্রতিবাদ করেছেন। তিনি মনে করেছেন আমি সত্য ও
কল্যাণভ্রষ্ট হয়েছি। কিন্তু কোন্ ধারণার বশে তাঁর
এ কথা মনে হয়েছে ভেবে দেখা প্রয়োজন। বিবেকানন্দ
সম্পর্কে তাঁর চিন্তা কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কারের
ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। বিচার করে দেখা কর্তব্য
সেগুলি সত্যভিত্তিক কিনা।

১। আমি বলেছি: "বিবেকানন্দের চিত্ত ছিল নিত্য-
শুদ্ধ। তাতে কোন প্রকার বিকারের কল্পনা অসম্ভব।"
শ্রীমান্ বলেছেন: "একথা বলা সত্ত্বেও তাঁর রচনায়
বিবেকানন্দের চিত্তের পরিচয় চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে।
বিবেকানন্দ নিবেদিতার অনুরাগের কথা যে জানতেন
না তার বড় প্রমাণ হল নিবেদিতার অন্তরে ঠিক এই
ধরণের অনুভূতির অস্তিত্বমাত্র ছিল না—থাকলে তিনি
বিবেকানন্দের দ্বারা গৃহীত হতেন না।"

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এ ধারণা সত্যের বিপরীত।
আমেরিকায় জনৈকা বিত্তশালিনী মহিলা তাঁর কাছে
বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁকে
পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে তাঁকে
শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধ চির-
দিন পবিত্র, সুন্দর ও সুগভীর ছিল। নিবেদিতার চিত্তকেও
পরিশুদ্ধ করে তিনি তাঁকে শিষ্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন।
আত্মশুদ্ধির সেই ইতিহাস যে-অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে
নিবেদিতা তার নামকরণ করেছেন 'আত্মা-জাগানিয়া'—
The awakener of Souls। বস্তুতঃ, প্রকৃত মহাপুরুষের
চরিত্র স্পর্শমণির মত। তার স্পর্শে লোহাও সোনা হয়।
কবিরাজ-গোস্বামীর প্রাসঙ্গিক তত্ত্বালোচনার কথা স্মরণ
করেই লোহা ও সোনার কথা বললাম। বিবেকানন্দেরও
সবচেয়ে বড় পরিচয়—তিনি ছিলেন আত্মা-জাগানিয়া।
তিনি মানুষের দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করতেন। "Each
soul is potentially divine. The goal is to
manifest the Divinity within, by controlling
nature, external and internal."

২। শ্রীমান্ বলেছেন: "বিদেশ থেকে যে-সব
[illegible]

সকলেই নিবেদিতার মত স্বামীজিকে ভালবেসেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন—স্ত্রীপুরুষ ভেদে এই ভালবাসার কোনও পার্থক্য ঘটে নি।" তাঁর মতে, শিষ্য-শিষ্যাদের সম্পর্কে স্বামীজির মনোভাবের মধ্যেও কোন তারতম্য-ভেদ ছিল না।

এ ধারণাও সত্যভিত্তিক নয়। বিবেকানন্দ মহাপুরুষ নিশ্চয়ই। কিন্তু মানবসত্তাতেই মহাত্মা। নিবেদিতা নিজেই বলেছেন, কোন মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে যখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভক্তসমাজ মিলিত হন তখন সেই মহাপুরুষের বাণী তাঁদের অন্তরে পৌঁছয় "hidden emotional relationship"-এর মধ্য দিয়ে। কেউ নিজেকে মনে করেন তাঁর ভৃত্য, কেউ ভ্রাতা, কেউ বন্ধু ও সখা, আবার কেউ কেউ তাঁকে প্রিয়পুত্ররূপেও গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁদের মনোবৃত্তি অনুসারে তাঁদের অনুভূতিরও তারতম্য ঘটা অনিবার্য।

বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের কি ভাবে গ্রহণ করতেন তার একটি সার্থক ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রীমতী জয়া। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর বিবেকানন্দ-জীবনীর ৯১-৯২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় জয়ার বক্তব্য উদ্ধার করে লিখছেন :

"Miss MacLeod tells us, "I said to Nivedita, 'he was all energy.' She replied, 'He was all tenderness ' But I replied, 'I never felt it.' 'That was because it was not shown to you.' For he was to each person according to the nature of that person and his way to the Divine." "

স্বামীজির দুজন অন্তরঙ্গ শিষ্যার এই কথোপকথন শ্রীমানের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।

৩। আমার বক্তব্য ছিল, বিবেকানন্দ-নিবেদিতার জীবনে শিব-চেতনা একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে। রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দ সম্পর্কে লিখেছেন : "It was as if his chosen God had imprinted His name upon his forehead." [পৃ° ৬]। বলাই বাহুল্য, বিবেকানন্দের এই 'নির্বাচিত দেবতা' বলতে রোমাঁ রোলাঁ শিবের কথাই বলেছেন। কাশীর বীরেশ্বর শিবের বরেই যে বিবেকানন্দ-জননী এই সন্তান লাভ নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন সেদিন প্রথমে গুরুশিষ্যা শিবপূজা করেছিলেন। তারপর স্বামীজি নিজে শিবের বেশ ধারণ করেছিলেন। শ্রীমান্ বলেছেন, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর মতে "সন্ন্যাসীর আদর্শই শিব।" "সন্ন্যাসীরা (রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরাও) বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এখনও শিবযোগী সাজেন। স্বামীজি প্রায়ই শিবযোগী সাজতেন।"

"সন্ন্যাসীর আদর্শই শিব"—শ্রীমানের এ উক্তিতে অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটেছে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর আদর্শ শিব নন। সাধারণ ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের আদর্শ শিব—এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু বিবেকানন্দের জীবনে শিবচেতনা একটি দুর্লভ মহিমা ও অন্তর্গূঢ় বিশিষ্টতা পেয়েছে। নিবেদিতার জীবনেও তিনি শিবচেতনাকে বিশেষ ভাবে অনুবিষ্ট করে দিয়েছিলেন। অমরনাথে তুষারলিঙ্গ শিবের কাছে নিবেদিতাকে নিবেদন করার বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১৮৯৮ সনে উত্তর-ভারত ভ্রমণে যাঁরা সঙ্গী ছিলেন তাঁদের সবাইকে পেছনে রেখে শুধু নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে স্বামীজির দুর্গম পর্বতারোহণ আকস্মিক ঘটনা নয়। নিবেদিতাকে অমরনাথ শিবের কাছে নিবেদন করার পর স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেছিলেন : "You do not now understand. But you have made the pilgrimage, and it will go on working. Causes must bring their effects. You will understand better afterwards. The effects will come" [Notes of some wanderings, পৃ° ১১২]

আমি বলেছি : "সে অভিজ্ঞতা নিবেদিতার জীবনে চেতনার নূতন স্তর রচনা করেছে। ধীরে ধীরে তাঁর বিবেকানন্দ-চেতনাও শিবচেতনায় উন্নীত হয়েছে।" সুধাংশুবাবু তাঁর আলোচনায় ভক্তিমার্গের একটি নিগূঢ় তত্ত্বকথা উচ্চারণ করেছেন : "গুরুই ভগবান।" আমি বলেছি ভক্তিমার্গে নিবেদিতার চেতনারও তিনটি স্তর. প্রথমে বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, তারপর বীরেশ্বর শিব, তারপর প্রেমস্বরূপ ভগবান। বীরেশ্বর [বিবেকানন্দ

। যাবে তাঁর 'Kali the Mother' গ্রন্থে। এই বীরেশ্বর"কে উৎসর্গ করা। "To Vireshwar— of Heroes," এই উৎসর্গপত্রে বীরেশ্বর শব্দটির । যে অপরিসীম, আশা করি তা ব্যাখ্যা করে বলার ন নেই।

। শ্রীমান্ বলেছেন: "স্বামীজির মধুরারতির শ্রেষ্ঠত্ব ঠ, প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, শিব উমা প্রসঙ্গের রণা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে—কিন্তু ক দৃষ্টির অভাবে এগুলির ব্যাখ্যা অসঙ্গত হয়ে য়েছে।"

মগ্রিক দৃষ্টির অভাব হয়েছে কি না এবং এগুলির । অসঙ্গত হয়েছে কি না তা তো বিতর্কের বিষয়। সে বিতর্কে প্রবেশ করব না। কিন্তু এ সম্পর্কে স্বামীজির প্রকৃত মনোভাবের প্রকাশক বলে একটি তুলেছেন। স্বামীজি তাতে বলছেন: "আর মধুর- ওপরেই বা এত ঝোঁক কেন? পুরুষ হয়ে মেয়ের নেবার দরকার কি?"

সম্পর্কে শ্রীমানকে জয়ার কথাটি পুনরায় স্মরণ দিই—"He was to each person according e nature of that person and his way to Divine." বস্তুতঃ, মহাপুরুষেরা তত্ত্ববিতরণে রাভেদ মেনে চলেন। বহিরঙ্গদের জন্যে নাম- ন আর অন্তরঙ্গদের জন্য লীলারসাস্বাদনের ঐতিহ্য দেশেই রয়েছে।

বেকানন্দের আলোচনায় ভক্তিধর্মের প্রসঙ্গ র্য। এবং ভক্তিমার্গে মধুরারতিই যে শ্রেষ্ঠ সেকথা ীকার করে গিয়েছেন। "No other has such ndous idealising power." [Notes of wanderings, পৃ° ৫৯]। "স্বামী বিবেকানন্দ লায় উনবিংশ শতাব্দী" গ্রন্থে শ্রীগিরিজাশঙ্কর ধুরী বলেছেন: "উনবিংশ শতাব্দীর এই নবীন ী মাধুর্যের রসে ভরপুর ছিলেন।" [নূতন সংস্করণ, পৃ° ৫৫]। এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ভক্তিবাদ বেকানন্দ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে তিনি ন: "ইহা বড়ই আশ্চর্য যে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিশেষতঃ গোপী-প্রেম এমন ক্তি আকর্ষণ করিল।" [পৃ° ৫৯]

স্যানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত "বাঙ্গলার বিবেকানন্দ" গ্রন্থে বলেছেন: "স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত দুর্লভ। তিনি নিজে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে কতদিন রাধাকৃষ্ণের বিরহ সংগীত অন্তরের গভীর ব্যাকুলতা নিয়ে গাইতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনে সমাধিমগ্ন হয়ে যেতেন। যেমন গায়ক, তেমনি শ্রোতা। ঐ সংগীতের আসরে কী আশ্চর্য আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হোত তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। কিন্তু সেই স্বামী বিবেকানন্দই পদাবলী সংগীত জনসাধারণের পক্ষে গাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। অনধিকারী ব্যক্তির চিত্তে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম উদ্বুদ্ধ করবার পরিবর্তে উহা কামুকতা ও হালকা ভাববিলাস বর্ধিত করবে এই ছিল স্বামীজীর অভিমত।" [পৃ°৩৩]

৫। শ্রীমান্ বলেছেন, 'মরণ-মিলন' কবিতার বক্তব্যের আলোকে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্ক আমি 'ঢেলে সাজার' চেষ্টা করেছি। তাঁর সিদ্ধান্ত হল, নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কোনদিনই ছিল না। ১৮৯৯ জুন পর্যন্ত উভয়ের পরিচয়ের অগভীরতারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে নিবেদিতার পত্রে। বিবেকানন্দের তিরোধানের পূর্বে স্বল্প সময় এবং কর্মব্যস্ততার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার সঙ্গে এমনভাবে মেশবার সুযোগ পান নি যাতে তাঁরা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। সুতরাং বিবেকানন্দের তিরোধানে নিবেদিতার জীবনের "গোপনতম উপলব্ধি"র কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার সম্পর্ককে বলেছেন 'পূজা'। অতএব বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্কটি শিব-উমার রূপকে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনদিনই ছিল না। ওটি আমারই সৃষ্টি।

নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা ছিল কি না এবং তিনি বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্ককে কী দৃষ্টিতে দেখতেন সে সম্পর্কে নূতন করে আর কোনও আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে করি না। নিবেদিতার মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ যে-প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তাতে দেখছি, নিবেদিতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তায় শিব-উমার রূপকটি

ওতপ্রোত ভাবে উপস্থিত হয়েছে। একজন ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীর জীবনসাধনাকে রবীন্দ্রনাথের মত বাণীসিদ্ধ কবি 'সতীর তপস্যা'র সঙ্গে তুলনা করলেন কেন তা বিশেষ ভাবে ভেবে দেখার বিষয়। আমার বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথের নিবেদিতা-চিন্তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এই শিব-উমার রূপকল্পটিই বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে নিবেদিতার হৃদয়ানুভূতির প্রতীক হিসাবে "মরণ-মিলন" কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মনেই এই সম্পর্ক-কল্পনাটি ছিল, আমি নূতন করে ঢেলে সাজি নি।

শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জনের প্রতিবাদ-প্রবন্ধের অন্যান্য প্রতিপাদ্য সম্পর্কে আর আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি যাঁদের কথা চিন্তা করে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি তাঁরা সেসব বিষয়ে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। আমার বক্তব্যের প্রতিবাদে শ্রীমান্ প্রভূত পরিশ্রম ও প্রচুর তথ্য সমাবেশ করেছেন। কিন্তু প্রাসঙ্গিকক্ষেত্রে, অন্যান্য প্রাজ্ঞ-জনের কথা বাদ দিয়েও, স্বামী তেজসানন্দ, স্বামী নিখিলানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দের অভিমত ও সিদ্ধান্তের চেয়ে তাঁর অভিমত ও সিদ্ধান্ত অধিকতর গ্রাহ্য এ কথা এখনও মেনে নিতে পারছি না। শ্রীমান্ সত্যরক্ষা ও সত্যপ্রতিষ্ঠার অভিমান করেছেন। আমি শুধু বলব, সত্যকে আধখানা ঢেকে আধখানা রেখে, ইচ্ছানুযায়ী বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করে বিচার করলে অভ্রান্ত তত্ত্বে পৌঁছনো যাবে না। কিন্তু আমার উপদেশ শ্রীমানের নূতন প্রকোপের কারণ হবে বলেই আমার ভয় হচ্ছে।

৬

শ্রীমান নলিনীরঞ্জনের প্রতিবাদ-প্রবন্ধের আলোচনায় আমি শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও মনে রেখেছিলাম। সুধাংশুবাবু ঠিকই বলেছেন, আমার মূল প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি: (১) বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্কের রূপ, (২) রবীন্দ্রনাথের "মরণ-মিলন" কবিতাটি এই আত্মিক সম্পর্কের উপর কোন আলোক নিক্ষেপ করে কি না। প্রথম প্রতিপাদ্যের দুটি স্তর। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে কোন্ রূপে দেখা দিয়েছিল, এবং এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি কিনা।

এ বিষয়ে আপাতত: আমরা রবীন্দ্রনাথের তিনটি উক্তি পাচ্ছি। (১) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে আমরা শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নারীর প্রকৃত গভীর অনুরাগ যদি কেউ পেয়ে থাকে তাহলে বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন নিবেদিতার কাছে। (২) শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে দেখছি, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বিবেকানন্দ কি বিবেকানন্দ হতেন যদি না নিবেদিতার আত্মনিবেদন লাভ করতেন।" (৩) শ্রীমতী রাণী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে দেখছি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মেয়েদের মধ্যে একটি জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে তাদের ভিতরকার জিনিস। emotion। এ যখন একটা character-এর সঙ্গে মিশে রূপ নেয়, তা অতি আশ্চর্য। এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি সত্যিকারের পূজো করতেন বিবেকানন্দকে।" এই তিনটি উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ 'নারীর প্রকৃত গভীর অনুরাগ', 'আত্মনিবেদন' ও 'পূজো' বলতে কি বুঝেছেন তা স্পষ্ট হয়েছে প্রাসঙ্গিক বিবৃতিতে। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন, মহুয়ার "মুক্তরূপ" কবিতায় কবি এই আত্মনিবেদিত অনুরাগের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। বলাই বাহুল্য, প্রেমের প্রসাধনকলা নয়, সাধনবেগেই তার বিশিষ্টতা। 'মুক্তরূপে'র মতো জীবনের গভীরতম মহত্তম প্রেরণাকেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন প্রেম।

রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি কি না তার বিচার করতে হবে মুখ্যত: নিবেদিতার উক্তি থেকে। সে উক্তি আছে তাঁর 'The master as I saw him' গ্রন্থের "The awakener of Souls" অধ্যায়ে, এবং 'Indian Studies of Love and Death' গ্রন্থের প্রথম ও শেষ দুটি অধ্যায় বাদ দিয়ে অন্যান্য রচনায়: বিশেষ করে Meditation গুলির মধ্যে। সুধাংশুবাবু বলেছেন, শেষোক্ত গ্রন্থের লেখাগুলির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হন নি, কেননা এগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির অনেক পরে প্রকাশিত। আমি বলি নি রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমি নিবেদিতার রচনার উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি কি না তারই পরীক্ষা করার জন্যে। 'ইণ্ডিয়ান

্ অব্ লাভ অ্যাণ্ড ডেথ' গ্রন্থে নিবেদিতা কোথাও কানন্দের নাম উল্লেখ করেন নি। সুতরাং তার ্য আমার মতে অভ্রান্ত ও সংশয়াতীত হলেও তা তঃ বিশ্বাস-সাপেক্ষ। অন্য গ্রন্থের 'আত্মা জাগানিয়া' ায়ে নিবেদিতা যে hidden emotional relation-p-এর কথা বলেছেন তার স্বরূপ কি তা তিনি সুস্পষ্ট বলেন নি। জয়ার কড়চার উপর ভিত্তি করে রোমাঁ লা তাকে বলেছেন passionate adoration বা বেগময় অনুরাগ। রোমাঁ রোলাঁ বলছেন, আবেগময় ও তা ছিল বিশুদ্ধ। "Nivedita's feelings for a were always absolutely pure." কিন্তু দেখা চ্ছ, ভারতে আসার পরও এই 'আবেগময় অনুরাগে'র নিবেদিতার মনে দ্বন্দ্ব রয়েছে। যে গুরুকে তিনি endly and beloved leader' মনে করে তাঁর ব্রতে নিবেদন করেছিলেন তিনি ক্রমশঃ 'indifferent' 'silently hostile' হয়ে পড়ছেন। রোলাঁ তার রণ বিশ্লেষণ করে বলছেন: "Perhaps in this way wished to defend himself and her against e passionate adoration she had for him; • • he perhaps saw their danger."

নিখিলানন্দ রোলাঁর এই অনুমানের সম্ভাব্যতা কার করেছেন।

তারপরে গুরুকৃপায় নিবেদিতা ব্যক্তিপরিচ্ছেদবিগলিত দৃষ্টি লাভ করলেন। নিবেদিতা বলছেন: "In my vn case the position ultimately taken oved that most happy one of a spiritual ughter." এই উক্তির বাগ্‌ভঙ্গিটি লক্ষ্য করবার মত। 'he position ultimately taken' কথাগুলির অর্থ, শেষ করে ultimately কথাটির তাৎপর্য, গভীরভাবে নিয়ে দেখা প্রয়োজন। আমার বক্তব্য হল, লৌকিক র থেকে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে বেদিতার অনুরাগ যে পরিশুদ্ধ-রূপ পরিগ্রহ করেছিল রই কথা অন্তরঙ্গ ভাষায় তিনি বলেছেন 'ইণ্ডিয়ান াডি অব্ লাভ অ্যাণ্ড ডেথ' গ্রন্থের "মেডিটেশন"গুলির ধ্যে। যেখানে তাঁর প্রিয়তমের ধ্যানে তাঁর গুরুই তাঁর গবান।

৭

এবার "মরণ-মিলন" কবিতাটির উৎস সম্পর্কে সুধাংশু-বাবুর সংশয়ের কথা। তিনি প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত, তর্কশাস্ত্রে প্রবীণ। কাজেই একেবারে গোড়া থেকেই তাঁর সংশয় শুরু হয়েছে। [১] কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের মাস দুই পরে। কিন্তু সুধাংশুবাবু বলছেন: "কবিতাটি কবে লেখা হয়েছিল তা আমরা ঠিক জানি না। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু লেখা প্রথম লিখিত হয়ে পড়ে থাকত, পরে এক সময় সেগুলি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত।" উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন: "মহর্ষির আদ্যকৃত্য হয় ১৩১১ সালে, সেই উপাসনা সভার প্রার্থনান্তিক ভাষণটি মুদ্রিত হয় ১৩১৩ সালে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড)।"

রবীন্দ্রনাথের কোনও উল্লেখযোগ্য লেখা প্রথম লিখিত হবার পর অনেকদিন পড়ে থাকত, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ যখন নিজে পত্রিকা সম্পাদনা করছেন তখন, —এ উক্তি সমর্থনে কোন সার্থক ও বিশিষ্ট উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমাদের ধারণা নয়। অন্ততঃ এর সমর্থক উদাহরণ হিসাবে সুধাংশুবাবু যে তথ্যটি পরিবেশন করেছেন তা সত্য নয়। "মহর্ষির আদ্যকৃত উপলক্ষ্যে প্রার্থনা"টি ১৩১৩ সালে মুদ্রিত হয় নি। ওটি ১৩১১ সালেই মুদ্রিত হয়েছে। মহর্ষির বার্ষিক শ্রাদ্ধসভায় পঠিত "মহাপুরুষ" প্রবন্ধটি ১৩১৩ সালেই লেখা, ১৩১৩ সালেই প্রকাশিত। "মরণ-মিলন" কবিতাটিও লেখা হওয়ার পর দু মাসের অধিক কাল অমুদ্রিত অবস্থায় পড়েছিল, এমন সংশয় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই।

[২] সুধাংশুবাবু বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই যুগে ও এর আগের যুগে এই শিব-উমা প্রতীককে বহু স্থানে পাই।" উদাহরণস্বরূপ তিনি যে কবিতাটির চার পংক্তি [অভেদাঙ্গ হরগৌরী…ইত্যাদি] উদ্ধার করেছেন সেটি "মরণ-মিলনে"র আগের যুগে তো নয়ই, সেটি প্রকাশিত হয়েছে "মরণ-মিলনে"র এগারো মাস পরে, ১৩১০ সালের শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে। ওটি রবীন্দ্রনাথের হিমালয়ষট্‌কের অন্তর্গত। 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের কবিতা।

[৩] সুধাংশুবাবু বলেছেন: "রবীন্দ্র-চেতনায় শিব

'ভদ্র' ও 'রুদ্র' বহুরূপ নিয়েছে, তার শেষ রূপ 'কবির দীক্ষা'য়। ১২৯০ সালে 'ভারতী'তে (আষাঢ় ১৩৬৭, শনিবারের চিঠিতে উদ্ধৃত) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর মৃত্যুকে কি আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে বিকট করালদশনা লোল-রসনা মূর্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ওই মৃত্যুই ইঁহার প্রিয়তমা, ওই মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া উনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন।"

এখানে 'শনিবারের চিঠি'র উল্লেখ করা উচিত হয় নি। তাতে প্রতীকটির তাৎপর্য স্পষ্ট হবে না। প্রবন্ধটি আছে 'আলোচনা' গ্রন্থে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ° ১৭-২৬। প্রবন্ধের নাম "ধর্ম"। ওই "ধর্ম" প্রবন্ধের অন্তিম অনুচ্ছেদের নাম 'রূপক'। এখানে কবি "শিবের সহিত জগতের তুলনা" করেছেন। তা ছাড়া এখানে শিব-উমার কল্পনা নেই; আছে শিব ও কালীর রূপক-কল্পনা। এই রচনারও আগে আছে, 'শৈশব সংগীত' গ্রন্থে "হর-হৃদে-কালিকা" কবিতাটি।

সুধাংশুবাবু আমাকে সম্ভবত একটু ভুল বুঝেছেন। রবীন্দ্র-চিন্তায় শিবের বহু রূপ আছে। আমি সেকথা বলি নি। শিব-উমার কল্পনাও আছে, হর-হৃদে-কালিকাও আছেন। আমার বক্তব্য তা নয়। আমার বক্তব্য হল "মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিবের সঙ্গে উমার মিলন"—এই রূপকল্পটি সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে একটিবার মাত্রই দেখা দিয়েছে এবং সেই একটি উদাহরণ হল "মরণ-মিলন" কবিতা। রবীন্দ্র-কাব্যে ব্যবহৃত শিব-উমা প্রতীকটি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাছ থেকে পেয়েছেন কি অন্যত্র পেয়েছেন, "মরণ-মিলন" কবিতায় সে প্রশ্ন অবান্তর। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিবের সঙ্গে উমার মিলন—এই রূপকল্পটি কালিদাসের কাব্যে বা প্রাচীন ভারতের রূপরেখায় কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনের কল্পনা 'মাথুর' পর্যায়ের বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের পদে পাই—

এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল-চন্দ।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিবের সঙ্গে উমার মিলন আমি অন্য কোথাও দেখি নি। রবীন্দ্রসাহিত্যেও "মরণ-মিলন" কবিতা ছাড়া অন্য কোথাও পাই নি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতত্ত্বের ক্রমবিবর্তন-পালায় এ তত্ত্বটি আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে অদ্বিতীয়। এই জন্যেই আমি এই কবিতাটিকে একটি বিশেষ মৃত্যু উপলক্ষে রচিত বলে কল্পনা করেছি। আর, পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের নিবেদিতা-চিন্তাতে [নিবেদিতার মৃত্যুর পরে লেখা প্রবন্ধে] এই বিশেষ প্রতীকটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই "মরণ-মিলন" কবিতার সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের কথা অনিবার্য ভাবেই দেখা দিয়েছে।

৮

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে সুধাংশুবাবু তাঁর আলোচনায় কিছু কিছু অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা এনেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, তাঁর আলোচনার রীতি যুক্তির ফুলগুলি গেঁথে গেঁথে সিদ্ধান্তের মাল্য রচনা নয়, ফুলগুলিকে পাতাশুদ্ধ রেখে সিদ্ধান্তের একটি সার্থক ও সুন্দর তোড়া তৈরি করা। পাতাগুলিও সেখানে অবান্তর নয়। নিবেদিতাকে লেখা বিবেকানন্দের চিঠি—'I will stand by you unto death'-এর প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন: "এর মধ্যে হরপার্বতীর দ্বৈত অর্ধনারীশ্বররূপ কল্পনা একটু কষ্ট-কল্পিত।" আমি এই চিঠি সম্পর্কে উক্ত কল্পনা কোথায় করেছি সুধাংশুবাবু বলবেন কি? বস্তুতঃ, হরপার্বতীর অর্ধনারীশ্বররূপ কল্পনা আমি কি কোথাও করেছি? "মরণ-মিলনে"র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি একটি কৌতুকাবহ উক্তি করেছেন: "যদি কোন বিশেষ শোককে ঘিরেই এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে উদিত হয়ে থাকে তবে সেখানে কি দয়িতার পুলকিত তনু হবার উপমা আসে?" সুধাংশুবাবুর এই প্রশ্নটি দেখে মনে হচ্ছে তিনি কবিতাটিকে ভাল করে পড়ে দেখেন নি। ভাল করে পড়লে তিনি এ প্রশ্ন উত্থাপন করতেন না। তা ছাড়া, বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার অনুরাগের আলোচনায় "মাথুর নৌকাবিলাসের ললিত লাস্যে"র প্রসঙ্গমাত্রই উত্থাপন করা উচিত হয় নি। আর, সুধাংশুবাবু যদি মনে করে থাকেন নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনের emotional crisis-কে আমি magnify

রছি তাহলে তিনি আমার প্রতি সুবিচার করেন। আমি নিবেদিতার ইমোশনাল ক্রাইসিসকে গ্লানিফাই করি নি, তিনি সেই ক্রাইসিস উত্তীর্ণ হয়ে দিব্যচেতনা লাভ করেছিলেন তার কথাই বলেছি। ষ্ঠ এহ বাহ্য। সুধাংশুবাবু ঠিকই বলছেন : "মতানৈক্য ন্ধের গুরুত্ব বা মূল্য কমায় না।" তিনি তাঁর লেখায় মাকে যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্যে আমি তাঁর ছে চিরকৃতজ্ঞ।

একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর বাকি রয়েছে। বিবেকানন্দের প্রয়াণে নিবেদিতার মনোভাব জানবার মত অন্তরঙ্গতা বেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ততদিনে গড়ে উঠেছিল না। মূল প্রবন্ধটিতে আমি এই বিশেষ প্রশ্নটির দিকে থাচিত মনোযোগ দিই নি। এটি যে আমার প্রবন্ধের চেয়ে বড় ত্রুটি তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার ন্দ্যাপাধ্যায় বলেছেন। নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের থম সাক্ষাতের পর "মরণ-মিলন" কবিতাটি রচনার পূর্ব ন্ত উভয়ের সম্পর্কের ইতিহাস এখানে পুনরায় স্মরণ রা যেতে পারে।

১. প্রথম দর্শনেই নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের আকৃতি ও ক্তিত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সম্বন্ধে ডায়েরিতে মন্তব্য খেছিলেন। মুক্তিপ্রাণা।। ২. স্বামীজিই নিবেদিতাকে কুর-বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই বেদিতা ঠাকুর-বাড়ির সাংস্কৃতিক বৈঠকে ঘনঘন তায়াত আরম্ভ করেন। পরস্পরের গুণে মুগ্ধ হয়ে এই স্কৃতিক কেন্দ্রের সভ্যবৃন্দ অচিরে এক গভীর প্রীতি ও ার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। [স্বামী তেজসানন্দ] ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় প্লেগ মহামারী-পে দেখা দেয়। সেই প্লেগে অবনীন্দ্রনাথের ছোট্ট য়েটি মারা গেল। তিনি 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে ছেন : "রবিকাকা এবং আমরা এ বাড়ির সবাই মিলে দা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। বিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইন্‌স-কশনে যেতেন। মার্স ডাক্তার সব রাখা হয়েছিল।" পৃ ১৩১-৩২] ৪. ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে বিলেত ত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার পত্র। বিলেত গিয়েও নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রা করে চলেছেন। তাঁরই পত্রের উপর ভিত্তি করে বীন্দ্রনাথ ইউরোপে "আচার্য জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তা" ঙালীর কাছে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছেন। ৬. এক-ন নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আলাপ-লোচনার সময় বিবেকানন্দের চিঠি আসার পর বেদিতার আচরণ ও মনোভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের [illegible] প্রাক্তন বিদ্যার্থিবৃন্দ আয়োজিত শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি, ভগিনী নিবেদিতা প্রধান-অতিথি। ৮. বেলুড়ে স্বামীজির শোকসভায় জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি।

স্বামীজির তিরোধানের সময় এবং তার অব্যবহিত পরে কলিকাতায় জগদীশচন্দ্রের উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। তখন জগদীশচন্দ্র যেমন নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তেমনি রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ অতি প্রিয়-বন্ধু। জগদীশচন্দ্রের মধ্যস্থতায় স্বামীজির তিরোধানের পরবর্তী শোকাচ্ছন্ন ও সংকটপূর্ণ দিনগুলিতে নিবেদিতার অন্তরঙ্গ মানসিক অবস্থার কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্যক্ অবগত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণিত হয়েছে।

৯

উপসংহারে একটি নিবেদন আছে। সুধাংশুবাবু বলেছেন, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ আজ আর রক্তমাংসের মানুষ নন, "শুধু নমস্য বরণীয় স্মরণীয় তর্পণীয় নন, তাঁরা 'আইডিয়া', 'আদর্শ', 'ইতিহাস', 'কাহিনী', 'প্রতীক'।" সুতরাং তাঁদের সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধা নিয়ে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে কথা বলতে হবে। শ্রীমান নলিনীরঞ্জনও বলেছেন : "বিবেকানন্দ ও নিবেদিতাকে ঘিরে যে মহৎ ভাবনা বাংলার সমাজকে একটু আলোকের সন্ধান দিয়েছে তা থেকে বঞ্চিত করলে আমরা কল্যাণ থেকেই বিচ্যুত হব।"

আমার বিশ্বাস আমি বিবেকানন্দের অকলঙ্ক চরিত্রের বিশুদ্ধ আদর্শ এবং তাঁর দেবদুর্লভ ব্যক্তিত্বের মহিমা বিন্দু-মাত্র ক্ষুণ্ণ করি নি। বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চন-সংস্পর্শ পরিহার করে চলতেন না। বলাই বাহুল্য, নিজের সম্ভোগের জন্য নয়, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকামনায় নয়, কামিনীকাঞ্চনকে তিনি আর্ত নিপীড়িত দরিদ্র ও অজ্ঞ মানুষের সেবায় এবং বিশ্বমানবের কল্যাণেই নিয়োজিত করেছেন। মহাকবি কালিদাস মহাযোগী শিবের যে আদর্শ কল্পনা করেছিলেন—"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—আমার চিন্তায় বিবেকানন্দ সেই বিকারহীন মহাযোগী।

কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন সহস্রশীর্ষ পুরুষ। তাঁর শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্ব দশ দিকে আপনার মহিমা বিস্তার করেছে। তাঁর তিরোধানের ষাট বৎসর পরেও যদি আমাদের ধারণা "হে ভারত ভুলিও না" পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে তবে পরম বেদনার সঙ্গেই বলব আমরা বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারি নি। প্রণিপাতের সঙ্গে পরিপ্রশ্ন নিয়ে এই সহস্রশীর্ষ বীর-সন্ন্যাসীর মহিমান্বিত জীবন ও আদর্শকে বহু বিচিত্র দিকে উদ্‌ঘাটিত করার মধ্যেই জাতির কল্যাণ

রম্যাণি বীক্ষ্য

উত্তর-ভারত পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এগারো

মুখ হাত ধোবার জন্য আমি যখন উঠে গেলুম, রামচন্দ্রবাবু তখন আরও জাঁকিয়ে বসলেন। মনোরঞ্জনও নড়েচড়ে এমন ভাবে সরে বসল যে তারও কোন উৎসাহের অভাব দেখলুম না।

ফিরে আসতেই মনোরঞ্জন বলল: বিহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেল।

এত তাড়াতাড়ি?

তাড়াতাড়ি কোথায়! তুমি তো কম সময় নাও নি!

গাড়িতে বসেই যদি একটা দেশের সম্বন্ধে ধারণা করা যায় তো কষ্ট করে বাড়ি থেকে বেরবার দরকার কী?

সে অন্য কথা। তবে তুমি যদি জানতে চাও তো সংক্ষেপে বলতে পারি।

আমি আমার পুরনো জায়গায় এসে বসলুম। বললুম: বল।

মনোরঞ্জন খুশী হয়ে বলল: আমরা এখন গঙ্গার দক্ষিণ দিক দিয়ে যাচ্ছি। এর নাম দক্ষিণ বিহার। গঙ্গার ওপারে উত্তর বিহার। সেও এক বিস্তৃত ভূখণ্ড। দু পারে কী কী শহর আছে, বলুন না রামচন্দ্রবাবু।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: পাটনার ওপারে সোনপুর। কার্তিক পূর্ণিমার মেলার জন্য বিখ্যাত।

বাধা দিয়ে মনোরঞ্জন বলল: পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ মেলা এটি।

প্রথম কোন্‌টি?

মনোরঞ্জন রামচন্দ্রবাবুর দিকে তাকালেন। তিনি বললেন: তা জানি নে। তবে এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সবচেয়ে বড়।

বললুম: সম্প্রতি কাগজে দেখেছি যে ছাপরার প্ল্যাটফর্ম এর চেয়েও বড় হয়েছে।

তাই নাকি!

বলে দুজনেই আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: তারপর সোনপুরের মেলার কথা বলুন।

হ্যাঁ, মেলায় এত পশু আপনি আর কোথাও দেখবেন না। শুধু গাই বলদ নয়, হাতি ঘোড়াও প্রচুর আসে।

ভদ্রলোক মজঃফরপুর মতিহারি ও বেতিয়ার কথা বললেন, বললেন দ্বারভাঙ্গা সহরসা ও পূর্ণিয়ার কথা। কিন্তু বৈশালীর কথা কিছু বললেন না। আমি তাই অনুরোধ করলুম: বৈশালীর কথা কিছু বলুন।

এ নামটি ভদ্রলোকের জানা আছে বলে মনে হল না। বললেন: ঠিক বলেছেন। কি —

মনোরঞ্জন বলল: নামটা যেন শোনা বলে মনে হচ্ছে।

প্রাচীন নাম। ভারতের একটা গৌরবময় অধ্যায়ের কথা এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: সত্যি নাকি!

বললুম: কিছুদিন আগে একখানা পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়ছিলুম। বৈশালীর খানিকটা পরিচয় তাতেই পেলুম। বিশ্বামিত্র মুনি যখন রাম লক্ষণকে জনকপুরে নিয়ে যাচ্ছেন তখন এই সমৃদ্ধ বৈশালী দেখিয়ে মুনি বলেছিলেন যে সত্যযুগে সমুদ্র মন্থনের আগে দেবাসুরের সম্মেলন হয়েছিল এই শহরে। দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যে তাঁর রাজধানীর জন্য এই জনপদটিই পছন্দ করেছিলেন। পুরাণে আছে যে রাজা বিশাল এইখানে তাঁর রাজধানী

াপন করে নিজের নামে বিশালাপুরী বা বৈশালী নাম রেখেন। বিশাল ছিলেন ইক্ষাকুর পুত্র ও সৃষ্টিকর্তা মার পৌত্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্টির গোড়া থেকেই বৈশালী নগরীর প্রাধান্ত ছিল।

ইতিহাসের যুগে বৈশালী ছিল লিচ্ছবি রাজাদের রাজধানী। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের জন্ম এই গারে। বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন তিনবার। নগরের উপকণ্ঠে ছিল অম্বাপালির আম্রকানন। এই নগর দেখতে এসেছেন চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়ান ও হিউএন চাঙ। তাঁরা অম্বাপালির বিহার দেখে ফিরে গেছেন।

কানিংহাম সাহেব, স্মিথ সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে মজঃফরপুর শহরের তেইশ মাইল দূরে বাসার নামে একটা গ্রামই প্রাচীন বৈশালী। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়ে এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। এখন নাকি ভাল রাস্তা হয়েছে, বৈশালী পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে। যাত্রীরা এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে নিয়মিত যায়-আসে।

রামচন্দ্রবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল তিনি খুবই আশ্চর্য হয়েছেন। এ সব কথা তাঁর কিছুই জানা ছিল না।

মনোরঞ্জন বলল: দ্রষ্টব্যস্থানের কথা কিছু বলবেন?

না দেখা জিনিস বলতে গেলেই ভুল হয়।

তা হোক।

বললুম: একটা উঁচু ঢিবির মত জায়গার নাম রাজা বিশাল কা গড়। সেখানে অনেক মাটির সীল পাওয়া গেছে। কলহুয়াতে যে অশোকের স্তম্ভ আছে, এই গড় থেকে সেখানে যাবার একটা রাস্তার অংশ খুঁড়ে বার করা হয়েছে। শুনে আশ্চর্য হবে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এই রকমের স্তম্ভ পাওয়া গেছে—রামপুরুয়া লউরিয়া আরারাজ লউরিয়া নন্দনগড় কলহুয়া—মসৃণ চকচকে বালিপাথরের কুড়ি-বাইশ ফুট উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটি সিংহের মূর্তি। পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন যে সম্রাট অশোক যখন পাটলিপুত্র থেকে লুম্বিনি গিয়েছিলেন তখন এই স্তম্ভগুলি তাঁর যাত্রাপথে পোঁতা হয়েছিল।

খুবই আশ্চর্যের কথা।

এই বৈশালীতে এখন অনেক কিছু দেখবার আছে। একটি জাদুঘরও হয়েছে। নালন্দায় যেমন পালি ও বুদ্ধলজি শিক্ষার মব নালন্দা বিহার, বৈশালীতে তেমন প্রাকৃত জৈনলজি শেখবার জৈন প্রাকৃত রিসার্চ ইনস্টিটিউট। মহাবীরের জন্মদিনে বৈশালী সংঘ বৈশালী মহোৎসব করেন।

মনোরঞ্জন বলল: তোমার কথা শুনে জায়গাটা একবার দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।

অন্ততঃ নালন্দা যাঁদের ভাল লাগে, তাঁদের তো বৈশালী দেখা নিতান্তই উচিত। বৈশালী নালন্দার চেয়ে প্রাচীন, রাজগৃহের চেয়েও। ভারতে এর চেয়ে প্রাচীন নগর আর কিছু আছে কি না আমার জানা নেই।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: মুঙ্গের ভাগলপুর অঞ্চলটাও খুব প্রাচীন। এই সব স্থান মহাভারতের অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত। অঙ্গের রাজধানী চম্পা ভাগলপুরের নিকটে। মুঙ্গের দুর্গের ভিতর কর্ণচৌরা নামে একটা জায়গা আছে। লোকে একটা খুব পুরনো গাছ দেখিয়ে বলে যে মহারাজ কর্ণ সেইখানে বসে প্রজাদের সোনা বিলোতেন। মুঙ্গের যান নি?

না।

না না, এসব জায়গা একবার দেখে নেবেন। কষ্টহারিণী ঘাটে স্নান করে মুঙ্গের দুর্গ দেখবেন। এখন সব গভর্মেণ্টের অফিস হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন জিনিস অনেক দেখতে পাবেন। তারপর পীর পাহাড়, গরম জলের সীতাকুণ্ড, ঋষীকেশ। কত রকমের জিনিস তৈরি হচ্ছে—বন্দুক সিন্দুক, সোনা-রূপা-লোহার জিনিস। ভাগলপুরের তসর আর এগুলির কথা তো জানেনই। গঙ্গার মধ্যে আজগৈবিনাথের মন্দির দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। উমানন্দ ভৈরব দেখেছেন?

না।

কামাখ্যা দেবীর ভৈরব উমানন্দ ব্রহ্মপুত্র নদীর মাঝখানে। আজগৈবিনাথও ওই রকম। মনোরঞ্জনকে আমি বললুম: বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনেছ?

শুনেছি।

ভাগলপুরের নিকটে সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: তারপর রাজমহল ও মন্দার

ছিল দেখুন। পুরাণে সমুদ্র মন্থনের কথা পড়েছেন তো! এই মন্দার পর্বতকে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মনে আছে, মন্দার হয়েছিল মন্থন দণ্ড।

পাটনা ছেড়েই দানাপুরে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। যাত্রীদের ঘুম তখনও ভাঙে নি। তারপর আরা ও বক্সারে দাঁড়িয়েছে। এইবার দিলদার নগর পেরিয়ে গেল। মোগলসরাইয়ের আগে আর কোথাও দাঁড়াবে না। মোগলসরাইয়ে রামচন্দ্রবাবু নেমে যাবেন। তার আগে আর দু-একটি স্থানের কথা জেনে নেওয়া দরকার। বললুম, পাটনার কথা কিছু বললে না?

পাটনাও দেখেন নি বুঝি?

না।

তবে ভোরবেলায় নেমে পড়লেন কেন? একটা রিক্শা নিয়ে এক চক্কর লাগিয়ে দিল্লী কিংবা জনতা এক্সপ্রেস ধরতেন। দু-তিন ঘণ্টায় মোটামুটি একটা ধারণাও হত, দুপুরবেলায় কাশীও পৌঁছে যেতেন।

মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: বেশ হত তা হলে?

মনোরঞ্জন বলল: তোমাকে মুরুব্বী ধরে তো সুবিধে হল না। ভেবেছিলুম—

বাধা দিয়ে বললুম: তোমার সঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁদের কথা কি ভুলে গেলে!

আমার সঙ্গে!

সে কি, রাতের লুচি তো বোধ হয় এখনও রাখা আছে!

মনোরঞ্জন এবারে হেসে উঠল, বলল: বুঝেছি, বুঝেছি।

বললুম: তবেই ভেবে দেখ, যেখানে-সেখানে নামতে বললেই কি নামা যায়!

তারপরে রামচন্দ্রবাবুকে বললুম: এইবারে আপনি পাটনার গল্প বলুন।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: পাটনার পুরনো নাম যে পাটলিপুত্র তা জানেন?

জানি। এই পাটলিপুত্র যখন নির্মিত হচ্ছিল, তখন বুদ্ধদেব এই পথে বৈশালী যাচ্ছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে এই শহর খুব সমৃদ্ধিশালী হবে। হয়েও ছিল। মহারাজ অশোক এখানে রাজত্ব করেছেন অতবড় সম্রাট ভারতবর্ষে আর জন্মায় নি। লোকে বলে, তিনি বৌদ্ধ না হলে ভারত কোনদিন বিদেশী শত্রুর হাতে যেত না।

মনোরঞ্জন বলল: [illegible] তোমার ইতিহাসের আলোচনা, পাটনার কথা কিছু শুনি।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: বছর তিরিশেক আগে এই পাটলিপুত্র শহর খুঁজে পাওয়া গেছে। মাটির নীচে থেকে যা খুঁড়ে বের করা গেছে তা মেগাস্থিনিসের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। বর্তমান পাটনা শহরে তিনটি ভাগ আছে। পুরনো পাটনা ষোড়শ শতাব্দীতে শের শাহের তৈরি, বৃটিশ আমলের বাঁকিপুর, আর নতুন রাজধানী। বড় বড় সরকারী বাড়িঘর সব রাজধানীতেই আছে। তা না দেখলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু গোলঘরের উপরে একবার উঠবেন।

সে আবার কী?

মৌচাকের আকারের একটি ঘর, কিন্তু উঁচু প্রা[illegible] একশো ফুট। উপরে উঠলে গান্ধী ময়দান ও পাটনা শহর দেখতে পাবেন, দেখতে পাবেন গঙ্গা নদীও।

আমি বললুম: পাটনায় আর একটি দ্রষ্টব্য স্থা[illegible] আছে—গুরুগোবিন্দ সিংয়ের জন্মভূমি।

রামচন্দ্রবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললুম এই শিখ গুরু যে ঘরে জন্মেছেন, শুনেছি, রণজিৎ সিং[illegible] সেখানে একটি গুরুদ্বার নির্মাণ করে দিয়েছেন।

আপনি কি হর মন্দিরের কথা বলছেন?

ওই রকমই কোন নাম হবে। শুনেছি, সেখানে গুরু[illegible] কৃপাণ ও খড়ম রাখা আছে।

রামচন্দ্রবাবু বললেন, খ্রীষ্টানদেরও একটা পুরনো গি[illegible] আছে, তার নাম পাদরি কি হাভেলি।

মনোরঞ্জন সশব্দে একটা হাই তুলতেই রামচন্দ্রবা[illegible] নীরব হলেন।

বারো

আধুনিক পাটনার সম্বন্ধে আমারও কৌতূহল [illegible] না। নূতন শহর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আ[illegible] পাটনা সেই পর্যায়ে পড়ে। পাটনা যদি পাটলি[illegible]

হত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই নেমে পড়তুম। ভারতের অতীত ছিল ঐশ্বর্যে ভরা। সেই ঐশ্বর্যের খণ্ড খণ্ড কাহিনী পড়েছি বৈদেশিক পর্যটকের লেখায়। এ যুগের সভ্য জগৎ আমাদের অতীতকে অস্বীকার করতে চায়। আমাদের বর্তমান যদি গৌরবের হত, তাহলে এ সুযোগ তারা পেত না। মাটির উপরের দারিদ্র্য ঢাকবার জন্য আমরা মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন বার করছি।

বললুম: বিহারে এই রকমের স্থান আরও একটি আছে।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: আপনি কি সসারামের কথা বলছেন?

না।

মনোরঞ্জন বলল: গয়ার কথা?

তাও না।

তবে?

বুদ্ধগয়া। আড়াই হাজার বছর আগে সিদ্ধার্থ যেখানে বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই স্থান।

মনোরঞ্জন বলল: দেখেছি। কিন্তু সসারাম দেখি নি। সসারামে কী আছে?

আমি বললুম: সসারাম ঐতিহাসিক স্থান, শের শাহর সমাধির জন্য বিখ্যাত।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: ঠিক বলেছেন। তবে শুধু শের শাহর নয়, তার বাপের ও ছেলের তিনজনেরই সমাধি আছে। তবে শের শাহর সমাধিই সবচেয়ে সুন্দর। একটা বড় দীঘির মধ্যে এই সমাধি একটা ছোট পাহাড়ের উপর।

বললুম: লোকে বলে, পাঠান স্থাপত্যের এইটিই শ্রেষ্ঠ নমুনা।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: একটা উদ্যান আছে, শের শাহর বাপ যে বাড়িতে থাকত, তার নাম কুইজ, আর একটা টার্কিশ বাথ। রেললাইন বসবার আগে যাত্রীরা যখন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যাতায়াত করত, তখন তারা এইখানে স্নান করে একটা খাতায় প্রশংসা লিখে রাখত।

মনোরঞ্জন বলল: সেই খাতা আপনি দেখেছেন?

না। লোকের মুখে শুনেছি।

আর কিছু?

আপনারা পুরনো জিনিস ভালবাসেন জানলে আরও কিছু জেনে নিতাম। একটা পাহাড়ের নাম চন্দন পীরের পাহাড়। তার নিকটে একটা গুহায় নাকি অশোকের শিলালিপি আছে। শুধু এইখানেই নয়, গয়া থেকে রাজগিরির পথেও নাকি আছে। এ সবে আমার কোন কৌতূহল নেই বলে ভাল করে জানবার চেষ্টা করি নি।

বললুম: অশোকের শিলালিপি মানেই বৌদ্ধ অধিকার।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: লোকে কিন্তু অন্য কথা বলে। অবশ্য মুসলমানেরা তারা ওই গুহাকে চন্দন পীরের চিরাগদান বলে। চিরাগ মানে বোঝেন তো? বাতি। চিরাগদান মানে বাতির আধার। চন্দন পীরের সমাধি আছে পাহাড়ের উপর, একটা দরগাও আছে।

মনোরঞ্জন বলল: গয়ার কথা তোমাকে বলতে পারব।

রামচন্দ্রবাবু বললেন: আপনি গেছেন বুঝি?

বেড়াতে যাই নি, গিয়েছিলুম পিণ্ড দিতে। ভারি ঝকমারি।

কেন?

যেমন নোংরা শহর, তেমনি টানাটানি। পাণ্ডাদের আমি বড় ভয় পাই।

আমি বললুম: টানাটানি কোন্ তীর্থে নেই।

রামচন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি বললেন: কোন বাজে লোকের হাতে নিশ্চয়ই পড়েছিলেন, তা না হলে গয়া তীর্থ হিন্দুদের খুবই বড় তীর্থ।

মনোরঞ্জন বলল: গয়ার মাহাত্ম্য আমি পাণ্ডাদের মুখেই শুনেছিলুম।

কোন রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী?

রামায়ণ মহাভারতে গয়ার উল্লেখ আছে, কিন্তু কাহিনীটা বায়ুপুরাণের। ধার্মিক রাজা গয়াসুরের গল্প। জাতে অসুর হলেও তার আচরণ ছিল ধার্মিকের মত। সেই অসুর কোলাহল পর্বতের উপর তপস্যা করতে বসল। কঠোর তপস্যা। দেবতারা দেখলেন, মহাবিপদ। একে ধার্মিক, তার উপর এই তপস্যা। এ তো স্বর্গরাজ্য থেকে

দেবতাদের তাড়াবে না, নিজেই দেবতা হয়ে বসবে। কী করা যায়! ইন্দ্র বললেন, চল পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, বিষ্ণুর কাছে চল। বৈকুণ্ঠে সভা বসল। অনেক চেঁচামেচির পর ভোটে একটা রেজলিউশন পাস হল : তপস্যা শেষ হবার আগেই গয়াসুরকে বর দিয়ে দেওয়া যাক।

দেবতারা সবাই গিয়ে কোলাহল পর্বতে উঠলেন। বললেন, বৎস, আমরা তোমার তপস্যায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর নাও। গয়াসুর বললেন, তবে এই বর দাও প্রভু যে আমার দেহ পৃথিবীর পবিত্রতম বস্তু হবে। দেবতারা বললেন, এ আবার এমন কি বর, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। তথাস্তু বলে সবাই বিদায় নিলেন।

এদিকে গয়াসুর তাঁর দেশে ফিরে বুক ফুলিয়ে রাস্তা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। যত পশুপাখি পাপীতাপী তাঁর পবিত্র দেহ দেখে উদ্ধার হয়ে যেতে লাগল। একেবারে সোজা স্বর্গবাস। নরক খাঁ-খাঁ করছে, যমের কাজকর্ম নেই, বিচার কার করবেন, আর কাকে শাস্তি দেবেন! এদিকে স্বর্গে স্থানাভাব। উদ্বাস্তুর মত পঙ্গপালের চাপে স্বর্গে তিষ্ঠানো দায় হল। গয়াসুর এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাচ্ছেন, এক নগর থেকে অন্য নগরে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। জীবের মুক্তির জন্য তিনি দিশেহারা। স্বর্গে আবার সভা বসল। অনেক পরামর্শ, অনেক চেঁচামেচি, অনেক হাতাহাতির পর স্থির হল গয়াসুরকে নিশ্চল কর, ও যেন নড়তে না পারে।

বাস্, বিষ্ণু গিয়ে গয়াসুরকে বললেন, যজ্ঞের জন্য তোমার দেহের দরকার। আমরা তোমার পবিত্র দেহের উপর যজ্ঞ করব। গয়াসুর বলল, সে তো আমার সৌভাগ্য প্রভু! গয়ায় মাথা, উড়িষ্যার যাজপুরে নাভি ও দক্ষিণের পীঠাপুরমে পা রেখে গয়াসুর শুয়ে পড়ল। যজ্ঞ আরম্ভ হবে।

প্রথমেই তাকে নিশ্চল করার চেষ্টা। ব্রহ্মা যমকে বললেন ধর্মশিলাটি তার দেহের উপর রাখতে। সমস্ত দেবতারা সেই ধর্মশিলার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু গয়াসুর নিশ্চল হল না। তখন বিষ্ণুও তার উপর উঠলেন। গয়াসুর নিশ্চল হয়ে বলল, আমাকে নিশ্চল করবার জন্য আপনাদের এত কষ্টের কী দরকার ছিল। আমাকে একবার বললেই তো পারতেন। দেবতারা স্বীকার করলেন, সত্যিই তো। তাহলে তুমি আর একটা বর নাও। গয়াসুর বলল, আমার নিজের জন্য আমি কিছুই চাই না। আপনারা বর দিন যে যতদিন এই পৃথিবী থাকবে আর আকাশে উঠবে চন্দ্র সূর্য, আপনারা সকলেই এই শিলায় অবস্থান করবেন, আর এই স্থান একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হবে। দেবতারা বললেন, তথাস্তু। গয়াসুরের নামে এই তীর্থের নাম হল গয়া।

মনোরঞ্জন থামতেই আমি বললুম : সাবাস।

কেন?

গল্পটি বেশ বলেছ। লিখলে নাম করতে পারবে।

রামচন্দ্রবাবু বললেন : সত্যিই ভাল বলেছেন।

মনোরঞ্জন বলল : গয়ায় শুধু একটি মন্দির দেখেছিলুম, বিষ্ণুপদ মন্দির। সাড়ে তিন শো বছর পূর্বে রানী অহল্যা বাঈ এই মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এখন ভিতরে একটি রুপোর পীঠের উপর বিষ্ণুর পদচিহ্ন আছে। লোকে এইখানে সারাক্ষণ পিণ্ড দিচ্ছে। মন্দির প্রাঙ্গণের এক কোণে অক্ষয় বট, সেখানেও পিণ্ডদানের রীতি। মূল অক্ষয় বট সেখান থেকে আধ মাইল দূরে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নীচে।

বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলে?—আমি জানতে চাইলুম।

মনোরঞ্জন বলল : তোমার কি মনে হয়?

যাও নি শুনলে বিস্মিত হব না। কাল রাতে বোধ হয় বলেছিলে দেখেছ।

দেখেছি। তবে তোমার মত বর্ণনা দিতে পারব না।

বর্ণনার দরকার নেই, যা দেখেছ বল।

যা মনে আছে বলছি। গয়া থেকে পাকা সাত মাইল যেতে হবে দক্ষিণে। যে নদীর ধারে বুদ্ধ গয়া, তার নাম নৈরঞ্জনা। দু-আড়াই মাইল দূরে আর একটা নদীর সঙ্গে মিলে এরই নাম হয়েছে ফল্গু। ভেবেছিলুম, একটি মন্দির দেখতে পাব, আর সেই বিখ্যাত বোধিদ্রুম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বনের ভিতর একটি আধুনিক আশ্রম। কতকটা শহরেরই মত। সারি সারি পিপুল গাছের মাঝখানে মহাবোধি মন্দির তো আছেই, প্রাঙ্গণে নানা আকার ও আকৃতির অসংখ্য স্তূপ ও মন্দির। তার ওপর চীনা মন্দির, তিব্বত ব্রহ্ম ও থাই বিহার।

বনবিভাগের জাদুঘর ডরমিটরি রেস্টহাউস টুরিস্ট ও ইনস্পেকসন বাংলো ও কতকগুলো ধর্মশালা।

মহাবোধি মন্দিরটি বড় সুন্দর। কিসের সঙ্গে তুলনা করব জানি নে। কতকটা পিরামিডের আকার। নীচেটা চারকোনা, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়ে উপরে উঠেছে, একেবারে শিখরটা ঘণ্টার মত। সারা গায়ে কারুকার্য, আলো ও ছায়ায় বড় সুন্দর দেখায়। একটা উঁচু ভিত্তির উপরে মন্দির, চার কোনায় একই আকারের চারটি মন্দির। পিরামিড বললে একটা বিরাট স্থূল জিনিস বোঝায়। আমার উপমা শুনে যদি তাই ভাব তো ভুল করবে। মন্দিরটি চতুষ্কোণ বলেই পিরামিডের কথা বলেছি, তা না হলে আর কোন মিল নেই।

বললুম: ভয় নেই, এই মন্দিরের ছবি আমি দেখেছি।

তবে আমাকে কষ্ট দিলে কেন?

মন্দিরের ভিতরে কী দেখেছ তাই বল।

অদ্ভুত সুন্দর বিরাট একটি মূর্তি—বুদ্ধদেব বসে আছেন। বোধিদ্রুমের নীচে তিনি যেমন করে বসেছিলেন। শুনলুম, ঠিক তেমনি ভাবে সেই জায়গাতেই এই মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীন রেলিং আছে, একটি তোরণ আছে, আর অনেকগুলি স্তূপ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লেগেছে অনিমেষ লোচন মন্দির।

মনোরঞ্জন থামতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আর কিছু মনে পড়ছে না?

মনে পড়ছে বইকি, সেই বোধিদ্রুমের কথা মনে পড়ছে। এমন প্রাচীন ঐতিহাসিক গাছ পৃথিবীতে আর নেই। বোধিসত্ত্ব যেখানে তপস্যায় বসেছিলেন তাকে বলে বজ্রাসন। একটা মন্দিরের নাম অনিমেষ লোচন কেন হল সে কথাও শুনলুম। যেখানে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ বোধিদ্রুমের দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁকে আশ্রয় দেবার জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে, সেইখানেই এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও তাকিয়েছিলুম বোধিদ্রুমের দিকে। আমার কী মনে হয়েছিল জান?

জানি না।

মনে হয়েছিল, আড়াই হাজার বছর আগে সংসারে বীতরাগ এক যুবক এসে এই গাছের নীচে ধ্যানে বসেছিল। নিজের কথা, মানুষের কথা, এই পৃথিবীর কথা তাঁর মনে ছিল না। তাঁর মনে ছিল শুধু একটি কথা—কেমন করে এই জগতের দুঃখ দূর হবে।

সিদ্ধার্থের সংকল্পের কথা আমার মনে পড়ল—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চ-
লিষ্যতে॥

এইখানে আমার শরীর শুকিয়ে অস্থি মাংস ত্বক মিলিয়ে যাক। বুদ্ধত্ব লাভ না করে আমি এই আসন ত্যাগ করব না। তাঁর তপোভঙ্গের জন্য মারের চেষ্টার কথা বুদ্ধচরিতে লিপিবদ্ধ আছে। মার নিজে ও তাঁর কন্যা রতি তৃষ্ণা ও আরতি নানা ভাবে ছলনা করে অকৃতকার্য হয়েছে। সিদ্ধার্থ তাঁর সংকল্প রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রামচন্দ্রবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গাড়ির গতি তো মন্থর হয় নি যে নামবার উদ্বেগে এই ব্যস্ততা। মনোরঞ্জনকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: সুজাতার কথা মনে পড়ে?

সুজাতা?

যে নারী ওই বোধিদ্রুমের নীচে তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধদেবকে পায়সান্ন খাইয়েছিলেন, তাঁর কথা তোমার মনে পড়ল না?

মনোরঞ্জন এ কথার উত্তর দেবার সুযোগ পেল না। রামচন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: এইখানে আমাকে নামতে হবে।

দু ধারে এখন মালগাড়ি দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পারলুম যে মোগলসরাই ইয়ার্ডের মাঝখান দিয়ে আমরা চলেছি, স্টেশনে পৌঁছতে আর দেরি নেই। ভারতের বৃহত্তম ইয়ার্ড মোগলসরাই।

নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে রামচন্দ্রবাবু ফিরে এলেন। বললেন: কলকাতায় গেলে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।

মনোরঞ্জন বলল: বেশ তো।

ঠিকানা লিখে নেবার জন্য রামচন্দ্রবাবু তাঁর পকেট থেকে নোটবুক বার করলেন। নিজেদের ঠিকানা আমরা লিখিয়ে দিলুম। ভদ্রলোক বললেন: ফেরার পথে

দেওঘরে আসবেন। আগে একটা চিঠি দিলে আমি স্টেশনে উপস্থিত থাকব।

মনোরঞ্জন রামচন্দ্রবাবুর ঠিকানাটা লিখে নিল।

গাড়ির গতি এবারে মন্থর হয়ে এসেছে। রামচন্দ্রবাবু বললেন: খবর দিতে না পারলেও চিন্তা করবেন না। পাণ্ডারা তো ছেঁকে ধরবে, আমার নাম করলেই রক্ষা পেয়ে যাবেন।

কিন্তু আপনি তো দুমকায় থাকেন।

থাকি বৈদ্যনাথধামে। একটা কাজে দুমকায় গিয়েছিলাম, বিন্ধ্যাচল থেকে বৈদ্যনাথধামেই ফিরব।

ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। নমস্কার করে ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

মনোরঞ্জন বিহ্বলভাবে তাকাল আমার মুখের দিকে। বললুম: ভয় নেই, ইনি কাশীর পাণ্ডা নন।

তের

মোগলসরাই মস্ত জংসন। গয়ার দিক থেকে ও পাটনার দিক ট্রেন আসে, যায় এলাহাবাদের দিকে ও লক্ষ্ণৌয়ের দিকে। কিউল থেকে গয়া আসা যায়, পাটনা থেকেও। তারপর আরা ও সসারামে সংযোগ আছে লাইট রেলওয়ে লাইনে। মোগলসরাই এসে এই দুই লাইন একত্র হয়েছে। সমস্ত ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়ায়। মনোরঞ্জন বলল: নামবে নাকি?

কী হবে নেমে।

মনোরঞ্জনের মুখে আবার স্মিতহাসি দেখলুম। বলল: এত লজ্জা কিসের।

লজ্জা!

লজ্জাই তো দেখতে পাচ্ছি। ওরা কি তোমাকে গিলে ফেলবে! না, দেখতে পেলেই টোপর পরিয়ে দেবে মাথায়।

তুমি কাদের কথা বলছ?

তাদের কথা।—বলে মনোরঞ্জন আমার হাত ধরে টেনে নামাল।

আমি তাকে অনুসরণ করে খানিকটা এগিয়ে যেতেই সব দেখতে পেলুম। সেই মুখুজ্জে পরিবার—শ্রীরামপুর কিংবা চন্দননগরের। গত শীতে পুরীতে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। নিজেরাই এগিয়ে এসে পরিচয় করেছিলেন। তারপরে তাঁদের হোটেলে নিয়ে গিয়ে চা খাইয়েছিলেন। এঁরা আমার সংবাদ পেয়েছিলেন মনোরঞ্জনের কাছে। আমাকে বলেছিল এঁদের কথা। কেন বলেছিল তাও বুঝতে পেরেছিলুম। এঁদের কন্যা সাবিত্রী বড় হয়েছে, বয়স হয়েছে বিবাহের। প্রতিবেশীকে সাহায্য করাও হল, আর আমারও একটা গতি হবার আশা করেছিল।

সেদিনের কথা আমি ভুলি নি। স্বাতির সঙ্গে তো রায়ের বিবাহের সংবাদ পেয়ে আমি বিচলিত হয়েছিলুম। মনোরঞ্জন আমাকে বলেছিল, হয় তুমি পুরুষের মত তোমার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত কর, নয় তোমার নায়িকা বদল করে নিশ্চিন্ত হও।

নায়িকা বদল করেও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! আবার হয়তো নায়িকা বদলাবার প্রয়োজন হবে। এমন করে লাভ কী?

মনোরঞ্জন বলেছিল, লাভ আছে বইকি। স্রোত তোমার ঘাটকে গেল না, বইতে লাগল। সমুদ্রের সন্ধান না পাক, হারিয়ে যাবার দুঃখ তো এড়ানো গেল।

সেই দিনই বলেছিল, আমাদের পাড়ার মুখুজ্জেরা পুরী যাচ্ছে। তাদের মেয়েটি ভাল।

কিন্তু আমি এই পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাই নি। তাই পুরীতে পরিচয় হবার পরে বলেছিলুম, মনোরঞ্জনের গণনার প্রশংসা আমি আর করি না। সে বলেছিল, এই চাকরিতেই আমার উন্নতি হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতেই তো পারলুম না।

বিস্ফারিত চোখে ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি?

ওরাই ছাড়িয়ে দিচ্ছে।

ভদ্রলোক হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, বুঝতে পেরেছি, অন্যত্র কোন ভাল চাকরি পেয়েছেন।

তা নয়।

তবে নিশ্চয়ই ব্যবসায় নামবার ইচ্ছে!

মূলধন নেই।

তবে কি পুরোপুরি সাহিত্য করতে চান?

তাতে একজনের পেটই ভরে না।

চিন্তিতভাবে মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কবে?

সমুদ্রের ধারে বসে সেই কথাই তো ভাবি।

না না, আপনি বোধ হয় অকারণে এ সব কথা ভাবছেন। মনোরঞ্জনবাবু বলেছেন, আপনার উন্নতির দিন আসছে। তখন আপনি আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকবেন না।

হাসতে হাসতেই আমি বলে এসেছিলুম, মনোরঞ্জন আজকাল বাজে কথা বেশী বলে।

মুখার্জি দম্পতি সেদিন হাসতে পারেন নি। হাসি তাঁদের অন্তর্হিত হয়েছিল। আমি নিজের সাফল্যে আরও একবার হেসেছিলুম।

আজ মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। আমি কা বলব ভেবে পেলুম না। কথা কইলেন মিস্টার মুখার্জি: কেমন আছেন গোপালবাবু?

আমি সংক্ষেপে বললুম: ভাল।

পুরী থেকে কবে পালিয়ে এলেন, কিছুই আমরা জানতে পারি নি।

পালিয়েই এসেছিলুম। কিংবা, পালিয়ে থাকবার প্রয়োজন গিয়েছিল ফুরিয়ে, তাই আবার কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম। বললুম: আর দেরি করলে চাকরিটা থাকত না।

মিসেস মুখার্জি বললেন: আপনি তো আমাদের চাকরি নেই বলেই ভয় দেখিয়েছিলেন।

বললুম যে আমার চাকরি না থাকলে ভয়টা আমারই, আর কারও নয়। আমার চাকরি গেলে কোন ভাবনা হবে এমন লোক আমার সংসারে নেই। উত্তর না দিয়ে আমি মনোরঞ্জনের দিকে তাকালুম।

মনোরঞ্জন বলল: কোম্পানি ওকে অনেক বার সতর্ক করেছে। প্রতিবারেই বলে, এর পরের বারে ঠিক জবাব দেব।

মিস্টার মুখার্জি বললেন: সত্যি নাকি?

মনোরঞ্জন বলল: জবাব দিলে ওর মত আর কাউকে পাবে?

তা বটে।

আমার পেটে ওর মত বিদ্যা থাকলে—

বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

কাশী।

কাশী!—ভয়ে আমি চমকে উঠেছিলুম

মিস্টার মুখার্জি বললেন: আপনারাও তো কাশী যাচ্ছেন।

ইচ্ছে হল, না বলি। কিন্তু তার আগেই মনোরঞ্জন আমাকে টেনে নিয়ে গেল। বলল: গল্প করলেই কি পেট ভরবে? খেতে হবে না কিছু?

প্রাতরাশের প্রয়োজন হয়েছিল সকালবেলাতেই, শুধু চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ম রক্ষা করেছি। বাড়িতে আমাদের এ চিন্তা নেই। হারানিধির দোকানের দু ভাঁড় চা খেয়েই প্রয়োজন মেটে। তারপরে ভাত খেয়ে অফিস। শুধু ছুটির দিনে এই শৌখিনতার ইচ্ছে জাগে। আর জাগে ভ্রমণে বেরিয়ে। স্বাতিদের সঙ্গে বেরিয়েই এই অভ্যাসটা হয়েছে।

মোগলসরাই থেকে কাশীর দূরত্ব মাইল দশেক। গঙ্গার এপার আর ওপার। মাঝখানে সামান্য ব্রীজ। মদনমোহন মালব্যের নামে পুল। বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তিনি ভিক্ষা করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা শুনেই আমরা গাড়িতে উঠে বসেছিলুম। মনোরঞ্জন বলল: তোমার কি আজকাল ব্লাডপ্রেসার হয়েছে?

কেন বল তো?

সামান্য কথাতেই ক্ষেপে উঠছ!

সে আবার কখন?

বেশ, আমি তখন টেনে না আনলে তারাপদবাবুকে হয়তো একটা শক্ত কথা শুনিয়ে দিতে।

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মনোরঞ্জন বলল: একটা কথা তোমাকে না বলে পারি না। বামন হয়ে তুমি চাঁদে হাত দিতে চাও। কিন্তু চাঁদ যে মাটির নয়, ও আকাশের জিনিস। বামনের হাত কি ওখানে পৌঁছবে?

এ কথার কোন উত্তর নেই। গত বড়দিনের সময় যখন স্বাতির বিবাহ স্থির হল জো রায়ের সঙ্গে তখন আমারও এই কথা মনে হয়েছিল। স্বামীকে চিনতে

আমার একটুও ভুল হয় নি, ভুল হয়েছে মামাকে চিনতে। আমি তাঁকে আমার পক্ষে মনে করে মস্তবড় ভুল করেছিলুম। আর স্বাতি! সে কি আমার সঙ্গে ছলনা করে! স্বস্তা যেমন রামানন্দবাবুকে নিয়ে খেলা করেছে উৎকলে, স্বাতিও কি তেমনি আমার সঙ্গে খেলা করছে! আমার বুদ্ধি কি এতই স্থূল যে এই খেলাকে সত্য ভেবে আমি আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছি!

মনোরঞ্জন বলল: চুপ করে কেন রইলে? উত্তর দাও।

কী উত্তর দেব!

উত্তর নেই, যুক্তি নেই। তোমার আচরণ অসঙ্গত।

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারলুম না।

মনোরঞ্জন বলল: তুমি আমাকে বোঝাতে চেয়েছ যে সমাজের বর্ণবৈষম্য সকলের চোখে সমান নয়। সাধারণভাবে এই বিভেদটা বড় স্পষ্ট ও দৃষ্টিকটু হলেও এই দোষ থেকে মুক্ত মানুষও সমাজে আছে। তার উদাহরণ তুমি তোমার মামাকে দেখিয়েছ। আমি আপত্তি করি নি।

আজ করছ নাকি?

অনেকদিন আগেই করা উচিত ছিল।

কেন কর নি?

প্রয়োজন হয় নি বলে।

আজ কেন প্রয়োজন হল?

সে কথা বলবার আগে আপত্তির কারণ বলি। তোমার স্বাতির সঙ্গে জো রায়ের বিবাহ স্থির হল, কে করলেন?

জানি না।

বোধ হয় তোমার মামী। ধরে নেওয়া গেল, স্বাতি তার স্বাভাবিক লজ্জায় মুখ ফুটে আপত্তি করতে পারে নি। মামা পারতেন। নিজের আপত্তি থাকলে তো পারতেনই, মেয়ের আপত্তি জানলেও করতেন। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ যে একজন নীরব থাকলেও একজনের মত ছিল ও আর একজনের আপত্তি ছিল না।

তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে?

প্রমাণ এই হচ্ছে যে মেয়ের বিবাহ স্থির করবার সময় তোমার কথা কেউ ভাবেন না। সেটা তোমার সামাজিক বর্ণবৈষম্যের জন্যই।

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। আমাকে ব্যস্ত হতে দেখে মনোরঞ্জন বলল: এখানে নয়, এ কাশী স্টেশন। আমরা বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নামব। গঙ্গার ওপার দিয়ে ছোট লাইনের গাড়িতে এলেও বেনারস সিটি স্টেশনে না নেমে এই ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনেই নামতুম। থুড়ি, বেনারস নয়, বারাণসী। দেশ স্বাধীন হবার পর বিলিতী গন্ধওয়ালা নামটা বদলেছে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলুম?

সে কথা শেষ হয়ে গেছে।

না, শেষ হয় নি। আমি বলতে চাইছি যে আকাশের চাঁদের মায়া ভোল। মাটির দিকে তাকিয়ে দেখ, চাঁদ শুধু আকাশেই নেই, মাটির ঘরেও চাঁদ আছে। কত বয়স হল?

হিসেব রাখি নি।

হিসেব করে আপসোস করবার আগেই আমার কথাটা ভেবে দেখ।

ধন্যবাদ।

কাশী স্টেশনে গাড়ি বোধ হয় মিনিটখানেক দাঁড়ায়। এইবারে বারাণসী পৌঁছব। বিহার পেরিয়ে আমরা উত্তর-প্রদেশে প্রবেশ করেছি অনেকক্ষণ আগে। বড় সমৃদ্ধ প্রদেশ।

চোদ্দ

বারাণসীতে ট্রেন থেকে নেমে মনোরঞ্জন বলল: একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

বলে যাত্রীদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুঝতে পারলুম যে সে মুখার্জি পরিবারের সাহায্যের জন্য গেছে। তখন আমি জানতুম না যে এই সাহায্য শুধু স্টেশনে নয়, বাইরেও প্রসারিত হবে। চোখের সামনে মনোরঞ্জন ওই পরিবারের অন্তর্গত হয়ে গেল।

কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে যখন তারা আমার কাছে ফিরে এল, জিজ্ঞাসা করলুম: কোথায় উঠবে?

মনোরঞ্জন বলল : সে ভাবনা আমার ওপরেই ছেড়ে ও না।

বললুম : আমার ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি।

কী রকম?

আমি স্টেশনে থাকব।

মনোরঞ্জন আমার হাত ধরে টানল, বলল : াদিখ্যেতা রাখ।

আমি প্রতিবাদ করলুম, জোর করে দল ছাড়বারও ষ্টা করলুম। কিন্তু মনোরঞ্জনের হাত ছাড়াতে পারলুম া। সে আমায় জোর করেই রিক্‌শায় তুলল, ঙ্গাসাবাদ করে একটা ধর্মশালায় এসে উঠল। সঙ্গে ধু আমি নই, গোটা মুখার্জি পরিবার—সস্ত্রীক তারাপদ-াবু, মেয়ে সাবিত্রী ও ছেলে পঞ্চানন।

এই ব্যবস্থা যে আমার মোটেই মনঃপূত হয় নি তা কলেই বুঝেছিলেন। মিসেস মুখার্জি আমাকে বললেন : াপনার খুবই কষ্ট হবে।

মনোরঞ্জন বলল : কেন?

ওর ভাল হোটেলে থাকা অভ্যেস।

এ কথার উত্তর মনোরঞ্জন সংক্ষেপে দিল, ভেংচি কটে বলল : রাজা বাদশাহ মানুষ।

অন্য সময় হলে আমি হয়তো প্রসন্ন মনে হাসতুম, কিন্তু খন তা পারলুম না। এই পরিবারটিকে আমার একটুও াল লাগছে না। পুরীতেও লাগে নি। কেন জানি । আমার মনে হয়েছিল যে টোপ ফেলে এঁরা আমায় ড়শিতে গাঁথতে চাইছেন, আর মনোরঞ্জন এ কাজে াদের প্রাণপণ সাহায্য করছে। টোপের কোন দোষ দই না, সে জড় পদার্থের মতই কুণ্ঠায় মরে আছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে মনোরঞ্জন বলল : এবেলা ামাদের রান্নাবান্না থাক, কী বলেন বউদি?

তারাপদবাবু চিন্তিত হয়ে পড়ছেন দেখে বলল : ্নান করে বিশ্বনাথ দর্শন করি, তারপর কোন হাটেলেই খেয়ে নেওয়া যাবে।

মিসেস মুখার্জি এই প্রস্তাবে খুবই আরাম পেলেন। ললেন : আপনার দাদার কি সেসব আক্কেল আছে াকুরপো, হাঁড়িকুড়ি নিয়ে রাঁধতে বসলেই উনি বেশী ুশী হবেন।

তারাপদবাবু কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন : বটে।

মনোরঞ্জন বলল : তাহলে আসুন, সবাই বেরিয়ে পড়ি। গঙ্গা তো বেশী দূরে নয়, হেঁটেই সব কাজ সারা যাবে।

মিসেস মুখার্জি বললেন : সেই ভাল, তোমরা ঘুরে এস।

আর আপনি?

আমি কি সেই ভাগ্য করেছি! গাড়িতে উনি জোর করে গেলালেন। শিবের পুজো ক্ষি খেয়ে হয়!

সাবিত্রী মায়ের আড়াল থেকে বলল : আমিও মা তোমার সঙ্গেই বেরুব।

তারাপদবাবু ইতস্তত: করতে গিয়ে গৃহিণীর কাছে বকুনি খেলেন : তুমি আবার ভাবছ কী, পাঁচুকে নিয়ে ওদের সঙ্গে ঘুরে এস।

ঠিক বলেছ।

বলে তিনি গৃহিণীর হাত থেকেই নিজের ও ছেলের গামছা-কাপড় সংগ্রহ করে নিলেন।

আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

কাশী হিন্দুর পরম তীর্থ। কর্মণাং কর্ষণাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে। জীব এখানে কর্মক্ষয় করে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় বলেই এই স্থানের কাশী নাম। বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাজা কাশ সুহোত্রের পুত্র, কাশের পুত্র কাশ্য বা কাশীরাজ। ভাগবতে সহোত্রের পুত্রের নাম দেখি কাশ্য, কাশ্যের পুত্র কাশী। সম্ভবত এই কাশীরাজের নামেই রাজ্যের নাম হয়েছিল কাশী, বিখ্যাত বৈদ্য ধন্বন্তরি ছিলেন কাশীরাজের নাতি, ভরদ্বাজ মুনির নিকট শিক্ষা পেয়ে তিনি আয়ুর্বেদে পারদর্শী হয়েছিলেন।

রামায়ণেও কাশীরাজ্যের উল্লেখ আছে। রামচন্দ্রের সময়ে কাশীরাজ ছিলেন প্রতর্দন। তাঁর পিতার নাম দিবোদাস। ঋগ্বেদেও এক কাশীরাজ দিবোদাসের নাম পাওয়া যায়। প্রতর্দনের পুত্র ব্যাস বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর তত্ত্বজ্ঞানী পত্নী মদালসার জন্য। ব্যাসের অন্য নাম ঋতধ্বজ বা কুবলয়াশ্ব। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই মদালসা ও কুবলয়াশ্বের কথা সতেরোটি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

ভবিষ্যপুরাণে এক কাশীরাজ বরণায়ের বিবরণ আছে।

কাশীতে তিনি বারাণসী নামে এক দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন যে এই বরণার থেকেই বারাণসী নাম হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কাশীখণ্ডের একটি শ্লোক তুলনীয়:

অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষা কৃতৌ কৃতে।
বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা॥

সত্যযুগে কাশীক্ষেত্র রক্ষার জন্য অসি ও বরণা নদীর জন্ম। হে মুনি, সেইদিন থেকে এই কাশী অসি ও বরণার সঙ্গম লাভ করে বারাণসী নামে বিখ্যাত হয়েছে।

সহসা আমার মনে পড়ল যে দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব এই বারাণসীর নাম বদলে মুহম্মদাবাদ রেখেছিলেন। তারপর আর একজন বাদশাহ মুহম্মদ শাহ এই মুহম্মদাবাদ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বলে হিন্দুরাজাকে দান করেন। কাশীতে তখন রাজা কেউ ছিলেন না, তাই গঙ্গাপুরের জমিদার মনসারামকে রাজা উপাধি দিয়ে তাঁকে এই তীর্থস্থানটি দান করেন। এঁরাই বাদশাহ।

দশাশ্বমেধ ঘাটে আমরা স্নান করলুম। কাশীর এইটিই সবচেয়ে বড় ঘাট, সবচেয়ে জনপ্রিয়। স্টেশন থেকে সোজা রাস্তা এখানে এসেছে, বিশ্বনাথের মন্দির কাছে, প্রশস্ত ঘাট, ছোট বড় অনেক মন্দির, যাত্রীদের আনাগোনায় সারাক্ষণ মুখর হয়ে থাকে। পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল রুদ্রসরোবর। ব্রহ্মা কাশীরাজ দিবোদাসকে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে বলেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হলে রুদ্রসরোবরের নাম হয় দশাশ্বমেধ। ব্রহ্মা এখানে দুটি শিব স্থাপন করেন—ব্রহ্মেশ্বর ও দশাশ্বমেধেশ্বর। গঙ্গার এই ঘাটে স্নান করলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

আমরা কোন আধ্যাত্মিক ফল পেলুম কিনা জানি না, শরীর আমাদের শীতল ও সুস্থ হল। পথশ্রমের গ্লানি আমরা ভুলে গেলুম।

রাজা দিবোদাসের একটি কাহিনী আমার মনে পড়ল। কাশীখণ্ডে পড়েছিলুম। ব্রহ্মার কথায় কাশী পরিত্যাগ করে মহাদেব গিয়েছিলেন মন্দর পর্বতে। সমস্ত দেবতাও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কাশীতে তখন রাজা দিবোদাসের শাসন। ধার্মিক রাজা, তপস্যার প্রভাবে মহাবলী। মন্দর পর্বতে মহাদেবের ভাল লাগছে না, অথচ দিবোদাসকে না তাড়ালে কাশীতে ফেরার উপায় নেই। কে তাড়াবে দিবোদাসকে?

মহাদেব প্রথমে চৌষট্টি যোগিনীকে পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়ে মণিকর্ণিকার সামনে রয়ে গেলেন। তারপর এলেন সূর্য। কাশীর মায়ায় সূর্যও বন্দী হলেন। এর পরে মহাদেব গণধরদের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরাও কিছু করতে না পেরে কাশীতেই বসবাস করতে লাগলেন। তারপরে গণেশ এলেন বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের বেশে। প্রথমে পুরবাসীদের বিশ্বাসভাজন হয়ে রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশের সুযোগ পেলেন। সকলের শেষে এলেন রাজার কাছে। গণনায় সন্তুষ্ট করে রাজাকে বললেন যে উত্তর দেশ থেকে যে ব্রাহ্মণ আসছেন, তিনি আপনার সিদ্ধির উপায় বলবেন।

এদিকে গণেশের দেরি দেখে মহাদেব বিষ্ণুকে পাঠালেন। রাজা দিবোদাসের তখন বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুকে দেখে তিনি তাঁর পরামর্শ চাইলেন, বিষ্ণু বললেন বিশ্বনাথকে নির্বাসিত করা তোমার দোষ হয়েছে। যদি পাপমুক্ত হতে চাও তো একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর।

দিবোদাস শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পুত্র সমঞ্জয়ের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করলেন। তারপরে শিবদূতের আনা রথে আরোহণ করে স্বর্গে গমন করলেন।

এই কাহিনীটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাঁরা বলেন যে কাশীতে চিরকাল ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু বুদ্ধদেবের সময়ে বা তার পরে এখান থেকে হিন্দুধর্ম নির্বাসিত হয়। সারনাথ তার প্রমাণ। তারপরে দিবোদাস নামে কোন রাজার রাজত্বকালে হিন্দু আধিপত্য ক্রমে ক্রমে ফিরে আসে। এই দিবোদাস যে রামচন্দ্রের সমসাময়িক প্রতর্দনের পিতা নন, তাতে সন্দেহ নেই। কাহিনীটি একটি সুন্দর রূপক। বৌদ্ধ অধিকৃত বারাণসীতে যে একে একে শাক্ত সৌর গাণপত্য বৈষ্ণব ও শৈবরা এসে প্রাধান্য পেল, তারই বর্ণনা করা হয়েছে।

স্নান করে ফেরার পথে মনোরঞ্জন বলল: বিশ্বনাথ দর্শন করে যাবেন কি?

তারাপদবাবু বললেন : তাইতো, আমিও তো সকালে হয়েছি।

ছেলেটি বলে উঠল : খেলে কি দেখা যায় না?

তা বটে। দর্শনে আর দোষ কী, পুজো না করলেই হল।

বিশ্বনাথ গলির মধ্যে আমরা ঢুকে পড়েছিলুম। দুপাশে নানা জিনিসের দোকানপাট ছাড়িয়ে মন্দিরের দরজায় পৌছলুম। পাশের একটা দোকান থেকে কয়েক পয়সার ফুল বেলপাতা আমি কিনে নিয়েছিলুম। মনে মনে শিবের ধ্যানই আবৃত্তি করে সেই ফুল বেলপাতা আমি শিবের মাথায় চড়ালুম।

পাণ্ডারা তারাপদবাবুকে ছেঁকে ধরেছিল। মনোরঞ্জন তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল।

আসুন আসুন, এইদিকে আসুন, ভাল করে সব দেখিয়ে দিচ্ছি। একটু ফুল বেলপাতা, একটু নৈবেদ্য ভোগ—এইখানে, হাতজোড় করুন, এইখানে প্রণাম, এইখানে দক্ষিণা, যা আপনার ইচ্ছে। রাস্তা ছাড়, রাস্তা ছাড়—

পাথরের মেঝের উপর জল ছপছপ করছে। পাণ্ডারা একজনকে রেখে অন্য সবাই সরে গেছে। বিশ্বনাথের মন্দিরের পিছনে এসে আমরা উপস্থিত হলুম।

এইদিকে আসুন, এইখানে জ্ঞান-বাপী, জ্ঞানের কূপ, ইচ্ছে এখানে ধরে দিন।

অন্নপূর্ণার মন্দির এইদিকে। ধুন্ডিরাজ গণেশ আর সাক্ষী বিনায়কও দর্শন করিয়ে দেব।

যন্ত্রচালিতের মত আমরা সেই ব্রাহ্মণের পিছনে চললুম। ব্রাহ্মণেরা এখানে-সেখানে পয়সা আদায় করলেন। পাণ্ডাও তার প্রণামী বাড়াবার জন্যে আধখানা গলি এগিয়ে এল। তারপর একটা কটূক্তি করে পিছন ফিরল।

ধর্মশালায় ফিরে এসে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। স্নান সেরে সাবিত্রী ঘরে বসে আছে। তার সামনে ইকমিক কুকার, অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে, আর একটা স্টোভ। তারাপদবাবু কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মিসেস মুখার্জি ঘরে এলেন। তিনিও স্নান সেরে এলেন। মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল : এ কি করছেন বউদি?

এ আমার কপাল ঠাকুরপো। তা না হলে তীর্থ করতে এসেও এই হাঁড়ি ঠেলা!

আমরা যে হোটেলেই ব্যবস্থা করে এলুম!

আর হোটেল! একদিন ওই ঝাল মসলা খেয়ে তিনদিন উনি আমাকে ভোগাবেন। মাছ মাংস নেই, আপনাদের একটু কষ্ট হবে।

বলে চিরুনি আর সিঁদুরের কৌটো বার করলেন।

পনেরো

আহারের পর বিশ্রামের জন্য আমরা পাশের ঘরে এলুম। খুবই সাদাসিধে খাদ্য, কিন্তু প্রচুর পরিতৃপ্তিতে খাওয়া গেল। ইকমিক কুকারের দুটো বাটিতে ভাত, একটায় নানান সবজি মেশানো ডাল, আর একটায় আলু-কপির তরকারি। তার সঙ্গে গাওয়া ঘি ও আমের মিষ্টি আচার। মিসেস মুখার্জি প্লাস্টিকের প্লেটে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। স্টোভে কিছু ভেজে দিতে চেয়েছিলেন, আমরা রাজী হই নি। বললেন : একটু মাছ আর দই হলে আপনাদের পেট ভরত।

আমি বললুম : যথেষ্ট ভরেছে।

এ আপনার ভদ্রতার কথা। কর্তা কাজের হলে সবই করা যায়। মাছ আর দই তো আমি গুছিয়ে আনতে পারি নি।

মনোরঞ্জন বলল : আমরা থাকতে উনি আবার কেন কষ্ট করবেন!

তারাপদবাবু আমতা আমতা করে বললেন : কষ্ট আবার কী!

পাশের ঘরে এসে মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল : কেমন দেখছ?

আমার আর যাই ভাল লাগুক, এই মাখামাখিটা ভাল লাগছিল না। বললুম : আমরা কি ওঁদের কাঁধে চেপেই থাকব?

না। প্রয়োজন হলে আমরা ওঁদের কাঁধে তুলব।

মানে?

মানে সহজ। তোমার ভার বইবার ভার তুমি আমাকে দিয়েছ, দরকার হলে আমি ওঁদেরও ভার বইব। এ জন্যে তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই।

তুমি অমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে জানলে আমি তোমাকে কোন ভারই দিতুম না।

কাশীর পান ভাল, খাবে একটা?

না।

কোন মসলা?

তারও দরকার নেই। তুমি আমাকে কখন মুক্তি দেবে বল?

ঠিক এই সময়ে তারাপদবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন: এদেশের পাণ্ডা দেখেছেন মশাই, কেমন গালে চড় মেরে পয়সা বার করে নিলে! না পুজো করলুম, না অন্য কিছু—শুধু শুধুই গচ্চা গেল!

এই না হলে কাশীর পাণ্ডা!

তারাপদবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন: আমি কি ভাবছি জানেন? আপনার বৌদি তো দুবেলা যাবেন মন্দির দর্শনে, এইখানেই না কতুর হয়ে যাই।

মনোরঞ্জন বলল: আমরা আর কদিন এখানে থাকব। দু-তিনদিনেই সব দেখা হয়ে যাবে।

তা হলেই বাঁচি।

বলে তিনি মনোরঞ্জনের শতরঞ্চির এক কোণে বসলেন।

পঞ্চানন ওরফে পাঁচু এসে চেঁচিয়ে উঠল: বাবা, মা বলছেন বিশ্বনাথের মন্দির আমরা দেখি নি।

কেন?

বিশ্বনাথের মন্দিরে নাকি সোনার চুড়ো, সোনার চুড়োওলা কোন মন্দির তো আমরা দেখি নি।

তারাপদবাবু করুণভাবে তাকালেন মনোরঞ্জনের দিকে। বিশ্বনাথের গলি থেকে মন্দিরের চুড়ো দেখা যায় না, দেখা যায় না মন্দিরের ভিতর ও বাইরে থেকে। পরে এই সোনার চুড়ো দেখবার জন্য আমরা পাণ্ডার শরণ নিয়েছিলুম। গলির একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে আমরা সেই বিচিত্র কারুকার্যময় স্বর্ণশিখর দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। দক্ষিণ-ভারতের গোপুরের মত তা বিশাল নয়, পুরী ভুবনেশ্বরের দেউলের মতও বিরাট নয়, এ একেবারে অন্য ধরনের। অনেকগুলি ছোট ছোট সূক্ষ্মাগ্র শিখরমূল শিখরটিকে বেষ্টন করে আছে, পাশে আর একটি গম্বুজের মত শিখর। সবই সুবর্ণমণ্ডিত। পাণ্ডা বললেন, মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ, আর পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চুড়ো তামার পাতের উপর সোনায় মুড়ে দিয়েছেন। এই সোনার ওজন হবে বাইশ মণ। ভিতরে যে বিরাট ঘণ্টা আছে, তা নেপালের মহারাজার দান।

বিশ্বনাথের মন্দিরের উপর দিয়ে অনেক অত্যাচার গেছে। হিউএন চাঙ এখানে এসে বিশ্বেশ্বরের যে লিঙ্গ দেখেছিলেন, তা একশো হাত উঁচু তাম্রময় লিঙ্গ। শাহাবুদ্দিন ঘোরি যখন কাশী লুণ্ঠন করেন, তখন তা বিধ্বস্ত হয়েছিল কি না জানা যায় না। বিশ্বেশ্বরের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছিলেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। মন্দির ধ্বংস করে তার উপর মসজিদ গড়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান মন্দিরের পাশে আজও সে মসজিদ আছে। অদূরে আর একটি মন্দির আছে তার নাম আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

সকালবেলায় আমরা যে জ্ঞান-বাপী দেখেছিলুম, কাশীখণ্ডে তারও একটি কাহিনী আছে। রুদ্ররূপী ঈশান তাঁর ত্রিশূল দিয়ে এই কুণ্ড খনন করেছিলেন। কুণ্ডের জলে পৃথিবী আবৃত হলে ঈশান সহস্র কলস জলে বিশ্বেশ্বরের স্নান করালেন। প্রসন্ন হয়ে বিশ্বেশ্বর বর দিলেন যে শিব অর্থাৎ জ্ঞান এই বাপীতে জলরূপে বিদ্যমান থাকবে। শোনা যায় কালাপাহাড় যখন কাশীতে এসেছিলেন মন্দির ধ্বংসের অভিযানে, বিশ্বেশ্বর এই জ্ঞান-বাপীর মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন।

মিসেস মুখার্জি অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রবেশের সময় পথের ভিখারীদের দু হাতে পয়সা বিলিয়েছেন। অজস্র খুচরো পয়সা এনেছিলেন দেশ থেকে সংগ্রহ করে। কাশীতে কেউ নাকি অনাহারে থাকে না, সে মা অন্নপূর্ণার আশীর্বাদে। দরিদ্রকে দান করেই অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ পাওয়া যায়। অন্নপূর্ণার এই মন্দিরটি প্রায় আড়াইশো বৎসর পূর্বে পুণার রাজা নির্মাণ করে দেন। মন্দিরের ভিতর অন্নপূর্ণার মূর্তি দেখে মন ভরে যায়। চারদিকে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে, লিখে না রাখলে

...র মনে রাখা যায় না। কাশী মন্দিরময় শহর। এত সংখ্য দেবদেবী বোধ হয় ভারতের আর কোন শহরে ...ই। সব মন্দির দেখে ওঠা যায় না, যা দেখা যায় ...রও সবকিছু মনে থাকে না।

বিকেলের চা খেয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে বেরলুম।

মনোরঞ্জন বলল: মন্দিরের মত কাশীতে ঘাটও সংখ্য। বারে বারে দেখেও সমস্ত ঘাটের নাম মনে ...খা যায় না।

বললুম: ঘাট দেখতে হলে নৌকোয় উঠতে হয়। ...মস্ত কাশী শহরটা এক নজরে দেখা যাবে।

পাঁচু লাফিয়ে উঠল, বলল: নৌকোয় আমি ...কানদিন চড়ি নি।

তারাপদবাবু বোধ হয় ভয় পেয়েছিলেন, বললেন: ...নৌকোয় উঠবেন!

উত্তর দিলেন মিসেস মুখার্জি, বললেন: কেন, কাশীতে ...সেও মরবার ভয় নাকি! এ তো ব্যাসকাশী নয় যে ...রে গাধা হবে!

পাঁচু বলল: ব্যাসকাশী কোথায় মা?

মিসেস মুখার্জী মনোরঞ্জনের দিকে তাকালেন। ...মনোরঞ্জন তাকাল আমার মুখের দিকে। বললুম: ...গঙ্গার ওপারে রামনগরে।

মনোরঞ্জন বলল: গল্পটাও শুনিয়ে দাও না।

এই রকমের গল্প শুনিয়ে অতীতে প্রশংসার বদলে ...কৌতুকের পাত্র হয়েছি। অভ্যাসের দোষে তবু আবার ...র শোনালুম। কাশীখণ্ডেরই গল্প। বেদব্যাস তখন ...কাশীবাস করছিলেন, আর প্রতিদিন তাঁর শিষ্যদের কাশীর ...হিমা শোনাতেন। একদিন মহাদেবের ইচ্ছা হল ...বেদব্যাসকে পরীক্ষা করার। অমনি অন্নপূর্ণাকে বললেন, ...আজ যেন বেদব্যাসকে কেউ ভিক্ষা না দেয়। সেদিন ...সারাদিন ঘুরে বেদব্যাস একমুঠো ভিক্ষা পেলেন না। ...ক্ষুতৃষ্ণায় কাতর হয়ে তিনি শাপ দিলেন, মুক্তির গর্বেই ...তা কাশীবাসীরা ভিক্ষা দেয় না, ত্রৈপুরুষী মুক্তি তাদের ...হবে না। রাগে দুঃখে তিনি ভিক্ষার পাত্র ছুঁড়ে ফেলে ...আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন। এমন সময় ছদ্মবেশে ...অন্নপূর্ণা এসে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, বললেন, অতিথি ...সৎকার না করে আমার স্বামী খান না, আজ আপনি আমার অতিথি হন। বেদব্যাস একা নন, সশিষ্যে তাঁর অতিথি হলেন। সৎকারের পর অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করলেন, স্বার্থসিদ্ধি না হবার জন্যে যে শাপ দেয়, সে শাপ কাকে লাগে? বেদব্যাস বললেন, তা শাপদাতারই প্রাপ্য। তখন বিশ্বেশ্বর বললেন, অকারণে তুমি কাশীবাসীকে শাপ দিয়েছ, তুমি এখানে থাকবার যোগ্য নও, কাশী তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। অন্নপূর্ণার মধ্যস্থতায় ব্যাসদেব রক্ষা পেলেন, অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে তিনি কাশীপ্রবেশের অনুমতি পেলেন।

পাঁচু বলল: তারপর?

তারপর ব্যাসদেব গঙ্গার ওপারে রামনগরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। লোকে সেই জায়গার নাম দিয়েছে ব্যাসকাশী। সেখানেও কয়েকটি মন্দির আছে। যারা কাশীতে আসে, তারা ব্যাসকাশীও দেখে। কাশীতে মরলে যেমন মুক্তি হয়, তেমনি ব্যাসকাশীতে মরলে গাধা হয়ে জন্মায় বলে লোকের বিশ্বাস।

পাঁচু হেসে উঠল আমি দেখলুম, সাবিত্রীও হাসছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। সিঁড়ি দিয়ে মনোরঞ্জনকে নামতে দেখে এক পাল নৌকোওয়ালা তাকে আক্রমণ করল।

একখানা খোলা নৌকো ঠিক করে মনোরঞ্জন আমাদের ডাকল: চলে আসুন।

আমরা সবাই গিয়ে সেই নৌকোয় উঠলুম।

মনোরঞ্জন বলল: একেবারে ডাকাত। পাঁচ টাকা থেকে পাঁচসিকেয় নামিয়েছি, আর একটু কড়া হতে পারলে হয়তো পাঁচ আনায় নামত।

নৌকোওয়ালা বাংলা বোঝে, বলল: না বাবু, পাঁচ আনায় হয় না।

তা হলে দশ আনা।

এ কথার উত্তর নৌকোওয়ালা দিল না। নৌকোর মুখ বাঁয়ে ঘুরিয়ে বলল: এইটে মানমন্দির ঘাট।

মনোরঞ্জন বলল: ঠেলে একটু নদীর মাঝখানে চল, কাশীর রূপটা একবার দেখি। অর্ধচন্দ্রাকার শহর বলে কত নাম এর।

মানমন্দির ঘাট নাম মানসিংহ থেকে বোধ হয় হয় নি, হয়েছে মানমন্দির থেকে। এই মানমন্দির মানসিংহের

প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু সোয়াই রাজা জয়সিংহ যে এর উৎকর্ষসাধন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের ইতিহাসে জয়সিংহের জ্যোতির্বিদ্যার খ্যাতি অক্ষয় হয়ে আছে। বিদেশ থেকে তিনি জ্যোতির্বিদ এনেছিলেন। মেনুয়েল নামে এক পর্তুগীজ পাদরী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। জয়সিংহ তাঁর মুখে পর্তুগালের গল্প শুনলেন, শুনলেন সে দেশের জ্যোতিষশাস্ত্রে উন্নতির গল্প। রাজা আর দেরি করলেন না, নিজের কয়েকজন পণ্ডিতকে পাঠালেন পর্তুগালের রাজা ইমানুয়েলের কাছে। এঁদের সঙ্গে ভারতে এলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ জেভিয়ার ডি সিলভা। সঙ্গে আনলেন ডি-লা-হায়ারের জ্যোতিরঙ্ক। সেই সমস্ত ফরমুলা আর টেবল নিয়ে জয়সিংহ নিজে গণনা করলেন দিনের পর দিন। তারপর হতাশ হয়ে সবই ফিরিয়ে দিলেন। পাদরী সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ আপনার কাজে লাগল না? একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা বললেন, না। তারপর বুঝিয়ে দিলেন সেগুলির দুর্বলতার কথা। কাগজ-কলমে খুবই ভাল সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিদর্শনের সঙ্গে অনেক প্রভেদ দেখা যাচ্ছে। চন্দ্রের স্থিতি নির্দেশে অর্ধ অক্ষাংশ ও চন্দ্র সূর্যের গ্রহণে প্রায় পনের পলের এই প্রভেদ। এই প্রভেদ যে যন্ত্রের নিকৃষ্ট ব্যাসের জন্য হচ্ছে, তাও বলে দিয়েছিলেন। জ্যোতির্বিদ উলুক বেগের খ্যাতি ছিল তুর্কিস্থানে, তাঁরও অনেক যন্ত্রপাতি ছিল। জয়সিংহ সে সবেরও ভুল বার করে সবাইকে বিস্মিত করেছিলেন।

অনেকে বিশ্বাস করেন না যে জয়সিংহ এই জ্যোতির্বিদ্যা বিদ্যাধর নামে এক বাঙালীর কাছে শিখেছিলেন। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র অনুসারে বিদ্যাধর জয়পুর শহরের প্ল্যান তৈরি করেছিলেন, আর দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহের অনুরোধে পঞ্জিকা সংস্কারও করেছিলেন।

এখানকার মানমন্দির সম্বন্ধে কারও কোন কৌতূহল দেখলুম না। আমি একসময় এটি দেখে নিয়েছিলুম। নক্ষত্রের গতি নির্ণয়ের জন্য জয়সিংহ যে সব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে জয়প্রকাশ রাম যন্ত্র ও সম্রাট যন্ত্র প্রধান। সম্রাট যন্ত্রের ব্যাসার্ধ প্রায় বারো হাত। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি হিপার্কাস টলেমি প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদের গণনায় ভুল ধরেছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত আরও অনেক যন্ত্র দেখলুম—ভিত্তি যন্ত্র, চক্র যন্ত্র। কিন্তু কোন্ যন্ত্রের কী ব্যবহার তা জানবার সুযোগ পেলুম না।

ইতিমধ্যে আমরা গঙ্গার বুকে এমন জায়গায় পৌঁছেছি, যেখান থেকে কাশী শহরটি দেখতে পাচ্ছি অর্ধচন্দ্রের মত। ঘাটের পরে ঘাট, তার পরেও ঘাট, কোনখানে এতটুকু ফাঁক নেই। ঘাটের উপর ছোট বড় মন্দির, অট্টালিকা, কোনটি বা দুর্গের মত। ডান হাতে রেলওয়ের পুল দেখতে পাচ্ছি অনেক দূরে, ওই পুল পার হয়ে আমরা কাশীতে প্রবেশ করেছি। নৌকো স্থির করে নৌকোওয়ালা আমাদের সব চিনিয়ে দিল।

ওই পুলের নীচেই রাজঘাট, কাঁচা মাটির ঘাট। যে যাত্রীরা কাশী স্টেশনে নামে, তারা এই ঘাটে এসে স্নান করে। স্টেশনের পাশেই ঘাট। পাড়ের উপর প্রাচীন কাশীর অনেক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু কাশী শহরের শেষ ওইখানে নয়। আরও দূরে বরুণা সঙ্গম ঘাট। বরুণা নদী যেখানে এঁকেবেঁকে গঙ্গায় এসে মিলেছে, সেইখানেই পঞ্চতীর্থের শেষ। কাশীর পূর্ব সীমান্ত। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে অগণিত যাত্রী সেখানে স্নান করতে যায়।

এধারে যে মসজিদটা দেখা যাচ্ছে, তা ঔরঙ্গজেবের তৈরি। তারই নীচে পঞ্চগঙ্গার ঘাট। আর বেণীমাধব ও দ্বারকাধীশের মন্দির। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কিরণা ও ধূতপাপা নদীর সঙ্গম।

সত্যিই কি এতগুলো নদী এখানে আছে?

না, গঙ্গা ছাড়া আর সব নদী বইছে মাটির নীচে দিয়ে। এই ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন জয়পুরের রাজা মানসিংহ।

পাঁচু জানতে চাইল: সামনের এই ঘাটে কেন আগুন জ্বলছে?

এটিই মণিকর্ণিকার ঘাট, কাশীর শ্মশান। দূর দূর গ্রাম থেকে এই ঘাটে লোকে শব দাহ করতে আসে।

মণিকর্ণিকার নাম কেন হল, তা নিয়ে অনেক গল্প আছে। কেউ বলে পার্বতীর কর্ণভূষণ এখানে পড়েছিল, কেউ বলে বিষ্ণুর, আবার কেউ শিবের কর্ণভূষণ বলে।

মাদের শাস্ত্রেই দু রকমের গল্প আছে। জ্ঞানসংহিতায় ছে যে বিষ্ণুর কান থেকে কর্ণভূষণ পড়েছিল। আর শীখণ্ডের মতে তা শিবের কান থেকে পড়েছিল। চক্র য় বিষ্ণু এখানে চক্র পুষ্করিণী খনন করেছিলেন, ইখানে তাঁর তপস্যা দেখে বিস্ময়ে শিব মাথা নয়েছিলেন। তাতেই তাঁর কর্ণভূষণ পড়ে এই তীর্থের র মণিকর্ণিকা হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে যে মানুষের ত্যুম সময়ে বিশ্বনাথ তার কানে তারকব্রহ্ম উপদেশ ।, সেইজন্য এই স্থানের নাম মণিকর্ণিকা। মতান্তরে স্থান মুক্তিলক্ষ্মীর মহাপীঠের মণি ও তাঁর চরণের কা, সেইজন্যই নাম মণিকর্ণিকা। নাম যে কারণেই ক মণিকর্ণিকার মত মহাতীর্থ কাশীতে আর নেই। রপুরাণ ঠিকই বলেছেন—

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ।
তত্রাপি মণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বর প্রিয়ম্॥

ার মত তীর্থ নেই, আর বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের প্রিয় কর্ণিকার মত তীর্থও দুর্লভ।

ধীরে ধীরে নৌকোওয়ালা পাড়ের কাছে ফিরে এল, শ্বমেধ ঘাট পেরিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল। াস্ত হয় নি, কিন্তু রৌদ্র আর তীব্র নয়। একটার পর টা ঘাট আমরা পেরিয়ে চললুম। নৌকোওয়ালা া বলে যাচ্ছে, আর আমরা তা ভুলে যাচ্ছি।

দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশেই অহল্যাবাঈ ঘাট, পিছনে ভাঙ্গার রাজবাড়ি। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ ণি করেছিলেন বলে নাম অহল্যাবাঈ ঘাট। এত ঘাট কাশীতে আর নেই। সেইজন্যে অনেক জনসভা এই ঘাটে, কথাকীর্তন হয়, সন্ধ্যাবেলায় সন্ন্যাসীরা লায় উপদেশ দেন যাত্রীদের। দশাশ্বমেধ ঘাটের এই ঘাটও জমজমাট হয়ে ওঠে।

হনুমান ঘাটে বল্লভাচার্য সজ্ঞানে দেহরক্ষা করে- লেন। এই বিজ্ঞ আচার্য ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন লঙ্গ দেশে। বাস করতেন মথুরার কাছে গোকুলে, ঠক বা মঠ স্থাপন করেন মথুরা আর উজ্জয়িনীতে। াকে বলে, ইনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পান। তাঁর াসনার প্রণালীর নাম পুষ্টিমার্গ। এর নূতনত্ব এই যে াবানের উপাসনার জন্য উপবাস বা কোন শারীরিক ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। ভোগবিলাস ও ভগবানের সেবা একই সঙ্গে চলতে পারে।

চৌষট্টি ঘাট বাংলার রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠা। আনন্দময়ী মায়ের নামে আনন্দময়ী ঘাট। নিকটেই তাঁর আশ্রম। শিবালাঘাটের উপরেই বারানসীর রাজা চেতসিংহের প্রাসাদ। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছেন। গঙ্গার ধারে যে জানলা দিয়ে পালিয়েছিলেন, নৌকোওয়ালা আমাদের সেই জানলাটি দেখিয়ে দিল।

হরিশ্চন্দ্র ঘাটেও শব দাহ হচ্ছিল। এটিই কাশীর প্রাচীনতম শ্মশানঘাট। এই ঘাটেই সূর্য বংশের রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাসরূপে দীর্ঘ এক বৎসর শ্মশানের কাজ করেন। এক নারীকে রক্ষা করতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তারপর নিজের যথাসর্বস্ব ঋষিকে দান করে নিরাশ্রয় রাজা স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে কাশীতে এসে উপস্থিত হন। এখানে এসে বিশ্বামিত্র দক্ষিণা চাইলেন। বাধ্য হয়ে রাজা স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করলেন। নিজে দাস হলেন এক চণ্ডালের। তারপরে সেই পরম পরীক্ষার দিন এল। সর্পাঘাতে মৃত রোহিতকে কোলে করে শৈব্যা এলেন শ্মশানঘাটে, স্বামীকে চিনলেন, হরিশ্চন্দ্র চিনলেন শৈব্যাকে। রাজপুত্রকে বুকে জড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদলেন রাজ্যহীন রাজা রাণী। স্থির করলেন, পুত্রের চিতায় তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দেবেন। কিন্তু প্রাণ তাঁদের বিসর্জন দিতে হল না, পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। চণ্ডালরূপী ধর্ম এলেন, দেবতারা এলেন। রোহিতকে রাজ্যভার দিয়ে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যাকে তাঁরা স্বর্গে নিয়ে গেলেন।

লালঘাট গোঘাট সঙ্কটঘাট দেখলুম, দেখলুম ভোঁসলা ও সিন্ধিয়াঘাট। সিন্ধিয়াঘাট আর মণিকর্ণিকাঘাট একেবারে পাশাপাশি।

কেদারঘাট অন্যদিকে। পঞ্চতীর্থের দ্বিতীয় তীর্থ এটি। নিকটেই হরপাপ হ্রদ। জনসমাগম এখানে খুব বেশী দেখলুম। বাঙালীটোলার কেদারেশ্বরের মন্দির বিশ্বনাথের পরেই। এই মন্দির দর্শনে হিমালয়ের কেদারনাথ দর্শনের পুণ্য কেন হয়, তার সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে।

বশিষ্ঠ নামে উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ কেদারনাথ দর্শনে যাবার পথে কাশীতে আসেন। তিনি এখানে পৌঁছে প্রতিজ্ঞা করেন যে প্রতি বৎসর তিনি কেদারনাথ দর্শনে যাবেন। তিনি কাশীবাসী হয়ে একষট্টিবার হিমালয়ে গিয়ে কেদারনাথ দর্শন করেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে এই অসাধ্য সাধনে বাধা দেন। কিন্তু বশিষ্ঠ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি যাবেনই, পথে মৃত্যু হলেও যাবেন। রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, হিমালয়ের কেদারনাথ তাঁকে বর দিতে এসেছেন। বশিষ্ঠ বললেন, প্রভু, তুমি যখন সদয় হয়েছ, তখন এইখানেই অবস্থান কর। সেই থেকে কেদারনাথ হিমালয়ে তাঁর অংশ রেখে এইখানে অবস্থান করছেন।

গঙ্গার ঘাটগুলি শেষ হয়ে আসছে। নৌকোওয়ালা বলল: এটি তুলসীঘাট, এর পরে অসি সঙ্গমঘাটেই কাশীর ঘাট শেষ।

রামচরিতমানসের অমর কবি তুলসীদাসের নামে এই ঘাট। তিনি তাঁর শেষ জীবন এই কাশীতে অতিবাহিত করেছিলেন। তুলসীদাসের জীবনের সঙ্গে কালিদাসের একটা মিল আছে। জনশ্রুতি যদি সত্য হয় তো দুজনেই কবি হয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে ধাক্কা খেয়ে। তুলসীদাস জন্মেছিলেন ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বাবার নাম ছিল আত্মারাম দুবে, আর মায়ের নাম হুলসি। নিজের নাম ছিল রামবোলা। অভুক্ত মূলা নক্ষত্রে সন্তানের জন্ম হলে পিতামাতার মৃত্যু হয়। এই অপরাধে রামবোলাকে তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন। এক সাধু তাঁকে কুড়িয়ে মানুষ করেন। তাঁর তুলসীদাস নাম দেন গুরু নরহরিদাসজী। তিনি তাঁকে বারাণসীর পঞ্চগঙ্গাঘাটে রামানন্দী মঠে নিয়ে যান।

তুলসীদাস দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করে তাঁরই মোহে মত্ত হয়েছিলেন। তারক নামে এক পুত্রের জন্ম হবার পর সেই মহিলা একদিন তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন:

অস্থিচর্মময় দেহ মম তামেঁ জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরাম মেঁ হোতি ন তো ভবভীতি॥

আমার অস্থিচর্মে তোমার প্রীতিক্ষয় না করে শ্রীরামচন্দ্রে মনোনিবেশ করলে তোমার পুনর্জন্মের ভয় দূর হত।

এই বিদ্রূপ তুলসীদাসের জীবনে পরিবর্তন আনল। গৃহত্যাগ করে তিনি বিশ বৎসর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন। শেষজীবন কাটালেন কাশীতে, সঙ্কটমোচনে আর এই তুলসীঘাটে।

তারপর অসি সঙ্গমঘাট কাশীর শেষ ঘাট। অন্য সব ঘাটের মত এই ঘাটটি বাঁধানো নয়, অসি নদীর সঙ্গমে একটি কর্দমাক্ত ঘাট। পঞ্চতীর্থের প্রথম তীর্থ এটি। বাকি চারটি তীর্থ হল কেদার ঘাট দশাশ্বমেধ ঘাট মণিকর্ণিকা ঘাট, পঞ্চগঙ্গা ঘাট ও বরুণা সঙ্গম ঘাট। পারের উপরে একটি জগন্নাথের মন্দির আছে।

পশ্চিমের আকাশে তখন সূর্যাস্তের শোভা দেখা যাচ্ছে। গঙ্গার ওপারে দেখলুম রামনগরের রাজপ্রাসাদ। এপারে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। কেউ নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে রামনগরে যায়, কেউ যায় মালবা ব্রিজের উপর দিয়ে আট মাইলের ঘোরা পথে। কিন্তু যায় অনেকেই। তারা রামনগরের রাজপ্রাসাদে তুলসীদাসের সচিত্র রামায়ণ আর দুর্গাপূজোর সময় বিচিত্র রামলীলা দেখতে নয় তারা ব্যাসকাশীও দেখে ভক্তিভরে।

আমরা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখব বলে ঘাটে নামলুম নৌকো থেকে।

[ক্রমশঃ]

কালো মানুষ

অতনু চট্টোপাধ্যায়

শহর থেকে পিচঢালা রাস্তাটা এসে দ্বিধা হয়ে গেছে এখানে। একটা, পাওয়ার হাউসের বিরাট চুরটার পাশ দিয়ে চলে গেছে হরিলাটি, অন্যটা ওরা। তার ওপাশে কোথায় গেছে, তা জানে না বন। জানার তার প্রয়োজন নেই।

এই ত্রিমোহনার ছোট্ট একটা ঘরে বসে এই ছোট্ট শটাকে সে অবাক হয়ে দেখে। এ দেশটা সত্যিই ট্ট। ওপাশে কতকগুলো ধাওড়া, গায়ে গা লাগানো। ানে থাকে মালকাটা, লোডার, কুলি-খালাসীর দল। পাশে লম্বা লম্বা কোয়ার্টার—সর্দার, মুনশী, হাজ্‌রেবাবু, রানীদের জন্য। ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ্রন্ট, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ওভারম্যানদের বাংলো ারে।

ত্রিমোহনার এই ছোট্ট ঘরটা জীবনের দোকান। নিসপত্র সামান্যই। বেশী জিনিস মজুত করবার মত মর্থ্যও তার নেই। এমন কি একটা সাইনবোর্ডও টাঙাতে পারে নি। না পারলেও এখানে পরিচিতি ছে তার। অনেকদিনের পুরনো লোক বলে সম্মানও ছে কিছুটা।

অনেকদিন? কতদিন? জীবনের আজ আর মনে ই সে কথা। মনে করতেও পারে না। তবু অনেকদিন। নটে ম্যানেজার বদল হয়েছে এর মধ্যে। কত লোক সেছে, গেছে। এ দেশের নিয়মই এই।

কয়লাখনি যদি বিরাট একটা যন্ত্র হয় তবে এ দীর্ঘদিনে বনও তার একটা বল্টু হয়ে গেছে। এখান থেকে তার মুক্তি নেই। যদি জীবন মুক্তি নিত তবে যন্ত্রের কাজ বন্ধ হত না ঠিকই, কিন্তু নিশ্চয়ই ঝিমিয়ে ত কিছুটা। জীবন সেটা বুঝতে পারে।

এ দীর্ঘদিনে অনেক মানুষকে জীবন দেখেছে। অনেক মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সে। সুখ পেয়েছে যেমন, তেমন দুঃখও পেয়েছে। যেমন হেসেছে, কেঁদেছেও তেমনই। কিন্তু সকলের কথাই কি আজও মনে আছে তার? নেই। থাকতে পারে না। সময়ের ব্যবধানে ঝাপসা হয়ে যাবে বইকি কিছুটা। কিন্তু সবাইকে কি ভুলে গেছে সে? কি করে ভুলবে!

এখনও অনেকে জংধরা পুরনো নাট-বল্টুর মত পরিত্যক্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে কয়লাখনির আশেপাশে। সেই পুরনো নাট-বল্টু ঘাঁটতেই জীবন এখন ভালবাসে। কারণ তাদের সঙ্গে যে তারও জীবন জড়িয়ে আছে কিছুটা। যারা চলে গেছে তাদেরও তখন মনে পড়ে। স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে এক এক করে।

অন্ধকার এ দেশ। মগবাতী হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ চলতে হয়। প্রাচীন জমিদার-বাড়ির অলিন্দের পর অলিন্দ পার হবার মত সুরঙ্গের পর সুরঙ্গ পার হয়ে যেতে হয় একে একে। দুরুদুরু বুকে উপরে দিনের আলো যে দেখছিল একটু আগে, চানকে দুটি ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে তলিয়ে গেল। কোথায়? যেখানে আলো নেই। শুধু অন্ধকার আর ভ্যাপসা গন্ধ। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয় যেখানে।

এই ছোট্ট দেশটা একটা কোলিয়ারি ঘিরে। সকাল থেকে সন্ধ্যা চানকের উপরের হুইল দুটো ঘোরে অনবরত। রাতেও ঘোরে। কিন্তু দেখা যায় না। আগে স্টীমে চলত। এখন চলে বিদ্যুতে। তাই ইটের বিরাট চিমনিটা এখন পরিত্যক্ত। বয়লারটা হয়েছে ওয়াটার ট্যাঙ্ক। ওই জল এ দেশের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছে যায়।

চিমনিটার পাশেই বাতিঘর আর তেলঘর। বাতিঘরে বাতি থাকে—সেফ্‌টি ল্যাম্প। সর্দাররা পায় ওগুলো। খনিতে গ্যাস জমলে সেফ্‌টি ল্যাম্প দেখেই যাতে বুঝতে পারে। মালকাটা আর লোডারদের মগবাতী। এগুলো নিজেরাই তৈরি করে ওরা। তেলঘর থেকে কেরোসিন তেল দেওয়া হয় রোজ তিন ছটাক। একটা টিনের মগে করে স্মৃতিকণ্ঠ মেপে দেয় সকলকে।

তার পিছনে ফ্যান হাউস। মালকাটারা বলে পাংখা ঘর। খনির বিষাক্ত গ্যাসকে বের করবার জন্ম দিনরাত সব সময় সোঁ সোঁ শব্দ হয় সেখানে। পাখার শব্দ।

মেশিন ঘর চানকের পাশে। তার এ পাশে অফিস। লেবার অফিসার, ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এজেন্টদের চেম্বার। হাজ্‌রেবাবু, পে-ক্লার্কদের ঘর তার পাশেই। সব সময় ছোটখাট একটা ভিড় জমে থাকে সেখানে।

সময়ের এখানে মূল্য আছে অনেক। প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মেশিন ঘরের মাথা থেকে বাঁশী বাজে। কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাজে বাঁশীটা। জীবন সব বুঝতে পারে। এবার দিনের পাল্লা শেষ হল। রাত পাল্লার সবাই তার আগেই গাঁইতা আর ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে বসে থাকে চানকের পাশে। এটা নিয়ম। দিন পাল্লার লোক উঠলে ওরা নাম্‌বে। ওরা উঠবে কাল সকালে। তখন এসে দেখবে সকাল পাল্লার সবাই প্রস্তুত। পাল্লা তিনটে। আট ঘণ্টার বেশী খাটা বে-আইনী। কিন্তু আইন মানলে পেট ভরে না সব সময়। বিশেষ করে মালকাটা আর লোডারদের ক্ষেত্রে—যেখানে মালের উপর নির্ভর করে পয়সা সেখানে।

মেয়েরা খনির মধ্যে নামে না। আইন নেই। তারা উপরেই কাজ করে। ঝুড়ি করে কয়লা নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে। সেখান থেকে ফিরে ঘর-সংসার করে। এদেশের তারাই প্রাণবস্তু। তাদের কেন্দ্র করেই এখানকার হাসি-কান্না—অর্থাৎ জীবন।

এ দীর্ঘদিনে অনেক কিছুই দেখেছে জীবন। হাসতে দেখেছে অনেককে আবার কাঁদতেও দেখেছে। মদ খেয়ে রাস্তার পাশে ড্রেনের মধ্যে পড়ে থাকতেও দেখেছে অনেককে।

সিংজী বলত, এহি হ্যায় দুনিয়া বাবুজী। এ দেশকা হালত এইসি হ্যায়।

তখন প্রথম এদেশে এসেছে জীবন। সব ঠিক বুঝে উঠতে পারত না। এখনকার মত তখন এত ট্যাক্সি-বাস হয় নি এদেশে। সিংজী ছিল টাঙাওয়ালা। ত্রিমোহনায় পুরনো টাঙাটা দাঁড় করিয়ে ভোরবেলা থেকেই হাঁকত—যায়গা ঝরিয়া, ঝরিয়া। আর তার ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোত। গায়ের রং ছিল সাদা। বুকের হাড় কখানা গুনে নেওয়া যেত সহজেই।

সিংজী বলত, লাট্টু, মেরা বুড্ডা হো গিয়া, ইস লিয়ে—

তা সিংজীরও বয়স হয়েছিল। মুখের দাড়িগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল সব। গালে দাঁত ছিল না। তবু ৬ ফিট লম্বা বিরাট ছিল তার দেহের কাঠামো। গায়ের চামড়াগুলো তখন ঝুলে গিয়েছিল একটু।

দুপুরে রোদের তাপ যখন অসহ্য হয়ে উঠত তখন জীবনের দোকানে এসে বসত সিংজী। গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলত, মরণ দাও গুরুজী আর যে পারি না।

তখন নতুন এখানে এসে দোকান করেছে জীবন। যত্ন করে বসিয়ে একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরত। বলত, এত কষ্ট তুমি কর কেন সিংজী? ছেলে-বউয়ের কাছে গিয়ে জীবনের শেষ দিনকটা কাটালেই পার।

কিন্তু সিংজী তাতে নারাজ। কেন নারাজ সে কথা কেষ্টবাবুর কাছে শুনেছিল জীবন। কৃষ্ণচন্দ্র দাস। বাড়ি ছিল বীরভূম। এখন সেটা ইতিহাস হয়ে গেছে অবশ্য।

কেষ্টবাবু তখন হাজ্‌রেবাবু হয়ে গেছেন। আসল নাম প্রায় ভুলেই গেছে সকলে। আগে খনির তলায় কাজ করতেন। মুন্সী। খালি ডিব্বাগুলো প্রতি সুরঙ্গের মুখে মুখে লোক দিয়ে পৌঁছে দেওয়া আবার বোঝাই হলে পাঠিয়ে দেওয়া চানকের মুখে—এই কাজ। মাইনে ছিল সামান্যই। তাই চানকের মুন্সীর সঙ্গে যোগসাজস করে আটটা ডিব্বা দশটা বলে চালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন। চাকরিই যেত। কিন্তু তখনকার সাহেব ম্যানেজার জন ম্যাথুস ছিলেন দিলদার আদমি। তাই নীচে থেকে পাঠিয়ে দিল উপরে। সেই থেকে কেষ্টবাবু হাজ্‌রেবাবু।

কেষ্টবাবু বলতেন, চুরি করে সব শালা, দোষ হয় আমার। সেই যে কথায় আছে না, ময়লা খায় সব যাছে দোষ হয় উলুকোর। এও সেই বিত্তান্ত।

কিন্তু উপরে এলেও কেষ্টবাবুর অবস্থার পরিবর্তন হল না তাতে। গরহাজিরের হাজ্‌রে লিখে বেশ কামাতেন দু পয়সা। বলতেন, না খেয়ে তো আর ছেলেমেয়ে নিয়ে মরতে পারি না মশাই। তাই।

তারপরই কেষ্টবাবুর গলাটা ভার হয়ে যেত। বলতেন, শুধু বাঁচার জন্তে আজ আমায় চুরি পর্যন্ত করতে হচ্ছে। শুধু পেটের জন্তে। কিন্তু জানেন, আমার বাপ-ঠাকুরদা চোরদের শাস্তি দিয়েছেন একসময়। নিজের প্রজাদের শাসন করেছেন। আর আমি?

জীবন একটা বিড়ি বাড়িয়ে দিত সন্তর্পণে। বলত, আপনার বাপ-ঠাকুরদার সে জমিদারি নষ্ট হল কি করে?

কেষ্টবাবু সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত দিতেন। বলতেন, নসীব। সবই এই মশাই। এখানে না লেখা থাকলে আমারই আজ এ অবস্থা হবে কেন?

জীবন বলত, তা ঠিক।

কেষ্টবাবু দেশলাই জেলে বিড়িটা ধরিয়ে বলতেন, যাক, যাবেন নাকি সিংজীর ছেলেকে দেখতে?

জীবন ইতস্ততঃ করত।

কেষ্টবাবু হেসে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে। বলতেন, বুঝেছি, বুঝেছি। আপনার আবার চলে না ওসব। আরে, আমারই কি চলত। বউটা মরে যাওয়ার পর মনের দুঃখেই না—

এসব কথা অনেকদিন আগের। জন ম্যাথুস তখন কোলিয়ারি ম্যানেজার। বিরাট চেহারার পুরুষ ছিলেন জন ম্যাথুস। মুখটা ছিল টুকটুকে লাল। ঠিক সিঁদুরে আমের মত। বাঘের মত বিরাট মুখটা। চোখ দুটো ছিল কটা। কিন্তু যেন জলত জলজল করে। অবিবাহিত সেই ম্যাথুস সাহেব তখন ছিলেন এখানে অনেকেরই আতঙ্ক।

রোজ বিকেলে বিরাট একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন জন ম্যাথুস। মুখে পাইপ জলত। পিছনে থাকত লছমন সিং। তার এক হাতে থাকত এক প্যাকেট বিস্কুট। কুকুরের খাত্ত। অন্ত হাতে এক কৌটো তামাক। সেটা সাহেবের।

সাহেব ডাকতেন, লছমন?

লছমন বলত, হুজুর।

সাহেব বলতেন, আগে বাঢ়ো।

সাহেব দাঁড়িয়ে পড়তেন। আর লছমন সিং বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে মাথার উপর একটা বিস্কুট রেখে চোখ বুজে দাঁড়াত।

তা দেখে সাহেব হাসতেন। হেসে বলতেন, টম্, ব্রিং ছাট।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মত কুকুরটা ছুটে গিয়ে লছমন সিংয়ের কাঁধের উপর দুটো পা তুলে দিয়ে মুখে করে সেই বিস্কুট তুলে নিয়ে ছুটে আসত আবার। সাহেব তার পিঠ চাপড়াতেন।

তারপর লছমনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতেন, এগেন। সে আবার দাঁড়াত বিস্কুট মাথায় করে।

এটা ছিল খেলা। এ খেলা অনেকেই দেখেছে দূর থেকে। জীবনও দেখেছে। অনেকে হেসেছে। জীবন কিন্তু হাসতে পারে নি। লছমন সিংয়ের অবস্থা দেখে তার যেন কেমন দুঃখ হত।

কিন্তু সেই কুকুরটাই একদিন টুকরো টুকরো করে ফেলল লছমন সিংকে। কেন? জন ম্যাথুস বললেন, নিশ্চয়ই চুরি করতে এসেছিল। নইলে এমন হবে কেন! কুকুর তো কম্পাউণ্ডের বাইরে গিয়ে মারে নি ওকে।

আইন জন ম্যাথুসের দিকে রায় দিল।

সাহেব লছমন সিংয়ের বউটাকে কিছু টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এখান থেকে। কোথায়? কেউ তা জানতে পারে নি।

চুরি করতে গিয়ে মরেছে লছমন সিং, জীবন বিশ্বাস করতে পারে নি এ কথা। কেষ্টবাবুও না। তিনি বলেছিলেন, চুরিটুরি ওসব ধাপ্পা মশাই। কারণ অন্ত।

তখন কিন্তু লছমন সিংয়ের মৃত্যু নিয়ে বেশ একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল এ অঞ্চলে, অমনি হয়। আবার নতুন একটা গল্প পেলে পুরনো গল্পটা আর মনে থাকে না কারও। এমনি কত গল্প যে এখানে উঠেছে আবার পড়েছে তার ঠিক হিসাব নেই।

লছমন সিংয়ের মৃত্যু নিয়ে যে সোরগোল পড়েছিল তা হঠাৎ চাপা পড়ে গেল নতুন একটা ঘটনাতে। ঘটনাটা ভীষণ। অনেকে দেখে শিউরে উঠল। ঘৃণায় নাক কুঁচকে চলে এল অনেকে। অনেকে দেখতেও গেল না। কেবল খবরটাই শুনল। গত রাতে যখন ফাঁকা বগীগুলো রেখে ফিরে যাচ্ছিল ইঞ্জিনটা তখন তার তলায় পড়ে মরেছে পুর্ণি।

এ সমস্ত অনেকদিন আগের কথা। তখন জীবন সবে এসেছে এখানে। সব ঠিক বুঝে উঠতে পারত না।

সিংজী শুধু হাসত। বলত, এহি হ্যায় কোলিয়ারি জীবনবাবু। এদেশ কা হালত এইসি হ্যায়।

কিন্তু সেই কোলিয়ারিকে আঁকড়ে এই কষ্ট সহ্য করে কেন যে পড়ে আছে সিংজী, জীবন তা বুঝতে পারত না। জীবন দেখত, অনেকদিন শুধু জল খেয়েই কাটিয়ে দিত লোকটা। কারণ যাত্রী হত না বেশী। তার বৃদ্ধ ঘোড়া লাট্টু অসমর্থ হয়ে পড়ছিল দিন দিন। কিন্তু সিংজী তাকেই চাবকে ছোটাত। বলত, খেল্ দেখলা দে বাবুলোগকো। ছুট, আউর জোরসে।

তবু যাত্রী তার কাছ ঘেঁষতে চাইত না। তখন আরও নতুন নতুন টাঙা এসে গেছে এদেশে। তাদের তেজী ঘোড়ার দিকে সকলেরই নজর। চড়াই-উৎরাই পথে ওটা দেখে নিতে হয়।

কিন্তু লাট্টু যেন বুকের পাঁজরা ছিল সিংজীর। রোজ যা কামাত তা থেকে পয়লে চানা আর বিচলি কিনত লাট্টুর জন্যে। বাকি যা থাকত তা অতি সামান্য। তাই খেয়ে কোন রকমে বেঁচে ছিল সিংজী।

জীবন বলত, নতুন একটা ঘোড়া কিনলেই পার।

সিংজী বলত, ক্যায়সে?

জীবন বলত, তোমার ছেলের তো শুনি অনেক টাকা। চোলাই মদের ব্যবসা করে লাল হয়ে গেছে। তার কাছে গিয়ে চাইলে পার।

ছেলের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চুপসে যেত সিংজী। কেমন যেন আমতা আমতা করত। বলত, ভিখ্? ভিখ্ হাম নেহি মাঙ্গতা বাবুজী। নেহি সেকতা।

তারপরই উঠে চলে যেত সঙ্গে সঙ্গে।

কেষ্টবাবু বলতেন, এইভাবেই মরবে বুড়োটা। ছেলের নাম পর্যন্ত যেন শুনতে পারে না। কেন জানে আসলে ছেলেটাই ওর নয়।

এ সব অনেকদিন আগের কথা। তখনও লছমন মরে নি। খাকীর হাফপ্যান্ট আর হাফসার্ট পরে জীবনের দোকানে সে আসত মধ্যে মধ্যে। সেই নিরীহ লোকটা দেখে জীবনের কেমন যেন মায়া হত। বলত, দিন দিন এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন লছমন ভাই?

লছমন সিং হাসত। বলত, এমনি।

কেষ্টবাবু বলতেন, তাই কখনও হয়। এমনি এর শরীরটা খারাপ হয় কখনও। লছমনের রোগ ঢুকেছে মনে।

অবশ্য কেষ্টবাবুরও তখন মনে শান্তি নেই। বউ মরে যাবার পর বীরভূমের সেই জমিদার বংশধর তখন পাল্টে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে। বলতেন, চিত্তে আমার সুখ নেই। বুকের ভিতরটা জ্বলে যায় সব সময়। এ সব ভোলবার জন্যেই না—

ঠিক সন্ধ্যাতেই আকণ্ঠ পান করে টলতে টলতে আসতেন কেষ্টবাবু। এসে বলতেন, জানেন, দুনিয়ায় যদি খাঁটি থাকে তবে এই একটা জিনিস। খান, দেখবেন পৃথিবীটা কত সুন্দর হয়ে গেছে। বিউটিফুল।

একটা মাতালের সান্নিধ্য জীবনের যেন ঠিক ভাল লাগত না। তবু তখন নতুন এসেছে এখানে, বলতেও পারত না কিছু। অতি সন্তর্পণে একটা বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বলত, খান, বিড়ি খান।

কেষ্টবাবু অতি কৃপা করে যেন নিতেন বিড়িটা। বলতেন, বিড়ি? তা দিন।

রাত বাড়ত। অনেক রাতে কেষ্টবাবুর ছেলে এসে বাবার হাত ধরে তুলে নিয়ে যেত বাড়িতে। কেষ্টবাবুর তখন বয়স হয়েছে বেশ। মাথার চুলে পাক ধরেছে। মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটিও পাশে দাঁড়ানোর মত হয়েছে প্রায়।

সিংজী বলত, তা হলে কি হবে। সেই কি একটা কথা আছে না, স্বভাব যায় না ধুলে—

বলেই ফোকলা মুখে হাসত সিংজী। মাথার পাগড়ীটাকে ঠিক করে জড়াতে জড়াতে বলত, মজার হাজ্‌রেবাবু বহুত খলিফা আদমি হ্যায়। জোয়ান ভি হ্যায় আভি এক। নেহি—

বলেই থেমে যেত সিংজী। কি বলতে গিয়ে থেমে ত? সে কথা অনেকদিন পরে শুনেছিল জীবন। ংজীই বলেছিল।

কালোমাটির দেশ এটা। যেখানেই দাঁড়াবে তার নায় কয়লা। কত তলায়? অনেক। শত শত ফিট নায়। ডুলি চেপে চানক দিয়ে নেমে যাও, দেখবে, শুধু লো কয়লা আর কয়লা।

এই কয়লাকে ঘিরেই আছে এ দেশের লোকগুলো। উ কাটে, কেউ বয়, কেউ তুলে নিয়ে আসে য়ে। সকলেই পয়সা পায়। আর তা ছাড়া বাঁচবেই কি করে?

প্রতি পাল্লায় লোক যায় নীচে দু দল। এক দল কোম্পানির লোক। তারা গিয়ে পাম্প করে জল বের করে দেয় খনি থেকে। হলেজ চালিয়ে ডিব্বা দেওয়া-নেওয়া করে। ইঞ্জিন চালিয়ে কয়লা নিয়ে আসে চানকের মুখে। তা ছাড়া আছে সর্দার, মুন্সী, ওভারম্যান—এরা মাইনে করা লোক। আর আছে ঝাড়ুদার কুলি, ব্লাস্টিং করে যারা। কাটিং মেসিন চালায় যারা সব মাইনে পায় কোম্পানি থেকে। মালকাটা আর লোডাররা যায় পরে। এদের মাইনে দেয় না কোম্পানি। একটা ডিব্বা কয়লা কেটে বোঝাই করে দিলে তবে দক্ষিণা পাঁচ টাকা ছ আনা। তারও আবার নিয়মকানুন অনেক। ফাঁকও অনেক।

কয়লা ঘিরেই এদেশের লোকের জীবনযাত্রা। তা ছাড়া অন্য কিছু নেই। চাষবাস প্রায় হয় না বললেই চলে। কাঁকুরে মাটি। সে মাটিতে ফসল ফলাতে যে মেহনতের প্রয়োজন সেটুকুতে কয়লা কেটে আয় করা যায় অনেক বেশী।

তাই এদেশের ধূধূ মাঠ আগাছায় ভর্তি। হাওয়ায় মাঠের ফসল দোল খায় না। আগাছাগুলো কাঁপে থরথর করে। ঋতুতে ঋতুতে ফুল ফোটে। তখন আদিগন্ত যেন চকচক করে। বনফুলের বাহার সত্যি সুন্দর।

জীবন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। দেখে অবাক হত। নতুন এদেশে এসেছে বলেই হয়তো হত। যারা পুরনো তারা ফিরেও তাকায় না সেদিকে।

তা জীবনই কি তখন বুঝতে পেরেছিল যে সে এখানে পুরনো হবে একদিন? আদিগন্ত নানা রঙের বনফুলের দিকে তাকাতে বিতৃষ্ণা আসবে?

শহর কয়েক মাইল দূরে। দোকানের মালপত্র আনতে হত সেখান থেকে। তাতে লাভ থাকত কম। কিন্তু তা ছাড়া উপায় ছিল না কোন।

তখন প্রথম এসে দোকান সাজিয়ে বসেছে এদেশে। বুকটার মধ্যে একদিন বিরাট একটা ধনী লোক হবার স্বপ্ন দোল খেত অনবরত। শহর থেকে মাল কিনে সিংজীর টাঙা বোঝাই করে বলত, চল সিংজী।

সিংজী কেমন যেন ইতস্ততঃ করত। বলত, চলিয়ে। মগর রাত হো গিয়া বহুত। এদেশ হারামীকা দেশ হ্যায় বাবুজী।

জীবনের গায়ে তখন হাতীর মত বল। বলত, চল, কোন্ শালা আসে গাড়ির ধারে দেখব।

টাঙা চলত। সিংজীর লাট্টুর গলার ঘন্টিটা বাজত ঠুন ঠুন করে। আর জীবন সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকত চুপটি করে।

দূরে কাঁচা কয়লা পুড়ত। তার লকলকে শিখাটায় লাল দেখাত দিগন্তটা।

টাঙা চলত। কয়েকটা পুরনো খনির পাশ দিয়ে এগুত আস্তে আস্তে। তার মধ্যে একটা খনি থেকে আগুন বেরুত তখন। কয়লায় আগুন লেগে গিয়েছিল বলে ওটা তখন পরিত্যক্ত হয়েছিল।

সে জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন। জীবনের বুক কাঁপত দুরদুর করে। সিংজী জোরে চাবুক মারত লাট্টুর পিঠে—চুট্, আউর জোরসে।

এইখানেই একদিন দেখা হল হরিরাম আর বীরেন-বাবুর সঙ্গে।

লোক দুটোকে দূর থেকেই দেখেছিল সিংজী। তাই চাবুকের পর চাবুক মারছিল লাট্টুর পিঠে। লাট্টু ছুটছিল। তখন রাত হয়েছিল বেশ। এই নির্জন দেশে ওই লোক দুটোর পাশে এসে কিন্তু হঠাৎ টাঙা থামিয়ে দিয়েছিল সিংজী। জীবন কেঁপে উঠেছিল প্রথমটা। বিরক্ত হয়েই বলেছিল, কি হল?

সিংজী উত্তর দেয় নি সে কথার। আরো টাঙা থেকে নেমে লোক দুটোর পাশে গিয়ে বলেছিল, বাবুজী, আপ? কাঁহাসে আতা হ্যায়?

জীবন টাঙায় বসে ছিল। আকাশে চাঁদ ছিল সেদিন। তার আলোতে দেখছিল সব।

এবার বাবুজীর গলা শোনা গিয়েছিল। বলেছিলেন, দেখ তো সিংজী, হরিরামটা এমন খেয়েছে যে আর বাড়ি যেতে পারছে না। বিলিতী বলে এমন খেতে হবে? হপ্তার সব টাকা কাবার করেছে একদিনেই।

জীবন বসে বসে শুনছিল। বাবুজী বলছিলেন কথাগুলো। কিন্তু জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল।

শেষে সিংজী একটা বেহুঁশ লোক পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসেছিল টাঙার কাছে। বলেছিল, ঘোড়া খরিয়ে বাবুজী।

সিংজীর কথা সেদিন না রেখে পারে নি জীবন। বাবুজীও তখন উঠে বসেছেন। বলছেন, চালাও। জোরসে চালাও সিংজী।

টাঙা চলতেই জীবনের গায়ের উপর ভেঙে পড়েছিল হরিরাম। সে তখনও জ্ঞান হারায় নি। জীবনকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করছিল, হাম আপকো বহুত তকলিফ দিতা হ্যায় বাবুজী। মুঝে ক্ষমা করনা। পিনা থোড়া জাদা হো গিয়া। ইস লিয়ে—

বীরেনবাবুকে বুকের মধ্যে চেপে রেখেছিল সিংজী। বীরেনবাবু সিংজীর বুকে মুখ রেখে চোখ বুজে নবাব সিরাজদ্দৌলা হয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলছিলেন, বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি, তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলি নি জনাব।

এ সব অনেকদিন আগের কথা। তখনও লছমন সিংকে জন ম্যাথুসের কুকুরে টুকরো টুকরো করে নি। পূর্ণিও মাথা দেয় নি রেলে।

তখন প্রায়ই জন ম্যাথুস বেরুতেন কোলিয়ারি এলাকা ইনভেস্টিগেশানে। কোন্ ধাওড়া অপরিষ্কার থাকে, কোন্ রাস্তায় ঝাড়ু পড়ে না ঠিকমত—এ সব ঘুরে ঘুরে দেখতেন।

লোকে বলত, ও-সব কিছু না। আসল উদ্দেশ্য অন্য। এদেশের সমস্ত স্তরের মধ্যে চাউর হয়ে গিয়েছিল কথাটা। তাই সাহেবকে দেখলেই ঘরে গিয়ে ঢুকত মেয়েরা।

ম্যাথুস আস্তে আস্তে হাঁটতেন। দু পাশে ধাওড়ার দিকে নজর রাখতেন। সঙ্গে থাকত অ্যালসেসিয়ানটা। লছমন সিং থাকত পিছনে।

হঠাৎ ম্যাথুস দাঁড়িয়ে পড়তেন: লছমন?

হুজুর?

ও কোন্ হ্যায়?

লছমন সিং যেন কেঁপে উঠত। তবু বিলাসপুরী ছ ফিট লম্বা দেহটা এগিয়ে নিয়ে এসে দূরে ঘোমটা-দেওয়া দ্রুতপলায়নরত একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলত, ও পিরভু কা ভৌজাই হুজুর।

সাহেব আর কিছু বলতেন না। পকেট থেকে একটা নোট বের করে লছমনের হাতে গুঁজে দিয়ে ফিরতেন সঙ্গে সঙ্গে।

এটাও ছিল খেলা জন ম্যাথুসের। লছমন সিং ছিল শাগরেদ।

কিন্তু সেই লছমন সিংকেই একদিন টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলল জন ম্যাথুসের অ্যালসেসিয়ান।

কেষ্টবাবু বলতেন, পরজন্ম বলে কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না মশাই। যা কিছু কর্মফল এ জন্মেই ভোগ করতে হয়। নইলে লছমন সিংয়ের ও-দশা হবে কেন?

জীবন একটা বিড়ি বাড়িয়ে দিত।

বিড়িটা ধরিয়ে কেষ্টবাবু আবার শুরু করতেন। বলতেন, কথায় আছে না, পরের সর্বনাশ করতে গেলে নিজের সর্বনাশ হয় আগে। লছমনের হয়েছে তাই। ওকে যদি কুকুরে না খেত মশাই তবে ধর্ম বলে কিছু থাকত না দুনিয়ায়।

জীবন প্রশ্ন করত, কি করেছে লছমন?

কেষ্টবাবু বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিয়ে বলতেন, কি করে নি? এই ধরুন না পূর্ণির কথা।

বলেই পূর্ণির কথা শুরু করতেন কেষ্টবাবু।

সাঁওতাল পরগনার একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে কালুর সঙ্গে যেদিন প্রথম এল এখানে সেদিনই যেন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। টালুস-টুলুস করে চারিদিক

কিছুক্ষণ তাকিয়ে কালুর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলেছিল, ই কোথাকে লে এলি!

কালু একটু বোকার মত হেসেছিল। বলেছিল, গাঁক লা কেনে। ডরটা কি? আমি তোর সোয়ামী নইছি লা।

বলেই জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল পুর্ণিকে।

পুর্ণি ঠেলে দিয়েছিল কালুকে। বলেছিল, সবুর সয় লা যে বড়।

হঠাৎ গল্পটা থামিয়ে দিয়ে কেষ্টবাবু চুপ করে থাকতেন কিছুক্ষণ। তারপর বলতেন, কিছু মনে করবেন না মশাই। মাসের শেষ, পকেট একদম গড়ের মাঠ। দুটো টাকা দেবেন? মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব আপনাকে।

জীবন তখন প্রথম এসেছে এখানে। না বলতে পারত না। দুটো টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলত, তারপর, কি হল পুর্ণির?

কেষ্টবাবু হাসতেন তখন। বলতেন, কি আর হবে। কালু বাদে মাল কাটতে নামল গাঁইতা কাঁধে নিয়ে, আর পুর্ণি গেল ঝুড়ি মাথায় করে গাড়ি বোঝাই করতে।

জীবন বলত, তা নয় গেল, কিন্তু লছমন সিং কি করল তাদের?

কেষ্টবাবু উঠে দাঁড়াতেন তখন। বলতেন, সে কথা শুনবেন আর একদিন। আজ থাক।

কেষ্টবাবু একটু দাঁড়িয়ে থাকতেন নির্বাক হয়ে। তারপর বলতেন, যাবেন নাকি?

জীবন বলত, কোথায়?

কেষ্টবাবু বলতেন সিংজীর ছেলেকে দেখতে। গেলেই যে চালাতে হবে তার কোন মানে আছে! আমিই কি চালাতাম আগে? বউটা মরে গেল বলেই না—

জীবন বলত, আজ থাক।

শনিবারের বিকেলে হাট বসে ত্রিমোহনায়। জগরূপ কুর্মি খাসী কেটে বিক্রি করে। কিছু তরকারির দোকান আসে—আলু, পেঁয়াজ, কুমড়ো, বেগুন।

শহর থেকে হরেক রকমের মাল নিয়ে আসে দু-একজন। সস্তাদরের হিমানী পাউডার, আলতা-সাবান। গন্ধতেল, কাচের চুড়ি, কাঁটা ফিতেও থাকে।

মালকাটারা বলে, শনিচারের হাট।

সেদিন ত্রিমোহনাটা লোকে গিসগিস করে। কাবলী সৈয়দ খাঁ এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে জীবনের দোকানের পাশে। সর্দার রঘু সিং গোঁফ মুচড়ে ঘুরে বেড়ায় এধার থেকে ওধারে। আসল নয়, সুদ আদায়ের ফিকির এ সব।

সেই শনিচারের হাটেই জীবনের দোকানে এসে হাজির হল হরিরাম। হাত দুটো জড়ো করে একবার কপালে ঠেকিয়ে বলল, নমস্তে বাবুজী। ও রোজ আপকো বহুত তকলিফ দিয়া। ক্ষমা করুনা।

জীবন প্রথম চিনতে পারে নি। রাতের অন্ধকারে দেখা লোককে মনে রাখা সত্যি কষ্ট। চিনতে পেরে বলল, ভাল আছ?

হরিরাম হাসল। বলল, আপকো দোয়াসে।

জীবন বুঝতে পারল এর মধ্যেই হরিরাম টেনেছে বেশ কিছু। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। দোকানে ভিড় ছিল। মাল দিতে দিতে জীবন বলল, বীরেনবাবুর খবর কি?

হরিরাম বলল, ওই তো মুঝে ভেজা। আজ আপকো হামারা ঘর যানে হোগা। হাম বহুত গরিব হ্যায় বাবুজী। আজ আপকো আউর থোড়া তকলিফ দেগা।

বলেই হনহন করে চলে গেল হরিরাম। জীবন অবাক। এমন লোক সে দেখে নি জীবনে। তার কাছে মত না নিয়েই কোথায় গেল লোকটা!

জীবন গলা বাড়িয়ে দেখল, জগরূপের মাংসের দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হরিরাম। বলছে, আচ্ছা মাংস দেও। আজ বাবুজী যায়গা মেরা ঘর। কিয়া দেতা হ্যায়? নিকাল হাড্ডি।

একটু পরেই ফিরল হরিরাম। একগাল হেসে বলল, হাম বহুত গরিব হ্যায় বাবুজী। থোড়া তকলিফ দেগা আপকো। চলিয়ে।

কি বলবে জীবন? কি বলার থাকতে পারে এর উপরে? কিছু না। জীবন বলল, একটু বসো হরিরাম। দোকানটা বন্ধ করে নিই।

এ সব কথাও অনেকদিন আগের। তখনও রক্ত ওঠে নি টিকেনবাবুর মুখ দিয়ে। তখনও দিনরাত ঘুরে

বেড়াচ্ছেন এ ধাওড়া থেকে ও ধাওড়া, ও ধাওড়া থেকে সে ধাওড়া।

কেষ্টবাবু বলতেন, ও একটা ছেলেমানুষ মশাই। নইলে ঘরের ভাত খেয়ে বোনের মোষ তাড়াতে যায় কেউ।

জীবন ঠিক বুঝত না। প্রশ্ন করত, কি করেন টিকেনবাবু?

কেষ্টবাবু বলতেন, করবে আর কি! তেলগুদামের বাবু। মাথাপিছু তিন ছটাক তেলের হিসেব। আর মুখে বড় বড় কথা—এক হও। সংঘবদ্ধ হও। উনি সবার জন্যে সোনার থালায় ভাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। এমনি কি আর বলি ছেলেমানুষ!

টিকেনবাবুও আসতেন মধ্যে মধ্যে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো অবিন্যস্ত। চওড়া কপাল। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো যেন কথা বলত। টিকেনবাবু কেবলই হাসতেন। বলতেন, আমাদের মত হতভাগাদের সঙ্গে কপাল মেলাতে কেন এখানে এলেন জীবনবাবু?

কেষ্টবাবু বলতেন, এই রকমই কথা ছোঁড়ার।

সিংজী কিন্তু দু হাত তুলে নমস্কার করত। বলত, টিকেনবাবু দেওতা হ্যায় বাবুজী, দেওতা। ইয়ে কোলিয়ারিকা দেওতা। ম্যানিজার সাহিবতক ডরতা হ্যায় উনকো।

জীবনের যেন ঠিক বিশ্বাস হত না কথাটা। কারণ জন ম্যাথুস কাউকে ভয় পাবার পাত্র নন। নিজের চারপাশে বেড়া দেবার মত বিলাসপুর থেকে জনকয়েক ভাল লাঠিয়াল এনে একটা অফিস করে বসিয়ে দিয়েছেন তাদের। কি? না ইউনিয়ন। তোমাদের সুখদুঃখের কথা ওর মাধ্যমেই জানাও কোম্পানিকে। জন ম্যাথুস মুক্ত। তাঁর আর দায়িত্ব নেই কোন। নইলে হলেজের তার ছিঁড়ে যাওয়া ডিব্বার নীচে পড়ে মুংগরা মাঝির পা কাটা গেল যাদে, ম্যানেজার তার অচৈতন্য দেহটা উপরে রাস্তার পাশে রেখে চুপ করে বসে রইল। ইউনিয়নের সুরথ সিং বলল, শত্রুর হাতে গেছে পাটা। কাল রাতে একটা চিৎকারও শুনেছিল সে।

খবর পেয়ে টিকেনবাবু এলেন। এসে বললেন, কত টাকা খেয়েছ সুরথ ভাই? [illegible] শাকেই যদি কাটবে তবে রক্তটা যাবে কোথায়?

অনেক চিৎকার করলেন টিকেনবাবু। ছুটোছুটি করলেন এখান থেকে ওখানে। ম্যানেজার দু ঠোঁটে পাইপটা চেপে ধরে বললেন, হু আর ইউ? ইউনিয়নকা তরফসে আউ। আর ইউ মেম্বার অব দি ইউনিয়ন?

এ সবও দেখেছে জীবন। তাই সিংজীর কথাটা বিশ্বাস করতে পারত না ঠিক। তবু টিকেনবাবু অনেকগুলো ধাওড়ার মন অধিকার করে নিয়েছিলেন। সিংজীর মত তাদের কাছেও তিনি ছিলেন দেবতা।

সিংজী বলত, আউর একঠো আদমি হ্যায়। ও হ্যায় বীরেনবাবু। মগর ও আজ চুপ্ গিয়া।

জীবন প্রশ্ন করত, কেন?

সিংজী বলত, ও বহুৎ বাত হ্যায় বাবুজী।

দুদিন বীরেনবাবুকে দেখেছিল জীবন। প্রথম বার দেখেছিল ঝরিয়া থেকে ফিরতে সেই পরিত্যক্ত খনি এলাকাটার পাশে হরিরামের সঙ্গে মত্ত অবস্থায়। দ্বিতীয় বার দেখেছিল শনিচারের হাটের পরে হরিরামের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়ে।

তখন রাত হয়েছিল বেশ। মালকাটা ধাওড়ায় তখন হল্লোড় শুরু হয়েছিল। একদল সাঁওতাল মেয়ে সুর মিলিয়ে গান গাইতে চেষ্টা করছিল। পারছিল না। সকলেই মত্ত। মত্ত ওরা রোজই থাকে। কেবল শনিচারের রাতে মাত্রা বাড়ে একটু। ওপাশে বিলাসপুরী ধাওড়ায় তখন করতাল বাজছে ঝম ঝম। রামনাম শুরু হবে এখনই।

জীবন যাচ্ছিল হরিরামের পাশে পাশে। ধাওড়া ধাওড়ায় কয়লা জলছিল। তাদের আলোতে যেন চকচক করছিল হরিরামের মুখ। কয়লা-কালো তৈলাক্ত হরিরামের মুখের চামড়া যেন কুঁচকে গেছে। এটা বয়সের ছাপ। জীবন বলেছিল, তোমার কত বয়স হল হরিরাম ভাই?

হরিরাম বলেছিল, তা পচাশ পার হো গিয়া বাবুজী।

তারপর আবার চুপ। হঠাৎ একটা কান্না শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল জীবন। বলেছিল, কে কাঁদে হরিরাম ভাই?

হরিরাম বলেছিল, ও পূর্ণি হ্যায় বাবুজী।

জীবন বলেছিল, কাঁদছে কেন?

হরিরাম বলেছিল, বহুৎ কঠিন বিমার হুয়া হ্যায় উসকো। কুষ্ট্।

জীবন যেন চমকে উঠেছিল। আর ঠিক সেই সময়েই দুজন লোক ছুটে গিয়েছিল পাশ দিয়ে। ভটচাযবাবু আর সেনবাবু। জীবনের চিনতে কষ্ট হয় নি একটুও। ওপাশের মালকাটাদের ধাওড়া থেকে একটা মেয়ে গাল দিচ্ছে তখন, ইথাকে কেনে? ভাগাড়ে যা। পূর্ণির মাছে যা না কেনে খাটমড়া। কুত্তার দল।

জীবন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তা দেখে হরিরাম বলেছিল, কিয়া দেখতা হ্যায় বাবুজী। ও বাবুজীকা খেল তো বহুৎ পুরানা চিজ হ্যায়। চলিয়ে।

জীবন বলেছিল, চল।

আরও দুটো ধাওড়ার পরে হরিরামের ঘর। তখন রাত হয়েছে বেশ। হরিরামের ঘর বন্ধ হয়ে গেছে তখন। অন্ধকার।

হরিরাম গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল দরজায়: পাণ্ড, উঠ। হাম আগিয়া। আউর দেখ্, মেরা বাবুজী আয়া। উঠ, পাণ্ড।

জীবন আসতে গিয়ে তার পায়ে বেধে একটা খালি বোতল গড়গড় করে গড়িয়ে গিয়েছিল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের অন্ধকার থেকে কে যেন কথা বলে উঠেছিল, নেই। সব শেষ বলেই শালা দেখুন গড়াচ্ছে কেমন। তা এত রাত হল যে আসতে?

জীবন বলেছিল, দোকান বন্ধ করে আসতে আসতে—

হরিরামের বউয়ের নাম পাগলী। হরিরাম আদর করে ডাকে পাগু। সেই পাগু দরজা খুলেছিল তারপর। সঙ্গে সঙ্গে হরিরাম ঘরে ঢুকে একটা খাটিয়া নিয়ে এসেছিল বাইরে। বলেছিল, বইঠিয়ে বাবুজী। হাম বহুৎ গরিব হ্যায়। তকলিফ হোগা আপকো।

পরে একটা ঢোক গিলেছিল হরিরাম। বলেছিল, পাগু, পুরী বানাও, আর মাংস। পুরী আর মাংস। মেরা বাবুজী আয়া। মেরা মেহমান। বহুৎ আচ্ছাসে বানানা।

তারপর বীরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, মাল সব জিনিস হোগিয়া কিয়া?

বীরেনবাবু বলেছিলেন, সব ফিনিস।

হরিরাম বলেছিল, অলরাইট। হাম আভি লে আতা হ্যায় আউর। বাবুজী, নেহি পিয়েগা? বিলাইতী হি য়া নেহি মিলতা হ্যায়। হিঁয়া কিরণ সিংকা মাল চলতা হ্যায়। ও যো টাঙা চালাতা হ্যায় সিংজী, উসকা বেটা। বহুৎ বড়িয়া চিজ বানাতা। পিকে নেহি দেখেগা বাবুজী?

বীরেনবাবু বলেছিলেন, কতদিন এসেছেন এখানে?

জীবন বলেছিল, তা মাস দুই হল।

বীরেনবাবু একটু হেসেছিলেন তারপর। বলেছিলেন, তাই মনে হচ্ছে। একেবারেই নতুন। নইলে কোলিয়ারিতে থেকে অমৃতে অরুচি তো দেখি নি কারও।

সেই দ্বিতীয় বার বীরেনবাবুকে দেখেছিল জীবন। কিন্তু এই দু বারেই লোকটা যেন একটা স্থান করে নিয়েছিল বুকে। কেন? তা জীবনও জানে না।

বাতিঘরে কাজ করতেন বীরেনবাবু। নম্বর দেখে বাতি দেওয়া আবার নম্বর মিলিয়ে ঘরে তোলা কাজ। বাকি সময় বসে থাকা চুপচাপ। ডিউটি পিরিয়ড আট ঘণ্টা শেষ না হলে যাবার নিয়ম নেই কোথায়ও।

কেষ্টবাবু বলতেন, উনি তো মহাপুরুষ। আলো জ্বালিয়ে পথ দেখাচ্ছেন সব্বাইকে।

সিংজী কেমন যেন ক্ষেপে যেত মধ্যে মধ্যে। হাতের উপর হাত ঠুকে বলত, আলবৎ দেখলাচ্ছে। ও বহুৎ শরিফ আদমি হ্যায়। হ্যাম জানতা হ্যায় উসকো।

সিংজীর মুখেই বীরেনবাবুর কথা শুনেছিল জীবন। যখন প্রথম এলেন এখানে তখনও হাফপ্যান্ট পরতেন বীরেনবাবু। কচি মুখখানাতে হাসি লেগেই থাকত সব সময়। বীরেনবাবুর দিদি থাকতেন এখানে। ভগ্নীপতি ছিলেন ডাক্তার। তাঁর ওখানেই এসে উঠলেন। ঝরিয়া থেকে টাঙা করে সিংজীই তাঁকে নিয়ে এসেছিল।

তখনও জন ম্যাথুস আসেন নি এখানে। পুরো দমে যুদ্ধ হচ্ছে তখন জার্মানীর সঙ্গে। কোথায় জার্মানী, সিংজী তা জানত না। তবে লোকমুখে শুনত, সে নাকি এক ভীষণ যুদ্ধ। কেমন করে যুদ্ধ হয় তাও সিংজী জানত না। তবে রোজই এ কোলিয়ারির নিস্তব্ধ আকাশ কাঁপিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেত উড়োজাহাজ। লোকে অবাক হয়ে দেখত। বলত, ওরাই বোমা ফেলে।

বোমা কি—সিংজী বুঝত না। কিন্তু রোজই শুনত, আজ বোমা পড়েছে বার্মায়, আজ পড়ল কলকাতায়। লোকের মুখ শুকোত। কলকাতা থেকে রোজই লোক আসত ছুটে ছুটে। ভয়ে আতঙ্কে অর্ধমৃত।

সিংজী বলেছিল, ও টাইমমে হামলোগভি কামায়া বহুৎ পয়সা বাবুজী। লাট্টুকা খরিদ কিয়া হ্যায় উস্ টাইম।

তা বীরেনবাবু তখনও হাফপ্যান্ট পরতেন। স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসেছিলেন এখানে। খবর বেরুল, পাস করেছেন।

সিংজী বলেছিল, ও-রোজ বাবুজী মুঝে মিঠাই খিলায়া।

পাস করার পর দিদি বললেন, কলেজে ভর্তি হ।

দেশ থেকে মা চিঠি লিখলেন, চলে আয় এখানে।

কিন্তু বীরেনবাবু কিছুই করলেন না। দেশেও গেলেন না, কলেজেও ভর্তি হলেন না।

তখন এখানে আসর জমিয়ে নিয়েছেন বীরেনবাবু। খেলাধুলো, যাত্রা, থিয়েটার। নিত্য নতুন নতুন নাটকের রিহার্সাল। আর সবেতেই নায়ক নিজে। অভিনয়ও করতেন সুন্দর।

সিংজী বলেছিল, ওই যে বাঙালী ক্লাব হ্যায় না, ও বীরেনবাবু বানায়া।

কিন্তু এই সময় বিঘ্ন সৃষ্টি হল হঠাৎ। ভগ্নীপতি বেশী মাইনে পেয়ে চলে গেলেন অন্য কোলিয়ারিতে। দিদি বললেন, চল আমার সঙ্গে।

বীরেনবাবু গেলেন না। দিদি চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন একদিন। উঁকেও স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল সিংজী।

সিংজী বলেছিল, ও দিদি বহুৎ পিয়ার করতে থি বীরেনবাবুকো।

সেই সময়ই যুদ্ধটা থেমে গেল হঠাৎ। যে সব লোক এসে ভরে গিয়েছিল এখানে তারা ফিরতে শুরু করল একে একে। কমল বটে কিন্তু যুদ্ধের খাতিরে জিনিসপত্রের যে দাম উঠে গিয়েছিল তা আর নামল না।

সিংজী বলেছিল, পয়সা বহুৎ কামায়া বাবুজী, মগর ও সব চলা গিয়া পেটকা অন্দর।

সেই অগ্নিমূল্যের বাজারে পেট ভরে না খেতে পেয়ে লোকগুলো ধুঁকত। খাদের মধ্যে নামতে সাহস করত না। কিন্তু পেটের জ্বালায় নেমে মরতও অনেকে। রাস্তাতেও অনেককে মরে থাকতে দেখেছে সিংজী।

এই সময় ঝরিয়ার আশপাশে খদ্দর-পরা বাবুরা চিৎকার করে বেড়াতে শুরু করেছেন খুব। কি?—না স্বরাজ চাই। ইংরেজ চলে যাও এদেশ থেকে।

কেন? সে সব ঠিক বুঝে উঠতে পারত না সিংজী। রোজই বিরাট বিরাট মিছিল বেরুত। হরতাল হত মধ্যে মধ্যে। সবকিছু বন্ধ। টাঙাটিও চলত না রাস্তায়। সেদিন চুপ করে বসে সিংজী ভাবত, স্বরাজ পেলে দুঃখ ঘুচবে। জিনিসপত্রের দাম কমবে বুঝি।

তা সেই স্বরাজ এল একদিন।

সিংজী বলেছিল, মগর হামারা কিয়া হুয়া বাবুজী?

তখন রেশন শুরু হয়েছে। মাথাপিছু দশ ছটাকের হিসাব লিখতে তখন চালগুদামে চাকরি পেয়ে গেছেন বীরেনবাবু। এতদিন দেশ থেকে টাকা এসেছে আর বসে বসে খেয়ে বাঙালী ক্লাবের ভিতকে পোক্ত করেছিলেন বীরেনবাবু। কিন্তু তাতেও যখন চলছিল না, তখনই কাজ নিলেন ওখানে।

লোকে বলত, চীফ ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরলালের মেয়ের কাছে লাথি খেয়েই মতি ফিরেছে ছোঁড়াটার।

তা লোকের কথা একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারে নি সিংজী। কারণ সুন্দরলালের মেয়ে রুক্মিণীকে নিয়ে বেশ একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে তখন। অমন সুন্দর চেহারা সত্যিই তার আগে কোনদিন আসে নি এখানে। যেমন চোখ-মুখ, গায়ের রঙও তেমনি। সিংজীর কথায়—পরীকা মাফিক।

সেই পরীর সঙ্গেই যে কি করে আলাপ হয়েছিল বীরেনবাবুর তা জানতে পারে নি সিংজী। কিন্তু দেখত, বিকেল হলেই হরিলাটির পথ ধরে পাশাপাশি হেঁটে যেত ওরা। দূরে মহুয়া বনের পাশে গিয়ে বসত কিছুক্ষণ। তারপর আবার ফিরে আসত।

মধ্যে মধ্যে ঝরিয়ায় যেত ওরা। সিংজীই নিয়ে যেত। টাঙায় উঠে যেন হাসিতে ভেঙে পড়ত রুক্মিণী। বলত, দেখলাও তো সিংজী, কায়সা ছুটতা হ্যায় তোমারা লাট্টু।

লাট্টু তখনও জোয়ান। লাগাম আলগা করে চাবুক মারার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে শুরু করত প্রাণপণে।

আর ঠিক সেই সময়ই বীরেনবাবুকে জড়িয়ে ধরত রুক্মিণী। আনন্দে চিৎকার করে বলত, সাবাস।

টাঙা থেকে নামবার সময় হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে টাকা বের করত। বলত, এ তোমারা লাট্টুকা নাম দিয়া হ্যায় সিংজী। বকশিশ।

এ সবও দেখেছে সিংজী। তাই লোকের কথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারত না।

তখন কয়েকজন এক জায়গায় জমলেই রুক্মিণী আর বীরেনবাবুর কথা উঠত। চারপাশে যেন গুনগুন করত ওদের প্রেমকাহিনী।

সিংজী বলেছিল, মগর বীরেনবাবু কিসিকো পরোয়া নেহি করতা বাবুজী। ইস লিয়ে ও আদমিকা গোসা আউর জাদা হো গিয়া।

কারণ তখন অনেকেই রুক্মিণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এখানে। ভটচায থেকে শুরু করে এজেন্ট গুপ্ত সাহেব পর্যন্ত। সকলেরই তাড়াবার চেষ্টা বীরেনবাবুকে। বাঙালী ক্লাবে ফাটল ধরল। নতুন নাটকের রিহার্স্যাল বন্ধ। কেউ আর অভিনয় করতে চায় না। বীরেনবাবু ছুটোছুটি করে হয়রান। ঠিক এই সময়ে ঘটল ঘটনাটা। সকলেই যেন চমকে উঠল।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরলাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন এখান থেকে। কেন? সে কথা কেউ জানে না। কোথায়? তাও জানে না কেউ।

লোকে বলত, রুক্মিণী বিয়ে করতে চেয়েছিল বীরেনবাবুকে। তাই এই বিপত্তি।

যাবার সময় নাকি বীরেনবাবু দেখা করতে গেয়েছিলেন রুক্মিণীর সঙ্গে। সুন্দরলাল কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে।

সিংজী বলেছিল, এ সব হাম শুনা হ্যায় বাবুজী। সাচ্ না ঝুট এ হাম বোল্ নেহি সেকতা।

কিন্তু রুক্মিণী চলে যাবার পরেই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন বীরেনবাবু। কোথাও যেতেন না। বাঙালী ক্লাবে নতুন নাটকের রিহার্স্যাল শুরু হল। বীরেনবাবু পার্ট নিলেন না তাতে। কেন?

লোকে বলত, রুক্মিণীর নাম ভুলতে পারছে না লোকটা, তাই।

তারপরই চাকরি নিলেন চাল-গুদামে। মাথাপিছু দশ ছটাক চালের হিসাবের মধ্যে মন দিয়ে ভুলতে চাইলেন সবকিছু।

সিংজী বলেছিল, উস্ টাইমমে ও সরাব শুরু কিয়া। উসকা আগাড়ী ও কভি নেহি পিতা বাবুজী।

জন ম্যাথুস এলেন তারপরই।

এই সময় কোলিয়ারিটা হাত বদল হয়ে গেল একবার। উপর উপর হল। নীচের কেউ জানতেও পারল না। পরিবর্তনও হল না কিছু। কেবল পুরনো ম্যানেজার চলে গেলেন এখান থেকে। তার বদলে নতুন মালিকানার প্রথম ম্যানেজার জন ম্যাথুস এলেন তাঁর অ্যালসেসিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে।

এসেই নাক কুঁচকে বললেন, হাউ ডার্টি! আভি হটাও এ ধাওড়া।

ইঞ্জিনিয়ার এলেন, ওভারসিয়ার এলেন। ইট-চুন-সুরকি-বালি-সিমেন্ট-টালি এল। নতুন নতুন ধাওড়া তৈরি শুরু হল। কনট্রাকটাররা পয়সা লুটল দু হাতে।

জন ম্যাথুস ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন অ্যালসেসিয়ান সঙ্গে নিয়ে। এ দেশের লোক অবাক হয়ে দেখল। লছমন সিং আসে নি তখনও এখানে। এল তারও কিছু পরে।

এবং তারপরেই খেলা শুরু হল জন ম্যাথুসের।

লছমন!

হুজুর।

আচ্ছা সরাব লে আও।

তখনই ডাক পড়ত সিংজীর। বিলিতী মদ আনতে টাঙা চেপে ঝরিয়া ছুটত লছমন সিং।

জন ম্যাথুস তখনই একটা আতঙ্ক হয়ে গিয়েছেন এ অঞ্চলে। এমন কি লছমন সিংয়েরও বুক কাঁপত।

লছমন!

হুজুর।

নাচ আউর গানা চাহি।

তখনও ডাক পড়ত সিংজীর। কারণ সাহেব গাড়ি কেনেন নি তখনও। কিনলেন তারও কিছু পরে।

সেই সময়ই প্রথম বাস আসে এখানে। ধানবাদ থেকে ভাওড়া। ভাড়াটে ট্যাক্সিও আসে কখানা।

সিংজী বলেছিল হামরা রুটি ও মারা বাবুজী। ও বহুত জোর ছুটতা হ্যায়। আদমি পসন্দ্ করতা উসকো।

করলেও টাঙা উঠে যায় নি আজও। কারণ মালপত্তর বেশী তুলতে চায় না বাসে। ট্যাক্সিতে পয়সা লাগে বেশী। তাই উপায়ান্তর না দেখে টাঙা ডাকে লোকে।

সিংজী বলেছিল, ইস লিয়ে আয় বহুত কমতি হো গিয়া। ঘোড়াকা চানাকা দাম নেহি উঠতা হ্যায় বাবুজী।

এটা জীবন দেখেছে। অনেকদিন শুধু জল খেয়েও কাটিয়ে দিতে দেখেছে সিংজীকে। কিন্তু তখন বেশ বয়স হয়েছে তার। কষ্ট হত। চিৎকার করতে পারত না। তবু টেনে টেনে বলত, যায়গা ঝরিয়া, ঝরিয়া—

প্রায়ই জীবনের দোকানে এসে বসত। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলত, মরণ দে দেও গুরুজী। আউর নেহি সেকতা।

কেষ্টবাবু বলতেন, পারতে ওকে কে বলেছে মশাই। দিব্যি সোনার সংসার ওর। স্ত্রী-পুত্র। সেখানে যাবে না। কেন জানেন? কারণ ছেলেটি ওর নয়।

তারপর কেষ্টবাবুর মুখেই সিংজীর কথা শুনত জীবন।

পাঞ্জাব থেকে এই কোলিয়ারির দেশে কি করে এসেছিল সিংজী তা কেউ জানে না। কেন এসেছিল তাও না। কিন্তু একদিন এসে মালকাটার দলে নাম লিখিয়ে বউয়ের হাত ধরে গিয়ে উঠেছিল ধাওড়ায় একটা ঘরে। সে অনেকদিন আগের কথা।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, সিংজী আমাদের অনেক আগে এসেছে এখানে। তাই সবকিছুই আমার গল্প শোনা। দেখার সৌভাগ্য জোটে নি। লোকে বলে, সিংজী আসার কদিন পরে দুজন পাঞ্জাবী খুঁজতে এসেছিল তাকে। কিন্তু কদিন কোথায় যেন পালিয়ে রইল সিংজী। খুঁজে না পেয়ে ফিরে গেল তারা। লোকে বলে ও দেশ থেকে একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে আসে এখানে। এসে তাকেই পরিচয় দেয় বউ বলে। আসলে বিয়ে-থা ওদের হয় নি কিছুই।

না হলেও সেই ধাওড়াতেই সংসার পেতেছিল ওরা। সুখেই ছিল।

কিন্তু সে সুখে যে বিঘ্ন আসবে কোনদিন এটা বুঝে উঠতে পারে নি সিংজী। প্রতি সপ্তাহে পাল্লা বদল হত। সাতদিন দুপুর পাল্লা তো পরের সাতদিন রাত পাল্লা। সিংজী চলে যেত কাজে। বউ একা দরজা বন্ধ করে থাকত ধাওড়ায়।

খুব সুন্দর দেখতে ছিল সিংজীর বউ। এখনও দেখলে তা অনুমান করা যায় সহজে। পাঞ্জাবী মেয়ের যৌবন টলটল করছে তখন। যা দেখে মতিভ্রম হত অনেকের।

সর্দার রতনলাল তখন মধ্যে মধ্যে আসতে শুরু করেছে ধাওড়ায়। বিনা ছুতোয় অবশ্য আসত না। কিন্তু সিংজীর কেমন যেন ভয় করত তাকে। ওর কথা ও হাসির মধ্যে কিসের গন্ধ পেয়ে যেন শিউরে উঠত। বউকে বলে দিয়েছিল, উসকা সাথ বাত-চিত না করনা।

কিন্তু রতনলালকে কিছুই বলতে পারে নি সিংজী। কেন? কারণ রতনলাল সর্দার। খাদে কাজ ভাগ করে দেওয়া তার কাজ। যদি চটায় সর্দারকে তবে এমন জায়গায় কাজ দেবে, এমন সুরঙ্গে, যেখানে দাঁড়ানো যায় না মাথা উঁচু করে। কিংবা দম নিতে কষ্ট হয় যেখানে। নয়তো প্রধান সুরঙ্গ থেকে অনেক দূরে। মাল কেটে ডিব্বা বোঝাই করতে অনেক সময় লাগবে বলে পোষাবে না কিছুতেই। কারণ ডিব্বা থাকে প্রধান সুরঙ্গে। বহু দূরেই মাল কাট, সেখানে এনে ডিব্বা না বোঝাই করলে পয়সা নেই। সুতরাং সর্দারকে চটালে চলে না কোনমতে। সিংজী তাই রতনলালকে বলতে পারে নি কিছু।

রতনলাল আসত। নানা কথা বলত। হাসত হে হে করে। আর চোখটা রাখত বউয়ের দিকে। সিংজীর অসহ্য লাগত সেইটাই।

কিন্তু রতনলাল সুন্দর সুন্দর জায়গায় কাজ দিত সিংজীকে। প্রধান সুরঙ্গের পাশে পাশে, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কয়লা কাটা যায় যেখানে। এবং বেশ আয়ও করা যায় দু পয়সা।

এ সব জায়গায় কাজ নিতে গেলে সর্দারকে সেলামী

দিতে হয় মালকাটাদের। এটা নিয়ম। সিংজীই দিয়েছে অনেকবার। তাই সে জানে সবকিছু। কিন্তু রতনলাল কোনদিন এক পয়সাও চাইত না সিংজীর কাছে। সিংজীর তাই বুক কাঁপত। ভয় করত রতনলালকে। কেন? সে কথা সিংজীও ঠিক বুঝত না।

কিন্তু রতনলাল ঠিকই আসত। কোন-কোনদিন এটা-ওটা হাতে করেও নিয়ে আসত। হে হে করে হেসে বলত, দেখ্, ক্যায়সা চিজ। পসন্দ্ আয়গা তেরা বিবিকা?

তখন সিংজীকেও হাসতে হত। বলত, জরুর। এ তো বড়িয়া চিজ মালুম হোতা হ্যায় সর্দারজী।

কোনদিন পকেট থেকে টাকা বের করে বলত রতনলাল, গোস্ত্ লে আয়। দেখা যায়গা, ক্যায়সা পাকাতা হ্যায় তেরা বিবি।

কোনদিন বা মদের বোতল বগলে করে এসে হাজির হত রতনলাল। বলত, আ যা। পিকে দেখ্ ক্যায়সা চিজ। থোড়া পিয়েগা তেরা বিবি?

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, রতনলালকে একরকম প্রশ্রয়ই দিয়েছিল সিংজী। নইলে তারপরে যা ঘটল সে ঘটনা ঘটতে পারত না কিছুতেই।

কিন্তু সিংজীর তখন আর করবার ছিল না কিছুই। কারণ রতনলাল তখন দোস্ত্ হয়ে গেছে তার। উঠতে বসতে রতনলালকে ছাড়া তখন আর চলে না সিংজীর। রতনলালেরও নয়। আর তা ছাড়া রতনলালের কাছ থেকে এত উপকার পেয়েছিল যে তার পিছনে কোন কারণের অনুসন্ধান করতেই ঘৃণা হত নিজের।

রতনলালের বাড়ি ছিল মুঙ্গের। মধ্যে মধ্যে ছুটি নিয়ে বাড়ি যেত। কিন্তু সিংজীর সঙ্গে দোস্তি হবার পর থেকে তা যেন কমতে লাগল আস্তে আস্তে।

তবু সিংজী সন্দেহ করতে পারত না। কারণ বউয়ের উপর তার বিশ্বাস ছিল। যে মেয়ে সেই সুদূর পাঞ্জাব থেকে শুধু তার কথার উপর ভর করে চলে এসেছে পিছে পিছে সে মেয়ে আর যাই করুক, প্রতারণা করতে পারবে না, এ বিশ্বাস সিংজীর ছিল। ছিল বলেই সন্দেহ করতে পারত না। রতনলালের কথায় শব্দ করে হেসে উঠলেও কিছু বলতে বাধত। কারণ সিংজী জানত, বউ তাকে ভালবাসে। ও কথা বললে যে তার ভালবাসায় সন্দেহ করা হয়।

তবু রাত পাল্লার কাজে গিয়ে, খাদের নিস্তল অন্ধকারের মধ্যে বসে কেমন যেন মুচড়ে উঠত বুকটার মধ্যে। এখন যদি গিয়ে হাজির হয় রতনলাল? তবে কি বউ আদর করে ঘরে নিয়ে বসাবে তাকে? সিংজী যেন দেখত, রতনলাল এসেছে। আর বউ তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। আর রতনলাল—

কিন্তু সিংজী বিশ্বাস করতে পারত না এটা। তখন যেন দেখত, রতনলাল এসেছে। আর তার নাকের উপর দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল বউ।

সিংজী খুশী হত তখন। উঠে আবার হাত দিত কাজে। নতুন একটা শক্তি এসে যেন ভর করত তখন তার দেহে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, কিন্তু চিন্তায় ভুল ছিল সিংজীর। নইলে কদিন পরে যা দেখল সিংজী তা কোনদিন দেখবে যেন ভাবতেই পারত না।

তখন রাত পাল্লা চলছিল সিংজীর। কিন্তু হঠাৎই কাজ থেকে চলে এল একদিন। তখন রাত হয়েছে বেশ। চারপাশ স্তব্ধ। প্রায় সব ধাওড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে। সিংজী এল আস্তে আস্তে। কি একটা কৌতূহল যেন চেপে গিয়েছিল তার মধ্যে। কি একটা পরখ করার আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু ঘরের মধ্যে রতনলালকে দেখতে পাবে এটা আশা করে নি। তাই চমকে উঠল সিংজী। তারপর—

বউ দরজা খুলে বাইরে এসে যেন আঁতকে উঠল, তোম্?

রতনলালও আঁতকে উঠল। তবু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলল, আ গিয়া তু। আ যা। দেখ্ তেরা লিয়ে ক্যায়সা আচ্ছা সরাব লে আয়া।

বলেই একটা মদের বোতল তুলে ধরেছিল সিংজীর সামনে। সিংজী তখন কাঁপছিল থরথর করে। কি করবে যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। কিন্তু মাথাটা তখন দপদপ করছিল। কি যেন কিলবিল করছিল তার মধ্যে। তাই হঠাৎই ঝটকা মেরে মদের বোতলটা ফেলে

দিয়ে কলার চেপে ধরেছিল রতনলালের। বলেছিল, বোল্ কিয়া মাংতা। ঘর সে যায়গা মেরা বিবিকো?

রতনলালও তখন কাঁপছিল। বলেছিল, বিসোয়াস তো কর্, হাম কুছ নেহি কিয়া হ্যায় দোস্ত্।

দোস্ত্? থু।—বলেই একটু থুথু ছিটিয়ে দিয়েছিল রতনলালের মুখে। তারপর নাকের উপর একটা ঘুসি বসিয়ে বলেছিল, বিসোয়াস করলে বোলতা হ্যায় বদমাশ। কুত্তা কা বাচ্চা। হাম বুদ্ধু হ্যায় কিয়া?

তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাইরে এনে বলেছিল, নিকাল যা হিঁয়াসে।

রতনলাল একবার বলতে চেয়েছিল, মেরা বাত তো শোন্।

কিন্তু তার আগেই সিংজী দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ভিতর থেকে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, তার পরদিনই সিংজী কোলিয়ারির কাজ ছেড়ে দিয়ে ধাওড়া থেকে চলে এসেছিল বউকে নিয়ে। কিন্তু বউয়ের সঙ্গে নাকি একটিও কথা বলে নি তখন। তার পরেও না।

কোলিয়ারির কাজ ছেড়েই টাঙা কেনে সিংজী। কোলিয়ারি এলাকার বাইরে এসে ঘর নিয়ে বাস করতে থাকে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, সে ঘর এখনও আছে। সেই ঘরেই এখন থাকে কিরণ সিং। সিংজীর ছেলে। যদি যান তবে দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারি। যাবেন নাকি?

জীবন বলেছিল আজ থাক্।

কেষ্টবাবু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, আরে ভয় কি মশাই। গেলেই তো কেউ আর জোর করে পাঁজাকোলা করে ঝিনুক দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছে না। আপনার খুশি, আপনি খেলেন না। আমিই কি আগে খেতাম? নেহাত—

তা কেষ্টবাবুর মনে তখন অনেক জ্বালা। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুশোক ভুলতে তখন প্রচুর চেষ্টা করতে হচ্ছে তাঁকে। কিরণ সিংয়ের দোকানে নিয়মিত হাজিরা দিতে হচ্ছে। কোনক্রমে যাতে দেরি না হয় সেজন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা।

জীবন বলেছিল, আপনি যে বলেছিলেন, আসলে কিরণ সিং ছেলেই নয় সিংজীর!

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সে কথা অন্য সময় বলব। আজ চলি। দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। হয়তো শালা জল মেশাতে শুরু করেছে মালের সঙ্গে। দুনিয়াটাই পাপে পাপে ভরে গেছে মশাই। এ যেন একটা লুটের বাজার। যে যেখান থেকে পারছে হাতিয়ে নিচ্ছে।

কয়লার রং কালো। এখানকার মানুষগুলোও কালো। তারপর কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে জল আর ঘাম মাখামাখি হয়ে খাদ থেকে ওরা যখন ওপরে ওঠে, তখন আর চেনা যায় না। তেল-কুচকুচে যে লোকটা ডুলি চেপে শেষবারের মত পৃথিবীর আলোর দিকে তাকিয়ে মহাদেবের জয় দিয়ে অন্ধকারের সমুদ্রে ডুব দিল তোমার সামনে, তাকেই তুমি চিনতে পারবে না কিছুতেই।

হরিরাম বলত, মদ আমি এমনি খাই না বাবুজী। মদ না খেয়ে পারি না বলেই খাই।

হলেজ ড্রাইভার ছিল হরিরাম। মোটা লোহার তার জড়ানো বিরাট হলেজটার পাশে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকতে হত তাকে। পাশেই থাকত ঘণ্টাটা। সেই ঘণ্টা দুবার বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই লোল অর্থাৎ তার ছাড়তে হত হলেজ থেকে। হরিরাম বুঝত এবার নীচে যাচ্ছে ডিব্বা। তিনবার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই গোটাতে হত তার। ডিব্বা উপরে উঠছে এবার। চার ঘণ্টায় আস্তে। এক ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই খাড়া অর্থাৎ তখনই থামিয়ে দিতে হত হলেজের ঘোরা। এই কাজ। এ কাজে গণ্ডগোল হলেই বিপদ। মানুষের জান নিয়ে টানাটানি।

হরিরাম বলত, এই ঝুঁকি নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয় বাবুজী। সব সময় বুক কাঁপে দুরদুর করে। এক মনে কাজ করতে হয়। অন্য কিছু ভাবতেই পারি না তখন।

অবশ্য হরিরামের অন্য কিছু ভাবনাও ছিল না এখন। ঘরে ছিল বউ পাণ্ড। হরিরাম বলত, ও মুঝে বহুৎ পিয়ার করতা হ্যায় বাবুজী। হাম ভি বহুৎ পিয়ার করতা হ্যায় উস্‌কো।

তখন দুটি ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে তাদের। কিন্তু লাসপুরের মেয়ে পাণ্ডর দেহ অটুট তখনও।

হরিরাম বলত, ও বহুৎ সাচ্চা আছে বাবুজী, তবু যদি কেউ নজর দেয় ওর দিকে, তবে তার জান আমি নিয়ে নব। আর ওই যদি নজর দেয় কারও দিকে তবে ওকেও আমি আস্ত রাখব না। এ কথা আমি বলে দিয়েছি।

হরিরাম ছিল সুখী। কিন্তু পাণ্ড মধ্যে মধ্যে মদ ছাড়বার জন্য অনুনয় করত তাকে। বলত, সরাব তু ছোড়ে দে।

হরিরাম হাসত। বলত, সরাব হাম নেহি ছোড় সকতা। কভি নেহি। জব তক জিয়েগা, তব তক পিয়েগা। ও তো মেরা কামকে লিয়ে দাবাই হ্যায়।

বাইশ টাকা করে হপ্তা পেত হরিরাম। কিন্তু তার অর্ধেকের বেশী চলে যেত কিরণ সিংয়ের দোকানে। বাকি যা থাকত তা এনে তুলে দিত পাণ্ডর হাতে।

এ নিয়েও মধ্যে মধ্যে ঝগড়া বাধত পাণ্ডর সঙ্গে। পাণ্ড বলত, রুপিয়াকা জরুরত নেহি হ্যায় মেরা। রাখ্ দে তেরা পাশ।

হরিরাম বলত, বহুৎ বড়িয়া বাত হ্যায়, মগর খায়েগা কিয়া? হাবা?

পাণ্ড কথা বলত না। গুম হয়ে বসে থাকত। হরিরাম কি করবে বুঝেতে না পেরে শেষে গিয়ে জড়িয়ে ধরত পাণ্ডকে। দু হাতের উপর পাঁজাকোলা করে তুলে নাচাত। বলত, পাণ্ড—মেরা আচ্ছি পাণ্ড।

পাণ্ড তখন হাসত। বলত, মাতোয়ালা কাঁহাকা। কই দেখেগা তো? ছোড়, ছোড় দে।

হরিরাম বলত, হাম বহুৎ গরিব হ্যায় বাবুজী। মগর দিলসে গরিব নেহি।

অনেক হপ্তার শেষের দিকে রুটিও জুটত না পেট ভরে। হরিরাম বলত, কই বাত নেহি।

কিন্তু পাণ্ড কাঁদত। বলত, হাম মর্ যায়গা। গর্দানমে দড়ি লটকে মর্ যায়গা।

হরিরাম বলত, কই বাত নেহি। হামভি যায়গা তেরা সাথ।

তবু ভবিষ্যৎ বলে কথা। দুটো ছেলেমেয়ে। তাদের মানুষ করা, অসুখ-বিসুখ, খাওয়া-পরা। তারপর মানুষের জীবন। সে তো পদ্মপাতার জল। এই আছে, এই নেই। তখন?

পাণ্ড বলত, থোড়া সমঝা, বাচ্চা লেকে হাম যায়গা কাঁহা? কই ত মেরা নেহি।

হরিরাম বলত, রুপিয়াকা জরুরত হ্যায়? বোল্, কেতনা? পাঁনশো? আভি ডিউটিমে যা কর্ কাট দেতা হ্যায় মেরা হাত। মিল যায়গা রুপিয়া।

পাণ্ড বলত, মাতোয়ালা কাঁহাকা।

দামোদর এখান থেকে একটু দূরে। দূর হলেও প্রয়োজন নিকট করেছে তাকে। এ কোলিয়ারির সঙ্গে রোপ-ওয়েতে সংযোগ তার সঙ্গে। দামোদরের বালি রোপ-ওয়েতে এসে পৌঁছয় এখানে। সারি সারি ডিব্বা বালি বোঝাই হয়ে চলে আসে। এখানে ঢেলে ফিরে যায় আবার সার বেঁধে। আবার আসে।

সিংজী বলত, ঠিক এদেশকা আদমিকা মাফিক। আনেকা টাইম লে আতা হ্যায় বহুৎ কুছ, মগর যানেকা টাইম বিলকুল ফাঁকা।

মানুষেরও যেমন প্রয়োজন আছে এখানে তেমন বালিরও আছে। পিলার কেটে চলে আসবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বালি দিয়ে বোঝাই করে দিতে হয় সে সুরঙ্গ। নইলে ধ্বস নামে।

সে বালি আসে দামোদরের বুক থেকে। রোজই আসে। দিন রাত সব সময়।

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে জন ম্যাথুস অনেকদিন রোপ-ওয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। দাঁড়িয়ে ডিব্বার আসা-যাওয়া দেখতেন। কালো কালো পোস্টগুলোর উপরের চাকায় শব্দ হত তারের। চাকা ঘুরত বোঁ-বোঁ করে। জন ম্যাথুস দেখতেন। তাঁর অ্যালসেসিয়ানটাও তাকিয়ে থাকত সেদিকে।

তারপর জন ম্যাথুস ডাকতেন, লছমন?

লছমন বলত, হুজুর।

জন ম্যাথুস বলতেন, দামোদর কেতনা দূর হ্যায় হিঁয়াসে?

থোড়া হুজুর।

চলো।—বলেই হাঁটতে শুরু করতেন দামোদরের দিকে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, অমনিই গোঁ ছিল লোকটার। যা বলবে তাই করবে। নইলে পুর্ণির মত মেয়েকে অত কষ্ট করে বাংলোয় তুলতে যেত না সাহেব।

পুর্ণি তখন ওয়াগন ভর্তির কাজে লেগে গেছে। আর কালু গেছে মাল কাটতে। দুজনেই পয়সা উপায় করছে। সন্ধ্যায় পেট পুরে চোলাই খেয়ে দুজন দুজনকে জড়িয়ে পড়ে থাকছে ধাওড়ার সেই ঘরে। ওরা স্বামী-স্ত্রী।

এই সময়ই একদিন জন ম্যাথুসের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল পুর্ণির। কাজ থেকে ফিরছিল। সারা দেহে কয়লার গুঁড়ো আর ঘামে মাখামাখি হয়ে বীভৎস। তবু সাঁওতাল মেয়ের নিটোল দেহ, উদ্ধত যৌবন মুগ্ধ করল সাহেবকে।

সাহেব ডাকলেন, লছমন?

হুজুর।

ও কোন্ হ্যায়?

লছমন তখনও যেন কেঁপে গিয়েছিল একটু। বলেছিল, ও কালুকা বিবি হ্যায় হুজুর।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই একটা নোট বাড়িয়ে ধরেছিলেন লছমনের দিকে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, কিন্তু সাহেবের চিন্তায় ভুল ছিল। এই কোলিয়ারিতেও যে জাত সাপ আসে মধ্যে মধ্যে এটা তিনি জানতেন না। তাই সেদিনই রাতের বেলা প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় এসে হাজির হল লছমন সিং। সাহেবের খাস বেয়ারা।

সাহেব তখন অনেক চেষ্টা করে সবে জমিয়েছেন নেশাটাকে। কিন্তু লছমন সিংয়ের অবস্থা দেখে ছুটে গেল তা সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, ক্যা হুয়া?

লছমন সিং তখন কাঁপছে। টেনে টেনে বলল, কালু ছুরিসে মারা হুজুর।

সাহেব যেন চমকে উঠলেন। বললেন, মারা!

লছমন কেঁদে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে, জী হুজুর।

সাহেব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁতে দাঁত ঘষলেন। তারপর বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। পায়চারি করলেন এধার থেকে ওধারে। হাতের উপর হাত ঠুকলেন। একটা মদের বোতল খুলে তার অর্ধেকটা ঢেলে দিলেন গলার মধ্যে। তারপর বললেন, ঘর যাও তোম। কালু কা হাম দেখতা হ্যায়।

এ সবও অনেকদিন আগের কথা। তখনও হাজরে-বাবু হন নি কেষ্টবাবু। হলেন তারপরেই।

সিংজী বলেছিল, ও বহুত খলিফা আদমি হ্যায় বাবুজী। বলেই কেষ্টবাবুর গল্প শুরু করেছিল সিংজী।

তখনও কেষ্টবাবুর বউ মারা যান নি। দুটো ছোট ছেলে-মেয়ে। সেই সময় ঘটল ঘটনাটা।

তেমন ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে। কিছুদিন লোকের মুখে মুখে ঘুরে শেষে অন্য আর একটা ঘটনার ঢেউয়ে মুছে যায় সবকিছু।

কেষ্টবাবু আর পারুলের কথাও তখন কিছুদিন ঘুরেছিল এখানকার লোকের মুখে মুখে। আজ আর কেউ বলে না। হয়তো ভুলে গেছে।

পারুল ছিল বাউরীর মেয়ে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার শংকরণের পাচক গোপাল বাউরীর মেয়ে। মানভূমের আদি বাসিন্দা। কালো কুচকুচে রঙ। একটু স্থূল দেহ। বাপ বিয়ে দিয়েছিল দামোদরের ওপারে এক গ্রামে। কিন্তু বর পছন্দ না হওয়াতে সেখান থেকে চলে এসে বাপের সাহায্য করতে লেগে গেল মেয়েটা। আর নতুন মানুষের তল্লাশে চোখ রাখল। সাঙ্গা করে মনের মত সংসার পাতার সাধ তার।

কেষ্টবাবু তখন হাজরেবাবু হয়েছেন। গরহাজিরের হাজিরা মেরে কামাচ্ছেন বেশ দু পয়সা। বয়স খুব একটা বেশী হয় নি তখনও। সুন্দর গৌরবর্ণ চেহারা থেকে বীরভূমের কোন এক জমিদার বংশের ছাপ তখনও নির্মমভাবে মুছে যায় নি।

সেই সময়ই একদিন পারুলের সঙ্গে দেখা কেষ্টবাবুর।

সিংজী বলেছিল, মগর উসকো দেখকে কেষ্টবাবুকা মেজাজ গড়বড় হো গিয়া বাবুজী।

কেষ্টবাবু তখন রোজই দেখতে যেতেন পারুলকে। কাজ থেকে বেরিয়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের বাংলোর পাশ দিয়ে একবার ঘুরে আসা চাই তাঁর।

সিংজী বলেছিল, ও হামভি বহুত রোজ দেখা বুজী।

সেই সময় কেষ্টবাবু যেন পালটে গেলেন সম্পূর্ণভাবে। ভাঙা জামাকাপড় পরে, নিখুঁত করে গোঁফটি ছেঁটে, ড়ি কামিয়ে, চুলটি আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে থাকতেন সব য়।

ওর বউ ঠাট্টা করে বলত, বুড়ো বয়সে যৌবন দেখি রে আসছে আবার। কি ব্যাপার?

কেষ্টবাবু যেন ক্ষেপে উঠতেন। বলতেন, আমাকে মি সন্দেহ কর? বেশ, যদি নতুন করে আর একটা য়েই করি, কি করবে?

বউ বলত, মরব।

সিংজী বলেছিল, কেষ্টবাবুকা বিবিকো হাম এক রোজ খা হ্যায় বাবুজী। বহুত খুবসুরত থি, মগর বহুত লা। একটো লাঠিকা মাফিক।

তারপর পর পর দুটো সন্তানের জননী হয়ে রক্তশূন্য য়ে গিয়েছিল একেবারে। সব সময়েই শুয়ে থাকত বিছানায়। শুয়ে শুয়ে কাতরাত।

কিন্তু তখন সেদিকে নজর দেবার মত সময় ছিল না কেষ্টবাবুর। পারুলের চিন্তায় তিনি পাগল হয়ে উঠেছেন প্রায়।

কিন্তু বাউরীর মেয়ে পারুল। সাঙ্গা করবার রেওয়াজ থাকলেও অসামাজিক কেষ্টবাবুকে সে সাঙ্গা করে কি করে? পারুলেরও মন উতলা কেষ্টবাবুর জন্যে। কিন্তু বাপ গোপাল বাউরীর বিনা মতে কিছুই করতে নারাজ সে। বাপকে সে ভয় করে।

গভীর রাতে অফিসার পাড়ার পিছনের মহুয়া বনে খন ওদের দেখা হচ্ছে নিয়মিত।

পারুল বলত, বাপকে তু বল্ না কেনে।

কেষ্টবাবু বলতেন, তুই বল্।

সিংজী বলেছিল, অ্যায়সা চলা বহুত রোজ।

কিন্তু ঘরে কেষ্টবাবুর বউ তখন ক্ষেপে উঠেছে ভীষণ। গভীর রাতে যখন বাইরে বেরিয়ে যেতেন কেষ্টবাবু তখন তাঁর বউ ফুঁসে উঠত। বলত, কোথায় যাচ্ছ এত রাতে?

কেষ্টবাবুও ফুঁসে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে। বলতেন, সে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি তোমাকে?

বউ বলত, আমি তোমার বউ, আমার কাছে দেবে না তো দেবে কার কাছে?

কেষ্টবাবু বলতেন, না, আমার বাপ-ঠাকুরদা কারও কাছে কৈফিয়ত দেন নি কোনদিন।

বলেই বাইরে চলে যেতেন কেষ্টবাবু। বাংলো-পাড়ার পিছনে অন্ধকার মহুয়া বনের মধ্যে তাঁদের অভিসার হত।

সিংজী বলেছিল, উসকা বাদই গড়বড় হুয়া। ফাঁস্ হোগিয়া সব কুছ্।

পারুলের বে-আইনী সন্তান জন্মগ্রহণ করার আগেই তাকে মুক্তি দেবার জন্যে যে উপায় অবলম্বন করবার মনস্থ করেছিলেন কেষ্টবাবু গণ্ডগোল বেধেছিল তাই নিয়েই। পারুল দু হাতে মুখ ঢেকে গুমরে কেঁদে উঠেছিল।

কান্না শুনে গোপাল বাউরী ছুটে এসেছিল। বলেছিল, কে বটে?

কেষ্টবাবু ছুটে পালাতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পারুল তাকে জড়িয়ে ধরেছিল সঙ্গে সঙ্গে। বলেছিল, কোথাকে যাস? তোর পাপের কথা বাপকে বইলে যা না কেনে।

কেষ্টবাবু যেন চমকে উঠেছিলেন। পারুলের মধ্যে সেই আদিম বাউরী মেয়ের হিংস্রতা দেখে ভয় খেয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, না না, আমি কোথায়ও যাচ্ছি না। তোকে ফেলে আমি কোথায় যাব? বল্, যেতে আমি পারি?

সিংজী বলেছিল, গোপাল কুছ্ নেহি বোলা বাবুজী। শ রুপিয়াকা একটো নোট দুখা দিয়া উস্‌কো পকিটকা অন্দর। আউর মাল দে দিয়া দু বোতল।

কিন্তু কথাটা চাপা রইল না। এ-কান ও-কান হতে হতে কেষ্টবাবুর বউয়ের কানেও এসে পৌঁছল একদিন। কিন্তু বউ কিছুই বলল না।

কেষ্টবাবু তখন পারুলকে নিয়ে এসেছেন গোপাল বাউরীর কাছ থেকে। এনে কোলিয়ারি এলাকার বাইরে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে রেখেছেন।

কেষ্টবাবুর বউও অন্য দশজনের মত জানল এ কথা। একদিন গিয়ে দেখাও করে এল তার সঙ্গে।

সিংজী বলেছিল, হাম লেগিয়া উস্‌কো বাবুজী।

কিন্তু দেখা করে পারুলকে তিনি কি বলেছিলেন তা শুনতে পায় নি সিংজী। তবে খুব বেশীক্ষণ ধরে কথা বলে নি। গিয়েই ফিরে এসেছিল। সিংজীই তাকে পৌঁছে দিয়েছিল আবার।

পরদিন সকালে অন্য দশজনের মতই খবরটা শুনে অবাক হয়েছিল সিংজী। গতকাল রাতের বেলা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে কেষ্টবাবুর বউ। কেন? তা কেউ জানে না। কিন্তু সিংজী সব জানে। বুকটার মধ্যে তার মুচড়ে উঠেছিল। আগের দিনের দেখা মানুষটার জন্যে দুঃখ আর কেষ্টবাবুর উপর ঘৃণায় মনটা তার বিষিয়ে উঠেছিল।

সিংজী বলেছিল, হাজ্‌রেবাবু উস্‌কো মারা হ্যায় বাবুজী। ও খুনী হ্যা একঠো।

কিন্তু কেষ্টবাবুর পরিবর্তন এল তারপর। যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।

কেষ্টবাবু বলতেন, চিত্তে আমার সুখ নেই। বুকের মধ্যে জ্বলে যায় সব সময়। তাই সব ভোলবার জন্যেই না—

অনেক মানুষকে দেখেছে জীবন। অনেক মানুষের কথা শুনেছে। এই কোলিয়ারির মানুষ। অবাক হয়ে শুনেছে। বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছে তাদের দিকে। আজও ভুলতে পারে নি তাদের। এ বুঝি ভোলা যায় না। কি করে ভুলবে? টিকেনবাবুকেই বা ভুলবে কি করে?

টিকেনবাবু ছিলেন এই অসংখ্য লোকের ভিড়ে একমাত্র ব্যতিক্রম। তেল-গুদামে কাজ করতেন। মালকাটারা বলত, তেলঘরের বাবু। কেরোসিন তেলের উগ্র গন্ধের মধ্যে বসে রোজ আট ঘণ্টা তিন ছটাক করে তেলের হিসাব রাখতেন। স্মৃতিকণ্ঠ ছিল অ্যাসিস্টান্ট। সে একটা মগে করে মালকাটা আর লোডারদের মগবাতীতে তেল ঢেলে দিত।

স্মৃতিকণ্ঠ বলত, এ কিসকো বাতি?

যে তেল নিতে আসত, সে বলত, ওটা আমার বা[illegible]

স্মৃতিকণ্ঠ বলত, এইটো?

ওটা দয়ালের আছে।

স্মৃতিকণ্ঠ বলত, দয়ালকো আনে হোগা। [illegible] মিলেগা নেহি। কোম্পানিকা ইয়ে হ্যায় নয়া কানুন।

টিকেনবাবু বলতেন, দিয়ে দাও স্মৃতিকণ্ঠ আজ[illegible] কিন্তু আর কোনদিন আসিস না। যার বাতি তারে[illegible] এসে তেল নিয়ে যেতে হবে। বুঝলি?

বলেই মোটা হিসেবের খাতায় ঢেড়া কাটতে[illegible] দয়ালের নামে। এই ছিল কাজ। জীবনধারণের অবলম্বন।

কাজ থেকে বেরিয়েই অন্য মানুষ টিকেনবাবু। অনে[illegible] রাত পর্যন্ত ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেড়াতেন[illegible] মালকাটা, লোডার, কুলি-খালাসীদের এই পৃথিবীর[illegible] এক দেশের মজুরদের কথা বলতেন। বলতেন, তারা[illegible] সে দেশের পরিচালক। না খেয়ে কেউ মরে না সেখানে[illegible] পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া হয় যথাযথ। আর আমরা[illegible] ভাবত, কি মূল্য পাই আমাদের খাটনির? কি [illegible] আমাদের কোম্পানি?

কেষ্টবাবু বলতেন, ওই রব বড় বড় কথা ছোঁড়ার[illegible] বড় বড় কথা বলেই কুলি [illegible]সাগীদের দেবতা সে[illegible] বসেছে মশাই।

এটাও জীবন দেখেছে। সিংজী হরিরামকে টিকেন[illegible]বাবুর নাম শোনবার সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে প্রণাম কর[illegible] দেখেছে।

টিকেনবাবু প্রায়ই আসতেন। বলতেন, মানুষে[illegible] সহ্যেরও একটা সীমা আছে জীবনবাবু। দীর্ঘদিন ধরে [illegible] ক্ষোভ জমছে মানুষের মধ্যে, তা একদিন ফাটবেই[illegible] সেদিনের আর খুব দেরি নেই। আপনি আমি দে[illegible] যেতে না পারলেও সেদিন নিশ্চয়ই আসবে।

কেষ্টবাবু বলতেন, পাগল!

মেসে থাকতেন টিকেনবাবু। সেখানে ভটচাযবা[illegible] সেনবাবুরা তাঁকে ঘৃণা করতেন। কেন? কুলি-খালাসী[illegible] দলে মিশে তাদের সম্মানে আঘাত করছেন টিকেনবাবু।

টিকেনবাবু হাসতেন। বলতেন, সম্মান এতে বাড়[illegible]

ই কমছে না ভটচায। মানুষ হিসেবে তারা তোমাদের চয়ে ছোট নয় কোন অংশে।

টিকেনবাবু ঘুরে বেড়াতেন টো টো করে। যে কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বুক দিয়ে।

ম্যানেজার জন ম্যাথুস বলতেন, হু আর ইউ? আর ইউ মেম্বার অব দি ইউনিয়ন?

টিকেনবাবু বলতেন, না। আমি তোমার ও ইউনিয়নকে মানি না। যে ইউনিয়নে মজুরদের প্রতিনিধি নই, সে আবার ইউনিয়ন কিসের?

জন ম্যাথুস বলতেন, শাট্‌ আপ।

টিকেনবাবু বলতেন, আমাকে চুপ করালেও সমস্ত মজুরকে তুমি চুপ করাতে পারবে না সাহেব। তারা আজ তাদের প্রতিনিধি ইউনিয়ন চাইছে।

জন ম্যাথুস চিৎকার করে উঠতেন। বলতেন, নো। ও কভি নেহি হো সেকৃতা। ইল্লিটারেট পারসন্‌সে ইউনিয়ন বানাকে হাম জিন্দাকা পিছ্‌ নষ্ট নেহি কর সেকৃতা।

টিকেনবাবু বলতেন, পিছ্‌ তুমি এমনিও বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না সাহেব। মানুষকে পায়ের তলায় চেপে খুব বেশীদিন রাখা যায় না। সে উঠবেই একদিন। আর, সেদিনের খুব বেশী দেরি নেই।

জন ম্যাথুস চিৎকার করে উঠতেন আবার। বলতেন, ইউ ক্যান গো। আই সে, গেট আউট। লছমন?

লছমন সিং মরে নি তখনও। জন ম্যাথুসের অ্যালসেসিয়ান তখনও তার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে নি। করল তার পরেই।

কেষ্টবাবু বলতেন, ও ছাড়া অন্য আর কোন উপায়ও ছিল না সাহেবের। লছমন সিংয়ের দিকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না তাকে ঠেকাবার। নইলে সেইদিনই ম্যাথুসের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিত লছমন সিং।

বিলাসপুরী ছ ফুট কুস্তি-করা বলিষ্ঠ দেহের লছমন সিং যখন প্রথম এল এখানে, তখন অনেকেই ভয় পেত তাকে দেখে। এক হাতে বিস্কুট, অন্য হাতে তামাকের টিন নিয়ে রোজ বিকেলে যখন সাহেবের পিছনে পিছনে বেড়াতে বেরুত তখন অনেকেই তাকিয়ে থাকত তার দিকে।

কেষ্টবাবু বলতেন, বেরুল জানোয়ার দুটো।

জানোয়ারের মতই ছিল লছমন সিং। সাহেবের হুকুম তামিল করতে জানোয়ারের মতই পরের ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কারণ নিজের ঘর ভাঙার ভয় ছিল তার মনে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, কিন্তু পরের ঘর ভাঙতে গেলে নিজের ঘরই যে আগে ভাঙে মশাই। লছমনেরও তাই হল।

বউটা এক কথায় সুন্দরী ছিল লছমনের। তার আশংকাও ছিল সেই জন্যে। সাহেবের নজরে পড়ে যাবার ভয়। সব সময় বউকে চোখে চোখে রাখত লছমন। বলত, মৎ যাও সাহেবকা সামনে।

বউয়ের কিন্তু কৌতূহল বাড়ত দিন দিন। বলত, কিঁউ? ও শের হ্যায়, না ভালু?

লছমন বলত, উসিসে বড়িয়া জানোয়ার। ও একটো বদমাশ হ্যায়।

বউ হাসত। বলত, তোম্‌ ডর্‌তা হ্যায় উসকো?

লছমন বলত, জরুর। ডর্‌না পড়্‌তা হ্যায় তেরা লিয়ে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, কিন্তু যে ভয় করেছিল লছমন, তাই ঘটল একদিন। সাহেবের নজরে পড়ে গেল লছমনের বউ।

সেদিনও বেড়াতে বেরিয়েছিলেন জন ম্যাথুস। সঙ্গে ছিল অ্যালসেসিয়ান। লছমন সিং ছিল পিছনে। কি জন্যে যেন বাইরে এসেছিল লছমনের বউ। হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল সাহেবের সঙ্গে।

সেদিনও জন ম্যাথুস ডেকেছিলেন, লছমন?

হুজুর।

ও কোন্‌ হ্যায়?

লছমন সিংয়ের বুকটা সেদিনও কেঁপে উঠেছিল। গলাটা গিয়েছিল শুকিয়ে। তবু একটা ঢোক গিলে বলেছিল, ও মেরা বিবি হ্যায় হুজুর।

টাকা বের করবার জন্যে ম্যাথুস হাত ঢুকিয়েছিলেন পকেটে। উত্তর শুনে হাতটা টেনে নিয়েছিলেন আবার। বলেছিলেন, আই সি।

তারপর নির্বাক কিছুক্ষণ। তার পরে আবার ডেকেছিলেন ম্যাথুস, লছমন?

হুজুর।

আগে বাড়ো।

ম্যাথুস দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আর লছমন সিং বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে মাথার উপর একটা বিস্কুট রেখে চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিল।

তা দেখে সেদিনও হেসেছিলেন জন ম্যাথুস। তারপর বলেছিলেন, টম, ব্রিং আউট।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, সেদিন ঘরে গিয়ে বউকে কিন্তু কিছুই বলল না লছমন।

তবু লছমনের ভয়-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে বউ কয়েকবার প্রশ্ন করেছিল, ক্যা হয়া। বলিয়ে না, হুয়া কিয়া?

লছমন অনেকক্ষণ বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কি যেন দেখেছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল বুকের মধ্যে। বলেছিল, বচন দে, তু মুঝে ছোড়কে কভি নেহি যায়গা।

বউয়ের চোখ দুটো বুজে এসেছিল তখন। বলেছিল, নেহি, কভি নেহি যায়গা।

সাচ্?

সাচ্।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, তবু কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল তা বুঝতে পারল না লছমন।

সাহেব-বাংলোর পিছনে সারভেণ্ট কোয়ার্টারে থাকত লছমনরা। বাংলো থেকে স্পষ্ট দেখা যেত ঘর। সাহেব লনে পায়চারি করতেন আর মধ্যে মধ্যে তাকাতেন এদিকে। তাই দেখে বুক কাঁপত লছমনের। সাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলেই সাহেব ডাকতেন, ইধার আও।

লছমন ছুটে যেত সঙ্গে সঙ্গে। বলত, হুজুর।

সাহেব বলতেন, স্বরূপ সিংকো লে আও।

ইউনিয়ন অফিসে ছুটত লছমন। সত্যিই ছুটত। তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্তে ছোটা যায় যত জোরে। বুক কাঁপত। যদি এর মধ্যে বউয়ের কাছে গিয়ে হাজির হয় সাহেব!

ফিরে এসে হাঁপাত। সাহেব বলতেন, এতনা জলদি চলা আয়া? গিয়া ত উসকা পাশ?

লছমন বলত, গিয়া হুজুর। ও আভি আতা হ্যায়।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, লছমন যেন ক্ষেপে গিয়েছিল মশাই। দিন রাত সব সময় সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। সাহেব যে শিকার দেখিয়ে দেবেন, ও জান কবুল করে সেই শিকার ধরে এনে দিত সাহেবের কাছে। কেন? সাহেব তুষ্ট থাকলেই তার শান্তি। ওর ঘরের দিকে নজর দেবে না আর।

কিন্তু এত করেও ঘর ঠিক রাখতে পারল না লছমন সিং।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, বানের জল কি বেড়া দিয়ে আটকে রাখা যায় মশাই, বেড়া ছাপিয়ে চলে যায়।

সেদিন রাতের বেলা ডেকেছিলেন জন ম্যাথুস, লছমন?

লছমন ছুটে গিয়ে বলেছিল, হুজুর।

ম্যাথুস বলেছিলেন, আচ্ছা শরাব লে আও ঝরিয়াসে।

বলেই একগোছা টাকা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন লছমনের দিকে। লছমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর কাঁপা-হাতে টাকাকটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাস চেপে ঝরিয়া। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে ফিরতে খুব একটা দেরি হয় নি লছমনের। ফিরে দেখল, বাংলোটা অন্ধকার হয়ে গেছে এর মধ্যে। দরজায় কান পাতল লছমন। মনে হল, একটা মেয়ে যেন কথা বলছে ফিসফিস করে। গলাটা চিনতে পেরে যেন চমকে উঠল লছমন। ডাকল, হুজুর?

ভিতর থেকে জন ম্যাথুস বললেন, কোন্?

লছমন বলল, হুজুর—

সাহেব বললেন, চলা আয়া?

ভিতরে যেন একটা হুটোপাটি পড়ে গেল সেই সময়। লছমন বুঝল, কে যেন ছুটে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

জীবন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঘরের মধ্যে কে ছিল কেষ্টবাবু?

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, লছমনের বউ।

জীবন আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, ও কি করে গেল সাহেবের বাংলোতে? গেলই বা কেন?

কেষ্টবাবু একটু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, টাকা মশাই—টাকা। টাকায় কাঠের পুতুল পর্যন্ত কথা বলে, আর ভারি তো লছমনের বউ!

কিন্তু লছমন সিং পাল্টে গেল আস্তে আস্তে। সব সময় মন কি ভাবত। যার জন্যে রোগা হয়ে গেল অনেকটা। সেই ছ ফুট বিলাসপুরী দেহটায় উজ্জ্বলতা বলতে রইল না কিছু। কেমন যেন রুক্ষ বিবর্ণ।

মধ্যে মধ্যে জীবনের দোকানে আসত লছমন। জীবন প্রশ্ন করত, তোমার এমন চেহারা হচ্ছে কেন লছমন ভাই?

লছমন যেন অতি কষ্ট করে একটু হাসত। বলত, এমনি।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, এমনি কারও শরীর খারাপ হয় না মশাই। ওর মনে তখন ওই রোগ ঢুকেছে। সব সময় একটা আশংকা এখনই হয়তো সাহেবের বাংলোতে চলে যাবে বউ। রাতে ঘুম আসত না। চোখ বুজে কান খাড়া করে মড়ার মত পড়ে থাকত। হাতেনাতে ধরতে না পারলে সে ফয়সালা করতে পারছিল না কিছুই। শেষে একদিন সে সত্যি সত্যিই ধরল। কিন্তু তার মৃত্যুও হল সেই জন্যে।

সেদিন সারা আকাশটা ছেয়ে গিয়েছিল মেঘে মেঘে। সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল টিপ টিপ করে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আর গুড়গুড় করছিল আকাশটা।

জন ম্যাথুস সন্ধ্যাতেই ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন লছমনকে। কিন্তু একটু পরেই ডেকেছিলেন আবার। বলেছিলেন, শরাব লে আও ঝরিয়াসে।

লছমন দাঁড়িয়ে মাথা চুলকেছিল একটু। তারপর বেরিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ঝরিয়ায় যায় নি লছমন। ও আগেই ঝরিয়া থেকে মদ কিনে জীবনের দোকানে রেখে দিয়েছিল। ছুটে গিয়ে সেই মদ নিয়ে ফিরে এসে কিন্তু চমকে গিয়েছিল। লছমন দেখেছিল তার বউটা ঢুকে গেল বাংলোর মধ্যে। সারা দেহটা যেন একবার কেঁপে উঠেছিল লছমনের। প্রতি শিরা থেকে উপশিরায় রক্তের চলাচল যেন দ্রুত হয়ে উঠেছিল। খুন—খুন চেপে গিয়েছিল লছমনের মাথায়।

পাঁচিল টপকে বাংলোর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল লছমন। তারপর ছুটে গিয়ে গলাটা টিপে ধরেছিল সাহেবের। বলেছিল, বদমাশ, কুত্তা কা বাচ্চা, আজ জানসে মার ডালুঙ্গা।

জন ম্যাথুসও গায়ে শক্তি রাখতেন বেশ। তিনি এক ঝটকায় মুক্ত করে নিয়েছিলেন নিজেকে। তারপর চিৎকার করে ডেকেছিলেন, টম্, টম্—

আর সঙ্গে সঙ্গে জন ম্যাথুসের সেই অ্যালসেসিয়ান এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লছমেনের ওপরে। তাই দেখে দু হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়েছিল লছমনের বউ। লছমন কিন্তু পালাতে পারে নি। কুকুরটা লাফ দিয়ে গলাটা কামড়ে ধরেছিল তার।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, পরজন্ম বলে কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না মশাই। যা কিছু কর্মফল এ জন্মেই ভোগ করতে হয়। ওকে যদি কুকুরে না খেত, তবে ধর্ম বলে কিছু থাকত দুনিয়ায়!

জগৎটা পরিবর্তনশীল। আগামীকাল আজকের মত হবে না কিছুতেই। গতকালের সঙ্গেও আজকের মিল নেই পুরোপুরি। আজ যে মানুষকে দেখছি, কাল সেই মানুষই হয়তো অন্য মানুষ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ অন্য।

সিংজী বলেছিল, বীরেনবাবু বিলকুল বদল গিয়া বাবুজী।

চাল-গুদামে চাকরি নেবার পর বীরেনবাবুর পরিবর্তন এসেছিল। এতদিনে নিজের কাজের জন্যে অনুশোচনা করতেন। বলতেন, সোনার পাথরবাটির মত এতদিন ছিলাম সিংজী। কয়লাকুঠিতে থেকেও তার মানুষ হতে পারি নি এতদিন।

তাই বীরেনবাবু পুরোপুরি কয়লাকুঠির মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তারপর। এ দেশের অগুনতি চরিত্রের মতই একটা চরিত্র।

রেশনের মাথাপিছু দশ ছটাক চালে পেট ভরে না

মালকাটাদের। কি করে ভরবে? সকালে পেট পুরে খেয়ে কতকগুলো মাটি আর পাথরের স্তর ভেদ করে গিয়ে কয়লার বুকে গাঁইতা চালানোর সঙ্গে সঙ্গেই সব জল। খাদ থেকে উঠেই মাথা ঘোরে। খিদেতে দলা পাকিয়ে যায় পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো। তখন ধাওড়ায় ফিরে যদি পেট পুরে খেতে না পায় তো পৃথিবী অন্ধকার।

কিন্তু দশ ছটাক চালে সেই পেট ভরে না তাদের। তাই সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয় চোরাবাজারে। সেখানে তখন চাল অগ্নিমূল্য, কিন্তু না খেয়ে তো মরতে পারে না মানুষ।

বীরেনবাবু তখন চাল-গুদামের বাবু। বস্তার পর বস্তা চালের বণ্টন-অধিকর্তা। সুতরাং তাঁর সম্মান এবং প্রতিপত্তিও অনেক।

সকাল থেকেই লোক এসে দাঁড়িয়ে থাকত লাইন দিয়ে। মেয়ে আর পুরুষের ছোটখাট একটা ভিড় লেগেই থাকত সব সময়। বীরেনবাবু হাসতেন। বলতেন, তোদের কি সব সময়ই খিদে লেগে থাকে নাকি রে?

মেয়েরা হাসাহাসি করত। বলত, বাবুটো কথা বলে বড় মিঠা। কিন্তু চাল বেশী দেয় না হুটো। বড় কড়া সিয়ানে।

বীরেনবাবুও হাসতেন। বলতেন, চাল নিবি? তা সন্ধ্যার দিকে এলেই পারিস।

মেয়েরা হাসিতে লুটিয়ে পড়ত এ ওর গায়ে। ফিস-ফিস করে বলত, বাবুটো বড় চালাক বটে।

তা বীরেনবাবু তখন পুরোপুরি কয়লাকুঠির চরিত্র হয়ে গেছেন। সন্ধ্যাতেই কিষণ সিংয়ের চোলাই গিলছেন পেট পুরে, আর—

চাল তখন অগ্নিমূল্য। তাও মেলে না। কালো বাজার থেকে লুকিয়ে কিনে আনতে হয়। তার উপর পুলিসের ভয়। ধরলে সে অনেক ঝামেলা।

কিন্তু বীরেনবাবু তখন উদার। পুরুষ নয়, মেয়েদের তিনি চাল বিলোচ্ছেন দু হাতে। নিয়ে যাও বাড়িতে। খাও গিয়ে পেট পুরে। কিন্তু তারপর যেন মনে পড়ে আমার কথা।

সিংজী বলেছিল, ইজ্জতকা কুছ দাম নেহি থি উস টাইম। খানেসে লিয়েই পাগল হোগিয়া সব।

আড়াই সের চালের বিনিময়ে সবকিছু দিতে তারা পারে। কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তি। কিন্তু চালটা যে অনেকক্ষণ পেটে থেকে শান্তি দেয়। স্বামী-পুত্র বাঁচে। মা-বাবা বাঁচে। সবচেয়ে নিজেও যে বাঁচা যায়।

ঠিক সেই সময়েই একদিন টুলু এল বীরেনবাবুর কাছে।

সাঁওতাল মেয়ে টুলু। দামোদরের ওপারে ঘর। বোন থাকে এখানে। তার কাছেই এসেছে। ভগ্নীপতি পঙ্গু। কয়লা কাটতে গিয়ে বিরাট একটা চাঙড় পড়েছিল পায়ের উপর। পাটা তাই কেটে ফেলতে হয়েছে তার। বোন কয়লা তোলে গাড়িতে। তার আয়ের উপরেই সংসার। একটা বাচ্চা আছে। আর একজন আসবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সাত মাস গেলেই তাকে বসিয়ে দেবে কোম্পানি। এটা আইন। কারণ সে অবস্থায় এখানকার কাজ করা কষ্টসাধ্য। বিপদও আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তাই এ নিয়ম। সামান্য কিছু টাকা তখন পাবে অবশ্য। বাচ্চা হয়ে যাবার পরেও কিছু। কিন্তু তাতে এই দুর্মূল্যের বাজারে চলবে কি করে? তাই দিদিকে সে নিয়ে যাবে এখান থেকে দেশে। এখন দিদির ছুটির অপেক্ষা। কোম্পানি ছুটি না দিলে যাবার উপায় নেই। কিন্তু এখনও থাকতে হবে যে কদিন সে কদিন খাবে কি? চাল পাওয়া যায় না কোথায়ও। যা পাওয়া যায়, দিদির অল্প আয়ে তা কেনা যায় না। ধাওড়ার মেয়েদের কাছে শুনেছে, সন্ধ্যায় নাকি চাল দেওয়া হয় এখানে। তাই সে এসেছে।

সিংজী বলেছিল, উসকো বাত শুনকর বীরেনবাবু বুড়বক্ বন গিয়া বাবুজী।

শুধু কথা শুনেই নয় টুলুকে দেখেও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বীরেনবাবু। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। নিকষ কালো গায়ের রঙ। আয়ত চোখ দুটোতে শিশুর মত সরলতা।

টুলু বলল, চাল মিলবেক নাই বাবু?

অফিস তখন ফাঁকা। সহকর্মী দুজন চলে গেছেন

ছু আগে। চাল ওজন করে দেয় রামুয়া, সেও আর ই এখন। কেবল বীরেনবাবু বসে স্টকটা মেলাচ্ছেন ক করতে—যে কোন সময় এসে হাজির হতে পারেন পরওয়ালা। তাই আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন জন্তে।

টুলুর কথা শুনে বীরেনবাবু একটু হাসলেন। বললেন, লবে না কেন রে? কিন্তু চাল নিতে গেলে যে দাম তে হয়, সে কথা শুনিস নি?

টুলু যেন একটু হকচকিয়ে গেল। বলল, দাম? ইসা তো লাই বাবু?

বীরেনবাবু আবার হাসলেন। বললেন, আয় দিকে।

টুলু এগিয়ে এল। এসে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল রেনবাবুর। বলল, চাল মোরে দিবি লাই বাবু?

বীরেনবাবু এক হাতে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরলেন। লেন, তোর ভয় করছে না?

টুলু যেন একটু অবাক হল। বলল, কেনে? ভয় করবে কেনে বাবু?

বীরেনবাবু আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। বললেন, তোকে যদি আর যেতে না দিই?

কথা শুনে টুলু হেসে উঠল শব্দ করে। যাইতে দিস লাই বাবু। যাইবার মোর সাধ লাই।

এসবও অনেকদিন আগের কথা। তখনও মুংগরা মাঝির পা কাটা পড়ে নি হলেজের তার ঠেঁড়া ডিব্বার নীচে পড়ে। তাই নিয়ে ম্যানেজার জন ম্যাথুসের সঙ্গে মন-কষাকষিও হয় নি তখনও টিকেনবাবুর। গণেশ মাহাতো মুংগরার বউ ভুনিকে নিয়ে তখনও ঘর বাঁধে নি। তখন কেবল ঝগড়া শুরু হয়েছে ওদের মধ্যে—গণেশ আর মুংগরার মধ্যে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, এ ঝগড়া ওদের অনেকদিনের মশাই। ওদের পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই চলে আসছে। ওদের আদিপুরুষ ছিল এক মায়ের পেটের দুই ভাই। নাম ছিল সুগরাই আর মুগরাই। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে মিল ছিল না মোটেই। কেউ মুখ দেখতে পারত না কারও। ফলে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তাদের বংশধররা আজও ছাড়াছাড়ি হয়ে আছে। সুগরাইয়ের বংশধররা হয়েছে মাঝি। আর মুগরাইয়ের বংশধররা হয়েছে মাহাতো। হলে কি হবে, মিল আর হল না। খাওয়াদাওয়া, বিয়েশাদি বন্ধই হয়ে আছে এখনও।

কিন্তু কি করে যে ওদের দু বংশের দুটো ছেলের সঙ্গে এমন হৃদ্যতা হয়েছিল সে কথা কেউ জানে না। তবে মুংগরা মাঝি গণেশ মাহাতোকে ছাড়া চলতে পারত না এক পা। গণেশ মাহাতোরও সেই একই অবস্থা।

এক বাধ্‌নী পরবের দিনে ওদের দেখা হয়েছিল প্রথম। দোস্তিও হয় সেইদিন।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, বাধ্‌নী পরব আসলে মন দেওয়া-নেওয়ারই পরব মশাই। মনের মানুষ যোগাড় করবার পরব। শীতের শুরুতেই একটা মোষকে বেঁধে প্রচুর ধোঁয়া দিয়ে আর ঢাকঢোল বাজিয়ে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয় তাকে। তারপর সেই মোষটা একসময় দড়ি ছিঁড়ে ছোটে বনের দিকে। ছেলেমেয়ের দলও ছোটে তার পিছনে পিছনে। তারপর বনের মধ্যে গিয়ে যে যাকে পারে নিয়ে হারিয়ে যায়।

তা মুংগরা মাঝি সেই বাধ্‌নী পরবের দিনই গণেশ মাহাতোকে নিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। তখনও ছিল ওরা ছেলেমানুষ। তাই কোন মেয়েই কাছ ঘেঁষে নি ওদের। গণেশও খুশী হয়েছিল মুংগরাকে পেয়ে। বলেছিল, পরবের দিন দোস্তি হল মোদের। এ টুটবেক লাই কোনদিন। কি বলিস?

মুংগরা হেসেছিল। বলেছিল, লা, টুটবে কেনে?

কিন্তু সেই দোস্তিতেই চিড় ধরে গেল একদিন।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, মেয়েমানুষ বড় ভীষণ চিজ মশাই। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত গণ্ডগোল বেধেছে, তার সবগুলোরই মূলে রয়েছে ওই বস্তু।

সেই মেয়েমানুষ নিয়েই মুংগরা আর গণেশের মন-কষাকষি শুরু হল।

এক বাধ্‌নী পরবের দিন দেখা গেল, গাঁয়ের মোড়লের মেয়ে ভুনিকে ওরা দুজনেই ভালবাসে। শাল-বনের মধ্যে ভুনিকে নিয়ে হারিয়ে যেতে মুংগরা দেখল গণেশ ঠিক তার পিছনে।

মুংগরা বলল, তুই।

ভুনি হাসল। বলল, লে, আমারে টুকরা কইরা লে তুরা। কিন্তু মারামারি করিস্ নাই বাপু।

ওরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। শালবনে হাওয়া বইল সিরসির করে। অসংখ্য পাখি ডেকে গেল আশেপাশে। সূর্যটা অস্ত যাবারও সময় হয়ে এল। এবার ফেরবার পালা।

মুংগরা বলল, ভুনিকে তু শাদি কর্।

গণেশ বলল, না, তু কর্। শাদি আমি করব নাই কোনদিন।

মুংগরা বলল, আমিও করব নাই।

ভুনি আবার হাসল। বলল, আমি যাব কোথা?

সেও এক সমস্যা বটে। লক্ষণ মাঝির মেয়ে ভুনি এখন যাবে কোথায়? অথচ বিয়ে প্রায় মনে মনে ঠিক হয়ে আছে মুংগরার সঙ্গে। কারণ সেও মাঝি। তাই গণ্ডগোল নেই। কিন্তু গণেশ মাহাতো। গণেশও যে ভালবাসে তাকে।

গণেশ বলল, শাদি তুকেই করবার লাগবে রে মুংগরা। মাঝির বেটি তো মোরে দিবেক নাই।

মুংগরা বলল, তুই মনে দুঃখ পাবি, এ হবেক নাই রে গণেশ।

গণেশ হাসল।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, হলও তাই। একদিন সত্যি সত্যিই মুংগরা মাঝির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ভুনির। গণেশ মাহাতো প্রচুর হাড়িয়া খেয়ে নয়ানজুলির মধ্যে পড়ে ছিল সেদিন।

বিয়ে মিটে গেলে ওদের দেখা হল একদিন।

গণেশ বলল, আমি কয়লা কাটিতে চলে যাব।

মুংগরা বলল, আমিও যাব।

গণেশ বলল, ভুনি?

মুংগরা বলল, ভুনিকে লিয়ে যাব।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, তারপর একদিন ওরা এসে হাজির হল এখানে। একই ধাওড়ায় ভুনিকে নিয়ে ওরা গিয়ে উঠল।

উঠল বটে, কিন্তু শান্তি এল না।

মুংগরা বলে, ভুনির সঙ্গে তুই কথা বলিস নাই কেনে?

গণেশ বলে, ও তোর বউ বটে।

এবং সেইজন্যে সব সময় দূরে দূরে থাকে গণেশ। ভুনিকে অসহ্য লাগে। মুংগরাকেও। ওরা যখনই কথা বলে, হাসে, তখনই সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, গণেশটা তখন দিনরাত চোলাই গিলত। কোন কোনদিন পড়ে থাকত রাস্তার ড্রেনের মধ্যে।

মুংগরা এসে ওকে খুঁজে নিয়ে যেত। বলত, এত খাস কেনে?

গণেশ বলত, বুকটা বড় জ্বলে।

শুনে ভুনি কাঁদত মধ্যে মধ্যে। বলত, আমি মরি না কেনে? লোকের মনে জ্বালা দিয়ে আমারও বেঁইচে লাভ? আমি তোদের শত্রু। তোরা মাইরা ফ্যাল আমারে। নয়তো চোলাই গেলা ছাড়্।

গণেশ বলত, তুই এখনও আমারে ভালবাসিস্ ভুনি?

মুংগরা বলত, ঘুম দে একটু। সব সাইরা যাবেক।

কিন্তু ঘুম দিলেও সে জ্বালা কমত না গণেশের।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, গণেশটা কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। খাদে নেমে ঝুড়ি ঝুড়ি কয়লা কাটত। কি একটা নেশায় যেন কেটে যেত ওই ভাবে।

মুংগরা বলত, এত খাটিলে মরবি গণেশ।

গণেশ বলত, মরি মরব। আমার কেউ কাঁদবার নাই।

মুংগরা বলত, এবার এট্টা শাদি কর্।

গণেশ বলত, না। এটা হবেক নাই।

মুংগরা আর কিছু বলত না। গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ভয় পেয়ে যেত।

গণেশ টাকা নিয়ে এসে ভুনির হাতে দিত। ভুনির চোখ দুটো ছলছল করত। বলত, এবার শাদি কর্ গণেশ।

গণেশ বলত, পারব নাই। তোকে ভুলতে পারব নাই ভুনি।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, শত হলেও মেয়েমানুষের প্রাণ। গণেশের জন্যে ভুনির তাই দুঃখ হত।

কিন্তু মুংগরা সেটা সহ্য করতে পারল না। বলল, আমার বউ। তা ভুলিস নাই।

ভুনি বলত, ভুলব নাই। কিন্তু গণেশ মোরে লবাসত।

মুংগরা বলত, তুই তো ভালবাসিস না তাকে। তবে ন করিস কেনে?

মদ খেয়ে কোন কোনদিন ভুনিকে এসে জড়িয়ে ধরত শ। বলত, তোকে ছাড়া আমি বাঁচব না ভুনি। ফেইলে দিস না আমাকে।

মুংগরা এসে ভুনিকে মুক্ত করত। বলত, ইটা কি ? ও কাজটা করা ঠিক নয় তোর গণেশ। ওতে াকে দশ কথা বলবেক। হাসবেক।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, কিন্তু তারপর হঠাৎই যেন অন্য ানুষ হয়ে গেল গণেশ। আর সেটাই সহ্য করতে রল না মুংগরা।

ওরা একসঙ্গেই কাজে যেত তুজন। ফিরতও কসঙ্গে। ভুনির সঙ্গে গণেশকে মেশবার সুযোগ দিত মুংগরা। কিন্তু তবু ওর বুক কাঁপত। মনে হত, ওরা মনে মনে এগিয়ে গেছে অনেকদূর। মুংগরাকে খন আর আগের মত ভালবাসে না ভুনি। বরং অনেক বশি ভালবাসে গণেশকে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, এই সময়েই একদিন হাতাহাতি য়ে গেল মুংগরার সঙ্গে গণেশের।

সেদিন ছিল ছাতা পরব। বিরাট একটা তালপাতার াতা পুঁতে গানবাজনা করে বর্ষার আগমন কামনা করেছিল। তিনজনেই সেদিন পেট পুরে হাড়িয়া খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ল।

গণেশ ভুনিকে একসময় জড়িয়ে ধরতে গেলেই তাকে ঠেলে ফেলে দিল মুংগরা। বলল, খবরদার।

গণেশ সঙ্গে সঙ্গে টেনে একটা চড় বসিয়ে দিল মুংগরার গালে। বলল, ভুনি আমার। আমি ওকে ভালবাসি। ও আমাকে ভালবাসে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভুনির গালে একটা চড় বসিয়ে দিল মুংগরা। আর গণেশও চিৎকার করে উঠল ঠিক সেই সময়। বলল, খবরদার, ও এখন আমার বটে।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, মানুষের অবস্থা কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না মশাই। পরদিনই হলেজের তার ছেঁড়া ডিব্বার নীচে পড়ে পাটা কাটা গেল মুংগরার।

অনেক মানুষকে জীবন দেখেছে। হাসতেও দেখেছে অনেককে, আবার কাঁদতেও দেখেছে। মুংগরা মাঝির পা কাটা যাবার পর কাঁদতে কাঁদতে তাকে এখান থেকে চলে যেতে দেখেছে জীবন। কারণ ভুনি তখন গণেশ মাহাতোকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। একদিনের বে-আইনী সম্পর্কটাকে সাঙ্গা করে আইনসিদ্ধ করেছে। মুংগরার দিকে তাকায় নি। তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করে নি।

বগলে ক্র্যাচ দিয়ে মুংগরা ঘুরে বেড়িয়েছে দোরে দোরে। ইউনিয়ন অফিসে। জন ম্যাথুসের কাছে। কি? না ক্ষতিপূরণ চাই।

জন ম্যাথুস কথা বলেন নি। ইউনিয়নও সাড়া দেয় নি সে কথায়। টিকেনবাবু শুধু চিৎকার করেছেন। বলেছেন, এটা কি? মজুরদের জীবনের নিরাপত্তা নেই? তার বিপদ হলে কোম্পানি তাকে দেখবে না?

ভটচাযবাবু, সেনবাবুরা নাক কুঁচকেছেন। বলেছেন, ননসেন্স।

সেই ভটচাযবাবু সেনবাবুদেরও ভোলে নি জীবন।

ভটচাযবাবু ছিলেন পে-ক্লার্ক আর সেনবাবু কাজ করতেন লেবার অফিসে। কিন্তু জাত বাঁচিয়ে চলতেন সব সময়। বলতেন, ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে ছোটলোক হতে পারব না মশাই।

কিন্তু বড়লোক অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের সঙ্গেও মিশতে পারতেন না তাঁরা। কেন? তাঁরাই আমল দিতেন না। অর্থাৎ না ঘরকা না ঘাটকা ছিলেন ভটচায আর সেন।

তবে সবকিছু ভোগ করার সাধ ছিল। ওই রাতের অন্ধকারে গা আড়াল দিয়ে মদ গিলতেন। গভীর রাতে ধাওড়ায় ধাওড়ায় সন্ধান করতেন আরও কিছুর।

মুখে বলতেন, ভদ্রলোক এখানে থাকতে পারে না মশাই। চারপাশে দেখে দেখে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

কিন্তু দম তাঁদের বন্ধ হত না কখনও। ধাওড়ার

মেয়েদের কাছে তাড়া খেয়ে একবারও তাঁদের মরবার সাধ হত না। আজমগড়ের মালকাটাদের কাছে একবার বেদম মার খেয়েও ভদ্রলোকের মুখোশ খুলে পড়ে নি তাঁদের।

সিংজী বলত, এহি হ্যায় কোলিয়ারি বাবুজী। এ দেশকা চালত এইসি হ্যায়।

তা সিংজীর বয়স তখন বাড়ছে ক্রমশঃ। তার লাটুরও বয়স হয়েছে অনেক। সে তখন আর ছুটতে পারছে না মোটেই। আর সেই অথর্ব ঘোড়াটিকে নিয়ে সিংজীর কি অসহ্য যন্ত্রণা। ছেড়ে দিতেও মায়া লাগে। রাখলেও খাওয়াবে কি?

কেষ্টবাবু বলতেন, খাওয়ানোর ওর অভাব কি মশাই! কিরণ সিংয়ের কাছে গিয়ে একবার যদি দাঁড়ায় সিংজী, তবে আর চিন্তা করতে হবে না তাকে।

কিন্তু কি করে দাঁড়াবে? কিরণ সিংয়ের দিকে যে তাকাতেই পারে না সিংজী। কেন? কারণ রতনলালকে দেখতে পায়।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, রতনলালকে তাড়িয়ে খনির কাজ ছেড়েও কিন্তু শান্তি পায় নি সিংজী। সারাদিন টাঙা চালাত। রাতে বাসায় ফিরেও কিন্তু কথা বলত না বউয়ের সঙ্গে। কেমন যেন ঘৃণা হত।

সেই ঘৃণাটা আরও বেশী হল তারপর। বউ অন্তঃসত্ত্বা ছিল এতদিন। এবার ছেলে হল একটা। সিংজী খুশী হয়েছিল প্রথমটা। কিন্তু আঁতকেও উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। ছেলেকে দেখতে গিয়ে রতনলালের মুখটা মনে পড়েছিল তার মধ্যে।

কিন্তু বাচ্চার মুখ কোন আকৃতিই নেয় না প্রথমে। যখন আকৃতি নিতে লাগল আস্তে আস্তে তখন যেন পাগলের মত হয়ে গেল সিংজী। রতনলালের মুখখানাই যেন স্পষ্ট কিরণ সিংয়ের মুখের মধ্যে।

বউও চমকে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে কিছুই বলে নি সিংজী। বাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল কেবল। ওর যেন কেমন ভয় হত। মনে হত, রতনলাল যেন বিদ্রূপ করছে ওকে। তাই ছেলের মুখের দিকে তাকাত না কখনও। আজও তাকায় না। বাসায় যেত না সেই থেকেই। আজও যায় না।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, কোন্ মুখে যাবে বলুন? যাওয়া কি সম্ভব!

অবশ্য এদেশে অসম্ভবও সম্ভব হয় অনেক। নইলে পূর্ণিকে বাংলোতে নিয়ে তুলতে পারতেন না জন ম্যাথুস।

পূর্ণিকে প্রথম দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন সাহেব। লছমন সিংকে পাঠিয়েছিলেন একটা নোট হাতে দিয়ে। কিন্তু পূর্ণির স্বামী কালুর মার খেয়ে ফিরে এসেছিল সে।

সাহেব বলেছিলেন, মারা? ঠিক হ্যায়। কালকা কাম দেখতা হ্যায়।

পরদিন সকালে এদেশে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল কি? না, পূর্ণি নিখোঁজ হয়ে গেছে ধাওড়া থেকে। কালুকে অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গেল ঝরিয়া যাবার পথের ধারে সেই পরিত্যক্ত খনি এলাকার মধ্যে। খবর পেয়ে টিকেনবাবু গেলেন ছুটে। কালুকে তুলে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু পূর্ণির আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না দীর্ঘদিন।

দীর্ঘদিন পরে পূর্ণি ফিরে এল। কোথা থেকে, তা বলতে পারে না কেউ। পূর্ণিও বলে নি সে কথা।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, কিন্তু আমি জানি মশাই। লছমন সিং বলেছিল আমাকে। জন ম্যাথুস বাংলোতে রেখে দিয়েছিলেন তার হাতমুখ বেঁধে।

পূর্ণি ফিরে এসে কিন্তু একবারও দেখতেও গেল না কালুকে। কেমন যেন হয়ে গেল। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কাউকে মুখ দেখাতেই যেন ওর লজ্জা। কি হয়েছে ওর?

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, কি আর হবে মশাই। এক আশ্চর্য রোগে তখন ধরেছে পূর্ণিকে।

গভীর রাতে চিৎকার করে কাঁদত মেয়েটা। যন্ত্রণায় ছটফট করত। কিন্তু কাউকে কিছু বলত না।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একদিন পারা খেল খানিকটা। ওতে যন্ত্রণার উপশম হয় কিছুটা। সেই জন্যে খেয়েছিল, কিন্তু তাতে ফল হল বিপরীত। সারা অঙ্গ ফুলে উঠল। চামড়াগুলো ফেটে ফেটে তা দিয়ে রস গড়াতে লাগল। বীভৎস! গলিত কুষ্ঠের দিকে তাকানো যায় না মশাই।

তখনও চিৎকার করে কাঁদত পুর্ণি। কিন্তু কিছু বলত না।

টিকেনবাবু অনেকদিন এসে দেখে যেতেন ওকে। বলতেন, এমন হল কি করে? বল্ আমার কাছে, তোর আর কি আছে?

পুর্ণি কেবল কাঁদত। বলত, সি কথা আমি বুলতে নাব বাবু।

তারপরই দু হাতে কপাল চাপড়াত। বলত, মোর সাই বারাপ বাবু।

কেষ্টবাবু বলেছিলেন, কাল্টার ভাল করে জ্ঞানটা ঠিক আর হল না কোনদিন। তবু বেহুঁশ অবস্থাতেই স বকত মধ্যে মধ্যে। লছমন সিংয়ের নাম করত বারই। ও পাগল হয়ে গেল তার পরই।

কিন্তু লছমন সিংকে তখন টুকরো টুকরো করে ফেলেছে ন ম্যাথুসের আলসেসিয়ান। আর তাই নিয়ে জোর র চলছে এদেশে। ঠিক সেই সময়ই নতুন আর একটা লের ঢেউ এল। লোকে অবাক হয়ে শুনল। ঘৃণায় রকতও হয়ে গেল অনেকের মুখ। কি? না, গত তে যখন ফাঁকা বগিগুলো রেখে ফিরে যাচ্ছিল ইঞ্জিনটা খন তার তলায় পড়ে মরেছে পুর্ণি।

অন্ধকারের যেন কি এক আকর্ষণ আছে। যার জন্যে লে দলে এখানে ছুটে আসে মানুষ। এসে এই কালিয়ারিরই এক-একটা নাট-বল্টু হয়ে যায়। তাদের যন আর মুক্তি থাকে না। সূর্য ওঠার আগেই গাঁইতা ড়ি নিয়ে দল বেঁধে ওরা গিয়ে ঝাঁপ দেয় অন্ধকারের মুদ্রে। একের পর এক মাটি-পাথরের স্তর ভেদ করে গয়ে দাঁড়ায় যেখানে তারও চারপাশে অন্ধকার। সামনে দেখা যায় না কিছু। পিছনেও না। শুধু মশ-বাতীর আলোতে আলোকিত হয় যেটুকু, সেইটুকু। তারপর পথ চলা। সেই শত শত ফুট তলা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া পায়ে পায়ে। সেখানেও চড়াই-উৎরাই পেরুল। শেষে যখন কাটিং প্লেসে গিয়ে হাজির হওয়া গেল তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। তারপর সর্দারের কৃপা যদি হয় তো ভাল, নইলে এমন সুরঙ্গে কাজ দিল যেখানে দাঁড়ানো যায় না সোজা হয়ে। হাওয়া ঢোকে না। নিঃশ্বাসটিও নেওয়া যায় না বুক ভরে। তারপর বিপদ। যে কোন সময়েই গ্যাস জমে আগুন লেগে যেতে পারে কয়লায়। ধ্বস নামতে পারে। কিছু না হোক উপরে ঝুলন্ত কয়লার চাঙড়টাও গায়ের উপর পড়ে আহত করতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তাই সতর্ক থাকতে হয় প্রতি মুহূর্তে। যেতে-আসতেও বুক কাঁপে ঢিপ ঢিপ করে। যে কোন সময় হলেজের তার ছিঁড়ে গায়ের উপর এসে পড়তে পারে ডিব্বাটা।

তবু মানুষ এখানে আসে। এত ভয়, এত আশংকা বুকে নিয়েও এসে কয়লা কাটে। কেন? পয়সার জন্যে। একটা ডিব্বা বোঝাই করতে পারলেই পাঁচ টাকা ছ আনা। এর আর ভুল নেই। তাই বুক ভরে নিঃশ্বাস না নিতে পারলেও, বুক টান করে দাঁড়াতে না পারলেও কথা ওরা বলে না। জল আর কয়লার গুঁড়োয় মাখামাখি হয়ে কাদা হয় পায়ের নীচে। তার মধ্যে দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাঁইতা চালায়। গা দিয়ে ঘাম ঝরে, কিন্তু ওদের লক্ষ্য থাকে ডিব্বার দিকে। ওটা বোঝাই হতে আর কত দেরি?

এত কষ্ট মানুষ সহ্য করে শুধু প্রাণধারণের জন্যে। বাঁচার জন্যে। ওদের অবশ্য এখন কষ্ট বলেই মনে হয় না এগুলো। বরং ওই অন্ধকারের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে না পারলে যেন কেমন অস্বস্তি লাগে।

তাই এদেশে একবার এলে সে আর যেতে পারে না কোথায়ও। যাওয়া আর হয়ে ওঠে না তার।

শত শত ফুট মাটির নীচে কালো অন্ধকার দিয়ে ঢাকা রয়েছে যে সম্পদ, সেই-ই যেন আঁকড়ে রাখে। পেটের চিন্তা নেই এখানে মানুষের। কারণ সে জানে, মাটির নীচের সম্পদ কেটে ডিব্বায় তুলতে পারলেই তার ভাত মিলবে। তাই সে নিশ্চিন্ত। এদেশের আকর্ষণও তাই। পেট ভরে খেয়ে বাঁচবার জন্যে এখানে ছুটে আসে মানুষ। বাঁচতে সে পারে কিন্তু তখন আর সে মানুষ থাকে না।

অন্ধকারের সত্যিই যেন আকর্ষণ আছে একটা। দিনরাত শত শত মানুষকে বাঁচার আশ্বাস দিয়ে সে পেটে পুরে রাখে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তোমার যদি শক্তি থাকে তবে কেউ মারতে পারবে না তোমাকে।

পৃথিবীর বুকের লুপ্ত সম্পদকে উপরে নিয়ে এসে তুমি বাঁচ।

কিন্তু যদি কখনও মনে হয় যে, তুমি যে পরিশ্রম করছ তার মূল্য বেশী হওয়া উচিত, কোম্পানি মুনাফা লুটছে বেশী, তোমাকে দিচ্ছে না কিছুই, তবে এখানে নয়। কোম্পানির কাজের সমালোচনা করবার অধিকার তোমার নেই। অবশ্য যদি খেয়ে-পরে বাঁচার সাধ থাকে তোমার।

টিকেনবাবু বলতেন, খুব বেশীদিন এ ভাবে পায়ের তলায় রাখতে পারবে না মশাই। বিপ্লব একদিন হবেই। আর সে দিনের খুব একটা বেশী দেরিও নেই। আপনি আমি হয়তো দেখে যেতে পারব না, কিন্তু খনিমজুরদের মানুষের মত বাঁচতে দিতে হবেই।

বলেই টিকেনবাবু কাশতেন খুক্ খুক্ করে। তখনই বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিল তাঁর দেহটা।

তারপর একদিন তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত বেরুল। খক্ খক্ করে কাশতে কাশতেই বুকের ভিতর থেকে উঠে এলো।

তার আগেই অবশ্য চাকরিতে জবাব হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ম্যানেজার জন ম্যাথুস দশ দফা অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে। টিকেনবাবু জবাব দিয়েছিলেন তার। কিন্তু সবকিছু দেখে চাকরিতে তাঁকে রাখতে সাহস পায় নি কোম্পানি।

কিন্তু যে শান্তি বজায় রাখবার জন্যে চাকরি গেল টিকেনবাবুর, দেখা গেল, চাকরি যাবার পরই সে শান্তি ভঙ্গ হল এখানকার। হরিরাম চিৎকার করে বলল, এ কভি নেহি হো সেকৃতা। টিকেনবাবু মেরা দেওতা হ্যায়।

শুনে জন ম্যাথুস হাসলেন। বললেন, ইস লিয়ে তো খতম কর্ দিয়া উসকো নকরি। দল পাকানা নেহি চলেগা। ইয়ে কানুন হ্যায় কোম্পানিকা।

তবুও চুপ করল না হরিরাম। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেশ কিছু লোক যোগাড় করে গিয়ে হাজির হল ইউনিয়ন অফিসে। বলল, এ হোতা কিয়া? বিচার-উচার কুছ নেহি হ্যায় দুনিয়ামে?

ইউনিয়নের সুরয সিং বললেন, হ্যায়। মগর ই কেসমে হামলোগ নাচার হ্যায় ভাই।

হরিরাম বলল, কিঁউ?

সুরয সিং বললেন, মেরা মেম্বারকে লিয়ে হাম জান দে সেকৃতা। মগর টিকেনবাবু মেম্বার তো নেহি হ্যায় ইউনিয়নকা।

হরিরাম বলল, থুক্ দিতা হ্যায় এইসি ইউনিয়নকা উপর।

ম্যানেজার জন ম্যাথুস হরিরামকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, এইসা করনেসে মুশকিল হো যায়গা বহুত হুঁশিয়ারিসে কাম করনা।

হরিরাম বলল, মগর টিকেনবাবুকো ছোড়ায়া কাহে

ম্যাথুস বললেন, কোম্পানি এইসা আদমি পসন্দ নেহি করতা। ও কোম্পানিকা কাম নেহি করতা ঠিকসে। ইস লিয়ে।

তবু কিন্তু শান্ত হল না হরিরাম। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে সই যোগাড় করল একটা দরখাস্তের ওপরে। যদি টিকেনবাবুকে কাজে না নেওয়া হয় আবার তবে ধর্মঘট করবে সমস্ত মালকাটা, লোডার, কুলি-খালাসী। গোপনে গোপনে ঘুরল। মীটিং করল গোপনে। এবং সকলে একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তেই হাজির হল এসে।

টিকেনবাবু তখনও আসতেন মধ্যে মধ্যে। বলতেন, দেখেছেন মশাই, কয়লা দি[illegible] আগুন হয়। ওদের প্রত্যেকের বুকেই আগুন আছে। কিন্তু আমরা বুঝতে ভুল করি বলে দাম দিই না। এখন দেখছেন, কি প্রলয় নৃত্যে নাচবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ওরা!

কিন্তু টিকেনবাবুর বুকে যে আগুন ছিল সেই আগুনে পুড়েই ঝাঁজরা হয়ে গিয়ছিল তাঁর বুকটা। ফুসফুস ফুটো হয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল মুখ দিয়ে।

সেদিনও চমকে গিয়েছিল এদেশের লোক। অবাক বিস্ময়ে খবরটা শুনে দলে দলে টিকেনবাবুকে দেখতে ছুটে এসেছিল।

হরিরাম দু হাতে মুখ ঢেকে ছোট্ট একটা শিশুর মতই ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। বলেছিল, এ কিয়া হুয়া বাবুজী!

টিকেনবাবু কিছু বলতে পারেন নি। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন সকলের মুখের দিকে।

তারপর প্রায় সমস্ত মালকাটা, লোডার, কুলি-কামীর সই-করা ধর্মঘটের নোটিস আর গেল না কাম্পানির কাছে। গোপনেই একদিন তাকে নিজে হাতে পুড়িয়ে ফেলল হরিরাম। আর টিকেনবাবু একদিন প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা হাতে করে চলে গেলেন এখান থেকে। অনেক লোক সেদিন জড়ো হয়েছিল ত্রিমোহনায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকেই চোখ মুছেছিল সেদিন। সিংজীও। শেষে টাঙা করে ঝরিয়া পর্যন্ত সেই-ই পৌঁছে দিয়ে এসেছিল তাঁকে।

এ সবও অনেকদিন আগের কথা। তখন সবে রেশন উঠে গেছে দেশ থেকে। আর বীরেনবাবু মাল-গুদাম থেকে বদলি হয়ে বাতিঘরে এসে উঠেছেন।

অবশ্য এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাঁর। জীবনটা মোড় ফিরেছে। টুলুই নাকি সে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে।

ঠিক সন্ধ্যায় যখন সকলেই বাড়ি চলে যেত চাল-গুদাম থেকে তখনই বীরেনবাবুর কাছে আসত টুলু। রোজ।

সিংজী বলেছিল, উসকা সাথ পিয়ার হোগিয়া বীরেনবাবুকা।

টুলু বলত, ইখান থিকে যাইতে মোর মন চায় না বাবু।

বীরেনবাবু বলতেন, যা, আমি গিয়ে তোকে নিয়ে আসব তোর দেশ থেকে।

তবু টুলুর যেন কেমন ভয় হত। মুঙ্গলার জন্যে ভয়। সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ত। যে সন্ধ্যায় মুঙ্গলা জোর করে তার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ঠিক আছে। আমার সঙ্গেই বিয়ে হবে তোর।

এই নিয়ম। অবিবাহিত সাঁওতাল মেয়ের কপালে সিঁদুর পরাতে পারলেই তার স্বামিত্বের অধিকারী হওয়া যায়। টুলুর তাই বুক কাঁপত। বলত, ঘরকে গেলেই বাপ যে শাদি করায়ে দিবে মুঙ্গলার সঙ্গে।

বীরেনবাবু বলতেন, আমি তার আগে গিয়েই নিয়ে আসব তোকে। ভয় কি?

তবু নির্ভয় হতে পারত না টুলু। তারপর একদিন দিদির আইনমত ছুটি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছিল তাকে নিয়ে এখান থেকে। যাবার দিন বীরেনবাবুর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল মেয়েটা। বলেছিল, মোর কথা তুই ভুলিস নাই বাবু।

বীরেনবাবু বলেছিলেন, পাগল! তোকে আমি ভুলতে পারি? কদিনে ঘর-দোর তৈরি করে গিয়ে নিয়ে আসব তোকে।

সিংজী বলেছিল, ও বো বোলা ওহি করা বাবুজী। এক রোজ যাকর্ ও হিঁয়া সে আরা টুলুকো।

রেশনের মওকায় বেশ দু পয়সা কামিয়েছিলেন বীরেনবাবু। তা দিয়ে কোলিয়ারি এলাকার বাইরে জমি কিনে ঘর তৈরি করে ফেললেন কয়েকদিনের মধ্যেই। তারপর সত্যি সত্যিই একদিন চলে গেলেন দামোদরের ওপারের এক সাঁওতাল গ্রামে।

কিন্তু গিয়েই চকচকিয়ে গিয়েছিলেন। অসংখ্য ছোট ছোট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাটির ঘর। এক দঙ্গল উলঙ্গ ছেলেমেয়ের ছুটোছুটি। একগাদা হাঁস-মোরগের জটলা। অসংখ্য মেয়েপুরুষের কৌতূহলী চোখ। এর মধ্যে কোথায় আছে টুলু?

তবু এগুলেন পায়ে পায়ে। একটু যাবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল জোয়ান ছেলে এসে সামনে দাঁড়াল: কুথাকে যাবি বাবু?

বীরেনবাবু একটু হেসে বললেন, তোদের গ্রাম দেখতে এলাম। তা মোড়ল কোথায় তোদের?

একটি ছেলে আর একটি ছেলের গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, বল্ না কেনে মুঙ্গলা, তোর শ্বশুর কুথাকে বইছে।

মুঙ্গলা একটু হাসল। বলল, কে জানে।

বীরেনবাবু একবার তাকিয়ে দেখলেন মুঙ্গলাকে। টুলুর মুখে এর কথা অনেকদিন শুনেছেন। কালো বলিষ্ঠ দেহ। কায়দা করে চুল ছাঁটা। তৈলসিক্ত মুখটার মধ্যে ছোট ছোট দুটো চোখে যেন কি এক অসীম লজ্জা মাখানো। বললেন, তোর নাম বুঝি মুঙ্গলা?

মুঙ্গলা মাথাটা কাত করল একবার: হ্যাঁ।

আর সঙ্গে সঙ্গেই পাশ থেকে একটা ছেলে বলে উঠল, লাজ দেখ। আজ ওর শাদি হবে বাবু।

বীরেনবাবু বললেন, তাই নাকি?

বলেই বীরেনবাবু যেন চমকে উঠলেন। তবু মুখের স্বাভাবিক ভাবটা ফিরিয়ে এনে একটু পরিহাস করে বললেন, তা হলে আমারও নিমন্ত্রণ, কি বলিস মুরলা?

কিন্তু বীরেনবাবু আর বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না সে সাঁওতাল গ্রামে। সারা দেহে যেন কি এক অসহ্য যন্ত্রণা। কি এক অপরাধবোধে নিজের কাছেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন ক্রমশঃ। কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারার জন্যে অনুশোচনা। কিন্তু এ অবস্থায় কি করতে পারেন তিনি? টুলুকে কি করে নিয়ে যাবেন এখান থেকে? কোথায়ই বা পাবেন তাকে?

তাই ছুটে পালিয়ে এলেন গ্রাম থেকে। কিন্তু পথেই দেখা হয়ে গেল টুলুর সঙ্গে। বীরেনবাবুকে দেখে সে আগেই গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ওখানে। বীরেনবাবু একটু অবাক হলেন। বললেন, তুই?

টুলু হাসল। বলল, পালাই চল। কেউ দেখতে পাইলে যাইতে দিবেক নাই বাবু।

বীরেনবাবু বললেন, আজ তোর যে বিয়ে হয়ে যেত আমি না এলে!

টুলু বলল, বিয়া আমি করতাম নাই বাবু। তুই না এলি বিষ খাইয়া মরতাম।

তারপর পালানো। ছুটে ছুটে দামোদর পার হয়ে ওরা এসে হাজির হল এখানে। হল বটে, কিন্তু—

সিংজী বলেছিল, বহুত ঝামেলা হয়া হ্যায় উসকা বাদ।

ঠিক সন্ধ্যার সময়ই দামোদরের ওপার থেকে একদল লোক এল লাঠি-সোঁটা আর তীর-ধনুক নিয়ে। কি? না টুলুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তারা।

দলের সর্দার এসে সামনে দাঁড়াল বীরেনবাবুর। বলল, মোর বেটিকে দিয়ে দে বাবু!

খবর পেয়ে হরিরাম ছুটে এল একটা লাঠি হাতে করে। বলল, ক্যা হুয়া? মেরা বাবুকা উপর হামলা করতা হ্যায় কাহে? টুলু? কই টুলু উলু হিঁয়া নেহি হ্যায়। নিকাল হিঁয়াসে। জলদি নিকাল।

তারপর সমস্ত লোককে ঠেলে বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, হামকো থোড়া পানি পিলাও খোড়া।

এই ছিল হরিরাম। যে কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত বুক দিয়ে। আগুপিছু ভাবত না। ভাববার প্রয়োজনও বোধ করত না। হরিরাম বলত, আপকে লিয়ে হাম জান দে সেকতা বাবুজী।

জীবনের অবাক লাগত। অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত হরিরামের দিকে।

কিন্তু লাঠি-সোঁটা তীর-ধনুক নিয়ে যে মানুষের দল এসেছিল টুলুকে খুঁজতে তারা গভীর রাত পর্যন্ত এই কোলিয়ারির পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল। তারপর শ্রান্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল একসময়।

টুলু কিন্তু বীরেনবাবুর কাছে রয়ে গেল সেই থেকে। আজও আছে। কিছুদিন হল ওদের ছেলে হয়েছে একটা। বীরেন মুখার্জীর বংশধর।

কিন্তু বীরেনবাবুর মা বেঁচে আছেন এখনও। দেশ থেকে নিয়মিত তাঁর চিঠি আসে। লেখেন, এবার তুই একটা বিয়ে কর খোকা। আমার তো দশটা-পাঁচটা নেই। তুই-ই একমাত্র। তুই বিয়ে না করলে বংশ যে লোপ পেয়ে যাবে।

উত্তরে বীরেনবাবু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন মাকে। লেখেন, আমি শান্তিতেই আছি মা।

বীরেনবাবু তখন মধ্যে মধ্যে আসতেন জীবনের দোকানে। বলতেন, আপনিই দেখছি আমাকে অবাক করবেন জীবনবাবু। এদেশে থেকে এখনও পর্যন্ত শুচিবাই গেল না আপনার। অমৃতে অরুচি এখনও। আশ্চর্য!

শুনে জীবন হাসত। কি বলবে সে!

কেষ্টবাবু বলতেন, আমিও আগে ওই রকম হাসতাম মশাই। মদ যারা খেত তাদের ঘৃণাই করতাম এক রকম। কিন্তু স্ত্রী মরে যাবার পর—

জীবন একটা বিড়ি বাড়িয়ে দিত। বলত, নিন, বিড়ি খান।

কেষ্টবাবু যেন নেহাত কৃপা করেই নিতেন বিড়িটা। বলতেন, বিড়ি? তা দিন।

কেষ্টবাবুর তখন বয়স হয়েছে। মাথার চুলে পাক

রছে। মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটিও পাশে ড়ানোর মত হয়েছে প্রায়।

সিংজী বলেছিল, মগর উ পারুলকা বাচ্চা-আচ্ছা নেহি হ্যায় বাবুজী। আভি তক্ হোতা, মগর চতা নেহি।

পারুলের তাই দুঃখ। যে অবৈধ সন্তানটিকে বৈধ তে গিয়ে স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল কেষ্টবাবুর, সেই নেটিও পৃথিবীর আলো দেখে নি। এদেশের হাওয়ায় শ্বাস নেয় নি একটিও।

কিন্তু কেষ্টবাবুর বউয়ের শূন্য ঘরে এসে তার বাচ্চা টাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শান্তি পেয়েছিল কিছুটা রুল। জীবন্ত একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মা হতে পারলেও প্রায় মায়ের মতই হয়ে উঠেছিল বইকি।

কেষ্টবাবু অবশ্য লোকের কাছে পারুলের পরিচয় তে লজ্জা পেতেন। বলতেন, ঝি মশাই, ঝি। বাচ্চা টোকে নিয়ে একা মানুষ পেরে উঠি না, তাই রেখে য়েছি ওকে। খায়দায়, বাচ্চা দুটোকে দেখে। বেশ টি মেয়ে।

পারুলও শুনত সে কথা। কিন্তু কোন কথা বলত । ওর ধুধু বুকে কেষ্টবাবুর সন্তানই শান্তি দিয়েছে ছুটা। তার নয়। তাই ভয় হত। যদি কেড়ে নেয় দের? তবে কি করে বাঁচবে পারুল? কেষ্টবাবুর ন্তানের মা হয়েও সে যে মা হতে পারে নি। কি নিয়ে প্রতিবাদ করবে সে কথার?

পারুলের সামনে এসে অবশ্য হেসে বলতেন কেষ্টবাবু, মন গম্ভীর দেখছি কেন মুখখানা!

পারুল বলত, তুই লোকের কাছে আমাকে ঝি লিস বাবু? আমি ঝি বটে?

কেষ্টবাবু জিভ কাটতেন সঙ্গে সঙ্গে। বলতেন, ছি ছি, তুই ঝি হতে যাবি কেন? তুই যে আমার সব রে— বে।

বলেই আদর করতেন পারুলকে।

পারুল বলত, খুব কইরা গিলছিস বুঝি আজ? তোর লাজ লাগে না? ছেলেমেয়ে বড় হইছে না?

তারপর পকেট থেকে একটা শিশি বের করে পারুলের হাতে দিতেন কেষ্টবাবু। বলতেন, খেয়ে দেখ্। প্রথম দিকের মাল। এটা আমার জন্যে স্পেশাল করে তুলে রেখেছিল কিরণ সিং।

পারুল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়ে দিত শিশিটা। বলত, ও তু খা বাবু। ছেলেমেয়ে বড় হইছে। আমি মদ খাই জানলে ওরা ঘৃণা করবে আমারে। আমি ওসব খাব নাই।

কেষ্টবাবু প্রায়ই আসতেন জীবনের দোকানে। কিরণ সিংয়ের দোকানে যাবার আগে এসে বলতেন, যাবেন নাকি মশাই, সিংজীর ছেলেকে দেখতে? চলুন না, গেলেই যে খেতে হবে তার তো কোন মানে নেই।

কিরণ সিংয়ের দোকান থেকে ফেরবার পথে এসে বলতেন, জানেন, দুনিয়ায় যদি খাঁটি জিনিস থাকে তবে এই একটি। খান, দেখবেন, পৃথিবীটা কত সুন্দর হয়ে গেছে আপনার কাছে। বিউটিফুল!

অনেক মানুষকে দেখেছে জীবন। ত্রিমোহনার এই ছোট্ট ঘরটায় বসে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছে এই দেশটাকে আর তার মানুষগুলোকে। কত মানুষ? অনেক, অসংখ্য। রোপ-ওয়ের ডিব্বার মতই পর পর এসেছে তারা, আবার চলে গেছে। শুধু আসা আর যাওয়া। এটাই নিয়ম এদেশের।

সিংজী বলত, আনেকা টাইম লে আতা বহুৎ কুছ, মগর যানেকা টাইম বিলকুল ফাঁকা।

তা সিংজীর লাট্টু মরে গিয়েছিল তারপর। সিংজী তখন প্রায় অথর্ব। তবু ছেলের কাছে যায় নি। ভিখ মাঙাকে যে সিংজী ঘৃণা করত একদিন সেই সিংজীকেই তারপর ভিক্ষা করতে দেখেছে জীবন। কিন্তু সেভাবে খুব বেশীদিন আর বাঁচে নি। একদিন হঠাৎই মারা গিয়েছিল।

ঠিক সেই সময়ই এদেশের লোক চমকে উঠেছিল আর একবার। হঠাৎ একদিন বাংলোর মধ্যে খুন হয়ে গিয়েছিলেন জন ম্যাথুস, কোলিয়ারি ম্যানেজার। একটা উন্মাদ সাঁওতাল এসে খুন করেছিল তাঁকে। কিন্তু খুন করে সে পালায় নি সেখান থেকে। জন ম্যাথুসের রক্তাক্ত দেহটায় লাথি মারছিল একের পর এক।

সেদিনও দলে দলে লোক ছুটে গিয়েছিল জন ম্যাথুসকে দেখতে। থানা থেকে পুলিস এসে উন্মাদটাকে বেঁধে ফেলেছিল। বলেছিল, তোর নাম কি।

উন্মাদ বলেছিল, আমি কালু মালকাটা।

পুলিস বলেছিল, তুই মারলি কেন সাহেবকে।

সে কোন কথা বলে নি।

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে এখানকার। কত নতুন নতুন মানুষ এসেছে। ট্যাক্সি বাস টাঙা রিক্‌শা এসেছে কত। কত নতুন নতুন দোকান হয়েছে। ত্রিমোহনা এখন জমজম করে সব সময়।

বাঙালী ক্লাব এখনও আছে। বিভিন্ন পূজো-পার্বণে এখনও নতুন নতুন নাটক করে তারা। শনিচারের হাট এখনও বসে। সৈয়দ খাঁ, রঘু সিং এখনও সুদ আদায় করে বেড়ায় সেখানে। বে-আইনী চোলাইয়ের জন্যে অনেক বার পুলিসের ঝামেলা সহ্য করেও এখনও টিকে আছে কিরণ সিং, এবং জীবনও আস্তে আস্তে এই কোলিয়ারির চরিত্র হয়ে গেছে একটা।

একদিন বড়লোক হবার সাধ ছিল। বিয়ে করে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে। বিয়েও করা হয় নি, সংসারও পাতা হয় নি। আর হবেও না কোনদিন।

সিংজীর ছেলে কিরণ সিংকে দেখাবার জন্যে একদিন অনেক চেষ্টা করেছেন কেষ্টবাবু। এখন রোজই কিরণ সিংকে দেখে জীবন। প্রত্যহ সন্ধ্যায়।

দোকানটা ছোট্টই রয়ে গেছে এখনও। সেই ছোট্ট ঘরটায় বসে এখনও অবাক হয়ে এই ছোট্ট দেশটাকে দেখে জীবন। ধূধূ মাঠে বিভিন্ন ঋতুতে আজও বনফুল ফোটে। কিন্তু সেদিকে তাকাতে ইচ্ছা করে না আর। প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মেসিনঘরের মাথা থেকে বাঁশী বাজে আজও, চানকের উপরের হুইল দুটো দিনরাত আজও ঘোরে। দলে দলে লোক খাদে নামে, আবার ওঠে। নতুন নতুন গল্পও সৃষ্টি হয় এখনও, কিন্তু জীবন যেন আগের মত স্বাদ পায় না তার।

তাই সেই ছোট্ট ঘরটায় বসে বসে আগের দিনগুলোর কথা ভাবে। আগের লোকগুলোকে মনের পটে এনে আনন্দ পায়। কেন? তাদের সঙ্গে যে তার জীবনও জড়িয়ে আছে কিছুটা, তাই।

এ দীর্ঘদিনে যত মানুষকে দেখেছে, সকলকে আজ আর মনে আনতে পারে না ঠিকই। কারণ সময়ের ব্যবধানে ঝাপসা হয়ে যাবেই বইকি কিছুটা। কিন্তু সিংজী, কেষ্টবাবু, লছমন সিং, জন ম্যাথুস, টিকেনবাবু, হরিরাম, বীরেনবাবু, মুংগরা মাঝি, পূর্ণিকে কী করে ভুলবে? কি করে সব কিছু ভুলবে জীবন?

প্রদোষের প্রান্তে

মূল রচনা : The Edge of Darkness—Mary Ellen Chase

অনুবাদ : রাণু ভৌমিক

১০

এই লাইনের সর্বশেষ ঘরটিই স্টোর। সেখানে পৌঁছে দেখল, হান্না স্টীভেন্স ওর জন্যে সামনেই ছোট ন্দায় অপেক্ষা করছে। কৃশ ও দুর্বলদেহ হান্নাকে ট ও ভঙ্গুর মনে হয়। জোয়েল নর্টন কোন এক সময়ে নার আবেগে—যদিও বা তার পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন—ছিল যে সে অবাক হয়ে ভাবে, হান্না তার নিজস্ব সব- রাখবার কোথায় স্থান পায়!

লুসী আজ সে কথাই ভাবছিল, কারণ হান্নাকে খুব ত্তজিত দেখাচ্ছিল। হান্নার উত্তেজনার কারণ দ্বিবিধ। মত: আজ বেনকে ডিনার দিতে দেরি হয়ে যাবে। ীয়ত: নাতি-নাতনীরা কি সব করে বেড়াচ্ছে। এরা কাল ঠাকুরমার কাছে থাকতে এসেছে। কিন্তু জোর : এই সব এবং আরও অনেক দুঃখজনক চিন্তা দূরে য়ে সে প্রথমে লুসীর কাছে দায়িত্বমুক্ত হয়।

—বলবার মত কোন বিক্রি হয় নি,—সে বলে, একজন ঝিনুক-অন্বেষণকারী ম্যাকরেল উপসাগর দিয়ে ার সময়ে তিন বোতল স্ট্রবেরী সোডা নিয়েছে। ত্রিশ ট ওখানে আছে। পশ্চিমের মেয়েটি নিয়েছে একটা রুটি ও প্যাকেট সিগারেট। উনপঞ্চাশ সেণ্ট। সে তার দাম টয়ে দিয়েছে। সব টাকাই কাউণ্টারে এক টুকরো গজে লিখে রাখা আছে। আর রাগুলের মেয়েটি রীপ চষে বেড়াতে যাবার আগে নিজের এবং অন্যান্য লের জন্য দশ সেণ্টের লিকোরাইস কিনেছে। হ্যাঁ, নিজেই সকলের জন্য কিনল তা বলতে আমি বাধ্য।

—বারটা ঠিক দিয়েছ তো! আমরা প্রতি নিকেলের ছ সেণ্টের মত জিনিস দিয়ে দিই। তা ছাড়া ওরাও

—না, আমি দিই নি। দশ সেণ্টে দশটাই দিয়েছি।

—শুনে দুঃখিত হলাম।—লুসী বলে, ছোট মেয়েটি বড় ভাল।

হান্না বিরক্ত হয়।

—এ দেশ স্বাধীন,—সে বলে, অন্তত: সবাই তাই জানে। কাজেই, প্রত্যেকেরই নিজের মতামত দেবার অধিকার আছে। আমার নাতিরা সুশিক্ষা পেয়েছে। আমি চাই না যে ওরা আমার কাছে এসে সব ভুলে যাবে। শুধু এই অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের জন্যে— নইলে আমি দেখিয়ে দিতাম।

—আজ অন্তত: কেউ কাউকে কিছু দেখাবে না—লুসী বলে, এই অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান আমাদের সকলের—ছোট ছেলেদেরও।

হান্না এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, আর তখনই লুসীর শৈশবে একবার দেখা ম্যাজিক লণ্ঠনের কথা মনে পড়ে। কি ভাবে এতে প্রথমে সাদা পর্দায় কালো চৌকো একটা দাগ পড়ে এবং লোকটি একটি খড়খড়ি টেনে দিতেই সেই চৌকো অন্ধকার উজ্জ্বল ছবিতে ভরে ওঠে।

—আমি সকালে একটা কেক তৈরি করেছি,—হান্না বলে, যাতে শাগ দ্বীপ থেকে ওরা ফিরে এলে চট করে হাতে হাতে কিছু দেওয়া যায়। আমি জানি তুমি কেক তৈরি করবার একটুও সময় পাবে না।

—হান্না, তুমি কি ভাল! এত ভেবে কাজ করেছ!

বারান্দার তিন ধাপ পার হয়ে দরজার দিকে যায়। পর্দার উজ্জ্বল ছবিটা হারিয়ে গেল—আবার সেই কালো চৌকো রেখা।

—ভাল। গত দুদিন ও যেমন ছিল তার চেয়ে ভাল ও থাকতে পারে না।

—বেশ।—হান্না বলে।

সে তার বাস্কেটে ঁইড়শির থলি করবার জন্য ভারী টোআইন সুতোর গুলি, রিপু করবার কাঁচ, সূক্ষ্ম ছুঁচের কাজ গুছিয়ে নেয় এবং নামবার উদ্যোগ করে।

—তোমার কি মনে হয় স্তান হন্টের আসার সাহস হবে? আজ তো শনিবার, স্কুল নেই।

—জানি না।—লুসী বলে।

সে স্টোরে ঢুকে কাউণ্টারের পেছনে তার পরিচিত চেয়ারে বসে। অভ্যাসবশতঃ সে চল্লিশ সেণ্ট, কোয়ার্টার, ডাইম, নিকেল কাউণ্টারের ওপর থেকে নিয়ে ড্রয়ারে রাখে। তারপরে তাকের ওপরে স্যুপের টিনের পেছনে চাবি লুকিয়ে রেখে দেয়।

সে চেয়ারে বসে থাকে। সামনের জানলা দিয়ে দেখতে পায় জোয়ারের স্রোত বালি পার হয়ে সমুদ্র-তীরের নুড়ির লাইন ও ঘরের চালের কাছাকাছি যাচ্ছে। নোঙরে বাঁধা মাছধরার বোট দুলছে। ছোট নৌকো ও ডিঙ্গি তীরে তোলা আছে। পশ্চাৎপটে হেরিং মাছের কালো খুঁটি ও দোলানো বাদামী বর্ণ জাল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপারের বিরাট অন্তরীপে মিশে যাওয়া খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ছেলেরা নেমে আসছে। ওদের হাত-ভর্তি ফুলের মধ্যে লাল রঙ দেখতে পাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে ওরা অসময়ের শিশি খুঁজে পেয়েছে।

স্টোরের পেছনের তাকের ঘড়িটায়—যে ঘড়িটা লুসীর শৈশবে ওর মার রান্নাঘরে ছিল—লুসী দেখল দুপুর গড়িয়ে গেছে। ওর এখন অনেক কাজ। সারা হন্টের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে যাবার আগে সব শেষ করে ওঠাই সম্ভব নয়। কিন্তু, এই মুহূর্তে, এখানে বসে সে কিছুতেই বহু কাজের একটিও মনে আনতে পারল না।

দ্বিতীয় খণ্ড : প্রতিবেশী

সামুয়েল পার্কার

মিসেস হন্টের অন্ত্যেষ্টির দিনে সামুয়েল পার্কার খুব ভোরে—এমন কি ওর পক্ষেও তা সকাল—উঠল। টাইডাল নদীর মোহনা দিয়ে স্রোত দ্রুত ফিরে যাওয়া আগে তাকে অনেকটা এগিয়ে যেতে হবে। এবং শ দ্বীপের উত্তরে পৌঁছে এই কুয়াশার মধ্যেই সবকি প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণতঃ দ্বীপের দক্ষিণ দিক দিয়ে যায় এবং সেজন্য ওকে তি মাইল সমুদ্রের দিকে যেতে হয়। কারণ, ওর ফাঁদ-জা সেদিকেই—বাইরের কিনারে। কিন্তু, আজ যখন ফাঁ জাল ফেলাটাই একমাত্র কথা নয় এবং পথও দীর্ঘত তখন সময়ের আগে বেরনোই ভাল।

যখন ও সামনের দরজা খুলল, বাঁ দিকে ড্রুজি ওয়েস্টের বাড়ি, ডান দিকে স্টোর। যখন ও বেরি প্রত্যহের মত প্রাকৃতিক আবহাওয়া দেখতে চাইল, ও মনে হল ভিন্ন একটি গ্রহে উপস্থিত হয়েছে। ও ভেবেছি এখনও ঠিক তেমনি পৃথিবীকে জড়িয়ে থাকা কুয়া দেখতে পাবে যা এক সপ্তাহ হল সবাইকে পাগল ক দিয়েছে এবং যে জন্য কম্পাসের সাহায্য নিয়ে কাল ওবে তিন ঘণ্টা দেরিতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে, সমস্ত দিন এ সর্বস্থানব্যাপী সেই দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসের প্রা মাতামাতি এখনও রয়েছে। কিন্তু আজ মোটেই বাত ছিল না। রাত্রে কোথাও গিয়ে যেন এর মৃত্যু হয়েছে কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। বাতাস শুকনো ও পরিষ্কার আকাশে বিবর্ণ তারা ফুটেছে। অন্ধকারের দি তাকিয়ে ওর মনে হল, উষার উদ সমুদ্র দূরদিগন্ত পর্ শান্ত হয়ে যাবে এবং যখন সে মাছ ধরবার জন্য প্রস্তুত হ তখন ঘূর্ণিঝর্ণা পর্বতের পশ্চাতের আলো-ঘরের শীর্ষ এ কাছে দেখাবে যে মনে হবে যেন হাত দিয়ে স্পর্শ ক যায়। এই উপকূলে বিস্ময়ের শেষ নেই, ঘরে গিয়ে তেবে স্টোভ জ্বালিয়ে দাড়ি কামাবার জন্য আর কফির জ জল গরম করতে করতে ও নিজের মনে বলে।

ও স্বভাবতঃই চিন্তাশীল, সাবধানী এবং বয়সের সা সঙ্গে ওর ধীর স্থির নিয়মানুবর্তী পরিচ্ছন্ন অভ্যাস দৃঢ় হয়েছে। সামনের দরজার দক্ষিণেই ওর ছোট শোব ঘর। ঠিক উল্টোদিকে বসবার ঘর। সেখানে হাওয় নিরোধক স্টোভ, পরিষ্কার কাঠের বাক্স, কয়েকটি বই টেবিল। সেখানেই কোন কোন নির্জন সন্ধ্যায় সে এ শব্দচয়ন খেলা খেলে। পশ্চাতে লম্বা রান্নাঘর। এ

ভাগে ভাগ করা—অন্ততঃ ও মনে মনে তাই ভাবে—দিকে ওর রান্না খাওয়া ও বাসন পরিষ্কার করবার স্থান, অপরদিকে ওর কারখানা। সেখানে একটা দারু কাঠের বেঞ্চ, তাকের ওপরে রঙের পাত্র ও দেওয়ালে যন্ত্রপাতি ঝুলছে। শীতে যখন ওর বোট নিভাগে জড়িয়ে পড়ে থাকে এবং নতুন জালও ক্রেম দিয়ে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন ও ছোট ছোট চিংড়ি-বয়া তৈরি করে তাতে উজ্জ্বল রঙ দিয়ে, গায়ে ডোরা কেটে চার দিকে ছোট ছোট গর্ত করে দেয়। তা ছাড়া, ও ছোট ছোট জাল, ঝিনুকের ঝুড়ি, ছোট নৌকো ও ডিঙিও তৈরি করে, অথবা সময়ে সময়ে হাল-পাল দেওয়া এক-মাস্তুল অথবা দু-মাস্তুল জাহাজ। এ সব জিনিস বিক্রি হয়। সাধারণতঃ যে সব ভ্রমণকারী গ্রীষ্মে পিকনিকের জায়গা খুঁজতে গাড়ি ঘটঘটিয়ে আসে তারা কেনে। উপকূলবর্তী শহরের দু-তিনটে দোকানেও সব বিক্রি হয়। শীতকালে জোয়েল নর্টনের ট্রাকে করে ও কখনও কখনও নিজে শহরে নিয়ে যায়। ওরা তাদের স্টোরে কিছু রেখে দিয়েছে। ও মাছ ধরবার যন্ত্রপাতির সঙ্গে রান্নাঘর অথবা কারখানা মিশিয়ে ফেলে না, সেই সব জিনিস—উঁচু বুট জুতো, জামা, জলনিবারক ওভারকোট, তৈলাক্ত চামড়ার পোশাক, লণ্ঠন, গীয়ারের ভাঙা টুকরো পেছনের বারান্দায় নিজের হাতে তৈরি একটা ছোট কুঠরাতে রেখে দেয়।

বাড়িতে বা নৌকোয় যখন একা থাকে তখন ও জোরে জোরে কথা বলবার অভ্যাস। এতে কারও কোন ক্ষতি হয় না, বরং একাকীত্বের ভাবটা একটু কমে যায়, মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হয়। তাই ও এই অভ্যাস ত্যাগ করবার কথা ভাবে নি। নিজের কণ্ঠস্বরে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে প্রায়ই জোরে জোরে বই পড়ে। পড়ার তালে তালে বাক্য ও শব্দের পতন উত্থান অত্যন্ত শ্রুতিমধুর মনে হয়। এই ভাবে সময় কাটাবার শব্দচয়ন খেলবার অভ্যাস ওর কথাবার্তায় এমন একটা ক্ষিপ্রতা ও বিশুদ্ধতা এনে দিয়েছে যা ওর সমশ্রেণীর কারও পক্ষে সহজ নয়।

—যদি আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতাম,—সসপ্যানে সেদ্ধ করবার জন্য দুটো ডিম ছাড়তে ছাড়তে ও বলে, তাহলে ভাবতাম যে এই দিনটা বিশেষ ভাবে মিসেস হস্টের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে।

ও ধীরে ধীরে প্রাতরাশ শেষ করে। দুটো ডিম, কিছু গরম করা বিস্কুট যা লুসী নর্টন ওর বিলম্বিত নৈশ ভোজনের জন্য তৈরি করেছিল এবং ঘন জমানো দুধ দিয়ে মিষ্টি দেওয়া অনেকটা ধোঁয়া ওঠা কফি। ও আগে ডিসগুলো ধুয়ে রেখে বাইরে গিয়ে লণ্ঠন জ্বালায়; যদিও ভোর হয়ে এসেছিল। তারপরে মাছ ধরবার পোশাক পরে সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হয়। ওর ছোট ডিঙি ভাসছিল। দশ মিনিটের মধ্যে ও বোট চালিয়ে যতটা নিঃশব্দে সম্ভব টাইডাল নদী দিয়ে শাগ দ্বীপের উত্তরে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে আসা উদ্গত শৈলস্তবক ধরে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। এই রকম উদ্গত শৈলস্তবকই দ্বীপের উত্তর দিকের বৈশিষ্ট্য। সেই দিকটা সাবধানে পার হয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে গিয়ে ও জাহাজ-আকৃতি কেবিনে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রেখে স্টীয়ারিং চাকার পেছনে যথাস্থানে বসে পাইপ ধরায়।

সমুদ্র অবিশ্বাস্য রকম শান্ত। সাধারণতঃ দু-তিনদিন ঝ'ড়ো হাওয়ার পরে বহুক্ষণ এ নিস্তরঙ্গ হয় না—বিশেষতঃ এখানে, এই গভীর জলে যেখানে বন্দরের মুখেই বিরাট বিশাল আটলান্টিক মহাসমুদ্র।

—আবার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, যদি কুসংস্কারাপন্ন হতাম,—ও গোপনে ওর পাইপ, ইঞ্জিন ও দ্বীপের ধূসর কালো স্প্রুস গাছগুলোর কাছে বলে।

শাগ দ্বীপের পূর্ব উপকূল তিন মাইল দীর্ঘ। অর্ধেক উচ্চ, ঘন বৃক্ষে পূর্ণ। যদি সেখানে কোন এক সময়ে গোচারণ কিংবা সতেজ মাঠ থাকত—যা পশ্চিমের ঢালুতে এখনও দেখা যায়—তবে তা বহু আগেই বৃক্ষের স্থির কঠিন অকরুণ বিজয় অভিযানে বশ্যতা স্বীকার করেছে। দ্বীপের উচ্চ ভূমি থেকে ফার ও স্প্রুস গাছ সেদিকটা অন্ধকার করে দিয়ে নীচের উদ্গত শৈলস্তবক ও গোলাকৃতি পাথরের দিকে নেমে এসেছে এবং সেখানেও স্থানে স্থানে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। ওরা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের একটা দেওয়াল কিংবা ঠিক করে বললে বলতে হয় খুঁটির বেড়া গড়ে তুলেছে। শুধু মধ্যে মধ্যে যেখানে স্বল্পপরিসরতার জন্য অথবা সূর্য-

লোকের অভাবে কোন একটি গাছ মরে গেছে সেখানে শৈবাল আঁকড়ে ধরা সেই কঙ্কাল ধীরে ধীরে মরচে রং অথবা রুপোলী-ধূসর হয়ে উঠেছে।

লুসী ও জোয়েল তীর থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। জোয়ার স্রোত পার হয়ে এসে ওর চালাবার আর কোন ব্যস্ততা ছিল না। সূর্য এখনও ওঠে নি। পূর্ব দিগন্তে সুন্দর হাল্কা হলদে রং। সূর্য সমুদ্র পার হয়ে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় প্রস্তুত হচ্ছে। সেই আলোতে বোটের রশারশির বিক্ষিপ্ত ছায়া তীরে পতিত হয়ে সিক্ত স্প্রুস গাছগুলোকে লক্ষ লক্ষ ত্রিশির স্ফটিকে উজ্জ্বল করে তোলে এবং স্বস্তি ও আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ও বোঝে তার চিংড়ী মাছের প্রথম লাল বয়াটা আর মাত্র আধ মাইল দূরে।

২

কুড়ি বছর আগে এই কোভ উপনিবেশে আসবার আগে শ্যাম পার্কার নানা উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করত। কোনটাই তার মনোমত ছিল না। ও 'মেনে'র জাহাজ-ঘাটায় কাজ করেছে। এখানকার নির্মিত জাহাজ দেশে-বিদেশে বিক্রয় করা হত। বাঙ্ক পর্যন্ত বায় এরকম একটি দু-মাস্তুল মাছ ধরবার জাহাজে সাহায্যকারী ছিল। আবার কিছুদিন গ্যাসমাকোডি শহরের একটি কারখানায় হেরিং মাছ প্যাক করতে শিখেছিল। তারপরে, ইস্টার্ণ স্টীমশিপ কোম্পানির হয়ে একটি খেয়া নৌকো চালনা করেছে। তার সেই তরুণ বয়সে তখনও এই কোম্পানি পেনবস্কট বন্দর ও বোস্টনের আটলান্টিক জেটির মধ্যে 'বেলফাস্ট ও কামডান' পাঠাত। ও এভাবে বার বার জীবিকা বদল করেছে কিন্তু ওর অসহায় চিত্ত কখনও শান্তি খুঁজে পায় নি। কারণটা সে কখনই ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি, কিন্তু মনে হয়েছে অনেক লোকের সান্নিধ্যই এর কারণ।

অপরাপর হাজার হাজার তরুণের মত ১৯৫৭ সনে ও নৌ-সেনাদলে যোগ দিয়েছিল এবং ওকেও গ্রেট লেকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে গাল পাখিও নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং সেখানকার জলে আলকাতরা ও তেলের গন্ধ। সেই সুদূর, চকচকে আকাশের নীচে ঐ বালিয়াড়ি ও সমান শূন্য বেলাভূমিতে ওর ইউনি[illegible] অনুচিত ওকে বিদেশীয় বলে মনে হত। ১৯১৮ সনে ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে যখন সে অনেক বাড়িতে পাশ[illegible] ছেলেকে জর ও আমাশায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মা[illegible] যেতে দেখল তখন সে চিরদিনের জন্য এই দা[illegible] পরিত্যাগ করল, যদিও এই সিদ্ধান্ত তার শৈশব-স্ব[illegible] সম্পূর্ণ বিপরীত।

যদি কোন শান্ত প্রভাতে ও এই সব ভাবনায় মন ছেড়ে দেয় তখনই ও উপলব্ধি করতে পারে যে লুসী ও জোয়েল নর্টনের জন্যই ও এই প্রকৃতি-বিতাড়িত স্থা[illegible] এসেছে। আরও অনেক দূরবর্তী পশ্চিমে অবস্থিত এ[illegible] জায়গায় ছেলেবেলায় ওরা একসঙ্গে থাকত, যদিও লু[illegible] ভাইনাল (তখন ওর ওই নাম ছিল) এবং জোয়েল ন[illegible] ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। একটি লাজুক, বুদ্ধি[illegible] বালকের মত সে লুসীকে ভালবাসত। এবং সেই প্রে[illegible] ভিন্ন ভাবে ও রূপে তার মনে এখনও আছে। ও যখ[illegible] পিতামাতার মৃত্যু ও একমাত্র ভগিনীর কালিফোর্নি[illegible] গমনের পরে একেবারে পারিবারিক বন্ধনশূন্য হয়ে গেল তখন কয়েকটি মৎস উপনিবেশ দেখবার পরে ও এই জায়গাটাই পছন্দ করেছিল। এখানে প্রকৃতি মানবের সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং লোকের ভিড় নেই।

ব্যাঙ্কে থাকাকালীন যখন ক্লা[illegible] ও নোংরা অন্যান্য লোকের সঙ্গে সে ঘুমুতে চেষ্টা করত, অন্য মাছ ধরবার বোটের তীব্র আলো, চলমান হিমবাহ, বিরাটাকৃতি সমুদ্র জাহাজের বিরুদ্ধে সতর্কভাবে পাহারা দিত তখন ও কখনও কল্পনাও করে নি যে একদিন নিজ গৃহের আরাম ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। বর্তমানে সে নিজেকে সর্বাপেক্ষা সুখী ও সৌভাগ্যবান মনে করে। জাল থেকে ওর ভালই আয় হয় এবং ওর নানা রকম হাতের কাজ মন্দা সময়কে পুষিয়ে দেয়। সে বিয়ে করে নি। তার অর্থ এই নয় যে সে তার প্রথম ও একমাত্র প্রেমের জন্য কোন কাব্যিক ধারণা পোষণ করে। যে দু-একটি মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে কল্পনায় তাদের সঙ্গে দাম্পত্য-বাসের ছবিই দ্বিধার মূল কারণ। ওর পক্ষে এটুকু বলা যায়

যে সেই মহিলাদের কথা বিবেচনা করেই ওর আপত্তি। নিজে ও নির্জনতাপ্রিয় এবং একরোখা প্রকৃতির। যখনই স্বাভাবিক জৈবিক তাগিদ এবং ইচ্ছায় ওর মন উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ও আশা করে যে নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতক সমুদ্রে এমন কোন ঘটনা ঘটবে যাতে ওর মন আবার পূর্বের ভারসাম্যে ফিরে আসবে।

৩

দিগন্তরেখা থেকে সূর্য সবেমাত্র লাফিয়ে ওপরে উঠেছে, তখনই ও ওর প্রথম লাল বয়াতে পৌঁছে গেল, এবং জাল গোটাতে আরম্ভ করল। দীর্ঘ অভিজ্ঞ ধীবরের মত ধীর স্থির একক ছন্দে ও এই কাজ করতে থাকে। সরু ডেকের ওপরে প্রতিটি নিক্তিতে ওজন করে, সঙ্করমাণ মাল খালাস করে, জাহাজের ওপরের অংশ থেকে ঝোলানো মাপদণ্ডের মাপের থেকে ছোট পুলিকে জলে ছেড়ে দিয়ে আবার বঁড়শি গেঁথে প্রতিটি জাল টুপ শব্দে এবং গোলাকৃতি দাগ কেটে নীচে পাঠিয়ে দেয়। আজকের ভাগ্য অন্যদিনের থেকে ভাল। যেন চিংড়ীমাছগুলো জলের নীচের গভীর স্রোতে বিরক্ত হয়ে দ্বীপের উদ্গত শৈলস্তবকে আশ্রয় নিয়েছে। ছোট ছোট স্প্রুসের টুকরো আটকানো কয়েক শত থাবা নীচে ফেলে ও ওর সওদা ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে বোটের পাশে আটকে দেয়। তারপরে ও ওর ক্লান্ত পিঠ এবং কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিয়ে শরীর দুলিয়ে ঠিক করে নেয়। আবার পাইপ ধরিয়ে এই প্রভাতের আলোতে সামনের ডেকে শুয়ে পড়ে দ্বীপের তীরগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে থাকে।

এখানে স্প্রুস গাছগুলো দ্বীপের উত্তরাংশের থেকে পাতলা ও কম উন্নত। এর ভিতর দিয়ে আলোর রেখা দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি নীচু জমির অপর দিকের সমুদ্রের একটু-আধটু নজরে পড়ে। ও ভাবছিল নভেম্বর মাসে কোন এক উপলক্ষে ওরা যখন এদিকে এসেছিল তখন এই গাছগুলোর ওদিকে একটা জলা দেখেছিল। সেখান থেকে একটা অসমান, আঁকাবাঁকা পথ পশ্চিম উপকূলে চলে গেছে, যেখানে বহু বছর আগে ঘন বসতি ছিল। আগাছাগুলো ও ডক ধীরে ধীরে গড়িয়ে বাইরের কোভের গভীর জলে নেমে গেছে। ওই স্থানটি ভাল করেই চিনত—বিশেষতঃ গত অপরাহ্ণ থেকে। জোয়েল নর্টন, কার্লটন সোয়ার এবং সে কাল কোদাল নিয়ে এসে এক বহুদিন পরিত্যক্তা পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে মিসেস চল্টের সমাধি তৈরি করেছিল। দুর্ভেদ্য কুয়াশায় ওরা এই কাজ করেছিল। চারদিকের স্বল্প কয়েকটি সমাধিস্তম্ভে লণ্ঠন ঝুলিয়ে অথবা ঠেকিয়ে রেখে সেই মৃদু আলোতে কাজ শেষ করে গায়ের চামড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরেছিল। তখন ও দ্বীপের চারিদিক লক্ষ্য করছিল। সে আজ উত্তর দিক থেকে না এসে দক্ষিণ দিক দিয়ে আসছে। কাজেই, ওখানেও নিশ্চয়ই ভিন্ন পথ দিয়ে যেতে হবে।

—জলা যে আছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ,—হাল্কা হাওয়ার কাছে ও বলে, এবং আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে এই পথটা প্রায় আধ মাইল গিয়ে পুরনো সেলার গর্তের সামনে শেষ হয়েছে।

পাইপ শেষ করে নীচে নেমে সে উঁচু বুট-জুতো খুলে একজোড়া পুরনো শব্দহীন জুতো পরে। ডেক-ঘরের দেওয়াল থেকে ধার পরীক্ষা করে নোঙর তুলে ইঞ্জিন চালিয়ে দেয়। জোয়ার শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং ওকে গভীর জলে যেতে হয়। কয়েক মিনিট পরেই ও ওর ছোট নৌকোয় উঠে লাল শৈলস্তবকের দিকে যেতে থাকে। দূর থেকেই দেখতে পায় শৈলস্তবকের পায়ের কাছে চমৎকার বেলাভূমি।

জলা সম্বন্ধে ওর ধারণা ঠিক। যদিও জলাটা এখন বাদাম, দেবদারু ও রামধনু গাছের বর্শাকারের পাতায় প্রায় ভর্তি, তবুও এটা জলাই বটে। যখন সে এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা খুঁজছিল তখন গাল পাখি নির্জনতার এই রকম উৎপীড়নে বিস্মিত হয়ে মাথার ওপরে চেঁচাতে থাকে। একটি ওস্প্রে পাখি নিজের নোংরা বাসা ছেড়ে একটা মরা স্প্রুস গাছের মাথায় পাক দিয়ে ঘুরতে শুরু করে। শেষে যখন ও পথ খুঁজে পেল তখন ওর পা পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেছে। ঘন বাদাম গাছ, জামের নীচু ঝোপ, বে-বেরী, শিপ-লরেলের ঘন বসতির ভিতর দিয়ে পথটা ওপরে উঠে গেছে। সেই

পথ ধরে ওপরে ওঠবার আগে সে একবার পিছনের জলার দিকে তাকায়।

—বসন্তে এই রামধনু গাছগুলো ফুলে ভর্তি হয়ে নিশ্চয়ই খুব অপরূপ দেখায়।—ও বলে. আমি একদিন লুসীকে দেখাতে নিয়ে আসব।

অবশেষে বিলুপ্তপ্রায় কষ্টকর পথ শেষ করে সে যখন সেলার গর্তের কাছে পৌঁছল তখন বেলা প্রায় আটটা। এখানে সমুদ্র একদম খোলা। প্রবল বাতাসের প্রতাপে দ্বীপের শীর্ষদেশে গাছ জন্মাতে পারে নি। আর, সেজন্যই অতীতের গৃহগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। কিন্তু এখনও ওর দু ঘণ্টার কাজ বাকি। তারপরে সে বোট নিয়ে দ্বীপের দক্ষিণ দিক দিয়ে বাড়িতে ফিরবে।

প্রায় একশত গজ নীচে অনেক আগাছার মধ্যে সমাধিক্ষেত্রের মরচে ধরা লোহার বেড়াটা একটু একটু দেখা যাচ্ছে. আর খানিকটা নেমে কাছাকাছি গিয়ে গতরাত্রের নিজেদের কাজের চিহ্ন চোখে পড়ে—কোদালের আঘাতে বাদামী. পাথুরে মাটি তোলা হয়েছে। ওরা কয়েকটি কালো খুটিতে পুরনো দিনের খিলানের ভাঙা স্তম্ভ স্মৃতিরক্ষার জন্য বেঁধে রেখেছে। কাল ওরা তীরে নেমে শ্লেট পাথর ও ভারী পাথরে অর্ধপ্রোথিত. কাদা ও ক্লেদে বাদামী সবুজ পিচ্ছিল ঢালু কাঠের গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছিল। বর্তমানে বিশ্বাস করা কঠিন যে এই পথ দিয়ে একসময়ে বড় বড় জাহাজ নীচের গভীর জলের পূর্ণ জোয়ার স্রোতে নামত এবং উৎসুক শাগ দ্বীপের অধিবাসীরা উৎসাহে চিৎকার করত। ও ভাবছিল. এখন এই মুহূর্তে যদি একটি কামান ধ্বনি শোনা যায় তবে কি রকম হয়। কিন্তু, তখন পৃথিবী ও সমুদ্রের যে কোন স্থানে যেতে প্রস্তুত দু-মাস্তুল চৌকো পাল জাহাজ, ক্ষুদ্র বা বড় পোত যখন দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ধুলোর মেঘ ও ছড়ানো পাথরের টুকরোর মধ্যে দিয়ে নামত তখন কামান-ধ্বনি হত।

লোহার বেড়ার নিকটতর হয়ে সে বলে, জাহাজ নামাবার সময়ে ওরা সর্বদাই কামানের ধ্বনি করত, এখন এখানে দাঁড়িয়ে অবশ্য সে কথা ভাবাও অসম্ভব মনে হয় এবং উনিও আমাকে এ সম্পর্কে কিছু বলেন নি। কিন্তু, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে এখানে একটা কামান ছিল।

তারপরেই সে তাড়াতাড়ি সমাধিক্ষেত্রের ভেতরটা পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে। কখনও হাত দিয়ে টেনে, কখনও কুড়ুলে কেটে ও দীর্ঘ বাদামী ঘাস, শক্ত ঝোপ, ছোট গাছ লোহার রেলিঙের ওপারে ফেলে দেয়। এখানে পাঁচটা সমাধি ছিল, সবচেয়ে বড়টি—যার গায়ের স্ফটিক প্রস্তরে ১৮৫২ লেখা ছিল এখনও ঠিক খাড়া হয়ে আছে। অন্য চারটি বেঁকে ভেঙে নীচের শুকনো ঘাসের মধ্যে পড়েছে। ও অন্ততঃ একটিকে দাঁড় করিয়ে পাথরের টুকরো ঠেকিয়ে রাখতে চাইল। কিন্তু শুধু দুটি হাতে তা করা সম্ভব নয়। সমাধিপ্রস্তর পরিষ্কার করে এবং জমিটা সাফ করেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

সব কাজ পছন্দমাফিক ভাবে শেষ হলে ও সমাধিক্ষেত্রের চারদিক ঘেরা ধূসর গ্রানাইট প্রাচীরের গড়ানো জায়গায় বসল। একসময় এই প্রাচীরের মাথায় লোহার রেলিং খুব সাবধানে বসানো ছিল। ও লক্ষ্য করল এখনও কতকগুলোর গোড়া খুব শক্ত।

—যে লোকটি এই কাজ করেছে,—শান্ত প্রশংসায় ও বলে, করেছে চমৎকার!

সূর্য এখন আকাশের অনেক ওপরে। হ্রস্ব শরৎ যাত্রায় সে একটু দক্ষিণে হেলে আছে। চারিদিকের গাছে ঘেরা নিস্তব্ধ বাতাস অদৃশ্য পোকার গুঞ্জনে মৃদু মৃদু কাঁপছিল। একঝাঁক বাদামী সারস কোন গুপ্ত স্থান থেকে উঠে বাঁকানো ঠোঁটে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। ওরা এ বছর অন্যান্য বারের তুলনায় বেশীদিন আছে। বোধ হয় এই রকম নির্জন বিশাল দ্বীপের লোভে তারা উত্তরের পথে প্রত্যাবর্তন করতে পারছে না। পাইপ টানতে টানতে ও এইসব ভাবছিল।

—আমার এতক্ষণ একবারও মনে হয় নি,—ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকা হাল্কা নীল ধোঁয়ার কাছে ও বলে, আমি এই কাজ শুধুমাত্র তাঁর জন্যে ছাড়া অন্য কারও জন্যে করছি। এ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। আজ দেখছি এখানে যত লোক ছিলেন সকলের জন্যেই

[আ]মি করেছি—যে লোকটি লোহার রেলিং বসিয়েছে, [যা]রা সেলারের এই গর্ত করে জাহাজ নির্মাণ করেছে, [তা] ছাড়া আরও অনেক—অনেক। আমি একসময় [এ]খানে যা যা ছিল সেই অতীতকে জাগিয়ে তুলতে চাই।

কয়েক মিনিট পরে সে প্রায় বর্বরের মত সমাধিস্থানের [বা]ইরে কুড়ুল দিয়ে সবকিছু কাটতে থাকে। ছোট [স্প্রু]স, দেবদারু, ফার, টামারাক্স ও কচি গাছের মূলগুলো [ও]র নিশ্চিত তীক্ষ্ণ আঘাতে মাটিতে পড়ে যায়। ও [ক]তকগুলো প্রায় লাল হয়ে ওঠা জলার মেপল এবং এক [খ]ণ্ড পাথরের ওপরের একটি হেয়ারবেল ফুলের কুঁড়ি বাঁচিয়ে [রা]খে। এক ঘণ্টার মধ্যে দু দিকে প্রায় বারো ফুটের [ম]ত জায়গাও পরিষ্কার করে ফেলল এবং যেখানে কাঠের গুঁড়ি ছিল সেখানে একটা মোটামুটি পথ তৈরি করে ফেলল। ঘামে ওর নীল সার্টটা ভিজে কালচে হয়ে যায় আর ও অনুতাপভরে ভাবে, জোয়েলের কাস্তেটা আনলে হত। কিন্তু ওর পক্ষে একা কাস্তে ও কুঠার এই জলা ও ঘাসে-ভরা পথে নিয়ে ওঠা সম্ভব হত না।

সব কেটে ফেলে বিরাট বোঝাটা যতটা দূরে পারা যায় জড়ো করে ও ওর নতুন পরিষ্কৃত জায়গায় ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। এখন ওই জায়গার একান্ত শূন্য পরিত্যক্ত ভাব কেটে গেছে। একে এখনও সুদূর ও নির্জন বলে মনে হলেও একেবারে পরিত্যক্ত বা বিশৃঙ্খল মনে হচ্ছিল না। বসন্তে যখন ও লুসীকে নিয়ে রামধনু ফুল তুলতে আসবে তখন ওরা সমাধিস্থানের নতুন ওঠা বন্য ঘাসগুলো কেটে দেবে এবং যদি কিছুটা চুন বালি মসলা আনতে পারে তবে এই সব স্থানচ্যুত পাথরের অন্ততঃ কয়েকটিকে আবার স্বস্থানে লাগাতে পারবে।

নৌকোয় ফেরবার আগে আর একটিমাত্র কাজ আছে। কাল রাত্রে নিদ্রাহীন চোখে দ্বীপের নির্জনতার কথা ভাবতে ভাবতে ও এই কাজটি সকালে করবে বলে স্থির করেছে। পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সর্বগ্রাসী ঝোপঝাড় ও বন লক্ষ্য করছিল। ওপারের অসমান ঢালুতে সেলার গর্তের ঠিক বাঁদিকে কতকগুলো পাহাড়ী অ্যাস গাছ লাল বেরীর মোটা মোটা গুচ্ছে পূর্ণ হয়ে আছে। ওদিকে অগ্রসর হতে হতে ওর মন আনন্দে ভরে ওঠে। ঠিক এইটাই সে চাইছিল। বৃদ্ধা মিসেস হন্টের বিশেষ প্রিয়। তিনি এদের 'রোয়ান' বলতেন। এর স্কচ নাম তাই।

সেই বিরাট গাছটিকে ও গোড়া থেকে কেটে মাটিতে ফেলে দিল, শাখাগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে ধীরে ধীরে ঢালু দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে এল। ও গাছটা দিয়ে পাথুরে মাটির বিশ্রী অসমান স্থানগুলো ঢেকে দিল, এবং সদ্য নির্মিত কবরের পাশে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিল। নতুন রৌদ্রালোকে ফুলগুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এতক্ষণে ওর মানসিক উৎকণ্ঠা দূর হয়। যদিও এখানে শুধু তারাই আসবে যারা ভাঁটার টানে টাইডাল নদীতে ছোট নৌকো চালিয়ে কালো কালো খুঁটি ও পচা কাঠের গুঁড়িতে কোন রকমে নোঙর ফেলে আসতে সক্ষম, কিন্তু তবুও এতক্ষণ পর্যন্ত ও এখানকার সৌন্দর্যের কথাই ভাবছিল।
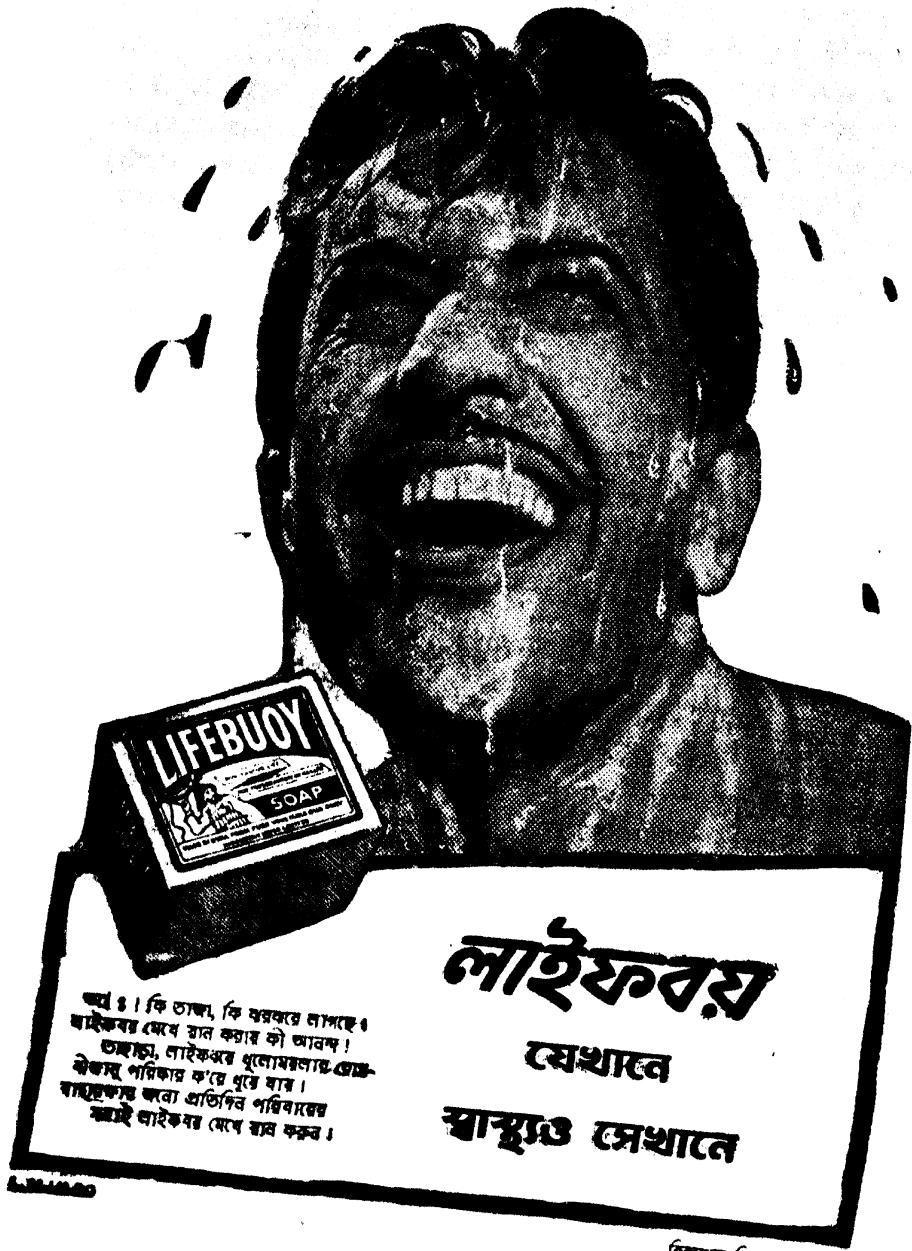
—কিন্তু সবকিছুই খুব মজার, তাই না—অন্ধকারের এত কাছাকাছি!

তারপরে সে কর্ডুরয় জ্যাকেট পরে কুড়ুল নিয়ে জলাভূমির নীচের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়।

[ক্রমশঃ]

LIFEBUOY
SOAP
আঃ! কি তাজা, কি ঝরঝরে লাগছে।
লাইফবয় মেখে স্নান করার কী আরাম!
তাছাড়া, লাইফবয়ের ধুলোময়লার রোগ-
জীবাণু পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে যায়।
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রতিদিন পরিবারের
সবাই লাইফবয় মেখে স্নান করুন।
লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

জ্ঞাসাধারণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তাঁরা যেন ভেজাল এবং নকল থেকে সাবধান কেন। এটা ভেজালের যুগ,—ওষুধে ভেজাল, খাদ্যে জাল, রাজনীতিতে ভেজাল, সাহিত্যে ভেজাল। জালে ভেজালে দেশটা ছেয়ে গেছে। আমরা যে শ্বাস নিচ্ছি তার মধ্যে যক্ষ্মা এবং সাম্যবাদের ভেজাল। মরা যে জল খাচ্ছি তার মধ্যে বিসূচিকা এবং রপেক্ষতা নীতির ভেজাল। এই সর্বগ্রাসী ভেজালের জন্যে কচিৎ কোথাও দু-একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ বা তিষ্ঠান আসল জিনিস সরবরাহের ভার নিয়েছেন। পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্যই তাঁরা এ পবিত্র য়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতবড় আদর্শের বিনিময়ে কিছু ... এবং প্রতিপত্তি ছাড়া তাঁরা আর কিছু কামনা রেন না। দেশবাসী যদি অকৃতজ্ঞতাবশতঃ তাঁদের জিনিস না কিনে ভেজাল বা নকল জিনিস কিনে তাঁদের ন্য লাভ থেকে বঞ্চিত করেন তবে তাঁদের (দেশবাসীর) কনাশ স্বয়ং রুশো সাহেবও ঠেকাতে পারবেন না।

সকলেই জানেন যে 'দেশ' পত্রিকা কিছুদিন আগে দেশবাসীর উপকারকল্পে যে স্বাধীনতা-মোদক বার রেছিলেন তাই-ই একমাত্র খাঁটি ও অকৃত্রিম স্বাধীনতা। ই স্বাধীনতা-মোদকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে মক্রমে আরও অন্যান্য পত্রিকাও নিজেদের স্বাধীনতার ধ্বজাবাহী বলে বিজ্ঞাপিত করছেন। তাঁদের ঢক্কানিনাদে ক্রেতাদের পক্ষে বিভ্রান্তি বোধ করা স্বাভাবিক। কাজেই ক্রেতাদের মঙ্গলের জন্য জানাচ্ছি যে বাজারের যতরকম ব্র্যাণ্ডের স্বাধীনতা-মোদক পাওয়া যাচ্ছে সে সবই ভেজাল ও নকল। একমাত্র 'দেশ' ব্র্যাণ্ড দেখে স্বাধীনতা-মোদক কিনবেন, নতুবা প্রতারিত হবেন!

শুধু ব্র্যাণ্ড দেখে যদি চিনতে অসুবিধা হয়, তবে 'দেশ'-মার্কা স্বাধীনতার গুণাগুণগুলোও ভাল করে জেনে রাখা ভাল। প্রথম কথাই হল স্বাধীনতা কথাটার আগে যাই অর্থ থাকুক, এখন তার অর্থ দাঁড়িয়েছে কমিউনিজমের বিরোধিতা করা। আপনি কারান্তরালে থেকেও বা চব্বিশ ঘণ্টা পরের বাড়িতে দাসবৃত্তি করেও স্বাধীন, যদি আপনি কমিউনিস্ট-বিরোধী হন। যদি বলেন যে অভিধানে স্বাধীনতার এই অর্থ লেখা নেই, তা হলে জানাই প্রচলিত জাল অভিধানগুলোর উচ্ছেদ সাধন করে 'দেশ' পত্রিকা শীঘ্রই যে প্রামাণ্য নির্ভরযোগ্য অভিধান প্রকাশ করবেন তাতে স্বাধীনতার এই অর্থই লেখা থাকবে। 'দেশ'মার্কা স্বাধীনতার অন্যান্য বিশেষত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিরুদ্ধদল মত বা নীতির উচ্ছেদসাধন, নেহেরু সরকার ও নেহেরু নীতির অবসান, নিরপেক্ষতা নীতি বর্জন, সোভিয়েটের সঙ্গে শত্রুতা করে আমেরিকার সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি। আপনি যদি চোখ-কান-নাক বুজে দেশের এই স্বাধীনতা-মোদক গলাধঃকরণ করেন তবে আপনার অশেষ মঙ্গল, নতুবা আপনি জাহান্নামে যান। আপনি যদি লেখক হন তবে 'দেশ' পত্রিকার ত্রিসীমানায় পা মাড়াবেন না। স্বাধীনতার কপিরাইট রক্ষায় 'দেশ' পত্রিকা কোনরকম শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেবে না। ইতিমধ্যেই ইংরেজ সরকার যেমন বণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতেন, 'দেশ' পত্রিকা লেখকদের জন্য তেমনি বণ্ড প্রথা চালু করেছেন। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' পর্যায়ে প্রত্যেক লেখককে ঘোষণা করতে হবে যে স্বাধীনতার অর্থ কমিউনিজমের বিরোধিতা করা, তবে তাঁরা ভবিষ্যতে 'দেশ' পত্রিকায় লেখার অধিকারী থাকবেন। যাঁরা বেসুরো কথা লিখবেন বা লিখেছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। স্বাধীনতা রক্ষায় 'দেশ' পত্রিকার অনমনীয় দৃঢ়তা একমাত্র হিমালয়ের সঙ্গেই তুলনীয়। সামান্যতম মতপার্থক্যকেও সে ক্ষমা করবে না। 'দেশ'-মার্কা স্বাধীনতা-মোদক পুরোটাই খেতে হয়; খানিক খেয়ে খানিক ফেলে দেওয়া বিপজ্জনক।

আপনারা বুঝি ভেবেছেন যে বেসুরো কথা লিখে অন্নদাশঙ্কর পার পেয়ে যাবেন তাঁর অসামান্য প্রতিভার জোরে? ভুল ভুল। ইতিমধ্যে গোপন বৈঠকে

অন্নদাশঙ্করের বিরুদ্ধে বহু উষ্মা উদ্‌গিরিত হয়েছে। যেসব কর্মচারী লেখাটি প্রকাশ করার জন্য দায়ী তাঁদের রীতিমত নাকে খত দিয়ে চাকরি বজায় রাখতে হয়েছে। এই বাজারে হাজার-দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরি তো গাছে গাছে ফোলে না! তার বদলে 'দেশ'-মার্কা স্বাধীনতা-গুলি দু-এক মাত্রা বেশী খেয়ে ফেলাও ভাল। কিন্তু 'দেশ' কর্তৃপক্ষের নজরে অন্নদাশঙ্কর চিহ্নিত হয়ে থাকলেন। সমস্ত বাংলা সাহিত্যটা 'দেশে'র মুঠোর মধ্যে। স্বাধীন মত প্রকাশের ছেলেমানুষিটা করার জন্য অন্নদাশঙ্করকে একটু পস্তাতে হতে পারে বইকি!

'শিল্পীর স্বাধীনতা' পর্যায়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের বিষয়বস্তু এ নয় যে শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে তাঁরা কী বোঝেন, বা এ ব্যাপারে তাঁদের কী অভিজ্ঞতা এবং কী দাবি। তাঁদের বিষয়বস্তু যে কী তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মনোজ বসুর ভাষায়—"কম্যুনিজম কেন আমার জীবনে ও সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য হয়নি তা বলতে গেলে কিঞ্চিৎ পটভূমিকার প্রয়োজন।" অর্থাৎ কমিউনিজমের বিরোধিতাই বিষয়বস্তু, স্বাধীনতা নয়।

মনোজ বসু চতুর লেখক। তিনি যে 'দেশ' পত্রিকার আমন্ত্রণের সুযোগ পেয়ে খানিকটা "নির্লজ্জ আত্মপ্রচার নিতান্তই দায়ে পড়ে" করে নিতে পেরেছেন তাই নয়, এক ঢিলে তিনি অনেক পাখি মারতে চেষ্টা করেছেন। কমিউনিজমকে তো তিনি মেরেছেনই, সেটা তো প্রাথমিক শর্ত; সেই সঙ্গে তিনি মেরেছেন, 'চীন দেখে এলাম' বইয়ের বিরুদ্ধবাদীদের, ভারতের সি. পি. আই.কে। "ভি-আই-পি যাঁরা লিখেছেন ও গলাবাজি করেছেন, তাঁদের বেলা লীলাখেলা।" কিন্তু মনোজবাবুর বেলায় বই বাজার থেকে তুলে নেওয়া সত্ত্বেও "হুকুম হল, প্রত্যেকটি বই প্রকাশ্যে পোড়ানোর।" এই বাক্যে যে ভি-আই-পিরা মারা পড়লেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পানিক্কর, সুন্দরলাল, শৈল মুখার্জী প্রভৃতি। কথাটার মধ্যে নেহেরু-নীতির বিরুদ্ধে ইঙ্গিত রয়েছে বলে 'দেশ' পত্রিকাকেও খুশী করা হল।

মনোজবাবু এখানে একটু সামান্য ভুল করেছেন। সুন্দরলাল, শৈল মুখার্জি সে সময়ে চীনের সপক্ষে বলেছেন বা লিখেছেন এই কারণে যে চীন তখন আমাদের রাজনৈতিক বন্ধু। রাজনৈতিক বন্ধুত্ব ডিপ্লম্যাসি নামক মিথ্যাচারের ভিয়েনে তৈরি করা হয়। যতদিন পৃথিবীতে ডিপ্লম্যাসি থাকবে ততদিন রাজনৈতিক বন্ধুত্ব নামক ভণ্ডামিকে স্বীকার করতে হবে। কাজেই উক্ত নেতারা তাঁদের এককালের চীন প্রশস্তির সমর্থনে শুধু একটা কথাই বলবেন যে ওটা ডিপ্লম্যাসি। কিন্তু মনোজবাবু রাজনৈতিক নেতা নন, তাঁর ক্ষেত্রে এ অজুহাত খাটে না। তিনি যদি বুঝেছিলেন যে "আমার জাতীয়তা-গর্বী মানসভূমিতে কম্যুনিজমের কোনক্রমেই স্থান হতে পারে না" তবে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে চীন দেখতে গেলেন কেন? যদি গেলেনই, তবে চোখ-কান-নাক বুজে চীন কর্তৃপক্ষের আদর সোহাগ উপভোগ করে তাঁরা যা বললেন বা দেখালেন ভাল ভাবে অনুসন্ধান না করে তাই-ই সরলভাবে বিশ্বাস করে অতবড় বই 'চীন দেখে এলাম' লিখে ফেললেন কেন? "দুদিনের জন্য গিয়ে আমাদের পক্ষেও সত্য নির্ণয় অসম্ভব।" এ কথা কি সেদিন তিনি জানতেন না? আর যদি তাঁর মনে এই প্রত্যয় থেকে থাকে যে সেদিন তিনি তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য কথাই লিখেছিলেন, তবে আজ এ বই প্রত্যাহার করার প্রশ্ন উঠবে কেন? তাঁর সেদিনকার পর্যবেক্ষণের মধ্যে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ভুল করার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার-গুলোর অন্যতম। গণতন্ত্রের পতাকাবাহী মনোজ বসু নিজের জন্য এই অধিকার দাবি করলেন না কেন, এবং সে জন্য প্রয়োজন হলে জনপ্রিয়তা হ্রাসের ঝুঁকি নিলেন না কেন?

সত্যি কথাটা বলব? সেদিন তাড়াতাড়ি মনোজবাবু 'চীন দেখে এলাম' লিখেছিলেন, কারণ জনমত সেদিন চীনের সপক্ষে ছিল। আজ তার চেয়েও তাড়াতাড়ি তিনি বইখানা প্রত্যাহার করেছেন, (এবং বইয়ে লেখা কথাগুলো মিথ্যে কথা বলে কার্যতঃ স্বীকার করেছেন) কারণ জনমত আজ চীনের বিরুদ্ধে। যিনি এত বেশী জনমতের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন, তিনি কি স্বাধীন?

সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে মনোজবাবু একটি ভাল কথা

খেছেন। "অর্থাৎ যাবতীয় সাংস্কৃতিক মানুষের বিবেকের দার হলেন কম্যুনিস্টরা, ওঁদের হয়ে কাজ করলে বেকবিক্রয়ের কথা আসে না।" কথাটা ঠিক, মিউনিস্টদের মতে ভালত্বের মাপকাঠি হল তাঁদের সমর্থন অসমর্থন। এবং 'দেশ' পত্রিকারও।

আজ বুঝতে পারছি নরেন্দ্রনাথ মিত্র কেন এতদিন ানন্দবাজারে' চাকরি করে একটিও প্রমোশন পেলেন । যাঁরা তাঁর চেয়ে অনেক জুনিয়র, যাঁদের সাহিত্য-তি তাঁর সাহিত্য-কৃতির সঙ্গে তুলনায় হাজার গুণ কৃষ্ট, তাঁরা 'আনন্দবাজারে' ঢুকে দু-চারদিনের মধ্যেই ামরাচোমরা হয়ে গেলেন। আর নরেন্দ্রনাথ কিনা জও সেই সাব এডিটর! এর কারণ তিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। জীবনে কোনদিন কমিউনিস্টদের রজাও মাড়ালেন না বা কংগ্রেসের ডান বা বাঁ কোন রজার দিকেই একবারও তাকিয়ে দেখলেন না। াজীবন তিনি একান্তভাবে নিজের শিল্পসত্তার দুর্গে াসীন থাকতে চেয়েছেন, এ কি এ যুগের কর্তাব্যক্তিরা খনও সহ্য করতে পারেন?

নরেন্দ্রনাথ তাঁর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে চীন এবং াশিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। চীন এবং রাশিয়ার প্রতি তাঁর কোন অহেতুক প্রীতি আছে বলে নয়, ীন এবং রাশিয়াকে কিছু অভিসন্ধিপ্রসূত গালাগাল দিয়ে নিজের স্বার্থের গুছিয়ে নেওয়ার কোন গরজ ার নেই বলে। চীন এবং রাশিয়ার লেখকদের াধীনতার অভাবের দরুন কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন না করে, নিজের দেশের লেখকদের স্বাধীনতার অনেক বেশী গুরুত্ব-র্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। স্বাধীনতা কউ কাউকে দিতে পারে না, স্বাধীনতা অর্জন করার জনিস। মৌলিক অধিকারের রাষ্ট্রীয় সনদ আসলে াধীনতা অর্জনের সাহায্যকারী শর্ত মাত্র। যিনি য়ে বা লোভে অনায়াসে নিজের অনুভূত সত্যকে কাশ করেন না বা অন্যের মতকে ধার করে নিজের ত বলে চালান, তাঁর কাছে প্রকাশের স্বাধীনতার র্থ কি? রাশিয়ায় অন্যের নির্দেশ অনুযায়ী লিখতে ার বাধা কোথায়? রাশিয়া লেখককে যত টাকা দয় এমন আর কোন দেশ দিতে পারে? যাঁরা ভয়ে বা লোভে বা প্রতারিত হয়ে 'দেশে'র অভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক অপপ্রচারের সঙ্গী হয়েছেন, তাঁরা কি স্বাধীন? লেখককে (বা যে কোন ব্যক্তিকে) অনেক যত্নে বহু সাধনায় স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। আসল কথা হল ইনটিগ্রিটি; অবিচলিত অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। যা ভয়ে ভাঙে না, লোভে মুগ্ধ হয় না, আপন উপলব্ধি বা মনন-জাত সত্যে যে চিরপ্রতিষ্ঠিত। এই কথারই ইঙ্গিত দিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যে। তিনি বলছেন: "শিল্পীর স্বাধীনতা লাভ কখনই সহজ নয়। সে পথ ক্ষুরধার আর দুর্গম। শুধু কি রাজ ভয়ই তাঁর একমাত্র ভয়? তা নয়। লোক ভয় অর্থ যশ প্রতিপত্তি হারাবার ভয় লোভ মোহ মদ—আত্মপ্রসাদ মত্ততা—কোন ভয়ই কম বিভীষণ নয়। মৃত্যুর ফাঁদ ভুবন ভরে পাতা। এই মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর আজীবন সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম গাথার নামই শিল্প।"

আমার আশঙ্কা এ রকম একটি রচনা লেখার জন্য 'আনন্দবাজার' পত্রিকার অফিসে নরেন্দ্রনাথের চাকরিতে প্রমোশন লাভের সম্ভাবনা আরও বিলম্বিত হবে। তিনি আদি ও অকৃত্রিম 'দেশ'মার্কা স্বাধীনতা-মোদক খান নি; ভুলে ভেজাল জিনিস খেয়ে ফেলেছেন।

অবশেষে 'দেশ'মার্কা স্বাধীনতা-মোদকের পতাকা বহন করে প্রচার অভিযানে বেরিয়েছেন শক্তিশালী যুগ্মাশ্ব—বিমল কর ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

অভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক প্রচারের বিশেষত্ব এই যে তা সব সময় অপর পক্ষের এবং নিজের পক্ষের অসুবিধাজনক তথ্যগুলোকে সযত্নে এড়িয়ে চলে। নিজের সব ভাল এবং অপরের সব খারাপ—এই হল প্রচারের অত্যন্ত সহজ ফরমুলা। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' পর্যায়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা অধিকাংশই যে মুক্ত মন নিয়ে লেখেন নি, 'দেশ'মার্কা স্বাধীনতা-মোদক যে তাঁরা পুরোপুরিই গলাধঃকরণ করেছেন, তার একটা প্রমাণ এই যে উপরোক্ত ফরমুলাটা তাঁরা বিনা দ্বিধায় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন। মাত্র দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এতজন লেখকের মধ্যে এমন একজনকেও দেখতে পেলাম না যিনি নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিষয়টা পর্যালোচনা করছেন! এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার! সকলের

দুর্বল স্বাস্থ্যের লোক নন, তাই তিনি একটু কম জঙ্গীবাদী। তিনি একটু সাবধানে বলেছেন : "স্ট্যালিন-পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু হালে ক্রুশ্চভ তাঁর স্পষ্ট ভাষণে জানিয়ে দিয়েছেন যে, লেখক সাহিত্যিক শিল্পীদের কাছে সহাবস্থান নেই, এমন কিছু তারা করতে পারবে না যা পার্টি-বিরোধী।" তবু ভাল যে বিমলবাবু 'কিঞ্চিৎ শৈথিল্য' কথাটা এই সর্বপ্রথম 'দেশ' পত্রিকায় উল্লেখ করতে সাহস পেলেন। এর জন্ম যদি তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় তাহলে আশ্চর্য হব না।

'দেশ' পত্রিকা জানে যে তাদের পনেরো আনা পাঠকই উল্টোরথ বা জলসা ছাড়া অন্ত কোন পত্রিকা এবং আমাদের গজেনদার বা নীহার গুপ্তের উপন্যাস ছাড়া আর কোন বই পড়ে না। তাই 'দেশ' (এবং আইয়ুব সাহেব) সত্য গোপন এবং সত্য বিকৃত করতে এতটুকু ভয় পান না। বরাবরই দেখতে পাচ্ছি চীন এবং রাশিয়াকে তাঁরা এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করেন। এ দুয়ের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য আছে তা জনসাধারণকে জানতে দিতে তাঁরা রাজী নন। কিন্তু সাহেবদের প্রকাশিত 'Encounter' পত্রিকা অনেক বেশী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। সত্যকে তাঁরা প্রকাশ করেন, যাতে পাঠকেরা তাঁদের মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলে না ভাবতে পারেন। এপ্রিল সংখ্যার 'এনকাউন্টারে' "New Voices in Russian Writing" নামে একটি বিরাট আলোচনা বহু রচনার নমুনা সহ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্যাট্রিসিয়া ব্লেক বলছেন : "...it now appears that after three decades of near-barrenness, Russia is again producing literature—burgeonings perhaps, by her nineteenth-century standards, but nonetheless splendidly promising. This development began during 'the thaw' in 1956... but was harshly arrested after the Hungarian Revolution by Khrushchev ('our hand will not tremble···' he threatened the writers)....During roughly the last three years, however, scarcely a month has passed when a young writer or poet has not published a work of the imagination, each bolder in form and substance than the last." (p. 28) অর্থাৎ তিরিশ বছরের প্রায় অনুর্বরতার পর রাশিয়া আবার প্রকৃত সম্ভাবনাপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করছে। এই প্রয়াস ১৯৫৬ সনের প্রথম পরিবর্তনের সূচনার সময়ে শুরু হয়; হাঙ্গেরীর বিপ্লবে সময় ক্রুশ্চেভ তাকে পরুষ হস্তে প্রতিহত করেন। কিন্তু গত তিন বছর ধরে এমন মাস কদাচিৎই যায় যে মাসে কোন না কোন তরুণ লেখক বা কবির প্রকৃত কল্পনা-সমৃদ্ধ রচনা প্রকাশিত হয় না। প্রতিটি রচনা পূর্ববর্তী রচনা থেকে আঙ্গিকে ও বিষয়বস্তুতে অধিকতর সাহসী।

আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এ ধরনের দুঃসাহসিক সাহিত্য-প্রচেষ্টা কালেভদ্রে এক-আধটির বেশী চোখে পড়ে না। গতানুগতিকতার স্রোতের উজানে যাওয়ার সাহস এদেশের খুব কম লেখকেরই আছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে দানবের অভিভাবকত্ব থেকে রুশ সাহিত্য এখন অনেক দূর সরে এসেছে; সমালোচনা অকুণ্ঠ কল্পনা ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনার একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। শুনলে আশ্চর্য লাগে যে ভজ্‌নেসেন্‌স্কি, বুলাত ওকুদ্‌জাভা প্রভৃতি তরুণ কবিদের কাব্যগ্রন্থের এক লক্ষ কপির একটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। আমাদের দেশে কিন্তু খুব কম কবিতার বইয়েরই এগারশো কপির সম্পূর্ণ সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। যে দেশের পাঠ-লিপ্সা এত জাগ্রত সে দেশকে দাবিয়ে রাখা সহজ নয়। এই সব কবি এবং কাজাকভ, নাগিবিন, আকসিওনোভ, প্রভৃতি কথা-শিল্পীদের কথা আমরা কিছুদিন ধরেই শুনে আসছি। 'এনকাউন্টারে' এঁদের কিছু রচনার নমুনা অনুবাদের মাধ্যমে পেয়ে আমাদের আরও সুবিধা হল।

সম্প্রতি ক্রুশ্চেভের অভিভাবক-বুদ্ধি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এ খবর আমরা রাখি। হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থানের সময়ও একবার তিনি অত্যন্ত কড়া হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কোন জাগ্রত দেশে কোন ব্যাপক প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে স্বয়ং ডিক্টেটরের পক্ষেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর। স্টালিনী বর্বরতা কিছু সময়ের জন্ম চলে, দীর্ঘ সময়ের জন্ম চলতে পারে না। তবু আমি অবশ্যই স্বীকার করব রুশ দেশ ডিক্টেটরসিপের দেশ। ডিক্টেটরসিপ

প। সোভিয়েট রাষ্ট্র আজ অনেক স্বাধীনতা ভোগ ছে, আমাদের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। কিন্তু তবু সাধারণের হাতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কিছু নেই। ধীনতার স্থায়িত্ব নির্ভর করছে কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর। দয়া দেওয়া জিনিস কেড়ে নিলে কর্তৃপক্ষকেও হয়তো প্লবের সম্মুখীন হতে হবে।

কিন্তু জনসাধারণের হাতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ আমেরিকায় আছে? ইংল্যাণ্ডে আছে? আমাদের দেশে আছে? আমি আগেই বলেছি, আমেরিকায় এবং ইংল্যাণ্ডে যেমন অর্থনৈতিক জগৎটা মুষ্টিমেয়ের শাসনে চলে গিয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যেটুকু স্বাধীনতা এসব দেশে আছে তা এঁদের দয়ার উপর নির্ভরশীল। এসব দেশের বইপত্তর থেকে আমরা অনুমান করি যে কিছু লিবারেলিজম এখনও এসব দেশে বেঁচে আছে, কিছু মত ও পথের সংঘাতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ লিবারেলিজমের চলায় কত তরুণ লেখক যে তাঁদের অনমনীয়তার দরুন প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছেন না, কত লেখক সংগ্রামের নিরর্থকতা বুঝতে পেরে অপরের মত ও চিন্তার কাছে আত্মবিক্রয় করছেন আমরা তার খবর রাখি না। নিজের দেশের অবস্থা দেখেই সে দেশের অবস্থাটা অনুমান করতে পারি। সংস্থা যখন প্রকাণ্ড হয়ে যায় ব্যক্তি-লেখকের তখন কোন মর্যাদা থাকে না, এ তো চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশের দেশ-আনন্দবাজার সংস্থা সমগ্র সাহিত্য প্রয়াসের একটা বড় অংশের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করছে। কতকগুলো অহঙ্কার ও মেদস্ফীত লোক নিরঙ্কুশভাবে লেখক ও শিল্পীদের উপর প্রভুত্ব করছেন। স্বাধীনতার মালিক কি জনসাধারণ, না এই কতিপয় স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন সম্ভোগপ্রিয় ব্যক্তির দয়ার উপর তা নির্ভর করছে?

আমাদের দেশ তো গণতন্ত্রের দেশ। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার কতটুকু ক্ষমতা জনসাধারণের আছে? জনপ্রিয় সেন মন্ত্রীসভার কলমের এক খোঁচায় নব-নাট্য আন্দোলনের কণ্ঠরুদ্ধ হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছে হয়েছে তিনি নাটক করতে দেবেন না, নাটকে তাঁর রাত্রের ঘুমে ব্যাঘাত হয়। কী উপায় আছে জনসাধারণের হাতে তাঁর এই 'সুমিষ্ট ইচ্ছা'য় বাধা দান করবার? যে গণতান্ত্রিক অধিকার বিত্তবান ও ক্ষমতাবানদের দয়ার দান মাত্র তা নিয়ে বিমল কর উল্লসিত হয়ে উঠতে পারেন (দয়া পেয়েছেন বলে), আমি পারি না।

নাটক প্রতি বার মঞ্চস্থ করার জন্ত আড়াইশো টাকা লাগবে এইটেতেই সকলে বড় গলায় আপত্তি জানাচ্ছেন। এতে কিন্তু আপত্তি করার কিছু নেই। গণতন্ত্র যদি মানতে হয়, তবে এও অবশ্য মানতে হবে যে একমাত্র পয়সাওয়ালা লোকেরাই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। পয়সাটা বড় কথা নয়। যদি কেউ নাট্য আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ বিলটা ভাল করে পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন এর মধ্যে প্রকাশের স্বাধীনতার উপরই মূলতঃ হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। নাটক করতে হলে প্রাক্-অনুমোদন চাই। সেই নাটককেই আপত্তিকর বলে গণ্য করা হবে, যে নাটক "...is likely to incite any person to resort to violence or sabotage for the purpose of overthrowing or undermining the Government or its authority in any area." (Calcutta Gazette, Dec. 10, p. 3780) ধারাটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হচ্ছে: "A performance shall not be deemed to be an objectionable performance merely (for)... expressing disapprobation or criticism..." অর্থাৎ সরকারবিরোধী হিংসার প্ররোচনা সৃষ্টি করলেই সে নাটক আপত্তিকর। তবে পলিসি বা বিশেষ কোন আইনের সমালোচনা বৈধ। আমি তো বুঝতে পারছি না সরকার যেখানে দলীয় সরকার সেখানে সমগ্রভাবে সরকারের নীতি ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করা চলবে না কেন? কথাগুলোর মধ্যে কী অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে পুলিসকে। যে কোন আবেগবান সংলাপই হিংসার প্ররোচনা দান বলে গণ্য করতে বাধা কি? কত সামান্য কথা থেকে যে মানুষ হিংসায় প্রবৃত্ত হতে পারে তার কি কোন সীমারেখা নির্দেশ করা সম্ভব?

এই আইনটি কি প্রমাণ করে না যে আমরা কার্যতঃ একজন ডিক্টেটরের অধীনে বাস করছি? পাঁচ বছর পরে ইলেকশনে আমরা তাঁকে অপসারণের সুযোগ পাব। কিন্তু এ কথা গণিতের মত অবধারিত যে বৃহৎ সমাজগোষ্ঠীতে অর্থ এবং প্রচারযন্ত্র যাঁর হাতে আছে তিনিই ইলেকশনে জিতবেন।

আসল কথা, নামেই শুধু তফাত, কার্যতঃ পৃথিবীর সমস্ত দেশ আজ ডিক্টেটরশিপের দিকে চলেছে। চোখ-কান-নাক যাঁদের খোলা আছে তাঁরা মানবজাতির ভবিষ্যৎ ভেবে ভয়ে শিউরে উঠছেন। কাজেই আসুন, আমরা বিমল করদের এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীদের মত 'দেশ'মার্কা স্বাধীনতা-মোদক খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকি।

—

পরিবারের জন্য
মায়েদের পছন্দ
ডালডা
ডালডা
খেজুরগাছ মার্কা
বনস্পতি
তেল থেকে তৈরী।
ছেলেমেয়েদের
ভিটামিনও রয়েছে।
প্রতারণা-প্রতিরোধক
টিনে
প্যাক-করা।
মনে রাখবেন ডালডা কখনও
খোলা বিক্রী হয় না।

নিন্দুকের প্রতিবেদন

চার্বাক

নিন্দুকবৃত্তির মত একটা নিন্দনীয় কর্মে চার্বাক প্রবৃত্ত হইয়াছে শুনিয়া শুভানুধ্যায়ীরা তাহাকে বিনামূল্যে প্রভূত উপদেশ দান করিয়াছেন। নিন্দাকর্ম সর্বদা নিন্দনীয় কিনা সে বিষয়ে চার্বাকের সন্দেহ আছে এবং দানপ্রতিগ্রহ সর্বদাই নিন্দনীয় এ বিষয়ে চার্বাকের সন্দেহ নাই; অতএব শুভানুধ্যায়ীর উক্ত উপদেশামৃতসমূহ সে যে পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিলে কী হইবে, সেই সকল অযাচিত উপদেশের অ-কাঙ্ক্ষিত দাতাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নাই; কেন না আমার রচনার আলোচ্য বস্তু অন্বেষণের জন্য এখন আর আমাকে মাথার চুল ছিঁড়িয়া চিন্তার আবাদ করিতে হয় না, চুলের পরিবর্তে শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপদেশ ছিঁড়িলেই আমি যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তার উপজীব্য খুঁজিয়া পাই। ইহা বড় কম সুবিধা নহে। মাথায় চুলের সংখ্যা সীমিত (সকল পাওনাদার যুগপৎ আক্রমণ করিলে চার্বাকের মুণ্ড হইতে প্রত্যেকের অংশে দুই-চারি গাছির বেশী জুটিবে না), পরন্তু উপদেষ্টার সংখ্যা অসীম। তাঁহাদের উপদেশাবলীকে আমি এইজন্য সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় বর্জন করিয়া থাকি এবং কখনও যদি উপদেশের সাপ্লাই স্বল্প হইয়া পড়ে তবে তাহাকে আমি মাথায় টাকপড়া অপেক্ষাও বড় দুর্ভাগ্য বিবেচনা করি।

নিন্দুকবৃত্তি হইতে বিরত হইবার জন্য আমি নিয়মিত যে সকল উপদেশ পাইয়া থাকি তাহার মধ্যে অনেকগুলির সারমর্ম এইরূপ: বাপু হে, খুঁত ধরা সহজ কর্ম, সৃষ্টি করা কঠিন; সাহিত্যের আসরে নামিতে চাও তো খুঁত ধরিয়া শক্তির অপব্যয় করিও না—যথাশক্তি সৃষ্টি করিয়া যাও। সৃষ্টিকর্মে নামিলে দেখিবে অপরের ছিদ্রান্বেষণের প্রবৃত্তি আপনি কমিয়া যাইবে। সমালোচনা অর্থ ছিদ্রান্বেষণ নহে, যথার্থ সমালোচনা হইতেছে সৃজনধর্মী সমালোচনা।

এই সকল উপদেশের অনেকগুলির গায়ে আবার কোটেশনের কোট চাপাইয়া দস্তুরমত জমকালো করা হয়। বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথের কোটেশন; ভদ্রলোক যে 'কণিকা' নামক পুস্তিকাখানির অর্ধেকেরও বেশী কবিতা আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া রচনা করিয়াছিলেন তাহা আমি আগে জানিতাম না।

সে যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি ওই সকল অযাচিত উপদেশ হইতে আমি চিন্তার উপজীব্য পাইয়া থাকি। ভবিষ্যতে কোটেশনগুলি সম্পর্কে আমার বিস্তারিত জাজমেণ্ট প্রকাশ করিবার বাসনা রহিয়াছে; সম্প্রতি আমি কেবল মাত্র একটি থিয়োরি উত্থাপন করিব। প্রকাশ থাকে যে উক্ত উপদেশগুলি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতেই এই থিয়োরিটির জন্ম হইয়াছে।

বলা হইয়া থাকে যে অক্ষমতাজনিত হীনমন্যতা হইতে ঈর্ষা এবং ঈর্ষা হইতে পরনিন্দার প্রবৃত্তি জন্মগ্রহণ করে। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে শক্তিমান স্বভাবতঃ পরমত-সহিষ্ণু, অসহিষ্ণুতা অশক্তির জনিতা। আমার নিবেদন, এইগুলি সর্বৈব মিথ্যা।

ঈর্ষা এবং পরমত-অসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কথঞ্চিৎ গবেষণা-কর্মে রত হইয়াছিলেন। 'কাহিনী' গ্রন্থের "গান্ধারীর আবেদন" শীর্ষক কবিতায় দুর্যোধনের জবানীতে এ বিষয়ে যুক্তি প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাহা হইলে কী হইবে, যুক্তিগুলি তিনি এমন একটি পাষণ্ডের মুখে বসাইয়াছেন এবং এমন সব দুষ্কৃতির সমর্থন-ব্যপদেশে, যে পাঠক কিছুতেই বক্তব্যগুলির সারবত্তা স্বীকার করিতে পারেন না। বিতর্কে যখন আমরা যুক্তির ধারে আঁটিয়া উঠিতে পারি না তখন প্রতিপক্ষকে ব্যক্তিগত কুৎসার ভার বাঁধিয়া ডুবাইতে প্রয়াসী হই; গান্ধারীর আবেদনে যুক্তিশৈলী আশ্রয় করিয়া 'ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম' এই তথ্য প্রমাণিত হইয়াও সপ্রমাণ হয় নাই, কারণ দুর্যোধনের পাপের বোঝা সেই যুক্তির উপর অদৃশ্যভাবে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু আমার উপপাদ্য ইহা নহে। রবীন্দ্রনাথ এবং দুর্যোধন ঈর্ষার মহত্ত্ব লইয়া তুলনামূলক গবেষণা করুন,

তাহাতে আমার শিরঃপীড়া কেন? আমি বলিতেছি, নিন্দাকর্ম শক্তিহীনের নহে, শক্তিমানের ব্রত।

সমালোচক-কুলে একদল কুলাঙ্গার দেখিতে পাইবেন যাঁহারা প্রাণে ধরিয়া কাহারও নিন্দা করিতে পারেন না। বাল্যকালে আমার একজন শিক্ষক ছিলেন (গুরুনিন্দা করিতে যাইতেছি, গুরুতর নিন্দাতেও আমি পরাঙ্মুখ হইব না।)—তিনি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী হইতে মানকুমারী বসু এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার হইতে যতীন্দ্রমোহন বাগচী পর্যন্ত যে কোন লেখকের যে কোনও রচনাই পড়াইতে বসিতেন, অমনি বলিতেন: অহো অহো! এরূপ উৎকৃষ্ট রচনা বাঙ্গালা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি নাই। আমরা কয়েক বৎসরে তাঁহার নিকট হইতে কয়েকশত 'অদ্বিতীয়' সাহিত্যকর্মে রস গ্রহণ করিয়া সাহিত্য সম্পর্কে যে কতদূর বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা সহজেই অনুমেয়। হুবহু এই শ্রেণীর সমালোচকের সংখ্যা এদেশে কম নহে; তাঁহাদের নিকট সকল রচনাই উৎকৃষ্ট। শুনিয়াছি তাঁহারা নাকি উদারমতাবলম্বী বলিয়া কাহারও মনে ব্যথা দিতে চাহেন না। আমি বলি তাহা হইলে তাঁহাদের সমালোচনা করিবার অপস্পৃহা কেন, আপনাপন উদার মতের তৈলপাত্রটি লইয়া গঙ্গার ঘাটে বসিয়া থাকিলেই তো পারেন—নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট নির্বিশেষে সকল স্নানার্থীকে প্রশংসার তৈলমর্দন করিয়া যাওয়াই যখন তাঁহাদের অভিপ্রায়। আসলে ইঁহারা শক্তিহীন, সাহস করিয়া কোদালকে কোদাল বলিতে ইঁহাদের শ্বাস-যন্ত্র রুদ্ধ হইয়া আসে; ভাবেন, কী জানি হয়তো যাহাকে কোদাল ভাবিতেছি উহা প্রকৃতপক্ষে চাদর—দুইটি বস্তুই যখন স্কন্ধে বাহ্য হয়, চট করিয়া কিছু বলিয়া ফেলা সঙ্গত নহে।

রবীন্দ্রনাথের দুর্যোধন যাহা বলেন নাই, বলিলেও বুঝাইতে পারিতেন না, 'শনিবারের চিঠি'র চার্বাক সেই কথা বলিলে সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে নিন্দা হইতেছে সমালোচকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য; এবং নিন্দাকর্ম দুর্বলের সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই সহজ কথাটা না বুঝিবার একটি কারণ হইল আমরা অনেকেই নিন্দা শব্দটির অর্থবোধে ভুল করি। কুৎসা এবং নিন্দা এক নহে। কুৎসা দুর্বলের কার্য, নিন্দা প্রবলের। কুৎসার সৃষ্টি সহস্র গুঞ্জনে, নেপথ্যে; নিন্দার আবির্ভাব একক কণ্ঠের দুঃসাহসে, স্পষ্টতার প্রকাশ্য আলোকে। স্তাবকতা এবং গুণগ্রাহিতায় যে পার্থক্য, যে পার্থক্য লালসা এবং প্রেমে, কুৎসা এবং নিন্দায়ও পার্থক্যের পরিমাণ ততখানিই।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। জনশ্রুতির চোরাগলি হইতে যখন আপনি শুনিতে পাইলেন, অমুক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম প্রধান এবং খ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমুককুমার অমুক মফস্বলের সাহিত্য-সভায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া মদ্যপানে বেহুঁশ হইয়াছিলেন, তখন বুঝিবেন ইহা নিন্দা নহে, কুৎসা। জনশ্রুতিটি সত্য কিংবা মিথ্যা সে প্রশ্ন অবান্তর; সত্য হইলেও ইহা কুৎসা, মিথ্যা হইলেও। কিন্তু সেই একই সাহিত্যিকের রচিত গল্প-উপন্যাস সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক যদি লেখেন, "সাহিত্যের স্বর্ণপাত্রে এইরূপ পচাইমদ চোলাই না করিয়া ইনি যদি বাস্তবিক চোলাই মদের কারবারে ব্যাপৃত থাকিতেন তবে আমরা আপত্তির কারণ দেখিতাম না," তাহা হইলে (অবশ্য উক্ত উৎসনা-বর্ষণের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে হইবে) ইহা কুৎসা নহে, নিন্দা। ইহা হইতেও যিনি নিন্দা কাহাকে বলে, কুৎসার সহিত নিন্দার পার্থক্য কী, বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া অল্প কিছু অপেক্ষা করিতে হইবে; আগামী সংখ্যা হইতে আমি নিন্দার বাস্তবিক উদাহরণ দর্শাইব।

নিন্দা যে সমালোচকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য এ বিষয়েও অনেকের সন্দিগ্ধতা শুনা যায়। মহাশয়, সমালোচনা কী? না, কোনও শিল্পকর্ম সম্বন্ধে সম্যক পর্যালোচনা। আর নিন্দা কী? না, কোনও ব্যক্তি বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত ত্রুটি বিকৃতি কদর্যতা ও অন্যান্য দোষগুলির সোচ্চার ঘোষণা। তাহা হইলে নিন্দা ব্যতীত সমালোচনা, দোষত্রুটির সোচ্চার ঘোষণা ব্যতিরেকে সম্যক পর্যালোচনা কী করিয়া সম্ভব? বলিতে পারেন, কেবলমাত্র দোষত্রুটি কেন, গুণগুলির আলোচনাও তো সমালোচকের কর্তব্য। না মহাশয়, সমালোচক যখন শিল্পকর্মের সমালোচক তখন গুণাবলীর পর্যালোচনায়

তাহার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। কারণ শিল্পের গুণ তাহার রসোত্তীর্ণতায় এবং রসের বিচার রসগ্রাহীর আপন অন্তরে; তাহা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা অবান্তর। একটি গোলাপ ফুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাহার পাপড়িগুলির সংখ্যা, বর্ণের ফটোমেট্রিক পরিমাপ এবং সৌগন্ধের প্রশংসায় আড়াই প্যারাগ্রাফ অলঙ্কারবহুল শব্দপ্রয়োগ একেবারেই অবান্তর। গোলাপ ফুল বলিলেই শ্রোতার মনে একটি স্পষ্ট ভাবের উদয় হয়; সমালোচকের আর কষ্ট করিয়া টীকা করিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু একটি গোলাপ যদি নির্গন্ধ হয়, যদি তাহার তিনটি পাপড়ি কীটদষ্ট থাকে, তাহার পরাগে যদি কীটাণুর [illegible]কোগার দেখা যায়, তবে সেইগুলি বলা প্রয়োজন। কারণ সাধারণভাবে গোলাপ বলিলেই শ্রোতার অন্তরে যে ভাবের উদয় হইল, তাহার সহিত সমালোচকের নিন্দাবাদগুলি যোগ করিলে তবে শ্রোতা সেই বিশেষ গোলাপটিকে বুঝিতে পারিবে। পদ্য বলিলেই বুঝা যায় তাহাতে মিল রহিয়াছে, সে কথা সমালোচককে বলিতে হইবে কেন? উপন্যাস বলিলেই স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইব যে তাহাতে একটি গল্প আছে, সমালোচক কোন্ দুঃখে সে কথা ফেনাইয়া বলিবেন? সাহিত্যিক বলিলেই আন্দাজ করিব যে ইঁহার অনুভূতিগুলিতে কিছু না কিছু বৈচিত্র্য থাকিবে, সেগুলির কথা তুলিয়া প্রশংসা করিতে হইবে কেন? সমালোচকের কর্তব্য হইতেছে—পদ্যটি যে কাব্য হইতে পারে নাই, উপন্যাসটি যে কাহিনীর পটভূমিতে জীবনকে প্রতিবিম্বিত করিতে পারে নাই, সাহিত্যিকটি যে অনুভূতির বৈচিত্র্যগুলি অপরের রচনা হইতে না বলিয়া এবং প্রায়শঃ না বুঝিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, এই সকল কথা বুঝাইয়া বলা।

এবং বুঝাইয়া বলিতে গিয়া সমালোচক যদি নিতান্তই নির্ব্যক্তিক শীতলতার অহিংস অস্পষ্টতা ছড়াইয়া রাখেন, যদি তাঁহার রচনায় ব্যক্তিত্বের রক্তিম উষ্ণতা ব্যক্ত না হয়, তবে তাঁহার কথাগুলি কষ্ট করিয়া পড়িতে যাইবে কোন্ মূর্খ? আমরা আমাদের সমালোচনা প্রবন্ধে নিন্দনীয় বস্তুগুলির দোষত্রুটি প্রকাশ করিয়া থাকি। এবং সেই প্রকাশ আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকোপে উত্তাল হইয়া উঠে; আপনারা বলেন, ইহা সমালোচনা হইল না, নিন্দা হইল মাত্র। আমরা প্রতিবাদ করি না, কেবলমাত্র সবিনয়ে বলিয়া থাকি যে ইহা নিন্দা হইল বলিয়াই সমালোচনা হইল। নিন্দা ব্যতীত বরঞ্চ পার্লিয়ামেণ্টে বিরোধী দলের বক্তৃতা সম্ভব, সাহিত্য-সমালোচনা কদাপি নহে।

'সৃজনধর্মী সমালোচনা' কথাটি আমি অল্প দিন হইল প্রথম শুনিয়াছি। এবং শুনিয়া যারপরনাই কৌতুক বোধ করিয়াছি। কৌতুকের কারণ এই যে ইহা শুনিয়া আমার একটি পুরাতন কাহিনী স্মরণ হইয়াছিল।

দেশবিভাগের স্বল্পকাল পরে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আমি পূর্ব পাকিস্তানের একটি মফস্বল শহরে বাস করিতেছিলাম। একদিন সেখানকার কোনও রাজনৈতিক সভায় একজন বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'কৃষক আন্দোলনের তরঙ্গে সারা পাকিস্তান আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।' তৎক্ষণাৎ তিন-চারিজন শ্রোতা উঠিয়া বক্তার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, 'পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এই কথা বলা এবং শুনা অত্যন্ত গুনাহ্, দেশদ্রোহী মীরজাফর ব্যতীত এরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না।' বেচারি বক্তা কয়েকবার আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বুঝাইতে চাহিলেন যে ভাঙ্গিয়া পড়া কথাটা তিনি নিতান্তই আলঙ্কারিক অর্থে বলিয়াছেন; পাকিস্তানের ভগ্নদশা তাঁহার কল্পনারও বাহিরে। কিন্তু জনতা তখন মামার্ষু (মার্ ধাতু হইতে সন্ এবং উ প্রত্যয় যোগে সিদ্ধ) হইয়া উঠিয়াছে; অবশেষে প্রত্যুৎপন্নমতি বক্তা আপন বক্তব্য সংশোধন করিয়া বলিলেন, 'কৃষক আন্দোলনের তরঙ্গে সারা পাকিস্তান গঠনমূলক ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।' তখন জনতা শান্ত হইল।

সৃজনধর্মী সমালোচনা বস্তুটিও গঠনমূলকভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ার মত কোনও প্রত্যুৎপন্নমতির উদ্ভাবন; শুনিতে সুমিষ্ট কিন্তু অর্থবিচারে সুস্পষ্ট নহে। সমালোচনা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবধর্মী, বিপ্লব যদি পরোক্ষভাবে সৃজনধর্মী হয় তবে সার্থক সমালোচনামাত্রই সৃজনধর্মী; বিশেষ করিয়া লেবেল আঁটিতে যাওয়া নিরর্থক।

যে-সকল সমালোচনাকে সৃজনধর্মিতার লেবেল

ছাঁটিয়া উচ্চ কোটিতে সূচিত করা হয়, সেইগুলি মূলতঃ সমালোচনাই নহে; সেইগুলি হয় প্রকাশকের বিজ্ঞাপন, না হয় স্তাবকের স্তুতিবাদ, কিংবা সুহৃদের পৃষ্ঠকণ্ডুয়ন, অথবা সমালোচনার সম্পর্কশূন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য-প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'কাব্যের উপেক্ষিতা' শীর্ষক একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধকে ভুল করিয়া কেহ কেহ সমালোচনা মনে করিয়াছিলেন; তাঁহারা সমালোচনার অর্থ জানেন না। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' এবং কী-যেন-এক-ব্যক্তির রচিত 'শীতে উপেক্ষিতা' একই শ্রেণীর সাহিত্যকর্ম, রম্যরচনা শ্রেণীর। তফাতের মধ্যে—একটি সার্থক রম্যরচনা, অপরটি রম্যরচনার অ্যাবোরশন।

না মহাশয়, সৃজনধর্মী রচনার মধ্যে চার্বাক নাক গলাইতে চাহে না, চার্বাক সম্মার্জনীধর্মী সমালোচনায় আস্থাবান। বাংলা সাহিত্যের নিতান্তই ক্ষুদ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, সৃজনধর্মী সাহিত্যের চোরাবালিতে পা ফেলিলে বড় বড় শক্তিমান সমালোচকও শেষ পর্যন্ত তলাইয়া যান, কড়া ইস্পাতের তৈয়ারি সমালোচনার কলম ভাঙিয়া তাঁহারা শেষ পর্যন্ত কাব্য-উপন্যাস-গল্প-নাটকের কর্তাল বানাইতে বসেন। চার্বাক সৃজনের কারবার হইতে শতহস্ত দূরে থাকিবে। ভুল করিয়াও তাহাকে ক্রিয়েটিব লিটারেচারের আসরে পাত পাড়িতে দেখিবেন না, এই প্রতিশ্রুতি।

আমার প্রতিবেদনে যে সকল সাহিত্যিক অবিলম্বে নিন্দিত হইবেন, তাঁহারা যদি আমার এই প্রতিশ্রুতিটি স্মরণ করেন তবে তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি সম্বরণ করা দুরূহ হইবে না। নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলাম বলিয়াই আমি তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলাম না, অতএব নিন্দুকের নিন্দাপ্রীতি তাঁহাদের নিকট শাপে বর মনে হওয়াও আশ্চর্য নহে। বঙ্গদেশ এমনই বিচিত্র স্থল যে এখানে বিরূপ সমালোচনায় সাহিত্যিকের খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ কিছুরই হানি ঘটে না; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা বিলক্ষণ। এখানে সকলেই ফাঁকা মাঠে গোল দিতে দক্ষ, দ্বিতীয় খেলুড়ি মাত্র ইঁহাদের চক্ষুশূল। সেই কারণে, আমার বিশ্বাস, সাহিত্যিকগণ আমাকে কখনই শত্রুজ্ঞান করিবেন না, মিত্রজ্ঞানে আলিঙ্গন করিবেন।

গৌরচন্দ্রিকার আয়তন দেখিয়া বিব্রত বোধ করিতেছি। এইখানে যদি একটি পুস্তকের সমালোচনা অর্থাৎ নিন্দাবাদ আরম্ভ করি তবে নির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে কুলাইয়া উঠিতে পারিব মনে হয় না। আবার এইখানে যদি প্রতিবেদন সমাপ্ত করিয়া দেই তবে সম্পাদকের নিকট চুক্তিভঙ্গের দায়ে পড়িব। এখন বুঝিতে পারিতেছি, সাহিত্যিকেরা কিসের জন্য বিস্তর বাজে মাল পুরিয়া পুস্তকের কলেবর অযথা বৃদ্ধি করেন। মহাজন-রীতি অনুসরণ করিয়া আমিও যদি কিঞ্চিৎ অবান্তর প্রসঙ্গ টানিয়া আনি মন্দ হয় না। তবে অবান্তর প্রসঙ্গের নিয়মগুলি মানিতে হইবে। যথা, মূল রচনার সহিত বর্ধিত অংশের অসংলগ্নতা যত প্রকট হইয়া উঠুক ক্ষতি নাই, কিন্তু অসংলগ্ন অংশটি যেন যথেষ্ট পরিমাণে কৌতূহলোদ্দীপক হয়—এই হইল এক নম্বর নিয়ম। ভ্রমণ-কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধির জন্য আপনি একটি অবৈধ প্রণয়ের কেচ্ছা জুড়িতে পারেন কিন্তু শালগম চাষের প্রণালী জুড়িলে চলিবে না। ভ্রমণ-কাহিনীর সহিত অবৈধ প্রেম এবং শালগম চাষ দুইটি বিষয়ই সমান অসংলগ্ন; কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক বিধায় প্রথমটি এখানে বিধিসম্মত, দ্বিতীয়টি অচল। দুই নম্বর নিয়ম হইল—অসংলগ্ন প্রসঙ্গটির বর্ণনায় অপ্রত্যাশিত চমক লাগাইতে হইবে, নতুবা আপনি ফেল পড়িলেন। পূর্বোক্ত উদাহরণে শালগমের কৃষিপদ্ধতি বর্ণনাও চলিতে পারে যদি আপনি শালগমের কথা লিখিতে লিখিতে [illegible] করিয়া শালগ্রামের কথায় লাফাইয়া আসিতে পারেন। তৃতীয় নিয়ম হইতেছে—পাণ্ডিত্য ফলাইয়া অবান্তর অংশকে গুরুগম্ভীর করিয়া তোলা। শালগম হইতে শালগ্রামের প্রসঙ্গে আসিবার মত উল্লম্ফন-ক্ষমতা যদি আপনার না থাকে তবে শালের মঞ্জরী এবং গমের শীষ দ্বারা ক্রস-ব্রিডিং প্রক্রিয়া মারফত কী করিয়া শালগমের সৃষ্টি হইয়াছিল এ বিষয়ে ফুটনোট কণ্টকিত কোটেশন বহুল গবেষণা প্রয়োগে আপনি সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। মোট কথা পাঠককে লইয়া যখন সাহিত্যিকের কারবার, তখন পাঠক মজানো হইল আসল কথা—তাহা পাঠকের যৌনবোধের বগলে সুড়সুড়ি দিয়া হউক, বা তাহার অজ্ঞতার টেক্কার উপরে আপন চালাকির তুরু[illegible] ঠুকিয়া হউক—পদ্ধতিটি গৌণ, উদ্দেশ্য হইল আসল কথা

সাহিত্যিকদের অনুকরণে আমার প্রতিবেদনেও
লগ্ন প্রসঙ্গ আমদানি করা এমন কিছু কঠিন কর্ম
য়া মনে হইতেছে না। আর কিছু না হউক,
তর কাছে প্রফিউমো স্যাণ্ডাল রহিয়াছে, জুড়িয়া
ত কতক্ষণ? বিশেষতঃ উক্ত কেচ্ছাটি জুড়িবার পক্ষে
মার প্রতিবেদনেই জুতসই স্থান রহিয়াছে; ইহার
ীয় পৃষ্ঠায় যে কুৎসা এবং নিন্দার তুলনামূলক
লোচনা রহিয়াছে সেইখানে একটি তারকাচিহ্ন দিয়া
। চারেক প্রফিউমো প্রসঙ্গ আলাদা কাগজে লিখিয়া
ল কম্পোজিটর মহাশয় অবলীলাক্রমে লেখাটিকে
মত সাজাইয়া দিবেন; আপনারা ধরিতেও পারিবেন
যে ইহা অবয়ব-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কপট সংযোজন।

কিন্তু হায়, শুনিতে পাইতেছি প্রফিউমো স্যাণ্ডাল
পাইতে হইলে নাকি বিলাতের কোন্ এক সিণ্ডিকেটের
কট নগদমূল্য গুনিয়া দিয়া অনুমতি লইতে হইবে;
বা কপিরাইট আইনের মকদ্দমা অবশ্যম্ভাবী। কী
ন্যায় কথা, আকাশের আলো-বাতাস এবং মৃত্তিকার
লের মত স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত কুৎসায় মানুষমাত্রেরই
ন্মগত অধিকার—তাহার উপরেও ইংরাজরা ব্যক্তিগত
ালিকানা বসাইয়াছে। অথচ সোভিয়েট দেশের দিকে
াকাইয়া দেখুন—(এইখানে সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, স্পেস
াভেল, ইত্যাদি প্রসঙ্গ জুড়িয়া দেওয়া যায়: অবান্তর
প্রসঙ্গ জুড়িবার ইহাও একটি সাহিত্যসম্মত কৌশল।)

কিন্তু না, সৃজনধর্মী সাহিত্যের কানাচ মাড়াইব
না বলিয়া যখন প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তখন সাহিত্যসম্মত
রীতিতে কলেবরবৃদ্ধি করিবার অধিকার আমি কী
করিয়া পাইলাম? আমাকে যদি প্রতিবেদনের অবয়ব-
বৃদ্ধি করিতে হয় তবে নিজস্ব কঠিন পথেই তাহা করিতে
হইবে। সৃজনধর্মী পথের শর্টকাট চলিবে না।

অর্থাৎ আরও কিছু মাল ছাড়িতে হইবে। অগত্যা
তাহাই করিব। দ্বিতীয় প্রতিবেদনের গৌরচন্দ্রিকায়
লাগাইব মনে করিয়া যাহা মগজে জমাইয়া রাখিয়া-
ছিলাম, তাহা আগাম খরচ করিয়া ফেলিতে হইবে।
তাহাই করিতেছি।

সাহিত্য নামধেয় যে বস্তুগুলির নিন্দাঘোষণায় আমাকে
তৎপর হইতে হইবে তাহার মধ্যে বেশির ভাগ উপন্যাস
জাতির অন্তর্গত। বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাসের
সংখ্যাধিক্য দেখিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন বাঙ্গালী
বুঝি চরিত্রগতভাবে উপন্যাসপ্রিয়। ইহা সত্য নহে।
প্রকৃত উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলে তাহা যে
প্রথমতঃ অত্যন্ত অনাদর পাইবে ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত।
যে অর্থে ওয়ার অ্যাণ্ড পীস, ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকৃত উপন্যাস সে অর্থে উপন্যাস রচনায়
বাঙ্গালা দেশে কেহই সমর্থ হয়েন নাই; বঙ্কিমচন্দ্রও
নহেন। তবুও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের কাছাকাছি পৌঁছিয়া-
ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ গোরা গ্রন্থে একবার, এবং ঐ এক-
বারই মাত্র, রীতিমত উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হইয়া-
ছিলেন; তাঁহার কনিষ্ঠদের মধ্যে কাহাকেও আজ অবধি
উপন্যাসে একনিষ্ঠ হইতে দেখিলাম না। অন্নদাশঙ্কর
'সত্যাসত্য'-পরিকল্পনায় উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন
পর্যন্ত, পালন করেন নাই; তারাশঙ্কর গোড়ার দিকে
যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উপন্যাসেরই শাবক, কিন্তু
তিনিও প্রবীণ বয়সে নবীনদের প্রভাবে পড়িয়া জনপ্রিয়
কাহিনী রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাস রচিত হইবার যুগ
ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিগত হইয়াছে আবার একবিংশ
শতাব্দীতে আসিতে পারে; বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর
পক্ষে উপন্যাস রচনা দুরূহ। কারণ উপন্যাস রচনা
একান্তই প্রবীণ বয়সের কর্ম, অভিজ্ঞতার বলিরেখা
বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিপক্বতায় কোমল হইয়া আসিলে তবেই
সাহিত্যিকের পক্ষে ঔপন্যাসিক হওয়া সম্ভব। এবং
জাতিগত ভাবে বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী অপরিণত,
অর্বাচীন, অ্যাডোলেসেণ্ট। তরুণ সাহিত্যিকের পক্ষে
স্মরণীয়তম কাব্যের আকস্মিক জনক হওয়া সম্ভব, জ্ঞানগর্ভ
প্রবন্ধের অধ্যবসায়ী স্রষ্টা হওয়া সম্ভব, মুক্তার মত নিটোল
ছোটগল্প সৃষ্টি হওয়া সম্ভব তাহার বেদনার্ত অন্তরের
অন্ধকার শুক্তিগহ্বরে; কিন্তু ঔপন্যাসিক নৈব নৈব চ।
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মামা খুড়া এমন কি ঠাকুরদাদা হইতে
পারি কিন্তু জ্যাঠামহাশয় হইতে চাহিলে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত
না হইয়া উপায় নাই। ঔপন্যাসিক হওয়াও জ্যাঠামহাশয়

হইবার মত। অপরিপক্ক ভূয়োদর্শনে উপন্যাস রচনা হয় না। জ্যাঠামহাশয়ের পরিবর্তে জ্যাঠা ছেলে হইবার মত উপন্যাসের পরিবর্তে তখন প্রিটেনশনবহুল বড় গল্প মাত্র সৃষ্টি হয়।

তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে উপন্যাসের এত নামডাক কেন? ইহার কারণ, বাঙ্গালী বড় সাইজের মাল চাহে। বিবাহের ভোজসভায় যে-কারণে রোহিত মৎস্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই একই কারণে বিবাহের উপচারে উপন্যাস ছাড়া চলিবে না। পুঁটি পার্শে মৌরলা আমরা অপছন্দ করি এমন নহে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভোজে সেগুলি পাইলে আমরা খুশী হই না।

অর্থাৎ মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়, রবিবারের দৈনিকপত্রে কয়েকটি ছোটগল্প না হইলে আমাদের চলে না কিন্তু পুস্তক ক্রয় করিতে কিংবা সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে ঋণ করিতে যাইয়া আমরা উপন্যাস ব্যতীত কিছুই লইব না। ছোটগল্প হইতেছে কুঁচা মৎস্য, ঘরোয়া পরিবেশে তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু বিবাহের ভোজসভায় কিংবা সাধারণ পাঠাগারের হোটেল-মেসে গল্পের কুঁচা চলিবে না—উপন্যাসের রুই-কাতলা চাহি।

অতএব বরফ-ঘরের জমাটি মাল, আমদানি করা পচা মাল, ধাপার নর্দমায় লালিত দুর্গন্ধ মাল, সকলই চলিতেছে, সকলেরই চাহিদা আছে। উপন্যাসের বাজার সর্বদাই চড়া; তাই এন্তার ভেজাল চলিতেছে। সিনেমার চপ-কাটলেট বানাইতে তো সর্বাপেক্ষা পচা মালের চাহিদাই সর্বাধিক। এইগুলির সাড়ে পনরো আনা বস্তুই যে আদৌ উপন্যাস নহে সে কথা বলিতেই বা কে যাইবে, শুনিতেই বা কে চাহিবে? ক্রমশ: অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে সক্ষম সাহিত্যিকরাও প্রকৃত উপন্যাস রচনার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন, জনপ্রিয়তার ফর্মুলা উল্লঙ্ঘন করিতে তাঁহাদের সাহস হইতেছে না।

তাহা হইলে বাঙ্গালীর বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিবে কী করিয়া, কী করিয়া তাহার অ্যাডোলেসেন্ট যুগ বিগত হইবে?

কী করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু হইবে। বামনের জগতে হঠাৎ একজন কল্কি অবতার জন্মাইবেন, জনপ্রিয়তালুব্ধ সাহিত্যিকের রাজ্যে একজন যুগন্ধর, যিনি পাঠককে সুড়সুড়ি দিয়া নহে—কানে ধরিয়া সুসাহিত্য পাঠে বাধ্য করিবেন। কিছুদিন পূর্বে দুর্বলতর লেখকেরা উপন্যাস ছাড়িয়া রম্যরচনা নামের একপ্রকার বস্তু বানাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থা আর কিছুদিন চলিলে প্রকৃত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারিত। কিন্তু আবার দেখিতেছি হাবিজাবি উপন্যাসের ঘোলাটে জোয়ার শুরু হইয়াছে। ইহার অর্থ, প্রকৃত ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব এখনও হয় নাই।

অথবা ইহাও হইতে পারে, তেমন ঔপন্যাসিক, তেমন উপন্যাস, আবির্ভূত হইয়াছে কিন্তু চার্বাকের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। চার্বাক নিরপেক্ষ পাঠক নহে, পেশাদার সমালোচক অর্থাৎ নিন্দুক মাত্র। দোষ-ত্রুটি-অপূর্ণতার সন্ধানই তাহার বৃত্তি, সেই সকল আবর্জনার পাশাপাশি যদি কোন পরিপূর্ণ সাহিত্য কোথায়ও ফুটিয়া উঠে, তাহার সন্ধান লওয়া তাহার পক্ষে পরোধর্ম ভয়াবহ।

এই কথা শুনিয়া আপনারা যদি আমাকে ড্রেন ইন্‌স্পেক্টর বিশেষণে ভূষিত করেন তাহাতে আমি লজ্জিত হইব না। নাগরিক জীবনে ড্রেন ইন্‌স্পেক্টরের ভূমিকা উদ্যানপালক অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। তাহা ছাড়া সাম্প্রতিক বাঙ্গালা সাহিত্যকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের তো ড্রেন ইন্‌স্পেক্টরকে তারিফ করা উচিত; কারণ কিছু কিছু সাহিত্যিকের নর্দমার প্রতি যেরূপ প্রবণতা দেখা যায় তাহাতে নর্দমার কাছাকাছি একজন শক্তিমান পর্যবেক্ষক না থাকিলে তাঁহাদের টানিয়া তুলিয়া প্রাণে বাঁচাইবে কে?

●

শ্রীমতীর ছন্দপতন

হীরালাল দাশগুপ্ত

ঘরে ননদিনী বাইরে কালা
রাধার হয়েছে বিষম জ্বালা,
কেমনে জল আনতে যাই !

নদীতে কুমীর ডাঙায় বাঘ,
এদিকে বোশেখ ওদিকে মাঘ
ঠাণ্ডা-আগুন ফাগুন নাই !
সুখ নয়, শুধু শান্তি চাই—
কোথায় পাই !

আলোক-চক্রে ধমনী 'পর
পূর্বপুরুষ বংশধর
দুই দিক দিয়ে শরীরে ঠেলা—
এ-দিকে মনের নেইও বেলা
গুরু নিতম্ব বক্ষ ভার
চলতে চরণ পারে না আর।
এ-ঘাটে কুমীর ও-ঘাটে বাঘ—
এ-দিকে হৃদয়ে পূর্ব-রাগ।
কেমনে জল আনতে যাই।
কোন্ ঘাটে জল আনতে যাই !
কোথায় গেলে শান্তি পাই !

ধুলোর বিন্দু কম্পমান
অতীত এবং বর্তমান।
কোথায় দ্বারকা বৃন্দাবন ?
এ-দিকে মগজ ও-দিকে মন !
মৃতের সৈন্য সংখ্যাহীন
হাড়ে হাড়ে আর মজ্জা লীন।
তাদের স্বপ্ন রক্ত ঢালা
ভাঙ্‌রে সোনার বন্দীশালা,
ছুড়ে ফেলে দে হীরার বালা,
কুল ছেড়ে আয় কুলের বালা !

রাধার হয়েছে বিষম জ্বালা।
ঘরে ননদিনী বাইরে কালা।
কেমনে জল আনতে যাই—
কোন্ ঘাটে জল আনতে যাই।

কোথায় শান্ত কদম তল ?
কোথায় শীতল যমুনা জল ?
কোন্ ঘাটে জল আনতে যাই !
সুখ নয়—শুধু শান্তি চাই—
কোথায় পাই !

—

কী যে চাই ?

মায়া বসু

সুতীব্র তৃষা মিটাতে চেয়েছি কয় ফোঁটা বারিবিন্দু
চাই নি সাগর, উথাল-পাথাল সিন্ধু !
স্রোতের ফুলের মতন চাই নি ভাসতে—
এক কূল থেকে আর কূলে যেতে আসতে।

হাজার প্রাণের সমারোহ তবু ভরল না এই মন তো
পেরুলাম কত পাহাড় নগর বন তো !
দূরে যাই যাকে ভুলতে—
বার বার সেই করাঘাত করে স্মৃতির দুয়ার খুলতে।

যে নদীকে বাঁধা যায় না, তাকেও এই বুকে মোর বাঁধলাম
চির-পিপাসায় আবার কেন যে কাঁদলাম !
অথই ঢেউয়ের দোলায় কেবলি দুললাম
নীরের মায়ায় তীরকেই শুধু ভুললাম।

শূন্য মুঠিটি ভরতে—
ব্যর্থ আকাশে দু হাত বাড়ায়ে কী জানি কী চাই ধরতে।

—

পায়রা

সুশীলকুমার গুপ্ত

উড়ে আয় পায়রা তুই, উড়ে আয় দুই পাখনা মেলে ;
সময়ের নখে দীর্ণ দেহের-বিটকে উড়ে আয়, তুই আয়।
এখনো দাঁড়িয়ে আছি তোরই জন্যে ; শয়তান শীতের হাত থেকে
বাঁচিয়েছি কিছু রোদ, সহ্য করে ভয়ংকর হাওয়ার দস্যুতা
রেখেছি লুকিয়ে বুকে কয়েকটা খড়কুটো। উড়ে আয় তুই—
শিকারী ঝড়ের গুলি তুচ্ছ করে, বৃষ্টির বীভৎস ছিঁড়ে-খুঁড়ে
উড়ে আয়, বাঁধ নীড়, একবার জাল প্রাণে পরিপক্ক আকাশের স্বাদ।

ধরবো তোকে দুই হাতে, থর থর করে কাঁপবি তুই।
চন্দ্রনিক্ত দেহে বাজবে স্বপ্নের সিম্ফনি, রক্তচ্ছন্দে যাবে শোনা
যে গল্পের শেষ নেই ; পালকের জ্যোৎস্না দিয়ে নেবো মুয়ে মুছে
বারুদরক্তের দাগ, তোর চোখে ডুবে গিয়ে তুলে আনবো যত
ব্যালেরিনা চিত্রকল্প, ঠোঁটে আর নখে মুখ ঘষে ঘষে পাবো
মৃত্যুর চেয়েও বেশী তীব্র শ্বেত সত্তার বিদ্যুৎ ;
আয় তুই, তোকে নিয়ে জীবনমৃত্যুকে আজ এক করে দেখি।

—

সংবাদ-সাহিত্য

[ব]ঙ্কিমচন্দ্র

[বাং]লা-সাহিত্যে অন্যতম স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত [হয়] এই ১৩ই আষাঢ় তারিখটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ১২৫তম [জন্ম]দিবস উত্তীর্ণ হইয়া গেল। নানা লতাগুল্মপাদপে আচ্ছন্ন [বাংলা-স]াহিত্য-কাননে যে পাঁচজন বিরাট প্রতিভার পঞ্চবটী [রূপে প্রকাশিত] হইয়া চিরকালের পথিকের জন্য ছায়াশীতল আশ্রয় [প্রদা]ন করিয়া রাখিয়াছে তাঁহাদের নাম এই প্রসঙ্গে [আর এক]বার স্মরণ করা কর্তব্য। সেই পাঁচটি মহীরুহের [নাম] : বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও [শরৎ]চন্দ্র। এই পঞ্চপ্রধানের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রেই বুদ্ধি ও [ভাবপ্রবণ]তার সহিত ভাব আদর্শ ও রুচির একটা আশ্চর্য [সমন্ব]য় ঘটিয়াছিল। চিন্তাশীলতায় বৈদগ্ধ্যে ও ভাষা-[বিন্যা]সে বঙ্কিমচন্দ্রের দান বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক [গুরু]ত্বপূর্ণ হিসাবে স্বীকৃত হইয়া থাকিবে। আজ প্রায় [শত]বর্ষ পূর্বেকার দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরাণী, কপাল-[কুণ্ড]লা, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর, বিবিধ [প্রবন্ধ] এবং জটিলতর সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদির [কথা] ভাবিলে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইতে হয়। [বাংল]া-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ লেখক রূপে, ব্যক্তিত্বে [ও ব]লিষ্ঠতায়, হাস্যে পরিহাসে, গাম্ভীর্যে ও তীক্ষ্ণতায় [বঙ্কি]মচন্দ্রের নাম সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া আছে। বঙ্কিম [বহুর] মধ্যে থাকিয়াও আপন মহিমায় বিশিষ্ট হইয়া [ছিলে]ন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বঙ্কিমসন্দর্শনের পরিচয় এই [ভাবে] দিতেছেন : "সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ [শ্রীযু]ক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের [মরক]তকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়া-[ছিল]। ঠিক কতদিনের কথা স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন [বাল]ক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত [অনে]ক যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধ-মণ্ডলীর একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন।...সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিম-বাবু। মনে আছে, প্রথম-দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।"

বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিম বহুর মধ্যে থাকিয়াও স্বতন্ত্র একটি মহিমময় জগৎ যেন নিজের চারিপাশে নির্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন।

আজ নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা চাপে বাংলা ও বাঙালীর অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, তখন দেশে নেতা নাই ; দলাদলি ও স্বার্থপরতায় নিমগ্ন প্রতিভাহীন সাহিত্যসেবীগণের দাপাদাপিতে বাংলা-সাহিত্য যখন পঙ্ককুণ্ডে পরিণত, সেই দুঃসময়ে বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের মত স্রষ্টা সমালোচক নাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কয়েকজন উদ্যমশীল বিচক্ষণ সমালোচক-সাহিত্যিক আমরা পাইয়াছি, কিন্তু তাহার পর হইতে এ পর্যন্ত কোনও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সমালোচক বাংলা-সাহিত্যের দিক্‌নির্দেশ করিতে আসরে অবতীর্ণ হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা আর একবার স্মরণ করি : "...যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক

অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া সামান্য পরিশ্রমে সুলভখ্যাতিলাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম।...সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্বলোকের দ্বারাই সম্ভব।...

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব-অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।...

সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণ-কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর-একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

সব্যসাচী বঙ্কিমের মত এইরূপ বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব আজ আমাদের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন।

• • •

এ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে মুখ্যতঃ দুইটি মাত্র সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে—একটি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস আয়োজিত মহাজাতি সদনে, অপরটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নৈহাটী-শাখা আয়োজিত নৈহাটী-কাঁটালপাড়ায়। প্রথমটির জন্য শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও দিল্লীর শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং দ্বিতীয়টির জন্য জরাসন্ধ ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত অপেক্ষা যোগ্যতর কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। সমগ্র ব্যাপারটি দেখিয়া লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা গিয়াছে। বঙ্কিম সম্পর্কে কি ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ বক্তা অথবা পণ্ডিত বলিয়া স্বীকৃত! আরও আশ্চর্যের কথা, শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁহার বক্তৃতায় খেদোক্তি করিয়াছেন "বাঙালী বঙ্কিম-প্রতিভাকে এখনও পরিপূর্ণরূপে বুঝিতে পারে নাই।"

ইহা সর্বৈব মিথ্যা। আমরা যতদূর জানি বঙ্কিমকে বাঙালীরাই বুঝিয়াছে, জানিয়াছে—গুজরাটি বা আফগানরা চেনে নাই, বোঝে নাই। বঙ্কিম-প্রতিভা যখন মধ্যগগনে তখন হইতেই বহু বাঙালী মনীষী বঙ্কিম-প্রতিভা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি বঙ্কিমের বিপুল পাঠকসংখ্যা তাঁহার জয়ঘোষণাই করিতেছে। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কি দিল্লীতে নোকরি করিতে গিয়া অবাঙালী বনিয়া গিয়াছেন, নহিলে এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করিলেন কেন? বাংলা-সাহিত্যে এখন জ্ঞানের কারবার প্রায় নাই বলিলেই চলে, মজাদার রসের কারবার এখন ফলাও চলিতেছে এবং অর্থলোভে সেই অপকীর্তিতে যাঁহারা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন বিস্ময়ের কথা, বক্তা শ্রীদাশগুপ্ত তাঁহাদের পরম মিত্র বলিয়াই ঘোষিত।

টিকিবে কে?

আমাদের অন্যতম দাদা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকাটির পঞ্চাশ বৎসর বয়স উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। শিশু, নারী, ভাগ্যান্বেষী, ক্রীড়া ও চলচ্চিত্রামোদী প্রভৃতিদের নানাভাবে তুষ্টিবিধান করিয়াও পত্রিকাটি দীর্ঘকাল যাবৎ সাহিত্য-পত্রিকার সম্মান অর্জন করিয়া আসিয়াছে—সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ ও অশোককুমার সরকার এই তিনজন বিখ্যাত সাহিত্যিক উৎসবে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক রূপে নেতৃত্ব করিয়াছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, কবি নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সাহিত্যিকেরা কোনও পাত্তা পান নাই ইহাতে লজ্জিত

য়াই উচিত। তিন প্রধানের মধ্যে শ্রীঅশোককুমার
এর বক্তৃতায় 'টিকিয়া থাকা' কথাটির উপর বিশেষ
দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "বঙ্গদর্শন,
মানসী ও মর্মবাণী, বিচিত্রা কত পত্রিকার জন্ম
, কিন্তু কোনটাই টেঁকে নাই। গত পঞ্চাশ
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যে কটি মুষ্টিমেয় পত্রিকা আজও
আছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম।...
ন্দ্রনাথ হইতে উপেন্দ্রনাথ অনেকেই উচ্চ ধরণের
বাহির করিয়াছেন। কিন্তু তাহা টিঁকিয়া থাকে

লাদেশে, শুধু বাংলাদেশে কেন, আজ পৃথিবীতেই
থাকাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু কোন্
কতদিন টিকিল তাহা কখনও মুখ্য আলোচনার
ইতে পারে না। কোন্ পত্রিকা সাহিত্যে কী
কোন্ গোষ্ঠীর পুষ্টি সেই পত্রিকার সাহায্যে
নূতন লেখক ও নূতন চিন্তার বিকাশে কোন্
কতখানি সহায়তা করিয়াছে তাহাই ভাবিবার
অশোক সরকার পরিচালিত 'আনন্দবাজার'
' কি চিরদিন টিকিয়া থাকিবে? আমরা জানি
াকিবে না।

মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁহার ভাষণে ওই টিকিয়া
বিষয়েই বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য: "এই
পিছনে 'আদর্শ' ছিল বলিয়াই ইহা টিঁকিয়া
"

নীতি-বিশেষজ্ঞ শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁহার ভাষণে
তকে সাহিত্য-পত্রিকার বহির্ভূত রাখিতে
করিয়াছেন।

দের জয় হউক এবং 'ভারতবর্ষ' হীরক ও
ম জয়ন্তী পর্যন্ত টিকিয়া থাকুক—ইহাই কামনা

ীজার

ানন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সম্প্রতি
উৎসব-সভায় বলিয়াছেন: "কৃষ্টির প্রধান অঙ্গ
জ্ঞানের বিষয় আলোচনা। সংবাদপত্র পাঠ এজন্য
আবশ্যকীয়।"

শুধু মুখের কথা নহে—সরকার মহাশয় কাজেও তাহার এতটুকু ব্যত্যয় ঘটিতে দিবার পাত্র নহেন। অতএব জ্ঞানবিতরণের জন্য তাঁহার 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ইংলণ্ডের এক গণিকার কেচ্ছা-কাহিনীকে মজাদার ভাষায় রসালো ভঙ্গিতে পরিবেশন করিয়া তিনি সমগ্র জাতির ধন্যবাদের পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রায় নগ্ন চিত্রে শোভিত করিয়া ক্রিষ্টিন কীলারের কুষ্টিনাশা মামলার কাহিনীকে "বিমোহিনী কীলারের কথা ও কাহিনী" নামে যেভাবে ধারাবাহিক উদ্ঘাটিত করা হইতেছে তাহাতে মদনমোহনতলায় ফাট ধরিবার বিপুল সম্ভাবনা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। বাংলাদেশের রুচি কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে যে কয়জন প্রাণপণে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এই 'আনন্দবাজার-দেশ' প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম। ষোল এবং চল্লিশ নয়া পয়সায় নানা ধরনের উত্তেজক নোংরা জিনিস ইঁহারা ফিরি করিয়া থাকেন। আমরা 'আনন্দবাজারে' এই বিলাতী কেচ্ছার সচিত্র প্রকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। পত্রিকার প্রচার বাড়াইবার কি ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই? তাহা ছাড়া পয়সার লোভে 'দেশ' পত্রিকাটিতেও ভালমন্দ নির্বিশেষে যেসব বিজ্ঞাপন ছবি ও গল্প ছাপা হইয়া থাকে তাহাতে সভ্যতা ও রুচির বালাই থাকে না।

মোটের উপর এই কৃষ্টি Killer পদ্ধতির সাহায্যে জ্ঞানের বিষয় আলোচনার অজুহাতে পত্রিকার প্রচার বাড়াইবার যত চেষ্টাই হউক না কেন, উঞ্ছবৃত্তি ও অবৈধ উপায় শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকিবে না—ইহাই ভবিষ্যদ্বাণী।

গোপালদার পত্র

"ভায়া হে,

টক, ফাটক আর নাটক মাত্র সম্বল এই বাংলাদেশে তোমাদের জাতীয় সরকার যেভাবে নাটকের কণ্ঠরোধ

করিতে চলিয়াছেন তাহা জারের আমলে রাশিয়ার কথা স্মরণে আনিয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নাট্যকারগণের বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং স্বাধীন ভারতকে সুষ্ঠুভাবে গঠনের কাজে নাটকের অত্যন্ত প্রয়োজন তাহা সরকার-বাহাদুর ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? বাংলা-দেশের নাট্যসাহিত্য ইতিমধ্যেই বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। নাটক ও নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করিয়া বহু লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও হইয়া থাকে। সে সবই দেখিতেছি এখন বানচাল হইবার উপক্রম। প্রস্তাবিত আইন কার্যে পরিণত করা হইলে নাট্যকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে তাহা রীতিমত অপমানজনক বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে। এই নাট্যানুষ্ঠান বিল সরকার যদি প্রত্যাহার না করিয়া লন তো অনুমান করিতেছি দেশব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি করিবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ মুশকিল এখন হইতেই এড়াইয়া চলা ভাল।

খবরের কাগজে শ্রীজওহরলাল নেহরুর উপস্থিতিধন্য আসন্ন চিন্তাবিদ সম্মেলনের সংবাদ অবগত হইলাম। অনুষ্ঠানের তালিকায় পরিচিত কোন সাহিত্যিক বা নাট্যকারের নাম খুঁজিতেছিলাম, যাঁহাকে দিয়া নাট্য-নিয়ন্ত্রণ বিল সম্পর্কে কিছু বলানো যাইতে পারে। কিন্তু হা কপাল, সম্মেলনে বাঙালী কথাসাহিত্যিক বা নাট্যকার একজনেরও নাম নাই। ইঁহাদের কি চিন্তাশক্তি নাই, ইঁহারা কি চিন্তাবিদ নহেন? ইঁহারা যে সাহিত্য রচনা করেন তাহা কি চিন্তার বহির্ভূত কোন বায়বীয় ব্যাপার? চিন্তাবিদ সম্মেলনে কাকা, মামা, জ্যেঠা, জ্যেঠাইমা, বউদিদি সকলেই আছেন—নাই শুধু দাদারা। বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি এই প্রকার দিল্লীর নাগরার ঘা না লাগাইলেই যেন ভাল হইত।

কয়েকদিন পূর্বেকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।

কলিকাতার দক্ষিণপ্রান্তে একটি সরোবরের তীরে বসিয়া একদিন এই নাটকমারী বিলটির কথাই ভাবিতেছিলাম। মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে—সময় প্রায় সন্ধ্যাকাল। উষসীর সেই ম্লান আলোছায়া চারিদি একটা অপরূপ মায়া বিস্তার করিয়া নামিয়াছে। মধুসূদ দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃ কথা একে একে মনে ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি নিতা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন সময়ে কানের কা যেন শ্রুত হইল: "গবর্মেণ্টের কাজ যারা করে গবর্মেণ্টের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে একটা গর্ব করে এবং দেশের লোকের থেকে একটা ভিন্ন শ্রেণীর ওঠে—যত দিন যাচ্ছে আমাদের এই ভাবটা ততই উঠছে।"

আশ্চর্য! কে এমন কথা বলিল? আমি স্বপ্নচ্ছ মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠিয়া আগাইয়া গেলাম। কাছেই এক জায়গায় নাটক অভিনয় চলিতেছে। একটি পরমাসুন্দ যুবতী রমণী যেন স্বপ্নের মধ্যেই আমার হাত ধরি ভিতরে লইয়া গেল। ক্ষণকালের মধ্যেই বুঝিলা 'গোরা'র অভিনয় চলিতেছে। অভিনয় করিতে মহিলারা। আমার সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল বলাকার মত মুক্ত পক্ষ মেলিয়া যে স্ত্রীলোকদের আকাশে উড়িয়া বেড়াইবার কথা সেই বেহেস্তের হুরী পরীরা কী অদ্ভুত যত্নে কঠিন 'গোরা'র নাট্যরূপ দিতেছে!

ভায়া হে, সেইদিন হইতে ভরসা জন্মিয়াছে। আড়াই বিঘৎ পরিমাণ দেশে আড়াই সহস্রাধিক বাহারে নামে নাট্যসংঘ থাকিলেও মরদের অভাবে এতকাল বড়ই লজ্জা বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু মহিলারা যেখানে গোরা সাজিতেছেন সে দেশ গোরাচাঁদের হইলেও আর আমরা সহজে মরিব না। গিরগিটি বহুরূপীরা আর আমাদে প্রতারিত করিতে পারিবে না। তবে সরকারের কথা ভাবিয়া মনটা বিষণ্ণ হইয়া যাইতেছে। ইঁহারা সকলে তো নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনে পড়িয়া যাইবে।

আজ এইখানেই শেষ করিতেছি। নাট্যানুষ্ঠান বিলটির কি গতি হয় তাহা জানিবার জন্য উন্মু রহিলাম। ওই সম্পর্কে আরও কিছু বক্তব্য পরে জানাইতেছি। ইতি

গোপালদা।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৬-২৮৩৮

শনিবারের চিঠি

৩৫শ বর্ষ

৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭০

সম্পাদক :

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ দশম অধ্যায় ॥

॥ পট পরিবর্তন ॥

এক

৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসটি সজনীকান্তের জীবনে একটি স্মরণীয় মাস। ওরই কোন-একটি মাহেন্দ্রক্ষণে "কে জাগে?" কবিতাটি রচিত হয়। সজনীকান্তের াত সাধনায় ওই কবিতাটি নবযুগারম্ভের সূচনা । 'অঙ্গুষ্ঠ'-'মনোদর্পণে'র ব্যঙ্গসুনিপুণ স্যাটায়ারিস্ট াকান্ত ওই কবিতার মধ্য দিয়ে 'রাজহংস'-'মানস বরে'র কবিভাষাটি আবিষ্কার করলেন। বাংলা- ত্যে কবি সজনীকান্তের সত্য পরিচয় 'রাজহংসে'র রূপে। সজনীকান্ত নিজে এই যুগকে বলেছেন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। আমরা বলতে চাই, কবি বে তাঁর নবজন্ম। রাজহংসের নাম-কবিতার াদ্ধৃত কটি পঙ্ক্তিতে এই নবজীবনের মূলমন্ত্র উচ্চারিত ছে :

ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক—
উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে,
নিম্নে কাল-কালিন্দীর তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ
ডাকিতেছে যুগে যুগে ঝাঁপ দিতে সে তিমির-নারে।
ধরিতে পারে না তারে, ঊর্ধ্বে তার বিরাট প্রয়াণ।
উচ্চে নীচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
চলিবে অনন্ত কাল, মিশিবে না কভু একেবারে।
কোটি-কোটি গ্রহ-চন্দ্র, কোটি তারা পাইবে বিলয় ;
লক্ষ সৃষ্টি ধ্বংস হবে, জন্ম লবে সৃষ্টি নবতন।

সজনীকান্ত বলছেন, এক দুর্যোগের দুঃসময়ে তাঁর মানস-সরস্বতী তাঁকে যে মহাজীবন-পথের ইঙ্গিত দিলেন, এর পর থেকে বাকি জীবন সুখে-দুঃখে সেই পথকেই তিনি অবলম্বন করে চলেছেন। সে পথ ক্ষুদ্রের পথ নয়, সে পথ ভূমার পথ।

"কে জাগে?" কবিতায় এই নতুন কবিদৃষ্টি নিয়ে নবজীবনের পথে সজনীকান্তের শুভযাত্রা শুরু হল। সজনীকান্ত যে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজেরই একজন, এই স্বাক্ষর রয়েছে "কে জাগে?" কবিতায়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনেক ভুল-ভ্রান্তি, অনেক সংঘাত ও সংগ্রাম পেরিয়ে সজনীকান্ত রবীন্দ্র-গোত্রেই নিজের কবি-পরিচয় খুঁজে পেলেন। সজনীমানসের সেই আত্ম-পরিচয় লাভের ইতিহাসটি এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়।

দুই

১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসটি সজনীকান্তের জীবনে ক্রান্তিলগ্নের মর্যাদা দাবি করে। সজনীকান্তের বয়স তখন বত্রিশ বছর তিন মাস। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হলেন ৮ই অগ্রহায়ণ [১৯৩২-এর ২৪ নবেম্বর]। মাসিক বেতন তিন শো টাকা। আপাততঃ পাবেন দুশো করে। একশো জমা থাকবে। নিয়োগকর্তা হলেন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

এবং মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্সের আদর্শবাদী শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। তাঁরই আদর্শপ্রচারের বাহন হিসাবে, তাঁরই পরিচালনাধীনে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক 'উপাসনা' মাসিক 'বঙ্গশ্রী' নামে নব-রূপায়ণে প্রকাশিত হবে। সজনীকান্ত হবেন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক এবং মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ। কার্যালয় ৩৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট। 'বঙ্গশ্রী' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের মাঘ মাসে। সজনীকান্ত দু বছর 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্তের সাহিত্যজীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়।

নিয়োগকর্তা ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন কোন্নগরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার ও সংরক্ষণ এবং হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ ছিল তাঁর আদর্শনিষ্ঠ জীবনের অন্যতম ব্রত। তাঁর ভাবাদর্শকে ভাষায় রূপায়িত করবার জন্যে তিনি একজন শক্তিশালী লেখকের সন্ধান করছিলেন। 'দৈনিক বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গে" বঙ্কিমপ্রয়াণ দিবসে সজনীকান্তের লেখা "বঙ্কিমপ্রসঙ্গ" পড়ে তিনি সজনীকান্তের প্রতি আকৃষ্ট হন। হয়তো তাঁর আশা ছিল সজনীকান্তের লেখনীমুখে তাঁর ভাবাদর্শ ভাষা পাবে। সজনীকান্ত অবশ্য যে দু বছর ভট্টাচার্য মহাশয়ের অধীনে চাকরি করেছেন সে দু বছর যথাশক্তি তাঁর কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রানুশাসনে বিধিবদ্ধ জীবন যাপন করা সেদিন সজনীকান্তের পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল না। তাঁর অশাস্ত্রীয় জীবনচর্যার সঙ্গে ভট্টাচার্য-আরোপিত অনুশাসনাবলীর দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠল। "বজ্র-আশীর্বাদ" কবিতায় [আশ্বিন ১৩৪১] সে দ্বন্দ্ব কাব্যচ্ছন্দে ভাষা পেয়েছে। সজনীকান্ত বললেন, "দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী।" বললেন, অন্যের অনুশাসন মেনে চলা তাঁর স্বভাবধর্ম নয়। বললেন :

ত্রিদিবের অধীশ্বর আমি আছি—আর কেহ নাই,
সৃজিয়া নিখিল বিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন খেয়ালে ;
জন্ম আর মৃত্যু—এই জগতের সত্য ইতিহাস
আমিই রচনা করি।
ভোগ করি, করি ক্ষয়, অপচয়ে আনন্দ আমার—
অতীতে করি না নতি, ভবিষ্যের করি না সঞ্চয়,
যাহা আছে যাহা পাই, মুঠি ভরি উড়াই ফুৎকারে,
অনন্ত কালের বক্ষে ক্ষণিকের বুদ্বুদ-বিলাস।

এই আত্মম্ভরিতা, এই অহংকৃত বিদ্রোহ, এই বেপরোয়া বেহিসেবিপনাই অনুত্তীর্ণযৌবন সজনীকান্তের মানধর্ম। এদিক দিয়ে তিনি মনেপ্রাণে আধুনিক। কাজেই 'বঙ্গশ্রী'র বিধিনিষেধের মধ্যে তিনি দু বছরের বেশি সময় কাটাতে পারলেন না। শিকল ছিঁড়ে বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে এলেন।

তিন

কিন্তু 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্তের সংগঠনমূলক সৃজনীশক্তির নবপরিচয় উদ্ঘাটিত হল। বস্তুত মাসিক 'বিচিত্রা' ও ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' প্রকাশের পর অমন সুসম্পাদিত পত্রিকা আর দেখা যায় নি। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'বঙ্গশ্রী' রূপদী রীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণ ও নবীন, বাম ও দক্ষিণের অনেকেই মিলিত হলেন 'বঙ্গশ্রী'তে। নিয়মিত বিভাগগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিচিত্র জগৎ), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে 'অন্তঃপুর'), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (বিদ্যার্থীদের জন্য 'চতুষ্পাঠী'), কিরণকুমার রায় ও শশাঙ্কমোহন চৌধুরী (পৃথিবীর নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংবাদ সম্বলিত 'সন্ধানী'), সম্পাদক স্বয়ং ('সৃষ্টিরহস্য' নামে 'বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ') এবং পরে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (বিজ্ঞান-জগৎ)। সাহিত্য সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধকার হিসাবে এলেন মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ ঘোষ, সুকুমার সেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, নীরদ চৌধুরী, প্রবোধ বাগচী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অমূল্যচন্দ্র সেন, প্রমথ বিশী ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাসাহিত্যে সীতা দেবী, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্র মৈত্র, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী, বনফুল, বিভূতিভূষণ,

ন্দ্র ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যে মোহিতলাল, কুমার, কৃষ্ণধন দে, প্রমথ বিশী, হেম বাগচী ও ক মহাশয় স্বয়ং।

ই নামাবলীর মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'র সবাই যে ন তা বলাই বাহুল্য। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বারের চিঠি'র প্রতিপক্ষ 'কল্লোল'-'কালিকলম' রও অনেকেই ছিলেন। সজনীকান্ত লিখছেন, "মোটের , বাংলা-সাহিত্যে উদিত ও উদীয়মান প্রায় সকলেই যা ধরা দিয়াছিলেন: দীনেশরঞ্জন দাস, মুরলীধর ও যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক) সহ গোটা 'কল্লোল'-লিকলম' দলটাই আসিয়া জুটিয়াছিলেন, আসেন নাই ল অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব।" [আত্মস্মৃতি-২ পৃ]। উক্তিটি অবশ্য 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কথা-ত্যিকদের সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেন না তদের মধ্যে কবি জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দেও আছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'বঙ্গশ্রী'র আসরটি। ীকান্ত লিখেছেন, "সাহিত্যিকের আড্ডাই সাহিত্য-কার প্রাণ: ঢিলাঢালা স্বাচ্ছন্দ্য, তক্তপোশ তাকিয়া ক তাম্বুল, অবাধ রাজা-উজিরমারী গল্প অথবা কথার তরবারিক্রীড়ার মধ্যেই সাহিত্যের আড্ডা ত লাভ করে।" [আত্মস্মৃতি ২, পৃ ২২২]।

৫৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে 'বঙ্গশ্রী'র আসরটি ছিল চার । প্রথম মহলে থাকতেন সহকারী সম্পাদক কিরণ , তিনি আপ্যায়িত করতেন নতুন আগন্তুকদের। র পরের মহল ছিল সজনীকান্তের সম্পাদকীয় দপ্তর: ানেই বসত 'বঙ্গশ্রী'র বিখ্যাত মজলিসটি। তৃতীয় লে ছিল সম্পাদকের খাস দরবার। চারিদিকে ঠাসা জার পাঁচেক বইয়ের মধ্যে বসে তিনি শাস্ত্রীয় ও শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ে লেখাপড়া এবং গম্ভীর অন্তরঙ্গদের ঙ্গ গুরু আলাপ-আলোচনা করতেন। চতুর্থ মহলে ছিল ট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিংয়ের শাস্ত্র-প্রকাশ-ভাগের সদাচারসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর ফরাস-তাকিয়া-জ্জিত একটি প্রকাণ্ড হলঘর। তাঁদের কাজ শেষ হলে টি পরিণত হত সংগীত-জলসার আসরে। নলিনীকান্ত রকার ছিলেন এই আসরের গীতিরসের মুখ্য যোগানদার। াত্ত গম্ভীর হলে কোন-কোনদিন ধূমকেতুর মতন উদিত হতেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর চাদরের পুচ্ছতাড়নায় এবং সংগীতরসপ্রবাহে পবিত্র শাস্ত্রপ্রকাশ-বিভাগ পবিত্রতর হয়ে উঠত। সঙ্গে থাকতেন পতিতপাবন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

'বঙ্গশ্রী'কে ঘিরে প্রবীণ ও নবীন, বাম ও দক্ষিণ যে একত্র মিলিত হতে পেরেছিল তার কারণ ছিল সম্পাদক সজনীকান্তের উদার সাহিত্যবোধ, অকুণ্ঠ বন্ধুপ্রীতি এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। 'কল্লোল যুগে' সজনীকান্ত প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, "আসলে সজনীকান্ত তো 'কল্লোলে'রই লোক, ভুল করে অন্যপাড়ায় ঘর নিয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন, "শক্তিধর সজনীকান্ত। লেখনীতে তো বটেই, ব্যক্তিত্বেও।"

সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্তের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল ধৈর্য। অখ্যাতনামা নবীন লেখকের গল্প-উপন্যাস ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শুনে যেতেন। পাঠ্য-অপাঠ্য নির্বিচারে অমন বিচিত্রমনা কৌতূহলী পাঠকও খুব কম দেখা যায়। তাঁর আরেকটি বড় গুণ ছিল—তিনি ছিলেন সাহিত্যরসের উৎকৃষ্ট যাচনদার। কবিতাই হোক, আর গল্প উপন্যাস নাটকই হোক, কোন্ রচনাটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ছিল অভ্রান্তভাবে তীক্ষ্ণ। নতুন প্রতিভার আবিষ্কারে তিনি অপরিসীম আনন্দ লাভ করতেন। শক্তিমান তরুণ সাহিত্যিক তাঁর কাছে নিরুৎসাহ হয়েছেন, এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

চার

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁকে বাদ দিয়ে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। অথচ সত্যবাণী দেবীর দৌত্য সত্ত্বেও সজনীকান্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসপ্রতিকূলতা তখনও নিঃশেষে দূরীভূত হয় নি। বরং কবিগুরুর ক্রোধানলে সজনীকান্ত জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে নতুন নতুন ঘৃতাহুতিও দিচ্ছিলেন। ফলে 'শনিবারের চিঠি'র মতই রবীন্দ্রনাথের নামে প্রেরিত 'বঙ্গশ্রী' ও 'রিকিউজড' হয়ে ফিরে এল। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র সজনীকান্ত ছিলেন না। 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশের পনেরো মাস পরে ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে

রবীন্দ্রনাথের "গদ্য ছন্দ" প্রবন্ধটি 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হল। ১৩৪০ সালের পূজাবকাশের প্রাক্কালে (সেপ্টেম্বর ১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছন্দ সম্বন্ধে যে দুটি বক্তৃতা দেন তার একটি হল 'গদ্য ছন্দ'। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত এই প্রবন্ধটি সজনীকান্ত সংগ্রহ করেন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কাছে। সর্ত ছিল যে, প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সজনীকান্ত অনুমতির অপেক্ষা না করেই প্রবন্ধটি বৈশাখের 'বঙ্গশ্রী'তে ছেপে দিলেন। অনুমতি প্রার্থনা করে অবশ্য কবিকে পত্র লেখা হল, কিন্তু বৈশাখের তিন তারিখ পর্যন্ত তার কোনও উত্তর না আসায় সম্পাদক সজনীকান্ত বিপন্ন ও বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। মুশকিল আসান হল বৈশাখের চৌঠা। অফিসে গিয়ে সজনীকান্ত পেলেন সচিব-মারফত প্রেরিত কবিগুরুর অনুমতিপত্র। উল্লসিতচিত্তে গুদামজাত বৈশাখের 'বঙ্গশ্রী' বাজারে প্রকাশের ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরে সজনীকান্ত কবিগুরুর অনুমতিপ্রাপ্তির নেপথ্য-রহস্য আবিষ্কার করলেন। এবার কবিগুরুর দাক্ষিণ্যলাভের পথ সুগম করেছিলেন তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী সুধারাণী দেবী। নববর্ষের প্রথম দিনে সুধারাণী কবিগুরুকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার নববর্ষের প্রণাম পেয়েছি, তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

এই মাসের শেষভাগে আমি সিংহলে যাত্রা করব। কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তখন সজনীকান্ত যদি কলকাতায় থাকেন তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তোমাকে হয় তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবেন।

বৎসরের আরম্ভে নানা ব্যাপারে আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুধারাণীর নববর্ষের প্রণাম যে কবিগুরুর সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে কোমল করে এনেছে পত্রে তার আভাস উঠেছে। সজনীকান্ত লিখছেন, "দীর্ঘ সাত বৎসর বিরতির পর এই চিঠিতে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম ঘণ্টা পড়িল" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ২৬৫]। 'বঙ্গশ্রী'র চাকরিতে তত্দিনে ফাটল ধরেছে। তার জন্যে সজনীকান্ত অনিশ্চয়তাজনিত অস্বস্তি ভোগ করছিলেন। কিন্তু কবিগুরুর আশীর্বাদ পত্রে গুরুশিষ্যের পুনর্মিলন সম্ভাবনার মায়াপ্রলেপে অস্বস্তির কাঁটাটুকু কোথায় মিলিয়ে গেল। সজনীকান্ত লিখছেন, "রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পাইলে সাহিত্য-জীবনে যে-কোনও পরিণতির জন্য আমি প্রস্তুত থাকিতে পারিব—এই বোধ আমাকে সাহস দিল। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ২৬৫]। সজনীকান্তের এই উক্তির আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

পাঁচ

বস্তুতঃ, "কে জাগে?" কবিতা রচনার পর সজনীকান্তের কাব্যসাধনার যে নবপর্যায়ের সূচনা হল সেখানে সজনীকান্ত একান্তভাবেই রবীন্দ্রশিষ্য। এতদিন তাঁর উপাসনা ছিল শত্রুভাবে। তাঁর তদ্গত চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে তির্যক ভঙ্গিতে—প্যারডি-রচনায়। "কে জাগে?" কবিতায় রবীন্দ্রানুসরণ স্পষ্ট হল।

এখানে আমাদের বক্তব্যকে [illegible] করার প্রয়োজনে একটু কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের "শিশুতীর্থ" আর সজনীকান্তের "কে জাগে?" কবিতা দুটির তুলনামূলক আলোচনা করলেই গুরুশিষ্যের সম্পর্কটি বুঝতে পারা যাবে। বুঝতে পারা যাবে সজনীকান্ত কি অর্থে কতটুকু রবীন্দ্রনিষ্ঠ কবি।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি তাঁর ইংরেজি 'দি চাইল্ড' কবিতার স্বকৃত বঙ্গানুবাদ। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীতে ভ্রমণকালে কবি যীশুখ্রীস্টের জীবনী অবলম্বনে রচিত বিখ্যাত 'প্যাশন প্লে'টি দেখার পর 'দি চাইল্ড' কবিতাটি ইংরেজিতে রচনা করেন। বাংলায় 'শিশুতীর্থ' শিরোনামায় তার রূপান্তর ঘটে ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে। মানবপুত্র যীশুর জন্মকে প্রেক্ষাপটে রেখে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় মানুষের চিরন্তন যাত্রার রহস্যরূপটি

ার্থে' পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মহাকালের পটভূমিতে ান্তরব্যাপী মানবসভ্যতার নিগূঢ় ইতিহাসটিই ওই য় অভিব্যক্ত। জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়ার মধ্য মানুষের সংসারে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতরূপে ানের প্রতীক নবজাতকের আবির্ভাবই মানব-সের চিরন্তন সত্য—এই তত্ত্বটিই কবিতার উপ- । ওই নবজাতকের জয়ধ্বনি করেই কবিতাটির হার রচিত হয়েছে—"জয় হোক মানুষের, ওই তকের, ওই চিরজীবিতের।"

জনীকান্তের "কে জাগে?" কবিতার শেষেও নবজাতকেরই জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে।—

াতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা গলিয়া পড়ে—
নহীন রসা রোড—
লে চারিজন ক্লান্ত চরণে ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ,
খে অতি ক্ষীণ—বল-হরি হরিবোল।
হাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে!
স ক্রূর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়
বজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

সজনীকান্তের কবিতাটি রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের তীর্থে'র ষোলো মাস পরে। কবিতাটি রচনার তে কবিমানসের যে উপলব্ধি ছিল তার ইতিহাস লোচনা প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখছেন:

"মনের এই অবস্থায় নূতন আপিসে সাহিত্যিক হৈ-হৈ ালের মজলিসের পর এক-একদিন সকলের অজ্ঞাত-া একা পথে বাহির হইয়া পড়িতাম, পায়ে হাঁটিয়া াও গঙ্গার ধার, কখনও বালিগঞ্জের লেক পর্যন্ত া যাইতাম, অনেক রাত্রে শ্রান্তক্লান্ত দেহে, অবসন্ন রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে ফিরিয়া আসিতাম। ফিরিবার মনে হইত, এই কর্মব্যস্ত নগরী, এমন কি নিখিল চর নিদ্রামগ্ন, আমিই একা জাগিয়া আছি। রসা ড ও রাসবিহারী অ্যাভেনিউ জংসনের কাছে একদিন ধলাম, পৌষের নিদারুণ শীতের মধ্যে চারিজন াহক কাঁধের বোঝা লইয়া ক্লান্ত চরণে চলিয়াছে, ধ জড়তার মধ্যে তাহাদের "বল হরি হরিবোল" ত ক্ষীণ ও করুণ শুনাইতেছিল। আমার মন এমনিতেই চড়া সুরে বাঁধা ছিল। আমি তাহারই মধ্যে সমস্ত জীবন ও জগৎকে ব্যঙ্গ করিয়া মহাকালের অট্টহাসি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, ইহাই শেষ, ইহাই সমাপ্তি; ইহার পরে আর কিছু নাই; নিঃশেষ মৃত্যুই মানুষের অনিবার্য পরিণতি। অকস্মাৎ নিকটের কোনও দোতলা হইতে সদ্যোজাত শিশুর তীব্রতীক্ষ্ণ ক্রন্দন উত্থিত হইয়া নগরীর ধূম্রধূলিকুয়াশা-লাঞ্ছিত আকাশমণ্ডলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিমূঢ় জড়তাগ্রস্ত আমার চিত্তে বিদ্যুদ্দীপ্তিবৎ নূতন চেতনার সঞ্চার হইল, আমার দেবতা যেন এক নিমেষে আমাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন—মাভৈঃ, এই অনন্ত অখণ্ড প্রবাহের শেষ নাই। প্রতি মুহূর্তেই ধ্বংস ও মৃত্যুকে উপহাস করিয়া নবজাতকের নূতন জন্ম হইতেছে, নবীন কিশলয় শুষ্ক গলিত পত্রের স্থান লইতেছে। সেই এক মুহূর্তে আমার ব্যর্থ ব্যথিত হতাশ জীবনের নবজন্মান্তর ঘটিল, আমি মরিতে মরিতে আবার বাঁচিয়া গেলাম।"

এই বিবৃতি থেকে "শিশুতীর্থে"র সঙ্গে "কে জাগে?"র মিল এবং অমিল দুটিই ধরা পড়বে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পটভূমি সারা পৃথিবী। তার কাহিনী মানুষের সমগ্র ইতিহাসকে আশ্রয় করেছে। সজনীকান্তের কবিতাটির পটভূমি কলিকাতা। তার কাহিনী বর্তমান কালের প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় বিধৃত। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে দুটি কবিতা একই সত্যকে প্রকাশ করছে। 'শিশুতীর্থ' সর্বজনপরিচিত কবিতা। তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়বার জন্যে এখানে "কে জাগে?" সমগ্রভাগেই উদ্ধারযোগ্য:

শহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল
বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা;
আর জেগে রয় রাস্তার মোড়ে বীটের পুলিস যত।—
পৌষের শীত রাত্রি দুপুর বাজে।

জেগে আছে যারা পানের দোকানে মদের বেসাতি করে,
বিড়ির দোকানে কোকেন যাহারা বেচে;
চাটের দোকানে প্লেটে সজ্জিত কাঁকড়া, ডিমের ঝাল,

গলদা চিংড়ি, বেগনে পলতা-ভাজা—
শীতের হাওয়ায় শুকায়ে হয়েছে কাঠ।

জেগে আছে তারা এখনও যাদের জোটে নাই খদ্দের,
জুটেছে যাদের—গাদা খুলে নিয়ে ভূতের নৃত্য করে—
মদে আর গানে, চাটে, বাঁয়া-তবলায়।
স্খলিত বচনে ঘন ঘন তারা পানওয়ালারে ডাকে,
অকারণে চুমু খায়, হাসে, কাঁদে, গান গায় অকারণে
বুদ্বুদ-সম কাবেগি নাড়ি হাওয়ায় মিলায়ে যায়।

জাগিয়া রয়েছে তাহাদের বধূ যাহারা ফেরে নি ঘরে,
মা-হতভাগিনী স্নেহময়ী কারো জাগে;
রাত বাড়ে যত শুকাইছে বাড়া-ভাত,
সদর-দরজা খুলে দিতে হবে, ঘুমে ঢুলে আসে আঁখি।
সরিষার তেল প্রলেপ করিয়া চোখে
জাগে বধূ, তার জ্বালা-ধরা চোখ জলে ছলছল করে,
বুকের জ্বালার প্রলেপ পাশের ঘুমানো খোকার ঠোঁটে।
ললাটে তোলে না হাত,
অদৃষ্টেরে ধিক্কার দিলে পাছে লাগে অভিশাপ।
তাবে ব'সে আর যত্নে লাগায় তালি,
দুইটি মাত্র পরনের শাড়ি ছিঁড়েছে ধোপার ঘরে।

শয্যায় রোগী জাগিয়া কাশিছে ব'সে,
নয়নের জ্যোতি ঝাপসা হতেছে ক্রমে,
চারিদিকে যত মানুষ এবং ঘরবাড়ি গাছপালা
লাগে ধূসরতর।
আঁকড়ি ধরিতে চাহিছে যখন, মুঠি খুলে খুলে যায়,
নিবে আসে ধীরে মলিন জীবন-বাতি।

তাহারই শিয়রে বসি
ক্লান্ত প্রেয়সী তন্দ্রায় জেগে আছে,
জাগিবে সে কত দিন।
যত জাগে তত সিঁথির সিঁদুর চওড়া ও গাঢ় করে,
হাতের নোয়ায় মনে হয় তার ঠিকরে হীরক-দ্যুতি।

জাগে কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে কাল যার আয়ু শেষ—
সে জন শোনে নি বহুকাল কানে, প্রিয়া ডাকে, "ওগো,
শোন"—
সাধের কন্যা ডাকে, "শোন শোন, বাবা।"
সহসা শিহরি মর্মের মাঝে ডাক শুনে জেগে আছে;
কোথায় যেন রে বিনিদ্র ঘরে প্রিয়া ফেলে নিশ্বাস
ঘুমায়, তবুও বুকে [illegible] করে।
কম্বলে তার শুধু আধখানা, আধখানা গায়ে দিয়ে,
ল্যাম্প সি ভুলিয়া আঁধার কক্ষে চেয়ে কড়িকাঠ পানে,
জাগ্রত আঁখি ঝাপসা যাদের হয়—
তারাও জাগিয়া আছে;
তারা প্রতীক্ষা করে—
প্রিয়া-বাহুপাশ একদা জড়াবে গলে,
সাধের কন্যা কণ্ঠলগ্না হবে,
আছে আশা, আশা মনে তবু কত আছে।

কাল যার আয়ু শেষ—
সে জন জাগিয়া খোঁজে আকাশের তারা,
কঠিন পাষাণে বাধা পেয়ে চোখ দেয়ালে কি যেন খোঁ
চলা উঠে গিয়ে এখানে সেখানে ফুটে ওঠে কত ছবি,
কত চেনা মুখ, অচেনা ভঙ্গী কত;
ভুলে-যাওয়া কোন্ বাল্য-সখীর ঠিক যেন এলো খোঁ
কবন্ধ আর ছিন্নমস্তা-ছায়া
দেয়ালে দেয়ালে জাগে—
চমকি জাগিলে মিলায় পলকপাতে।
মনে প'ড়ে যায়, পাশের বাড়ির মেয়ে
একদা আসিয়া বলেছিল কবে, ভেঙে গেছে পেন্সিল
কেড়ে দিতে হবে—সকাতর অনুরোধ;
ধমকিয়া তারে বলেছিল, নাহি হবে।
যে বেদনা-ছায়া নেমেছিল কালো চোখে,
সেই স্মৃতিখানি কেন তার মনে আসে,
কাল যার আয়ু শেষ!
মার আঁখিজল নহে,
কবে কোথা দ্রুত সাইকেলে যেতে, নেহাত অসাবধ
চাপা পড়েছিল একটি কুকুরছানা,
তাহারই আর্তনাদ।

জাগে পাগলিনী, পাগলা-গারদে গরাদে রাখিয়া হা
ঘুম নাই তার চোখে,
মুখে হাসি দম-কান্নার মত ঠেকে,
পরনে জীর্ণবাস।

একে একে তার সন্তান যত মরিল কালের ঘায়ে—
জাগিছে মহাকাল।
তোমাদেরই পথ চেয়ে জেগে আছে জননী উন্মাদিনী—
অন্ধকারের চরণ-শব্দ শোনে নিবিষ্ট মনে,
হঠাৎ হাসিয়া উঠে;
হঠাৎ আর্তনাদে
স্তব্ধ নিশার নিবিড় শান্তি ক্ষণ-বিঘ্নিত করি
ডাকে, আয় বাছা, হাঁটি হাঁটি পায় পায়।
প্রসারিত বাহু ব্যর্থ শীতল হয়,
স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়ে—
ফোঁটা ফোঁটা দুধ কান্নার ধুলায় পড়ে টপটপ করি—
যুগান্তরের সঞ্চিত কালো ধুলা!
সৃষ্টি শিহরি উঠে,
কাঁদে গতি-বন্যায়।

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—
সবারে ঢাকিয়া সেই সুর যেন নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ভাসিয়া যায়।

আর জাগে ভগবান—
জাগে নির্গুণ, পরম ব্রহ্ম, জাগেন নির্বিকার;
ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর,
অঙ্কুর মেলে পাতা, সেই পাতা শুকায়ে ঝরিয়া পড়ে—
তারে তিনি দেন কোল।
জাগে অশক্ত সর্বশক্তিমান—
জাগ্রত ভগবান!
শুধু হাসে মহাকাল—
হা-হা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী-দ্বিপ্রহরে,
শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসারোড—
চলে চারিজন ক্লান্ত চরণে ক্ষণে বদলি যা কাঁধ,
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে!
সে ক্রুর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

ছয়

এই কবিতার সঙ্গে 'শিশুতীর্থ' কবিতার রূপ ও রূপকল্পগত সাদৃশ্যের দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। দুটি কবিতারই আরম্ভ অশুভ রাত্রির বীভৎস ও ভয়ংকর 'ইমেজ' দিয়ে। 'শিশুতীর্থ' কবিতার আরম্ভে আছে:

রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেন না অন্ধ কাল যুগযুগান্তরের
গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের
চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;

* * *

বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট;

* * *

কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে,
বলে, হায়, হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান
উচ্ছন্ন গেল।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত
নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে,
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না।

"কে জাগে?" কবিতার আরম্ভেও এই ইমেজগুলিই কাব্যরূপ পেয়েছে। মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মত পাহাড়তলির অন্ধকারই মহানগরীর নিশীথরাত্রির 'বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল'-এর দুধসাদা এবং লাল চোখের রূপ গ্রহণ করেছে। বিকারের প্রলাপের মত যে বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো 'শিশুতীর্থে' অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্টরূপে কবিদৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে সেই

বিভিন্ন বস্তুগুলোই বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে সজনীকান্তের কবিতায় ষষ্ঠ থেকে দশম পঙ্‌ক্তিতে। বেপরোয়া কামিনীর যৌবনমদবিলসিত অট্টহাস্যই "কে জাগে?"র একাদশ থেকে ষোড়শ পঙ্‌ক্তির "ভূতের নৃত্য" আর "স্খলিত বচনে"র মধ্যে ধরা দিয়েছে।

এই বীভৎস জীবলীলার পাশেই শিশুতীর্থে "ভক্তে"র আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

> ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত,
> তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ;—
> আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু
> খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
> মেঘ যখন ঘনীভূত,
> নিশাচর পাখি চীৎকার শব্দে যখন উড়ে যায়,
> সে বলে, ভয় নেই ভাই,
> মানুষকে মহান বলে জেনো।

"কে জাগে?" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের "ভক্ত"ই হয়েছে সজনীকান্তের "কবি"। তিনি বলছেন :

> জাগিয়া রয়েছে কবি,
> গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
> মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—
> সবারে ঢাকিয়া সেই সুর যেন
> নিখিল ছাপিয়া উঠে,
> নয়ন ভাসিয়া যায়।

বলাই বাহুল্য, দুটি কবিতার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু ভাববস্তুতে একটির উপর অন্যটির প্রভাব অবশ্য-স্বীকার্য।

সাত

রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' গদ্যছন্দে লেখা। সজনীকা "কে জাগে?" অমিল মুক্তবন্ধ মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রচিত। রবীন্দ্রনাথের ভাববস্তুকে সজনীকান্ত নিজের যুগের উপলব্ধি ও তারই উপযুক্ত অথচ স্ব ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যের ঐতিহ্য এই ভা যুগগত ভাষাকে আশ্রয় করে পূর্বাগত রিক্থকে যুগ যে যুগান্তরে বহন করে নিয়ে যায়। I. M. Pars "The Progress of Poetry"র ভূমিকায় বলছেন :

"...So that though it is true that the best poets in any age are those who are most successful in finding an idiom close enough to the world in which they live, it is also true that the poetical progress of an age can only be represented by those poets whose work is a genuine development of what has gone before..."

এই অর্থেই সজনীকান্ত কালের বিচারে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের কবি হয়েও ভাবাদর্শের বিচারে রবী ঐতিহ্যেরই কবি। তিনি একদিকে যেমন যুগচেতন উপযুক্ত কবিভাষার সন্ধান পেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেম তাঁর কবিকৃতি পূর্ববর্তী যুগেরই স্বাভাবিক পরিণা এই অর্থেই "কে জাগে?" থেকে সজনীকান্তের সারস্ব জীবনের উত্তর পর্যায়ের সূত্রপাত। তাঁর মানসলো রবীন্দ্রবিরোধিতার অবসান হয়ে রবীন্দ্রানুগত্যের সুবাতা প্রবাহিত হতে লাগল। 'অঙ্গুষ্ঠ'-'মনোদর্পণে'র কবি চিত্তলোকে 'রাজহংস'-'মানস সরোবরে'র কবির জন্ম হল

[ক্রমশঃ

* *
*

রবীন্দ্র-স্মৃতি

বনফুল

তোমাদের কাগজে আমাকে আমার রবীন্দ্র-স্মৃতি লিপিবদ্ধ করতে অনুরোধ করেছ। এ ধরনের অনুরোধ আগেও অনেকে করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে বরাবরই আমার একটু সঙ্কোচ আছে, তাই এড়িয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্কোচের প্রথম কারণ ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়ত: আমি এ ধরনের প্রবন্ধে যেসব নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করতে বাধ্য হব তার কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারব না। কেউ যদি বলেন তুমি মিথ্যা কথা বলছ, তাহলে চুপ করে থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ, এরকম স্মৃতি-চিত্রে আমাকে-লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত না করলে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে ঠিক কি ছিল তা বোঝানো যাবে না। সে চিঠিগুলিতে আমার এত প্রশংসা করেছেন তিনি যে সেগুলি তুলে দিলে অনেকে মনে করবেন আমি হয়তো বুড়ো বয়সে আত্ম-বিজ্ঞাপনে রত হয়েছি।

এই সব কারণে রবীন্দ্র-স্মৃতি সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়: মনে করেছিলাম। কিন্তু তোমাদের আগ্রহাতিশয্যে সে নীরবতা ভঙ্গ করতে বাধ্য হলাম। যদি কিছু অশোভনতা হয় সে দায়িত্ব তোমাদের। বাল্যকাল থেকেই আমি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় ভক্ত। ভক্তির মাত্রা এত বেশী ছিল যে তাঁকে দেবতা বলে মনে করতাম। তাঁর দেবত্বে কোনরকম কলঙ্ক সহ্য করা অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে। বাল্যকাল থেকে আমি কিন্তু একটা অত্যন্ত বিশুদ্ধ নৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম। ফলে আমার মনের নেপথ্যে নীতির যে মানদণ্ডটি গড়ে উঠেছিল তা অত্যন্ত কড়া এবং তীক্ষ্ণ। তাই দিয়েই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি সবাইকে মাপতাম। একটু বড় হয়ে সেই মাপকাঠি দিয়ে রবীন্দ্র-নাথকে যখন মাপতে গেলাম তখন দেখলাম তাঁরও মনুষ্যোচিত অনেক দুর্বলতা আছে। তিনি তোষামোদপটু একদল পারিষদ পরিবৃত হয়ে থাকেন এবং তাদের [illegible]

আপত্তি নেই। এমন কি তাঁর শেষ বয়সে লেখা প্রেমের কবিতাগুলি পড়ে অবাক হয়ে ভাবতাম—যে বয়সে আমাদের বাণপ্রস্থে যাওয়া উচিত সেই বয়সে উনি এরকম প্রেমের কবিতা লিখেছেন! কবিতাগুলি অপরূপ, কিন্তু এ বয়সে ও ধরনের কবিতা লেখা কি শোভন? তারপর দেখলাম উনি নানা অক্ষম লেখকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সার্টিফিকেটও দিচ্ছেন এবং সেগুলি সর্বত্র ছাপা হচ্ছে। দেবতার গায়ে এইসব কলঙ্ক দেখে আমি যেন ক্ষেপে গেলাম। এরই ফলে তাঁকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটি ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলাম 'শনিবারের চিঠি'তে। সময়টা বোধ হয় ১৯৩৭-৩৮। এরপর আর একটা ঘটনা ঘটল। জনৈক রামচন্দ্র ঝা কালীঘাটে এসে পাঁঠা-বলির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাহবা দিয়ে এক কবিতাও লিখলেন 'প্রবাসী'তে। এ দেখে আরও ক্ষুব্ধ হলাম আমি। দোলসংখ্যা 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'য় রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে এক চিঠি লিখলাম কবিতায়। কবিতাটি আমার ঠিক মনে নেই, আমার কোনও সঙ্কলনেও ওটিকে স্থান দিই নি। তবে কবিতাটির ভাবার্থ এই: আপনি অসহায় অজশিশুর প্রতি যে করুণা প্রকাশ করেছেন তা আপনার মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু শুনেছি আপনি শুধু কবি নন, বিজ্ঞানীও। তাই আপনাকে প্রশ্ন করছি ছাগ-শিশুর প্রতি এ পক্ষপাতিত্ব কেন। যে সব ফুল গাছ থেকে কেটে এনে আপনার ফুলদানীতে সাজানো হয় বা মালা গাঁথা হয় তারা কি জীবন্ত নয়! আপনি যে তসর-গরদের জামা-কাপড় পরেন তা যে কত লক্ষ কীটকে নৃশংসভাবে মেরে তৈরী হয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই, আপনার প্রেয়সীর চরণ অলক্তকে রাঙাবার জন্য যে কত কোটি কীট প্রাণ দেয়—এও আপনি নিশ্চয় জানেন। কিন্তু এদের হত্যা-নিবারণ-কল্পে আপনি কখনও কিছু লেখেন নি তো। ছাগ-শিশুর প্রতি এ পক্ষপাতিত্বের কারণ কি জানবার জন্য উৎসুক রইলাম।

কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার কিছু পরে কলকাতায় একদিন আমার এক প্রাক্তন কলেজী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। সে বলল, তুমি 'আনন্দবাজারে' যে কবিতাটি লিখেছ তা পড়ে গুরুদেব খুব খুশী হয়েছেন। জিজ্ঞেস করছিলেন—'বনফুল' লোকটি কে, কোথায় থাকে। আমার কাছে কখনও আসেনি তো। তুমি যেও তাঁর কাছে। খুব খুশী হবেন।

আমি বললাম, ভাই, অতবড় লোকের দরবারে যেতে ভয় করে। তা ছাড়া, আমি ডাক্তার এবং ব্রাহ্মণ, 'কল' না পেলে কোথাও যাই না। অতবড় লোকের কাছে অনিমন্ত্রিত যাওয়ার সাহসও নেই। দারোয়ান হয়তো ঢুকতেই দেবে না।

আমি আশা করি নি যে সে এসব কথা রবীন্দ্রনাথের কর্ণগোচর করবে। কিছুদিন পরে অবাক হয়ে গেলুম রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে চিঠিটি হারিয়ে ফেলেছি। তার মর্ম কিন্তু মর্মে গাঁথা আছে।

পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করলাম, ত্রুটি মার্জ্জনা কোরো। আগামী অমুক তারিখে এখানে বসন্তোৎসব হবে। তুমি সপরিবারে এলে খুব খুশী হব। অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হবে না।

অভিভূত হয়ে গেলাম এ চিঠি পেয়ে।

এরপর যেতেই হল। সপরিবারেই গেলাম। আমাদের ঘরে তখন গাই ছিল। ঘরের দুধ থেকে খানিকটা সন্দেশ তৈরি করে নিলেন গৃহিণী। আমার প্রথম সন্তান মেয়ের বয়স তখন সাত বছর হবে, বড় ছেলে অসীমের বয়স বোধ হয় চার বছর, আর ছোট ছেলে চিরন্তন এক বছরের শিশু—বড়জোর দেড় বছর, হামাগুড়ি দিচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনে আমরা গিয়ে হাজির হলাম শান্তিনিকেতনে। গিয়ে উঠলাম আমার তৃতীয় ভ্রাতার শাশুড়ীর বাসায় গুরু-পল্লীতে। তিনি তখন তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে ওখানেই থাকতেন। সোনাদি নামে প্রখ্যাত ছিলেন তিনি। সকালবেলা কবি-সন্দর্শনে গেলাম। তিনি তখন বাইরে মাঠে একটা গাছের ছায়ায় বসে চা খাচ্ছিলেন। চায়ের টেবিলে আরও দু-একজন ছিলেন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহনবাবু। তিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রণাম করতেই বললেন, "বস, বস। ভারী খুশী হয়েছি।"

আমার হাতে সন্দেশের কৌটোটা দেখিয়ে ব "ওটা কি?"

বললাম, "সন্দেশ এনেছি আপনার জন্যে।"

কৌটোটা খুলে রাখলাম তাঁর সামনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিলেন। দু- মুখ নেড়েই বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে।

বললেন, "এ সন্দেশ তুমি ভাগলপুরে পেলে কি

গৃহিণীকে দেখিয়ে বললাম, "ইনি করেছেন। আ গাই আছে, তারই দুধ থেকে করেছেন।"

ক্ষিতিমোহনবাবুর দিকে চেয়ে কবি গম্ভী বললেন, "এ তো বড় চিন্তার কারণ হল।"

"কেন?"

"বাংলাদেশে তো দুটি মাত্র রস-স্রষ্টা আছে। দ্বারিক, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ যে তৃতীয় (আবির্ভাব হল দেখছি।"

স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর চোখমুখ।

এমন সময় আমার মেয়ে কেয়া একটা অদ্ভু করে বসল তাঁকে।

"আপনার গলায় ফুলের মালা নেই তো? আ বাড়িতে আপনার যে ফোটো আছে সেটাতে ফুলে আছে কিন্তু।"

হেসে উত্তর দিলেন, "আজকাল আর অ মালা কেউ দেয় না। কি করব বল।"

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, "(উঠেছ?"

"গুরু-পল্লীতে আমার এক আত্মীয়া আছেন সে উঠেছি।"

"আমার এখানে ওঠা উচিত ছিল। যাই বিকেলে কিন্তু চা খাবে। তোমার লেখা পড়ে ম তুমি ঝাল খেতে ভালবাস। বিকেলে বড় বড় মটরের ঘুগনি করলে কেমন হয়। ঘুগনির মা একটা লাল লঙ্কা গোঁজা থাকবে। কি বল?"

"বেশ তো।"

সুধাকান্তদা রবীন্দ্রনাথের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছি তিনি ভুরু কুঁচকে চোখমুখের কি একটা ইঙ্গিত করলি ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বলডুইন (Baldwin), বলাইকে ভাল করে ঘুগনি খাওয়াও আজ। লাল লঙ্কা যেন থাকে।"

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী তখন রবীন্দ্রনাথের খাস্তমন্ত্রী ছিলেন। মাথায় প্রকাণ্ড টাক বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আদর করে 'বলডুইন' আখ্যা দিয়েছিলেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বললেন, "তোমার নাম 'বনফুল' কে দিয়েছিল? তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল 'বিছুটি'। যা দু-এক ঘা দিয়েছ তার জলুনি এখনও কমে নি।"

অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। রবীন্দ্রনাথ স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "আমি তো এখন লিখতে বসব। তোমরা এগারোটা নাগাদ 'উত্তরায়ণে' এস।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "বসন্তোৎসব কখন হবে?"

"সে তো দুদিন পরে হবে।"

"কিন্তু আপনি আমাকে তো আজ আসতে বলেছিলেন।"

"তাই নাকি! তারিখটা লিখতে হয়তো ভুল হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, আজও তোমাদের কিছু দেখিয়ে দেব। স্টেজ বাঁধা হয়েছে।"

এগারোটা নাগাদ 'উত্তরায়ণে' গেলাম।

দেখলাম রবীন্দ্রনাথ প্রকাণ্ড ঘরে একটা প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে তখনও লিখছেন। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "বস তোমরা। আমার এখুনি হয়ে যাবে।"

বসলাম। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম নানারকম দামী আসবাবে ঘর সাজানো।

বললাম, "অত ঝুঁকে লিখতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? আজকাল তো নানারকম চেয়ার বেরিয়েছে, ঠেস দিয়ে বসে আরাম করে লেখা যায়।"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, "সব রকম চেয়ারই আমার আছে। কিন্তু ঝুঁকে না লিখলে লেখা বেরোয় না। দোয়াতের জল কমে গেছে তো, তাই উপুড় করতে হয়।"

লেখা শেষ করলেন। কথাবার্তা শুরু হল।

"শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখলে না কি?"

"না, এখনও দেখা হয় নি।"

"এর আগে আস নি কখনও?"

"না।"

আমি একটু অসুবিধায় পড়েছিলাম। রন্তুকে আমি কোলে করে বসেছিলাম। সে কিন্তু কোলে থাকতে চাইছিল না, নাবতে চাইছিল। দুরন্ত দামাল ছেলে, আমার ভয় হচ্ছিল এখনই হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে হয়তো কোন দামী আসবাবে হাত দেবে, কোন ফুলদানী হয়তো ভেঙে ফেলবে। তাকে কোলের উপর চেপে ধরে বসেছিলাম।

লেখা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওকে ধরে রেখেছ কেন, ছেড়ে দাও না।"

"ঘরের চারিদিকে এত দামী জিনিস ছড়ানো রয়েছে, ওকে ছেড়ে দিলে এখুনি গিয়ে ধরবে, ভেঙেও ফেলতে পারে।"

"ফেলুক। ও সব শিশু-স্পর্শ-বঞ্চিত হতভাগ্য জিনিস। ওর হাতে কোনটা ভেঙে গেলে তার মুক্তি হবে। ছেড়ে দাও ওকে।"

রন্তুকে ছেড়ে দেওয়া মাত্র সে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কোণের একটা বড় নীল রঙের 'ভাস্' (ফুলদানী) ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাসটা খুব বড় এবং উঁচু। রন্তু সেটা ধরতেই পড়ে গেল সেটা। আমি হাঁ হাঁ করে ছুটে গেলুম।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "ওটা কাগজের, ভাঙবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এ ঘরের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর কোন জিনিসই ওর নাগালের মধ্যে নেই। ওকে বেপরোয়া ছুটে বেড়াতে দাও।"

রন্তু (চিরন্তন) বে-পরোয়া হামাগুড়ি দিতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ আমার দিকে চেয়ে বললেন, "ভাগলপুরের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে। ভাগলপুরেই সর্বপ্রথম এক বড় সাহিত্য-সভায় আমাকে কবি বলে স্বীকার করেছিল। ভাগলপুরে আগে সাহিত্য এবং গান-বাজনার খুব চর্চা ছিল। এখনও কি আছে?"

"এখন আর তত নেই।"

"ভাগলপুরেই কি তোমার বাড়ি?"

"না। আমি প্র্যাকটিস করবার জন্যে ওখানে গেছি। আমার আসল বাড়ি বাংলাদেশে হুগলী জেলায়। আমার বাবাও ডাক্তার, তিনি পূর্ণিয়া জেলার মনিহারী গ্রামে

প্র্যাকটিস করতে বসেছিলেন। সেইখানেই আমার জন্ম হয়, সেইখানেই আমাদের বাড়ি।"

"প্র্যাকটিস করতে করতে লেখবার সময় পাও কি করে?"

"আমি general practice করি না। আমার একটা ল্যাবরেটরি আছে, ক্লিনিকাল পরীক্ষা করি। তারই ফাঁকে ফাঁকে লিখি।"

"বই বেরিয়েছে?"

"বেরিয়েছে দু-একখানা। আপনার কাছে ভয়ে পাঠাতে পারি নি। এবার দিয়ে পাঠাব?"

"পাঠিও।"

মনে হল ওঁর চোখে শঙ্কা ঘনিয়ে এল। ভাবলেন বোধ হয়, ওরে বাবা, আর একজন সার্টিফিকেটের উমেদার হাজির হল বুঝি।

"সার্টিফিকেটের লোভে পাঠাব না কিন্তু। আপনি সময় করে পড়ে আপনার সত্যিকার অভিমত যদি জানান তাহলে অবশ্য কৃতার্থ হব। নাও যদি দেন, আপত্তি করব না।"

মুচকি হেসে বললেন, "বেশ।"

তারপর টেবিল থেকে তাঁর 'সাহিত্যের পথে' বইখানা তুলে নিয়ে তাতে লিখতে লিখতে বললেন, "এবার তোমাকে দিচ্ছি না। প্রথমে ওঁকে দিচ্ছি। তোমার নাম কি?"

গৃহিণী তখন সলজ্জ হয়ে মাথা নীচু করে বললেন, "লীলা, লীলাবতী।"

নাম লিখে বইখানা আমার গৃহিণীর হাতে দিয়ে আমার দিকে কটাক্ষে চেয়ে হাসলেন একটু।

চুপ করে রইলাম। বলবার কি-ই বা ছিল।

একটু পরেই দেখলাম রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য নীলমণি দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওই আমার সমন এসে গেল। এবার উঠতে হবে।"

আমি ব্যাপারটা যে বুঝতে পারি নি তা আমার চোখের দৃষ্টিতেই ফুটে উঠেছিল বোধ হয়।

পরিষ্কার করে বললেন, "আমার খাবার দেওয়া হয়েছে। নীলমণি বড় কড়া গার্জেন। এক মিনিট এদিক ওদিক হবার জো নেই।

আমরা উঠে পড়লাম।

উনি নীলমণির সঙ্গে চলে গেলেন। দেখল কুঁজো হয়ে হাঁটছেন।

বিকেলে রঙ্গমঞ্চে সত্যিই নৃত্যানুষ্ঠান হল অ ভূত। খুব ভাল লাগল। নাচের সঙ্গে গানও ছিল মোহর (কণিকা) অনেক গান শোনাল। একটি মেয়ের নাচ (যতদূর মনে পড়ছে মেয়েটি অবাঙালী ইন্দোনেশিয়া) খুব ভাল লেগেছিল আমার। না হলে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগল?

"চমৎকার। বিশেষ করে মাঝখানে যে নাচছিল তার নাচ খুব ভাল লেগেছে।"

"নাচের তুমি কিছু বোঝ?"

"না।"

"তাহলে মাঝখানের মেয়েটি যে বেশী ভাল তা কি করে বুঝলে?"

অকপটে বললাম, "মেয়েটি দেখতে যে ভাল।"

একটা হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল চোখেমুখে বললেন না।

একটা প্রশ্ন অনেক দিন থেকেই কাঁটার মত মনে বিঁধে ছিল, সেইটেই এবার প্রকাশ করলাম।

বললাম, "আপনি যে মেয়েদের এত নাচ শে এতে কি ভাল ফল হবে শেষ পর্যন্ত? তা ছাড়া ম ঘরের মেয়েরা তো দুদিন পরেই বিয়ে করবে, তখন নাচবার সুযোগ পাবে কি?"

রবীন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টিতে এককণা আলো করে উঠল। বললেন, "আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পরে মধ্যবিত্ত বাঙালীর ছেলেরা আর উপার্জন পারবে না। তখন এই মেয়েরাই নেচে গেয়ে খাওয়াবে। তাই এ বিদ্যেটা ওদের শিখিয়ে f এতে ওদের সহজাত একটা নিপুণতাও আছে।"

চুপ করে রইলাম। মনে মনে তখন তাঁর সায় দিতে পারি নি। কিন্তু এখন দেখছি তাঁর ভবি কিছুটা ফলেছে।

"বিকেলে তোমরা 'উত্তরায়ণে' এস। ৫ সুধাকান্ত তোমাদের জন্য কিছু খাওয়ার আ করেছে।"

এই বলে তিনি উঠে গেলেন।

একটু পরেই সুধাকান্তদার সঙ্গে দেখা হল।

তিনি বললেন, "তুমি আজ আমাকে মেরে ফেলেছ!"

"কি রকম?"

"কাবুলী মটর কাছে-পিঠে পাওয়া যায় না জানতুম। ...কে মোটর নিয়ে সিংহবাবুদের ওখানে যেতে ...ছিল। তোমাকে তখন চোখের ইশারা করলাম। ...যদি বলে দিতে আমি খাব না তাহলে আমার ...র্ভোগ হত না।

বললাম, "অত কষ্ট করতে গেলেন কেন।" না হয় ...বাদই যেত!"

"ওরে বাবা, খাবার টেবিলে ঘুগনি হাজির করতে না ...লে আমার আজ শির যেত।"

'উত্তরায়ণে' গিয়ে দেখি একটা বারান্দাকে পরদা দিয়ে ...। সেইখানেই আমাদের খাওয়ার আয়োজন হয়েছে। ...দের পাঁচজনের জন্য পাঁচটি টেবিল, তাতে থরে থরে ...রকম খাবার সাজানো। লাল লঙ্কা-সমন্বিত ঘুগনিও ...ছে একটি টেবিলে। টেবিলগুলি অদ্ভুত। প্রত্যেক ...লের তিনটি কি চারটি থাক (ঠিক মনে নেই), তার ...াক থাকেই খাদ্য এবং পানীয়। উপরের থাকের ...র খাওয়া হয়ে গেলে হাত দিয়ে একটু ঠেললেই সেটা ...যাবে, বেরিয়ে পড়বে খাবার সুদ্ধ দ্বিতীয় থাকটা। ...ন্দ্রনাথ আমাদের সামনে একটা উঁচু চৌকিতে ...ছিলেন। তখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছিল, ...দায় ঢাকা থাকা সত্ত্বেও গরম হচ্ছিল একটু। পাখা ...ঘুরছিল।

রবীন্দ্রনাথ হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। পর বললেন, "অস্তাচলচূড়াবলম্বী রবি।"

ঘুগনি ছাড়া আরও নানারকমের প্রচুর খাবার ছিল। ...খেলাম। আমার ছোট ছেলে রন্তুর জন্যও একটা ...লি ছিল। সে টেবিলে ঠিক নাগাল পাচ্ছিল না। তাকে আলাদা একটা প্লেটে মিষ্টান্ন দেওয়া হল। ...জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল— ...। আমাদের প্রত্যেকেরই পিছনে একজন করে ...র দাঁড়িয়েছিল। রন্তুর পিছনে যার দাঁড়িয়ে থাকবার ...সে বোধ হয় বাইরে গিয়েছিল একটু। আমি রন্তুকে আমার গ্লাস থেকে জল ঢেলে দিলাম। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মুখে কে যেন আবীর মাখিয়ে দিলে। টকটকে লাল হয়ে উঠল সারা মুখটা। চোখের দৃষ্টি থেকে ঠিকরে পড়ল অগ্নি-কণা। বললেন, "এরা সব গেল কোথা—"

চাকরটা বাইরে থেকে ছুটে এল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলে আর এক গ্লাস জল।

আমি বললাম, "আর জল দরকার নেই। আমি ওকে দিয়েছি।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওকে চাইতে হল কেন।"

নির্বাক হয়ে রইলাম সকলে। তারপর রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কদিন আছ?"

"আজই চলে যাব।"

"আজই? এত তাড়া কেন? ও, তুমি যে ডাক্তার সে কথা ভুলেই গেছি।"

আমরা সকলে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে এলাম। ভাগলপুরে যখন ফিরলাম, তখন মনে হল একটা পরম সম্পদ লাভ করেছি। এমন পরম প্রাপ্তি আমার জীবনে আর ঘটে নি। কয়েকদিন পর্যন্ত মনে হতে লাগল একটা অপরূপ ছন্দ যেন আমার মনে অহরহ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, এর পর সাহস বেড়ে গেল। তাঁকে বই পাঠাতে লাগলাম। প্রথমে 'তৃণখণ্ড' পাঠালাম। কোনও উত্তর এল..না। তারপর পাঠালাম 'দ্বৈরথ'। একটু অনুযোগও করলাম কোনও উত্তর পাই নি বলে। এবার উত্তর এল। তখন বুঝলাম ওঁর শরীর খারাপ হয়েছে।

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল।

কল্যাণীয়েষু,

তুমি ডাক্তার। আমার আয়ুক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে আমার সম্পূর্ণ ছুটির দাবীর নিশ্চয় সমর্থন করবে। তোমার 'দ্বৈরথ' পেয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি—কিন্তু এখন সে সব কথা থাক—আমার মৌন ব্রত সুরু হয়েছে। আশীর্বাদ জেনো। ইতি

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২।৬।৩৮

কিছুদিন চিঠি লিখতে সাহস হল না। তারপর খবর পেলাম তিনি সুস্থ হয়েছেন, শুনলাম চন্দননগর সাহিত্য সম্মিলনেও আসবেন। সম্মিলনে আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম কবি তাঁর 'পদ্মা' নামক বোটে আছেন। আমরা জনকয়েক সাহিত্যিক বোটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। এর বিশদ বর্ণনা শ্রীপরিমল গোস্বামী একটি প্রবন্ধে দিয়েছেন। সেই সময় আমি তাঁর হাতে আমার 'বৈতরণী তীরে' বইটি দিয়েছিলাম। নামটি দেখে হেসে বলেছিলেন, "ঠিক সময়েই দিয়েছ। আমিও বৈতরণী তীরে এসে হাজির হয়েছি।" কথা ছিল সাহিত্য-সম্মিলনের সভা রবীন্দ্রনাথই উদ্বোধন করবেন। সভায় আমরা সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছি, রবীন্দ্রনাথ আর আসেন না। কি হল! দু-একজন বোটে খবর নিতে গেলেন। খবর যা এল তা বিস্ময়কর। যে জুতো পরে রবীন্দ্রনাথের সভায় আসার কথা ছিল সে জুতো নাকি আনা হয় নি। মোটর ছুটেছে কলকাতায় সে জুতো আনতে। সে জুতো এসে পৌঁছলে তবে তিনি সভায় আসবেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক সভার কার্য স্থগিত রইল। তারপর রবীন্দ্রনাথ এলেন শৌখীন একজোড়া নূতন জুতো পায়ে দিয়ে।

এর পর আমার 'কিছুক্ষণ' বইটা প্রকাশিত হয়। বইটা রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করবার বাসনা হয়েছিল। তাই তাঁর অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলাম একটা। অবিলম্বে উত্তর পেলাম।

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল।

কল্যাণীয়েষু,

তোমার "কিছুক্ষণ" আমার নামে উৎসর্গ করবার ইচ্ছে করেছ—সে ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা সম্মিলিত করি। কিছুদিন পূর্ব্বে "বৈতরণী পারে" (তীরে হবে এটা) বইখানি পেয়েছি, এর মধ্যে বীভৎস রস করুণ রসের যে মিশ্রণ ঘটিয়েছ তাতে তোমার সাহস এবং নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে—এর মধ্যে রচনার অপূর্বতা আছে। ইতি,—

৩ বৈশাখ ১৩৪৪

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি যে সময়ে আসতে চেয়েছ এসো—দেখা হ
বলা বাহুল্য, এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করি নি। সে
সপরিবারে গিয়েছিলাম। গৃহিণী প্রাইভেটে বি.
পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। ভাগল
পড়ার অসুবিধা হচ্ছিল বলে তিনি কলকাতা যাচ্ছি
আমার শ্বশুর-শাশুড়ী তখন কলকাতায় থাকতেন। ঐ
করে বসতেই বললেন, "এবার ক'দিনের ছুটি
এসেছ? কবে ভাগলপুর ফিরবে?"

"এখান থেকে কলকাতা যেতে হবে, এঁকে
বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিতে।"—গৃহিণীকে দে
বললাম।

"কেন, ঝগড়া হয়েছে না কি?"

"না, উনি এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবেন, বা
বাড়িতে থাকলে পড়াশোনার সুবিধা হবে।"

"বাপের বাড়ি যাওয়ার দরকার কি, এখানেই
না। এইখানেই বি. এ. পড়বে, দু-একটা ক্লা
পড়াবেও। খরচ খুব কম। সীট রেণ্ট পাঁচ টাকা, খা
দশ টাকা। আর তুমিও তোমার ল্যাবরেটরি নিয়ে
এখানে। ঘুরে ঘুরে দেখ, যে বাড়িটা পছন্দ হয়
খালি করিয়ে দিচ্ছি।"

মৃদু হেসে বললাম, "এখন আর ভাগলপুর ছাড়
পারব না, শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে।" তা
একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলাম, "আমাকে এখ
আসতে বলেছেন কেন?

রবীন্দ্রনাথ একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন, তা
বললেন, "আমার ইচ্ছে এখানে সাহিত্যিকেরা
বাস করুক। আমাদের দিন তো ফুরিয়ে এসে
আমি যখন থাকব না তখন হয়তো বিশ্বভারতী কিছু
টিকে থাকবে, কিন্তু এর অভিনবত্ব আর থাকবে
অভিনবত্ব দিতে পারে সাহিত্যিকেরা। তাদের হা
এর নূতন রূপ গড়ে উঠুক এই আমার ইচ্ছে।"

"আমার পক্ষে তো আসা অসম্ভব।"

এর পরই চা খাবার প্রভৃতি আসতে লাগল।
প্রসঙ্গে আর কোন কথা হয় নি। পরের ট্রেনেই কলক
চলে গেলাম। [ক্রম

['রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' হইতে পুনর্

হারানো কালের স্মৃতি

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

...শ শো তেতাল্লিশের জুলাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি তখন তথাকথিত মিত্রশক্তির ...লে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে বঙ্গমায়ের ত্রিশ লক্ষ পুত্রকন্যা নিঃশেষ। লীগ-মন্ত্রিকুলের কুশাসনে ও মাড়োয়ারী ...দলের কদর্য শোষণে বাঙালীর রাজনৈতিক আর ...নতিক গগনে বইতে লাগল হতাশার হাওয়া। এমন ... এক তরুণ সৈন্যগ্রাহক দপ্তরে গিয়ে সামরিক ...গে যোগ দিতে দাসখত দিলেন। মনে মানতেন, ...ীয় স্বার্থের যুক্তিতে এ সময় তাঁর নয়। যাঁদের ...দেশে এবং উপদেশে ভারত জনসংগ্রামে সানন্দে ...র্ন জানাত, লোকবরেণ্য সে নেতৃবর্গ কারাগারে বন্ধ ...তে বাধ্য হতেন না। জগতের মোড়লির জন্য ...মানরা যুদ্ধের সূচনা করেছে, দোস্ত জুটেছে জাপানীরা। ...নীতে দীর্ঘকালের সঞ্চিত কর্তৃত্ব রক্ষায় ইংরেজরা ...তীর্ণ হয়েছে এই সময়ে ; দোসর মিলেছে ইয়াংকিরা। ... রাষ্ট্রগুলোর ভুবন-জোড়া প্রভুত্বের অবৈধ ইচ্ছা ...নাশা সংগ্রামের জঘন্য উৎস। পরাধীন ভারতবাসীর ...ক নীতিগত বা প্রয়োজনগত কোন সিদ্ধান্তে যুদ্ধ আদৌ ...জন নয়। প্রাণঘাতনায় নিরুপায় হয়ে বঙ্গদুলাল ...জ্ঞা-পত্রে নাম সই করলেন।

বিছানা গুছিয়ে, মেসের লেনদেন চুকিয়ে এলেন ...টা মিলিটারি শিক্ষাকেন্দ্রে। পরিচয়-চিঠি পেয়ে ...নফ হোসেন নামে জনৈক পাঞ্জাবী মুসলমান সুবেদার ...কে নিয়ে গেলেন জুডাস জালমন নামে একজন ...বাবারি ইহুদি ক্যাপ্টেনের সামনে। কুশল সংবাদ ...নে কোম্পানি-কমাণ্ডার পাঠিয়ে দিলেন শিক্ষার্থীর ...স্তানায়। লাইনে এসে ভাবলেন, অজানা জীবনের ... কি ভাবে রক্ষা হবে, খালি চাকরির খাতিরে ...শরাজের সেবাদাস হয়ে যৌবন কাটাবেন অথবা ...মরিক অভিজ্ঞতাকে আগামীতে সফল করবেন দেশের ... দশের কল্যাণে ?

যুবক প্রাণধারণের জন্য ভর্তি হয়েছেন পেশাদার আর্মিতে, কিন্তু আদর করছেন না অবাঞ্ছিত জীবনকে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তিনি বিপ্লবী বাঘা যতীনের স্বজাতি ; বিদ্রোহী সূর্য সেনের স্বদেশী। তাই এ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত মিলিটারীর দ্বার বঙ্গজনের ভাগ্যে অবরুদ্ধ ছিল। শ্বেতদ্বীপের সাম্রাজ্য সংহিতায় সামরিক বাহিনীতে বঙ্গজাতি যুগান্তের অপাঙ্‌ক্তেয়। বঙ্গবাসী ছাড়া গোটা ভারতে অপর কেউ জবর-জোরে পাঞ্জা লড়ে নি বর্তানিয়ার বিপক্ষে। তাই তো মর্জিমত বাঙালী জাতিকে অপবাদ দিয়েছে—রণবিমুখ গোষ্ঠী। বেনিয়া উড়িষ্যা জয় করেছে বঙ্গভূমির পল্টনদের সাহায্যে, আসামে অভিযান পাঠিয়েছে বাংলাদেশী পদাতিকদের সহায়তায় ; কপট দরকারমাফিক সত্যকে মিথ্যা বলে প্রচার করতে কখনও অক্ষম হয় নি।

পাঠান-পাঞ্জাবীর বরাতে ফৌজের দুয়ার অবারিত। মাত্র আঠার টাকায় বিনিময়ে আত্মদ্রোহী আনুগত্য সমগ্র ভারতবর্ষে অন্য কে জানিয়েছে ইংরেজকে ? ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌প্রাপ্ত গোলন্দাজদের চাইতে ফাঁসির আসামী ক্ষুদিরাম মানুষ হিসেবে উৎকৃষ্ট। সিপাই খান কুটিল শাসকের ভৃত্য। শহীদ বসু নির্মম শোষকের সমন। অবশ্য মিলিটারীতে বঙ্গসন্তান প্রয়োজন অনুযায়ী বেশ যোগ্যতা দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থলবাহিনীতে চৌধুরী, জল-বিভাগে চক্রবর্তী, বিমান বাহিনীতে মুখার্জি প্রমুখ কীর্তিমানদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিন কাটে বুটের খটাখট শব্দে, টাইপ-রাইটারের টকাটক ধ্বনিতে, ওস্তাদের গালভরা গালিতে। প্যারেড গ্রাউণ্ডে ইউনিট অ্যাডজুটান্ট সুবেদার হোসেন হাঁকেন, ইয়ে বংগালীও, কমজোরও, ছাতি খুলকে আগে চল্‌হো। কমার্সিয়াল কলেজে বঙ্গখ্রীষ্টান প্রিন্সিপাল মানস মোল্লা কড়া মেজাজে বলেন, ইউ বয়েজ, প্যাক অফ উল্‌ভস্‌, আই অ্যাম টেরিবৃলি অ্যানয়েড উইথ দি এণ্টায়ার ক্লাস। অর্ডালি রুমে অফিসার-কমাণ্ডিং ক্যাপ্টেন জালমন দোষীর বিচারে বসেন। অপরাধগুলো এই ধরনের

ছিল : সন্ধ্যায় বেরিয়ে ফিরতে কার নির্দিষ্ট ক্ষণ থেকে একটি সেকেণ্ড দেরি হয়েছিল, রাত্রিতে ঘুমোবার বিউগেল বাজানোর পরেও কারা সিগারেট খেয়েছিল। আমাদের সৈনিককে একদা দ্বিপ্রহরে একস্ট্রা ড্রিল করতে হল; হেতু তাঁর উদ্যোগে বাংলার জওয়ানবৃন্দ এক দৈনিক পত্রিকার রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে চাঁদা দিয়েছিলেন। দুরাত্মার অভিমতে অন্যায় বিবেচনায় বঙ্গতনয় শাস্তি পেলেন।

নানা দ্বন্দ্বে কাটল কয়েক মাস। সতীর্থগণ অনেকে এখনও আছেন ট্রেণিং সেণ্টারে, কেউ বা চলে গেছেন দূরান্তরে—বাগদাদে নতুবা বন্দর আব্বাসে।

পৌঁছলেন কোশলের মনোপীঠ জব্বলপুরে। এখানে নতুন শিক্ষাকেন্দ্রে নিতে হবে উন্নত তালিম। বিবিধ প্রান্তের বহুজনের সঙ্গে এখানে হলেন পরিচিত। পাঞ্জাবীরা শিক্ষার্থী শিবিরে সংখ্যাগুরু সর্দার-উদেদারদের মধ্যে। ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডিং অফিসার বঙ্গপুত্র মেজর মিত্র।

নির্ধারিত স্থানে মাথা গোঁজবার জায়গা পেলেন। ট্রেনিং সেণ্টারের ব্যবস্থা বঙ্গদুলালের কাছে কত অসহনীয়, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে বুঝবে না. সামরিক কঠোরতা আরামপ্রিয় বঙ্গসন্তানের শিরোপীড়ার নামান্তর; বৃটিশের বিভেদ বণ্টনের সহযোগী পঞ্চনদের ওস্তাদদের অতিরিক্ত বঙ্গবিদ্বেষের ফলে অসহ্য। পাঞ্জাবী উদেদারকুলের উদ্ধত প্রকৃতির সঙ্গে বঙ্গদেশের রিক্রুটদলের উদার প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য অসম্ভব। বঙ্গনন্দনেরা শতেক অত্যাচার সইতেন মুখ বুজে।

অসংখ্য অসুবিধার মধ্যেও দিন কাটছিল, কিন্তু অবস্থার সঙ্গে কোনই খাপ খাওয়ানো যেত না—যখন পঞ্চনদের ওস্তাদদের অসংগত আশকারায় বিহারি-উত্তরপ্রদেশীয় জওয়ানরা অভদ্র ভাষায় বঙ্গজাতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করত। বর্তানিয়ার কৌশলে সারা ভারত-সমাজের অন্তরে বঙ্গপ্রেমের এ হেন অভাব! আফ্রিকা থেকে আমেরিকা পর্যন্ত মাতব্বরী স্থাপনে ম্লেচ্ছ সরকার রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের প্রাণখোলা বঙ্গভূমি বাদে অন্যত্র কোথাও ঠেকে নি। তাই বুঝি সদাই সতর্ক বঙ্গচিত্তের সম্পর্কে। সপ্তরথীর আঘাতে বঙ্গসত্তাকে বিব্রত রাখতে সবিশেষ ব্যতিব্যস্ত। কার্জন থেকে ওয়াভেল পর্যন্ত ধূর্ত বাহাদুরেরা বাঙালী দমনের দারুণ দৈত্য।

ভোর চারটে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বি[illegible] বিশ্রাম পেত না। স্নানের সময় নেই কাজের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে খোলা মাঠে রাইফেল তবু বাংলার শিক্ষার্থীরা প্রসন্নতায় পরিস্থিতিকে [illegible] নিলেন, শুধু বেতনের বিনিময়ে নয়, প্রেরণা ছিল ই[illegible] রাজত্বে এত বিস্তৃত যুদ্ধবিদ্যা শেখার সুযোগ কখনও আসে নি। বাঙালী জাতি লড়াই ক[illegible] এমন নিন্দাকে খণ্ডন করতে বাংলাদেশের জ[illegible] বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নি।

প্রতি শনিবার বিকেলে রিক্রুটদের মধ্যে [illegible] আলোচনা চলত। বিষয়—ভারত মহাদেশের অধি[illegible] রক্ত ও কৃষ্টির, সাহিত্য আর সভ্যতার, ভূগো[illegible] ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ। এক-একজন অফিস[illegible] একটি আসরে সভাপতি আলোচনায়।

আলাপের ত্রৈমাসিক সম্মিলনী। মিত্র সাহে[illegible] শোভা। অনুষ্ঠান আরম্ভ হলে তিনি চন্দ্রভান চোপ[illegible] নামে জনৈক পাঞ্জাবী শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করলেন, পঞ্চ[illegible] কেন প্রখ্যাত? উত্তরে চোপরা বললেন, ভা[illegible] প্রথম আর্য উপনিবেশ পাঞ্জাবে প্রসারিত হয়েছিল পঞ্চনদকে কেন্দ্র করেই আর্যপ্রাধান্য পরিবর্ধিত হয়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে।

তারপর মেজর মিত্র আন[illegible] আয়ার নামক এক[illegible] তামিল জওয়ানকে জিজ্ঞেস [illegible]লেন, তামিলনা[illegible] কি[illegible] বিদিত? আয়ার জবাব দিলেন, প্রাচীন ভারত[illegible] পাঁচ হাজার বছর পূর্বে হড়প্পায় যে শিল্পপ্রথা [illegible] হয়েছিল, তামিলভূমি আজও সে প্রাগার্য শৈলীমালা[illegible] সযত্নে সংরক্ষা করেছে।

অতঃপর তিনি সৈনিকের কাছে জানতে চাই[illegible] বাংলা কোন্ বিষয়ে বিখ্যাত? উত্তরে তরুণ বললে[illegible] বঙ্গদেশ বহুজনের জন্য বিশ্রুত। সভাপতির কৌতূহ[illegible] জাগল মুগ্ধ চোখে। যুবক বলতে লাগলেন, মীননা[illegible] গোরক্ষনাথের, চন্দ্রগোমিন শীলভদ্রের, শান্তিরক্ষি[illegible] দীপংকরের, চৈতন্য-নিত্যানন্দের, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে[illegible] প্রাণবন্যায় নিত্যকালে প্রমাণিত হয়েছে বঙ্গজাতি[illegible] জন্যই বাংলাদেশ পুণ্যধন্য। বঙ্গচরিত্র প্রাচ্যালোক[illegible]

[৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মাংসের চপ

অচ্যুত গোস্বামী

সৈন্যে সৈন্যে সারাটা দেশ যেন ছেয়ে গেছে। পথে-ঘাটে মাঠে-বাদাড়ে সর্বত্র তারা ছড়িয়ে পড়েছে র দিনের উচ্চুনি পোকার মত। শান্ত নির্বিরোধ রণ মানুষেরা যেখানে বাস করে ছোট ছোট ঘেঁষি বাড়িগুলোতে সেখানেও কোন বাড়ি থেকে কোন সময়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্যদল বেরিয়ে এলে শ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রাস্তায় প্রতি পনেরো-বিশজন য়ের মধ্যে অন্ততঃ একজন সৈন্য নজরে পড়বেই। র সেই খাকী বা নীল বা বাদামী রঙের পোশাক-পরা ন্দুক-কাঁধে মানুষগুলোর ভারী বুটের শব্দের মধ্যে এমন টা ভয় আর বিস্ময়ের মেশামেশি আছে যে যেখানে কজন সৈন্য আছে সেখানে আশেপাশে একশো জন ন্য মানুষ থাকলেও তারা আছে বলেই যেন মনে য় না।

দেশে যে এত সৈন্য আছে তা কি কেউ কখনও বুঝতে পেরেছে! আজ অবশ্য সবাই বুঝতে পারছে য দেশরক্ষার নাম করে পূর্ববর্তী সরকার যে বাজেটের ই-তৃতীয়াংশ টাকা আলাদা করে রাখতেন তা শুধু শুধু নয়। সেই বিরাট টাকায় এই বিপুল সৈন্যবাহিনী তিল তিল করে তৈরি হয়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী শাসকদল এই বিপুল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন দেশরক্ষার প্রয়োজনে না হোক, অন্ততঃ নিজেদের শাসন-ক্ষমতা বজায় রাখার প্রয়োজনে। তারপর একদিন সেই তাঁদের দেওয়া দুধ-কলা দিয়ে বর্ধিত সাপের দল তাঁদেরই ছোবল মেরে সরিয়ে দিয়ে দেশের শাসন-ক্ষমতা দখল করে বসেছে। এককালে যারা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল আজ তারা জেলখানায়। কারও কারও বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের পালা ইতিমধ্যেই চুকে গেছে। যাদের এখনও বাকি আছে তারাও সেই অবধারিত পরিণামের জন্য প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

সারাটা দেশ যেন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। রাস্তায় লোক চলাচল পর্যন্ত অনেক কমে গেছে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কেউ রাস্তায় বেরয় না। রাস্তায় বেরুলেও কেউ হৈচৈ চেঁচামেচি করে না। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না, এবং তাও বলে ফিসফিস করে। দেশটা হঠাৎ অত্যন্ত সভ্য হয়ে গেছে; সবাই জানে যে, জোরে জোরে কথা বলা বা রেগে যাওয়া বা হেসে ওঠা নির্লজ্জ প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতা। প্রথম প্রথম দু-চারদিন সান্ধ্য-আইন জারি করা হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আর সামরিক কর্তৃপক্ষ তার কোন দরকার বোধ করছেন না। সান্ধ্য আইন না থাকা সত্ত্বেও সন্ধ্যার পরে রাস্তায় কদাচিৎই কোন লোক চোখে পড়ে।

দেশের সমস্ত লোক সেই প্রথম ভাগের সুবোধ বালক হয়ে পড়েছে। এমন নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খল জীবন-যাত্রা দেখে দু চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় যেন ডিসিপ্লিন জিনিসটা এ দেশের মজ্জায় মজ্জায় গাঁথা হয়ে গেছে। বুঝতে পারা যায় যে ডিসিপ্লিন রপ্ত করার জন্য স্কুলে কলেজে বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা দেওয়ার কোন দরকার হয় না। উপযুক্ত শাসকের হাতে পড়লে জনতা এক রাত্রির মধ্যে ডিসিপ্লিন শিখে নিতে পারে।

দেশের লোকের অপরাধ-প্রবণতাও আশ্চর্যজনকভাবে কমে গেছে। চুরি-ডাকাতি, ঘুষ খাওয়া, ভেজাল দেওয়া প্রভৃতি সবকিছু অনাচারই ভোজবাজির মত বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষ যে স্বভাবতঃই সৎ এবং ধর্মভীরু এই রকম সামরিক শাসনের হাতে না পড়লে তা সহজে বোঝা যায় না।

এ দেশে আর জোরে বাতাস বইছে না। আকাশে ভারী মেঘের দল এসে গুরু গুরু আওয়াজ তুলে অখণ্ড শান্তিকে ভঙ্গ করতে চাইছে না। পাছে বজ্রগর্ভ

ডিসিপ্লিনের এতটুকু ছেদ পড়ে এই ভয়ে মূক প্রকৃতি যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রখর রৌদ্রের তাতে ভিজছে দিনের পর দিন। এক অজানিত সম্ভাবনার আতঙ্কে দেশের সমস্ত লোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। বোবা হয়ে গিয়ে তারা শুধু নিজেদের বুকের উদ্দাম ধুকপুকুনির শব্দটুকু শুনতে কান পেতে। আর এই আতঙ্কই তো সভ্য-ভব্য জীবন-যাত্রার সার সত্য। সমস্ত আবহাওয়ায় এক গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে আর সেই থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধুমাত্র ভারী বুটের শব্দ আর অকস্মাৎ কুচকাওয়াজের লেফ্‌ট রাইট ধ্বনি দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে, নববিবাহিত দম্পতির ফুলশয্যার ঘরে, শিশুদের খেলার ঘরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে।

হ্যাঁ, একমাত্র সামরিক কর্তৃপক্ষই জানে কী করে দেশের লোককে ডিসিপ্লিন শিক্ষা দিতে হয়।

পুরনো আমলের অধিকাংশ সরকারী অফিসই এখন বন্ধ। দু-চারটে অপরিহার্য সরকারী অফিস এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সেখানেও একজন করে সামরিক অফিসার সর্বময় কর্তা হিসাবে মোতায়েন রয়েছেন, আর বড়বাবু বড়সাহেবের দল এখন জোড়হস্ত হয়ে নির্দেশ অনুসারে কাজ করে যাচ্ছেন। সাধারণ কেরানীরা পরম সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে চিরকাল যাদের রক্তচক্ষুর নীচে কাজ করতে হয়েছে সেই ঘুঘুদের উপরে ঘোগেরা বাস করে। আগের দিনের ভাগ্যবিধাতারা—জজ ম্যাজিস্ট্রেট বড় বড় পুলিস অফিসার—এখন সন্দেহভাজন ব্যক্তি, নিজের নিজের কোয়ার্টারে এখন কার্যতঃ নজরবন্দী। আদালত-কাছারিগুলো এখন সম্পূর্ণভাবে তালাবন্ধ হয়ে চামচিকেদের বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছে। দেশের সমস্ত বিচারের ভার সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বয়ং গ্রহণ করেছে। সে বিচার যেমন দ্রুত, তেমনি তার কার্যকারিতাও অসীম। সামরিক ক্যাম্পের সামনে খোলা জায়গায় বিচার হয়; অঞ্চলের লোকজনদের ডেকে আনা হয় বিচার দেখবার জন্যে।

বিচারের প্রয়োজন খুব কমে গেছে। চুরি ডাকাতি বা ওই জাতীয় ঘটনা আজকাল প্রায় ঘটছেই না। তবু কেমন করে যেন এক-আধটা ঘটনা ঘটে যায় মানুষের সাময়িক মতিভ্রমের দরুন।

যে অঞ্চলের কথা বলছি সে অঞ্চলের সর্বময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফৈ-মির উপর ন্যস্ত। সকালে খানিকক্ষণের জন্য [illegible] একটি ছোট্ট ক্যাম্পে জনসাধারণের অভাব অভিযোগ নালিশ ইত্যাদি [illegible] জন্য। ইচ্ছে করেই একটা মাঠের সামনে তিনি ক্যাম্পটি স্থাপন করেছেন। যাতে প্রয়োজন হলে লোক মাঠে এসে জড়ো হতে পারে এবং তিনি [illegible] সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

তাঁর চেহারা এবং চাল-চলন দেখলে তাঁকে সাধারণের আপনার লোক বলেই মনে হবে। উপরকার এবং বুকের তারকা চিহ্নগুলো বাদ তাঁর ইউনিফর্মটি সাধারণ সৈনিকদের ইউনিফর্ম এমন কিছু উন্নত স্তরের নয়। শার্টে বা [illegible] কোথাও ধোবা-বাড়ির ভাঁজের একটুও অবশিষ্ট হাতের আস্তিন গুটিয়ে তুলে দিয়েছেন কনুইয়ের পর্যন্ত। ঠোঁটের উপরকার অযত্নে বর্ধিত [illegible] বুনো গাছের মতই অসমানভাবে বেড়ে উঠেছে। [illegible] গালটায় কিসের যেন দাগ। কিন্তু তাঁর মোটা মাগ [illegible] চেহারায় আর পুরু অমসৃণ চামড়ায় আর রোমশ [illegible] আভিজাত্যের ছাপ না থাক শক্তি আর দম্ভের পরি[illegible] আছে।

গরমের দিন বলে এবং গরমে সহজেই কাতর পড়েন বলে ক্যাম্পের ভিতরে না বসে তিনি বা[illegible] একটা আমগাছ-তলায় বসার ব্যবস্থা করে নিয়েছে[illegible] চেয়ারের উপর গা এলিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর [illegible] পা দুখানি ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বসে থাকেন। [illegible] তার বিপরীত দিকে একটি কেরানী বসে [illegible] ধূলিমলিন বুটজোড়ার দিকে একদৃষ্টিতে তা[illegible] থাকে। আশেপাশে জনকয়েক আর্দালী আর [illegible] প্রখর রোদের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে আ[illegible] প্রতীক্ষায়।

ফৈ-মির সঙ্গে দেখা করার জন্য আগে [illegible] সময় নির্ধারণ করতে হয় না, বা স্লিপ পাঠাতে হয় [illegible] কোন রকম আমলাতান্ত্রিক কায়দা-কানুনের [illegible] ধার ধারেন না। সব ব্যাপারেই তিনি সামরিক ক্ষিপ্র[illegible] পক্ষপাতী। যে কেউ এসে সোজাসুজি তাঁর

...পরে। সে যথারীতি স্যালুট করল কি না ...বিনয়ের সঙ্গে কথা বলল কি না সে সব তিনি না। সে যদি খুব সংক্ষেপে কোন রকম ... বাগাড়ম্বর না করে কাজের কথাটি বলে পারে তা হলেই তিনি সন্তুষ্ট। ছোট বড় যে ...রের দর্শনপ্রার্থীর ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম।

... বলতে কি তাঁর এই ধরনধারণগুলোর জন্য ইতিমধ্যেই খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে না। লোকে তাঁর কাছে আসতে ভয় পায় ...তবু জানে যে এখানে এসে তাড়াতাড়ি কাজ ...য়। সরকারী অফিসের দীর্ঘ বিলম্ব আর ...া মারে হয়রানী থেকে সেটা অনেক ভাল।

...র প্রতি যদিও লোকের ভক্তি যথেষ্ট আছে ...নি এখানে ত্রাণকর্তা-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন যদিও অনেকে বলতে শুরু করেছে, তবু যে ...টা তিনি এখানে বসেন সে সময়ের মধ্যে কাছে লোকজন খুব কমই আসে। সাধারণ ...র কাছে ভক্তির আকর্ষণের চেয়ে ভয়ের বিকর্ষণটাই যাদের মনে শুধু অভিসন্ধি পূরণের আকাঙ্ক্ষাই ...ই সঙ্গে সাহসও যথেষ্ট আছে, তারাই আসে। আসে এমন লোক যাদের অভিযোগের আশু ...র দরকার। তা ছাড়া বেশীর ভাগ লোকই ...যটুকুতে এদিকটা দিয়ে যাওয়ার দরকার থাকলেও ...য পথ দিয়ে যায়, কাজেই এ সময়টা লেফটেন্যান্ট ...র কাছে কার্যতঃ বিশ্রামের সময়। বিশ্রামটুকু ... করার জন্য তাঁর পনেরটি সিগারেট আর ...সর মিশ্রিত চা আর একটি গোটা মুরগির রোষ্ট ...হয়।

...দিন সকালবেলায় টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ...দীতে মুরগির অবশিষ্ট ঠ্যাংটা চিবুতে চিবুতে লক্ষ্য করলেন যে একটি লোক রাস্তা থেকে ...দিকে আসবার জন্য দু-এক পা বাড়াচ্ছে আবার ফিরে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি চিবনো বন্ধ ...ক দিয়ে বললেন, শো, যাও তো, ওই লোকটা ...য় আমার কাছে আসতে চাইছে, ওকে ডেকে ...স। বল যে কোন ভয় নেই।

কথাগুলো বলতে গিয়ে মাংসের খানিকটা রস পুরু ঠোঁট পেরিয়ে চিবুক অবধি নেমে এল। বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে তিনি সেটুকু মুছে নিয়ে ট্রাউজারের পিছন দিকে হাতটা মুছে ফেললেন।

শো-র হাত-ধরা অবস্থায় লোকটা কাঁপতে কাঁপতে এসে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সামনে দাঁড়িয়ে আভূমি নত হয়ে সেলাম জানিয়ে বলল, হুজুর মা-বাপ।

তোমার নাম কি?—ফৈ-মি জিজ্ঞেস করলেন।

ভু-দা।

কী কাজ কর?

ভাগচাষ করি হুজুর। আর দু-তিনটে দুধেল গরু আছে।

ও! তা কী হয়েছে তোমার বল। কোন ভয় নেই। নির্ভয়ে বল।

আজ্ঞে হুজুর, আমার একটা গরু চুরি গেছে। পুরো দু সের করে দুধ দিত গরুটা। অমন ভাল গরু এ তল্লাটে কম আছে।

টেবিলের অপর প্রান্তে যে কেরানীটি বসেছিল সে মন্তব্য করল, যে-জিনিসটা চুরি যায় সেটা সব সময়েই সেরা জিনিস হয়।

ভু-দা বলে উঠল, হুজুর যদি বিশ্বাস না করেন—

ফৈ-মি হাত তুলে কথা বলতে বারণ করলেন। বললেন, বাজে কথা বাদ দাও। গরুটা কে চুরি করেছে বলতে পার?

আজ্ঞে পারি। কা-মি চুরি করেছে। আমি নিজে তার গোয়ালে আমার গরুটা বাঁধা দেখে এসেছি।

তোমার গরু তুমি চিনতে পারবে?

তা পারব না হুজুর? আপনারা যেমন চেনা মানুষ দেখলে চিনতে পারেন আমরা তেমনি চেনা গরু দেখলে চিনতে পারি।

কেরানী মন্তব্য করল, হুজুর, এ লোকটা বড্ড বেশী কথা বলছে। এর কথা বিশ্বাস করা যায় না।

বাস্তবিক ভু-দা যখন প্রথম এসেছিল তখন তাকে যতটা ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল এখন আর তা দেখাচ্ছে না। সে চাষী বলে যে-কথা বলে সে-কথা সম্পর্কে তার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে।

কৈ-মি বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন, আঃ পা-মো, তুমি চুপ কর তো। ভু-দা, বেলা দুটোর সময় তোমার গরু-চোরের বিচার হবে। সময়মত এস। শো, ঢোল পিটিয়ে সকলকে জানিয়ে দাও যে বেলা দুটোর সময় গরু-চোরের বিচার হবে। সকলে যেন দেখতে আসে।

স্বভাবসুলভ উঁচু গলাটা আরও একটু চড়িয়ে দিয়ে তিনি কথাগুলো বললেন। বলবার সময় মুরগির হাড়ের টুকরোগুলো ছিটকে বেরিয়ে এসে দু-চার টুকরো ভু-দার মুখে লাগল। ভু-দা মুখটা হাত দিয়ে মুছে নিয়ে বলল, হুজুর, সাক্ষীটাক্ষী যদি—

আমার কাছে নালিশ করাই যথেষ্ট। সাক্ষী-প্রমাণের দরকার হয় না।

কৈ-মি সবুট পা-জোড়া সবেগে টেবিলের বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে সরিয়ে দিতে গিয়ে অসতর্ক কেরানীটির হাতের উপর বেশ জোরেই আঘাত দিলেন। ইচ্ছে করে নয় অবশ্য। পা-মো ব্যথা পেয়েও মুখটা একটু বিকৃত করল মাত্র, কোনরকম কাতরোক্তি করতে ভরসা পেল না। সাহেব যাতে টের না পান তাই খুব সন্তর্পণে হাতখানা বুটের তলা থেকে বার করে আনল। তারপর আড়ষ্ট হাতখানা টেবিলের তলায় নিয়ে গিয়ে অপর হাত দিয়ে মালিশ করতে লাগল।

বেলা ঠিক দুটোর সময় লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল একখানা জীপ হাঁকিয়ে ক্যাম্পে এসে হাজির হলেন। সমস্ত কাজ তাঁর নির্দেশ অনুসারে করা হয়েছে দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। ইতিমধ্যে গরু-চোরকে ধরে এনে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে দড়ি দিয়ে। তার দু হাতে শিকল পরানো। ভু-দাও এসেছে এবং তাকে বসার জন্য একপাশে একটা টুল দেওয়া হয়েছে। মাঠের চার-পাশে পঞ্চাশ-ষাটজন কৌতূহলী দর্শকও এসে জড়ো হয়েছে। অধিকাংশেরই মাথায় মাথালি, দু-চারজনের মাথায় ছাতা।

কৈ-মির আদেশ পেয়ে একজন সিপাই ক্যাম্পের ভিতর থেকে একখানা ইজিচেয়ার এনে গাছের ছায়ায় পেতে দিল। তিনি এমনভাবে বসলেন যাতে গোটা মাঠটা তাঁর মুখোমুখি পড়ে। একজন সিপাই পিছনে দাঁড়িয়ে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগ[ল।] ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পা-টা রাখতে অসুবি[ধা] হচ্ছিল বলে তিনি একটি সিপাইকে সামনে [বসতে] বললেন। তারপর তার দুই কাঁধের উপর [তাঁর] পা-দুখানি রাখলেন।

কৈ-মি আদেশ দিলেন, লোকটাকে খুঁটি [থেকে] খুলে দাও।

সিপাইরা যখন গরু-চোরের বাঁধনগুলো খুলে [দিতে] ব্যস্ত তখন সে বলল, হুজুর, আমি কী দোষ করেছি [যে] এরা আমাকে এমন করে বেঁধে এনেছে?

সে তুমি নিজের অন্তরেই জানতে পারবে। কা[উকে] বলে দিতে হবে না।

সিপাইরা ওকে মুক্ত করে মাঠের ভিতরে খানি[ক] এগিয়ে নিয়ে গেল। এখন শুধু তার হাত দুখানা শি[কল] দিয়ে বাঁধা।

এবার লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল স্বয়ং উঠে মা[ঠের] ভিতরে এগিয়ে গিয়ে আসামীর কাছাকাছি দাঁড়া[লেন।] তারপর সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগ[লেন,] বন্ধুগণ, আপনাদের সামনে যাকে শিকল-বাঁধা অব[স্থায়] দেখছেন এ লোকটা গরু চুরি করেছিল। আগের [দি]ন হলে কী হত? প্রথমে পুলিসে ওকে ধরে নিয়ে [যেত] এবং জামানে খালাস দিত। এক মাস দু মাস প[রে] মামলা কোর্টে উঠত। তারপর এ-পক্ষের সাক্ষ্য-প্র[মাণ] নেওয়া হত, ও-পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ নেওয়া হত। [তার] যার-যার পক্ষের উকিল নিজের মক্কেলের সমর্থন করে[ন] লম্বা বক্তৃতা দিতেন। ছ মাস কি এক বছর [পরে] আনুষঙ্গিক কাজগুলো মিটে গেলে বিচারক হয়তো ব[ুঝতে] পারতেন যে লোকটা সত্যিই অপরাধী, কিন্তু স[াক্ষ্য-]প্রমাণে অপরাধ ঠিক প্রমাণ হচ্ছে না বলে [কিংবা] অপরাধটা ঠিক আইনের ছকের মধ্যে পড়ছে না [বলে] বিচারক তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হতেন। যে [লোক] ন্যায়বিচার চেয়েছিল, তার খরচ করাই সার, ন্যায়বিচার সে পেত না। পূর্ববর্তী সরকারের অ[ধীনে] সুবিচার ছিল না বলেই সামরিক বাহিনী দেশের শা[সন]ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এ সব কথা আপ[নারা] নিশ্চয়ই জানেন। তবু যে সত্যটা জানা [নেই]

...র পুনরুক্তি না করলে তার জোর বাড়ে না। ...সুবিচার প্রতিষ্ঠা করাই সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য। ...দের কাছে ধনী দরিদ্র ধর্মাধর্ম ছোটবড় নেই। ...পনারা নিজের চোখেই দেখুন আজকের বিচারে যে ...ভিযোগকারী সে আমার কাছে বিধর্মী, আর আসামী ...মার সধর্মী। তবুও আমি ন্যায়বিচার করব। ...ক্ষপাতে বিচার করব। আমি এমনভাবে বিচার করব ...তে সবাই সন্তুষ্ট না হয়ে পারবে না। অভিযোগকারী ...ষ্ট হবে, কারণ এর চেয়ে বেশী কিছু সে প্রত্যাশাই ...রতে পারে না। আসামীও সন্তুষ্ট হবে, কারণ সে ...রোপুরি পাপমুক্ত হবে বলে তাকে আর নরকে যেতে ...বে না। উপস্থিত দর্শকরাও সন্তুষ্ট হবেন, কারণ ...মার এ বিচার অন্যান্য অপরাধীর কাছে উদাহরণস্থল ...য়ে থাকবে। এবার আপনারা চুপ করে দেখুন কী ...ভাবে আমি বিচার করি।

...জগম্ভীর কণ্ঠে কথাগুলো বলে ফৈ-মি থামলেন। ...নতা যেমন নিস্তব্ধ ভাবে তাঁর কথা শুনছিল তেমনি ...নিস্তব্ধ ভাবে পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। কেউ হাততালি দিল না বা কোনরকম হর্ষধ্বনি করে ...উঠল না; কারণ তারা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে যে ফৈ-মি ওসব পছন্দ করেন না।

ফৈ-মির ইঙ্গিতে একজন সিপাই আসামী কা-মির পাজামার দড়িটা কাঁচি দিয়ে কেটে দিল পিছন থেকে। পাজামাটা সরসর করে নেমে যাচ্ছে অনুভব করে হঠচকিত কা-মি হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে ফেলতে ...গিয়ে দেখল যে আর একজন সিপাই তার হাত ধরে রয়েছে, নাড়বার উপায় নেই। কাঁচি-হাতে সেপাইটি এবার কা-মির গায়ের কোর্তাটি কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে ...গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

সম্পূর্ণ উলঙ্গ মানুষটির কালো মসৃণ ...র উপর, সুপুষ্ট মাংসপেশীগুলোর উপর সূর্যের আলো ঝিকমিক করতে লাগল। পঞ্চাশ-ষাট জোড়া বিস্ফারিত চোখ সেই নিটোল দেহটির উপর আছড়ে পড়ল। এমন কি ফৈ-মি পর্যন্ত সেই দেহটির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন, চমৎকার শরীরখানা! তাকিয়ে দেখার মত। শো, ওর হাতের শিকল খুলে দাও।

শিকল খোলা হয়ে গেল দেখে কা-মি ভাবল তার যেটুকু শাস্তি পাওয়ার ছিল তা বোধ হয় সে পেয়ে গেছে। ফৈ-মির দিকে তাকিয়ে বলল, হুজুর, এবার আমি তবে পাজামাটা পরি?

ফৈ-মি কোন জবাব দিলেন না। তার বদলে আর একজন সিপাই পা দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, কা-মি, এইখানটাতে চিত হয়ে শোও।

সিপাইটা আবার নতুন উৎপাত সৃষ্টি করছে দেখে কা-মি একটু অসহিষ্ণু বোধ করল। প্রতিবাদ করার জন্য ফৈ-মির মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু সে মুখের অনমনীয় গাম্ভীর্য দেখে কোন কথা না বলাই সঙ্গত বোধ করল। আরও কিছু দুর্ভোগ কপালে আছে বুঝতে পেরে সে সিপাই কর্তৃক নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বোধ হয় নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সে একটু সরে গিয়েছিল। সিপাইটি তার কোমরে সজোরে একটা বুটের লাথি দিয়ে বলল, ওখানে নয় শুয়ার, এখানে।

একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ করে কা-মি এবার ঠিক জায়গাতে সরে গেল। সে লক্ষ্য করে দেখে নি যে যেখানটায় সে শুয়েছে তার চারপাশে চারটি খুঁটি পোঁতা আছে। কাজেই তার দু হাতে এবং দু পায়ে শিকল পরিয়ে যখন খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল, তখন সে আর হাত পা নাড়তে পারছে না দেখে বিস্মিত হল। তার মাথাটা মাঠের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল এবং কয়েকটা খুঁটি এমন ভাবে পোঁতা হল যে তার আর মাথা ঘুরিয়ে নেওয়ার উপায় রইল না। মনে মনে দারুণ শঙ্কিত হয়ে সে ভাবল, কপালে কিছু ভারী রকমের দুর্ভোগ আছে বলেই বোধ হচ্ছে।

একটি সিপাই তার মুখে রুমাল গুঁজে দিতে এল। সে মুখ খুলতে আপত্তি করছে দেখে গালের উপর রুল দিয়ে এমন গুঁতো দিল যে মুখখানা আপনা থেকেই হাঁ হয়ে গেল এবং সেই পথ দিয়ে প্রকাণ্ড রুমালখানা গুঁজে গুঁজে ঢুকিয়ে দিল।

ভয়ে আতঙ্কে গরমে কা-মি ঘেমে উঠল। তার সারা গা বেয়ে ঘাম গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল, আর তার উপর পড়ে সূর্যের আলো আরও বেশী চিকমিক করতে লাগল। শরীরটাকে একটুও নাড়বার উপায় নেই তার, এমন কি

মাথাটা পর্যন্ত একটু ঘুরোতে পারছে না। মাঠের অপর প্রান্তে একটা ভারী লরি দাঁড়িয়ে আছে, সেই লরিটা ছাড়া সে চোখ দিয়ে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এই ভাবে এই তীব্র রোদের মধ্যে যদি বাকী বেলাটুকু তাকে থাকতে হয় তবেই হয়েছে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফিরে গিয়ে ইজিচেয়ারটার উপর বসলেন। সিপাইরা সবাই ছায়ার দিকে সরে গেল। কিন্তু তার কাছাকাছি যে আর কেউ নেই কা-মি তা জানতেও পারল না।

হঠাৎ মাঠের অপর প্রান্তের লরিখানা চলতে শুরু করল। কা-মির বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল। জনতা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে অপলক দৃষ্টিতে রহস্যময় লরিটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক কা-মির দেহ লক্ষ্য করে লরিটা এগিয়ে চলেছে কেন! আজকের এই নাটকে লরিটারও কোন অংশ আছে নাকি! কী মতলব লরিটার!

কা-মি ভয়ে ভয়ে চোখ বুজল। লরিটা তার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। এখনো যদি লরিটাকে থামিয়ে না দেয় তবে সে চাপা পড়বে। কেউ কি দেখছে না কী ঘটতে চলেছে!

হঠাৎ গভীর উৎকণ্ঠার পরে জনতা একটা আরামসূচক ধ্বনি করে উঠল। যাক, লরিটা মোড় ঘুরেছে। কা-মিকে চাপা দেওয়া তবে ওটার উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু লরিটা একটু বেঁকে গিয়ে আবার সোজা ভাবে অগ্রসর হল এবং কা-মির পায়ের পাতার ঠিক উপর দিয়ে পর পর দুখানা চাকা চলে গেল। পায়ের পাতাজোড়া ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ছিল, কাত হয়ে পড়ে গেল। আর অত টান-টান করে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও কা-মির সমস্ত শরীরটা প্রচণ্ড বিক্ষেপে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠল।

ঝড়ের একটানা শব্দের মত সমবেত জনতার মধ্য থেকে একটি সহানুভূতিসূচক চু চু শব্দের ঐকতানবাদন শোনা গেল। ফৈ-মি বিরক্ত হয়ে তাকালেন জনতার দিকে। তারপর ঠোঁটের উপর তিনি নিজের তর্জনীটি স্থাপন করতেই জনতা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কা-মি একটা বোবা যন্ত্রণা অনুভব করল, কিন্তু ঠিক কী যে ঘটেছে তার শরীরে তা বুঝতে পারল না। চোখ খুলে সামনে লরিটা না দেখতে পেয়ে সে ভাবল, এবার কি তার যন্ত্রণার শেষ হল!

কিন্তু লরিটা আবার ঘুরে গেল তার আগের জায়গায়, আবার অনায়াসে সহজ গতিতে সে এগিয়ে আসতে লাগল কা-মির দেহ লক্ষ্য করে। কা-মির কাছাকাছি এসে আবার লরিটা মোড় ঘুরল। আগেকার পায়ের যে জায়গা দিয়ে চাকা দুটো গিয়েছিল, এবার ঠিক তার এক ইঞ্চি উপর দিয়ে তারা গুঁড়িয়ে গেল গড়-গড় শব্দ করে।

এমনি করে সমস্ত দেহটার উপর দিয়ে লরির চাকা চালিয়ে নিতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগল। অবশ্য শেষ বারে যখন লরির চাকা মাথার খুলিটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল, তার অনেক আগেই কা-মি মারা গেছে। কিন্তু ঠিক কখন যে সে জ্ঞান হারিয়েছিল এবং কখন যে মারা গিয়েছিল তা কেউ জানে না। মৃত্যুর পর সে নরক-বাস থেকে অব্যাহতি পেয়ে স্বর্গে গিয়েছিল কিনা তাও কেউ জানে না।

জনতা কিন্তু আর একবারও সহানুভূতিসূচক শব্দ করে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে নি। যারা দৃশ্যটা সহ্য করতে পারে নি তারা নিঃশব্দে মাঠ ছেড়ে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত দশ-পনেরোজনের বেশী লোক মাঠে ছিল না।

কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফৈ-মি খুশীমুখে কা-মির থেঁতলানো দেহটার কাছে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে এলেন। হাত দিয়ে এক তাল মাংস তুলে নিয়ে জনতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কী রকম চমৎকার কাটা হয়েছে দেখেছেন! এ রকম কাটা মাংসই চপ রাঁধার পক্ষে উপযোগী। শো, নাও তো এই মাংসটুকু। বাবুর্চীকে বল চপ রান্না করতে।

শো ফৈ-মির হাত থেকে মাংসটুকু নিয়ে ক্যাম্পের দিকে চলে গেল। ফৈ-মি আবার ফিরে এসে তাঁর ইজিচেয়ারটার উপর বসলেন। হাতটা রক্তে চটচট করছে দেখে ট্রাউজারে মুছে নিলেন। তাঁর মুখে খুশীর ভাবের সঙ্গে ঈষৎ ক্লান্তি আর বিরক্তির ছাপ। যেন এক আত্মসন্তুষ্ট স্যাডিস্ট ঈশ্বর একটা কাজের মত কাজ করতে পেরে খুশীও হয়েছেন আর পরের কৃতকর্মের জন্য এতখানি ঝামেলা পোয়াতে হল বলে একটু বিরক্তও হয়েছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত তু-দা তার টুলটার উপর একভাবে

দাঁড়িয়েছিল স্থাণুর মত। তার দেহ যেন আড়ষ্ট অবসন্ন হয়ে গেছে, যেন সেঁটে গেছে টুলটার সঙ্গে। ধীরে ধীরে তার যন্ত্রণাকাতর হৃদয় একটা তীব্র আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। আসলে তো তারই দোষ। কেন নালিশ করতে এসেছিল? গরুটা অবশ্য ভালই ছিল; কিন্তু সেটা না থাকলেও কোনরকমে তার দিন কেটে যেত।

ফৈ-মিকে ধপ করে ইজিচেয়ারটার উপর বসে পড়তে দেখে তার সম্বিৎ ফিরে এল। সকলে অন্যমনস্ক আছে। এই ফাঁকে সে সরে পড়তে পারে। কোনরকমে এখান থেকে পালাতে পারলে সে যেন বাঁচে। বেশ খানিকটা আয়াস স্বীকার করে তবে সে তার আড়ষ্ট নির্জীবপ্রায় দেহটাকে টুল থেকে টেনে তুলতে পারল।

কিন্তু সে দু-এক পা বাড়াতে না বাড়াতেই ফৈ-মির নজর তার উপর পড়ল।

কোথায় যাচ্ছ বাবা?—ফৈ-মি মিষ্টিগলায় জিজ্ঞেস করল।

হুজুর, আমি এখন যাই।

তা কি হয়? বিচার দেখলে, বিচারের ফল না পেয়ে কি করে যাবে? বিচার দেখে খুশী হয়েছ তো?

হ্যাঁ হুজুর, খুব খুশী হয়েছি।

নিঃশব্দ হাসিতে ফৈ-মির পুরু ঠোঁট আর পুরু গাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

বিচারের ফলটা পেলে আরও খুশী হতে পারবে।

হুজুর, বিচারের ফল আমি চাই না। আমাকে ছাড়ি যেতে দিন।

এবার ফৈ-মির মুখের আকর্ণবিস্তৃত হাসিটা মিলিয়ে গেল। কাঠিন্যের ছাপ পড়ল মুখে।

আমি কখনও কোন কাজ অসম্পূর্ণ রাখি না ভূ-দা। বিচারের ফল না পেয়ে তোমার যাওয়া হবে না।

ভূ-দা একবার ভাবল, যা থাকে কপালে—সে ছুটে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তাকিয়ে দেখতে পেল ইতিমধ্যে দুজন সিপাই তার দু-দিকে দাঁড়িয়ে গেছে। আশে-পাশে আরও কজন সেপাই ছাড়া আর কোন লোক নেই। মাঠের পাশের রাস্তাটিতে একজনও পথিক নেই। মাঠ থেকে শেষ দর্শকটিও কখন চলে গেছে অলক্ষিতে। সে বুঝতে পারল, ফৈ-মির কথা না শুনে উপায় নেই। অবসন্নভাবে আবার সে বসে পড়ল টুলটার ওপর।

অস্তগামী সূর্যটা যেন পচে-যাওয়া পোকা-লাগা বিবর্ণ পলাশ ফুল। ক্যাম্পের ছায়া লম্বা হয়ে প্রায় সারা মাঠটা জুড়ে ফেলেছে। শুধু খানিকটা ছেঁড়াখোঁড়া মাংসের স্তূপের উপর কালো মাছির মত রোদ যেন এখনও ঝিকমিক করছে। আসলে সেটা রোদ নয়, জমাটবাঁধা কালো রক্তের ওপর বিকেলের ছায়া চিকচিক করছে।

রাত কেন নেমে আসছে না পৃথিবীর বুকে! নিশ্চন্দ্র নির্নক্ষত্র অন্ধকার কেন ঢেকে ফেলছে না কলঙ্কিত পৃথিবীকে!

কিছুক্ষণ পরে একটা সেপাই কালো কালো একটা কি জিনিস প্লেটে করে এনে ভূ-দার হাতে দিল।

ফৈ-মি চলে গিয়েছিলেন জীপ হাঁকিয়ে। ফৈ-মির জায়গায় বসেছিল শো। শো মিষ্টিগলায় বললে, খাও। বিচারের ফল।

কী জিনিস না বুঝতে পেরেও ভূ-দা খানিকটা মুখে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র বিষাক্ত গন্ধে তার সারা গা গুলিয়ে গেল। অপ্রতিরোধ্য বমির বেগ সামলাতে না পেরে সে সেখানে বসেই বমি করে ফেলল।

শো খেঁকিয়ে উঠলেন: বদমাইশ! শুয়োরের বাচ্চা! আদব-কায়দা জান না? ওসব ন্যাকামি করে রেহাই পাবে না আমার কাছে। সবটুকু খেয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়ে তবে ছাড়া পাবে।

না খেয়ে যে উপায় নেই ভূ-দা তা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। বহুকষ্টে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংযত রেখে সে সেই অজ্ঞাতনামা খাদ্যটুকু খেয়ে নিল। তারপর ক্যাম্প থেকে একটু জল চেয়ে নিয়ে এসে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়ে তবে সে পরিত্রাণ পেল।

বাড়ি ফেরার পথেই ভূ-দার বমি শুরু হল। বাড়ি ফিরে এসে সে আর কোন কথা বলতে পারল না। বমিতে বমিতে ঘরের মেঝে ভাসিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত বউ ঘটিবাটি বন্ধক রেখে ডাক্তার ডেকে এনেছিল। তিনিও বমি বন্ধ করতে পারলেন না। তিনদিন ধরে ক্রমাগত বমি করে ভূ-দা মারা গেল।

—

বাংলায় কৌতুক-নাট্যগীতি

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

কৌতুক-নাট্যগীতি [comic opera] ইংরেজি অপেরার একটি শাখা। বাংলায় কৌতুক-নাট্যগীতি ইংরেজিরই দান। ইংরেজি 'কমিক অপেরা' বাংলায় কৌতুক-নাট্যগীতি নামে পরিচিত।

কৌতুক-নাট্যগীতি বাংলায় যে আদৌ অপরিচিত তা নয়। বাংলায় যাত্রাগানের ধারা-ধরন ও কবিগানের সখী-সংবাদ ইংরেজি অপেরার মত। আর কৌতুক-নাট্যগীতির উপাদান-উপকরণ বাংলায় যে যথেষ্ট রয়েছে, এবং বাঙালীর মানস-প্রবণতার মধ্যে যে কৌতুকপ্রিয়তার প্রবল একটা ঝোঁক রয়েছে, সে কথা বাংলা নাট্যাভিনয়ের পথিকৃৎ রাশিয়ান ভাষাতত্ত্ববিদ হেরাসিম লেবেদেফ [Herasim Lebedeff] লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যাকরণবিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকায় লেবেদেফ স্পষ্টই বলে গেছেন :

"...the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed..."[১]

এই বিবৃতি থেকেই বোঝা যায়, কৌতুক-নাট্যগীতি বাংলায় আদৌ অপরিচিত নয়। আর, কৌতুক-নাট্যগীতির ক্ষেত্রও বাংলায় যথেষ্ট প্রশস্ত।

ইংরেজি 'কমিক অপেরা' বা 'বার্লেস্ক' [burlesque] শ্রেণীর নাট্যরচনা, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী 'উপরূপক'শ্রেণীর অন্তর্গত। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে আঠারো প্রকারের উপরূপকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপরূপকশ্রেণীর নাট্যরচনাগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে হাস্যরসাত্মক। দৃষ্টান্তস্বরূপ : নাট্য-রাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, বিলাসিকা, হল্লীশ, ভাণিকা—প্রভৃতি উপরূপকশ্রেণীর উল্লেখ করা যায়।[২]

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার উপরূপকের মধ্যে 'নাট্য-রাসক' ও 'উল্লাপ্য' শ্রেণীর উপরূপকের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য 'কৌতুক-নাট্যগীতি' বা কমিক অপেরার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। নাট্যরাসক ও উল্লাপ্য, এই উভয় প্রকার উপরূপকেরই ধর্ম তথা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য : অঙ্ক— বিষয়—প্রেম ও কৌতুক, কিন্তু পৌরাণিক ; নৃত্যগী যুক্ত। কৌতুক-নাট্যগীতি বা কমিক অপেরার সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্রিটানিকা লিখেছে :

Comic opera, which in its broadest signi ficance may be regarded as including an kind of opera or musical play of a humorou character, in its more restricted and mor commonly received meaning, implies a opera light in character, based on an amusin subject and having spoken dialogue.[৩]

অর্থাৎ, যে কোনপ্রকার কৌতুক-নাট্যগীতি বা অপে হোক না কেন, চপলমতি চরিত্র, কৌতুকপূর্ণ বিষয় ও কথ্যভাষার সংলাপই হচ্ছে এই জাতীয় পালার বৈশিষ্ট্য।

॥ দুই ॥

বাংলায় কৌতুক-নাট্যগীতি জাতীয় রচনার পূর্ণ-দৈর্ঘ নিদর্শন পাচ্ছি প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের মারফত। রাজকৃষ্ণবাবু রচিত অন্ততঃপক্ষে ৩টি কৌতুক-নাট্যগীতির সংবাদ আমরা রাখি। ঐ রচনাগুলির নাম প্রকাশকালের ক্রম অনুসারে : চতুরালী [১৮৯০], চন্দ্রাবলী [১৮৯০] ও হীরে মালিনী [১৮৯১]।

কৌতুক-নাট্যগীতির স্বভাবধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে একা আগে আমরা সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র ও ব্রিটানিকা থেকে উদ্ধৃত করে যা দেখিয়েছি, রাজকৃষ্ণবাবু রচিত আলোচ্য চতুরালি, চন্দ্রাবলী ও হীরে মালিনী কাহিনী তিনটিতে কৌতুক-নাট্যগীতির সেই স্বভাবধর্ম পুরোপুরি বজা আছে, এ কথা আলোচনাক্রমে আমরা দেখব।

কৌতুক-নাট্যগীতির স্বভাবধর্ম অনুসারে বিচার করে দেখা যাবে, রাজকৃষ্ণ রচিত প্রথমোক্ত 'চতুরালী' 'চন্দ্রাবলী' কাহিনী দুটির অঙ্কসংখ্যা যথাক্রমে দুই তিন ; কাহিনী—পৌরাণিক ; বিষয়—প্রেম ও কৌতু নৃত্যগীতাদিযুক্ত। রাজকৃষ্ণ রচিত তৃতীয় ও শেষো

মালিনী' কাহিনীর অঙ্ক সংখ্যা ১; কাহিনী—ঙ্কিক বা ঐতিহাসিক; বিষয়—প্রেম ও কৌতুক, রসনিযুক্ত। অর্থাৎ, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে ক-নাট্যগীতির সংজ্ঞার মাপকাঠিতে রাজকৃষ্ণ রচিত চা কাহিনী তিনটির প্রথম দুটিতে [চতুরালী ও লী] অঙ্ক-সংখ্যা একের অধিক; এবং শেষোক্ত তৃতীয়টিতে [হীরে মালিনী] কাহিনী পৌরাণিক ঐতিহাসিক; এইটুকু ত্রুটি ঘটেছে। কিন্তু প্রথম রচনা কাহিনী পৌরাণিক; তৃতীয়টির অঙ্কসংখ্যা এক; সর্বোপরি কাহিনী তিনটিরই প্রতিপাদ্য প্রেম ও তুক। কৌতুক-নাট্যগীতির সংজ্ঞার মানদণ্ডে কাহিনী টি এখানে ঠিকই পাস-মার্কা পেয়েছে বা পরীক্ষায় ণ হয়েছে। বলা যায়, কোনও একটি উপবিভাগে র্ণ না হলেও কাহিনী তিনটি মোট স্বভাবচরিত্রে আছে।

কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৌতুক-নাট্যগীতি কমিক-অপেরার অঙ্ক-সংখ্যা বা দৃশ্য নিয়ে ইংরেজিতে ত্তের মত এত সূক্ষ্ম বিচার করা হয় নি। অতএব, লায় কৌতুক-নাট্যগীতি বা কমিক অপেরাকে যখন রেজিরই দান বলেছি, তখন একে ইংরেজি মতে র করেও দেখতে হবে। সুতরাং রাজকৃষ্ণ রায় ক্ত কাহিনী তিনটির প্রথম দুটিতে অঙ্ক-সংখ্যাজনিত টি এবং তৃতীয়টিতে কাহিনীর উৎসবিষয়ক ত্রুটি যে ত্মক কিছু নয়, এ কথা স্বীকার করতে কোনও বাধা নি না। বরং, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ও ইংরেজি লশাস্ত্র মতে স্বাকৃত কৌতুক-নাট্যগীতির মূল ধর্ম কৃষ্ণ রচিত কৌতুক-নাট্যগীতির মধ্যে যে পুরোপুরি হ আছে, এ কথা আমরা সানন্দে স্বীকার করব। জকৃষ্ণ রচিত তিনটি কাহিনীই এই সূত্রে আমরা লোচনা করব।

॥ তিন ॥

প্রকাশকালের ক্রম অনুসারে রাজকৃষ্ণ রচিত 'চতুরালী' ৮৯০] কাহিনীটিই জ্যেষ্ঠ। এই কাহিনীর ভূমিকায় জকৃষ্ণবাবু, বাংলায় কৌতুক-নাট্যগীতি রচনায় জকে পথিকৃৎ হিসাবে দাবি করেছেন। এই হিনী রচনার কাল, রাজকৃষ্ণবাবুর বলিষ্ঠ আন্তরিক উক্তি, এবং বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের সর্ববাদিসম্মত স্বীকৃতি প্রভৃতির কথা বিবেচনা করে রাজকৃষ্ণবাবুর এই দাবি যথার্থ বলেই মনে হয়। এই বিষয়ে অর্থাৎ রাজকৃষ্ণবাবুর পাইওনিয়ারিটি নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি। তবে যে আমরা এই বিষয়ের অবতারণা করেছি সে কেবল এই জন্যে যে, বাংলা-সাহিত্য তার বিষয়-বৈচিত্র্যে—ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় ইংরেজি সাহিত্যেরই পাশাপাশি চলছিল, এ বিষয়ের সশ্রদ্ধ একটা উল্লেখ আলোচনার জন্যে। 'উল্লেখযোগ্য' বললাম এই জন্যে কারণ আমরা জানি বাংলা-সাহিত্য নানা ভাবেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে পুষ্ট। আর, রাজকৃষ্ণবাবুর হাতে ইংরেজি কমিক অপেরার অনুসরণে কৌতুক-নাট্যগীতির সার্থক রূপায়ণ বাংলা-সাহিত্যের গৌরব। রাজকৃষ্ণবাবু তাঁর প্রতিভাবলে বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি নতুন যে বস্তু আমদানি করলেন, তা নিয়ে আমাদের গর্ব করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

'চতুরালি' কৌতুক-নাট্যগীতির ভূমিকা বা 'বিজ্ঞাপন' হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায় যে বিবৃতি রেখে গেছেন, বাংলা কৌতুক-নাট্যগীতির ইতিহাসে তা ঐতিহাসিক দলিল বা ডকুমেন্টারি হিসাবে পরিগণিত ও সম্মানিত। এখানে ওই বিবৃতিটি উদ্‌ধৃত করা গেল।

['চতুরালী']

বিজ্ঞাপন: "বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত আদৌ একখানি কৌতুক-নাট্যগীতি [Comic Opera] কেহ রচনা করেন নাই, সুতরাং কোন দেশীয় থিয়েটারে অভিনীতও হয় নাই। কিন্তু অভাবটি পূরণ হওয়া উচিত বিবেচনায় আমি সর্বপ্রথমে এই কমিক অপেরা 'চতুরালী' রচনা করিলাম। ইহা মদীয়া বীণা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। ইহার ধরণ কায়দাকারণ প্রভৃতি সমস্তই সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের; সুতরাং অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছি। ভগবানের কৃপায় চতুরালী অভিনয় দর্শকমাত্রেরই যার-পর-নাই নূতন ধরনের তৃপ্তিকর ও আমোদজনক হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে আশাতীত সুখের বিষয়।"—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

॥ চার ॥

এখানে, যথাক্রমে কাহিনী তিনটির আলোচনা করা যাচ্ছে।

চতুরালী ॥ ক

দুই অঙ্কে মোট ৪ দৃশ্যে বিভক্ত এই কৌতুক-নাট্যগীতি 'চতুরালী'র পরিচয়: নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ॥ পুরুষ: শ্রীকৃষ্ণ। সুদাম। সুবল। মধুমঙ্গল। আয়ান। চঞ্চল। রাখাল বালকগণ ॥ স্ত্রী: রাধিকা। জটিলা। কুটিলা ॥

কাহিনী-সংক্ষেপ ॥ [প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য: বৃন্দাবন, আয়ানের গৃহ] ॥ জটিলা কুটিলার প্রবেশ, জটিলা ও কুটিলা কর্তৃক রাধিকার অবৈধ কৃষ্ণপ্রীতির ভর্ৎসনা। ইতিমধ্যে রাধিকাকে টেনে নিয়ে এলো কুটিলা, এবং জটিলা নিয়ে এলো দড়ি রাধিকাকে বাঁধবার জন্যে। উভয়ে রাধিকাকে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধলো। এদিকে, লাঙ্গল কাঁধে আয়ানের প্রত্যাবর্তন। রাধিকার বন্ধনদশা দেখে আয়ান দুঃখিত হল এবং বন্ধন মোচন করে দিল। তাতে জটিলা কুটিলা আয়ানকে তীব্র ভৎর্সনা করল। রাধিকার বিরুদ্ধে আয়ানের কাছে জটিলা কুটিলার অভিযোগ—(গীত):

কদমতলায় বাঁশী বাজে
ঘরের কোণে রাধা সাজে,
সাজের কিবে ছটা—
ভরা ঘড়ায় জল ফেলে দে,
খালি ঘড়া বাঁ কাঁকে নে,
কদমতলায় ছোটা, সাবাস বুকের পাটা।
চুলের ঝোঁটন এলিয়ে পড়ে,
কাঁটাবনে আঁচল ছেঁড়ে
ছোটে যেন ভাঁটা—এমনি প্রেমের আটা।
কালার বাঁশী কি গুণ জানে,
তোর বৌকে হেঁচকে টানে,
দেখ যে লোকে খোঁটা,—
ওরে ও আবাগের বেটা ॥

সরল হৃদয় আয়ান ঘোষ রাধিকাকে সান্ত্বনা দিলেন, তবে নিষেধ করলেন যেন কৃষ্ণের কাছে না যায়, কেন না তাতে মা-বোন দুঃখ পায়, লোকে পাঁচ কথা কয়, লোকনিন্দা বাড়ে। রাধিকা ঘরেই নজরবন্দী রইলেন। রাধিকার যমুনার ঘাট থেকে জল আনা বন্ধ হল, তার পড়লো জটিলা কুটিলার ওপর।

প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ রাধিকা আর যমুনা ঘাটে জল নিতে আসে না। প্রেমিক কৃষ্ণ বিরহগীত গেয়ে মনের দুঃখ প্রকাশ করে বেড়ায়। মধুমঙ্গল, সুবল প্রভৃতি সখা রাখাল বালকগণ কৃষ্ণকে জানায় রাধিকার বন্দীদশার কথা। কৃষ্ণ বললে: 'ভুল ভুল তোমাদের সকল কথাই ভুল। আমি চতুর-চূড়ামণি, আমার চতুরালীর কাছে কে পার পেতে পারে?' কৃষ্ণ ভাবলো—[গীত]:

কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী
রাইকিশোরী বিনোদিনী
আমার তরে সইছে পীড়ন ঘোর।
হায় হায় রে! হায় হায় রে!
অকলঙ্কী করবো তারে,
নতুন চতুরালী কোরে,
শাস ননন্দী দেখবে ফিকির মোর ॥

কৃষ্ণ তার সখাদের বলল: জটিলা কুটিলাকে নাকে কানে খত দিইয়ে তবে ছাড়বো, কিন্তু তোমাদের সাহায্য চাই। তোমরাই আমার চতুরালীর চক্র।

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ॥ বৃন্দাবন-যমুনাতট। হাতে জটিলা ও দুই কাঁখে জলপূর্ণ দুই কলসী নিয়ে কুটিলা দণ্ডায়মান। বিব্রত কুটিলার উদ্দেশে কৃষ্ণ-সখা সুদাম ও মধুমঙ্গলের বিদ্রূপ-কটাক্ষ; এবং কুটিলা কর্তৃক সরোষ-ব্যঙ্গগীত:

ওরে ড্যাগরা ছোঁড়া,
হতচ্ছাড়া, মুখ-পোড়া।
কুকুর, ভেড়া শেয়াল মেড়া!
খোঁড়া ঘোড়া, ঘাটের মড়া!
কুয়ের গোড়া, গুয়ের ঝোড়া,
শিখনিঝাড়া, ঢুঁসো টোঁড়া,
বাঁকা টেড়া ন্যাকড়া ছেঁড়া,
মারবো নোড়া দাঁড়া দাঁড়া ॥

জবাবে সুদাম ও মধুমঙ্গলের সরোষ-ব্যঙ্গগীত:

মাইরি নাকি প্যাঁচামুখী,
পান্তাখাকী ভাঙা ঢেঁকী।
বেরাল-চোখী, থ্যাদা-নাকি,
ঘুঘু পাখী, কলসী-কাঁকী,

ধুমড়া খুকী, চ্যাপ্‌টা বুকী,
মারবি মোড়া, মারজো কেবি ॥

দোম, সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি কৃষ্ণ-সখারা কৃষ্ণর
র জটিলা কুটিলার কাছে রটিয়ে দিল যে : রাধা
র গেছে কালার কাছে।—জটিলা কুটিলার ধারণা,
দের ঘরেই আছে। তবু এই কথা শুনে তারা
ত ছুটলো, এ রটনা সত্যি কি মিথ্যে।

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ বৃন্দাবন—গ্রাম্যপথ।
নের প্রবেশ। দধিভারস্কন্ধে চঞ্চনগোপ এসে সংবাদ
কৃষ্ণর সঙ্গে রাধিকার গোপন সাক্ষাৎকারের
দ। তখন আয়ান বিবিধ ভঙ্গিতে কখনও তাল
কখনও লম্ফঝম্প দিয়ে, কখনও বা চঞ্চনকে চড়-
ড় দিয়ে গান ধরে চললো—এ হেন অপ্রত্যাশিত
দের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে। [আয়ানের গীত]:

এখনি যাব, কোসে ঠাঙাব,
মজা দেখাব, ভাই।
কদম-তলে, লোচন-জলে,
ভাসবে ভুতুড়ী রাই ॥
হাস্তেরি কানু, হাস্তেরি বেণু,
দুস্তেরি প্রেমিক ছাই।
চঞ্চন দাদা, হাস্তেরি রাধা,
দুস্তেরি পিরিতিয়া রাই ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য ॥ বৃন্দাবন—লতাকুঞ্জ।
পবেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণ ও অবগুণ্ঠনবতী রাধিকা
পায়মান। কৃষ্ণ রাধিকাকে নিয়ে সোহাগ-গীত গাইছে,
—অদূরে অন্তরালে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ। রাধাকে
লার পাশে অবাঞ্ছিতভাবে দেখে জটিলা ও কুটিলা
দের ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রকাশ ও গালিগালাজ করছে রাধা
ও কৃষ্ণের প্রতি। এমন সময় সেখানে চঞ্চনগোপের
সে আয়ানের প্রবেশ। আয়ান কৃষ্ণের পাশে তার
রাধিকাকে দেখে সক্রোধে ছুটে গিয়ে রাধাকে
ধলো তাকে মারবার জন্যে। রাধিকার অঙ্গাবৃত বসন
খুলে ফেলতেই আয়ান সপ্রতিভ হয়ে দেখলে এ তো
তার রাধা নয়—এ তো কৃষ্ণসখা সুবল। আয়ান তখন
সংবাদদাতা চঞ্চনগোপকে তিরস্কার করলো, মা জটিলা ও
ভগ্নি কুটিলাকে ভর্ৎসনা করলো রাধিকার প্রতি অযথা
সন্দেহ পোষণ করবার জন্যে। রাধা সতী প্রমাণিত হল।
কৃষ্ণের চতুরালী সার্থক হল। আয়ান বলল কৃষ্ণকে

সান্ত্বনা দিয়ে: ... কোন দোষ নেই, তুমি কিছু ...

তারপর অঙ্গ সকলকে উদ্দেশ করে, কৃষ্ণর পিঠে
গেয়ে বলল আয়ান: 'শোনো সকলে! আমি যেমন
ছেলেবেলায় ছেলেদের সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে কোন কোন
ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে বউ বউ খেলতুম, কানায়ে
ভাগেও আমার সেইরূপ ছেলেটিকে মেয়ে সাজিয়ে বউ
বউ খেলে: কারণ, 'নরাণাং মাতুলক্রম'।'

এদিকে সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি কৃষ্ণ-সখাবৃন্দ
জটিলা-কুটিলাকে নাকে খত দিয়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য
করলো। কৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ হল। সুদাম, সুবল
প্রভৃতি রাখাল-বালকগণ গান ধরলো:

ওরে ও ভাই বনমালী,
খেললি ভাল চতুরালী,
রাই কিশোরীর মান বাঁচালি,
প্রাণ বাঁচালি চতুর চালে।
রাই সাজালি সুবলচাঁদে,
শাস ননদী পড়লো ফাঁদে
রেয়ের প্রণয় অটুট বাঁধে,
বাঁধলি ভাল ফিকির খেলে ॥
তোর চাতুরী বুঝতে নারি,
ব্রজপুরীর নরনারী,
তোর কাছে ভাই মানে হারি,
কৌশলে তোর আপন ভোলে,
সাবাস রে তোর চতুরালী:
চতুর-চূড়ামণি কোলে ॥

এখানেই কৌতুক-নাট্যগীতি 'চতুরালী' পালা সাঙ্গ
হয়েছে।

'চতুরালী' কৌতুক-নাট্যগীতির ভাষার নমুনা—

জটিলা ॥ [সরোষে] ওমা! কি লজ্জা, বউড়ী হয়ে
এমন ধাউড়ী, আমা হেন শাউড়ীকে ফাঁকি!

কুটিলা ॥ মা! মা! শুধু তোমাকে ফাঁকি নয়,
আমাকেও ফাঁকি। আমি হেন ননদী, নদী শুকিয়ে দি
হাঁকুনির চোটে,—আমার ডাকুনি যেন নোকের কানে
কাঁটা ফোটে, আমার হাতনাড়া দেখে আঁতকে উঠে
সবাই ছোটে, আমার চোক রাঙানিতে ছুঁড়ী বুড়ী
চোম্‌কে উঠে, পায়রা নোটে, এমন যে আমি কুটিলে,
আমাকেও ফাঁকি, তা ছাড়া দাদাকেও ফাঁকি।

* * *

কুটিলা ॥ [জটিলার প্রতি] মা, সাধে কি বলছিলুম, বউ ছুঁড়ী দাদাকে গুণ করেছে।

আয়ান ॥ আরে গুন্ গুন্ করিস কি? আমি ভোমরা না কি?

জটিলা ॥ আরে হাড়হাবাতে, তুই ভোমরা হোলে তো বাঁচতুম, তুই গোবরেপোকা, তা নৈলে তোর পদ্মফুলের মধু সেই কেলে ভোমরায় খায়?

আয়ান ॥ ভোমরা ভরিও না, আমার পদ্মফুল এখনও কুঁড়ি।

• • •

আয়ান ॥ [রাধিকাকে ধরিয়া ফেলিয়া] তবে রে কোঁচকে ছুঁড়ীর মোচকে কুঁড়ী। পিরীত গুঁড়ী। তুটকো ছুঁড়ী! মুড়ীপুড়ী! ছেঁড়া ঘুড়ী! গালার চুড়ী! ভাঙ্গা ঝুড়ী! পোড়া মুড়ী! ভাঙ্গা হাঁড়ী! ফুচকে ধাড়ী! আজ তোরব তোকে কোড়ে যাঁড়ী।

• • •

আয়ান ॥ [জটিলা ও কুটিলার প্রতি] খবরদার আর কখন আমার পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী রাধার ঘাড়ে এমন করে মিছিমিছি দোষ চাপিও না! রাধার আমার কিসের অভাব, মরায়ে ধান আছে, ডাবরে পান আছে, পাঁদাড়ে ঘুঁটে আছে, ভাঁড়ারে মিঠে আছে, পেঁটরায় বসন আছে, কাঠরায় বাসন আছে, গাছে ফল আছে, জালায় জল আছে, বাড়িতে হাত আছে—গা-ভরা গয়না আছে; তা ছাড়া আমি, তার সবধন স্বামী। শোন বল,—নিশ্চয়, সুনিশ্চয়, অতিনিশ্চয়, রাধা আমার নয় কুপথগামী। তাতে আবার সে এই কাপর মামী॥

• • •

ব্রিটানিকার মতে কৌতুক-নাট্যগীতির প্রাণই হচ্ছে কথ্য ভাষার সংলাপ। উল্লিখিত ভাষার নমুনায় দেখা গেল, রাজকৃষ্ণবাবু এই সংলাপের ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। এই একান্ত গ্রাম্য ভাষার সঙ্গে রাজকৃষ্ণবাবুর স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রাস কাহিনীর সংলাপকে যেন জীবন্ত করে তুলেছে।

ব্রিটানিকার মতে কৌতুক-নাট্যগীতির অপর গুণ চপলমতি চরিত্র। সেদিক থেকে বিচার করলেও নাট্যকারের নির্বাচন শক্তির প্রশংসায় পাঠক পঞ্চমুখ হবেন। আলোচ্য নাটকের চরিত্র: কেলে ছোঁড়া, তার সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি, কিংবা রাধিকা, জটিলা, কুটিলা, আয়ান, চন্দন প্রভৃতির চপলমতিত্বে কারও সন্দেহ পোষণ করবার অবকাশ রাখেননি নাট্যকার রাজকৃষ্ণবাবু।

আর, বিষয়বস্তু যে কত কৌতুকপূর্ণ, পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

এই ভাবে দেখা গেল, ব্রিটানিকার মতে বিশ্বসাহিত্য বিচারের মানদণ্ডেও রাজকৃষ্ণ রায়ের কৌতুক-নাট্যগীতি 'চতুরালী' তার স্বভাবধর্ম পুরোপুরি বজায় রেখেছে। সর্বোপরি, রাজকৃষ্ণবাবু বাংলা-সাহিত্য-সংসারে আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য এই জন্যে যে, তিনিই প্রথম কৌতুক-নাট্যগীতি সফলতার সঙ্গে রচনা করলেন।

রাজকৃষ্ণবাবুর বীণা থিয়েটারে এই কৌতুক-নাট্যগীতি 'চতুরালী' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়, এবং দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসাও পায়।

চন্দ্রাবলী ॥ খ

রাজকৃষ্ণ রচিত অপর একখানি কৌতুক-নাট্যগীতি 'চন্দ্রাবলী' বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাবলীর ব্রজরঙ্গ। প্রকাশকাল—১৮৯০ [২৬ জুলাই], পৃষ্ঠাঙ্ক ২৬। তিন অঙ্কে মোট সাত দৃশ্যে সমাপ্ত এই কৌতুক-নাট্যগীতি 'চন্দ্রাবলী'র পরিচয়: নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ॥ পুরুষ—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম। সুদাম। সুবল। মধুমঙ্গল। আয়ান। গোবর্ধন। চন্দন॥ স্ত্রী—রাধা। চন্দ্রাবলী। শৈব্যা। তারা। সুবেলা। পদ্মা॥

কাহিনী-সংক্ষেপ ॥ প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য: বৃন্দাবন—যমুনাতট। বিরহযন্ত্রণাকাতর শ্রীকৃষ্ণ গান গেয়ে মনের অস্থির ভাব প্রকাশ করছে। চন্দ্রাবলীর বিরহে কাতর কৃষ্ণ যমুনার জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত, এমন সময়ে সহসা বালকবেশে চন্দ্রাবলীর আবির্ভাব। কৃষ্ণের মনোভাব বুঝবার জন্যেই চন্দ্রাবলীর ছদ্মবেশে আগমন। চন্দ্রাবলী পরামর্শ দিল: 'আচ্ছা ভাই কালা, চন্দ্রাবলীর তরে যদি এত জ্বালা, তবে আজ রাত্রে তার কুঞ্জে চুপ্-চুপ্ যাও না কেন? সুখের মিলন হবে, সখের ঝুলন হবে।'—কৃষ্ণ সভয়ে বলল: 'চন্দ্রাবলীর শাশুড়ী ভারুণ্ডা যেন উগ্রচণ্ডা, স্বামী গোবর্ধন যেন তীর্থের পাণ্ডা, একে ষণ্ডা, তায় হাতে ডাণ্ডা! আয়ানকে আছে পার, গোবরার কাছে

ভার।'—চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে কৃষ্ণ আর রাধার কুঞ্জে যাবে না। চন্দ্রাবলী বললে, নৌকোর পা দিলে চন্দ্রাবলীকে পাওয়া যাবে না। পর বালকবেশী চন্দ্রাবলী ছদ্মবেশ ত্যাগ করে কৃষ্ণের গানল শান্ত করলো। চন্দ্রাবলী পরামর্শ দিল, আজ চন্দ্রাবলী যমুনাতীরে এইখানে এসে কৃষ্ণকে নারী হয়ে তার কুঞ্জে নিয়ে যাবে সখি পরিচয় দিয়ে। ও শাশুড়ী তার কিছুই বুঝতে পারবে না।

ইতোমধ্যে জটিলা ও কুটিলার প্ররোচনায় এবং বেশী চঞ্চলের কাছে সংবাদ পেয়ে আয়ান এলো ার খোঁজে, কিন্তু যমুনাতটে নির্দিষ্ট স্থানে তখন -চন্দ্রাবলীর প্রেমালাপ চলছে। কৃষ্ণের সঙ্গে লাপরত চন্দ্রাবলীকে রাধা মনে করে চঞ্চলকে সঙ্গে য়ে আয়ান তাকে মারতে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলো এ তো রাধা নয়, রাধার বোন, তারই ভায়রাভাই েরার স্ত্রী—তারই ফোচকে শালী 'চাঁদবালী' ওরফে বলী। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই 'ফলপূর্ণ ডালী কে' ফলবিক্রেতা বালকবেশে রাধার ঘটনাস্থলে েশ। ছদ্মবেশ ত্যাগ করে চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের কাছে া নিজের পরিচয় দিল। রাধা ও চন্দ্রাবলীতে দ্বন্দ্ব লো। রাধার প্রতিজ্ঞা—চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণকে দিয়ে র পায়ে ধরিয়ে ছাড়বে। এমন সময়ে শ্রীদাম, সুদাম, বল ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি রাখালবালকগণের প্রবেশ এবং কলে মিলে তখন বিবিধ ভঙ্গিসহকারে নৃত্যগীত করতে াগল।

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য॥ বৃন্দাবন পথে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল বিবিধ ভঙ্গিসহকারে নৃত্যগীতরত। টনাস্থলে চঞ্চলের প্রবেশ। চঞ্চলকে জব্দ করবার জন্যে সকলে কপাটি খেলতে লাগলো। ছেলেদের খেলায় চঞ্চলও ভিড়ে পড়লো। তখন সবাই চঞ্চলকে মারধোর করে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিল—কেন না, সে রাধা ও চন্দ্রাবলীর গোপন প্রেমের কথা তাদের শাশুড়ী ননদীকে বলে দিয়ে কৃষ্ণকে হয়রান করে। চঞ্চল এই অপমানের পালটা শোধ নেবে, এই ভয় দেখিয়ে আপাততঃ অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য॥ বৃন্দাবনে কদম্বকাননে চন্দ্রাবলী ও নারীবেশে শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলো, চন্দ্রাবলী কেন এমন ভাবে স্বামী সংসার পরিজন ত্যাগ করে এলো। চন্দ্রাবলী বললে: 'স্বামী আদি গুরুজন, বন্ধন, সংসারবন্ধন না ছাড়লে তোমায় তো কেউ পায় না। যার চোখের সামনে সংসারের আয়না, সে ফাঁকিই দেখে, তোমায় দেখতে পায় না। তাই সব ভুলে এসেছি।'—ইতোমধ্যে কৃষ্ণহারা রাখালবালকগণের প্রবেশ। চন্দ্রাবলীকে আড়ালে রেখে কৃষ্ণ নিজে স্ত্রীবেশে রাখালবালকগণকে চমক লাগিয়ে দিল, তাদের নিয়ে কিছুক্ষণ তামাশা করল।

দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য॥ বৃন্দাবন, চঞ্চলগোপের চালাঘর। চঞ্চলগোপ সিদ্ধি-ঘোঁটনে বিব্রত। রাখাল বালকগণের হাতে অপদস্থ চঞ্চল অপমানের জ্বালা ভুলতে পারে নি। আর, আয়ান তার ভায়রাভাই চন্দ্রাবলীর স্বামী গোবরার কাছে রাধার সম্বন্ধে কটাক্ষ শুনে মনে মনে অসহায়ভাবে অপমানিত। তাই, চঞ্চল আর আয়ান ভাবছে কি ভাবে অপমানের জ্বালা জুড়ানো যায়। সিদ্ধির লোভে এসে জুটলো চন্দ্রাবলীর স্বামী গোবর্ধন। আয়ান ও চঞ্চল তাকে বলল, রাধা নয়, চন্দ্রাবলীই গোপনে যায় কালাচাঁদের কাছে। শুনে গোবর্ধন ধরাশায়ী,—এমন সময়ে এলো গোবর্ধনের মা ভারুণ্ডা, অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর শাশুড়ীঠাকরুণ। গোবর্ধনকে ভূতলে শয়ান দেখে এবং চঞ্চল ও আয়ানের বাক্যবাণে আহত ভারুণ্ডাও মূর্ছা গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনেরই জ্ঞান ফিরে এলো। তখন সবাই মিলে চললো রাধা সতী কি চন্দ্রাবলী সতী—কে যায় গোপনে কেলে ছোঁড়ার কাছে, তাই দেখতে।

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য॥ বৃন্দাবন, উদ্যান পার্শ্ববর্তী পথ। কলসী-কক্ষে চন্দ্রাবলী ও নারীবেশে কলসী-কক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। এমন সময়ে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল এসে সংবাদ দিল চন্দ্রাবলীর স্বামী গোবর্ধন, তার মা ও আয়ান চঞ্চল প্রভৃতি দলবল নিয়ে এসে পড়লো বলে। কৃষ্ণ ফন্দি বার করলো, সে চন্দ্রাবলীর 'দেশ-কালি বোবা মেয়ে' সেজে থাকবে। আর, শাশুড়ী-স্বামী এলে চন্দ্রাবলী অভিযোগ জানাবে এই বলে যে, রাখাল ছোঁড়া-গুলোই তাকে কালার কাছে যেতে প্ররোচনা দিচ্ছে, এর

একটা প্রতিকার হওয়া চাই।—গোবর্ধন তার দলবল নিয়ে বৃন্দাবন কুঞ্জে এসে পড়লো, চন্দ্রাবলীও যথারীতি কৃষ্ণের শেখানো অভিনয় করলো। দুই দলে বচসা লেগে গেল। বাক্যবাণে নিপুণা ভারুণ্ডা ও রাখাল ছোঁড়াদের বাক্‌যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে মূল অভিযোগ টিকলো না, দ্বন্দ্ব লেগে গেল আয়ান ও গোবর্ধনের মধ্যে। রাখাল ছোঁড়ারা পালালো কিন্তু চন্দ্রাবলীর সখীরূপে 'দেখনহাসি' নামধারী কৃষ্ণ বসে আছে বোবা মেয়ে সেজে। শাশুড়ী ও স্বামীকে বোঝালো চন্দ্রাবলী যে ওই মেয়েটি বোবা, আর ওই তাকে রক্ষা করেছে এ যাত্রা। চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণপ্রীতির প্রমাণ না পেয়ে স্বামী ও শাশুড়ী সন্তুষ্টচিত্তে বধূকে অনুমতি দিল তাকে নিয়ে তার ঘরে যেতে। কৃষ্ণের ছলনা সফল হল, কেন না 'ছলনাপূর্ণ সংসারকে ছলনা না কোরলে' অভিলাষ পূর্ণ হয় না।

তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য॥ বৃন্দাবন, অরণ্য। চঞ্চল-গোপের প্রবেশ এবং শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি রাখাল বালকগণের সহিত সাক্ষাৎ। চঞ্চলকে জব্দ করবার জন্যে তাকে চাদরে জড়িয়ে হাত পা বেঁধে পথের উপর ফেলে রাখলো। এমন সময় এলো গোবর্ধন ও তার মা ভারুণ্ডা। রাখাল বালক শ্রীদাম সুদাম বলল, চন্দ্রাবলীর জাত-কুল নিয়েছে কেষ্ট, এখন ভান করে পড়ে আছে রাস্তায়, এই সুযোগে তাকে মেরে শেষ করো। তখন গোবর্ধন ও তার মা যথাক্রমে প্রহার ও বাক্যবাণে চঞ্চলকে জর্জরিত করলো। অবশেষে তারা জানতে পারল কৃষ্ণ ভেবে তারা এতক্ষণ চঞ্চলকে প্রহার করেছে। চঞ্চল মনে প্রাণে বুঝলো, কেষ্টকে যে ঠকাতে যাবে, সে নিজেই ঠকবে।

তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য॥ বৃন্দাবন, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ। কুঞ্জের পুষ্পবেদীর উপরে শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী দণ্ডায়মান। দুই পাশে চন্দ্রাবলীর সখি শৈব্যা, তারা, সুবেলা, পদ্মা প্রভৃতি গোপীগণ দণ্ডায়মান। কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলীর মিলন হল। কৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ হল। চন্দ্রাবলীর অপবাদ দূর হল, তার স্বামী শাশুড়ী জব্দ হল।

• • •

বলা প্রয়োজন, এই 'চন্দ্রাবলী' কৌতুক-নাট্যগীতি রাজকৃষ্ণ রচিত পূর্বোক্ত 'চতুরালী' পালারই সমগোত্রীয়। 'চতুরালী' চতুর-চূড়ামণি কৃষ্ণের রাধা-লাভের কাহিনী,—'চন্দ্রাবলী'তেও কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলীর মিলন কাহিনী। চতুরালীতে যেমন চন্দ্রাবলীতেও তেমন, চাতুরীর আশ্রয়ে সাফল্য লাভই মূলকথা। চতুরালী কাহিনীতে রাধাকে এবং চন্দ্রাবলীর কাহিনীর চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণ চাতুরীর দ্বারা লাভ করলেন, সমাজে তাদের কলঙ্ক দূর করলেন। দুই কাহিনী এক জাতীয়,—তাই কাহিনী-অংশে ও সংলাপের ধরনে কিছু এক[illegible]মি আছে।

ভাষার নমুনা:

[চন্দ্রাবলীর বিরহে অস্থির কৃষ্ণের উক্তি। ১ম দৃশ্য]

"পলে পলে, বিরহানলে, মোলেম জ্বোলে! রূপের বলি চন্দ্রাবলী! আমি কৃষ্ণ কালো অলি! মিলন বিনে আর বাঁচিনে, আর পারিনে থাকতে! হায়, আর কি পাব দেখতে! গাছের আড়ালে, ঘোমটা খুলে, বদন তুলে, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতো দেখা যায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে, পালিয়ে গেল, আমায় করে হত। দেখার চেয়ে না দেখা ভালো। চোখ থাকার চেয়ে কানা হওয়া ভালো। আমি একে কালো, হলেম আরও কালো, পোড়া বিরহের তাপে। গা কাঁপে, পা কাঁপে, তাপের জ্বালার দাপে। রূপসীর রূপ আর কিছুই নয়, চিতের আগুন। জ্বালতে হয় না, আপনি জ্বলে; নেভে না সাত সিন্ধুর জলে। হলুম খুন—হলুম খুন। তপ্ত ভূঁয়ে পড়ি শুয়ে, যদি বিষে বিষক্ষয় হয়। [ভূতলে শয়ন করিয়া ক্ষণকাল পরে] বাপ! দ্বিগুণ তাপ। কার সাধ্যি সয়! যাই তাড়াতাড়ি, ঝাঁপিয়ে পড়ি যমুনার জলে, যা থাকে কপালে।"

'চন্দ্রাবলী' কাহিনীতেও পূর্বোক্ত 'চতুরালী'র মত রাজকৃষ্ণবাবুর রচনার ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'চন্দ্রাবলী' রাজকৃষ্ণবাবুর বীণা থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং দর্শকদের বিচারে সাফল্য লাভ করে।

হীরে মালিনী ॥ গ

রাজকৃষ্ণ রায়ের তৃতীয় কৌতুক-নাট্যগীতি 'হীরে মালিনী'র নামচরিত্রটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অতিপরিচিত। প্রকাশকাল: বাংলা ১২৯৭ [ইংরেজি ১৮৯১ জানুয়ারি]; পৃষ্ঠাঙ্ক ২৯। ভারতচন্দ্রের মত রাজকৃষ্ণও হীরা মালিনীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে

চ সযত্ন প্রয়াস পেয়েছেন। হীরা কি কৌশলে কে বশ করলো কিংবা সুন্দর কিভাবে 'বিদ্যা' লাভের য় রাজবাড়ির মালিনী হীরার সঙ্গে মাসি সম্পর্ক য়ে তারই ঘরে আশ্রয় পেল—তথা বর্ধমান রাজকন্যা প বিদ্যাবতী গুণবতী ও সুন্দরী 'বিদ্যা'লাভের পথে পদক্ষেপ করলো, সেই অতি প্রাথমিক অথচ হার্য অংশটুকুই রাজকৃষ্ণবাবু 'হীরে মালিনী' ক এই কৌতুক-নাট্যগীতিকাটিতে বিবৃত করেছেন।

সুন্দরের সঙ্গে হীরা মালিনীর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ান রাজবাড়ির উদ্যানমধ্যস্থ সরোবরতটে বকুল-তলে। হীরা মালিনী তখন রাজবাড়ির জন্তে চয়নে ব্যাপৃত। বকুলবৃক্ষতলে সুন্দর উপবিষ্ট। হীরা লিনী আপনমনে গান ধরেছে :

চোক্ থাকতে যে জন কাণা,
সে জন আমায় কুরূপ বলে।
আমার মতন রূপ অপরূপ,
নাইকো কারো ভূমণ্ডলে ॥
ফুলবাগানের ফুলকুমারী,
হীরেমণির রূপ-ভিখারী,
আমার রূপের ছটা পেলে,
তবেই ফুলের রূপটি খোলে,—
বর্ধমানের শোভার ঘটা
গাছ-ফুলে নয়, হীরে-ফুলে ॥

ায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী,—'যার কথায় ীরার ধার হীরা তার নাম'—সেই হীরার সঙ্গে রাজকৃষ্ণ রায়ের হীরার তফাত অনেক। তবু হীরা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দুজনেরই রচনায় সুন্দর ফুটেছে। রাজকৃষ্ণ-বাবুর হীরা চরিত্রে ভারতচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। রাজকৃষ্ণ রায়ের ছড়া-পদ্যের অনুপ্রাসভরা রচনারীতির বৈশিষ্ট্যেও তাঁর হীরা মালিনী তার চরিত্রানুগ রূপ পেয়েছে, এ কথা স্বীকার করা যায়। কাহিনীর ভাষার চাল কাহিনীর উপযুক্তই হয়েছে।

মাত্র এক অঙ্ক ও পাঁচটি দৃশ্যে সমাপ্ত এই 'হীরে মালিনী' কৌতুক-নাট্যগীতির পরিচয় :

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ॥ পুরুষ : সুন্দর, কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধুর পুত্র। ফুকন সিং ও ভুখন সিং, কোটাল। বোম-পাগল, জনৈক পাগল ॥ স্ত্রী : হীরে মালিনী, যুবতীগণ ও নারীগণ ॥

কাহিনী-সংক্ষেপ ॥ প্রথম দৃশ্য : বর্ধমান—নগর-তোরণ। কোটাল ফুকন সিং ও ভুখন সিং বচসামত্ত। রাজবেশে সুন্দরের প্রবেশ। সুন্দরের কাছ থেকে তলোয়ার বখশিশ নিয়ে ফুকন ও ভুখন দুই কোটাল সুন্দরকে নগরে প্রবেশ করতে অনুমতি দিল। এমন সময় হীরা মালিনীর সঙ্গে কোটালদ্বয়ের সাক্ষাৎ ও ব্যঙ্গব্যঙ্গপূর্ণ আলাপ হয়। হীরা এই দুই কোটালের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে প্রধান নগর কোটালের কাছে গেল অভিযোগ জানাতে।

দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ বর্ধমান—উদ্যানপার্শ্বস্থ পথ। গান গাইতে গাইতে সুন্দরের প্রবেশ। নগর দেখে সুন্দর আকৃষ্ট, নগরীর কুলবালা ও যুবতীদের রূপদর্শনে মুগ্ধ। যুবতীরাও সুন্দরের রূপে মোহিত। বিশ্রামলাভের আশায় সুন্দর রাজবাড়ির বাগানের সরোবরতীরস্থ বকুলতলায় বসল।

তৃতীয় দৃশ্য ॥ বর্ধমান—রাজোদ্যানমধ্যস্থ সরোবরতটে বকুলগাছ। বৃক্ষতলে সুন্দর উপবিষ্ট। ফুলডালীকক্ষে গান গাইতে গাইতে হীরা মালিনীর প্রবেশ। নিজের রূপ গুণ প্রকাশ করে গানের শেষে হীরা নাগরের প্রণয় লাভের আশায় ক্ষোভ প্রকাশ করছে। হীরার ইচ্ছা সুন্দরের সঙ্গে নাগর সম্পর্ক পাতায়। কিন্তু সুন্দরের রূপে মুগ্ধ নগরের যুবতীদের সামনেই সুন্দর হীরাকে মাসি বলে ডাকলো, বাধ্য হয়েই কামবাসনা বা কামবৃত্তি সংযত করতে হল, কিন্তু মনাগুণে পুড়তে লাগলো হীরা। লজ্জায় দিশাহারা হয়ে সুন্দর মাসির কাছ থেকে অন্যত্র চললো আশ্রয়ের আশায়। কামাতুরা হীরা মালিনী চললো তার খোঁজে ॥

চতুর্থ দৃশ্য ॥ বর্ধমান—উদ্যানপার্শ্বস্থ পথ। বোম পাগলার প্রবেশ। পাগলের পাল্লায় পড়ে সুন্দর তার পাগড়ি খুলে দিয়ে সেখান থেকে পালালো। পাগলের হাতে সুন্দরের পাগড়ি দেখে হীরা তাকে সুন্দর বলে ভুল করলো। অবশেষে পাগলের কথায় তাকে চিনতে পেরে নিজের ভুল বুঝলো। কিন্তু মালিনী সুন্দরকে ধরতে পারলো না।

পঞ্চম দৃশ্য ॥ বর্ধমান—দেবালয় সম্মুখস্থ পথ। নগরের নারীরা গান গাইতে গাইতে আসছে। পথের মাঝে সুন্দরকে দেখে তারা মুগ্ধ ও কামমোহিত হল। এমন

সময় হীরা মালিনীর প্রবেশ। সে সবাইকে ডেকে ডেকে শুধায়—কোথায় আমার 'বোনপো' সুন্দর। অবশেষে নগরের নারীদের কথামতো হীরা সুন্দরের দেখা পেল। সুন্দর তার মনের কথা অর্থাৎ 'বিদ্যা' পাবার আশা মাসিকে জানালো, হীরা সুন্দরের অভিলাষ পূর্ণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে নিয়ে গেল নিজের আশ্রয়ে।

এইখানেই 'হীরে মালিনী' কৌতুক-নাট্যগীতির শেষ।

ভাষার নমুনা :

রাজবাড়ির জন্যে পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত হীরা মালিনী আপনমনে নিজের রূপ গুণের বিবৃতিমূলক একটি গান গাইলো [ভূমিকায় উল্লিখিত 'চোক্ থাকতে যে জন কাণা' ইত্যাদি]। তারপর নিজেই তার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হল :—

"গাছের নাকে ফুলকলি—আমার নাকে রসকলি। গাছের ফুলকলি দেখে ভ্রমর ভোঁ ভোঁ করে—আমার রসকলি দেখে নাগর গোঁ গোঁ করে। ফুলগাছে আমায় অনেক মিল আছে। তাতে আবার আমি মালিনী, ফুলগাছ ছাড়া থাকি নি। গাছের ফুল, মানুষ-ফুল দুই-ই ভালোবাসি, কিন্তু কালদোষে এ ছার দেশে, মনের মতন তেমন মনোমোহন মানুষ-ফুল মেলে না। হায় রে পোড়াকপাল, মানুষ-ফুল খুঁজে খুঁজে হলুম নাকাল। শুধু মেলে কই সাধের মানুষ-ফুল। কেবল মন ব্যাকুল! যদি মনের মত মানুষ-ফুল পাই আজ, পূজি তবে মদনরাজ, দিয়ে আমার প্রেমের সাজ। [বকুলবৃক্ষতলে সুন্দরকে দেখে সানন্দে]—ওমা, এই যে, মেঘ না চাইতে জল! বা রে বা, মদন ঠাকুরের কি কল। ফুল তো ফুল, একেবারে ফল!"

হীরা মালিনীর মত কামপীড়িত ধূর্তাশ্রেণীর নারীর মনোভাব উদ্ধৃত সংলাপে সুন্দরভাবে প্রকাশিত।

অনুপ্রাসভরা ভাষার এই মারপ্যাঁচে রাজকৃষ্ণের সিদ্ধহস্ত। আর, অনুপ্রাসে এই সিদ্ধিলাভই রাজকৃষ্ণবাবুর কবিখ্যাতির অন্যতম কারণগুলির মধ্যে একটি। এক্ষেত্রে তিনি অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ [১৮৪৯-৯৪] ঈশ্বরচন্দ্রের [১৮১১-৫৯] যোগ্য উত্তরসাধক।

॥ পাঁচ ॥

যথাসাধ্য বিস্তারিত এই আলোচনার শেষে বলা যায়, বাংলায় কৌতুক-নাট্যগীতি রচনার সূত্রপাত ও ইতিহাস রাজকৃষ্ণ রায়ের বহুমুখী প্রতিভার ফলশ্রুতি। বাংলা-সাহিত্যে রাজকৃষ্ণবাবুর দান সহজ সত্যের মতই স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষায় : 'তাঁহার [রাজকৃষ্ণ রায়ের] গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু'।[৪] অথচ একদা কিশোর রবীন্দ্রনাথ, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর-সরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী'[৫] নামে যে প্রবন্ধ সমালোচনামূলক গদ্যরচনাটি নিয়ে বাংলা-সাহিত্যের আসরে আলোড়ন জাগিয়েছিলেন, সেই গ্রন্থত্রয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অবসর সরোজিনী' ১ম ভাগ [১৮৭৬] কাব্যগ্রন্থটি যে এই রাজকৃষ্ণবাবুরই রচিত, এ কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কিন্তু কিশোর রবীন্দ্রনাথের হাতে . নির্মম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল রাজকৃষ্ণবাবুকে, ততখানি তিরস্কার যে রাজকৃষ্ণবাবুর প্রাপ্য না তা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের এই গদ্য রচনাটির উপলক্ষ্যও অংশত রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনা। এইভাবে রাজকৃষ্ণ রায়ের ক্ষমতা প্রথম থেকেই বাংলা-সাহিত্যের আসরে গুণীজনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

বহুমুখী প্রতিভার ক্ষমতাবলেই রাজকৃষ্ণ রায় বাংলা সাহিত্যে অনাস্বাদিতপূর্ব এই কৌতুক-নাট্য-গীতির প্রথম পরিবেশন করে পথিকৃৎ হিসাবে সম্মানিত।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১. A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects, by Herasim Lebedeff, 180 : Introduction (P. vi).

২. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' ১ম সংস্করণ, ৯ম খণ্ড।

৩. Encyclopaedia Britannica. 4th edn., Vol. 6 ; দ্রঃ 'Comic Opera' প্রসঙ্গ।

৪. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, ১৩২৬।

৫. 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর-সরোজিনী দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধ, দ্র° 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকা ১২৮৩ কার্তিক [১৮৭৬ অক্টোবর-নভেম্বর] সংখ্যা। এই প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৯ বৈশাখ আষাঢ় সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

রম্যাণি বীক্ষ্য

উত্তর-ভারত পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ষোল

পায়ে হেঁটে খানিকটা এগিয়ে রিক্শা পাওয়া গেল। কাশী সাইকেল রিক্শার দেশ, সারাক্ষণ অজস্র রিক্শা রাস্তা দিয়ে ছোটাছুটি করছে। একখানায় মিসেস মুখার্জি বসলেন সাবিত্রীকে নিয়ে, একখানায় পাঁচুকে নিয়ে তারাপদবাবু, আর একখানায় মনোরঞ্জন ও আমি বসলুম। কথা হল, বিশ্ববিদ্যালয় দেখাবার পর অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থানও দেখিয়ে দেবে। ভাড়ার কথা মনোরঞ্জন বলল না, বলল : সে আমি বুঝব।

মিসেস মুখার্জি বললেন : বেশি দেরি করলে আমার চলবে না। রাতের খাবারের কোন ব্যবস্থা করে আসি নি।

তারাপদবাবু বললেন : সত্যিই তো, বাজারও করতে হবে।

মনোরঞ্জন বলল : দু বেলা আপনাকে রাঁধতে দেব না বউদি, এবেলা আমার ব্যবস্থা।

মিসেস মুখার্জি বললেন : আপনি আবার কী ব্যবস্থা করবেন ?

মনোরঞ্জন হেসে বলল : দেখে আপনাকে তারিফ করতে হবে। আর তারাপদবাবুর অসুখ করলে আমি তার জন্য দায়ী।

এই সব আলোচনা হয়েছিল রিক্শায় উঠবার আগে। রিক্শায় উঠে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কী ব্যবস্থা করবে উনি ?

এ দেশে শুনেছি খাঁটি ঘিয়ে পুরি ভাজে, তার সঙ্গে তরকারি। তোমরা তো দ্বারকায় ভাল রাবড়ি খেয়েছিলে, এখানেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মন্দ হবে না। অন্ততঃ ওই ভদ্রমহিলা খানিকটা আরাম পাবেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এখান থেকে বেশি দূর নয়। একটা সুন্দর ফটক পেরিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম। এগারো শো একর জায়গা জুড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, পরিধি হবে মাইল পনর। ১৯১৬ সনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তার পর দিনে দিনে এই প্রতিষ্ঠানটি বেড়ে আজকের এই বিরাট আকার ধারণ করেছে। প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে আমরা সৌধগুলি দেখতে লাগলুম। একই ধরনে তৈরি এই বাড়িগুলি দূরে দূরে। উন্মুক্ত আলো-বাতাসে উজ্জ্বল। আমরা আর্টস্ ইঞ্জিনিয়ারিং ও এগ্রিকালচার কলেজ দেখলুম, সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদিক কলেজ উইমেনস কলেজও দেখলুম। হস্টেল দেখলুম দুটো, সেনট্রাল অফিস লাইব্রেরি হাসপাতাল। ভারতীয় কলাভবন শুনলুম দেখবার মত। মালব্য-মন্দির ও গান্ধী আশ্রমও দেখলুম। রাস্তা থেকেই এ সব দেখবার পরে বিশ্বনাথের মন্দিরের সামনে এসে নামলুম।

এ নতুন বিশ্বনাথের মন্দির, বিড়লার টাকায় তৈরি হচ্ছে। সুন্দর তোরণ পেরিয়ে ফুলের বাগান, মাঝখান দিয়ে পথ। তারপরে পাথরের মন্দির। সম্পূর্ণ হতে এখনও বাকি আছে। যতটুকু হয়েছে তাতেই মন প্রাণ মুগ্ধ হয়। ধর্মের মত গম্ভীর, স্বপ্নের মত সুন্দর। বিংশ শতাব্দীর জয়যাত্রার যুগেও গর্ব করবার মত অপূর্ব শিল্পকর্ম। এই মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা হয় না।

কাশীতে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তার নাম সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। ১৭৯১ সনে একটা ভাড়াটে

বাড়িতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত ইংরেজ কুইনস্ কলেজ স্থাপন করেছিলেন, গথিক কায়দায় নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে ১৯৫২ সনে। এখন এই কলেজের নাম হয়েছে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

কাশী বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এগুলি দেখবার আমাদের সুযোগ ছিল না।

ফেরবার পথে প্রথমে আমরা সঙ্কটমোচনে নামলুম। রাস্তা থেকে হাঁটাপথে খানিকটা এগিয়ে একটি বনময় পরিবেশের মধ্যে এই মন্দির। হনুমানের মন্দির। কবি তুলসীদাসজী এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের অন্য ধারে আর একটি মন্দির আছে রামচন্দ্রের। শনি মঙ্গলবারে এখানে সবচেয়ে বেশী যাত্রীসমাগম হয়। পাঠ কথকতা ও উৎসব হয় নানা রকম। মেলা বসে চৈত্র মাসে।

তারপর আমরা দুর্গা মন্দিরে এসে নামলুম।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটোরের রাণীভবানী এই মন্দির ও সংলগ্ন দুর্গাকুণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ মন্দিরের কারুকার্য দেখলুম, দেখলুম স্তম্ভগুলির শিল্পনৈপুণ্য। তারপরে এগিয়ে গিয়ে দেবীর দর্শন পেলুম। দণ্ডায়মান মূর্তি, সৌম্য প্রসন্ন। ধূপে ও ধুনায়, মালায় ও চন্দনে এমন একটি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যে খানিকক্ষণ সেখানে বসে থাকতে ইচ্ছা হল।

শুনলুম, এই দুর্গাবাড়ি অতি প্রাচীন স্থান। কাশীখণ্ডে এই দুর্গার উল্লেখ আছে। সামনে যে বিরাট ঘণ্টাটি ঝুলছে এটি নেপালের মহারাজা দিয়েছেন। বাকি সবকিছু বাংলার রাণীভবানীর কীর্তি।

এই মন্দিরে বানরের অভাব নেই। যাত্রীদের অনেকে তাদের খাওয়াচ্ছিল, আমাদের কাছে তারা কিছুই চাইল না।

ভাস্করানন্দজীর সমাধি এই মন্দিরের নিকটে। এঁর সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু জানা ছিল না। শুধু এইটুকু জানতুম যে তৈলঙ্গস্বামীর পরে তিনি কাশীতে খুবই নাম করেছিলেন। একজন যোগী ও সাধু, বেদান্তে অগাধ জ্ঞান ছিল বলে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনাও করেছিলেন।

ভারতমাতার মন্দিরে কোন দেবতা নেই। একটি সাধারণ বাড়ির ভিতর পাথরের উপরে ভারতের একটি রিলিফ মানচিত্র। এ একটি আধুনিক দ্রষ্টব্য। কে নির্মাণ করেছেন তা জানবার জন্য আমাদের কৌতূহল হল না।

পথে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছিল। রাস্তার দোকানে ও গৃহে বাতি জ্বলেছে অনেকক্ষণ আগে। পথচারীর সংখ্যা কমে নি।

মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আর কি দেখবার বাকি আছে?

মনোরঞ্জন বলেছিল: বাকি সব কিছুই। কালভৈরব, তিলভাণ্ডেশ্বর—

এ সব স্থান কোথায় আমাদের জানা নেই। চিন্তিত ভাবে তারাপদবাবু প্রশ্ন করলেন: এ সব আজই দেখতে হবে?

মিসেস মুখার্জি বললেন: আজ থাক না। ফিরতে পারলে রাতের ব্যবস্থাটা আমিই করতে পারব।

পাঁচু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল: তিলভাণ্ডেশ্বর কী?

তিনহাত লম্বা আর দশহাত মোটা একটি শিব।

পাঁচু খিলখিল করে হেসে উঠল।

মনোরঞ্জন বলল: প্রথমে কি আর অত বড় ছিল, তিলে তিলে বেড়ে ওই রকম চেহারা হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলে, দিনে এক তিল বাড়ে। তুমি যখন আবার বড় হয়ে আবার আসবে, তখন আরও মোটা দেখবে।

এবারে সাবিত্রীকেও হাসতে দেখলুম।

তিলভাণ্ডেশ্বর দেখতে আমরা গেলুম না, ধর্মশালায় ফিরলুম না। রিকশাওয়ালাকে মনোরঞ্জন বলল: চকের ভিতর দিয়ে চল।

তারাপদবাবুরা আগে আগে চললেন, আমরা সকলের পিছনে। বললুম: অনেক দেশ ঘুরে একটু অহংকার জন্মে ছিল। এখন তোমার পারদর্শিতা দেখে অবাক হচ্ছি।

আরও আশ্চর্য হবে।

বলে পরম কৌতুকে তাকাল আমার মুখের দিকে।

আমি কোন জবাব দিলুম না।

মনোরঞ্জন বলল: কাল ভগুর অন্বেষণ করতে হবে। ঠিকানা আছে?

না। তবে খোঁজাখুঁজি করবার মত ধারণা আছে।

ক জায়গায় মনে হল, গানের সুর শুনতে পেলুম। গলির ভিতর থেকে ভেসে এল। মনোরঞ্জনও পেয়েছিল। সে আমার দিকে তাকাল। বললুম: ও কাশীর সুনাম আজও কমে নি। অনেকে কী করেন জান? কণ্ঠসঙ্গীতে ঠুংরি এই কাশীরই ন। ভারতের শ্রেষ্ঠ তবলাবাদকেরা এই কাশীতেই ন। আর শানাই—এখানকার চেয়ে ভাল নহবত এ আর কোথাও নেই। যদি নাচ দেখতে চাও, তাও বে। লক্ষ্ণৌ আর জয়পুরের মত কথকের নৃত্যশিল্পী নেও আছে। রাতে বেরবে কি?

মনোরঞ্জন বোকার মত প্রশ্ন করল: কোথায়?

হেসে বললুম: এই একটু—

মনোরঞ্জন আর কোন কথা বলল না। গম্ভীর বসে রইল কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে ল না। চেঁচিয়ে উঠল: সোজা সোজা।

সোজা মানে ধর্মশালায় নয়, দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। ল: তোমাকে গান শোনাতে নিয়ে যাচ্ছি।

দশাশ্বমেধ ঘাটে আবার গান কিসের?

ঘাটে নয়, বিশ্বনাথের গলিতে। কষ্ট করে একা বে কেন, আমরাও সঙ্গ দেব।

এ মনোরঞ্জনের রাগের কথা। কিন্তু আমার মাথায় বুদ্ধি এল। মনে মনে ঠিক করে ফেললুম যে রাতে বার বেরুব।

বিশ্বনাথ গলির মুখে পৌঁছেই মনোরঞ্জন চেঁচিয়ে ল: রোকো রোকো।

একে একে রিক্শা দাঁড়াল। মনোরঞ্জন লাফিয়ে য়ে সবার পয়সা মিটিয়ে দিল। তারাপদবাবু বাধা বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন।

মনোরঞ্জন মিসেস মুখার্জির কাছে এগিয়ে গিয়ে লল: দুপুরবেলায় আপনার বিশ্বনাথ দর্শন হয় নি, এবেলায় বাবার আরতি দেখুন।

মিসেস মুখার্জি বললেন: আপনি ছিলেন বলে ভাই এই কথা বললেন, তা না হলে আমার জন্যে কি কেউ বে। আমার দরকার হাঁড়ি ঠেলবার জন্যে।

তারাপদবাবু বললেন: দুপুরবেলায় কি আমি তোমাকে আসতে বারণ করেছিলুম?

একবার বলেছিলে।

দেখুন তো কী বিপদ।

বলে তারাপদবাবু আমার দিকে তাকালেন।

গলি দিয়ে আমরা মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলুম, আর বিস্মিত হচ্ছিলুম দুধারের দোকান দেখে। দুপুরবেলাতেও দেখেছি, আর এখনও দেখছি। আলোয় এখন চারিদিক ঝকঝক করছে, আর জমজমাট হয়েছে ক্রেতায় ও বিক্রেতায়। মনে হল, এইটিই কাশীর সবচেয়ে জনপ্রিয় বাজার। কত রকমের পণ্য তার শেষ নেই। বাসনের দোকান ও কাঠের রঙীন খেলনার দোকান অনেকগুলি, বাসন শুধু পিতলের নয়, রুপো ও জর্মান সিলভারের নানা প্রয়োজনীয় ও শৌখিন জিনিস। পানের মসলার দোকান কত। এ সব কাশীর নিজস্ব জিনিস। বাইরের জিনিস তো আছেই।

আমরা দুধারে তাকাতে তাকাতে চলেছিলুম। মিসেস মুখার্জি বললেন: ফেরার পথে দু-একখানা শাড়ি দেখলে মন্দ হত না।

তারাপদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: বেনারসী শাড়ি?

অমন ভয় পাচ্ছ কেন?

ভয় নয়—

তবে?

ভাবছিলুম এই বয়সে তোমাকে—

কেন, তোমার কি মেয়ে নেই নাকি? মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে হবে না।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার মামীর কথা মনে পড়ল। দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের সময় তিনিও মাদ্রাজে শাড়ি কিনতে চেয়েছিলেন। কাঞ্চীপুরমের একখানা শাড়ি কিনেছিলেন, সাদা সিল্কের উপর জরির পাড় আর আঁচল। বলেছিলেন, অগ্রহায়ণে স্বাতির বিয়ে। এই শাড়ি পরে জামাই বরণ করব।

রেশমি কাপড় যে কত মোলায়েম ও মজবুত হতে পারে, তা সেই প্রথম দেখেছিলুম। দুনিয়ার সমস্ত রঙ একত্র করেছে শাড়ির বাজারে, জরির ভারি আঁচলে বেঁধে রেখেছে এক অতীত দিনের ঐতিহ্যকে। মনে পড়েছিল পুরাকালের দেবদাসীদের কথা, অনেক যুগ আগে এমনি শাড়ির আঁচল দুলিয়ে মন্দিরে মন্দিরে তারা

নাচত। তাই এত রঙের চটক ও সোনার ছড়াছড়ি। স্বাতির কিন্তু একখানা শাড়িও পছন্দ হয় নি। বলেছিল: অমন গাঢ় রঙ আর ফাঁপা-ফোলা শাড়ি কলকাতায় অন্ততঃ অচল।

বেনারসী শাড়ির বিচিত্র রূপ। আকাশের রামধনু তো মাত্র সাত রঙের, পৃথিবীর সমস্ত রঙ দেখা যায় বেনারসী শাড়ির বাজারে। কাশ্মীর মত শুধু গাঢ় রঙ নয়, কোন হালকা রঙই এখানে বাদ পড়ে না। শুধু রঙ নয়, পাড় আঁচল ও জমির কত বৈচিত্র্য। কত দাম। শুধু রাজামহারাজার অন্তঃপুরে নয়, গরীবের কুটীরেও বেনারসীর অবাধ অধিকার। বেনারসী না হলে কন্যার বিবাহ হয় না। একখানা অন্ততঃ চাই। মেয়ে সেই বেনারসী পড়ে পিঁড়িতে বসবে, শুভদৃষ্টি হবে বেনারসীর আঁচলের তলায়, বর মুখ দেখবে। তারপর সেই বেনারসী বাক্সে তোলা থাকবে, মেয়ে অন্যের বিবাহে যাবে সেই বেনারসী পরে। সেদিন অসংখ্য বেনারসী-পরা মেয়ের মাঝখানে কনে চিনতে হবে চন্দনের ফোঁটা থেকে। কিছুদিন আগেও বিবাহে শুধু লাল বেনারসীর প্রচলন ছিল, এখন অনেকে লালের বদলে গোলাপী কিনছে, হলদে কিনছে, কিন্তু কিনছে বেনারসী। তার বদলে মাদ্রাজী কিংবা বোম্বাই শাড়ি কিনছে না। সাবিত্রী বড় হয়েছে, তার বিবাহ দিতে হবে। বেনারসে এসে মিসেস মুখার্জির তাই বেনারসী শাড়ির কথা মনে পড়েছে।

তারাপদবাবু থতমত খেয়ে বললেন: তা বটে, তা বটে।

আমরা আর একবার বিশ্বনাথ দর্শন করলুম। কিন্তু আরতি দেখা হল না। শয়নারতির তখনও অনেক দেরি ছিল। শুনলুম যে ঠিক এই সময়েই কাশীতে কোন উৎসব নেই। তা না হলে এখানে বার মাসে তের পার্বণ। বর্ষায় লোকে কাজরী গিয়ে রাত জেগেছে, আর কিছুদিন পর থেকে রামলীলা শুরু হবে। পুজোর সময় শুরু হয়ে সারা শীতকাল ধরে চলবে। আষাঢ়ে রথযাত্রা হয়েছে, শ্রাবণে সারনাথের মেলা, লক্ষ্মীজীর মেলা হয়েছে ভাদ্র মাসে। আশ্বিনের শেষে হবে ভরতমিলাপের দিন। তারপর মাঘে বেদব্যাসের মেলা, হোলি শিবরাত্রি।

মন্দির থেকে ফেরার পথে আমরা শাড়ি দেখলু[illegible] মিসেস মুখার্জির দু-তিনখানা শাড়ি পছন্দ হয়েছিল, [illegible] একখানাও কিনলেন না। বললেন: আজ থাক।

পথে নেমে বললেন: বিয়ের দিন স্থির হলে [illegible] যেত।

সাবিত্রীর পছন্দের কথা তিনি জিজ্ঞাসা করে[illegible] জিজ্ঞাসা করলে সে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হত, কোন [illegible] দিতে পারত না। ভয়ে ভয়ে তারাপদবাবু বললে[illegible] তবে দেখলে কেন?

আসল জিনিসের দামের একটা ধারণা হল।

আসল জিনিস কি আমরা দাম দিয়ে কিনি!

সতেরো

মনোরঞ্জনের ব্যবস্থায় আমরা দোকানে [illegible] ধর্মশালায় ফিরেছিলুম। আমাদের দখলে দুখানা [illegible] ছিল। একখানা মুখার্জি পরিবারের জন্য, আর একটা আমাদের। নিজেদের ঘরে এসে বসবার আগেই [illegible] মনোরঞ্জনকে ডাকতে এল, বলল: মা আপনা[illegible] ডাকছেন।

মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল: বুঝেছি[illegible]

বললুম: এই ফাঁকে আমিও একটু ঘুরে আসি।

কোথায়?

যত্রতত্র।

মনোরঞ্জনের দৃষ্টি কঠিন হল।

বললুম: ভস্ম করে ফেলবে [illegible]কি? কিন্তু শাস্ত্রবাক্য জান তো? একটা শহরের সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করতে হলে তিনটি স্থান দেখতে হয়, মন্দির বাজার আর—

পাঁচু দাঁড়িয়ে ছিল বলে কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারলুম না। বললুম: মন্দির আর বাজার দেখা তো হয়েছে, এইবারে অনুমতি দাও।

বলে আমি আর অপেক্ষা করলুম না। স্তম্ভিত মনোরঞ্জনকে ঘরে ফেলেই আমি বেরিয়ে গেলুম। পিছনে পাঁচুর প্রশ্ন আমি শুনতে পেয়েছিলুম। সে জিজ্ঞেস করল: উনি কোথায় গেলেন কাকাবাবু?

মনোরঞ্জন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: গঙ্গার ধারে।

...ক গিয়ে বাইজীর গান শোনার বাসনা আমার ছিল ...ধু আত্মরক্ষার জন্যই এই ছলনার প্রয়োজন হয়েছে। ...জন এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চায়। সে আমার ...র কারণ জানে। যে দিনগুলির স্মৃতি আমি সযত্নে ... করি, তা সে মিথ্যা মনে করে, আমার স্বপ্নকে ... দুর্বলতা। আমার মুক্তির জন্যই সে আমাকে ...কা বদলের পরামর্শ দিয়েছে। শুধু পরামর্শ নয়, ...লিও শুরু করেছে। পুরীতে মুখার্জী পরিবারকে ...র সংবাদ দিয়েছিল। এখানে আমার অজ্ঞাতে এমন ...যোগ করেছে যে পদে পদে বিব্রত বোধ করছি। ...ন তরফ থেকেই প্রস্তাব আসে নি, কিন্তু সাবিত্রীর ...া দেখেই কিছু অনুমান করা যায়।

পথে বেরিয়ে আমি চকের দিকে গেলুম না, পা ...লুম গঙ্গার দিকে। কোন ঘাটে বসে খানিকটা সময় ...বার ইচ্ছা হল। কাশীর গঙ্গার ঘাট বড় পবিত্র। ... সাধু মহাত্মা মহাপুরুষ এই ঘাটে বসে সাধনা করেছেন ...র হিসাব কেউ জানে না। অগণিত ভক্তের ভিতর ...রা লুকিয়ে থাকেন। সাধুকে যে খুঁজে বার করতে ...বে, সে কখনও সাধারণ মানুষ নয়। তৈলঙ্গস্বামী ... দিয়েছিলেন বলেই আমরা তাঁকে চিনতে পেরে-...লুম। তিনি কেন ধরা দিয়েছিলেন তা অনুমান করা ...ন নয়। দেশে ইংরেজ-ভক্তি বেড়ে গিয়েছিল। দেশের ...চার ধর্মকে লোকে কুসংস্কার বলে পরিহার করতে দ্বিধা ...রছিল না। তৈলঙ্গস্বামী সেই ভাঙনের যুগে অলৌকিক ...ক্তি দেখিয়ে হিন্দুধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। এ ...গের শঙ্করাচার্য।

দশাশ্বমেধ ঘাটের নানা স্থানে জটলা হচ্ছিল। ...বাইকে বাঁচিয়ে আমি একটু নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে ...সলুম। সামনে অনেকগুলো বজরা ও নৌকো বাঁধা ...আছে, পাশের কোন ঘাট থেকে কিছু পাঠের শব্দ ...আসছে, গানের শব্দও আসছে অল্প অল্প। আমার ...মত নিঃশব্দে বসে থাকতে কেউ এসেছে কিনা দেখতে ...পেলুম না। সুখী মানুষ নীরব থাকতে চায় না, দুঃখ মানুষকে মূক করে। সুখে আছে ভোগের বাসনা, বেদনায় জীবনের সাধনা। সুখ দুঃখ আনে, দুঃখ আনে মহত্ত্ব। দুঃখকে জয় করে মানুষ হয় মহাপুরুষ।

কিন্তু আমার দুঃখ আমি জয় করতে পারি নি। এই রকম নিঃস্ব মুহূর্তে আমার অতীত আমাকে অস্থির করে। জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিবাহ কেন স্থির হয়েছিল, সে কথা আমি আজও ভেবে পাই নি। জো রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল ওখার পথে। দ্বারকায় যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় মামারা উঠেছিলেন, সাহেবী পোশাকে জো রায় সেই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন। অযাচিত ভাবে তিনি সাহায্য করেছিলেন, মামা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁকে ধন্যবাদ দিতে।

গাড়িতেই জো রায়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। একটা ফার্মের বড় অফিসার। হেড কোয়ার্টার্স বম্বে, কাজের এলাকা কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র। বিলেত ঘুরে এসে পিতৃদত্ত জনার্দন নাম হয়েছে জো, কথায় ও কাজে পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানা। মিঠাপুরে তাঁর কাজ ছিল, কিন্তু নামতে পারলেন না। মামাদের সঙ্গেই ওখা গেলেন, ওখা থেকে বেট দ্বারকা। ফেরবার পথেও তাঁর মিঠাপুরে নামা হল না। আমাদের সঙ্গে তিনিও সোমনাথ দেখতেন। কিন্তু স্বাতির কথায় তা হল না। ভদ্রলোককে নেমে যেতেই হল।

জো রায়কে মামীর ভাল লেগেছিল। চুপিচুপি মামাকে বলেছিলেন, বেশ ছেলেটি, তাই না!

গম্ভীর ভাবে মামা বলেছিলেন, হুঁ।

এতবড় চাকরি, অথচ অহঙ্কার নেই এতটুকু।

হু।

মামী পরামর্শ দিয়েছিলেন, ওর ঠিকানাটা লিখে রাখ। ওই সঙ্গে ওর বাপের নাম ঠিকানাও।

মামা তাতেও বলেছিলেন, হুঁ।

গাড়িতে খাওয়াদাওয়ার পর জো রায় বলেছিলেন, সোমনাথ তাঁর দেখা হয় নি।

বেশ তো, চলুন না আমাদের সঙ্গে।

হাত দুটো কচলে জো রায় বলেছিলেন, আমাকে আপনি বলবেন না।

উত্তর শুনে মামী খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন, তা বটে। তুমি তো আমার ছেলেরই মত।

মামীকে খুশী করবার জন্য আমি বলেছিলুম, আপনি এই গাড়িতেই থাকুন, আমিই যাব পাশের গাড়িতে।

কিন্তু স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে মুখে আর কথা যোগাল না। বুঝতে পারছিলুম, সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, সোমনাথ পরে দেখলে আপনার চলবে না!

মামী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, একসঙ্গে যদি দেখতে পাওয়া যায় তো পরে দেখবে কেন?

কাজের চেয়ে কি আর কিছু বড় আছে!

স্বাতির উত্তরে কোন উষ্মা প্রকাশ পেল না। বরং আরও নম্র, আরও মিষ্টি শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ব্যস্তভাবে জো রায় বলেছিলেন, সে খুব ঠিক কথা। আমি তো এদিকেই আছি, আমি অন্য সময়ে সোমনাথ দেখব।

পরের স্টেশনেই জো রায় নেমে গিয়েছিলেন পাশের গাড়িতে। আর মামী অনেকক্ষণ ধরে স্বাতিকে বকেছিলেন। স্বাতি একটি কথারও উত্তর দেয় নি।

সোমনাথে আমি মূর্খের মত ভেবেছিলুম, জো রায়কে বুঝি হারিয়ে দিতে পেরেছি। মামীর ব্যবহারেই তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল, পরে তা বুঝেছি। এ কথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে রাজনীতিতে, সমাজ-চেতনায় হয় নি। আজও ভারতের অস্থিতে মজ্জাতে পরাধীন সন্তার গ্লানি লেগে আছে। আজও আমরা মানুষকে তার যোগ্যতা দিয়ে বিচার করি না, বিচার করি তার অর্থসামর্থ্যে, তার সরকারী প্রতিপত্তিতে। এ দেশ আরও অনেকদিন চাঁদির পূজো করবে।

আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম মামার কথা ভেবে। জো রায়কে তিনি দেখতে পারতেন না। তাঁর কথাবার্তাতেই সে কথা প্রকাশ পেয়েছে। জো রায়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি কী করে রাজী হলেন! তবে কি স্বাতি নিজেই রাজী হল! সেও কি সম্ভব! দুনিয়ায় কী সম্ভব আর কী নয়, তা কি কেউ জানে!

জো রায়ের সঙ্গে যে বম্বেতে আবার দেখা হয়ে যাবে, সে কথা আমরা কেউই ভাবি নি। অপরাহ্ণে আমরা মালাবার হিলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। মামা-মামী একটা বেঞ্চিতে বসলেন। স্বাতির সঙ্গে আমি নেমে এলুম পাহাড়ের পূর্বদিকের একটা পথ ধরে। পছন্দমত একটা স্থান বেছে নিয়ে আমরা পাশাপাশি বসলুম। মেরিন ড্রাইভ এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—বেলাশেষের স্তিমিত রৌদ্রে অর্ধচন্দ্রের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। দক্ষিণের সমুদ্র নয় তরঙ্গসঙ্কুল, স্থিরও নয়, ছলছল করে প্রাণের আবেগে আছে উচ্ছল হয়ে। একসময় অন্ধকার নামবে কিন্তু এ দৃশ্য একেবারে মুছে যাবে না। আলোর মালায় আরও রমণীয় হয়ে উঠবে।

স্বাতি বলল, তোমার ইতিহাসের কথা মনে পড়ছে না তো?

হেসে বললুম, অতীতের চর্চা করে রিক্ত মানুষ। নিজেকে হঠাৎ ধনী ভাবছ কেন?

ধন পেয়েছি বলে।

সে কি আজ নতুন পেয়েছ?

না।

তবে?

ভয় ছিল দস্যুতে কেড়ে নেবার।

আজ বুঝি সে ভয় আর নেই?

নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলার অবকাশ পেলুম না। অদূরে কোন পরিচিত মানুষের সন্ধান পেলুম। উপর থেকে নীচে নামছে। যাকে চেনা মানুষ ভাবছি, তাকে আড়াল করে আছে একটি পার্সী মেয়ে, তন্বী সুন্দরী। তার পায়ের ছন্দে আর মুখের হাসিতে একটা প্রাণবন্ত জীবনের ঘোষণা দেখছি। পুরুষটিকে চিনতে আমার বেশিক্ষণ লাগে নি। যাকে সন্দেহ করেছিলুম, সেই জো রায়কে দেখেই নিঃসন্দেহ হলুম।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তার দৃষ্টি অন্য ধারে। জো রায়কে সে বোধ হয় দেখে নি। দেখলে এমন নির্বিকারে বসে থাকত না।

কিন্তু তার পরের কথায় আমার সন্দেহ জেগেছিল, আর কতক্ষণ বসবে?

ভাল লাগছে না বুঝি?

বাবা মা অপেক্ষা করছেন কিনা, তাই বলছি।

অন্যত্র স্বাতি এ কথা ভাবে নি, আমাকেই স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে। তাইতেই এই প্রস্তাবটা কেমন বিসদৃশ মনে হল। বললুম, এ জায়গা যদি ভাল না লাগে তো কোথায় লাগবে?

...তি বলল, এলিফেন্টার গুহা।

...থিবীটা কি তোমার ছোট হয়ে আসছে?

...জের একটা জগৎ গড়বার চেষ্টা করছি। সেখানে ...থাকবে না।

...কজন থাকবে তো?

...ভবে দেখব।

...জই আমার আরজি পেশ করে রাখলুম।

...তি এ কথার উত্তর দেয় নি।

...জো রায়ও আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। সেই পার্সী ...কে লুকিয়ে রেখে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ...দের ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন, কাল সকাল ...তেই আপনাদের হোটেলে এসে জুটব। বম্বে ...বার ভার আমি নিলুম।

কিন্তু সকালে স্বাতি জো রায়ের জন্য অপেক্ষা করে নি। ...দের সমস্ত ব্যবস্থা সে ওলটপালট করে দিয়েছিল। ...কে টেনে নিয়ে গিয়ে উঠেছিল পুণার ট্রেনে।

তার পরের দিনও সে পালিয়েছিল। মামা-মামীকে ...দেখে আমাকেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে। জো ...র পাশে দাঁড়াতে আমাকে দেয় নি, সে নিজেও তার ...নে দাঁড়ায় নি। আমার মনে হয়েছিল, এই ব্যবহারে ...ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। মালাবার হিলের পার্সী ...য়েটাকে সে নিশ্চয়ই দেখেছিল।

জো রায় যে নাছোড়বান্দা তাতে আমার সন্দেহ ...ল না। আমি জানতুম যে সকালবেলায় হোটেলে ...মাদের না দেখে তিনি দমবেন না, আবার আসবেন। ...তবার ধরা না যায় ততবার আসবেন। সোমনাথের ...থে স্বাতি যে তাঁকে নামিয়ে দিয়েছিল, সে কথা হয়তো ...লেই গেছেন। মনে থাকলেও গায়ে কোন অপমান ...খে রাখেন নি। পুরুষকে ধরা দেবার জন্যই তো বারে ...রে নারী ফিরিয়ে দেয়, প্রেমের পরীক্ষা হয় এই ...করানোর খেলায়।

সত্যিই জো রায় আমাদের ধরে ফেলেছিলেন। ...তির সঙ্গে পালিয়ে গিয়েও নিষ্কৃতি পাই নি। চৌপাটিতে ...লির উপর আমরা বসেছিলুম। স্বাতিকে বড় প্রফুল্ল ...া ছিল। বলল, সারাদিন আজ আমি এইখানে ...য়ে থাকব।

খিদে পেলে?

উঠব না।

বালি তেতে উঠলে?

উঠব না।

পরক্ষণেই বলল, একটা কথা জানতে চাইলে তুমি রাগ করবে না?

খুশী হব।

তোমার ছেলেবেলার কথা বল।

আমার শৈশবের কথা কোনদিন কেউ জানতে চায় নি, স্বপ্নেও ভাবি নি যে কেউ কোনদিন জানতে চাইবে। সহসা নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। তবু আমি অসঙ্কোচে সব কথা বলেছিলুম।

জো রায় আমাদের এইখানে আবিষ্কার করেছিল। চেঁচিয়ে উঠেছিল, আপনারা এইখানে! আমি সমস্ত বোম্বাই শহর আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তারপর তারই নিমন্ত্রণে আম্বাসাডরে লাঞ্চ খেলুম, বোম্বাই শহর দেখলুম তারই সঙ্গে। শুধু আমি আর স্বাতি নয়, মামা-মামীও সঙ্গে ছিলেন।

জো রায়কে যতই দেখছিলুম, ততই আমার ভয় বাড়ছিল। এই ভয় আমার আগে ছিল না, এই ভয় আমার নতুন দেখা দিয়েছে। যার কিছু নেই, তার আবার হারাবার ভয় কি! আমি কি কিছু পেয়েছি যে হারাবার ভয় আজ নতুন জেগেছে! বুকের ভিতর একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা টনটন করে উঠছিল।

আমার সম্বন্ধে স্বাতির দুর্বলতার পরিচয় যেমন পেয়েছি, তেমনই পেয়েছি তার বিরাগের ইঙ্গিত। গির্ণার পাহাড়ের উপরকোটে স্বাতি আমায় প্রশ্ন করেছিল, এমন হালকা ভাবে আর কতকাল কাটাবে?

বলেছিল, বড় অপমান বোধ হয়। আমি কি খেলার জিনিস না বাজারের পণ্য!

সেই সঙ্গেই প্রশ্ন করেছিল, তোমার কি কোন দাম নেই এই সমাজে? কারও কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পার না?—তারপর নিজেই বলেছিল, এ যুগের বিচারে তোমার দাম নেই।

আমি বলেছিলুম, এ যুগ একদিন বদলাবে, আর ওখানেই আমার সান্ত্বনা।

কাশীর শহর ছাড়িয়ে আমরা যখন খোলা রাস্তায় পড়লুম, তখনও মনোরঞ্জন আমার সঙ্গে কথা বলল না। আমি তার রাগের কারণ জানি। সে নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে আমি চলে গিয়েছিলুম বাঈজীর গান শুনতে। তা না হলে এত রাত করে কেন ফিরব। গঙ্গার ঘাটেও যে চুপ করে বসে থাকা যায়, সে কথা সে বিশ্বাস করে না। একা একা মানুষ কখনও সময়ের অপচয় করতে পারে!

বুঝতে পারছিলুম যে একটা বিস্ফোরণ না হলে তার মনের গুমোট কাটবে না। কিন্তু আমি সেই সুযোগ তাকে দিলুম না। আমি সারনাথের কথা ভাবলুম।

সারনাথের নামে আমার বুদ্ধের কথা মনে এল। এবারে এই ভ্রমণে বারে বারে তাঁর কীর্তির সাক্ষাৎ পাচ্ছি। ভারতের এই অঞ্চলে তিনি মহা মহিমায় বেঁচে আছেন। নেপাল রাজ্যের তরাই অঞ্চলে লুম্বিনিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বুদ্ধগয়ায়। আর এই সারনাথে প্রথম ধর্মপ্রচার করেছিলেন। শ্রাবস্তী ও সঙ্কাস্তে তিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন, রাজগৃহ নালন্দা ও বৈশালীতে তিনি জীবনের কিছু কাল অতিবাহিত করেছিলেন। কুশীনগর তাঁর নির্বাণের স্থান। সাঁচী অজন্তা ও ইলোরায় বৌদ্ধকীর্তির অপূর্ব নির্দশন আছে। কিন্তু সেখানে তাঁর পদধূলি পড়েছিল কিনা জানা নেই।

কপিলাবাস্তু থেকে লুম্বিনি বারো মাইল দূরে। অশোক এখানে এসে একটি স্তম্ভ রেখে যান। আর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। চীনা পরিব্রাজকেরা যা দেখেছিলেন, এখনও তা খুঁড়ে বার করা সম্ভব হয় নি।

প্রাচীন রাজ্য কোশলের রাজধানী হল শ্রাবস্তী। বর্তমান গোণ্ডা জেলার সীমায় সাহেথ মাহেথে যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাকেই শ্রাবস্তী বলে অনুমান করা হয়। বুদ্ধ এখানে অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছিলেন।

এটা জেলার সঙ্কিসা গ্রামের প্রাচীন নাম হল সঙ্কাস্ত। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে স্বর্গত মায়ের কাছে অভিধর্ম প্রচার করে বুদ্ধ এখানে নেমেছিলেন। আজ এখানে অনেক জায়গা জুড়ে কয়েকটি ঢিপি আছে। চীনা পরিব্রাজকেরা এখানে এসেও অনেক কিছু দেখেছিলেন।

মাটি খুঁড়লে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে।

কুশীনগর বুদ্ধের পরিনির্বাণের স্থান। আশি ব[illegible] বয়সে একটি শালগাছের নীচে বুদ্ধ তাঁর দেহরক্ষা ক[illegible] ছিলেন। গোরখপুর জেলায় কাশিয়া নামক স্থানে সেকালের কুশীনগর অবস্থিত ছিল। কোন অজ্ঞা[illegible] কারণে এই নগর অকালে পরিত্যক্ত হয়েছিল। চী[illegible] পরিব্রাজকেরা এখানে এসে শুধু ধ্বংসস্তূপ দেখেছিলেন।

রাজগৃহ নালন্দা বৈশালী ও বুদ্ধগয়ার কথা আগে বলা হয়েছে। সাঁচী অজন্তা ও ইলোরাও আমরা আ[illegible] দেখেছি। এইবারে দেখব সারনাথ।

বুদ্ধগয়ায় তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করবার পর বুদ্ধ শুনে[illegible] যে তাঁর পাঁচজন সঙ্গী ঋষিপত্তনে আছেন। ঋষিপ[illegible] সারনাথের প্রাচীন নাম। তিনি সেই সঙ্গীদের খোঁ[illegible] এলেন এইখানে। সারনাথের মৃগদাব উপবনে [illegible] তাঁদের নতুন ধর্মের কথা শোনালেন। এরই নাম ধ[illegible] চক্র প্রবর্তন। সঙ্গীরা শিষ্য হলেন। ষাটজন ভিক্ষুকে নি[illegible] তিনি সংঘ গঠন করলেন। দিকে দিকে তাঁরাই গেলে[illegible] বুদ্ধের নতুন ধর্মপ্রচারে। সারনাথে তৈরি হল ধ[illegible] চক্র প্রবর্তন বিহার। আজ যে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের অসং[illegible] মানুষের প্রাণের ধর্ম, সেই ধর্ম এই সারনাথেই প্র[illegible] রূপ নিয়েছিল। নতুন ধর্মের আলো এইখান থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল চারিদিকে।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে আমরা চলছিলুম। চার মা[illegible] পথ। বরুণা নদীর পুল পেরবার পরে আমি মনোরঞ্জ[illegible] মুখের দিকে তাকালুম। বললুম: আজ এমন গ[illegible] কেন?

মনোরঞ্জন বোধ হয় কথা বলতে পেরে বাঁচল। বল[illegible] তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ। এই তীর্থস্থানে এ[illegible] তোমার জন্য আমায় মিথ্যা কথা বলতে হল।

আমি চাই না যে আমার জন্যে কেউ মিথ্যা ক[illegible] বলে।

সত্য কথা কাউকে বলা যায়? কী ভাববেন ও[illegible] আর ওই সরল মেয়েটাই বা কী ভাববে?

আমি যা, তাই ভাববেন।

তারপরেও তাঁরা তোমায় মেয়ে দেবেন ভাব[illegible] গঙ্গায় কি জল নেই?

য়েয়ে নেবারও একটা প্রশ্ন আছে, এবং সেইটেই প্রশ্ন।

মানে ?

মানে, অন্যের অধিকারে তুমি হস্তক্ষেপ করছ। এ মার অনধিকারচর্চা।

বটে!—বলে মনোরঞ্জন মুখ বুজল। পথে আর একটা াও বলল না।

সারনাথ একটি পরিচ্ছন্ন অঞ্চল। নতুন শহরের খিন পাড়ার মত। পথের ধারে কয়েকটি সুন্দর বাড়ি, র কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। এর মধ্যে সবচেয়ে গৌরবে যা দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম ধামেক স্তূপ। রিক্শা থেকে নেমে একটা গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ াতে হয়। বড় একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সবাই ে তোলে। কালের চিহ্ন-ক্ষত বিরাট এই স্তূপটিকে বতে বড় ন্যাড়া দেখায়। ছবিতে যখন গাছের একটি ল স্তূপের পাশে দেখা যায়, তখন এই ন্যাড়া স্তূপটিকে নিকটা সজীব মনে হয়।

কানিংহাম সাহেব বলেছিলেন যে ধামেক ধর্মোপদেশক ধর্মদেশক শব্দের অপভ্রংশ। দয়ারাম সাহনি বলেছেন, সংস্কৃত শব্দ ধর্মেক্ষা কালক্রমে ধামেক হয়েছে।

এখন আমরা যে স্তূপ দেখি, তা প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু, চের ব্যাস তিরানব্বই ফুট। একটি গোলাকার বস্তু, র নীচের অংশ স্থূল আর উপরের অংশ কিছু সংকীর্ণ। র্থাৎ ভূমির সংলগ্ন ব্যাসের চেয়ে উপরের ব্যাস কম। মে ক্রমে কমে নি, কমেছে মাঝখান থেকে। স্তূপ এমন রাট না হলে বলা যেত যে একটি বিপুলায়তন শিবলিঙ্গ াটিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

নিকটে গিয়ে দেখলুম যে এই স্তূপের নীচের অংশ াথরে গাঁথা, আর উপরের অংশ ইঁটের তৈরি। স্তূপের ায়ে যে নক্শা ছিল, তার কিছু কিছু এখনও অক্ষত াছে। উপরে নীচে ফুল লতাপাতা, মাঝখানে জ্যামিতির ক্শা। এত স্পষ্ট যে অত্যন্ত আধুনিক বলে মনে হবে।

এই স্তূপের এক দিকে একটি জৈন মন্দির দেখলুম। াকাদশ তীর্থঙ্কর শ্রী অংশনাথের মন্দির। ইনি এখানে াধনা ও নির্বাণ লাভ করেছিলেন বলে জৈনদের কাছে এই স্থানও পবিত্র।

ধামেক স্তূপের অন্যদিকে মূল গন্ধকুটি বিহার। সুন্দর বাগানের মধ্যে এই নতুন নির্মিত সৌধটি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের আদর্শে নির্মিত। পার্থক্যও একটুখানি আছে। একটি হলঘর এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে আমরা এই বিহারে এলুম। ওধার থেকেও যাত্রীরা আসছে ধামেক স্তূপ দেখতে। আমাদের রিক্শা রাজপথ ধরে এগিয়ে গিয়ে বিহারের সামনে দাঁড়াবে। ফেরার পথে আমরা আর এদিক দিয়ে ফিরব না।

মূল গন্ধকুটি বিহারে প্রবেশ করে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মার্বল পাথরের মেঝে দেখে নয়, দেওয়ালের ফ্রেস্কো দেখে। অজন্তার শৈলীতে চারিদিক চিত্রিত। শুনলুম, জাপানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কসেটু নসু এই দৃশ্যগুলি এঁকেছিলেন। বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনাকে ছবিতে রূপ দেওয়া হয়েছে। ১৯৩১ সালে মহাবোধি সোসাইটি এই মন্দির নির্মাণ করেন। নাগার্জুনকোণ্ডা ও তক্ষশীলায় যেসব বৌদ্ধ নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা এই মন্দিরেই সংরক্ষিত হয়েছে।

এখানেও মাটি খুঁড়ে ধ্বংসাবশেষ বার করার চেষ্টা হয়েছিল। সে জায়গাটাও আমরা দেখলুম। এইখানেই কোথাও ছিল ধর্মরাজিকা স্তূপ। আষাঢ়ের এক পূর্ণিমায় বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই স্তূপের ইঁট ভেঙে নিয়ে গিয়ে কাশীতে জগৎসিংহের মহল্লা তৈরি হয়েছে। জগৎসিংহ দেওয়ান ছিলেন কাশীর রাজা চৈৎসিংহের। পথে আর একটি ভাঙাচোরা স্তূপ দেখতে পেয়েছিলুম। তার নাম শুনলুম চৌখণ্ডি। হুমায়ুনের সারনাথ দর্শন উপলক্ষ্যে আকবর বাদশাহ একটি বুরুজ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। আর কানিংহাম সাহেব যে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন তার চিহ্নও এখানে বর্তমান।

মূল গন্ধকুটি বিহার থেকে বেরিয়েই আমরা বিড়লার রেস্টহাউস দেখলুম। এই দোতলা বাড়িতে যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা আছে।

পূর্বদিকে খানিকটা এগিয়ে আমরা চীনামন্দির দেখলুম। খাঁটি চীনা শৈলীতে তৈরি। চীনদেশে যাবার সৌভাগ্য যাঁদের হবে না, তাঁরা এই মন্দিরে চীনা উপাসনার কিছু পরিচয় পাবেন।

একটি বর্মী বিহারও আছে। আর যাত্রীদের জন্য একটি দোতলা ধর্মশালা।

সকলের শেষে আমরা সারনাথের যাদুঘর দেখতে গেলুম। সুন্দর একটি উদ্যানের মধ্যে এই যাদুঘর। মাঝখানে মস্তবড় ঘর, দুধারেও ঘর। কতশত মূর্তি দেখলুম তার হিসাব নেই সেই বিখ্যাত অশোক স্তম্ভ দেখলুম। সারনাথের লায়ন ক্যাপিটাল। ধর্মচক্রের উপর চারটি সিংহ। বুদ্ধের নানা ভঙ্গির মূর্তি। আর একটি পাথরের বাক্স। জগৎসিংহ যখন ইট সংগ্রহের জন্য একটি স্তূপ ভাঙেন, তখন তার ভিতরে এই বাক্সটি পাওয়া গিয়েছিল। এই বাক্সের ভিতর একটি সোনার পাত্রে ছিল অস্থি। জগৎসিংহের হুকুমে সেই অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল, সোনার পাত্রটি কোথায় গেছে কেউ জানে না। আমরা পাথরের বাক্সটি দেখে এই গল্প শুনলুম।

যাদুঘর থেকে বেরিয়ে দেখলুম, রৌদ্র বেশ তীব্র হয়েছে। মনোরঞ্জন বলল : আর দেরি করা উচিত নয়, ওঁরা অপেক্ষা করবেন।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে রিক্শায় তার পাশে উঠে বসলুম। সারনাথকে পিছনে ফেলে আসার সময় আমার মনে এল ধম্মপদের দুটি লাইন :

সব্বপাপসস অকরণং কুসলসস উপসম্পদা।
সচিত্তপরিযোদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং॥

কোন পাপ না করা, কুশল কাজ করা ও নিজের মনকে পবিত্র করা—এই হল বুদ্ধের অনুশাসন।

উনিশ

পরদিনই মনোরঞ্জনকে আমি বললুম : আমাকে ছুটি দাও।

কেন?

আমার আর ভাল লাগছে না।

কী হলে তোমার ভাল লাগবে তা জানি, কিন্তু সবাই তো বেহায়াপনা ভালবাসে না।

এই অভিযোগের কোন উত্তর দিতে ইচ্ছা হল না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মনোরঞ্জন বলল : সাবিত্রীকে আমি বলেছিলুম। কিন্তু সে বেচারীর দোষ কী! তুমি কথা না বললে সে গায়ে পড়ে কী বল[...] বল?

অভদ্র ইঙ্গিত! এই পরিবেশটাই আমার কা[...] অসভ্য বলে মনে হল। সহজ ভাবে যারা মেলামে[...] করতে জানে না, পরিচয় হবার আগেই যারা এক[...] সম্বন্ধের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সুস্থ মানুষকে পঙ্গু ক[...] দেয়, তারা বলে বেহায়াপনার কথা! সাবিত্রীর [...] আমার দুঃখ হল। ওই মেয়েটাই সবচেয়ে বেশী [...] পাচ্ছে। আনন্দ করতে বেরিয়ে ওকে অভিনয় কর[...] হচ্ছে।

স্বাতির কথা আমার মনে পড়ল। তাকে কোন[...] এই কষ্ট পেতে হয় নি। হাওড়া স্টেশনে তাকে আ[...] প্রথম দেখেছিলুম। ট্রেনের কামরায় হাতল ধরে দাঁড়ি[...] সে আমাকে দেখেছিল। তারপর চলতি ট্রেনে য[...] আমি উঠে পড়লুম, মামী বললেন, তোমার [...] স্বাতিকে বুঝি তুমি আগে দেখ নি গোপাল?

মাথা নেড়ে স্বীকার করলুম, দেখি নি।

স্বাতি বড় সপ্রতিভ, বলল, আমি কিন্তু গোপালদ[...] আগে দেখেছি। নতুন কলেজে উঠে কনভোকে[...] দেখতে এসেছি। মনে পড়ছে, গোপালদা এম. [...] ডিগ্রী নিলেন গোড়ার দিকে।

আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। সহজ হয়ে [...] সম্বন্ধ। এর পর আমাদের আর অভিনয় করবার দরক[...] হয় নি। মামীকেই এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হ[...] সত্যিকার কোন সম্বন্ধই ছিল না, তবু বলেছিলেন, স্ব[...] তোমার বোন। নারীর সঙ্গে পুরুষের তো মা বোনে[...] সম্বন্ধ। প্রিয়ার সম্বন্ধ জোর করে চাপিয়ে দিতে [...] সেটা প্রাকৃতিক নিয়মেই স্থাপিত হোক।

আমার মনে হল, এই অস্বস্তিকর পরিবেশে আ[...] কিছুতেই টিকতে পারব না। টিকতে হলে [...] পরিবেশকেই আমার সহজ করতে হবে। তারাপদ[...] বা তাঁর স্ত্রী আমাকে সাহায্য করবেন না, বাধা [...] মনোরঞ্জন। ভাবলুম, আমাকে পাঁচুরই সাহায্য নি[...] হবে। দুপুরের আহার সেরে তারা পাশের ঘরে শুয়ে[...] আমরাও শুয়েছিলুম এ-পাশের ঘরে। হঠাৎ উঠে [...] ডাকলুম : পাঁচু!

মনোরঞ্জনও চমকে উঠে বলল : কী হল ?

বললুম : পাঁচুকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব।

মনোরঞ্জন ক্যাল ক্যাল করে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

পাঁচু এসে জিজ্ঞাসা করল : আমাকে ডাকছেন ?

বললুম : গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবে ?

মাথা দুলিয়ে পাঁচু বলল : হ্যাঁ।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম, বললুম : চল।

ততক্ষণে মনোরঞ্জনও নিজেকে সামলে নিয়েছিল, বলল : দিদিকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

কী বললে ?

মনোরঞ্জন গম্ভীরভাবে বলল : দিনে দুপুরে বেহায়াপনা করো না।

পাঁচু ছুটে গিয়েছিল তার দিদিকে ডাকতে। কিন্তু সাবিত্রীর বদলে তারাপদবাবু বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মনোরঞ্জন উঠে বসল।

তারাপদবাবু উদ্বিগ্নভাবে বললেন : কী ব্যাপার ?

মনোরঞ্জন বলল : গোপাল গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাচ্ছে। বললুম, একা যাবে কেন, পাঁচু আর সাবিত্রীকে নিয়ে যাও।

নিশ্চিন্ত হয়ে তারাপদবাবু বললেন : ভালই তো, আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সাবিত্রী একটু দেরিতে এল। এই সময়ের মধ্যে আমার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি খেলে গেল। মনোরঞ্জনকে হেসে বললুম : তাহলে আসি।

উত্তরে মনোরঞ্জন একটা কটাক্ষ করল।

পথ চলতে চলতে পাঁচুকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : তুমি আমায় কী বলে ডাক ?

কিছু না।

কেন ?

মা বারণ করেছেন।

কী নামে আমাকে ডাকবে জান ? গোপালদা।

পাঁচু মুখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম : সবাই আমাকে গোপালদা বলে ডাকে।

পাঁচুর এ কথা বিশ্বাস হল না। সে তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করল : মা বকবেন না তো দিদি ?

সাবিত্রী খুব জড়োসড়ো ভাবে চলছিল। কোন রকমে সে বলল : জানি না।

জোর দিয়ে আমি বললুম : তোমার ভয় কি ? বলবে, গোপালদা বলেছে। আমার নাম করলেও কি মা বকবেন সাবিত্রী ?

অত্যন্ত সঙ্কোচে সাবিত্রী বলল : না।

শুনলে তো। আচ্ছা, এইবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে কী করবে বল ?

নৌকোয় উঠব।

দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছে একখানা নৌকো ভাড়া করে উঠে বসলুম। পাঁচু আমার পাশে বসল, সাবিত্রী একটু দূরে। মাঝিকে বললুম : রাজঘাটের দিকে চল। বরুণার সঙ্গম দেখব।

পাঁচুর পুলক আর ধরে না। বলল : আপনার সঙ্গে আমি রোজ বেড়াব গোপালদা।

সাবিত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : তোমার কেমন লাগছে ?

সাবিত্রী বলল : ভাল।

হেসে বললুম : তোমার ভয় কি এখনও ভাঙল না ?

ভয় কিসের ! আমি তো ভয় পাই নি।

তবে এমন চুপচাপ কেন ?

পাঁচু বলল : আপনার সামনে দিদি অমন গম্ভীর হয়ে আছে। নইলে—

নইলে কী ?

বলব দিদি ?

আমি বললুম : বাড়িতে বুঝি খুব হুড়োহুড়ি করে ?

পরিমলদার সঙ্গে।

পরিমলদা কে তা আমি জানতে চাইলুম না। বললুম : হুড়োহুড়ি করতে আমারও খুব ভাল লাগে।

সাবিত্রী বলল : শুনেছি, আপনি বেড়াতে খুব ভালবাসেন।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে আমি পাঁচুকে বললুম : তুমি নৌকো বাইতে পার ?

পারি না, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে করে।

তবে তুমি ওইখানে বসে দেখ। আর তুমি এস এইখানে।

বলে সাবিত্রীকে নিজের পাশে ডেকে নিলুম। পাঁচু উঠে গিয়ে মাঝিকে দেখতে লাগল মন দিয়ে।

এইবারে আমি সাবিত্রীকে বললুম: আমার কথা আর কিছু শোন নি?

শুনেছি।—বলে সাবিত্রী ইতস্তত করতে লাগল।

বললুম: বল না, কী শুনেছ।

আপনার মামা-মামীর সঙ্গে আপনি বেড়াতে যান।

আর সঙ্গে স্বাতি থাকে। তোমার চেয়ে বয়সে সে বড়।

শুনেছি।

আসল কথাটিই শোন নি।

সাবিত্রী আমার মুখের দিকে তাকাল।

খুব আস্তে আস্তে বললুম: স্বাতি আমাকে ভালবাসে।

আর আপনি?

আমি তাকে বিয়ে করব ভেবেছি।

খুব ভাল।

কেন বল তো?

আপনি কাউকে বলবেন না তো?

না।

ওই পরিমলদাও আমাকে ভালবাসে।

আর তুমি?

পরিমলদা বামুন নয় বলে বাবা-মা ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না।

ঠিক আছে। এখন থেকে আমি তোমাকে সাহায্য করব।

কিন্তু—

তুমি ভাবছ কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাঁচু তখন মাঝির সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে। বলছে: এবারে আমাকে একটু নৌকো বাইতে দাও।

সাবিত্রী বলল: সাবধান পাঁচু।

আমার দিকে ফিরে বলল: আপনি ওকে শাসন করুন গোপালদা, ভারি দস্যি ছেলে।

মেয়েটিও যে দস্যি দেখছি।

সাবিত্রী এবারে হাসল। এমন সহজ স্মিত হাসি আমি অনেকদিন পরে দেখলুম।

ধর্মশালায় ফেরার পথে সাবিত্রীকে আমি ডাকলুম: ঘুগনি খেতে তোমার কেমন লাগে?

সাবিত্রী একটা মুখভঙ্গি করে বলল: খাওয়া গোপালদা?—বলে দুধারে দেখতে লাগল।

পাঁচু বলল: লুকিয়ে লুকিয়ে দিদি আলুকাব খায় গোপালদা।

তবে তো আমাদেরও খেতে হবে।

খুঁজেপেতে আমরাও একটা দোকানে বসে গেলুম।

সেখানে দইবড়াও আছে। সাবিত্রী জিভের এ শব্দ করে বলল: জমবে ভাল।

বললুম: ওই মাখামাখিটা আমার ভাল লাগে। ফুচকা গোলগাপ্পা আছে? নেই! তবে এদের দই আর ঘুগনি দাও, আমাকে শুধু ঘুগনি।

পাঁচু বলল: দইবড়া আমারও ভাল লাগে না।

সাবিত্রী বলল: ইস, কী রসে বঞ্চিত আপনা গোপালদা!

আমার মনে পড়ল, রামেশ্বরেও আমরা এব দোকানে বসেছিলুম। আমি আর স্বাতি। কফির স বড়া ভাজা খেয়েছিলুম তেঁতুলগোলা জল দিয়ে। স্বা জিজ্ঞাসা করেছিল, এরা আলুকাবলি খায় না, ঘুগ আর ফুচকা? আমি বলেছিলুম, তোমার মত পার্টনা পেলে তারই একটা দোকান খুলতুম এখানে। আড়চোখে চেয়ে স্বাতি জবাব দিয়েছিল, রাস্তার মত আস্বাদ কে কিছুতেই হয় না।

এসব রসিকতা সাবিত্রীর সঙ্গে চলবে না। স্বাতির চেয়ে সে বয়সে ছোট, বুদ্ধিতেও ছোট মানুষ। মনোরঞ্জনের কাছে শুনেছি, সে স্কুলের পরীক্ষা পাস করে কিছুদিন কলেজে গিয়েছিল। এখন কলেজ ছেড়ে বাড়িতে বসে আছে। স্বেচ্ছায় ছেড়েছে, না ছাড়িয়ে আনা হয়েছে, তা জানা নেই। এর পিছনে পরিমলদের ফস্টিনস্টিও থাকতে পারে। বাপ-মা তাই প্রবল উৎসাহে বিবাহের চেষ্টা করছেন। সাবিত্রীকে আমার সঙ্গে তাঁরা কেন ছেড়েছেন, তা বুঝতে পারি। শুধু মনোরঞ্জনের কথায় ও পাঁচুর ভরসায় নয়, কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার আশাতেও বটে। কিন্তু আমাদের এই ব্যবস্থার খবর তাঁরা বুঝবেন না, চট করে জানতেও পারবেন না। পরে যখন টের পাবেন, তখন অভিশাপ দেবেন আমাকে, আর সাবিত্রীর নিগ্রহ সে নিজে বুঝবে।

দইবড়ায় কামড় দিয়ে সাবিত্রী বলল : আপনি হঠাৎ [illegible]র হয়ে গেলেন ?

বললুম : এর পরে কী করা যায় ভাবছি।

পাঁচু বলল : এর পরে পান খাব।

একটা নয়, দুঠো করে আমরা পান খেলুম। কাশীর [illegible] পান সত্যিই উপাদেয়। পানের রঙ হলদে, পাকা [illegible]নের মত। মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়, শুধু সুগন্ধি [illegible]লার গন্ধে মন ভরপুর হয়ে থাকে। ঠোঁট লাল [illegible]রে আমরা ধর্মশালায় ফিরলুম।

কুড়ি

কাশী চষে ফেলতে আমাদের বেশীদিন সময় লাগল [illegible]। একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমরা দুন এক্সপ্রেসে [illegible]ঠে বসলুম। দেরাদুনগামী দুন এক্সপ্রেস বেলা [illegible]ায় এগারটার সময় বেনারস ছাড়ে। সকাল সকাল [illegible]য়ে আমরা ট্রেন ধরেছিলুম। এবারে আর আলাদা [illegible]াড়িতে নয়, মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে এক গাড়িতে [illegible]ঠেছিলুম। কোণার দিকটা ওঁদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে [illegible]নোরঞ্জনের সঙ্গে আমি একটু দূরে বসেছিলুম।

মনোরঞ্জনের মেজাজ ভাল ছিল না। ভৃগুর সন্ধান [illegible]াওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক বলেছেন যে শাস্ত্রীজী এখন দিল্লীতে আছেন, মাঝে মাঝেই যান এবং থাকেন নিউ দিল্লীতে কোন শিষ্যের বাড়িতে। শুধু এম. পি. [illegible]য়, মন্ত্রীদের মধ্যেও অনেকে তাঁর শিষ্য হয়েছেন। [illegible]রকারী কোন কাজ হাঁসিলের দরকার থাকলে মন্ত্রীর [illegible]দলে শাস্ত্রীজীকে ধরলেই হবে। দিল্লীতে এখন তাঁর [illegible]বল প্রতিপত্তি।

কবে ফিরবেন ?

কোন ঠিক নেই।

হরিদ্বারে মাঝে মাঝে যান শুনেছি।

আগে যেতেন, এখন যান কিনা জানি না।

তারপর মনোরঞ্জন ভৃগুর গণনার সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছিল। ভদ্রলোক বলেছিলেন : গণনা আমি জানি না, তবে কী করেন জানি। ওই কাগজপত্র আমার থাকলে আমিও জ্যোতিষী হতে পারতুম।

কী রকম ?

অনেক প্রাচীন কাগজপত্র আছে, ভৃগুর গণনা। অনেকে এই ভৃগুকে আমাদের প্রাচীন ঋষি ভৃগু বলে মনে করেন। তা ভুল। অনেক পরবর্তীকালে ভৃগু একজন ক্ষমতাশালী জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁর গণনার কোন পদ্ধতি নেই। তিনি নিজে কোন কায়দায় গণনা করে ঠিকুজি তৈরি করেছিলেন। জন্ম রাশি নক্ষত্র মিলিয়ে এক-একজনের এক এক ঠিকুজি। শুনে আশ্চর্য হবেন যে তিনি প্রত্যেকটি জাতকের ঠিকুজি তৈরি করে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোন জ্যোতিষীর কাছে সমস্ত ঠিকুজি পাওয়া যায় না। যে কখানা আছে জ্যোতিষীরা তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছেন।

বাকি লোকের কী হয় ?

জাল জালিয়াতি।

মানে ?

নেই, এ কথা তো বলা যায় না। তাই নিজেদেরই তৈরি করে রাখতে হয়েছে। সেগুলো মেলে না। আসল ভৃগু যার পাওয়া যায়, তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা মিলে যায়।

আমরা দুজনেই কৌতূহলী হয়েছিলুম।

ভদ্রলোক বললেন : আপনি আপনার ঠিকুজি নিয়ে আসবেন। জন্ম রাশি নক্ষত্র মিলিয়ে আপনার সঠিক কাগজখানি যদি পাওয়া যায় তো শাস্ত্রীজী তা আপনাকে পড়ে শোনাবেন। আর আপনি আপনার জীবনের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে যাবেন। আপনার অতীত মিলবে, বর্তমান মিলবে, তখন আপনি আপনার ভবিষ্যৎ লিখে নেবেন। আপনার মৃত্যুর তারিখ বার সময় পর্যন্ত লেখা আছে।

কী করে তা সম্ভব ?

অসম্ভব কিছুই নয়। গ্রহনক্ষত্রের একরকম সমাবেশ কয়েক হাজার বছর পরে হয়। কাজেই ওই কাগজটি একজনের জন্যে তৈরি, অথবা একসময়ে জন্মেছে এমন অনেক লোকের জন্যে। একটা গল্প বলি, তাহলেই ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারবেন।

কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন শাস্ত্রীজীর কাছে। সেদিন আমি তাঁর বৈঠকখানায় ছিলুম। কয়েক-

দিন ধরে খুঁজেপেতে শাস্ত্রীজী ঠিক কাগজখানি বার করে রেখেছিলেন। ভদ্রলোক আসতেই শাস্ত্রীজী পড়তে শুরু করলেন। সাধারণ ঘরের ছেলে, লেখাপড়ায় খুব তীক্ষ্ণ মেধাবী, পরিশ্রমী, জীবনে উন্নতি করবেন, আবার রাজার সঙ্গে বিবাদের জন্যে জেল খাটবেন। খুঁটিনাটি অনেক কিছু বলছিলেন, সেগুলো মিলছে কি মিলছে না তা সেই ভদ্রলোকই বুঝছেন। হঠাৎ আমরা শুনে চমকে উঠলুম যে এই জাতক নিজেই রাজা হয়েছেন। কত বছর কত মাস, কত সাল কত তারিখ। কিন্তু আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই আর এক ভদ্রলোক এসে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাইরে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে আগন্তুক চলে গেলেন ও ভদ্রলোক আবার ভিতরে এসে কপাসে বসলেন। শাস্ত্রীজী পড়লেন যে এই পর্যন্ত পড়বার পরে যদি কোন রাজপুরুষ এসে কোন জরুরী রাজকার্যের জন্য পড়ায় বাধা সৃষ্টি করেন তবে বাকি অংশটুকুও পড়তে পারেন। শাস্ত্রীজী সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন, আর ভদ্রলোক সংক্ষেপে অনুরোধ করলেন, পড়ুন।

মনোরঞ্জন তাঁকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ভদ্রলোক কোথাকার রাজা?

বলছি। তার আগে আরও একটু শুনুন।

বলুন।

শাস্ত্রীজী পড়লেন, রাজ-সম্মান ও রাজকার্য জাতকের ভাল লাগবে না। বিদ্যানুরাগ তাঁর মানসিক শান্তির অন্তরায় হবে। অনেক বিচার-বিবেচনার পর তিনি স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করবেন। এই ঘটনারও সময় তারিখ দেওয়া আছে।

মনোরঞ্জন বলল : এইবারে ভদ্রলোকের পরিচয় দিন।

ভদ্রলোক নিজে তাঁর পরিচয় দেন নি, শাস্ত্রীজীর প্রণামী দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমরা চেষ্টা করে জেনেছিলুম যে তিনি একটি প্রদেশের রাজ্যপাল।

একটি নাম আমার মুখে এসেছিল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার আগেই ভদ্রলোক বললেন : তাঁর নাম আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। শুধু জেনে রাখুন যে কিছুদিন পরেই খবরের কাগজে তাঁর গদিত্যাগের খবর পড়ে অভিভূত হয়েছিলাম।

মনোরঞ্জন বলল : সত্যি বলছেন?

আমি সত্যি বলছি, কিন্তু ভদ্রলোকের পরিচয় যদি মিথ্যা জেনে থাকি তো অপরাধ নেবেন না।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে মনোরঞ্জন বলল : এখানে কতদিন অপেক্ষা করলে শাস্ত্রীজীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে?

বলতে পারি না।

আমরা কাল হরিদ্বার যাব ভাবছি। সেখানেই কি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব?

সেখানেই এ খোঁজ নেবেন।

মনোরঞ্জন নাছোড়বান্দা, বলল : আপনি কী পরামর্শ দেন?

আমার পরামর্শ। খুব বেশী দরকার থাকলে দিল্লীই চলে যান। কিংবা—

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মনোরঞ্জন বলল : বলুন।

দেশে ফেরার পথে এইখানে একবার খোঁজ নিয়ে যাবেন।

ভেবে দেখি বলে মনোরঞ্জন তাঁর কাছে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু কী করবে এখনও স্থির করতে পারে নি বলে মেজাজ অপ্রসন্ন আছে। হঠাৎ আমার উপরেই ক্ষেপে উঠল, বলল : তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

প্রশ্ন করলুম : কিসে বাড়াবাড়ি দেখলে?

দুদিন আগে যখন কথা বলছিলে না তখন একেবারে মৌনীবাবা, এখন তোমার বেহায়াপনা দেখে আমাদের লজ্জা করছে।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে আমি হাসলুম।

হাসছ কোন্ আক্কেলে!

আজ মেজাজ এমন খারাপ কেন?

দেশে তোমাকে চিনতে পারলে এমন কাজ আমি করতুম না।

গম্ভীর ভাবে বললুম : এখন চিনেছ তো, সাবধান হবার সময় যায় নি।

মনোরঞ্জন বলল : নাকটা যে কাটা গেল!

সে তো নিজেই কেটেছ। আমাকে না জানিয়ে তোমরা এতবড় ষড়যন্ত্র করলে, আর এখন দোষ হল আমার।

মনোরঞ্জনের রাগ বোধ হয় খানিকটা পড়ল, বলল : টু রয়ে-সয়ে এগোতে হয়।

বললুম : সময়মত শেখাবে তো সব।

দেখ, এখন আমি তোমার গুরুজন। আমার সামনে মার একটু সমঝে চলা উচিত। আর সাবিত্রীকেও কথা জানিয়ে দিয়ো।

যে আজ্ঞে।

মনোরঞ্জনের এখন আত্মপ্রসাদের অন্ত নেই। সে র কৌশল সার্থক হয়েছে ভেবে পুলকিত। তারাপদবাবু তাঁর স্ত্রীকেও প্রফুল্ল দেখছি। মেয়ের একটা গতি হবে যে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সাবিত্রীও সব বুঝতে রেছে, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করে নি। প্রকাশ করা র পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। শুধু আমার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হেসেছে। মনোরঞ্জন তার এ হাসিটিও পেছে, এবং তার আত্মপ্রসাদ বেড়েছে।

এইবারে আমি মনোরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলুম : মেজাজটা খারাপ হয়েছিল কেন ?

সে তুমি বুঝবে না।

বোঝবার খুব চেষ্টা করব।

আমাদের দিল্লী যাওয়া কেন অসম্ভব বলতে পার ?

পারি।

মনোরঞ্জন সোজা হয়ে বলল : পার বলতে ?

হেসে বললুম : শাস্ত্রীর বদলে যদি স্বাতির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় !

মনোরঞ্জন বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : দেখা হবেই। দিল্লী যাব, অথচ স্বাতির সঙ্গে দেখা হবে না, এ একটা কথা হল !

মনোরঞ্জন বিব্রত ভাবে বলল : তুমি কি ভৃগুর গণনা শিখলে নাকি !

তারপরেই খাঁজিয়ে উঠল : তোমার কি লজ্জা সরম নেই ! এ পর্যন্ত কতবার লাথি খেলে বল তো ?

মাত্র [illegible]কয়েক। কিন্তু তাতে পিছিয়ে এলে আমার পৌরুষটা রইল কোথায় !

কী বলছ তুমি !

ঠিকই বলছি। দিল্লীতে তোমার সঙ্গে চাওলার পরিচয় করিয়ে দেব, সে মিত্রার কাছে অন্ততঃ হাজার বার লাথি খেয়েছে, এখনও তার আশা ছাড়ে নি। আমার মনে হয় আশা ছাড়বার আর দরকার নেই। অগ্নি-পরীক্ষায় চাওলা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মিত্রার কথাগুলি আমি আজও ভুলি নি, কোনদিন ভুলব না। এমন স্পষ্টবাদী মেয়ে আমি বোধ হয় কোনদিন দেখি নি। গোড়া থেকেই আমি এ কথা অনুভব করেছিলুম। সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করেছিলুম সেই দিন যেদিন ওখলায় আমার পাশে বসে বলেছিল, চাওলাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

কেন জানি না, সেই মুহূর্তে মিত্রাকে আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে এমন অকপটে মেলে ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। কোন স্বল্পপরিচিত পুরুষ তাকে নির্লজ্জ ভাববে, এ তো ভয়েরই কথা। মিত্রা ভয়কে জয় করেছে, সংস্কারকে উপেক্ষা করছে। তাকে আমার ভাল লাগল। বললুম, ভালই যখন বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কী ?

মিত্রা বলল, তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটেকুড়নীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যের দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

চাওলার পরিচয় আমি খানিকটা পেয়েছিলুম। মিত্রা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। তাই সেদিন প্রতিবাদ করি নি।

আর একদিন চাওলার কাছে শুনেছিলুম মিত্রার কথা। বলেছিল, প্রেমে পড়ে প্রথমে আমি ভাবতুম, সামান্য মেয়ে সে নয়। সে অসামান্যা।

জিজ্ঞেস করেছিলুম, এখন কি তোমার মত বদলেছে ?

কেন বদলাবে না ! চোখে তো আর রঙীন ঠুলি নেই ! মোহ ভাঙতেই খাঁটি রূপটা দেখতে পেয়েছি।

তবু তো তাকে ভালবাস !

ভালবাসা বলতে তুমি কী বোঝ জানি না। কিন্তু

আমি যা বুঝি মিত্রা তা স্বীকার করে না। আমি ভালবাসতে চাই একটি মেয়েকে। কিন্তু যাকে ভালবাসব তাকে চাই আমার সমস্ত অধিকারের মধ্যে। দুনিয়ায় আর কেউ তার ওপর কোন দাবি রাখতে পারবে না।

বললুম, সাবাস! এই তো পুরুষের ভালবাসা। আদিম যুগ থেকে আজও পর্যন্ত একেই তো আমরা শ্রদ্ধা করে আসছি।

কিন্তু তুমি শ্রদ্ধা করলে কী হবে। যে শ্রদ্ধা করলে আমার জীবনটা সার্থক হত, সে তো অন্য কথা বলে। সে মেয়ে ভাবে যে ভালবাসলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে ভালবেসেও কুমারী থাকা চলে। বন্ধুকেও তো লোক ভালবাসে!

সত্যিই তো, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কি শুধু স্বামী-স্ত্রীর।

চাওলা বোধ হয় চটে উঠল, বলল: এ সব তত্ত্বকথা বলতে বেশ লাগে। যে ভোগে, সেই বোঝে। আমিও তো রইলাম, দেখব, এ সব কথা তোমার কতদিন ভাল লাগে।

পরে একদিন স্বীকার করেছিল, মিত্রার আশা আমি আজও ছাড়ি নি।

অনেকদিন পরে, আবু পাহাড়ে আবার তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দুজনে বেড়াতে এসেছিল। তারপর তাদের খবর আর জানি নে।

মনোরঞ্জন বলল: তুমি কি চাওলার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে?

ভৃগুর সাক্ষাৎ পেলে কারও পদাঙ্ক অনুসরণের দরকার থাকবে না।

মনোরঞ্জন চিন্তিত হল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

আমি জানি, মিত্রা ও চাওলার বিবাদ একদিন মিটে যাবে। মিটবেই। তাদের বিবাদে কোন সামাজিক বর্ণভেদ নেই, প্রভেদ শুধু মতের। একটা কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করে মনের মিলকে তারা দূরে ঠেলে রাখছে। মিত্রার পিতা মিস্টার ব্যানার্জি কোনদিন তাদের বিবাহের অন্তরায় হতে পারবেন না। তাঁর কঠিনতম আপত্তি উপেক্ষা করে মিত্রা চাওলাকে বিবাহ করতে পারে, মিত্রার চরিত্রে সেই বলিষ্ঠতা আছে। মিস্টার ব্যানার্জি যে এ বিবাহে রাজী হতে পারবেন না, তা তারা দুজনা জানে। পরীক্ষায় চাওলা তাঁর কাছে ফেল হয়ে গেছে। এ গল্প আমি চাওলার মুখেই শুনেছি।

একদিন বলেছিল, এই ধর না আমার কথা। কেউ বলে, আমার লাখ নয় কোটি টাকার কারবার, খামকা এমন নেংটি সেজে। আবার আর একদল বলে যে সবটুকুই আমার চাল, আসলে সব গড়ের মাঠ। প্রেমের ব্যাপারেও আমি কাঁচা ছিলুম।

বলে সংক্ষেপে গল্পটা বলল: মিস ব্যানার্জির সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গ হবার পর হঠাৎ একদিন মনে হল, মেয়েটি আমায় ভালবাসে। মনে হতেই নিজেকে হিরো বানিয়ে তুললুম। ঝোঁকের মাথায় একখানা গাড়িও কিনে ফেললুম। কিন্তু হলে হবে কী! ঝানু আই. সি. এস. আমাদের সিনিয়ার ব্যানার্জি। ঝপ করে একদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়ে বসলেন। বললেন, বড় দরকার, যতটা দিতে পার ততটাই কাজে লাগবে। ধারকর্জ করে বাপের কাছে চেয়ে কি আর কিছু দিতে পারতুম না, কিন্তু পিছিয়ে এলুম। একটা মেয়ের লোভে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করব! পরে জানতে পেরেছিলুম, বুড়ো আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের খোঁজ নিয়েছিলেন এমনই করে।

হাসতে হাসতেই চাওলা যোগ করেছিল, বুড়োর ধারণা, পয়সাওয়ালা ছেলে প্রেমে পড়লে টাকা ধার করবেই, আর ধারকর্জ করে দিলে ছেলেটা খাঁটি বুঝবে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, মেয়ে কী বলে?

চাওলা চমকে উঠে বলেছিল, তার মনের কথা জানতে পারি, এমন সাধ্য নেই আমার। তবে বিয়ে করতে রাজী হলে বুঝতুম। খাঁটি জিনিস পেয়েছি। মিত্রা কখনও মিথ্যে বলবে না।

চাওলার দু চোখে যে শ্রদ্ধার আভাস দেখেছিলুম, তাও মনে পড়ল।

স্বাতির সম্বন্ধেও কি আমার এমনই শ্রদ্ধা আছে! আমিও কি তাকে খাঁটি জিনিস ভাবি! তবে সে কেন জো রায়ের মত একটা অপদার্থকে বিয়ে করতে রাজী হল! ভৃগুর জন্য যদি দিল্লী যাই তো স্বাতিকে এই কথা আমি জিজ্ঞাসা করব।

[ক্রমশঃ

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ কাব্যভাষ্য

॥ প্রেমচেতনা ঃ পঞ্চম অধ্যায় ॥

॥ কাদম্বরী ঃ ধ্রুবতারা ॥

১

মানুষের চেতনার নানা স্তর। অতিসূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মহাকবি রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনাও যে নানা স্তরে বিন্যস্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। 'পত্রপুটে'র পনেরো-সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমচেতনার দুটি ধারার কথা বলেছেন,—

> একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
> প্রিয়ার মধুর রূপে।
> এল সুর দিতে আমার গানে,
> নাচ দিতে আমার ছন্দে,
> সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।
>
> • • •
>
> ভালোবেসেছি তাকে।
> সেই ভালোবাসার একটা ধারা
> ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
> গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
> অল্পবেগের সেই প্রবাহ
> বয়ে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
> অস্বচ্ছ তটচ্ছায়ায়।
>
> • • •
>
> আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
> মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
> মহীয়সী নারী স্নান ক'রে উঠেছে
> তারি অতল থেকে।
> সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
> আমার সর্বদেহে-মনে,
> পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
> জেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
> চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

রবীন্দ্রচিত্তে কাদম্বরী-চেতনা দ্বিতীয় ধারার দ্যোতক। তা মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী। কবির সর্বদেহে-মনে তার আবির্ভাব অপরিসীম ধ্যানরূপে। কবির চেতনার নিভৃত গভীরে জেলে রেখেছে চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

'চেতনার নিভৃত গভীরে'র বাগ্‌ভঙ্গিটি এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত। জ্যাক মারিতাঁ তাঁর 'Creative Intuition in Art and Poetry' গ্রন্থে বলেছেন, "The creative emotion of minor poets is born in a flimsy twilight and at a comparatively superficial level of the soul. Great poets descend into the creative night and touch the deep waters over which it

reigns. Poets of genius have their dwelling place in this night and never leave the shores of these deep waters."[১]

অর্থাৎ সাধারণ কবিরা আত্মার অপেক্ষাকৃত অগভীর স্তরে চেতনা-গোধূলির আলো-আঁধারি লীলায় তাঁদের কাব্য রচনা করেন। মহাকবিরা সৃষ্টির নিশীথ-অন্ধকারে তলিয়ে যান এবং চেতনার অতল প্রবাহে অবগাহন করেন। কথাটা সত্য, অথচ সর্বাংশে সত্যও নয়। সাধারণ কবিরা আত্মার অতল গভীরে তলিয়ে যেতে পারেন না, এ কথা অবশ্যই সত্য; কিন্তু মহাকবিরা সর্বদা সৃষ্টির নিশীথ-অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে চেতনার অতল প্রবাহে অনুক্ষণ নিমজ্জিত থাকেন—এ কথা সত্য নয়। মহাকবিদের চেতনারও নানা স্তর আছে। কখনও তাঁদের মানসলোকে গোধূলির আলো-আঁধারি লীলা, কখনও নিশীথের নিস্তরঙ্গ সৃষ্টি-অন্ধকার।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের "দিঘি" কবিতাটি স্মরণীয়। নিস্তব্ধ কবিমানসের আত্মার অতল গভীরতারই উপমান এই দিঘি। কবি বলছেন:

শেওলা-পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,
ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে।

দিঘির অতল জলে সকল-হারা দেশে পৌঁছে কবি বলছেন:

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গম্ভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধুলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন,
হঠাৎ থেমে তোমার 'পরে নত হয়ে প'ড়ে
দেখিছে দর্পণ।

আত্মার সৃজনলীলা বোঝাতে কবি ও দার্শনিকের দুটি রূপকল্প আশ্চর্যভাবে এক হয়ে গেছে। 'নিবিড় নিশীথ রাত্রি' এবং 'কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো শীতল জলরাশি' আর 'creative night' এবং 'deep waters over which it reigns' ভাব ও ব্যঞ্জনায় অবিকল এক। কিন্তু এই অবগাহন যে বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তেই সম্ভব, তার ইঙ্গিত রয়েছে "দিঘি"র অন্তিম স্তবকে। কবি বলছেন:

দিন ফুরাল রাত্রি এল, কাটল মাঝের বেলা
দিঘির কালো নীরে।

যদি বলা যায়, সৃষ্টির মুহূর্তগুলিই এই বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত, তাহলেও কবিমানস-রহস্যের সবটুকু বলা হয় না। মহৎ কবির চেতনারও কোন প্রবাহ 'গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মত,' আবার কোন প্রবাহ 'মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী'। কাদম্বরী-প্রেমেই রবীন্দ্র কবি-মানস আত্মার অতল গভীরতায় তলিয়ে যেতে পেরেছে। অন্যান্য প্রেমচেতনায় আছে গোধূলির আলো-আঁধারি প্রদেশে রোমান্স-রাগরঞ্জিত কবিচিত্তের বিচিত্র সফরী-লীলা। কলাকৃতি ও কাব্যরূপায়ণের দিক থেকে সেগুলির বর্ণাঢ্যতা নগণ্য নয়। জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে কবিমানসের চিরপুরাতন-বিরহমিলন-লীলা মধুস্বাদী কিন্তু প্রতিদিনের অস্বচ্ছ তটচ্ছায়ায় অল্পবেগের সে-প্রবাহ মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত বহন করে আনতে পারে নি।

তা ছাড়া কবির প্রেমচেতনা আত্মার গভীরে তলিয়ে গেলেই নব নব উপলব্ধি ও শিল্পসুন্দর জীবনবোধের ব্যঞ্জনা বহন করে আনে। কবির যে-প্রেমচেতনার সঙ্গে তাঁর সৌন্দর্য-চেতনা ও জীবনদেবতা-চেতনার সম্পর্ক রয়েছে সে প্রেমচেতনা কবির আত্মার নিভৃত-গভীরে জ্বেলে রেখেছে চিরবিরহের প্রদীপশিখা। আর এই চির বিরহী প্রেমের আলম্বন-স্বরূপিনী হলেন কাদম্বরী দেবী।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে রাখা কর্তব্য। যে প্রদীপশিখা কবির মানসমন্দিরে জ্বলছে তার আলোয় কাদম্বরী দেবীর মানবী-মূর্তিটি যেমন চির-উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তেমনি সেই আলোতেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর নব-নব সৌন্দর্যমূর্তি এবং অন্তর্যামী-রূপিণী দেবীমূর্তি

স্তের চেতনায় বেয়াত্রিচে কি ভাবে বিরাজমানা ছিলেন র কথা বলতে গিয়ে মারিত্তী বলছেন :

Symbolically transmuted as she may be, eatrice is never a symbol or an allegory for ante. She is both herself and what she gnifies.[২]

রবীন্দ্রনাথের বেয়াত্রিচেও একটি বিশেষ মানবী-র্তিতেই কবিমানসে চিরপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ই মূর্তিই দিব্য-এরসের অনুপ্রেরণায় কবির মানসসুন্দরী, লোসঙ্গিনী ও অন্তর্যামীর নব নব দিব্যকান্তিতে বার বার দেখা দিয়েছেন। তার ফলে কাদম্বরী দেবীর প্রতি একদিকে কবির অনুরাগ যেমন চিরদিনই প্রেমচেতনার বিচিত্র স্তরে নিত্যবিলসিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি তিনিই জগতের মাঝে' 'বিচিত্ররূপিণী', এবং 'অন্তর মাঝে 'তুমি একা একাকী' লীলা-সঙ্গিনী হয়ে কবি-চেতনাকে দেবানুভূতির নব নব ঘাটে বহন করে নিয়ে গেছেন।

২

আমরা অন্যত্র বলেছি, চেতনার স্তরভেদে কবির কাছে তাঁর নতুন বৌঠানের ছিল তিনটি সত্তা। অনুরক্ত ভক্তের কাছে তিনি ছিলেন দেবী, রসিক কবির প্রেমকল্পনায় তিনি রহঃসখী, আর তরুণ প্রেমিকের হৃদয়বাসনায় কৌতুকময়ী মানসসুন্দরী।[৩]

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে তাঁর কবিজীবনের যাত্রারম্ভ তিনখানি কাহিনীকাব্য দিয়ে—'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়'। এই কাহিনী-কাব্যত্রয়ে কাদম্বরী দেবী কি ভাবে কবিচিত্তকে অনুপ্রাণিত করেছেন তা বলা সহজ নয়। 'শৈশবসংগীতে'র গীতিকবিতাগুলিতেও তাঁর অলক্ষ্য চরণের আবির্ভাব দুর্নিরীক্ষ্য। কবির কুড়ি বৎসর বয়সে, 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৭ সালের কার্তিক মাস থেকে 'ভগ্নহৃদয়' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়ে'র "উপহার" কবিতাটিই কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে কবির প্রথম গীতিনৈবেদ্য নিবেদন। আসলে এটি একটি গান। ছায়ানট রাগিণীতে গেয়। এই গীতি-উৎসর্গটি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধার-যোগ্য—

> তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
> এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
> যেথা আমি যাই নাকো, তুমি বিরাজিত থাকো
> আকুল এ আঁখি 'পরে ঢাল' গো আলোকধারা।
> ও মু'খানি সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
> আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।
> কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
> অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।
> চরণে দিনু গো আনি— এ ভগ্ন-হৃদয়খানি
> চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।

এই গানটি ঈষৎ বদল করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।[৪] কাদম্বরী দেবীর প্রতি তরুণ কবির প্রথম হৃদয়ানুরাগ এই দেবীপূজার আকারেই প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে যে-ভাবানুষঙ্গগুলি পাওয়া যাবে তা হল : ১ কাদম্বরী দেবীই কবিজীবনের ধ্রুবতারা। ২ কবিমানসে তিনি নিত্য-বিরাজিতা। ৩ ওই মুখখানি তাঁর আঁধার-হৃদয়ে দেবী-প্রতিমার মত উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। ৪ কবির বিপথ-গামী চিত্ত ওই মুখখানি দেখে শরমে সারা হয়। ৫ কবির হৃদয়-শোণিত-ধারায় তাঁর চরণ রঞ্জিত হবে।—এই ভাবানুষঙ্গগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন এই জন্যে যে, কবিমানসে কাদম্বরী দেবীর মানবীমূর্তি থেকে দেবীমূর্তিতে বিবর্তনের আলোচনা-প্রসঙ্গে এগুলির কথা স্মরণ করা প্রয়োজন হবে।

এই গানটি ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত হওয়ায় 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কবি নূতন উপহার-কবিতা রচনা করেন। উক্ত "উপহারে"র প্রথম দুটি স্তবকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা প্রয়োজন। কবি বলছেন :

> হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
> ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
> বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায় শুকায়ে যাক্,
> ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায় ;
> বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
> ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়।

জীবন-সমুদ্রে তব জীবন তটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর,
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি,
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ, জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

বলাই বাহুল্য, এই কবিতাটিও দেবীপূজা। কবি-কিশোরের হৃদয়ের বনে বনে শত শত কাব্যের সূর্যমুখী ওই মুখপানে চেয়েই ফুটে উঠেছে। এখানে কাদম্বরী দেবী কবির কাছে জ্যোতির্ময়ী সাবিত্রী। দ্বিতীয় স্তবকে বলা হয়েছে, কবি তাঁর জীবন-তটিনীকে তাঁরই জীবন-সমুদ্রে আনন্দে বিভোর হয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন। কেউ জানুক আর না-ই জানুক, কবিজীবনের প্রতিটি ভাবতরঙ্গ তাঁরই চরণে গিয়ে মিশবে এবং বিরাম লাভ করবে। এই 'পরানুরক্তি'র প্রতিশ্রুতি দিয়েই কবিভক্তের প্রথম দেবীবন্দনা উচ্চারিত হয়েছে।

৩

'ভগ্নহৃদয়ে' এই দুটি উপহার-কবিতার পরে তরুণ কবির যে কাব্যসংকলনের সঙ্গে কাদম্বরী দেবী ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, সে কাব্যসংকলনের নাম 'সন্ধ্যাসংগীত'। রচনাবলী সংস্করণে 'কবির মন্তব্যে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সন্ধ্যাসংগীতেই তাঁর কাব্যের প্রথম পরিচয়। সন্ধ্যা-সংগীতের কবিতাই 'প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে' কবিকে আনন্দ দিয়েছিল। "সে উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।"

'সন্ধ্যাসংগীত' কবির একবিংশবর্ষ বয়সের কাব্য। চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে বসে এর বেশির ভাগ কবিতা রচিত হয়। শেষদিকের কিছু কবিতা লেখা হয়েছিল চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে জ্যোতিদাদার বাসায় বসে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র দোসর হল "বিবিধ প্রসঙ্গ"। প্রথম খণ্ডে আমরা বলেছি, "বিবিধ প্রসঙ্গ" 'সন্ধ্যাসংগীতে'-পর্বের কবিমানসের কড়চা। 'সন্ধ্যাসংগীতে' যে মান-অভিমান রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্বে কবিচিত্ত আন্দোলিত হয়েছে "বিবিধ প্রসঙ্গ" যেন তারই সহজবোধ্য গদ্যভাষ্য। আমরা আরও বলেছি, চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে কাদম্বরী দেবীর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ ও সান্নিধ্যের মধ্যে তাঁরই অনুরক্ত ভক্তকবির চিত্তে নবযৌবনের যে বিচিত্র ভাবরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল "বিবিধ প্রসঙ্গে" রয়েছে তারই আলোছায়ার লীলা।[৫]

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে এই সময়কার তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, এ যেন মনের রাজ্যে বসন্ত সমাগম। বলেছেন :

"মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম—মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটি উত্তেজনা।"[৬]

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র "সমাপনে"র সর্বশেষ অনুচ্ছেদটিকে আমরা গ্রন্থের উৎসর্গপত্র বলেছি। এই উৎসর্গপত্রটি কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে লেখা। কবি বলছেন, "আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে। * * * এই লেখাগুলির মধ্যে কিছুদিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আরেক লেখা আর সকলে পড়িবে।"[৭]

এই কথাগুলিকে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র ব্যাখ্যার মূলসূত্র হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। কেন না, কবির সাক্ষ্য অনুসারেই[৮] 'বিবিধ প্রসঙ্গ' 'সন্ধ্যাসংগীতে'র দোসর একুশ বৎসর বয়সে কবির মানসলোকে বসন্ত-সমাগমে প্রস্ফুটিত যুগল-পলাশ।

কবি 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতাগুলিকে কাঁচা আমের

তুলনা করেছেন। বলেছেন, "তাকে আমের
লের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির
, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা
রেছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি, তাই তার দাম
।"[৯]

'জীবনস্মৃতি'তে "সন্ধ্যাসংগীতে"র আলোচনা প্রসঙ্গে
ও বলেছেন, "এখন হইতে কাব্যসমালোচকদের মধ্যে
মার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে, আমি
ভাঙা-ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি। সমস্তই
মার ধোঁয়া-ধোঁয়া, ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন
মার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক-না কেন, তাহা
মূলক নহে।"[১০]

মূলক নয় বলেই, কবি ভাঙা-ভাঙা ছন্দে আধো-
আধো ভাষায় ধোঁয়া-ধোঁয়া ছায়া-ছায়া যে ভাবগুলিকে
কাশ করেছেন তার মধ্যে তাঁর হৃদয়ের একটি বিশেষ
বস্থার বিশেষ পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে বলেই, তিনি
ন্ধ্যাসংগীতে' তাঁর স্বকীয় কবিতার রূপ দেখে আনন্দিত
য়েছিলেন। সেগুলি উৎকৃষ্ট না হতে পারে, কিন্তু
গুলি তাঁর নিজেরই বটে। তাই 'জীবনস্মৃতি'তে
লেছেন:

"যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, কারণ
তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থার সত্য—তেমনি
কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে
কাব্যসাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ করা হয়।
হৃদয়ের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একটা আবেগ আসে
যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা।
সৃষ্টিপ্রকৃতিতে তাহা সত্য সুতরাং তাহার প্রকাশকে
মিথ্যা বলিব কী করিয়া। এরূপ কবিতার মূল্য নাই
বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া
তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে
কি অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, কাব্যের ভিতর দিয়া
মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা
করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয়
যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে
কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়—ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে
ফেলিয়া দিয়া থাকে।"[১১]

'সন্ধ্যাসংগীতে' রবীন্দ্র-কবিহৃদয়ের একটা বিশেষ
অবস্থার একটা বিশেষ পরিচয়ই ব্যক্ত হয়েছে। আর,
বলাই বাহুল্য, 'বনফুল'-'কবিকাহিনী'-'ভগ্নহৃদয়ে' কাহিনী-
কাব্যের মাধ্যমে নিজের কবিস্বপ্নশিহরিত নবীনা-
কৈশোরের প্রেমচেতনাকে ভাষা দিয়ে প্রথমযৌবনারম্ভে
কবি গীতিকবিতার আকারে প্রথমপুরুষের বাচনিকে
হৃদয়ের যে বিশেষ অবস্থাটিকে ভাষা দিলেন আলংকারিক
পরিভাষায় তার নাম পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভ। অপ্রাপ্তির
বেদনাই তার মূল সুর। প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে রবীন্দ্র-
নাথ যাকে বলেছেন 'অব্যক্তের বেদনা', 'অপরিস্ফুটতার
ব্যাকুলতা', বিষয়ালম্বনের দিক দিয়ে তারই নাম অপ্রাপ্তির
দুঃখ। কবির প্রথম গীতিকাব্যসংকলন 'সন্ধ্যাসংগীত' যে
বিষণ্ণহৃদয়ের গান, তার মূল কারণ কবিচেতনার কেন্দ্রবর্তী
ওই অপ্রাপ্তি-জনিত বিষাদ। ওরই অন্য নাম ত্রৈশী
অসন্তোষ।

৪

মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে বসে লেখা "বিবিধ
প্রসঙ্গে"র প্রথম যে-প্রবন্ধটি ১২৮৮ সালের শ্রাবণের
'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম "মনের বাগান-
বাড়ি"। "বিবিধ প্রসঙ্গে"র মূল সুরটি ওর মধ্যেই
উচ্চারিত। ওই প্রবন্ধের প্রথমেই কবি বলছেন, "ভালবাসা
অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা
কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা
করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির,
সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।"[১২]

'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবি তাঁর হৃদয়ের দেবত্রভূমির মন্দিরে
যে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে প্রতিমার নাম
কাদম্বরী। তাঁর উদ্দেশ্যে বিরচিত কবির প্রথম হৃদয়-
সংগীতগুলি ওই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে গুঞ্জরিত।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র মূল সুরটি পাওয়া যাবে "হৃদয়ের
গীতিধ্বনি" কবিতায়। কবি বলছেন:

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস।

এ প্রাণের ভাঙা ভিতে শুদ্ধ দ্বিপ্রহরে,
ঘুঘু এক বসে বসে গায় এক স্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়!
গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায় হায়।

মনের দ্বারের কাছে এই 'বিষণ্ণ প্রাণী'র অনুক্ষণ উপস্থিতি এবং ঘুঘুর প্রতীকটি এখানে বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ। ঘরোয়া প্রেমের প্রতীক কপোত, কবিকল্পনায় মুক্তপ্রেমের প্রতীক হিসাবে দেখা দিয়েছে বনকপোত।

"অনুগ্রহ" কবিতায় সেদিনকার কবিমানসে বিলসিত বিপ্রলম্ভ-প্রেমের স্বরূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন:

ভালোবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মতো,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
• • •
দেয় যথা মহা পারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি গাহিয়া উঠে
আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।
• • •
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগত-ব্যাপী গান।
• • •
ভালোবাসা স্বাধীন মহান্,
ভালোবাসা পর্বত-সমান।
ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন;
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
সে চাহে উর্বর করিবারে;
জীবন করিতে প্রবাহিত,
কুসুম করিতে বিকশিত।

এই 'সমুদ্র-ভরা আনন্দ', এই 'জগত-ব্যাপী গান'ই তরুণ কবির সেই ভালবাসার যথার্থ রূপক। এ ভালবাসার উপমান পৃথিবীর প্রতি সূর্যের ভালবাসা। সে চায় উজ্জ্বল করতে, উর্বর করতে। জীবনকে প্রবাহিত করতে, কুসুমকে বিকশিত করতে। বলাই বাহুল্য, 'সন্ধ্যাসংগী'তে রবীন্দ্রনাথ নিজের পবিত্র-সুন্দর প্রেমের ভাষাটিকে খুঁজে পেয়েছেন। প্রেমের প্রেরণাসম্পৃক্ত স্বরূপটিকেও।

৫

আমরা বলেছি, 'সন্ধ্যাসংগীতে'র প্রেম বিপ্রলম্ভ পূর্বরাগের অপ্রাপ্তি-জনিত বিষণ্ণতায় একাধারে করুণ ও মধুর। তরুণ হৃদয়ের মাত্রাতিরেকী আবেগের তুঙ্গ যে অন্যপক্ষের অস্বস্তির কারণ, তারই আভাস পাওয়া যাবে "অসহ্য ভালোবাসা" কবিতায়।—

বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
কী ভাব তোমার মনে জাগে,
বুক-ফাটা প্রাণ-ফাটা মোর ভালোবাসা
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
এত ভালোবাসা বুঝি পার না সহিতে,
এত বুঝি পার না বহিতে।

কখনও নিজের অনুভূতির প্রতিদানে কিছু না পেয়ে কবি কাদম্বরী দেবীকে বলছেন পাষাণী। "পাষাণী" কবিতায় আছে:

তুমি নও, সে জন তো নও,
তবে তুমি কোথা হতে এলে?
এলে যদি এস তবে কাছে,
এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে,
একবার সব দিই ঢেলে,
তোমার সে কঠিন পরান
যদি তাহে এক তিল গলে,
কোমল হইয়া আসে মন
সিক্ত হয়ে অশ্রু জলে জলে!

এ অনুরাগে সন্নিকর্ষে যেমন অতৃপ্তি, বিচ্ছেদ-ব্যবধানেও তেমনি হাহাকার। "পরিত্যক্ত" কবিতায় এই হাহাকারই প্রতিধ্বনিত হয়েছে:

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।

শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার,
শুধু বলিতেছে
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল দলে গেল গো।"

প্রেম-বিচ্ছেদে মান-অভিমান-ভরা এই বেদনার আনন্দই ব্যক্ত হয়েছে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র এই কবিতাগুলিতে। প্রণয়ীয়াকে পাবার অভিলাষ ও উদ্বেগ, এবং পাওয়ার অতৃপ্তি ও বেদনাই তার মুখ্যচেতনা। কাব্যের শেষ কবিতাটির নাম "উপহার",—কাদম্বরীকে সমর্পিত। ওরই প্রথম স্তবকে কবিজীবনে সেই প্রেমের উদ্ভব কথাই উচ্চারিত হয়েছে। কবিহৃদয়ের দেবত্র-হৃদ মন্দিরে প্রেমপ্রতিমা প্রতিষ্ঠার কথা :

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে, শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

এই অপূর্ব-সুন্দর কাব্যাংশটুকু নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরে 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যখানি ছেকে "উপহার" ওই স্তবের ষোড়শ পঙ্‌ক্তিকে "দৃষ্টি" শিরোনামায় কবি স্থান দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসংকলন 'সঞ্চয়িতা'য়। 'সন্ধ্যাসংগীত' নামকরণের তাৎপর্যও ওর মধ্যে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। নিসর্গ-সন্ধ্যার বন্দনা করেই গ্রন্থখানির আরম্ভ। কিন্তু তার উপসংহারে দেখা দিয়েছে কবির মানস-সন্ধ্যার ধ্রুবতারাটি। কাদম্বরী দেবীর "সন্ধ্যাসম" আঁখি দুটির দৃষ্টিপাতেই কবির মানস-আকাশের তারা ফুটে উঠেছে। ওঁরই নয়নের দৃষ্টি দিয়ে কবি নিজের হৃদয়কেও দেখতে পেয়েছেন। প্রেমের আলোকে এই আত্মপরিচয়ই কবির প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয়ই তাঁর অন্তরতর পরিচয়।

প্রেমিক-হৃদয়ে প্রিয়ার আঁখিতারার দীপ্তিতেই য়ুরোপীয় দৃষ্টিতে দিব্যপ্রেম দ্যোতিত হয়। বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের, লরার প্রতি পেত্রার্কার দিব্যপ্রেম রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-জীবনে তাঁর স্বপ্নকামনার বিষয়ীভূত হয়েছিল। পেত্রার্কা তাঁর দশম কান্‌ৎসোনেতে লরার নয়নবন্দনায় বলেছেন :

As, vex'd by the fierce wind,
The weary sailor lifts a night his gaze
To the twin lights
which still our pole displays,
So, in the storms unkind
Of Love which I sustain,
in those bright eyes
My guiding light and only solace lies ;

যেন ওরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা॥

কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্র-জীবনের ধ্রুবতারা।

[ক্রমশঃ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ Creative Intuition in Art and Poetry, Meridian Books, N. Y., 1957, পৃ° ২৬৭।
২ তদেব। পৃ° ২৬৬।
৩ কবিমানসী-১, পৃ° ২১৭।
৪ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-১, পৃ° ১৪৪-১৫৭।
৫ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-১, পৃ° ১৭৪-২১৭।
৬ জীবনস্মৃতি, দ্র° রচনাবলী-১৭, পৃ° ৩৯৫।
৭ কবিমানসী-১, পৃ° ১৯৪।
৮ দ্রষ্টব্য, প্রভাতসংগীতের আলোচনার শেষ অনুচ্ছেদ, জীবনস্মৃতি ; রচনাবলী-১৭, পৃ° ৪০৩।
৯ সন্ধ্যাসংগীতে কবির মন্তব্য। রচনাবলী-১, পৃ° ২।/০॥
১০ রচনাবলী-১, পৃ° ৩৯২।
১১ তদেব, পৃ° ৩৯৩।
১২ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-১, পৃ° ১৮৪-৫।

জোয়ার এলো

প্রভাত বসু

চলেছিলাম ভাঁটার টানে
শান্ত, নিস্তরঙ্গ জনসমুদ্রের বুকে ভেসে।
প্রাচীন বুলি আর কৃপার ঝুলি
জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে উঠেছিল।
যেন মূল্য না দিয়ে চুরি-করা মুক্তি
গোপনে উপভোগ করছিলাম।
জীর্ণ পূজার ফুল, উপচীয়মান মালিন্য
তটের দিকে আছাড় খেয়ে
আবিল করে তুলেছিল সহস্র মন।…
হঠাৎ তুষারের ঝড় নামল পাহাড় থেকে;
আরাম-শয়নে দুঃস্বপ্ন শুধু মুহূর্তের।
তারপর
কঠিন শপথে দৃঢ় হয়ে উঠল
জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা;
হিমালয়-শীর্ষে পৌঁছল তার প্রচণ্ড সংঘাত।
একজাতি-একপ্রাণ-একতার জাগরণ
দ্বাদশকোটী সূর্যের খররশ্মি যেন।
এক নিমেষে
পুঞ্জিত গ্লানি ছাই হয়ে গেল।
জনতরঙ্গের এমন মহিমময় রূপ
আর বুঝি দেখি নি।…
একেই বলে জোয়ার;
স্বাধীনতা-চন্দ্রের আকর্ষণে
উদ্বেল কোটী প্রাণ।
আপোস-রফা, যুক্তি-তর্ক
সব ভেসে যাবে এই প্লাবন-প্লাবনে।
জোয়ার এলো—
কান পেতে শোনো
সেই অশ্রুতপূর্ব জলকল্লোল।

—

ট্রেন

অমিয়া চক্রবর্তী

সে এক আশ্চর্য দ্বীপ কাপ[illegible]ার মত
সূর্যস্না[illegible]প্ত উজ্জ্বল।
দূর থেকে দেখে মনে হয়
কত কাল কত যুগ কত পথ পার হয়ে গেলে
পৌঁছব ওখানে গিয়ে যান্ত্রিক যুগের যত যন্ত্রণার পারে
লুব্ধ চোখে শুধু চেয়ে থাকি।

রেলের লাইন পাতা।
শ্যামল শস্যের খেত ধুধু করা ধূসর প্রান্তর—
খেজুর গাছের সারি, বনঝাউ, ভাঁটির জঙ্গল,
তারি মাঝখান দিয়ে রেলের লাইন পাতা।
ট্রেনের দুরন্ত চলা ছক-বাঁধা পথে,
মাঝে মাঝে স্টেশনে স্টেশনে
শ্রান্ত হয়ে ক্ষণিকের থামা আর সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
বেদনার অভিব্যক্তি মুক্তির কামনা।
তারপর আরবার পথে ছুটে চলা
অন্ধবেগে গতির নেশায়।

চলার দুরন্ত বেগে ধূলিঝড় ওঠে—
বাতাসের ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খায় ঝরাপাতা,
জীর্ণ শুষ্ক ইচ্ছাগুলো অনির্দেশ পথে
ঝড়ের উদ্দাম বেগে উড়ে চলে যায়
কোথায় উধাও হয়ে।
শিকলে শিকলে বাজে ঘর্ষণের কর্কশ আওয়াজ
লোহার ঢাকনা ঢাকা দগদগে বুকের আগুন
দেখা দেয় অশ্রুবাষ্প হয়ে;
ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টি হতে ঢেকে যায়
দিগন্তের সীমা,
অতীতের স্বপ্ন হয়ে থাকে সেই দ্বীপ
আশ্চর্য উজ্জ্বল সেই সূর্যস্নাত অপূর্ব বিস্ময়।

—

প্রদোষের প্রান্তে

মূল রচনা : The Edge of Darkness—Mary Ellen Chase

অনুবাদ : রাণু ভৌমিক

লুসী ও জোয়েল নর্টন

লুসী ও জোয়েল নর্টন পেনবস্কট উপসাগরের মাঝামাঝি ...কারের একটি দ্বীপে একসঙ্গে বড় হয়েছিল। ওরা ...ন জন্মগ্রহণ করেছিল তখন ওদের শৈশবে সেই দ্বীপে ...নাইট পাথর তোলার কাজই বেশী হত, মাছ-ধরা ...ল অপেক্ষাকৃত অবহেলিত জীবিকা। ওরা এত ...রিতে পৃথিবীতে এসেছিল যে ওরা দেখে নি, এমন কি ...ই সব মাছ ধরবার জাহাজের গল্পও শোনে নি যারা ...নের অধিক কাল দেশ ও দ্বীপের বন্দরগুলো থেকে ...ছরে দুবার লাব্রাডার ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে যেত। এই ...াহাজগুলো ছিল প্রশস্ত সরু সুচলো কোণ বা টাবের মত ...র্শ্ববিশিষ্ট দু মাস্তুলের জাহাজ। ওরা সেই সব ...ক্তিশালী জাহাজ-বণিক-মালিকের কথাও জানত না ...ারা উপকূলীয় শহর থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও দক্ষিণের ...ইরোপীয়ান বন্দরে মাল পাঠাবার জন্য এই সব জেলেদের ...বণাক্ত কড মাছের অসংখ্য কুইণ্ট্যালের যোগানের জন্য ...পেক্ষা করত। ওদের শৈশবে যে কটি জাহাজ বাস্ক ...থবা ফাণ্ডি উপসাগরের কাছাকাছি যেত সে সব ...াহাজে খাটত মেনের সংযুক্ত নাবিক ও চাষীরা। এরা ...সন্তে শস্য বোনা এবং বিলম্বিত শস্য ঝাড়াইয়ের মাঝখানে ...বং মধ্যে মধ্যে অক্টোবর ও দীর্ঘ শীতকালে নিজেদের ...াড়ির বোট নিয়ে আয় বাড়াবার জন্য বেরিয়ে যেত ...বং প্রায় অনায়াসে প্রচুর মাছ ধরে রকল্যাণ্ড, পোর্টল্যাণ্ড ... বোস্টেন বাজারে বিক্রি করত, ওদের দুজনের ...িতৃপুরুষরাও এই রকম মিশ্রিত উপায়ে জীবিকানির্বাহ ...রে গেছেন।

যখন ওরা দ্বীপের সাধারণ স্কুলে নিতান্তই নীচু শ্রেণীর ...াত্র তখনই ওখানে গ্রানাইট প্রস্তর উত্তোলনের কাজ ...ীরে ধীরে কমে আসছিল। এখন কুড়ুলে কাটা ...্রানাইট পাথর ম্যাসন-ই গীর্জা, সুদৃশ্য গৃহ এবং বড় বড় বাড়িতে বেশী ব্যবহৃত হত বলে বাজারে দ্বীপের উপকূলে প্রাপ্ত প্রকৃতিদত্ত প্রচুর ধূসর বড় বড় পাথরের চাহিদা কমে গেল।

মাছ ধরা এবং পাথর তোলার পরিবর্তে মেন উপকূলের 'ওল্ড অর্চাড'-এর প্রশস্ত শুভ্র বালুকাভূমি থেকে ফ্রেঞ্চমান বের গভীর জমি আবদ্ধ বন্দর পর্যন্ত এক নিশ্চিত সহজ উত্তেজনাহীন ব্যবসা গড়ে ওঠে—গ্রীষ্মকালীন অধিবাসী ও প্রবাসীদের জন্য খাদ্যাদি সরবরাহ করা। মেনের সেই পরিবারসমূহ যাদের নাম একশত কি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও ভারতমহাসাগরে, চীনের উপকূলে শোনা যেত তারা এই পরিবর্তন উৎসুকচিত্তে না হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেনে নিল।

ধনীরা এখানে গ্রীষ্মকালীন আনন্দভ্রমণে এলে স্থানীয় ব্যবসায় বেড়ে যায়। কিন্তু যদি ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে আসে তাহলে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত বড় বড় বাড়িগুলো বিক্রি করে দেওয়া যেতে পারে। তাদের ছেলেমেয়েরা অনেক রকম কাজ পেতে পারত—যেমন প্রমোদ-নৌকো চালনা, ঘোড়া চালনা, লন ও বাগান নির্মাণ, টেবিলে খাবার পরিবেশন, শহরে শিশুদের দেখাশুনা। লুসী ভাইনাল ও জোয়েল নর্টন শিক্ষায়তন থেকে বেরিয়ে দেখল অনেক রকম কাজই আছে, কিন্তু কোনটাই ওদের বিশেষ ভাল লাগে না।

কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পঞ্চাশ বছর আগে যখন আমেরিকার বড় বড় বন্দরের চেয়ে নিউ ইংল্যাণ্ডের জাহাজ বন্দর গ্রামকোনাদি থেকে নারাগনগট বিদেশী পোতাশ্রয়ে অধিকতর পরিচিত ছিল, তখন যদি জোয়েল নর্টন জন্মাত, তাহলেও ও কোন বিশেষত্ব দেখাতে পারত না। অন্যান্য ধীবর বংশধরের মত গভীর জলে নাবিক হবার বা ভবিষ্যৎ জাহাজ-চালক হবার মত গুণ ওর ছিল না। বরং পরিবারগত ঐতিহ্য এবং ইতিহাস

অনুযায়ী ও সহজ এবং স্বল্প সময়ব্যাপী সমুদ্র-চারণ পছন্দ করত। ওর মানসিক গঠন এমন ছিল যে ও ফোরমাস্টার বা কোয়ার্টার ডেকের অকারণ নিয়মানুবর্তিতা সহ্য করতে পারত না। শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল অনেক কাম্য। পিতা-পিতামহের মতই ও বিপজ্জনক ঝুঁকির অপেক্ষা স্থায়ী স্থির কাজ ভালবাসত।

উত্তাল সমুদ্রে স্বল্পক্ষণ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ চেষ্টার পরে শান্তিতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস এবং অপর কারও অংশীদার হিসেবে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত আয় ওর কাছে ঈস্ট ইণ্ডিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান বাণিজ্য জাহাজে প্রথম অফিসার এমন কি ক্যাপ্টেন হওয়ার চেয়েও অধিকতর প্রার্থনীয় ছিল। কোন ব্যাপারে অথবা কোন সময়েই ও অপ্রাপণীয় উচ্চাশা দ্বারা চালিত হত না।

সেই সময়ে মাছ ধরবার কাজের প্রাথমিক সরঞ্জাম ও গীয়ার কিনতে অনেক খরচ পড়ত এবং গ্রানাইট কাটার মত এ কাজও ধীরে ধীরে কমে আসছিল। তাই ও বুদ্ধিমানের মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতের কাছে অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় যে জীবিকা পেল তাই গ্রহণ করল। উনিশ বছর বয়সে ও একটি প্রমোদতরীর চালক হল। তরীর মালিক ন্যু-ইয়র্কের অধিবাসী। তারা নিকটবর্তী একটি স্থানে গ্রীষ্ম-নিবাস নির্মাণ করেছিল। তারা জোয়েলকে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল এবং যথার্থই তাকে পাওয়া ভাগ্যের কথা! জোয়েলের ইউনিফর্ম ছিল বোতাম দেওয়া নীল কোট ও নীল টুপি—তাতে সাদা হাঁস উড়ছে।

চরিত্র বা চেহারা কোন দিক দিয়েই জোয়েল চটুল নয়। ও দেখতে বেঁটেখাটো, আচার-আচরণ ধীর স্থির, সাবধানী। ওর চুল লালচে, কোঁকড়ানো, চোখ নীল; ও প্রায়ই অস্বস্তি বোধ করে এবং সে সময়ে ওর চোখ বড় হয়ে যায়; একজন শ্রেষ্ঠ নাবিক—শৈশব থেকেই উপকূল ও দ্বীপগুলোর সঙ্গে পরিচিত। ও সেই ফিটফাট প্রমোদ-তরী আকৃতি বোটটিকে চমৎকার ভাবে রাখত। তিনটি গ্রীষ্মে বোট নিয়ে নিকটতর ভ্রমণ কিংবা ছেলেদের মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে গভীর সমুদ্রে গিয়ে ও নিজের দুঃখের কথা লুসী ভাইনালকে বলেছে। বলে মনে শান্তি পেয়েছে। লুসী ওখানেই পরিচারিকা হিসেবে কাজ করত, কর্ম-দক্ষতার জন্য তার সুনাম ছিল।

ছুটির সময়ে ওরা যখন খাবার নিয়ে কোন নি কোভে পিকনিক করতে যেত কিংবা একদিনের ছুটি ছোট মোটরবোটে দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করত তখন দু দুজনেই স্বীকার করত যে মালিকরা অত্যন্ত সহৃদয়। ও সহৃদয়তা ও অর্থসম্বন্ধীয় অকৃপণতার জন্য ওরাও বন্ধু বিবেচনার সঙ্গে কাজ করত। কিন্তু যতই হোক না এরা দ্বীপ ও উপকূলের নির্ধারিত জীবনযাত্রার মানদ বিদেশী। কারণ এখানের অধিবাসীরা বহুদিন ধ কেন্দ্রিকতায় অভ্যস্ত থাকায় নিজেদের মাতৃভূমির সং শুভেচ্ছাসম্পন্ন আগন্তুকের সঙ্গেও ভাগ করে নিতে রা নয়, বিশেষতঃ যারা সামাজিক ও আর্থিক দিক দি একদম বিপরীত।

—আমি বুঝতে পারি না, কি করে বললে যথা হবে।—টুপিটা নাড়তে নাড়তে এবং হাত যে ভিজে এবং ঘাড় লাল ও গরম হয়ে গেছে তা অনুভব ক করতে জোয়েল লুসীকে বলে, কিন্তু এরা যত চেষ্টা ক না কেন কখনও এখানকার অধিবাসী হতে পারবে আমি এদের জন্য সমবেদনা অনুভব করি; যদিও এরা কেউ আমাকে সেজন্য ধন্যবাদ দেবে না, কিন্তু ভাবতে গেলে আমাদের নিজেদের এবং অতীতের মনে পড়ে আরও কষ্ট হয়।

লুসী সেই মুহূর্তে গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণকারী বা অ দিনের অপেক্ষা জোয়েলের জন্যই বেশী দুঃখ অ করত। যখনই সে ওকে লাল হয়ে, বিচলিত চিত্তে হাতড়াতে দেখত—যা জমাট হয়ে ওর মনে থাকত কি মুখে আসত না—তার ইচ্ছে হত বাঘিনীর মত ও স্পর্শকাতরতা ও বিরক্তিকর ব্যাপার থেকে বাঁচিয়ে রা স্কুলেও যখনই জোয়েল নিরুৎসাহ মনে নীরব থেকে তখনই লুসী ওকে উৎসাহ দিয়েছে, সাহায্য করেছে তেমনি এখনও ওকে সবকিছু বিশ্বাসের সঙ্গে সহজভাবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করতে চাই নিজে সে এই গ্রীষ্মকালীন কাজে সন্তুষ্ট ছিল না। কি স্বভাবতঃই সে চটপটে ও মনোযোগী, কোন অসুবিধে পড়লে মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, সর্বজনপ্রিয় বন্ধুত্বভাবাপন্ন এবং নিজের কোন বোকামিতে ম খারাপ করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়।

এই তিন বছর, শরৎ ও বিলম্বিত বসন্তের মধ্যবর্তী-লে সে দ্বীপের স্কুলে প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়ে পড়িয়েছে ও জোয়েল মেনল্যাণ্ডের বিরাট অট্টালিকার এক ক্ষুদ্র শে থেকে অত্যন্ত দুঃখিত চিন্তান্বিত চিত্তে বাড়ি নাবেক্ষণ করত। কাজটা যেন ওকে পেয়ে বসেছিল। যকবার যখনই ও বোটে পার হয়ে লুসীকে দেখতে ছে ওর ভয় হয়েছে কিছু না কিছু ত্রুটি ঘটবে।

তৃতীয় বছর আগস্ট মাসে ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল। ইয়র্কের পরিবারটি লুসীর মানিয়ে নেবার ক্ষমতা, দক্ষতা, সদানন্দ প্রফুল্ল মূর্তির জন্য তাকে এত সবাসক্ত যে তারা শরতে শহরে প্রত্যাবর্তনকালে কে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল। গ্রীষ্মকালীন কাজের পেক্ষা এখনকার কাজ সহজ, কারণ শহরের বাড়িতে নারকম সুবিধা আছে। তা ছাড়া লুসী এতদিন যা দেখে এসেছে তা থেকে নতুন কিছু দেখতে পাবে। এক পরাহ্নে যখন লুসী ও জোয়েল নিকটবর্তী উদ্ধত লস্তবকে মাছ ধরতে গিয়েছিল তখন সে ওকে এই বাদটি দিল।

খবরটা শুনে জোয়েল ব্যথায়, যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে ল। ওর মনে হল জীবনের একমাত্র নোঙর ছিঁড়ে ছে এবং ও বিপদসঙ্কুল পাহাড়-শীর্ষ ও জলের নীচে কোনো অদৃশ্য পর্বতের দিকে ভেসে যাচ্ছে।

নাবিকের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক এই অনুভূতিতে এত ভয় পেয়ে গেল যে কোনরকমে মরিয়া হয়ে লুসীকে য়ের এবং ওর সঙ্গে বাস করবার প্রস্তাব করতে পারল। বং জোয়েলের সততা ও প্রয়োজনের কথা জানা থাকায় লুসী করুণায় গলে গিয়ে তাকে আধ মিনিটের বেশী দুঃখ ষ্ট ও ভয় পেতে দিল না। আগস্ট মাসের সেই পরাহ্নের পরে আজ ত্রিশ বছর কেটে গেছে, কিন্তু এক হূর্তের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের জন্যও লুসী কখনও এর জন্য অনুতপ্ত হয় নি।

২

ওরা এই দ্বীপে বাস করে নি। হেরিং মাছের জন্য মহাসাগরীয় জলে ঘুরে বেড়ানো একটি ঝাঁকি জাল-নিক্ষেপকারীর কাছে ওরা খবর পেল যে একটু বিপথে অবস্থিত একটি মৎস্য উপনিবেশে পাইকারী দোকানঘর খালি আছে, স্থানটি উপকূল থেকে একশত মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত। মাছ ধরবার উপযোগী এই স্থানটি প্রাকৃতিক অবস্থান ও সম্পদের দিক দিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ওরা ভেবে দেখল এই গ্রীষ্মকালীন কাজ ওদের জন্য নয়, এমন কি মাইনে বাড়িয়ে দিলেও না। আর জোয়েলের অবস্থা তো আরও শোচনীয়, দীর্ঘ শীতকালে বাড়ি পাহারা দেওয়া এবং অবসর সময়ে এদিক-ওদিক টুকরো টুকরো কাজ করা।

ক্রেঞ্চমান বের পূর্বদিকে গভীর খাঁজ কাটা, উপকূলরেখায় ও বিস্তীর্ণ ভূভাগে এখনও অনেক সম্প্রদায় বাস করে যারা নির্জন কোন স্থান, অন্তরীপ, টাইডাল নদীর ওপরের দিক, কোভ বা পশ্চাতের আবদ্ধ জলা আঁকড়ে ধরে আছে এবং গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণকারীদের হাত থেকে বেঁচে গেছে। গ্রীষ্মকালীন গৃহনির্মাতারা প্রমোদতরী কুঞ্জারের জন্য নিরাপদ বন্দর পছন্দ করেন। তা ছাড়া, তাঁরা বাজারের কাছাকাছি থাকতে চান, গলফ ও টেনিস খেলার সুবিধে ও নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতিবেশী চান। শুধু কয়েকজন, যাঁরা আরামের চেয়ে নির্জনতার অধিকতর পক্ষপাতী, তাঁরাই মেনের পূর্বদিকের দূরবর্তী কোণে গিয়েছেন। এই স্থানসমূহ গত দু শতকের মত এখনও পুরনো অধিবাসীদের অধিকারে আছে। তারাই এর মালিক যারা বিশ্বাসঘাতক ঝড়ো হাওয়ার তীর থেকে বড়শি বা ঝাঁকি জাল ফেলে, এবং জলে নেমে জাল টেনে, ফাঁদ পেতে অথবা জাল ফেলে মাছ ধরে।

জোয়েলের সতর্ক অতিরিক্ত সাবধানী স্বভাব হয়তো তাদের সামান্য মূলধনে এই বিরল-বসতি স্থানে প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত একটি দোতলা বাড়ির জন্য নিয়োগ করতে ইতস্ততঃ করত, কিন্তু লুসীর আগ্রহে ওর সমস্ত বিবেচনা ভেসে যায়। শূন্য স্টোরটি এবং পারিপার্শ্বিক যা দেখবার তা এক ঘণ্টার মধ্যে দেখে লুসী আনন্দ উৎফুল্ল মনে কল্পনা করতে থাকে কি ভাবে বাড়িটা সারিয়ে নেবে। নতুন ছাদ হবে এবং সে ছাদ ওদের দুজনের পরিশ্রমে রং করা হবে। সামনের প্রশস্ত জানলায় ফুল থাকবে। যখন জোয়েল সযত্নে ছাদ, নড়বড়ে সিঁড়ি, বাইরের ঘর এবং ইঁদারার

অবস্থান ও অবস্থা দেখছিল তখন লুসী কয়েকটি উৎসুক প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করে ফেলল।

ওরা বললে, লুসী ও জোয়েল স্থলপথে না এসে জলপথে আসার জন্য প্রথম দৃষ্টিতে যা দেখেছে এখানে লোকবসতি তার চেয়ে অনেক বেশী। অন্ততঃ এক ডজন পরিবার বড় রাস্তার দু পাশে বাস করে। সেই সব পরিবারের কর্তারা এই উপসাগরে এবং পশ্চাতের আবদ্ধ জলে মাছ ধরে। এই আবদ্ধ জলরাশিই দীর্ঘ ভূখণ্ডকে পূর্ব পশ্চিমে ভাগ করেছে। এ ছাড়া তিনটি আলো-ঘরের তত্ত্বাবধায়করা এই স্টোরটিকে ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে, আর বাইরের দ্বীপটিতেও অনেক লোক আছে যারা নিয়মিত এখানে জিনিসপত্র নেয়। মাছের সীজ্‌নে অনেক বোটই এদের জোড়কে কেন্দ্র করে—তা যত কম সময়ের জন্যে হোক না কেন। নভেম্বরে সাধারণতঃ শিকারীরা আসে। এবং গ্রীষ্মে একাধিক প্রমোদতরী রাত্রে এখানে আশ্রয় নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ জিনিসপত্র নিয়ে যায়। যদি পূর্বের স্টোররক্ষক কোন একটা উঁচু স্থানের অধিবাসী না হত এবং ধীবরদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে জানত তাহলে তার কোন অসুবিধে হত না। তা ছাড়াও প্রকৃত কথা এই যে, কোন দিশী উপকূলবাসী বিশেষতঃ ধীবরশ্রেণীর লোকই এখানে প্রয়োজন।

অবশেষে, অবশ্য বলতে গেলে কোন শেষই নেই, কারণ জোয়েল লুসীর মতামতের বিরুদ্ধে কিছুই বলে নি—অন্ততঃ সেই মুহূর্তে তার কোন কথা মনে হয় নি। ওরা স্টোরটা কিনল।

৩

আসল কথা এই যে লুসীর দোকান করবার আকাঙ্ক্ষা এই অত্যধিক আগ্রহ স্বামীর জন্যেই। ওকে সে নারী-হৃদয়ের কোমলতায় পূর্ণরূপে বুঝত। এবং যুগযুগান্তরের বুদ্ধিমতী নারীদের মত সে এই কথাটা নিজের মনের গোপন কোণে লুকিয়ে রেখেছিল। অবশ্য এই দৃশ্যের কল্পনায় ওর মনে খুব আনন্দ হয়েছিল যে শিশুরা পয়সা আঁকড়ে নিয়ে জ-ব্রেকার, জেলীবীন, পাকানো লাইকো-রাইসের সামনে দাঁড়িয়ে গভীর উৎকণ্ঠায় হিসেব করছে, মেয়েরা তার সঙ্গে প্যাক করে রাখা ও বাড়িতে তৈ[illegible] ইয়েটের তুলনামূলক আলোচনা করছে, ক্লান্ত জেলে[illegible] শীতের রাত্রে বাড়ি ফেরবার আগে ঘণ্টাখানেক স্টোভে[illegible] চারপাশে বসে পাইপ খাচ্ছে ও একটু গরম হয়ে নিচ্ছে[illegible] ওর ভাবতে ভাল লাগত যে তাকগুলো ভরতি। সেখা[illegible] সারির পর সারি উজ্জ্বল লেবেল মারা টিন, [illegible] প্যাকেজ, ব্যাগ ও বোতল। কিন্তু এ সমস্তই তা[illegible] অন্তরের অন্তঃকোণে গভীর ও প্রবলভাবে বিরা[illegible] সেই সত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মাত্র।

লুসীর সঙ্গে স্টোর চালিয়ে জোয়েল আত্ম-বিশ্বা[illegible] প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। নিজের ভয় ও সঙ্কোচ জ[illegible] করে নিজেকে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসে[illegible] আবিষ্কার করবে—ঠিক যেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মান [illegible] জোয়েলকে করে। এবং ভবিষ্যতে সে যদি নিজের প্র[illegible] লক্ষ্য রাখে—যা সে জানে সে পারবে—তা হলে শী[illegible] জোয়েল দোকানের স্বত্বাধিকার এবং নিজের অধিকা[illegible] সম্বন্ধে সচেতন হবে। সে শুধুমাত্র সাহায্যকারী সহকা[illegible] হিসেবে থাকবে। সে কল্পনায় দেখছিল, নব-নির্মি[illegible] সামনের সাইনবোর্ড টাঙানো আছে। সাদা চালু [illegible] সব সবুজ রঙে মানিয়ে যাওয়া সবুজ অক্ষরে লেখা আ[illegible] জোয়েল নর্টন—মুদিখানা ও মনিহারী দোকান। লু[illegible] সব আশা ও স্বপ্ন জোয়েল সফল ক[illegible] নি কিন্তু অনেকগু[illegible] করেছিল। কিছুকাল পরে ও [illegible] মনে মনে বেশ সুখ [illegible] আরাম অনুভব করত যা ওর নিজের কল্পনাতেও সম্ভব ছিল না। ওকে বেশী কথা বলতে হত না বলেই ও আজকাল কথা বলত। যেমন অবহেলিত লালচে কুল সম্বন্ধে একদিন বলে, আমার স্থির বিশ্বাস ঝিনুকের মত লালচে কুলও খুব শীঘ্রই ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারব। সেদিন পড়ছিলাম যে ইউরোপের অনেক দেশে এটা একটা বিশেষ প্রিয় খাদ্য। কিংবা হয়তো সামুদ্রিক পাখীর মল সম্বন্ধে আমরা এই দ্বীপ থেকেই প্রথম শ্রেণীর সার পেতে পারি। পাহাড়ের অনেক ফাটলে প্রায় এক ফিট গভীর হয়ে মল জমে আছে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকো ভরতি করে তা আনা যায়। অবশ্য সবাই মিলে কাজ করতে হবে এবং জোয়ারের জল খুব শান্ত হওয়া চাই। গভীর জলের নাবিকরা অনেকদিন আগে এইরকম

ছিল। ওরা বড় বড় জাহাজ-ভরতি পাখির মল দক্ষিণ মরিকার থেকে শহরে পাঠিয়েছিল। শুনলে অবাক হয়, কিন্তু এটা সত্যকথা। ওরা এর নাম দিয়েছিল নো'। এমন কি ওরা এই মাল টনে টনে সুদূর রোপ পর্যন্ত চালান দিত। যতদূর জানি এতে অনেক ন হয়েছিল।

জোয়েল দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলছে এবং প্রতিবেশীরা শব্দ মনোযোগে সব কথা শুনছে, এই দৃশ্য দেখে লুসীর আনন্দে নৃত্য করে ওঠে। সে নিজেও কোডের প্রান্তের অধিবাসিনী সারা হন্টের দেওয়া বইগুলো রে শোবার সময়ে যখন চা টোস্ট খায় তখন স্বামীকে ড় শোনায়।

দোকান খোলবার প্রথম দশ বছর অবস্থা খুবই খারাপ ল। সস্তায় কিনে মজুত করে রাখবার মত সঙ্গতি বা কোন নিয়মতান্ত্রিক ধারা তাদের ছিল না। দের দোকান এত ছোট এবং যাতায়াতের এত সুবিধে ছিল যে, সঙ্গতি থাকলেও পাইকারী বড়-জারে সস্তায় জিনিস কিনে মজুত করে রাখা সম্ভব ত না। নিকটতম শহরে ও সমুদ্রপথে যেতে ত—যতদিন না খারাপ রাস্তার জন্য ট্রাক পাওয়া ল, এবং যতদিন না তা কেনবার মত টাকা য়ে উঠল। তাই, প্রথম দিকে লাভ খুব কম ছিল এবং প্রথম থেকেই হাসিমুখে ধার দিতে হত। তবুও দের আগমনের প্রথম দিনে যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত য়েছিল তা মোটের ওপর মিলে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ-বিস্তৃত পথের দু দিকে ছড়ানো পরিবারসমূহ তাদের সদাসর্বদা উপস্থিত মাছ ও সাধারণ প্রধান খাদ্যের সঙ্গে আলু ও নুনে জড়ানো শূকরের মাংস খায়। হেরিং দ্বীপ, শাগ দ্বীপ বা উত্তরের দ্বীপে গমনেচ্ছু শিকারীরা সঙ্গে নেবার জন্য অনেক জিনিস কিনত। আলো স্টেশন ও দ্বীপের আনুকূল্য খুব একটা কিছু না হলেও কখনও উপেক্ষণীয় ছিল না। এবং কোন কোন দিন যখন ফাঁদ-জালগুলো মাছ ভরতি হয়ে যেত তখন অসংখ্য ক্ষুধার্ত লোকে কোভ পূর্ণ হয়ে উঠত। কিছুদিন পরে যখন গ্যাসোলিনের জন্য ট্যাঙ্ক স্থাপন করা হয় এবং নিত্য-নিয়মিতভাবে গ্যাসের ট্রাক চলতে আরম্ভ করে তখন বোট ইঞ্জিনের জন্য জ্বালানী ও টিন টিন মোটর তেল বিক্রির সম্ভাবনায় ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মালপত্র কেনাকাটা জোয়েলই করত। গোড়ার দিকে সে সযত্নরচিত লিস্টটি নিয়ে সমুদ্রপথে সপ্তাহে একবার কি দুবার যেত। শেষে নিজেদের ট্রাক হলে সে প্রত্যহ নিকটতম শহরে এবং ব্যবসা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আরও দূরবর্তী পাইকারী বাজারে যেত। বিক্রি ছিল লুসীর হাতে। জোয়েল এতে অস্বস্তি বোধ করত, হানা স্টিভেন্স যখন নিজস্ব ভঙ্গীতে এক নিশ্বাসে সমস্ত প্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিসের কথা—চাল, শুকনো আঙুর, বেকিং পাউডার, চিনি, পাইপ, তামাক,—বলে যেত জোয়েলের ঘাড় লাল হয়ে উঠত এবং যোগ দিতে গিয়ে ইতস্ততঃ করত। ঠিক সেই সময়ে প্রতি বারই লুসীর মনে পড়ত ও ওপরতলায় এমন কিছু একটা ফেলে এসেছে যা শুধু জোয়েলই আনতে পারবে কিংবা পিছনের মালগুদামে একটি বস্তা পড়ে আছে যেটি লুসীর পক্ষে অত্যন্ত ভারী।

৪

ত্রিশ বছর।

সকালে স্টোর পরিষ্কার করতে করতে এবং সমগ্র দিনব্যাপী কাজ আরম্ভ করবার আগে লুসী মধ্যে মধ্যে ভাবে, ত্রিশ বছর অনেক সময়। একটি লোকের জীবনের প্রায় অর্ধেক। সত্যিই কি এখানে আমরা ত্রিশ বছর ধরে আছি।

এখানে যখন প্রথম এসেছিল তখনকার চেহারা লুসী ভাবতে চেষ্টা করে, কিন্তু বর্তমানের কাছে অতীতের স্মৃতি সম্পূর্ণ ম্লান। এখন ওদের বয়স তিপ্পান্ন। জোয়েল দীর্ঘকাল ট্রাকে বসে এবং থলে ও কার্ডবোর্ড টেনে বেশ একটু বেঁকে গেছে। লুসীর চুল ধূসর, মুখময় সূক্ষ্ম রেখার জাল। যদিও ভাবতে তার নিজের খুব খারাপ লাগে, কিন্তু অবধারিতভাবে এ রেখা সকলের চোখে পড়বে। জীবনের এই বছরগুলো কেটে যাবার জন্য সে কিন্তু মোটেই দুঃখিত নয়, সে শুধু মধ্যে মধ্যে অবাক হয়ে আবিষ্কার করে যে কি আশ্চর্যভাবে এতগুলো বছর তার

পশ্চাতে এসে জমা হয়েছে। অবশ্য, কখনও কখনও ওরা দুজনে একত্রে কোথাও বেড়াতে গেছে—কোথাও যাবার আনন্দে ওরা তখন উৎসুক হয়ে উঠত—দোকান বন্ধ করেও আয়সকোস্টের বিস্তৃত মাঠ, বেঙ্গর বা পোর্টল্যাণ্ডের উত্তেজনা উপভোগ করতে গেছে। কিন্তু সবই কয়েক-দিন পরে আত্মবিরোধী ও বিরক্তিকর মনে হত এবং ওরা নিজেদের পরিচিত জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পেরে সুখী হত।

এই দীর্ঘকালে কোভ উপনিবেশে খুব কম পরিবর্তন হয়েছে। প্রবলতম জীবনীসম্পন্ন জেলেরাও স্বভাবতঃ ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে না। একবার নিজেদের মাথা গোঁজবার খানিকটা জায়গা এবং খেটে রোজগার করবার মত বিস্তৃত জল পেলে তারা পাহাড়ের গায়ে লটকানো নাছোড়বান্দা শামুকের মত আঁকড়ে অনড় হয়ে থাকতে ভালবাসে। হেরিং ও চিংড়ী মাছের সততসঞ্চরমাণ অনিশ্চিত স্বভাবের কথা জানা থাকায় ওদের অস্থির-চিত্ততার মতি পরিবর্তনের জন্য তারা ধৈর্যভরে অপেক্ষা করে। যখন এই কোভের জেলেরা তিন মাইল মাত্র দূরে মাছের বান ডেকেছে শুনতে পায় অথবা জানতে পারে যে চিংড়ী মাছ পূর্বে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে কিন্তু তাদের জালে পড়ছে না তখন তারা ভাগ্যের বিরক্তিকর খেলায় একবার মাত্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেদের বিলম্বিত হলেও নিশ্চিত সৌভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করে।

হান্না ও বেঞ্জামিন স্টীভেন্স ষাট পেরিয়ে গেছে। ওদের এখানের নোঙর ত্রিশ বছরের বেশী। নোরা ও শেঠ বলজেটেরও তাই। নর্টনরা স্টোরটি কেনবার পূর্বেই তারা এখানেও থাকত। বৃদ্ধ, ক্ষীণজীবী ডেনিয়াল থারস্টন যে অন্তরীপের ছায়ায় সমুদ্রতীরে শুয়ে আছে, গর্বভরে বলে যে সে এই উপকূল অর্ধশতাব্দীর বেশী সময় ধরে চেনে। অপরাপর গৃহবাসীরা বদলে গেছে। এই পরিত্যক্ততার কারণ প্রায়ই দুঃখজনক এবং লুসী তা ভুলেই থাকতে চায়। পুরনো অধিবাসীদের স্থান নতুনরা গ্রহণ করেছে। প্রায় কুড়ি বছর হল স্যাম পার্কার এখানে আছে। ওকে বেশ সুখীই মনে হয়। এবং ও আছে বলে লুসী ও জোয়েল মনে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে। নভেম্বরে ও জোয়েলের সঙ্গে শিকারে এবং শীতে বাজারে জিনিসপত্র কিনতে যায়। তা ছাড়া, লুসী[...] অসংখ্য কাজে সাহায্য করে তরুণ সোয়ার দম্পতি[...] বিয়ের পর থেকে এখানে আছে—তা প্রায় দশ বছর হ[...] ওরা এখন যে বাড়িতে বাস করছে তার মালিক [...] অন্তরীপের কাছে ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় জলে ডু[...] মারা গিয়েছিল। ড্রুজিলা ওয়েস্ট—ডাকনাম ড্রুজি[...] কিছুদিন হল একা আছে। ওর স্বামী ওকে জল[...] পোত থেকে ভেসে ওঠা এক অপ্রার্থিত মাল মনে ক[...] ছেলেটির শৈশব এখানেই কেটেছে, এখন গ্রেট লেকে[...] একটা ফেরি স্টীমারে কাজ করছে। হয়তো সে কোনদি[...] স্ত্রীর কাছে ফিরে নাও আসতে পারে। দু বছর আ[...] রাওলারা তাদের একটি মাত্র সন্তান নিয়ে এসে এ[...] বসতি করেছে, ভগবান জানেন ওরা কোথা থে[...] এসেছে। ওরা ডেনিয়াল থারস্টনের কাছ থেকে এ[...] একর জমি নিয়ে অন্তরীপের দিকে এগিয়ে যাওয়া টি[...] পাহাড়ের ওপরে কোন রকমে একটি ঘর করেছে। [...] মাছ-ধরাটাই ওদের একমাত্র জীবিকা কিনা সে বিষ[...] সন্দেহ আছে।

৫

অনেকদিন আগে, সেপ্টেম্বরের সেই একদিনে—যেদি[...] ওরা বসবাস করতে এখানে এল এবং যখন ওরা মাল-ভর্তি[...] নৌকো নিয়ে জোয়ারের অপেক্ষায় অধৈর্যভরে বসেছি[...] —লুসী ঘরোয়া জিনিসের স্তূপের ওপরে বসে দেখতে পা[...] একজন দীর্ঘাকৃতি মহিলা পূর্বদিকের সাগর উপকূলে[...] পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন এবং মধ্যে মধ্যে একজোড়া[...] দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোভের জল লক্ষ্য করছেন।

—উনি নিশ্চয়ই বৃদ্ধা মিসেস হন্ট।—সে জোয়েলকে[...] বলে।

এই অপরিচিত সমুদ্রকূলে এসে জোয়েল মানসিক[...] অস্বস্তি বোধ করছিল। ওর মনে নানা চিন্তা—ডিঙি[...] কি করে পাড়ে ভেড়াবে! প্রতিবেশীরা জিনিসপত্র[...] নামাতে সাহায্য করবে কিনা! ও অন্যমনস্কভাবে[...] ভদ্রতার খাতিরে একবার তাকাল।

—হ্যাঁ, ওর হাঁটার ভঙ্গী অন্যান্যদের মত নয়,—লুসী

সবাই ওকে বুড়ো বলে। কিন্তু আমার তা মনে না।

কোনদিনই সারা হন্টকে লুসীর বৃদ্ধা মনে হয় নি। থেকেই ওঁর রান্নাঘর ও বসবার ঘর লুসীর আকর্ষণ-ছিল। স্টোরের কাজে একটু অবসর পেলেই ও ছুটে যেত। সেখানে সেই পুরনো বাড়িতে হুক বানো, ক্রেচেটের কাজ, সেলাই, রিপু এবং অসংখ্য ধরনের বড়শির থলে করতে করতে লুসী অনেক জায়গার শুনত যার অস্তিত্বই ওর জানা ছিল না, অনেক লোকের কথা শুনত যারা শুধুমাত্র নামে ছিল ওর কাছে, অনেক চিন্তা মনে উদয় হত যা সারা হন্টের সঙ্গে পরিচয় না হলে সে কখনই ভাবতে পারত না। সে সম্পূর্ণ নতুন রীতিতে বই পড়তে আরম্ভ করে। দের শিক্ষালয় কিংবা স্কুলের শিক্ষকতা কখনই তা পারে নি।

—এই বইগুলোর জন্যে শুধু,—সারা হন্ট বলতেন, তা না হলে হয়তো আমি অনেক আগেই টাইডাল নদীতে চলে যেতাম।

হঠাৎ বলা এই রকম অদ্ভুত মন্তব্য শুনতে লুসী খুব ভালবাসত। একবার ও জোয়েলকে এ রকম একটি কথা শুনিয়েছিল যাতে সে ভীত-বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল।

সারা হন্টের বাড়িতে ও যেন এক নতুন জগতে উপস্থিত হত। তবুও এ শুধুমাত্র সেই অতীতের জগৎ নয়, যে জগতে বড় বড় পালের অর্থই সাহস, বিপদ, বিস্ময়। আবার এ লুসীর বর্তমান পৃথিবীও নয়—বঙ্কিম তটের ভয়প্রদ উপকূলে বসবাসকারী এক পিষে-যাওয়া সমাজ—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যাদের নিঃসঙ্গতা আরও বর্ধিত করে তুলেছে। এই জগৎ দুয়ের সংমিশ্রণ কিংবা তার চেয়েও অনেক বেশী।

অতীতের ইন্দ্রজাল শক্তিতেই সারা হন্ট সেই দিনটিকে আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত করে দিতেন। এতে জীবনের বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠত—বাস্তব, নতুন অর্থে জীবনে পূর্ণ হত। এ জগৎ গ্যাসোলিন এবং তেলের গন্ধে ভরা কুৎসিত ইঞ্জিনের জগৎ; চিংড়া মাছের জাল বাঁধবার জন্য কঠিন স্প্রুসের টুকরো বাঁকানো; দামী জাল শূন্য থাকে; কঠিন পরিশ্রমে ক্লান্ত লোকরা প্রকৃতির সমস্ত খামখেয়ালের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে কাজ করে যায়; উৎসুক হিংসাপরায়ণ মহিলারা ক্যাটালগ পরীক্ষা করেন; শিশুরা স্বপ্ন দেখে না—বিপদে ভীত হয়। কিন্তু সারা হন্টের ধারণাক্ষম জীবনবোধের জন্য এই নিষ্ফলা পরিশ্রম মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠত, এবং সকলেই যেন নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটি উচ্চ মহান ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠত।

যে রমণী লুসী নর্টনের খামখেয়ালীতে বেছে নেওয়া এই সাধারণ জীবনযাত্রা অসাধারণত্বে রূপান্তরিত করতে পারতেন, অসংখ্য জটিল ধাঁধা সমাধান করতে এবং অস্পষ্টতা স্পষ্ট করে তুলতে পারতেন, অন্ধকার দূর করে আলোর উজ্জ্বলতা আনতেন, তিনি ছিলেন এই রাজ্যের হৃদয়—কেন্দ্রবিন্দু। সেই এক গাছের মাস্তুলের মত—লুসীর পরিচিত একটি জাহাজের মেরুদণ্ড। যা পছন্দ করে সুন্দরভাবে কেটে স্রোতের বিরুদ্ধে অপরাজেয় করে তোলা হয়েছিল। অতীতের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাধারা উদ্দীপ্ত করে তাঁর মনে এনেছিল শান্তি ও আনন্দ। আর, এই অতীতেরই সবচেয়ে বড় দান এক অপূর্ব অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। তাঁর জীবনে তিনি কয়েকটি বিভিন্ন জগৎকে দেখেছিলেন—প্রতি পরিবর্তনই তাঁকে বিস্ময়, অনুতাপ, কৌতূহল, ভয় ও সাহস দিয়েছে। তিনি একই সঙ্গে সেই দিনগুলোকে অভিশাপ দেন আবার আশীর্বাদও করেন।

এ কথা কখনও তাঁর মনে হয় নি যে এই নিষ্ফলা সমাজ—যেখানে তিনি পারিপার্শ্বিকের চাপে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন তাঁকে বাইরের জীবন থেকে বঞ্চিত করে বন্দী করে রেখেছে। এই জীবনের সুর অপরাপর জীবন থেকে পৃথক বলেও তাঁর মনে হয় নি। যদিও তিনি এই সম্প্রদায়ের স্বভাবগত অদ্ভুত সমাজ-ব্যবস্থা জানতেন। তিনি নিজের গৃহস্বামী চিনতেন—চিনতেন শুধু কয়েকটি প্রতিবেশীকে। অপরাপর জাতির মত এরাও অপরিসীম বিপরীতধর্মী ভাব ও ইচ্ছার সমষ্টি। তাদের বাসস্থান ও কর্মের বিশেষ রূপের জন্য এই সংঘাত আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তিনি এদের চরিত্রে বারবার পরস্পরবিরোধী গুণাবলী আবিষ্কার করে বিস্মিত

হন নি। কারণ তিনি জানতেন কৃপণতা ও দানশীলতা, কোমলতা ও নিষ্ঠুরতা, ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব একই সময়ে একই হৃদয়ে থাকতে পারে না। শুধুমাত্র ওদের মধ্যে নয় নিজের চরিত্রের বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশও তিনি বেশ খোসমেজাজে খুঁটিয়ে বের করতেন।

সেই সব দিনে যখন কোড, দ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ, এমন কি বড় আলোটাও কুয়াশায় হঠাৎ লুকিয়ে যেত এবং আকাশ ও সমুদ্রের সবই দৃশ্য ও স্পর্শনীয় হয়ে উঠত অথবা হেমন্তের ধূসর আকাশে একঝাঁক উড্ডীয়মান গাল পাখী মনে নামহীন ভয় জাগাত, পানকৌড়ির বিকট উন্মত্ত হাসি শুনে পাগল হয়ে ঘরের কোণে বা গ্রীষ্মকালীন হোটেলের বারান্দায় আশ্রয় নিতে হত তখন লুসী কোন দিকে না তাকিয়ে জাহেলকে জোরে বেধে গ্রাম্য পথ ধরে পূর্বদিকে রওনা হত। আবার, ও ঠিক সেই ভাবে সেই পথে যেত যখন অবিরাম কয়েক সপ্তাহ রোজগার না থাকায় লোকেরা অস্থির অশান্ত ও ঝগড়াটে হয়ে উঠত এবং চারিদিকে ফিসফিস গুজব শোনা যেত যে অন্ধকারে কেউ আক্রোশবশে ফাঁদের লাইন কেটে দিয়েছে অথবা অপরাহ্ণের কুয়াশার সুযোগে ফাঁদের মাছ কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।

সারা হন্ট সর্বদাই ওর মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে দিতে পারতেন, ওদের এই বন্দী জগৎকে পুনরুদ্ধার করতেন—সবকিছুরই মূল্যবান আবিষ্কার করতেন।

—লুসী, কারও কাছেই খুব বেশী আশা কর না—বিশেষতঃ সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়; সমুদ্র বড় রুক্ষ প্রকৃতির মনিব। এ মানবের মনের পশুত্বকে টেনে বার করে, এবং অদ্ভুতভাবে নিকৃষ্টতমকে লালন করে। আজকাল সবাই অতীতের সমুদ্র ভ্রমণের গল্প করে—সত্যিই সেদিনগুলো বলবার মতই ছিল বটে। কিন্তু তখনও সমুদ্র মহোত্তম ও হীনতম দুইই সৃষ্টি করত এবং অনেক সময়ে এই দুয়ের সংমিশ্রণ। আমি সমস্ত জীবন সমুদ্রে বা সমুদ্র-তীরে কাটালাম তবু আমি এখনও এর রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হই নি। শুধু এইটুকু জানি যে সমুদ্র যেমন ভয় দেখাতে পারে তেমনি আর কেউ পারে না।

—কিন্তু, সব সময়ে নয়,—লুসী উত্তর দিত, কখনও কখনও। এই রকম অদ্ভুত দিনে।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কিছুই সব সময়ের জন্য নয়,—সারা হন্ট বলতেন, আচ্ছা, একটু চা খাওয়া যাক।

লুসী কালো, কড়া চা তৈরি করত। দামী, পাতলা সাদা কাপে চা খেত ওরা। কাপের গায়ে সবুজ গাছ, ছোট ছোট পাতার ছবি। প্রায় একশো বছর আগে সারার বাবা এই কাপগুলো ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে এ দ্বীপে এনেছিলেন।

—জাহাজে, সমুদ্রের ওপরে এই ভয় আমি বহুবার দেখেছি। কিন্তু কখনই খাপ খাইয়ে নিতে পারি নি। যখন আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ট্রেডসের সামনে দিয়ে চলে গেছি—প্রকৃতির রূপ অপূর্ব এমন কি পালও একই ভাবে আছে—তার চেয়ে সুখের জীবন নাবিকরা ভাবতে পারে না। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের জন্য বিষুব রেখার সন্নিকটে স্থির সমুদ্রে অথবা কেপ হর্নের প্রবল ঝড়ের বিরুদ্ধে জাহাজ চালানো হোক তাহলেই সেই অদ্ভুত ভয় সকলের মনে বাসা বাঁধবে। এ সেই ভয় নয় যে আর কখনও বাতাস না পেয়ে এখানেই আটকে থাকতে হবে, কিংবা কোন পাহাড়ের চূড়োতে ধাক্কা লেগে জাহাজ চুরমার হয়ে যাবে, কিংবা মধ্যসমুদ্রে ডুবে যাবে। এটা গ্রীষ্ম, শৈত্য বা ডুবে যাবার ভয় নয়। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি—জলের সেই অসীম গভীরতা—যেখানে তোমার কোন হাত নেই সেখানে হারিয়ে যাবার অনুভূতি। আমি নিজের চোখে দেখেছি লোকে প্রথমে বিস্মিত হয়, পরে ভীত হয়ে ওঠে। এবং সেই ভীতিপ্রদ অনুভূতি কয়েকদিন থাকবার পরে ক্রোধে মন পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষ আপন পর সকলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

একটি নাবিকের কথা মনে পড়ছে। দীর্ঘ চীন যাত্রা পথে ওকে আমরা মরিশাস থেকে তুলে নিয়েছিলাম। ও ছিল স্কচ। পশ্চিম উপকূলের দ্বীপ থেকে এসেছিল নিতান্তই সাধারণ একটি নাবিক—যারা বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়ায় তাদেরই একজন। লোকে বলে স্কচরা স্বভাবতঃ উগ্র ও গম্ভীর। কিন্তু তুমি ধারণা করতে পারবে না যে ও কি রকম আমুদে ছিল। ওর একটা পুরনো বেসুরো বেহালা ছিল, ও জাহাজের গীয়ারে সেটাকে চেপে নিয়ে জিগ বাজাত এবং যাদের সে সময়

থাকত তাদের নাচাত। আমার স্বামী বলতেন ত নাবিক একশোতে একজন হয় কিনা সন্দেহ। খারাপ আবহাওয়াতেও ও ছুটোছুটি করে জাহাজের ড়ি ধরত, ডেকের ওপরে শুয়ে গান করত। ডাস সেলাই থেকে রান্না করা—এমন কোন কাজ না যা ও না করতে পারত। আমরা সবাই ওর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম। এমনি সময়ে ভারত সাগরের নিবাতনিষ্কম্প অবস্থায় গিয়ে পড়লাম, র চোখ যায় মাইলের পর মাইল অনন্ত সমুদ্র। র ওপরে সূর্যের তীব্র রশ্মি। সকলে প্রায় নগ্ন ডেকের ওপরে ঘুমুত। কারণ, ওদের ঘরগুলো গুনের কুণ্ড হয়ে উঠেছিল।

এই ভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেলে সকলের অবস্থাই চনীয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু এই ছেলেটির মাথা একদম রাপ হয়ে গেল। দিনের পর দিন ও একা একা কি বতে থাকে—সবই বিশ্রী, নীচ চিন্তা। এক অপরাহ্নে ন সবাই বিরক্তির শেষ সীমায় চলে গেছে এবং মেজাজ ব্যস্ত খারাপ, সূর্য ও সমুদ্র আমাদের উপহাস করছে, ও ৎ ছুটে নীচে গিয়ে একটা ছুরি নিয়ে এসে সকলকে দেখাতে লাগল। প্রথম অফিসার ও আরও কয়েকটি বিককে রীতিমত আহত করবার পরে সমবেত চেষ্টায় কে বেঁধে ফেলা হল। নীচে রাখলে গরমেই মরে যাবে ই ওকে একটা মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। পাশে কোয়ার্টার ডেকের ওপাশে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একদম কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তো অনেক দেখেছি, কিন্তু এরকম ভয়ের ছবি আর কারও চোখে দেখি নি।

তখন আমি স্বামীর জন্যে একটি শার্ট তৈরি করছিলাম। চমৎকার জামাটা। সামনের দিকটায় সুন্দর সেলাইয়ের কাজ করে দিচ্ছিলাম, তখনকার দিনের জাহাজ-চালকেরা যেমন পরতেন। আমরা বন্দরে ভিড়লেই অপরাপর জাহাজ থেকে ডিনারের নিমন্ত্রণ আসত। ওর চোখের সে দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে আমি জামাটা ওর কাছে নিয়ে গেলাম, বললাম যে, আমি এটা ওর জন্যই করেছি, হংকং পৌঁছে ওকে দিয়ে দেব। ও আমার দিকে বা জামাটার দিকে একবারও তাকাল না। একটা ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল। আমি ওর সেদিনের সেই কান্না জীবনে ভুলব না। বাতাস স্থির। সূর্য একটি রক্তবর্ণ গোলকের মত দিগন্তরেখায় অস্ত যাচ্ছে আর সেখানে দাঁড়িয়ে ও কেঁদেই চলেছে। শাগ দ্বীপের এক দয়ালু-হৃদয় ব্যক্তি সেই অসম্ভব গরমে দাঁড়িয়ে ওর চোখের জল ও মুখের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছিল। ও একটু শান্ত হলে সে ওকে খাইয়ে দিল। তখন ও বেহালাটা চাইল। আমার স্বামী যখন ওকে বেহালাটা দেবার সিদ্ধান্ত করলেন তখন স্ত্রী হিসেবে আমি খুবই গর্ব অনুভব করলাম।

—ও কি 'জিগ' বাজাল?—কুয়াশা ও প্রবল ঝড়বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে লুসী প্রশ্ন করে। লুসী স্টোরের কথা ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল যে জোয়েলের যোগে ভুল হয়। ওর মনে হচ্ছিল, দিগন্তবিস্তৃত কাচের মত সমুদ্রের ওপরে ছেলেটির কান্না সে জীবনে ভুলতে পারবে না; ছেলেটিকে যদি জিগ বাজাতে না দেওয়া হয়ে থাকে তবে ও সহ্য করতে পারবে না।

—হ্যাঁ, ও জিগ বাজাল। সেদিনের সুরেই সবচেয়ে আনন্দ ফুটল যেন। আমরা সবাই নাচলাম। প্রথমে আমি আর আমার স্বামী আরম্ভ করলাম এবং তারপরে সকলেই যোগ দিল। আমরা নেচেই চললাম।

এমন কি ফার্স্ট অফিসার তাঁর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে নাচতে লাগলেন। আমরা সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম তখনই দেখতে পেলাম আকাশে প্রথম তারা এবং বন্দরের দিক থেকে এক ঝলক বাতাস এসে দড়িগুলোকে নাচিয়ে দিল।

উনি থামলেন। লুসী নিজের হাতের সেলাইটা ভাঁজ করে রাখে। লণ্ডনের পুরনো ঘড়িতে চারবার প্রতিধ্বনিত সুর বেজে ওঠে। ধীবরদের নৈশভোজের সময় সাধারণতঃ পাঁচটা।

—আমি বলছি না যে ভয়ের রূপ সর্বদাই এই—সারা হন্ট বলেন, কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে যাদের অন্তরঙ্গতা আছে তাদের সঙ্গে সমুদ্র প্রায়ই এই রকম ব্যবহার করে। সে ওখানে অপেক্ষা করে আছে। হয় তোমাকে গড়ে তুলবে, নয় শেষ করে দেবে। তোমাকে যদি সপ্তাহের পর সপ্তাহ কুয়াশা বা বিপরীত বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তোমার অপরিসীম পরিশ্রমের কণামাত্র মূল্যও যদি তুমি না পাও তাহলে তোমার মনে ভয় জাগবে, তিক্ততার সৃষ্টি হবে, একাকীত্বের বেদনায় পীড়িত হয়ে উঠবে। আবদ্ধ জলার অথবা দ্বীপের অধিবাসীরা নীচ প্রকৃতির জন্য ট্রাপ লাইন কাটে না বা চিংড়া মাছ চুরি করে না—অন্ততঃ অধিকাংশ লোক করে না। ওরা ভয় পায় আর তখনই নীচতা মহত্ত্বকে পরাজিত করে।

[ক্রমশঃ]

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

লের দাম চল্লিশ টাকা হয়েছে জেনে এবং গ্রামাঞ্চলের বহু লোক চালের অভাবে কলমি-শাক কচু সেদ্ধ খেয়ে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণান্ত হচ্ছে জেনে বেশ একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছিলাম. এমন সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে কোনো খাদ্যসংকট নেই শুনে পরম স্বস্তি লাভ করি। মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের মাঝে মাঝে এরকম আশ্বাস দেন তা হলে খুব ভাল হয়। বাজারে যখন চিনি পাওয়া যায় না তখন যদি তিনি ঘোষণা করেন যে গুদামে অজস্র চিনি ক্রেতার অভাবে পচে যাচ্ছে বা মাছের অগ্নিমূল্য যখন সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে তখন যদি তিনি জানিয়ে দেন সস্তা দামে প্রচুর মাছ পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা যখন ছেলেরা ভর্তি হওয়ার আশায় কলেজের দরজায় দরজায় ঘুরে হয়রান হচ্ছে তখন যদি তিনি একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান যে দেশে উচ্চ-শিক্ষার এমন বিপুল আয়োজন আছে যে যে-কোন ছাত্র ইচ্ছে করলে যে-কোন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, অথবা বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম তখন যদি সংবাদ দেন যে দেশে বেকার সমস্যা বলে কোন সমস্যাই নেই তা হলে আমরা অনেক দুশ্চিন্তা-উদ্বেগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। আমাদের দেশের লোক আমরা জানি যে যা আমরা চোখে দেখি বা কানে শুনি বা পেটের জ্বালায় অনুভব করি তা আপাত-প্রতীয়মান সত্য মাত্র, প্রকৃত সত্য নয়। প্রকৃত সত্যের পরিচয় লাভ করা এমন দুরূহ ব্যাপার যে কেবলমাত্র মহাপুরুষরাই তা লাভ করে থাকেন। স্বভাবতঃই এই সব মহাপুরুষের কথাকে আমরা বেদবাক্য জ্ঞানে বিশ্বাস করি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে অনায়াসে অবিশ্বাস করি যদি মুখ্যমন্ত্রীর মত মহাপুরুষগণ ঘোষণা করেন যে যা ঘটছে তা মিথ্যা, মায়া, তার বিপরীতটাই আসলে সত্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, মুখ্যমন্ত্রীর আরও একটি বাণী আমাকে দুর্লভ আনন্দ দান করেছে। তিনি জানিয়েছেন যে ১৯৫২ সনে কুচবিহারে চালের দাম মণ প্রতি বাহাত্তর টাকা হয়েছিল, এবং ফলে পরবর্তী ইলেকশানে কংগ্রেস সেখানে পাঁচটি আসন লাভ করেছিল। এই তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে চালের দাম যত বাড়ে, কংগ্রেসের জনপ্রিয়তাও তত বাড়ে। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে সরকারের আশীর্বাদ লাভ করে ব্যবসায়ীরা যদি এ বছর কলকাতায় চালের দাম একশো টাকায় তুলে দিতে পারে, তবে আগামী ইলেকশানে কংগ্রেস এখানকার সবগুলো আসন লাভ করবে। অনশনব্রতী বামপন্থী নেতারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে আন্দোলন করে যে প্রকাণ্ড একটা ভুল করছেন সেটা এই উদাহরণ থেকে বুঝতে পারা যাবে।

কাজেই এতে কোন সন্দেহ নেই যে ইমার্জেন্সি সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা যে অকুতোভয়ে চালের দাম বাড়িয়ে চলেছে তার পিছনে সরকারের সমর্থন এবং অনুপ্রেরণা রয়েছে।

হাসবেন না। হাসির কথা আমি বলছি না। সত্যি, মুখ্যমন্ত্রীর কুচবিহারের উদাহরণটা ভেবে দেখার মত। জিনিসের দাম যত বাড়ে, কংগ্রেসের প্রতি লোকের ভক্তিও তত বাড়ে। এটা একটা প্রমাণিত সত্য, এবং এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি যে দেহকে যত কষ্ট দেওয়া যায়, আধ্যাত্মিক মার্গে তত উন্নতি লাভ ঘটে। কাজেই যারা আমাদের দৈহিক কষ্টের ব্যবস্থা করে, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি। এবং এই কৃতজ্ঞতার সামান্য প্রকাশ হিসাবে কষ্টদাতাকে আমরা ইলেকশানে জিতিয়ে দিই।

এখন বুঝতে পারছি ইমার্জেন্সির করাত যে কেবল একদিক দিয়ে কাটে তার পিছনে কী মহৎ পরিকল্পনা রয়েছে। ইমার্জেন্সির ফলে যারা চাকরিজীবী, সরকারী বা বেসরকারী অফিসে, কল-কারখানায়, ইস্কুল-কলেজে যাঁরা চাকরি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আয় করেন,

তাঁদের বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয়েছে। অধিকন্তু তাঁদের উপর অতিরিক্ত কর এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অফিস দোকান কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যের যাঁরা মালিক তাঁদের খুশী-মত দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেওয়ার পথে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় নি। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। দেশের বেশীর ভাগ লোক আরও বেশী কষ্ট স্বীকার করতে বাধ্য হবে; ফলে তারা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি স্বর্গ লাভ করে মানবজন্ম সার্থক করতে পারবে। অপরপক্ষে মালিকশ্রেণীর লোকেদের জন্য আরও বেশী সুখের বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যাতে তাদের স্বর্গ-গমন আরও বেশী বিলম্বিত হয়।

সরকারের এই মহৎ উদ্দেশ্যটা আমি বুঝতে পেরেছি। আর বুঝতে পেরেছেন 'বসুধারা' পত্রিকা। 'বসুধারা' পত্রিকার সম্পাদক বলছেন: "যাঁদের বেতন থেকে বার্ষিক আয় হয় ১৫০০৲ বা ততোধিক অথচ যাঁদের আয়কর দিতে হয় না, তাঁরাই এই আইনের (বাধ্যতা-মূলক সঞ্চয় আইনের) আওতায় পড়বেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে আয়ের শতকরা ২½ ভাগ জমা দিতে হবে। এই জমা টাকা অবশ্য পাঁচ বৎসর পরে শতকরা ৪ টাকা সুদ শুদ্ধ ফেরৎ দেওয়া হবে। এই সঞ্চয় পরিকল্পনায় কিছু লোকের অসুবিধা হলেও একটা সুবিধে হবে যে নিম্নবিত্তদের হাতে কিছু টাকা জমবে যা পরে দুঃসময়ে তাদের খুব কাজে লাগবে।"

টাকা জমানোর যে সুবিধাটার কথা 'বসুধারা' জানিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে একজন শ্রমিকের উক্তি উল্লেখ করি। সে জানিয়েছে যে তার যা আয় তার থেকে মাসিক চার টাকা করে কর্তন হবে। তার ফলে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে সে এখন যে টাকা ধার নিচ্ছে অতঃপর তার ওপর আরও চার টাকা করে অতিরিক্ত ধার নিতে হবে। এবং এই ধারের জন্য তাকে সুদ দিতে হবে টাকা প্রতি মাসে দু আনা করে। কাজেই পাঁচ বছর পরে এই শ্রমিকটির যে অতিরিক্ত সঞ্চয় কী দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাজারদরের দিকে যিনি নজর রাখেন তিনিই বলবেন যে এ শ্রমিকটি একটি ব্যতি-ক্রম নয়, শতকরা অন্ততঃ পঁচানব্বইজন শ্রমিকেরই অবস্থা ঠিক এইরকম। 'বসুধারা' পত্রিকার সম্পাদক এ অত্যন্ত স্থূল সত্যটা জানেন না তা নয়, কিন্তু তিনি অন্য-বশতঃ তা উল্লেখ করতে পারেন নি। কংগ্রেসের মুখ-হয়ে কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করা তো সম্ভবপর নয়। 'বসুধারা' একটি উদাহরণ মাত্র। এটা দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে কোন সাহিত্যপত্র যদি কো দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে (সেই দল যদি ক্ষমতা অধিকারী হয় তা হলে তো পোয়া বারো) তবে সকল আগে একজন খুন হবেন। তাঁর নাম সত্য।

আমার তো মনে হয় মুখ্যমন্ত্রী যে সব কথা বলে তারপর দেশের বর্তমান অবস্থাকে খাদ্যসংকট না খাদ্যকলঙ্ক বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। খাদ্যকলঙ্ক প্রফুমো-কলঙ্কের মধ্যে কোন্‌টার গুরুত্ব বেশী তা ঠিক জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি প্রফুমো-কলঙ্ক ফলে ইংলণ্ডে কারও প্রাণহানি ঘটে নি; কিন্তু খাদ্য কলঙ্ককে যদি বর্তমানের অবস্থায় আরও কিছুদিন জিইয়ে রাখা যায়, তবে নিশ্চয়ই বেশ কয়েক লোকের অকালে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে। প্রফুমো-কেলেঙ্কারি সম্পর্কে কথাসাহিত্য বলছেন: "ইংরেজের নিকট আমরা অনেক শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি—কিন্তু এখনও অনেক কিছু শিক্ষার প্রয়োজন আছে। ওদেশের একজন মন্ত্রী তরুণী কুমারী মেয়ের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত এই সংবাদ প্রচারিত হইলে (মনে রাখিবেন অপর কোন গুরুতর অপরাধ নয়—রাষ্ট্রের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই বা বিদেশে চালান যায় নাই) শুধু যে সে মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয় বা দেশান্তরী হইতে হয় তাহা নহে—এখনও ওদেশে একের এই অপরাধে সমস্ত শাসকদলের মাথায় হাত দিয়া বসিতে হয়—আগামী নির্বাচনের সম্মুখস্থ হইতে তাঁহারা শিহরিয়া ওঠেন। আর আমাদের দেশে? মন্ত্রীরা কেহ কেলেঙ্কারী করিলে বরং তাঁহাদের পদোন্নতি হয়!"

উদ্ধৃতিটিতে ব্রাকেটে বর্ণিত অংশটুকু খুব সম্ভব ঠিক নয়। প্রফুমো-ঘটিত ব্যাপারে কোন গুপ্ত তথ্য বিদেশে চালান গিয়েছে বলে প্রমাণিত হয় নি বটে, কিন্তু সেই আশঙ্কা রয়েছে বলেই ব্যাপারটা এত গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের দেশের মত ওদেশেও নারীঘটিত কেলেঙ্কারি

...টে থাকে, এবং সুখভোগ যে সমাজের একমাত্র ... সে সমাজে এ জিনিস এখন প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলে ...নের স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানুষ বহু কষ্টস্বীকার বহু অর্থব্যয় করে মন্ত্রী হওয়ার পর যদি দু-চারজন ... সঙ্গলাভ করারও সুযোগ না পায় তবে আর মন্ত্রী ...ভ কী? সব সমাজেই সাধারণ মানুষদের জন্য সমাজের উপরতলার মানুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ...মানের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু এটা গৌণ প্রসঙ্গ। মোটের উপর 'কথা-...ত্যে'র উপরের উদ্ধৃতিটিতে এ ক্ষোভ অত্যন্ত স্পষ্ট ...ধ্বনিত হয়েছে যে শ্রীরাধার মতই আমাদের দেশের ...ের কাছে কলঙ্ক হল অঙ্গের ভূষণ, লজ্জার বিষয় নয়। ...ম একটু আগেই শ্রীসেনের ঘোষণা উল্লেখ করেছি যার ...ল, শাস্ত্রকলঙ্কই কংগ্রেসের শ্রীবৃদ্ধির সোপান মাত্র। ...ই এ কথা মানতে হয় যে সরকার-বিরোধী অপ্রিয় ...কথা বলার সৎসাহস 'কথাসাহিত্য' অন্ততঃ কখনও ...ও দেখিয়ে থাকেন।

সাহিত্যের আলোচনা করতে বসে আমি যে এতখানি ...প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলাম, ...র উদ্দেশ্য উপরের দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা। যে ...রাজনৈতিক পটভূমিকায় উপরের উদ্ধৃতি দুটি প্রকাশিত ...য়েছে তার আলোচনা ছাড়া এদের প্রকৃত তাৎপর্য ...দঘাটন করা সম্ভব ছিল না। 'বসুধারা' পত্রিকা সম্প্রতি ...কান কোন কংগ্রেস নেতার তত্ত্বাবধানে চলে গিয়েছে। ...র ফলে এ কথা আজ জলের মত স্পষ্ট যে এখন থেকে ...গোপন, সত্যবিকৃতি আর নির্জলা মিথ্যা পরিবেশনই এই পত্রিকার মূল মন্ত্র হয়ে উঠবে। কোন দলীয় স্বার্থের সঙ্গে কোন পত্রিকার গাঁটছড়া বাঁধা থাকলে একটি কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি: সে পত্রিকার সত্যনিষ্ঠা বা অবজেকটিভিটি বলে কোন জিনিস থাকবে না। যেসব ...ে কবিতায় অপ্রিয় সত্যকে অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশের ...চেষ্টা থাকে, সেসব সাহিত্য-কর্ম সেখানে প্রকাশিত হবে না। এ কথাকে যদি আমরা একটি স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করি যে সত্যনিষ্ঠা ব্যতীত সৎসাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না, তবে এই ধরনের পত্রিকা কোনদিনই সৎসাহিত্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠবে না। পক্ষান্তরে 'কথাসাহিত্য' বা এই ধরনের কোন দলীয় আনুগত্য বহির্ভূত পত্রিকা খুব আদর্শনিষ্ঠ না হলেও অন্ততঃ মাঝে মাঝে সত্য কথা বলতে এবং সৎসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে বা পারবে বলে আশা করা অসঙ্গত নয়।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বসুধারা'র পাতাগুলো একবার উলটে গেলেই এর বিধবা-চরিত্রটি ধরতে পারা যাবে। পত্রিকাটি যে কংগ্রেসীদের হাতে পড়েছে সে কথা যেন নামাবলীর মত এর সারা গায়ে লেখা রয়েছে বলে মনে হয়। এর প্রতি পাতায় একটা কংগ্রেস-কংগ্রেস খাদি-খাদি গন্ধ আছে। শুধু তাই নয়, সেই খাদি-গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটা ধর্ম-গন্ধ। আদর্শহীনতার দেশে এমন আদর্শনিষ্ঠা দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়।

কিন্তু 'বসুধারা'য় আদর্শনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি দেখে একটু গোলে পড়েছি। প্রচার করতে গেলেই তার ভাষা একটু স্থূল হয়ে পড়ে; প্রচারমূলক সাহিত্যের সাহিত্যগুণ বিশেষ থাকে না। এ সব আমরা জানি এবং জেনে-শুনেও দেশের লোকের ভালর জন্যে আমরা আদর্শমূলক প্রচারকে কখনও কখনও সমর্থন না করে পারি না। কিন্তু আমার ভোঁতা মাথা থেকে একটা খটকা কিছুতেই দূর করতে পারছি না। যে সময়ে কংগ্রেসী নেতারা ও মন্ত্রীরা এবং তাঁদের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা প্রাণপণে অর্থ শক্তি ক্ষমতা আর বিলাসদ্রব্য আহরণে ব্যস্ত, তখন কংগ্রেসী প্রচারের মধ্যে এত ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন। যতদূর জানি, কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মনীতি ও লক্ষ্যের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। গান্ধীজী ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর রামরাজ্য পরিকল্পনার মধ্যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিল; কিন্তু নেহেরুর সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণভাবে জড়বাদী চিন্তা অনুযায়ী পরিকল্পিত। আমার নজর একটু বাঁকা, তাই যে-মানুষ একভাবে চিন্তা করে এবং আর একভাবে কাজ করে এবং আর এক তৃতীয় রকমে প্রচার করে, সে-মানুষকে আমি একটু সন্দেহের চোখে না দেখে পারি না।

'বসুধারা' পত্রিকার ধর্মানুরক্তি যে কতখানি প্রবল, তার একটু পরিচয় দিচ্ছি।

প্রথমেই উল্লেখ্য বিমল মিত্র রচিত ধারাবাহিক উপন্যাস "আমি"। উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত বিমল মিত্র

ভাল করেই জানেন যে কাহিনীর নায়ককে সব সময়েই হতে হবে কতকগুলো আদর্শের অটোমেটন বা পুতুল। নায়ক সব সময়ই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরহিতব্রতী, ত্যাগী এবং নিতান্ত সাধারণ বা অসহায় অবস্থা থেকে উন্নীত হয়ে বিরাট অর্থ বা পদের অধিকারী। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' পর্যন্ত তাঁর নায়করা আদর্শ পুরুষ; কিন্তু এবারকার উপন্যাসে তিনি যে নায়কটি সৃষ্টি করেছেন সে মহাপুরুষ; গান্ধীজী এবং রামকৃষ্ণকে পাঞ্চ করলে যা হয় সে তাই। পড়লেই বোঝা যায় কারুর ফরমাশ অনুযায়ী বিমলবাবু একেবারে স্বর্গ থেকে গান্ধীয়ান আদর্শের টিংচারে তৈরী ছাঁচে-গড়া নায়কটিকে অর্ডার দিয়ে আমদানি করেছেন। বিমলবাবু অবশ্য পাঠকের নাড়ী ধরে লেখেন; তিনি ভাল করেই জানেন তাঁর নায়কের মুখ থেকে গান্ধীয়ান বুকনি শোনার জন্য কেউ তাঁর বই পড়বে না। তাই অন্যান্য বইয়ের মত এই বইয়েও তিনি একটি রূপকথার গল্প ফেঁদেছেন। তার মধ্যে বনেদী বড়লোক, জমিদার, জমিদারের প্রকাণ্ড শিল্পপতিতে রূপান্তর, বড়লোকের ছেলের সিদ্ধার্থের মত বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে অনেক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে মহাপুরুষ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি যাবতীয় রূপকথাসুলভ উপাদানকে সংগৃহীত করেছেন। কাজেই বিমলবাবুর কাহিনীটির গায়ে নামাবলী জড়ানো থাকলেও ভিতরে অনেক আমিষের ব্যবস্থা থাকবে বলে আশা করি তাঁর ভক্ত পাঠকগণ এটির প্রতিও তাঁদের ভক্তি নিবেদন করবেন।

আলোচ্য সংখ্যাটিতে ছয়টি রচনাই বিদেশী সাহিত্য বা দেশের অতীতের বা বর্তমানের পত্রপত্রিকাদি থেকে সংগৃহীত। এই সংগ্রহ-বাতিক দেখে সন্দেহ হয় যে ফরমাশ দিয়ে টাকার প্রলোভন দেখিয়েও যথেষ্ট সংখ্যক প্রচারমূলক রচনা পাওয়া যাচ্ছে না। সংগৃহীত রচনাগুলোর মধ্যে "আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতি" নামক প্রবন্ধটিতে পরলোকগত আচার্যের ভাববাদী দর্শন সম্পর্কে আলোচনা আছে; সুতরাং এটি ধর্মালোচনার মাসতুতো ভাই। নলিনীকান্ত গুপ্তের "সত্যানন্দ, মানানন্দের" নামক কাল্পনিক কথোপকথন নামক নিবন্ধে ভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্যের মহত্ত্ব কীর্তন করা [illegible] "জপ" নামক সংগৃহীত গল্পটি একটি

রূপক গল্প। লেখক দেখিয়েছেন যে কামনা-বাসনার পিছনে ছুটে বেড়ানোই মানুষের স্বভাব এবং সেইজন্য সে সর্বদাই ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। বলা বাহুল্য এই উপলব্ধি ধর্মলাভের প্রথম সোপান মাত্র। যাঁরা প্রতি তিনতলার উপর চারতলা এবং চারতলার উপর পাঁচতলা বাড়ি হাঁকাচ্ছেন, এ গল্পটিতে একেবারে তাঁদের উপলব্ধির নির্যাসটুকু প্রকাশ পেয়েছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" নামক গল্পটি বঙ্কিমের যুগের [illegible] সুতরাং তার মধ্যে কিছু ধর্ম আর আদর্শের মিলন [illegible] দেখতে পাওয়া যাবে।

'ঘুম' নামে সুবোধকুমার চক্রবর্তী একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন। চক্রবর্তী মশাই এমনিতেই ধর্মবিশ্বাসী মানুষ সুতরাং 'বসুধারা'র অনুকূল ক্ষেত্র তিনি যে এই উপন্যাসে প্রচুর ধর্মমূলক মাল ঢুকোবেন তার লক্ষণ বর্তমান সংখ্যাতেই পাওয়া [illegible] শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের "যতদূর রোদ্দুর" গল্পটি পয়লা নম্বরের হিতোপদেশের গল্প। নায়ক [illegible] হিংসুটে ও সাহসী ছিল, ততদিন পর্যন্ত সে ছিল নিজের বাপ-মাকে পর্যন্ত ঘৃণা করত। তারপর [illegible] সকলকে ভালবাসতে আরম্ভ করল, তখন দেখল বাপ-মাকে সে কত ভালবাসে; এবার সে সত্যি সুখী হল। গল্পটির উপদেশের লক্ষ্য হল কমিউনিস্ট এবং এর মধ্যে একটি প্রধান কংগ্রেসী উপদেশ রয়েছে— সবাইকে ভালবাস, এমন কি বেত্রধারী শাসককেও।

ধর্মমূলক বা ধর্মাশ্রয়ী নীতি বা তত্ত্বপ্রচারের মতো নয় এমন কয়েকটি রচনাও অবশ্য এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে দুটি সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ: "প্রকল্পনা ও বিকল্পনা" নামক প্রবন্ধ সংগৃহীত; তাতে কোলরিজের বিখ্যাত Imagination আর Fancy তত্ত্বের আলোচনা রয়েছে, আর "যৌবনের কবি নজরুল" নামক একটি মৌলিক রচনায় বিদ্রোহী নজরুল আর প্রেমিক নজরুলের মামুলী স্তুতিমূলক আলোচনা রয়েছে। কয়েকটি ধর্ম-সম্পর্কহীন বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধও রয়েছে। প্রবন্ধগুলিতে পাণ্ডিত্য বা চিন্তাশীলতার কোন স্থান নেই; নিতান্ত সাদামাটা কতকগুলি তথ্য বা উপদেশ সরবরাহ করাই এ

—এ ধরনের প্রবন্ধ সাধারণতঃ দৈনিক পত্রিকার রবিবার সংখ্যায় বা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ছাপা হয়ে প্রবন্ধগুলিতে খুব কৌশলে কংগ্রেসের নীতি করা হয়েছে। "যৌবন জলতরঙ্গ" প্রবন্ধটিতে দীর্ঘ লাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক উপদেশ দিচ্ছেন: "বেশী খাওয়া চলবে না।" যে মানুষের নিম্নতম দৈনিক প্রয়োজন ৩০০০ ক্যালরির বদলে লোকে ১৫০০ থেকে ১৮০০ ক্যালরির বেশী খাদ্য খায় না সে দেশে এ রকম উপদেশ দেওয়ার অর্থ কি তা বোঝা কিছু কঠিন "বেকার সমস্যা ও কর্মসংস্থানের নবদিগন্ত" প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে উপযুক্ত বৃত্তি চনে ব্যর্থতার ফলেই লোকে বেকার থাকে; কারণ দিকে যেমন বেকারের সংখ্যা প্রচুর, অপরদিকে "এই র সমস্যার সঙ্গে কয়েক শ্রেণীর কর্মীরও বিশেষ অভাব এই রাজ্যে।" লেখক বুদ্ধি করে কোন সংখ্যান উল্লেখ করেন নি: যদি তিনি বিভিন্ন বৃত্তিতে জন কর্মীর অভাব এবং মোট বেকারের সংখ্যা এই দুইয়ের হিসাব পাশাপাশি হাজির করতেন লে গণিতশাস্ত্র নিজেই লজ্জা পেয়ে মুখ লুকোত।

চারটি কবিতার মধ্যে তিনটিই প্যাস্টারন্যাকের বাদ। এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। এ সব আর একটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ প্রসঙ্গ আছে—নেমা এবং সিনেমার নট-নটীদের আলোচনা।

সাহিত্য-মূল্যের বিচারে বলা চলে একমাত্র সংগৃহীত গুলি পড়ার মত; নিঃসন্দেহে অনেক অনুসন্ধান করে খুঁজে বার করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম প্রকাশিত গুলির মধ্যে আমি একটিও খুঁজে পাচ্ছি না যেটা অক্ষরে প্রকাশ করার উপযোগী।

সুধারা'র একটি সংখ্যার বিষয়-সূচীর এই সংক্ষিপ্ত থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নবকলেবরের রা' একটি সাধারণ বুদ্ধিজীবী বা সাহিত্যমূলক পত্রিকা নয়; এটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারমূলক পত্রিকা। দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের ধানে সাহিত্যকর্মকে নিয়োগ করা হচ্ছে। কংগ্রেসের প্রচারকার্য পরিচালনা করার জন্য এদেশে যথেষ্ট পত্র-পত্রিকাদি বহুদিন ধরেই কাজ করে চলেছে। সকলেই জানেন যে, যে-সব দৈনিক পত্রিকা অনেক সময় কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মের কঠোর সমালোচনা করে থাকে, তারা আসলে একান্তভাবেই কংগ্রেসের অনুরক্ত, এবং যে কোন মৌলিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে তারা দৃঢ়ভাবে কংগ্রেসের পিছনে এসে দাঁড়ায়। একটু নিরপেক্ষতার ভান আছে বলে প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে এগুলির উপযোগিতা আরও বেশী। তবুও কেন 'বসুধারা' নামক নিরীহ পত্রিকার কাঁধের উপর প্রচারের জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া হল তার কারণটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সাহিত্যকে প্রভাবিত করা, সাহিত্য-কর্মকে একটি নির্দিষ্ট খাতে পরিচালিত করার প্রয়াস হিসাবে এই পত্রিকার আবির্ভাব। যে কাজ ইতিপূর্বে কমিউনিস্ট পত্রিকাগুলো করেছে, যে কাজের উদাহরণ মস্কো এবং পিকিঙে অজস্র দেখতে পাওয়া যায়, অবশেষে আমাদের সুমহান্ কংগ্রেসও সেই বহুপদচিহ্ন-রঞ্জিত পথে যাত্রা শুরু করলেন। 'বসুধারা' পত্রিকা কমিউনিস্ট-বিরোধী, কিন্তু কমিউনিস্টদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। এ পত্রিকায় স্বাধীনতার জয়গান করা হবে, কিন্তু এক বিশেষ ধরনের রচনা ছাড়া অন্য ধরনের রচনা এখানে প্রবেশাধিকার পাবে না।

কিন্তু সেই পুরনো প্রশ্নটা এখনও উঁকিঝুঁকি মারছে: 'বসুধারা' পত্রিকায় বিশেষ করে কাহিনীমূলক রচনার মধ্যে এত ধর্ম বা ধর্মাশ্রয়ী চিন্তার বাড়াবাড়ি কেন? আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের যত ঘোষণা ও প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কোথাও ধর্মের কোন সংস্রব খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু গান্ধীজীর শুধু দৈহিক দিক থেকেই মৃত্যু হয় নি, তাঁর চিন্তা ভাবনা আদর্শও মরে-হেজে ভূত হয়ে বেহেস্তে গমনে করেছে। কংগ্রেসী সাহিত্য সেই মরা ভূতটাকে কাঁধে করে ধেই ধেই করে নাচছে কেন?

কারণ, ধর্ম যে কত বেশী কার্যকরী বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা লেনিনই সে কথা বলে দিয়ে গিয়েছেন: Religion is the opium of the people. সেই আফিমেরই বিশেষ ভাবে দরকার দেখা দিয়েছে আজকে। জনচিত্তকে বাস্তব চিন্তা থেকে বিক্ষিপ্ত করতে হলে ধর্মের চেয়ে অধিকতর উপযোগী হাতিয়ার আর কিছু নেই।

শুধু আফিম সরবরাহের জন্যই যে ধর্মমূলকতা তা নয়, আরও কারণ আছে। কমিউনিজম এক ধরনের ধর্ম; যদিও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসগুলির সে ঘোরতর বিরোধী। কাজেই কমিউনিজম নামক ধর্মকে প্রতিরোধ করতে হলে একটি বিকল্প ধর্ম আবশ্যক, বিশেষ করে আমাদের দেশের মত পশ্চাদ্‌বর্তী দেশে। কংগ্রেসের নিজের কোন ধর্ম নেই, কংগ্রেস শুধু ধর্মনিরপেক্ষ নয় ধর্মবর্জিত, পাশ্চাত্ত্য সেক্যুলার স্টেটের আদর্শই তার ঘোষিত ও উপজীব্য আদর্শ। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? প্রচলিত দৃঢ়মূল ধর্মবিশ্বাসগুলোকেই নতুন সাজে সাজিয়ে সাহিত্যিকদের কুশলী তুলির স্পর্শে সঞ্জীবিত করে জনচিত্তের সামনে তুলে ধরলে তা কমিউনিজম নামক ধর্মকে প্রতিরোধ করতে পারবে বইকি।

Opposite poles meet. আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব পৃথিবীর যে সব দেশে কায়েত একদলীয় শাসন প্রবর্তিত রয়েছে, সে সব দেশেই কোন না কোন ধরনের আফিমের প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হচ্ছে। চীনদেশের আফিম বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন, আমেরিকার আফিম বর্বর ভোগবাদ, ইংলণ্ডের আফিম মিস্টিসিজম, পাকিস্তানের আফিম ভারতবর্ষ নামক জুজু, আর ভারতবর্ষের আফিম ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা এই বিভিন্ন ধরনের আফিমকে গালিয়ে ছাঁচে ফেলে সাহিত্যের বড়ি তৈরি করেছেন, আর সেই বড়ি খেয়ে অনিদ্রা রোগগ্রস্ত পাঠকরা নিদ্রালাভ করছে। সচেতন ভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে মানবচিত্তের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করা যায়—এ সত্যটা কমিউনিস্টরা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। আজকে সেই একই অস্ত্র কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হচ্ছে। এ এক মজার ব্যাপার। সাহিত্য কি তা আমরা আজও ঠিক ঠিক ভাবে জানি না, কিন্তু সাহিত্যকে আমরা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারি—যেমন মানুষের মন কি তা আমরা জানি না, কিন্তু মনকে 'কণ্ডিশন' করে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারি।

অতএব রাজনৈতিক জগৎ যেমন দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে সাহিত্যের জগৎও তেমনি দুই শিবিরে ভাগ হতে চলেছে। আশা করা যায় এর ফলে সকলেরই ভাল হবে। শাসকরা নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ করতে পারবেন, পত্রিকাগুলো ফেঁপে উঠবে, লেখকেরাও ফেঁপে উঠবেন এবং পাঠকদেরও বেশ সুনিদ্রার ব্যবস্থা হবে। ভাল হবে না শুধু দুষ্ট একটি উইপোকার—সাহিত্যের। যে সাহিত্য মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, মানুষকে আচমকা দারুণ আঘাত দিয়ে সচেতন করে তোলে, যে সাহিত্য অপ্রিয় সত্য কথা বলে, অসুবিধাজনক তথ্যকে প্রকাশ করে, জীবনের সমাজের অনেক অশোভন অপ্রীতিকর গোপনীয় ঘটনাকে নির্মম নিষ্ঠুর নিরাসক্তির সঙ্গে উদ্ঘাটিত করে, সেই সাহিত্য আর সৃষ্টি হবে না। যে সাহিত্য আশ্চর্য, অদ্ভুত, খাপছাড়া, খামখেয়ালী, অনিশ্চিতধর্মী—কখন সে কাকে আঘাত করে বসবে বলার উপায় নেই, যে সাহিত্য যুগে যুগে সুখের সংসারকে ভেঙে দিয়ে নতুন সংসার রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে, অসুবিধাজনক বলে যে সাহিত্যকে প্লেটো তাঁর রিপাব্লিক থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, সে সাহিত্য আর লেখা হবে না। তার বদলে যা লেখা হবে তার পরিচয় 'বসুধারা'র পাতায় পাতায় দেখা যাবে। সহজ সুললিত ভাষায় লেখা সহজ মিষ্টি নীতি-উপদেশাত্মক এই কাহিনীগুলির দ্বিতীয় ভাগ সাহিত্য নাম দেওয়া চলে। যে পাঠকদের বয়স হয়েছে, অথচ তবু যাদের আমরা চিরশিশু করে রাখতে চাই, এই সাহিত্য পড়ে তারা ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করবে, আর শিখবে কী করে শাসক শ্রেণীর আদেশ নির্বিবাদে পালন করতে হয়। অতএব আসুন আমরা বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাগ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

'বসুধারা'র গুণকীর্তন নামক মজলিসী পর্ব এখানে শেষ হল। এবার আমি একটি কথা সবিনয়ে জানাতে পারি। আমি ধর্মের বিরোধী নই বা ধর্মমূলক সাহিত্যের বিরোধী নই। আমি জানি যে, ধর্মীয় অনুভূতি অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে এমন কি এই বিংশ শতাব্দীতেও। কিন্তু ধর্মমূলক সাহিত্য বা যে কোন ধরনের সাহিত্যকর্মই তখনই সাহিত্য হয়ে ওঠে যখন তা লেখকের অন্তরের অভিজ্ঞতার সহজ স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসাবে রচিত হয়। কৃত্রিম ভাবে চাপ সৃষ্টি করে, প্ররোচনা দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, অনুকূল ফ্যাসান সৃষ্টি করে, লেখককে দিয়ে যা-ই লেখানো যাক না, সুন্দর সুন্দর ধার-করা কথা ও বাক্যের সমষ্টি হয়, সাহিত্য হয় না—যেমন বিমল মিত্রের 'আমি'। কাজেই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনার পথ রোধ করার পন্থা আবিষ্কারের জন্য 'বসুধারা'কে আর একবার ধন্যবাদ জানাই।

আলোচনাটি এই পর্যন্ত পড়ে আমার এক বন্ধু বললেন, ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। তোমার কি সেই অবস্থা হয়েছে নাকি?

জিজ্ঞেস করলাম, কেন, এ কথা বলছ কেন?

বসুধারার একটি মাত্র সংখ্যা পড়ে তুমি যে এতটা অনুমান করে ফেলেছ, এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে তুমি মনে কর না?

একটু চিন্তা করে বললাম, হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। যদি 'বসুধারা'র পরবর্তী সংখ্যাগুলো দেখে মনে হয় আমার অনুমানগুলো অসঙ্গত, তা হলে যথাসময়ে ভুল স্বীকার করব।

নিন্দুকের প্রতিবেদন

চার্বাক

॥ জরা এবং যৌবন ॥

আমার প্রিডিসেসর-নিন্দুক তাঁহার প্রতিবেদনে এক-একবার এক-একজন সাহিত্যিক-কুলাঙ্গারকে ধরিয়া পড়িতেন। বকরাক্ষসের মত তাঁহার বরাদ্দ ছিল মাসে একটি : কোটা-অনুযায়ী বরাদ্দ পাইলে তিনি তাই বেশি খাই-খাই করিতেন না। আমি কিন্তু মনস্থ করিয়াছি এক একটি নহে, দুই দুইটি করিয়া বিষয়ের উপর মাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপিত করিব। গত মাসে কোনও সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ না করিলেও আমি জোড়া ভাঙ্গি নাই—যথারীতি দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি।

ইহার প্রধান কারণ হইল, স্বভাবতঃ আমি রক্ষণশীল, সনাতনপন্থী। আমাদের সনাতন ট্রাডিশনে দেখা যায় আমরা ইউনিট হিসাবে এক অপেক্ষা জোড়াতে বেশি [illegible]। অদ্বৈতবাদ আমাদের মধ্যে তেমন স্থায়ী [illegible] বিস্তার করিতে পারে নাই, দ্বৈতবাদেই আমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ। অধিকাংশ দ্রব্যের বেচাকেনা আমরা জোড়ার দরে করিতে অভ্যস্ত। পাতিলেবু হইতে আরম্ভ করিয়া দৃষ্টান্ত দেখুন, প্রথাগত ইউনিট এক নহে—দুই। বিশেষতঃ যে দুইটি বস্তু কখনই আপনি অযুগ্ম অবস্থায় কল্পনা করিতে পারিবেন না, করিলে আপনার বাঙালী নামে কলঙ্ক লেপন হইবে,—তাহারা হইল আকাশবাণী কলিকাতার আধুনিক বাংলা গান এবং কাঁচকলা। এই দুর্মূল্যের বাজারেও—যখন জোড়া-হিসাবে ধুতি-শাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বোল্লিখিত পাতিলেবু পর্যন্ত অনেক কিছুতেই আমরা অবস্থার চাপে সনাতন রীতি পরিত্যাগ করিয়াছি তখনও—কাঁচকলা এবং আধুনিক গান জোড়া ভাঙিয়া খুচরা সাপ্লাইয়ের উদাহরণ অত্যন্ত বিরল ব্যতিক্রম।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সহিত আধুনিক বাংলা গানের সম্পর্ক স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু গান অপেক্ষাও কাঁচকলার সহিত সাহিত্যের মিল আরও অধিক। দেখুন কাঁচকলা কাঁচা থাকিতেই আদৃত, পাকিলে তাহার আদর নাই : সাহিত্যও—আধুনিক বাংলা সাহিত্যও—যত কাঁচা এবং কচি হইবে, ততই তাহার খরিদ্দার-সংখ্যা বেশি হইবে। কাঁচকলা এবং বাংলা সাহিত্য ম্যাচিওর হইলেই বরবাদ হইয়া গেল, কেহই তেমন বস্তু পছন্দ করে না। উদ্ভিদ-জাতীয় কলা-গোষ্ঠীতে যাহা কাঁচা, তাহার নাম কাঁচকলা : শিল্পজাতীয় কলার গোষ্ঠীতে যাহা কাঁচা (কাঁচা খিস্তি হইলে আরও উত্তম) তাহাই এক্ষণে সাহিত্য নামে খ্যাত। কাঁচকলার একটি বৃন্তে কতগুলি কাঁদি ফলিবে, একটি কাঁদিতে কতগুলি কদলী, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা যেমনই কঠিন, একটি সাহিত্যিকরূপী কদলীবৃক্ষে কতগুলি সাহিত্য-কদলীর অপপ্রসব হইবে তাহা অনুমান করাও তাদৃশ কঠিন কর্ম। কিন্তু একটি কথা বলিতে পারি : সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে—অন্ততঃ যে সকল সাহিত্যিক আমার প্রতিবেদনে আলোচিত হইবেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে—কদলীর সংখ্যা কমপক্ষে আট। সাহিত্যে অষ্টরম্ভা যিনি না প্রসব করিয়াছেন, আমার শনির দৃষ্টি আমি সাধারণতঃ তেমন সাহিত্যিকের উপর ফেলিব না।

তাহা হইলে বুঝান গেল, কী কারণে কাঁচকলার ন্যায় সাহিত্য-প্রতিবেদনেও আমি জোড়ার ইউনিট ব্যবহার করিতে চাই। তবে এ কথাও বলিয়া রাখি, সর্বদাই যে জোড়া বলির মানত রক্ষা করিতে পারিব ইহার গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নহে। সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করিব না, ইহাই নিবেদন।

এবারে পাঠকের চণ্ডীমণ্ডপের চত্বরে আমি যে দুইজন সাহিত্যিককে হাজির করিব, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে কিছুই মিল নাই। ইঁহাদের একজন যুবক, অপরজন বৃদ্ধ। একজন সুপুরুষ, অপরজন—লিখিতে যাইতেছিলাম, কাপুরুষ ; কারণ তিনি ছদ্মনামের অন্তরাল-বাসী ; কিন্তু এ অপবাদ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য

হইতেছি, কারণ আমি নিজেও ছদ্মনামা। একজন ভুল বাংলা লেখেন সুখপাঠ্য রচনার প্রয়োজনে, অপরজন ভুল বাংলা লেখেন দ্রুতবেগে লিখিয়া রচনার সংখ্যা বৃদ্ধির নিষ্প্রয়োজনে। একজন কলিকাতা ছাড়াইয়া উত্তরের বৃহত্তর শিল্পাঞ্চলের অধিবাসী, অপরজন দক্ষিণ শহরতলীর কেতাদুরস্ত এলাকার।

ইঁহাদের প্রথম ব্যক্তির নাম সমরেশ বসু, দ্বিতীয় ব্যক্তির ছদ্মনাম জরাসন্ধ।

সমরেশ কেবলমাত্র বয়সেই যুবক নহেন, তাঁহার রচনার বিষয়বস্তুও সচরাচর যৌবন ও যৌবনের অনুষঙ্গ। জরাসন্ধ কেবল নামের প্রথমার্ধে 'জরা'-গ্রস্ত নহেন, তাঁহার সাম্প্রতিক রচনাসমূহের সামান্য উপজীব্যও জরা। কখনও সেই জরা কাহিনীর নায়কের দেহে কিংবা মনে, কোথায়ও বা সেই জরা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত জড়াইয়া থাকার ফলে গ্রন্থের মলাট হইতে মলাট পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

কিন্তু এই সকল আপাত-বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও আমি যে এই দুইজনকে একই প্রতিবেদনের সহিত বাঁধিতেছি তাহার কারণ বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা মূলতঃ ইঁহাদের সাদৃশ্য কম নহে। সেই মৌলিক সাদৃশ্য হইল রুচির বিকৃতিতে। সমরেশ বসু ইতঃপূর্বে আর একবার এই প্রতিবেদনের পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছিলেন, সে-কারণে আমি এবারে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে তাঁহার সামারি ট্রায়াল সারিব। এবং সেই কারণেই উপন্যাসের পরিবর্তে এবারে সমরেশের একটি ছোট গল্পের সংগ্রহ পুস্তক আমি আলোচনার্থে সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা হইতেই আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য দেখানো যাউক।

গল্প সংগ্রহখানির নাম 'তৃষ্ণা।' ইহার ভূমিকায় সমরেশ লিখিতেছেন :

"জীবনের মূল (উকার-স্থলে উ-কার মুদ্রণ-প্রমাদ-জ্ঞানে উপেক্ষণীয়) আবর্তের অন্তরালে, যে অদৃশ্য চাবিকাঠিটি নিয়ত ঘুরপাক খায়, তাকে আমরা সহসা দেখতে পাই নে। কিন্তু তার নিয়মেই জীবনের যত খেলা। আর সেই জন্যেই তাকে আমরা খুঁজে মরি। এই খুঁজে মরার-ই নাম বোধ হয় শিল্পীর পরিশ্রম, তার অধ্যবসায়, তার অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান। চাবিকাঠিটি খুঁজে পাওয়া বড় দায়। তাই সংকলনের গল্পগুলির মধ্যেও সেই একই মূল কথা—'তৃষ্ণা'। পিপাসা। পিপাসা জীবনের ও মনের, বাঁচার ও ভালবাসার।"

ভূমিকার এবম্বিধ সিউডো-দার্শনিক পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সমরেশ বসুর সাহিত্য-কীর্তির মূল চাবিকাঠিটি খুঁজিয়া পাইতে পাঠকের খুব কিছু দেরি লাগিবার কথা নয়। সমরেশ বসুর তৃষ্ণা যে পিপাসা নহে, ক্ষুধা ; এবং সে ক্ষুধা যে জীবন ও মন, বাঁচা ও ভালবাসার বহুরূপী ছদ্ম-পোশাক পরিয়া থাকিলেও আসলে জান্তব [illegible] ছাড়া অন্য কোন জটিল [illegible] নহে, এই কথা বুঝিবার জন্য গল্প-সংকলনটির [illegible] যেকোনও স্থান হইতে [illegible] পৃষ্ঠা পড়িলেই যথেষ্ট।

কিংবা তাহাও নহে। সংকলনটি হাতে করিলেই যথেষ্ট। প্রচ্ছদপটের তাৎপর্যময় চিত্রটি, যাহার প্রতিলিপি পুস্তকের টাইটেল পেজের পূর্ব পৃষ্ঠায় পুনশ্চায়িত, দেখিলে পুস্তকটির উপজীব্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই কারণে প্রচ্ছদ-শিল্পীকে বাহবা দিতে হয়। কিংবা কে বলিতে পারে, বাহবা হয়তো গ্রন্থকারেরই প্রাপ্য—হয়তো তিনি প্রচ্ছদ-শিল্পীকে এই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ ডিজাইন আইডিয়া দিয়াছেন।

চিত্রটির বর্ণনা করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। কোন একটি বিশেষ প্রাতঃকৃত্যের ক্ষেত্রে যেমন যে করিতেছে তাহার অপেক্ষা যে দেখিতেছে তাহার লজ্জা অধিক (এত ঘুরাইয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না, ১৪৮ পৃঃ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া "রাস্তার পাশে কাঁচা নর্দমাটি বসে মলমূত্র ত্যাগ" লিখিলেই মিটিয়া যাইত !)—তেমনি এই পুস্তকের প্রচ্ছদ-চিত্রও যিনি আঁকিয়াছেন তাঁহার অপেক্ষা যিনি বর্ণনা করিবেন অশ্লীলতার মোকদ্দমায় জেল খাটিবার সম্ভাবনা তাঁহারই অধিক। যিনি আঁকিয়াছেন তিনি তো আভাসে সারিয়াছেন, কিন্তু বর্ণনা করিবেন তিনি এই সচুচুক পয়োধরা নারীমূর্তি নিতম্বলগ্ন পুরুষমূর্তিকে কোন্ রূপকের ভাষায় ঢাকিয়া সারিবেন ভাবিয়া পাইতেছি না। ইহাই যদি সমরেশ বসুর 'তৃষ্ণা'র সিম্বলিক রূপায়ণ হয় তবে তাহার [illegible] প্রকাশ্যে না হওয়াই ভাল ছিল।

কিন্তু প্রচ্ছদের কথা যাউক, রচনার কথায় আসি

সংকলনটিতে দশটি ছোট গল্প। কয়েকটি গল্পের নমুনা দেখুন।

প্রথম গল্পের নায়ক শানা বাউরী। তাহার 'তৃষ্ণা'র বিশদ বিবরণ হইতেছে—

"মাগীটো আমার কুটনী।···আপনকাদের ঘরবাসী এখেনে গো, মায়ের হাতে দুটো পয়সা দিলে, বউকে জোর করে তুলে দেয়।···ডাগর বউকে লিয়ে শুতে উয়াদের সঙ্গে বড় দপ্‌দপানি।···আমার বউটো সুয়ামির সঙ্গে ঘর করতে পারে না।"

দ্বিতীয় গল্পের নাম "তৃষ্ণা"। তাহার নায়িকা বাইশ বছরের বিধবা বউ বিমলার উপর অপদেবতা ভর করিয়াছে। পাখির ডাক, জ্যোৎস্না, মলয়বায়ু ইত্যাদি তাহার গায়ে "ঝিলমিল করে পেঁচিয়ে" ধরে। অবশেষে সিদ্ধপুরুষ বনমালী তাহার ব্যাধিটি চিনিতে পারিল; কী, না—"বোঝ না, সেই সাপ কোথায় কিলবিলিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরে। শরীরের আর মনের যেখানে খালি, সেখেনে সে কুণ্ডলী পাকায়। ও-মেয়ের যে সব খালি, বোঝ না?"

বুঝিলাম, কিন্তু ডায়াগ্‌নোসিস তো ইহার পূর্বে কৃষ্ণনগরের পাস-করা ডাক্তারও বুঝিয়াছিল, চিকিৎসার বন্দোবস্ত কি হইল তাহা তো বনমালী অথবা সমরেশ কেহই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না?

তৃতীয় গল্প "কিছু নয়" বাস্তবিকই সমরেশ বসুর স্ট্যাণ্ডার্ডে কিছুই নয়। ইহাতে বিবাহ বাসরে বসিয়া বরযাত্রী সুধীন ("চওড়া বলিষ্ঠ শরীরে প্রায়-বোতাম-খোলা পাঞ্জাবি") এবং কনের পিসতুত দিদি সুরোবালা ("অমার্জিত আর সুঠাম স্বাস্থ্যোদ্ধত শরীর") একটু আধটু ফস্টিনস্টি করিয়া শেষ পর্যন্ত সকলের চক্ষুর অন্তরালে একটা পড়ো জমিতে গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল মাত্র, আর কিছুই করে নাই। সুরোবালা "একটু ঘন হয়ে" দাঁড়াইয়াছিল সুধীনের কাছে; "সুধীনের হাতের শিরা-উপশিরাগুলি" কেবলমাত্র দপ্‌দপ করিয়াছিল, আর কিছু নহে। কাজেই সমরেশের হিসাবে ইহা "কিছু নয়"।

এবার শেষ দিক হইতে একটু নমুনা দেখা যাউক। শেষ গল্পের নাম "প্রত্যাবর্তন"। কুড়ি পৃষ্ঠা আয়তনের এই গল্পটির শুরুতে নায়িকা বাসন্তী নেহাতই ছিল বালিকা; ছয়-সাত পৃষ্ঠা পরে তাহার মা হঠাৎ "দেখল, বাসন্তীর সারা শরীর যেন কী যাদুতে উজলে উঠেছে, ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা ফ্রকটা ফেটে যেন উছলে উঠতে চাইছে শরীরের প্রতিটি রেখা।···পায়ের গোছ হয়ে উঠেছে ভারী শক্ত আর সুন্দর। হায় পোড়াকপাল, ছুঁড়ী যে কবে ধুমসী মাগী হয়ে গেছে।"

স্বগতোক্তির ভাষাব্যবহার দেখিয়া মনে হইল, বাসন্তীর মা যদি গল্প লিখিতে আরম্ভ করিত তবে সমরেশ বসুর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিত সন্দেহ নাই। কেন না, ওই "ধুমসী মাগী" পর্যন্ত ভাবিয়াই সে থামে নাই; ইহার পর "বিড়বিড় করতে লাগল, আ সব্বোনাশ, ছুঁড়ীর জল লেগেছে কবে গো···?"

বুঝিতে পারিতেছেন, এই 'জল' যে-সে জল নহে, 'তৃষ্ণা'র জল।

ইহার মধ্যে অন্যত্র পড়িলাম, "বাসি (অর্থাৎ বাসন্তী) ঘরের অন্ধকার কোণটায় গিয়ে সত্যি ভাইয়ের মুখের কাছে তার শক্ত পুষ্ট বুক খুলে দেয়। কিছুই হয়ত বোঝা যায় না।···কেবল কাঁটা দিয়ে ওঠে বাসির সারা শরীরে, মাথাটার মধ্যে ঝিমঝিম করে। তারপরে অবাক হয়ে দেখে বিন্দু বিন্দু ঘামের মত সাদাটে গাঢ় রস ফুটে বেরুচ্ছে তার স্তনের বোঁটায়।"

বুঝিলাম সমরেশ বসু কী মন্ত্রে যে একাধারে লারেলাপ্পা পাঠক সমাজের কাছে পপুলারিটিও পাইয়াছেন আবার মহৎ সাহিত্যিকের খ্যাতি পাইতেও সচেষ্ট হইতে পারিয়াছেন! "শক্ত পুষ্ট বুক" দেখাইয়া পপুলারিটি অর্জন করিয়াই তিনি থামেন নাই, তাহার বোঁটায় ঘামের মত সাদাটে গাঢ় মহত্ত্বের রস ফুটাইয়া ছাড়িয়াছেন।

এই জন্যই বোধ হয় সমরেশ বসুর সাহিত্য-কীর্তিতে এত ঘামের দুর্গন্ধ।

অধিক দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিয়া পাঠকের বিবমিষা উদ্রেক করিব না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বইটির গুটিতিনেক গল্প বাদে বাকি সবগুলিরই কাহিনীতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই যদি হয় "জীবনের স্থূল আবর্তের অন্তরালে (অন্তরালের বালাই কি আর সকল স্থলে

রাখিয়াছ দাদা ?), যে অদৃশ্য চাবিকাঠিটি ঘুরপাক খায়" —তাহা হইলে বলিতে হইবে যে চাবিকাঠিটি অদৃশ্য থাকিলেই ভাল হইত। কেন না, গল্পগুলির কাহিনীতে সামান্য লক্ষণ হইতেছে এই পরম-দার্শনিক তত্ত্ব যে দুনিয়ার তাবৎ পুরুষ এবং রমণীর শরীর সর্বদা একটি রমণী এবং পুরুষের জন্য ছোঁক-ছোঁক করে।

সমরেশের ভাষায় ইহার নাম চাবিকাঠির খেলা।

সমরেশ বসুর রচনায় যতিচিহ্নাদির মধ্যে 'কমা'-র উপর পক্ষপাত চোখে পড়িল। নিষ্প্রয়োজন 'কমা'র ব্যবহার বহুস্থলে অর্থবোধকে ব্যাহত করিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া মনে হইল ইহা অতীব স্বাভাবিক মুদ্রাদোষ। কেন না সমরেশের বইগুলি বাংলা সাহিত্যে মূর্তিমান কমা ব্যাসিলাস ছাড়া আর কী ?

সমরেশ বসুর সাহিত্য যদি হয় কমা ব্যাসিলাস, তাহা হইলে জরাসন্ধের রচনাকে কী বলা উচিত ? বলা উচিত অ্যামিবা, ডিসেন্টি্ ব্যাধির অ্যামিবা।

কমা ব্যাসিলাস কলেরার বাহন, সেগুলি যে মারাত্মক জীবাণু তাহাতে সন্দেহ নাই। অ্যামিবিক ডিসেন্টি্ কলেরার মত মারাত্মক নহে। কিন্তু অনেক বেশি বিরক্তিকর। বস্তুতঃ নীহার গুপ্তকে হিসাব হইতে বাদ দিলে বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে জরাসন্ধের তুল্য বিরক্তিকর গ্রন্থকার আর দেখা যায় না, প্রবোধ সান্যাল অপেক্ষাও ইনি বেশি বোরিং।

তাহা হইলে জরাসন্ধকে আমি প্রতিবেদনের যোগ্য মনে করিলাম কেন এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। সত্য বলিতে কি, জরাসন্ধ নিজগুণে কদাপি নিন্দুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেন না; তাঁহাকে আমদানি করিবার কারণ হইল সমরেশ বসুর সহিত জোড়া মিলাইবার চেষ্টা। ভূমিকাতেই লিখিয়াছি, যৌবনের সহিত জরা আপাততঃ বিসদৃশ; কিন্তু সেই আপাত-বৈসাদৃশ্যের অন্তরালে যে মৌল সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা পরিস্ফুট করিবার মধ্যে একটি শিল্প-সম্ভাবনা দেখিতেছি বলিয়াই আমি সমরেশের জুড়ি হিসাবে জরাসন্ধকে নির্বাচন করিয়াছি। এবং সেইজন্যই প্রতিবেদনের টাইটেল দিয়াছি—জরা এবং যৌবন।

'জরাসন্ধ' এই শ্রুতিকটু তিক্ততা-উদ্রেকী নাম ছদ্মনাম হিসাবে যিনি নির্বাচন করিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন না যে জেলখানার গল্প লিখিয়াই তাঁহার সাহিত্যের চক্রব্যূহ রচনা সমাপ্ত হইবে না, জরাসন্ধ-বধ পর্ব আসিবার পূর্বে তাঁহাকে আরও বহু কসরত দেখাইতে হইবে। জানিলে তিনি নিজের অপর কোন নামকরণ করিতেন।

তাঁহার প্রথম পুস্তক 'লৌহকপাটে'র প্রথম পর্ব পাঠকের কাছে আদৃত হইয়াছিল; তাহার কারণ জরাসন্ধ সাহিত্যিক হইবার প্রতিশ্রুতি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এমন নহে; তাহার কারণ, পুস্তকটিতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত ঈষৎ একটু গাঁজাখুরি মিশাইয়া এমন একটি কৌতূহলোদ্দীপক রোম্যান্টিক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা পাঠকের তৎকালীন মেজাজে উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বস্তুটির প্রতি আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সেই অভিজ্ঞতা যদি আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ অপরিচিত হয়। তুষারকান্তিবাবুর 'বিচিত্র কাহিনী' ভাষা-কাহিনী-বক্তব্য কোন দিক দিয়াই সাহিত্য-পদবাচ্য না হইলেও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে অনেকের নিকট আকর্ষণীয় হইয়াছিল। 'সত্যবস্থি' ছদ্মনামে একজন চিকিৎসক কিছুদিন আগে তাঁহার কেস-ডায়ারী হইতে কতকগুলি কাহিনীর গায়ে অল্প রঙ চড়াইয়া বাজারে ছাড়িয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পাঠকের কাছে যদিও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন তবু আমার মনে আছে তাঁহার রোজনামচা সে সময়ে কেমন গরম পিঠার মত বিক্রয় হইয়াছিল।

পাঠকের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্যের নামে দুষ্পাঠ্য ও দুর্বল গল্প-উপন্যাস দেখিয়া দেখিয়া পাঠকের সাহিত্য-অজীর্ণ রোগ হইয়াছে; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অম্ল-মধুর স্বাদ না হইলে সহজে তাহার আর রুচির উদ্রেক হয় না। তাহাতে আপত্তির কারণ নাই। আপত্তির কারণ হইল সেই সকল অভিজ্ঞতামূলক

কাহিনীকে যখন লেখক সাহিত্য বলিয়া জাহির করেন। মুদ্রিত পুস্তক হইলেই যদি সাহিত্য হইত তবে কলিকাতা গেজেটও সাহিত্য; প্রভূত সংখ্যায় বিক্রয় হইলেই যদি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য হইত তবে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য।

সাহিত্যের পিছনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভূমিকা থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে; তিনিই সাহিত্যিক যিনি তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার সহজাত তীব্র অনুমান-শক্তিতে উজ্জয়িনীর রাজসভায় বসিয়া পক্ষগুম্ফ বনচ্ছায়ে লুক্কায়িত দশার্ণ গ্রামের স্পষ্ট চিত্র দেখিতে পারেন, মানস-সরোবরের কনকপদ্ম-কোরকের মুদ্রিত নয়নে তরুণ রবির উর্ধোৎসারিত স্তুতিবাদের মত রশ্মি-পাত দেখিতে পান। অভিজ্ঞতা যখন সেই প্রতিভার সহিত যুক্ত হইয়া মণিকাঞ্চনযোগ সৃষ্টি করে তখন নিঃসন্দেহে উত্তম সাহিত্যের জন্ম হয়; তাই বলিয়া শুধু-মাত্র অভিজ্ঞতার সম্বল লইয়া কাহিনী রচনা করিলে পাঠকের কৌতুহল যতই উদ্দীপ্ত হউক তাহা সাহিত্য হয় না। যেহেতু এক্ষণে বঙ্গদেশের সাড়ে পনের আনা গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতাও নাই, তীব্র অনুমানশক্তিও নাই, সেই কারণে যিনি অভিজ্ঞতার কাহিনী রচনা করিতে পারেন তাঁহার নূতন চমকে চমৎকৃত হইয়া পাঠক-সমাজে দুই-চারিদিন বড় সোরগোল পড়িয়া যায়। ইহা লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী মহলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বড়ই কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। কেহ ভ্রমণকাহিনী লিখিবার উদ্দেশ্যে কাগজ-কলম লইয়া ভ্রমণ শুরু করেন, কেহ দণ্ডকারণ্যে আদিবাসীদের সহিত রাত্রিবাস করিতে থাকেন, কেহ বা গণ্ডাখানেক চোরকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়িতে মাসাবধিকাল পুষিয়া রাখেন। অভিজ্ঞতা চাই, নূতন অভিজ্ঞতা। পাঠক যাহা জানেন তাহা অপেক্ষা বেশি কিছু নয়, তাহা হইতে নূতন কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলেই নূতন সাহিত্য হইল।

অতএব অভিজ্ঞতামূলক রচনার এক্ষণে বড়ই চাহিদা। ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারীর রসালো কাহিনী শুনাইলেন, অমনি তাহা সাহিত্য হইল। মোক্তার তাঁহার মোক্তারী জীবনের দুই-চারিটি ধূর্ত মুহূর্ত বর্ণনা করিলেন, অমনি তাহা সাহিত্য হইল। মুচি-মিস্ত্রি-বেশ্যা-দালাল, চোর-ডাকাত-গাঁটকাটা-কেপমারী, তান্ত্রিক-কাপালিক-অঘোরী-সহজিয়া যে কেহ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী ফলাও করিয়া লিখিতে পারিবেন তিনিই রাতারাতি সাহিত্যিক হইয়া যাইবেন। নিস্তরঙ্গ-জীবন বাঙালী মধ্যবিত্ত পাঠকের একঘেয়ে জীবনযাপনের সুযোগ লইয়া বড়ই সহজ ফরমুলা আমরা আবিষ্কার করিয়াছি।

জরাসন্ধ চাকুরীজীবনে জেলখানার বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁহার দর কম হইবে কেন? তিনি জেলখানার গল্প বলিতে শুরু করিলেন। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, জরাসন্ধের পরেই একজন তথাকথিত "সাহিত্যিক" বঙ্গসাহিত্য গগনে উদিত হইবেন যিনি পাগলা-গারদের সুপারিনটেনডেণ্ট অথবা চিড়িয়াখানার কর্তা ছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার পুঁজি জরাসন্ধ হইতে কম নহে, কাজেই তিনিও বড় কম সাহিত্যিক হইবেন না।

কিন্তু কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার পুঁজি লইয়া কতদিন লেখা যায়? লৌহকপাটকে রবারের কপাট করিয়া টানিতে টানিতে বড়জোর তিনটি পর্ব হইতে পারে, তাহার পর তামসী পর্যন্ত না হয় হইল সেই একই বস্তু নূতন বোতলে ভরিয়া; কিন্তু অতঃপর? কুড়াইয়া-বাড়াইয়া যাহা ছিটাফোঁটা ঝড়তি-পড়তি মাল পাওয়া গেল তাহা জুড়িয়া দু-একটি ছোট গল্পকে উপন্যাস বলিয়া চালানো হইল কিছুদিন, কিন্তু তাহাতে কতদিন সাহিত্যের কলেজ স্ট্রীটে আশ্রয় পাওয়া যায়? অথচ এদিকে পাবলিশার মহলে পসার হইয়াছে, কোনও রকমে হাবিজাবি কিছু ঝাড়িতে পারিলেই হাজার দু-হাজার টাকা পাওয়া যায়! কিন্তু এক জেলখানা লইয়া কতদিন পারা যায়? যাবজ্জীবন মেয়াদেরও তো শেষ আছে, তাহাতেও তো খালাস পাইতে হয়। তখন বেকার জরাসন্ধ কী করিবেন?

তখন তিনি চাকুরিগত অভিজ্ঞতা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, একেবারে নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, যদি গল্পের মসলা পাওয়া যায়। দেখিলেন জেলখানার কাহিনীগুলি ছাড়া আর যাহা সম্বল, তিনি সারা জীবন ধরিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জমা।

তখন তিনি জরাকে উপজীব্য করিলেন। জরাসন্ধ নাম অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইল।

বয়সে প্রৌঢ় না হইলেও জরাসন্ধ গ্রন্থকার হিসাবে জরাগ্রস্ত হইতে বাধ্য হইতেন। কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা পুঁজি করিয়া গল্প বলা জরার ধর্ম। মানুষ যখন দেহে ও মনে জরাগ্রস্ত হয়, নব নব কর্মের উদ্যমে যখন অশক্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহাকে স্মৃতিরোমন্থন করিতে দেখি। 'আমাদের বাল্যকালে এরূপ হইত না', 'আমরা যৌবনে তোমাদের অপেক্ষা সাহসী ছিলাম', ইত্যাদি বিবৃতি হইতে শুরু করিয়া বৃদ্ধরা অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনান; এবং ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন তাহার মধ্যেও কল্পনার মেশাল বড় কম থাকে না। অভিজ্ঞতা-সর্বস্ব কাহিনী, কল্পনার রোমান্সে বর্ণাঢ্য হইলেও, নিতান্ত জরাগ্রস্ত মানুষের পক্ষেই বলা স্বাভাবিক। জরাসন্ধ প্রথম হইতেই তাহা করিয়াছেন। সেইজন্য 'ছায়াতীর' নামক যে তথাকথিত উপন্যাসটি আমি আলোচনার জন্য লইয়া বসিয়াছি তাহাতে জরাসন্ধ স্বাভাবিক ভাবেই জরাকে উপজীব্য করিয়াছেন।

কিন্তু কোন্ জরা?

প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে যে একটি বিষণ্ণ মর্মবাণী রহিয়াছে, কার্তিকের নিস্তেজ রৌদ্রে গৈরিক রশ্মায়িত দিনের যে করুণ মর্মবাণী, অঘ্রাণের ধানকাটা শেষ হইয়া গেলে শূন্য প্রান্তরের মধ্যে যে আসন্ন পূরবীর শিহরিত আভাস, জরাসন্ধ কি তাঁহার ব্যর্থ উপন্যাসে ঘুণাক্ষরেও তাহার ইঙ্গিত আনিতে পারিয়াছেন? এইরূপ নিষ্ঠুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আশা করি জরাসন্ধকে কেহ লজ্জা দিবেন না। সি. এস. পি. সি.এ.-র অনুকরণে না হয় কোন সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টুওয়ার্ডস মিডিওকার রাইটার্স নাই, তাই বলিয়া একজন প্রবীণ মধুরভাষী শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকে এরূপ প্রশ্ন করা নিশ্চয় গর্হিত কর্ম।

না, জরাসন্ধ প্রৌঢ়ত্বের সেই বেদনাকে বুঝিবার প্রয়াসও করেন নাই। তিনি রতিবিলাপের সুরে প্রৌঢ়ত্বের কাওয়ালি গাহিয়াছেন। প্রৌঢ়কে নায়ক করিয়া একটি অত্যন্ত বিরক্তিকর প্রেমের গল্প লিখিয়াছেন। লিখিয়া সেই জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার গল্পের সর্বাঙ্গে প্যাড সাঁটিয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া অনেক কষ্টে ১৬২ পৃষ্ঠা সাইজে পৌঁছাইয়াছেন। তাহার পর প্রথম পৃষ্ঠার পৃষ্ঠাঙ্ক ৭ বসাইয়া পুস্তকটিকে আর একটু বড় সাইজের ছদ্মবেশ পরাইয়াছেন। এবং পাঁচ টাকা দামের উপন্যাস বলিয়া বাজারে ছাড়িয়াছেন।

ইহাতেও মুনশীয়ানা বড় কম লাগে নাই। এ গল্পকে ১৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত টানিয়া লওয়া সহজ নয়। আমি তো অনেক কষ্টেও ইহাকে সাড়ে সাত পৃষ্ঠার বেশী বানাইতে পারিতাম না। বিশ্বাস না হয়, গল্পটি বলিতেছি, শুনুন।

হিমাংশু গুপ্ত, বয়স আটচল্লিশ (জরাসন্ধ অপেক্ষা অন্ততঃ দশ বৎসরের ছোট), ডিকৃসন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। আগে দৌলতপুর কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। কত বৎসর বয়সে অধ্যাপনা ছাড়িয়া ডিকৃসন কোম্পানিতে জুনিয়র আফিসার হইয়া যোগ দিয়াছিলেন এবং তখনই বা কত মাহিনা পাইতেন এবং কত বৎসর ধরিয়া প্রমোশন পাইতে পাইতে ম্যানেজারের পদে উঠিয়াছেন এবং এখন কত মাহিনা পাইতেছেন সেই সকল কথা জরাসন্ধ বলেন নাই। কিন্তু আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি যে সকল সম্পত্তি ট্রাস্টের হাতে দিয়া গেলেন তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে তাঁহার বাৎসরিক আয় ষাট হাজার টাকার কম হইবে না। সে যাহা হউক, হিমাংশু গুপ্ত বড় দুঃখী। তাঁহার স্ত্রী মালনা চাটানগর হইতে করাচী পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালচারাল নাচগানের ফাংশন করিয়া বেড়ায়, সঙ্গে শোভন দত্ত নামক একজন 'মোসাহেব' থাকে। শোভন হিমাংশুর পুত্র হিরণের বন্ধু। হিরণ বাবার উপর অভিমান করিয়া সুদান চলিয়া গিয়াছে। কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অতএব হিমাংশু বড় একাকী। তাঁহার একমাত্র সঙ্গী তরুণী স্টেনোগ্রাফার কুমারী কণিকা সেন। কণিকা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। এদিকে কণিকা জ্যোতির্ময় নামে একটি ছেলেকে বিবাহ করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু স্থির করিলে কী হইবে, তাহার সহিত কণিকার দেখা-সাক্ষাৎ হয় বড় কম। কেন না সে থাকে দানাপুরে (১৬২ পৃষ্ঠার মধ্যে

সে বেচারী মাত্র পাতা-তিনেক স্থান পাইয়াছে) অথচ হিমাংশু গুপ্ত সর্বদা উপস্থিত। তাহার পর টাইফয়েড হইয়া হিমাংশুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেহ কাছে নাই! কণিকা তখন আসিয়া দিবারাত্র হিমাংশুর সেবা করিল। শুধু সেবা করিলে কিছু হইত না, হিমাংশুর এক সাহেব বন্ধু একদিন রোগশয্যার মধ্যে আসিয়া শুনাইয়া গেল বৃদ্ধ বয়সে সে তাহার সোসাইটি-ভুরন্ত মেমসাহেব স্ত্রীকে ডিভোর্স করিয়া একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণীকে বিবাহ করিয়াছে এবং তাহাতে পুনর্যৌবন পাইয়াছে। হিমাংশু এবং কণিকা দুইজনকে শুনাইয়া এই কাহিনী বলিতে বলিতে সে-ব্যাটা সাহেব আবার কণিকাকে (ইচ্ছা করিয়াই কিনা কে জানে) মিসেস গুপ্ত বলিয়া ভুল করিয়া বসিল। তাহার উপর ডাক্তার মিসেস গুপ্ত কণিকার সহিত কলহ করিল। অতএব হিমাংশু কণিকাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। আর হিমাংশু যেহেতু বড় দুঃখী সেই কারণে কণিকাও রাজী হইয়া গেল। এই পর্যন্ত লিখিয়া জরাসন্ধ বোধ হয় নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিঞা-বিবি রাজী হইলে কী হইবে, জরাসন্ধর লজ্জা করিতে লাগিল। কাকতালীয়তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইয়া তিনি হিমাংশু গুপ্তকে শুনাইয়া অপরিচিত জ্যোতির্ময়কে দিয়া পার্কের বেঞ্চিতে বিষাদসিন্ধু আবৃত্তি করাইলেন এবং তাহাতে বিগলিত হিমাংশু চাকুরি সংসার বিষয় সম্পত্তি এবং তরুণী স্টেনোগ্রাফার বাগদত্তা সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া একাকী কাশীবাসী হইলেন। এইখানে গল্পটি শেষ হইলেই যথেষ্ট পরিমাণে হাস্যকর হইতে পারিত, কিন্তু জরাসন্ধ এইখানে থামেন নাই। হিমাংশুকে বারাণসীতে বার্ধক্য যাপন করিতে দিলেন না জরাসন্ধ। তাঁহাকে ডিহরি-অন-শোনে লইয়া গিয়া আকস্মিক সাক্ষাতে মিলিত করিলেন অপরিচিতা এক বিধবা যুবতীর সহিত; প্রথমে অপরিচিতা কিন্তু অবিলম্বে পরিচিতা—তাহার মাতুল নাকি হিমাংশুর সহ-অধ্যাপক ছিলেন। অতএব মাধবী (ইহাই বিধবাটির নাম) বলিল, হিমাংশু তাহার সহিত থাকুক। এবং হিমাংশু স্মিতমুখে ডান হাতখানি মাধবীর পিঠে রাখিলেন।

উপরের সারাংশ-রচনায় আমি কাহিনীর কোনও ডিটেল বাদ দিই নাই। ইহাকে পাঁচ টাকার উপন্যাস বানাইতে মুনশীয়ানা বড় কম লাগে নাই।

এইবারে জরাসন্ধর বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

এক নম্বর বৈশিষ্ট্য শব্দপ্রয়োগে। এক স্থলে হিমাংশুর স্ত্রী মলিনা টেলিফোনে হিমাংশুকে স্টেনোগ্রাফার প্রসঙ্গ তুলিয়া খোঁচা মারিতেছে। সেখানে সংলাপ, "...এমন বসন্ত সন্ধ্যা। নির্জন ঘর...শুনেছি, অফিসের পাশে একখানা বিশ্রামের ঘরও আছে।" ইহার পর জরাসন্ধর মন্তব্য: "বিশ্রাম কথাটি টেনে টেনে এমন ভাবে বললেন যে, তার ভিতরকার নিগুঢ় অর্থটা চাপা রইল না।"

এখানে 'নিগুঢ়' শব্দটি লক্ষণীয়। পাঠক যদি ভাবিয়া থাকেন ইহা নিগূঢ় লিখিতে গিয়া বর্ণাশুদ্ধি অথবা মুদ্রণ প্রমাদ, তবে ভুল বুঝিয়াছেন। নিগূঢ় বলিলে অর্থটা চাপা থাকিত; দীর্ঘ স্থলে হ্রস্ব স্বর ব্যবহারে জরাসন্ধ বুঝাইতেছেন, অর্থটি বেশী নিগূঢ় নহে, হ্রস্ব মাত্রায় নিগুঢ়।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে আছে মলিনার "নিম্নোষ্ঠে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের কুঞ্চন ফুটে উঠল।" এখানেও নিম্নোষ্ঠ কিংবা অধর বলিলে মলিনার ঠোঁটের বর্ণনা স্পষ্ট হইত না। নিম্নোষ্ঠ বলিলে ঠোঁটটি বড় বেশী পুরু মনে হয়, অধর বলিলে একেবারে পাতলা; মলিনার ঠোঁট মাঝারি রকম, তাই তাহার নাম নিম্নোষ্ঠ।

এইরূপ আরও আছে।

কিন্তু আমরা এখন শব্দালঙ্কার ছাড়িয়া অর্থালঙ্কারের সন্ধান করিব।

একস্থলে শোভন তাহার মাসী (ডাক-ভুতো) মলিনাকে স্ত্রীলোকের জেলাসির কাহিনী বলিতেছে। "কিছুদিন আগে বর্ধমান যাচ্ছিলাম। ভিড় ছিল, তবে খুব বেশী নয়। আমি বসেছিলাম একটা বেঞ্চির শেষ সিটে। ঠিক তার পাশের বেঞ্চিতে একটি পেয়ার আগে থেকেই কোণের দিকটা দখল করেছিল।...ঘন হয়ে বসে অনর্গল বকে চলেছে, যতটা সম্ভব নিচু গলায়। দু একটা টুকরো কথা যা কানে এল, তার থেকে বুঝলাম, সবে বিয়ে হয়েছে।" এইভাবে কাহিনী

শুরু করিয়া শোভন বলিল অন্য একটি পেয়ার (এই শব্দটি দম্পতি অর্থে জরাসন্ধ বারংবার ব্যবহার করিয়াছেন কেন? সব দম্পতির মধ্যে কি বাস্তবিক পেয়ার থাকে শেষ পর্যন্ত? কাপ্‌ল্ বলিলেই হইত।) গাড়িতে উঠিয়াছিল এবং সেই দম্পতির মহিলাটি নববিবাহিতার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। নববিবাহিত পতি স্ত্রীর নিকট ঈর্ষার ব্যাখ্যায় বলিল, "যে জিনিস হারিয়ে উনি ওই রকম হয়ে গেছেন…" ইত্যাদি। স্ত্রী প্রশ্ন করিল, "কী জিনিস?" তখন "ছেলেটি এবার বউয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, তার নাম যৌবন।"

আমি গভীর চিন্তায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, "অনর্গল বকে চলেছে" সত্ত্বেও শোভনের শুধু "দু একটা টুকরো কথা কানে" আসিতেছিল, কিন্তু "কানের কাছে মুখ নিয়ে" বলা শব্দটি কী করিয়া সে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল। শেষে বুঝিলাম কানের কাছে মুখ লাগাইয়া বলাতেই এরূপ হইল; কেন না যাহার কানের কাছে ছেলেটি মুখ লাগাইয়াছিল সে উহার স্ত্রী। স্ত্রীর কান এবং লাউড স্পীকার একই বস্তু। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই জন্য স্ত্রীর কানের কাছে গোপন কথা বলেন না। আপনারা ইহা না জানিতে পারেন কিন্তু জরাসন্ধ জানেন। ভুলিবেন না, ইনি অভিজ্ঞতা-সর্বস্ব সাহিত্যিক।

হিমাংশু একস্থলে ভাবিতেছেন, "কিসের জন্যে এই আক্রোশ মলিনার? কোথায় তার জ্বালা?" একটু পরেই আবার রহিয়াছে, "একগৃহে বাস করা ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে একত্ব বলতে তাঁর আর কিছু নেই।" স্ত্রীর সহিত একত্ব না থাকিলে স্ত্রীর জ্বালা ঠিক কোথায় হইয়া থাকে ইহা জরাসন্ধ প্রশ্ন করিতেছেন। উত্তর দিতে হইলে আমরা সমরেশকে ডাকিয়া আনিব। তিনি আসিয়া চাবিকাঠিটি দেখাইয়া দিবেন। দেখাইয়া বলিবেন, ইহা জ্বালা নহে—তৃষ্ণা।

সমরেশের মত গুছাইয়া বলিতে না পারিলেও জরাসন্ধ ওই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ এরূপ ভাবিবেন না। আজ তিনি প্রৌঢ় হইতে পারেন, কিন্তু একদা তাঁহারও যৌবন ছিল। কালিদাসের উপর রবীন্দ্রনাথের যে-কারণে জিত (তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ, আমার কালের কণামাত্র পান নি মহাকবি!), সেই কারণেই সমরেশের উপর জরাসন্ধ জয়ী। সমরেশ যৌবনের … রাখেন, বার্ধক্যের মজা কি করিয়া জানিবেন? … জরাসন্ধ যৌবনের খবর মৃদুমন্দ মনে রাখিয়াছেন, অধিক… প্রৌঢ়ত্বের বিষয়ে তিনি অথরিটি।

যৌবনের সেই কণি… ইঙ্গিত জরাসন্ধ … কায়দায় লিখিয়াছেন। …হিমাংশু গুপ্ত গাড়ি চড়িয়া … ফিরিতেছেন, পথে কণিকা সেনকে বাসের … প্রতীক্ষমাণা দেখিলেন। অতএব লিফট দিবার … দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে কণিকা কর্তৃক তাহা গ্রহণ, উভয়ে… সহ-মোটর-গমন।

এইখানে সমরেশ হইলে যা-তা করিয়া বসিতে… (লজ্জাবশতঃ আমি সেই গল্পটির কথা উল্লেখ করি না… যেখানে সমরেশ একটা চলন্ত মোটর লরীর মধ্যেই … মিটাইবার বর্ণনা দিয়াছেন।) জরাসন্ধ অনেক জোরে… তিনি লিখিলেন, "কণিকা…দরজাটা…টেনে দিয়েছিল… গাড়ি চলা শুরু করতেই ঘটঘট করতে লাগল। বন্ধ … নি। 'আচ্ছা দাঁড়ান, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি'—ব… হিমাংশু হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে জোরে … দিলেন। কণিকার হাতে ও হাঁটু-মূলে তাঁর … লাগতেই তার বুকের ভিতরটা কেমন ঢিপ ঢিপ কর… লাগল।"

সমরেশ তো কত স্পর্শ লাগাইয়াছেন, হাত … হাঁটু পর্যন্তই থামিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না, … জরাসন্ধর মত এইরূপ "ঘটঘট" করিতে করিতে … লাগাইতে পারিয়াছেন?

বাই দি ওয়ে, হাঁটু-মূল বস্তুটা কী মহাশয়? জর… কি হাঁটুর মত একটা কঠিন অঙ্গকেও অমূলক থা… দিতে রাজি নহেন?

শব্দ ও অর্থ ছাড়িয়া এইবার চরিত্র-চিত্রণ… যাউক। হিমাংশু চরিত্রটি সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু না ব… ভাল। আপন স্ত্রী ব্যতীত বিশ্বসংসারের প… অপরিচিত সকল নারী যাহার উপর আকৃষ্ট হইয়া … করিতে চায়, এইরূপ চরিত্র বাস্তবে না থাকি… আমাদের সকলেরই কল্পনায় রহিয়াছে। সেই ক… কারণ কল্পনা করিতে ফ্রয়েড হইবার প্রয়োজন…

আমাদের, পুরুষমানুষদের, এই ট্রাজেডির কথা প্রকাশ্যে আলোচিত না-ই বা হইল। আমরা প্রত্যেকেই একটু বয়স হইলে কল্পনা-বিলাসে অল্পবিস্তর হিমাংশু গুপ্ত হইয়া পড়ি।

কল্পনা গুপ্ত সম্বন্ধেও কিছু বলিব না। কারণ জরাসন্ধ নিজেই লিখিয়াছেন, স্বামী তাহার সহিত এক গৃহে বাস করা ছাড়া কোনরূপ একত্ব রাখেন নাই। এমতাবস্থায় কল্পনার যে কোনও পার্ভার্সন জন্মিতে পারে। অবশ্য [illegible]ভন দত্ত পর্যন্ত। জরাসন্ধর উপন্যাসে নায়কের স্ত্রী হওয়া কল্পনার পক্ষেও একটু গুরুদণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে কথা যাউক। আমরা তাহার কী করিতে পারি?

কণিকা সেন নামক একটি তরুণীর চরিত্র অঙ্কনেই জরাসন্ধ সর্বাপেক্ষা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যাহার সহিত "মন দেওয়া-নেওয়ার পালা" শেষ হইয়াছে বছর কয়েক আগে, অথচ যাহার সহিত বৎসরে একবারের বেশি সাক্ষাৎ ঘটে না, সেই জ্যোতির্ময়কে কণিকা একটি সন্ধ্যা একান্তে পাইয়াছিল ৯৪ পৃষ্ঠায়। সেইদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া কণিকার জ্বর হইল। তিন সপ্তাহ পরে সারিয়া উঠিয়া শুনিল হিমাংশু গুপ্ত অসুস্থ। অমনি কণিকা তাহার সেবায় রত হইল। সেবা করিতে করিতে এমন কী হইল যে জ্যোতির্ময়কে কুচ করিয়া কাটিয়া দিয়া হিমাংশু গুপ্তকে বিবাহ করিবার জন্য সে ক্ষেপিয়া উঠিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। জ্যোতির্ময়কে কণিকা বলিল, "তোমার জীবনে আমার মত অনেক মেয়ে আসবে জ্যোতিদা, কিন্তু ওঁর যে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।" কথাটা যে সত্য নহে তাহা জরাসন্ধ ভাল করিয়াই জানেন, কণিকার পরেও হিমাংশু মাধবীকে জুটাইয়াছিল; জ্যোতির্ময় অন্য কাহাকেও পায় নাই। পাছে আপনাদের কাছে এই সকল ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হয় সেইজন্য জরাসন্ধ জ্যোতির্ময়ের একটি অনুল্লিখিতনামা বন্ধুকে দিয়া এই চরিত্রের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছেন এইরূপ :

"আশ্চর্য! মেয়েদের মনের এ এক অদ্ভুত কমপ্লেক্স। কথা আছে না? There is a mother in every woman! আমার মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে কণিকা যে ঠিক ভালোবাসে তা নয়, খানিকটা স্নেহ, খানিকটা শ্রদ্ধা —সব মিলিয়ে এ এক জটিল মনোভাব।"

খানিকটা স্নেহ আর খানিকটা শ্রদ্ধার উপরই অবশ্য জরাসন্ধ ষোল আনা নির্ভর রাখেন নাই, তাহার সহিত খানিকটা হাঁটু-মূলে চাপ এবং খানিকটা বুকের মধ্যে টিপ টিপ মেশাল দিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতির্ময় সে কথা জানিবে কী করিয়া? তাই তাহাকে জরাসন্ধ সান্ত্বনা দিলেন, there is a mother in every woman বলিয়া।

কিন্তু মহাশয় এ কীরূপ কথা যে হিমাংশুর 'মাদার' হইবার জন্য কণিকা জ্যোতির্ময়কে বিবাহ করিবে না? আমরা তো জানিতাম একজনার মাদার হইতে হইলে অপর কাহারও স্ত্রী হইতে হয়।

অথবা হয়তো জ্যোতির্ময় কিছুতেই হিমাংশু গুপ্তর ফাদার হইতে রাজি হয় নাই। স্টেপ ফাদার-ও না।

তাহা হইলে আশ্চর্য হইব না। কারণ হিমাংশু গুপ্ত চরিত্রটি যেরূপ রাঙ্গা মুলা মার্কা হইয়াছে তাহাতে যে-কোনও সেন্সিব্‌ল্ পুরুষের পক্ষে উহার স্টেপ ফাদার দূরের কথা, তিন চার স্টেপ দূরের ফাদার হইতেও আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক।

জরাসন্ধ তাঁহার এই জরাগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত একান্ত অকিঞ্চিৎকর ও আলোচনার অযোগ্য পুস্তক মারফত একটি উদ্দেশ্যই মাত্র সিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। আমার অন্তত: একটি প্রতিক্রিয়াই হইয়াছে এই পুস্তক পাঠে। ইহার আগে বৃদ্ধ হওয়া বস্তুটিকে আমি তেমন ভয় করিতাম না, পরম বিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে পারিতাম: Grow old along with me—the best is yet to be! আর এখন, জরাসন্ধ বিরচিত কাহিনী পাঠের পর আমার সকল বিশ্বাস ভাঙিয়া তছনছ হইয়া গিয়াছে; সন্দেহ হইতেছে বৃদ্ধ হইলেই আমাদের বারটা বাজিয়া যাইবে। জীবনের সকল শব্দ-বর্ণ-গন্ধ নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়া জরাসন্ধর মত শক্তিহীন অক্ষম অতিরঞ্জিত-অভিজ্ঞতার বাহ্বাস্ফোট-সর্বস্ব করুণার পাত্র হইয়া যাইব।

আর তখন বসিয়া বসিয়া সমরেশ বসুর গল্প পড়িয়া শরীর তাতাইব।

—

সংবাদ-সাহিত্য

সন্তু নিবেদনং

নানা কারণে আমাদের আষাঢ় সংখ্যা প্রকাশে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গেল। সহৃদয় গ্রাহক পাঠকগণের নিকট যথাযথ যুক্তি বা কৈফিয়ত হাজির করিবার উপায় নাই। কারণটা নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত হইলেও একাধিক ব্যক্তি এই বিষয়ে জড়িত। শুধু লজ্জার মাথা খাইয়া স্বীকার করিতেছি যে শ্রাবণ সংখ্যা হইতে এই বিলম্বজনিত ত্রুটি যথাসাধ্য শোধরাইবার চেষ্টা করিব। আশা করিতেছি শ্রাবণ ভাদ্র দুইটি মাস কোনমতে পার করিয়া দিতে পারিলে আশ্বিন অর্থাৎ পূজা সংখ্যা ঠিক সময়মত প্রকাশ করা যাইবে। শনিবারের চিঠি—শুধু শনিবারের চিঠি কেন, যে কোন মাসিক পত্রিকার ক্ষেত্রে মাসের হিসাবটাই বড় কথা নহে। আসল বিচার পত্রিকার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বা লঘুত্বের উপর নির্ভর করে। রসিক পাঠকেরা এইটুকুই বিচার করিবেন। শ্রাবণের শেষদিকে আষাঢ় মাসের কাগজ হাতে পাইলেও আশা করি তাঁহাদের মুখ আশ্বিনের আকাশের মতই নির্মল থাকিবে। পাঠকের অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ আমাদের তমোময় জীবনে অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং চিরদিনই হইবে।

আমাদের নানা দোষ। অন্যের পাকা গুটি কাঁচাইয়া দিতে আমাদের বড় আনন্দ কিন্তু নিজের ঘর সামলাইবার কথা তখন মনে থাকে না। আমাদের স্বাদবর্ণগন্ধহীন জীবনে মধুর বা বিচিত্রের আবির্ভাব কদাচিৎই ঘটে কিন্তু যে কুটিল চক্র আমাদের বেড়িয়া আছে তাহার ঠেলায় মানুষ তো দূরের কথা, ইন্দ্রের বিশ্বাসও টলিয়া যায়। তাহার প্রভাবে ব্যক্তির লাঞ্ছনা সমষ্টির লাঞ্ছনায় কখন পরিণত হয় আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি না। তবে একটা কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লড়িলেও আমাদের লক্ষ্য এক—এবং ধ্রুবতারা ঠিক থাকিলে সহসা কোনও গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা নাই। আমরা কাঁটা কম্পাস হাতে লইয়াছি, সুতরাং ইহার পর হইতে দিক বা সময়ের আর ভুল হইবে না। অরসিকের নিকট মাফ চাহিতেছি।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রখ্যাত সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে জুলাই আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ শারীরিক অসুস্থতার জন্য সাহিত্যিক অথবা সামাজিক পরিবেশের মধ্যে তাঁহাকে বড় একটা দেখা যায় নাই। সদালাপী, মিষ্টভাষী, উচ্ছল প্রকৃতির নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বহুদিন হইতেই যেন আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। তিনি প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত এইরূপ বহুধা-বিভক্ত প্রতিভা আমরা দেখি নাই। শিশু-সাহিত্য, জীবনী-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, পত্রিকা-সম্পাদনা, রেডিও, সিনেমা, গ্রামোফোন ইত্যাদি নানা দিকে তিনি তাঁহার প্রতিভাকে যথেচ্ছ পরিচালনা করিয়াছিলেন। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ কোনও একটি বিষয়েই পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করিতে পারেন নাই।

ব্যক্তিগত জীবনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের মত অকৃত্রিম বন্ধু পাওয়া বিশেষ ভাগ্যের কথা এ কথা তাঁহার সখ্যলাভের অধিকারী যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। আত্মভোলা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের নাম বাংলা-সাহিত্যে ইতস্ততঃ-ভ্রাম্যমাণ উদাসী পথিকদের দলে উজ্জ্বলভাবে লিখিত থাকিবে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের স্বপ্নালু কবিদৃষ্টি নিরেট গদ্যময় জীবনে প্রতিহত হইয়া প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে, আমরা আমাদের স্থূল বাস্তবদৃষ্টিতে এই কবিপ্রাণের সত্যরূপকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই যথার্থ হইবে।

অমৃতে গরল

চিড়িয়াখানা, রেসকোর্স, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত, জেলখানা ইত্যাদির গৌরবে

গৌরবান্বিত আলিপুরের আর একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা সাহু জৈন নিলয়ে প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠে'র সংবাদ অবগত হইয়াছি। দারিদ্র্য লোভ আর অভাব আমাদের কত নীচে নামাইতে পারে এইবার তাহারই পরীক্ষা আরম্ভ হইল বলা যায়। এই 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ' প্রতি বৎসর ভারতীয় ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের জন্য এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এই পুরস্কারের উদ্যোক্তা সাহু জৈন কোম্পানির কর্তা শান্তিপ্রসাদ জৈন—চোরাই কারবার হইতে আরম্ভ করিয়া স্মাগলিং ইত্যাদি বিবিধ মামলা ইঁহার নামে ঝুলিতেছে। শুনিলাম সম্প্রতি আর একটি মামলায় জামিনে খালাস আছেন। ইঁহার শ্বশুর শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া বর্তমানে মোটা টাকার জাল তহবিল তছরুপের দায়ে জেলে পচিতেছেন। পুরস্কারে ঘোষিত এক লক্ষ টাকার জন্য অনেকদিন হইতেই হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আলিপুরে আর ফাঁকা জায়গা পাইবার জো নাই। সর্বত্রই উদ্বাস্তুদের টেকনিকে পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর উঠিতেছে। তাহাতেও কুলাইতেছে না। পুরস্কারলোলুপ বহু লেখক প্রয়োজন হইলে চিড়িয়াখানায় গিয়া থাকিতেও রাজী আছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। শান্তিপ্রসাদের প্রসাদধন্য হইবার জন্য বেঁটে মোটা কালো চ্যাপ্টা বেঢপ প্রভৃতি হরেকরকম সাইজের লেখক সম্ভবতঃ ওই অঞ্চলেই বাসা বাঁধিয়াছেন। এই 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ' নানাবিধ কাগজ-পত্র ফর্ম ইত্যাদি ছাপাইয়াছেন এবং আমাদের নিকট কিছু কপিও পাঠাইয়াছেন। সমগ্র ব্যাপারটি আনুপূর্বিক চিন্তা করিয়া আমাদের ঘৃণা তো উদ্রিক্ত হইয়াছেই, সেই সঙ্গে ভয়ও বাড়িয়াছে যথেষ্ট। পাঁচ হাজারের রবীন্দ্র ও আকাদমী পুরস্কার লইয়া কলহ বিবাদ প্রচুর হইয়া গিয়াছে, লাখের ব্যাপারে খুন জখম ধর্ষণ হওয়া কিছু বিচিত্র হইবে না। সন্ধ্যার সময় এখন আমাদের আলিপুরের দিকে যাইতে গা ছমছম করে। যে কোনও মুহূর্তে সাহিত্যিকদের দাঙ্গা বাধিতে পারে। লাখ টাকার শিকা কাহার ভাগ্যে ছিঁড়িবে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এই টাকা হাতে লওয়া অপেক্ষা ইতর কাজ আর কিছু পৃথিবীতে সম্ভব নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। ভাষায় হিন্দুস্থান জুড়িয়া জোর তদ্বির চলিতেছে। সাহু জৈনের নামাঙ্কিত পুরস্কার লইলে চরম কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবে এই সাবধানবাণী আমরা পূর্বেই উচ্চারণ করিয়া রাখিতেছি। 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ' ইত্যাদি যত গালভরা নামই দেওয়া হউক না কেন, মতলবের গন্ধ এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

সাক্ষী গোপাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে একজন কবি আমাদের বঙ্গ দেশে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া কা নাটক গল্প উপন্যাস সংগীত ইত্যাদি রচনায় বঙ্গভারতী সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তিনি নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হওয়ায় ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহার পর হইতে এই পোড়া বাংলা দেশে কত কোটি লোক জন্মিল, কত কোটি লোক মরিয়া হইল কিন্তু মায়ের মুখ আর দ্বিতীয়বার উজ্জ্বল হইল না। বছরে বছরে কত কম্পিটিশন কত প্রতিযোগিতা—ফুটবল ধূলা হইতে আরম্ভ করিয়া সৌন্দর্যের লড়াই পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। অন্ধকার মুখ অন্ধকারই রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেই রবি ঠাকুরের পর হইতে আমরা বাঙালীরা বিমর্ষ চিত্তে অপেক্ষা করিতে ছিলাম কবে আবার মুখ উজ্জ্বল হয়। বাংলা দেশ দূরের কথা, সারা ভারতবর্ষ মিলাইয়া এম. কে. গা নামে জনৈক অবাঙালী ব্যক্তির ভাগ্যে একবার শিকা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ফসকাইয়া গেল। গেল বোধ হয় বাঙালী নন বলিয়াই। (সি. ভি. রমণ ক্ষমা করিবেন।)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ঐকান্তিক আশা ব্যর্থ হইল না। অদ্যকার সংবাদপত্রে দেখিতেছি কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডি বিখ্যাত বাংলা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন মস্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে সংবর্ধিত করিতেছেন। অভিনেত্রীর স্তুতিকালে সেই রবীন্দ্রনাথেরই নাম উচ্চারিত হইয়াছে এবং ভয়ঙ্করভাবেই হইয়াছে। মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন "পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পরে আপনাদের শি শিল্পী আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করিলেন। এই সম্মা

তার প্রতিভার স্বীকৃতি। ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়।"

শ্রীরেড্ডি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, সুতরাং তাঁহাকে কিছু দোষারোপ করা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু উক্ত সংবর্ধনা-আসরে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের কী এই উক্তির প্রতিবাদ করার মত একটুও বুদ্ধি হইল না? বুঝিলাম বাংলাদেশের চলচ্চিত্রজগতে একটিও গাধা নাই। প্রায় স্যাণ্ডোগেঞ্জি পরিহিতা সুচিত্রা সেন রেড্ডি মহাশয়ের নিকট হইতে অভিনন্দন-পত্র লইতেছেন তাহার চিত্র আপাতদৃষ্টিতে যতই মনোরম হউক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সঙ্গে ইহার অনেকখানি ফারাক। এ ফারাক শুধু আজ নহে, চিরদিনই থাকিবে। মাড়োয়ারী মাদ্রাজীতে সমগ্র বাংলাদেশকে ধ্বংস করিয়া দিলেও বিদ্যাসাগর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমিতে সুচিত্রা সেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্র্যাকেটায়িত হইয়াছেন—নির্বংশ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা অপেক্ষা নিদারুণ আঘাত আর কিছু নাই। বাঁধা অবস্থায় মার খাইতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, কিন্তু এই সাত পাকে বাঁধিয়া যাহারা আমাদের মারিল তাহারা ওস্তাদের মার মারিয়াছে। ভাগ্য আমাদের সব দিক দিয়াই প্রতিকূল—গোপালদের সাক্ষীগোপাল মনে করিয়া ইহার পর আমরা যেন আর বিভ্রান্ত না হই।

শঙ্করীর বিবমিষা

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগ এবং কলেজ স্ট্রীটের গজকচ্ছপ কোম্পানিকে একসঙ্গে সেলাম জানাইতেছি। একটি অত্যাশ্চর্য প্রতিভার বিকাশে ইঁহারা যথার্থই সহযোগিতা করিয়াছেন। ইডেনে শীতের দুপুর কাটাইয়া ছাপার হরফে যে ব্যক্তিটি ক্রিকেটকে মায় রমণীদের নিকটে পর্যন্ত রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন আমরা সেই রম্যরচনালেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কথাই বলিতেছি। এই অর্ধমানবটিকে আমরা ক্রিকেট-সাংবাদিক বলিয়াই জানিতাম। কখন কোন্ ফাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক সাজিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছেন টের পাই নাই। টের পাইতাম না, যদি গজ-মথর দল তাঁহাদের 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত জগদীশ ভট্টাচার্য রচিত "বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধটির শঙ্করীপ্রসাদ-কৃত শঙ্করীভাষ্য প্রকাশ না করিতেন। গজকচ্ছপেরা ইদানীং দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়া আখের ভালই গুছাইয়া লইয়াছেন। গজের কপালে পুরস্কারও জুটিয়াছে, সুতরাং বামাচারবিমুখ গজের খেয়াল হইল নূতন মাল জুটাইতে হইবে। পাশাপাশি শোওয়ার ঠাঁই না হইলেও শঙ্করীকে (শঙ্করাকে নহে) ডাকা হইল। 'নীলকণ্ঠী'-গজ-সহবাসে যাহা স্বাভাবিক তাহাই হইল। প্রথমে পথ্যে অরুচি, পরে বিবমিষা। কিন্তু বমির বদলে যাহা বাহির হইল তাহার নাম লেখা—'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার'।

আমরা উক্ত রচনাটি সম্পর্কে আলোচনা করিব না—কেন করিব না তাহা বলিতে গেলে হয়তো আমাদেরও বিবমিষা জাগ্রত হইবে। আপাততঃ শঙ্করীপ্রসাদকে অন্যভাবে নাড়াচাড়া করিয়া দেখা যাউক।

'কথাসাহিত্যে' প্রকাশিত উক্ত রচনায় শঙ্করীপ্রসাদ যে ভাবে উৎকট বিবেকানন্দ-ভক্তি দেখাইয়াছেন তাহা এককথায় অতুলনীয়। তাহা ছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক হিসাবে শঙ্করী-প্রসাদের নাম দেখিয়া বুঝিতেছি ইনি বিবেকানন্দের বিশেষ ভক্ত। কিন্তু ভক্তির এই অত্যুগ্র আত্যন্তিকতার হেতু কী? হেতু আবিষ্কার করিতে গিয়া উচ্চনাদিনী তস্কর-রমণীর উপমা মনে পড়িতেছে। মনঃসমীক্ষণের আলোকে এই নওজোয়ানের মগজ-ধোলাই করিলে দেখা যাইবে একটি অপরাধ-চেতনা ইঁহার নির্জ্ঞানে প্রচণ্ডভাবে কাজ করিতেছে বলিয়াই সজ্ঞান মনে বিবেকানন্দ-ভক্তি এতটা উচ্চনাদী। স্বামী বিবেকানন্দ বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন; কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তির চিত্তে বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেম উদ্বুদ্ধ করিবার পরিবর্তে বৈষ্ণবের পরকীয়া প্রেম কামুকতা ও তরল ভাববিলাস বর্ধিত করিবে—এই আশঙ্কায় স্বামীজী জনসাধারণের নিকট বৈষ্ণবপদাবলী প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সম্পর্কে তাঁহার বিতৃষ্ণা এত গভীর ছিল যে তিনি নাকি অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের ঘরে যে বামাচার ঢুকাইতে চাহিবে সে ইহকালে পরকালে উৎসন্নে যাইবে।

শঙ্করীপ্রসাদ একাধারে বিবেকানন্দের ভক্ত এবং পরকীয়া বৈষ্ণবপ্রেমের বিলাসকলাকুতূহলী রসপরিবেশক। বৈষ্ণবপ্রেমের ভক্তিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় তিনি মোটেই আস্থাবান নহেন। বিদ্যাপতির উপযুক্ত কাব্যরসিক হিসাবে তিনি কামসূত্রের 'নাগর'কে স্মরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে এই রসিকের একখানি গ্রন্থের পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল দশ-বারো পঙ্‌ক্তির মধ্যেই চারি বার 'দেহমন্থন' শব্দটি নানাভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আরও বহু মজা ইঁহার রচনায় আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা হেঁট করিতে যে কোনও পঁচিশ পৃষ্ঠাই যথেষ্ট। ব্যাটবলবিলাসী লেখকের রসনা সম্ভবতঃ 'দেহমন্থনে'ই পরিতৃপ্ত হইবে না। আমাদের মনে ইঁহার আলোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জাগিতেছে—ইহা কাব্যতত্ত্ববিচার না কামতত্ত্ববিচার? এই ভাষায় ও ভঙ্গিতেই কি আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষ্ণবসাহিত্যের পঠন-পাঠন হইতেছে? কর্তারা যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিদগ্ধ নাগরের আস্বাদনীয়-রূপে বৈষ্ণব-সাহিত্যের পরিবেশনে শিক্ষিত সমাজের প্রবল আপত্তির কারণ আছে। সেই জন্যই এই দেহমন্থনবিলাসী রম্য-রসিকের স্বরূপ সর্বজনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

পরবর্তী কোনও সংখ্যায় এই শঙ্করীপ্রসাদের সাহিত্য-কীর্তির যথাযথ মূল্যায়ন করিতে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করিব। এই বিষয়ে নারায়ণ দাশশর্মা এবং চার্বাক উভয়েই আমাদের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। নারায়ণ দাশশর্মা অতিশয় উগ্রপন্থী—'ঋতু সংহারে'র পরও তাঁহার আশ মিটিতেছে না। অন্য দিকে চার্বাক অনেকটা ধীরস্থির প্রকৃতির লোক। কিন্তু বধ্য জীবের প্রতি উভয়েই নির্মম। আমরা বলিতেছিলাম বিলম্ব যখন হইয়াছে তখন আগামী বকরিদ পর্যন্ত রাখিয়া দিলে মন্দ হয় না।

কিন্তু শর্মা এবং চার্বাক কেহই রাজী নহেন, সুতরাং………

শঙ্করী লো শঙ্করী
আয় না খানিক সং করি
গজেনভায়া চালায় কাগজ
বুদ্ধি যোগায় বিশীর মগজ
সাঁওতালী নাচ নাচছে সেথা
সুমথ ভয়ংকরী।

শঙ্করী লো শঙ্করী
খেলছি খেলা অঙ্করই।
কলুটোলায় বৃথাই কদিন
মরলি নেচে ধিনতা তাধিন,
ময়দানে বেশ ছিলি সুখে
ঘাস খেয়ে আর ঢং করি।

শঙ্করী লো শঙ্করী
এবার তোকে রং ক[illegible]
ঐই খড়িবাজ মি[illegible] ঘোষ
টানছে সুখে চণ্ডু চরস
তুই বেচারা পড়লি মারা
বাঘের সনে জং করি।

ভ্রম সংশোধন: গত সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত 'বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা [প্রবন্ধকারের নিবেদন]' প্রবন্ধের ১৪৩ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ২০ পংক্তিতে 'বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ সম্পর্কে' স্থলে হবে 'রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ সম্পর্কে'; আর ১৫৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের দ্বিতীয় পংক্তির শেষাংশ থেকে একাদশ পংক্তি পর্যন্ত অংশটুকু বাদ যাবে, কারণ তা পরবর্তী কালের ঘটনা। বস্তুতঃ, বেলুড়ে স্বামীজি সম্পর্কে আহূত যে-সভায় জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন সে-সভা ১৯০৫ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি স্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।—প্রবন্ধকার।

হারানো কালের স্মৃতি

[২৪৮ পৃষ্ঠার পর]

[illegible] সেরা সুরকে বাজিয়ে চলেছে অনাদি অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে।

রিক্রুটদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিত্র সাহেব আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। সভাশেষে সৈনিককে ডেকে বললেন, কনৌজ-কাবুল-লণ্ডনের [illegible] বাঙালী জাতি চায় না। কেরল থেকে [illegible], জাভা থেকে জাপানের গুরুগিরিই শাশ্বতের দাবী বঙ্গআত্মার।

চাঁদমারীর অন্তে প্রকাশিত হল শিক্ষার্থীকুলের লক্ষ্যভেদে নৈপুণ্যের ফলাফল। ইংরেজের দেওয়া দুর্নামকে অমূলক প্রতিপন্ন করে ভীতু বাঙালীরা স্থান নিলেন বিভিন্ন প্রান্তবাসীর পুরোভাগে, বহুল বিঘোষিত বীর পাঞ্জাবীদল জায়গা পেলেন অন্যান্য প্রদেশবাসীর নিচে। চাঁদমারীতে শারীরিক শক্তির ততটা দরকার নেই, যতটুকু প্রয়োজন সাধারণ বুদ্ধির।

প্লাটুনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুবেদার মেজর হরিন্দরসিং রসিক লোক। তিনি জওয়ানদের নিয়ে ছাউনীতে ফেরার পথে বললেন, এক মজার গল্প বলছি, সবাই শোন। সৃষ্টির আদিতে স্বর্গের একটি স্কুলে ঈশ্বর পণ্ডিত পাঠ দিচ্ছিলেন। বিষয় ছিল—বুদ্ধিমত্তা। আমার স্বগোত্রেরা সকলে অনুপস্থিত সেই ক্লাসে। পরিণাম আজ প্রত্যেকে অনুভব করছ চাঁদমারীর ময়দানে।

সর্দার সাহেবের কথা শুনে সর্বভারতীয় রিক্রুটরা হেসে উঠলেন। পঞ্চনদের ভাইয়েরা গাম্ভীর্য অবলম্বনে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রইলেন তামাশাকে উপভোগ করতে।

উচ্চতর তালিম লাভ করে সৈনিক চললেন কলকাতার উদ্দেশে, হেড কোয়ার্টার ইস্টার্ণ কমাণ্ডে জয়েন করতে। ডাউন বম্বে মেল তীব্রবেগে ছুটল। পিছনে পড়ে রইল গোণ্ডরাণী দুর্গাবতীর মদনমহল, অর্ডনান্স কোরের মিলিটারি ট্রেনিং সেন্টার।

এলাহাবাদ থেকে খয়ের খান নামে জনৈক চালবাজকে সঙ্গী পেলেন সৈনিক। তিনি বরিশালে সরকারী সম্ভ্রান্ত পদে বহাল রয়েছেন, বাংলার অগণিত সুশিক্ষিত বেকারের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে মুসলিম-লীগ মন্ত্রীবর্গ উত্তর-ভারত থেকে অশিক্ষিতদের আমদানি আরম্ভ করেছেন, তবে সাত শো সালের দাসত্ব সত্ত্বেও যে জাতি বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মবান্ধব, ব্রজেন শীল প্রভৃতি দিকপালের উদয় ঘটায়, সে সমাজের প্রাণশক্তি সম্বন্ধে আণ্ডার এস্টিমেশন যুগধুরন্ধর নাজিম-সুরাবর্দীর বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়।

কমাণ্ড দপ্তরের হরেক আয়োজন উত্তম, তবুও অস্বস্তি লাগত যখনই সাদামুখো অফিসারেরা তাঁদের আচরণে বোঝাতেন—তাঁরা শাসক, ভারত-জনতা শাসিত। বাস্তবকে অস্বীকারের উপায় নেই, অথচ ব্রিটিশ অফিসার-দের ব্যবহারে প্রকাশ পেত: শাসনের যোগ্যতা গেছে। বর্তানিয়াদের বিদায় নিতে হবে। সাধের সুদিন কবে আসবে?

দেশী অফিসার জনৈক ইংরেজ সার্জেণ্টকেও সমীহ করেন। সর্বদাই ব্রিটিশ অফিসারবৃন্দের কাছে জাহির করেন তাঁরা কত না অনুগত অনুচর, কারণ অন্যথায় একজন স্বদেশী ক্যাপ্টেনকে মর্যাদা খুইয়ে লেফটেনাণ্ট রূপে রামগড়ে বদলি হয়ে মশার কামড় খেতে হবে। কোন অপরাধ নেই কালো অফিসারদের। অভুক্ত ছেলেমেয়ের মুখে আহার্য তুলে দেবার প্রতিদানে যদি শোষক বর্তানিয়াকে পদে-পদে সেলাম ঠুকতে হয়, মানবেই অনন্যোপায় পিতা।

দিন কাটে ক্যান্টিনে ও ক্যাবারেটে, প্যারেড গ্রাউণ্ডে আর নাইট ডিউটিতে, রুট মার্চে আর সুইমিং পুলে। প্রত্যহ পরিচিত হতে লাগলেন সদাব্যস্ত সামরিক-জীবনের সঙ্গে।

একসময় খাবার টেবিলে কথা উঠল তাঁদের নিয়ে, যাঁরা কোহিমায় তুললেন আজাদ হিন্দের পতাকা, সম্মান জানাতে কলকাতা করল রুধিরস্নান, বোম্বাই দেখাল নৌবিক্ষোভ, সাহিত্যিক শ্রীনেহরু পরলেন আইনজীবীর

রোজ পরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT
SOAP
রোজ পরার কাপড়—ঝলমলে, ধব্‌ধবে
ফরসা ! সানলাইটে কাপড় কাচার এই হলো
সব কাপড় জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন।

ছিলেন। যিনি ব্রহ্ম-মালয়ে ভারতের মুক্তিসমর পরিচালিত করে গেলেন, শ্রদ্ধানত যাঁর স্মরণে দিল্লী থেকে টোকিও পর্যন্ত অর্ধেক এশিয়ার অধিবাসী, তাঁরই সম্পর্কে কটূক্তি করলেন শৈলেন সোম নামক একজন উৎকট কমিউনিস্ট। তিনি বলতে লাগলেন, সুভাষের ঘৃণ্য পন্থাকে সমাদর করা সমীচীন নয়; সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ট নিপ্পনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জয়চন্দ্র-মীরজাফরের মতন ভারতবর্ষকে আর একদফা বৈদেশিক দাসত্বের নাগপাশবন্ধনে আবদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

নাস ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার।—বললেন সৈনিক। তুমি মাননীয় নেতাজীকে নাম ধরে হেয় করেছ। নবীন পাঠশালায় দু পাতা পাঠ নিয়ে এ হেন স্পর্ধা দেখালে কেমন করে? ইংরেজদের উৎকোচ পেয়ে তথাকথিত আন্তর্জাতিকতার ফাঁকা বুলি কতই না কপচানো যায়, কিন্তু পরাধীন স্বজাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামে সেই আত্মোৎসর্গের দরকার, তা অর্জন করা যায় না। দৃষ্টি বিদেশের দিকে: বিভীষণের আধুনিক সংস্করণ। তোমার বক্তব্য অনুযায়ী নিপ্পনকে শত্রু বললেও ব্রিটিশকে মিত্র ভাবব কোন্ হিসাবে? যারা বারবার কাঁথি-বালুরঘাটে কিশোরশ্রেণীকে করল বেত্রাঘাত, যুবকদের পাঠাল আন্দামানে, ললনা সম্প্রদায়ের উপর চালাল নৃশংস অত্যাচার, তাদের স্বদেশবন্ধু বুঝব আজকে বর্তানিয়া-দালাল তোমাদের!

—পড়াশুনা কর না, অযথা দোষ দাও।

—তুমি মনে কর সবাই মূর্খ, তোমরা একমাত্র জ্ঞানশাস্ত্রী?

—ফ্যাসিজম সাম্যবাদের পূর্বাভাস।

—ভেজাল তন্ত্রের বাহক না হয়ে আসল সত্যের ধারক হওয়াই বিধেয়।

সৈনিক চলে গেলেন লাইনে। সোমবাবু রোষভরে তাকিয়ে রইলেন তাঁর উদ্দেশে।

বঙ্গজনের রাজনৈতিক আকাশে উঠল প্রলয় ঝড়। বঙ্গমাতার আহত ললাট থেকে শোণিতধারা গড়াল। কলকাতা কাঁদল অনেক বঙ্গপুত্রের বেদনায়, নোয়াখালি হল মুহ্যমান অসংখ্য বঙ্গদুলালীর লাঞ্ছনায়। বেনারস-আলীগড়ের টাগ-অব-ওয়ারে বঙ্গজাতি দিল চরম মূল্য। এল বঙ্গপ্রাণের দুঃখের গোধূলি: আগত বঙ্গসমাজের যাতনার অমানিশা! ইংরেজ আমলের বাঙালী জাতির নবজীবনের রাজা রামমোহন উষার অরুণ, উদয়াচলের আদিত্য। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সন্ধ্যার সূর্য, অস্তাগিরির সবিতা।

সৈনিক ছুটিতে বেড়াচ্ছেন পুরুলিয়ার প্রান্তরে। বাংলাদেশের আদিম অঙ্গে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে আবৃত্তি করলেন:

রামমোহনের বাংলা হায় রে আজি বুঝি ডুবে যায়;
রামকৃষ্ণের বঙ্গদেশ যে বিলাপ বেদনায়।
অরবিন্দের শুভসাধনার
রবি ঠাকুরের অতি আপনার
সুভাষ বসুর বঙ্গজননী কাঁদিতেছে শংকায়।

কাটল কিছুক্ষণ। মানভূমের বক্ষে বসে কালপুরুষের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, আবার বৈজ্ঞানিক বিচারে রেনেসাঁ, দার্শনিক বিশ্লেষণে সুগলাল। পুনরায় পাশ্চাত্যের ভাবনায় মহাবলদের মনোমেলা, প্রতীচ্যের ধারণায় অবতারদের আবির্ভাব। পুনর্বার চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের সাত্ত্বিক পূজা; তারপরে কেদার রায় আর সীতারাম রায়ের; ক্ষুদিরাম বসু এবং সুভাষ বসুর রাজসিক আরতি।

ছুটি কাটিয়ে ফিরলেন টালিগঞ্জের ব্যারাকে। অনুপস্থিতিতে বিরাট ষড়যন্ত্র সৃজিত হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে। অতীতে মেসে অপমানিত শৈলেন সোম উপরওয়ালাকে জানিয়েছেন, তিনি নাকি গিয়েছিলেন নোয়াখালিতে। যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল কুক তলব করলেন খাস কামরায়। মিথ্যে অভিযোগ প্রমাণ করা সোমবাবুর পক্ষে সম্ভব হল না; কমাণ্ডার সাহেবও কোনই দণ্ডাদেশ শোনালেন না। দাম্ভিক কর্নেল কুকের সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হল না, তাই বোধ হয় বদলি করে দিলেন মধ্যপ্রদেশের কাটনি পল্লীতে।

রাজধানী পশ্চাতে রেখে সৈনিক রওনা হলেন গণ্ডগ্রামের দিকে, ট্রেনে বসে ভাবলেন শৈলেন সোমের হীনতা। প্রতারকের কাছে কী আশা করা যায়?

এসে গেলেন কাটনিতে, হোল্ডিং রেজিমেন্টে।

জাপানে তখন বৃটিশশাহীর নানান এলাকা থেকে দখলকারী ফৌজ পাঠানো হচ্ছে, নামকরণ হয়েছে কমাইণ্ড কমনওয়েলথ ফোর্সেস। জেনারেল শ্রীনাগেশ তপনোদয়ের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় ডিভিশনের সর্বময় কর্তা হয়েছিলেন।

এখানে চলে আসা তাঁর সাথে বর হল, পেলেন এক মাসের ছুটি। এর পর ওরা ওদের রাঁচি শহরে হাজিরা দেবার হুকুম। ছুটি কাটাতে ফিরে এলেন বঙ্গদেশে। ঘুরে বেড়ালেন নবদ্বীপে-ঈশ্বরীপুরে-গৌড়ে। তীর্থ ভ্রমণ শুরু হয়ে গেল। খ্যাপা খুঁজল নদীয়ার গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুর পবিত্র পদরেণু, ঈশ্বরীপুরের মহৎ মাটিতে প্রতাপাদিত্যের বলিষ্ঠ প্রাণস্বাক্ষর, গৌড় নগরের গর্বিত গগনে ধর্মপালদেবের আর্যাবর্ত-দলিত বিজয়নিশান বঙ্গজাতির!

জয়েন করলেন বিহার-উড়িষ্যা এরিয়ার হেড অফিস রাঁচিতে। প্রতিদিন বেলা বারোটার মধ্যে দপ্তরের কাজ শেষ হত। সময় কাটানো কষ্টকর ঠেকত। দিবানিদ্রা মিলিটারি জীবনে অসম্ভব, অহোরাত্র বিপুল ব্যস্ততার কর্মপ্রবাহে যারা ভেসে চলে, তারা দিনমানে ঘুমোতে চাইলেও নিদ্রাদেবী ভুলেও ধরা দেয় না।

অলস দুপুরে উপলব্ধি করতে চাইতেন অজ্ঞাত আনন্দ, অতৃপ্তির আস্বাদ। অবসর কল্পনা আনত এক গৃহের— যেখানে থাকবেন জনৈকা প্রেরণাময়ী বান্ধবী। পরমমুহূর্তে সকল কামনাকে মনোনদের অতলে ডুবিয়ে ভাবতেন, বাসনার ঊর্ধ্বে সৈনিকের লক্ষ্য নিবদ্ধ হওয়া উচিত। নিজেই ভাবতেন, তিনিও রক্তেমাংসে রচিত মানব।

সময় কাটানোর অপর পন্থা সহকর্মী বাঙালী মুসলমান আবদুল আলীর সঙ্গে তর্ক করা। বিতর্কের বিষয় ছিল, বাংলাকে কেটে কেন হিন্দুবঙ্গ গঠিত হবে না? কিসের যুক্তিতে তোমাদের চূড়ান্ত দেশদ্রোহিতাকে মেনে নেব আমরা যুগঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তগণ! কালনেমিকুলের কবলের বাইরে যতটা স্বদেশ রক্ষা পায়, ততটুকু কাম্য, ততটাই কল্যাণের।

বর্তানিয়ার ভারত ত্যাগের মাহেন্দ্র লগ্ন ঘনাল। কিন্তু ভারতবর্ষের মহত্তম অঞ্চলের কাছে ইতিহাসের এ কি বৃহত্তম মূল্য গ্রহণ? অর্ধশতক আগে চার্লস কার্জন বঙ্গভঙ্গকে ভিত্তি করে ভারতভূমিতে যে জাতীয়তা জেগেছিল, অর্ধশতাব্দীর অন্তে লুই মাউন্টব্যাটেন চক্রান্তে সে বঙ্গবিভাগকে স্বীকার করেই ভারত দেশকে সংগ্রহ করতে হল স্বায়ত্তশাসন! বঙ্গনায়ক শরৎ বসু প্রাণপণ প্রচেষ্টার পরেও পারলেন না লীগ-কংগ্রেস নিখিল ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতার ভরাডুবি থেকে বাঙালী জাতিকে উদ্ধার করতে।

আদিবাসী জীবন ফুরল। এলেন অণ্ডাল। প্রতিদিন কাটতে লাগল লালমুখো অফিসার দের দুর্ব্যবহারে ও অণ্ডালের দুরন্ত গ্রীষ্মের দুঃসহ দৌরাত্ম্যে।

একটি তেলেগু খ্রীষ্টান কুলি স্কোয়াড্রের সঙ্গে সঙ্গী হলেন সৈনিক। ডিটাচমেণ্টের প্রত্যেকে স্বরাজবিরোধী। তাদের বিশ্বাস বিধাতার বরে বর্ণশ্রেষ্ঠ ইংরেজ ভারতজনের উপর প্রহার আর প্রভুত্বের অধিকার অর্জন করেছে। শ্রমিকদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ভারত সাম্রাজ্যে দেবদূত বৃটিশের চিরপ্রতিষ্ঠা।

এই ক্যাম্পে বেশিদিন বাস করতে হল না। হপ্তার মধ্যে পোস্টিং পেলেন পানাগড়ে, নয়া স্টেশনে পৌঁছে পেয়ে গেলেন তিন মাসের লম্বা ছুটি। যাত্রা করলেন কলকাতার উদ্দেশে। দানাপুর প্যাসেঞ্জার তাঁকে এবং অগণিতকে কোলে তুলে পানাগড় পরিত্যাগ করল বর্ধমান-ব্যাণ্ডেল হয়ে হাওড়া পর্যন্ত পাড়ি জমাতে।

রেলগাড়ি চলতে লাগল। সৈনিক ভাবতে লাগলেন, রাঢ় নামে সোনার বাংলার অংশবিশেষ রুক্ষ রাঢ় দেশে বঙ্গমাতৃকার ভৈরবী বেশ; তবু রাঢ়ই হবে সর্বরিক্ত বঙ্গসন্তার ভাবী দিনের উপনিবেশ। বারবার মৌলভী-পাদ্রীর আক্রমণের ফলে চন্দ্রকেতুর পতন, লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের, সিরাজদ্দৌল্লার পরাভবের প্রায়শ্চিত্ত করতে থাকবে চিরন্তনের বঙ্গআত্মা রাঢ়ের পুণ্য মাটিতে। অজয় বঙ্গজাতির অমরত্ব ঘোষণা করবে, রূপনারায়ণ জপ করছে বঙ্গজীবনের মৃত্যুঞ্জয়ের গুরুমন্ত্র।

উনিশ শো সাতচল্লিশের জুন।

—

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৬-২৮৩৮

শনিবারের চিঠি

৩৫শ বর্ষ

১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭০

সম্পাদক :

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

॥ কবিস্বীকৃতি ॥

এক

সজনীকান্তের 'রাজহংস' কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল ১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে, ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে। কবির বয়স তখন পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে ছত্রিশ চলছে। আমরা বলেছি, বাংলা সাহিত্যে কবি সজনীকান্তের সত্য পরিচয় 'রাজহংসে'র কবিরূপে। 'রাজহংসে'র মুক্তবন্ধ ধ্বনিপ্রধান ছন্দেই সজনীকান্ত তাঁর নিজস্ব কবিভাষাটি আবিষ্কার করেছিলেন। 'রাজহংসে'র অধিকাংশ কবিতাই মুক্তবন্ধ। তানপ্রধান রীতির কয়েকটি কবিতাও ওতে আছে। সেগুলি 'বলাকা'রই অমিল অনুসরণ। ধ্বনিপ্রধান মুক্তবন্ধের রূপটি সজনীকান্তেরই আবিষ্কার—এ কথা বলা অবশ্য ঠিক হবে না। নজরুলের 'অগ্নিবীণা'র "বিদ্রোহী"তে তার প্রথম মুক্তিসম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তারপর কিছুদিন নিশিকান্ত 'বিচিত্রা'য় এই ছন্দমুক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। সজনীকান্ত প্রথমে 'শনিবারের চিঠি'তে "টুকরি" শীর্ষক কবিতাবলীতে তাঁর রচনার এই নবীন পক্ষিরাজকে লঘু-চটুল ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখলেন। 'শনিবারের চিঠি'র "রবীন্দ্র জয়ন্তী" সংখ্যায় প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথ" কবিতায় বাহনপরীক্ষার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হল। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু "কে জাগে?" কবিতায়। তারপর রাজহংসের পাখায় যথাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতি উন্মুক্ত নীলাকাশে উদার মুক্তিলাভ করল। এই যথাত্রিক ধ্বনিপ্রধানের অমিল মুক্তবন্ধ রূপটিই সজনীকান্তের বিশিষ্ট ছন্দবাহন।

'রাজহংস' প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সজনীকান্ত গ্রন্থখানিকে কবিগুরুর কাছে পাঠালেন। সরাসরি নয়, মধ্যস্থ হলেন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। কবি প্রমথনাথ বিশী দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ছাত্র। কবিগুরুর বিশেষ স্নেহের পাত্র। 'শনিবারের চিঠি' ও 'বঙ্গশ্রী'র অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর একজন। কাজেই সজনীকান্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থখানিকে কবিগুরুর কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে প্রমথনাথের শরণ নিলেন। রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের কবিত্ব-শক্তিকে স্বীকার করলেন। "রাজহংস বইখানি ভাল হয়েছে" বলে প্রশংসাও করলেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথকে লেখা কবিগুরুর পত্রখানি উদ্ধারযোগ্য :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অভিমত দিতে আমি একান্ত নারাজ—ভালোই বলি আর মন্দই বলি এতে দেশের দুর্মুখকে জাগিয়ে তোলা হয়। বড়ো অশান্তি, আমার বয়সে এই দুর্বিপাক থেকে নিষ্কৃতি দাবী করতে পারি। তোকে গোপনে বলি, রাজহংস বইখানি ভালো হয়েছে। আমার মতে কবিতার দুই জাত আছে ভালো এবং মন্দ। মাঝখানে যে সংকর-বর্ণের আবির্ভাব দেখা যায় তাদের জাতিনির্ণয় করতে

বৃথা পরিশ্রম না করাই শ্রেয়। এই ইসারাটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হলুম, এ নিয়ে হট্টগোল করিস নে।

ছন্দ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে গদ্য এবং পদ্য—কাব্যের এই দুই ছন্দ আছে। রাজহংসের ছন্দ স্পষ্টতই পদ্যছন্দ, তাকে তোর চিঠিতে গদ্যছন্দ কেন আখ্যা দিয়েছিলি বুঝতে পারলুম না। আমি আজকাল অনেকসময়ে গদ্যছন্দে কবিতা লিখি—আর কোনো ছন্দে ঠিক এই সকল ভাব বলা আমার পক্ষে সাধ্য নয় বলেই আমার এই অধ্যবসায়। কাজটা কিছুমাত্র সহজ নয় এ কথা জানিয়ে রাখলুম। সহজ মনে করে যদি প্রবৃত্ত হোস তবে হঠাৎ ঘাটের থেকে পড়বি পাঁকের মধ্যে। ইতি ২৯ এপ্রিল ১৯৩৬

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রখানি সজনীকান্তের আত্মশ্লাঘার যোগ্য বটে। যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত প্রকাশ্যে বলতে কুণ্ঠিত হয়েছেন, প্রমথনাথকে লিখেছেন, "ইসারাটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হলুম, এ নিয়ে হট্টগোল করিস নে," তবু এ কথা অস্পষ্ট রইল না যে, রবীন্দ্রনাথের মতে 'রাজহংসে'র কবিতাগুলি ভালো জাতের কবিতা।

দুই

সজনীকান্তের আত্মশ্লাঘার এর চেয়েও বড় হেতু রয়েছে অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথ 'জন্মদিনে'র "ঐকতান" কবিতায় বলেছেন :

"সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে
নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।"

রবীন্দ্রনাথের চিরগ্রহিষ্ণু মনের স্বীকরণ-ক্ষমতা ছিল অসামান্য। উত্তরসূরিবৃন্দের মধ্যেও নতুন কোন কবিকৃতি সার্থক হয়েছে দেখলেই তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হতেন। কখনও কখনও নিজের কাব্যসাধনায় তাকে গ্রহণও করেছেন। এমন কি যাঁরা "পথ রুধি বসি আছ রবীন্দ্র ঠাকুর" বলে তাঁদের কাব্যসাধনা আরম্ভ করেছেন সেই রবীন্দ্রবিদ্রোহী তরুণ কবিসমাজের কাছেও ভাব ও প্রকাশরীতির অভিনবত্বের সন্ধান পেলে কবি তা গ্রহণ করতে পশ্চাৎপদ হন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের কবিসমাজকে প্রভাবিত করেছেন—এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের কবিগণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছেন—এ কথা যতই আপাত-বিস্ময়কর বলে মনে হোক না কেন, তা ঐতিহাসিক সত্য। 'পরবর্তী যুগ' বলতে অবশ্য অনা... কালের কথা চিন্তা করছি না, কবিমানস ও কাব্য... কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করছি। রবীন্দ্রনাথের শি... বা শিষ্যোপম, তন্নিষ্ঠ বা বিদ্রোহী, যে-সব কবির সাহিত্য সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ নিজের সারস্বত সাধনায় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা শুধু সৌভাগ্যবানই নন তাঁরা সে সৌভাগ্যকে তাঁদের সারস্বত জীবনের পরম গৌরব ও চরম সার্থকতা বলেও মনে করতে পারেন।

বিষয়টি বিস্তৃত গবেষণা সাপেক্ষ। আমরা এখানে একটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করব। রবীন্দ্র-বিদ্রোহী কল্লোল-যুগের অন্যতম কবিপ্রতিনিধি হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতাটি তাঁরই নাম "নগর-প্রার্থনা"।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "নগর-প্রার্থনা" তাঁর প্র... কাব্যসংকলন 'প্রথমা'য় আছে। 'প্রথমা' ১৯৩০-এ... আগে প্রকাশিত হয়েছে, সা... পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশ তারও আগে। রবীন্দ্রনাথ 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থে "কলুষিত" কবিতাটি লিখেছেন ১৪ ভাদ্র ১৩৪২। অর্থাৎ 'প্রথমা' গ্রন্থাকারে প্রকাশের অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পরে। "কলুষিত" কবিতা রচনায় "নগর-প্রার্থনা"র প্রভাব প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। প্রভাবটি অবশ্য অন্যোন্য... "নগর-প্রার্থনা"র ভাব রবীন্দ্রানুসারী। কবিতাটি পড়লে 'চৈতালি'র "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর" দীর্ঘপঙ্‌ক্তিক সনেটকল্প কবিতাটি মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে 'মানসী'র "বধূ" কবিতাটিও। মনে পড়ে পাষাণকায়া রাজধানীর "ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট, নাইকো ভালোবাসা নাইকো খেলা"। সভ্যতার প্রতি সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হে নব-সভ্যতা তুমি তোমার "লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর" ফিরিয়ে নাও। নাগরিক সভ্যতার এই রূপই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পনা...

রয়েছে লৌহ-কাষ্ঠ-শিলায় কারাগার। তার চেয়েও বড় কথা, "নগর-প্রার্থনা"র সবচেয়ে উজ্জ্বল বাক্‌প্রতিমাটি প্রেমেন্দ্র মিত্র পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথেরই কাছে। নগরীকে তিনি বলেছেন, "উন্মত্তা নারী-কাপালিক"। সে পতিতা। তার শাপমুক্তির প্রার্থনায় কবি ভরতবচন উচ্চারণ করে বলেছেন :

যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি,
ভেদ করি, ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি,
---সৌম্য-শুচি কুমার-সন্ন্যাসী
হে পতিতা তোমার আলয়ে।

পতিতার আলয়ে সৌম্যশুচি কুমার-সন্ন্যাসী-রূপে প্রভাতের আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের 'কথা'-কাব্যগ্রন্থের "অভিসার" কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় নগরী হয়েছে উন্মত্তা নারী-কাপালিক, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নগরীর নটী ছিল যৌবনমদে-মত্তা। 'অভিসারে'র শাপমোচনকারী সন্ন্যাসী 'কুমার কিশোর'। তাঁর 'নবীন গৌরকান্তি' আর 'সৌম্য সহাস করুণ বয়ান'ই প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রভাতকে 'সৌম্য-শুচি কুমার-সন্ন্যাসী'তে পরিণত করেছে। কিন্তু, এই অপূর্ব-সুন্দর বাক্‌প্রতিমাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোক থেকে আহরিত হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে যেন নবজন্ম লাভ করেছে। কবিতার মূল ভাবটিও, রাবীন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও, প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবসৃষ্টি। এই নবসৃষ্টির নবীনতাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। তাই তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাক্‌প্রতিমাকে সানন্দে অনুসরণ করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাটি তানপ্রধান অমিল মুক্তবন্ধ ছন্দে লেখা। পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ৫৫। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিও তানপ্রধান মুক্তবন্ধ, কিন্তু সমিল, পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৬২। 'হে নগরী' সম্বোধনে দুটি কবিতারই আরম্ভ। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন :

আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদখানি
লও তব মাথে,
হে নগরী,
লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্র-জটা-বিভূষিত শিরে,
তব লৌহ-কাষ্ঠ-শিলা কারাগার হতে,
রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তব
কর দুটি জুড়ি
আজি এই প্রভাতেরে কর নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথও কলুষিত নগরীকে সম্বোধন করে কাব্যারম্ভে বলেছেন :

শ্যামল প্রাণের উৎস হতে
অবারিত পুণ্যস্রোতে
ধৌত হয় এ বিশ্বধরণী
দিবস-রজনী।
হে নগরী, আপনারে বঞ্চিত করেছ সেই স্নানে,
রচিয়াছ আবরণ কঠিন পাষাণে।
আছ নিত্য মলিন অশুচি,
তোমার ললাট হতে গেছে ঘুচি
প্রকৃতির স্বহস্তের লিখা
আশীর্বাদটিকা।
উষা দিব্যদীপ্তিহারা
তোমার দিগন্তে এসে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন :

তোমার ব্যথিত বক্ষে,
অন্ধকারে যেথা
অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলে দিকে-দিকে,
হারায় কংকাল পথ
বিকারের পয়োনালী মাঝে,
লুকায় সুড়ঙ্গ লাজভরে মৃত্তিকার তলে,
লোভ হিংসা ফেরে ছদ্মবেশে,
অন্ধকারে নিঃশব্দ লোলুপ,---

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই ছদ্মবেশী 'লোভ হিংসা'ই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হয়েছে 'দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষ'। তিনি বলেছেন :

দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষে
আলোহীন অন্তরের গুহাতলে হেথা রাখে পুষে
ইতরের অহংকার ;
গোপন দংশন তার ;
অশ্লীল তাহার ক্লিষ্ট ভাষা
সৌজন্য-সংযম-নাশা।

দুর্গন্ধ পঙ্কের দিয়ে দাগা
মুখোসের অন্তরালে করে শ্লাঘা ;
সুরঙ্গ যেমন করে,
ব্যাপি দেয় নিন্দা ক্ষতি প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে।

বলাই বাহুল্য, দুটি কবিতার ভাব, বিষয়বস্তু, এমন কি ভাষাও প্রায় অভিন্ন। রূপকল্পগুলি অবিকল এক। দুই কবিতাতেই দেখতে পাওয়া যায়, অভিশপ্তা নগরী সুন্দরকে ভুলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহজ প্রাণকে ভুলে সে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে নিয়েছে। দুজনেই দেখেছেন যন্ত্রের জটিল পথে বিকলাঙ্গ জীবনের ব্যঙ্গ-সমারোহ। পার্থক্য এই যে, কলুষিত নগরীর শাপমোচনের জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র এনেছেন প্রভাতের সৌম্য-শুচি কুমার-সন্ন্যাসীকে ; আর রবীন্দ্রনাথ এনেছেন রুদ্রের জটাবদ্ধ হতে মুক্ত আকাশগঙ্গার প্লাবনকে। কিন্তু এই ব্যবধান সত্ত্বেও দুটি কবিতা একই প্রেরণা থেকে উৎসারিত। সমকালীন দুজন কবি একজন আরেকজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আর, ভাবতে বিস্ময় লাগে, এ ক্ষেত্রে উত্তরসূরিই দাতা, পূর্বসূরি গ্রহীতা।*

তিন

সজনীকান্তের যথামাত্রিক ধ্বনিপ্রধান মুক্তবন্ধ ছন্দটিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'শ্যামলী'র উৎসর্গ-কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। উৎসর্গ-কবিতাটি "কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাণী মহলানবীশ"-এর উদ্দেশে লেখা। পূর্বেই বলা হয়েছে, সজনীকান্তের 'রাজহংস' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪২ সালের চৈত্র মাসে। 'শ্যামলী'র উৎসর্গ-কবিতাটি লেখা ১৩৪৩ সালের ১লা ভাদ্র। 'শ্যামলী' রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে লেখা গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের শেষ গ্রন্থ। কিন্তু উৎসর্গ-কবিতাটি লেখা হয়েছে পদ্যছন্দে—সজনীকান্তের ধ্বনিপ্রধান মুক্তবন্ধ রীতিতে। রবীন্দ্রনাথ এর পূর্বে যথামাত্রিক মুক্তবন্ধ ধ্বনিপ্রধান রীতিতে কোন কবিতা রচনা করেন নি। কাজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্যায় হবে না যে, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তফাত এই যে, সজনীকান্তের কবিতাগুলিতে অন্ত্যানুপ্রাস নেই, এই অর্থে সেগুলি অমিত্রাক্ষর ; আর রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে অন্ত্যানুপ্রাস আছে—এই অর্থে তা মিত্রাক্ষর।

শুধু ছন্দের দিক দিয়েই যে রাজহংসের কবিতাগুলির সঙ্গে 'শ্যামলী'র উৎসর্গ-কবিতাটির মিল আছে তা নয়, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাচনভঙ্গির দিক দিয়েও একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। 'রাজহংসে'র "পান্থপাদপ" কবিতাটির সঙ্গে 'শ্যামলী'র "উৎসর্গ" কবিতাটির ভাবগত নৈকট্য একটু বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "পান্থপাদপ" কবিতায় সজনীকান্ত তাঁর কবিমানসে আবির্ভূতা বিভিন্না নায়িকার আলো-আঁধারি লীলার স্মৃতিচিত্র রচনা করেছেন। কবি বলছেন :

> রজনী যখন আঁধারিয়া আসে, গগনে ঘনায় কালো,
> দূরে কোথা শুধু প্রহরী পেচক জাগে,
> মেঘে মেঘে যবে ধূসর আকাশ, আলো আবছায়া হয়,
> অবিরল ধারে আকাশের ধারা ঝরে ;
> একাকী আমার বাতায়নে বসি, মন-বাতায়নে সখী,
> স্তব্ধ পুলকে দেখি চলিয়াছ সবে—

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিও একটি স্মৃতিচিত্র। ইঁটকাঠে গড়া নীরস খাঁচা থেকে শ্রীমতী মহলানবীশ একদিন কবিকে "নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ নিরালয়" ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারই কথা স্মরণ করে শান্তিনিকেতনে বসে কবি কবিতাটি রচনা করেছেন। কবি বলছেন :

> বসি যবে বাতায়নে
> কলমি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে।
> বিকেল বেলার আলো
> জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।
> ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
> চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।
> জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
> আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে

* আলোচনার এই অংশটি প্রবন্ধকারের "উত্তরসূরির কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ" প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রিত। দ্রষ্টব্য : উজ্জ্বলকুমার দাস সম্পাদিত 'রঙ্গিলিখা', শ্রাবণ ২ সংখ্যা, ১৩৬৯।

নীকান্ত তাঁর একটি নায়িকার প্রসঙ্গ শেষ করে বলছেন :

তারপর দূর, বহু দূরে সখী, সুগভীর বনভূমি.
পাহাড়ে ও বনে চোখে অবসাদ জাগে ;
সেথা তব বধূবেশ ;
গুহন শিরে, চাহিছ ভুলিতে কবে কি ঘটেছে ভুল।
আমার মনের বনে—
একদা যে শাখী শাখা মেলেছিল, যদিও শুকায়ে গেছে
দখিন বাতাসে আজিও তাহার মর্মর-ধ্বনি শুনি ;
যদি কভু দেখা হয়—
তোমার প্রণাম সহজে লইব, সখী।

ন্দ্রনাথ বলছেন :

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন,
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব প্রণতি-ভরা,
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

লা প্রয়োজন যে, ভাবানুষঙ্গের দিক দিয়ে আলোচ্য টি কবিতার গরমিল অনেকখানি। সজনীকান্তের বিতায় আছে পরকীয়া ও স্বকীয়া প্রেমের স্মৃতিচারণা ; র রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে বাংলাদেশের গৃহিণীর রব প্রণতিভরা সেবার অর্ঘ্য। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই তিরসে স্মৃতির পাত্রটি পূর্ণ। কিন্তু স্বাদে ও সুরভিতে টি কবিতার জাত আলাদা। তবু বাচনভঙ্গির দিক দিয়ে কী আশ্চর্য মিল রয়েছে দুটি কবিতাতে! জনীকান্তের 'মনের বন' হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বনপ্রকৃতির মন'। সজনীকান্ত বলেছেন :

মেঘে মেঘে যবে ধূসর আকাশ, আলো আবছায়া হয়,

* * *

একাকী আমার বাতায়নে বসি, মন-বাতায়নে সখী,
শুষ্ক পুলকে দেখি চলিয়াছ সবে!

রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

বসি যবে বাতায়নে
কলমি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে।

* * *

ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।

সজনীকান্ত স্মৃতির সরণি বেয়ে তাঁর মানস-পরিক্রমা শেষ করে কবিতার উপসংহারে বলছেন :

আঁধি আসে আর আঁধি সরে সরে যায়—
ধূ ধূ মরুভূমি পড়ে থাকে সীমাহীন।
তোমরা এসেছ, তোমরা গিয়েছ সরে,
একে একে সখী, সব ছায়া রোদ হবে,
সব আঁধি পিছে পথের মতন পিছনে রহিয়া পড়ে।

* * *

আমার জীবনে শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।
এর বেশি কিছু নহে,
আমি তোমাদের নহি—
চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিতার উপসংহারে প্রায় একই সুরে বলছেন :

কালের লীলায় দিয়ে যাব সায়, খেদ রাখিব না চিতে,
এ ছবিখানি তো মন হতে ধনী পারিবে না কেড়ে নিতে।
তোমার বাগানে দেখেছি তোমারে কাননলক্ষ্মীসম,—
তাহারি স্মরণ মম
শীতের রৌদ্রে, মুখর বর্ষারাতে
কুলায়বিহীন পাখির মতন মিলিবে মেঘের সাথে।

সজনীকান্তের কবিতায় আছে যৌবনবেদনা, আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রৌঢ়-মানসের প্রশান্তি। জীবনবোধেও পার্থক্য আছে। কিন্তু বাচনভঙ্গিতে দুটি কবিতাই এক। আর, ভাবতে বিস্ময় লাগে, এখানে পূর্বসূরিই অনুসরণ করেছেন উত্তরসূরিকে। সজনীকান্তের কাব্যসাধনার এর চেয়ে মহত্তর গৌরব আর কী হতে পারে যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দ ও বাচনভঙ্গিকে গ্রহণ করেছেন, তাঁর সারস্বত সাধনাকে স্বীকরণের দ্বারা পরম স্বীকৃতি দান করেছেন!

[ক্রমশঃ]

বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা

(আলোচনা—দ্বিতীয় পর্ব)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং—এই আপ্ত ঋষি বাক্যকে সম্যক্ শ্রদ্ধা জানিয়েই সমিধপাণি না হয়েও সুপণ্ডিত অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা সম্বন্ধে নব নিবেদন (শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০) আগ্রহের সঙ্গেই একাধিকবার পড়লাম। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়েরও এক নিবন্ধ (কথা-সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০) পড়বার সুযোগ হয়েছিল। দুটি প্রবন্ধ পড়ে উপকৃত যে হয়েছি সে কথা স্বীকার করতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই, কিছু কিছু ভুলভ্রান্তির নিরসনও হয়েছে এ কথা ঠিক, তজ্জন্য জগদীশবাবু ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ও সহযোগী নলিনীবাবু দুজনেই ধন্যবাদার্হ। সবচেয়ে পরিতৃপ্তি পেয়েছি যে শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ সেন ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রসজ্ঞ ও মনীষিদের কিছু মতামতের সঙ্গেও পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন জগদীশবাবু। তিনি শুধু প্রবন্ধকার নন, তিনি জ্ঞানীগুণী ধীমান ব্যক্তিত্ববান পুরুষ, তাঁর রচনাশৈলী আমাদের ভাল লাগে, তাঁর বিচার কৌশল যুক্তিতর্ক আমাদের লুব্ধ করে, তাঁর মননশীলতা আমাদের চমক লাগায়, তাঁর সারস্বত বিশ্বাস বা সাহিত্যিক নিষ্ঠার প্রতি আমাদের আস্থা আছে, তবু আমার মূল জিজ্ঞাসার সুনিষ্ঠ সমাধান আমি পেয়েছি এ কথা বলতে পারছি না। শুধুমাত্র এই কারণে তাঁর সঙ্গে অযথা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই, ক্ষমতাও নয়—বিশেষ করে যে তিনজন লোকোত্তর ত্রয়ীর পুণ্যনাম ও সাধনা এই আলোচনার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিজড়িত তাঁরা শুধু প্রণম্য নন, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় ঐতিহাসিক legend and symbol (কাহিনী ও প্রতীক) হয়েছেন। ভারতভাগ্যবিধাতা নিজহাতে তাঁদের ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন, পাঞ্চজন্য বাজিয়ে পঞ্চজনের পরিষদে সসম্মানে বরণ করে স্মরণীয় করে রেখেছেন। কিন্তু এ কথা কেউ না মনে করেন যে জগদীশবাবুর প্রবন্ধ পড়ে আমার মনে হয়েছে যে তিনি এই ত্রয়ীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নন। সে প্র[illegible] একেবারে অবান্তর। আমি তাঁর সঙ্গে একমত [illegible] প্রণিপাতের সঙ্গে পরিপ্রশ্নের প্রয়োজন কারণ বিচারহীন বিশ্লেষণ বা শুধু ভক্তিগদগদ নিবিড়তা কাম্য নয়। [illegible] আরতি শঙ্খঘণ্টামুখর দেবালয় থেকে বে[illegible] বিশ্বভুবনমণ্ডলে ব্যাপ্ত হোক, মানুষে মানুষে মিলিয়ে [illegible] মহাদেবতা, তার পাদপীঠ স্পর্শ করুক এই আমরা চাই। বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ শুধু সহস্রশীর্ষপুরুষ নন, তাঁ[illegible] সহস্রকরও, মন জাগানিয়া (Awakener of souls[illegible] 'Grand Seignior.'

ইক নদিয়া ইক নাম কহাবত মৈলী নীর ভরো
জব মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো সুরসুরি নাম প[illegible]

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে জগদীশবাবু [illegible] প্রশ্নগুলি অবতারণা করেছেন সেগুলির সার্থক মী[illegible] প্রায় একেবারে অসম্ভব, কারণ সাক্ষ্যপ্রমাণ সবই প[illegible] অনুমানসাপেক্ষ ও সুসমঞ্জস ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশী[illegible] একজনের সঙ্গে আর এক[illegible] আত্মিক সম্পর্ক [illegible] পর্যায়ে পড়ে, বা কোন কবি কোন কবিতা কেন লিখে[illegible] তার বিচার যদি প্রত্যক্ষপ্রমাণ বা স্বীকৃতির ভিত্তিতে [illegible] হয় তা হলে আনুমানিক হতে বাধ্য। কারণ ম[illegible] গভীরে বা জীবননৃত্যনাট্যশালার স্বল্পালোকিত [illegible] কখন কি ঘটে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হয়তো সাই[illegible] অ্যানালিস্ট করতে পারেন, আমাদের মত অর্বা[illegible] অভাজনরা নন। মহাজনরা হয়তো বলেই বসবেন [illegible] সব হচ্ছে অরসিকেষু রসের নিবেদন, অব্যাপারেষু ব্যাপা[illegible]

মরম না জানে ধরম বাখানে এমত আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা

মূল প্রশ্ন হচ্ছে দুটি : প্রথমত:, বিবেকানন্দ-নিবেদি[illegible] আত্মিক সম্পর্কের রূপ (সে রূপ রবীন্দ্রনা[illegible] কবিদৃষ্টিতে কোথাও প্রতিফলিত হয়েছিল কি না [illegible] এই দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি কি না)।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের 'মরণ-মিলন' কবিতাটি এই ...ত্বিক সম্পর্কের উপর কোন আলোক নিক্ষেপ করে না।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা পূর্বেই ...ন্ধে নিবেদন করেছি, সেই কথাগুলির কিছুটা পুনরুক্তি ...রি—চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে ...নুভব করে, রূপরস স্পর্শের সীমায়, ঘটনার পারম্পর্য ...রে যুক্তিতর্ক করে বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসে অনেক ...ময়ই দেখা যায় কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক থেকে ...চ্ছে। তবু এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে গুরুশিষ্যের ...ভীরতম শ্রদ্ধা প্রায় গভীরতম প্রেমের পর্যায়েরই। যখন ...আমরা গভীরতরভাবে কাকেও শ্রদ্ধা করি (কি স্ত্রী কি ...রুষ) তখন তার পিছনে একটা (নিবেদিতার নিজের ...ভাষাতে) hidden emotional relationship গড়ে ...ঠা অসম্ভব নয়, কিন্তু সম্পর্কের এই যে নাটকীয়ত্ব এর ...ল কথা হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা পেরিয়ে wholly impersonal ...এবং গুরুকে ভগবান জ্ঞানে আত্মনিবেদন। নিবেদিতার ...র বিবেকানন্দের প্রতি শুধু যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ছিল তা ...য় একটা গভীরতম মমতাও হয়তো ছিল, যার রসঘন ...কৃতি "আমার গুরুদেব" এই দুটি কথায়। এখানেও emotional catharsis আছে কিন্তু সে বিরেচন বস্তু-জগতের নয়, ভাবজগতের—

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি
তোমার আলোতে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী

এ-দেশের ও-দেশের সাধন ইতিহাসের গুরুশিষ্য সম্পর্কের এই রীতি বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। তাকে সেবা বা পূজা বলাই সঙ্গত—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শেষ বিচারে যা বলেছেন। শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুর গল্পটিও সেই কথাই সমর্থন করে। ...তিকারের গুরু হচ্ছেন দক্ষিণামূর্তি, তাঁকে দেখলে, ...াঁর কথা শুনলে, তাঁর পত্র পেলে মনের তন্দ্রাবভাবী বা ...শান্তচিত্ত হওয়া বিচিত্র নয়। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্ন সংশয়া", সেখানে আবেগঘন একটা দিক থাকতে পারে কিন্তু সেটা সাম্যসামীপ্য নৈকট্যের উপর নির্ভর করে না, দেহজ বা দেহাতীত এ প্রশ্ন সেখানে অবান্তর—সেটির স্বরূপ হচ্ছে আত্মনিবেদন বা ভগবান জ্ঞানে পূজা—তাকে প্রেম বলুন, ভক্তি বলুন, শ্রদ্ধা বলুন তাতে কিছু আসে যায় না। তাই জগদীশবাবুর সঙ্গে আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের মতভেদ সামান্য কিন্তু তত্ত্বগত এবং মৌলিক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বা line of approach নিয়েও বিতর্ক চলতে পারে। তর্কশাস্ত্রে দু ধরনের বিচার গ্রাহ্য—Inductive ও Deductive—আরোহ সিদ্ধান্ত ও অবরোহ সিদ্ধান্ত প্রণালী।

বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ঘটনা থেকে অখণ্ড মীমাংসায় উপস্থিত হতে হলে কতকগুলি নিয়ম বাঁচিয়ে চলতে হবে। জগদীশবাবুর একটি মন্তব্য নিয়ে নলিনীবাবুর সঙ্গে বিরোধ ঘটেছে—

"প্রথম দর্শনে তিনি স্বামীজীকে দয়িতরূপে কল্পনা করেছিলেন।" (শনিবারের চিঠি ৪র্থ সংখ্যা মাঘ ১৩৬৯ পৃ. ২৮৭) এর পরের কথাটি হচ্ছে—"ভারতে আসার প্রথম দিকে সম্পর্কটি ছিল অন্তহীন বিরোধের ও সংঘাতের।" এর সত্যাসত্য বিচার প্রায় অসম্ভব এবং আজকের দিনে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক এবং এহ বাহ্য। নিবেদিতার নিজের কথাতেই বলি—It is strange to remember and yet it was surely my good fortune, that though I heard the teachings of my Master, the Swami Vivekananda, on both the occasions of his visits to England in 1895 and 1896, I yet knew little or nothing of him in private life, until I came to India, in the early days of 1898." (The Master as I saw Him, p. 3, Second Edu. 1918) স্বামীজী তাঁকে ২ বছর সময় দিয়েছিলেন ভেবে দেখবার, মন স্থির করবার, "দারিদ্র্য অধঃপতন, আবর্জনা, ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত নরনারী"র মধ্যে কাজ করতে পারবেন কি না চিন্তা করবার। তাঁর আদর্শ যে "অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রচার (potentially divine),...শুধু জাগো, জাগো" এও জানিয়েছেন। এই সময়ে যে সব পত্রালাপ হয়েছিল তা থেকে দেখা যায় যে স্বামীজীর দিক থেকে তিনি তাঁর শিষ্যার কাছ থেকে কি চান সে সম্বন্ধে কোন-রকম মোহময় ভ্রান্তিবিলাসের বা রম্যকল্পনার স্থান ছিল না। তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, ভাবালুতাহীন। জগদীশবাবু এই প্রসঙ্গে (শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০,

পৃ. ১৫৩) নিবেদিতার একটি উক্তির বাগভঙ্গি আমাদের লক্ষ্য করতে বলেছেন—"In my own case the position ultimately taken proved that most happy one of a spritual daughter." তিনি "ultimately" কথাটির উপর সঙ্গতভাবেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু এই ultimately-র কাল নিরূপণ ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮ ধার্য করলে কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না, বরং নিবেদিতার নিজের কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। নিবেদিতা স্বামীজীকে গুরুপিতা, গুরু ভগবান মেনে নিয়েই ভারতে পদার্পণ করেন—"The time came, before the Swami left England when I addressed him as "Master." I had recognised the heroic fibre of the man and desired to make himself the servant of his love for his own people. But it was to his 'character' to which I had thus done obesiance... I became his disciple (p. 11, Ibid)

তিনি কার কাছে মাথা নোয়ালেন—সেই বিরাট চরিত্রের কাছে, কাকে ভালবাসলেন, সেই সেবাব্রতকে—প্রেমের দাস হলেন—কার, না রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ভাষায়, মানুষের মধ্যে যে শিব আছে তাঁর—এই আত্মসমর্পণ বিবেকানন্দকে উপলক্ষ্য করে দীনদরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে হীনবর্ণ উপেক্ষিত পল্লীর শিবকে। বিবেকানন্দই নিবেদিতাকে শিখিয়েছিলেন যে তাঁর শিব বিবেকানন্দরূপী মানুষ নন, ভাবৈকরসপূর্ণ ব্যক্তিসত্তাশূন্য একটি সমগ্রতার আদর্শ।

তদেতৎ প্রেয়ো পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্বস্মাৎ অন্তরতরযদয়মাত্মা

এই আদর্শ নিয়েই ভারতবর্ষে তিনি পদার্পণ করেন। কি কারণে তিনি স্বামীজীর শিষ্যা হলেন তার কারণও তিনি নিজে বলেছেন—

(১) তাঁর ধর্মসংস্কৃতির বিরাট বিস্তৃতি (breadth of his religious culture)।

(২) তাঁর যুক্তি-বিচারের নূতনত্ব ও নবচেতনার ধারা (the great intellectual newness and interest of the thought he had brought us)।

(৩) যা কিছু বলিষ্ঠ, যা কিছু সুন্দর, তারই নামে তাঁর আহ্বান যেখানে মানুষের নীচ বা নিম্ন প্রবৃত্তির কোন স্থান নেই (His call was sounded in the name of that which was strongest and finest and was not in any way dependent on the meaner elements in man. p. 16, Ibid.)।

এই প্রসঙ্গে নলিনীবাবুর প্রবন্ধে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ১৯০২ সনে বোম্বাইয়ে হিন্দু লেডিজ সোস্যাল ক্লাবে নিবেদিতার নিজস্ব মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য।

"For Seven years I was in this wavering state of mind very unhappy and yet very eager to seek the truth and now came the turning point of my faith ..The Swami I met was no other than Swami Vivekananda who afterwards became my Guru and whose teachings have given me the relief that my doubting spirit had been longing for so long. (Pravrajika Atmaprana Sister Nivedita p. 37

এই প্রসঙ্গে আর দুইটি ঘটনা মনে রাখা কর্তব্য। একটি : তিনি ১৮৯৮ সনে ভারতে আসার কিছুদিন পরে তাঁকে দীক্ষা দেন স্বামীজি আর দ্বিতীয়টি নিবেদিতার নিজের কথায় "the Swami invited his daughter to go to the cave of Amarnath with him and be dedicated to Siva." (Notes on some wanderings, p. 104. ২৫শে জুলাই ১৮৯৮ সনে ঘটনা।)

আমার মতে এ প্রসঙ্গে আর বেশী আলোচনা হওয়াই সঙ্গত। সেইজন্য আমার ব্যক্তিগত মতামতে এইখানেই বিরতি করলাম।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা সম্পর্কে জগদীশবাবুর বক্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার মনে করি—

(১) মহর্ষির আত্মকৃত্যে প্রার্থনাত্মিক ভাষণটি প্রকাশিত ১৩১১ সালে, জগদীশবাবুর এই উক্তি গ্রাহ্য। তাঁকে ধন্যবাদ।

(২) রবীন্দ্রনাথের হিমালয় গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা

চারিটি পঙ্‌ক্তি 'অভেদাঙ্গ হরগৌরী…' আমি উদ্ধৃত করেছি সেটি রবীন্দ্রনাথের 'মরন-মিলন' কবিতার কয়েক বছর পরে লেখা এই কথা জানিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টির কি অসদ্ভাব হল ঠিক বুঝতে পারি নি। আমি "এই যুগে" কথাটিই ব্যবহার করেছি। রবীন্দ্রকাব্যের এক একটি পর্বে এক একটি বিশেষ mental climate আছে—'ঋতুপরিবর্তন'ই পরিচয়ের পরিমণ্ডলটিকে বিশিষ্ট করে তোলে, অখণ্ড ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র দশম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেখা যায় যে, 'উৎসর্গ' ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'উৎসর্গে' প্রকাশিত সকল কবিতাই মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) হইতে গৃহীত। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী গ্রন্থানুক্রমে মুদ্রিত না হয়ে ভাবানুষঙ্গ ক্রমে বিভিন্ন বিভাগে সজ্জিত হয়েছিল। 'মরণ-মিলন' (সঞ্চয়িতা, ৪৭০) বা মরণ (চয়নিকা পৃ. ৩৭৪) যা বিশ্বভারতী 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দশম খণ্ড, পৃ. ৭১-এ উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি 'উৎসর্গ' কাব্যে হিমালয় মটকের কবিতাগুলির সঙ্গে একই সঙ্গে কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত—যেমন ৪৫নং কবিতা ২৮নং কবিতা।

এর আগে রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীন ভারতীয় রীতির অনুসারে শিব বা যুক্ত শিব-উমা প্রতীকের উল্লেখ আছে একথা আমি বলেছি, এই জন্য যে 'মরণ-মিলন' কবিতার শিব-উমা প্রতীক রবীন্দ্র-চেতনায় কিছু নতুন নয়। জগদীশবাবু ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত। তাঁর বর্তমান বক্তব্য হচ্ছে যে এই প্রতীকটিকে সূক্ষ্মস্তরে বিভাগ করে কবি এই রূপকল্পটি—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিবের সঙ্গে উমার মিলন—প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই যুক্তি অসম্ভব নয়, কিন্তু তিনটি মূল সূত্র আছে, (১) এই প্রতীক যে বিবেকানন্দ-নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে এসেছে এই প্রতীক থেকে তার কোন Internal evidence নেই, (২) আমাদের কল্পনায় শিবই মৃত্যু সেইজন্য এখানে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মিলন হল বলার বিশেষ সার্থকতা নেই, (৩) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতত্ত্বের মূল মৃত্যুকে অস্বীকার—মৃত্যু হচ্ছে জীবনের আর এক পিঠ, দোসর, সেইজন্য তাঁর কাছে মৃত্যু শোক নয়, মৃত্যু অনেক সময়ে মানস উল্লাস নিয়েই এসেছে।

'গীতাঞ্জলি'র শেষ কবিতা কটি মৃত্যুর উপর লেখা—আঁদ্রে জিদ্ বলছেন যে বিশ্বের কোনও সাহিত্যে এর চেয়ে গভীরতর সুন্দরতর দ্যোতনা তিনি পান নি। প্যারিস থেকে এণ্ড্রুজকে তিনি চিঠি লিখছেন (Letters to a friend, সেপ্টেম্বর ২০, ১৯২০, পৃ: ৯৫), "The teacher is Shiva. He has the divine power of destroying the destructiveness, of sucking out the poison....In the heart of death life has its ceaseless play of joy."

আঠারো বছর বয়সের 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে'র

> জাগো জাগো জাগো মহাদেব
>
> … … …
>
> গাও দেব মরণ সংগীত
>
> … … …
>
> মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
>
> জগতের মহাচিতানল

থেকে শেষ বয়সের "কবির দীক্ষা" পর্যন্ত নানা রূপে নানা ভাবে 'শিব'কে কবি কাব্যে ব্যবহার করেছেন। 'মেঘদূত' কবিতায় গৌরীর ভ্রুকুটি ভঙ্গীর সঙ্গে ধূর্জটির চন্দ্রকরোজ্জ্বল জটা তো নিখুঁত কালিদাসীয় রীতি। 'চিত্রা'য় "প্রেমের অভিষেক", 'চৈতালি'তে "কুমারসম্ভবের গান", 'মানস কৈলাস শৃঙ্গে নির্জন ভুবনের কথা', কল্পনায় 'স্বপ্ন' সবই এই প্রতীকটির পরিচয়। জগদীশবাবু নিশ্চয়ই বলতে পারেন যে তিনি প্রতীকটিকে সীমাবদ্ধ করে দেখেছেন এবং এই রূপকল্পটি সম্পূর্ণ অভিনব। তিনি লিখেছেন যে এই রূপকল্পটি কালিদাসের কাব্যে বা প্রাচীন ভারতের রূপরেখায় কোথাও আছে বলে তাঁর জানা নেই। এটি তো মৃত্যুতত্ত্বের মধ্যেই বিশ্লিষ্ট।—

> সনাতনমেতমাহুরে উতাদ্যস্যাৎ পুনর্ণবঃ

ইনিই সনাতন ইনিই পুনর্ণব। মদন ভস্ম হল, রতিবিলাপ সংগীতে বিশ্বভুবন ভরে উঠল, ভস্মাবশেষের মধ্য দিয়েই অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি অপমান শয্যা ছেড়ে রুদ্রবহ্নি হতে অনলচিত্তয় নিলেন এ কল্পনা আমরা 'মহুয়া'য় পাই। পুষ্পধনুকে উজ্জীবন করিয়েছেন তিনি, মৃত্যু হতে তুলে মিলনকে প্রবর করিয়েছেন, প্রতীক অস্পষ্ট নয়, ভারতীয় নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জগদীশবাবু তার উত্তরে, আমি কবির আত্মপরিচয়ের

যে উল্লেখ করেছিলাম সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। অথচ এই 'মরণ-মিলন' কবিতার সম্পর্কে কবির নিজের এই উক্তি সবচেয়ে প্রামাণিক।

কবির জীবনে একটি নতুন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল তার স্মৃতি তিনি রেখে গেছেন "বর্ষশেষ" কবিতাতে—

হে দুর্দম হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন
সহজ প্রবল

... ...

এই সময়ে 'বঙ্গদর্শনে' "পাগল" বলে একটি সদ্য প্রবন্ধও কবির জীবনে এই ঋতুপরিবর্তনের সূচনা দেখি। কবি লিখছেন—

'আমাদের এই খ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।'

'মরণ-মিলন' কবিতার সম্পর্কে কবির নিজের উক্তি, "তারপরে আমার রচনায় বার বার এই ভাবটী প্রকাশ পেয়েছে—জীবনে এই দুঃখ বিপদ-বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব—এবং এই কবিতাটিরই তিনি উল্লেখ করলেন।—

কহ মিলনের এ কি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহ ভার কিছু নেই
নেই কোন মঙ্গলাচরণ?

তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে পিছে কেউ ববে না?

... ...

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ

কবির ধর্ম এই আগমনীর গান গাইছে যেখানে মৃত্যুর [illegible] হবে, বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করে বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করা যাবে। এর মধ্যে বিবেকানন্দ নিবেদিতার প্রতীক আসে কি না জানি না। কোন বিশেষ [illegible] নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লিখতে খুব কমই দেখা গেছে। জগদীশবাবুর বক্তব্যের একমাত্র যুক্তি হতে পারে [illegible] কবিতাটি যে সময়ে লেখা সে সময়ে সদ্য স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ হয়েছে, নিবেদিতার সঙ্গে কবির বন্ধুত্ব ছিল এবং কবিচিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। এ যুক্তি মেনে নিলেও সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথ এ কবিতা যে বিবেকানন্দ-প্রয়াণকে স্মরণ করে লিখেছিলেন এ কথা হয়তো জগদীশবাবুও বলবেন না—অবচেতনে এই স্মৃতি ছিল কি না এ কথা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেন না, নিবেদিতার সঙ্গে কবির আলাপ বিবেকানন্দের মৃত্যুর পূর্বে মোটে কয়েক মাসের কথা, সে সময়ে কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল জগদীশবাবুর আট দফা প্রমাণের পরেও সংশয়াচ্ছন্ন বিশেষ করে কবির নিজের এই কবিতার আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে একটা অবিশেষ মৃত্যুতত্ত্ব নিয়েই তিনি তখন মেতেছিলেন—হয়তো মনের অচেতন গভীরে এ মৃত্যু কিছুটা ক্রিয়াশীল ছিল—এ ছাড়া আর কোন সম্ভাব্য যুক্তি মনে আসে না।

*
* *

াতযুগের এক বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ক্ষেত্র গুপ্ত

এক

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৯—১৯২৪) বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম গে অনেকগুলি উপন্যাস লিখে তিনি বেশ জনপ্রিয়তা ভ করেছিলেন। তাঁর কোন উপন্যাসই উনবিংশ াব্দীতে প্রকাশিত হয় নি। ১৯০৫-৬ থেকে ১৯২০ সনের ধ্য তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস প্রকাশিত। কিন্তু তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের বাঙালী ঔপন্যাসিকদের াত্রভুক্ত। ফলে তাঁর রচনায়ও বিংশ শতকের হাওয়া গে নি।

শচীশচন্দ্রের উপন্যাস লেখার প্রেরণা এসেছে প্রধানতঃ ঙ্কমচন্দ্রের আদর্শে। একটি উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি শিষ্ট বাঙালী লেখকদের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্বন্ধের ল্লেখ করে শ্লাঘা প্রকাশ করেছেন: "...যাঁহারা বঙ্গ-হিত্যগুরু, তাঁহারা অনেকেই আমার নিকট আত্মীয়। ম্যপাদ স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র আমার পিতৃব্য এবং র্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় আমার শ্বশুর। বুঝিবা ই দর্পে গ্রন্থ লিখিবার এত সাধ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তাঁর উপন্যাসগুলিতে খুবই স্পষ্ট। ঙ্কিমের কাল থেকেই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের দুই ারা—ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাস। চীশচন্দ্রও বঙ্কিমোত্তর আর পাঁচজন ঔপন্যাসিকের মত ই জাতের উপন্যাসই লিখেছেন। কিন্তু দুটি দিক থেকে ঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সালোক্য ঘটেছিল। প্রথমতঃ, তিহাসাশ্রিত রোমান্সে নায়ক চরিত্রে তিনি কখনও খনও সৌন্দর্যমোহের তীব্র জ্বালা এবং ব্যক্তি-জিজ্ঞাসার াজেডি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সামাজিক উপন্যাসেও রুষের হৃদয়ে পরনারীর প্রতি আকর্ষণ এবং তার যন্ত্রণার দি মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে। বঙ্কিমের 'রজনী'-'বিষবৃক্ষ'-কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে এদের গুণগত ন্যূনতা অনেকটা, ন্তু সাদৃশ্যের দিকটিও দৃষ্টি এড়ায় না। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিম-পরবর্তী অনেক ঔপন্যাসিক সামাজিক উপন্যাসে সমাজচিত্রের দিকেই প্রবণতা দেখিয়েছেন। শচীশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে ঘটনাগত নাটকীয় চমকের অতিরেক লক্ষ্য করা যায়। জীবনের প্রাত্যহিক নিরুত্তাপ ঘটনাধারার নয়, তারা কাল্পনিক রোমান্সরাজ্যের কাছাকাছি। সামাজিক উপন্যাসের ঘটনাবাহুল্যে শ্বশুর দামোদর মুখোপাধ্যায়ের প্রবণতা তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে। দামোদরের চেয়ে শচীশচন্দ্র অনেক শক্তিশালী লেখক, অবশ্য কম পরিচিত। রমেশচন্দ্র-তারকনাথ প্রমুখের সামাজিক উপন্যাসের পারিবারিক চিত্রধর্মিতার স্থানে শচীশচন্দ্র চমকপ্রদ ঘটনাবহুল ও উত্তেজক পরিস্থিতিপূর্ণ যে রীতিটির অনুসরণ করলেন তা বঙ্কিমের নিজস্ব পন্থার স্থূল অনুসরণ, এবং দামোদর প্রভৃতির উপন্যাসেও বহু ব্যবহৃত। তা ছাড়া শচীশচন্দ্রের নীতিবোধও দামোদর মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত। পাপ ও পুণ্যের সংঘর্ষ প্রায়ই এঁরা সরল-রেখায় এঁকেছেন। পুণ্যের প্রতিষ্ঠা এবং পাপীর দুঃখময় পরিণতি-প্রদর্শনে এঁদের সমান উৎসাহ। নিজের কঠিন দুরবস্থায় অথবা পুণ্যাত্মার সংস্পর্শে অসৎ ব্যক্তির দ্রুত ও আকস্মিক মানস-পরিবর্তন ঘটাতে এঁদের দ্বিধা নেই। অবশ্য শচীশচন্দ্র মাঝে মাঝে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। দামোদর অগভীর স্থূলতায় নিশ্চিন্ত।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাসের সামান্য প্রভাব শচীশচন্দ্রের উপরে পড়েছে বলে মনে হয়। তাঁর 'বীরপূজা', 'রাজা গণেশ' প্রভৃতি উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রে এমন এক ধরনের আদর্শবাদী নিষ্ক্রিয়তার আভাস লক্ষ্য করা যায় যা 'রাজর্ষি'র (১৮৮৭ সনে প্রকাশিত) নায়কের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মোটামুটি বলা যায়, শচীশচন্দ্র বঙ্কিমী-ধারার শেষ প্রতিনিধিদের অন্যতম। বিংশ শতকে উপন্যাসের যে নব্যধারার প্রচলন ঘটেছে তাতে তিনি ভূমিকাহীন।

দুই

শচীশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এক: ঐতিহাসিক রোমান্স—বীরপূজা, বাঙালীর বল, রাজা গণেশ, রাণী ব্রজসুন্দরী প্রভৃতি। দুই: সামাজিক উপন্যাস—প্রণবকুমার, অমরনাথ, বঙ্গসংসার, বেলমতিয়া প্রভৃতি। তিন: ভক্তিরসাত্মক জীবনী-উপন্যাস—মহাত্মা তুলসীদাস এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী। শেষোক্ত ধারাকে একটি নতুন পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ ছাড়া বঙ্কিমের 'রাজমোহনের স্ত্রী' এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি তিনি 'বারিবাহিনী' নাম দিয়ে সম্পূর্ণ করেন। 'পূজার মালা' নামে তাঁর একটি গল্প ও নকশার সঙ্কলন আছে। 'শঙ্করনাথ', 'অন্তরীপের বধূ' প্রভৃতি আরও কতকগুলি গল্প তাঁর আছে যেগুলি গ্রন্থবদ্ধ হয় নি।

তিন

শচীশচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলা ভাষা ব্যবহারের অভিনবত্ব নেই, কিন্তু ভাবাবেগসঞ্চারে ব্যর্থতার পরিচয়ও তিনি দেন নি। বর্ণনা এবং বিবৃতির ভাষা বঙ্কিমীরীতির সাধু, তবে তুলনায় অনেক সরল। প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে সংলাপের ভাষাও সাধু। কচিৎ ক্রিয়াপদে চলিতের নিষিদ্ধপ্রবেশ ঘটেছে। এ চ্যুতি বঙ্কিমেও আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ সামাজিক উপন্যাসে এবং শেষদিকের দু-একখানি ঐতিহাসিক রোমান্সেও তিনি সংলাপে পুরোপুরি চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। চলিত ভাষা রীতিতে কোথাও সাবলীলতার অভাব ঘটে নি। কখনও কৌতুক রসের স্পর্শ তাঁর সংলাপের ভাষাকে উপভোগ্য করেছে, কোথাও বাক্‌বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমানুভূতির আবেগকম্পনও তাঁর চলিত ভাষার সংলাপ সাফল্যের সঙ্গে ধরে রেখেছে।

শচীশচন্দ্রের ভাষায় অলঙ্করণ বেশী নেই। বঙ্কিমের অনুকরণে উপন্যাসের ভাষা গড়ে নিলেও আপন ক্ষমতার সীমাজ্ঞান তাঁর ছিল। বর্ণনায়, পরিবেশ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সাধু-রীতির সংস্কৃতানুগ অলঙ্কৃত গদ্যকে যে ভাবে ব্যবহার করেছেন শচীশচন্দ্র তার নৈকট্যও কল্পনা করতে পারতেন না। তিনি বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন নি, ঘটনার বিবরণকেই মুখ্য করে তুলেছেন। মুসলমানী জীবনের বিলাসবাহুল্য, রাজস্থানের পার্বত্যভূমির বিশিষ্ট রূপ, উড়িষ্যার দেবালয় ও সমুদ্র তাঁর উপন্যাসে বিষয় হিসেবে এসেছে, তাদের কোন তীব্র আবেগ আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারে নি।

চরিত্রচিত্রণে ভাষা কোথাও কোথাও চিত্তবিশ্লেষণের পথ ধরেছে। আত্মসমীক্ষাকে প্রাধান্য না দিলেও বিশ্লেষণের পথ তিনি পরিহার করেন নি। তবে অন্তরের সূক্ষ্ম উপলব্ধি প্রায়ই বি[illegible]মুখী ঘটনাবিন্দুতে প্রকাশ পেয়েছে, দীর্ঘকাল ধরে নানা ক্ষুদ্র ঘটনার এবং তার ব্যাখ্যানে ধরা পড়ে নি।

চার

শচীশচন্দ্র ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স নিয়ে তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন আরম্ভ করেন। বাংলা ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের স্বর্ণযুগ কিন্তু উনিশের শতকে শেষ হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ইতিহাস-কেন্দ্রিক নাটকের প্লাবন চলেছে। জাতীয়তার আন্দোলনের সঙ্গে এই শ্রেণীর নাটকের ভাবপ্রেরণার যোগ ছিল। শচীশচন্দ্র সমকালীন মঞ্চনাট্যের প্রভাবও হয়তো অনুভব করে থাকবেন, কিন্তু বঙ্কিম-ঐতিহ্যই তাঁর উপরে বেশী কার্যকর হয়েছিল।

শচীশচন্দ্র রাজস্থানের কাহিনী নিয়ে বীরপূজা লিখেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর দৃষ্টি বাংলাদেশের মধ্যযুগ ইতিহাসের উপরে পড়ল। মুসলমান আমলের [illegible] বীরত্বকে কেন্দ্র করে তিনি কয়েকটি উপন্যাস লিখলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' এদের প্রত্যক্ষ আদর্শ [illegible] থাকবে।

তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের তুলনায় কিংবদন্তী কাহিনী এবং কাল্পনিক প্রণয়বৃত্তান্ত, ধর্মীয় আদর্শ এবং পরোক্ষ স্বাধীনতাপ্রীতি প্রাধান্য পেয়েছে। কালের বিশিষ্ট সুর, যুগপরিবর্তনের মহাকোলাহল, জাতীয়-জীবনের তরঙ্গভঙ্গ—এক কথায় ইতিহাসরস শক্তি যেমন তাঁর ছিল না, তেমনি সে চেষ্টাও করেন নি। অতিনাটকীয় চমকপ্রদ ঘটনা এবং [illegible] লৌকিক আধ্যাত্মিকতা তাঁর এই শ্রেণীর উপন্যাসে প্রধান উপকরণরূপে ব্যবহৃত।

'বীরপূজা' উপন্যাসে নিষধ রাজকুমার ভবানী[illegible]

: আজমীঢ় রাজকন্যা ঊর্মিবালার প্রণয়কাহিনী বিবৃত। নীপ্রসাদের বীরত্ব, অনন্তরামের শয়তানি, ভবানী-ন্দের তরল ও উচ্ছ্বসিত ভ্রাতৃপ্রীতি, জনার্দনের চুক্তি, প্রমদার আত্মদান, প্রণয়-ব্যর্থ জয়ন্তকুমারের র দুঃখবহন কখনও কিঞ্চিৎ সাফল্যের সঙ্গে, কখনও কারণ বাগাড়ম্বরে প্রকাশ পেয়েছে। রচনাটি অপরিণত, ত্রগুলিতে প্রাথমিক কতকগুলি বৃত্তিমাত্র প্রদর্শিত, ও সর্বত্র স্বাভাবিক ভাবে নয়।

'রাজা গণেশ'ও দুর্বল রচনা। তবে এর বিষয়বস্তু চীশচন্দ্রের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হয়ে থাকবে। মলমান শাসকদের পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করে রাজা গেশ বা কংসনারায়ণের হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক টনা। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে ঐতিহাসিকতা সামান্য, াল্পনিক প্রেমোপাখ্যান এবং যুদ্ধ বর্ণনাই প্রধান। ণেশের চরিত্রে বীরত্ব, ধর্মপ্রীতি, ন্যায়পরতা গাম্ভীর্যের যোগে কিছু মাহাত্ম্য এনেছে। রাণী করুণাময়ীতে র্য, রণকৌশল ও আভিজাত্যের মিশ্রণ ঘটেছে। রাজার শান্ত গাম্ভীর্য এবং রাণীর সংযত কিন্তু কর্মকামী অধৈর্যের ধ্যে কিছুটা বৈপরীত্যও দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোথাও বিন-জিজ্ঞাসার গভীরতা বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের তীব্রতা মূর্ত হয় নি। এদের চরিত্রের কোনও মৌলবৃত্তির ান্দোলন উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে নি। সুলতান-ন্যার প্রতি যদুনারায়ণের প্রেমে রূপমোহের নির্বিবেক ীব্রতা প্রকাশের সুযোগ ছিল, কিন্তু তার ধর্মত্যাগের াত্রায় আকস্মিক বলে মনে হয়েছে। মহুয়ার ছদ্মবেশে াকিনী অনেক সাহস, চাতুর্য এবং কর্মতৎপরতা দিয়েছে। প্রতিহিংসার অতি তীব্র ও জ্বালাময় একটি ঙ্কুই এদের উৎস। কিন্তু সবটাই নিবার্য ও অতি-াটকীয় বলে মনে হয়েছে।

'বাঙালীর বল' 'বীরপূজা'র এক বছর পরে লেখা। ন্তু অনেক পরিণত। বীরভূমির হিন্দু রাজা বীরসিংহ বং পাঠান সুলতান গায়সউদ্দীনের সংগ্রাম, পরিশেষে াধীন হিন্দু রাজ্যটির পতন উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়। ূমিকায় লেখক বলেছেন, "ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে ন্থখানি লিখিত। গায়সউদ্দীন, বীরসিংহ, ফতেসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সাদক খাঁ, ধ্রুব গোস্বামী কাল্পনিক চরিত্র। ঘটনাক্ষেত্র আজও বর্তমান। গড়খাই, রাণীদহ, কালীমূর্তি আজও দৃষ্ট হয়।" কিন্তু উপন্যাসটিতে বর্ণিত বিষয়ের অধিকাংশ কাল্পনিক।

মায়ার চরিত্রে বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা এবং মনোরমার প্রভাব আছে। সে নিজে অপাপবিদ্ধা, অজ্ঞাতপরিচয়—যেন প্রকৃতিজ। প্রকৃতির মূল স্বভাব তাতে বর্তেছে। পার্থিব কামনা-বাসনা তাকে স্পর্শ করে নি। নিরাসক্তি এবং বালিকা-সুলভ সরলতা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, অথচ পুরুষমাত্রকে সে আকর্ষণ করেছে; কঠিন হৃদয় নৃপতিকেও কর্তব্যভ্রষ্ট—অন্ততঃ বিচারবিমূঢ় করেছে। তার প্রতি যে আকৃষ্ট তারই সর্বনাশ ঘটেছে, অথচ সেই সর্বনাশা ঘটনাবর্তে তার সক্রিয়তা নেই, দায়িত্বও নেই। সে যেন মূর্তিমতী নিয়তি। অবশ্য যে-জাতীয় রহস্যময়তা তাঁর চরিত্রে আনতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক তাতে সাফল্য-লাভের মত বড় প্রতিভা শচীশচন্দ্রের ছিল না।

বীরসিংহের নীরব ও অন্তর্দাহী প্রেমের চকিত আভাস যথেষ্ট সংযম ও সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতিমাত্রায় আদর্শায়িত হওয়ায় তা স্বাভাবিকতাভ্রষ্ট হয়েছে, যন্ত্রণার তীব্রতা, তথা মানবহৃদয়-রহস্যের গহনতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফতেসিংহের বীরত্ব, রণকৌশল এবং বিলাসী ইন্দ্রিয়াসক্তির সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছেন লেখক। মায়ার প্রতি বিমূঢ় আকর্ষণের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে বেলাবিবির প্রতি তার ভালবাসার যে চিত্র আঁকা হয়েছে তার রমণীয়তা যেমন উপভোগ্য, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বাসযোগ্যতাও স্বীকার্য।

বেলাবিবি রোমান্সের নায়িকাদের ন্যায় বহু অবিশ্বাস্য কর্ম সহজে নিষ্পন্ন করে; ছদ্মবেশ-গ্রহণে তার পটুত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে; দিল্লী-মুঙ্গের-বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতে সে ক্লান্তিহীন, বুদ্ধিতে শাণিত, সাহসে অনমনীয়, রণকৌশলে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। তার রূপে বিদ্যুতের চমক, হাসিতে সে বিশ্বমোহিনী। কিন্তু এই সবের উৎসে তার গভীর ও তীব্র ভালবাসা, ঘটনাচক্রের কোনও বাধা, ভাগ্যের কোনও বঞ্চনা যা মানে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় নারীর এই রূপ সার্থকভাবে উপন্যাসবদ্ধ হয়েছিল। শচীশচন্দ্র একেবারে ব্যর্থ অনুকারক নন। রাণী নর্মদায় ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের মিলন ঘটেছে। তার চরিত্রে

অসাধারণ কোনও উপকরণ না থাকলেও প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তশায়ী পূর্ণযৌবনার রাজ্ঞীসুলভ মহিমা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

'বাঙালীর বলে' রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি'র কিছু প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে ; যদিও এদের বাচনভঙ্গি এবং কল্পনাভঙ্গির মধ্যে অনেক দূরত্ব। প্রথমতঃ, বীরসিংহ এবং ফতেসিংহের ভ্রাতৃসম্পর্ক, জ্যেষ্ঠের প্রতি বিরক্ত হয়ে ফতেসিংহের মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ, বীরসিংহ কর্তৃক ফতেসিংহকে রাজ্য অর্পণের বাসনা গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, নর্মদার দেবীমূর্তি বিসর্জনের প্রসঙ্গটি সোজাসুজি 'রাজর্ষি'র প্রভাবজাত।

'রাণী ব্রজসুন্দরী'র কাহিনী কালাপাহাড়ের কিংবদন্তী মিশ্র ইতিহাস থেকে সঙ্কলিত। কল্পনা সহযোগে তা পূর্ণাঙ্গ রোমান্সের রূপ নিয়েছে। অপরাপর উপন্যাসের মত এখানেও ঘটনার আড়ম্বর, নাটকীয়তার অতিরেক ও বিপুল তরঙ্গভঙ্গ লক্ষণীয়। শচীশচন্দ্র তাঁর প্রিয় উপকরণগুলির সমাবেশ ঘটিয়েছেন এই রোমান্সে। তবে চরিত্রজিজ্ঞাসায় মানবজীবনের গভীরতায় প্রবেশের যে চেষ্টা এখানে হয়েছে তা অন্যত্র বড় সুলভ নয়।

কালাচাঁদ বা কালাপাহাড়ের অন্যতমা পত্নী ভুবনবালার পতিপ্রেম, ছদ্মবেশে সাহচর্য, ধর্মত্যাগ ও আত্মত্যাগ যতটা আদর্শান্বিত ততটা চরিত্রের ব্যক্তি-স্বভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রথম যৌবনে গোপন প্রণয়ে সে পেয়েছে অবহেলা। বিবাহবাসরের অপ্রত্যাশিত আঘাত এবং দীর্ঘ বঞ্চনা তার মনের কোণে যে বেদনাকেন্দ্র সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে এ রমণীর উত্তর-জীবনের কোনও মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ ঘটানো যায় নি। গদাধরের চরিত্রটি মামুলী এবং আদর্শবাদী কিন্তু প্রাণহীন নয়। সুলতান-নন্দিনার প্রেমবিকাশ সুচিত্রিত।

কিন্তু সবচেয়ে সু-অঙ্কিত রাণী ব্রজসুন্দরী এবং কালাপাহাড়ের চরিত্র। চরিত্র দুটিই জটিল ; কালাপাহাড় জটিলতর এবং গভীরতর। ব্রজবালার চরিত্রে পতিব্রতা নারীর পুস্তকবর্ণিত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানো হয় নি, বরঞ্চ সে আদর্শের দিক থেকে তার চরিত্র খুবই নিন্দার্হ। রূপগর্ব এবং ব্যক্তিত্ব তার চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু। গদাধরের প্রতি প্রথম কৈশোরে তার প্রেমের উন্মেষ ঘটেছিল। কালাপাহাড়ের সঙ্গে বিবাহে তা চরিতার্থ হতে পারে নি। বিবাহ না হলেও প্রেম কোমল মাধুর্য নিয়ে ব্রজবালার জীবনে কিছুতেই দেখা দিত না। তার চরিত্রের মূল ধাতুই পৃথক। উচ্চাশা, শাণিতবুদ্ধি, গর্ব, আভিজাত্য যুক্ত হয়ে তাকে একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। মুকুন্দদেবের সঙ্গে তার অভিনব সম্পর্ক সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। প্রেম ও সংযমের এরূপ যৌগপদ্য দুর্লক্ষ্যপ্রায়। অথচ সমস্ত জিনিসটা শালীনতা ও রহস্যে মণ্ডিত হওয়ায় পাঠকের ভাবনাকে অনেকখানি মুক্তি দেয়। কালাচাঁদের চরিত্রেও সহজ ভালমানুষী ছিল না। তার মধ্যে বলিষ্ঠতা, গর্ব, দুর্দান্ত সাহস, ধৈর্যহীন হৃদয়োদ্বেলতা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তীব্র জয়াকাঙ্ক্ষা এবং রূপমোহ তার চরিত্রের প্রধান ধাতু। ব্রজবালার সঙ্গে প্রথম দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতা কালাচাঁদের অন্তরে যে শূন্যতার জন্ম দিয়েছিল পরবর্তী জীবনে তার সুদূরপ্রসারী ফল ফলেছিল। কালাচাঁদের কালাপাহাড়ে রূপান্তর চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। কিন্তু জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করার সময়ে বিদীর্যমান আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ডতা নিয়ে কালাপাহাড়ের অন্তরের ধর্মত্যাগের আর্তনাদ, প্রেম-জীবনের ব্যর্থতার হাহাকার একসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ প্রকাশভঙ্গীতে এমন একটা সংযত গাম্ভীর্য আছে যার ট্রাজিক মহিমা অনস্বীকার্য।

'রাণী ব্রজসুন্দরী' শচীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বাংলা ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সগুলির মধ্যে এ রচনা একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবি রাখে।

পাঁচ

সামাজিক উপন্যাসে শচীশচন্দ্র বঙ্কিমীরীতির অনুসরণ করতে চেয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র না এঁকে ঘটনার বহুলতা এবং উত্তেজিত তরঙ্গভঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন ; ফলে বাস্তবতার উপরে কল্পনার প্রাধান্য এসেছে। মামলা-মোকদ্দমা, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, নিরুদ্দেশ, ছদ্ম বা অজ্ঞাতপরিচয়, ডাকাতি-রাহাজানি প্রভৃতি কাহিনীতে জটিলতা ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করে কৌতূহল শেষ পর্যন্ত জাগ্রত রেখেছে। ফলে দৈনন্দি

...রজীবনের চিত্র তাঁর উপন্যাসে বড় স্থান পায় নি। ...পুণ্যের প্রসঙ্গ সোজাসুজি এসেছে, পুণ্যবান পুরস্কৃত ...পাপী লাঞ্ছিত হয়েছে। জীবনে প্রতিনিয়ত ন্যায়ের ...য় ও ...ভোগ চলেছে। ভাল লোকেদের সংস্পর্শে ...রাপ লোকেদের প্রায়ই চরিত্র পরিবর্তন ঘটেছে। ...র্শবাদ তাঁর বহু উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ ...রেছে। প্রণয়চিত্রগুলিতে অভিনবত্ব নেই, ঘটনাসন্ধি বা ...লাপ মামুলী, কিন্তু কোথাও তা কৃত্রিম নয়, কোথাও ...শোত্তাপের অভাব নেই। কখনও কখনও বিবাহিত ...ষের অপর রমণীর প্রতি আকর্ষণ এবং তজ্জাত ...দ্বন্দ্ব কিছু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ...ন্যাসগুলি প্রায়ই মিলনান্ত এবং তাও যতটা ঘটনাগত ...বং আকস্মিক ততটা চরিত্রগত অনিবার্য নয়।

'প্রণবকুমার' উপন্যাসে কোন বিশিষ্ট সমাজসমস্যা ...ই। প্রণবকুমারের চরিত্রে নানাবিধ সৎগুণ সমন্বিত। ...র খুল্লতাত ভ্রাতা সরিতের চরিত্রটি ঠিক বিপরীত। ...বনে এত সোজাসুজি গুণ আর দোষ স্বতন্ত্র আশ্রয়ে ...ল ভাবে থাকে না। প্রণব অনেকটা আদর্শবাদী। ...ন্তু দেবরাণীর প্রতি প্রেমে সে মর্তবাসী মানবের মূর্তি ...য়েছে। জেঠামহাশয়ের আদর্শবাদ বাস্তবতার সব ...ন ছিন্ন করায় অবিশ্বাস্য হয়ে পড়েছে। শেষ দিকে ...তের চরিত্র-পরিবর্তন আকস্মিক, কিন্তু অবস্থার ...রিবর্তনে, বিশেষ করে বিন্দুর প্রশান্ত প্রেমের স্পর্শে ...য়ের পরিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক। উচ্ছৃঙ্খল ও বেশ্যাসক্ত ...য়ের স্নিগ্ধ ভালবাসার জন্য আকুতি সুচিত্রিত। ...কৃত নির্বিকারত্ব ও কিঞ্চিৎ বিরক্তির আবরণে ...নো ভালবাসা এবং সরস কৌতুকে হরিশঙ্করের ...ই সবচেয়ে উপভোগ্য।

'অমরনাথ' উপন্যাসটি আদর্শবাদের দ্বারা অতি ক্লিষ্ট। ...ককে মহামানবরূপে চিত্রিত করার ব্যর্থ প্রয়াস ...ণীয়। অমর সম্পর্কে অপরে যে পরিমাণ প্রশংসা ...ছে তার নিজের কাজে তা প্রতিষ্ঠিত নয়। ...কটা ...বোধহীন ফাঁপানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রায় সব- ...চরিত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট করেছে। তবে কৃষ্ণনাথের ...বার্তায় মার্জিত ও বুদ্ধিবিচ্ছুরিত ঔজ্জ্বল্যে কৌতুক- ...র স্পর্শ আছে।

'বঙ্গসংসারে' বাঙালীর সংসার-জীবনের কোন স্বাভাবিক চিত্র বা সমস্যা স্থান পায় নি। তার বদলে উত্তেজিত ঘটনা-বিন্যাস, মামলা-মোকদ্দমা, জলে ডোবা, স্বামীহত্যা, আত্মহত্যা, লাম্পট্য প্রভৃতি প্রধান হয়ে উঠেছে। নির্মল ও বিজলীর প্রেম, বিজলীর ভ্রাতৃবধূ জ্যোৎস্না ও লম্পট হারাণের চেষ্টায় নির্মলের মনে সন্দেহসৃষ্টি এবং পরিশেষে সন্দেহের অবসানে মিলন— উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কাহিনী। ঘটনাবর্ত লেখকের সব দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে, চরিত্রের অন্তরলোকে প্রবেশের সুযোগ বড় ঘটে নি। জ্যোৎস্না চরিত্রটিতে আধুনিক শিক্ষিত নারীর প্রতি লেখকের বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষিত হয় নি।

তুলনায় 'বেলমতিয়া' অনেক ভাল লেখা। সামগ্রিক বিচারে অবশ্য এটিও উচ্চাঙ্গের উপন্যাস নয়। অন্যান্য সামাজিক উপন্যাসের ন্যায় এখানেও ঘটনার বাহুল্য। ঝড়ে অন্নদাবাবুর নৌকা-ডুবি হল এবং জমিদারমশাই পত্নীকন্যা হারালেন। কি করে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এদের পুনর্মিলন হল তাই-ই উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়। রমণীমোহন এবং নীরদার সরস প্রেমকাহিনী সুচিত্রিত। কিন্তু কোন চরিত্রেই মানস্তাত্ত্বিক জটিলতা বা গভীরতা নেই। শুধুমাত্র বেদগর্ভার প্রতি অধ্যাপক তারাপদর অবৈধ আকর্ষণে জীবনসমস্যার গভীরে অবতরণ করেছেন লেখক। সুন্দরী স্ত্রী শোভনার প্রতি গভীর ভালবাসা সত্ত্বেও বেদগর্ভার প্রতি প্রেমাকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যাত হয় নি, কিন্তু অনিবার্যতা বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। সংযতচিত্ত তারাপদর অন্তর্দ্বন্দ্ব দু-একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানেই অন্যান্য সামাজিক উপন্যাসের তুলনায় এর উৎকর্ষ।

বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজমোহনের স্ত্রী' আরম্ভ করেছিলেন। শচীশচন্দ্র 'বারিবাহিনী' নাম দিয়ে শেষ করলেন। এঁদের প্রতিভার তুলনা হয় না বলেই শচীশচন্দ্র কতটা সামঞ্জস্য আনতে পেরেছেন সে-বিচার অর্থহীন। তবে শচীশচন্দ্র উপন্যাসের শেষভাগে বহু খুনখারাপির আমদানি করে ঘটনাবাহুল্যকে বল্গাহীন উদ্দামতা দিয়েছেন। মাতঙ্গিনী মাধবের জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা। তার প্রতি মাধবের মনোভাব

সতর্কতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মহৎ জাতি সতর্ক যে সদাই থাকে,
রক্ষা করে সুরুচি ও শুচিতাকে।
দেয় না হতে জাতির জীবন কলুষিত,
রাজার মাথায় পা দিতেও হয় না ভীত।
বড় করেই দেখে জাতির মর্যাদাকে।

২

সমাজধর্ম ইহাই, ইহাই বিশিষ্টতা—
সকল শক্তি সমৃদ্ধিরও মূলের কথা,
রক্ষা করে ইহাই বৃহৎ ভয় হতে,—
বিনাশ এবং দুর্গতি ও ক্ষয় হতে
বিপর্যয়ে উচ্চ রাখে শির সদা।

৩

রাখতে শুচি সৃষ্টি এবং কৃষ্টিকে,
মুক্তা-গড়া চাই যে স্বাতির বৃষ্টি এ।
এ অশ্বমেধ যজ্ঞ করার যোগ্যতা—
হারাইলে মহাজাতির স্থান কোথা?
এড়ানো চাই কপিল মুনির দৃষ্টি [illegible]।

৪

রক্তে করে সঞ্চারিত নূতন করে সেই সুধা
প্রতি নরনারীর প্রাণে বাড়ায় অমৃতের ক্ষুধা
বরণীয় সংযমে ও সম্ভ্রমে—
ধন্য করে, পুণ্য বাড়ায়, পাপ কমে,
করে তাদের জয়ধ্বনি তপস্বিনী বসুধা।

৫

অগ্নিকেলি চলছে বাণীর জতুগৃহের দরবারে
আতসবাজির তীব্র আলোয় চক্ষে আবার
জল ঝরে

খর্ব মোরা করছি দেশের কুশলকে
বরণ করে আনছি কুলের মুষলকে,
শিবকে এবার ভস্ম মদন করবে রে!

—

প্রেমানুভূতিকে স্পর্শ করেছে অথচ সংযমকে কিছুমাত্র বিচলিত করে নি। এই শালীন এবং রহস্যজড়িত মনোভাবের চিত্র বর্তমান উপন্যাসে শচীশচন্দ্রের সফল সংযোজন।

ছয়

সনাতন গোস্বামী এবং তুলসীদাস প্রসঙ্গে শচীশচন্দ্র যে দুটি গ্রন্থ লিখেছেন তা উপন্যাসশ্রেণীর। লেখক ভক্তিবশতঃ এদের ঠিক উপন্যাস বলতে চান নি। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এবং কাল্পনিক ঘটনা যুক্ত হয়ে যে রূপ গ্রহণ করেছে তাকে উপন্যাসের ব্যাপক সংজ্ঞার মধ্যে অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়।

ভক্তিরস বাংলা উপন্যাসে প্রশ্রয় পায় নি। অথচ গিরিশ-প্রভাবিত উনবিংশ শতকের রঙ্গমঞ্চে তার বিশেষ প্রচলন ছিল। ভক্তজীবনী নিয়ে লেখা অনেকগুলি নাটক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। গিরিশচন্দ্র 'ঝালোয়ার দুহিতা' (১৮৯৯) নামে একটি উপন্যাসে মীরাবাঈ প্রসঙ্গে ভক্তিরস নিবেদনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শচীশচন্দ্রের আলোচ্য রচনা দুটিকে ভক্তিরসাত্মক জীবনী-উপন্যাস লেখার প্রয়াস বলা যেতে পারে। বাঙালীর মনে ভক্তিরসের আবেদন সম্ভাবনাময় হলেও এই ধারা বাংলা উপন্যাসে সফল হয় নি কোন শক্তিশালী লেখক ধারাটির সাহিত্যরূপ [illegible]ষ্ঠিত করতে এগিয়ে আসেন নি বলেই বোধ হয় এরূপ ঘটেছে।

শচীশচন্দ্রের আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে অলৌকিক ঘটনার প্রাধান্য এবং ভক্তিরসের অতিরেক চরিত্রের ব্যক্তিরহস্যে প্রায়ই প্রবেশ করতে চায় নি। আদর্শবাদের দ্বারা আদ্যন্ত আচ্ছন্ন হওয়ায় জীবনের বাস্তব রূপ এবং নরনারীর চরিত্র প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। একমাত্র সনাতন গোস্বামীর চরিত্রের ক্রমবিকাশ অনেকখানি মনস্তত্ত্বসম্মত।

শচীশচন্দ্রকে আমরা যতটা ভুলে গিয়েছি ততটা ভোলা উচিত হয় নি। তাঁর উপন্যাসগুলির সাহিত্যিক মূল্যবিচারে দেখা যায় অন্ততঃ কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করার দাবি তিনি রাখেন। বঙ্কিমযুগের মুখ্য ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রও যখন ব্যক্তিজিজ্ঞাসার গভীর স্তরে অবতরণে সঙ্কুচিত হয়েছেন তখন শচীশচন্দ্র সাহসের সঙ্গে মানবমনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে চেয়েছেন এবং কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ সফলও হয়েছেন, এটি কম কথা নয়।

—

আহ্নিক

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

কালে সত্যভূষণের ঘুম ভাঙে চায়ের ডাকে। যেদিন আগে ঘুম ভাঙে সেদিনও সে চোখ বুজে পড়ে থাকে লার আওয়াজ আর ডাকের অপেক্ষায়। জানতে চায় না কাউকে যে ঘুম ভেঙেছে।

এর পরে প্রাতরাশ পর্যন্ত দুই তিন প্রস্থ কাজের ওপর যেন গড়িয়ে যায় সত্যভূষণ। কিন্তু তার পরে আর গড়ায় না। স্ত্রী করুণা নিঃশব্দে বাজারের থলেটা এনে দিলে একটু মৃদু ধাক্কা বোধ করে। প্রায় সঙ্গে খবরের কাগজখানা নামিয়ে রেখে রওনা পড়ে।

সেদিন দু-তিন মিনিট পরেই ফিরে এল সত্যভূষণ। ঘটনা দৈবাৎ কোনদিন ঘটে। স্ত্রীর জিজ্ঞাসা-র মত মুখভঙ্গীর জবাবে পেটের ওপর হাতটা কয়েক বুলিয়ে নিল সত্যভূষণ।

মুখ টিপে হেসে করুণা সরে গেল। কারণ বুদ্ধিমতী স্বামীর হস্ত সঞ্চালনের কার্যকারণসম্পর্ক চট করে ফেলে।

জরুরি কাজটি সেরে সত্যভূষণ আবার থলে হাতে বাজারে চলে গেল

পথে নিত্যগোপালের সঙ্গে দেখা। বাজারের পথে ই এমন দেখা হয় দুজনে। এবং দেখা হলেই নীতি আর অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রাণখোলা আলাপ ।

কি নিত্যবাবু, আমি বলেছিলাম না? হল তো?

নিত্যগোপাল হেসে সায় দিয়ে বলল, তাই তো ছি।

আরে, আমি ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি, বুঝলেন?

নিত্যগোপাল বুঝেছে মনে হল। কারণ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়তে লাগল সে।

সত্যভূষণ বলল, কত করে কিনলেন আপনি?

কি?

সত্যভূষণ একটু দমে গেল। নিত্যগোপাল 'তাই তো দেখছি' বলে কি দেখে কোন্ বিষয়ে সায় দিল বুঝতে পারল না। বলল, আমি চালের কথা বলছিলাম।

নিত্যগোপাল অপ্রতিভ হাস্যের সঙ্গে বলে উঠল, ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। চালের কথাই তো হচ্ছিল। আমি হঠাৎ কি একটা ভাবতে ভাবতে—। হ্যাঁ, চাল কিনলাম একত্রিশ টাকা দরে। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। কিছু কমেছে।

কমেছে?—সত্যভূষণ চোখ কপালের দিকে তুলল, বলছেন কি মশাই? কম সে কম দু টাকা তো বেড়েছে!

নিত্যগোপাল এবার ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল, ইয়ে—সেদিন কি আপনি দর বাড়বে বলেছিলেন?

নিশ্চয়। পাঁচ লক্ষ টন ঘাটতি আছে বলে সরকারী বিবৃতি যেদিন বেরিয়েছিল সেই দিনই আমি বলেছিলাম যে চালের দর বাড়বেই।

নিত্যগোপাল প্রমাদ গণল। সত্যভূষণের পাওনা টাকা দশটা যদি এখনই চেয়ে বসে! মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল কি জানেন—আপনি তো জানেনই—এরা সব এর ভায়ের বাড়িতে প্রায় তিন মাস কাটিয়ে এল তো। কাজেই চাল এর আগে অনেকদিন কেনা হয় নি।

সত্যভূষণ কিছুটা প্রশমিত ক্রোধের সঙ্গে বলল, তাই

বলুন। এ ক মাস কত ধানে আর কত দরে কত চাল সে হিসেব রেখেছে আপনার শালা। আপনি আর কী করে জানবেন।

নিত্যগোপাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হেসে উঠল: যা বলেছেন। ভারি আরাম পাওয়া গেছে ক মাস।

সে তো বুঝতেই পারছি।

বলে সত্যভূষণ চুপ করে হাঁটতে লাগল।

বাজারের কাছে এসে পড়তেই নিত্যগোপাল আরও অস্থির হয়ে পড়ল। সত্যভূষণের কাছে হাওলাত নেওয়া দশ টাকা ফেরত দেবার সময় মাসখানেক আগেই পার হয়ে গেছে। সে হিসেবে চুপ করে পাশাপাশি পথ চলা খুবই অস্বস্তিকর। অথচ ভাল একটা নতুন প্রসঙ্গ তাড়াতাড়ি মাথায় আসছেও না।

কিন্তু যাই বলুন,—হঠাৎ বেশ উল্লসিত কণ্ঠে নিত্যগোপাল বলে উঠল, আমাদের মধ্যবিত্তদের বাঁচবার আর উপায় নেই। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত।

সত্যভূষণ কিছু খুশী হয়ে বলল, চিন্তা করলে একমত হতেই হবে। যারা চিন্তা করে না তাদের কথা আলাদা।

সত্যভূষণের চিন্তাশীলতায় মুগ্ধ হল নিত্যগোপাল। কারণ উক্তিটির দ্বারা নিত্যগোপালকেও চিন্তাশীল বলে স্বীকার করা হল। বলল, চিন্তা করে কজন?

উপস্থিত দুজনের বেশী ওর চোখে পড়ল না। আবার বলল, বেশীর ভাগই তো গরু ভেড়ার মত কাজ করে, খায় আর শোয়। বাস্‌।

নিত্যগোপালকেও চিন্তাশীল বলে গ্রহণ করতে আপত্তি ছিল সত্যভূষণের। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারল না। বরং হেসে বলতে হল, হ্যাঁ, গরু ভেড়ার সঙ্গে তফাত বিশেষ নেই।

বাজারে ঢুকে আলাদা হয়ে পড়ল দুজন।

ফেরবার সময়ও সঙ্গী জুটল সত্যভূষণের। পাড়ার কামাখ্যাপ্রসাদ।

সত্যভূষণ জিজ্ঞেস করল, কি মাছ নিলেন?

কামাখ্যা সত্যভূষণের থলের মুখে ইলিশমাছের [illegible] দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলল, নাঃ, আজ আর ইলিশমাছ নিলাম না। খেতে খেতে [illegible] ইলিশের ওপর অভক্তি এসে গেছে। বাড়িতে [illegible] আজ চচ্চড়ির জন্যে ছোট মাছ নিতে হবে। [illegible] বলে তাই নিলাম।

বলে আবার হাসল কামাখ্যাপ্রসাদ।

সত্যভূষণ বলল, অবশ্য চচ্চড়িও মন্দ নয়। [illegible] আরে মশাই, কি চচ্চড়ির মাছ, কি ইলিশ মাছ, [illegible] তো ছোঁয়া যায় না।

কামাখ্যা আর এক পর্দা চড়িয়ে বলল, [illegible] জিনিসটাই বা বাজারে ছোঁয়া যায় বলুন?

সত্যভূষণ একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করে বলল, [illegible] কথা আর বলবেন না, খারাপ কথা মুখে আসে।

যা বলেছেন।—সায় দিল কামাখ্যা।

এরপর দুজনই চুপ করে হাঁটতে লাগল। [illegible] কথার উল্লেখ খারাপ কথার ঢেউ তুলল দুজনের মনেই।

ক্ষণকাল পরে সত্যভূষণ গলার আওয়াজ হঠাৎ [illegible] নামিয়ে বলল, কথায় কথায় মনে পড়ল, আমরা [illegible] তো চাল ডাল বাজার নিয়েই ব্যস্ত আছি, এদিকে [illegible] যে বৃন্দাবন হয়ে উঠেছে সে খবর রাখেন কিছু?

নিমেষে কামাখ্যার চোখমুখ যেন কোন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় সরস হয়ে উঠল। প্রায় দম বন্ধ করে [illegible] না তো! কি ব্যাপার?

সত্যভূষণ মৃদু হেসে চুপ করে থেকে দর চড়াতে লাগল।

বুঝতে পেরে কামাখ্যা ভিন্ন সুর ধরল। বলল, [illegible] বলতে পারেন যে এ সব পরচর্চা ভাল নয়। সে [illegible] ঠিক। তবে—

সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। সত্যভূষণ মহা উত্তেজিত [illegible] বলে উঠল, পরচর্চা! বলছেন কি মশাই! ওরা [illegible] চর্চা করছে সেগুলো বড় পবিত্র!

কামাখ্যা তখন মৃদুকণ্ঠে বলল, কী, করেছে কী?

সত্যভূষণ এবার খুব অল্প সময় চুপ করে [illegible] প্রয়োজনীয় আবহাওয়া তৈরি করে প্রায় ফিস ফিস বলল, আরে, ওই যে দত্তবাড়ির কথা। মেয়ে[illegible] পড়তেও দিল না, বিয়েও দিল না। এখন বা[illegible] কুঞ্জবনের লীলা চলছে। শোনেন নি কিছু?

কামাখ্যা হতাশ কণ্ঠে বলল, ওঃ, ওই নীলিমার কথা ন ? ও তো আমিও শুনেছি কিছু কিছু স্ত্রীর কাছে।
ত্যভূষণ বলে উঠল, আরে মশাই, এ সব কথা স্ত্রী আবার কার কাছে শোনা যাবে ?
কামাখ্যা হেসে উঠল। বলল, হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে ভাবছিলাম নতুন আরও কোন ঘটনা ঘটেছে বুঝি।
ঘটেছে তো।—সত্যভূষণ গভীর অর্থপূর্ণ ভঙ্গী করল ব।
কোথায় ? কে ? কার সঙ্গে ?
বিজয়ীর মৃদুহাসি ফুটল সত্যভূষণের মুখে। চোখ টি করে বলল, নইলে কি আর অমনি বললাম র কথা ? পাড়াটাই এখন ভদ্রলোকের বাসের য় হয়ে গেছে, জানেন ?
তা জানব না কেন ?—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কামাখ্যা, রে সবাই বলবে এ কথা।
কথাটায় সত্যভূষণের মনে খটকা লাগল। সবাই যদি খারাপ বলে তাহলে পাড়ায় খারাপ থাকে কে ? ই চিন্তা করে বলল, না, সবাই বললে চলবে কেন। র জন্যে খারাপ হয়েছে তারাও যদি বলে তাহলে ব নাকি ?
কামাখ্যাও জবাব দিতে পারল না কিছু। চিন্তা তে লাগল।
সত্যভূষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার চাপা গলায় বলল, ওই যে চন্দ্রকান্তের বিধবা বোনটা— শালায় মাস্টারি তো করছে, আর কি করছে শোনেন বুঝি ?
কামাখ্যা ওর গলির মুখে এসে পড়ে থামল। লজ্জিত হাসির সঙ্গে বলল, ওঃ, ওই নির্মলার কথা বলছেন ? কথাও শুনেছি কিছু কিছু।
স্ত্রীর কাছে ?
হ্যাঁ।—বলে হেসে চলে গেল কামাখ্যা।
সত্যভূষণ দু পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে ন থেকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলল, কিন্তু আসল কথাটা ধ করি শোনেন নি। আচ্ছা, পরে বলব।
কামাখ্যা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু সত্যভূষণ মুহূর্ত ক্ষেপ না করে বিজয়ীর মত হন হন করে হাঁটতে লাগল।

বাজারের থলেটা রান্নাঘরের সামনে ফেলে দিয়ে ছুটে চলতে লাগল সত্যভূষণ। আর সময় নেই। অফিসে যাওয়ার আগে কাজ বাকি অনেক প্রস্থ।

আগে দাড়ি কামাতে বসল। রোজই কামায় এবং রোজই ক্রুদ্ধ হয় এবং ফলে রোজই এই সময় কিছু চেঁচামেচি করে।

শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়েই প্রতিদিনের মত পেটের ওপর হাত রাখল বটে, কিন্তু বাজারে যাওয়ার আগের দৃশ্য মনে পড়ে যাওয়ায় এই প্রশ্ন বাদ দিল। সঙ্গে সঙ্গে অনাবিল শান্তি পেল সত্যভূষণ। নিশ্চিন্তে বসে বড় আরাম পেল আজ সিগারেটটায়।

কিন্তু ঘড়িতে চোখ পড়তেই চকচকিয়ে উঠল। জোরে জোরে কয়েকটা শেষ-টান দিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বাকিটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেগে স্নানের ঘরে গেল।

খেতে বসে ছেলেদের কথা মনে পড়ল সত্যভূষণের। বলল, সান্তুরা কোথায় ? ওরা ইস্কুলে যাবে না ?

করুণা ঝামটা দিয়ে বলল, কি জানি, সে তুমি জান আর তোমার ছেলেরা জানে।

আর তুমি ?

আমার কথা ওরা শোনে নাকি ? এই তো সারাটা সকাল দুজনে ঝগড়া করে কাটাল। তুমি শাসন করতে জান নাকি ?

আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খাবে তুমি, আর আমি শাসন করব ? কত মারধর তো করলাম। যে গরু সেই গরুই তো থেকে যাচ্ছে। আসলে মা ঠিক না হলে ছেলে মানুষ হয় না। বুঝেছ ?

করুণা এখন ঝগড়া করবে না। কাজেই হেসে বলল, বুঝেছি। ও কথা রোজই বুঝছি তো।

সান্তুও খেতে বসল এসে।

সত্যভূষণ প্রথমেই প্রশ্ন করল, গরুতে আর মানুষে তফাত কি ?

একটা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন মনে করে সরল মনে সান্তু বলল, গরু ঘাস খায়, মানুষ ভাত খায়।

ছেলের বুদ্ধিতে মা চমৎকৃত হল। বাবা প্রথম ধাক্কায়

হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। পরে সামলে নিয়ে বলল, আর কোন পার্থক্য নেই?

ভাবে ভঙ্গীতে উপমাটার কারণটা অনুমান করে সান্তু এবার চুপ করে গেল।

সত্যভূষণ আবার বলল, তোমরা কি খাও?

নিজেই জবাব দিল, ভাত খাও। তবে গরুর মত দুই ভায়ে গুতোগুঁতি কর কেন? লজ্জা করে না? ফের যদি পড়ার সময়ে মারামারি করেছ শুনি তবে মার খেয়ে মরবে।

সান্তু বলল, মান্তুটাই তো শুধু শুধু গরুর মত মারামারি করতে আসে। আর মা ওকে কিছু বলে না বলে আরও মাথায় উঠেছে।

করুণা ধমক দিয়ে উঠল, আহা:, তুমি তো একেবারে শান্ত বুদ্ধিমান ছেলে। যত দোষ খালি মান্তুর আর আমার।

সত্যভূষণ সান্তুর উক্তিটা পছন্দ করল। চোখের একটা গুপ্ত ভঙ্গী করে তাকাল করুণার দিকে।

কিন্তু করুণা কোন সুযোগ দিল না। কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

খাওয়ার পরে করুণার হাত থেকে পানটা নিয়ে মুখে দিল সত্যভূষণ। পানের রসে মুখটা ভর্তি হয়ে এলে মেজাজটা খুব ভাল হয়ে ওঠে জানে করুণা। মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঠিক সময় বুঝে টুকিটাকি জিনিস আনবার ফরমায়েশ করে। আজও করল।

সত্যভূষণ পানের বৌটা থেকে একটু চুন জিভে দিয়ে বলল, আচ্ছা, দেখি যদি সময় পাই।

করুণা হেসে বলল, সময় পাবে না কেন?

রাগ হল সত্যভূষণের। কিন্তু পানের রসে চাপা পড়ে গেল। হেসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, জানই তো, ছুটির পরে আর দেরি করতে ইচ্ছে করে না পথে। তখন তো তুমি আমার গোলপোস্ট। বেগে ছুটে আসি।

করুণা হাসি গোপন করে বলল, ক্ষিদে পায় সেই কথাটা এত ঘুরিয়ে বলবার দরকার কি?

সত্যভূষণ চোখ পাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, খিদে পায়, তবে সে খিদে—

করুণা কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলল, খু... তো খুব!

সত্যভূষণের হাসি দপ করে নিবে গেল। রাগ... আর আটকাতে পারল না, ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠে বলল, খে... কাজে নয়? আচ্ছা, দেখা যাবে।

দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল সত্যভূষণ।

হাসল করুণা।

একজন সঙ্গী যোগাড় করে খেলা দেখতে সত্যভূষ... একটু আগে বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে।

বেরোবার সময় আরও একজন সঙ্গী জুটল। সি... পথে নেমে তাকে উল্টো দিকে রওনা হতে দেখে সত্যভূ... বলল, ও কি, ও দিকে কোথায় যাচ্ছেন?

জবাব এল, একটু কাজে যাচ্ছি!

কাজের নামে সত্যভূষণ চটে গিয়ে বলল, কাজ ম... কাজ। কাজ—খাওয়া আর শোওয়া। এই কি জীব... নাকি? খেলা দেখতে যাবেন না?

খেলা? কি খেলা?

ফুটবল খেলা।

ও, ফুটবল খেলা! ফুটবল খেলা আমার ছে... দেখে। আমি আর দেখি না। আর কোন্‌টাকে জীবন বলে তাও ঠিক জানি না।

চলে গেল ভদ্রলোক।

সত্যভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে সঙ্গীকে বলল, দেখলেন মানুষ হয়ে জন্মানোর কি সার্থকতা এদের বলুন?

সঙ্গী বলল, কিছু তো দেখি না।

দুজনই শিরায় শিরায় মনুষ্যজন্মের সার্থকতা বো... করতে করতে গর্বভরে অগ্রসর হল।

খেলার শেষে ফেরবার পথে বৃষ্টি এল। দৌড় দৌড়তে এক বাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠল দুজন।

রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে সত্যভূষণ বল... ওবেলাই আমি বলেছিলাম, আজ বৃষ্টি হবে। বুঝলেন!

সঙ্গীর রাগ হচ্ছিল বৃষ্টির ওপর। বলল, বুঝ... তো। আপনি যা বলেছিলেন তাই হচ্ছে, কা... আপনার আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু আমার যে তাড়াতা... ফেরা দরকার।

আকাশের দিকে তাকিয়ে সত্যভূষণ বলল, ভাববেন এখুনি বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বললাম, দেখবেন না।

সঙ্গী জবাব দিল, মাথা খারাপ? দেখছেন না রাস্তুন। সারা রাতে থামে কিনা দেখুন।

সত্যভূষণ হেসে বলল, যা বললাম দেখে নেবেন।

কয়েক মিনিট পরেই বৃষ্টি কমে গেল।

বিজয়ী বীরের মত সত্যভূষণ তাকাল সঙ্গীর দিকে। চল, এবার চলুন?

সঙ্গী বুঝতে পেরে বলল, খেপেছেন? অবেলায় বৃষ্টিতে ভিজলে রক্ষে আছে?

বৃষ্টি! বৃষ্টি দেখছেন কোথায়?

বাঃ! ওই যে পড়ছে ওগুলো কী জিনিস?

বাঃ, গুঁড়ি গুঁড়ি তো থাকবেই। যা বলেছিলাম, দেখে নিন। এখন চলুন।

অগত্যা সত্যভূষণের সঙ্গে নেমে পড়ল সঙ্গীও।

দুজনে দুটো রিক্‌শ ভাড়া করল।

বাড়ি পৌঁছে সত্যভূষণ নেমে চার আনা দিতে গেল। কিন্তু রিক্‌শওয়ালা নিল না। বলল, ও কি দিচ্ছেন? কমসে কম ছ আনা তো দেবেন? আট আনা ভাড়া হয়।

ভীষণ চটে গেল সত্যভূষণ। বলল, চালাকি পেয়েছ? আট আনা ভাড়া, তার দু আনা আবার রেয়াৎ দিচ্ছে!

আপনি পুছে লেন না। সবাই জানে।

পুছে টুছে লিব না। এ কি নতুন আদমি পায়া হ্যায়? চার আনা নেবে কি না তাই শুনি?

না বাবু, চার আনা লিব না। ছ আনা ভাড়া।

এ কি চোরের মুলুক, না ডাকাতের মুলুক? এইটুকু পথ ছ আনা হয় কখনও? এই জন্যেই তো যারা তোমাদের পয়সা না দিয়ে মার দেয় তারাই করে উচিত কাজ।

ওটা তো সুবিস্তাই আছে বাবু।

সুবিস্তা তো আছেই।

বলে ফেলে পরক্ষণে ব্যঙ্গটুকু লক্ষ্য করে সত্যভূষণ চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাঁ? আবার রসিকতা হচ্ছে?

ততক্ষণে করুণা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিক-ওদিক লোকজনও দু-চারটে দাঁড়িয়ে গেছে। যথার্থ ভদ্রলোক সত্যভূষণ ছ আনাই ফেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

খালি হাতের দিকে তাকিয়ে করুণার রাগ হল বটে, কিন্তু কিছু বলল না। কিন্তু সত্যভূষণ আগেই খেঁকিয়ে উঠল, কটমট করে তাকালে কিছু লাভ হবে না। তোমার হুকুমমত এই জলঝড়ে প্রাণটা তো আর দিতে পারব না।

করুণা হাসিমুখ করেই বলল, কে বলেছে তোমাকে প্রাণ দিতে। আমার কোন জিনিস আনতে হলেই যখন তোমার প্রাণ যায়! আজ তো সত্যি সত্যিই জল ঝড়।

তোমার জিনিস আনি না?

করুণা তাড়াতাড়ি বলল, আনবে না কেন। তুমি না আনলে কে আনে?

তবে? এত কথার দরকার কি? নিজে গিয়ে নিয়ে এলেই পার।

নিজে বেরুনো যদি অত সোজা হত, তোমার সংসারে তাহলে আর ভাবনা ছিল কি! দেখি, জল ফুটছে, আমি চা নিয়ে আসি। তুমি জামা কাপড় ছেড়ে খাবে তো খেয়ে নাও।

সত্যভূষণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমার সংসারে তোমার এত অসুবিধে হচ্ছে, সেটা তো ভাবনারই কথা।

কিন্তু করুণা আর জবাব না দিয়ে চলে গেল।

চা খাওয়া শেষ হবার আগেই পাড়ার তাসের আসর থেকে ডাক এল।

করুণা এসে বলল, এই জল ঝড়ে আবার না বেরোলেই চলে না? জল ঝড় তো থামে নি এখনও।

খোঁচাটা লক্ষ্য করল না সত্যভূষণ। সে ব্যস্ত হয়ে ছাতাটার খোঁজ করছিল। ছাতা হাতে নিয়ে বলল, না না, থেমে গেছে। তা ছাড়া এইটুকু তো যাব। ছাতাও নিলাম।

আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু তাস খেলা হল না। ওরা মোট দুজন উপস্থিত ছিল। সত্যভূষণকে নিয়ে তিনজন হল।

সত্যভূষণ বলল, কি হল নিবারণবাবু, আর সব কোথায়?

নিবারণ রেগেই ছিল। কথার সঙ্গে সঙ্গে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বাবুদের সব সর্দির ধাত যে! দেখুন গে গলায় মাফলার জড়িয়ে সব বউয়ের আঁচল ধরে বসে আছে। আসবে কি করে?

সত্যভূষণ ছাতাটা রেখে বলল, আরে, এরা মানুষ নাকি!

বলতে বলতে আরাম করে বসল এর পাশে। তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে আবার বলল, কি, সদানন্দবাবু চুপ করে আছেন যে! আপনারও সর্দিটর্দি হল না কি?

সদানন্দ বলল, কি করব আর। লোকজন এল না। অবশ্য ফটিকবাবু বলেছিল যে আজ আর আসতে পারবে না। ওর ছোট ছেলের অসুখ। কদিন থেকেই নাকি জ্বর চলছে, আজ একটু বেশী।

নিবারণ বলে উঠল, এই সব মেয়েলী কথাই আমার সহ্য হয় না। ছেলের জ্বর, তা ও বাড়ি বসে থেকে কি করবে? ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ালেই তো হয়।

সদানন্দ বলল, খাওয়ালেই তো হয় বুঝলাম। কিন্তু যা বাজারের অবস্থা, মেজাজ ঠিক রেখে কিছু করাও শক্ত।

সত্যভূষণের মেজাজ এতে আরও খারাপ হয়ে গেল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, আরে মশাই, বাজারের সঙ্গে তাস খেলার কি সম্পর্ক দেখলেন আপনি? এই বাজারে কে সুখে আছে বলুন তো? এই সব ঝামেলা অশান্তি ভুলে থাকবার জন্যেই তো আরও তাস খেলা দরকার। তা ছাড়া খেলা হল সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ। সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

সভ্যতার নামে সদানন্দ ভক্তিসহকারে বলল, তা তো বটেই, তা তো বটেই।

সত্যভূষণ আবার বলল, আরে, গাড়ি-টানা বলদগুলো পর্যন্ত কাজ আর খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গা-চাটাচাটি খেলা খেলে, জানেন?

বলে নিবারণের দিকে তাকাতেই নিবারণ বলে উঠল, আরে, আমি তো জানি। আমাকে আর কী শেখাচ্ছেন আপনি। যাদের জানা দরকার ছিল তারা তো আসছে না কেউ।

সত্যভূষণ হতাশ কণ্ঠে বলল, না এলে আর কী করব। পাড়ার আমরা এই পাঁচ-ছজন মানুষই একটু যা হোক খেলাধুলো করি। এর মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে খসে যায়। আর সব যে কী করে সন্ধ্যেবেলা কিছু জানি না।

নিবারণ বলল, একেবারে জানব না কেন। কিছু কিছু জানিই তো। এরা বোয়ের কাছে বসে বসে পাড়ার কেচ্ছা শোনে।

সত্যভূষণ এবার মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করল: না না, সে তো খাওয়াদাওয়ার পরেও শুনতে পারে।

পরে আর সময় কোথায়? পরে তো—

শেষ না করে বাকি অংশের জন্যে হাসল নিবারণ।

সত্যভূষণ বুঝতে পেরে বলে উঠল, অ্যাঃ, কার কথা... ইয়ে আমার জানা আছে। রোজই ব্যস্ত থাকে বলছেন? মাথা খারাপ? ওদের সপ্তাহের মধ্যে ছ-দিনই কা... বোয়ের সঙ্গে কথা বলে। শুধু কথা—বুঝেছেন?

নিবারণ গম্ভীর ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল, তার জন্যে দায়ী শুধু ওরা নয়। এখন আমাদের বউগুলো সব হয়েছে ভাঙা জাহাজ, বুঝলেন খালি রিপেয়ার আর রিপেয়ার। মেজাজই খারাপ হয়ে যায়।

সত্যভূষণ হেসে উঠল হি হি করে। বলল, এই একটা কথা বলেছেন। গায়ে একটু হাত দিতেই খেঁকিয়ে ওঠে।

সদানন্দও হেসে ফেলল।

নিবারণ চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের এই রকম নাকি? আমি ভেবেছিলাম উলটো।

সদানন্দ যেন কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ল। বলল, উলটো মানে?

সত্যভূষণ বলল, আমারও তো তাই ধারণা। মা... আপনার গিন্নীর তো স্বাস্থ্য বেশ ভাল মনে হয়।

সদানন্দ সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলল, দূর, বাইরে থেকে দেখতে তাই মনে হয় বটে। ভেতরে একেবারে ঝাঁঝরা।

নিবারণ হঠাৎ সামনে ঝুঁকে মুখটা ওদের কাছে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, কিন্তু, ওই চন্দ্রকান্তের স্ত্রীর বয়স মনে হয় আপনাদের? যে সব কথা শুনি—তা হলে করে সম্ভব হত? জিজ্ঞেস করলে তো হাজার দুখের নাম করে। স্বামী তো খালাদা শোয়, কিন্তু যে প্রায় নাতির বয়সী অনাত্মীয় ছেলেটাকে কাছে শোয়, সেটা কি ব্যাপার? স্নেহরস?

সত্যভূষণ চোখ বড় বড় করে ফিস ফিস করে বলল, তাই নাকি! কই, এ কথা তো শুনি নি আমি!

নিবারণ বলল, আশ্চর্য কথা! আপনি শোনেন নি! তো সবাই জানে।

চন্দ্রকান্ত কী বলে?

কী আর বলবে। গোপনে হজম করে। যেমন পুরুষ তেমনি তো হবেই।

সদানন্দ আমতা আমতা করে প্রতিবাদ তুলল: না না, তা আমি মনে করি না। স্ত্রীলোকের স্বভাব যদি খারাপ হয় তা হলে স্বামী যেমনই হোক সে খারাপই হবে।

সত্যভূষণ আর নিবারণ উভয়েই একসঙ্গে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

সদানন্দ নিজের ওপর আক্রমণের ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল, নইলে পুরুষ যখন খারাপ হয়? তখন কি বলবেন?

সত্যভূষণ কি যেন চিন্তা করল। মুহূর্তকাল পরে বলল, কথাটা বোধ করি সদানন্দবাবু ঠিকই বলেছেন।

নিবারণ বলল, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তৃপ্তি থাকলে কেন হবে। অতৃপ্তিই ওর মূল।

সত্যভূষণ হঠাৎ যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ করল। বলে উঠল, তৃপ্তি? কোথায় দেখলেন তৃপ্তি? তৃপ্তি নেই—

কিন্তু হঠাৎই আবার থেমে গেল সত্যভূষণ। বিষয়টা কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে উঠল।

পরক্ষণে নিজের জমিতে পা রেখে বলে উঠল, আরে মশাই, সারারাত স্ফূর্তি করে স্বামী সকালবেলায় সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে মিটমিট করে তাকায়। স্ত্রীও পুরুষ দেখলে জানলা থেকে সরে না।

সদানন্দ হেসে উঠল।

সত্যভূষণ বলে চলল, অতৃপ্তি যদি মূল হত তবে সংসারে বদমায়েশ ছাড়া মানুষ থাকত না।

জ্ঞান সংক্রামক হয়ে পড়ল। নিবারণ বলে উঠল, নেই তো। সব মানুষই আসলে মনে মনে বদমাশ। কিন্তু নানা কারণে বেশীর ভাগ লোক চেপে যায়, এই মাত্র।

সদানন্দ ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, সে কথা সত্যি। চিন্তা করে দেখতে গেলে তাই ঠিক। কিন্তু কজন সংসারে চিন্তা করে।

সত্যভূষণ বলে উঠল, কেউ না, কেউ না। শুধু খায় আর শোয়। চিন্তা করবার সময় কোথায় লোকের?

এরা তিনজনই চিন্তাশীল প্রতিপন্ন হওয়ায় চুপ করে চিন্তা করতে লাগল সম্ভবতঃ।

কিন্তু নিশ্চিন্তে চিন্তা করবার সময় বেশী ছিল না। সদানন্দ গা-মোড়া দিয়ে বার দুই হাই তুলে বলল, তাহলে এখন উঠতে হয়। রাত অনেক হল। আর বসে থেকে লাভ কি। আজ আর কেউ আসবে না।

এলেই আর খেলার সময় কোথায়! দূর ছাই, ভাল লাগে না।—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সত্যভূষণ: চলুন যাওয়া যাক।

টিপ টিপ বৃষ্টি ছিল তখনও। সত্যভূষণের ছাতার নীচে সদানন্দ মাথাটা বাঁচিয়ে রওনা হল।

জনকয়েক মেয়ে আর মহিলা মাথায় আঁচল দিয়ে বেগে যাচ্ছিল। দেখে সত্যভূষণও বেগ বাড়িয়ে দিল। সদানন্দের কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছিল, ঠিক করতে গিয়ে পেছনে পড়ে গেল। বলে উঠল, ভিজে গেলাম যে।

থামল না সত্যভূষণ, সামনের দিকে চোখ রেখে বলল, একটু পা চালিয়ে আসুন না।

সদানন্দ অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল, দূর ছাই, ভিজেই গেলাম।

এবার থামল সত্যভূষণ। মেয়ের দল চলে গেল। সদানন্দ ছাতার নীচে ঢুকল আবার।

সত্যভূষণ হেসে বলল, সিনেমা দেখার শখ আজ কিছুটা মিটেছে বোধ করি। শাড়ি ভিজে গায়ে বসে গেছে।

সদানন্দ রেগে ছিল। কিছুটা ঝাঁজের সঙ্গে বলল, কিন্তু তাতে দেখতে ভাল হয়েছে।

সত্যভূষণ ফিক করে হেসে ফেলল। কিন্তু পরক্ষণে হাসিটির একটি নির্দোষ ব্যাখ্যা দেবার জন্যে বলল, আপনি বেশ হাসির কথা বলছেন সদানন্দবাবু। বয়স বাড়ছে, না কমছে? আপনি এত লক্ষ্যই বা করলেন কখন?

সদানন্দ বলল, আমি? আমি আর ভাল করে দেখতে পারলাম কোথায়!

ও, ভাল করে দেখতে পারেন নি?

না। আমি তো আপনার বেগ দেখে বুঝলাম যে দৃশ্য ভাল।

সত্যভূষণ একটু চুপ করে থেকে হেসে বলল, আরে দূর, এ বয়সে বেগ দিয়ে আর লাভ কি বলুন।

কোন লাভ বোধ করি নেই। কিন্তু মন তো মানে না।

সত্যভূষণ এবার পাল্টা আক্রমণ করল: মন আপনার মানছে না তা সত্যি। কাপড় সামলাতে গিয়ে পিছিয়ে পড়লেন আপনি, আর এখন রাগ ঝাড়ছেন আমার ওপর!

দুজনই হেসে উঠল।

সদানন্দের বাড়ি পথেই পড়ে। সে ছুটে চলে গেল।

খাওয়ার পরে রেডিও খুলে দিয়ে আরাম করে বসল সত্যভূষণ। গান শুনতে শুনতে মাঝখানে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে খবরের কাগজখানা নিয়ে এল। এটা-ওটা সংক্ষেপে দেখে আদালতের খবরটা আবার পড়ল। কয়েকটা সিনেমার বিজ্ঞাপন শেষ করে নিরুদ্দেশের খবর দু-একটা দেখতে দেখতেই করুণা ঘরে এল। সত্যভূষণ কাগজ বন্ধ করে রেখে দিল জায়গামত। ফিরে এসেই রেডিও বন্ধ করে দিল।

করুণা বলল, বারে, গানটা শেষ করতেও দিলে না!

সত্যভূষণ হেসে বলল, ওঃ, শেষ হয় নি নাকি! থাক গে, ও আর শেষ করতে হবে না। রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ি।

কিন্তু শুল না সত্যভূষণ। আর একটা সিগারেট ধরাল। করুণা শুয়ে পড়লে তারপর শুতে গেল।

গায়ের ওপর হাতটা আসামাত্রই করুণা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। বলল, চুপ করে ঘুমোও।

রাগ হল সত্যভূষণের: গায়ে হাতটা রাখলে দোষ?

করুণা হাসি চেপে বলল, হ্যাঁ, দোষ।

তখন কি বলেছিলে মনে আছে?

কখন?

ওবেলা, অফিসে যাওয়ার সময়?

কি জানি, আমার তো কিছু মনে পড়ে না।

মনে তোমার সবই পড়ে। কিন্তু তোমার মত ভিজে বেড়াল স্ত্রীলোক খুব কম আছে। তখন বললে না, আমার নাকি শুধু মুখেই খিদে, কাজের বেলায় কিছু নয়?

করুণা এবার হেসে ফেলল, তুমি যে কি বোকা! তোমাকে রাগাবার জন্যে ঠাট্টা করে একটা কথা বললাম। নইলে তোমাকে কতদিন বলেছি না যে তুমি অন্য ব্যবস্থা কর, আমি পারব না।

রোজই বল তো।

তবে?

আবার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে করুণা বলল, উঁহু, বিরক্ত কর না লক্ষ্মীটি। শরীরটা ভয়ানক খারাপ।

আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সত্যভূষণ। বলল, কি করব বল তো? দিনে তো কোন শান্তিই নেই সংসারে, তারপরে রাত্তিরেও যদি শুয়ে একটু শান্তি না পাই তাহলে আর বেঁচে থেকে লাভ কি বল?

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ কাব্যভাষ্য

॥ প্রেমচেতনা ঃ পঞ্চম অধ্যায় ॥

॥ **কাদম্বরী ঃ ধ্রুবতারা** ॥

৬

াদম্বরী দেবীর মৃত্যু ১২৯১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ। কাদম্বরী দেবীকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রমানসের চেতনা এই মৃত্যুর দ্বারা দ্বিখণ্ডিত। মৃত্যুর পূর্বে আর র পরে। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বে কবির কাব্য-সংকলন হল 'শৈশবসংগীত,' 'সন্ধ্যাসংগীত,' াতসংগীত,' 'ছবি ও গান'। একটি পদ ছাড়া [কো বোলবি মোয়] 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ও এই র রচনা।

কাদম্বরী দেবীর জীবদ্দশায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোথায় ানে তাঁর প্রত্যক্ষ ছায়াপাত হয়েছে তা চিন্তা করে া বিশেষ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের আঠারো-উনিশ র বয়সে লেখা প্রথম পত্রগুচ্ছ "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" তঃ কাদম্বরী দেবীকেই লেখা।[১৩] গ্রন্থাকারেও এই াবলী তাঁরই হস্তে সমর্পিত। 'ভগ্নহৃদয়ে'র দুটি ার-কবিতাও তাঁরই উদ্দেশে লেখা। তেরো থেকে ঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত কবিতার সংকলন শবসংগীত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কাদম্বরী দেবীর র পাঁচ সপ্তাহ পরে [২৯ মে ১৮৮৪]। এ গ্রন্থ-িও তাঁরই নামে উপহার দিয়ে কবি লিখছেন, "এ বতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, ার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। ই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।"

একুশ বৎসর বয়সে লেখা 'সন্ধ্যাসংগীতে'র উপহার ও অন্যান্য কবিতার কথা এই অধ্যায়ের পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র দোসর, কবির প্রথম কাব্য-সুরভিত মন্ময় গদ্যসংকলন 'বিবিধ প্রসঙ্গ'ও কাদম্বরী দেবীকেই উপহৃত। এই প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে কবি বলছেন, "এই লেখাগুলির মধ্যে কিছুদিনের গোটাকয়েক সুখ দুঃখ"[১৪] তিনি লুকিয়ে রেখেছেন। এই লেখাগুলি সাধারণভাবে সকলের হলেও বিশেষভাবে দুজনের। ["আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।"[১৫]]

বস্তুতঃ, দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার উদ্যোগ মাদ্রাজ পর্যন্ত এগিয়ে ব্যর্থ হবার পর তরুণ কবি বেশির ভাগ সময়ই জ্যোতিদাদা ও নতুন বৌঠানের সঙ্গে কাটাতে লাগলেন। একবিংশ বর্ষটি কাটল চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে। লেখা হল 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতা ও 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র নিবন্ধগুলি। চন্দননগর থেকে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিদাদাদের সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে উঠলেন সদর স্ট্রীটের বাড়িতে। সেখানে 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি লেখা শুরু হল। কিছুদিনের জন্যে সদর স্ট্রীটের দল গেলেন দার্জিলিঙে। সেখান থেকে ফিরে আর সদর স্ট্রীটে নয়, এলেন সার্কুলার রোডের বাসা-বাড়িতে। পরবর্তী গ্রীষ্মে কিছুদিন কাটল কারোয়ারের সমুদ্রতীরে। এই কালসীমার মধ্যেই 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি লেখা। 'প্রভাত-

সংগীতে'র প্রকাশ ১২৯০ সালের বৈশাখে। বেশির ভাগ কবিতাই লেখা ১২৮৯ সালে। 'ছবি ও গান' প্রকাশিত হয় 'প্রভাতসংগীতে'র দশ-এগারো মাস পরে, ১২৯০ সালের ফাল্গুনে।

'ছবি ও গানে'র "উৎসর্গে" কবি লিখেছেন, "গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।" বলাই বাহুল্য, কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশেই এই উৎসর্গ-লিপি রচিত। এই উৎসর্গ-লিপির ভাষার তাৎপর্য আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচনা করেছি।[১৭] 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি 'প্রভাতসংগীতে'র প্রায় সমকালীন। "গত বসন্তের ফুল নিয়ে এ বৎসরকার [১২৯০] বসন্তে মালা" গাঁথা হয়েছে—এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে উৎসর্গের ভাষায়। 'গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে' কবি বলেছেন, "এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা।"[১৭]

'ছবি ও গানে'র "উৎসর্গ" এবং "গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে" যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি মুখ্যত: কবির বাইশ বৎসর বয়সের লেখা। সুরের পার্থক্য অনুসারে একই বৎসরের ফসল দুখানি পৃথক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতাগুলি তত্ত্বপ্রধান। কবির কণ্ঠে আলোর মন্ত্র উচ্চারিত। 'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলি ভাবপ্রধান, কবির কণ্ঠে প্রেমের মন্ত্র গুঞ্জরিত। কবি নিজেই এই পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রচনাবলী সংস্করণে "কবির ভণিতা"য় তিনি বলেছেন, সন্ধ্যাসংগীত পর্বে তাঁর মনে কেবল মাত্র "হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন" চলছিল। 'প্রভাত-সংগীতে' দেখা দিল "একটা আধটা মননের রূপ।" কবি বলছেন, "কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দর-মহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ঐগুলো হচ্ছে অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি।"[১৮]

'প্রভাতসংগীতে'র মূল সুর ফুটে উঠেছে প্রভাত-উৎসবে। কবি বলছেন:

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

* * *

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কী গান।

'ছবি ও গান' সম্পর্কে রচনাবলী সংস্করণে "সূচনা-মন্তব্যে" কবি বলেছেন, "পূর্বেকার অবস্থায় একটা [illegible] ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে [illegible] করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা [illegible] সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। * * [illegible] সংসারের ভিতরে তখনো প্রবেশ করে নি, [illegible] বাতায়নবাসী।"[১৯]

'ছবি ও গানে'র মূল সুরটি প্রকাশিত হয়েছে '[illegible] কবিতার শেষ দুটি পংক্তিতে। কবি বলছেন:

আলোতে ছেলেতে ফুলে এক সাথে আঁখি [illegible]
প্রভাতে পাখিতে গান গায়।

৭

ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে [২১ মে, ১৮৯০] কবি [illegible] চৌধুরীকে 'ছবি ও গান' সম্পর্কে একখানি দীর্ঘ [illegible] লেখেন। তাতে তিনি বলেছেন, "আমি তখন [illegible] পাগল হয়ে ছিলুম।"..."আমার সমস্ত শরীরে [illegible] নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো [illegible] পড়েছিল।"..."একটা বাতাসের হিল্লোলে একরা[illegible] মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল [illegible] মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছুই ছিল না। কেবলি এ[illegible] সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। ..."সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এ[illegible] আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গা[illegible] পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে [illegible] আমার কোন পুরোনো লেখায় হয় না।"[২০]

সেই নবযৌবনের নেশা-ধরা পরিবেশটি পাওয়া [illegible] 'ছবি ও গানে'র "জাগ্রত স্বপ্ন" কবিতায়। কবি বলছে[illegible]

চারি দিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-কুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের 'পরে ফেলিব চরণ,
যৌবন-মাধুরী ভরে।

চারিদিকে মোর মাধবী মালতী
সৌরভে আকুল করে।

...র নিজের অবস্থাটি ফুটে উঠেছে "পাগল" ও ..." কবিতায়। "পাগল" কবিতায় কবি নিজের ...দশাটি বর্ণনা করে বলেছেন :

যেখান দিয়ে যায় সে চলে
সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে
...যেন চরণ ছুঁয়ে
শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায় যেন কুসুম ফোটে ফোটে।

* * *

...বলে এস এস,
কানন বলে ব'সো ব'সো,
সবাই যেন নাম ধরে তার ডাকে।
...যখন কয় সে কথা,
মূর্চ্ছা যায় রে বনের লতা,
লুটিয়ে ভুঁয়ে চুপ করে সে থাকে।

..." কবিতায় কবি বলছেন :

...কিরণ পান করে ওর ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,

* * *

ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।

একাকিত্বের বেদনাই 'ছবি ও গানে'র মূল সুরটি ...। "পাগল" কবিতায় কবি আক্ষেপের সুরে ...:

তোরাই শুধু শুনলি নে রে,
কোথায় বসে রইলি যে রে,
দ্বারের কাছে গেল গেয়ে গেয়ে,
কেউ তাহারে দেখলি নে তো চেয়ে।
গাইতে গাইতে বলে গেল,
কত দূর সে চলে গেল,
গানগুলি তার হারিয়ে গেল বনে
দুয়ার দেওয়া তোদের পাষাণ মনে।

...ল" কবিতায় তাঁর প্রাণের অভিলাষটি ব্যক্ত করে ...ছেন :

চলো দূরে নদীর তীরে,
বসে সেথায় ধীরে ধীরে,
একটি শুধু বাঁশরী বাজাও।
আকাশেতে হাসবে বিধু,
মধু কণ্ঠে মৃদু মৃদু
একটি শুধু সুখেরি গান গাও।

৮

'দুয়ার দেওয়া পাষাণ মনে'র কাছে অতৃপ্ত প্রেমিকের আকুল আবেদনই 'ছবি ও গানে'র প্রেমচেতনার মর্মবাণী। চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগান-বাড়ির বকুল গাছটি কবিমানসকে নিত্যসুরভিত করে রেখেছে। এই বকুলই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রিয়ফুল। সেই বকুল গাছের ছায়ায় নতুন বৌঠানের ছবিটিকে কবি নানারূপে ফিরে ফিরে দেখছেন।—

আঁধার গাছের ছায়
ডুবু ডুবু জোছনায়
ম্লানমুখী রমণী দাঁড়িয়ে।"[১]

ডুবু ডুবু জোছনায় আঁধার গাছের ছায়াটিতে তরুণ কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ আনন্দিত চিত্তের কলাকৃতির স্পর্শ লেগেছে—

ঘন গাছের পাতার মাঝে,
আঁধার পাখি গুটিয়ে পাখা,
তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে,
ছায়াগুলি এ'লিয়ে দেহ
আঁচলখানি পেতে যেন
গাছের তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।"[২]

"সুখের স্মৃতি" কবিতায় সেই গাছের ছায়ায়, সেই চাঁদের আলোয় কাদম্বরী দেবীর মূর্তিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

চেয়ে আছে আকাশের পানে
জোছনায় আঁচলটি পেতে,
যত আলো ছিল সে চাঁদের
সব যেন পড়েছে মুখেতে।

* * *

অতি দূরে বাজে ধীরে বাঁশি,
অতি সুখে পরাণ উদাসী,
অধরেতে স্খলিতচরণা
মদিরহিল্লোলময়ী হাসি।
কে যেন রে চুমো খেয়ে তারে
চলে গেছে এই কিছু আগে;
চুমোটিরে বাঁধি ফুলহারে,
অধরেতে হাসির মাঝারে,
চুমোতে চাঁদের চুমো দিয়ে
রেখেছে রে যতনে সোহাগে।

জ্যোৎস্নার প্রসাধনে কাদম্বরী দেবীর সুন্দর মুখখানি প্রেমমুগ্ধ কবির চোখে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর চোখ দুটিতে কবি তাঁর আত্মার গভীর

রহস্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর বর্ণনাতে আত্মিক প্রেমের প্রতীক সেই দুটি চোখের কথাই এসেছে বারবার। "স্নেহময়ী" কবিতায় কবি বলছেন, জুঁই বেলা অশোক বকুলের মত ওদেরই একজন হয়ে, তাঁর স্নেহ কুড়োবার বাসনা কবিচিত্তকে অনুক্ষণ ঘিরে আছে—

বড়ো সাধ যায় তোরে
ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে,
নয়ন-কিরণে তোর
ছলিবে পরান মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।

এই কথাকলির বাগভঙ্গিটি লক্ষ্য করার মত। 'নয়ন-কিরণে তোর ছলিবে পরান মোর।'—স্বতঃই এই চরণটি কবির চিরপ্রিয় জ্ঞানদাসকে মনে করিয়ে দেয়—

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥

অমিয়-মাধুরী-মাখা সেই চোখের বর্ণনায় কবি চির-অতৃপ্ত। বলছেন:

অমিয়-মাধুরী মাখি
চেয়ে আছে দুটি আঁখি,
জগতের প্রাণ জুড়াইছে,
ফুলেরা আমোদে মেতে
হেলে দুলে বাতাসেতে
আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে।

কবিচিত্তের পুষ্পকামনাও ওই দৃষ্টিসুধা পানের জন্যে চিরপিপাসিত। তাই তাঁর প্রার্থনা:

ওই দৃষ্টিসুধা দাও,
এই দিক পানে চাও,
প্রাণে হোক প্রভাত বিকাশ।

এই বাসনাই "স্মৃতি-প্রতিমা"র কবিতায় শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে নূতন আদরের প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে—

সেই পুরাতন স্নেহে
হাতটি বুলাও দেহে,
মাথাটি বুকেতে তুলে রাখি,
কথা কও নাহি কও,
চোখে চোখে চেয়ে রও,
আঁখিতে ডুবিয়া যাক আঁখি।

কিন্তু 'ছবি ও গানে' কবির পূর্বরাগ-বিপ্রলম্ভ যত 'প্রৌঢ়' [illegible]

নিখাদে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিরা পূর্ব [illegible] বর্ণনায় স্বপ্নকে একটা বড় স্থান দিয়েছেন। "সাক্ষাৎ চ" রূপ দেখে পূর্বরাগ সঞ্চার শুধু বৈষ্ণব কবিদেরই সংস্কৃত সাহিত্যেরও একটা বড় দিক। বড়, কেননা মনস্তত্ত্বসম্মতও বটে। 'ছবি ও গানে'র প্রচলিত সংস্করণ শেষ কবিতা "নিশীথ-চেতনা" এই স্বপ্নানুরাগেরই সার্থক রূপ। এই কবিতায় কবিকল্পনা বৈষ্ণবানুগ হয়েও স্বকীয় মাধুর্যে উজ্জ্বল। স্বপ্নকে সম্বোধন করে কবি বলছেন:

স্বপ্ন, তুমি এস কাছে, মোর মুখপানে চাও,
তোমার পাখার 'পরে মোরে তুলে লয়ে যাও

স্বপ্নের পাখায় ভর করে স্বপ্নতনু হবার এই বাসনার নির্ণয় করে কবি বলছেন:

হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি মোরা সারা নিশি,
প্রাণে প্রাণে খেলাইয়া প্রভাতে যাইব মিশি

এই সাধারণ বাসনাটিই কবিতার শেষপ্রান্তে এসে বিশেষ প্রাণের স্বপ্ন হয়ে ওঠার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় পরিসমাপ্ত হয়েছে। কবি বলছেন:

ওরে স্বপ্ন, আমি যদি স্বপন হতেম হায়,
যাইতাম তার প্রাণে, যে মোরে ফিরে না চায়
প্রাণে তার ভ্রমিতাম, প্রাণে তার গাহিতাম
প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশি নিশি।
যেমনি প্রভাত হত আলোকে যেতাম মিশি।
দিবসে আমারি কাছে কভু সে খোলে না প্রাণ,
শোনে না আমার কথা, বোঝে না আমার গান
মায়ামন্ত্রে প্রাণ তার গোপনে দিতাম খুলি,
বুঝায়ে দিতেম তারে এই মোর গানগুলি।
পরদিন দিবসেতে যাইতাম কাছে তার,
তাহলে কি মুখপানে চাহিত না একবার!

যে ফিরেও চায় না তার দুয়ার-দেওয়া পাষাণ[illegible] প্রবেশের পথটি কবির নিজেরই বিপ্রলব্ধ চিত্তের আবিষ্কার। স্বপ্ন দেখে উপজাত পূর্বরাগের প্রথানুগত্য মাত্রই বৈষ্ণবপদাবলীর ঐতিহ্যকে এখানে কবি সূক্ষ্ম চারু মণ্ডিত করেছেন।

৯

কবি বলেছেন, 'ছবি ও গান' রচনার সময় সেই বয়স ছিল যখন "কামনা কেবল সুর খুঁজছে রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে।" [illegible]

ঃ 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পর্বের সঙ্গে 'প্রভাতসংগীত' এবং ও গানে'র পর্বের একটি বড় পার্থক্য এখানেই ছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পর্বে কেবলমাত্র "হৃদয়ের গদ্গভাষী আন্দোলন।" 'প্রভাতসংগীতে' "জগৎ আসে প্রাণে, জগতে প্রাণ যায়।" 'ছবি ও গানে'তেও "আলোতে লতে ফুলে এক সাথে আঁখি খুলে প্রভাতে পাখিতে গায়।"

এই দুই পর্বে কবির জীবনচেতনার যে পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিবর্তন তাঁর প্রেমচেতনার মধ্যেও স্ফুট হয়ে উঠেছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র প্রেম হৃদয়ের গদ্গভাষী আন্দোলনেই পরিসমাপ্ত, 'ছবি ও গানে'র প্রেম কেবল সুরই খুঁজছে না, রূপ খুঁজতেও বেরিয়েছে। কেবল আত্মকথাই নয়, যাকে ভালবাসি তার প্রতিও ই উন্মুক্ত হয়েছে। 'ছবি ও গানে'র প্রথম দুটি কবিতায় বির প্রেমাবিষ্ট 'আমি' তন্ময় হয়ে দেখছে প্রেমস্বরূপিণী মীকে। "কে?" কবিতায় কবি বলছেন:

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

চেতনা এখানেও আত্মলগ্ন। কিন্তু "সুখস্বপ্ন" কবিতায় স্বরূপেই সমুদ্ভাসিতা। তন্ময় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কবি বলছেন:

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।

এই দুটি কবিতার আলম্বনস্বরূপিণী কবির মানসলক্ষ্মী গানের পাখায় ভর করে শাশ্বত প্রেমের অমর লোকে পৌঁছেছেন। কিন্তু তাঁর যে বিশেষ লাবণ্যময় মূর্তিটি কবি ধ্যান করেছেন সেই মূর্তিটিই চিরকালের জন্য তাঁর মানস-পটে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে—

চোখের উপর মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখি,
সারা দিন ধরে বকুলের ফুল
ঝরে পড়ে থাকি থাকি।

মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

এই লাবণ্যমূর্তিটির দিকে তাকিয়ে ভানুসিংহের মানসরাধাকে মনে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'ছবি ও গানে'র কবির ধ্যানে কাদম্বরী দেবীর সৌন্দর্যমূর্তিটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে "আচ্ছন্ন" কবিতায়। কবি বলছেন:

আলোক-বসনা যেন আপনি সে ঢাকা আছে
আপনার রূপের মাঝার।

পরিণত বয়সে কবি অমরাবতীর বাতায়নবর্তিনী[২৩] জ্যোতির্ময়ী ঊষসী-মূর্তিরূপে কাদম্বরী দেবীর যে ধ্যানে তন্ময় হয়েছিলেন তারই প্রথম লাবণ্যপ্রতিমা রচিত হয়েছে 'ছবি ও গানে'র এই "আচ্ছন্ন" কবিতায়। এখানে কবির প্রেমচেতনা তাঁর সৌন্দর্য-চেতনার সহোদর। কবিতাটির অন্তিম স্তবকে অন্তরঙ্গ কবির মানস-সিন্ধু মন্থন করে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়েছেন কবির হৃদয়-কমলাসনে তাঁর অধিষ্ঠান চিরদিনের। প্রেমের দৃষ্টিতে যে সৌন্দর্যের আলোক বিচ্ছুরিত হয় তারই কিরণে উদ্ভাসিত—কবির সেই মানসপ্রতিমার দিকে তাকিয়ে কবি বলছেন:

কে তুমি গো উষাময়ী, আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন,
রূপের সাগর মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন।
ধীরে ধীরে ওঠো দেখি, একবার চেয়ে দেখি,
স্বর্ণজ্যোতি কমল আসন,
সুনীল সলিল হতে ধীরে ধীরে উঠে যথা
প্রভাতের বিমল কিরণ।
সৌন্দর্য-কোরক টুটে এসো গো বাহির হয়ে
অনুপম সৌরভের প্রায়,
আমি তাতে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে যাব
উদাসীন বসন্তের বায়।

এই স্বর্ণজ্যোতি কমলাসনা উষাময়ী মূর্তিই 'ছবি ও গানে'র কবিমানসের অনিষ্ট ধ্যানের মূর্তি। [ক্রমশঃ]

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১৩ দ্রষ্টব্য: কবিমানসী-১, পৃ° ১৪১-৪৬।
১৪ তদেব। পৃ° ৪৮০।
১৫ তদেব।
১৬ তদেব। পৃ° ২১৭।
১৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, পৃ° ৬২৬।
১৮ তদেব। পৃ° ৪৮-৪৯।
১৯ তদেব। পৃ° ১০৪।
২০ চিঠিপত্র-৫, পৃ° ১৩২-৩৩।
২১ বিদায়, ছবি ও গান: রচনাবলী-১, পৃ° ১২১।
২২ তদেব।
২৩ দ্রষ্টব্য, 'পূরবী'র "আহ্বান" কবিতা।

ফুরোনো যুগের কাহিনী

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশ শো সাতচল্লিশের জুলাই।

পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় ক্যাম্প থেকে একজন বাঙালী সৈনিক তিন মাসের লম্বা ছুটি পেয়ে যাত্রা করলেন কলকাতার উদ্দেশে। দানাপুর প্যাসেঞ্জার তাঁকে এবং অগণিতকে কোলে তুলে পানাগড় পরিত্যাগ করল বর্ধমান-ব্যাণ্ডেল হয়ে হাওড়া অবধি পাড়ি জমাতে।

বাষ্পশকট ছুটে চলল।

সৈনিক ভাবতে লাগলেন, রাঢ় নামে সোনার বাংলার অংশবিশেষ; রুক্ষ রাঢ়দেশে বঙ্গমাতৃকার ভৈরবীবেশ; তবু রাঢ়ভূমিই হবে সর্বরিক্ত বঙ্গসন্তার ভাবী দিবসের উপনিবেশ। বামুন-মৌলভী-পাদ্রীর আক্রমণের ফলে চন্দ্রকেতুর পতনের, লক্ষ্মণসেনের পরাজয়, সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে থাকবে চিরন্তনের বঙ্গ-আত্মা রাঢ়বঙ্গের পুণ্য মাটিতে। অজয় বঙ্গজাতির অমরত্ব ঘোষণা করছে; রূপনারায়ণ জপ করছে বঙ্গজীবনের মৃত্যুঞ্জয়ের ধ্রুমন্ত্র!

রেলগাড়ি চলতে লাগল।

সৈনিক এলেন কলকাতায়, এক বন্ধুর বাড়িতে জনৈকা তরুণী তাঁকে দেখেশুনে মুগ্ধ হলেন, যুবতীকে চিনেজেনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন; উভয়ের মনে দোলা লাগল।

পরিচয় প্রীতিতে পরিণত হল। প্রীতি পূর্ণতা পেল প্রেমে। নারী ভাবলেন, খুঁজে পেলাম খুশীর উপনিবেশ। নর ভাবতে লাগলেন পৌঁছে গেলাম সবপেয়েছির দেশে।

একের প্রাণের প্রাঙ্গণে অপরে এসে গেলেন প্রণয়ের মাতাল উল্লাসে। পরিচিতা দিতে লাগলেন প্রিয়তমকে মানসিক তথা ব্যবহারিক অপার আনন্দের অঢেল আমেজ।

পনেরোই আগস্ট ভারতের মানচিত্র পরিবর্তিত হল। পদ্মার তীর ও সিন্ধুর সৈকত বিদেশ হয়ে গেল ভারত-[illegible]। বাংলা আর পাঞ্জাব অঙ্গকে খণ্ডিত এবং হৃদয়কে রক্তক্ষরা করে আহুতি দিল পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ মানুষের মঙ্গলকল্পে।

যুগলে চললেন শ্যামা পূর্ববঙ্গের একটা গাঁয়ে শিয়ালদা থেকে সফর শুরু হল। যাত্রীদ্বয়কে নিয়ে যন্ত্রদানব ছুটল। সকল দৃঢ়চেতার বৃহৎ জীবনের বাইরে এক গোপন দিক থাকে, সে দিগন্তে সুমহান আদর্শবাদেও কামনা করেন এককের অনুপ্রেরণা; সে নিভৃত বাসনা আজ উথলে উঠল আত্মভোলার মনে। সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে কল্পনার জাল বুনতে লাগলেন। আকুল অন্তরে গাইলেন—

'আমরা ভুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে···'

পৌঁছলেন খুলনা স্টেশনে, উঠলেন গিয়ে স্টীমারে শ্যামলী পূর্ব-বাংলার অন্তস্তলে প্রবেশ করতে। জাহাজ ত্যাগ করল জেটি। পূর্ণিমার চাঁদ নাচে পুলকে আকাশে। ভৈরবের বারিধারা বিরাট ব্যথায় গগনের চন্দ্রকে বলছে, কলঙ্কী শশী; সুদূরের তুমি মান-অপমানের অতীত, তাই বুঝি নেশায় মেতেছ; আমি তাই আজকে তোমার হাসিখুশীর খেলায় যোগ দিতে অক্ষম। সময়ের শাপে বিঘ্ন এসেছে, এমন দুঃখ কখনও পাই নি। আমার বুকে ভেসেছে প্রতাপাদিত্যের নৌবহর, আমারই বক্ষে সাঁতার কেটেছে সীতারাম রায়ের রণবাহিনী। বঞ্চিত হলাম দাদা দামোদরের আদর হতে। আবার কবে বীর প্রতাপ ও বাহাদুর সীতারাম নবজন্মে ফিরে আসবে এহেন দুর্দৈব দূরীভূত করতে?

ভৈরবের বিপুল বেদনা বিলেতি কোম্পানীর স্টীমার আদৌ অনুভব করছে না, যদিও তাদের দেখা হয় প্রত্যহ; যেমন উপলব্ধি করতে পারেন নি ইংরেজ বিচারক সিরিল র‍্যাডক্লিফ। তাই তো কশাইয়ের মত কাটারি চালিয়ে বঙ্গভূমিকে বিকলাঙ্গ করলেন মহৎ সত্তাকে বিনাশের জন্য।

জাহাজ ভৈরবের বারিরাশি পেরিয়ে চলল মধুমতীর

হ্মালা ডিঙিয়ে। চাঁদের আলোর মেলায় পূর্ব কেস্তানের সে কী প্রাণমাতানো রূপ! কেবিনের নে দাঁড়িয়ে কপোত আর কপোতী সানন্দে উপভোগ তে লাগলেন সাধের মধুযামিনীকে। জ্যোৎস্নাভরা িমের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি দিয়ে সহযাত্রিণী জীবনানন্দে বলেন, তিনিও বোধ হয় নভোচারী সুন্দরী একটি একা। আবেগ ভরে গেয়ে উঠলেন, 'সোনার বাংলা গো তোমায় ভালবাসি...'

সে গান গাও, যে সংগীতে জার্মানের স্বদেশপ্রীতি ; দিমের স্বধর্মপ্রেম প্রতিভাত হবে প্রত্যেক বঙ্গদুলালের হৃদয়ে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ধন্য বঙ্গসন্তান পণ্য হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা-র এবং প্রাদেশিকতাপন্থী হাটে। তাই সব বঙ্গতনয়কে নতে হবে বঙ্গমাটির সঙ্গে কিসের শাশ্বত সম্পর্ক!

কোন্ সম্বন্ধ নিত্যযুগের?

সৈনিকের চোখ গাঢ় হল, গূঢ় হয়ে উঠল। পরিচিতা নয়নে খানিক আগে দেখেছিলেন চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, সে চোখেই এখন দেখতে লাগলেন সূর্যের বহ্নিশিখা ; করের মুঠি বদ্ধ হল, নজর বহু দূরে নিবদ্ধ হয়ে গেল ; র দিকে তাকিয়ে তরুণী বিচলিতা হলেন। ভাববিহ্বল স্তুতি আরম্ভ করলেন:

জানি গো তোমারে বঙ্গজননী অনন্তকাল ধরি,
প্রতি যুগে আমি পুণ্য ধন্য তোমায় প্রণাম করি।
আমিই পূজারী প্রতিমা তোমার
ফাঁসির মঞ্চে নন্দকুমার
আমি ক্ষুদিরাম, আমি গো কানাই, আমি প্রফুল্লচাকী
আমারি শোণিতে তোমার ললাটে তিলক দিয়াছি আঁকি।
আমি যে আমার পরম প্রকাশ
কালজয়ী বীর নেতাজী সুভাষ
আমারি রুধিরে তোমার পতাকা রাঙায়ে তুলিয়া ধরি,
প্রতি যুগে আমি পুণ্য ধন্য তোমায় প্রণাম করি।

ভীতা ভাবতে লাগলেন, প্রিয়ার প্রেম বা মায়ের মমতা এ সব পুরুষের চলার পথে বাধার প্রাচীর তুলতে পারে না। এই প্রকৃতির সঙ্গে ভাব করা যায়, ঘর করা অসম্ভব। এঁরা আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস অথবা বাত্যাক্ষুব্ধ আটলান্টিক। সাধারণের অনুধাবনের অনেক ব্যবধানে আবাস। ব্যষ্টিকে করেন উপকার, করে যান সর্বনাশ এক-একটা ব্যক্তির।

যুবক এক মনে অনুসন্ধান করছিলেন অনাগত লীলা-ময়কে। ভারি গলায় বললেন, দি লিডার উইল শেক দি ডিসঅর্ডারস্ ; অল গেট রেডি টু ওয়েলকাম হিম।

শঙ্কিতা বলে ফেললেন, ব্রত ভুলে যাও ; একান্ত ভাবে আমার হও। তোমাকে পুরোপুরি পেতে চাই।

নির্ভীক বলতে লাগলেন, সামরিক পরাজয়ের পরে জীবন্ত জাতি সাংস্কৃতিক বিজয় ঘটায়। প্রাণবন্ত সমাজের সেনানীদের যেখানে শেষ, সাধকগণের সেখানে শুরু। চন্দ্রবর্মার পরাভবেই মীননাথের প্রস্তুতি। পুনরায় এশিয়া-পূজায় বঙ্গচিত্ত ফিরিয়ে আনুক চন্দ্রগোমিন, শীলভদ্র, শান্তি রক্ষিতের অমূল্য আমল বঙ্গদেশের ; অভিনব অধ্যায় বঙ্গআত্মার।

স্টীমার গভীর রাত্রিতে ভেঁপু হেঁকে ভাসতে লাগল মধুমতীর উদ্দাম স্রোতে। শীতল হাওয়ায় ডেকের ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে প্রেমিক চিন্তামগ্ন। প্রিয়া লেবুর শরবৎ তৈরি করে গ্লাস এগিয়ে দিলেন। দুজনে নির্বাক। মৌনতা ভেঙে যুবতী বললেন, বেশ রাত হয়েছে, এবারে ঘুমোতে চল।

উত্তর দিলেন, আরও কিছুক্ষণ দেখব ভূমিদেবীকে। বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হয়ো না, কোনই অসুখ-বিসুখ হবে না—আমি এভরিথিং ফ্রেশ।

কাটল কয়েক ঘণ্টা। তরুণ এসে দাঁড়ালেন রেলিঙে হেলান দিয়ে। উজ্জ্বল শশী ও উচ্ছল মধুমতী ধমনীতে যেন সাড়া জাগাল নিশির শেষযামে। নয়নের জলে, হৃদয়ের যাতনায় বললেন, মা গো! আমাকে ইতিহাস ফিরিয়ে দাও। তরুণী শয্যায় ছটফট করছিলেন, উঠে গেলেন বাইরে, জিজ্ঞেস করলেন, এখনও কী তুমি দেখছ?

দেখছি চিরন্তনের বঙ্গজননীকে!

কথাবার্তা সমস্ত খেয়ালিপূর্ণ।

খালি আমি খেয়ালি নই, প্রত্যেকে খামখেয়ালি। বিবিধ খেয়ালকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সৃষ্টির কাহিনী। বিভিন্ন খামখেয়ালকে অবলম্বন করেই মনী-

লেবক রচনা করেছেন মানবের শোক আর সান্ত্বনা; অসি-উপাসক নির্মাণ করে গেছেন মানুষের জয় এবং পরাজয়। ভুবন-হেয়ালিতে ভরপুর।

চালচলন আপত্তিজনক। তুমি অনিয়ম। তোমার সঙ্গে পর্যটন আগামীতে নিশ্চয়ই আমার পরিতাপের কারণ হবে।

একটি টিকটিকি তিনবার টিকটিক করে উঠল। মিলিত পরিভ্রমণ শেষ পর্যন্ত সত্যিই ধাবিত হয়েছিল একেবারে উল্টোদিকে।

সৈনিক এলেন পিত্রালয়ে পরিচিতাকে নিয়ে। স্বগ্রামকে নতুন ভঙ্গীতে দেখলেন। কালীতলায় সন্ধ্যাদীপ জলে—বামুন ভবেশ ভট্টাচার্যের হাতে নয়, শূদ্র সুবল সিকদারের হস্তে। হাই স্কুল চলছে, হেড-মাস্টার সুবোধ মিত্র নেই; পদ পূরণ করেছেন সুলতান মিঞা। বিদ্বান কায়স্থ গোবিন্দ গুহের কন্যা গায়ত্রী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নন, স্থান সংগ্রহ করেছেন বিত্তবান নমঃশূদ্র মাধব মণ্ডলের দুহিতা মধুমিতা। পল্লীর মোড়লি জমিদার বোস-মুখুজ্জেরা করেন না, করছেন উকীল সুলেমান চৌধুরী। বিনয় বসুর পাঁচমহলা, মদন মুখোপাধ্যায়ের নাটমন্দির পড়ে রয়েছে; কিন্তু সাতপুরুষের সম্ভ্রান্তগণ সপরিবারে ছুটেছেন বাঁকুড়া-বীরভূম-বর্ধমানের ম্যালেরিয়া বিনাশ করতে।

পূর্ববঙ্গের হিন্দু নেতৃকুল কলকাতায় গঙ্গাযাত্রায় ছুটেছেন। এ গাঁয়ের শচীন সেনের মতন কংগ্রেস-কর্মী, যার আহার জুটত দশের দয়ায়—সেও পশ্চিমবঙ্গে পালিয়েছে। দলগত সুযোগে জাতীয়বঙ্গের বিধানসভায় যোগদানের ইচ্ছা আছে। তাই যে বুঝি মেদনীপুর-মুর্শিদাবাদের কোথাও প্রচুর নীতিবাক্য প্রচার করছে।

এক সকালে বেড়াতে বেরোলেন যুবক। শূদ্রপাড়ায় সাক্ষাৎ হল পাঠশালার পণ্ডিত সুদর্শন সমাদ্দারের সঙ্গে। তিনি বললেন, ভদ্রলোকদের দেখাই মেলে না। কেন, গ্রামের পাট তুলে দিচ্ছেন? মন কাঁদে যখনই শূন্য গৃহগুলির উদ্দেশে দৃষ্টি মেলি; মুখের ভাষায় বোঝাতে পারব না কত শান্তি আজ পেলাম আপনার দর্শন পেয়ে।

অভাবে সৈনিক বলতে লাগলেন, বর্ণপ্রধানগণ এসে-ছিলেন কনৌজ থেকে। অতীতে প্রয়োজনে বঙ্গমাটিতে পৌঁছেছিলেন; আজকে দরকারেই দেশত্যাগী হচ্ছেন। বঙ্গভূমির প্রতি সুবিধাভোগীদের কিছুমাত্র অনুরাগ নেই; রয়েছে কেবল স্বার্থসিদ্ধির অসৎ আগ্রহ।

কত না শতক বাংলায় বসবাস করে সম্পূর্ণ বাঙালীত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই তো বঙ্গসভ্যতায় অনবদ্য অবদান। শ্রীরামকৃষ্ণের মাধুর্যে দিয়েছেন সূক্ষ্মজগতের সমাচার, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে শিখিয়েছেন জাতীয়তা-বোধ, কবি রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বে করেছেন ভুবনবরেণ্য।

উপকারের তুলনায় অপকার হয়েছে অধিক। কান্যকুব্জ অভিমুখীরা বঙ্গপ্রাণকে তিলে-তিলে মেরে ফেলেছেন, বঙ্গজীবনকে আর্যাবর্তের অধীনতায় আনয়নের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রাহ্মণ্যপ্রথা; হাজার বছর বঙ্গদেশে কাটিয়ে দিয়ে আজিও ধ্যানে-ধারণায় একদম বহিরাগত।

শ্রীচৈতন্যই সাম্যহীন বর্ণব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে গণসমাজ গঠনে প্রচেষ্ট হয়েছিলেন।

মহাপ্রভুর পুণ্যপ্রয়াস বামুন বৃত্তির অভিব্যক্তি নয়, বঙ্গসত্তার শুভবুদ্ধির ধন্য জাগরণ।

আলাপে ছেদ পড়ল; মধুমিতাদেবী এসে পণ্ডিত মশাইকে ডাকলেন, আসুন, চণ্ডীপাঠের সময় হয়েছে।

যুবক প্রশ্ন করলেন, পল্লীতে পাঠ হবে নাকি?

মধুমিতা উত্তর দিলেন, বঙ্গবিভাগের তারিখ থেকে প্রতিদিন হচ্ছে।

তরুণ উৎসাহিত হয়ে বললেন, বঙ্গলক্ষ্মীর ভগ্নমূর্তির নিমিত্ত এমন পরম আক্ষেপ অন্যত্র কোথাও দেখি নি।

আমাদের চণ্ডীপাঠ শুনবেন?

অবশ্যই শুনব; আমি কৃতার্থ হব।

তিনজনে পৌঁছলেন মাধববাবুর বাড়িতে। সেখানে শতাধিক স্ত্রী-পুরুষ সমবেত ছিলেন। সুদর্শন সমাদ্দার পাঠ আরম্ভ করলেন—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা...'

পণ্ডিত মশাইয়ের চণ্ডীপাঠে কত একাগ্রতা ও কত না বিশুদ্ধতা। ভঙ্গবঙ্গে প্রকৃত পাঠ আজই প্রথম সম্ভব হল একজন ব্রাহ্মণ যা পারেন নি, জনৈক নমঃশূদ্র তা সম্পাদন করলেন; বঙ্গ-অঙ্গনে ব্রহ্মময়ীর বোধন বোধ হয় বাজল।

যুবক চললেন পৈতৃক ভিটাতে। রাস্তায় হাঁটে

.. বলতে লাগলেন, শক্তিঅর্চনা আবার আসুক ..: আসুন বঙ্গ-অন্তরে সর্বজয়া মহেশ্বরী। নবীন ..ের ঋত্বিক হিসেবে উদয় চাই কোন একজন তথা-.. শূদ্রপুত্রের।

এক দুপুরে গাঁয়ের ডাকঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ..েখছিলেন দেওয়ালে টাঙানো দ্বিখণ্ডিত বাংলা-..র ম্যাপখানি। বাধা পড়ল মধুস্মিতাদেবীর আগমনে। ..সে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তন্ময় হয়ে কি অত ..ছেন?

জবাব দিলেন, দেখছিলাম ঢাকা আর কলকাতার ..।

এই কৃত্রিম ব্যবধান দীর্ঘস্থায়ী হলে চরম সংকট ..েছে।

দুর্যোগ আগেও এসেছিল। সমুদ্রগুপ্ত-বখ্‌তিয়ার-..ভ বঙ্গ-ইতিহাসে সাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করে ..াগরে ডুবে মরেছে।

বঙ্গপ্রাণের ভিত্তি ভেঙেছে, বঙ্গজাতিকে শোণিতে .. সংস্কৃতিতে বর্ণসংকর করেছে; সম্পূর্ণভাবে বঙ্গ-..কে পরকীয়া বানিয়েছে।

..বু অগণিত গুণী-জ্ঞানী যে বঙ্গজীবনের মহাসৌধ ..ছে, সে বঙ্গস্বভাব অমর-অক্ষয়; আজকের প্রচণ্ড ..কেও বঙ্গপ্রকৃতি জয় করবেই ত্যাগে-তপস্যায়।

আপনি অত্যন্ত চমৎকার।

আপনার আন্তরিকতাকে অশেষ ধন্যবাদ।

রওনা হলেন নিজের কাজে। সড়কে চলতে চলতে .. বললেন, ভূগোলে লেখা স্থানের নামগুলো কৈশোরে ..ণে থাকে নি। শিক্ষকের বেতের ডগায় শিহরিত ..টলাসের বিবিধ জায়গার বিন্দুমালা; অশ্রুতে ঝাপসা করসমূহ তখন দেখেও দেখি নি। আজ মানচিত্র ..ুখে রেখে নির্ভুল বলতে পারব—এখান থেকে এখানে ..মার বাংলা ছিল। বিশাল বঙ্গভূমিকে বিভিন্ন ফ্রেমে ..টবার পরে, হায় রে, অবস্থা হয়েছে আজকে ব্যঙ্গছবির ..ম। বিক্ষুব্ধ মনের মণিকোঠায় লাঞ্ছিত বঙ্গআত্মার ..র্তনাদ!

এক বিকেলে গ্রামের প্রাচীন বটগাছের নীচে বসে ..কাশ-পাতাল ভাবছিলেন যুবক। আত্মস্থতা ভাঙল পল্লীর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আন্দামান-ফেরত বিপ্লবী স্বরাজ রায়ের উপস্থিতিতে। তিনি প্রশ্ন করলেন, হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং সোলজার।

উত্তর দিলেন, আই অ্যাম থিঙ্কিং হাউ টু থিঙ্ক।

অতলে ডুবছে বঙ্গবাসীর প্রাণমণ্ডপ, এখন খালি ভাবলে চলবে না।

চিন্তা আনে কর্ম। লেখক শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী 'সব্যসাচী'র স্বপ্ননায়ক সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সত্য হয়।

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মতে আদর্শরাষ্ট্র কাকে বলে?

জবাব দিলেন, যে দেশে শাসকদল জনতার স্বার্থ ও সুবিধাকে শুধু কথায় আর কাগজে সীমাবদ্ধ রাখে না; যে সমাজে সামান্যতম ব্যক্তি পর্যন্ত খাদ্য এবং বস্ত্রের মৌলিক প্রয়োজন থেকে প্রতারিত নয়; সেই হচ্ছে আমার অভিমতে সার্থক সরকার। একে বিবেকানন্দের 'শূদ্ররাজ' বলতে পারেন, অরবিন্দের 'ধর্মরাজ্য' বুঝতে পারেন; মহামানবের নির্দেশিত পথ মহৎ; কিন্তু ভণ্ডের নীতিবাদ অর্থহীন। ঠিক যেমন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব্যাখ্যা যে বঙ্গদুলাল জানে না, সেই বঙ্গসন্তান শতদ্রু-ইয়াঙ্‌-সিকিয়াঙের বিশ্লেষণ খোঁজে কোন্ যুক্তিতে! বঙ্গনন্দনকে শিখতে হবে আত্মোন্নতি বিশ্বোন্নতির সহায়ক হবার প্রধান শর্ত; প্রথম সোপান। বিষয়ের ধারা বদলে বললেন, চলুন, ফেরা যাক। রাত বাড়ছে।

রাত্রি বেড়েই চলেছে। বঙ্গজনের অভিশপ্ত অমারজনী কবে শেষ হবে!

বঙ্গজাতির জীবনগঙ্গায় পুনরায় জোয়ার আসবে। আমি আশায় অভিভূত আছি। আপনিও বিশ্বাসের অনুভূতি আনুন।

বক্তব্যকে সরল কর।

বৈষ্ণবমার্গে ভগবান চৈতন্য বঙ্গবনকে বৃন্দাবন দেখিয়েছেন, তন্ত্রসিদ্ধিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বঙ্গপ্রাণকে বারাণসী দেখালেন; জনৈক যুগদেবতা শৈবপন্থায় বাঙালী জাতিকে কৈলাসধাম দেখাবেন।

ভাবপাগল চললেন আপন গৃহে। থমকে দাঁড়ালেন সুবল সিকদারের কুটিরের সামনে, কালীতলার সেবাইত গাইছিল—'দয়াল তোমার নয়ালীলায় আসিতে হবে⋯'

ভক্তের কীর্তন শুনে ভাবলেন এ হেন আহ্বানই ঘটাবে অবতারের আবির্ভাব পদ্মা-মেঘনা-কর্ণফুলীর কূলে।

সৈনিকের পাকিস্তানী জীবন ফুরলো। ছুটি কাটিয়ে পরিচিতাকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন হিন্দুস্থানে। তাঁকে কলকাতায় রেখে এসে পৌঁছলেন পানাগড়ে। পুনর্বার জয়েন করলেন কঠিন গন্ডময় মিলিটারি পরিবেশে।

কেটে যায় দিন। সুখস্মৃতি হল বিলীন। ক্ষণিকা বেছে নিলেন বিচ্ছেদ। বেপরোয়া এগিয়ে চললেন আগামীর দিকে মনোসাধকে প্রাণসত্যে উন্নীত করতে।

বন্ধাবিহীন স্বেচ্ছায় যাত্রা করলেন কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রে। বান্ধবেরা বলতে লাগলেন, জাতীয়বঙ্গের স্বকীয় জলবায়ু বর্জন করে বিপদসঙ্কুল জম্মু-কাশ্মীরে ছোটবার কী দরকার ছিল?

উত্তর দিলেন, পানাগড়ের শিষ্ট আবহাওয়া মোটে লোভনীয় নয়; আমাকে সমধিক আবিষ্কারের সুযোগ পাব রাইফেল কাঁধে দুলিয়ে বরফ-ঘেরা কাশ্মীরের অগম্য গিরিকন্দরে। সামরিক জীবনের সে উন্মাদনা থেকে বঞ্চিত হতে প্রলুব্ধ করবেন না। বন্দেমাতরম্।

অমৃতসরের উদ্দেশে ট্রেন ছাড়ল।

তিনি ভাবতে লাগলেন, জম্মু কাশ্মীরের বর্বর অসুরের অত্যাচারে স্বর্গ আজ শঙ্কিত, নরলোকের রাজা দুষ্মন্তের নিকট তাই যে সংকটের মুহূর্তে সাহায্য প্রার্থনা স্বেচ্ছাসেবক, তুমি বুঝি ভারতপতি দুষ্মন্তের একান্ত অনুগত অনুচর; তাই তো বোধ হয় আজকে বিপন্ন বান্ধব! তুমিই লড়েছ চিরদিবসের নওজওয়ান পানিপথ হলদিঘাটে।

রেলগাড়ি চলতে লাগল।

উনিশ শো সাতচল্লিশের ডিসেম্বর।

অপূর্ব স্বাধীনতা

সাবিত্রী দত্ত

আমরা স্বাধীন জাতি,
খাওয়া-পরা যত ছোট কথা লয়ে
করি নাকো মাতামাতি।
বড় বড় কথা বড় চিন্তায়,
ঝঞ্ঝার বেগে দিন চলে যায়,
সমাধান তরে রুদ্ধ দুয়ারে জাগি মোরা সারারাতি।
পদভরে চলি মেদিনী কাঁপায়ে ফুলায়ে বুকের ছাতি।
আমরা স্বাধীন জাতি।

দধীচি দানিল কিবা?
সহস্র প্রাণ বলি দিয়ে মোরা করি অপরের সেবা।
ক্ষুধার অন্ন জুগাতে না পেরে,
গোটা পরিবার রাখি অনাহারে.
শত শত তরী শস্যে পূর্ণ করি সারা নিশি দিবা—
রপ্তানি করি বিদেশে তাহারে, মোরা বাহাদুর কিবা।

স্বাধীন হয়েছি মোরা।
বস্ত্র বিহনে জাতিভেদ ভুলে ধরেছি পাজামা পরা।

এটুকু যদি না মেলে কোনদিন—
কৌপীনধারী রব চিরদিন।
উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিব কাঁপিয়া উঠিবে ধরা—
স্বাধীন হয়েছি মোরা।

আমরা নির্বিকার—
অন্ন, বস্ত্র, বেকার জীবন পরোয়া করি না তার।
মুক্ত করেছি মৃত্তিকা মারে,
মানুষ মা যদি মরে অনাহারে
ক্ষতি তাতে কিবা কার?
শিরে করভার, গৃহে অনাহার, আমরা নির্বিকার।

আমরা স্বাধীন জাত,
অভাবের লাগি মরে যদি সব করি নাকো দৃকপাত।
মানুষ কে কবে হয়েছে অমর,
একদিন সে তো যাবে যমঘর,
দুদিন আগেতে গেলে কিবা দোষ, হব না আমরা ব
সে মহাশ্মশানে গরজি বলিব আমরা স্বাধীন জাত।

অদ্য শেষ রজনী

হরিপদ বসু

চরিত্রলিপি

ভবশঙ্কর……রিটায়ার্ড ভদ্রলোক।

রাখাল… ঐ ভৃত্য।

বরেন… ঐ পরিচিত যুবক।

হেমাঙ্গিনী… ঐ বিদুষী স্ত্রী।

শোভনা……হেমাঙ্গিনীর পরিচিতা যুবতী।

প্রথম দৃশ্য

দ্বিতলে ভবশঙ্করের বসিবার ঘর।

[ে উঠিতে দেখা যায় ঘরে কেহ নাই। একটু পরে বেশ করেন ভবশঙ্কর। বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে। চুলে শ পাক ধরিয়াছে, গায়ে গলাবন্ধ কোট, চোখে কালো টা ফ্রেমের চশমা।

বাহির হইতে ঘরে ঢুকিয়া তিনি আলো জ্বালেন। তরে ও বাহিরের দরজায় বড় বড় করিয়া লেখা দুইটি র্ড ঝুলিতেছে। উহাতে লেখা আছে "অদ্য শেষ জনী"। ওই লেখাটির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া বেশ একটা চাপা র্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ভবশঙ্কর ভিতরে চলিয়া যান। খানিক রে বাহির হইতে আসেন তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী, তিনিও খাগুলির উপর তাকাইয়া ভিতরে প্রস্থান করেন।

কয়েক মিনিট আবার জনশূন্য গৃহ। এবারে সেই একই বেশে আসেন ভবশঙ্কর, হাতে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা। ঙ্গে ভৃত্য রাখাল, তামাকের গড়গড়া তার হাতে।

আরামকেদারায় বসিয়া হাতের বইখানা খুলিয়া ভবশঙ্কর আবৃত্তি করিতে থাকেন।]

ভবশঙ্কর। "নহ মাতা নহ কন্যা

নহ বধূ সুন্দরী রূপসী

হে নন্দনবাসিনী উর্বশী"

রাখাল। তামাক খান বাবু—

ভবশঙ্কর। তামাক! তা দে, আজকের রাতটাও যাই, কাল থেকে এ তামাকও বন্ধ করে দিতে হবে।

রাখাল। কেন বাবু?

ভবশঙ্কর। অনেক খরচ রে, অনেক খরচ। তবে কি ভাবছি জানিস, এত দিনের অভ্যেস—

রাখাল। বলছিলাম কি বাবু, তামাক যদি ছেড়েই দেন, না হয় তামাকের পাতা খান। তাতে বেশ মৌজ হয়, আর খরচাও খুব কম।

ভবশঙ্কর। কথাটা মন্দ বলিস নি, হিন্দুস্থানীরা খায় শুনেছি।

রাখাল। হিন্দুস্থানীরা কি বাবু, আজকাল অনেক আচ্ছা আচ্ছা বাঙালী বাবুরা পর্যন্ত খাচ্ছে।

ভবশঙ্কর। খাচ্ছে?

রাখাল। খাবে না তো কি করবে বাবু, যা দিনকাল পড়েছে! তার ওপর ওতে আবার দাঁতও নাকি খুব মজবুত থাকে।

ভবশঙ্কর। আমার আর দাঁত! দাঁত থাকতেও আর দাঁতের মর্যাদা বুঝলাম কই। ও দু পাটিই তো আমার বাঁধানো। যাক, ভেবে কিছু লাভ নেই। বেশ, ওই তামাক পাতাই এবার থেকে খাব।

রাখাল। হ্যাঁ বাবু, একটু চুন দিয়ে কিন্তু খাবেন।

ভবশঙ্কর। চুন!

রাখাল। বেশী নয় সামান্য, নইলে আবার মুখ পুড়ে যেতে পারে—

ভবশঙ্কর। পোড়া মুখ আর নতুন করে কি পুড়বে! ভাবছি কাল থেকে আবার দুজনেই একা। এতদিন তবু তোর গিন্নীমা আর আমি দুজনে রোজগার করেছি, সংসারটা বেশ ভাল ভাবেই চলে গেছে। কিন্তু কাল থেকে সবই আলাদা। তার ওপর অফিস থেকেও পেনসন দিয়ে দিলে। ওই কটা টাকায় খোকার পড়াশুনো, আমার নিজের খরচ—

রাখাল। কি যে অলুক্ষণে কাণ্ড আপনারা শুরু করেছেন। এ বয়সে আবার ওসব কেন?

ভবশঙ্কর। যুগের হাওয়া রাখাল, এ হচ্ছে যুগের হাওয়া। নইলে আজ সনাতন হিন্দুধর্মে এসব অনাচার

ঢুকবে কেন? তোরা গাঁয়ের মানুষ, সহজ সরল তোরা। আমাদের মত শিক্ষিত শহুরে তোতাপাখিদের কথা তোরা বুঝবি না।

রাখাল। তা যা বলেছেন বাবু—

ভবশঙ্কর। তবে তোর গিন্নীমার বেশ ভাল ভাবেই চলে যাবে। ও নিজেও ভাল রোজগার করছে। যার হাতে যাচ্ছে সেও শুনেছি মোটা টাকা মাইনে পায়।

রাখাল। (মাথা চুলকাইয়া) একটা কথা বলব বাবু?

ভবশঙ্কর। কি রে?

রাখাল। হয়তো ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে—

ভবশঙ্কর। না না, তুই বল্ না, তা ছাড়া তোকে আমি কোনদিনই এ বাড়ির চাকরের মত দেখি না—সে তো তুই জানিস।

রাখাল। তা আর জানি না বাবু, জানি বলেই তো বলছি। আচ্ছা বাবু, আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর গিন্নিমা যে বাবুকে বিয়ে করছেন, সে তো খুব ছেলেমানুষ বাবু! গিন্নিমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হবে—

ভবশঙ্কর। তবু এ বিয়ে হবেই রাখাল। তা ছাড়া আজকাল ও বয়সটয়সের বালাই একরকম উঠেই গেছে।

রাখাল। কালই কি আপনাদের ছাড়াছাড়ির রেজিস্টারি হচ্ছে বাবু?

ভবশঙ্কর। সেই রকমই তো কথা আছে। বাড়িওয়ালাকেও জানিয়ে দিয়েছি—কাল থেকে এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

রাখাল। কোথায় যাবেন ঠিক করলেন?

ভবশঙ্কর। বেলেঘাটার বস্তিতে দশ টাকায় একটা ঘর ঠিক করেছি। একা মানুষ, একভাবে চলে যাবেই। আর তোর মাইনেও কাল সব মিটিয়ে দেব, তুই না হয় দেশেই চলে যাস।

রাখাল। সে তো যেতেই হবে বাবু—আপনারা যখন আর রাখবেন না!

ভবশঙ্কর। কি করব বল্, পারলে ঠিকই রাখতাম। পেনসনের টাকা-কটায় নিজেরই চলা ভার। তবে হ্যাঁ, তোর গিন্নীমাকে একবার বলে দেখতে পারিস, ওরা তো

রাখাল। বলেছিলাম, ওরা নাকি লোক ঠিক করে ফেলেছে, তা ছাড়া বাঙালী চাকর ওরা রাখবে না।

ভবশঙ্কর। কেন?

রাখাল। তা জানি নে বাবু।

ভবশঙ্কর। সত্যিই তো, তুই কেমন করে জানবি? জানতেন শুধু রবীন্দ্রনাথ, আর তাই তিনি বিশ্বকবি হয়েছিলেন, তাই লিখতে পেরেছিলেন—

"নহ মাতা নহ কন্যা
নহ বধূ সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী"

[দ্বারে হেমাঙ্গিনী]

রাখাল। এর মানে কি বাবু?

ভবশঙ্কর। এর মানে—

হেমাঙ্গিনী। থাক্, একটা গেঁয়ো ভূতকে আর রবীন্দ্রনাথের মানে বোঝাতে হবে না।

ভবশঙ্কর। না না, এ কি বলছ, রবীন্দ্রনাথকে জানবার অধিকার আজ প্রতিটি মানুষের আছে। তা তো এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন—

"মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে—"

হেমাঙ্গিনী। খু-ব হয়েছে—অধিকারের চেয়ে অনধিকারচর্চা করাই তোমার চিরদিনের স্বভাব।

ভবশঙ্কর। তুমিও আজ এ কথা বললে গিন্নী!

হেমাঙ্গিনী। আঃ, আবার সেই গিন্নী, শুনতে যে [illegible] করে। হ্যাঁ রাখাল, তুই নীচে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর একটি মেয়ে আসবে আমার অফিসের—এলেই ওপরে নিয়ে আসবি।

[রাখাল প্রস্থানোদ্যত]

ভবশঙ্কর। আমার অফিস থেকেও একটি ছেলে আসবে—সে এলে আমায় খবর দিবি। (উঠিলেন)

[রাখালের প্রস্থান]

হেমাঙ্গিনী। আরও কটা বছর আগে যদি আমাদের এই ডিভোর্সটা হত—

ভবশঙ্কর। হলে ভালই হত।

হেমাঙ্গিনী। তার মানে?

ভবশঙ্কর। মানে—

হেমাঙ্গিনী। থাক, আর ঢোক গিলতে হবে না। ওর ভ্রূকুটির অর্থ আমি খুব বুঝি।

ভবশঙ্কর। বিশ্বাস কর, আমি ভেবে বলি নি।

হেমাঙ্গিনী। ভেবে বল নি, তবে বলে ভাবাতে চেয়েছিলে। বিশ বছর ঘর করলাম আর তোমাকে চিনি না? আমার পাত্র জুটে গেল তাই হিংসে হচ্ছে?

ভবশঙ্কর। হিংসে?

হেমাঙ্গিনী। চেষ্টা করলে তুমিও পাত্রী পেয়ে যাবে। এদেশে পাত্রীর অভাব নেই।

ভবশঙ্কর। না হেম, না, ও সাধ আর নেই।

হেমাঙ্গিনী। বৈরাগ্য?

ভবশঙ্কর। আমি কোনমতেই আজ আর এদেশের মেয়ের যোগ্য নই। তা ছাড়া আজকালের মেয়েরা কী চায়—সত্যি বোঝা শক্ত। বুঝেছিলেন একমাত্র রবি ঠাকুরই তো বলতে পেরেছিলেন, নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ—

হেমাঙ্গিনী। থামো। এদেশের মেয়েরা সব দেশের মেয়েদের চেয়ে স্পষ্ট। তারা চায় স্বামীর ফেম অ্যাণ্ড নেম।

ভবশঙ্কর। এ তো সীতা-সাবিত্রীর যুগের মেয়েদের কথা। এ যুগের মেয়েরা চায় টাকা—

হেমাঙ্গিনী। মিথ্যে কথা। এখনকার মেয়েরা টাকা রোজগার করতে জানে, কাজেই স্বামীর টাকা তারা চায় না। চায় স্বামীর নাম, যশ—

ভবশঙ্কর। সে চেষ্টাও কি আমি করি নি হেম?

হেমাঙ্গিনী। কি চেষ্টা করেছ শুনি?

ভবশঙ্কর। তোমার কথামত কাঁচা দাঁতগুলোকে পটাপট তুলে ফেলেছি গায়ক হব বলে। সিনেমার নায়ক হব বলে। মাথার চুলগুলো শ্যাম্পু করে করে আর গন্ধতেল মেখে অকালে পাকিয়েছি, এখন তাতে কলপ দিতে হচ্ছে।

হেমাঙ্গিনী। আর সেই কলপের কালিতে রোজই তো বিছানা ছাপাখানার মত হয়ে থাকে।

ভবশঙ্কর। এ সবই তো তোমার জন্যে হেম।

হেমাঙ্গিনী। আমি তোমাকে মানুষই করতে চেয়েছিলাম।

ভবশঙ্কর। পারলে না তো?

হেমাঙ্গিনী। পারলে আজ আর এ ডিভোর্সের প্রশ্নই আসত না। গান শিখতে গেলে, তোমার গলার আওয়াজে পাড়ার লোকে নোটিস দিল, সিনেমার হিরো হতে গিয়ে সেখানেও ওই অবস্থা।

ভবশঙ্কর। কেন, সিনেমায় তো আমি অভিনয় করেছিলাম।

হেমাঙ্গিনী। তা করেছিলে, আর সে এমনই করেছিলে যে, পরিচালক তোমার অংশটুকু ছবি থেকে কেটে বাদ দিলে। হবে না, হবে না, তোমাদের মত ডেড ম্যানদের দ্বারা আজকের জগতের কোন ফাইন আর্টের কিছু হবে না।

ভবশঙ্কর। কেন হেম?

হেমাঙ্গিনী। তোমরা সব পুরুষই, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষকার নেই। যাদের আছে, তাদের দেখ, তারা কী না করছে! আকাশে উঠছে, পর্বতে চড়ছে, সাঁতরে বড় বড় সমুদ্র পার হচ্ছে, চন্দ্রলোকে যাচ্ছে, স্বর্গলোকে যাচ্ছে, মাইকেলের অমৃতাক্ষর ছন্দের হিন্দি অনুবাদ করে জগৎকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। আর তুমি কিনা শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করে ক্ষেপে উঠেছ—যাঁকে সারা বাংলাদেশ ড্যান্স-ড্রামার কবি করে তুলেছে।

ভবশঙ্কর। না না, তা হবে কেন! রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুমুখী প্রতিভা—

হেমাঙ্গিনী। ও বড় কঠিন জিনিস। কাজেই বুদ্ধিমান বাঙালী গোটা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীটা প্রায় নৃত্যের তালে তালে চালিয়ে গেল।

ভবশঙ্কর। কথাটা একেবারে মিথ্যে বল নি। রবীন্দ্রনাথ এক জীবনে যা লিখে গেছেন একটা মানুষ তার সারা জীবনেও তা পড়ে শেষ করতে পারবে না।

হেমাঙ্গিনী। ওইখানেই তিনি মস্ত ভুল করে গেছেন। কিন্তু দেখ মাইকেলকে—

ভবশঙ্কর। হ্যাঁ, তুমি একটু আগে বলছিলে না, মাইকেলের কবিতার হিন্দি অনুবাদ? তুমি শুনেছ?

হেমাঙ্গিনী। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা। ও শুনতে হয় না—শোনায়। এতদিন রেডিওতে শুনেছি, কাগজে পড়েছি। কিন্তু যেদিন নিজের কানে সেই মহান স্রষ্টার কণ্ঠ থেকে

মাইকেলের কবিতার হিন্দি অনুবাদ শুনলাম, আমি মুগ্ধ হলাম, বিহ্বল হলাম। স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল।

ভবশঙ্কর। এই মহাপুরুষটি কে হেম?

হেমাঙ্গিনী। আমার ভাবী স্বামী। শুনবে, শুনবে তার সেই অনুবাদ কাব্যলহরী? হয়তো আজ মাইকেল বেঁচে থাকলে এ অনুবাদ শোনার পর বাংলায় আর কাব্য রচনা করতেন না।

ভবশঙ্কর। বড় অধীর হয়ে উঠছি, শোনাও হেম—

[হেমাঙ্গিনী তাহার বক্ষদেশ হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে থাকে]

হেমাঙ্গিনী। শোন—

আশাকো ধোঁকামে কিয়া ফল মিলা হায়
ও জীবনমে সোচ রাহা
জীবন প্রবাহ বয় কর কালসিন্ধুকা পাছ যাতা হ্যায়
উসকো কেইসা লটায়ে গা।

[ভবশঙ্কর চোখ বুজিয়া ছিলেন]

হেমাঙ্গিনী কেমন লাগল?

ভবশঙ্কর। সুন্দর! (আপনমনে আবৃত্তি করিতে থাকেন)

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে!

হেমাঙ্গিনী। চমৎকার!

ভবশঙ্কর। আমার আবৃত্তি তোমার ভাল লাগে হেম?

হেমাঙ্গিনী। বাট ইট ইজ টু লেট!

ভবশঙ্কর। কেন?

হেমাঙ্গিনী। তোমার আর কোন আশা নেই। আরও একটা সু-খবর শুনে রাখ, আমার ভাবী স্বামী শীগগিরই এই মাইকেলের কবিতার অনুবাদের জন্য ডক্টরেট পাচ্ছে।

ভবশঙ্কর। সবই তো হল, দীপঙ্করের কথাটা একবার ভেবে দেখলে পারতে—

হেমাঙ্গিনী। অসম্ভব। ওর দায়িত্ব এখন তোমার, আমার মিটে গেছে। তা ছাড়া হস্টেলে থেকে সে তো পড়াশুনা করছে, তোমার পেনসনের টাকায় তোমাদের ছুটো পেট ভালই চলে যাবে।

ভবশঙ্কর। কথাটা তা নয়, দীপুর লেখাপড়ার খরচ দিনদিনই বাড়বে। কিন্তু আমার পেনসনের টাকা তো আর বাড়বে না।

হেমাঙ্গিনী। কি দরকার ওকে অত লেখাপড়া শিখিয়ে, তা ছাড়া কি হবেই বা অত লেখাপড়া শিখে। একশো টাকা মাইনের একটা কেরানীগিরিও জুটবে না। তার চেয়ে হাতের কাজে লাগিয়ে দাও, ভবিষ্যৎ আছে।

[ভিতরে প্রস্থান]

[ভবশঙ্কর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আপন মনে বলিতে বলিতে ভিতরে প্রস্থান করেন]

আশাকো ধোঁকামে কিয়া ফল মিলা হায়
ও জীবনমে সোচ রাহা।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

[শোভনাকে লইয়া রাখালের প্রবেশ]

রাখাল। আপনি এখানে বসুন দিদিমণি, আমি গিন্নীমাকে খবর দিচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত)

শোভনা। শোন—

রাখাল। কিছু বলবেন দিদিমণি?

শোভনা। না—মানে, যে ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এল—

রাখাল। তা তো এলেন। আর আমি তো বাবুকে আসতেও বললাম।

শোভনা। বলছিলাম, কতক্ষণ ও ভাবে একা-একা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে?

রাখাল। তা একটু দাঁড়াতে হবে বইকি, ইচ্ছে করেই যখন এলেন না। দেখি, গিয়ে কর্তাবাবুকে বলি—

শোভনা। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কোন দরকারে এসেছেন। শেষ পর্যন্ত আবার চলে যাবে না তো?

রাখাল। দরকার থাকলে আর যাবে কি করে! যাই, গিন্নীমাকে আপনার খবরটা দিয়ে আসি।

[ভিতরে প্রস্থান]

[রাখাল চলিয়া গেলে শোভনা ক্ষিপ্তের মত পায়চারি

শোভনা। ছি ছি, হঠাৎ মনটা এত দুর্বল হয়ে গেল …ন? অতীত—সে তো আজ মরতে বসেছে। বর্তমান—ও ব্যর্থ হতে চলেছে। ভবিষ্যৎ—কোন প্রশ্নই আসে …তার।

[…রে বাহির হইতে বরেন আসিয়া দাঁড়ায়। দেখা যায় …াল দিয়া মাথার জল মুছিতেছে। সে গলা-খাঁকারি দিয়া উঠে]

শোভনা। কে?

বরেন। বাইরে খুব বৃষ্টি তাই—

শোভনা। তাই বুঝি আওয়াজ করে ঢুকতে হল? …ন, আমি কি বাঘ না ভাল্লুক?

বরেন। না না, তা কেন—

[কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব]

বরেন। বৃষ্টি বোধ হয় থেমে গেছে—

শোভনা। কেন, এখানে কি খুবই অসুবিধে হচ্ছে?

[রাখালের এক কাপ চা ও জলখাবার সহ প্রবেশ]

রাখাল। এই যা, আপনিও এসে গেছেন!

শোভনা। ইচ্ছে করে উনি আসেন নি, বৃষ্টি ওঁকে তাড়া করেছে।

বরেন। তুমি জান না, ঝড়বৃষ্টি আজ আমার কাছে কিছুই নয়। তোমার বাবু রিটায়ার্ড করবার সময় তাঁর অফিসে চাকরি করে দিয়ে আমায় চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। হ্যাঁ, ভবশঙ্করবাবু কোথায়?

রাখাল। আমি খবর দিচ্ছি, আর আপনার জলখাবারটাও নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান]

শোভনা। (বরেনকে অন্য দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া) না, আগে জানলে দেখছি একটু দেরি করে এলেই ভাল হত।

বরেন। অসুবিধে হলে, আমি বরং বাইরে গিয়েই অপেক্ষা করছি, বৃষ্টি এতক্ষণ নিশ্চয়ই থেমে গেছে।

শোভনা। জ্যোতিষবিদ্যার চর্চাও করা হয় দেখছি!

বরেন। জ্যোতিষবিদ্যা?

শোভনা। মিথ্যে চাকরটার সন্দেহের কারণ হয়ে লাভ কি?

বরেন। [illegible]

শোভনা। ও এসে যদি আমাকে একা দেখে, নিশ্চয়ই ভাববে, আমার জন্যেই চলে যাওয়া হয়েছে। তার চেয়ে দয়া করে এই চা আর খাবারটা খেয়ে নিলে বিশেষ বাধিত হব।

[চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট বরেনের সামনে রাখিল]

বরেন। কিন্তু ও তো আমার নয়—

শোভনা। নাই বা হল। বুঝেছি, এ জগতে আজ আমার সহজ হওয়াও বিপদের। আগে জানলে আসতাম না, কিছুতেই না।

বরেন। মিথ্যে এ রাগের কোন মানেই হয় না।

শোভনা। মিথ্যে! সত্যি আজ আমার সবটুকুই মিথ্যে হয়ে যেতে বসেছে। শুধু হেমাঙ্গিনী দিদির সঙ্গে এক অফিসে চাকরি করি, তাই অনেক দিনের অনুরোধ আজ আর কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারলুম না, কাজেই এখানে আসতে হল।

বরেন। হেমাঙ্গিনী দেবীকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে তো?

শোভনা। ধন্যবাদ?

বরেন। তিনি আজ যা করতে চলেছেন, নারীজীবনে তা আদর্শস্থানীয়।

শোভনা। বটেই তো।

বরেন। ঠিক সেই লেজ-কাটা শিয়ালের গল্পের মত। নিজের যখন কাটা গেছে আর কজনের ওই অবস্থা করতে না পারলে আর চলবে কি করে! কিন্তু হেমাঙ্গিনী দেবীর যে একটি ছেলে আছে সে কথাটা কি জানা আছে?

শোভনা। (চমকে ওঠে) ছেলে!

বরেন। ক্ষতি কি, তোমারও তো ছিল।

শোভনা। পুরুষ-মানুষগুলো সত্যিই কি নিষ্ঠুর! কি স্বার্থপর!

বরেন। তোমাদের চেয়েও?

শোভনা। হেমাঙ্গিনী দিদির ছেলে আছে, স্বামী আছে, সংসার আছে; এখনও—এই মুহূর্ত পর্যন্ত যেন সব ঠিক আছে। কিন্তু আমার? কি আছে, কি নিয়ে বেঁচে আছি আজ আমি?

বরেন। যা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলে।

শোভনা। (ক্ষিপ্তের মত) মিথ্যে, মিথ্যে—সব আমার জীবনে আজ প্রকাণ্ড মিথ্যে হয়ে উঠেছে।

বরেন। শোভনা—

শোভনা। ভুলের ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথতে গিয়েছিলাম। দুদিনে সে মালা শুকিয়ে ঝরে গেল। আঁস্তাকুড়ে গিয়ে মিশে গেল। কে তার খোঁজ নিল, কে তার হিসেব রাখল। ছেলেটা পর্যন্ত আজ আমার কাছে পর হয়ে গেছে।

বরেন। পর করে দিয়েছ বলেই—

শোভনা। না, তাকে পর করেছ তুমি।

বরেন। না, মায়ের লজ্জা ঢাকবার জন্যে সেই-ই তার পথ বেছে নিয়েছে।

শোভনা। তাই বুঝি আজকাল সে তোমাকেও তার বাপ বলে পরিচয় দেয় না?

বরেন। তাতেও তার সেই একই বিপদ—আমাকে বাপ বলে পরিচয় দিলে সেখানেও উঠবে তার মায়ের প্রশ্ন।

শোভনা। এখন বুঝতে পেরেছি। তাই সে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। আমায় দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কতদিন তার স্কুলের দরজায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেছি, একবার তাকিয়েও দেখে নি। নির্লজ্জের মত তবু ডেকেছি—ওরে, একবার আমার দিকে দেখ্, একবার মা বলে ডাক্। নাই-বা হলাম আমি তোর মা, নাই হলাম আমি কেউ তোর, তবু আয়, কাছে আয়—মা বলে ডাক্, আমার মা হওয়ার বাসনাকে সার্থক করে দে—অভাগিনীর ভিক্ষের ঝুলি ভরিয়ে দে খোকা, ভরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে আমার হারিয়ে যাওয়া মায়ের অধিকার।

[কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে]

বরেন। শোভা—

শোভনা। আমার সব অহঙ্কার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গো, সব গেছে!

বরেন। কেন, তোমার বর্তমান স্বামী?

শোভনা। তার সঙ্গে আজ আমার কোন সম্পর্ক নেই। তার নাম করতেও আমার ঘৃণা হয়। তবু—তবু সে আমায় রেহাই দেয় না। তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছ না, ভাবছ এ এক নতুন রূপকথা! রূপকথাই বটে—যার বিকৃত রূপ আজ আমার সারা অঙ্গে ফুটে উঠেছে। (বাহু দেখাইয়া) এই দেখ—

[জানলায় হেমাঙ্গিনী ও ভবশঙ্করকে দেখা যায়]

বরেন। এ দাগ কিসের?

শোভনা। চাবুকের—

বরেন। চাবুক!

শোভনা। হ্যাঁ, এ আমার প্রায়শ্চিত্তের নিদর্শন। সারাটা দেহ—সারাটা দেহ আজ আমার এমনি দাগে বিষিয়ে দিয়েছে। বিদেশী মানুষ, ও বাঙালী মেয়ের মর্যাদা বুঝবে কি করে? তাই আমার বর্তমান স্বামীর কথা উচ্চারণ করতেও লজ্জা করে। বল, চুপ করে থেকো না, তোমাকে ছেড়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ আমার সারা দেহে ফুটে উঠেছে। এখনও কি তুমি আমায় ক্ষমা করতে পার না?

বরেন। আর আমি শুনতে চাই না শোভনা, আর আমায় শুনিয়ো না।

শোভনা। শোনাতে যে আমাকে হবে, নইলে এমন পরম মুহূর্ত আর কি এ অভাগীর জীবনে আসবে?

বরেন। শোভা—

শোভনা। এ অপবিত্র দেহটা দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করি এমন স্পর্ধা আমার নেই, নইলে তোমার পায়ে মাথা দিয়ে বলতাম, তুমি আমায় বাঁচাও, তুমি আমায় উদ্ধার কর। একদিন অহল্যার মত পাতকীরও তো উদ্ধার হয়েছিল—বল, বল, আমার সে পথও কি বন্ধ?

বরেন। না, কোনদিনই না।

শোভনা। তবে, আমি কি করব?

[হেমাঙ্গিনী ও ভবশঙ্করের প্রবেশ]

ভবশঙ্কর। সনাতন হিন্দুধর্মে সব বিধানই আছে মা। মেয়েরা মায়ের জাত, তারা কোনদিনই অপবিত্র হতে পারে না। বরেন আমার ছেলের মত, সে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ; সে নিশ্চয়ই তোমায় গ্রহণ করবে। তুমি যে তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ ওতেই তোমার সব অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে, সমাধি হয়েছে সব অশুভের।

হেমাঙ্গিনী। তোমরা আমাদের বাঁচালে শোভনা। না জেনেশুনে কী ভুলই তোমাদের মত আমরা করতে চলেছিলাম!

ভবশঙ্কর। শুধু আমরাই কেন হেম। সারা দেশ আজ ওই ভুলের পেছনে ছুটছে। তবে এ ভুলের অবসান একদিন হবেই। যে দেশের মাটিতে বুদ্ধ, চৈতন্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশের হিন্দুধর্ম কোনদিন নষ্ট হতে পারে না। কোনদিনই না।

[বরেন ও শোভনা ভবশঙ্করকে প্রণাম করে]

[যবনিকা]

রম্যাণি বীক্ষ্য

উত্তর-ভারত পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

একুশ

আমার পাশে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে টাইম-টেবল দেখছিলেন। তাঁর দেখা শেষ হতেই আমি লুম: আমি একবার দেখতে পারি?

আমি ইংরেজীতে বলেছিলুম, তিনিও ইংরেজীতে উত্তর দিলেন: ও, নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক প্রবীণ, পুরু কাচের চশমাখানি সরিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর টাইম-টেবলখানি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন: এই লাইনের জন্যে ষোল নম্বর টেবল দেখুন।

ভদ্রলোকের কথার ভিতর একটা আন্তরিকতার র শুনলুম। এ যুগে কিছু চাইলেই লোকে বিরক্ত হয়, ধু চাঁদা বা সাহায্য নয়, দেশলাই বা টাইমটেবল ইলেও। ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজখানা কুড়িয়ে ড়তে গেলেও লোকে অবজ্ঞার চোখে তাকায়। ধন্যবাদ য়ে টাইমটেবলটি নেবার সময় তাঁর অন্য পাশে আরও য়েকখানি বই দেখলুম। উপরের বইখানা মলাট ওয়া বলে তার নাম পড়তে পারলুম না।

ষোল নম্বর টেবল ফৈজাবাদ লুপের। মোগলসরাই কে দুটো লাইন পশ্চিমে গেছে, একটা মির্জাপুরের র দিয়ে এলাহাবাদ-দিল্লীর দিকে। আর একটা রাণসী পর্যন্ত এসে আবার দু ভাগ হয়েছে। একটা ইন জঙ্ঘাই হয়ে লক্ষ্ণৌ গেছে। আর এই লাইন ক্ষ্ণৌ পৌঁছেছে ফৈজাবাদ হয়ে। ও লাইনে বড় স্টেশন াপগড় ও রায়বেরেলি। এ লাইনে জাফরাবাদ নপুর অযোধ্যা ফৈজাবাদ বরাবাঁকি। এলাহাবাদ ক জঙ্ঘাই হয়ে জৌনপুর ট্রেন আসে। আবার াপগড় হয়েও ফৈজাবাদ ট্রেন যায়। এলাহাবাদ থেকে রায়বেরেলি বা লক্ষ্ণৌ যাবারও সোজা রাস্তা আছে।

এ অঞ্চলে ছোট লাইনের ট্রেনও প্রায় সর্বত্র আছে। ছাপরা থেকে বারাণসী এলাহাবাদ, কাটিহার থেকে লক্ষ্ণৌ কানপুর আগ্রা। লক্ষ্ণৌ বেরেলি মোরাদাবাদ দিল্লী—কোথায় নেই। পাঞ্জাবের মত উত্তর-প্রদেশেও রেলগাড়ির অভাব নেই।

মোটামুটি সময়গুলো আমি দেখে নিলুম। বেলা প্রায় সোয়া বারোটায় জৌনপুর। স্টেশনে খাবার ব্যবস্থা আছে। অযোধ্যা বেলা তিনটেয়, তার পাশেই রাঁডগঞ্জ বা ফৈজাবাদ সিটি। ফৈজাবাদ জংসন পরের স্টেশন। এ সমস্তই চার মাইলের মধ্যে। ফৈজাবাদ বড় জংসন স্টেশন। আমিষ নিরামিষ খাদ্য ও চায়ের দোকান আছে। বরাবাঁকি সাড়ে পাঁচটায় ও সাড়ে ছটায় লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌয়ে আমাদের ট্রেন চল্লিশ মিনিট দাঁড়াবে। তারপর সাড়ে আটটায় বালামৌ, নৈমিষারণ্য এখান থেকে শাখা লাইনে ষোল মাইল। রাত নটায় হর্দৈতে খাবার ব্যবস্থা আছে, শাজাহানপুরেও ব্যবস্থা আছে সাড়ে দশটায়। তারপর ঘুম। বেরেলি আর মোরাদাবাদ ঘুমিয়ে কাটবে। হিমালয়ের পাদদেশে কোটদ্বার যেতে হলে নাজিরাবাদে নামতে হবে ভোর সাড়ে চারটের পর। সাড়ে পাঁচটার পর লক্সর জংসন। পাঞ্জাব মেল চলে রুড়কি সাহারাণপুর আম্বালা লুধিয়ানা জলন্ধরের উপর দিয়ে অমৃতসর যেত, আমাদের ট্রেন লক্সর থেকে উত্তরে হরিদ্বার হয়ে দেরাদুন যাবে।

নৈনিতাল রাণীক্ষেত ও আলমোড়া একই অঞ্চলের তিনটি সুন্দর শৈলাবাস। লক্ষ্ণৌ ও বেরেলি থেকে ছোট লাইনের

মোটরে যেতে হয়। মানসসরোবর ও কৈলাসের পথ আলমোড়া থেকে। কোটদ্বার থেকে কেদার-বদরীর পথ। হরিদ্বার হৃষীকেশ থেকে যে পথ গেছে, সেই পথ মিলেছে শ্রীনগরে। এ শ্রীনগর কাশ্মীরের শ্রীনগর নয়। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথও এই সব পথের সঙ্গে যুক্ত। বদরীনাথের পথ থেকেও মানসসরোবর ও কৈলাসে যাওয়া যায়। মসুরি একটি সুন্দর শৈলাবাস। দেরাদুন থেকে মোটরে যেতে হয়। এই অঞ্চলের চক্রাতায় আছে একটি সেনানিবাস।

আমরা সোজা হরিদ্বারে গিয়ে নামব। নৈনিতাল রাণীক্ষেত ও আলমোড়া আমাদের দেখা হবে না। হরিদ্বারেও আমরা বেশিদিন থাকব না। কাজেই হিমালয় দেখার সুযোগই আমাদের হবে না। হাতে প্রচুর পয়সা আর অপর্যাপ্ত সময় থাকলে মানস ও কৈলাস দর্শন করা যেত। কিংবা গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী আর কেদার-বদরীনাথ। বেশী নয়, অযোধ্যাই আমাদের দেখা হবে না।

আমি যখন টাইমটেবলটি বন্ধ করে ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিলুম, তিনি অন্য একখানা বই দেখছিলেন, চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কতদূর যাচ্ছেন?

সংক্ষেপে বললুম : হরিদ্বার।

তীর্থদর্শনে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামচন্দ্রের অযোধ্যা দেখবেন না?

হাতে সময় থাকলে নিশ্চয়ই দেখতুম।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ভাল করে কিছু দেখলেন ও বোঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন : সম্ভব হলে হরিদ্বারে একদিন কম থেকে ফেরার পথে অযোধ্যা দেখে যাবেন।

আমি এ উপদেশের সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করলুম না। বললুম : দেখবার বুঝি অনেক কিছু আছে?

সেকথা বলবার আগে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার।

লজ্জিতভাবে আমি নিজের পরিচয় দিলুম।

একটা কলেজে আমি প্রাচীন ইতিহাস পড়াই। কিন্তু মনে করবেন না, লেখাপড়ায় আপনার কী রকম অনুরাগ।

বললুম : এই অনুরাগের জন্যেই আমার কিছু হল না।

ঠিক এই মুহূর্তে মনোরঞ্জন একটা হাই তুলে চোখ বুজল।

আমার মনে হল, ভদ্রলোক ইতিহাসের অধ্যাপক না হলেই যেন ভাল হত। ইতিহাস জানা লোকের সঙ্গেই আমার বেশি সাক্ষাৎ হয় বলে একটা বদনাম আছে। সত্য কথা বললে লোকে সন্দেহ করবে। আর বিশ্বাস করাতে হলে আমাকে মিথ্যা বলতে হবে। মিথ্যা কথাই আজকাল মানুষের সহজে বিশ্বাস হয়।

রাজস্থান ভ্রমণের সময় এক ভদ্রলোকের আমি পুরো নাম লিখে দিয়েছিলুম। তার পরিণামের জন্য [illegible] লজ্জিত। বাংলা দেশ থেকে যাঁরা রাজস্থানে [illegible] সেই বই হাতে নিয়ে, তাঁরা সেই ভদ্রলোকের [illegible] করেই তৃপ্ত হল না, তাঁর অতিথি হয়ে থাকেন। অতিথি বৎসল সজ্জন মানুষ বলেই এই অত্যাচার সানন্দে [illegible] করেন। সেই থেকে যাঁদের বিপদে ফেলবার [illegible] নেই, তাঁদের পুরো নাম আমি লিখি না। যেমন, মিস্টার শর্মার কলেজের নামটা আমি [illegible] করে গেলুম।

মিস্টার শর্মা জিজ্ঞাসা [illegible]লেন : প্রাচীন অযোধ্যার সমৃদ্ধির পরিচয় আপনার জানা আছে তো?

কোন দ্বিধা না করে বললুম : না।

রামরাজ্যের চিত্র আছে পদ্মপুরাণে। পুরাণকার লিখেছেন, শস্যক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত শস্য, গবাদির প্রচুর খাদ্য সারা বছর পাওয়া যেত। দেশের স্বাস্থ্য সুন্দর ছিল। গ্রামে গ্রামে দেবালয় ছিল, ছিল ফল ও ফুলের উদ্যান। কারও কোন অভাব ছিল না। ধর্মাচারী প্রজারা পরিবার ও পরিজন নিয়ে সুখে জীবন যাপন করতেন।

হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন : আপনি সংস্কৃত জানেন?

বললুম : অল্প অল্প।

শব্দগুলি সুন্দর বলে আপনাকে বলতে ইচ্ছে করছে।

স পদ্মিনীককাসারা যত্র রাজন্তি ভূময়ঃ।

কুলান্যেব কুলীনানি বর্ণানাং ন ধনানি চ।
বিভ্রমো যত্র নারীষু ন বিদ্বৎসু চ কর্হিচিৎ॥
নদ্যঃ কুটিলগামিন্যো ন যত্র বিষয়ে প্রজাঃ।
তমোযুক্তাঃ ক্ষপা যত্র বহুলেষু ন মানবাঃ॥
রজোযুক্তঃ স্ত্রীয়ো যত্র ন ধর্মবহুলা নরাঃ।
ধনৈরনন্ধো যত্রাস্তি জনো নৈব চ ভোজনম্॥

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: মানে বুঝেছেন?

একে সংস্কৃত, তায় অবাঙালী উচ্চারণ। নির্বিবাদে স্বীকার করলুম: বুঝি নি।

ভদ্রলোক মিলিয়ে মিলিয়ে আমাকে মানে বলে দিলেন—যত সরোবর, তত পদ্ম। সদন্তে নদী বইত, কিন্তু মানুষের কোন দন্ত ছিল না। বংশে লোক কুলীন ছিল, কিন্তু তাদের ধন চোরের ভয়ে ভূগর্ভে কুলীন ছিল না। বিভ্রম ছিল নারীদের বিলাসে, পণ্ডিতের কোন বিভ্রম ছিল না। কুটিলগামী ছিল দেশের নদী, প্রজারা নয়। আর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ছিল তমোযুক্ত, মানুষ নয়। রজোযুক্ত হত রমণী; ধার্মিক মানুষের কোন রাজসিক ভাব ছিল না। মানুষ ধনে অনন্ধ ছিল, কিন্তু ভোজনে নয়। প্রথম অনন্ধের মানে অমত্ত, আর দ্বিতীয়টির মানে অন্নহীন। ধনগৌরবে মানুষ মত্ত হত না, অন্ন থাকত আহারে। অনন্ধ শব্দটির আজকাল ব্যবহার নেই বলেই এই শ্লোকটির সৌন্দর্য সহজে ধরা পড়ে না।

অযোধ্যার বর্ণনা আছে রামায়ণের আদিকাণ্ডে। প্রশস্ত রাজপথে এক কণা ধুলো থাকত না, ভিজে পথের দুধারে ফুটে থাকত নানা রঙের ফুল। কত সৌধ, কত উদ্যান, কত আম্রকানন। অস্ত্রাগারও কত। নগরের চারিদিকে শাল গাছের মেখলা, বাইরে জলদুর্গম পরিখা। নানা দেশ থেকে বণিক আসত বাণিজ্যে, করদরাজারাও আসতেন। তাদের জন্য স্থানে স্থানে সিমন্তিনীদের নাট্যশালা।

মিস্টার শর্মা একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ পড়েছেন?

এই মানুষটির কাছে নিজের অজ্ঞানতা স্বীকার করতে আমার লজ্জা এল না। বললুম: তাকে পড়া বলে না।

দক্ষিণ-ভারতীয়রা ভাবেন, কাম্বারামায়ণের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু নেই, আমরা ভাবি তুলসীদাসের রামচরিত-মানসই রামায়ণের শেষ কথা।

আমি বললুম: আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ি।

কিন্তু কোনটাই মূল রামায়ণের অনুবাদ নয়। কবিরা আপন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যা লিখেছেন তা অপূর্ব হলেও মূল গ্রন্থের আস্বাদ তাতে পুরোপুরি মিলবে না। মূল রামায়ণ ও মহাভারত প্রত্যেক ভারতীয়ের যত্নসহকারে পড়া উচিত। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ না পড়া পর্যন্ত ভারতীয়ের শিক্ষাদীক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে।

মিস্টার শর্মার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এখন আর তাঁকে একজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এখন তিনি তাঁর ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। কিন্তু তিনি থেমে পড়তেই আমি বিস্মিত হলুম।

খানিকক্ষণ নীরবে থেকে বললেন: কিছু মনে করবেন না, এ আমার একটা পাগলামি। পরিণত বয়সে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় আমি এই বিরাট কাব্য দুখানি পড়েছি। শুধু আনন্দই পাই নি, আমার মনে হয়েছিল যে এতদিন আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল। শিক্ষায় সভ্যতায় যুদ্ধে ও রাজনীতিতে ভারত কত উন্নত ছিল, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আমার ছিল না। আজ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। সে যুগে এর কোনটা ছিল না।

লোকে বলে রামের জন্মের যাট হাজার বছর আগে রামায়ণ রচিত হয়েছিল। কিন্তু রামায়ণে আমরা অন্য কথা দেখি।—

প্রাপ্ত রাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥

রামচন্দ্রের রাজত্ব লাভের পরেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণেই আছে যে নারদ সত্তরটি শ্লোকে বাল্মীকিকে রামচরিত শুনিয়েছিলেন। আর বাল্মীকি রামায়ণ রচনার পরে লবকুশকে সপ্ত সুরে সকল রস সংযোগে সেই গান গাইতে শিখিয়েছিলেন।

মিস্টার শর্মা বললেন: গোপালবাবু, আপনি ভাল

এই রামায়ণকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। বাল্মীকি রামায়ণের পর আপনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়ুন। তাতে রামায়ণের আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের সম্পূর্ণ রূপ পাবেন। তারপর পড়ুন অদ্ভুত রামায়ণ। এর পরে বেদব্যাসের নানা পুরাণে রামায়ণের কাহিনী, পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অধ্যাত্ম রামায়ণ। কালিদাসের রঘুবংশ পড়ুন, ভর্তৃহরির ভট্টিকাব্য। পদ্মপুরাণে রামায়ণ আধুনিক পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। রাবণ বধের পর আরম্ভ, এবং পূর্বের ঘটনা ডায়েরির মত দিনক্ষণ দিয়ে লেখা। রামচন্দ্র ও সীতার বয়সের হিসেব শুনেও কৌতুক বোধ করবেন। রাম যখন জনক রাজার গৃহে হরধনু ভঙ্গ করেন তখন তাঁর বয়স পনর বছর। সীতা তাঁর চেয়ে ন বছরের ছোট, তাঁর বয়স ছ বছর। বিবাহের পর বারো বছর তাঁরা অযোধ্যায় সুখে বাস করেছিলেন। বনগমনের সময় রামের বয়স সাতাশ ও সীতা আঠারো বছরের তরুণী। তের বছর বনবাসের পর রাবণ সীতা-হরণ করে মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর বিন্দু মুহূর্তে। সীতার বয়স তখন একত্রিশ। দশ মাস পরে সীতার সন্ধান পাওয়া যায় জটায়ুর বড় ভাই সম্পাতির কাছে। সেদিন ছিল অগ্রহায়ণের শুক্লানবমী। লঙ্কায় গিয়ে হনুমান সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসবার পরে অষ্টমীর বিজয় মুহূর্তে রামচন্দ্র যুদ্ধযাত্রা করেন। অমাবস্যা পর্যন্ত তাঁরা সমুদ্রতীরে শিবিরে বাস করেন। পৌষ মাসের শুক্লাদশমী থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত সেতুবন্ধ হয়, তারপর দ্বিতীয়া পর্যন্ত সৈন্যদের সমুদ্র অতিক্রম। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, চৈত্র মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে রাবণ বধের পর সাতাশি দিনের যুদ্ধ শেষ হয়। প্রত্যেকটি ঘটনার তিথি নক্ষত্রের উল্লেখ দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন।

সত্যই আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। বললুম : আপনার স্মৃতিশক্তির তুলনা নেই।

ভদ্রলোক হেসে বললেন : ইতিহাসের সন তারিখ পড়াতে পড়াতে মুখস্থ হয়ে গেছে, এও তেমনি। দু-চার বার আওড়ালে আপনারও মুখস্থ হয়ে যাবে।

আমি বললুম : রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমার

আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ নয়, মহাভারতের তুলনায় আধুনিক।

মিস্টার শর্মা বললেন : এটি বিদেশী মত। তাঁরা বলেন, সভ্যতার বিকাশের যে ধারা আছে তা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, রামায়ণের যুগের সভ্যতা উন্নততর। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় সমাজের যে অবস্থা দেখা যায়, তা অপেক্ষাকৃত আদিম। রামায়ণের কাল অনেক সভ্যতর। কাজেই মহাভারতই প্রাচীনতম গ্রন্থ। যদি তাই হত, তাহলে রামায়ণে মহাভারতের উল্লেখ পাওয়া যেত, মহাভারতে ও পুরাণে রামায়ণের উল্লেখ থাকত না।

আর একটা আপত্তি আছে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে। সত্যযুগে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। দেবতারা ও ঋষিরা তখন এদেশে বাস করতেন। বেদের জন্ম হয়েছিল। দর্শন ও অধ্যাত্ম সাধনায় দেশে তখন চরম উৎকর্ষের দিন। তারপর ত্রেতা, দ্বাপর। মানুষের মান নেমে নেমে কলিতে অবনতির শেষ ধাপে নেমেছে। এর পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনিই বলুন, পৃথিবী ধ্বংস হবার কি কিছু বাকি আছে?

বললুম : সত্যি কথা। কিন্তু এই ধ্বংস হবার ধারণাকে আমি মানি না। আমার মনে হয় না যে প্রলয় হয়ে পৃথিবীর রূপ পালটাবে।

তবে?

আমার ধারণা শুনে আপনি হয়তো হাসবেন। আমার মনে হয়, ধ্বংসের দিকে আরও অনেকদূর অগ্রসর হয়ে মানুষ থমকে দাঁড়াবে। ভাববে, এবারে কোন্ দিকে যাই। তারপর উলটো দিকে ফিরে আবার হাঁটতে শুরু করবে। কলির পর দ্বাপর ত্রেতা, তারপর সত্যযুগ ফিরে আসবে।

মিস্টার শর্মা আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। বললেন : মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি ভাবেন?

ভয়ে ভয়ে বললুম : একটু ধৃষ্টতার কাজও করেছি।

কী?

এই বিষয়ে আমি একটা থিসিস দাখিল করে এসেছি। ডক্টরেট না পেলেও আমার কোন দুঃখ হবে না।

আমার ধারণা হয়তো ভুল, কিন্তু কারও কাছে ধার নয়। এই পুরনো পৃথিবীতে নতুন কথা বলার চেষ্টা করেন না। আমি বলেছি যে নতুন কথা ভাববার আমাদের এসেছে, তার সুযোগ নিলে সাহিত্যই হবে না, সমাজও রক্ষা পাবে।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দুটি কথা।

আমি বললুম: এইবার অযোধ্যার কথা কিছু

কথার উত্তর না দিয়ে মিস্টার শর্মা বললেন: নি সাহিত্যের ছাত্র?

আজ্ঞে।

কোন কলেজে অধ্যাপনা কেন করেন না?

াস করে বেরিয়ে কোন সুযোগ পাই নি।

এখন যদি সুযোগ পান—ধরুন, লক্ষ্ণৌয়ে।

ভদ্রলোক আমার নাম ঠিকানা তাঁর টাইমটেবলের য় টুকে নিলেন, বললেন: চিঠি দেব।

বললুম: এইবারে বলুন।

পাণ্ডারা বলেন, অযোধ্যায় এখন ছিয়ানব্বইটি মন্দির, মন্দিরের সংখ্যা তেষট্টি এবং শিবের মন্দির তেত্রিশ। আপনি বিস্মিত হবেন যে এই অযোধ্যা এখন দের তীর্থস্থান। এখানে মসজিদ আছে ছত্রিশটি। টি সমাধিস্থান আছে, তা বাইবেলে উক্ত নোয়ার বলে কথিত। গ্রীক বীর আলেকজান্দার নাকি কবরটি নির্মাণ করান। তারপর বৌদ্ধ ও জৈন । হিউএন চাঙ এখানে কুড়িটি বৌদ্ধ মন্দির খছিলেন। আর জৈনদের আছে ছটি মন্দির। ধ্যে আদিনাথ অজিতনাথ প্রভৃতি পাঁচজন ঙ্করের জন্মস্থান বলে জৈনদের বিশ্বাস।

অযোধ্যায় লোকে এখন রামকোট দেখে, রামচন্দ্রের জন্মস্থান রামসীতার স্থান ও স্বর্গদ্বার দেখে। ায়ণের অনেক মূর্তি আছে—দশরথ ও কৈকেয়ী, মিত্র, কণক সীতা, রাজবেশে হনুমান প্রভৃতি। এই গুলি শিল্পমণ্ডিত না হলেও ধর্মভাবের সহায়ক।

লোকে মনি পর্বত, সুগ্রীব পর্বত, কুবের পর্বত দেখে, শত্রুঘ্নঘাট ও স্বর্গঘাট। এখানে ... সম্প্রদায়ের মঠ আছে। বৈষ্ণবদেরই সাতটি মঠ।

আমাদের শাস্ত্রে যে কয়েকটি পুরী মোক্ষদায়িকা নামে পরিচিত, অযোধ্যা তাদের অন্যতম। স্বয়ং মনু এই পুরী নির্মাণ করেন। মনুর পর একশো বারো পুরুষ এখানে রাজত্ব করেন। তারপর রাজা সুমিত্র এই নগর পরিত্যাগ করলে এ স্থান অরণ্যে পরিণত হয়। মাঝে কিছুদিন বৌদ্ধপ্রভাব পড়েছিল। রাজা বিক্রমজিৎ এখানকার জঙ্গল কাটিয়ে অযোধ্যা উদ্ধার করেন। এখানে তিনি তিনশো ষাটটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সূর্যবংশের পর শ্রাবস্তীর রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন, তারপর অশোকের অধিকার। বিক্রমজিৎ অযোধ্যা জয় করেছিলেন কাশ্মীরের রাজা মেঘবাহনের কাছ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর সমুদ্রপালবংশীয়রা এখানে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন।

অতীতে অযোধ্যা অনেকবার অরণ্যে পরিণত হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে দেখি হিমালয়ের থারুরা জঙ্গল কেটে অযোধ্যায় চাষবাস করছে। সোমবংশের জৈন রাজারা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষে সোমবংশীয়দের তাড়ালেন কনৌজের রাজা চন্দ্রদেব। তারপর ভড় নামে এক অসভ্যজাতি এসে অযোধ্যা অধিকার করল। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা লুণ্ঠন করেছিলেন শাহাবুদ্দিন ঘোরী। তারপরেই মুসলমান অধিকার কায়েম হল। অযোধ্যার নবাবদের কথা আজকাল ইতিহাসে পড়ানো হয়। অযোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচারের দায়ে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার হয়েছিল বিলেতের পার্লামেণ্টে।

প্রাচীন কোশল রাজ্য সম্বন্ধে কিছু না বললে অযোধ্যার কথা সম্পূর্ণ হয় না। কোশলের রাজধানী অযোধ্যা, শত্রুর অজেয় বলে নাম অযোধ্যা। রামের মৃত্যুর পর এই রাজ্য বিভক্ত হয়। কুশের রাজ্য হল কোশল বা কোশলা, রাজধানী কুশবতী বা কুশস্থলী। লবের রাজ্য উত্তর কোশল, রাজধানী শ্রাবস্তী। ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র তক্ষ গেলেন তক্ষশীলায়, কনিষ্ঠ পুষ্কল বা পুষ্কর গেলেন পুষ্পাবত বা পুষ্করাবতীতে। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্র অঙ্গদ অঙ্গদীয়ায়, কনিষ্ঠ চন্দ্রকেতু চন্দ্রকান্তায়। শত্রুঘ্নের ... বিদিশায় রাজধানী স্থাপন করলেন।

কিন্তু কোথায় আজ রঘুপতি, তাঁর রাজ্য কোশলই বা কোথায়।

রঘুপতে কঃ গতোত্তর কোশলা।

বাইশ

গল্পে গল্পে কত পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি খেয়াল করি নি। মনোরঞ্জন সেই যে চোখ বুজেছিল আর খোলে নি। এখন তার নাক ডাকছে।

মিস্টার শর্মা বোধ হয় ক্লান্ত হয়েছিলেন। জলের একটা বোতল বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি ধন্যবাদ দিলুম। তিনি নিজের গলায় খানিকটা জল ঢেলে সেটা তুলে রাখলেন।

এই ভদ্রলোকের কাছে আমার অনেক কিছু জানবার আছে। শুধু লক্ষ্ণৌয়ের কথা নয়, সম্ভব হলে নৈনিতাল রাণীক্ষেত ও আলমোড়ার কথাও। হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধেও কিছু জেনে নেবার ইচ্ছা হল। কিন্তু লজ্জা হল কিছু প্রশ্ন করতে। ভদ্রলোক কী ভাববেন।

হঠাৎ আমার নাগপুরের দত্তর কথা মনে পড়ল। তাঁর শখ যে ভদ্রলোক সারা ভারতবর্ষের পাহাড় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাশ্মীর থেকে কোডাইকানাল। উত্তর-ভারতের সমস্ত পাহাড়ী শহরগুলো তাঁর নিশ্চয়ই দেখা। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে অনেক কিছু জেনে নেওয়া যেত।

মিস্টার শর্মা বললেন : কী ভাবছেন ?

বললুম : পাহাড়ের কথা।

দত্তর কথাও তাঁকে বললুম। শুনে তিনি অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন : অনেকদিন আগে ও অঞ্চল আমি ঘুরে এসেছি। কিছু জানবার থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

প্রশ্ন করতে হলে কিছু জানা দরকার। সে জ্ঞান আমার নেই। আপনার যা মনে আছে তাই বলুন।

আমার সঙ্গে একখানি সরকারী গাইড বই ছিল। তাতে পড়েছিলুম যে কলকাতা থেকে যাঁরা আসেন, তাঁরা লক্ষ্ণৌ থেকে কাঠগোদাম যান ছোট লাইনের ট্রেনে। যাঁরা পশ্চিম দিক থেকে আসেন, তাঁরা আগ্রা

কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল মাত্র বাইশ মাইল সুন্দর প্রশস্ত পথ, ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। যতদূর মনে পড়ছে সমুদ্রতল থেকে নৈনিতালের উচ্চতা ছ হাজার সাড়ে তিনশো ফুট।

দত্তর কথা আমার আবার মনে পড়ল। সে বলেছিল হিমালয়ের এ একটা রসিকতা। এ দেশে যত ভাল ভাল শহর, সব ছ হাজারের বেশী। তারপরে মুখে মুখে সব হিসাব দিয়েছিল। দার্জিলিঙ ছ হাজার ... রাণীক্ষেত ছ হাজার, নৈনিতাল ছ হাজার তিনশো মসুরি ছ হাজার পাঁচশো, ডালহাউসি ছ হাজার ... সিমলা সাত হাজার দুশো।

আমি বলেছিলুম, আলমোড়ার উচ্চতা তো কম।

আলমোড়া কেন, শিলং কালিম্পং কার্সিয়াং ... উচ্চতায় যেমন কম, গৌরবেও তেমনি নীচু।

হিমালয়ের এই গিরিশ্রেণীর সাধারণ নাম কুমায়ুন হিলস্। সামনে এই শৈলাবাসগুলি, পিছনে তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী। এই অংশের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে সে হল কতকগুলো স্বাভাবিক জলাশয়। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা এই জলাশয়গুলোকে এ অঞ্চলের লোক তাল বলে। তালের নামেই স্থানের নাম। যেমন নৈনিতাল, পুনাতাল, ভিমতাল, সাততাল, নৌকুচিয়াতাল, মালোয়াতাল। এই অঞ্চলে নাকি এ রকমের তাল ... যাটেক আছে। নৈনিতাল নামের আরও একটু কৈফিয়ত আছে। লেকের ধারে আছে নয়না বা নয়নী দেবী মন্দির। তাঁরই নামে তালের নাম নৈনিতাল। এখানে আরও একটি মন্দির আছে। তার ঠিক উলটো দিকে পাষাণ দেবীর মন্দির। নৈনিতালের জল এইখানে প্রায় পাঁচশো ফুট গভীর।

আমি এই গাইড বইয়েই পড়েছিলুম যে প্রায় সোয়াশো বছর আগে এক শালা ও ভগিনীপতি এ অঞ্চলে শিকারে এসে এই সুন্দর স্থানটি আবিষ্কার করেছিলেন। মিস্টার ব্যাটেন ও মিস্টার ব্যারন মিস্টার ব্যারন শাজাহানপুরে ব্যবসা করতেন, তিনি পিল্‌গ্রিম ছদ্মনামে আগ্রা আখবারে একটি প্রবন্ধ লিখে নৈনিতালের সৌন্দর্যের খবর এদেশে প্রচার

স্টার শর্মা বললেন : নৈনিতালে নেমে আমি বিস্ময়ে
হৃত হয়ে গিয়েছিলাম।

কন ?

াঠগোদাম থেকে নৈনিতাল পৌঁছতে ঘণ্টাদেড়েক লেগেছিল। মোটর বাস এসে একেবারে লেকের দাঁড়াল। সামনেই বিস্তৃত জলাশয়, চারিধারের ড ক্রমশঃ আকাশের দিকে উঠে গেছে। সেই ড়ের গায়ে শুধু নানারকমের গাছ নয়, অনেক সুন্দর েন ফুলের মত ফুটে আছে। জলে তার ছায়া ছে, বাতাসে দুলছে, আর দুলছে পাল-তোলা সব কাগুলো। কত বিচিত্র সাজে নানা দেশের মেয়ে ব নৌকোয় বসে বিশ্রাম করছে, কেউবা খেলা ছে।

যেখানে আমরা নামলাম সেই জায়গার নাম ল্লাল। শহরের নীচু অংশ, সস্তার বাজারহাট, ারণ লোকের বাস। লেকের অপর পারের নাম ল্লাল, উঁচু পাড়া, বড় বড় হোটেল আর শৌখিন ার সব এই দিকে। কয়েকদিন থাকবার পরেই নিতালের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না। ড়ে আট হাজার ফুট উঁচু চীনা পিকে কোন রকমে াতে হাঁপাতে উঠে সমস্ত শ্রান্তি জুড়িয়ে গেল। ত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয়, মনে হল যেন দিগন্তে এক গলা পোর স্রোত বইছে। এমন সুন্দর বরফের পাহাড় মি আগে কখনও দেখি নি। অন্য ধারে অনেক নীচে নিতাল দেখলুম। মনে হল, উড়ো জাহাজ থেকে চের দৃশ্য দেখছি। নৈনিতাল যদি লম্বায় এক হাজার ত হয় তো চওড়ায় তার এক তৃতীয়াংশ হবে। পারের কানখানে লম্বা ঝাউ গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনখানে অন্য কোন গাছ জলের উপর নুয়ে পড়েছে। পাল-তোলা নৌকোগুলো দেখাচ্ছে বিন্দুর মত। লারিয়া কান্টা নামে আর একটা জায়গা প্রায় চীনা পিকের সমান উঁচু। সেখান থেকে এই অঞ্চলের অনেকগুলো লেক দেখা যায়। ল্যাণ্ডস্ এণ্ড থেকে দেখা যায় নীচের সমতলভূমি। এ সব অদ্ভুত দৃশ্য, রয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হয়। ছুটোছুটি করে দেখলে এ সবের সৌন্দর্য বোঝা যায় না। দ্রষ্টব্যস্থান নৈনিতালে আরও অনেক আছে—কিলবেরি দেওপাট্টা বা ক্যামেল্স্ ব্যাক স্নো ভিউ, টিফিন টপ বা ডরোথি সিট।

সাহেবদের মেজাজ ঠিক আমাদের মত নয়। পাহাড়ে আমরা যাই স্বাস্থ্যান্বেষণে, বড়লোকেরা বিশ্রামের জন্যে যায়। আমরা নির্জনতা ভালবাসি, পায়ে হেঁটে দূরে দূরে নির্জন পথে বেড়াতে যাই। কিংবা নৌকোয় উঠে চুপ করে বসে থাকি, নয় বই পড়ি। মিউনিসিপাল লাইব্রেরিতেও অনেকে বই পড়তে যাই। সাহেবরা এই অলস জীবন ভালবাসে না। তারা জীবন উপভোগ করে কায়িক পরিশ্রম দিয়ে। তার জন্যেও সুব্যবস্থা আছে। সাঁতারের জন্য সুইমিং পুল আছে, ইয়াট আর নৌকো আছে, ঘোড়া আছে, স্কেটিং ট্রেকিংয়েরও ব্যবস্থা আছে। মল্লিতালের কাছে আছে ফ্ল্যাটস। সেখানে ফুটবল ক্রিকেট হকি খেলা হয়, মাঝে মাঝে পোলো খেলাও হয়। তারপরে ক্লাব আর সিনেমা।

সমস্ত পাহাড়ী শহরে এই রকম খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই। দার্জিলিঙের রেসকোর্স লেবংয়ে, সে অনেক দূর। সিমলার মাঠ অ্যানানডেলে, সে অনেক নীচে। যাতায়াতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। মসুরিতে শুনেছি কোন খেলার মাঠ নেই, বেড়াবার পার্ক নেই, ভাল বসবার জায়গাও নেই। মসুরি নাকি বড়লোকের স্বাস্থ্যনিবাস— যাঁরা নিজেদের প্রাসাদের বাগানে বসে সময় কাটাতে পারেন।

যাদের বয়স কম, নৈনিতাল থেকে তারা নানা জায়গায় বেড়াতে যায়। খুরপাতাল একটি ছোট জলাশয়, হাঁটাপথ মাত্র তিন মাইল পশ্চিমে। ভাওয়ালি সাত মাইল আর ভিমতাল চোদ্দ মাইল দূরে। নৈনিতাল থেকে নিয়মিত বাস চলাচল করে। ভাওয়ালিতে কেউ আপেলের বাগান দেখতে যায়, কেউ যায় টি. বি. স্যানাটোরিয়াম দেখতে। ভিমতাল সমুদ্রসমতল থেকে মাত্র চার হাজার ফুট উপরে। এখানকার লেকটি ভারি সুন্দর। লেকের মাঝখানে একটি ছোট দ্বীপ আছে। একটি ঘন ওকের জঙ্গলের মধ্যে নৌকুচিয়াতাল একটি নয়কোণা জলাশয়, তাতে প্রচুর মাছ। মাছ ধরার অনুমতি নিয়ে লোকে সেখানে যায়। নৈনিতাল থেকে চোদ্দ মাইল দূরে রামগড়ে লোকে ফলের বাগান দেখতে

যায়। আপেল পীচ চেরি আর অ্যাপ্রিকটের বাগান। এখান থেকে এগার মাইল দূরে মুক্তেশ্বরে হল ইণ্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

তারপর রাণীক্ষেতের প্রসঙ্গ। রাণীক্ষেতকে যাঁরা ভারতের শ্রেষ্ঠ পার্বত্য শহর বলেন, তাঁরা এই কারণে বলেন যে এটি একটি মালভূমির উপর অবস্থিত ও এইখান থেকে হিমালয়ের দুশো মাইল ব্যাপী তুষারধবল গিরিশ্রেণী দেখা যায়। রাণীক্ষেতের উচ্চতা প্রায় ছ হাজার ফুট, ক্যাণ্টনমেণ্ট এরিয়া আরও এক হাজার ফুট উঁচুতে। এই প্রশস্ত সুন্দর মালভূমিটি দেখে ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়োর ভারি পছন্দ হয়েছিল। তিনি ভারতের রাজধানী সিমলা থেকে এইখানে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

আমি আমার বইয়ের মানচিত্রটি খুলে দেখলুম যে কাঠগোদাম থেকে রাণীক্ষেতের দূরত্ব তিয়াত্তর মাইল। জেওলিকোট থেকে সোজা রাস্তা নৈনিতাল গেছে, সেই রাস্তাই ডান দিকে গেছে ভাওয়ালি। নৈনিতাল থেকেও একটা সোজা রাস্তা ভাওয়ালি এসেছে। এটি একটি ত্রিভুজ। ভাওয়ালি থেকে পাঁচটি বড় রাস্তা পাঁচ দিকে গেছে। একটি কাঠগোদাম আর একটি নৈনিতাল। তৃতীয় রাস্তা নৌকুচিয়াতাল গেছে, সাততাল ও ভিমতাল এই পথের দক্ষিণে, আর একটা পথ মুক্তেশ্বর গেছে। রামগড় থেকে মুক্তেশ্বর পর্যন্ত পথের দু ধারে ফলের বাগান। শেষ পথটি গেছে রাণীক্ষেতের দিকে। কোশী নদীর পুল পেরিয়ে আরও উত্তরে রাণীক্ষেত। যাঁরা আলমোড়া যাবেন তাঁদের কোশী নদী পেরতে হয় না। কোশী নদীর এপার থেকেই ডান দিকে বেরিয়ে গেছে আলমোড়ার পথ। কাঠগোদাম থেকে আলমোড়া তিরাশি মাইল, রাণীক্ষেত থেকে মাত্র তিরিশ।

মিস্টার শর্মা বললেন: রাণীক্ষেতের চারিদিকে যেমন ঝাউ ওক সিডার ও সাইপ্রেস গাছের ঘন অরণ্য, ভিতরে তেমনি সুন্দর পথঘাট, খেলার মাঠ, পোলো গ্রাউণ্ড ও গলফ্ কোর্স। প্রায় সব পথে মোটর চলে ও বেশীর ভাগ বাড়িতেই মোটরে যাতায়াত করা যায়।

একদিন ভোরবেলায় উঠে উত্তরে হিমালয় পাহাড়ের দিকে তাকালে চোখ আপনার জুড়িয়ে যাবে। এর চেয়ে ভাল দৃশ্য আপনি জীবনে কখনও দেখেছেন কি মনে পড়বে না। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর দেখা যায় সবটাই বরফের পাহাড়। নেপাল থেকে টেহ্‌রি গাড়োয়াল ও বদরীনাথের বিস্তার বোধ হয় দুশো মাইল। রাণীক্ষেতের অনেক জায়গা থেকেই এ দৃশ্য আপনার চোখে পড়বে।

জিজ্ঞাসা করলুম: মাউণ্ট এভারেস্টও কি দেখতে পাওয়া যায়?

আমি দেখতে পাই নি, কিন্তু শুনেছি, খুব পরিষ্কার দিনে অস্পষ্টভাবে মাউণ্ট এভারেস্ট অনেকে দেখেছে। যা দেখে চোখ জুড়োয়, তা হল নন্দাদেবী। সামনে পূর্বে একটি ধূসর পিরামিডের মত শিখর। তারপর ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টি। পশ্চিমের দিকে হাতি পর্বত, গৌরী পর্বত। এরই পিছনে কোন কোন দিন মাউণ্ট এভারেস্ট দেখা যায়। আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে যে সব পাহাড় দেখা যায়, তাদের নাম হল মানা পিক বামেই পাঁচকোটি ও নীলকান্ত। এ সব বদরীনাথের দিকে।

মিস্টার শর্মা বললেন: এই সব পাহাড় দেখবার জন্যেই সবাইকে একবার রাণীক্ষেতে যাওয়া দরকার। আপনি কী বলবেন জানি না, সমুদ্রের মত পাহাড়ে গেলেও নিজেকে বড় ছোট মনে হয়, নিজের সঙ্কীর্ণতা নিজের কাছেই ধরা পড়ে, ধীরে ধীরে মন হয় উদারতায় অভ্যস্ত।

বলতে আমার লজ্জা হল যে সমুদ্র যেভাবে দেখেছি, পাহাড় দেখি নি তেমন করে। যে সব পাহাড়ে উঠেছি, তার আকর্ষণ অনুভব করি নি। আকর্ষণ তো পাহাড়ের নয়, বোধ হয় বরফের। হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে একবার যে তার বরফ দেখেছি সেই-ই বাঁধা পড়েছে পাহাড়ের মায়ায়। বারে বারে তাকে ছুটে যেতে হয়, তার আর নিস্তার নেই।

উত্তরে আমি বললুম: গান্ধীজীও এই কুমায়ুন পাহাড়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

মিস্টার শর্মা একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

আমি গাইড বই খুলে দেখলুম যে আলমোড়া জেলা

ীন শহর। কুমায়ুনের রাজা কল্যাণচাঁদ ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে শহর পত্তন করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এটি শের হাতে এসেছে। পাঁচ হাজার ছশো ফুট উঁচু, শহরটির অন্যরকম মায়া। দু মাইল লম্বা এই শহরটির রদিকে পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় মাথায় মন্দির। রের বাজারটি পাথরে বাঁধানো, তার দু ধারে শ্লেট রের বাড়ি, ছাদও শ্লেটের। দোতলা তেতলা তলা বাড়ি।

মিস্টার শর্মা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন: লমোড়ায় বরফের পাহাড় দেখতে লোকে লালমণ্ডি । চার মাইল দূরে কালিমাট থেকে নেপালের পাহাড় যা যায়। কালোমাটির জন্যে নাম কালিমাট। ছাকাছি আরও অনেক পাহাড় আছে, উঁচু-নীচু পথ র সে সব জায়গায় পৌঁছতে হয়। সব নাম আমার ন নেই, মনে আছে শুধু ঝাণ্ডি ধরের নাম। এখান কে শুধু শহরের দৃশ্য নয়, হিমালয় ও কুমায়ুনেরও সুন্দর দ দেখা যায়। রাজা কল্যাণচাঁদের এটি প্রিয় াসাস ছিল। তিনি একটি শিবমন্দিরও নির্মাণ করে ছেন।

আমি বললুম: আলমোড়ার কাছে মায়াবতী শ্রমের কথা শুনেছিলুম।

ঠিকই শুনেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, আনন্দময়ী য়ের আশ্রম ও উদয়শঙ্করের প্রতিষ্ঠান আলমোড়া রে, রামকৃষ্ণ মিশনেরই মায়াবতী আশ্রম বিয়াল্লিশ ইল দূরে। মোটরে চম্পাবতী গিয়ে ছ মাইল হাঁটতে য়। প্রবুদ্ধ ভারত নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ার দপ্তর এই আশ্রমে। নির্জনতার জন্য আপনাদের শবন্ধু এই আশ্রমটি বড় ভালবাসতেন।

উপেনদার কাছে আমি এই গল্প শুনেছি। বললুম: ানি।

মিস্টার শর্মা বললেন: পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার আমি েখতে যেতে পারি নি। হাতে আমার সময় ছিল না। তা না হলে যে রকম সুব্যবস্থার কথা শুনেছিলুম, তাতে াবার বড় লোভ হয়েছিল। আলমোড়া থেকে মাত্র পঁচাত্তর মাইল হাঁটতে হয়, দিন আষ্টেকের যাত্রা। আটটি পারলে এ একটা চমৎকার যাত্রা। মে জুন কিংবা সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বেরতে হয়। তের চোদ্দ হাজার ফুট ওঠবার সময় ধাপে ধাপে প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে ঝাউগাছ শেষ হয়ে আসবে ওক গাছ, তারপরে দেবদারু। আরও উপরে উঠলে বুনো ফুল ফার্ন আর রডোডেনড্রন। একেবারে গ্লেসিয়ারের কাছে ঘাস আর গুল্ম।

এই গ্লেসিয়ারটি হল দু মাইল লম্বা, চওড়ায় ছয় থেকে আটশো হাত। এই বরফ আসে নন্দাদেবী ও নন্দকোট পাহাড় থেকে। নীচে পিণ্ডারী নদী। এই দৃশ্য আপনি কল্পনা করতে পারেন?

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন, আর আমি তাকালুম তাঁর মুখের দিকে। উত্তর শুধু একটি শব্দে এল: অপূর্ব।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়ে বললেন: এই আলমোড়া থেকে যাত্রীরা আর একটি লোভনীয় স্থানে যায়।

আপনি মানসসরোবর ও কৈলাসের কথা বলছেন?

ঠিক ধরেছেন। নানা দেশ থেকে যাত্রীরা এসে আলমোড়ায় জমা হতে থাকে। তারপর একযোগে যাত্রা। পথের দূরত্বও যত, দুর্গমও তত। কেদার-বদরীনাথের মত পথের ধারে ধারে চটি নেই, নিজেদেরই সমস্ত ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। শুধু খাদ্য নয়, রাত্রি-বাসের জন্য তাঁবু পর্যন্ত। লিপুলেকে ভারতের সীমান্ত, তারপরে তিব্বত। বামে রাক্ষসতাল ও দক্ষিণে মানস-সরোবর। তার মাঝখান দিয়ে কৈলাসের পথ। যাত্রীরা কৈলাস পরিক্রমা করে, গৌরীকুণ্ডে স্নান করে, তারপর তুষারমৌলী কৈলাসকে প্রণাম করে দেশে ফেরে। কোন মন্দির নেই, দেবতা নেই, শুধু জল আর বরফ। এই আমাদের দেবতা। এই দেবতাকে দেখবার জন্যে যুগ-যুগান্ত ধরে যাত্রীরা যায় কৈলাসে।

কালিদাসের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ল।—

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থ সন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবণিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিত খং
[illegible] প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥

কুবের বিজয়ী রাবণ একদিন বাধা পেয়েছিলেন এই কৈলাস পর্বতে। পুষ্পক রথ থেকে অবতরণ করে মোহাচ্ছন্ন রাক্ষস তাঁর বিশ হাতে এই পর্বতকে পৃথিবী থেকে উৎপাটিত করে লঙ্কায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লীলাময় মহাদেবের পায়ের চাপে নিপীড়িত হয়ে তাঁর অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। তারপর এই মানস-সরোবরের তটে সেই উদ্ধত রাক্ষস সহস্র বর্ষ তপস্যা করেছিলেন। তাঁর দেহের স্বেদে কিংবা অশ্রুধারায় এই রাবণ হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল।

কুবের কোন কালে ভারতের আরাধ্য দেবতা ছিলেন না। যুগ যুগ ধরে ত্যাগের শিক্ষা পেয়েছে যে দেশ, ঐশ্বর্যে বিরাগ ছিল তার রক্তে ও মজ্জায়। কুবের তাই ভারতের সীমানা এই হিমালয় পাহাড় ডিঙিয়ে মানসের তীরে তাঁর পুরী নির্মাণ করেছিলেন। সকাল সন্ধ্যা তাঁর পুরললনারা স্নান ও প্রসাধনের জন্য এই সরোবর তীরে নেমে আসতেন। তাঁদের চঞ্চলচরণে কনকনূপুরের নিক্কণ উঠত মন্দিরার মত। পরিধেয় পট্টবস্ত্রের বর্ণাঢ্য রামধনুর ছায়া পড়ত মানসের নীলজলে। আর তাঁদের হীরকাভরণ থেকে বিচ্ছুরিত হত মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের বিচিত্র দ্যুতি।

আবেগোচ্ছল হংসমিথুন সেই শান্ত সুনীল জলরাশির উপর কেলি করত। তাদের পক্ষপুট বিক্ষুব্ধ সলিল তরঙ্গ নিক্ষেপ করত বলয়ের মত। সেই তরঙ্গ মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে স্নানার্থিনীদের নিরাবরণ বক্ষে এসে আঘাত করত। কঙ্কণবলয়সিঞ্চিত লীলায়িত বাহুর তাড়নায় তরঙ্গের নৃত্য উঠত তটপ্রান্তে।

সেখানে স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করেছিল একটি বৃদ্ধ বট, নির্বাক প্রহরীর মত তার দিবারাত্রির সতর্ক প্রহরা। স্নানসমাপনান্তে কুবের কন্যারা এসে প্রসাধন করত এই বটের ছায়ায়। যেখানে সূর্যকিরণ এসে মৃত্তিকা স্পর্শ করে, সেই উত্তাপে ঘনকৃষ্ণ কেশদাম মেলে দিত কেশবতী কন্যা, আর যৌবনভারগর্বিতা নারী তার বেশবিন্যাস করত ঝুরির আড়ালে দাঁড়িয়ে।

আজ আর মানসতটে সে বটগাছ নেই। কুবের কন্যাদের কলহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে না তার তীরভূমি। নতুন পুরী রচনা করেছেন দেশান্তরে। যে ভারত একদিন তাঁকে চায় নি তার আদর্শে সেই ভারতকে তিনি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে গেছেন। ক্ষুধা ভারত আজ ক্ষুধায় কাঁদে।

কিন্তু ভারতের আদর্শ আজও মরেও মরে নি। সেই সর্বত্যাগী ভোলা মহেশ্বর আজও তপস্যারত তাঁর তুষার শৈলশিখরে। কৈলাস আজও জেগে আছে। জেগে থাকবে।

তেইশ

মনোরঞ্জনের নাক ডাকার শব্দ বন্ধ হতেই আমি তার দিকে তাকালুম। সে চমকে সোজা হয়ে বসেই চেঁচিয়ে উঠল : এই চা!

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে ট্রেন একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর চাওয়ালা চেঁচিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। এ কোন স্টেশন?

মিস্টার শর্মা বললেন : ফৈজাবাদ।

মনোরঞ্জনের পরে আমি চা নিলুম। মিস্টার শর্মাকে এগিয়ে দিতে গেলে তিনি বললেন : ধন্যবাদ। চা আমি খাই না।

নিজের বোতল বার করে তিনি খানিকটা জল খেলেন।

মনোরঞ্জন তারাপদবাবুকে চেঁচিয়ে বলল : এখুনি খেয়ে নিন দাদা। পরে জুটবে কিনা জানা নেই।

তাঁরাও চা নিলেন। মাটির ভাঁড়ে গরম চা। ঘনঘন হাত বদল করে খেতে হল।

এই সময় মিস্টার শর্মা বাথরুমের দিকে উঠে যেতেই মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল : ভদ্রলোক পাগল নাকি?

কেন?

একেবারে রেডিও চালিয়েছিলেন।

রেডিও তো তুমি চালিয়েছিলে।

কেন?

তোমার নাক ডাকার শব্দে আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলুম না।

বটে!—বলে মনোরঞ্জন গম্ভীর হল।

ক্ষণ ভারত ভ্রমণের সময় বিজয়ওয়াডায় আমরা রাতের বার খেয়েছিলুম। গাড়ি সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। মার গাড়িতে খেয়েদেয়ে নিজের কামরার দিকে নে পা বাড়াচ্ছিলুম, তখন স্বাতি বলল, একখানা বই য়ে যাবেন গোপালদা?

বলেছিলুম, বই আমার চাই না।

তাহলে সময় কাটাচ্ছেন কী করে?

সংক্ষেপে বলেছিলুম, রেডিও শুনে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়েছিল: রেলের গাড়িতে রেডিও শুনছেন আপনারা!

আমরা বাজালে অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ করে দিতুম। জাচ্ছেন এক ভদ্রলোক, যাঁর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

তাঁকে বারণ করতে পারছেন না?

বারণ করলেই বা শুনছেন কে! রেল কোম্পানি রকারী নোটিস মেরেছেন কামরার দেওয়ালে—জানলা য়ে হাত পা বার কর না, অযথা শিকল টানলে পঞ্চাশ কা জরিমানা লাগবে, বিড়ির টুকরো বাইরে ফেল, নকি সহযাত্রীর অনুমতি নিয়েই সিগারেট ধরাতে র পর্যন্ত। কিন্তু—

পিছনে গার্ড সাহেবের সবুজ আলো দেখে বললুম, লাবরী থেকে এক ভদ্রলোক গাড়িতে উঠেছেন— লীঘটের হালদার। আশ্বিন মাসে বিয়ের গল্প নিয়ে সর জমিয়েছেন, থামছেন না কিছুতেই।

স্বাতির হাসি ছাপিয়ে গিয়েছিল মামার অট্টহাসি

মাদ্রাজে নেমেও স্বাতি আমাকে 'আপনি' বলত। তারপর নিজে থেকেই 'তুমি' বলা ধরল। বলল, কম করে হাজার আটবার 'আপনি' বলেছি তোমাকে।

হেসে বলল, পরকে এমন আপন বলি নি এ জীবনে।

সেই স্বাতি এবারের বড় দিনের সময় কলকাতায় এসেছিল। মাঘ মাসে তার বিয়ে ঠিক জো রায়ের সঙ্গে। বিবাহের আয়োজনের জন্য মামা আমার সাহায্য প্রার্থনাও করেছিলেন। আমি পালিয়ে গিয়েছিলুম কলকাতা থেকে। পুরীর সমুদ্রবেলায় শুয়ে জীবনটা [illegible]। তারপর ওই কালীঘাটের হালদারের মুখে তার বিয়ে ভেঙে যাবার সংবাদ পেয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম। স্বাতিরা তখন দিল্লীতে ফিরে গেছে।

আমার সামনেই স্বাতির তিনটে সম্বন্ধ ভেঙে গেল। দুটো কলকাতায়, আর একটা দিল্লীতে। তার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখনই একটা সম্বন্ধ পাকা হয়ে ছিল। বিলেত-ফেরত ছেলে, মামীর খুবই পছন্দ ছিল। কিন্তু স্বাতি আমাকে তার মনের কথা জানিয়েছিল। সেই লোকটার গলায় মালা দেবার চেয়ে তাদের চাকর রাম খেলাওনের সঙ্গে ইলোপ করাও তার পক্ষে সহজ হবে। এই বিয়েটা কেন ভাঙল, সে কথা আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। এবারে জো রায়ের সঙ্গে সম্বন্ধটাও ভেঙে গেল। হালদারের কথা যদি সত্য হয়তো সেই বিয়েটা ভেঙেছে। তার ধারণা, এই কাজ করে সে শুধু আমারই উপকার করে নি, স্বাতিকেও সাহায্য করেছে।

দিল্লীতে তার সম্বন্ধ হয়েছিল রাণার সঙ্গে। শুধু সম্বন্ধই হয়েছিল, বিয়ের কথা পাকা হয় নি। দিল্লীর বিয়ের বাজারে স্বাতি রাণার কাছে দাম পেয়েছিল, পায় নি তার বাবার কাছে। ঝানু আই-সি-এস ব্যানার্জি সাহেব যেমন চাওলাকে যেকা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তেমনি স্বাতিকেও গ্রহণ করেন নি খাঁটি বলে। অঘোর গোস্বামীর এম. পি. থেকে উপমন্ত্রী হবারও সম্ভাবনা থাকলে তিনি হয়তো বিবেচনা করে দেখতে পারতেন। একটা মন্ত্রী কিংবা উপমন্ত্রীকে বেয়াই পাকড়াতে পারলে ছেলের উন্নতি ও নিজের এক্সটেনসন দুইই সম্ভব হত। কাজেই রাণা এ বিয়েতে বাপের মত পেল না। আর বিনা অনুমতিতে বিয়ে করার দুঃসাহস রাণার মত ভাল ছেলের নেই।

পুরী থেকে ফিরে এসে আমি স্বাতির খোঁজ করতে গিয়েছিলুম তাদের বাড়িতে। কারও দেখা পাই নি। তাঁরা দিল্লীতে ফিরে গিয়েছিলেন। আমাদের চা-ওয়ালা হারানিধি তাঁদের খোঁজ দিয়েছিল। তারা আমার খোঁজ করতে উত্তরপাড়ায় এসেছিল। কারও কাছে খোঁজ না পেয়ে ফিরে গেছে।

স্বাতি আমাকে কেন চিঠি লেখে নি তা অনুমান করতে পারি। মামী নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছিলেন।

হয়তো আমাকেই দায়ী করেছেন এই বিয়ে ভাঙবার জন্যে। আমরাই হালদারকে নানা জায়গায় সুযোগ দিয়েছি নানা ভাবে। তিনি যদি মুখরোচক গল্প কিছু রাষ্ট্র করে থাকেন তো তার জন্যে আর কেউ দায়ী নয়। রামেশ্বরে যে রাত আমরা মন্দিরে কাটিয়েছিলুম, সেই রাতে হালদারও ছিলেন ধর্মশালায়। তিনি নিজের চোখেই সব দেখেছিলেন। তারপরে পুষ্করে আমাদের দেখেছেন, দেখেছেন দ্বারকার সমুদ্রতীরে সায়াহ্নের অন্ধকারে, প্রভাসে সোমনাথের মন্দিরের আড়ালে দেখেছেন পূর্ণিমার রাতে। হালদারকে আমরা আর ভয় পাই না। কিন্তু মামী ভয় পান। তাঁর ধারণা, এই সব ঘটনা হালদার কলকাতা বাজারে রঙ দিয়ে রটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

হালদারের কথা আমার মনে পড়ল। পুরীতে আমাকে বলেছিলেন, গোপালবাবু, পরনিন্দার জন্যে পরনিন্দা করি না, করি পেটের জন্যে। আর ভয় দেখিয়ে যদি রোজগার হয় তো ও কাজ কেন করব। এই আপনাদের কথাই ভাবুন না। যা দেখেছি, তাই কি যথেষ্ট নয়। ইচ্ছে করলে এই কথা ভাঙিয়েই খেতে পারতুম। কিন্তু তা করি নি। আপনারা যে নির্দোষ। সে কথা তো জানি।

আমি বলেছিলুম, সত্যি কথা।

সত্যি কথা!

বলে হা-হা করে হালদারমশাই হেসে উঠেছিলেন। পিছনের পথচারী চমকে উঠেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু সমুদ্রের গর্জন খানিকক্ষণ শুনতে পেলুম না। হাসি ফুরোবার পরে বলেছিলেন, এবারে বলেছি সব কথা, বলে বিয়েটা ভেঙে দিয়েছি।

আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

হালদার মশাই বললেন, হাঁ করে দেখছেন কী! এবারে এই কর্মই তো করে এলুম। কিন্তু যার পয়সায় এলুম তার নাম আমি কিছুতেই ভাঙব না।

অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে বললেন, প্রতিজ্ঞা করেছি।

সেদিন পুরীর সমুদ্রতীরে বসে বুঝতে আমার একটুও [illegible]

এইটুকু ভেবেই আশ্চর্য হয়েছিলুম যে হালদারের সাহায্যের কেন দরকার হল। সময়মত সে ভদ্রলোক এসে না পড়লে কি এ বিয়ে ভাঙত না।

স্বাতি এখন কী করছে। কী করে তার সময় কাটছে! একবার যেন শুনেছিলুম, সে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে এম. এ. ক্লাস করতে। কথাটা সে আমার কাছে গোপন রেখেছে। কেন রেখেছে, তা সে নিজেই জানে। তার সময় কাটাবার আর একটি জিনিস দিল্লীতে দেখেছিলুম। একটি সেতার। একদিন সে আমাকে তার সেতার শুনিয়েছিল।

তখন আমি জানতুম না যে সে সেতার বাজায়। ঘরের কোণায় টাঙানো একটা সেতার দেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কে বাজায় এটা?

জবাব না দিয়ে স্বাতি একটুখানি হেসেছিল।

তোমারই সম্পত্তি বুঝি? কিন্তু জানতুম না তো।

সব কথাই যে জানতে হবে, তার কি মানে আছে।

একসঙ্গে থেকেও জানি না, এইটুকুই আপত্তির বিষয়।

দিনকয়েক একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, সেই কি এক সঙ্গে থাকা হল!

তোমাদের বাড়িও তো গেছি কয়েকবার। কিন্তু সে তর্ক থাক। এবারে কিছু বাজিয়ে শোনাও।

সঙ্গত করতে পারবে?

স্বাতির প্রশ্নে খানিকটা কৌতুক ছিল।

বলেছিলুম, আমার দিক থেকে তার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার বাজনা শুনতে চাই।

সে কি!

আমি সত্যি কথাই বলছি। তবলার সঙ্গত না হলেও তোমার হাতের সুর আমি উপভোগ করতে পারব। তোমার দিকে যখন চাই, তখন তোমাকেই দেখি। বাণার পাশে তোমাকে কেমন মানাবে সে কথা ভাবি না।

সঙ্গীত সম্বন্ধে যে তুমি কিছুই জান না, এই তর্কে তারই প্রমাণ দিচ্ছ।

তা হয়তো দিচ্ছি। কিন্তু আমার রসবোধ আছে। সেই বোধ সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত না হলেও তো ভেজাল নয়। তোমার সুরও তেমনি খাঁটি হলে ঠিক জায়গাতেই [illegible]

স্বাতি তবু উঠল না। বলল, আর একটা বাধা আছে। এখন বিকেল, এ সময়ের কোন রাগিণী আমার জানা নেই।

জানলা দিয়ে চেয়ে বললুম, সূর্যাস্তের সময় হয়েছে। এর জন্যে শুনেছি অনেক রাগিণী আছে।

শ্রীরাগ আমার ভাল লাগে না।

বসন্তের কোন রাগিণী বাজাও, চৈত্র এখনও শেষ হয় নি।

আমার বসন্ত তো শেষ হয়ে গেছে, তাকে কি আর ফিরিয়ে আনতে কোনদিন পারব!

এর উত্তর আমার মুখে যোগাল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি বলেছিল, রাত গভীর হোক, তোমাকে বেহাগ বাজিয়ে শোনাব। সেই আমার মনের সুর হবে।

রাতে একখানা খাটিয়া পেতে বাইরে শুয়েছিলুম। আর ভাবছিলুম নিজের জীবনের কথা।

অনেকক্ষণ থেকে একটা মিষ্টি সুর কানে এসে লাগছিল। ভাল করে শুনেই বুঝতে পারলুম যে ঘরের ভিতর স্বাতি সেতার বাজাতে বসেছে। ভারি মিষ্টি হাত, মীড় টেনে টেনে আলাপ করে যাচ্ছে আপন মনে। কিন্তু বড় করুণ, বড় উদাস সেই সুরটি। ভাবনার জাল আমার ছিঁড়ে গেল, আমি উৎকর্ণ হয়ে তার বাজনা শুনতে লাগলুম।

একসময় মনে হল, স্বাতি আমার মনের সুরটি যেন ধরতে পেরেছে। এক মুঠো কাশফুলের মত সেই সুর ভেসে বেড়াচ্ছে দুরন্ত বাতাসে। তার গতির প্রবাহ নেই, স্থিতিও নেই, লক্ষ্যহীন ভাবে জটলা পাকাচ্ছে। একটা শ্রান্ত ঔদাস্যে মন আমার ভরে গেল

সকালবেলা স্বাতি বলেছিল, কাল বাজনা শুনেছিলে আমার? বেহাগ বাজিয়েছিলাম।

এরপর স্বাতি আর আমাকে সেতার শোনায় নি।

কিন্তু সেই কথাটি সেদিন কেন বলেছিল?—আমার বসন্ত তো শেষ হয়ে গেছে, তাকে কি আর ফিরিয়ে আনতে কোনদিন পারব?

সেদিন এ কথার মানে আমি বুঝেছিলুম, তাই তাকে কোন প্রশ্ন করি নি। কোন উত্তরও দিতে পারি নি। পরে তাকে আমি উত্তর দিয়েছিলুম। সে কথায় নয়, কাজে। দিল্লী থেকে ফেরবার পথে এলাহাবাদ স্টেশনে আর নামি নি। সোজা ফিরেছিলুম কলকাতায়।

আমি কি এলাহাবাদে নামতে ভয় পেয়েছিলুম? যমুনার অভিশাপের কথাই যদি বিশ্বাস করতুম তো এলাহাবাদের টিকিট কাটতুম কেন? অর্থ প্রতিপত্তি না মিত্রার লোভে?

সেখানে না নেমে আমি কী পেয়েছি?

কে বলে কিছু পাই নি? জীবনের বসন্ত ফুরিয়ে গেছে বলে কি স্বাতি এখনও অপেক্ষা করছে!

চব্বিশ

আমি একটু নড়েচড়ে বসতেই মনোরঞ্জন বলে উঠল: ঘুমোও ঘুমোও, একটু ঘুমিয়ে নাও। রাতটা তো আবার বসে কাটাবে।

মনোরঞ্জনের পাশ থেকে মিস্টার শর্মা জিজ্ঞাসা করলেন: বসে কাটাবেন কেন?

ওর ওই রকম অভ্যেস। বেনারস আসবার পথে ওকে আমি শুতে দেখি নি।

আমি যে খানিকক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাতে আমার সন্দেহ রইল না। বাথরুম থেকে ফিরে এসে মিস্টার শর্মা আমার পাশে না বসে অন্য ধারে মনোরঞ্জনের পাশে বসেছেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হল যে এতক্ষণ তাঁরা গল্প করছিলেন। মিস্টার শর্মা মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন: কনগ্র্যাচুলেশনস্।

নিতান্ত বিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করলুম: অভিনন্দন আবার কিসের জন্যে?

মিস্টার শর্মা একবার মনোরঞ্জনের দিকে আর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে হাসলেন। মনোরঞ্জনও রহস্যময় চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: আপনার কথা আমি বুঝতে পারলুম না।

এর উত্তরে তিনি সাবিত্রীর দিকে চেয়ে হাসলেন।

আমার আর বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। আমার অজ্ঞাতসারে মনোরঞ্জন মিস্টার শর্মার কাছে অনেককিছু বলেছে। কিন্তু কেন বলেছে, তা বুঝতে পারলুম না।

সহযাত্রীর সঙ্গে আমরা আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করি। কিংবা স্থান কাল রাজনীতি নিয়ে। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা মার্জিত রুচির পরিচয় নয়। বললুম: আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারছি না।

নেই বা দিলেন।

বললুম: বিবাহ আমার কাছে বিলাস। আমার বন্ধু এই কথাটি বুঝেও বোঝে না।

মিস্টার শর্মা বললেন: এটি একালের সমস্ত যুবকের কথা। আপনিও এই কথা বলে যুগের ধর্মকেই সম্মান করলেন।

বলুন, যুগের সত্যকে স্বীকার করলুম।

মিস্টার শর্মা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: যে যুগে একজন লোকের উপার্জনের উপর একটা গোটা পরিবার নির্ভর করে থাকত, সে যুগ আজকাল গত হয়েছে। এখন এমন দিন এসেছে যে পরিবারের প্রত্যেককে রোজগার করতে হবে। এই হল সাধারণ মানুষের ভাগ্য। যারা অসাধারণ তাদের অন্য কথা, অন্য নিয়ম। আমি অসাধারণ নই।

মিস্টার শর্মা চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: কেন এমন হল?

এ কথার উত্তর দিতে হলে নিজেরই বিপদ ডাকা হবে। তবে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের নীতির পরিবর্তন সাধন দরকার।

এই সঙ্গেই যোগ দিলুম: মানুষের সমাজে বর্ণভেদ না থাকলে অনেকদিন আগেই আমি সংসার পাড়তে পারতুম। তা যখন করি নি, তখন আর সে বাসনা নেই।

আপনার বয়স এমন কিছু বেশি নয়।

অভিজ্ঞতা বেশী হয়েছে। জেনেশুনে ফাঁদে পা দেবার নির্বুদ্ধিতা আর নেই। তার চেয়ে আপনি অন্য কিছু বলুন।

কী বলব?

বলুন—

ভাবতে গিয়ে প্রথমেই আমার হিন্দীসাহিত্যের দিকপাল ভারতেন্দুর কথা মনে পড়ল. বললুম: ভারতেন্দুর সম্বন্ধে কিছু বলুন।

আমার অনুরোধ শুনে মিস্টার শর্মা হাসতে লাগলেন।

বললুম: হাসছেন যে?

আপনি যে খাঁটি রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক তা বুঝতে পারছি।

কেন?

একটা মধুর প্রসঙ্গ ছেড়ে সাহিত্যের কচকচির মধ্যে ঢুকতে চাইছেন! কিন্তু আমি তো সাহিত্যের অধ্যাপক নই। সব কথা আমি আপনাকে বলতে পারব কেন।

আমাকেও কোন পরীক্ষা দিতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।

মনোরঞ্জন বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল।

মিস্টার শর্মা বললেন: শুনে আশ্চর্য হবেন, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের নামে একটা যুগ ধরা হয়। তিনি মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মারা যান।

বলেন কি!

মিস্টার শর্মা হাসলেন। বললেন: আপনার মত সকলেই এ কথা শুনে চমকে ওঠেন। বেঁচে থাকলে তিনি কী করতে পারতেন সে কথা আজ অবান্তর। যা করেছিলেন, তার জন্যেই তিনি আজ হিন্দী সাহিত্যের জনক বলে মান্য হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে সাহিত্যের ভাষা নিয়ে প্রবল বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। একদল ফার্সির পক্ষে, অন্যদল সংস্কৃতের। তরুণ ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র বললেন, ফার্সি নয়, সংস্কৃত নয়, সাহিত্যের ভাষা হবে পশ্চিমী হিন্দীর কথ্যভাষা খড়িবোলি। এই ভাষার সংস্কারে এগিয়ে এলেন সরস্বতীর সম্পাদক পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিদ্যাসুন্দরের অনুবাদ নিয়ে ভারতেন্দু সাহিত্যের আসরে নামেন ষোল বছর বয়সে। কবিতা ও প্রবন্ধের চেয়ে নাটক লিখে বেশী খ্যাতি পান। তাঁর নাটকে সংস্কৃত রীতির সঙ্গে ইংরেজী আঙ্গিকের সমন্বয় হয়েছে।

ভারতেন্দুর মত পণ্ডিত দ্বিবেদীও একটি যুগের প্রবর্তক। বিশ বছর তিনি সরস্বতীর সম্পাদক ছিলেন এবং খড়িবোলির সংস্কার করে বর্তমানে রূপ দেন। তাঁরই অনুকরণে এ যুগের কবিরা ব্রজভাষা ছেড়ে খড়িবোলিতে

রেজী নয়, মারাঠী ও বাংলা ভাষারও নানা গ্রন্থ াদ করে হিন্দীকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মৈথিলী শরণ গুপ্ত এই যুগের কবি হলেও ছায়াবাদ ন্দালনেরও একজন নায়ক।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ছায়াবাদের কী মানে?

মিস্টার শর্মা বললেন : ছায়াবাদের মানে আমার ছও খুব পরিষ্কার নয়। বোধ হয় ইংরেজী সিজমকেই হিন্দীতে ছায়াবাদ বলা হয়েছে। কন্দ্রিক কবিতা হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মনের উপর প্রকৃতি প্রমের প্রভাব নিয়ে কবিতা শুরু হল। একদিকে র বিদ্যাপতির প্রেরণা, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ ও লী কবিদের প্রভাব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে য় পনর বছর এই ছায়াবাদের যুগ।

এই যুগের কবি মৈথিলী শরণের দুখানি কাব্য ল্লখযোগ্য—সাকেত ও যশোধরা। প্রথমটি রামায়ণ বো উপেক্ষিতা উর্মিলার কাহিনী, দ্বিতীয়টি বুদ্ধপ্রিয়া শারার কথা।

জয়শঙ্কর প্রসাদ তাঁর কামায়ণী কাব্যে শক্তির সাক্ষর খে গেছেন। গল্প উপন্যাস আধুনিক নাটকও ইনি খেছেন। উপন্যাসে আদর্শবাদী ও ছোটগল্পে কাব্য- ী। ঐতিহাসিক নাটক রচনার যুগে তাঁর তুলনা ই।

কবি নিরালা শুধু ছায়াবাদের যুগের নন, এ যুগেরও ষ্ঠ কবি।

আমি বললুম : বাংলাদেশে তাঁর জন্ম বলে শুনেছি।

মিস্টার শর্মা বললেন : মহিষাদল বোধ হয় বাংলায়। লাদেশে মানুষ হয়েছেন বলে বাংলার প্রভাব তাঁর পর পড়েছে, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। দে আমরা তাঁর কবিতার সমালোচনা পড়ে জেনেছি। ন্দময় কবিতাও লিখেছেন, আবার গদ্যকবিতাও আছে। ার অনেক কবিতা আমার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে য়েছে।

নিরালার আসল নাম আমি একবার শুনেছিলুম, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি। সেই কথা শুনে মিস্টার র্মা বললেন : সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা নামে লিখতেন। শুনি নি।

মিস্টার শর্মা বললেন : এঁরই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। আর কবি নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন। ব্রজভাষার লালিত্য যদি খড়িবোলিতে এসে থাকে তো তা কবি সুমিত্রানন্দনের জন্যেই।

একটু ভেবে বললেন : মহাদেবী বর্মার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই বললেন : তিনি শ্রেষ্ঠ মহিলা কবিই নন, তাঁর মত শক্তিমতী কবি শুধু ছায়াবাদের যুগে নয়, এ যুগেও কম আছেন। অনেকে তাঁকে আধুনিক মীরাবাঈ বলেন। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত ও প্রাচীন হিন্দীর কিছু প্রভাব পড়েছে। এঁর সমগ্র কাব্যে একটি বেদনার সুর। মিলনকা মত নাম লে, মৈঁ বিরহ মে চির হুঁ শলভ। ব্যর্থতার পথ বেয়ে আসবে জীবনের সার্থকতা।

মিস্টার শর্মা এইখানে থামলেন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললুম : তারপর?

তারপর প্রগতিবাদের যুগে এসে আমি খেই হারিয়ে ফেলি।

কেন?

কেউ বলেন, শুধু প্রগতিবাদ নয়, আছে পরীক্ষাবাদ বা প্রতীকবাদ।

হেসে বললুম : বাদাহুবাদে আমার দরকার নেই। আপনি কয়েকজন শক্তিশালী লেখকের কথা বলুন।

তা পারি। কবিদের মধ্যে পন্ত নিরালার পর দিনকর সুমন কেদারনাথ।—মিস্টার শর্মা আরও নাম মনে করবার চেষ্টা করছিলেন। আমি বললুম : থাক। এবারে বরং গদ্য-সাহিত্যের কথা কিছু বলুন।

মিস্টার শর্মা আরাম পেলেন, বললেন : সেই ভাল।

কিন্তু কথাসাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে প্রাচীন নাম কোন মনে করতে পারলেন না। বললেন : প্রেমচাঁদের আগের কোন নাম মনে পড়ছে না। বোধ হয় নেই। শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি উর্দুতে লিখতেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিন্দীতে হাত দিলেন। কাজেই হিন্দী কথাসাহিত্যের জীবনকাল বছর চল্লিশের বেশী হবে

... প্রেমচাঁদের কোন লেখা পড়েছেন?

বললুম: উপন্যাস পড়ি নি. দু-একটি ছোটগল্পের অনুবাদ পড়ছি।

তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর লেখা কত জীবনঘনিষ্ঠ। পাত্রপাত্রীর কথাবার্তাও তাদের চরিত্রের অনুকূল। জয়শঙ্কর প্রসাদও এই সময়ে উপন্যাস লিখতেন। তাঁর লেখার অন্য মেজাজ। এমন কি ভাষাও। প্রেমচাঁদের হিন্দীতে যেমন উর্দু ভাষার প্রাধান্য, জয়শঙ্কর তেমনি সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করেছেন। কৌশিক উগ্র এঁরাও এই সময়ে উপন্যাস লিখে নাম করেছেন। কৌশিকের নাম ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য, উগ্র বস্তুবাদে বড়ই উগ্র। জীবনের এমন অনেক নগ্ন চিত্র এঁকেছেন যা বীভৎস। ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ীর লেখাতেও কদর্যতা আছে।

মিস্টার শর্মা একটু ভেবে বললেন: জৈনেন্দ্রকুমার এই যুগের আর একটি নাম। তাঁর উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা যায়।

এর পর মিস্টার শর্মা আর অনেকক্ষণ কথা কইলেন না। যখন আমার মনে হল যে তিনি আর কিছু বলবেন না, তখন জিজ্ঞাসা করলুম: এ যুগের কথা কিছু বলবেন না?

এই যুগের কথা।

হ্যাঁ।

এ যুগের সাহিত্যের খবর এ যুগের লোকের কাছেই পেতে পারেন। আমরা পুরনো হয়ে গেছি।

বললুম: সাহিত্যের খবর একেবারেই রাখেন না, এ কথা সত্য হতে পারে না।

কিছু পড়ি এবং পড়ে আনন্দও পাই। কিছু বলতে ভয় পাই এইজন্যে যে পড়ার চেয়ে না পড়ার বহরই বেশী। ভালকে বাদ দিয়ে হয়তো মন্দর নামই করে বসব।

আমার তাতে ক্ষতি নেই।

তাহলে আপনাকে দু-তিনটে নাম বলি। যশপাল, অজ্ঞেয় ও ইলাচাঁদ যোশী। ভগবতীচরণ শর্মাও শক্তিমান লেখক। যশপাল মার্কসবাদী, অজ্ঞেয় মনস্তাত্ত্বিক, আর

মনে হয়েছে। এ যুগে আরও অনেক জনপ্রিয় লেখক আছেন, কিন্তু শ্রদ্ধা করবার মত লেখক আমি কম পেয়েছি। পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও রাহুল সাংকৃত্যায়ণ। যদি সম্ভব হয়, তাঁদের একখানি করে বই আপনি পড়ে দেখবেন।

বলুন।

দ্বিবেদীজীর বাণভট্ট কি আত্মকথা ও রাহুলজীর ভোল্‌গা সে গঙ্গা।

বললুম: ভোল্‌গা সে গঙ্গা আমি বাংলায় পড়েছি। সমাজবিবর্তনের অপূর্ব চিত্র।

মিস্টার শর্মা খুশী হয়ে বললেন: বাংলায় অনুবাদ হয়েছে বুঝি!

হয়েছে। আরও অনেক হিন্দী বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। সে সবের নাম আমি জানি না।

মিস্টার শর্মা বললেন: বাংলার সাহিত্য এত উন্নত যে অনুবাদ পড়বার প্রয়োজন আপনাদের হয় না। হিন্দী সাহিত্য অনেক পিছনে পড়ে ছিল, কিন্তু খুব দ্রুত উন্নতি করছে। এই দেখুন না, ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পে কত উন্নতি হয়েছে। নাটকও মন্দ লেখা হচ্ছে না। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নাটকের চেয়ে একাঙ্ক নাটকই বেশী। শুধু গদ্যসাহিত্য এখনও তেমন সমৃদ্ধ নয়। তবে অনেকেই হাত দিয়েছেন। সাহিত্যিকেরাও পিছিয়ে নেই। নিরালা জয়শঙ্কর প্রসাদ সুমিত্রানন্দন ও অজ্ঞেয় গদ্য লিখছেন। আশা করা যায় এ দারিদ্র্য দূর হতে আর দেরি নেই।

মনোরঞ্জন এতক্ষণ মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। এইবারে বলে উঠল: বাংলার কাছে ঋণের কথা কিছু বললেন না?

সে যে আমাদের আলোচনা শুনছিল, সে কথা বুঝতে পারি নি। মিস্টার শর্মাও আশ্চর্য হলেন। বললেন: শুধু বাংলা কেন, হিন্দী অনেকের কাছেই ঋণী।

আমি মনোরঞ্জনের দিকে তাকালুম।

মনোরঞ্জন বলল: কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলুম যে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার প্রয়োজনে

রছিলেন। পাঞ্জাবে নবীনচন্দ্র রায় প্রথম আন্দোলন রন ও তাঁর কন্যা সুগৃহিণী নামে একটি হিন্দী পত্রিকা াশ করেন। কলকাতায় প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র কাশিত হয় সমাচার সুধা বর্ষণ, তার সম্পাদক শ্যামসুন্দর ন। বেনারস আখবার ও সুধাকর নামে যে দুখানি খ্যাত পত্রিকা বের হত, তার সম্পাদক ছিলেন তারা-াঁদ মিত্র। এ সমস্তই গত শতাব্দীর কথা, হিন্দী হিত্যে ভারতেন্দুর যুগ তখনও শুরু হয় নি।

মনোরঞ্জন তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তাকে ান্ত করবার জন্য বললুম: অনেক কথা মনে রেখেছ া।

[illegible] বেহারের লোক বাঙালীকে শত্রু মনে করে না, তাই এসব মুখস্থ করে রেখেছি।

এই প্রসঙ্গে সুনীতিবাবুর কথা আমার মনে পড়ল। ন্তু মিস্টার শর্মা দুঃখিত হবেন বলে বললুম না। তিনি লখেছিলেন, একশো বছর আগে খড়িবোলি অর্থাৎ াধুনিক নমুনার হিন্দী গদ্যে কোন সাহিত্য ছিল না। মন কি ১৯২৫ সন পর্যন্তও খড়িবোলি গদ্যে কোন াধিক সাহিত্যের নিদর্শন নেই। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের র্বাচীন এই হিন্দী গদ্য এখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা য়েছে।

এর পিছনে কোন রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে কিনা, া নেতারা জানেন। আমাদের আলোচনা এখানে বান্তর।

পঁচিশ

বাইরে কখন সূর্যাস্ত হয়েছিল খেয়াল করি নি। বোবাঁকিও পেরিয়ে এসেছি। এর পরেই লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ শহরের সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য আমার খুবই কৌতূহল ছিল। কিন্তু শর্মাজীকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে আমার লজ্জা হল। সারা দুপুর তাঁকে অনেক বকিয়েছি, নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে তাঁকে জ্বালাতন কম করি নি। অধ্যাপক মানুষ বলেই তিনি এত কথা বলতে পেরেছেন, অন্য মানুষ হলে চুপ করে থাকতেন, কিংবা চটে উঠতেন।

পথে তিনি কিছু খান নি। চা খান না, কোনও [illegible] হয়েছি। মনে হয়েছে, তিনি ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন, পাঁচজনের হাতের ছোঁয়া খান না। কিছু বলতে না পেরে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলুম।

সহসা শর্মাজী প্রশ্ন করলেন: লক্ষ্ণৌয়ে একবার নামবেন না?

মনোরঞ্জন উত্তর দিল: এখন তো অসম্ভব।

ফেরার পথে?

আমি উত্তর দিলুম: চেষ্টা করে দেখব।

শর্মাজী বললেন: যদি নামেন তো গরীবের কুটীরে উঠবেন।

বলে নোটবুকের একটি পাতায় নিজের নাম ঠিকানা লিখে সেই পাতাটি ছিঁড়ে আমার হাতে দিলেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে সেই কাগজ পড়ে পকেটে রাখলুম।

শর্মাজী বললেন: সাইকেল রিকশায় চেপে বসলে দশ মিনিটেই পৌঁছে যাবেন।

এইবারে সুযোগ পেলুম, বললুম: কী দেখাবেন আমাদের?

যা কিছু দ্রষ্টব্য আছে টাঙ্গায় করে সবই দেখিয়ে দেব।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। তাই দেখে বললেন: লক্ষ্ণৌয়ের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তা আপনাদের মানতেই হবে। গঙ্গার শাখা গোমতী, তারই তীরে বিস্তৃত প্রশস্ত শহর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। কেউ বলেন রামায়ণের লক্ষ্মণ এই শহর পত্তন করেন। কেউ বলেন জৌনপুরের মুসলমান শাসনকর্তার হুকুমে লখ্‌না নামে এক হিন্দু স্থপতি এই শহর তৈরি করেন। তাঁদের নামেই শহরের নাম। কিন্তু আজকের লক্ষ্ণৌ যে অযোধ্যার তৃতীয় নবাব আসফ উদ্দৌল্লার কীর্তি, তাতে আর সন্দেহ নেই। তার সবচেয়ে বড় কাজ হল গোমতী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত বড় ইমামবরা। আসফ উদ্দৌলা নবাব হবার ন বছর পরে কিফায়েৎ উল্লা নামে একজন স্থপতি এই ইমামবরা তৈরি করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকের কথা।

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল: ইমামবরা কী?

মহরমের উৎসব হয় এখানে, আলি ও তাঁর দুই পুত্র হাসান আর হোসেনের উৎসব। পঞ্চাশ ফুট উঁচু এর বড়

ঘরটি, কিন্তু কোন থাম নেই। উপর থেকে লক্ষ্ণৌ শহরটা দেখে নিতে যেন ভুলবেন না।

এর পরে রুমি দরওয়াজা পেরিয়ে ছোট ইমামবরা। রুমি দরওয়াজাকে কেউ কেউ টারকিনা গেটও বলেন। এই ইমামবরা নবাব মুহম্মদ আলি শাহর আমলে তৈরি, সিপাহী বিদ্রোহের পনর-যোল বছর আগে। এর ভিতরের জাঁকজমক ভাল করে দেখে নেবেন, পাশের পুরনো প্রাসাদে দেখবেন নবাবদের ছবি।

নদীর ধারে ধারে যে পথ, তার উপর পুরনো রেসিডেন্সীর ধ্বংসাবশেষ। এই বাড়ির আয়ু ছিল মাত্র সাতান্ন বছর। সিপাহীরা ইংরেজ মারতে গিয়ে বাড়িটাও ধ্বংস করেছিল। এখন এখানকার বাগানে ভাল গোলাপ ফোটে।

শহরের দিকে আর খানিকটা এগিয়ে কাইজার বাগ। পার্কের দু ধারে কয়েক সারি হলদে বাড়ি। নবাবের হারেম ছিল একসময়ে। কাছেই নবাব শাহ আফৎ আলি খান ও তাঁর রূপবতী বেগম খুরশিদের সমাধি।

খুরশিদ মনজিলে আজকাল মেয়েদের লা মার্টিনিয়ার স্কুল বসেছে। ছেলেদের লা মার্টিনিয়ার কলেজ হল ক্যান্টনমেন্টের কাছে। জেনারেল ক্লড মার্টিনের নাম লক্ষ্ণৌয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোত ভাবে। ফরাসী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে এই ভদ্রলোক ভারতে এসেছিলেন তাঁর ভাগ্যান্বেষণে। কিছুদিন পরে ইংরেজের সেনাদলে তাঁকে দেখা গেল বিখ্যাত সেনাপতিরূপে। ভদ্রলোক শিল্পী ছিলেন, ব্যবসায় বুদ্ধিও তাঁর প্রখর ছিল। লক্ষ্ণৌয়ের এই সমস্ত প্রাসাদের পরিকল্পনা একদিন তিনিই করেছিলেন। ভারতবর্ষকে যে তিনি ভালবেসেছিলেন, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে কলকাতা ও লক্ষ্ণৌয়ের স্কুল ও কলেজ। তাঁর সারা জীবনের উপার্জন উজাড় করে দিয়েছেন তিনটি বিদ্যাপীঠের জন্য। তৃতীয়টি তাঁর জন্মস্থান লিয়ঁ শহরে।

ক্লড মার্টিনের গল্প আমাদের জানা ছিল না। শুনে বড় আশ্চর্য লাগল।

কিন্তু শর্মাজী থামলেন না, বললেন : মেয়েদের স্কুলের কাছেই সাদা বড় গম্বুজওয়ালা শাহ নাজাফ নবাব গাজী উদ্দীন হাইদর ও তাঁর পত্নীর সমাধি। সোনা ও রূপোর

গাড়ির গতি মন্থর হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলুম যে লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে আর দেরি নেই। শর্মাজী তাড়াতাড়ি বললেন : যে সব বাগানের জন্য লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধি আছে, তাও দেখিয়ে দেব। বানারসী বাগ একসময় নবাবের প্রাসাদের অন্তর্গত ছিল। এখন চিড়িয়াখানা হয়েছে। জন্তুজানোয়ারকে এখানে স্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর রাখা হয়েছে। চোখের সামনে গণ্ডার আর বাঘ সিংহ স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এইটুকুই এই চিড়িয়াখানার বিশেষত্ব।

দেখাব সিকান্দার বাগ। অযোধ্যার শেষ নবাব যা তাঁর বেগমের জন্য তৈরি করেছিলেন। আজ তাকে বটানিকাল গার্ডেনে পরিণত করা হয়েছে। দেখাব দিলখুশা। নবাবরা শিকার করতেন এখানে। লক্ষ্ণৌবাসী আজ দিলখুশায় পিকনিক করছে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় দেখাব, দেখাব মেয়েদের ইসাবেলা থোবর্ন কলেজ, ভাতখণ্ডের গানের স্কুল, আর্ট স্কুল, বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অব পলেবটানি, আর ছাত্তার মনজিলে সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল : বাজার দেখাবেন না?

দেখাব বইকি। হজরতগঞ্জ ও আমিনাবাদ দুটো বাজারই দেখাব। হোটেলে খাঁটি মোগলাই খানা খাওয়াব—বিরিয়ানি পোলাও, মুরগ মুসল্লম আর ককোরি কাবাব। তারপর বাড়ির জন্য চিকনের শাড়ি কিনে দেশে ফিরবেন।

বলে শর্মাজী হাসলেন।

মনোরঞ্জন বলে উঠল : গোপালকে সেই আশীর্বাদ করুন। ওর যেন এইবারেই শাড়ি কেনবার দরকার হয়।

স্টেশনে এসে গাড়ি থামছিল। শর্মাজী দাঁড়িয়ে বললেন : কানপুর আর লক্ষ্ণৌ, এ দুটোই নতুন স্টেশন অবশ্য এখন পুরনো হয়ে গেছে। স্টেশন থেকে বেরুবার সময় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখবেন। রাজস্থানী শৈলী আপনাদের ভাল লাগবে।

ভদ্রলোক নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্যে তৈরি হলেন। হঠাৎ কী মনে হতেই টাইমটেবল

লজ্জিতভাবে আমি বললুম: না না, আমাদের কার হবে না।

শর্মাজী হেসে বললেন: সঙ্গে থাকলেই কাজে হবে। আসি।

বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমিও তাঁর পিছনে এগিয়ে গেলুম। তিনি নামলে আমিও নেমে দাঁড়ালুম। শ্রদ্ধা জানিয়ে আনন্দ পেলুম অন্তরে। শ্রদ্ধারই পাত্র। শুধু দিয়ে গেলেন, নিলেন কিছু। অতীতে গুরুশিষ্যের এই সম্বন্ধই ছিল।

মনোরঞ্জন আমাকে ডেকে বলল: তোমার টাইম-টেবলটা একবার দেখ তো।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে বললুম: কী দেখব?

বউদি বলছেন, ভরসন্ধ্যায় খাওয়া উচিত নয়, এর পরে কোন খাবার জায়গা আছে?

এ আমি আগেই দেখেছিলুম। বললুম: আছে। রাত নটায় হর্দৈ স্টেশনে খাবার পাওয়া যাবে।

মনোরঞ্জন পাঁচুকে জিজ্ঞাসা করল: রাত নটা পর্যন্ত জাগতে পারবে তো?

পাঁচু মাথা দুলিয়ে বলল: খুব পারব।

মিসেস মুখার্জি তারাপদবাবুকে কিছু বললেন। উনি ব্যস্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালেন। তারপরেই ডাকলেন একটা কলাওয়ালাকে। সবুজ রঙের সিঙ্গাপুরী কলা। তাই এক ডজন কিনে স্ত্রীর হাতে দিলেন। বুঝতে পারলুম যে পাঁচুর জন্যে কেনা হল। সে একটু খেতে পাবে, আমরাও পেতে পারি।

মাটির খেলনা নিয়ে ফেরিওয়ালারা জানলার কাছে ছুটেছে। নানারকমের ফল, পাখি। কাগজের বাক্সে নানা জাতের সাধু পাশাপাশি সাজানো। আরও কত কী। দেখতে বেশ, দামও বেশী নয়। কিন্তু নিয়ে যাবার হাঙ্গামা। মিসেস মুখার্জি বললেন: না না, এখন এসব নয়। ফেরার পথে দেখব।

চল্লিশ মিনিট দাঁড়াবার পর ট্রেন ছাড়ল।

এর পর বালামৌ। বালামৌয়ের নামে আমার নৈমিষারণ্যের কথা মনে পড়ল। বালামৌ থেকে সিতাপুর লাইনে নৈমিষারণ্য ষোল মাইল দূরে। গোমতী নদীর তীরে অতি প্রাচীন তীর্থ। রামায়ণে এর উল্লেখ আছে। ষাট হাজার মুনির বাস বলে এই অরণ্য প্রসিদ্ধ ছিল।

সাড়ে চার হাজার বছর আগের কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেশ ছারখার হয়ে গেছে। জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞ শেষ হয়েছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সেখানে নিজে কথাবৃত্তি করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পঞ্চম শিষ্য রোমহর্ষণ ও তাঁর পুত্র উগ্রশ্রবা। তারপর কুলপতি শৌনক এই নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করলেন। ষাট হাজার মুনি-ঋষি এসে একত্র হলেন। পুরাণের আলোচনা হচ্ছে, তাতে সভাপতিত্ব করছেন সুত রোমহর্ষণ। এমন অদ্ভুতভাবে তিনি পুরাণের গল্প বলতে পারতেন যে তা শুনে শ্রোতাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। সেইজন্যেই তাঁর নাম হয়েছিল রোমহর্ষণ।

সেদিন আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি। দশখানি পুরাণ পাঠ শেষ করে রোমহর্ষণ একাদশ পুরাণ শুরু করেছেন। এমন সময় তীর্থযাত্রী বলরাম এসে সভায় উপস্থিত হলেন। সমবেত ব্রাহ্মণেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু রোমহর্ষণ তাঁর সভাপতির আসন পরিত্যাগ করে বলরামকে সম্মান প্রদর্শন করলেন না। বলরাম ক্রুদ্ধ হলেন, সুতপুত্রের এতবড় স্পর্ধা!

রোমহর্ষণ প্রতিলোম বিবাহের সন্তান। তাঁর ক্ষত্রিয় পিতা, মা ব্রাহ্মণ। বলরাম এই কারণেই বললেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁকে সম্মান দিতে পারলেন, আর এত অহঙ্কার একজন সুতপুত্রের! ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলরাম তাঁকে হত্যা করলেন।

তারপর অসমাপ্ত কাজের ভার পড়ল সৌতি উগ্রশ্রবার উপর। বাকি সাড়ে সাতখানি পুরাণ পিতার উপযুক্ত পুত্র আবৃত্তি করে শোনালেন।

নৈমিষারণ্যে এখন অরণ্য আছে কিনা জানি না। তবে একটা বাংলা বইয়ে এই তীর্থের কথা কিছু পড়েছি। নৈমিষারণ্যকে এখন নিমসর বা নিমখার বলে। এই নাম কেন হয়েছিল তা পড়েছি। ব্রহ্মা এক মণিময় চক্র নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই চক্র পৃথিবী পরিক্রমা করে এইখানে এসে ভাঙল। সঙ্গে ছিলেন মুনি ঋষি ও তীর্থ। তাঁরাও এখানে থামলেন। কেউ বলেন, দানবসেনা এখানে এক নিমেষে ধ্বংস হয়েছিল।

নিমসরে আসতে হয় ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে। তখন এখানে পরিক্রমা মেলা, নানা স্থান ঘুরে সেই মেলা আসবে মিশ্রিকে। মিশ্রিকের দধীচিকুণ্ড ও হত্যাহরণ তীর্থ সকলে দেখে। অসুর বধের জন্য ইন্দ্রের নতুন অস্ত্র চাই। বজ্র তৈরি হবে। দেবতারা দধীচির হাড় প্রার্থনা করলেন। ঋষি এই দধীচিকুণ্ডে স্নান করে ইন্দ্রকে তাঁর দেহ দান করেছিলেন। রাবণ বধ করে রামের ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ হয়েছিল। তাঁর সেই পাপ স্খলন হয় হত্যাহরণ তীর্থে স্নান করে।

নিমসরেও অনেক তীর্থ আছে। চক্রতীর্থ, ললিতা দেবীর মন্দির। চক্রতীর্থ চতুষ্কোণ সরোবর নয়, এর ছটি কোণ। চারিদিকে ছোট বড় আরও অনেক তীর্থ ও মন্দির আছে। রাত্রিবাসের জন্য ধর্মশালাও আছে। যাঁদের সময় কম, তাঁরা এক ট্রেনে নেমে আর এক ট্রেনে ফিরে আসেন। আমরা নৈমিষারণ্যে যাব না।

[ক্রমশঃ]

প্রদোষের প্রান্তে

মূল রচনা : The Edge of **Darkness—Mary Ellen** Chase

অনুবাদ : রাণু ভৌমিক

৬

সারা হন্টের অপরাপর প্রতিবেশীদের মধ্যে একমাত্র স্থাম পার্কার ছাড়া আর কেউ ওঁকে লুসী নর্টনের মত চিনত না। লুসীর চেয়ে কম চিন্তাশীল এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কর্মে ব্যস্ত—যে সব কাজ প্রথানুসারে তাদের মধ্যে এসেছে অথবা প্রয়োজনে নিজেরাই আরম্ভ করেছে—এই অধিবাসীরা নিজেদের কর্মসমষ্টি নিয়েও চিন্তা করে না, এমন কি ভালভাবে বুঝতেই পারে না। ওরা খুব আশ্চর্যান্বিত ও বিচলিত হত যদি মুহূর্তের জন্যও জানতে পারত যে এই বৃদ্ধা মহিলা ওদের কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন এবং কত সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেন। কিন্তু ওঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতা ওদের সর্বদাই ছিল। ওরা জানত উনি কোভের ওপরে নিজের ঘরে বসে আছেন এবং শেষ দিনগুলিতেও সামনের বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখছেন। যদি আর কাকেও ওঁর মত অতীতের জীবনের গোপনীয়তা ও প্রেমের মত একটি ছেলে যে মায়ের জীবনে অশান্তি ও অপমান এনেছে তাকে নিয়ে চলতে হত তাহলে তাঁকে ওরা করুণা করত। কিন্তু, ওরা এক বিশেষ অনুভূতিতে বুঝতে পেরেছিল যে উনি করুণাপ্রার্থী নন। সময়ে সময়ে ওরা অন্তরিভরে ওঁর মনের ভাব এবং কেন ওঁকে ওদের থেকে পৃথক করে দিয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করত।

ওঁর মৃত্যুর পরে ওরা বুঝতে পারল এ সম্বন্ধে ধারণা করতেই ওরা অক্ষম।

হান্না ও বেঞ্জামিন স্টীভেনস

এই শতাব্দীর প্রথমদিকে শীবরের জীবিকা নেবার সম্মানজনক জীবিকা উপকূলরক্ষীরা আলোর স্টেশনগুলোর ভার নেবার আগে প্রায়ই পিতা থেকে পুত্রে বর্তাতো। বেঞ্জামিনের পরিবারে এই বৃত্তি তিন পুরুষের। বেন এক একর পাহাড়ে জন্মেছিল ও পালিত হয়েছিল। এই পাহাড়টি মেনল্যাণ্ড থেকে ... মাইল দূরে উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে অবস্থিত ও ... বিপজ্জনক প্রণালী বলে চিহ্নিত ছিল। শৈশবে ও ... খেলার মাঠ ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং পৈতৃক গৃহ—একশো ফুট ওপরে আলোর দণ্ডের সঙ্গে আটকানো একটি ছোট ধূসর বর্ণ ঘর।

শৈশব থেকেই ও পিতার সঙ্গে ঘোরানো সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেত—যা অনেক ওপরে লণ্ঠন-ঘরে মিশেছে এবং বড় তেলের বাতির ফিতে কাটা, পরিষ্কার করা এবং তেল-ভরা দেখত। প্রদোষ থেকে প্রভাত পর্যন্ত এই আলোটি চার ঘণ্টা অন্তর ওঠানো-নামানো হত। সে বিশেষ স্পর্শকাতর বা কল্পনাপ্রবণ ছেলে ছিল না। তা ছাড়া অপরাপর ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করবার মত অত আলাপ-পরিচয়ও তার ছিল না। কাজেই সে এই বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পটভূমিকাকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। তাই ওর মা বড় ভয় নিয়ে মনে করে প্রবল জোয়ারের সময়ে ওকে বাইরের লোহার সিঁড়িতে শক্ত করে বেঁধে রাখতেন, তখন ও খুব বিরক্ত হলেও আশ্চর্য হত না।

রৌদ্রালোকিত দিনে স্রোতের নিম্ন গতিতে ওর খেলার মাঠ চারিদিকে কুড়ি ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত, তখন তার অনেক কিছু করণীয় ছিল। সে দাঁড়ের ওপরে বসে থাকা দলে দলে টার্ন পাখী, ওলরিব করমরান্ট এবং গাল পাখীদের ভয় দেখাত আর ওদের কর্কশ ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনত। তাকিয়ে দেখত কি ভাবে

উন্নাত শৈলস্তবকের পাথরের ওপরে রোদে শুতে এ ছাড়া ওর কাজ ছিল স্তূপীকৃত অলিভ সবুজ আকারের সমুদ্র-আগাছা থেকে স্রোতে ভেসে-চিংড়ী মাছের ফাঁদ ও বয়া, ভাসানো ছিপি, পরিষ্কার র উজ্জ্বল, পাকানো সুতো অন্বেষণ এবং সমুদ্রের ট ঢেউয়ের আঘাতে উঁচু বাঁধানো তীরে যে সব গর্ত হ তা খুঁজে খুঁজে দেখা। দিনটা খুব বিশ্রী না সে নৌকোর আচ্ছাদনের কোণ থেকে মাছ ধরত। যেদিন সরকারী কাটাররা তেল ও অন্যান্য াজনীয় জিনিস নিয়ে কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ এসে স্থিত হত সেদিন তো ওর খুবই উত্তেজনার দিন। কোলে সমুদ্রে যখন এক-মাস্তুল জাহাজ বা লঞ্চ ওখানে চানো সম্ভব হত তখন মধ্যে মধ্যে দর্শকরা অনেক ধাপ রে সেই স্তম্ভের শীর্ষে উঠতেন—বিরাট লণ্ঠনটার কাজ, ও দূরবর্তী সমুদ্র উপকূলের বিস্তৃত দৃশ্য দেখতেন এবং রকম একটি অভিশপ্ত নির্জন জীবনযাত্রার কষ্ট নিয়ে লোচনা করতেন। একটু বড় হয়ে সে পশ্চিমদিকের নো শৈলস্তবকের ওপরে কতকগুলো জাল পেতে জেদের জন্য গলদা চিংড়ী ধরত, এমন কি ওর বাবা ন মধ্যে মধ্যে ডাকে চিঠি আনতে বা অন্যান্য জিনিসের মেনল্যাণ্ডে যেতেন তখন তার সঙ্গে বিক্রির জন্য কিছু য়ে দিত। তার একমাত্র খেলার সঙ্গী ছিল ওর পাঁচ রের ছোট বোন। যার সম্বন্ধে ওদের মা প্রায়ই শ্চিন্তা করতেন এবং যে তার নানারকম পরিকল্পনার রেক্তিকর প্রতিবন্ধক ছিল।

পড়াশুনা ও খুব অল্পদিনই করেছিল। নিকটবর্তী মেনল্যাণ্ড স্কুল থেকে বই ধার দেওয়া হত। সেই বই ড়ে এবং মায়ের শিক্ষকতায় খানিকটা এগিয়ে যাবার রে সমুদ্রতীরবর্তী মিশনের শিক্ষয়িত্রী বছরে একবার অথবা বার পক্ষকাল পড়িয়ে যেতেন। শিক্ষিকা ছিলেন এক নির্ভীক যুবতী। যাঁকে বছরের বারো মাসের মধ্যে এগারো মাসই যেখানে শিশু আছে এমন এক আলোঘর থেকে অপর আলোঘরে নিয়ে যাওয়া হত। তিনি সেই স্বল্পকালে যতটা সম্ভব পড়াতেন। এই সব ছাত্রদের নিয়ে তাঁর স্কুলঘর হত বায়ু নিকাশের গোলাকৃতি [illegible] চেয়ার ও শিক্ষকদের জন্য একটি টেবিলে সাজানো হত। শিক্ষিকাটিকে ছোট বোন এর চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহে স্বাগত জানাত। বারো বছর বয়সে তাকে মেনল্যাণ্ডে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে তিন-চারটি টার্মের জন্য স্কুলে পড়ানো হল। সেই সব বই তার একটুও ভাল লাগে নি এবং সে অপরিচিত পরিবেশে সর্বদাই অস্বস্তি বোধ করেছে।

যৌবনে সে বেশ স্থূলদেহ হয়ে উঠেছিল—দীর্ঘাকৃতি ও ভারী, দৃঢ় কঠিন পেশী এবং শক্তিশালী হস্তদ্বয়। যদিও তার হাঁটাচলা ছিল যথেষ্ট ক্ষিপ্র ও নমনীয়; একটু রুক্ষ, প্রভুত্বভরা ভঙ্গীতে হলেও চেহারাটা ছিল মোটামুটি সুশ্রী; কুৎসিত ভাব ঢাকবার জন্যে সে এক ধরনের ঔদ্ধত্যের মুখোস পরে থাকত। সে স্থির নিশ্চিতভাবে জানত যে সে আলো-রক্ষকই হবে—খুব সম্ভবতঃ বাবার আলো-স্টেশনে—যখন তার বাবার কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং যখন তিনি সমস্ত জীবনের অবিরত পরিশ্রমে প্রণালী দিয়ে জাহাজ, মাছের বোট, কাঠের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়া দু-মাস্তুল জাহাজ, উপকূলে যাবার স্টীমার অথবা প্রমোদতরী নিরাপদে পাঠাবার দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে মেনল্যাণ্ডে গিয়ে বাস করবেন।

২

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর কম্পন অনুভব করতে থাকল এবং ধীরে ধীরে ওর মনে ভবিষ্যতের নানা রকম ভাবনা উপস্থিত হল। মধ্যে মধ্যে সমুদ্র ও আকাশ ঠিক থাকলে সে মেনল্যাণ্ডের শহরে দৃশ্য দেখতে যেত। শেষের দিকে সাহস সংগ্রহ করে ও নাচত। কখনও কখনও তার সঙ্গে তাদের প্রতিবেশী—দশ মাইল দূরবর্তী ঠিক তেমনি বিপজ্জনক সমুদ্রের আলো-রক্ষকের ছেলের সঙ্গে দেখা হত। তারা প্রায়ই মেনল্যাণ্ডের ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া কথা-কাটাকাটি বা মারামারি করত এবং সেই সব কলহে তারাই বিজয়ী হত। এই ভাবে ওদের শক্তি ও পেশীচালনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

একবার এই রকম একটি অভিযান ও হাতাহাতির

পরে তার একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। মেয়েটির নাম হান্না খ্যাল। তার বাবার একটা ঝিনুকের কারখানা ছিল এবং তিনি নিজের উপকূলগ্রামে যথেষ্ট ক্ষমতাবান ও অর্থবান। হান্না কৃশ, সুন্দরী। ও নিজে ভাল নাচত এবং বেনের হোঁচট খেয়ে অনিশ্চিত পদের নৃত্য সহ্য করত। ও স্পষ্টতঃই তার অনুরাগিণী ছিল। হান্নার পোশাক ছিল চমৎকার। বন্ধুর সঙ্গে বাৎসরিক ভ্রমণে গিয়ে ও খাস বোষ্টন শহর থেকে কিনেছিল। লোকেরা মেয়েটির খুব প্রশংসা করত। ও ওর বাবার কারখানায় অনেক সাহায্য করত এবং ব্যাপটিস্ট গির্জায় পিয়ানো বাজাত। ওর বাবা মা অবশ্য ওর নাচের আসরে যাওয়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু তরুণ বেঞ্জামিন বুঝেছিল যে ও পিতামাতা উভয়কেই দাবিয়ে রাখে। এই প্রথম কোন মেয়ের ভালবাসা সে পেল। এই সব কারণে এবং ভবিষ্যতের স্থায়িত্ব ও সাহায্যের প্রয়োজনে সে এক সন্ধ্যায় নিতান্ত রুক্ষভাবে হান্নাকে বিয়ের প্রস্তাব করল। হান্না স্বীকৃত হলে সে অসীম তৃপ্তি পেল ও নিশ্চিন্ত হল। তখন তার বয়স একুশ, হান্নার প্রায় চব্বিশ।

পরের ঘটনাগুলো ওদের দুজনের পক্ষেই সহজে ঘটে গেল। সে অনেক সময়ে ভাবত নিতান্ত অকরুণরূপে যদিও ঠিক এই রকম চিন্তা করবার মত মানসিক গঠন তার ছিল না। তার বাবা পঞ্চাশ বছর বয়সে বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেলেন এবং তার পক্ষে দুরারোহ ওই সিঁড়ি পার হয়ে বাতি-ঘরে যাওয়া প্রতিদিনই কষ্টকর হয়ে উঠল। তার মা-ও শৈশব থেকে মেনল্যাণ্ডের রীতিনীতি থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবনের শেষ কটা দিন এই দুর্ভেদ্য কুয়াশা, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, অবিরত অশান্তি এবং গাল পাখীর সুদূর তীব্র চিৎকার থেকে দূরে আরামে কাটাতে চাইলেন। ছোট বোনটি—শিক্ষার এই অনির্দেশ্য স্বল্প সুযোগেও তার থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল—উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে এই ব্যবস্থায় ওর স্কুলে পড়ার স্বপ্নকে সফল করে তুলতে পারবে। সুতরাং সব দিক ভেবে নিলে বেনের এই পাহারাদারের কাজ নেওয়া অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় কি হতে পারত? এই বৃত্তিতে সে বংশের তৃতীয় পুরুষ। সরকারী কর্মচারীরা করাই জাহাজকে নিরাপদ পথে চালনা করবার সর্বাপেক্ষা সুব্যবস্থা। যখন ও সন্তানসম্ভবা হল, ছোট্ট রান্নাঘরটায় নিজেকে মন্থর ও জড়বৎ মনে হত; কিন্তু ওর দেহমনের অবস্থা যাই হোক না কেন ওকে শুধু সেই ঘরটি নয় বাড়ির সবগুলো ঘর পরিষ্কার রাখতে হবে, ডিসগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ঝকঝক করবে, ধাতুর তৈরি প্রতিটি দরজার হাতল পালিশ করা হবে, তখন হান্না সময়ের অনেক আগেই বাপের বাড়ি যাবার জন্য জেদ করতে লাগল। ও বলল, হয়তো কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না-ও ঘটতে পারে এবং হয়তো ডাক্তারও ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারবে, কিন্তু সেজন্য ও অপেক্ষা করবে না। অপরাপর আলো-রক্ষকের স্ত্রীরা যদি এই রকম ভীতিকর একাকীত্বে অপেক্ষা করতে চায় তো করুক, ও রাজী নয়।

ওদের আলোর স্টেশনে প্রবাসজীবন যন্ত্রণাময় হয়েছিল। হান্নার মতে এ স্থান শিশুর অনুপযোগী এবং একরোখা অশান্ত ছেলের পক্ষে বিপজ্জনক। সন্তানকে বিপদের নাগালের বাইরে বেঁধে রাখবার নিয়ম ও মনে-প্রাণে ঘৃণা করত এবং এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করত। স্বামীও ক্রমাগত তার অনুযোগ ও অসন্তোষ-পূর্ণ অভিযোগ শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। এক বসন্ত দিনে যখন সে সমুদ্রতীর ও নৌকো-আচ্ছাদন নিয়ে এবং হান্না ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন তাদের তিন বছরের মেয়েটি পাহাড়ের একটা গভীর গর্তে পড়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ভাটার টানে জল সরে গেলে ওকে তারা খুঁজে পেল। তারা আজও জানে না শিশুটি কিভাবে মারা গিয়েছিল—পতনের আঘাতে অথবা জলে ডুবে।

অপর একটি আলো-রক্ষক পাওয়া যাওয়ামাত্র বেঞ্জামিন স্টীভেনস মেনল্যাণ্ডে হান্নার সঙ্গে মিলিত হল। কয়েক মাস পরেই ও কোভের বসতিতে এসে চিংড়ি-মাছওয়ালা হয়ে বসল। শিশুটির স্মৃতিতে তারা বহু বছর পীড়িত হত যদিও পরস্পরের কাছে বিশেষ কোন উল্লেখ করত না—আর বাইরের লোকের কাছে কোন দিনই নয়। হান্নার মনে হত ওর মনের মধ্যে একটা দাঁত-কাটা পাথর থেকে থেকে উল্টেপাল্টে ঘুরছে—যে ভাবে

পরে এই অস্তিত্বের যে অশ্রান্ত যন্ত্রণা এতদিন শেষ করে দিচ্ছিল তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল ওর মনে হল। মনে হল এবার ভুলবে।

কিন্তু এ কখনও হান্নাকে ভোলে নি।

৩

এই মৎস্য উপনিবেশে নতুন জীবন যাপনের প্রথম দুই প্রতিবেশীদের অপেক্ষা ওরা বহির্জীবনের প্রতি আগ্রহশীল ছিল না। হান্না বলত, বেন মধ্যে মধ্যে বর্তন ভালবাসে এবং ও তা পাবার জন্য কঠিন শ্রম করে। জেলে হিসেবে সে ধীর, স্থির, সাবধানী, ছেগী নয়, কঠিন পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থের উদ্বৃত্ত দ সে চিংড়ী মাছের পরিপূরক হিসেবে হেরিং ধরবার বাঁধ পাতে নি। তার একটি কারণ এই সে কারও সঙ্গে কাজ করতে চায় না সমুদ্রে বাঁধ নায় যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় রণ এই যে এজন্য পূর্বদিকের কোন না কোন ছর প্যাকিং প্রতিষ্ঠানে মূলধন ধার নিতে হত যা সে ত রাজী ছিল না। সে চিংড়ী মাছ ধরতে ভালবাসত ং জাল অপেক্ষাকৃত স্থির জলে ফেলত। কিন্তু তে আসবার দশ বছর পরে হান্নার পিতার মৃত্যুর উত্তরাধিকারসূত্রে যে প্রচুর লভ্যাংশ ওরা পেল তাতে দর অবস্থা বেশ ভালই হয়ে গিয়েছিল। এর বহুদিন গেই জোয়েল নর্টন ট্রাক কেনবার মত যথেষ্ট টাকা য়েছিল, এখন হান্নার গাড়ি কেনবার সঙ্গতি হল। রা এই গাড়িতে মাঝে মাঝে—বিশেষতঃ রবিবার—হিক জীবনের বিরক্তিকর একঘেয়েমি থেকে পালিয়ে রের জগতের কিছুটা দেখতে চাইত।

তাদের বহির্বিশ্ব টাইডাল নদীর মোহনার কুড়ি ইলের মধ্যে একটা ছোট গির্জা। সাধারণতঃ উ লণ্ডের উপকূলে যে সব ধর্মসম্প্রদায় আছে এটা তাদের রও ছিল না। এটি খুব গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মমতাবলম্বীদের পেক্ষাকৃত নির্জন প্রতিষ্ঠান। এই সম্মেলনের শ্রোতারা ৎসুক ও বিশ্বাসী। তারা বিনা প্রতিবাদে প্রত্যাদিষ্ট ... বাণী শুনত। তাদের কাছে এই বাণীর প্রতিটি বাক্যের শব্দ থেকে শব্দাংশ সবই স্বয়ং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত এবং তাঁর পুত্র দ্বারা ঘোষিত। তাদের ধর্মতত্ত্ব—যদি তাদের সামান্য সহজ নীতিকে এই রকম সম্মানসূচক নাম দেওয়া যায়—ছিল অত্যন্ত অনুভূতিপ্রধান। এর দাবি বিরাট—অতীত ও বর্তমানে সমস্ত পাপের স্বীকৃতি, অনুশোচনা, অনুতাপ, জগতের কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীয় অপরাধ প্রকাশ করা। তারপরে সব ধর্মভ্রাতা ও ভগ্নীদের সামনে কোন উপসাগরে অথবা নদীর মোহনায় সম্পূর্ণ অবগাহন। তখনই নিশ্চিত অবধারিত পরিত্রাণ। এই নির্মম দাবির তুলনায় হান্নার প্রথম জীবনের ব্যাপটিস্ট গীর্জার ঋজু ধর্মমত ও নিয়মাচরণ অনেক উদার ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই নতুন সাধুসঙ্গে সে নিজের অপরাধবোধে এত সচেতন হয়ে গিয়েছিল যে শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় নয় আগ্রহভরেই আবার দ্বিতীয়বার দীক্ষা নিল।

ধীবর-জীবিকা গ্রহণের কুড়ি বছর পরে বেঞ্জামিনের দীক্ষা হয়। প্রথম দিকে সে প্রতি রবিবার হান্নাকে নিয়ে গীর্জায় যেত এবং মধ্যে মধ্যে সান্ধ্য পাঠ-চক্রে। কারণ, সে বুঝতে পারত গৃহের শান্তি বজায় রাখবার জন্য এটুকু করা প্রয়োজন। কিন্তু ধীরে ধীরে ওর মনেও এক অপরিতৃপ্ত অভীপ্সা—কোন বিশেষ কিছুর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার, একান্ত নির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। হয়তো সম্মেলনে ধর্মযাজকরা প্রায়ই যে ভাবাতিরেকের কথা বলতেন—প্রভু সৃষ্টির প্রারম্ভে তার কর্মের জন্য ধীবরদের মনোনীত করেছিলেন। এখন সৃষ্টির ধ্বংসকালে চারিদিকের বিচিত্র চিহ্ন যা প্রমাণ করছে তাতে মনে হয় তিনি ধীবরকুল দ্বারাই সে কাজ সমাপ্ত করতে চান—এ তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলেছিল। তার কণ্ঠস্বর সুন্দর গম্ভীর এবং কিছুদিন অস্বস্তিকর অসুবিধে অনুভব করবার পরে সে এক রবিবারের প্রভাতে অপর সকলের সঙ্গে গানে গলা মেশাল। হান্না প্রচারবেদীর দক্ষিণ দিকের চৌকি থেকে পা দিয়ে ছোট অর্গানে হাওয়া দিতে দিতে এবং অনিচ্ছুক চাবি হাত দিয়ে চাপতে চাপতে তার দিকে উৎসাহপূর্ণ চোখে তাকাল। প্রভাতের উপাসনা সমাপ্ত হয়ে গেলে প্রতিবেশীদের কৃতজ্ঞতাভরা, সপ্রশংস মন্তব্যও

এর কানে মধু বর্ষণ করত। এই সব প্রভাব হান্নার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাভরা বক্তব্যের—যখন পরিবার থেকে তারা নিষ্ঠুর অথবা সহজভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করবে কিংবা অসীম আনন্দে একসঙ্গে দুটি আত্মা বাস করবে, তাদের পার্থিব অক্ষমতা ও পাপের রেশমাত্রও সেখানে থাকবে না—অনেক শক্তিশালী ছিল। যখন অবশেষে সে পুনঃপুনঃ সংঘটিত পুনর্জীবন উৎসবের একটিতে সাহসভরে 'করুণা-কেদারা'তে বসে, তার বিরাট মাথা ও কাঁধ অগণিত অসংখ্য রোরুদ্যমান কুঁকড়ে যাওয়া মুণ্ডুগুলোর ওপর দিয়ে দেখা যেতে লাগল তখন সে মনে মনে খুব শান্তি ও আরাম পেল, যদিও প্রচারক যে বিশেষ শান্তির কথা মুক্তকণ্ঠে বলেন তা সে পায় নি।

গীর্জায় কখনই তার হান্নার মত প্রভাব ছিল না। হান্না ওখানে ঢোকবার পর থেকেই ওখানকার ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায় অর্গানবাদিকা এবং রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের পরিচালিকা হিসাবে ওর পদমর্যাদা ওকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু এই পদমর্যাদা তার ক্ষমতা ও প্রভাবের মাত্র বাইরের দিক। প্রভাতে যখন বেন জাল ফেলতে যেত এবং ও রান্নাঘরের টেবিলে এক কাপ কফি নিয়ে বাইবেল পড়ত, তখনই ও গীর্জার অপেক্ষাকৃত কম প্রত্যক্ষগোচর সমস্যা নিয়ে চিন্তা করত, এবং কালো ভোঁদড় যেভাবে সমুদ্রতীরের পাহাড় ও উদ্গত শৈল-স্তবকের খাঁজে খাঁজে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মাছ চুরি করে বেড়ায় ঠিক তেমনিভাবে ওর চিন্তাধারা ঘুরপাক খেত। বাইবেলের মতে—প্রত্যেকেই ধর্মভ্রাতাদের পাপ ও ভ্রান্তির জন্য দায়ী এবং বৃক্ষের অক্ষম শাখা ছেদন ও ধ্বংস করাই কর্তব্য; ও খুব মনোযোগের সঙ্গে নিজের রচিত নিক্তির ওজনে সম্মেলনের সভ্যদের বিচার করত এবং প্রায়ই তাদের মধ্যে 'অভাব' দেখতে পেত। তারপরে দিনের শেষে স্বামীর বড়শীর থলে ও জালের মাথাগুলো তৈরি করবার সময়ে সে ভাবত সকলের শুভ কামনায় কি করা উচিত এবং প্রকৃতপক্ষে কি করতে হবে।

ধর্মসম্বন্ধীয় কাজ কিংবা কলাকৌশল নিয়ে ব্যাপৃত না থাকলে এমনিতে হান্না খুবই দয়ালু প্রতিবেশিনী, সেবা-শুশ্রূষায় ওর জন্মগত দক্ষতা। ও স্বেচ্ছায় মাইলের গৃহিণীপণা ও রন্ধনে পারদর্শীতমা। ও অন্যান্য গৃহিণীদের নিজের রন্ধনবিদ্যা নৈপুণ্যের ফল পরিবেশন করত, শুধুমাত্র অনিপুণাদের নয় সবাইকে সে দিতে ভালবাসত। ওর নিকটতম প্রতিবেশীদের ওপরেও সে নিজের ধর্মবিশ্বাস চাপাত না, কারণ ওর সদা-বিব্রত স্বামী তা করতে নিষেধ করেছিল—তুমি মুখ বন্ধ করে থাক, সে বলত, যদি ওরা সবাই মিলে নরকে পচে মরতে চায় তো মরুক।

যদিও প্রতি রবিবার মেষপালক দ্বারা মেষদের ধর্মসম্বন্ধীয় উৎসাহ দেওয়া হত এই সংক্ষিপ্ত নির্দেশের তার ঠিক বিপরীত, তবুও হান্না বুদ্ধিমতীর মত তা মে নিতে স্বীকৃত হয়েছিল।

৪

মিসেস হন্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে যখন সে ওয়া নর্টনের দোকানে প্রাতঃকালীন অনুপস্থিতির সময়ে ওকে সাহায্য করতে গিয়েছিল তখন হাতের থলি অন্যান্য টুকিটাকির সঙ্গে কতকগুলো চিঠির কাগজ নি গিয়েছিল। বাইবেলের মধ্যে কাগজগুলো ছিল কা এই বইটা কাছে থাকলেই তার ভাল লাগে এবং এখান থেকে উদ্ধৃতিও তুলতে চাইছিল। চিঠিটা খু সাবধানে এবং যত্নে লিখতে হবে। যদিও অনেক থেকেই কথাগুলো মনে মনে সাজাচ্ছিল, তবু আজ প্রকাশ করবার মত সুন্দর, কার্যকরী ভাষা ও খু পায় নি। সে মনে মনে স্থির করছিল দোকানেই চি সবচেয়ে ভাল করে লেখা যাবে। জেলেরা সবাই মা ধরতে গিয়েছে, কাজেই বিশেষ কিছু বিক্রি হবে না শিশুরাও বাইরে যাচ্ছে তা নিরাপদ বা বিপজ্জনক যেম স্থানেই হোক না কেন। এবং সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাতীত কতক গুলো অবোধ্য কারণে সে নিজের ঘরের পরিচিত দৃশ্যে মধ্যে লিখতে পারছিল না।

চিঠি লেখবার জন্য হান্না বাইবেলের সমাচার ও সতর্কবাণী ছাপানো কাগজ ব্যবহার করত। এই কাগ গীর্জায় কেনা হত, এর লাভ মিশনের জন্য যে সামা মূলধন ছিল সেখানে জমা হত। কারণ ঈশ্বর পৃথিবীতে

ছলেন, একটি চিঠির কাগজে লেখা ছিল—আমার বাই আইস যারা শ্রমী এবং ক্লান্ত. আর একটিতে, তোমার পাপ রক্তে রাঙা হইয়া আছে, কিন্তু তাহা মত শুভ্র হইয়া যাইবে। যদিও তাহারা কঠিন বুও তাহারা পশমের মত কোমল সাদা হইবে। টি বর্তমান ধর্মযাজক সম্পর্কিত। বোষ্টনের পরিচালকের প্রধানের নিকট পাঠাতে হবে। তি টাইডাল নদীর সম্মেলনের অনুরূপ কয়েকটি ঐকান্তিক সম্প্রদায়ের সভাপতি। কয়েক সপ্তাহ একমনে ধর্মযাজকের কর্মপ্রণালী ও জীবনযাত্রা ভেবেছে, এবং কিছুটা সময় অন্ততঃ ও নিজেকে তাই ছিল ওকে ঠিক পথে চালনা করবার জন্য ঈশ্বরের প্রার্থনা করেছে। চিঠিটা লেখা কঠিন হয়ে উঠেছে যে কয়েক মাস পূর্বে গীর্জার কেরানী হিসেবে ও সিম্পসন, সিম্পসন গৃহিণী ও তিনটি সন্তান সম্বন্ধে ল রিপোর্ট দিয়েছে—বলেছে যে, তাঁর প্রেরণাময় য় আত্মারা আশ্চর্যরূপে ত্রাণ লাভ করছে, এবং যাজনপল্লী তাঁর সততা নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে সামান্য বাড়িয়ে দিতে চাইছে। এখন যখন ওকে সম্পূর্ণ কথা বলতে হচ্ছে তখন শব্দ চয়ন ও কারণ জন খুবই যত্নভরে ও সাবধানে করতে হবে যাতে নের সমিতির কাছে ওর কথার মূল্য থাকে।

মস্টার সিম্পসন একাগ্রচিত্ত, উৎসুক, পাণ্ডিত্যহীন শবর্ষীয় যুবক—যিনি অল্পবয়সে সুসমাচার তাঁবুতে রিত হয়েছিলেন এবং কেনটাকির পাহাড়ে নির্জন স্নাস রোডে বড় হয়েছিলেন। প্রায় সেই সময়ে সেই পরিবেশেই ওঁর ভাবী স্ত্রীকে উনি দেখেছিলেন। লাজুক, ভীতু মেয়ে—যে তাঁকে একজন বিরাট ক মনে করত এবং তাঁর উন্নতির জন্য অত্যন্ত ভাবে নিজের যৎসামান্য যথাসর্বস্ব দিতে চেয়েছিল। পরিপূর্ণ নম্রতা ছিল কিন্তু তিনি প্রকৃতই বিশ্বাস তন যে তিনি সহধর্মীদের পাপ থেকে পরিত্রাণ র জন্য বিধিনির্দিষ্ট। একবার তিনি একটি উঠতি ং স্কুল আবিষ্কার করেছিলেন যাদের শিক্ষার অপেক্ষা নষ্টতার দিকে অধিকতর দৃষ্টি ছিল। তাদের একটি

[illegible]

এর ব্যাখ্যায় লোকচিত্তে ধর্মপ্রাণতা উদ্দীপ্ত করবার নিয়ম আলোচনা করে কাটিয়েছিলেন। টাইডাল নদী। এই সম্মেলন তাঁর প্রথম যাজনস্থান। তিনি ও তাঁর স্ত্রী অল্প কয়েকটি নোংরা জিনিসপত্র গর্ব ও আনন্দভরে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কখনও কখনও তাঁর ভয় হত যে এই গর্ব ও আনন্দ বিপজ্জনকরূপে এবং হয়তো শয়তানের মত তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে।

এখানে যাজনার কাজ নেবার পর থেকে আজ পর্যন্ত হান্না স্টীভেনসকে তিনি তাঁর উপহূর্গরূপে জানেন; ও যেন প্রাচীন প্রচারকদের মত কঠিন, প্রতিরোধকারী দেওয়াল ও স্তম্ভ। ও তাঁর রবিবারের স্কুল চালিয়েছে, অর্গান বাজিয়েছে, ওঁর যাজনার জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারিত করে দিয়েছে—সে সব বিষয় নিয়ে তাকে খাটতেও হয়েছে, এবং ও ডজনখানেক পরিত্যক্ত গীর্জাহীন গ্রাম থেকে পতিত আত্মা শিকার করে এনেছে। ও তাঁর স্ত্রীর অন্তঃকরণে বিশ্বাস জাগিয়েছে, নতুন রকম খাবার করতে শিখিয়েছে, তাঁদের শোচনীয় খাদ্যভাণ্ডার পুনর্বার পূর্ণ করেছে, তাঁর সন্তানদের জামা দিয়েছে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে তিনি এই ভদ্রমহিলার স্বামীর কাছে একটু অস্বস্তি বোধ করেন, কারণ, ভদ্রলোকের আকৃতি ও দৈহিক শক্তি সবকিছুতেই আতিশয্য আছে। তবে, বেঞ্জামিন স্টীভেনস রবিবার প্রভাতের দানে খুব মুক্তহস্ত—এবং একবার ও সিম্পসন পরিবারকে ওর মাছ ধরবার বোটে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা তাঁদের সকলকে এত উত্তেজিত করেছিল যে তাঁরা ফিরে এসে পারিবারিক প্রার্থনায় মন স্থির করে যোগ দিতে পারেন নি। যাজক প্রত্যহ হান্নার জন্য প্রার্থনা করতেন। হান্না তাঁর কাছে এক দেহে মূর্তিমতী ডরকাস, প্রিসিলা, লুই, ইউনিস। তিনি মনেপ্রাণে প্রার্থনা করতেন যেন এখানে, এই বিশেষ আঙুরক্ষেত্রেই তিনি চিরদিন থাকতে পারেন যেখানে প্রতিপূরণ প্রচুর এবং প্রয়োজনও বহুবিধ।

চিঠি লিখতে আরম্ভ করে হান্না মিস্টার সিম্পসনের এই সব মনোমুগ্ধকর গুণের দিকটাই অস্বস্তিভরে ভাবছিল। সে চেষ্টা করছিল বিষাক্ত স্মৃতি—ওদের বড় ছেলেটি যে তাদের পিটুনিয়া ফুলের বাগিচাটা একদম তছনছ করে দিয়েছে, বা যেদিন বরফ পড়বার জন্য সে ও বেঞ্জামিন

ওখানে যেতে পারে নি সেদিন তার পরিবর্তে মিসেস সিম্পসন চমৎকার অর্গান বাজিয়েছিলেন—মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসে ও নিজেকে বোঝাতে থাকে যে এখানে প্রকৃতই একটি নতুন পাদ্রীর প্রয়োজন, এই সব ঘটনার সঙ্গে সেই প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে যাজকের ছেলে-মেয়েরাই অপরাপর শিশুদের আদর্শ হবে এবং যাজকের স্ত্রীরও অন্তের করণীয় কর্ম সম্পাদনে অতটা আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ সব কথা শুধুমাত্র ঝড়ের মুখে খড়ের কুটো—মিস্টার সিম্পসনের অক্ষমতা মীমাংসিত সত্য এবং সেই সত্যকেই সে কাউণ্টারের পশ্চাতে বসে কাগজে কলমে লিখতে চেষ্টা করে।

শেষে ও স্থির করে অসংযমী বা মদ্যপ লোকের সঙ্গে ব্যবহারে তার সাহসের অভাব নিয়ে চিঠি আরম্ভ করা যেতে পারে—হ্যাঁ, তার চোখের সামনেই তো কত শয়তান আছে—বিশেষতঃ, গীর্জা তাকে একটি পুরনো গাড়ি কিনে দেওয়াতে দূরও নিকট হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে ওর কাছেই ঠিক এই ভাবের শিরোনামাযুক্ত কাগজ আছে—মদ যখন রক্তবর্ণ হইবে তখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। শেষে ইহা সর্পের মত দংশন করিবে ও কেউটের মত বিষ ঢালিবে। যখন ও সবেমাত্র প্রথম দিকটা ভেবে নিয়েছে তখনই রাখাল শিশুটি দশ সেণ্ট মূল্যের লাইকোরাইস কিনতে এল। আর সবাই নীরবে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ও ভীতচকিত মেয়েটিকে একটি কাগজের থলেতে দশটি স্টিক দিল এবং চেঁচিয়ে নাতিনাতনীদের একমুহূর্তের জন্য প্রাতরাশের সময়ে যা বলে দিয়েছে তা না ভুলতে বলে আবার চিঠিতে মন দিল।

মাননীয় মহাশয়, ও একটা বাজে কাগজে পেনসিল দিয়ে লেখে। কারণ চিঠি আগে মনোমত খসড়া করে তবে চিঠির কাগজে তুলবে।

…মাননীয় মহাশয়, গত দশ বছর গীর্জার কেরানী ও অর্গানবাদিকা এবং বহু বছর যাবৎ রবিবাসরীয় স্কুলের শিক্ষিকা ও খ্রীষ্টান হিসাবে আমি মনে করি এই আমার বেদনাদায়ক কর্তব্য যে আপনার কাছে…

৫

লিখতে লিখতেই ওর চোখে পড়ে শিশুরা মিসেস হন্টের ফুল সংগ্রহের জন্য পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠছে। কেন যে সেই দৃশ্য ওর মন ও কাজের মধ্যে এসে [illegible] তা সে বলতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ ও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। অবশেষে, যখন মন থেকে শিশুদের [illegible] দূর করে দিতে সমর্থ হল তখন আর একটি চিন্তায় [illegible] বিরক্তি ও অস্বস্তিতে ভরে যায়—সারা হন্টের শেষ [illegible] সময়ে ওকে ডাকা হয় নি, যদিও এর চেয়ে বড় বড় কাজে এই রকম সময়ে তাকে বহু বার ডাকা হয়েছে। [illegible] বেনের কথা মনে হল, সে এখন জাল ফেলছে, [illegible] তার চোখের আড়ালে না রাখতে পারলে কি [illegible] না সে করবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর মনে পড়ল [illegible] আগে ও যখন ওঁদের কেক ও পাই দিয়েছিল [illegible] যাজকের স্ত্রী আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে কি [illegible] চেঁচিয়ে উঠেছিল এবং নিজের মনের অনুশোচনা, [illegible] কর্মব্যস্ততায় চাপা দেবার জন্য ও ঠিক তেমনি কেক [illegible] সকালে করেছে। আর সব সময়েই সে অনুভব করে এই যন্ত্রণাদায়ক, অবাঞ্ছিত কল্পনা ও স্মৃতিচারণের পশ্চাতে সেই মৃতা নারীর মুখ—যাঁকে ও ইচ্ছে করেই দেখতে যায় নি।

স্টোভের ওপরের তাকের লুসী নর্টনের ঘড়ি টিক টিক শব্দে চিঠি লেখার দু ঘণ্টা সময় পার করে দিল। চিঠি লেখা উচিত এবং লিখতেই হবে—এ বিষয়ে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ তো লেখবার দিন নয়। লুসীকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে সে কাগজ বাইবেলে ঢুকিয়ে কাজের বাস্কেটের নীচে লুকিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

[ক্রমশঃ]

নির্জন গোধূলি

সুনীল রায়

ড়ি আর গগন। এই নিয়েই জ্ঞানেশের সংসার। জ্ঞানেশকে চেনে না এ অঞ্চলে এমন লোক নেই। র এই সর্বজনপরিচিতির মূলে আছে ওই গাড়ি। ড়িটা যদি জ্ঞানেশের পরিচয় হয়, তাহলে গগনকে দয়ে আবার ওই গাড়িটাকে কল্পনা করা যায় না। রেই গগন এসেছে এবং ওই গাড়িটার পেট্রোলের নেও অপরিহার্য। গগন শুধু জ্ঞানেশের ড্রাইভারই গন ছাড়া জ্ঞানেশ এক পাও চলতে পারেন না। যদি জ্ঞানেশ নিজেও চালান, পাশে গগনের ন চাই-ই। তা না হলে জ্ঞানেশ আর গাড়ি রেন না। তাই লোকে যখন গাড়িটাকে দেখে সঙ্গে গগনকেও দেখে আর বুঝতে পারে যে শ আসছেন।

লোকে গাড়িটার নাম দিয়েছে 'পক্ষীরাজ'। কোন ফাজিল ছেলে বলে দেশলাইয়ের বাক্স। পথে-অনেক সময় অপরিচিত লোকেরাও গাড়ির দিকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ওই দেখ্ যাচ্ছে।

কিন্তু যে যাই বলুক, জ্ঞানেশ ওই গাড়িতেই চড়েন সব জায়গাতেই যান।

গাড়ি সম্বন্ধে লোকের এই মন্তব্য ও বিদ্রূপ যে শের কানে আসে না তা নয়; মাঝে মাঝে কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বলেও বসে—

একটা ভাল গাড়ি করুন। এখনকার দিনে ও টা একেবারে অচল। আর চাপতেই যদি হয় র, তাহলে গাড়ির মত গাড়ি করাই দরকার।

তারপর চলে মুখে মুখে ফিরিস্তি। কোন্ গাড়ির তা একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ডই কিনবেন। দেখেশুনে নিতে পারলে ওতেই লাভ আছে। এই মাস দুয়েক আগে ওই সুরেন ঘোষের মেজ ছেলে কেমন একখানা পুরনো রোভার্স কিনে বসল। দিব্যি গাড়ি। তবে দামে একটু বেশী পড়েছে, এই যা। মোট দু হাজার। তা আপনার অতবড় রোভার্সেই বা কি দরকার। আমাদের জগন্নাথ উকিলের মত একটা মাঝারি মরিসেও চলে যাবে।

নানা লোক নানান পরামর্শ দেয়। জ্ঞানেশ সবই শোনেন। শুনতে তাঁর ভালই লাগে। গাড়ি সম্বন্ধীয় আলোচনায় তাঁর মোটেই অনাসক্তি নেই। গাড়ি যে শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই তিনি কিনেছেন তা নয়, আসলে গাড়ি তাঁর মস্তবড় একটা হবি। তাঁর অনেক-দিনের সাধ। শুধু তাঁরই নয়, সেই সঙ্গে আরও একজনের।

কিন্তু যদি তাঁর সাধের গাড়ির কেউ নিন্দা করে তখনই জ্ঞানেশ কিছুটা অসংযত হয়ে পড়েন। নিন্দার মাত্রাধিক্যে জ্ঞান হারাবার আশঙ্কাও যে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয় এ কথা যাঁরা বোঝেন, তাঁরা তখন আবার নিন্দাকারীকে নিরস্ত করেন। তা না হলে গাড়ির প্রসঙ্গে জ্ঞানেশ খুশীই হন, তখন তাঁকে বেশ সদালাপী বলেই মনে হয়। ফিয়াট, ল্যাণ্ডমাস্টার, বুইক, হিলম্যান, কার কত হর্স পাওয়ার, মাইলে কত তেল পোড়ে, কোন্ সালের মডেল, কার কি দাম—এসব কথা মুখে মুখে ফেরে। কোথায় কে কোন্ গাড়ি কেনাবেচা করছে এসব খবরও তিনি রাখেন।

বড় গাড়ি কি আর কিনতে পারি না।—জ্ঞানেশ

চোখ বুলিয়ে নেন। বড় গাড়ি কেনার সক্ষমতা প্রকাশ করায় কার কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করেন।

কিন্তু কিনে কি হবে? এ শহরের রাস্তাগুলো কি গাড়ি চালাবার মত! আর রাস্তাই বা কটা—কেবল সরু সরু গলি। সেবার একটা হাম্বার গাড়ি নিয়ে এল আমার কাছে। বলল ট্রায়াল দিয়ে দেখুন। পছন্দ হলে কিনবেন। তা আমাদের এই গলির মোড়ে গিয়েই আটকা পড়ে গেল। অতবড় গাড়ি এখানে চলবে কেন!

হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে যান জ্ঞানেশ। খানিক চুপ করে থেকে বলেন, তা ছাড়া একজন লোকের জন্যে ছোট গাড়িই কনভিনিয়েণ্ট।

সত্যিই তো। খুবই সত্যি কথা। একটা বড় জাঁদরেল গাড়ি নিয়ে জ্ঞানেশ করবেনই বা কি। একা লোক। এবেলা-ওবেলা গাড়ি চেপে স্কুলে যাওয়া আর বাড়ি ফেরা। সপ্তাহে একদিন গড়ের মাঠে আর গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যাওয়া।

লোকে স্বীকার করে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে একখানা প্রকাণ্ড বড় গাড়ি কেনার কোন কথাই ওঠে না, উঠতে পারে না। অনর্থক টাকা পয়সা নষ্ট করা ছাড়া আর কি!

কিন্তু তবুও রুগ্ন, রিকেটগ্রস্ত ছেলের মত গাড়িটা যখন হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় তখন কেউই না হেসে পারে না। পাড়ার বখাটে ছেলেগুলো রাস্তার দু পাশে সরে যায়। বেশ চেঁচিয়ে বলতে থাকে, এই, পথ ছাড়্, পথ ছাড়্, দেখছিস না গাড়ি আসছে!

এমনিই সব কটূক্তি, বিদ্রূপ। জ্ঞানেশ ওসব ভ্রূক্ষেপ করেন না। গাড়ি চালিয়ে সোজা চলে যান। ঝরঝর করে কাঁপে গাড়ির মাডগার্ড আর বনেটগুলো। র‍্যাডিয়েটার ক্যাপের ফাঁক দিয়ে আর্ত গাড়িটার ধোঁয়াটে নিঃশ্বাস ওঠে ঘন ঘন। ধুঁকতে ধুঁকতে গাড়িটা ছোটে। স্টীয়ারিং চেপে জ্ঞানেশ বসে থাকেন। ককিয়ে কেঁদে ওঠার মত হর্নটা বেজে ওঠে মাঝে মাঝে। গগনের ইচ্ছে হয় হর্নটাকে বদলে দেয়। একটা ইলেকট্রিক লাগালে মন্দ হয় না। কিন্তু জ্ঞানেশ ভাল। হর্ন শুনেই লোকে গাড়ি চিনতে পারে। চালাতে চালাতে এক এক সময় অ্যাকসিলেরেটার সবটাই চাপেন। বেশ ফাঁকা রাস্তা দেখলে গতির তীব্রতা বাড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফল হয় উল্টো। অনেক সময় বেতো ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়িটা। জ্ঞানেশ হাসেন। সে হাসিতে বিরক্তি নেই। নিজের একান্ত আপনার বাহনটির অক্ষমতায় জ্ঞানেশ স্নেহের হাসি হাসেন। গগনকে বলেন, না, এটা আর চলবে না। কুড়ি মাইলের ওপর গেলেই দম বন্ধ।

কিন্তু বিরক্তও হন জ্ঞানেশ। যখন ট্র্যাফিক পুলিসের হাতের আড়ালে এসে গাড়িটা একেবারে দম ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন অবাধ্য, একগুঁয়ে ছেলের মত, এক পাও নড়বে না। আশপাশের জমাট গাড়ির ভিড় সচল হয়ে ওঠে—জ্ঞানেশের গাড়ি রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে ট্র্যাফিক পুলিসের রোষ-কটাক্ষে বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে ঠেলে নিয়ে যায় রাস্তার এক পাশে। পর্যুদস্ত গাড়িকে লক্ষ্য করে চলমান উদ্ধত গাড়ির ড্রাইভার। মন্তব্য করে—উঃ লোহাপট্টীমে ভেজ দিজিয়ে। স্ক্র্যাপ আয়রন হোগা।

রাগে কাঁপতে থাকেন জ্ঞানেশ। ইচ্ছে হয় ঘুঁষি দিয়ে ওদের বিকশিত বত্রিশটা দাঁত গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেন।

কিন্তু ঝরঝর করে গাড়ি যখন চলে তখন জ্ঞানেশের বেশ আমেজ আসে। রেড রোডের প্রশস্ত বুকের ওপর দুরন্ত ছোট্ট শিশুর মতই গাড়িটা নেচে নেচে চলে। নতুন হাঁটতে শিখেছে—জ্ঞানেশ বলেন গগনকে। পাশ দিয়ে হুস হুস করে ঝড়ের বেগে উড়ে যায় স্টুডিবেকার, বুইক, ল্যাণ্ডমাস্টার। জ্ঞানেশের চোখে পড়লে বলেন গগনকে, ওই যাচ্ছে, ১৯৪৬-এর মডেল। এখনও ভালই আছে। কত মজবুত গাড়ি! আর এই নতুন নতুন গাড়ি—হাসেন জ্ঞানেশ। এ আর ক'দিন চলবে। দেখতেই বেশ।

গাড়ি। মোটর গাড়ি। বেবী অস্টিন। ১৯৩২-এর মডেল। জ্ঞানেশকে কোলে বসিয়ে ঘুরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় পৌঁছে জ্ঞানেশ আবার যেন

ছে গাড়ির ভেতর। বাতাসে গন্ধটা উড়ে উড়ে লাগছে। ফুরফুর করে হাওয়ার আঁচল ঝাপটা জ্ঞানেশের চোখেমুখে। স্টিয়ারিংয়ের ওপর হুটো আলগা হয়ে আসে। গড়ের মাঠের সুবিস্তৃত সরে কালো কালো চওড়া রাস্তায় গাড়ি চালাতে তে জ্ঞানেশের কল্পনা বিস্তৃত হয়। আকাশের ফাঁকা মনটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে।···

নেবুতলার নীহারিকা মৈত্র। স্কুল-মিস্ট্রেস নীহারিকা। একসঙ্গে বি. টি. পরীক্ষা দিয়েছিলেন দুজনে। নেশ তখন শহরতলীর একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সুরেনের সঙ্গে নীহারিকা এসে হাজির হলেন দিন। তিনিও দিচ্ছেন এবার পরীক্ষা। সুতরাং রস্পরিক সহযোগিতা চাই। আলাপ হল নোট ওয়া-নেওয়ার মারফত। জ্ঞানেশের কাছ থেকে টের কপিগুলো পান নীহারিকা—আর উপহার দেন টি চটুল হাসি।

কিন্তু দুর্ঘটনাটা ঘটল পরীক্ষার শেষ দিনে। হল কে বেরিয়ে এলেন দুজনে। বেরিয়ে এসে নীহারিকা লেজ স্ট্রীটে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ট্রামে উঠতে গিয়ে। কজন চারদিকে হৈ হৈ করে উঠল। পড়ে গিয়ে হারিকা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন আর ততোধিক ব্রত হয়ে পড়লেন জ্ঞানেশ।

কি করবেন কিছুই স্থির করতে না পেরে কেবলই দিক-ওদিক চারপাশ ঘুরতে লাগলেন আর একশো-রই বলতে আরম্ভ করলেন—লাগে নি তো?—লাগে নি তো?

আশপাশের জমাট ভিড় দেখে নীহারিকা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তার ওপর জ্ঞানেশের ওই এক কথা লাগে নি তো' শুনে ধমকে উঠলেন, তোমার জন্যেই তো এইরকম হল। বলেছিলাম মোটরটা বার করতে, তা নয়। যাও, এখন একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এস। ট্রামে-বাসে আমি যেতে পারব না।

নিশ্চয় নিশ্চয়, ট্যাক্সি এখনি নিয়ে আসছি।

ট্যাক্সি এলে নীহারিকা গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে ——— ——— [illegible]

হেসে বললেন, কিছু মনে করলেন না তো? কি করি বলুন, লোকগুলো যা ভিড় করে মজা দেখছিল।

একটু ইতস্তত: করে নীহারিকা গলা নামিয়ে বললেন, আজ নয়, আর একদিন। আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ি। কেমন?

জ্ঞানেশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন কি না বোঝা গেল না। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

তবু একটা খটকা রয়ে গেল মনে। নীহারিকা হঠাৎ গাড়ির কথা বললেন কেন। ট্রামে উঠতে গিয়ে পড়ে যাওয়াটা তো এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কত লোকই তো ওইরকম পড়ে যায়। কিন্তু পড়ে গিয়ে কেউ মোটরের কথা বলে নাকি! আর নীহারিকা তো শাড়ি জড়িয়েই পড়ে গেলেন ট্রামে উঠতে গিয়ে।

নীহারিকা মৈত্র অবশ্য কথা রেখেছিলেন। পরীক্ষার ফলাফল বার হবার পরেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে নিজের সাফল্যে আর জ্ঞানেশের কৃতকার্যতায় অভিনন্দনও জানিয়েছিলেন।

চিঠিখানা তিনদিন পকেটে পকেটে নিয়ে ঘুরলেন জ্ঞানেশ। জীবনে এই প্রথম একটি কুমারীর আহ্বান এল তাঁর কাছে। নিস্তরঙ্গ, প্রায়-অস্তমিত জীবনে সজোরে একটা ঢিল ছুঁড়লেন নীহারিকা। জ্ঞানেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন কদিন।

তারপর প্রতীক্ষিত দিনটিতে যথারীতি সাজসজ্জা করে বাড়ি থেকে বার হলেন। বড়লোক মাসতুতো ভাইয়ের মোটরে চড়ে নীহারিকার বাড়ি হাজির হলেন।

বাড়ির সামনে মোটরের হর্ন শুনে নীহারিকা বাড়ি থেকে সোজা রাস্তায় নেমে এলেন।

ওমা, এ যে মোটরে করে এলেন দেখছি!—নীহারিকা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

হ্যাঁ, মোটরেই আসতে হল। ট্রামে-বাসে যা ভিড়—আমি তো উঠতেই পারি না।—গাড়ি থেকে নামতে নামতে নীহারিকাকে অবাক হতে দেখে খুশী হয়ে উঠলেন জ্ঞানেশ।

সেদিনের কথাটা আজও মনে আছে দেখছি।—হাসলেন নীহারিকা: খুব শোধ নেওয়া হল। তাহলে মোটরের ভাড়াটা কিন্তু আমিই দেব।

ভাড়া। ভাড়া কিসের ?—ওটা তো আমাদেরই গাড়ি।

ইস্‌, আপনার গাড়ি বুঝি। আপনার আবার গাড়ি হল কবে ?

না, মানে, আমার ঠিক নয়। আমার এক আত্মীয়ের গাড়ি।

ও, তাই বলুন।

জ্ঞানেশের জ্বলন্ত উৎসাহে নীহারিকা একেবারে জল ঢেলে দিলেন। যেন গাড়ি না থাকাটা একটা মস্তবড় অপরাধ। মেয়েরা কেবল শাড়ি-গাড়িই বোঝে। তাই সেদিন গায়ে উৎসাহ নিয়ে শাড়ি জড়িয়ে পড়তে গিয়ে নীহারিকার প্রথমেই গাড়ির কথা মনে হয়েছিল।

জ্ঞানেশকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে নীহারিকা মা-বাবার সঙ্গে জ্ঞানেশের আলাপ করিয়ে দিলেন। জ্ঞানেশের কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগছিল। এতদিন বইয়ের আড়ালেই জীবনটাকে কাটিয়ে এসেছেন। তাঁর অটল, অবিচলিত গাম্ভীর্যে বাড়ির লোকেরাও কাছে আসতে পারত না। একটা অখণ্ড স্বাতন্ত্র্যের বেড়াজালের আড়ালে জ্ঞানেশ থাকতেন বই নিয়ে।

নীহারিকার সঙ্গে পরিচিত হয়ে জ্ঞানেশ কদিনে বদলে গেলেন। বাড়ির ভিতর মাঝে মাঝে পায়চারি আরম্ভ করলেন। বাড়িতে একটা পোষা ময়না ছিল, তার খাঁচায় নিজের হাতে খাবার দিলেন। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের টফি-লজেন্স কিনে দিলেন। শেষে মাসতুতো ভাইকে দিয়ে বললেন তার গাড়িটা একদিনের জন্যে তাঁকে ছেড়ে দিতে।

একটা সন্ধ্যা নীহারিকার সঙ্গে কাটালেন জ্ঞানেশ। নীহারিকা তাঁকে সেলাইয়ের কাজ দেখালেন। নিজের প্রাইজ-পত্তর দেখালেন। নিজের হাতে রান্না করে মাংস, পোলাও, মাছের কালিয়া খাওয়ালেন। তারপর তানপুরা নিয়ে তিনখানা গানও শোনালেন। শেষে দেখালেন একখানা চিঠি। বেথুনের চাকরি ছেড়ে সুদূর জলপাইগুড়ি চলেছেন প্রধানা শিক্ষিকা হয়ে।

যে ক্ষীণ আশার আলোটুকু জ্বলেছিল দপ্‌ করে কে যেন তা নিভিয়ে দিল। জ্ঞানেশ প্রবল আপত্তি

অত দূরে চাকরি নিতে হবে না। এই কলকাতায় কাছেই দেখেশুনে নিলেই চলবে।

নীহারিকা বললেন, না, সে হয় না। হেডমিস্ট্রেসের চাকরি কলকাতায় কোনদিন পাব না। আর তা ছাড়া, ওখানে আমার মামারা আছেন, মাইনেও ভাল দিচ্ছে।

যাবার দিন স্টেশনে গিয়েছিলেন জ্ঞানেশ। শেষবারের মত অনুরোধ জানালেন নীহারিকাকে। বিয়ের প্রস্তাবও সেই সঙ্গে।

নীহারিকা মুখ লুকোলেন।

তা আর হয় না। তোমার প্রায় পঁয়তাল্লিশ হল, আর আমিও চল্লিশে পা দিয়েছি। এ বয়সে আর লোক হাসিয়ে কাজ নেই।

হাসুক লোকে। তোমার আমার জীবন তো ব্যর্থ হবে না। তুমি রাজী হও নীহার। ও চাকরি ছেড়ে দাও, বাড়ি ফিরে চল।

নীহারিকার সম্মতি পাবেন মনে করে শেষটায় মরিয়া হয়ে বলেও ফেললেন জ্ঞানেশ, আমি গাড়ি কিনব। তুমি দেখো, আমি সত্যিই মোটর কিনব।

হাসলেন নীহারিকা।

কানের পাশ থেকে একগুচ্ছ চুল তুলে ধরে দেখালেন, দেখো, চুলে আমার পাক ধরেছে, তোমারও দাঁত পড়েছে। নাঃ, এখন আর হয় না। তা ছাড়া—

কি তা ছাড়া ?—জ্ঞানেশ অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

এতদিন আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছি, তা যখন খর্ব হবে তখন কেউই তা সইতে পারব না। সংসারের খাঁচায় যত মধুই থাক, এই বুড়ো মনটাকে আর সে শেকলে বাঁধতে পারব না।

স্টেশনের আলোগুলো খুব ঝাপসা লাগল জ্ঞানেশের চোখে। মনে হল কোথায় যেন ঝড় উঠেছে আর উড়িয়ে নিয়ে আসছে রাশিরাশি ধুলো। সে ধুলোয় সব আলো এখনি ঢাকা পড়ে গেছে।

সেই প্রথম—আর সেই শেষ। জ্ঞানেশের আকাশে নীহারিকা আর দেখা দিলেন না।…

আকাশের কোলে কোলে মেঘের জটলা দেখে

এসেছে গঙ্গার ওপার থেকে। গাড়ির জানলায় স্ক্রীন লাগাতে হবে।

জ্ঞানেশও তারপর চাকরি নিয়েছেন অনেক দূরে দূরে। কখনও মেদিনীপুর, কখনও বীরভূম। হয়তো রাগ করে নিয়েছেন নীহারিকার ওপর। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞাকে শান্ দিয়েছেন। মানুষের ওপর অনেক কঠোর হয়েছেন, সংসারের মাটিতে যেখানে যে শিকড় ছিল, তা নিজের হাতেই কেটে দিয়েছেন।

গ্রামে গ্রামে মাস্টারী করে ফিরেছেন জ্ঞানেশ। গ্রামের লোকেরা মাস্টারমশায়কে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করত। ভালো লোক জ্ঞানেশবাবু।

'ব্রহ্মচর্যের কঠোর তপস্যায় উত্তীর্ণ,…বাগদেবীর চরণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ…নির্লোভ, নিষ্কাম…জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি নিস্পৃহ…নব জীবনধারার ঋত্বিক…" এ রকম অনেক মানপত্র পেয়েছেন জ্ঞানেশ।

মনে মনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন জ্ঞানেশ। মানুষ তৈরির কারখানার কারিগর তিনি। লোকে তাঁর মূল্য উপলব্ধি করতে পারছে। কিন্তু একজন পারে নি। শুধু একখানা গাড়ি—একটা মোটরকার। প্রতিজ্ঞাকে বার বার শানিয়ে নিয়েছেন জ্ঞানেশ।

শেষে তাই শহরে। সহপ্রধান শিক্ষকের অপেক্ষাকৃত মোটা মাইনের চাকরি। কলকাতার কাছেই ছোট শহরে। গাড়ি কিনলেন জ্ঞানেশ আর গগন এল ড্রাইভার হয়ে।

সেই থেকে গাড়ি আর গগন নিয়েই সংসার। মাঝে মাঝে দু-একটা বিয়ের কথাও উঠেছিল। কিন্তু সে কথা শোনামাত্র তাঁর চোখের সামনে নীহারিকার তাচ্ছিল্যভরা মুখখানা ভেসে উঠত। না—গাড়ি না হলে তিনি বিয়ে করবেন না।

কিন্তু আজ গাড়ি হয়েছে। ছুটিতে নীহারিকা নিশ্চয়ই বাড়িতে আসে। নীহারিকাকে গাড়িটা একদিন দেখিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়। মনে মনে অনেক বার ভেবেছেন জ্ঞানেশ। চোখের সামনে নীহারিকার খুশীভরা চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠেছে। নীহারিকা সত্যি সত্যিই খুব অবাক হয়ে যাবে। বলবে—ওমা, সত্যি সত্যিই

পরক্ষণে আবার মনে হয়েছে নীহারিকা হয়তো তাঁর বার্ধক্যের ওপর কটাক্ষ করবে। নীহারিকা হয়তো বলবে—পঞ্চান্ন বছর বয়সে এ উন্মাদনা বেমানান। তার চেয়ে এই ভাল। গাড়ি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন তিনি। মানুষের মত এ অবাধ্য হবে না। অবহেলা-বিদ্রূপের, মান-অভিমানের জটিল আবর্ত সৃষ্টি হবে না—নেহাতই একটা যান্ত্রিক সম্পর্ক। কলকব্জা ঠিক থাকলেই হুকুম মেনে চলবে। অনেক বেশী সহজ, অনেকখানি নিশ্চিন্তি।

জানলায় স্ক্রীনগুলো লাগিয়ে গগন উঠে এসে বসল গাড়িতে। ধুলোর ধোঁয়ায় চারদিক ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। পথ চিনে গাড়ি চালানোই দুষ্কর। জ্ঞানেশ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ভরসা শুধু গগন। গগন না থাকলে গাড়ি বার করেন না জ্ঞানেশ। ছেলেটা গাড়ির যত্ন নেয়। গাড়ির কদর জানে। জ্ঞানেশ ঠিক এই রকম লোকই খুঁজেছিলেন। যন্ত্রকে ভাল না বাসলে ভাল যন্ত্রী হওয়া যায় না। মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন গগনের। এখন গগন শুধু ড্রাইভারই নয়—তাঁর সবকিছু ভারই গগনের ওপর।

দেখতে দেখতে ধুলো সরে গিয়ে বৃষ্টি নামছে। বড় বড় ফোঁটায়—তারপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি। গড়ের মাঠের বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে একটানা বৃষ্টি নামছে। বাতাসের উদ্দাম ঝাপটায় ছোট্ট গাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কিন্তু স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়িটায়। অনেক চেষ্টা করেও স্টার্ট নিচ্ছে না। কেবলই একটা অস্ফুট গোঙানি উঠে গড়িয়ে গড়িয়ে থেমে যাচ্ছে। জ্ঞানেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

গায়ে কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা এসে বিঁধলো। আরও কয়েকটা। হাওয়ার ঝাপটায় স্ক্রীনগুলো ছিঁড়ে যেতে চাইছে। গাড়ির হুডের ওপর ঝমঝম জলের শব্দ ভেঙে পড়ছে।

অনেক চেষ্টাতেও গাড়ি চালানো গেল না। প্রচণ্ড বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন জ্ঞানেশ।

গাড়িটাকেও ঠিক করে রাখতে পার না! এই মাঠের মাঝখানে সন্ধ্যেবেলায় আমি এখন জলে ভিজব!

ষাট টাকা মাইনে দিয়ে তাহলে আমার ড্রাইভার রাখার কী দরকার ?

সজোরে এক চড় বসিয়ে দিলেন গগনের গালে।

একশো বার বলেছি যত টাকাই খরচ হোক গাড়ি সব সময় আমার ঠিক রাখা চাই। সে সব কথা মনে থাকে না ?

বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

অপদার্থ সব—

একটা লোককেও দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

পৃথিবীতে একটা লোককেও বিশ্বাস করা যায় না। একমুহূর্তে সবকিছু বিষিয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগে সারা শরীর জ্বলতে লাগল। অকৃতজ্ঞ—ইতর সব। তাঁর সাথে সবাই বাদ সাধতে চায়।

বাইরে অবিশ্রান্ত আওয়াজ। বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। স্ক্রীন উড়িয়ে গাড়ির ভেতর বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে। ভিজে গেছে সমস্ত শরীর। গাড়ির ভেতরও ভিজে যাচ্ছে। সামনের রাস্তাটায় জল জমে উঠছে।

জ্ঞানেশ চুপ করে বসে রইলেন। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত এইভাবেই বসে ভিজতে হবে। অনেক দূরে অন্ধকারে কয়েকটা আলো প্রেতের চোখের মত তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে। সব মিথ্যে মনে হচ্ছে—প্রচণ্ড রকম শূন্যতায় ভরা। মানুষ মিথ্যে—এই কলকব্জা বসানো গাড়িটাও মিথ্যে। পায়ের নীচে ছিঁড়ে পড়ে থাকা বেলফুলের মালাটার মতই সব মিথ্যে।

জ্ঞানেশ একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ভিজে জামাকাপড়ে এতক্ষণে একটা সিরসিরে ঠাণ্ডা হাড়ের মধ্যে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। হাওয়ার ঝাপটায় মাঝে মাঝে কাঁপুনি লাগছে। মনে হচ্ছে যেন জমাট ঠাণ্ডায় দেহটা অসাড় হয়ে যাবে। নিশ্চল গাড়িটার মতই রক্ত-মাংসের দেহটাও অবসন্নতায় স্তব্ধ হয়ে আসবে। বুকের কাছে এখনও যে ধক্‌ধক্‌ করে হৃদপিণ্ডের স্পন্দনটুকু শোনা যাচ্ছে, গাড়িটার জীর্ণ ইঞ্জিনের যান্ত্রিক আওয়াজটার মতই তা হারিয়ে যাবে। পঞ্চান্ন বছর বয়সের ভার হঠাৎ বড় বেশী দুর্বহ মনে হচ্ছে। সামনের অন্ধকার মাঠটার মতই বাকি জীবনটা কুহেলি-কুহকে আচ্ছন্ন। শিথিল বিবশ শরীরে একটা গভীর ঘুমের অবসাদ অন্ধকারের মতই নেমে আসছে।

গগন—

হঠাৎ ভয়ার্তস্বরে ডেকে উঠলেন জ্ঞানেশ। গগন নিরুত্তর, নির্বাক। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না জ্ঞানেশ। মাতাল আকাশের তলায় অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর। হাত বাড়িয়ে ধরলেন।

দু হাতে শক্ত করে ধরলেন গগনকে।

গগন, কেউ নেই আমার। গগন

সেই নির্জন অন্ধকারে গগনকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন জ্ঞানেশ।

*

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

নকদিন আগে 'অমৃত' সম্পর্কে লিখেছিলাম যে এই নবাগন্তক সাপ্তাহিকটি 'দেশে'র যমজ ভাই র জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। যেন 'দেশ' পত্রিকা ত আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শে সাহিত্য া প্রকাশ করা যায় না। সম্প্রতি দেখছি একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অর্জন করার জন্য 'অমৃত' প্রাণপণে করছে। আশান্বিত হয়ে তিন-চার সংখ্যার 'অমৃত' া পড়ে ফেললাম এক নিঃশ্বাসে।

ড়ার পর বুঝতে পারলাম 'অমৃত' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা মৌলিক সিদ্ধান্তে ে গিয়েছেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন সাহিত্য ও ৃতির চর্চা আসলে ইতিহাস ও ভূগোলের চর্চা ছাড়া কিছু নয়। মনে বড় আনন্দ হল। এই রকমের কিছু সোজা সোজা ফরমুলা পেলে বড় সুবিধা হয়। তার প্রসঙ্গে যে বাজারে গণ্ডা 'ইজম্' আর প্রশ্নের সহ্য করতে হয় তার দায় থেকে কত সহজে ক্তি পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরও অনেক সুবিধা নিয়মিত 'অমৃত' পত্রিকা পড়ে পাঠক বলতে পারবেন বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ তে পারছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সাধারণ জ্ঞানের রও বৃদ্ধি পাচ্ছে; এবং যদি তিনি কোন যোগিতামূলক পরীক্ষার ছাত্র হন তবে এই সাধারণ তাঁর যথেষ্ট উপকারে লাগবে।

'অমৃত' পত্রিকা এবার যে লাইন নিয়েছে তার আর ন তুলনা নেই। সাময়িক বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ নিয়ে লোচনা করলে নানা জন নানা কথা বলবে। কিন্তু াবে ইতিহাস এবং ভূগোল অত্যন্ত পবিত্র জিনিস; সম্পর্কে বক্রোক্তি করবে এমন লোক ভূ-ভারতে

সকলে এক বাক্যে বলবে যে 'অমৃত' পত্রিকা টি অতি সৎ আদর্শ অনুসরণ করছে। জ্ঞানদানের য় পবিত্র কর্ম আর কী থাকতে পারে। জ্ঞানই হিত্য, জ্ঞানই সংস্কৃতি, জ্ঞানই মোক্ষ। এতে শুধু যে পাঠকসাধারণই উপকৃত হবেন তাই নয়, লেখকও উপকৃত হবেন। ইতিহাস এবং ভূগোলের অনেক মোটা মোটা বই বাজারে পাওয়া যায়। যে কোন একখানা বই টেনে নিয়ে তার যে কোন একটি পরিচ্ছেদ একটু সংক্ষিপ্ত করে লিখে দিলেই 'অমৃত'র প্রবন্ধ হয়ে যাবে। কী সহজ কাজ! সাহিত্যচর্চা যে এত সহজ ব্যাপার তা যাঁরা জানেন না তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা আজই 'অমৃত'র গ্রাহক হন।

'অমৃত' পত্রিকার প্রসারবৃদ্ধির জন্য আমি যে এত সুপারিশ করছি তা দেখে অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন আমি নিশ্চয় ঘুষ পেয়েছি। তা নয়, তবে আশা আছে যে এই প্রবন্ধটি পড়ার পর 'অমৃত' কর্তৃপক্ষ আমাকে ডেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টাকা সাধবেন। যদি সাধাসাধি করেন, তবে দু-একবার না না করলেও শেষ পর্যন্ত না নেওয়াটা কি ভাল দেখাবে? এ বিষয়ে 'অমৃত' পত্রিকা নিজেই যে ফতোয়া জারি করেছেন তা উল্লেখ করছি: "তাইতো বলি প্রয়োজনে না অপ্রয়োজনে হোক, সুখেই হোক বা দুঃখেই হোক, হয়ে বোধ করি সবাই করে। তাই নয় কি?"

'দিল্লী থেকে বলছি' বিভাগের লেখক এ কথাটি বলেছেন: সমস্ত দিল্লী শহর তোলপাড় করে লেখক মাত্র একটি তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। খবরটি এই যে রাষ্ট্রপতির ভোজের টেবিল থেকে চুরুট চুরি যায়। এত জটিল রাজনৈতিক আবর্ত যেখানে বয়ে চলেছে সেখান থেকে এই কৌতুকের খবরটি মাত্র সরবরাহ করতে পেরেছেন এর মধ্যে 'অমৃত'র প্রচুর ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিচয় আছে। এই ব্যবসায়িক বুদ্ধিটি অবশ্য খুবই সততা-প্রণোদিত—বিশুদ্ধ জ্ঞান সরবরাহের ইচ্ছা থেকে এর জন্ম। চিন্তা ভাবনা সংঘাত বিতর্ক সমস্ত রকম জটিলতার ভেজাল থেকে পরিশ্রুত করে বিশুদ্ধ জ্ঞান সরবরাহই 'অমৃত' পত্রিকার ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও সততার আদর্শ। 'দিল্লী থেকে বলছি' পর্যায়ে যে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে তা

রাজনীতি নয়, অর্থনীতি নয়, সমাজনীতি নয়—নির্ভেজাল ভৌগোলিক জ্ঞান। এবং আমি আগেই বলেছি 'অমৃত' পত্রিকার কাছে ভৌগোলিক জ্ঞান = সাহিত্য।

'অমৃত' পত্রিকা যে জ্ঞান দানের কী বিপুল আয়োজন করেছে দু-একটি সংখ্যা থেকে তার কিছু নমুনা উল্লেখ করছি। এ বছরের ১৩শ সংখ্যায় ঐতিহাসিক জ্ঞানমূলক এই কটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে :

১। মধুসূদনের শেষ লেখা ২। সেকালের পাতা : একালের চোখ ৩। প্রাচীন সাহিত্য (কবির গান সম্পর্কিত আলোচনা) ৪। ভারতের জাতীয় পক্ষী।

ভৌগোলিক জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ বেরিয়েছে এই কটি :

১। কালোর জেহাদ ২। শ্রাবণ পূর্ণিমায় অমরনাথ ৩। দাক্ষিণাত্য ৪। দেশেবিদেশে।

শেষোক্ত নিবন্ধগুলির মধ্যে অবশ্য অনেক ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় আছে, কারণ ইতিহাস আর ভূগোল তো আসলে পরস্পর-সাপেক্ষ বিষয়।

আলোচ্য সংখ্যাটিতে উপরোক্ত নিবন্ধগুলি এবং গল্প উপন্যাস ছাড়া আর যা উল্লেখযোগ্য বিষয় স্থান পেয়েছে তা হল খেলা এবং সিনেমার খবর। ৮০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মধ্যে ২০ পৃষ্ঠাই খেলা আর সিনেমার জন্য নির্দিষ্ট।

একটি সংখ্যার প্রমাণ নির্ভরযোগ্য বলে মনে না হতে পারে। কাজেই আর একটি সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক জ্ঞানমূলক নিবন্ধ স্থান পেয়েছে :

১। বিস্ময়কর অপহরণ ২। সেকালের বাজার ৩। সেকালের পাতা : একালের চোখ ৪। সংবাদ বিচিত্রা ৫। লণ্ডন থেকে বলছি।

নিম্নলিখিত ভৌগোলিক নিবন্ধ (ঐতিহাসিক জ্ঞানসহ) স্থান পেয়েছে :

১। জার্মানী থেকে লণ্ডন থেকে প্যারিস ২। মনে পড়ল (গায়ে হলুদ) ৩। দাক্ষিণাত্য ৪। দেশেবিদেশে।

এক একটি সংখ্যা 'অমৃতে' এই পরিমাণ জ্ঞান সরবরাহ করা হচ্ছে। কাজেই কোন সন্দেহ নেই, কয়েক বছর নিয়মিত 'অমৃত' পড়ার পর বাঙালী পাঠকরা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে উঠবেন। তখন আমরা তাঁদের বিদেশে আন্তর্জাতিক পণ্ডিতী লড়াইয়ে যোগদানের জন্য পাঠাতে পারব। এর চেয়ে আশা ও আনন্দের কথা আর কী থাকতে পারে!

কিন্তু প্রবল আশার সঙ্গে একটু আশঙ্কাও যে নেই তা নয়। জ্ঞানলাভ খুব ভাল জিনিস বটে, কিন্তু খুব ভয়েরও জিনিস। সত্যি বলতে কি জ্ঞান জিনিসটাকে আমি নিজে অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখি। পাছে ওরা ঠেসেঠুসে আমার মগজে কিছু জ্ঞান ঢুকিয়ে দেয় এই ভয়ে আমি কোনদিন স্কুল-কলেজের ছায়া মাড়াই না। বড় বড় লোকদের বাড়িতে আমি কখনও যাই না পাছে তাঁরা কলেকৌশলে আমাকে জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেন। আমি স্বীকার করি আমার সঙ্গে তুলনায় আধুনিক বাঙালী পাঠক অনেক বেশী সাহসী; তাঁরা যে অবলীলাক্রমে অনেক বেশী জ্ঞান হজম করতে পারেন তার প্রমাণ উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম। কিন্তু তবুও 'অমৃত' পত্রিকার এত জ্ঞান কি তারাই হজম করতে পারবে? এই পেটের গোলমালের দেশে এত জ্ঞানের বোঝা যদি পাকস্থলীতে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে তবে কী উপায় হবে?

অনেক ভেবে দেখলাম যে 'অমৃত' কর্তৃপক্ষ এদিকটাও চিন্তা করে রেখেছেন। সাধারণ্যে পরিবেশনের জন্য জ্ঞানকে যে তাঁরা যথেষ্ট জল মিশিয়ে dilute বা পাতলা করে সরবরাহ করছেন শুধু তাই নয়, জ্ঞানদানের একটি বিশেষ নীতি তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। যে জ্ঞান মানুষকে ভাবায়, চিন্তা করায়, যে জ্ঞান জগৎ জীবন সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে প্রসারিত করে, যে জ্ঞান আমাদের এই জটিল পৃথিবীর বাসিন্দা হওয়ার উপযুক্ত করে তোলে, 'অমৃত' সে জাতের জ্ঞান সরবরাহ করে না। এ জ্ঞান হল চুটকি জ্ঞান, মজাদার জ্ঞান। যে খবর উদ্ভট বলে অবসর সময়ে পড়তে ভাল লাগে এ সেই জ্ঞান। এ জ্ঞান পড়ার পর ভুলে গেলে কোন ক্ষতি নেই। মনে রাখলে স্মরণশক্তিকে পীড়িত করা ছাড়া আর কোন লাভ নেই। এ জিনিস জানার আগে আমাদের মন যেখানে ছিল, জানার পরেও সেখানে থাকে। এই আশ্চর্য জ্ঞানদায়িনী বৃক্ষের নাম হল 'অমৃত'। যেমন কবি মণীন্দ্র রায় রচিত 'জার্মানী থেকে লণ্ডন থেকে প্যারিস' নিবন্ধটি পড়ে আমি একটি জ্ঞান-

ভ করেছি : কোন কোন মানুষ নাকি ঘুমের মধ্যেও শ্নের জবাব দেয়। ভ্রমণ-কাহিনীর অনেক গতানুগতিক মূলী কথার মধ্যে যাতে এই জাতীয় দু-একটি জ্ঞানের থা উল্লেখ করতে পারেন, সেইজন্য বিগত-কবিত্ব কবিকে নেক হাজার টাকা খরচ করে য়ুরোপে পাঠানো হয়েছে। সত্যিই পাঠানো হয়েছে কিনা জানি না; কারণ এ জাতীয় গতানুগতিক ভ্রমণকাহিনী ঘরে বসেও এন্তার লেখা যায় এবং লেখা হয়ে থাকে।)

কাজেই, হে লেখক-সমাজ, আপনারা জ্ঞানের নাম নে ভয় পাবেন না। 'অমৃত' যে জ্ঞানদান করে তা পনার মস্তিষ্কের বোঝা নয়। তা সত্যিই অমৃতফল-গুলি। এ জাতীয় জ্ঞান যে কত উপকার করে তার কটা প্রমাণ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উল্লেখ রছি। ছুটির দিনের দুপুরে বা রাত্রে যদি ঘুম না আসে বে আমি হাতের কাছে ধোবার হিসাবের খাতা পেলে ও পড়ি। এই খাতার মধ্যে যে জ্ঞান থাকে তা ড়তে পড়তে আমার ঘুম আসে। মসলা-মুড়ি বা নেবাদামের সঙ্গে অনেক সময় পুরনো খবরের কাগজে রা ঠোঙা আমার ঘরে আসে। সেই ঠোঙাগুলো ড়ে যে কাগজের টুকরো পাই তার মধ্যে অনেক সময় শ্চর্য আশ্চর্য জ্ঞানের কথা থাকে। যেমন, কোন্ দেশে কটি চার-হাতওয়ালা ছেলে হয়েছিল, কোন্ দেশের ণী নিয়মিত দাড়ি কামাতেন, কোন্ দেশে অতিথি লে পিঠে লাঠ্যাঘাত করে সম্বর্ধনা জানানো হয়, ত্যাদি। এ সব খবর পড়তে পড়তে সত্যিই ঘুম আসে, রীক্ষা করে দেখতে পারেন। কাজেই, হে পাঠক, পনার যদি যথেষ্ট পয়সা থাকে তবে ধোবার হিসাবের তা বা ছেঁড়া কাগজের টুকরোর বদলে অনায়াসে কটি হরিণের ছবিযুক্ত 'অমৃত' পত্রিকা কিনে শিয়রের শে রেখে দিতে পারেন। তাতে আপনার ঘুমের হায্য হবে; অধিকন্তু আপনি প্রতিবেশীদের মধ্যে হিত্যানুরাগী বলে খ্যাতি লাভ করবেন; অধিকন্তু পনি যদি বয়সে তরুণ হন তবে বন্ধুমহলে অনেক টকি গল্প বলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার মত বিশ্ববিখ্যাত তে পারবেন।

আসল কথাটা এইবার বলি। 'অমৃত' পত্রিকা হল 'যুগান্তর' পত্রিকার ডাস্টবিন। দৈনিক পত্রিকার আপিসে অনেক দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা বুলেটিন ইত্যাদি আসে। তাতে যে হরেক রকমের খবর থাকে দৈনিক পত্রিকায় তার স্থান সঙ্কুলান হয় না। উদ্বৃত্ত খবরগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিলে সেটা নেহাত অপচয় হত। তা না করে বুদ্ধিমান কর্তৃপক্ষ সেগুলো প্রকাশের জন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করে নিয়েছেন। তাতে লোকসানের বদলে উল্টে আরও লাভ হচ্ছে। বাংলা-দেশে এরকমের ব্যবসা চলে। কারণ আমরা জেনেশুনে বোকা সাজতে ভালবাসি।

'অমৃতে'র সবকিছুই যে সংবাদপত্রের উচ্ছিষ্ট সম্ভার এত বড় অপবাদ আমি অবশ্য দিচ্ছি না। আগেই উল্লেখ করেছি যে কিছু কিছু জিনিস আছে যা বড় বড় বই-পুস্তক থেকে সংগ্রহ করা। অবশ্য সংগ্রহ করার সময় যথাসাধ্য সার জিনিস বর্জন করে অসার জিনিসকে গ্রহণ করার চেষ্টা থাকে। ভ্রমণ-কাহিনী নামে যে জিনিস প্রকাশিত হয় (যেমন, 'দাক্ষিণাত্য' প্রবন্ধটি) তার সঙ্গে সত্যিকারের ভ্রমণের কোন সম্পর্ক না থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই; কারণ এই সব প্রবন্ধের বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে যে ঐতিহাসিক বিবরণ কিংবদন্তী ইত্যাদি থাকে তা সংগৃহীত। যে সব বিবরণে অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের প্রাধান্য সে সব বিবরণই বিস্তর অলঙ্কাররঞ্জিত ভাষায় রসালো করে উপস্থিত করা হয়। যেমন উক্ত 'দাক্ষিণাত্য' প্রবন্ধে মীনাক্ষী যে তিন স্তন বিশিষ্ট হয়ে রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে শিবকে বিয়ে করেছিলেন, শঙ্করাচার্য যে জাতিস্মর পুরুষ ছিলেন ইত্যাদি বিবরণ ফলাও করে বর্ণিত হয়েছে।

কাজেই সস্তাপচা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড, থার্ড-হ্যাণ্ড মালই হচ্ছে 'অমৃত' কাগজের একমাত্র সম্বল। তিন-চারটি সংখ্যা অনুসন্ধান করেও আমি এমন একটিও রচনা পেলাম না যার সঙ্গে মৌলিক চিন্তা বা মৌলিক তথ্যের সামান্যতম সম্পর্কও আছে। পচা খাদ্য খেলে পেটের অসুখ হয় বটে, কিন্তু পচা সাহিত্য অত্যন্ত লঘু-পথ্য, তাতে আপনার একটা ঢেকুর পর্যন্ত উঠবে না। বাংলা-দেশে যে কী বিপুল পরিমাণ ভুসিমাল উৎপন্ন হচ্ছে তা জানতে হলে অবশ্যই 'অমৃত' পড়বেন।

রোজপেরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT SOAP
পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড়।
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন...

ন হলে কি 'অমৃত'তে মৌলিক প্রবন্ধ বলে কিছু না? না না, তা কি হয়? মৌলিক প্রবন্ধের ও মিলবে বইকি! ২৭শে আষাঢ়ের সংখ্যাতে নের মহারাণী সম্পর্কে যে প্রশস্তিমূলক প্রবন্ধটি য়েছে তা নিশ্চয়ই একটি মৌলিক রচনা; কারণ তে বোধ হয় এমন কোন পণ্ডিত নেই যিনি তাঁর একজন সাধারণ জমিদারণীর নাম উল্লেখ করার জন বোধ করবেন। কাজেই এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বই-পুস্তক থেকে সংগৃহীত নয়। লেখিকার মতে নের মহারাণীর মহত্ত্বের প্রমাণ তিনি লোকের বাড়ি গিয়ে ভোটভিক্ষা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি লেখিকার সঙ্গে একমত হতে না পারার জন্য সেদিন একজন ভিখিরী পয়সার জন্য সকলের দুয়ে ভিক্ষা চাইছিল। একজন ক্ষমতার লোভে ছেন, আর একজন পয়সার লোভে তাঁর চেয়েও এগিয়ে গিয়েছে। এঁদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আমি তা বুঝতে অক্ষম। বরং কেউ যদি কারও অযাচিত ভাবে সকলের ভোট পান তবে কিছু মহত্ত্ব আছে বলে অনুমান করা সঙ্গত। ই মতে যাই হোক জিনিসটা যে মৌলিক খুব সহজেই স্বীকার করা যায়।

আরও দু-একটি মৌলিক প্রবন্ধ 'অমৃত' বেরয় বইকি। যেমন উক্ত ২৭শে আষাঢ়ের 'সিগারেটের ধোঁয়া' নামে একটি প্রবন্ধ ছি। ২রা শ্রাবণ সংখ্যায় 'গায়ে হলুদ' নামে প্রবন্ধ আছে। এ জাতীয় যে কটি প্রবন্ধ আছে লোর বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না। কারণ নামের মধ্যেই এদের যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। 'অমৃত' পত্রিকায় মৌলিক রচনার কোন স্থান নেই কথা একমাত্র শত্রু ছাড়া আর কেউ বলবে না।

তবে এ কথা ঠিক মৌলিকত্ব সম্পর্কে 'অমৃত' কর্তৃপক্ষের অ্যালার্জি আছে। থাকাই স্বাভাবিক। মৌলিকের বেয়ে কখনও যে কীলক প্রবেশ করবে না এ কথা কি যায়! যদি কখনও কোন রচনায় চিন্তা ভাবনা বিতর্ক সমস্যা প্রশ্নের সামান্যতম অনুপ্রবেশও ঘটে বই তো সর্বনাশ। তা হলেই তো সমস্ত আবর্জনা-মুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান সরবরাহের পবিত্র আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে। কাজেই মৌলিকত্ব থেকে শত হস্তের জায়গায় সহস্র হস্ত দূরে থাকলে আপনি আরও বেশী নিরাপদ বোধ করবেন।

কিন্তু মুশকিল এই যে 'অমৃত' পত্রিকা যদিও নিছক সাংবাদিকতার কাগজ, তবুও এটি জনসমাজে সাহিত্য পত্রিকা বলে খ্যাত। কাজেই নামের মহিমা বজায় রাখার জন্য অজস্র সাংবাদিক রচনার মধ্যে কিছু গল্প উপন্যাস অবশ্যই সরবরাহ করতে হয়। কিন্তু গল্প উপন্যাস তো আর সংগ্রহ করে দেওয়া যায় না। চৌর্যবৃত্তির অবশ্য সুযোগ আছে, কিন্তু সেখানেও চৌর্যাপরাধ ঢাকার জন্য নাম-ধাম-ঘটনা ইত্যাদি কিছু কিছু পরিবর্তন না দিলে চলে না। কাজেই গল্প উপন্যাস এমন জিনিস যেখানে মৌলিকত্বকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তবুও অসাধারণ বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পাদকমশাই মৌলিকত্বের পরিসরকে যথাসাধ্য সংকুচিত করে এনেছেন প্রতি সংখ্যায় একটি করে অনূদিত গোয়েন্দা গল্প সরবরাহ করে। দু-একটি গল্প আমি পড়ে দেখেছি, অতি নিকৃষ্ট ধরের গল্প। এগুলোর চেয়ে আমাদের শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ভাল গোয়েন্দা গল্প লিখতে পারতেন। অবশ্য এ ব্যাপারে সম্পাদকের কোন দোষ নেই। গল্পের ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তাঁর নেই বলে তাঁকে অনুবাদকের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এবং অনুবাদক হাতের কাছে যা পাচ্ছেন তাই শ্রেষ্ঠ গল্প বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। তিনি ভাল করেই জানেন যে গল্প শ্রেষ্ঠ হোক আর নিকৃষ্ট হোক তাঁর দক্ষিণা সমানই থাকবে।

কিন্তু এত চেষ্টা করেও সব সামলানো দায়। দু-একটি মৌলিক (অথবা মৌলিক বলে দাবিকৃত) উপন্যাস এবং গল্প ছাপতেই হয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তবু একটা সুবিধা আছে। প্রবোধদা গজেনদার মত কিছু কিছু নামজাদা তিরস্কার (থুড়ি, পুরস্কার) পাওয়া নির্বিষ লেখক আছেন যাঁদের কাছ থেকে নিশ্চিন্ত মনে লেখা নেওয়া যায়। তরুণতর লেখকদের কাছ থেকে লেখা নেওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে 'অমৃত' সম্পাদক বিস্তর অর্থ ব্যয় করে এসব বিগলিতদন্ত লেখকদের কাছ থেকে উপন্যাস

সংগ্রহ করেন। কারণ এঁদের লেখায় কখনই চিন্তা-ভাবনা বা সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি থাকবে না। গতানুগতিক ছাঁচে ছাড়া এঁরা কখনও পরীক্ষামূলক উপন্যাস লিখতে যাবেন না। এঁরা বিশুদ্ধ আর্টের পূজারী এবং আর্ট বলতে এঁরা বোঝেন কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু 'আমিষ' উপাদান সংযোজন করা।

গত কয়েক সংখ্যা ধরে গজেনদার 'পৌষ ফাগুনের পালা' নামক উপন্যাসটি প্রকাশিত হচ্ছে। বলতে লজ্জা বোধ করছি না যে গজেনদার সব বই আমি পড়ি নি। আমার ভরসা আছে যে আকাদমী পুরস্কার লাভ করলেও সাহিত্যের ইতিহাসে গজেনদার নাম উঠবে না, কাজেই তাঁর সব বই বা কোন বই না পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। তাঁর যে কখানা বই পড়েছি তার মধ্যে লক্ষ্য করেছি যে একটি কাহিনী ঘুরেফিরে বারবার করে দেখা দিচ্ছে। একটি মেয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কোন জায়গায়ই আশ্রয় পাচ্ছে না। যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই যে পুরুষটি রক্ষকের বেশে হাজির হচ্ছে সেই পরে ভক্ষকে পরিণত হচ্ছে, এবং মেয়েটি নির্বিবাদে ভক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান উপন্যাসটিতেও এই কাহিনীই উপস্থাপিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই মেয়েটি একবার ভক্ষিত হয়েছে। আশা করা যায়, কাহিনী যত এগুবে ভক্ষিত হওয়ার ঘটনার সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাবে।

গজেনদার রচনায় যে কোন গুণ নেই তা নয়। তাঁর মূল চরিত্রগুলি প্রত্যয়গ্রাহ্য নয়, অবিকশিত। কিন্তু তাঁর পার্শ্বচরিত্রে অনেক সময় সুন্দর বাস্তবতার পরিচয় থাকে; যেমন এই উপন্যাসে ঐন্দ্রিলার (নায়িকা) মার চরিত্রে স্বার্থপর হিসাবী মনের একটি সার্থক চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। কল্পনা-কুশলতা এবং চিন্তা এ দুয়েরই অভাব থাকার ফলে একমাত্র নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তিনি যেখানে লেখেন সেখানে তিনি সার্থক। গজেনদাকে তাই হয়তো পাঠকরা তবু সহ্য করতে পারবেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা 'কালো হরিণ চোখ' উপন্যাসটি যে কোন্ গুণের জন্য ছাপা হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম না। কোন গুণ যে নেই বোধ হয় সেইটেই 'অমৃত'র সম্পাদকের কাছে একটা মস্ত গুণ।

উপন্যাস বেশী টাকা খরচ করে নামকরা লেখকদের কাছ থেকে নেওয়া যায়, কিন্তু ছোটগল্পের জন্য তো আর অত পয়সা খরচ করা যায় না। কাজেই কাঁচা আধ-কাঁচা ডাঁশা তরুণ লেখকদের লেখা ছাপতে হয়। তার ফলে মাঝে মাঝে বড় চমৎকার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়। গল্পের ক্ষেত্রে 'অমৃত'-সম্পাদক সাধারণতঃ একটি নীতি মেনে চলেন। আগেই বলেছি ভালমন্দ নির্ধারণ করার কোন ক্ষমতা না থাকার ফলে গল্প নির্বাচন অনেকটা লটারির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই একটি সাধারণ নীতি থাকায় সুবিধা হয়। নীতিটা হল এই যে গল্পে 'আমিষ'-জাতীয় কিছু থাকা চাই। তাতে দু রকমের সুবিধে। গল্প যত বাজেই হোক, পাঠক তা গোগ্রাসে গিলবে। এবং এসব গল্পে সাধারণতঃ অন্য কোন অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ থাকে না। ৯ই শ্রাবণ সংখ্যায় 'লেখক ও নায়িকা' গল্পটি একটি সুন্দর উদাহরণ। এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে কী করে 'অমৃত' পত্রিকায় কালেভদ্রে এক-আধটি ভাল গল্প স্থান পেয়ে যায় বোঝা যায় না। শ্রীঅতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাশুল' এমনি একটি সার্থক গল্প; জীবনের একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র এতে স্থান পেয়েছে। আমার সামনে 'অমৃত'র যে চারটি সংখ্যা রয়েছে তার মধ্যে এইটিই একমাত্র রচনা যা পড়া যায়।

কাজেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলাল যেমন দেশোদ্ধারের জন্য বহু প্রয়াসে নিজের প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, তেমনি আমাদের 'অমৃত' পত্রিকা একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যসেবা করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অত্যন্ত সাবধানে সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন যে সমকালীন চিন্তা-সঙ্কট তাকে এড়িয়ে চলেছে।

কাজেই এতকাল পরে যে 'অমৃত' পত্রিকার একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা চলতে পারে। এই রূপহীন, গুণহীন, রসহীন, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কাগজখানি যে লোকে পয়সা দিয়ে কেনে তাতে প্রমাণ হয়—কানা ছেলের প্রতি মায়ের দরদ বেশী হয় বলে যে বাংলায় একটি প্রবচন আছে তা যথার্থ।

নিন্দুকের প্রতিবেদন

চার্বাক

তিবেদনের প্রারম্ভে আমি সাধারণতঃ একটি ভূমিকা যোগ করি। বলির পূর্বে যে কারণে বাজানো হইয়া থাকে, সেই কারণেই আমার ভূমিকা-ঢক্কা-নিনাদ; যে পুস্তকখানিকে প্রতিবেদনের ড়কাঠে চাপানো হইবে সেখানিকে যতক্ষণ পর্যন্ত ধ্যে স্নান এবং সিন্দুর-চর্চা করানো হইতেছে ততক্ষণ র আপনাদের ভূমিকার দুন্দুভি শুনাইয়া চলি।

কিন্তু এইবার বোধ করি অনুষ্ঠানটির ব্যতিক্রম র। মনে হইতেছে এইবারকার পুস্তকখানিকে ত অবস্থাতেই বলি দিতে হইবে; ভূমিকার অবসর নবে না।

যদিচ ইহার লেখক স্বীয় নামের মধ্যেই অনুরোধ য়াছেন, ইঁহাকে যেন আমরা ধৌত করিতে ভুলিয়া যাই, যেন তাঁহাকে মালিন্য হইতে আমরা মুক্ত : আন্‌ফুরচুনেটলি আমার পক্ষে তাঁহার অনুনয় করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যতই ল কর,' 'বিমল কর' বলিয়া আপন মর্মবাণী ঘোষণা ন, আমি তো কিছুতেই তাঁহাকে বিমল করিবার য় দেখিতেছি না। শতধৌতেন যে-বস্তুর মালিন্য হইবার নহে, তাহার গলায় বিমল করিবার অনুরোধ-ক বিজ্ঞাপন ঝুলাইয়া রাখিবার কোন অর্থই আমি তে পারিতেছি না। কুঁজার নাম সরল কর, ধীর নাম রতন দে, মুলোর নাম হিমাদ্রি ধর ধবার মত ইঁহার নাম বিমল কর রাখা হইয়াছে।

মনে হইতেছে ভদ্রলোকের নামের অর্থবোধে মাদের হয়তো আদৌ ভুল হইয়াছে। 'বিমল কর' দুইটির অর্থ বোধ হয় প্রাকৃত ইডিয়মে অনুবাদ য়া বুঝিতে হইবে। ইহার অর্থ 'ধুইয়া মুছিয়া কার করিয়া দাও' নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহার অর্থ—লাই কর। ইহাই সহজ অর্থ; বুঝিতে না পারিয়া আমরা এতক্ষণ সোডা-সাবান-সাজিমাটি, স্পঞ্জস্টিল-ঝামা ইত্যাদি লইয়া ব্যর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাল কাটাইয়াছি। বিমল করকে বিমল করিতে হইলে ওই সকল বস্তুর কর্ম নহে, সে ধোলাই-কর্মের জন্য অন্য-প্রকার উপচার ও কৌশল প্রয়োজন। তাহা ইডিয়ম্যাটিক ধোলাই।

এই পর্যন্ত পড়িয়া কোন পাঠক যদি আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন তবে সঙ্গত কর্মই করিবেন। কারণ নাই, যুক্তি নাই, সাক্ষ্য নাই, প্রমাণ নাই, অকস্মাৎ একজন ভুঁইফোঁড় সমালোচক যদি একজন গ্রন্থকারকে অকারণে ধোলাই করিতে উদ্যত হয় তবে তেমন সমালোচকের উপর আমাদের অবশ্যই ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত।

বস্তুতঃ, বহু পাঠক—তাঁহাদের সংখ্যা তিন-চারিজনার কম হইবে না—নিন্দুকের এইরূপ নিষ্ঠুর কর্মের তীব্র প্রতিবাদও করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একজন সাহিত্যিকও আছেন, যিনি প্রতিবেদনে কদাপি নিন্দিত হন নাই, এবং যিনি একদা 'শনিবারের চিঠি'র নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের প্রতিবাদের যুক্তিযুক্ততায় আমার সন্দেহের অবলেশ নাই। কেন না, সমালোচনা যদি ন্যায়-বিচার হয়, তবে নিন্দুক যাহা করিয়া থাকে তাহা সমালোচনা নহে; আমাদের প্রতিবেদনে আর যাহাই থাকুক, ন্যায়-বিচার থাকে না। ন্যায়-বিচার বলিতে অবশ্য যদি অ্যাংলো-স্যাক্সন জুরিসপ্রুডেন্সের সূত্র বুঝি।

অ্যাংলো-স্যাক্সন ন্যায়-বিচারে আসামীর বিরুদ্ধে যতক্ষণ দোষ সপ্রমাণ না হইল ততক্ষণ সে নিরপরাধ বলিয়া সসম্মানে স্বীকৃত। ইহাতে দলিল-দস্তাবেজ-সাক্ষী-শমন-উকিল-জুরি-শামলা-মুহুরী-পেস্কার-দস্তুরি-পেয়াদা-বকশিশ ইত্যাদি বিস্তর বখেড়ার সওয়াল-জবাবের গোলকধাঁধা পার না হইলে কিছুতেই কিছু প্রমাণিত হয় না। সেই সব বখেড়া পার হইতে হইতে আসামীর এমন সঙ্গীন অবস্থা হইয়া পড়ে যে সে-বেচারী যে

কেবল নিজের অপরাধ-নিরপরাধ ভুলিয়া যায় তাহা নহে, বহু ক্ষেত্রে আপনার পিতৃ-নাম পর্যন্ত ভুলিয়া যায়। একই রীতিতে সাহিত্য-সমালোচনার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। তাহাতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের ভাব-ভাষা-জীবনদর্শন-সমাজচেতনা-প্রতীক-আঙ্গিক-সাযুজ্য-চিত্রকল্প-ঐতিহাসিক পটভূমি ইত্যাদির গোটা গন্ধমাদন পর্বতই অমিতশক্তি সমালোচক কাঁধে বহিয়া আনিয়া পাঠকের সম্মুখে দুম করিয়া ফেলিয়া দেন; তাহার মধ্যে বিশল্যকরণীর সন্ধান করা পাঠকের দায়। নিরপেক্ষ সমালোচনা এইরূপ কঠিন, এবং কঠিন বলিয়াই মূঢ় পাঠকের মতে প্রশংসনীয় কর্ম।

নিন্দুক যাহা করে তাহা ন্যায়বিচার নহে, প্রসি-কিউশন। নিন্দুক নিন্দা করিয়া খালাস, ন্যায়-বিচার করিতে হয় পাঠক করুন।

মহাশয়, সংসারে কে কাহার বিচার করিতে পারে? আমরা প্রত্যেকেই আপেক্ষিক বিচারে যুগপৎ চালুনি এবং ছুঁচ, কেটল এবং পট। কাজেই নিরপেক্ষ বিচারের কথা আমাকে বলিবেন না। নিন্দা বলুন, বান্দা প্রস্তুত।

কিন্তু পূর্বের অংশটি আমার এই মাসের প্রতিবেদনে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই জানিবেন। উক্ত স্বীকারোক্তির সহিত আমার অদ্যকার নিন্দাকর্মের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে।

আজ আমি যে 'ধোলাই কর' বাবুর গ্রন্থ লইয়া বসিয়াছি, তিনি সেই সকল বিরল প্রতিভার অন্যতম, যাঁহাদের ক্ষেত্রে সমালোচনা এবং নিন্দা, প্রসিকিউশন এবং জাজমেণ্ট, অবজেকটিভ মূল্যায়ন এবং সাবজেকটিভ নিষ্ঠীবনক্ষেপন—দুয়ের মধ্যে উল্লেখ্য কোন তফাত নাই।

এবারের প্রতিবেদনটি পড়িলে আপনাদেরও সন্দেহ থাকিবে না যে, বাস্তবিক এই লেখকটিকে বিমল করা আমার অসাধ্য।

প্রতিবেদ্য পুস্তকখানির নাম 'অশোক-কানন'; প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০। প্রকাশকাল আর কয়েক বৎসর পূর্বের হইলে ভাবিতাম অশোক এবং কানন বলিতে লেখক বুঝি কোন বাস্তব চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু না, ধোলাই কর বাবুর নামে এ অপবাদ আমি দিতে পারি না। পারি না, কারণ বাস্তবের সহিত ধোলাই কর বাবুর সেই সম্পর্ক, যে-সম্পর্ক জিহ্বার সহিত কনুইয়ের—বহু কসরত করিয়াও যাহার স্পর্শ ঘটানো কঠিন।

নাম-রহস্য ছাড়িয়া দিয়া আসুন আমরা পুস্তকখানির অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। এইখানে পূর্বাহ্নেই চেতাবনি শুনাইয়া রাখা দরকার। ধোলাই কর বাবুর পুস্তকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ব্রাহ্মণ পাঠক উপবীত দয়া করিয়া কানের উপর তুলিয়া লইবেন।

পুস্তকটিতে যতগুলি চরিত্র আছে প্রথমে তাহার এক তালিকা করা যাউক।

ইহার প্রথম পৃষ্ঠার পৃষ্ঠাঙ্ক ৯, সেখানে দুইটি চরি পাইলাম। দুজনেরই নাম অনুল্লিখিত, একজনের পরি 'আমি', অপর ব্যক্তি হইল 'লোকটা'।

প্রথম অনুচ্ছেদেই ইহাদের আবির্ভাব। এইরূপে:

"লোকটাকে আমি চিনেছিলাম। একদিন আমার সঙ্গে ভোররাত পর্যন্ত ছিল।...আমার বিছা নতুন চাদর পেতে দিয়েছিলাম।...বেশী করে ওডিকোল ঢেলেছিলাম...সমস্ত ঘর প্রবৃত্তির গন্ধে ভরে উঠেছিল।"

এই প্রথম অনুচ্ছেদেই প্রথম দুই চরিত্রের প উদ্ঘাটিত। তবু 'প্রবৃত্তির গন্ধ' সত্ত্বেও পাছে ওডিকোলো আতিশয্যে সে-পরিচয়ে আপনাদের বিন্দুমাত্র স থাকিয়া যায়, তাই ইহার অনতিবিলম্বেই ধোলাই আরও স্পষ্ট হইয়াছেন।

"লোকটা...শুয়ে পড়ল। বলল, বাতি নেভা সাধারণত আমি খুব ব্যস্তবাগীশদের ছাড়া আর কাউ আমার কাছে ত্বরিত হতে দেখি না।"

কিন্তু ত্বরিত হওয়ার কথা পরে হইবে। বিমল কা কাছে আমি ত্বরিত হইবার কারণ দেখিতেছি না। চরিত্রের কথা হইতেছে; তাহাই হউক।

এই 'লোক'-টির ভূমিকা ১১ পৃষ্ঠাতেই ইতি ব্যস্তবাগীশ কিনা।], যখন সে "একটা পাঁচ টাকার বের করে রেখে পালিয়ে গেল।"

কিন্তু "আমি" রহিয়াছে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। চরিত্র দেখিলাম ১৫ পৃষ্ঠায়। মকবুল। ইনি ধোলাই বাবুর "আমি"র নিকট কয়েকবার "সঙ্গী হয়ে এসে ভোর পর্যন্ত ছিল।"

র্থ চরিত্র আসিল ১৬ পৃষ্ঠায়, তাহার নাম জানা ১৭ পৃষ্ঠায়, রবীন। "ওর মুখ চৌকোনো, গাল একটু পুরু হাড, নাক লম্বা," ইত্যাদি। রবীন "আমি"-র িনি চাহিতে আসিয়াছিল। এই চিনি যে অপর প্রতীক ইহা বুঝিতে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ল। ২৪ পৃষ্ঠায় তাহা বুঝিলাম। বুঝিয়া বুড়বক ম—

...নের গলার কাছে হাড় খুঁজে পেয়ে আমি তাতে ...লাম। তার পায়ের সমস্ত ভার আমার পায়ে। ...র পাশে। সে আমায় সঙ্গ দিচ্ছে।"

...র পূর্বেই, তখন পর্যন্ত চব্বিশ বছর বয়সের "আমি" ...ইশ বছরের রবীনকে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া সঙ্গ ...ত ধরিয়া লইয়া আসে নাই, পঞ্চম চরিত্রের ...ইয়াছি। তিনি রবীনের মা বেলা বিশ্বাস। ...ড়ির কাছে আমি রবীনের বাবার কথা শুনেছি। ...দেশী বালক। সৈন্য হয়ে এদেশে এসেছিল। ...দেশী বালক এ-দেশী বেলা বিশ্বাসকে উপভোগ ..."

...নম্বর পরিচ্ছেদে এই পর্যন্ত। না, এই পর্যন্ত নয়। ...পরিচ্ছেদের সূত্র ধরিবার জন্য প্রথমের শেষ ...টি লাইন জানা প্রয়োজন। না, কয়েকটির দরকার একটি লাইন মাত্র।

...হা চইল—সঙ্গ দিতে দিতে কিংবা নিতে নিতে ...া উভয়ই যুগপৎ) রবীনের অপূর্ব একটি সংলাপ: ...মায় নষ্ট করেছে।

কনটেক্সেটের জন্য বলি, ইতঃপূর্বে 'আমি' দেবী দাবি ...ছিল, সে রবীনকে নষ্ট করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাদ করিয়া জানাইয়াছিল, সে আগে নষ্ট হইয়াছে। ...র শেষ সংলাপে জ্ঞাত হইলাম কে তাহাকে নষ্ট ...ছে।

কী ভাবে রবীনের মা রবীনকে "নষ্ট" করিয়াছে সে ধোলাই কর বলেন নাই।

দুই নম্বর পরিচ্ছেদের প্রথম লাইন: "আমার মা ...কেও নষ্ট করেছিল।"

এইবার আমরা 'আমি' দেবীর নাম জানিলাম। শোভনা। তাহার মায়ের নাম দুর্গা। তাহার বাবা দাঙ্গায় খুন হইয়াছিল। সে-বেচারীর সাতপুরুষের সুকৃতি যে খুন হইয়াছিল, ফলে তাহাকে আর ধোলাই কর বাবুর বইয়ে আসিতে হয় নাই, নেপথ্যে থাকিতে পারিয়াছে।

এই পৃষ্ঠাতেই আমরা সপ্তম চরিত্র পাইলাম। "বিধবা মা-র এক দেওর জুটেছিল। তার নাম সুকুমার।"

যেন ধোলাই কর বাবুর উপন্যাসের একই পৃষ্ঠাতে দুইজনার নাম উল্লিখিত হওয়াই যথেষ্ট নহে [আমার বিশ্বাস, বিমল করের কোন রচনার একই পৃষ্ঠায় যদি একটি ঘোড়া আর একটি গাধার উল্লেখ থাকে তবে পরের পৃষ্ঠায়, নিদেনপক্ষে দুই-তিন পৃষ্ঠা পরে, আমরা অন্ততঃ একটি খচ্চরের সাক্ষাৎ নিশ্চিতই পাইব।], আবার পষ্টাপষ্টি লিখিবার যেন কোন প্রয়োজন ছিল যে, "খানিকটা রাত হলে,...মা আমায় নীচে রেখে সুকুমার-কাকার তক্তপোশে উঠে যেত।"

ইহার পরবর্তী আবির্ভাব সুরূপামাসির। "সুরূপা-মাসি দেখতে ভাল ছিল।...তার ছিল এক জড় সন্তান। সুরূপামাসির নিজের এক ধরনের রোগ ছিল।" এই মহিলা হইতেছেন একজন পেশাদার ৪২০। এই চ্যাপ্টারে আরও দুই-চারিটি খুচরা সাইড ক্যারেক্টার রহিয়াছে; তাহাদের আমি গুণতির মধ্যে ধরিলাম না; যথা, মলিনাদি ("ভাড়াখাটা মেয়ে"), বিন্তি (যাত্রার দলে সখী সাজত), চারুদি ("কাজল পরে বিকেলে বেরোয়") ইত্যাদি।

ইহার পরের পরিচ্ছেদে দুইটি চরিত্র পাইলাম, যাহারা এই কাহিনীর সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম। ময়নাদি ও তাহার ভাই পূর্ণ। ময়নাদি এই কাহিনীতে একমাত্র নারীচরিত্র যাহাকে বিমল কর তেমন কিছু পার্ভার্স করিয়া বানান নাই। পার্ভার্স করেন নাই বলিয়াই ময়নাদি সম্বন্ধে কোন ডিটেল বলেন নাই। বোধ করি তাড়াহুড়া করিয়া লিখিতে গিয়া বিমল কর ইঁহাদের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই; শুধু শেষদিকে পূর্ণ শোভনাকে লইয়া একরাত্রি "মজা" পাইতে চাহিয়াছিল এইরূপ কথা লিখিয়া দায়সারাভাবে আপন বৈশিষ্ট্যের নীবং চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছেন।

এ পর্যন্ত দশটি হইল।

ইহার পর একজোড়া চরিত্র আসিল, নরেন ও চিত্রা। প্রথমে শুনিলাম, ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী; শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য বোধ করিলাম। স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া একসঙ্গে বিমল করের উপন্যাসে ঘর ভাড়া করিল! আচ্ছা বেকুব তো! এখনই তো লেখক উঁহাদের মাসী-বোনপো বানাইয়া ছাড়িবে। খোঁজ-খবর না লইয়া এমন স্থানে আসিতে আছে!

অবিলম্বেই কিন্তু আশ্বস্ত হইলাম। না, ইহারা প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রী নহে। "অসুস্থ রুগ্ন···স্বামীকে ফেলে দিয়ে চিত্রাদিদি তার বন্ধুর সঙ্গে···চলে আসে।" ইহাদের বিস্তারিত সংলাপে জানিলাম নরেনের "কোনো লুকোনো রোগ আছে" এবং সে "লম্পট"; আর চিত্রা হইতেছে "খচড়ি মাগী, বিচ্, বেশ্যা কোথাকার।" এই সব সংলাপ বলা শেষ হইলে ইহারা মারামারি করিত এবং অতঃপর 'ছাড়' 'আঃ' ইত্যাদি অব্যয় উচ্চারণ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিত। "পরের দিন বেলা সাতটার আগে কেউ বিছানা ছেড়ে" উঠিত না।

আমি চরিত্রের ফিরিস্তি দিতেছি, কাহিনীর নহে; অতএব শোভনা যে ইহাদের সংসারে আশ্রিতা ছিল সে কথা এখানে অবান্তর। এবং একই প্রকার অবান্তর সেই প্রসঙ্গের উত্থাপন যাহার ফলে চিত্রা "আমায় তাড়িয়ে দিল। তাড়িয়ে দেবার আগে···জামাকাপড় খুলে নিয়ে ঝেঁটা মেরেছিল। বলেছিল, 'হারামজাদী, তুমি আমার বাড়িতে বেশ্যাপনা করবে, আর আমি তাই দেখব!'"

ইহার পর আবার কিছু খুচরা চরিত্র আছে। জগবন্ধু ও অন্যান্য, যাহারা শোভনাকে আশ্রয় দিয়াছিল।

বইটির অর্ধেকের বেশী আমরা পার হইয়া আসিয়াছি। আর দুইটি মাত্র চরিত্র বাকি রহিয়াছে। অমলকান্তি এবং প্রফুল্ল দাশ।

অমলকান্তি শোভনার স্বামী। হাঁ স্বামী; এই কথাই লেখা আছে বইয়ে। ছাপার হরফে। ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াও দিয়াছেন বিমলবাবু, "বিয়েটা কোনরকম মন্ত্রটন্ত্র পড়ে হয়নি। আমি সই করা বিয়েও করিনি। এমনি বিয়ে।" আরও ভাল করিয়াও বুঝাইয়াছেন লেখক, "আমরা অনেকটা মাঝামাঝি, রক্ষিতা আর বি[...] ···আমার বরাবরই ভদ্রসভ্র জীবন কাটাবার অভিলা[ষ] ছিল। আমি জ্যোৎস্নাদির মতন থাকা পছন্দ করতা[ম] কোনো এক পণ্ডিতলোকের সে রক্ষিতা ছিল।"

আর প্রফুল্ল দাশ অমলের বন্ধু এবং অমলের [...] [যাহাকে ভদ্রসভ্র ভাষায় অনুবাদ করিলে বলা যায়— রক্ষিতা] শোভনার লভার।

আমি কাহিনী বলিতেছি না, তাই অমলকান্তি [...] কারণে এবং কী ভাবে শোভনাকে বিবাহ করিল ["অ[...] সব জেনে শুনেও···বলল, বি[য়ে] [ক]রবে।"] তাহা বলিবা[র] প্রয়োজন নাই। শুধু প্রয়োজন নাই বলিয়াই বলি[লাম] না এমন নহে, উপায়ও নাই; কারণ বিমল কর তা[হা] বলিয়া দেন নাই। [ছোট একটি প্যারাগ্রাফে [...] সারিয়া দিয়াছেন; এইভাবে,—"অমলকে আমি [...] করে পেয়েছিলাম সে-কথা বললে একটা বড় গ[ল্পের] মত শোনাবে। কিন্তু ওকে যেন আমি পাব এই [...] কপালে আমার লেখা ছিল। ভগবান লিখে দিয়েছিলে[ন।" ...] দেখিতেছি বেকায়দায় পড়িলে শয়তান যে কেবল [...] আওড়ায় তাহা নহে, গল্পের প্যাঁচে কুলাইতে না [...] বিমল করও ভগবানের শরণ লইয়া থাকে। [...] লিখিতে না পারিলে অগত্যা ভগবান লিখিয়াছেন [...] ছাড়া উপায় কী?]

প্রফুল্ল দাশ কী করিয়া এবং কী কারণে শোভনা[র] লভার হইল তাহাও কাহিনীর অংশ। তাহা বাদ দি[য়া] চরিত্রের কথা বলি। প্রফুল্লর দিদি বিবাহের পর পা[গল] হইয়াছিল, কারণ সে বিবাহ করিয়া ভালবাসা পায় [নাই] এবং ভালবাসার পাত্রে তাহার বিবাহ হয় নাই; [...] বলিয়া প্রফুল্ল যোগ করিয়াছিল, "আমিও একদিন [...] একটা হয়ে যাব। দিদির সঙ্গে আমার স্বভাবের এক[টা] মিল আছে।" শেষ পর্যন্ত শোভনার ভালবাসা [...] পাইয়া প্রফুল্ল—না পাগল হইল [পাগলদের উপর বি[মল] করের বড়ই ঈর্ষা, বিশেষতঃ কামজ উন্মাদদের উ[নি] তাহাদের উনি কদাচ উপন্যাসের প্রকাশ্যে আসিতে [দেন] না, নেপথ্যে রাখিয়া দেন!], না আত্মহত্যা করিল।

অতঃপর শোভনা অমলকান্তিকে সব বলিয়া দি[...]

বং শুনিয়া অমল শোভনাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল; যাইবার পূর্বে বলিল, "তুমি যে ইতর যে নোঙরা ছিলো সই ইতরই থেকে গেলে! তোমার রক্তে এই রোগ আছে।"

এই চরিত্রবিশ্লেষণ শোভনা নিজেও স্বীকার করিল, স্বগতোক্তিতে। "আমি আমার কোনো এক অদ্ভুত ক্ষুধার কাছে অক্ষম হয়ে আত্মসমর্পণ করি, না করে পারি না।" সেই ক্ষুধার বশে ইনি এক-একদিন এক-একজন অপরিচিত পুরুষ জুটাইয়া আনেন এবং রাত্রিবাস করেন। তাহারা সকলেই কিছু আর যাইবার সময় পাঁচ টাকার নোট দিয়া যায় না, কেহ কেহ বরঞ্চ কিছুই না দিয়া বিনামূল্যে চিনি চাহিয়া নেয়। প্রতীক চিনি।

এই এক ডজন চরিত্র, এবং আরও কিছু খুচরা ও কিছু নেপথ্যবাসী পাত্রপাত্রীর মধ্যে আমরা অংশতঃ সুস্থ মানুষ পাইতেছি দুইটি মাত্র। তাহারাও একেবারে স্বাভাবিক মানুষ বলিলে ভুল হইবে, তবু সহ্য করিবার মত। বাকি দশটি চরিত্রের প্রত্যেকটি পার্ভার্স এবং কয়েকটি অবিশ্বাস্য রকমের পার্ভার্স।

ইহা আকস্মিক কাকতালীয়তা নহে, ইহাই বিমল কর [যাহাকে ইডিয়ম্যাটিক তর্জমায় আমি ধোলাই কর নাম দিয়াছি] মহাশয়ের বিচরণ ক্ষেত্র। পার্ভার্সন ব্যতীত ধোলাই করের দ্বিতীয় কোন ঔপন্যাসিক উপজীব্য আমি আজ পর্যন্ত দেখিলাম না। 'হ্রদ' হইতে যে পার্ভার্সনের শুরু, 'অশোক-কাননে' তাহারই নবতর ভার্সন ব্যতীত আর কিছু নাই।

তথাপি ইনি যে বিখ্যাত হইতে পারেন নাই, তাহাই আমার বিস্ময়কর মনে হয়। গুরুদেব বুদ্ধদেব বসু যে-বেসাতি বেচিয়া এতবড় হইলেন সেই একই মাল এতগুলি ছাড়িয়াও [এবং গুরুমারা বিদ্যায় একটু কড়াতর মালই ছাড়িয়াছেন] ধোলাই কর এখন পর্যন্ত যাদবপুর কিংবা আর্বানা (ইলিনোয়া) কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই নিমন্ত্রণ পাইলেন না, ইহা বিষম অন্যায়।

বুদ্ধদেবের পার্ভার্সনটুকুই মাত্র অনুকরণ করিয়াছেন, ধোলাই করকে আপনারা এত অক্ষম মনে করিবেন না। উঁহার বিচিত্র দো-আঁশলা ভাষা, কাহিনী-রচনায় অক্ষমতাবশতঃ কাহিনী এড়াইয়া স্বগতোক্তি-ইত্যাদির কৌশলে ফাঁপা রচনায় পৃষ্ঠা ভরাইবার কায়দা, কৃত্রিম কেতাবী সংলাপের মধ্যে ইতস্ততঃ দুই-চারিটি নিতান্ত প্রাকৃত খিস্তি যোগ করিয়া সংলাপকে বাস্তবানুগ করার ব্যর্থ চেষ্টা, ইত্যাদি বুদ্ধদেবের সকল প্রকার অপসাহিত্যিক কৌশলই ধোলাই কর গ্রহণ করিয়াছেন; এবং বুদ্ধদেব অপেক্ষা ভাল ভাবে অনুশীলন করিয়াছেন। নমুনা দেখাইতেছি।

বিমল কর একস্থলে "ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টি" পড়ার কথা লিখিতেছেন। ইহা ঝুপ ঝুপ ও টিপ টিপ দুইটি অনুকার শব্দের ক্রসব্রিড। ইংরেজির সহিত মিশানো বাংলার একটি উদাহরণ—"একেবারে পুরো এলো চুল হতে আমার পছন্দ করে না।" বাংলায় আমরা লিখিয়া থাকি 'পছন্দ হয় না'। কিন্তু ইংরাজিতে 'পছন্দ'টা কর্তা নহে, 'পছন্দ করাটা' ধাতু এবং কর্তৃবাচ্যের ধাতু। অতএব দো-আঁশলা বাংলা হইল, "আমার পছন্দ করে না"। আর একটি বাক্য, "এই বাধা ও ভয়-এর চেয়েও লোভ অনেক ভীষণ, সুখের স্বাদ অধিক কাম্য।" এখানে 'ভয়-এর' এইরূপ এক্সোটিক বাংলা লিখিবার কারণ এই যে 'এর' প্রত্যেকটি শুধু ভয়ের সহিত অন্বিত নহে, বাধার সহিতও অন্বিত। এইরূপ ক্ষেত্রে আধুনিক ইংরাজি ভাষায় পূর্বপদ দুইটিরই সহিত হাইফেন যোগ করা হয়; দো-আঁশলা বাংলায় ধোলাই কর একটি হাইফেন দিয়াছেন। কিন্তু বাক্যটি আর একবার পড়িয়া খটকা লাগিল। বাধা ও ভয়, দুইটি বস্তুর সহিত লোভকে তুলনা করিলাম—দেখিলাম প্রথম দুইটি অপেক্ষা তৃতীয়টি বেশী ভীষণ; তাহার পর কমা লাগাইয়া লিখিলাম "সুখের স্বাদ অধিক কাম্য" তাহা হইলে বাধা ও ভয়ের সহিত সুখের স্বাদকেও তুলনা করিলাম এবং দেখিলাম, প্রথম দুইটি অপেক্ষা শেষটি বেশী কাম্য। ইহা ব্যতীত অর্থ হয় না। তবে কি বাধা ও ভয় ভীষণও বটে, কাম্যও বটে? ধোলাই কর তাহা বলিতে চাহেন নাই, কিন্তু দো-আঁশলা ভাষায় এইরূপ বিপত্তি হইয়া থাকে।

কাহিনী সম্পর্কে একটি উদাহরণ আগেই দিয়াছি। অমলকান্তি ও শোভনার বিবাহ-ঘটিত অংশে বিমল কর

কী ভাবে কঠিন বস্তুকে সহজ ফাঁকি দিয়া এড়াইয়াছেন, সেই কৌশলের উদাহরণ।

গল্পটিতে অবশ্য আগাগোড়া প্রত্যেকটি মোড়ফেরার কাহিনীই এই রকম সহজ করিয়া লেখা। পড়িলে মনে হইতে পারে, ইহা এক প্রকারের নূতন টেকনিক। যে স্থলে ঘটনায় নূতন কিছু ঘটিতেছে না, সে স্থলে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির বর্ণনায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লাগিয়া যাইতেছে; যখনই ঘটনাস্রোতে পরিবর্তনের প্রয়োজন হইল তখনই তিন লাইনে মারিয়া দেওয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদটি উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন অংশ। বস্তুতঃ ইহা উপন্যাসের শেষ লাইন ঘটিবার পরবর্তী ঘটনা; এই পরিচ্ছেদের পর ফ্ল্যাশব্যাক দ্বারা বাকি পরিচ্ছেদগুলি উদ্ঘাটিত। এই প্রায় নিষ্প্রয়োজন প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমার্ধ শোভনা ও তাহার শয্যাংশের এক-রাত্রির ভাড়াটিয়া অনুল্লিখিতনামা লোকটির যৌনক্রিয়া এবং শেষার্ধ শোভনা ও রবীনের অপর এক রাত্রির যৌনক্রিয়ার বর্ণনায় কাটিয়া গিয়াছে। একুনে মোট ১৭ পৃষ্ঠা। যৌনতায় কদর্য দুইটি রাত্রির বর্ণনা ১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী টানিয়া খোলাই কর হয়তো বুঝাইতে চাহেন, উনি কত 'শক্তিশালী' লেখক!

এই অংশে শোভনাকে দিয়া লেখক বেশ কয়েকবার বলাইয়াছেন: নিজের জীবনের কথা বলিতে তাহার ভাল লাগে না। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদের প্রথমেই কী কুক্ষণে লেখা হইল—"আমার কথা একটু বলি:"—তাহার পর হইতে গোটা পুস্তকটিতে আর কিছু নাই। শুধুই শোভনার আত্মকথা। পুস্তকখানির মলাট এবং টাইটেল পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া পড়িলে নিঃসন্দেহে মনে হইত, ইহার নাম "শিক্ষিত পতিতার আত্মকথা, দ্বিতীয় সংস্করণ!"

সর্বত্র কিন্তু, আগেই বলিয়াছি, এত বিশদ বর্ণনা নাই। শোভনার মা এবং তাহার সহিত এক তক্তপোশে শোওয়া দেওর সুকুমারকাকা দুইজনার তুই-তোকারি ঝগড়া লইয়া কয়েক পৃষ্ঠা ভরাইয়া রাখিলে কী হইবে, সেই মা যখন অবশেষে বিমলবাবুর নির্দিষ্ট 'লাইনে' চলিয়া গেল তখন উনি দুইটি বাক্যে প্রসঙ্গটি সারিয়া দিয়াছেন: "আমার মা ঘর ছেড়ে পথে চলে গেছে। গলি-টলিতে তাকে পাওয়া যেতে পারে।"

কাহিনীর আর একটি দিক পরিবর্তন শোভনা এবং প্রফুল্লর প্রথম লদ্‌কালদকি; বিমলবাবু সেরেফ সংক্ষেপে মারার টেকনিক চালাইয়া সেই অংশকে প্রায় উতরাইয়া দিয়াছেন।

শোভনা তখন অমলকান্তির স্ত্রী। অমল তাহাকে আরামে রাখিয়াছে। তাহারা উভয়ে উভয়কে লইয়া সুখী। এমন অবস্থায় বিমল কর গল্প বানাইতে চাহিলেন যে আসলে শোভনা সুখী নয়, আসলে সে ভালবাসা পায় নাই; অপর একজন পুরুষের আকস্মিক আমদানি করিতে হইবে—এইরূপ প্লট বিমলকান্তি, থুড়ি বিমল কর, স্থির করিলেন। [নিন্দুক-কৃত বুদ্ধদেব বসু-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত 'শেষ পাণ্ডুলিপি'র অনুরূপ কাহিনী তুলনীয়।] এইরূপ অদ্ভুত যোগাযোগ একেবারেই সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে, জীবনে এইরূপ ঘটনা কচিৎ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু জীবনে যে ভাবে ঘটিতে পারে সে ভাবে ঘটাইতে হইলে প্রথমতঃ জীবন সম্বন্ধে [illegible] প্রশস্ত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, কেবলমাত্র পার্ভার্সনে অভিজ্ঞ হইয়া তাহা ঘটানো কঠিন; দ্বিতীয়তঃ, একটা [illegible] করিয়া ঐরূপ ঘটনার উপযুক্ত পটভূমিকা সৃষ্টি করিতে হয়। 'ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে'-গোছের হুট করিয়া এরূপ ঘটনা ঘটানো অসম্ভব। বিমলচন্দ্রের পক্ষে তাই টেকনিক আশ্রয় ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

এইভাবে:

অমল কোথায় বাহিরে গিয়াছে, শোভনা সন্ধ্যায় সাজিয়া-গুজিয়া বেড়াইতে বাহির হইল; তখন তাহার নিজেকে অত্যন্ত একাকী মনে হইতে লাগিল। [বর্ণনার দৈর্ঘ্য ৫৩ লাইন।] এমন সময় সেই পুরুষটি [অপরিচিত, নাম জানিবারও কারণ নাই] মোটরবাইক চালাইয়া কাছে আসিল এবং নির্জনে একা একটি স্ত্রীলোককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহী হইল। গাড়ির পিছনে শোভনাকে বসাইয়া সে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিল। [বর্ণনার দৈর্ঘ্য ১২ লাইন।] তারপরের অংশটি উদ্ধৃতি দিতেছি:

"বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। বললাম, 'একটু ভেতরে আসুন।' সে ভেতরে এল। সে আমার ঘরে এসে বসল। আমায় প্রথমে দেখে সে বিস্মিত ও

ত হয়েছিল হয়ত। হয়ত আমায় বিশ্বাস করেনি। ; আমার ঘরে এসে সে বুঝতে পারল আমি স্পর্শযোগ্য হতো।"

এবং এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম বিমল কর মদের স্পর্শযোগ্য নহেন।

একটি বিবাহিতা স্ত্রী পরিচয়ে পরিচিতা বাহ্যিক রে পরিতৃপ্তা রমণী যে-কোনও একজন অপরিচিত কে রাস্তা হইতে হ্যাঁচকা টানে নিজের বাড়িতে য়া আনিয়া তাহাকে দেহ দান করিতেছে [অথবা হয় স্পর্শদানই হইল !]—এবং ঘটনার অকুস্থল একটি মল শহর—এই মারাত্মক বস্তু কত সহজে পরিবেশন য়া গেল !

কাহিনী-পরিবেশনের এই যে টেকনিকে বিমল কর হইয়াছেন—ফালতু স্থানগুলিতে বিলম্বিত লয় এবং ত্র গ্রহণীব্যাধিগ্রস্তের মত বেসামাল—এই টেকনিকটির চীক ইনি আগেভাগেই দেখাইয়া রাখিয়াছেন, ন্যাসের প্রথম পুরুষ চরিত্রে ; যাহার নাম 'লোকটা'। হীন বলিয়া তাহাকে তাচ্ছিল্য করিবেন না, দূতের বিরহী যক্ষও অনুল্লিখিতনামা, কশ্চিৎ মাত্র। উপন্যাসের 'লোকটা' স্বয়ং গ্রন্থকারের প্রতীক। ন, বলিতেছি।

নায়িকা তাহার "আঙুলে ঝুটো মুক্তোর আংটি" খিয়া তাহাকে প্রথমে "বিস্তর বড়লোক" ভাবিয়াছিল। মরাও বিমল করের ঝুটা চাতুর্যের ছটা দেখিয়া অনুরূপ । করি নাই কি? শেষে লোকটাকে দেখা গেল খের তলায় বসন্তের দাগ" এবং "মুখটা সেদ্ধ ডিম"-মতন। বিমল করকেও আমরা শেষ পর্যন্ত ইহা পক্ষা বেশী কিছু ভাল দেখি না। লোকটা পাঁচ টাকা র দক্ষিণা দিয়া ভাগলপুর হইয়াছিল ; বিমল কর খবার সময় তাঁহার সমস্ত সাহিত্যকীর্তি দ্বারা বোধ পাঁচ-সিকার বেশী মূল্য রাখিয়া যাইতে পারিবেন না। কটা যে-ভাবে নীরবে ধীরে সুস্থে ওমলেট ছিঁড়ে ড়ে খেল, চায়ে চুমুক দিল এবং ভোজনে সময় ব্যয় ল তাতে আমার মনে হয়েছিল, এই আহার সমাপ্ত র সে আমার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করবে, গল্প শেষ য়ার আগেভাগে হয়ত আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেবে···" ইত্যাদি পড়িয়া এখন মনে পড়িতেছে, আমরাও বিমল করের বিলম্বিত লয়ে কাহিনীর সূত্রবিস্তার দেখিয়া একটি গল্প পাইব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু লোকটির সম্বন্ধে শোভনার এবং লেখক সম্বন্ধে আমাদের আশাভঙ্গ হইতে দেরি লাগিল না। লোকটা খালি "বাতি নেভাও" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল এবং বাতি নেভানো হইতেই স্ত্রীলোকটিকে জাপটাইয়া ধরিল। তাহার একটু পরেই সে ঘুমাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে থাকিল। অনুরূপভাবে বিমল করও পাঠককে যাহা দিয়াছেন, তাহা হইল অন্ধকার, জাপটাইয়া ধরা এবং ঘুমের মধ্যে মড়াকান্না। গল্প নহে।

এইবার একটি উপসংহার যোগ করা যাউক।

উপসংহারের কথায় উপন্যাসটির উপসংহারের কথা মনে পড়িল। যেখানে পুস্তকের নামকরণের যুক্তি উপস্থাপিত, সেই সর্বশেষ প্যারাগ্রাফটি এইরূপ :

"মাঝে মাঝে মাঝে [তিনবার 'মাঝে' মুদ্রণপ্রমাদও হইতে পারে, 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত'-গোছের টেকনিকও হইতে পারে, বুঝিবার উপায় নাই] আমার মনে হয় কোন এক রাক্ষস আমায় তার বন্দিনী করে রেখেছে। মাঝে মাঝে সে আসে। আমি তার ভয়ে এত ভীত কণ্টকিত হয়ে থাকি যে আমার মনে হয়, কেউ তখন আমার পাশে থাকে—আমার স্পর্শের মধ্যে।"

এই এক অনুচ্ছেদে উপন্যাসের স্ত্রী-চরিত্রটির নিম্ফোম্যানিয়া-ব্যাধি এবং নামকরণ দুইয়েরই যাথার্থ্য বর্ণিত। ব্যাধির কথা থাকুক, নামকরণটির বিষয় একটু চিন্তা করিয়া দেখি।

রাক্ষসের নিকট সীতা বন্দিনী হইয়াছিল অশোক-কাননে। বিমলবাবুর নিম্ফোম্যানিয়াক হাফগেরস্ত নায়িকা [ইনিই বিমল-বাল্মিকীর সীতা !] বন্দিনী হইয়াছে তাহার পার্ভার্স যৌন-ক্ষুধার নিকট ; অতএব কাহিনীর নাম অশোক-কানন। বুঝিলাম। কিন্তু রূপকটি আর একটু বিশ্লেষণ করিলে প্রশ্ন উঠে সীতার, নিম্ফোম্যানিয়ার অশোক-কাননে বন্দিনী সীতার, দুরবস্থার কাহিনী আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে কে ? পার্ভার্সনে কণ্টকিত এই কাহিনী যদি অশোক-কানন, তবে সুস্থ

মনুষ্যত্বকে বলা উচিত অযোধ্যা। সেই অযোধ্যার অধিবাসী সুস্থ স্বাভাবিক সহজ পাঠকের নিকট বন্দিনী সীতার বেদনা বহিয়া আনিবার দূত হইবে কে? রামায়ণে এই ভূমিকা লইয়াছিলেন মহাবীর পবননন্দন, এখানে বিমল কর। হায়, কিসে আর কিসে!

তবু অশোক-কাননে হনুমানের ভূমিকার সহিত এই উপন্যাসে বিমল করের ভূমিকার একটি স্থলে কিঞ্চিৎ মিল পাইতেছি। কৃত্তিবাস বলিয়াছিলেন:

"সীতা নাড়ে মুখ, বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি নর-বানরের কথা॥"

এইখানে, এই রূপক অশোক-কাননেও নর-বানরের কথা বুঝিবার চেষ্টায় আমরা বড়ই হিমসিম খাইয়াছি।

কিন্তু ইহা উপসংহার নহে। আমার প্রতিবেদনে একটি উপসংহার যোগ করিতে আমি প্রতিশ্রুত আছি।

আমি এই ব্যক্তিকে এত দীর্ঘ প্রতিবেদনের সম্মান দিলাম এই কারণে যে বিমল কর জাতীয় কয়েকজন লেখক সম্বন্ধে কোন কোন মহলে একটি মিথ প্রচলিত আছে। সেই মিথ হইল বিমলের রচনা "মনস্তাত্ত্বিক"।

মনস্তাত্ত্বিক গল্প-উপন্যাস কথাটা হাস্যকর রকমের ভুল। শুধু বিমল করের রচনা-সম্পর্কে নহে, সংজ্ঞাটি মূলতঃ ভুল সংজ্ঞা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিলে বুঝায় ইহার কাহিনী ইতিহাসাশ্রিত। সামাজিক উপন্যাসের কাহিনী সমকালীন সমাজের পটভূমিতে। গোয়েন্দা কাহিনী, সায়েন্স ফিকশন, প্রেমের গল্প, ভূতুড়ে কাহিনী—এই সব নামের অর্থ এবং চরিত্রও স্পষ্ট। কিন্তু সাইকোলজিক্যাল উপন্যাসটি আবার কী বস্তু মহাশয়? উপন্যাসের কারবার যদি জীবিত মানুষ লইয়া তাহা হইলে তো উপন্যাসমাত্রই মনস্তাত্ত্বিক হইতে বাধ্য। চরিত্র 'ক' যদি চরিত্র 'খ'-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার পিছনে মনস্তত্ত্বের সূত্র নিশ্চয় রহিয়াছে; চরিত্র 'গ'-এর প্রতি বিদ্বিষ্ট হইলে তাহাও মনস্তত্ত্ব বাদ দিয়া হইতে পারে না। জীবিত মনুষ্যের প্রত্যেকটি সচেতন [illegible], অবচেতন চিন্তা ও অচেতন স্বপ্ন—সকল কিছুর রহস্য-অন্বেষণই সাইকোলজির অন্তর্গত; সাইকোলজি বাদ দিয়া উপন্যাস হইবে কী করিয়া?

তবে কতকগুলি রচনায় বিশেষ করিয়া মনস্তাত্ত্বিক লেবেল আঁটিবার কারণ কী? কোন কোন লেখক সাইকোলজির দুই-চারিটি ছেঁড়া পৃষ্ঠা পড়িয়া যত প্রকার বিকৃত-মানসিকতার অতি বিরল উদাহরণ দেখিতে পান তাহার সবগুলিকে জোর করিয়া কাহিনীর মধ্যে ঢুকাইয়া দেন। ইহাকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক রচনা বলি।

বিমল কর এই ফর্মুলা অনুসরণ করেন। তাই তিনি মনস্তাত্ত্বিক লেখক।

সেইজন্য বিমলের লেখাতে দেখিবেন ইডিপাস-ইলেকট্রা-আদি যতপ্রকার কম্প্লেক্স ফ্রয়েড-হ্যাভেলক খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, যত প্রকার উদ্ভট বিকৃত-মানসিকতার দৃষ্টান্ত দ্বারা মনোজগতের রহস্য-অন্বেষণে পণ্ডিতেরা ব্রতী হইয়াছেন, যত অসুস্থ অদ্ভুত বিদঘুটে সমকামী, উন্মাদ, স্যাডিস্ট, ম্যাসোকিস্ট, একৃজিবিশনিস্ট ইত্যাদি বস্তু যত জায়গায় শোনা গিয়াছে—তাহার সকলগুলির জগাখিচুড়িতে জঘন্য এক-একটি চিড়িয়াখানা তৈয়ারী হইল। জীবনের চিত্র আঁকিতে জানিলে তাহাতে স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য জটিল-সরল সকল প্রকার মানসিক প্যাটার্ন স্বভাবতঃ সহজভাবে আসিত, আসিয়া সকলের ঐকতানে একটি শ্রেয়সের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিত; তাহার পরিবর্তে যৌন-মনস্তত্ত্বের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ বদহজম করিয়া উপন্যাসের মধ্যে বীভৎস উদ্‌গিরণে পটু হইতে ব্রতী হইয়াছেন বিমল কর এবং অন্যান্য কয়েকজন। তাহা পড়িলে সাহিত্য-রসিক ঘৃণায় জর্জর হইয়া উঠেন, মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিত অনধিকারীর দুঃসাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান।

সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞান উভয় নিরিখেই নিতান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত জঘন্য ঔদ্ধত্যে দুই-কান-কাটা রচনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ খোলাই কর মহাশয়ের এই নিরা উপন্যাসটি।

—

সংবাদ-সাহিত্য

শু—

'মরা গত সংখ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নিন্দাবাদ করিয়াছিলাম এই ধরনের আজেবাজে মার্কা লোককে বঙ্গভাষার শিক্ষকরূপে নিয়োগ করার জন্য খোদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেই বীতরাগ হইয়াছিলাম। 'শনিবারের চিঠি'তে মন্তব্য প্রকাশিত হইবার পর বহু প্রবীণ ও নবীন পাঠক নানাভাবে আমাদের সাধুবাদ জানাইয়াছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার" নামক গ্রন্থে দেখিতেছি :

"পূর্বে দেখিয়াছি, শিক্ষাধিকর্তার নিযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক-নির্বাচন-সংসদ সকল বই আদ্যোপান্ত না পড়িয়া গুরু-লঘু বিচার না করিয়া অনুমোদন করেন। সেইরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত পাঠ্য-নির্ধারণ-সমিতিরও (Board of Studies) সকল সদস্য সকল বই পড়েন কি না সন্দেহ। মাতৃকা পরীক্ষার নিমিত্ত একখানি বিজ্ঞানের বইতে কেঁচোর জনন-ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক শিক্ষক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কেমনে বালক-বালিকাকে ইহা বুঝাইবেন? আমি বলিয়াছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়কে জিজ্ঞাসা করুন।" বি. এ. বাংলা পাঠ্যের একখানি অতিশয় অশ্লীল পুস্তক পাঠ্য-নির্ধারিত হইয়াছে। গ্রাম্য ভাষায় 'খেউড়' বলিতে পারা যায়। আমার বিবেচনায় এই বই রহিত করা কিংবা ইহার অংশ পোড়াইয়া ফেলা উচিত। ছাত্রেরা বাংলা ভাষা সম্যক্‌রূপে শিখিতে পারিবে, এই আশায় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু সদস্যেরা সভ্যতা-বর্জিত ইংরেজী-বাংলায় রচিত পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন।"

বিদ্যানিধি মহাশয় প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সবিশেষ প্রয়োজন এখনও অনুভূত হইতেছে। চৌদ্দ বৎসরে রাম বনবাস অন্তে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা সেই বনেই রহিয়া গিয়াছেন।

আর একটি বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দর্শনশাস্ত্র নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় যে বস্তুটি বিরাজ করিতেছে এবং স্কুলের গণ্ডী পার হইতে না হইতেই ছাত্রেরা যে বিদ্যাচর্চার সুযোগ পাইয়া থাকে তাহার সার্থকতা এবং উপযোগিতা কী তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্পর্কে আচার্যের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

"কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, আমি দর্শনের প্রতি বিমুখ। উত্তম বিষয়ও দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে অযোগ্য হইতে পারে। প্রথম কথা, ১৯।২০ বৎসরের যুবক-যুবতীরা দার্শনিক হইবার অযোগ্য। যদি তাহাদিকে দর্শন পড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহারা তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিবে না; অমুকের মত, অমুকের মত, কতকগুলা মত মুখস্থ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়াদি হইতে যত শীঘ্র এই পরমতপ্রত্যয় দূরীভূত হয়, দেশে স্বাধীন চিন্তার পক্ষে ততই মঙ্গল। তাহারা বলিতে পারিবে না, "এই মতই সত্য এবং তদনুসারে আমাদের জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব।" ছাত্রেরা বুদ্ধির তাৎপর্যের পরিচয় পায়, কিন্তু তাহাদের কর্মক্ষেত্রে তাহা নিষ্ফল। পুনশ্চ, দেশটাই দার্শনিকের দেশ, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রা অতিশয় প্রত্যক্ষ। দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইতেছে না। Ethics নামে বিষয়টি আমাদের ভাষায় ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর আমরা বহুকাল হইতে জানি, ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। কোন্ পণ্ডিত ইহা নির্ণয় করিয়া আমাদের জীবনের পথ নির্ণয় করিতে পারে? ফলে থাকে কতকগুলি মত আর তর্কের কচকচি। আমি দর্শনের বিরোধী নই, কিন্তু তাহা জানিবার বয়স আছে। অধিশিক্ষায় দর্শন চলিতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য যোগেশচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষীদের নির্দেশিত পথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চালনা করাই এখন সর্বপ্রধান কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনকে কারনানি ম্যানসনে পরিণত করিয়া বাংলা সাহিত্য বিভাগে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ও কেচ্ছাদার উপন্যাস লেখকদের অধ্যাপকরূপে বসাইয়া দিলে আর যাহাই হউক, ছাত্রদের জ্ঞান অর্জন সুষ্ঠুভাবে কখনই হইতে পারে না।

কাম-নাদার পীল

কামরাজ প্রস্তাব অনুযায়ী সর্বভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন ম্যাজিকের মত সংসাধিত হইয়া গেল তাহা দেখিয়া আমরাও কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। একটি প্রস্তাব আমাদেরও মনে জাগিতেছে এবং তাহা বলিয়া ফেলাই ভাল। বাংলাদেশে এখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁহারা সর্বপ্রকারে নেতৃত্ব করিতেছেন, অর্থাৎ কি খ্যাতিতে, কি বিক্রয়বাহুল্যে, কি পাঁচকষা-কষিতে যাঁহারা উচ্চতম ধাপগুলিতে বসিয়া আছেন তাঁহারা সকলেই বৃদ্ধ। শুধু বৃদ্ধ নহেন, অতি বৃদ্ধ— ষাটের উপরে তো বটেই, ঠিকুজী কোষ্ঠী বাহির করিলে কেহ কেহ সত্তরও পার হইয়াছেন দেখা যাইবে। এই ধরনের এক ডজন লোলচর্ম পলকেশ বৃদ্ধ এ জন্মের মত সাহিত্য রচনা স্থগিত রাখিয়া, এক পূজায় পাঁচ-সাতখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখিবার মোহ ত্যাগ করিয়া কামরাজী মতে রামরাজ পরিত্যাগ করুন। ইঁহাদের সকলেই দেশসেবার যোগ্য না হইলেও আজিকার এই ঘোর দুর্দিনে অন্ন-বস্ত্র-ঔষধ অভাবে জর্জরিত জাতিকে নানাভাবে সেবা করিতে পারেন। এই বারো জনের নামের এবং কামের একটি তালিকা আমরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, অভিশপ্ত হওয়ার ভয়ে আর প্রকাশ করিলাম না। তবে ইঁহাদের রচিত সাহিত্য পাঠে আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে যে কবিরাজী চিকিৎসা হইতে আরম্ভ করিয়া লটকোনার দোকান এবং প্রাইমারি পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া চুল ছাঁটিবার সেলুন পর্যন্ত সবই ইঁহারা অশেষ যোগ্যতার সহিত চালাইতে পারিবেন। আমাদের নির্বাচিত বারো জনের বুড়া হাড়ে এখনও ভেল্‌কি খেলে, ইঁহারা একমতে এক ময়দানে নামিলে সেখানকার মাটি চব্বিশ হাত নীচু হইয়া যাইতে পারে। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসের মত সব দিক দিয়া সম্পূর্ণ নিখুঁত।

মোটের উপর দেশের দুর্গত জনগণের সেবায় ইঁহাদের এখনই নামিয়া পড়া উচিত। নচেৎ এই বৎসরের শারদীয় সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর কামরাজ নাদারের দৃষ্টি এদিকেও পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

এলোমেলো

কেদারা ছায়ানট গাহিতে চায় মন
কণ্ঠে আসিতেছে মারুবেহাগ,
তবলা তেতালায় বাজিছে চৌতালে
শান্ত মনে তবু কাটে না দাগ।

মেঘের পরে মেঘ জমেছে ঘন কালো
আকাশ জুড়ে নামে অন্ধকার
ডি. ভি. সি. দয়া কর, বসিব গৃহকোণে
বিজলী বাতি হায় জ্বলে না আর।

বসিয়া নির্জনে যাহারি কথা ভাবি
এ দেহ শিহরায়, আকুল হই,
পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়,
আমার পানে ফিরে চাহে সে কই!

বিগত যৌবন অথবা রোমিও সে
তিরিশে চুলে পাক ধরেছে যার,
কেওড়াতলা যেতে বলেছে প্রিয়া তাকে
জেনেছে বুড়োরাই প্রেমিক সার।

হাওড়া হতে ট্রেন ছাড়িছে দেরাদুন
পুরীর যাত্রীরা চড়িল তাতে
সে গাড়ি থেমে গেল সকরিগলিঘাটে
প্রভাত হল যবে লুধিয়ানাতে।

ঠোঁটেতে মাখো রং অথবা করো ঢং
এ ধুলো দুই হাতে চাহিব ক্ষমা
পুরুষে পারে যাহা, নারী কি পারে তাহা
সরমে পরিহরি, হে নিরুপমা !

পালদার পত্র—১

া হে,

সর্বাগ্রে পনেরোই আগস্টকে প্রণাম জানাইয়া এই র সূচনা করিতেছি। ভারতবাসীর জীবনে চিরকালের এই তারিখটিই শ্রেষ্ঠতম দিন হিসাবে চিহ্নিত হইয়া ক। এই দিনটির মর্যাদা তোমরা রক্ষা করিও।

পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের উৎসব সভায় বিবিধ ভোজ্যবস্তুতে তৃপ্ত হইয়া তো ফিরিয়া সলে কিন্তু লাভ লোকসানের হিসাব একবার খতাইয়া য়োছ কী? পনেরোই আগস্টের পরের দিনটিই যে রং ষোলই আগস্ট তাহা কী মনে নাই? ওই রিখে প্রকাশিত মারাত্মক 'অমৃত' পত্রিকাখানি য়াছ নিশ্চয়ই।

মাদের জ্যেষ্ঠতাত তারাশঙ্কর এ কী করিলেন! ল বছরের বাংলা সাহিত্যে প্রমথ বিশী, বিমল গজেন্দ্র মিত্র ছাড়া আর কেহ নাই! আজ হইতে ত বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' স্মরণ বিপন্ন ইন্দ্রজিৎ খুড়া মহাশয়কে বলিতেছেন : "হে হ্না, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!" "মৃগেন্দ্র কেশরী, , হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে!" রিতেছি, তোমাদের অবস্থা ইন্দ্রজিৎ অপেক্ষাও চনীয়।

ভায়া হে, অমৃতং বালভাষিতং (রাবীন্দ্রিক মতে নহে) করিয়া সমস্ত বিষয়টাকে লঘুভাবেই উড়াইয়া দিতে রিতাম, কিন্তু তারাশঙ্করকে বালক মনে করিবার স্পর্ধা । এই কাজ, অর্থাৎ উক্ত 'অমৃতে' প্রকাশিত বাংলা হিত্যের খতিয়ান তারাশঙ্কর সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় রয়াছেন তাহা ভাবিলেও করোনারী আক্রমণ ঘটিতে রে। তবে একটা সন্দেহ মনে জাগিতেছে। দীর্ঘকাল রিয়স গল্প-উপন্যাস লিখিয়া এবার তারাশঙ্কর সত্যই ক্লান্ত হইয়াছেন। সুতরাং রুচি পালটানো প্রয়োজন। তারাশঙ্কর এইবার স্যাটায়ার লিখিতেছেন।

স্যাটায়ার গল্প লেখা যদি বা সহজ হয় স্যাটায়ারধর্মী প্রবন্ধ রচনা অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু বিচক্ষণ তারাশঙ্কর অতি নিপুণভাবে কুশলী শব্দপ্রয়োগে কী উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গরচনাই না সৃষ্টি করিলেন! আত্মবঞ্চনার কথা ভাবিতেছ? সে কথা থাক।

বেশীদিন আগের কথা নহে, মনে পড়িতেছে। বাংলা সাহিত্যের আসরে বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর মানিক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলজানন্দ বলাইচাঁদ বিভূতিভূষণ এই তিন মুখোপাধ্যায় একে একে তাঁহাদের শিল্পসম্ভার হাজির করিতেছেন। এই সৃষ্টিধরদের পাশে তারাশঙ্কর কথিত কয়জন পুরাপুরি দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের নাম মনে করিলে বিপুল হাস্যোদ্রেক ছাড়া আর কী হইতে পারে? সমরেশ শঙ্কর আশুতোষের রচনায় যদিবা কিছু বস্তুর সন্ধান মিলিতে পারে, প্রমথনাথ গজেন্দ্রকুমার বিমলচন্দ্রের রচনায় প্রাণান্তকর প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নাই।

ভায়া হে, তারাশঙ্করের উক্ত রচনাটি পড়িয়া যে কী প্রচণ্ড মনস্তাপ পাইয়াছি তাহা চট করিয়া ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি ধর্মবিশ্বাসী শক্তিমান পুরুষ, যথাসময়ে শাস্ত্রমতে হয়তো নিজেকে শোধন করিয়া লইবেন, কিন্তু তোমরা আগামী কুম্ভমেলা পর্যন্ত টিকিয়া থাকিবে কী?

ইতি

গোপালদা।"

পুরানো কথা

আমরা আমাদের হিতৈষীমহল কর্তৃক সাহিত্য-বহির্ভূত পলিটিক্স চর্চা না করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। তাঁহাদের অনুরোধই আমাদের নিকট আদেশ। কিন্তু আমরা যুগধর্মকে এড়াইব কি করিয়া, তাহাই ভাবিতেছি। যে যুগে অনধিকার-চর্চাই সর্বজনগ্রাহ্য রীতি, বিপরীত আচরণই যে যুগের ধর্ম, সে যুগের সাহিত্যিকরাই এমন কি অপরাধ করিল? দেশশুদ্ধ রাজা-মহারাজা, এমন কি,

ধাঙড় মেথর মুচী মুদ্দাফরাশ যখন সাহিত্যিকের হাঁড়িতে বিনা দ্বিধায় কাঠি দিতে পারে, তখন তাহারাই বা গলা বাড়াইয়া বেড়া ডিঙাইয়া অপরের বাগানের ফুল-ফলের আঘ্রাণ না লইবে কেন? কেহ কেহ বলিবেন, "সাহিত্য আলো-বাতাসের মত, সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার; রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, খোঁয়াড় আলাদা—সেখানে বিচরণ বা প্রবেশ করিতে হইলে বিশিষ্ট অধিকার অর্জন করিতে হয়। জেলে গিয়া, ধর্মঘট ঘটাইয়া, দল বাঁধিয়া ও গুণ্ডা মারিয়া দাগী এবং ঝানু না হইলে এ দেশে সে অধিকার কাহারও জন্মে না।" যে পলিটিক্সের কথা ইঁহারা বলেন, আমরা সেই পলিটিক্স কখনও চর্চা করিতে চাহি না। সাধারণ মানুষ হিসাবে এবং দেশের অধিবাসী হিসাবে আমরা এমন কতকগুলি অধিকার চাই, যাহা আমাদের জন্মগত অধিকার বলিয়া আমরা মনে করি। খাইয়া পরিয়া নিরুপদ্রবে বাস করিবার দাবি তাহার মধ্যে প্রধান। সম্প্রতি বাংলা দেশে, আমরা সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছি। কর্তৃপক্ষ বর্তমান মহাযুদ্ধকেই ইহার কারণ বলিয়া চালাইতে চাহিতেছেন; ইহা সত্য হইলে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু থাকিত না। আমরা দেখিতেছি, ইহা সর্বৈব সত্য নয়। কতকগুলা ক্ষমতাশালী মানুষের অপরিমিত লোভ এবং একদল দুর্জনের সঙ্ঘবদ্ধ চক্রান্তে দেশের অধিকাংশ লোক প্রত্যহ সাধারণ জীবন-যাত্রার ব্যাপারে নিগৃহীত হইতেছে। মানুষে অর্থ সামর্থ্য এবং সময় ব্যয় করিয়াও খাইতে পরিতে পারিতেছে না। ইহা এক প্রকারের অরাজকতা। যে রাজার শাসনে এরূপ ঘটে, সে রাজার অপকীর্তি ঘোষিত হইতে বাধ্য। শুধু অতিলোভী ও দুষ্টদের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে চলিবে না। দুষ্টের শাসন রাজারই কর্তব্য। শাসনকার্য-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনেকে এই চক্রান্তের মধ্যে আছেন—এইরূপ সন্দেহ কাহারও কাহারও মনে জাগিয়াছে। এইরূপ অবস্থাতে পড়িয়া আমরা নিরুপায় হইয়া অন্য প্রতিকারের পন্থা না দেখিয়া আর্তনাদ করিতেছি। ইহাই আমাদের পলিটিক্স। যাঁহারা আমাদিগকে শিশুর সামিল করিয়া রাখিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন—শিশুর রোদনই বল। সকল শাসন এবং সকল আইন সত্ত্বেও সেই রোদন আমাদের কণ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। কাঁদিতে না পাইলে দম বন্ধ হইয়া আমরা মরিয়া যাইব।

* * *

চাউলের মন চল্লিশের ঊর্ধ্বে গিয়াছে, অন্যান্য দ্রব্য মূল্যও অবিশ্বাস্য রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে—এরূপ ব্যাপারের পরিণতি চিন্তা করিতে গিয়া আমরা দেখিতেছি, বাংলা দেশের তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের উচ্ছেদ অনিবার্য। কলে বা ফ্যাক্টরিতে মুটে ও মজুর রূপে যাহারা কাজ করে, নিজেদের স্বার্থের খাতিরে কল-ফ্যাক্টরির মালিকরা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে তাহাদের আহার্যের সংস্থান করিতেছেন; ইহারা নিম্নশ্রেণী বা lower class। উচ্চ শ্রেণী বা upper class যাঁহারা, তাঁহারা বিত্তশালী; বিত্তের ফাঁদে বিত্ত ধরিবার বহুবিধ সহজ পন্থা বর্তমান যুদ্ধের দরুন উন্মুক্ত হইতেছে, সুতরাং এই শ্রেণীরও মার নাই। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই উপার্জনক্ষম; কর্তৃপক্ষই তাহাদের আহার্য-পরিধেয়ের জন্য চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় বাড়ে নাই, খরচ দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; সভ্যতার নানা সংস্কার মানিয়া চলিতে তাহারা বাধ্য বলিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াও আহার্য-সংস্থান তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেস্টিজের খাতিরে আত্মহত্যা করিতে ইহারা অভ্যস্ত। তা ছাড়া এই শ্রেণীর প্রত্যেকটি পরিবার মাত্র একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া চলে—সেই কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তিরা বর্তমানে সর্বনাশের গহ্বরমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদিগকে বাঁচাইবার কোনও আয়োজন কোনও দিকে দেখা যাইতেছে না। আমরা চীৎকার করিয়া এই সকল নিপীড়িত মূক ব্যক্তিদেরই সচেতন ও সংঘবদ্ধ হইতে ডাকিতেছি। ইহা পলিটিক্স নয়, আত্মরক্ষার প্রয়াস মাত্র; আমরাও যে এই দলে!

* * *

আমরা এই প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আর একবার উত্থাপন করিয়াছিলাম। তখন বলিয়াছিলাম, যতদিন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা পুনরায় স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ না করে, ততদিন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিম্নশ্রেণীর সহিত এক হইয়া গিয়া কৌশলে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে।

...রে বিলুপ্ত হইলে দেশেরই ক্ষতি, কারণ ইঁহারাই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও রক্ষক, সাহিত্য ও সাহায্যে দেশের প্রবহমান প্রাণধারার পরিপুষ্টি ...সাধন করিয়া থাকেন, ইঁহাদের মৃত্যুতে জাতিরই ...। পৃথিবীতে এমন দুর্ঘটনার দৃষ্টান্তের ...নাই। সুতরাং আমরা শিক্ষকই হই আর ...কেরাই হই, আত্মশক্তিতে অথবা বুদ্ধিকৌশলে টিকিয়া ...র ব্যবস্থাই আমাদিগকে সর্বাগ্রে করিতে হইবে। ...লিটিক্স কি না জানি না, ইহাই এখন আমাদের সংস্কৃতি-মূলক যে স্বাতন্ত্র্যবোধের গৌরবে আমরা ...গৌরবান্বিত ছিলাম, তাহা আজ পরিত্যাজ্য। ...লি এতদিন আমাদের উপজীবিকা ছিল, বর্তমানে শ্রমিক-নিম্নশ্রেণীর অবিশ্বাসের কারণ হইয়া মারাত্মক ...উঠিতেছে—এই দালালির পেশা আমাদিগকে ...ত হইবে। যাহারা গতর খাটাইয়া খায়, তাহাদের এক হইয়া তাহাদেরই কল্যাণচিন্তা আমরা করিব, ...পক্ষ অর্থাৎ ধনিকের দলভুক্ত হইয়া তাহাদের ...র সহায়ক হইব না। অর্থাৎ প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ...কে প্রত্যক্ষ পরিশ্রমের দ্বারা আমাদের নিত্য-...র্য কোনও না কোনও বস্তু উৎপাদন করিতে হইবে। ...বং শিল্পবাণিজ্য—এই দুইটি মাত্র পথ, যে কোনও ...কে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে। আমরা প্রচার করিতেছি এবং আরও প্রচার ...। এই প্রচার পলিটিক্স হইলে আমরা নাচার।

* * *

...কুরির মায়ায় আমরা ঘোরতররূপে বদ্ধ হইয়া ...ছি বলিয়া আজ আমাদের এই দুর্দশা। চাকুরি ...রীই হউক, অথবা সওদাগরী আপিসেই হউক, ...স্টেটগিরি হউক, অথবা পেয়াদাগিরি হউক, আসলে ...দালালি ছাড়া কিছু নয়। এক পক্ষ এই চাকুরি-দালালদের সহায়তায় লাভের লোভে অন্য পক্ষের ...কারবার করে। ইহাদের পরিশ্রমে এক পক্ষের ...ন মাত্র বৃদ্ধি হয়, কিছু উৎপন্ন হয় না। এই ...বৃত্তি যতদিন না আমরা জাতিগতভাবে পরিত্যাগ ..., ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। ইংরেজী শিক্ষায় ...ত বাঙালীর দালালির চোটে সমগ্র ভারতবর্ষে ভারতবাসীর অনেক ক্ষতি হইয়াছে। অপর প্রদেশের অধিবাসীরা এই কারণে মধ্যবিত্ত বাঙালীকে ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষে দেখে। এখন বাংলা দেশেরই নিম্নশ্রেণীর মনে এই সন্দেহ জাগিয়াছে। নিজেরা মধ্যবিত্ত বাঙালী হইয়া যদি এই শ্রেণীর মঙ্গলকামনায় আন্দোলন করিতে থাকি তাহা হইলে কর্তব্যপালনই করিতেছি। ইহাকে পলিটিক্স আখ্যা দিয়া শাসন করা সহজ, কিন্তু আমরা জানি, আমরা মৌলিক জীবধর্ম পালন করিতেছি মাত্র।

[শ. চি. জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ হইতে]

গোপালদার পত্র—২

ভায়া হে,

অনেককাল পরে একটি কবিতা লিখিয়াছি। এই বয়সে এই ধরনের কবিতা লেখা উচিত নয় জানি, তবু লিখিলাম। আর যেহেতু আমার সকল দায় তোমার অতএব তুমি এই দায় হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেই এ বিশ্বাস আছে। পড়িয়া তোমার ভাল লাগিলে সুখী হইব।—গোপালদা

দিবসের আলো হল শেষ,
আলোকিত যৌবনের শেষ শিখা হয়ে এল ম্লান
কালের নির্মম হাত নিমেষে ঢাকিয়া দিল তারে
লুপ্ত হল শেষ রেখাটুকু।
গাঢ় তমসার পুঞ্জ কখন ঢেকেছে চারিধার
তারি মাঝে পথ চিনে একা চলিয়াছি শ্রান্তদেহে
সঙ্গীহীন ক্লান্ত দিনশেষে।
দূর পথপ্রান্তে হেরি জ্বলিতেছে মিটিমিটি আলো
অন্ধকারে জোনাকির মত।
আমার শান্তির নীড়, কবে পঁহুছিব সেইখানে
এখন আশ্রয় চাই, শেষবার করিব বিশ্রাম।

সম্মুখের পথ সখী এঁকে বেঁকে গেছে কত দূর
এবার চাহিয়া দেখ ফেলে আসা পিছনের পানে
বিশাল নির্জন পথ শূন্যতায় মগ্ন হয়ে আছে
পদচিহ্ন দেখা নাহি যায়।
পুরানো দিনের কথা স্মরিবারে যদি চায় মন
স্মৃতির মঞ্জুষা হতে বার করো জীর্ণ চিত্রখানি

হয়তো মুছিয়া গেছে, তবুও আভাস আছে তার।
কতদিন হয়ে গেছে পার,
সেই চেনা মুখখানি কী বেদনা যে রেখেছে লুকায়ে
না-বলা কথার রেশ বাতাসে বেড়ায় যেন ভেসে।
জানি সখী জানি আমি ক্ষণেক উতলা হলে তুমি
দু ফোঁটা অশ্রুর কণা বাষ্প হয়ে গেল মিলাইয়া;
কেহ নাই পাশে তব, শূন্য পথ গেছে বহু দূরে
পিছনে রহিল পড়ে তরঙ্গিত স্মৃতির সাগর।
আর আমি কোথা?
আমি একা পড়ে আছি বিস্মৃতির বালুকা-বেলায়।

তুমি করিয়াছ ভুল, আমি সখী ভুল করি নাই
জীবনের খরস্রোতে খড়কুটো সবই ভেসে যায়
আলোছায়া হাসিকান্না সবই সত্য জীবনের মাঝে
ক্রমে তাই মহাকাব্য হয়
বিচিত্র রূপের জালে মূর্ত হয় যাহার মহিমা।
অপরূপ সে জীবনে রূপহীন প্রকাশে তাহার
চেনা-অচেনার দ্বন্দ্ব কখন মিটিয়া বুঝি যায়;
তুমি করিয়াছ ভুল, মাসুল গণিয়া যাব আমি
তাই হোক সত্য চিরকাল।

তোমারে বেসেছি ভাল এ তো নহে মোর অপরাধ
মনে পড়িতেছে আজ, হুহু করে শ্রাবণ আকাশে
ছুটে আসে ঝড়ো হাওয়া, গাছের পাতারা সব কাঁপে
শরতের ছোঁয়া লেগে আবার জাগিয়া বুঝি ওঠে,
দিনগুলি ডানা মেলে পাখীর মতন উড়ে যায়।
কখনো বা মনে হয় প্রখর নিদাঘে
আকাশ চৌচির হয়ে ঝরে পড়ে আগুনের কণা
নীচে তপ্ত মরুভূমি, বালুকণা করিতেছে ধূধূ,
সে প্রখর মরুপথে ছোটে কালো ঘোড়া—
তার 'পরে বসে আছে খাপা সে আরব বেদুইন।

ভালবাসিবার ছল যদি কভু করে থাকো সখী
তাও জেনো হবে না বিফল
উদ্বেল আবেগ মোর যদি কভু উগ্র হয়ে থাকে
তাহারে করিও ক্ষমা, মনে রেখো এই শেষ নয়।

অধরে চুম্বন দিলে সারা দেহ হয় জর্জরিত
মনে হয় আরো চাই, নিবিড় করিয়া পেতে চাই
বাতাসের বাণী বলে আরো আছে, আরো কত আছে
শুধু এই কথা ভেবে বেদনায় ভরে ওঠে মন
আজ যাহা মহাসত্য, পুরাতন হয় তাহা কাল।

কত রাত্রি হয়ে গেল পার
আরও কত হবে জানি দিনরাত্রি আসাযাওয়া খেলা
তারি মাঝখানে তুমি অনন্ত যৌবন নিয়ে থাক
দগ্ধ করে দাও সব কিছু।
সকাল দুপুর হয়, দুপুর সন্ধ্যায় মিশে যায়
রূপ তব ক্ষণে ক্ষণে নবরূপে হয় উদ্ভাসিত—
দুপুরের খররৌদ্রে আগুনের দীপ্ত শিখা তুমি
কালো এলোচুল যেন রচিয়াছে ঘন ধূম্রজাল
সন্ধ্যার কোমলস্পর্শে ভরে তাহা ওঠে স্নিগ্ধতায়।
আমি শুধু দেখে যাই তোমার বিচিত্র সমারোহ
দূর ব্যবধান হতে, যেথা তব দৃষ্টি যাবে নাকো
স্মৃতির আলোক যেথা পশিবে না সখী।
আমি তবু জানি,
অপার রহস্যে ঘেরা সেই জগতের ছায়ালোকে
মায়ামরীচিকা শুধু গুঁড়া গুঁড়া হয়ে ভেঙে যায়,
মিশে যায় পৃথিবীর কোটি কোটি ধূলিকণা মাঝে।
আমরা ফসিল হব—
সত্য হয়ে রবে শুধু চুম্বনের কটি ইতিহাস।

—

বিজ্ঞপ্তি: আমাদের খোশনবীস জুনিয়র গত বৎসর সেই যে অজ্ঞাতবাসে চলিয়া গেলেন তাহার পর হইতে আর কোনও খোঁজ আমরা পাই নাই। সম্প্রতি তিনি স্বশরীরে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন এবং আমরা গণিয়া দেখিয়াছি তাঁহার দুই হাতে পাঁচ পাঁচ দশটা আঙুল আছে। সেই দশ আঙুলে তিনি আমাদের প্রণাম করিয়াছেন এবং আগামী ভাদ্র সংখ্যা হইতে 'শনিবারের চিঠি'তে নিয়মিত তাঁহার দপ্তর খুলিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। রসিক পাঠকেরা উল্লসিত হইবেন বিবেচনায় সংবাদটির অগ্রিম প্রচার করিয়া রাখিলাম।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে

শনিবারের চিঠি

৩৫শ বর্ষ

১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭০

সম্পাদক :

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

॥ কবিস্বীকৃতি ॥

চার

বীন্দ্রনাথ কেন প্রকাশ্যে 'রাজহংসে'র প্রশংসা করতে চান নি তার হেতুনির্ণয় দুঃসাধ্য নয়। রবীন্দ্র-রণে 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত শালীনতার সমস্ত নাই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভক্ত-মহলে তিনি ছিলেন বিগ্রহবিধ্বংসী কালাপাহাড়: তাঁর ংসা অন্তরঙ্গজনকে বিক্ষুব্ধ করবে বলে রবীন্দ্রনাথ নীরব াই দুর্বিপাক থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রকৃষ্ট পথ বলে করেছেন।

কিন্তু নিন্দা রবীন্দ্রনাথের আজীবন সঙ্গী ছিল। সত্তর র উত্তীর্ণ হবার পর 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে ছাত্র-ীদের সংবর্ধনার উত্তরে তিনি যে প্রতিভাষণ পাঠ রন তাতে তিনি বলেছিলেন, "খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা নক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, ন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা মার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে নি। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি।" দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, অবতরণিকা, পৃ° ১।/০।] এই উদ্ধৃতির উপান্ত্য বাক্যটির বাগ্‌ভঙ্গি লক্ষণীয়। "এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা"! কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এও তাঁর খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এই বিশ্বাসেই তিনি তাঁর নিন্দুকদেরও শেষ পর্যন্ত ক্ষমার চক্ষেই দেখেছেন। আর এ ক্ষেত্রে সজনীকান্তই প্রথম ব্যক্তি নন। তা ছাড়া, পূর্বেই বলা হয়েছে, সজনীকান্তের মানসলোকে দুই সজনীকান্ত পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতই বাস করেন। একজন রবীন্দ্রনিষ্ঠ কবি, আর-এক জন দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনায় 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্যের দুর্মুখ লেখক ও দুর্ধর্ষ সম্পাদক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম ক্ষমা; তাই বার বার তিনি এই পথভ্রান্ত ভক্তকে ক্ষমা করে তাঁর উদার দাক্ষিণ্যের স্নেহ-ছায়ায় আহ্বান করেছেন। তা ছাড়া সারস্বত ক্ষেত্রে শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে গুণীর গুণকীর্তন করা রবীন্দ্রনাথের সহজাত ধর্ম। তাই রাজহংসের প্রকাশ্য প্রশংসায় পরাঙ্মুখ হলেও স্বগতভাষী অন্তরঙ্গ আলাপনে তাঁর মনোভাবটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

'রাজহংস' কবির হাতে পৌঁছবার পর এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবটি জানবার প্রথম সুযোগ হয়েছিল শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র করের। কর-মহাশয় নিজে কবি। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের প্রতিদিনকার রচনাসংগ্রহ এবং গ্রন্থাদি মুদ্রণ ও প্রকাশনের অনেকখানি দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর ওপর। যেদিন ডাকযোগে 'রাজহংস'

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছয় সেদিনকার প্রসঙ্গে তিনি বলছেন :

"স্মৃতিসূত্রে টান প'ড়ে এই প্রসঙ্গে মনে আসছে আর একদিনের কথা। ১৩৪৩ সনের বৈশাখ। চলছে কবির 'পত্রপুট' কাব্যের পালা। তার তের নম্বর কবিতাটি সেই দিনই কি তার আগের দু-একদিনের মধ্যেই লেখা হয়েছে। কপি করে এনে দেওয়া গেল কবির হাতে। কবি তখন 'কোনর্ক'-বাসী। 'কোনর্ক' গৃহের বারান্দার সামনে যে শিমুল গাছটি আছে, তার তলায় বসেছেন কবি সকালবেলার কাজে। লেখার টেবিল পাতা রয়েছে সামনে। সদ্য রচিত উপরোক্ত কবিতার কথাই চলছিল। খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাব্যোপহার ['রাজহংস'] এসে পৌঁছেছে হাতে, সেই ডাকেই। প্যাকেট থেকে বই খুলে উল্টেপাল্টে দেখলেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি পারি নি, কিন্তু এ পেরেছে, যা বলতে চেয়েছি—এর মধ্যে দেখছি কত সবল সুন্দর তার প্রকাশ।' বিশ্বকে সর্ব অনুভবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে লেখা কবির 'পত্রপুটে'র সেই তের নম্বরের কবিতাটি। সে বেদনা তাঁকে এমন পেয়ে বসেছে, দিনরাত ওই ভাবছেন আর লিখছেন, কাটছেন, যোগ করছেন; কবিতা লিখেও মনের ভার কমে নি, একটার পর আর একটা লিখছেন। বারো নম্বরের কবিতাটিতে তার আগে মর্মান্তিক বেদনা জানিয়েছেন। বিশ্বজীবনের বিশেষ বিশেষ বাস্তব অভিজ্ঞতায় অক্ষমতা নিয়ে। তাতে শেষটায় লিখেছেন—

'মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চ'লে।
... ...
ব্যূহ ভেদ করে
স্থান নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের
সংগ্রাম-সহকারিতায়।
কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরু গুরু,
কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন
... ...
যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়-জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে।
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।'

এতেও হয় নি, আরো সুনির্দিষ্ট যথাযথ সঙ্কেত রূপ দেওয়ার কথাই মনে ঘুরছে, বয়ঃকনিষ্ঠ কবির মনে [illegible] অনুভবের সার্থকতার সাড়া পেয়ে নিজের শিল্পরূপ চেতনার বেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছিল সেই অপরের প্রশস্তিতে অকুণ্ঠ উৎসাহে।" ["রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-[illegible]" যুগান্তর, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫।]

রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের 'রাজহংসে' "স্বায় অনুভবের সার্থকতার সাড়া" পেয়েছিলেন—কবির নিত্যসঙ্গী [illegible] কর-মহাশয়ের এই উক্তিটি সজনীকান্তের কবিকীর্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণীয়। উদ্ধৃত কবিতার সঙ্গে 'রাজহংসে'র "কালকূট" কবিতাটি মিলিয়ে পড়লেই রসিক [illegible] কর-মহাশয়ের বক্তব্যটি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, গদ্যকবিতার সৃষ্টিযুগ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন পুনরায় পদ্যচ্ছন্দে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করলেন তখন একাধিক কবিতায় তিনি সপ্তমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মুক্তবন্ধ রূপটিকে [illegible] ভাবের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'সেঁজুতি' গ্রন্থের "যাবার মুখে" কবিতায় এই ছন্দ ব্যবহৃত। কবি বলছেন :

নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু ফাঁকি
তবুও যা রয় বাকি—
জগতের সেই
সকল-কিছুর অবশেষেতেই
কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়,
মন-ভোলাবার অকারণ গানে কাজ-ভোলাবার খেলায়।
সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
তারা কেহ নয় তারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে।
শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে।

ওয়ার পথ দিয়ে তারা উঁকি মেরে গেছে দ্বারে,
কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারিনি কারে।

* * *

পথের নামহারা ওরা লজ্জা দিয়েছে মোরে
বাটে যবে ফিরেছি কেবল নামের বেসাতি ক'রে।

টি ১৩৪৩ সালের ২২ মাঘ বিরচিত। এই কে রবীন্দ্রনাথের "পান্থপাদপ" বলা যেতে পারে। থিক সজনীকান্ত তাঁর জীবনের "অজানা যাত্রাপথে"র দের কথাই বলেছেন তাঁর "পান্থপাদপে"। নাথও তাঁর পথিক-জীবনে যারা "মন-ভোলাবার ণ গানে কাজ-ভোলাবার খেলায়" কবিমনকে য়েছিল সেই-সব "অজানা পথের নামহারা"দের কথাই ছেন "যাবার মুখে" কবিতায়।

সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের "নিঃশেষ" কবিতায়ও এই ব্যবহার করেছেন—"শরৎবেলার বিত্তবিহীন মেঘ / য়েছে তার ধারাবর্ষণ-বেগ।" [রচনা-তারিখ ১৯৩৮ ন্দের ৮ এপ্রিল]; 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের নাম- তা [নবজাতক] [নবীন আগন্তুক, নবযুগ তব র পথে চেয়ে আছে উৎসুক], এবং "প্রায়শ্চিত্ত" পর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো], "পক্ষীমানব" দানব, মানবে করিল পাখি] কবিতায় এই ছন্দ ত। 'সানাই' গ্রন্থের "জানালায়" [বেলা হয়ে তোমার জানালা-'পরে], "সম্পূর্ণ" [প্রথম তোমাকে খি তোমার বোনের বিয়ের বাসরে], "উদ্বৃত্ত" দক্ষিণ হাতের পরশ কর নি সমর্পণ] এবং মুখতা" [মন যে তাহার হঠাৎ প্লাবনী নদীর] কবিতায় কবি এই মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান মুক্তবন্ধ টিকে তাঁর বিচিত্র ভাবপ্রকাশের বাহন করেছিলেন। র উদাহরণ থেকে এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, জহংসে'র এই বিশেষ ছন্দরূপটি রবীন্দ্রনাথের গোধূলি- যের কাব্যে একাধিকবার দেখা দিয়েছে। বাংলা দ-মুক্তির সাধনায় সজনীকান্তের সিদ্ধি কবিগুরুর হাতে যে মর্যাদা পেয়েছে।

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

॥ আরেক সজনীকান্ত ॥

এক

বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারি কলেজে ছাত্রাবস্থায় সজনীকান্ত প্রথম নিজের সারস্বত শক্তিকে আবিষ্কার করলেন। তাঁর এই উপলব্ধি হল যে, তিনি ব্যঙ্গে বা স্যাটায়ারে প্রতিপক্ষকে মর্মান্তিক আঘাত হানতে পারেন। সেদিন তিনি ছিলেন প্রগতিশীল শিবিরের নির্মম যোদ্ধা। ছাত্রাবাসে টিকিওয়ালাদের ছুঁৎমার্গ ও গোঁড়ামি ছিল তাঁর মর্মবিদারী আক্রমণের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের নবাবিষ্কৃত 'বলাকা'র ছন্দ ছিল তাঁর বাহন। সেদিন রক্ষণশীলতার দুর্গ তাঁর স্যাটায়ারের অব্যর্থলক্ষ্য কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। কলিকাতার কুরুক্ষেত্রে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হিসাবে তাঁর সেই অস্ত্রই শাণিত হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতিরোধকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে লাগল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই সারস্বত কুরুক্ষেত্রে সজনীকান্ত রক্ষণশীল শিবিরের প্রধান সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন তিনি প্রতিবিপ্লবের অধিনেতা। ১৩৩৪ থেকে ১৩৩৯—এই যুগার্ধকাল, অর্থাৎ সাতাশ থেকে বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সজনীকান্তের মুখ্য পরিচয় হল ব্যঙ্গরসিক কবি ও 'শনিবারের চিঠি'র দুর্ধর্ষ সম্পাদক। সেদিন তিনি ছিলেন, দাদাঠাকুরের ভাষায়, 'নিপাতনে সিদ্ধ'। অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রের বড় বড় মহারথীদের নিপাতিত করাই ছিল তাঁর মহৎ ব্যসন। ভাষা ও ছন্দে তিনি ছিলেন অসামান্য শক্তির অধিকারী। সেদিন তিনি খেলাচ্ছলেই সেই শক্তিকে ব্যবহার করেছেন। প্রতিপক্ষের ওপর আঘাত হেনেছেন নির্মমতম হিংস্রতায়। কিন্তু সেও খেলাচ্ছলে।

তারপরে এল অভিশাপ-মুক্তির লগ্ন। বত্রিশ বৎসর বয়সে সজনীকান্ত আবিষ্কার করলেন নিজের কবি-প্রতিভার মহৎ সম্ভাবনাকে। লিখলেন 'কে জাগে?' কবিতা। 'রাজহংসে'র কবির জন্ম হল। জীবনের মহাকুরুক্ষেত্রের পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেখা দিল নবসৃষ্টির নবাঙ্কুর। চিত্তে বিশ-শতকীয় প্রথম-সমরোত্তর বিপর্যস্ত-জীবনের করাল অভিজ্ঞতা, কণ্ঠে বেপরোয়া

যৌবনের দুঃসাহসী প্রমত্ততার তিক্ত হলাহল, প্রেরণামূলে মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বিশাল সারস্বত ঐতিহ্য—সজনীকান্ত নবীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি-প্রতিনিধিরূপে দেখা দিলেন। ভাষা দিলেন নবযুগের চেতনাকে। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক প্রবীণ কবি বললেন, "আমি পারি নি, কিন্তু এ পেরেছে, যা বলতে চেয়েছি—এর মধ্যে দেখছি কত সবল সুন্দর তার প্রকাশ।"

ধীরে ধীরে সজনীকান্তের সারস্বত সত্তার স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠল। বাঙালী ও বাংলার মহৎ ঐতিহ্যের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা তার একটি মুখ্য উপাদান। আধুনিক যুগের মানুষ তিনি,—আধুনিকতার আশীর্বাদ ও অভিশাপ সমান ভাবে তাঁর ভাবে ও ভাবনায়, স্বপ্নে ও চর্যায় ক্রিয়াশীল। কিন্তু ভাবকল্পনায় সজনীকান্ত ঐতিহ্যনিষ্ঠ কবি। তাঁর এই ঐতিহ্যনিষ্ঠাই তাঁকে সারস্বত তীর্থের অনুসন্ধিৎসু গবেষকে পরিণত করেছে। সজনীকান্তের সারস্বত সাধনার নূতন পরিচয় পাওয়া গেল সাহিত্যের গবেষণায় তাঁর সশ্রদ্ধ আগ্রহ ও শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে। 'বঙ্গশ্রী'র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁকে আহ্বান করেছিলেন অতীতের পুনরুজ্জীবনের যজ্ঞশালায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী কায়স্থ আদর্শনিষ্ঠ ভট্টাচার্যের অনুশাসন স্বীকার করে নিতে পারেন নি। আচারে ও আচরণে সমকালীন শিল্প-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। কাজেই 'বঙ্গশ্রী'র ধর্মানুশাসিত পবিত্র পরিবেশ ছাড়তে তিনি বাধ্য হলেন। কিন্তু 'বঙ্গশ্রী'র অনুত্তীর্ণ দুটি বৎসর তাঁর জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত করে দিল। নিজের সংগঠনশক্তির গৌরবান্বিত মহিমার সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। পেলেন সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্যকে রক্ষণ ও লালনের প্রেরণা। তারপরে সজনীকান্ত যখন আবার 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করলেন তখন খেলাচ্ছলে নির্বিচার আক্রমণের মনোভাব আর তাঁর রইল না। 'শনিবারের চিঠি'কে রক্ষা করতে হলে 'সংবাদ-সাহিত্য'কে রক্ষা করতে হয়। তাই চিঠির এই 'যুদ্ধং দেহি' বিভাগটি থাকল বটে, কিন্তু আক্রমণের ক্ষেত্র সীমায়িত হল। সাহিত্যের উচ্চ আদর্শকে সম্মুখে স্থাপন করে তারই কঠিন অনুশাসনে নূতন রচনাকে যাচাই করে ব্যর্থ সৃষ্টিকে ধিক্কার দেওয়াই হল এখন থেকে 'সংবাদ-সাহিত্যে'র লক্ষ্য। সম্পাদক সর্বক্ষেত্রে এই আদর্শ রক্ষা করতে পেরেছেন—এমন কথা বলা যাবে না। খেলাচ্ছলে শুধু রঙ্গরসিকতা শুধু ঠাট্টা-মশকরার মনোবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। 'বঙ্গশ্রী'র যুগেও যাঁরা পূর্বশত্রুতার কথা স্মরণ করে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের প্রতি চিত্তের প্রাতিকূল্য নিঃশেষে অপসারিত করাও সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু সজনীকান্তের মানসহংস তখন আকাশের আলো ডানায় মেলে মানসসরোবরের উদ্দেশে উধাও হয়েছে। মর্ত্যের মৃত্তিকাবিহারী মানুষের পারস্পরিক ঈর্ষা ও অসূয়া, বিদ্বেষ ও হানাহানির প্রতি তার আর আসক্তি নেই। কাজেই 'শনিবারের চিঠি'র নবীন সত্রে ধ্বংসের পাশেই নবসৃষ্টি, বিসর্জনের পাশেই প্রতিষ্ঠার আবাহনমন্ত্র উচ্চারিত হল। 'বঙ্গশ্রী'-সম্পাদকের সংগঠনশক্তি নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত সব্যসাচী-মূর্তিতে দেখা দিলেন। এক হস্ত গঠনকার্যে, এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালিয়ে রাখার কাজও তাঁর, অন্যদিকে ধূম ও ভস্মরাশি দূর করবার ভারও তাঁর।

'আনন্দমঠে'র উপসংহারে সত্যানন্দকে মহাপুরুষ বলেছিলেন, "চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়-শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্তি দেখাইব।" সজনীকান্তের কবিমানসে সত্যানন্দ ও মহাপুরুষ পাশাপাশি বাস করেন। কাজেই হিমালয়-শিখরস্থিত মাতৃমন্দিরে সারস্বত-সন্তানের আরাধ্য মাতৃমূর্তি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

'আনন্দমঠে' মাতৃমূর্তির সন্ধানে মহাপুরুষ যখন সত্যানন্দের হাত ধরলেন তখনকার মিলনদৃশ্যটির ধ্যান করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "কি অপূর্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ, বিসর্জন।"

সজনীকান্তের সারস্বত সাধনায় মহাপুরুষ এসে রামানন্দের হাত ধরলেন। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আরেক সজনীকান্তের আবির্ভাব হল। একাধারে নবযুগের কবি ও বিগত যুগের গবেষক। বহুশ্রুতি সজনীকান্তের সারস্বত চেতনাকে পরিশীলিত করেছে। সহজাত সাহিত্যরসবোধ আসল ও নকলের মূল্যনিরূপণে সহায়ক হয়েছে। ঐতিহ্যনিষ্ঠা পূর্বসূরিবৃন্দের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে সুগভীর শ্রদ্ধা। সাহিত্যের গবেষণাকর্মে কুশলী কর্মীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী নিয়ে সজনীকান্ত দেখা দিলেন সারস্বত সত্রের নূতন ভূমিকায়। প্রথম যুগে তাঁর মন্ত্র ছিল অশিববিনাশ। দ্বিতীয় যুগে তাঁর স্বপ্ন ছিল নবসৃষ্টি। তৃতীয় যুগে তাঁর লক্ষ্য হল ইতিহাসের অবলুপ্ত কক্ষে সত্যের সন্ধান। কালজয়ী সাহিত্য-সাধকগণের কীর্তিরক্ষা।

দুই

বৈষ্ণব পদাবলীর একখানি প্রাচীন পুথিকে অবলম্বন করেই সজনীকান্তের সাহিত্যিক গবেষণার সূত্রপাত। কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময়ই বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় প্রাচীন পুথি সংগ্রহের দিকে তাঁর কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছিল। এ কাজে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে যে-সব পুথি সংগৃহীত হল তার মধ্যে একখানা ছিল মহাজন পদাবলীর সংকলন। পুথিটির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রত্যেক পৃষ্ঠার শিরোনামায় নকল করার তারিখ লিপিবদ্ধ ছিল। এইসব তারিখ থেকে সজনীকান্ত সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে এই পুথিখানি পদাবলী সংকলন পুথিসমূহের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নকল করা। অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর ব্রজবুলি বিষয়ক গ্রন্থে এই পুথির একটি পাতার প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছেন। তিনি এই পুথিকে বলেছেন 'দাস ম্যানাস্ক্রিপ্ট'। বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রেরণায় সজনীকান্ত এই পুথি নিয়ে কাজ শুরু করেন। এই গবেষণাকর্মে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একটার পর একটা ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে এই মহাজন পদাবলী সম্পাদনার কাজটি আর সমাপ্ত হয় নি।

'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনা কালে সজনীকান্ত নিয়মিত গবেষণাকর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। এ বিষয়ে তাঁর গুরু, পথপ্রদর্শক ও পরবর্তী জীবনে সহযোগী ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজি ১৯৩৩, বাংলা ১৩৪০ সালের কথা। বৎসরটি রামমোহনের মৃত্যুর শততম বৎসর। ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহন নিয়ে গবেষণা করে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। এ নিয়ে প্রচণ্ড তর্কবিতর্কের শুরু হয়েছিল। একটা সমস্যা ছিল রামরাম বসুকে নিয়ে। তৎকালপ্রচলিত ধারণা ছিল, রামমোহন রামরাম বসুর গুরু। 'লিপিমালা'র প্রারম্ভে রামরাম যে এক-ঈশ্বরের প্রশস্তি রচনা করেছেন তা রামমোহনেরই একেশ্বরবাদের প্রভাবসঞ্জাত। ব্রজেন্দ্রনাথ এই প্রচলিত মতের বিরোধী ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নথিপত্র থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে রামরাম রামমোহন অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু রামরাম বসু সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত কাগজপত্র থেকে নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্যে ব্রজেন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে নিযুক্ত করলেন। সজনীকান্তের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি যেমন বিশাল ছিল তেমনি বহুবিচিত্র বিষয় সম্পর্কে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-সংগ্রহের প্রতি ছিল তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণ। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহে সুদক্ষ সজনীকান্ত উৎসাহের সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজের গ্রন্থাগারে গবেষণাকর্ম শুরু করলেন। সজনীকান্তের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল 'প্রণিপাত',—অর্থাৎ নিজেকে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করা। 'কার্যং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পাতয়েয়ং': মহাকবি মধুসূদনের এই মূলমন্ত্রটি সজনী-কান্তেরও জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সজনীকান্ত গবেষণাকর্মে ডুবে গেলেন। একনাগাড় প্রায় ছ-মাস কাল সপ্তাহে দু-তিন দিন করে শ্রীরামপুর কলেজ-গ্রন্থাগারে সকাল দশটা থেকে রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত চলল তাঁর তথ্যানুসন্ধান। পুরনো ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা বই, কালি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, বইয়ের পাতা জীর্ণ, পরকলা কাচের সাহায্যে বহুকষ্টে তার পাঠোদ্ধার, উইলিয়ম কেরির লেখা পলিগ্লট ডিক্শনারির পাণ্ডুলিপি, টমাস কেরি ওয়ার্ড মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারি সাহেবদের

চিঠিপত্র ও জার্নাল প্রভৃতি পড়তে পড়তে সজনীকান্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যের শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ সম্পর্কে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান পেলেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফল 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল। এবং পরে তা 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড'-রূপে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হল। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে মহাশয় বলেছেন, এই গবেষণাকার্যে "রসিকের ধর্মের সহিত পণ্ডিতের কর্মের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে।" গবেষক-সজনীকান্ত সম্পর্কে এই যুগের গবেষণায় পথিকৃৎ ডক্টর দের অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত ভূমিকায় তিনি আরও বলেছেন:

"সজনীকান্ত অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার সহিত বাংলা গদ্যের এই ভিত্তিমূলের যতদূর সম্ভব নিখুঁত ও নিরপেক্ষ বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার রস-পিপাসা কোথাও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। পথিকৃৎ না হইলেও সজনীকান্তের রচনা তাঁহার পূর্বগামীদের রচনার পূরণ ও সংশোধন হিসাবে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। শ্রীরামপুর কলেজের ও অন্যান্য স্থলের বিক্ষিপ্ত দপ্তরে অনেক পুরাতন কাগজপত্র পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য তিনি পাইয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্বগামীদের নাগাল ও নজরের বাহিরে পড়িয়া ছিল। নূতন তথ্যের উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা ও উইলিয়ম কেরি সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন কথা বলিতে পারিয়াছেন, মিলার ও আপজনের পুস্তক তিনি প্রথম আবিষ্কার করিয়া আমাদের গোচরে আনিয়াছেন। এই গ্রন্থটিকে বিশেষজ্ঞের সংকলন মাত্র অথবা গবেষকের প্রমাণপঞ্জী বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে; সজনীকান্তের লেখনী-নৈপুণ্য শুধু তথ্যমাত্র-সন্ধানী নয়, নীরস বস্তুকে অপরূপ সরসতায় অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতাও রাখে।"

তিন

সাহিত্যের গবেষণায় সজনীকান্ত আপন শক্তিমত্তার অভ্রান্ত পরিচয় দিলেন। কবি ও সম্পাদক সজনীকান্ত গবেষক হিসাবেও যে কারও পশ্চাতে নন তা প্রমাণিত হল। ইংরেজি ১৯৩৭, অর্থাৎ বাংলা ১৩৪৪ সালের ১৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী সভার সভাপতি হিসাবে সজনীকান্ত একটি প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবটির ফলাফল সুদূরপ্রসারী। তাই এখানে তা বিশেষ উল্লেখের দাবি করে। সভাপতি-পদে বৃত হয়ে সজনীকান্ত বীরসিংহের সারস্বত তীর্থের উদ্দেশে কলিকাতা থেকে যাত্রা করলেন। শ্রাবণ মাস। নিদারুণ বর্ষা। মেদিনীপুর থেকে প্রায় ষাট মাইল মোটরে। শেষ দু-তিন মাইল তখন ছিল কাঁচা রাস্তা। কাদায় জলে প্রায় দুর্গম। পথ ভেঙে হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে সভাপতি যখন বহু বিলম্বে সভামণ্ডপে উপস্থিত হলেন তখন সভা শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচিত সভাপতির বিলম্ব দেখে সভার উদ্যোক্তারা তৎকালীন জেলাশাসক বিনয়রঞ্জন সেনকে সভাপতির আসনে বসিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। সভার আয়োজন হয়েছিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার উদ্যোগে। সজনীকান্ত সভায় উপস্থিত হবার পর কর্মকর্তারা নূতন আকারে সভার অনুষ্ঠান শুরু করলেন। সজনীকান্ত তাঁর লিখিত ভাষণ সভায় পাঠ করলেন। জনবিরল স্থানে স্মৃতিমন্দিরের পিছনে অযথা অর্থব্যয় না করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্তিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর গ্রন্থাবলীর পুনঃপ্রচারের জন্যে ব্যাকুল আবেদন জানালেন তিনি। স্বনামে বেনামে লেখা তাঁর প্রচলিত ও অপ্রচলিত সম্পূর্ণ গ্রন্থের ও বিস্মৃত রচনাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাও তিনি সভায় দাখিল করলেন। সভান্তে জেলাশাসক বিনয়রঞ্জন সজনীকান্তের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

অদ্ভুতকর্মা বিনয়রঞ্জনের বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতির সঙ্গে মিলেছিল তাঁর অসামান্য সংগঠন-নৈপুণ্য। মেদিনীপুরের অন্যতম কংগ্রেসনেতা চিত্তরঞ্জন রায়ের গঠনমূলক দেশ-হিতৈষণা বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-তর্পণে তাঁর সহায়ক হল। উভয়ের চেষ্টায় ঝাড়গ্রামের কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর প্রমুখ মেদিনীপুরের সুসন্তানগণের বদান্যতায় শুরু হল বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী পুনঃপ্রকাশের কাজ। বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে ঝাড়গ্রামের অর্থানুকূল্যে আচার্য

নীতিকুমার **চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ** বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্তের **সম্পাদনায় রঞ্জন পাবলিশিং** হাউস থেকে পরিচ্ছন্ন **বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী** প্রকাশিত হল। 'সাহিত্য', **'সমাজ'** এবং 'শিক্ষা ও বিবিধ'—এই তিন খণ্ডে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ রচনাবলী ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩৪৬ সালের চৈত্রের মধ্যে মুদ্রিত হয়। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের সারস্বত কীর্তিরক্ষার এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের দ্বারা সজনীকান্ত গ্রন্থ-সম্পাদনার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন তার পরবর্তী ইতিহাস বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

১৯৩৮ সনে এল **বঙ্কিমচন্দ্রের** জন্মশতবার্ষিকী। বিনয়রঞ্জন প্রস্তাব **করলেন** বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর মত যদি রঞ্জন প্রকাশালয় বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রকাশেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে তিনি ঝাড়গ্রামরাজের আনুকূল্যে দশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হলে সজনীকান্তের ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের হেতু হতে পারত। কিন্তু সজনীকান্ত ব্যক্তিগত লাভের লোভ সংবরণ করে বিনয়রঞ্জনের প্রস্তাবিত অর্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভাণ্ডারে অর্পণ করতে বললেন। পরিষদের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। বার্ষিক মাত্র বারো শত টাকার সরকারী সাহায্য এবং সভ্যগণের মাসিক চাঁদার উপর নির্ভর করে পরিষদের দৈনন্দিন কৃত্যাদিও চালিয়ে যাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠেছিল। সজনীকান্তের প্রস্তাব অনুসারে বিনয়রঞ্জনের বদান্যতায় ঝাড়গ্রাম-রাজ প্রদত্ত দশ হাজার টাকা দিয়ে পরিষদের 'ঝাড়গ্রাম তহবিল' তৈরি হল। ব্রজেন্দ্রনাথ **ও সজনীকান্তের** যুগ্ম-সম্পাদনায় পরিষৎ কর্তৃক নয় খণ্ডে **বঙ্কিম-রচনাবলী** প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৩৪৫-এর আষাঢ়, শেষ খণ্ডের মুদ্রণ-শেষ ১৩৪৮-এর পৌষ। আচার্য যদুনাথ সরকার বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর ঐতিহাসিক অংশের ভূমিকা লিখে দিলেন। গ্রন্থ-সম্পাদনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী ও বঙ্কিম-রচনাবলীর প্রকাশ বাংলা গ্রন্থপ্রকাশের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ব্রজেন্দ্রনাথ ও **সজনীকান্তের** মিলিত নেতৃত্বে **বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের**ও নবযুগ সূচিত হল।

এতদিন সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের হস্তলিখিত পুথি অবলম্বনে গ্রন্থাদি সম্পাদনা ও মুদ্রণের দিকেই বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের নেতৃত্বে পরিষৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকস-এর পুনর্মুদ্রণে অগ্রণী হলেন। পরিষদের তৎকালীন সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পরিষৎ-প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংস্করণের "বিজ্ঞপ্তি"তে সত্যই বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত যশস্বী হয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন পরিষদের শুধু সম্পাদকই ছিলেন না, ছিলেন এই সারস্বত মন্দিরের প্রাণপুরুষ। সজনীকান্তও ১৩৪০ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, পরে গ্রন্থাধ্যক্ষ ও পত্রিকাধ্যক্ষ, ১৩৫২ থেকে ১৩৫৫ সাল পর্যন্ত সম্পাদক, ৫৬-৫৭ সালে সহকারী সভাপতি এবং সর্বশেষে ১৩৫৮ সাল থেকে পর পর পাঁচ বৎসর পরিষদের সভাপতি পদে বৃত হয়ে সজনীকান্ত সাহিত্য-পরিষদের সেবা করে গেছেন। ঝাড়গ্রাম তহবিলের অর্থানুকূল্যে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের যুগ্ম সম্পাদনায় ভারতচন্দ্র, রামমোহন, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, পাঁচকড়ি, রামেন্দ্রসুন্দর ও বলেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থাবলী পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর সজনীকান্তের একক সম্পাদনায় অক্ষয়কুমার বড়ালের গ্রন্থাবলী, রামেন্দ্রসুন্দরের ষষ্ঠ খণ্ড এবং নবীনচন্দ্রের রচনাবলীও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও স্বতন্ত্র ভাবে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছে। রঞ্জন পাবলিশিং থেকে তাঁর পরিচালনায় "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র প্রকাশও এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। সজনীকান্তই রঞ্জন পাবলিশিং থেকে 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র সম্পাদনা করে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের এই অদ্ভুতকর্মা শিল্পীর যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পণ্ডিত-সমাজে উদ্ঘাটিত করেছেন। সজনীকান্তের সারস্বত সাধনার এই দিকটি তাঁর জীবন-ইতিহাসে নগণ্য নয়। এই গবেষণা-কর্মের দ্বারাও তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টি নূতন করে আকর্ষণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য বাল্যরচনাবলীর আবিষ্কারেও তাঁর গবেষণা ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅরবিন্দ ও 'বন্দে মাতরম্'

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

স্বদেশী আন্দোলনের যুগের (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর) প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদী (ন্যাশনালিস্ট) দলের মুখপত্র ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশিত হয়, কলিকাতা ৫৫ নং কর্পোরেশন স্ট্রীট (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড) হইতে। ওই স্থানের ক্লাসিক প্রেসে পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া বাহির হইল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট। প্রেসের মালিক ছিলেন বি. এল. চক্রবর্তী; পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন কে. এম সিং। তারপর কাগজখানি মুদ্রিত হইত ১৯৩ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের (বর্তমানে বিধান সরণী) সারস্বত প্রেসে—যাহার মালিক ছিলেন কার্তিকচন্দ্র নান, নিকুঞ্জলাল দত্ত, সতীশচন্দ্র দাস ও সুরেন্দ্রনাথ সিংহ। কিছুকাল পরে ওই ছাপাখানার নাম বদলাইয়া সিংহ প্রেস নাম দেওয়া হইল। এই প্রেসে পত্রিকাখানি মুদ্রিত হইয়াছিল ২১শে আগস্ট হইতে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন এ. পি. মুখার্জি। ভারত-বিখ্যাত বাগ্মী ও লেখক জাতীয়বাদী দলের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পালের নাম ওই পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া প্রকাশিত হইত। প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা কালীঘাট হালদার পরিবারের হরিদাস হালদার তৎকালে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মুদ্রণ, প্রকাশন ও প্রচারের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেন।

বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ স্থির করিলেন যে, একটি লিমিটেড কোম্পানি গঠন করিয়া 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। তদনুসারে 'বন্দে মাতরম্ প্রিন্টারস্ এবং পাবলিসারস্ লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানি রেজেস্টারি করা হইল। পত্রিকার কার্যালয় স্থানান্তরিত হইল ২।১ নং ক্রীক রোর রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের একটি বাড়িতে এবং তথায় প্রিন্টিং প্রেসও বসানো হইল। ডিরেক্টর বোর্ডে ছিলেন: রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, শরৎচন্দ্র সেন, সুন্দরীমোহন দাস, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, রজতনাথ রায়, বিজয়চন্দ্র চাটার্জি, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানির সমস্ত শেয়ার বিক্রিও হইয়া গেল।

'বন্দে মারতরম্' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন: অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জি ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকার সম্পাদকরূপে কাহারও নাম প্রকাশিত হইত না; কেন না, তৎকালে সংবাদপত্রে সম্পাদকের নাম প্রকাশ করার কোন অবশ্যপালনীয় (ম্যানডেটরি) বিধি ছিল না। তবে বস্তুতপক্ষে অরবিন্দ ঘোষই ছিলেন প্রধান সম্পাদক। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ইংরেজী রচনা-শৈলী (স্টাইল) সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে—শ্যামসুন্দরবাবু তাঁহার (অরবিন্দের) স্টাইল এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, শ্যামসুন্দর বাবুর লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অরবিন্দের লেখা বলিয়া মনে হইত।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার ... ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া অরবিন্দ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছাড়িয়া দিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলার জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতিক লক্ষ ও কর্মপন্থা প্রচারিত হইতে লাগিল নির্ভীক ভাবে জ্বলন্ত ভাষায়। ওই দলের লক্ষ্য ছিল—'Absolute Autonomy free from British contro[l]' অর্থাৎ বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা। কর্মপন্থা ছিল—রাজদরবারে আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে আত্মশক্তির উপর নির্ভর, এবং প্রয়োজন হইলে বিদেশী শাসনযন্ত্র বিকল করিবার জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পন্থা (passiv[e] resistance) অবলম্বন। অল্পকাল মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' সমগ্র ভারতে লোকপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' ছিল বিপ্লববাদী দলের মুখপত্র। ইহাতে প্রকাশ্যেই বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের বাণী প্রচারিত হইত।

এই পত্রিকার পরিচালনায় অরবিন্দ ঘোষের উপদেশ পনে লওয়া হইত। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার াদকীয় প্রবন্ধে কিংবা সংবাদ প্রচারে আইনের সীমা ন করা হইত না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহাকে রাজ-হের অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। ১৯০৭ র মধ্যভাগে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাবুলী ওয়াই' নামক একটা বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ াশিত হইল 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায়। প্রবন্ধের ্য ছিল—কাবুলীরা যেমন দাবি আদায়ের জন্য প্রয়োগ করে, তেমনই বিদেশী শাসকদের কাছ হইতে রতবাসী স্বরাজ পাইবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে রে। ওই প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশের অভিযোগে প্তার করা হইল অরবিন্দ ঘোষকে ও মুদ্রাকর অপূর্ব-বসুকে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ সিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের আদালতে দ্রোহের অভিযোগ আনা হইল। পত্রিকায় অরবিন্দ ষের নাম সম্পাদক বলিয়া প্রকাশিত হইত না। রাং তাঁহাকে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক াণের জন্য সরকার পক্ষ হইতে সাক্ষী মানা হইল পিনচন্দ্র পালকে। তিনি যদি সাক্ষ্য দেন তবে তাঁহাকে ্য কথা বলিতে হইবে এবং সত্য কথা বলিলে অরবিন্দ াদক বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। ফলে রাজদ্রোহের ভিযোগে তাঁহার কারাদণ্ড সুনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় পিনবাবু স্থির করিলেন যে, তিনি আদালতের সাক্ষীর ঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হলফ লইবেন না ; সুতরাং তাঁহাকে র সাক্ষ্য দিতে হইবে না। কিন্তু হলফ লইতে কার করিলে তাঁহাকে আদালত অবমাননার দায়ে উয়া দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ইহা অবগত থাকিয়াও নি ওই সঙ্কটের পথই বাছিয়া লইলেন, যেহেতু তাহাতে াহার সহকর্মী বন্ধু অরবিন্দ মুক্তি পাইবেন।

বিপিনবাবু হলফ লইতে অস্বীকার করিয়া আদালত বমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। আইন ে চরম দণ্ড ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে তাঁহাকে ণ্ডিত করা হইল। অরবিন্দকে সম্পাদক লিয়া প্রমাণ রিতে না পারায় তিনি মুক্তি পাইলেন। মুদ্রাকরের জা হইল। অরবিন্দের রাজদ্রোহের মামলায় মুক্তি উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন তাঁহার ১৩১৪ সালের ৭ই ভাদ্র (১৯০৭ খ্রীঃ আগস্ট) রচিত বিখ্যাত "নমস্কার" কবিতার মধ্য দিয়া :

> "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
> হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
> বাণী-মূর্তি তুমি।"…

বিপিনচন্দ্র সতেজ স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর-কণ্ঠে কহিয়াছিলেন :

"I have conscientious objection against taking part in a prosecution which I believe to be unjust and injurious to the cause of popular freedom and the interest of public peace. I refuse to answer any question in connection with this case"

অর্থাৎ—সরকার পক্ষের আনীত যে মামলা আমি অন্যায় ও গণ-স্বাধীনতার উদ্দেশ্যের এবং জন-শান্তির স্বার্থের হানিকর বলিয়া বিশ্বাস করি, উহার অংশভাগী হইতে আমার বিবেকানুগ আপত্তি আছে। এই মামলা সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অস্বীকার করি।

শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত শিষ্য সুসাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার রচিত 'ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"বন্দে মাতরম্ শ্রীঅরবিন্দের মানস সন্তান। তাই হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া তিনি ইহাকে নবীন দলের শক্তিশালী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ভারতে জাতীয় ভাবধারা প্রচারের গৌরব সেদিন 'বন্দে মাতরম্' যেভাবে লাভ করিয়াছিল এবং সেই দুর্লভ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহার যে একনিষ্ঠ এবং নির্ভীক প্রয়াস, তাহা ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের এই কীর্তিস্তম্ভ আজ স্মৃতির বিষয় হইলেও, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে ইহা কোনও দিনই বিলুপ্ত হইবে না। পরবর্তীকালে জাতীয় মহাসভায় যে নবীন রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার প্রাণ-শিল্পী ছিলেন 'বন্দে মাতরমে'র শ্রীঅরবিন্দ।

রবীন্দ্রস্মৃতি

বনফুল

[পূর্বানুবৃত্তি]

এর পরের বার যখন গিয়েছিলাম তখন সকালবেলা। রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলী'তে ছিলেন। দেখলাম তাঁর চিঠিপত্র এসেছে ডাকে। প্রকাণ্ড একটা থলি বোঝাই। আমাকে দেখে বললেন, "বস। এগুলো দেখে নিই।"

তারপর হঠাৎ একটা বড় প্যাকেট আমার হাতে দিলেন। দেখলাম সেটা Registered with acknowledgment due. না খুলেই আমাকে দিলেন। কি করব বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ এটা আমাকে দিলেন কেন। আমার বিব্রত ভাবটা দেখে একটু হেসে বললেন, "ওটা তুমি ভাগলপুরে নিয়ে যাও, পড়ে দেখো। তোমার গল্পলেখার কিছু খোরাক হয়তো পাবে।"

"আপনি খুলে দেখবেন না?"

"না খুলেই বুঝতে পারছি কি আছে ওর মধ্যে। রোজ একটা করে আসে। লোকটির অধ্যবসায় আছে।"

পরে খুলে দেখেছিলাম সেটা। বিরাট ব্যাপার। জনৈক ভদ্রলোক ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখন আমাদের কি কি করা উচিত তারই এক সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অতি বিশদ এবং তথ্যপূর্ণ আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করেছিলেন এইটুকুই শুধু মনে আছে। পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল ভদ্রলোক বোধ হয় পাগল।

টেবিলের উপর একটি মাসিকপত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ ডাক দেখছিলেন আমি সেটা ওলটাচ্ছিলাম। দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ একজন লেখককে যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন সেটা তাতে ছাপা হয়েছে।

ডাক দেখা শেষ করে কবি আমার দিকে চাইলেন।

"কি পড়ছ ওটা?"

"আপনার প্রশংসাপত্র। সত্যিই কি এই লেখকের লেখা আপনার খুব ভালো লেগেছে?"

---

*'বন্দে মাতরম্' দেশের লোকের চিন্তায় বিপ্লব আনিয়া দিল, দলের শক্তি বৃদ্ধি করিল, ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দিল। নবীন ও প্রবীণের সংঘর্ষ আসন্ন এবং অনিবার্য করিয়া তুলিল। মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে 'সুদর্শন' আর নবীন ভারতে শ্রীঅরবিন্দের হস্তে বন্দে মাতরম্ একই কাজ করিয়াছে। ইহা তত্ত্ব বা দর্শনের কথা নহে—ইতিহাস-সম্মত সত্য।"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগের মধ্যপর্বে তৎকালীন বিদেশী সরকার ক্ষিপ্ত হইয়া এমন কঠোরতার সহিত নির্যাতন-নীতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, কিছুকাল পরে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেল। সন্ধ্যা, যুগান্তর এবং নবশক্তি পত্রিকাগুলিও বন্ধ হইয়া গেল। 'বন্দে মাতরম্' বন্ধ হইয়াছিল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের ২০শে তারিখের পরের দিন হইতে। ওই শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিবার মতলবে তৎকালীন বিদেশী সরকার প্রেস আইন সংশোধন করেন এবং জামানতের টাকা দাবি করা, প্রেস বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদির বিধি-ব্যবস্থা সেই সময়ে নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে করা হয়। কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষ করিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রদেশে জাতীয়তাবাদী দলের কয়েকটা প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুণা নগরে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের পরিচালিত ও সম্পাদিত মারাঠী ভাষার সাপ্তাহিক 'কেশরী' পত্রিকা এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রিন্টিং প্রেসকেও ওই আইনের দাপটে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল যথেষ্ট।

পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের কয়েক বৎসর পূর্বেও বাংলাদেশের অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি সংবাদপত্রের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল ওই শ্রেণীর আইনের সাহায্যে।

—

হাসলেন একটু।

"না, খুব ভালো লাগে নি। তবে লেখার ক্ষমতা আছে ওর।"

"তাহলে এত ভালো সার্টিফিকেট দিলেন যে?"

"ওরকম দিতে হয়। আমি প্রার্থীকে পারতপক্ষে বিমুখ করি না। সাহিত্যের বিচারক মহাকাল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসা বা নিন্দার কি কোনও মূল্য আছে?"

চুপ করে রইলাম।

একটু পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোমার নতুন গল্পের বইটা এসেছে। এখনও পড়া হয় নি। পড়ে যা মনে হয় পরে জানাব।"

বললাম, "যদি দোষ কিছু চোখে পড়ে দেখিয়ে দেবেন। তাতে আমার উপকার হবে।"

"প্রশংসা একটুও করব না?"

তাঁর চোখে হাসি চিক্‌মিক্ করতে লাগল।

"যা খুশি করবেন।"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "আপনার কাছে একটা উপদেশ নিতে চাই। দেবেন?"

"আমি উপদেশ বড় একটা দিই না। ও জিনিস কেউ নেয় কিন্তু পালন করে না। কিসের উপদেশ?"

"লেখা সম্বন্ধে।"

চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "তুমি যখন লিখবে তখন মনে রেখো তুমি যা লিখছ তা দেশের শ্রেষ্ঠ রসিক, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা পড়বেন। তাঁদের জন্যই লিখবে। বাজে লোকের সস্তা চাহিদা মেটাবার জন্য যারা লেখে তারা কবি নয়, ব্যবসায়ী।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের যে উপদেশ দিয়ে গেছেন তা পড়েছ তো?"

"পড়েছি।"

"ওইটেই সবচেয়ে ভালো উপদেশ। কিন্তু ওর অনেকগুলো আজকাল পালন করা শক্ত। আজকাল লেখকদের তাড়া এত বেশী যে লেখা লিখে ফেলে রাখবার উপায় নেই। কালি শুকুতে না শুকুতে ওরা নিয়ে যায়। সুবিধা হয়, কাছেপিঠে যদি কোন সমঝদার শ্রোতা বা শ্রোত্রী পাওয়া যায়, আর তার যদি নির্ভয়ে সমালোচনা করবার তাগদ থাকে। তোমার কাছাকাছি এরকম লোক আছে কেউ?"

"আছে দু-একজন। আমার গিন্নীই আমার লেখার প্রথম পাঠিকা ও সমালোচক। মাঝে মাঝে সজনীও আসে।"

"তাহলে তো ভাল লোক পেয়েছ। কোন্ সময় লেখ?"

"সকালবেলায়।"

"রোজই এক সময় লিখতে বসবে। আর রোজই বসা চাই। লেখা মনে না এলেও টেবিলে গিয়ে বসবে। ক্রমশঃ দেখবে সেই সময়টাতেই লেখা মনে যোগাবে। একটা বিশেষ সময় রোজ খেলে যেমন সেই সময় খিদে পায়, একটা বিশেষ সময়ে ঠাকুর-ঘরে ঢুকে পুজোয় বসলে মনে যেমন ভক্তি জাগে—একটা বিশেষ সময় রোজ লিখতে বসলেও তেমনি মনে লেখা যোগায়। রোজ একটা নির্দিষ্ট সময় করে লিখতে বসবে। কতক্ষণ লেখ রোজ?"

"সব দিন সমান হয় না। দু-তিন ঘণ্টার বেশী পারি না।"

"ওই যথেষ্ট। পড়ো তো?"

"পড়ি।"

"কি বই পড়?"

"ক্ল্যাসিকাল উপন্যাসই বেশী পড়ি। ইতিহাস বিজ্ঞানও পড়ি কিছু কিছু—"

"ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন এই সবই বেশী করে পড়া চাই। উপন্যাস না পড়লেও চলবে। জমিতে যেমন সার দিতে হয় মনেও তেমনি সার দিতে হয়। তা না দিলে ভালো ফসল ফলে না। আচ্ছা, এবার আমি লিখতে চললুম। তুমি আর কারও সঙ্গে গল্প কর গিয়ে। শান্তি-নিকেতনটা ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখ না। আগে দেখেছ ভালো করে?"

"না।"

"তাহলে তাই দেখ গিয়ে। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তোমার মতামত পরে শোনা যাবে।"

বেরিয়েই আমি একজন সঙ্গিনী পেয়ে গেলাম। আমার ভাইয়ের শালী অনু আমার খোঁজে আসছিল। তাকেই বললাম, "শান্তিনিকেতনে যা যা দেখবার আছে, আমাকে দেখিয়ে দাও।"

অনেকক্ষণ ঘুরলাম দুজনে। প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা। অমু বাড়ি চলে গেল। আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে এলাম। দেখলাম তিনি আরাম কেদারায় বসে কি একটা পড়ছেন।

"কে, বলাই না কি, এসো।"

বসলাম গিয়ে একটা চেয়ারে। এখন একটা কথা মনে হচ্ছে, তখন হয় নি। অতবড় একজন বিরাট লোকের সামনে বসেছিলাম, কিন্তু কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নি। মনে হয়েছিল যেন একজন অতি পরিচিত নিকট আত্মীয়ের কাছে বসে আছি। সে আত্মীয় এত নিকট যে তার কাছে মনের যে কোন কথা অসঙ্কোচে বলা যায়।

"শান্তিনিকেতন দেখা হল ?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন দেখলে ?"

"ভালই।"

আমার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত হাসিমুখে। তারপর বললেন, "মনে হচ্ছে প্রাণ খুলে ভালো বলছ না।"

আমিও হাসলাম।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আর কিছু করে না থাকতে পারি কতকগুলো পাকা বাড়ি তো করিয়েছি। আগে ফাঁকা মাঠ ছিল একটা—"

"সে তো নিশ্চয়ই। এরকম বিদ্যালয় তো ভারতবর্ষের কোথাও নেই। তবে—"

চুপ করে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে।

"আমার যা মনে হচ্ছে তা বললে আপনি রাগ করবেন না তো ?"

"না বললেই রাগ করব।"

একটু ইতস্ততঃ করে শেষকালে বলেই ফেললাম।

"আমার মনে হচ্ছে এটাকে যদি পুরোপুরি মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় করে দেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। ছেলেদের এখানে না রাখাই ভালো। আমার মনে হয় এখানে ছেলেদের লেখা-পড়া হওয়া শক্ত।"

রবীন্দ্রনাথের সামনে আমার এরকম স্পর্ধা কি করে হল, বার বার 'আমার মনে হয়' 'আমার মনে হয়' উচ্চারণ করে কি করে ওকথা বলতে পারলাম তা ভেবে এখন আমি নিজেই বিস্মিত হই। সত্যিই Fools rush in where angels fear to tread গোছের ব্যাপার করে ফেলেছিলাম সেদিন। ফেলতে পেরেছিলাম তার কারণ রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের হাসিতে, তাঁর সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে আমি এমন একটা কিছু দেখেছিলাম যা আমাকে নির্ভয় করেছিল, যা আমার আর তাঁর মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর সহজ সহৃদয় ব্যবহারে আমাকে প্রায় তাঁর সমকক্ষ করে নিয়েছিলেন সেদিন যেন। সঙ্কোচের কোন অবসর ছিল না. যেন অকপটে তাঁর সঙ্গে আলাপ না করলে অশোভন হবে এই রকম একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল সেদিন।

"ও, তোমার বুঝি এই সব মনে হয়েছে! এখানে ছেলেদের লেখা-পড়া হওয়া শক্ত হবে কেন ?"

"ছেলেরা যদি মেয়েদের সঙ্গে ছাত্রজীবনে খুব বেশী মেলামেশা করে তাহলে সাধারণতঃ তাদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বসে না। এতদিন তো আপনার স্কুল হয়েছে খুব বেশী কৃতী ছেলে কি বেরিয়েছে এখান থেকে ?"

রবীন্দ্রনাথ মুচকি হাসলেন একটু।

"একেবারে যে বেরোয় নি তা নয়। কিন্তু তারা আমাকে সিঁড়ির মত ব্যবহার করে অন্যত্র চলে গেছে। এখানকার অনেক ভালো ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছি আমি। আমার আশা ছিল তারা এখানেই আবার ফিরে আসবে, কিন্তু তারা তা আসে নি। অনেকেই অন্য ভালো চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে। তারা যদি থাকত তাহলে তাদের সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতে পারতে এখানে লেখা-পড়া তারা ভালই শিখেছিল।"

"আমি একটা ভুল কথা বলে ফেলেছি। লেখাপড়া মানে আমি ঠিক জ্ঞানার্জন বলতে চাই নি। এখানে জ্ঞানার্জন করার নানারকম সুযোগ সুবিধা আছে তা কে অস্বীকার করবে। লেখা-পড়া মানে আমি বলতে চেয়েছিলাম পাঠ্য বই পড়ে পরীক্ষা পাস করা। এখানকার আবহাওয়া তার অনুকূল নয়। Co-education ছাড়া আর একটা কারণও এখানে আছে।"

"সেটা কি ?"

"সেটা আপনি নিজে। আপনার বিরাট ব্যক্তি

...ানে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে তার ...কাছি থেকে পরীক্ষা-পাসের জন্য পড়া মুখস্থ করা ...। এখানে আজ গান্ধীজী আসছেন, কাল জহরলাল, ...ও সিলভা লেভি, আরও কত লোক। পৃথিবীর ...কোন বিদগ্ধ লোক একবার অন্তত: এখানে আসবেনই। ... আসবেন না, এসে বক্তৃতাও দেবেন। এ সব ছাড়া ...খানে নানারকম উৎসব লেগেই আছে। আর লেগে ...ছে আপনার নাটকের রিহার্সাল। এগুলোর খুবই ...য়োজন আছে, কিন্তু এটাও ঠিক, এর ভিতর বসে ...রীক্ষার পড়া করা শক্ত।"

"তুমি তাহলে পরীক্ষার পড়াটাকেই জীবনে সবচেয়ে ...শী প্রাধান্য দিতে চাও?"

"না দিয়ে উপায় কি। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ...ছেলেদের বাঁচতে হলে পরীক্ষা পাস করে ভালো একটা ...চরি যোগাড় করতেই হবে। না করতে পারলে তাদের ...বিষ্যৎ অন্ধকার। শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন বা শিল্প সৌন্দর্য-...া করলে তাদের চলবে না। আমাদের দেশের ...ধিকাংশ ছেলেদের পক্ষেই এ কথা সত্য। মেয়েদের ...হক জ্ঞানার্জন বা শিল্প-সৌন্দর্য-চর্চা চলতে পারে, কারণ ...াদের এখনও পেটের অন্নের জন্যে চাকরির ক্ষেত্রে না...তে ...নি। তাই বলছিলাম এটা মেয়েদের ইউনিভার্সিটি ...লে ভালো হয়।"

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। আমিও ...য় পেয়ে গেলাম মনে মনে। ওঁর সামনে এ রকম ...চালতা যে কি করে করেছিলাম তাই ভেবে এখনও ...বাক লাগে।

কয়েক মুহূর্ত পরে রবীন্দ্রনাথের মুখে হাসি ফুটল। ...ললেন, "বেশ তো, তুমি যা বলছ তা হাতে-কলমে করে ...দেখিয়ে দাও। বিশ্বভারতী তো ডেমক্রাটিক ইন্‌স্টিটিউশন। ...তুমি এখানে এসে তার সভ্য হও আর তোমার মত ...সবাইকে আনতে চেষ্টা কর। তুমি যা বলছ তা যদি ...করতে পার তাহলে আমিও এখান থেকে চলে যাব, ...আমাকে যেখানে যেতে বলবে সেইখানে যাব। তোমার ...ভাগলপুরে যেতেও আমার আপত্তি নেই।"

এটা দুঃখ না ব্যঙ্গ: কিসের অভিব্যক্তি তা বুঝতে ...পারলাম না। চুপ করে থাকাই শ্রেয়: মনে হল।

ঠিক সেই সময় আর একটি ঘটনা ঘটাতে এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ল। আমি বাঁচলুম। একটি ছাত্র এসে দাঁড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ও, তুমি 'সাহিত্যিকা'থেকে এসেছ বুঝি বলাইকে নিমন্ত্রণ করতে!"

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "যাও না, ওদের সাহিত্য-সভায় আজ। ওরা কি রকম লেখে শুনে এস।"

বললাম, "নিশ্চয় যাব।"

ঠিক হল সেই দিনই বিকেলে 'সাহিত্যিকা'য় যাব।

মনোরম পরিবেশে সভা আরম্ভ হল। ছাত্র ছাত্রীদের কয়েকটি লেখা শুনলাম। মনে হল অত্যন্ত কাঁচা লেখা। অত্যন্ত মামুলী পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি আর চর্বিত-চর্বণ। নিষ্ঠা, বৈদগ্ধ্য, বা কল্পনা-কুশলতার কোনও প্রমাণ না পেয়ে দুঃখিত হলাম। এর চেয়ে বেশী পাব এই আশা করে এসেছিলাম। সভাপতির ভাষণে আমার হতাশার কথা ব্যক্তও করলাম। বললাম, "তোমরা রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার সংস্পর্শে আছ। তোমাদের কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করেছিলাম। ফাঁকি দিয়ে সাহিত্য-সাধনা করা যায় না। তার জন্য নিষ্ঠা চাই, শ্রদ্ধা চাই, অধ্যয়ন চাই। কিন্তু তোমাদের লেখার মধ্যে এক গতানুগতিকতা ছাড়া আর তো কিছু পেলাম না।"

হঠাৎ নজরে পড়ল সামনের বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে সুধাকান্তদা মাথা এবং হাত-পা নেড়ে আমাকে কি যেন বলতে চাইছেন। কি বলছেন ঠিক বোঝা গেল না। সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার দেখা হল তাঁর সঙ্গে।

"আমাকে কিছু বলছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ, গুরুদেব আমাকে পাঠিয়েছিলেন। বললেন, 'ওদের প্রবন্ধ, কবিতা গল্প শুনে বলাই হয়তো রেগে যাবে। ওকে বলে দিও যেন ছেলেমেয়েদের বেশী না বকে।' কিন্তু তুমি তো ওদের যাচ্ছেতাই করলে। আমি মাথা নেড়ে নেড়ে তোমাকে বারণ করছিলাম কিন্তু তুমি তো সেদিকে দৃকপাত পর্যন্ত করলে না।"

কি আর বলব, মুচকি হেসে চুপ করে রইলাম।

রবীন্দ্র-চরিত্রের আর একটা দিক আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ছে। সেই বারেরই ঘটনা, না, অন্যবারের, তা এখন ঠিক মনে নেই। কি একটা সভা হচ্ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় তাঁর 'বসন্ত' কবিতাটি পড়েছিলেন বই থেকে। আমিও ছিলাম। দেখলাম তিনি দুটো স্ট্যাঞ্জা বাদ দিয়ে পড়ে গেলেন। সভা শেষ হয়ে যাবার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন একটু?"

"না। কেন?"

"আপনি কবিতার দুটো স্ট্যাঞ্জা বাদ দিয়ে গেলেন কি না, তাই মনে হচ্ছিল—"

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টি।

"তুমি ধরতে পেরেছ?"

"ও কবিতাটা আমার মুখস্থ আছে।"

"এখানে কেউ ধরতে পারে না। প্রায়ই আমি বাদ দি—"

বললাম, "বাইরে আমরা আপনাকে পেতে চেষ্টা করি আপনার লেখার ভিতর দিয়ে। এরা এখানে আপনাকে খুব কাছে পেয়েছে, তাই বোধ হয় আপনার লেখা পড়ে না।"

এর কিছুদিন পরেই বোধ হয় আমার 'কিছুক্ষণ' বইটা প্রকাশিত হয়েছিল। বইটা উৎসর্গ করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের নামে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এক কপি পাঠিয়েছিলাম আর দুরু দুরু হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কোনও জবাব আসে কি না। অবিলম্বেই জবাব এল।

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু,

সাবাস্। তোমার 'কিছুক্ষণ' খুবই ভালো লাগল। উল্টে-পড়া রেলগাড়ি যে অসংলগ্ন জনতা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে তুমি যথেষ্ট রস আদায় করে নিয়েছ। এর মধ্যে ঝাঁজ আছে কম নয়, সেটা যে কেবল স্বাদের পক্ষে ভালো তা নয়, পথ্যও বটে। সমস্ত বইখানার মধ্যে কেবল প্রথম প্যারাগ্রাফ্‌টার উপর আমি কালীর আঁচড় না চালিয়ে থাকতে পারি নি। আমার বেহোঁস অবস্থায় তুমি যে বইখানি পাঠিয়েছিলে সেটা আমার চৈতন্যলোকের নেপথ্যে মারা গেছে। ইতি ২৪।১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ইরিসিপ্লাসে ক্লান্ত হয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে যান ঠিক তার আগে আমি তাঁকে খুব সম্ভবত আমার একটি গল্পসংগ্রহ 'বনফুলের আরও গল্প' পাঠিয়েছিলাম। এ বইটি তিনি পান নি। পরে আবার পাঠিয়েছিলাম। সে খবর যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করব।

[ক্রমশঃ]

['রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' হইতে পুনর্মুদ্রিত]

পুরাতন বাঙ্গালা হইতে

তুলোট কাগজে খাতার আকারে বাঁধা একখানি নামগোত্রহীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিটি াকারে বৃহৎ নহে। ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক বং তাহার পরে বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। নিম্নে তকগুলি শ্লোক এবং অনুবাদ সাধারণ পাঠকের বগতির জন্য ছাপাইয়া দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য যে ন সংস্কৃত শ্লোকগুলি অপপাঠে ও ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। ামরা সেগুলির শুদ্ধ পাঠই দিয়াছি। বাঙ্গালা অনুবাদের াঞ্জলতা ছাড়া অন্য গুণ কিছু নাই। অনুবাদ যথাসম্ভব লের অনুগত।

পুঁথিতে কোন তারিখ নাই। লিপি দৃষ্টে অনুমান য় যে পুথিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে অথবা নবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে লিখিত হইয়াছিল। বিংশ তাব্দীর প্রথম পাদে লিখিত হওয়াও নেহাত অসম্ভব হে।

নিম্নে যে ছয়টি শ্লোক দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে থম তিনটি সুবিখ্যাত উদ্ভট শ্লোক; শেষের শ্লোক নটী শ্রীরূপ গোস্বামীর উদ্ধব সংবাদ* হইতে উদ্ধৃত ইয়াছে।

১

[মূল]

শ্লিষ্টঃ কণ্ঠে কিমিতি ন ময়া মুগ্ধয়া প্রাণনাথ
শ্চুম্বত্যাস্মিন্ বদনবিনতি কিং কৃতা কিং ন দৃষ্টঃ।
নোক্তঃ কস্মাদিতি নববধূ চেষ্টিতং চিন্তয়ন্তী
পশ্চাত্তাপং বহতি তরুণী প্রেম্নি জাতে রসজ্ঞা॥

[অনুবাদ]

কেন হাম বন্ধুরে না দিলুঁ ভিড়ি কোল।
চুম্বিল আমারে যবে বয়ন না তোল॥
এ দুই নয়ান ভরি কেনে না হেরিলুঁ।
কেন বা তাহার বোলে উত্তর না দিলুঁ॥
হেনমতে নববধূচেষ্টা মনে গুণি।
প্রেমের সঞ্চারে ঝুরে রসজ্ঞা তরুণী॥

২

[মূল]

নবনখপদমঙ্গং গোপয়স্যংশুকেন
স্থগয়সি পুনরোষ্ঠং পাণিনা দন্তদষ্টম্।
প্রতিদিশমপরস্ত্রীসঙ্গশংসী বিসর্পন্
নবপরিমলগন্ধঃ কেন শক্যো বরীতুম্॥

[অনুবাদ]

প্রতি অঙ্গে সুবেকত নব নখরেহ।
নেতের বসনে কেন ঝাঁপয়সি দেহ॥
দংশিত অধর ওষ্ঠ তাহে হাথ দিঞা।
আবরণ কর বন্ধু মনে কি ভাবিঞা॥
পরস্ত্রীর সঙ্গশংসী অঙ্গ পরিমল।
তাহে নিবারণ কর দেখি তব ছল॥

৩

[মূল]

ত্রুসম্বগুচ্ছান্ নিবর্ত্তয় সখীবর্গস্য বন্ধুস্ত্রিয়ঃ
কাবেরীতটসন্নিবিষ্ট নয়নে মুগ্ধে কিমুত্তাম্যসি।

---

* শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩, ৪০, ৪১।

আস্তে পুত্রি সমীপ এব ভবনাদেলালতালিঙ্গন-
স্তম্ভবালতমালদন্তুরদরী তত্রাপি গোদাবরী ॥

[অনুবাদ]

সেবা কর গুরুজনে সখীগণে সম্ভাষণে
জ্ঞাতিস্ত্রীরে করহ বন্দন।
কাবেরীর তটোপরি নয়ন নিবিষ্ট করি
অয়ি মুগ্ধে কি কর ভাবনা ॥
হে বৎসে সেথাও আছে তব ভবনের কাছে
এলালতা-আশ্লেষ-বিহ্বল।
তমাল-দন্তুর-দরী অপরূপ গোদাবরী
না হও না হও উতরল ॥

৪

[মূল]

রেণুর্গীয়ং প্রসরতি গবাং ধূমধারা কৃশানো
বেণুর্ণায়ং গহনকুহরে কীচকো রোরবীতি।
পশ্চোন্মস্তে রবিরভিযযৌ নাধুনাপি প্রতীচীং
মা চাঞ্চল্যং কলয় কুচয়োঃ পত্রবল্লীং তনোমি ॥

[অনুবাদ]

গো-খুরের রেণু নহে ধূমচক্রবাল।
বেণুনাদ নহে ধ্বনি কীচক রসাল ॥
এখানে রবির গতি নহে ত প্রতীচী।
না কর চাঞ্চল্য শুনে পত্রবল্লী রচি ॥

৫

[মূল]

মা মন্দাক্ষং গুরুজনাদ্দেহলীং গেহমধ্যা
দেহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হন্ত বিশ্লেষতোঽসি।
এষ স্মেরো মিলতি মৃদুলে বল্লবীচিত্তহারী
হারী গুঞ্জাবলিভিরলিভির্লীঢ়গন্ধো মুকুন্দঃ॥

[অনুবাদ]

না কর না কর লাজ গুরুজন হৈতে।
গৃহ মধ্য পরিহরি আইস দেহলীতে ॥
সকল দিবস গেল বিচ্ছেদে-আতুর।
শ্রামর হইল দেহ বচনের দূর ॥
হের দেখ স্মেরমুখ গোপীচিত্তহারী।
অলিলীঢ় গন্ধমাল্য মিলয়ে মুরারি ॥

৬

[মূল]

শৌরী গোষ্ঠাঙ্গনমনুসরন্ শিঞ্জিতৈরেব মুগ্ধঃ
কিঙ্কিণ্যাস্তে পরিহর দৃশোস্তাণ্ডবং মণ্ডিতাঙ্গি।
আরাদ্গীতৈঃ কলপরিমিলন্মাধুরীকৈঃ কুরঙ্গে
লব্ধে সদ্যঃ সখি বিবশতাং বাগুরাং কস্তনোতি॥

[অনুবাদ]

কিঙ্কিণীর কলধ্বনি মোহিল মুরারি।
নেত্রের তাণ্ডব ত্যজ অয়ি বরনারি ॥
কুরঙ্গ হইলে মুগ্ধ স্নিগ্ধকলগীতে।
না করে বিস্তার ব্যাধ জাল তার ভিতে ॥

['শনিবারের চিঠি' ভাদ্র ১৩৪১ হইতে]

বৃদ্ধ বানরের প্রতি

বনফুল

১

হে বৃদ্ধ বানর,
লম্ফঝম্প করিও না বেশী,
হস্ত-পদ করে থর-থর
জঙ্ঘা দুটি জরায় জর্জর
লোমহীন শীর্ণ যে লাঙ্গুল,
উরসেতে নাই শক্ত পেশী ;
লম্ফঝম্প করিও না বেশী।

২

হে বৃদ্ধ বানর,
দাঁত খিঁচায়ো না বন্ধু আর।
দাঁত নাই খালি মাড়ি
মালহীন মালগাড়ি
সব লুপ্ত জরার চুলায়,
শ্লথ হয়ে আসে নব-দ্বার !
দাঁত খিঁচায়ো না বন্ধু আর।

৩

হে বৃদ্ধ বানর,
হিংসা ত্যাগ কর যাদুমণি
হিংসার অনল দিয়া
ভাব দিবে পোড়াইয়া
সকলের সমস্ত বৈভব ?
অসম্ভব তাহা মনে গণি
হিংসা-ত্যাগ কর যাদুমণি।

৪

হে বৃদ্ধ বানর,
তুমি অতি নীচে নামিয়াছ
কাম-ক্রোধ-লোভ স্বার্থ
চর্চা করি দিবারাত্র
জলে' পুড়ে ঈর্ষ্যার আগুনে
বোঝ নাই কোথা থামিয়াছ,
তুমি অতি নীচে নামিয়াছ।

৫

হে বৃদ্ধ বানর,
এ ভাবেতে কতদিন যাবে ?
মাত্র ক'টি গোনা দিন
হায়, নখ-দন্ত-হীন,
শান্ত মনে স্মর ভগবান
হয়তো বা শান্তি কিছু পাবে ;
এ ভাবেতে কতদিন যাবে।

৬

হে বৃদ্ধ বানর,
চেয়ে দেখ পশ্চিম গগনে
অস্ত যায় দিবাকর
এখনই তো চরাচর
ঢেকে যাবে গাঢ় অন্ধকারে
মৃত্যু ওই ডাকিছে সঘনে
চেয়ে দেখ পশ্চিম গগনে।

—

আকাশ আমাকে দেখে

সনতকুমার মিত্র

এক ফালি ছাদ পেয়ে আমার স্বপ্নরা দেখ হাসে :
দূরে কিছু চিল ওড়ে, আরো দূরে আকাশ আড়াল,
আহার-মৈথুন-নিদ্রার চাকাটাই নিত্য শুধু ঘোরে ;
এর মাঝে একটুকু স্নেহের ছায়ায় মেলে ডাল
নারী মন খুশী হয়, শিশিরের টিপ প'রে ভোরে
বছরে একটা ফুল উপহার দিতে ভালবাসে।

আকাশে অনেক তারা : চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-উপগ্রহ
তারাও ঘুরছে, আর আমিও প্রত্যহ দশটায়
ছেঁড়া গেঞ্জি পাঞ্জাবিতে এবং মনের রং ঢেকে
চেয়ারে শরীর ছুঁয়ে আংরিত সব রসটাই
ঢেলেছি মাকড়সার মত জালে মনটুকু রেখে ;
তবুও আমার স্বপ্ন বেঁচে থাকে, কত অনুগ্রহ !

আকাশ আমাকে দেখে, বুকে জ্বালে তারা অগণন ;
কত অল্পে খুশী আমি, কত ছোট আমার এ মন।

●

আতসবাজি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

এখানে পৃথিবী আর্তলোকের শোকে,
প্রাণের রোশনি জেলে জ্বলে নেভে ধোঁকে।
থামে না এখানে, উপায় তো নেই থামবার,
শুধুই সরণি নীচে আরো নীচে নামবার।
শেষ হয় না যে অকূলপাথার চিন্তার,
সময়ের নদী ঢেউ ছোট ছোট দিন তার,
দু হাতের লগি দিয়ে কোনমতে সাঁতরাই,
ঘূর্ণিতে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে [illegible]রাই।

তবুও আশার প্রত্যূষ হয় অবাক তো,
সে কথা জানাতে পাখীরা এখনো সবাক তো !
তবুও প্রকৃতি আজও কি অপার আনন্দে,
গাছে গাছে ফুল ফুটিয়ে রেখেছে সানন্দে !
বার বার ভুলি যত গ্লানি আছে আকিঞ্চন,
কল্পলতায় স্বপ্নবারি দি' সিঞ্চন।
মগ্ন-হৃদয় রুটি-রুটিনের তুচ্ছতা
ভুলে গিয়ে পায় সূর্য চাঁদের উচ্চতা।

●

গাছটা

মায়া বসু

নড়ে না চড়ে না গাছটা !
ওর রূপসী ঝাঁকড়া পাতা-ভর্তি বিরাট দেহটা নিয়ে,
পাহাড়ের মত অজঙ্গম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
আমার শোবার ঘরের জানলার পাশে।
সহস্রাক্ষ দৃষ্টি দিয়ে—
ও যেন আমাকে পাহারা দেয়
সজাগ সতর্ক অতন্দ্র প্রহরীর মত।

মনে হয়—
আমি যেন ওর বন্দিনী !
এক অদৃশ্য কঠিন শিকল দিয়ে
এই চার দেয়ালের মধ্যে, সহস্র পাকে
ও আমাকে বেঁধে রেখেছে নির্মমভাবে।
অসহায় আমি যেন ওর হাতের এক খেলার পুতুল !
যেন ওই শক্তিমান নির্লজ্জ গাছটার উপর
ক্রোধে ক্ষোভে বিরক্তিতে অস্বস্তিতে—
আমার সমস্ত অন্তর জ্বলে ওঠে !

বুক চেপে ধরা অন্ধকার ঘুরঘুট্টি
কৃষ্ণপক্ষের হাওয়াহীন রাতে
যখন ওর একটা পাতাও কাঁপে না—
অনিবার্য মৃত্যুর মত—অমোঘ নিয়তির মত—
সুকৃষ্ণ ডানা মেলে আমাকে ও ঢেকে রাখে।
ওর ভ্রূকুটি ভরা কালো থমথমে ছায়া
জড়িয়ে থাকে আমার চোখে মুখে—সর্বাঙ্গে !
কী এক অজানা রহস্যময় আতঙ্ক
বিষ ছড়ায় আমার শিরায় শোণিতে।
আমি চমকে উঠি বার বার—
আর তখন ওকে ঘৃণা করি !

আবার যখন বায়ুকোণের রক্ত মেঘের ইশারা—
রূপান্তরিত হয় রুদ্র কালবৈশাখীতে
যখন প্রচণ্ড ঝড়ের দোলায় দুলতে থাকে ওর
প্রকাণ্ড দেহটা—
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহা ভয়ঙ্কর
একটা ডাইনোসোরাসের মত
ও যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়
ছিন্নভিন্ন করতে চায় আমাকে—
তখন আমি আতঙ্কে আর্তনাদে শিউরে উঠি
ভয় করি ওই ভয়াল ভয়ঙ্কর গাছটাকে !

•   •   •

সেদিন হঠাৎ মধ্যরাত্রে—
জ্যোৎস্নাধবল চাঁদ আর তারাভরা প্রহরে
কী জানি কেন আমার ঘুম ভেঙে গেল ?
এক নিদারুণ অব্যক্ত একাকীত্বের বেদনায়
ঘুম-না-আসা চোখ মেলে
নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলাম গাছটার দিকে।
কঠিন ভূগর্ভের স্তরে স্তরে শিকড় ছড়িয়ে
কী গভীর আকুলতায়—কী ব্যাকুল বেদনায়
ও যেন দু হাত বাড়িয়ে ধরেছে—
অসীম শূন্যের দিকে—
ব্যর্থ আকাশ পিপাসায়—তৃষ্ণার্ত ট্যান্টালাসের মত !
চমকে উঠলাম আমি !
আমার দেহের অণু-পরমাণুর সঙ্গে—
আমার সত্তা—আমার আত্মার সঙ্গে
কোথায় যেন মিল আছে না ওর ?
তখনি একাত্ম হয়ে গেলাম ওর সঙ্গে।
আর—আর—
তখনি ওকে ভালবাসলাম !!

অতীত দিনের রোমন্থন

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশশো আটচল্লিশের জানুয়ারি।

পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় ক্যাম্প থেকে জনৈক বাঙালী সৈনিক স্বেচ্ছায় যাত্রা করলেন কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রে। বান্ধবেরা বলতে লাগলেন, জাতীয় বঙ্গের স্বকীয় জলবায়ু বর্জন করে বিপদসংকুল জম্মু-কাশ্মীরে ছোটবার কোন্ দরকার ছিল!

উত্তর দিলেন: পানাগড়ের শিষ্ট আবহাওয়া মোটেই লোভনীয় নয়; আমাকে সমধিক আবিষ্কারের সুযোগ পাব রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে বরফ-ঘেরা কাশ্মীরের অশান্ত গিরিকন্দরে। সামরিক জীবনের সে উন্মাদনা থেকে বঞ্চিত হতে প্রলুব্ধ করবেন না। বন্দে মাতরম্।

অমৃতসরের উদ্দেশে ট্রেন ছাড়ল।

তিনি ভাবতে লাগলেন জম্মু-কাশ্মীরের কথা। অসুরের অত্যাচারে স্বর্গ আজ শঙ্কিত। নরলোকের রাজা দুষ্মন্তের নিকট তাই যে সঙ্কটের মুহূর্তে সাহায্য প্রার্থনা! স্বেচ্ছাসেবক, তুমি বুঝি হিন্দুরবি ভারতপতি মহারাজ দুষ্মন্তের একজন অনুগত অনুচর; তাই তো বোধ হয় আজকে বিপন্নের বান্ধব! তুমিই লড়েছ [illegible]রিস্তনের নওজওয়ান পানিপথে, হলদিঘাটে।

রেলগাড়ি চলতে লাগল।

আপ পাঞ্জাব-মেল বিহার-উত্তরপ্রদেশ পেরিয়ে এল পূর্ব পাঞ্জাবে। সৈনিক আম্বালা জলন্ধর ডিঙিয়ে পৌঁছলেন অমৃতসরে। জাতীয় পাঞ্জাবের কোন স্টেশনে জনৈকও মুসলমানকে না দেখে ভাবলেন, কেন মুসলিম লীগের ভাঁওতায় ভুলল লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগা! মুসলমান যত সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য ছিল তাঁরা ভারতবাসী। অনুসন্ধানে জানলেন, আজ নানা অসুবিধা ভোগ করছেন পূর্ব পাঞ্জাবের অধিবাসী। চুল কাটার নাপিত নেই, কাপড় কাচার ধোপা নেই, কিসের সান্ত্বনা হিন্দু শিখের মনোদুর্গ জাতীয় পাঞ্জাবে?

অমৃতসর ঘুরে দেখার সময় পেলেন তিনি। প্রণাম করলেন মোগলদিনে মুক্তিপণের সর্দার শিখগুরুদের পট স্বর্ণমন্দিরে, অর্ঘ্য দিলেন অশ্রুধারা শহীদদের স্মরণে জালিয়ানওয়ালাবাগে, পুলকিত হলেন রক্তরাঙা স্মৃতিপরিষদের কর্মকর্তা এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

এলেন পাঠানকোটে। রণজিৎ সিংহের মাটি পিছনে ফেলে, লাজপত রায়ের ভূমি পশ্চাতে রেখে মিলিটারি কনভয়ে রওনা হলেন জম্মুর দিকে। জম্মু শহর জম্মু প্রদেশের প্রাণকেন্দ্র। হিন্দুপ্রধান এলাকা ও জনতা ডোগরা নামে অভিহিত; সামরিকশ্রেণী হিসেবে তাঁরা ভারতবর্ষে বিদিত।

পাহাড়ের আঁকাবাঁকা প[illegible] গিয়ে চললেন। চোখে পড়ে অনাবাদী পতিত জমি[illegible] [illegible]দ্রকায় বেগবান গিরিনদ[illegible] তিনি ভাবতে লাগলেন, [illegible]-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতল বাংলা যেমনি একান্ত নিজ[illegible] [illegible]ম্মুর পার্বত্য প্রান্তও তেমনি অতি আপনার। কাশ্মী[illegible] থেকে কুমারিকা পর্যন্ত, সিন্ধু হতে আসাম অবধি সুবিস্তৃত সীমানা ভারত মায়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি। ভারতের এই স্বরূপ যুগ থেকে যুগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক [illegible]হস্যবাদী দার্শনিকদের অন্তরে ভারতবাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গান্ধার থেকে জলধি-শেষ পর্যন্ত ভারতভূমিকে কৃপা[illegible] দাপটে একত্রিত করেছিলেন, সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য কেরল থেকে শ্রীনগর অবধি ভারতবাসীকে শাশ্বত সত্তার সন্ধান দিয়েছিলেন; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাত শতাব্দীর দাসত্বের অন্তে মিলনের মহামন্ত্রে পঞ্চনদ থেকে তামিলনাদ পর্যন্ত ভারতজীবনে সম জাতীয়তাবোধের সঞ্চয় জমিয়ে গেলেন। ভারতের আকৃতি আজকে বিকৃতি লাভ করলেও, প্রতি ভারতপুত্রের মানসচিত্রের ভারতবর্ষ আগে যেমন ছিল আজও তেমন আছে।

সৈনিক পৌঁছলেন জম্মু শহরে। দিন কাটতে লাগলো বিরাট ব্যস্ততার মধ্যে। প্রত্যহ অনুভব করতে লাগলেন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানীকে। দৈনন্দিন

অভিজ্ঞতায় অনুধাবন করলেন ডোগরাগণের দৈহিক আত্মিক গঠন বলিষ্ঠ হিন্দুত্বের পরিচায়ক।

জম্মুর রঘুনাথজীর মূর্তি বেশ প্রাচীন। রাঢ়বঙ্গের বঙ্গসুদেব পরমশক্তি' খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে রঘুনাথ মন্দিরে নবান্ন-পূজা পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন। চম্বা-মণ্ডী-কুলুথলের সামন্তেরা গৌড়বঙ্গের রাজবংশের অবতংশ বলে পরিচিত। পুরাতাত্ত্বিকদের বিচারে বঙ্গদেশের পাল নৃপতিগণের উত্তর-ভারত অধিকারের ভগ্নাবশেষ এ সব ডোগরাগোষ্ঠী।

নওশেরা সমরে বিগ্রেডিয়ার ওসমানের আত্মদান ভারতরাষ্ট্রের উদ্দেশে রণনেতার অমূল্য উপহার নিবেদন। ওসমান সাহেব জিন্নার মতে হিন্দু-মুসলিমের পৃথক জাতিত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রতিবাদ, লিয়াকতের অভিমতে মুসলমানগরিষ্ঠ কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতাপন্থী পাকিস্তানের সৈন্য প্রেরণের প্রতিরোধ। জনাব ওসমান মোগলগদির দেশদ্রোহী সেনানী মানসিংহ নন; মারাঠা দরবারের দেশদরদী সেনাপতি বাহাদুর খান।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংগ্রাম-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। জোজিলাজয়ী জেনারেল থিমাইয়ার বিজয়যাত্রা থামল। অগ্রগামী জওয়ানের হাতিয়ার রুদ্ধ হয়ে গেল। সবাই বলল, সম্মানজনক রফা কেমনে সম্ভব ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, রক্ষকের সঙ্গে ভক্ষকের ?

মেসে দোলের দিনে ভোজনের আয়োজনে দাক্ষিণাত্য আর আর্যাবর্তের মধ্যে প্রথমে গালাগালি পরে হাতাহাতি চলল। কানাড়ী-কেরলী পল্টনেরা বানাতে বললেন দোসা-রসম; পাঞ্জাবী-রাজস্থানী পদাতিককুল তৈরি করাতে চাইলেন পুরি-তরকারী। স্বীয় খাদ্য-পোশাক সকল মানবের প্রিয়; কিন্তু স্বকীয় খাবার-পরিচ্ছদ অন্যের উপর চাপানোর অর্থ অযথা অনর্থ রচনা। সংকীর্ণতায় সমাচ্ছন্ন গোটা ভারতসমাজ। বঙ্গদুলাল দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদলের সামঞ্জস্য ঘটাতে প্রস্তাব করলেন, মধ্যাহ্ন আহার হোক দোসা-রসম যোগে এবং নৈশভোজন হোক না পুরি-তরকারী সহযোগে; মধ্যস্থতায় বিবাদমান দলদ্বয়ে সন্ধি হয়ে গেল।

দুপুর অবধি হোলি খেলে উৎকল সতীর্থ অজয় আচার্যকে নিয়ে তিনি স্নানে গেলেন স্থানীয় নদীতে—নাম তার 'তবী'। উভয়ে উর্দি খুলে নামলেন জলে। অজয়বাবু বলতে লাগলেন, সকালে দোসা-পুরির মল্লযুদ্ধে তুমি মাছ-ভাতের বিধান দিলে না, হেতু তোমরা স্বার্থপর নও। সারা ভারতজন যখন প্রাদেশিকতাকে প্রবল ভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তখন ভারতমাতার জ্ঞানরূপ তথা ধ্যানরূপকে লাঞ্ছিত বঙ্গমন আঁকড়ে পড়ে আছে। বঙ্গপ্রাণ বুদ্ধি বিবেক দুই দিয়েই সমগ্র ভারতবাসীকে ভালবাসে। দারুণ দুঃখ সইছ সন্দেহ নেই, তবু অস্বীকারের উপায় নেই বাঙালীরা ভারত মহাদেশে একক জাতি—যারা বাস করে রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্রের বৃহৎ চিন্তের চাঁদোয়া-তলায়।

কোথায় গেল ভারতের সাধের সোমনাথ, সাধনার নালন্দা? ঐক্যাভাবে কালসায়রে তারা ডুবেছে। সাত শো সালের ব্যথাভরা অভিজ্ঞতায় সম্মিলিত শক্তির দামামা বাজে কই ভারতজনের সংঘবদ্ধ চরিত্রে ?

ভারত-ভাগ্য নিত্যই প্রাচ্যভারতের মধ্যমণি বঙ্গভূমিতে প্রকাশিত হয়েছে। আবার বঙ্গদেশ ধর্মের শোধন শেখাক; পুনরায় বঙ্গবাসী কর্মের বোধন বাজাক।

বন্ধুর বক্তব্য শুনে সাঁতার কাটতে কাটতে ভাবলেন, বাংলাদেশের একটা রেনেসাঁ নিঃশেষ হয়েছে; বাঙালী-জাতির আর-এক যুগলীলা সৃজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। নবজন্মের গর্ভযন্ত্রণা এখন সইছে বঙ্গসমাজ। বিপুল বেদনা অবসানান্তে এগিয়ে আসছে বিশাল আনন্দমেলা। ভাবীদিবসের কোলে মহাজীবন জাগে!

পয়লা বৈশাখ স্টেট মিলিসিয়ার তরুণরা মার্চ করে যাচ্ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-মুসলিম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সমবায়ে সংগঠিত নয়াজমানার নওজওয়ানদের মিলিটারি কায়দায় সম্বর্ধনা করলেন। স্পষ্টভাবেই দেখলেন, যৌবন জেগেছে; আগামীর অভিষেক হচ্ছে ইতিহাসের আশীর্বাদে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘুরতে লাগলেন ডাক্তার বোসের বাড়িতে বাংলা পত্রিকা পড়ার লোভে, রাত্রিতে ইঞ্জিনীয়ার গুহের গৃহে বাঙালী খাদ্য খাওয়ার লালসায়। জম্মু শহরের বিশ ঘর বঙ্গপরিবার বঙ্গসন্তানের প্রবাসকাল

সহজ ও স্বাভাবিক করে দিলেন। বঙ্গমন সেথায় যায়, বঙ্গমাটি সেথায় ধায়।

ঝুলনের দিনে একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক বললেন, মাইল পঁচিশেক দূরে এক বস্তীতে বৈষ্ণবীদেবী অবস্থিত। সে মূর্তি অতীব প্রবীণ। মহাদেবীর মন্দির ধর্মপ্রাণ ডোগরাদের একটি পীঠস্থান। জম্মুর সঙ্গে বঙ্গের সুসম্পর্কের সমাচার পাবেন যদি শীঘ্রই সেখানে বেড়াতে যান। অধমের অনুরোধ ভুলবেন না।

ছুটলেন দেবীর দিকে। ডোগরাজনের বৈষ্ণবীদেবী পরমেশ্বরী দক্ষিণা কালীকা। আশ্চর্য হলেন আদ্যাশক্তির মূর্তি-মন্দির দর্শন করে। এখানে পরিচয় হল কতিপয় বাঙালী সাধুর সঙ্গে। কথাপ্রসঙ্গে জনৈক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন দূরে এলেন কেমন করে?

আমরা নেপালে-তিব্বতে যাই—ঘুরে বেড়াই।

বিদেশে বহুদূরে কেন যান?

বসুন্ধরাকে সীমাবদ্ধ ভাবতে চাই না বলে।

আপনাদের প্রকৃত লক্ষ্য কি?

গম্ভীর গলায় সাধু জবাব দিলেন, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে কল্যাণ কামনা; মানুষের স্বভাবের ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

বঙ্গতরুণ স্তম্ভিত হলেন। বুঝলেন, বয়োবৃদ্ধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী জ্ঞানবৃদ্ধও বটে। শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করলেন শুভের সাধককে।

সুদীর্ঘ আলাপের শেষে মহাশক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সাধুজী বললেন, ওই ব্রহ্মময়ী আমার দেশজননী—আমাদের ভুবনমাতৃকা।

বঙ্গযুবক যাত্রা করলেন ক্যাম্পের উদ্দেশে। ভাবতে লাগলেন, বিজাতির চালে চিন্তাকে চালিত করে বঙ্গতনয়েরা নিজেকে অল্পই জানতে আর বুঝতে পেরেছে। বিদেশমুখী বঙ্গনন্দনদের স্বগত বললেন, চালাকি ছাড়, চেলাগিরি ভোল—গুরুত্ব আন; গুরুগিরি দেখাও।

জম্মু-কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দর-দাম শুরু হল। 'ডেলভয়-ডিকসন' এলেন এবং গেলেন, কিন্তু মৌলিক সমস্যার কোনই সমাধান হল না। প্রত্যেকের প্রশ্ন জাগল—রাজ্য পূর্ণাঙ্গ থাকবে অথবা বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে?

উধমপুরের মেজর মুখার্জির উদ্যোগে, জম্মু শহরের বঙ্গদেশী অফিসারগণের উৎসাহে, জম্মু ডিভিশনের বাঙলাদেশী পল্টনদের আনুকূল্যে বিজয়া-উৎসব পালিত হল। আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যকুল আমন্ত্রিত হলেন অনুষ্ঠানে। নিমন্ত্রিতবর্গের আপ্যায়নের জন্য কলকাতা থেকে উড়োজাহাজে এল দই-সন্দেশ-রসগোল্লা। জলযোগের পর বাঙালী পদাতিকদল সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে পরিবেশন করলেন বাংলা গান কবিতা নাটক। আর্মির এডিকেট অনুযায়ী সমাবেশের সভাপতিত্ব করলেন মেজর জেনারেল তারা সিং বল্ সাহেব।

তাঁর ডোগরা জীবন শেষ হল। রওনা হলেন জম্মু-কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরের দিকে। পৌরাণিক যুগের রাজা চিত্ররথের গন্ধর্বলোকের দিকে। বৈদিক আমলের মহারাজ ইন্দ্রের স্বর্গভূমির উদ্দেশে।

সামরিক কনভয় জাতীয় সড়কে এগিয়ে চলল। সত্তরখানা লরি সারি বেঁধে আকাশে ডিজেলের কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে ছুটল। পিছনে পড়ে রইল কুদ-বানিহাল-কাজিকুণ্ডা নামক বিবিধ জনপদ। গাড়িগুলো চলতে লাগল।

তিনি এসে গেলেন শ্রীনগরে। স্রষ্টা চিরকাল ভারতমায়ের মুকুট চিত্রিত করে রেখেছেন কাশ্মীর উপত্যকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে। শঙ্করাচার্য মঠ ও ডোগরাশাহীর রাজপ্রাসাদ শ্রীনগরের নকল হীরা ডাললেক—শালিমারবাগ আসল হীরক শিল্পীর লীলাপুরী। কাশ্মীর উপত্যকার শতকরা নব্বইজন মুসলিম; তাঁরা সবাই দীনদরিদ্র। অভাবের ফলে কাশ্মীরী মুসলমান হারিয়েছেন দৈহিক মানসিক দৃঢ়তা। কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা দশজনেরও কম। তাঁরা সকলেই সঙ্গতিপন্ন। কাশ্মীর হিন্দু রক্তে আর্য, কৃষ্টিতে আরব। কাশ্মীর উপত্যকা প্রত্যেকেই সুন্দর—বিশেষ করে ব্রাহ্মণেরা অপরূপ।

শ্রীনগরের বেঙ্গল-মোটার-কোম্পানির মালিক নিয়োগীবাবু অব্যবসায়ী বঙ্গজাতির ব্যতিক্রম। কর্মই

হুদূর কাশ্মীরে গিয়ে বাঙালী জাতির ব্যবসাবিমুখতার অপবাদ আংশিক ঘুচিয়েছেন। দেওয়ান নীলাম্বর মুখুজ্জে, দেওয়ান আশুতোষ ঘোষ, বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী বঙ্গজনকে শ্রীনগরের অধিবাসী এখনও বিস্মৃত হন নি।

হিন্দুকালে আর বৌদ্ধযুগে কাশ্মীর ছিল সংস্কৃত অধ্যয়নের এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রস্থল। মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সেদিনের শ্রীনগরের হিন্দু ব্রাহ্মণদের, বৌদ্ধশ্রমণগণের সাংস্কৃতিক সংযোগ ছিল। একালের বিদ্যায় কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা কারুর পশ্চাতে পড়ে নেই; তাঁদের রুধির প্রবাহিত সফরু-কাটজু-কুঞ্জুরুর ধমনীতে। জয়গর্বও রেখে গেছে শ্রীনগর খ্রীষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীতে। কাশ্মীরগৌরব মহারাজ 'ললিতাদিত্য' বাংলা-আসাম ছাড়া সম্পূর্ণ উত্তরপথ অধিকার করেছিলেন। আর্যাবর্তের অধিপতি ললিতাদিত্যের গদি অলঙ্কৃত করতেন মহামন্ত্রী বঙ্গপুত্র 'মিত্রস্বামী'। তাঁর দুলালও শ্রীনগরের দরবারে মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ইসলাম এনেছিল কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রলয়। পাঠান-পর্বে শতেক শিক্ষালয় হয়েছিল ভস্মীভূত, কতক মন্দির চৌচির। জরাজীর্ণ মার্তণ্ডমূর্তি এ যুগের প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের জানাচ্ছে—হিন্দু আমলে কাশ্মীর কত উন্নত ছিল। মোগল-জমানায় বাদশাগণ গ্রীষ্মাবাসে আসতেন শ্রীনগরে। সঙ্গে থাকত সাধারণ সিপাইকুল থেকে অসাধারণ ওমরাহদল। জওয়ানরা ভোগ করত ইতর নারীদের; আমীররা উপভোগ করতেন সম্ভ্রান্ত মহিলাদের। হতভাগিনীরা স্থান পেত না হিন্দু-সমাজে। তাই যে বুঝি ধীরে ধীরে কাশ্মীরে বেড়ে গেছে মুসলিমের সংখ্যা। কাশ্মীর উপত্যকার সব মুসলমানের শরীরেই বইছে হিন্দুশোণিত।

পুণ্যদিবস পনেরোই আগস্ট তৃতীয় বার উদ্‌যাপিত হল সকল ভারতীয় ইউনিটে। ধর্মাশোকের চক্রশোভিত ভারতবর্ষের ধস্ত নিশান গর্বে গগনে উড়ল। উচ্চতম অফিসার থেকে নিম্নতম সিপাই পর্যন্ত নানান পদমর্যাদার ভারতসন্তান মিলিতভাবে অভিবাদন জানালেন রাষ্ট্রের প্রতীক পতাকাকে।

প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে ফেরার পথে মারাঠী সহকর্মী দেবদত্ত দাতার সৈনিককে বললেন, বাংলা ভারত মহাদেশের সেরা দেশ। তোমরা জাতীয় গীত গেয়ে কেবল আজ সমবেতদের কৃপা করলে না, দীর্ঘকাল আগেই লিখে গোটা ভারতবাসীকে কৃতার্থ করেছিলে। ভারতের মনোমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' বঙ্গতেজের তপের বর, প্রাণমন্ত্র 'জনগণমন' বঙ্গবীর্যের তপস্যার ধন; জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এ যুগের ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র বঙ্গস্বভাব সুসম্ভব করেছে। তোমরাই সাহিত্যের সাধনা করেছ, শিল্পকলার উপাসনা করেছ, নৃত্যবিদ্যার আরাধনা করেছ, বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করেছ, ইতিহাসের অনুশীলন করেছ এবং অমারজনীতে নির্ভয়ে গেয়েছ শিকল-ভাঙার সঙ্গীত ফাঁসির মঞ্চে। দশচক্রে আজকে বড়ই বিপদে পড়েছ, তবুও অস্বীকারের উপাই নেই—বঙ্গবৃত্তি কমঠ-ব্রতের নয়— বঙ্গাবিবেক চরৈবেতির!

বঙ্গদেশের মস্তককে তুমি সম্মান জানালেও এদিনের ভারতবর্ষের প্রভুপক্ষ সমাদর করতে একেবারেই অসম্মত।

ভারতের কর্তা হয়েছে বৈশ্য উত্তরপ্রদেশ। কপট বৈশ্যের কাছে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের মর্যাদা স্বীকৃতি পাবে না। সমাদৃত হবে বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের তলোয়ারের দৌরাত্ম্য। আমি মারাঠী, আমরা ক্ষাত্রধর্মে গর্বিত; সাত্ত্বিক বঙ্গজাতিকে গুরুত্ব দেওয়াই রাজসিক মহারাষ্ট্রের গৌরব।

তোমার হৃদয়ে এহেন গভীর বঙ্গপ্রেম উথলে উঠল কেন?

বঙ্গসত্তার প্রতি মারাঠিদের অনুরাগ আলোকিত পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গের সময়ে লোকমান্য তিলকের আন্দোলনে, মহারাষ্ট্রীয়দের উপর বঙ্গ-আত্মার আকর্ষণ উদ্ভাসিত গুরুদেব রবি ঠাকুরের শিবাজী-প্রতিনিধি কবিতার মাধ্যমে। অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী-ধার্মিকের উদয় বঙ্গসমাজ দিল, কিন্তু বিভিন্ন বিপর্যয়ের ফলে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি—বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

তিনি বলতে লাগলেন, বাঙালী-জন্মের দাবিতে তোমার মতন বঙ্গবান্ধবকে অভিনন্দন জানাচ্ছি; কারণ সর্বত্রই বাঙালী নিজেকে মিত্রহীন মনে করছে, তবে আমার আশাবাদী বুকের বিশ্বাস বঙ্গতনয় অতীতের চাইতে আগামীতে অধিক সার্থক হবে, আপদের সৃষ্টি

করেই বাংলার ভাগ্যবিধাতা বঙ্গপ্রাণকে প্রখরতর করছেন। আলোচনার ইতি টানার আগে আরও বাক্য যোগ করব। বাঙালীরা মারাঠিদের ভারি ভালবাসে। বঙ্গসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের কলমে প্রকাশিত মহারাষ্ট্রীয় 'তলোয়ারকারে'র আদর্শচিত্র, বাঙালী সাংবাদিক যাযাবরের লেখনীতে প্রচারিত 'আগারকারে'র অভিনব চরিত্র। ভাই দাতার, তুমি আমার কাশ্মীরী জীবনে অনবদ্য আবিষ্কার।

বঙ্গনন্দন লাইনে ফিরে ভাবলেন—কালের সদিচ্ছাকে পূর্ণ করতেই বঙ্গমাতা বোধ হয় ছিন্নমস্তা! বিবেকানন্দ বঙ্গজনকে বলেছেন, এবার কেন্দ্র সারা ভারত ; জানি দেশগুরুর দীক্ষায় দধীচি বঙ্গজাতির অস্থি দিয়ে ভারত-জননীর মুক্তিবজ্র গঠিত হয়েছে। অরবিন্দ বঙ্গবাসীকে বললেন, এবারে লক্ষ্য সমগ্র ভুবন ; মানি বিশ্বগুরুর প্রজ্ঞায় শিবি বাঙালা জাতির হৃদ্‌পিণ্ড দিয়েই ভুবন-মাতৃকার মোক্ষবর্তিকা নির্মিত হবে। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আবৃত্তি করলেন :

পদ্মা-গঙ্গা কালী-কমলার পুত্র বাঙালীগণ,
চলার পথের বিঘ্ন দলিতে তাদের নিত্য পণ।

ব্যাটেলিয়ানে বীরাষ্টমীর দিন ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হল। অপ্রীতিকর অবস্থা ঘটল যখন পদকোলীন্যে অফিসারকুল গররাজী হলেন জওয়ান, এন-সি-ও, জে-সি-ও প্রভৃতি আপামর ফৌজের সঙ্গে একত্রে আহার করতে। ইংরেজ যুগে লাল-চামড়ার প্রাইভেট, এন-সি-ও ইত্যাদির সঙ্গে এক বৈঠকে বসে মদ খেয়ে, খানা খেয়ে আন্তরিকতার অন্ততঃ অভিনয় করতেন ; বিটুইন দি মেন অ্যাণ্ড দি লিডারস্ অফ দি আর্মি। স্বরাজ প্রাপ্তির পরে জাম্পিং প্রোমোশন পেয়ে এঁরাই হয়েছেন 'মন্টগোমারি-ম্যাকআর্থারে'র ভারতীয় সংস্করণ। ক্ষত্রিয়ের পোশাক পরার সৌভাগ্য নিঃসন্দেহে পেয়েছেন। পরিচ্ছদের নীচে রয়েছে শূদ্রবুদ্ধির ক্ষুদ্রপ্রবৃত্তি!

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ না ছাড়লে এঁদের দাম দিল্লী-মাদ্রাজের বাজারে মাসে একশো টাকাও হত না। ইংরেজী ভদ্রপ্রথায় লিখতে অক্ষম হলেও টমি-ধরনের উচ্চারণে অত্যন্ত ওস্তাদ। এঁরা বর্তানিয়াকে অনুসরণ করেন নি কর্মক্ষমতায়। অনুকরণ করেছেন শুধু উচ্ছৃঙ্খলতায়।

অসুস্থ সৈনিক হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলেন, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে কাশ্মীর নৃপতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত বঙ্গাধীশের নিধনের প্রতিশোধ নিতে যে দুঃসাহসী বাঙালীদল সন্ন্যাসী সেজে শ্রীনগরে গিয়ে 'পরিহাস-কেশবে'র বিগ্রহখানি ভেঙেছিলেন, যুগের পরিবর্তনে সেই ঐতিহাসিক তিক্ততা দূরীভূত হয়ে গেছে। রাহুগ্রস্ত কাশ্মীরকে রক্ষা করতে তাইতো ভারত মহাদেশের প্রত্যেক অধিবাসীর পাশে পাশে তাঁর কত না বঙ্গপুত্র হাজির হয়েছেন। কেউ এসেছেন অফিসারবেশে, কেউবা কেরানী হিসাবে। অন্য কাশ্মীরের মিলিটারি ইতিকথায় বাহাদুর বঙ্গসন্তান মেজর জেনারেল প্রদীপ সেনের, সত্যব্রত রায়ের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে।

যাত্রা করলেন সিক্ লিভ যাপন করতে। ঝিলমের বিতস্তার তীরে বসে বললেন, বিদায় দাও তুষারকন্যা কাশ্মীর ; যাই তোমার কোল ছেড়ে। জীপ ঢুকল পশ্চাতে পড়ে রইল বানিহাল, উধমপুর, জম্মু নামক কত না জনপদ। রাভী তথা ইরাবতীর সৈকতে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতন তাকালেন তীরের দিকে। বলতে লাগলেন, এই পথে এ জীবনে ফিরব না ; তবুও এই সড়ক স্মরণে থাকবে আজীবন, বঙ্গনন্দনের নমস্কার নাও কাশ্মীরীদের দেশ, ডোগরাদের ভূমি। জয়হিন্দ।

তিনি পৌঁছলেন পাঠানকোটে। উঠলেন গিয়ে ট্রেনে। অমৃতসরে গাড়ি করলেন বদল। ডাউন পাঞ্জাব মেল চলল হাওড়ার উদ্দেশে। ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিন তীব্রবেগে ছুটল। বাষ্পরথের দোদুল দোলার সঙ্গে সংযুক্ত হল তাঁর হৃদয়দোলা, শব্দের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে গেল সুর। ভাবতে বসলেন—জম্মু-কাশ্মীরকে হারালেন অথচ আমরণ নিবিড়ভাবে গেয়ে গেলেন!

রেলগাড়ি চলতে লাগল।

ঊনিশশো ঊনপঞ্চাশের ডিসেম্বর।

উপগ্রহ

অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

এই দুটো ঘর, সামনে একফালি বারান্দাও আছে—মাঝে মাঝে বসা যাবে। তবে জলটাই একটু মুশকিল করল, কুয়ো থেকে তুলতে হবে। একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল, কি বল? তোমার শরীরটাও এবারে ভাল হবে।

শর্বাণী মাথা নীচু করে রইল, শুধু বলল, ছবিগুলো টাঙাবে না?

সব হবে, তুমি কিছু ভেব না।

ঘুরে ঘুরে শর্বাণীকে বাড়িটা দেখাল বিজন। সামনে একটা ছোট পাহাড়। উপরে একটা শিবমন্দিরও রয়েছে। তাকে বলে শিবপাহাড়। শীত শেষ হয়ে এসেছে। বসন্তের টান লেগেছে। দূরে শিমুল-পলাশের আগুন-লাগা সমারোহ। শর্বাণীর এ সব দেখতে বেশ ভাল লাগছিল।

শর্বাণী বলল, ওই বড় রাস্তাটা কোথায় গেছে?

ওটা ভাগলপুর রোড। আর ওই বড় বাড়িটা দেখছ ওটা জিলা স্কুল, আর ওই দূরে আবছা নীল মত—নাগাটি তারপর ত্রিকূট পাহাড়। তুমি কখনও এর আগে পাহাড় দেখ নি, না?

রেলিঙের ওপর শীর্ণ আঙুলগুলো বোলাতে বোলাতে শর্বাণী বলল, ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে মুসৌরী গিয়েছিলাম—লালটিব্বার কথা এখনও মনে আছে। দিদি একটা কবিতা লিখেছিল ওই নিয়ে।

শর্বাণী একবার উদাস দৃষ্টিতে বিজনের দিকে তাকাল।

বিজন কথার মোড়টা পালটে ফেলল, বলল, তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও, আর খুসিকেও সাজগোজ করিয়ে দাও। রাত জেগে এসেছে। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে সব।

তুমি ছবিগুলো টাঙাবে না?

ছবিগুলো টাঙানোর জন্যে তুমি অত ব্যস্ত হলে কেন বল তো? ও একসময় টাঙালেই চলবে। বরং দরজা-জানলার পর্দাগুলো এস সকলে মিলে টাঙিয়ে ফেলি।

সকলে বলতে তো চারটি প্রাণী—বিজন, শর্বাণী, খুসি আর শিবু। সকাল থেকে বেশ আনন্দ লাগছিল বিজনের। সব কাজেই একটা উদ্দীপনা পাচ্ছিল। হঠাৎ মনটা কেন জানি না দমে গেল। শর্বাণী হয়তো এখানেও ভাল থাকতে পারবে না। শরীরটাও হয়তো ভাল হবে না। তার এত পরিশ্রম অর্থব্যয় সব নষ্ট হবে।

নাও, তোমার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। অত কি ভাবছ?

কই, কিছু না তো! বিকেলে না হয় ওই পাহাড়টার দিকে বেড়াতে যাওয়া যাবে। একটু হাঁটাহাঁটি না করলে শরীরটাও ভাল হবে না।

আমার কোথাও যেতে ভাল লাগে না।

এ তো কলকাতা নয়, এখানে যত খুশি তুমি বেড়াতে পার।

মাথাটা নীচু করে হাতের আঙুলগুলো দেখছিল শর্বাণী। নিজেকে যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। বিজন দেখল শীর্ণ আঙুলগুলো যেন কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। হাতের আংটিটাও কেমন যেন বড় মনে হল বিজনের।

আংটিটা তোমার বড় হয় না?

এটা দিদির আংটি।

না, এটা আমার মার। বাবা গড়িয়ে দিয়েছিলেন।

দিদি! দিদি! কথাটা যেন কেমন সশব্দে বিজনের কানে এসে লাগে। ভাল লাগে না ভাবতে, ভাবতে চায় না বিজন, তবু যেন একটা বিরাট কামানের ভয়ঙ্কর আওয়াজের মত কানে এসে লাগে। এসব মুছে ফেলতে চায় বিজন মন থেকে একেবারে। অতীতের পাতা সব ছিঁড়ে ফেলতে চায়। তবু যেন কোন এক দমকা বাতাসের মত সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়ে পেছনের অতীত সামনে এসে পড়ে। সব ভুলতে চাইলেই কি

ভুলতে পারা যায়? খুসির মুখটা ওর মায়ের মুখকে মনে করিয়ে দেয়। অতীতকে কাছে টেনে আনে।...

বেশী দিনের কথা নয়। তবু যেন মনে হয় অনেক দিনের কথা। অনেক কালের কথা। প্রশান্তর সঙ্গে গিয়েছিল একটা মেয়ে-কলেজের হস্টেলে। সেখানেই আলাপ হয়েছিল প্রশান্তর বোন শিবানীর সঙ্গে। শিবানীও দেখেছিল বিজনকে। ব্যাপারটা হয়তো সেখানেই শেষ হয়ে যেত। শরীরবিদ্যার ছাত্র বিজনের মানুষের মনের দিকে নজর দেবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু সে অবকাশের সুযোগ একদিন ঘটে গেল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

প্রশান্ত একদিন বলল, বিজন, মা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন, তুই একটু কষ্ট করে শিবানীকে দিয়ে আসিস ভাই। আমার একটু কাজ আছে।

বিজন হস্টেলের ওয়েটিং-রুমে গিয়ে অপেক্ষা করেছিল। একরাশ বই বুকের কাছে ভাঁজ করে শিবানী এসে দাঁড়াল।

কখন এলেন?

এই আধ ঘণ্টা। প্রশান্ত এটা দিয়েছে।

শিউলির আধফোটা লাবণ্য নিয়ে শিবানী কাছে এসেছিল। জিনিসগুলো নিয়ে নিল। শান্ত গম্ভীর মুখটার দিকে বারবার তাকিয়েছিল বিজন। পরিশ্রান্ত মুখটায় উচ্ছ্বাসের বিন্দুমাত্র নেই। শুধু ক্লান্তির স্বাক্ষর চোখ দুটোতে কাজল পরিয়ে দিয়েছে। গভীর, অতন্দ্র। অসংখ্য নার্ভ ভেন আর রক্তকণিকা ভেদ করে বিজন একটা প্রাণের সন্ধান পেয়েছিল।...

কি ভাবছ মাথা নীচু করে? তোমাকে ভাবতে দেখলে আমার বড় ভাবনা হয়।

শর্বাণীর কথায় বিজন যেন চমকে উঠল।

শিবুকে বাজারে পাঠিয়েছ, বাজারটা চেনে তো?

ও নিজেই গেছে।

সন্ধ্যার ছায়া পাহাড়গুলোর উপর ঘনিয়ে আসে। দূরে সবুজ পাহাড়গুলোর উপর নীলাভ ধোঁয়াটে কুয়াশা জমা হতে থাকে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে দু-একটা বাতিও দূরান্তের নক্ষত্রের মত মিটমিট করে।

খুসিকে খাইয়ে দিয়েছ? অনেক হেঁটেছে আমাদের সঙ্গে। ওকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

তুমি তো জান ও আমার কাছে ঘুমুতে চায় না।

বিজন জানে শিকদার বাগান লেনের বাড়িতে এক পিসীমার কাজ ছিল। পিসীমাই ওর সবকিছু করত।

কেন, কি বলে?

একদিন বলেছিল, আগে আমাকে গান গাইয়ে ঘুম পাড়াতে, এখন তুমি গান গাও না কেন মা?

বিজন বলল, তুমি কি বললে?

আমি কিছু বলি নি।

বিজন মাথা নীচু করে সব শুনছিল। সত্যিই তো এক গাছের বাকল আর একটা গাছকে কী করে আঁকড়ে ধরবে! শিবানীর সেই কণ্ঠস্বর এখনও বিজনের কানে এসে লাগে। প্রথম যেদিন শিবানীর গান শোনে এখনও সে ঘটনা মনে পড়ে।...

প্রশান্ত একদিন ডিউটি থেকে এসে বিজনকে বলেছিল শিবানীর কলেজ-সোস্যালে যাবি? শিবানী দুটো কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে।

গিয়েছিলও বিজন। শিবানীর মুখে শুনেছিল একটা রবীন্দ্র-সংগীত—'তুমি মোর সন্ধ্যায় সুন্দর বেশে এসেছ'।

গানের শেষে শিবানী কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল বিজয়িনীর গর্ব নিয়ে নয়, নিতান্ত সাধারণভাবে। শুধু চোখ দুটোতে ধরা পড়েছিল উচ্ছলতার আভাস। যেন অনেক অদেখার সলজ্জ চাউনি বিজনের কাছে ধরা পড়েছিল।

আমাদের ওখানে একদিন এস। প্রশান্তর ঘরেই থাকি জান তো।

শিবানী এসেছিল। বিজন শিবানী আর প্রশান্তকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। কাজের অছিলায় প্রশান্ত চলে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ বিজন একসঙ্গে হেঁটেছিল। কোন কথা বলতে পারে নি। তবু দুজন দুজনকে বুঝেছিল। অনেক সময় মনের ভাব বোঝাতে ভাষাই যথেষ্ট হয় না, তখন চুপ করে পথ-চলাতেই অনেক কিছু বলা হয়ে যায়।...

তুমি এতগুলো জিনিস টেনে না আনলেই পারতে।

শর্বাণীর কথায় হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেল বিজন।
লল, কেন, এমন বেশী কিছু তো আনি নি।

চেয়ার-টেবিলগুলো না আনলেই পারতে।

কেউ যদি বেড়াতে আসে বা আমরাই যদি ব্যবহার রি ক্ষতি কি!

তা নেই—তবু বেশী জিনিস আমার ভাল লাগে না।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে রাত্রি নেমেছে। দূরে শাল-পলাশের ন জোনাকী জ্বলছে। দূর থেকে ভেসে আসছে মাদলের একটানা সুর। সারাদিনের ক্লান্তি-শেষেও ওরা গান ইছে।

তুমি গলার হারটা খুলে রাখলে কেন শর্বাণী? তুমি আজকাল গয়নাগুলো এক এক করে সব বিদায় চ্ছ।

খুসি বলছিল তুমি তো আগে কখনও হার পরতে না!

বিজন জিনিসটা ঠাট্টার ছলে নিল। বলল, ও. কিন্তু সির বাবা বলছে ও হারটা তোমায় পরতে হবে।

কিন্তু আমি তো খুসির মা নই!

আবার কোমল জায়গায় আঘাত করল শর্বাণী। জন মাথা নীচু করে বসে রইল। শর্বাণীকে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে বলল, তুমি শোবে না? বিছানা ঠিক করে য়েছে শিবু?

খুসির খাটের কাছে নীচে মেঝেতে বিছানা করে য়েছে।

মাটিতে শুলে তোমার অসুখ করবে শর্বাণী। শিকদার ান লেনের বাড়িটা দোতলা ছিল। এখনও অল্প অল্প ত আছে, বাড়িটাও একতলা।

খাটে আমি শুতে পারি না, ভয়ানক অস্বস্তি হয়. মাকে বোঝাতে পারব না।

তোমাকে খাটে শুতেই হবে।

আমাকে মিছিমিছি কষ্ট দেবার জন্যে তুমি ডেক না।

শর্বাণী চলে গেল। বিজন ভাবতে লাগল দু বোনের ধ্যে কত তফাত।···

কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাত থেকে বিজন একদিন বানীকে একটা বেলফুলের মালা কিনে দিয়েছিল। রপর অনেকদিন পরে একদিন শিবানীই বলেছিল, জান, সেই বেলফুলের মালাটা শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ইচ্ছে করেই সেটাকে ফেলতে পারি নি, রেখে দিয়েছি।

কেন?

তুমি দিয়েছিলে বলে।

বিজন আপন মনেই হেসে উঠেছিল, সেই সঙ্গে মুগ্ধও হয়েছিল তার যত্নের জন্যে। বিজন ঠাট্টার ছলে বলেছিল, তুমি খুব ভাল গৃহিণী হতে পারবে।

শিবানী লজ্জায় মাথা নীচু করেছিল।

বিজন বলল, জান, আমার দিদিমা আমাদের কাছে গল্প করতেন—দাদু যা জিনিস এনে দিতেন দিদিমা সেটা খুব যত্ন করে রেখে দিতেন। একবার মালদহ থেকে এক কৌটো আমসত্ত্ব এনে দিয়েছিলেন দাদু। দিদিমা নাকি সেটা ছ মাস খোলেন নি। যখন খুললেন তখন সেটা খাবার অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

বিজন আপন মনেই হেসে উঠেছিল হো-হো করে। আচ্ছা, তুমি আমসত্ত্ব ভালবাস? আমার কিন্তু মনে হয় জুতোর সুখতলার সঙ্গে ওর কোন তফাত নেই।

একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল দীপকের সঙ্গে। বিজন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, প্রথমে কথা বলতে সাহস হয় নি। কি জানি, একই চেহারার অন্য কত লোকই তো থাকতে পারে। বিশেষতঃ এটা বাংলাদেশও নয়। তবু প্রাথমিক বাধাটা বিপত্তি হয়ে দাঁড়ায় নি। দীপক জড়িয়ে ধরেছিল বিজনকে, আরে, তুই এখানে!

বিজনই জিজ্ঞেস করল, তুই এখানে এলি কি করে!

আমি চেঞ্জে এসেছি।

ডাক্তারের চেঞ্জ?

না ভাই, আমার জন্যে নয়, আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যটা ভাল যাচ্ছে না, তাই নিয়ে এলাম এখানে। শুনেছি, এখানকার জল হাওয়া ভাল।

ভাল ছিল জানিস, কিন্তু দিন দিনই যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। লোকও বেড়েছে অনেক।

তুই এখানে কি কাজে?

দীপক সবই বলল, একটা বিলিতী কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে এসেছে। প্রায় বছর তিনেক হল।

বিজন দীপককে ধরে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে।

দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, দেখ, কাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

দীপককে দেখে শর্বাণী একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে দিল।

বিজন বলল, ওকে দেখে আর তোমার ঘোমটা টানতে হবে না। আমার বন্ধু দীপক, এখানেই থাকে।

শর্বাণী নমস্কার করল।

অ্যাসট্রেতে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বিজন বলল, এখানে তোর বাড়িটা কোথায়?

বাঁধের কাছেই।

অনেকক্ষণ ধরে চলেছিল দুজনের পুরনো স্মৃতির রোমন্থন। শর্বাণী নির্বাক দর্শকের মত বসে সব শুনছিল।

ওয়ান হস্টেলের কথা তোর মনে পড়ে দীপক?

পড়ে না মানে!

দীপক হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর আরম্ভ করল, জানিস, সেই সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মধুপুরে। বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। আমাকে তো চিনতেই পারলেন না প্রথমটা। ঢিপ করে একটা প্রণাম করে বললাম, কেমন আছেন স্যার?

তুমি! ঠিক চিনতে তো পারলাম না বাবা!

আপনার ছাত্র ছিলাম। ওয়ান হস্টেলে থাকতাম। এখন তো চিনতেই পারবে না, কি বলিস বিজন! সেই সরস্বতী পুজোর রাতে সারারাত ঢোল বাজিয়ে ছিলাম, তোরাও তো ছিলি সবাই, এসে আমাকেই ধরল: তোমাকে আমি হস্টেল থেকে বের করে দেব জান?

কেন স্যার?

জান, আমার ব্লাডপ্রেসার আছে! সারারাত না ঘুমুলে আমার প্রেসার বেড়ে যায়!

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। সময়ের খোলস ছাড়িয়ে অল্পক্ষণের জন্যে অনেক যুগের আগের অতীতে চলে যেতে পেরেছিল দুজনে।

আচ্ছা, জয়ন্তর খবর জানিস?

শুনেছি ও বিলেতে আছে।

আবার সকালবেলাকার তির্যক্ রোদ প্রতিদিনের মত ঘরে এসে ঢোকে। খুসি ওর ট্রাইসাইকেলটা চেপে বসে ঘরের মধ্যেই চালাতে শুরু করে। শর্বাণী যেন আরও নিস্তব্ধ হয়ে গেছে আজকাল। শরীরটাও ঝিমিয়ে পড়েছে।

চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বিজন জিজ্ঞেস করে, পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল?

সেদিন পাশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বেশ বাড়িটা। বাড়িটা ভদ্রলোক গাছে গাছে ছেয়ে ফেলেছেন। ওঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করল। একটি মেয়ে—তাও থাকে ডেহরী-অন-শোনে।

ভদ্রলোক কি করেন?

ডাক্তার।

এখানে দেখছি অনেক ডাক্তার। সেদিনও দুজনের সঙ্গে আলাপ হল। এখানে প্র্যাক্‌টিস করলে হত, কি বল?

শর্বাণী একটা কাজের অছিলায় ভেতরে চলে গেল। সেটা বিজন বুঝল। এ বাড়িতে আসবার পর থেকেই বিজন লক্ষ্য করেছে শর্বাণী যেন কিছুক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, কথা বলার সময় হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। নয়তো ভেতরে চলে যায়। বিজন একটা সিগারেট ধরাল।···

একদিন কলেজ স্ট্রীটের এক রেস্টুরেণ্টে চা খেতে খেতে বিজন শিবানীকে ব[লে]ছিল, পাস করার পর এক বছর হাউস-সার্জেন থাকতে হবে, ততদিনে তোমার কলেজে পড়াও শেষ হবে কি বল?

কথাটার ইঙ্গিত শিবানী বুঝেছিল। বিজন কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিল, আচ্ছা, প্রশান্তর কাছে শুনেছি তোমার একটি ছোট বোন আছে না?

হ্যাঁ।

কোথায় থাকে?

ধানবাদে মাসীর ওখানে থেকে পড়ে। এই তো কাল শর্বাণীর চিঠি পেয়েছি।

প্রশান্তর কাছে তোমাদের বাড়ির গল্প প্রায়ই শুনি। সারাদিন ডিউটির পর এসব ঘরোয়া গল্পই আমাদের মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয় আমরা নির্বাসনে নেই, আমাদেরও আত্মীয়স্বজন আছে।

তুমি কিছু বল না ?

আমি আর কি বলব বল ? আমাদের বাড়ির গল্প তুমি নিজে। মা-বাবা তো নেই—এক পিসী আছেন, দেশে থাকেন। ছুটিতে বাড়ি যাই, তাও বেশীদিন ভাল লাগে না।

সেদিন মালবিকা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

আমাকে কি করে চিনল ?

ও নাকি আমাদের একসঙ্গে যেতে দেখেছে।

ভালই তো।

আমার লজ্জা করে।

কিসের লজ্জা ?

ওরা হস্টেলে বলাবলি করে।···

শিবানী ! এখনও শিবানীর স্মৃতি একটা কৌটোয় তুলে রাখা মূল্যবান রত্নের মত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে চিন্তার জোয়ারে কথাগুলো গুছিয়ে মনে করতে পারে না বিজন, কিন্তু কর্মব্যস্ত দিনগুলোর মালার মাঝে একটা একটা রবিবার মূল্যবান লকেটের ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে।

এখনও শর্বাণীকে নিয়ে হিজলী পাহাড়ের কাছে বা সুবর্ণরেখা নদীর ধারে গেলে পুরনো স্মৃতির রোমন্থন হয়। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না বিজন, কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়। শর্বাণী যেন বুঝতে পারে বিজনের মনের কথা। অনেক চেষ্টা করেও একটা প্রকাশ্য সত্যকে বিজন ঢাকা দিতে পারে না সন্ধ্যার অন্ধকার দিয়েও। সিগারেটটাও বিস্বাদ লাগে। তবু বসে থাকতে হয়। বেদনাময় অতীতকে পিছনে ফেলে সামান্য বর্তমানকেই স্বীকার করতে হয়।···

শিবানী বলে ওঠে, চল, রাত হয়ে গেল যে, অনেকটা হাঁটতে হবে।

কথাটা একদিন সোজাসুজি বিজন বলেছিল প্রশান্তকে, এখন তো লেখাপড়ার পাট চুকে গেল। আমার সঙ্গে শিবানীর সম্বন্ধটা তো তুই জানিস।

বেশী কথা বলতে হয় নি বিজনকে। প্রশান্তই সবকিছুর ভার নিয়েছিল।

বিজন বলেছিল, আমার ওই এক পিসীমা। বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তা আমার পড়ার খরচেই শেষ হয়ে গেল। এখন আমার প্র্যাকটিস আর শিবানীর ভাগ্য।

প্রশান্ত গম্ভীর হয়ে কথাগুলো শুনেছিল। জানত বিজন ভাল ছেলে। শিবানী হয়তো সুখেই থাকবে।

বিজনও যেন একটা আশার আলো দেখতে পেয়েছিল। শিবানীই আনবে তার জীবনে নূতনত্ব। শিবানীর মায়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল নিজের মার প্রতিচ্ছবি—স্নেহাশীর্বাদ। নিজের মায়ের স্মৃতি গচ্ছিত ছিল পিসীমার কাছে, যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েই পিসীমার অব্যাহতি।

ফুলশয্যার রাতে বিজন নতুন করে শিবানীকে শুনিয়েছিল তার বিগত ব্যথাময় জীবনের ইতিহাস। সেই সঙ্গে চেয়েছিল পরিপূর্ণতার অভয় আকৃতি।

কলেজেই একটা চাকরি জুটে গেল, সার্জারী ডিপার্টমেন্টে। ডক্টর সেনের প্রিয় ছাত্র ছিল বিজন। তিনি ঠিক করে দিলেন চাকরিটা। বিজন নতুন বাড়ি ভাড়া করল শিকদার বাগান লেনে। শিকদার বাগান লেনের বাড়িটায় এখনও দিন রাত পর্যায়ক্রমে আসে। আবার উদাসী পথিকের মত চলে যায়। সেদিনও আসত।

পিসীমা আর শিবানীকে নিয়ে বিজনের ছোট্ট সংসার। পিসীমাও শিবানীকে বিজনের মায়ের গচ্ছিত স্নেহ ঢেলে দিলেন।

সকালবেলায় বিজন কাজে যেত। দুপুরে আসত। উদাসী বাউলের একতারা বাজিয়ে চলে যাবার মত দুপুরটাও চলে যেত। বিজন আবার ডিউটিতে যেত। ফিরতে রাত হত। কোন-কোনদিন শিবানীকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত।

এই একঘেয়েমি দূর করল খুসি এসে। হাসপাতালে সকলেই চেনা। ডক্টর দত্ত বলেছিলেন, গত বছরও তুমি আমাদের ছাত্র ছিলে, এখন যে জেনারেশন শুরু হয়ে গেল। হয়তো তোমার মেয়েও আমাদের স্টুডেন্ট হবে। তা খাওয়াবে তো ?

বিজন লজ্জা পেয়েছিল। অনেকদিন পর শিবানীকেও কথাটা বলেছিল।

শিবানীর মেয়ের অন্নপ্রাশনে সবাই এসেছিলেন। শিবানীর আতিথেয়তায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।···

আজকের খুসির সঙ্গে সেই ছোট্ট তুলতুলে খুসির কত তফাত ! মাঝে মাঝে বিজনের কেমন যেন এখনও ভুল হয়ে যায়।···খুসি যেদিন প্রথম খাটের পায়া ধরে দাঁড়াতে

শিখেছিল, শিবানী সেদিন চিৎকার করে বাড়িটা মাতিয়ে তুলেছিল।

বিয়ের পর শিকদার বাগান লেনের বাড়িটায় তিন বছর শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা শরৎ বসন্ত এল। পিসীমাও বৃদ্ধা হয়ে গেলেন আরও। তবু খুসি পিসীমাকে ছাড়ল না। কাশী যাবার ইচ্ছেটা স্থগিত রাখতে হল। কিন্তু কে জানত পিসীমাকে আবার সংসারের নতুন করে কাণ্ডারী হয়ে থাকতে হবে!

সেদিন হাসপাতালে জরুরী একটা কেস ছিল। নতুন একটা অপারেশনের রিস্ক নেবেন ডক্টর সেন। ডাক্তার-মহলে একটা উদ্দীপনার ঢেউ। বিজনও ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ কে যেন খবর দিল বিজনকে বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে।

বিজন বিরক্ত হল, কে আবার এ সময়ে বিরক্ত করতে এল! তবু বিজন বাইরে এল অ্যাপ্রন পরেই।

পাশের বাড়ির মিত্তিরদের ছেলেটা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ দুটো অগ্নিময়।

কি হয়েছে রে!

শীগ্‌গির চলুন, বউদির দারুণ অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

অ্যাকসিডেণ্ট! বিজনের পায়ের তলা থেকে মাটিটা যেন সরে যাচ্ছিল। সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

স্টোভ বার্স্ট করে শাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল। আমরা সকলে মিলে কিছুই করতে পারি নি।

বিজন যখন বাড়ি পৌঁছল সারা দেহে একরাশ আগ্নেয় বিভীষিকা নিয়ে শিবানীর মৃতদেহটা পড়ে আছে। খবর পেয়ে প্রশান্ত এল, শর্বাণীও এল। বিজন কোন কথা বলতে পারে নি, শুধু খুসিকে একবার জোরে চেপে ধরেছিল। নির্বোধ অসহায় শিশু কিছুই বুঝল না। জানল মার অসুখ করেছে।

প্রতিদিনের রোদটা তির্যকভাবে এসে পড়ল শিকদার বাগান লেনের বাড়িটার উপর। আবার বর্ষার জলটাও বারান্দার আলসেটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। ঘরের এক কোণে বসে বিজন সিগারেট টানছিল। হঠাৎ প্রশান্তর কথা শুনে চিৎকার করে উঠল অ্যাবসার্ড, অসম্ভব।

প্রশান্ত বলল, কিন্তু খুসি? ওর কথা তো তোকে চিন্তা করতে হবে।

পিসীমা তো আছেন।

পিসীমা কদিন থাকবেন। আজ ছ মাসের ওপর শিবানী মারা গেছে, পিসীমা যেন সব সময় আনমনা হয়ে থাকেন, ভাল করে খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত করেন না। আর খুসির চেহারাও কি হয়েছে চেয়ে দেখেছিস!

কিন্তু শিবানীর স্মৃতি এখন ভুলতে পারব না।

সেই জন্যে তো আরও দরকার। ওর স্মৃতিটা যত মনে করবি তত নিজেও কষ্ট পাবি, এদেরও কষ্ট দিবি। আমার বাড়িতেও এমন কেউ নেই যে খুসির দেখাশোনা করে। তা ছাড়া খুসিকে নিয়ে গেলে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তুই পিসীমা কেউ থাকতে পারবি না।

শর্বাণীই-বা আমাকে বিয়ে করবে কেন? ওর নিজেরও তো একটা পছন্দ আছে।

সে ভারটা না হয় আমার ওপরই ছেড়ে দে।

বিজন ভাবতে লাগল। প্রশান্ত যেন আবার নতুন কোন ষড়যন্ত্র করতে চাইছে। শর্বাণীকে বিজনের খুব বেশী দেখার সৌভাগ্য হয় নি। ধানবাদেই থাকত। যখন এসেছে হয় সৌভাগ্যে না হয় নিদারুণ দুঃখে। তবু বিজন তাকে স্ত্রী হিসেবে ভাবতে পারল না, শিবানীর পাশে ওকে দাঁড় করাতে পারল না কোনমতেই। খুসিরও হয়তো অস্পষ্ট মায়ের স্মৃতিটা মনে আছে। তবু মনে হল শর্বাণী তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না।

শিকদার বাগান লেনের বাড়িটায় সেদিন আলোকের ছটা ছিল না, সানাই বাজল না, তবু বিয়েটা হয়ে গেল। যেন সকলের অলক্ষ্যে একটা গোপনীয় কাজ সারা হল, তবু সকলেই জানল বিজন আবার বিয়ে করেছে।

ফুলশয্যার ফুলগুলো শুকোবার আগেই শর্বাণীর শরীরটাও যেন কেমন শুকিয়ে গেল। মাঝে মাঝে ডিউটি থেকে ফিরে বিজন দেখত শর্বাণী ওর দিদির ছবিটাকে মনোযোগের সঙ্গে দেখছে। নয়তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। বিজনের মনে হত পুরনো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শর্বাণী যেন একটা অশরীরী প্রেতাত্মার মত নিজেকে সর্বক্ষণ লুকিয়ে রাখতে চায়।

তুমি এত চুপচাপ থাক কেন শর্বাণী!

আমার বেশী কথা বলতে ভাল লাগে না।

কিন্তু প্রয়োজনের কথাটুকুও তুমি বলতে চাও না।

প্রয়োজন ছাড়া তো তুমি ডাক না আমাকে।

তুমি কি মনে কর তোমার উপর অবিচার করেছি? প্রশান্তর জন্যেই—

আমি তো তোমাকে সেকথা বলি নি কখনও।

তুমি মেঝেতে শুয়ে থাক, ভাল শাড়ি ও গয়না কিছুই র না। মনেও কোন ফুর্তি নেই।

খাটে শুতে আমি পারি না, ভয়ানক অস্বস্তি লাগে—নে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত শরীরটা কাঁপতে াকে।

কিন্তু আমি কষ্ট পাই।

আমি এসব ইচ্ছে করে করি না জান।

তবে?

কেমন যেন একটা ভয়-ভয় লাগে সব সময়।

কিসের ভয় তোমার শর্বাণী?

তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না সবকিছু।

সেদিন দীপক জোর করেই ধরে নিয়ে গেল বিজনকে র বাড়িতে। বাঁধের পাশে সুন্দর ছবির মত বাড়িটা। নেকদিন পর বিজন যেন আনন্দের অনুভূতি পেল। াট সংসার দীপকের, স্ত্রী আর একটি ছেলে। দীপক াড়িতে ঢুকেই বলল, জান, উনি এলেন না, শরীর ভাল ই—তাই বিজনকেই ধরে নিয়ে এসেছি।

দীপকের সংসারটা বেশ লাগল বিজনের। একটা রিপূর্ণ সুখের জীবন। হাসি আর উচ্ছলতায় ভরা নটি প্রাণ।

দীপক বলল, রাতটা ভাই বেশ ভাল লাগে। সন্ধ্যে তেই মাদলের আওয়াজ ভেসে আসে আর দূরের াড়গুলোতেও আলোর দেওয়ালী।

বিজন ভাবছিল নিজের জীবনের কথা। শর্বাণী অ র সিকে নিয়ে একটা অশান্ত আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাটে।

কথাটা বলব না বলব না করে বলেই ফেলল দীপকের াছে। শর্বাণীর কোন কথাই লুকোল না।

নিমেষের মধ্যে দীপকের মত হাসিখুশী লোকও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, তুই তো নিজেই ডাক্তার বিজন, আমি এর কি সমাধান করব।

মানুষের বাইরের দিকটা নিয়েই ডাক্তারের কাজ, কিন্তু মনের অসুখ কি করে সারাব বল্?

কিছুদিন না হয় ওকে মায়ের কাছে রেখে আয়।

তাও করেছি, ফল হয় নি। আর শর্বাণী নিজেও যেতে চায় না। ভাবলাম, হয়তো চেঞ্জে এলে একটু পরিবর্তন হতে পারে, এখানেও দেখছি ও ভাল থাকছে না। শর্বাণীর মনে একটা ধারণা জন্মেছে ও যেন নিতান্ত আমার প্রয়োজনেই এসেছে আমার বাড়িতে। সত্যি, দুই বোনের আশ্চর্য রকম তফাত। তুই বল্ দীপক, এখন আমি কী করি? এ ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। খুসিকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে এখনি মরছি।

সেদিন বিকেলে বিজনের মনটা ভাল ছিল না। খুসিকে নিয়ে শিবু বেড়াতে গেছে। শর্বাণী নিজের ঘরের মেঝেয় বসে কি যেন একটা কাজ করছিল। বিজন শর্বাণীর ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল, আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার দিদির ছবিটা কে টাঙাল?

আমি, শিবুকে দিয়ে টাঙিয়েছি।

কেন?

মনে হয় দিদি যেন সর্বক্ষণ কাছে কাছে আছে।

বিজনের সমস্ত শিরা-উপশিরায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। এতদিনের সমস্ত সংযম যেন নিমেষে ভেঙে গেল।

ওটা আমি নামিয়ে ফেলব, ভেঙে চুরমার করে দেব।

কেন?

না, ও ছবি আমি রাখতে দেব না এ বাড়িতে, কিছুতেই না।

তুমি তো দিদিকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলে।

সে ভালবাসার সম্মান তুমি রাখতে দিলে না। তুমি চাও আমাকে অপদস্থ করতে, যন্ত্রণা দিতে। তুমি সব সময় মনে কর, তুমি এসেছ নিতান্ত প্রয়োজনে।

কথাটা তো অন্যায় নয়। দিদিকে তুমি ভালবেসেছিলে, আর আমাকে খুসির প্রয়োজনে, তোমার প্রয়োজনে এনেছ।

তুমি তোমার দাদাকে বিয়ের আগে এ সব বললেই পারতে। প্রশান্ত আমাকে মৃত্যুর ইন্ধন জুগিয়ে দিয়ে গেছে। তুমিও তো মত দিয়েছিলে বিয়েতে।

কি করব বল, আমি মনটাকে কিছুতেই তৈরি করতে পারি নি।

সে তোমার অক্ষমতা।

শর্বাণী চুপ করে থাকে। দুজনের মাঝে যেন একটা অনন্তকালের সময়ের ব্যবধান।

বিজন শুরু করে, দিনের পর দিন মানুষ কি ভাবে এ সব সহ্য করতে পারে! হয় খুসিকে মেরে ফেলতে হয়, না হয় আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়।

এ সব তুমি কি বলছ?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। এ ছাড়া আর কী পথ খোলা আছে আমাদের। তুমি এতদিন চেষ্টা করেও আমাদের হতে পারলে না।

বিজনের চোখ দুটো আগুনের মত জলতে থাকে—যেন পুঞ্জীভূত চাপা আক্রোশ সহের সীমা অতিক্রম করে বেরিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে দেখতে পায় একটা বিবর্ণ বিশীর্ণ নারীদেহ খাটের উপর মাথা লুটিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সেদিন দীপকের বাড়ি থেকে ফিরতে রাত হল বিজনের। বাড়ি এসে দেখল, শর্বাণীর ঘরে আলো নেবানো রয়েছে। তবু মনে হল শর্বাণী জেগে রয়েছে। একবার কৌতূহল হল শর্বাণী কি করছে দেখবার জন্য। দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, শুনতে পেল খুসি বলছে শর্বাণীকে, মা, তুমি গান গাও না কেন? আগে আমায় গান গাইয়ে ঘুম পাড়াতে।

আমার গলায় অসুখ করেছিল, তাই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলেছে এখন গান গাওয়া বারণ। গলা ভাল হয়ে গেলে আবার তোমায় গান গাইয়ে ঘুম পাড়াব, কেমন!

তুমি কানে সেই দুলটা এখন পর না কেন মা?

তোমার বাবা বলেছে, ওটা পুরনো হয়ে গেছে, তাই নতুন একটা গড়াতে দিয়েছে।

তুমি ছবিটা নামিয়ে রা[illegible] কেন মা?

ওটা তো আমার এ[illegible] ছবি। এবার আমি, তুমি, তোমার বাবা একসঙ্গে [illegible]কটা ছবি তুলে ওখানে টাঙিয়ে রাখব, কেমন!

বিজন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল এক ভাবে। দূর থেকে ভেসে-আসা সাঁওতালদের মাদলের আওয়াজটা অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী সুরেলা মনে হল বিজনের। বোধ হয় ওদের পরবের দিন খুব কাছে চলে এসেছে।

●

রম্যাণি বীক্ষ্য

উত্তর-ভারত পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ছাব্বিশ
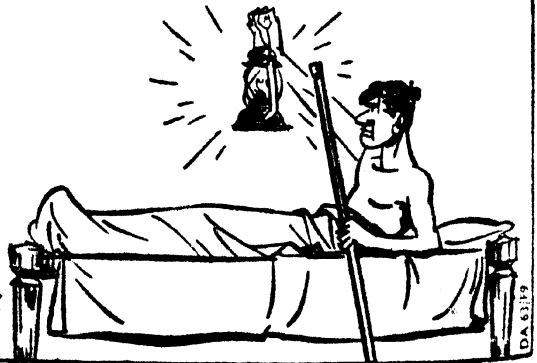
সকাল সাড়ে ছটার একটু পরে আমরা হরিদ্বারে এসে নামলুম। এক ঘণ্টা আগে লক্সরে আমাদের গাড়ি বদল করতে হয় নি, পাঞ্জাব মেল কিংবা অন্য গাড়িতে এলে নামতে হত। সে সব ট্রেন অমৃতসর যায়। দুন এক্সপ্রেস হরিদ্বারের উপর দিয়ে দেরাদুন যাবে। আমরা হরিদ্বারে নেমে একটা ধর্মশালায় গিয়ে উঠলুম।

স্টেশনের বাইরে ভাল রিটায়ারিং রুম ছিল। মনোরঞ্জন সেদিকে তাকাতেও দিল না। বলল: মামার সঙ্গে এলে ও-সবের খোঁজ কর।

আমি আশ্চর্য হলুম যে মামার সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না। মনে হল যে এই ব্যাপারে তাঁদের অনেক কিছু জানা আছে। জানা থাকাই মঙ্গল।

ধর্মশালায় পৌঁছে সাবিত্রী মনোরঞ্জনকে চেপে ধরল। বলল: কোন্ দেবতার জন্যে হরিদ্বার এত বড় তীর্থ?

মনোরঞ্জন বলল: হরিদ্বার নাম থেকেই বোঝা যায় হরির দ্বার।

এখানকার লোকেরা তো হরিদ্বার বলছে না, বলছে হরদোয়ার, মানে হরের দ্বার।

এ দেশের উচ্চারণই অমনি, হরিদ্বার না বলে হরদ্বার বলছে।

সাবিত্রী মানল না, বলল: হরির সঙ্গে গঙ্গার কী সম্বন্ধ! শিবই তো গঙ্গাকে তাঁর জটায় ধারণ করেছিলেন।

তারাপদবাবু চিন্তিত ভাবে বললেন: সত্যিই একটু গোলমেলে ব্যাপার।

মনোরঞ্জন আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম: হরিদ্বার হরদ্বার দুটোই ঠিক।

কী রকম?

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে গঙ্গা বিষ্ণুর স্ত্রী। সরস্বতী তাঁর সতীন। দুজনে বিবাদ করে দুজনের শাপে দুজনেই পৃথিবীতে নদীরূপে প্রবাহিতা। আবার এই-গঙ্গাই যখন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করছিলেন, তখন রাজা ভগীরথ তাঁকে পৃথিবীতে আনবার জন্যে তপস্যা করছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ অযোধ্যাপতি সগরের ষাট হাজার পুত্র পাতালে কপিল মুনির শাপে ভস্ম হয়ে আছেন। তার উপর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত না হলে তাঁদের মুক্তি নেই। গঙ্গা বললেন, আমি নামব, কিন্তু পৃথিবীতে আমাকে ধারণ করবে কে? শিব। আকাশ থেকে গঙ্গা শিবের জটার ভিতরে নামলেন। কাজেই হরিদ্বার বললেও ঠিক, হরদোয়ার বললেও ঠিক। বৈষ্ণব ও শৈবরা এখন ঝগড়া করছেন, আগে করতেন না।

কেন?

তখন নাম ছিল গঙ্গাদ্বার। স্কন্দপুরাণে আছে:

গঙ্গাদ্বারসমং তীর্থং ন কৈলাসসমো গিরিঃ।
বাসুদেবসমো দেবো ন গঙ্গাসদৃশং পরম্॥

সাবিত্রী আমার মুখের দিকে চেয়েছিল বিহ্বলভাবে। বললুম: মানে বুঝেছ?

ভয়ে ভয়ে সে উত্তর দিল: না।

হেসে বললুম: গঙ্গাদ্বারের মত কোন তীর্থ নেই, আর কৈলাসের মত পর্বত। বাসুদেবের মত দেবতা নেই, আর গঙ্গার মত নদী।

মনোরঞ্জন বলে উঠল: তাহলেই দেখ, বাসুদেব হরির কথা এসে পড়ল।

বললুম: তার পরের শ্লোকটি শুনলে আর এ কথা বলবে না।

সাবিত্রী বলল : বলুন না গোপালদা।

বললুম : যে এই গঙ্গার ধারে পনের দিন শিবের চিন্তা করে, সে শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। এর বেশী আর কী বলব।

সাবিত্রী হাততালি দিয়ে উঠল : কাকাবাবু হেরে গেছেন।

কিন্তু মনোরঞ্জন হারবার পাত্র নয়। হরকি পৌড়িতে স্নান করতে গিয়ে কার কাছে শুনল যে এই ঘাটের দেওয়ালে একখানা পাথরের উপর বিষ্ণুর পায়ের ছাপ আছে। আর যায় কোথা। সাবিত্রীকে ডেকে বলল : দেখ এইবারে কার হার।

সাবিত্রীও হারবার মেয়ে নয়। করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : হেরে যাচ্ছি যে গোপালদা!

বললুম : এ ঘাটের নাম কী জিজ্ঞেস কর।

এর নাম তো হরকি পৌড়ি।

তার মানে শিবের ধাপ।

সাবিত্রী চেঁচিয়ে উঠল : হেরে গেছেন, হেরে গেছেন কাকাবাবু।

আমি ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে হরকি পৌড়ির রূপ দেখছিলুম। হিমালয় থেকে নেমে গঙ্গা সমতলভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বাম তীরে হিমালয়, দক্ষিণে হরিদ্বার। দক্ষিণেও পাহাড় আছে, তার নাম শিবালিক। রাস্তার ধার থেকেই এই পাহাড় ক্রমে ক্রমে উপরে উঠে গেছে। মাথায় যে মন্দির দেখা যাচ্ছে, তা মনসাদেবীর। স্থানীয় লোকের মুখে শুনেছিলুম যে এই মন্দির প্রায় দশো বছরের পুরনো। যাত্রীরা উপরে ওঠে। প্রতিমার তিন মাথা ও পাঁচ হাত দেখে আশ্চর্য হয়। পাশে দেবী অষ্টভূজা ও তাঁর ভৈরবের মন্দিরও দেখে। যারা বেশী সমর্থ, তারা পিছনে প্রায় আধ মাইল নেমে সূর্যকুণ্ড দেখে।

স্টেশন থেকে যে রাস্তা এসেছে, তা এই হরকি পৌড়ির পাশ দিয়ে হৃষীকেশ গেছে। এই পথের উপরেই রিক্শা থেকে নামতে হয়। তারপরে হেঁটে গঙ্গার ঘাট। এই ঘাট অনেক দূর পর্যন্ত বাঁধানো। হরকি পৌড়ির ঘাটে দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় সবটাই বাঁধানো। পারের উপর বড় বড় বাড়ি ধর্মশালা গায়ে গায়ে লেগে আছে। বেনারসের ঘাটের মত একটার পর আর একটা ঘাট নয়, এ যেন একটাই ঘাট। শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

হরকি পৌড়ির অবস্থান বড় বিচিত্র। চারিদিক বাঁধানো একটি জলাশয়ের মত মনে হবে। গঙ্গার ধারা এক ধার দিয়ে প্রবেশ করে অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মূল গঙ্গা ও হরকি পৌড়ির মাঝখানে প্রশস্ত ঘাট, তীরের বাঁধানো ঘাটের সঙ্গে পুল দিয়ে যুক্ত। এরই এক পাশে একটি উঁচু ঘন্টা-ঘর। আর দুটি পাথরের মূর্তি। এই পবিত্র পরিবেশে নেতাজীর মূর্তি দেখে আনন্দে মন ভরে যায়।

হরকি পৌড়ির মাঝখানটিকে ব্রহ্মকুণ্ড বলে। পুণ্যার্থীরা এই কুণ্ডে স্নান করেন। ঘাটে বসে সাধন ভজন করেন। ঘাটের উপরেই গঙ্গা গায়ত্রী রামচন্দ্র বদরীনাথ ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। কুণ্ডের জলের মধ্যে যে গোলাকার মন্দির, তা মহারাজ মানসিংহের ছত্রী। আকবর বাদশাহ তাঁর আজীবনের বিশ্বস্ত সেনাপতি মানসিংহের অস্থি এইখানে বিসর্জন করে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

হরকি পৌড়ির ঘাটে আমরা স্নান করলুম। পুরুষেরা এক দিকে, মেয়েরা অন্য দিকে। তাদের জন্য ঘাটের কিয়দংশ ঘিরে দেওয়া হয়েছে। পঁচিশ বছর আগে যাঁরা এই ঘাটে স্নান করে গেছেন, আজ তাঁরা এই স্থান চিনতে পারবেন না। এই ঘাটের উপরেও বড় বড় বাড়ি ছিল। সরকার নাকি সাত-আট লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেই বাড়িগুলো ভেঙে এই ঘাট নতুন করে গড়েছেন। অতীতে এই অপ্রশস্ত ঘাটে কুম্ভযোগ ও বৈশাখী মেলায় বহু লোকের প্রাণনাশ হত। বর্তমান ব্যবস্থা দেখে সবাই খুশী হবেন।

সন্ধ্যায় আমরা গঙ্গার আরতি দেখতে এই ঘাটে এসেছিলুম। তখনও সূর্যাস্তের কিছু দেরি ছিল। যাত্রীরা একে একে এসে জমা হচ্ছিলেন। ছোট ছেলেদের কাছ থেকে ময়দার গুলি কিনে মাছকে খাওয়াচ্ছিলেন। বড় বড় মাছ একেবারে সিঁড়ির কাছে এসে ময়দা খাচ্ছে, আর লেজের ঝাপটায় জল তোলপাড় করছে। পাঁচু বললে : আমরাও মাছকে খাওয়াব।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সাবিত্রী চেঁচিয়ে উঠল : ...পালদা, ঘুগনি !

...নের চোঙ দেখে পাঁচু লাফিয়ে উঠল : এগুলো ... গোপালদা ?

কুলফি।

ঘুগনির সামনে সাবিত্রী দাঁড়িয়ে গেছে, আর পাঁচু ...ফির সামনে। তারাপদ স্ত্রীর দিকে চেয়ে ভয়ে ... বললেন : এ সব খেলে যে অসুখ করবে—একেবারে ...লো—

মনোরঞ্জন বলল, কী আর হবে ! দাও এক-একটা।

সাবিত্রী আর আমি ঘুগনি নিলুম, আর সবাই নিলেন ...ফি।

কুলফি খেয়ে মিসেস মুখার্জি বললেন : মুখটা মিষ্টি ... গেল।—বলে তাকালেন মেয়ের দিকে।

মনোরঞ্জন বলল, এবারে একটা ঘুগনি নিন না।

সাবিত্রী বলল, আমরা কুলফি পাব না কাকাবাবু ?

আমি বললাম : পেতেই হবে।

...ক জায়গায় একদল ছেলেমেয়ে পড়ছিল। এক ...ার তাদের পড়াচ্ছিলেন। কথকতা হচ্ছিল আর ...ক জায়গায়, স্থির হয়ে কিছু লোক শুনছে। কখন ...র্যাস্ত হয়েছে আমরা খেয়াল করি নি। তাড়াতাড়ি ...কার হচ্ছিল। আমরা ফিরে এসে হরকি পৌড়ির ...ড়িতে বসলুম। জুতো নিয়ে ঘাটে নামতে মানা ...ল আমরা উলটো দিকে জায়গা পেলুম।

পাঁচু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : দিদি, দেখ্ দেখ।

যাত্রীরা পাতার ডালায় দীপ জ্বেলে জ্বেলে ব্রহ্মকুণ্ডের ...লে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। অস্বচ্ছ আলোয় আমরা যাত্রীদের ...ল দেখতে পাচ্ছি না, শুধু দীপের শিখা দেখছি ...লের উপর, স্রোতের টানে ভেসে ভেসে গঙ্গার দিকে ...লে যাচ্ছে। একটা দুটো নয়, অসংখ্য দীপ। মানুষের ...কাঙ্ক্ষার যেমন শেস নেই, তেমনি এক একটি ...সনার জন্য এক একটি দীপ জ্বেলে গঙ্গায় ভাসিয়ে ...চ্ছে। এ দৃশ্য আর কোথায় দেখেছি, সহসা মনে ...ড়ল না।

অন্ধকার আরও গভীর হলে আরতি শুরু হল। ...গার আরতি। ব্রাহ্মণেরা ধূপ দীপ কর্পূর নিয়ে আরতি শুরু করলেন। কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনিতে চারিদিক মুখর হল। সমস্ত যাত্রী স্তব্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। আলো, আরও আলো। ব্রাহ্মণদের হাতের আলোয় যেন আগুন লেগেছে। জলের উপর তার প্রতিবিম্ব দুলে উঠল। অপূর্ব দৃশ্য। এ দৃশ্যের যেন তুলনা নেই। বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হয়ে গেলুম।

যখন সেই আলো নিবল, তখন আমাদের সম্বিৎ এল ফিরে।

সমস্ত হরিদ্বারে আমরা এমন দৃশ্য আর দেখি নি। দুপুরবেলায় আমরা শহর দেখতে বেরিয়েছিলুম। তিনখানা রিকশ ভাড়া করে প্রথমে গিয়েছিলুম কনখলে। মাইল দুই দক্ষিণে গঙ্গার তীরে এই পবিত্র স্থান। প্রবাদ আছে যে মহারাজা দক্ষ প্রজাপতির রাজধানী ছিল এইখানে। বিখ্যাত দক্ষযজ্ঞ এইখানেই হয়েছিল। সেই যজ্ঞের কথা কার না জানা আছে। শিবকে তাঁর শ্বশুর দক্ষ অপমান করেছিলেন। অপমান নয়, সম্মান করেন নি। একবার তাঁকে আসতে দেখে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আসুন আসুন। শিব নির্বিকার বসেছিলেন। এই রাগ। তাই নিজের যজ্ঞে জামাইকে নিমন্ত্রণ করলেন না। এত বড় যজ্ঞ, স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সবাই নিমন্ত্রিত। সতী বললেন, আমিও যাব। কিন্তু নিমন্ত্রণ কোথায়! বাপের বাড়ি যাব, তার জন্যে আবার নিমন্ত্রণের কী দরকার! শিব বললেন, দরকার আছে। সতী যাবেনই, আবার স্বামীর মত নিয়েই যাবেন। তাই একে একে দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করতে লাগলেন। শিব ভয় পেলেন, দু চোখ ঢেকে বললেন, আর নয়, তুমি যাও।

সেই সতী বাপের বাড়ি এসে প্রাণত্যাগ করলেন। এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। তাঁর স্বামী বাঘছালপরা জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, গলায় সাপ জড়িয়ে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান। তাই বলে স্বামীর নিন্দা স্ত্রী হয়ে সইতে হবে! সতীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছল কৈলাসে শিবের কাছে। শিব ক্ষেপে উঠলেন, তাঁর ক্রোধ থেকে বীরভদ্রের জন্ম হল। সেই বীরভদ্র এই কনখলে এসে দক্ষের মাথা কেটে যজ্ঞ পণ্ড করলেন।

শিবের ক্রোধ কমল, তিনি দক্ষের প্রাণ দিলেন।

তারপর লোকে অধীর হয়ে সতীর দেহ কাঁধে করে পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করলেন। দেবতারা প্রমাদ গণলেন। বিষ্ণু এসে তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। দেহের এক এক অংশ এক এক জায়গায় পড়ে এক একটি পীঠস্থান হল। হরিদ্বার কোন পীঠস্থান নয়। সতীর দেহের কোন অংশ এখানে পড়ে নি।

কনখলে এখন দক্ষের একটি মন্দির আছে। গঙ্গার ধারে ছায়াশীতল পরিবেশের মধ্যে এই মন্দির। দক্ষেশ্বর মহাদেবও আছেন। শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার এখানে মেলা বসে।

কনখলের আর একধারে একটি কুণ্ড আছে। তার নাম সতীকুণ্ড। স্থানীয় লোকেরা বলে যে এই কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েই সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। ধর্ম বিশ্বাসের কথা। বুকে এই বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বেঁচে আছে।

এখান থেকে আমরা গুরুকুল কাংড়ী দেখতে গিয়েছিলুম। এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০২ সনে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এটি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকার এটি অনুমোদন করেছেন। স্টেশন থেকে মাইল চারেক দূরে গুরুকাল কাংড়ী একটি দ্রষ্টব্য স্থান। অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলি অট্টালিকা। শুনলুম, এখানে প্রধান কলেজ মাত্র চারটি। তাদের নাম আদর্শ কলেজ, বেদবিদ্যালয়, আয়ুর্বেদ কলেজ ও কন্যাগুরুকুল। ছোটখাটো একটি জাদুঘরও আছে। ছয় থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত বালকদের এখানে ভর্তি করা হয়। চব্বিশ বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচারী থেকে এরা গুরুর কাছে অধ্যয়ন করে। এখন শুধু বেদবেদান্ত নয়, পাশ্চাত্ত্য দর্শন রাজনীতি ও অর্থনীতিও শেখানো হয়।

যাতায়াতের পথে আমরা মায়াপুর দেখেছিলুম। হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যে অবস্থিত এটি একটি প্রাচীন স্থান। কিছু ধ্বংসাবশেষ নাকি এখনও আছে। লোকে বলে তা পৌরাণিক যুগের রাজা বেনের জীর্ণ দুর্গের চিহ্ন। মায়াপুরে এখন গঙ্গার উপরে নতুন বাঁধ হয়েছে। লোকে তার উপর হাওয়া খেতে যায়, জীর্ণ দুর্গ আর দেখতে যায় না।

এই মায়াপুর দেখে আমার একটি অনেকদিনের কৌতূহল নিবৃত্তি হল। দক্ষিণ-ভারতের তীর্থদর্শনের সময় একটি শ্লোক শুনেছিলুম।—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী তথা সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

এই মায়া কোন্ শহরের নাম তা জানা ছিল না। এখন আর সন্দেহ রইল না যে হরিদ্বারই এই শ্লোকের মায়া বা মায়াপুর। পুরাকালে যে এটি সমৃদ্ধ শহর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মায়াদেবীর মন্দিরের গায়ে যে শিলালিপি আছে, তাতে জানা যায় যে মন্দিরটি দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীর। তার আগেরও অনেক মুদ্রা মাটির নীচে পাওয়া গেছে। একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। হিউএন চাঙ যখন এখানে এসেছিলেন তখন এই জায়গার নাম ছিল মায়াপুর। তিনি বলেছিলেন মো-য়ু-লো।

বিল্বকেশ্বর মহাদেবের স্থান স্টেশন রোডের কাছেই একটি ছায়াঘন পরিবেশে বেলগাছের নীচে এই শিবের মন্দির।

হরকি পৌড়ির দক্ষিণে আর একটি তীর্থ আছে, তার নাম কুশাবর্ত তীর্থ। এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ শোনা যায়। ঋষি দত্তাত্রেয় এইখানে গঙ্গার তীরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে দশ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। একসময়ে গঙ্গা স্ফীতা হয়ে ঋষির দণ্ড বস্ত্র ও কুশ ভাসিয়ে নিয়ে যা[illegible]র চেষ্টা করেন। কিন্তু ঋষির তপস্যার প্রভাবে ব্যর্থ হন। সেই জিনিসগুলি গঙ্গার জলে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা এসে বাধা দেন। ঋষি বললেন, যদি তোমরা এই তীর্থে সারাক্ষণ বিরাজ কর, তাহলেই আমি অভিশাপ দেব না। দেবতারা বললেন, তথাস্তু। সেই থেকে এই স্থানের নাম হল কুশাবর্ত তীর্থ

শ্রমণনাথ মহাদেবের মন্দির এই তীর্থেরই নিকটে। মহাদেবের মূর্তি পঞ্চমুখ। শঙ্খ-পাথরের বিরাট নন্দীশ্বর মূর্তি। শ্রমণনাথ এক সাধুর নাম। তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তাঁর নামেই মহাদেবের নাম। এই সাধুর নামেও অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার নাকি তিনি ভাণ্ডারা করেন। সন্ন্যাসী অতিথিরা

হার করবে। বিরাট আয়োজনে ঘি কম পড়ে গেল। দের মাথায় বজ্রাঘাত। স্বামীজীকে বলতেই তিনি লেন, গঙ্গার কাছে চেয়ে নাও। কী আশ্চর্য ব্যাপার! রা গঙ্গার তীরে পৌঁছতেই আকাশবাণী হল, টিন র্তি করে নাও। গঙ্গার জল থেকে ঘি উঠল।

গঙ্গার অপর পারে নীল পর্বত। এই নাম কেন হল, রও একটি কাহিনী আছে। অবন্তিকাপুরের এক রের নাম অশ্বচিত্র। কঠিন দারিদ্র্যের জন্য সে চুরি তে শুরু করে। একদিন সে চুরি করবার জন্য মায়াপুরে সে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু এই স্থানের প্রাকৃতিক ন্দর্য দেখে সে মুগ্ধ হল, আধ্যাত্মিক ভাবে মন তার রে গেল। তারপর এই পাহাড়ে উঠে সে মহাদেবের ধ্যানে মগ্ন হল। অনাহারে অনিদ্রায় কাটল সাত দিন ত রাত। শেষ পর্যন্ত মহাদেব তাকে দর্শন দিলেন, লকণ্ঠ মহাদেব। বর দিলেন যে তাঁর নামে এই পর্বতের ম নীল পর্বত হবে, আর অশ্বচিত্রের নামও এই সঙ্গে ক হয়ে থাকবে।

ছ মাইল দূরে এই পাহাড়ের উপরে আমরা উঠি সাত-আট মাইল দূরে গঙ্গার ধারে আর একটি হাড়ের উপর চণ্ডীদেবীর মন্দির। সেখানেও আমরা ই নি। ভীমগোড়া ও সপ্ত সরোবর হৃষীকেশ থেকে রার পথে দেখব বলে স্থির করা হয়েছিল। মগোড়ার কুণ্ড ও মন্দির হরকি পৌড়ির খুবই নিকটে। নিকটা দূরে সপ্ত সরোবর। গঙ্গা এখানে সাত ধারায় বাহিত হয়ে আবার মিলিত হয়েছেন। পুরাকালে প্তঋষি এখানে তপস্যা করেছিলেন। আর কুরুক্ষেত্র দ্ধের পরে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর এখানে দেহত্যাগ রেছিলেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের নামে ভীমগোড়া ম। ভগীরথ যখন স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনলেন, তখন ঙ্গাকে পথ দেখাবার জন্য ভীম এখানে অপেক্ষা রেছিলেন। তাঁরই ঘোড়ার খুরে এই কুণ্ড তৈরি য়েছে।

গঙ্গার নামে আমার কপিল মুনির নাম মনে পড়ল। কান সময় এই স্থানেরই কপিলা নাম ছিল। এখন শুধু পিলস্থান আছে।

গঙ্গার আরতি দেখে ধর্মশালায় ফেরার পথে সাবিত্রীকে আমি বললুম: তাহলে এই শহরের নাম কী সাব্যস্ত হল—হরিদ্বার না হরদ্বার?

সাবিত্রী বলল: হরদ্বার।

মনোরঞ্জন বলল: হরিদ্বার।

পাঁচু বলল: আমি বলব গোপালদা?

বল।

গঙ্গাদ্বার।

তারাপদবাবু বললেন: পাঁচুই ঠিক বলেছে। এখানে হরি নয়, হরও নয়, এখানে গঙ্গা। গঙ্গার চেয়ে বড় এখানে কিছু নেই।

ভীষ্মের পিতামহ রাজা প্রতাপের কথা আমার মনে পড়ল। এই গঙ্গাদ্বারে তিনি যখন তপস্যায় রত ছিলেন, তখন গঙ্গা মোহিনী কন্যারূপে এসে তাঁর দক্ষিণ উরুতে বসেছিলেন। অভিশপ্ত অষ্টবসুকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে মা হতে হবে, তাই তিনি রাজার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। গঙ্গাকে প্রতীপ যে উত্তর দিয়েছিলেন, অতি অপূর্ব। তিনি বললেন, বরাঙ্গনা, তুমি আমার দক্ষিণ উরুতে বসেছ। এই উরু সন্তানের জন্য, পুত্রবধূর জন্যও। প্রিয়ার জন্য পুরুষের বাম উরু। তুমি সেখানে বস নি। আমি তোমার দিকে প্রেমিকের চোখে তাকাব না, তোমাকে আমার পুত্রবধূ হবার জন্য অনুরোধ করব।

ঋষি ভরদ্বাজের সঙ্গে স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচীর সাক্ষাৎ হয়েছিল এই গঙ্গাদ্বারে। পাণ্ডব ও কৌরবের গুরু দ্রোণাচার্য তাঁদেরই সন্তান।

তারপর অর্জুনের কথা। এই গঙ্গাদ্বারে তীর্থ করতে এসেই তিনি নাগরাজকন্যা উলুপীর কাছে বাঁধা পড়েছিলেন। একদিন যখন তিনি গঙ্গাস্নান করছিলেন, তখন উলুপী তাঁকে টেনে নিয়ে চলে যান। দীর্ঘদিন অর্জুন নাগরাজের প্রাসাদে ছিলেন। উলুপীকে বিবাহ করে সংসার করেন। তারপর এইখানে আবার ফিরে আসেন। ব্রহ্মচারী অর্জুনের সঙ্গে উলুপীর কথোপকথন আমার মনে পড়ল। কিন্তু মিসেস মুখার্জীর মনে পড়ল অন্য কথা। তিনি বললেন: হরিদ্বার বলতে আমরা কুম্ভমেলা বুঝি।

কথাটা মিথ্যা নয়। এখানে কোন দেবতাকে নিয়ে উৎসব হয় না, উৎসব হয় কুম্ভযোগের। কুম্ভের কথা

জানতে হলে পুরাণের কথা জানতে হয়। অমৃতমন্থনের কথা।

সমুদ্রের নীচে অমৃতের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেবাসুরের যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হল। বিষ্ণু হলেন কূর্ম, মন্দার পর্বত তাঁর পিঠে স্থাপিত হল, বাসুকি হলেন রজ্জু। অসুরেরা মুখের দিকে ও দেবতারা লেজের দিকে ধরলেন। সমুদ্র মন্থন শুরু হল। প্রথমে লক্ষ্মী উঠলেন। রূপমুগ্ধ দেবাসুর বললেন, কে এই দেবী? বিষ্ণু বললেন, ইনি আমার মত ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি, আমার মায়া প্রিয়া অনন্তা, সমস্ত জগৎকে ধারণ করে আছেন। সুতরাং ভাগাভাগির প্রশ্ন নেই। উঠলেন উর্বশী, তিনি হলেন ইন্দ্র-সভার সুন্দরী। উঠল ঐরাবত, দেবরাজ ইন্দ্র তা পেলেন। পারিজাতও গেল স্বর্গের নন্দন-কাননে। অসুরদের ভাগে কিছুই পড়ছে না, তবু খাটছে অমৃতের জন্য। শেষ পর্যন্ত সেই অমৃত উঠল, চতুর্দশ সামগ্রী। একটু-আধটু নয়, পূর্ণকুম্ভ অমৃত। দেবাসুরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই অমৃত খেয়ে অমর হতে চান। ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত সেই কুম্ভ নিয়ে পালালেন। পিছনে অসুর। বারো দিন তাঁরা হাত বদল করে অমৃত রক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত অসুরদের পরাস্ত করে দেবতারা অমৃত খেলেন চেটেপুটে। কিন্তু মর্ত্যের ভাগ্যে ছিল চার ফোঁটা। কুম্ভ নিয়ে কাড়াকাড়ির সময় ভারতের চার জায়গায় সেই অমৃত পড়েছিল—হরিদ্বার প্রয়াগ নাসিক ও উজ্জয়িনীতে। দেবতাদের বারো দিন পৃথিবীর বারো বছর। তাই বারো বছর পর পর এই সব স্থানে কুম্ভযোগ হয়। ১৯৫০ সনে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়েছে, তারপর হয়েছে ১৯৬২ সনে।

শুনেছি সে এক অদ্ভুত যোগ। এদেশে যে এত সাধু সন্ন্যাসী আছেন, না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে কতশত সম্প্রদায়ের সাধু এসে এখানে সমবেত হন গঙ্গায় কুম্ভস্নানের জন্য। শঙ্করাচার্য এই সাধুদের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। তাঁদের নাম সরস্বতী পুরী বন তীর্থ গিরি পর্বত ভারতী অরণ্য আশ্রম ও সাগর। কুম্ভযোগে অনেক যাত্রী এই সব সাধুর সাক্ষাতে আসেন। নগ্ন ও চীর পরিহিত সাধুরা শোভা-যাত্রা করে চলেন সকলের আগে। নানা সম্প্রদায়ের সাধু ও সজ্জন। সকলের শেষে সাধারণ যাত্রী। ধীরে ধীরে সেই বিরাট শোভাযাত্রা গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছবে। কুম্ভযোগে স্নান করবে গঙ্গার জলে, তারপর অন্য পথে ফিরে যাবে। এই মাহাত্ম্যই হরিদ্বারের মাহাত্ম্য, গঙ্গার মাহাত্ম্য, গঙ্গাই হরিদ্বারের একমাত্র দেবতা। আমরা তাই গঙ্গার আরতি দেখি।

আমার সামনের দিগন্ত এখনও আগুনে লাল হয়ে আছে।

সাতাশ

পরদিন সকালেই আমরা হৃষীকেশ যাত্রা করলুম। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ পর্যন্ত শাখা লাইন ট্রেন আছে, কিন্তু আমরা ট্রেনে গেলুম না। শহর থেকে বাস চলে। সময়ের কোন ঠিক নেই, যাত্রী ভরলেই এক-একখানা বাস ছাড়ে। চোদ্দ মাইল পথ ট্রেনে যাবার যেমন আরাম আছে, তেমনি শহরের মধ্য দিয়ে বাসে যাবারও একটা আনন্দ আছে। পথে সাত মাইলে সত্যনারায়ণের মন্দির আছে, সেখানে বাস দাঁড়ায়। হৃষীকেশের বাজারে না থেমে লক্ষ্মণ ঝুলার পুল পর্যন্ত নিয়ে যায়। ট্রেনে এসে স্টেশনে নামলে এই পথটুকুর জন্য টাঙ্গা ভাড়া করতে হয়।

যদি কোন যাত্রী সমগ্র উত্তরাখণ্ড দেখতে চান তো তাঁকে বারে বারে কোন একটি স্থানে ফেরার দরকার নেই। মসুরি থেকে যমুনোত্রী, [illegible]বান থেকে গঙ্গোত্রী কেদার ও বদরীনাথ হয়ে মানসসরোবর ও কৈলাস চলে যেতে পারেন। ফিরবেন আলমোড়ার পথে। তা না হলে এই হৃষীকেশ তো আছেই। বাসে উঠেই পায়ে চলার পরিশ্রম অনেক পরিমাণে লাঘব করা যায়। একযোগে এই চারটি তীর্থ পরিক্রমা করতে প্রায় পৌনে সাতশো মাইল অতিক্রম করতে হয়।

সাত মাইল অতিক্রম করে আমাদের বাস এসে সত্যনারায়ণের মন্দিরের সামনে দাঁড়াল।

মনোরঞ্জন বলল: হৃষীকেশ দেখা আমাদের হবে না।

কেন?

হৃষীকেশের বাস বাজারে অল্পক্ষণ দাঁড়ায়।

আমরা তো হৃষীকেশেই যাচ্ছি।

মনোরঞ্জন বলল: না, এই বাস লছমনঝুলা যাবে।

তাহলে তো আরও ভাল। আমাদের একেবারেই
ইতে হবে না।

কিন্তু এতবড় একটা তীর্থস্থান আমাদের দেখা
ব না!

কী দেখবার আছে, খবর নিয়েছ?

নিয়েছি বইকি। ভারতের প্রাচীন মন্দির। বাবা
লীকমলীওয়ালার পঞ্চায়েতী সত্র, পাঞ্জাবী ও সিন্ধী
. ধর্মশালা—

আমি হেসে ফেললুম।

মনোরঞ্জন রেগে উঠল, বলল: হাসছ যে?

পিছন ফিরে সাবিত্রী বলল: ধর্মশালা আবার কেউ
খ নাকি কাকাবাবু!

সেও হাসছিল।

কালীকমলীওয়ালার নাম আমরা সকলে জানি না।
া বিশুদ্ধানন্দজী সারাক্ষণ কালো কম্বল গায়ে দিতেন
 লোকে তাঁকে কালীকমলীওয়ালা বলত। তাঁরই
ম প্রতিষ্ঠান। এদের ধর্মশালার সংখ্যা নব্বই, সদাব্রত
শ, মন্দির চিকিৎসালয়, গোশালা, অনাথ আশ্রমের
খ্যা নেই।

মনোরঞ্জন গম্ভীর হয়ে গেল। আর কোন কথা
ল না।

লছমনঝুলায় বাস থেকে নেমে আমরা গঙ্গার ধারে
স দাঁড়ালুম। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ভাগীরথী
 বয়ে আসছে। নীচে জলের ধারা, উপরে ঝোলানো
। লোহার তার দিয়ে দু ধারের পাহাড়ের সঙ্গে
া এই লোহার পুলটির নামেই এই স্থানের নাম।
ারে যেমন মন্দির ও ধর্মশালা আছে, ও-ধারেও
নি।

এ পারের মন্দিরগুলো দেখে আমরা পুলের উপরে
লুম। মনে হল, পুলটা অল্প অল্প দুলছে। মাঝখানে
কজন দাঁড়িয়ে পুলটা দোলাবার চেষ্টা করছেন।
নারঞ্জন বলল: একজন লেখক এই পুলকে ক্যান্টিলিভার
জ বলেছেন।

বললুম: কলকাতার পুলকে ক্যান্টিলিভার বলে
নছি।

দুটো কি একই রকমের পুল?

না। দুটোর কোনটার নীচেই থাম নেই সত্যি, কিন্তু
ব্যবস্থা অন্যরকম। কলকাতার অতবড় পুল দুটো পায়া
আর নিজের ওজনের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। এই ছোট
পুল দেখছি লোহার দড়ি দিয়ে ঝোলানো।

তাহলে এটাকে কী পুল বলবে?

আমি ইঞ্জিনীয়ার নই, এর বেশী আমাকে জিজ্ঞাসা
করো না।

পুল পার হয়ে আমরা ছোট ছোট মন্দিরগুলি
দেখলুম। তারপর অগ্রসর হলুম স্বর্গাশ্রমের দিকে।
লছমনঝুলায় লক্ষ্মণের মন্দিরটি সবচেয়ে ভাল দেখলুম।
হৃষীকেশে ভরতের মন্দির, এখানে লক্ষ্মণের, দেবপ্রয়াগে
শুনলুম রামচন্দ্রের মন্দির। ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমে
দেবপ্রয়াগ। এই মনোরম স্থানে রামের বিশাল শ্যামবর্ণ
মূর্তি যাত্রীরা দু চোখ ভরে দেখে। শত্রুঘ্নের মন্দির
কোথায় আছে জানি না।

হিমালয়ের পাদদেশে রামচন্দ্র বোধ হয় রাবণবধের
পাপস্খলনে এসেছিলেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জানবার
মত কোন পণ্ডিত মানুষ সঙ্গে নেই।

বাসেরই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেছিলেন, সেখানে
গঙ্গায় নৌকো পাওয়া যায়। এপারে কৈলাস আশ্রম,
ওপারে স্বর্গাশ্রম। শিবানন্দ স্বামীর আশ্রম ও গীতাভবন।
তিনি নৌকোয় পার হয়ে গীতাভবনে যাবেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলুম: দেখা হবে তো সেখানে?

উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন: তাঁর ইচ্ছা।

লছমনঝুলায় আমরা একজন গাইড পেয়েছি। সে
ছোকরা নাছোড়বান্দা। আমাদের সে সব কিছু
দেখাবেই। পয়সা না দিলেও দেখাবে। মনোরঞ্জনের
তাড়া খেয়েও সামনে সামনে চলতে লাগল। শেষ
পর্যন্ত রফা হল। সে পাঁচ টাকা থেকে পাঁচ সিকেয়
নামল, মনোরঞ্জন পাঁচ আনা থেকে এক টাকায় উঠল।
সে আমাদের লছমনঝুলার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাবে, সঙ্গে
সঙ্গে স্বর্গাশ্রম যাবে, স্নান-আহারের ব্যবস্থা করে দিয়ে
গীতাভবন প্রভৃতি স্থান দেখিয়ে নৌকোয় তুলে দেবে।

সে বলেছিল: বলেন তো ওপারে গিয়ে বাসেও তুলে
দিয়ে আসতে পারি।

মনোরঞ্জন ধমক দিয়েছিল : তার জন্তে তো আবার পয়সা চাইবে! যথেষ্ট হয়েছে।

সে আর কথা বলে নি। মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরের নাম, দেবতার নাম বলেছে। আমাদের দর্শনের পর আবার নিঃশব্দে চলেছে আগে আগে।

দেবপ্রয়াগের কথা আমি এই ছেলেটির কাছেই শুনেছিলুম। সে নিশ্চয়ই সেখানে গেছে, হয়তো কেদার-বদরীও ঘুরে এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করে হয়তো আরও কিছু জানা যাবে। আমি তাই এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললুম।

ছেলেটি বলল : এই রাস্তাটি বেশ ভাল, তাই নয় বাবুজী! গাছের ছায়ায় চলতে একটুও কষ্ট হয় না।

বললুম : গঙ্গার বাতাসও পাওয়া যাচ্ছে।

কয়েক পা এগিয়ে বললুম : তুমি তো দেবপ্রয়াগ দেখেছ, কেদার-বদরী যাও নি?

দুবার গিয়েছি।

বললুম : সাবাস। তাহলে তো তোমার অনেক পুণ্য হয়েছে।

ছেলেটি গদগদ হয়ে বলল : আপনারা যান নি?

কই আর যাওয়া হল! খুব ভাল জায়গা বুঝি?

একবার গেলে বারে বারে যেতে ইচ্ছে করে।

সেই একই কথা। সবাই এই কথা বলে। বললুম : আর কষ্ট?

কষ্ট এমন কী! আর আপনারা পায়ে হেঁটে কেন কষ্ট করবেন? এখান থেকে বাসে উঠে দেবপ্রয়াগে গিয়ে নামবেন। কালীকমলীওয়ালার ধর্মশালায় উঠে হরিকুণ্ডে স্নান করবেন, রঘুবীরের পুজো দেবেন। তারপর অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম দেখে আবার বাসে উঠবেন। টেহরীর বাসে উঠলে ভাগীরথীর তীরে তীরে আপনাকে যমুনোত্রী গঙ্গোত্রীর দিকে নিয়ে যাবে। আপনি রুদ্রপ্রয়াগের বাসে উঠে মন্দাকিনীর তীরে তীরে সোজা চলে যাবেন। কীর্তিনগর আর শ্রীনগর রাস্তা থেকেই দেখে নেবেন।

রুদ্রপ্রয়াগে এক রাত্রি ধর্মশালায় থাকবেন। জায়গাটি আপনার ভাল লাগবে। অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম দেখবেন, আর রুদ্রনাথজীর পুজো করবেন। কেদারনাথ এখান থেকে আটচল্লিশ মাইল, আর বদরীনাথ অষ্টআশি মাইল। কুণ্ড পর্যন্ত একশো মাইল পথ আপনি মোটরে যাবেন, দেড় মাইল হেঁটে গুপ্ত কাশী। তারপর মন্দাকিনী পার হয়ে দু মাইল দূরে উখীমঠ। এইখান থেকে বদরীনাথের রাস্তা ডান হাতে।

কেদারনাথে যাবার মাঝপথে আপনি ত্রিযুগীনারায়ণের বিশাল মন্দির দেখবেন। নারায়ণের নাভি থেকে জল বেরিয়ে বাইরের কুণ্ডে গিয়ে পড়ছে। কুণ্ড এখানে চারটি—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও সরস্বতী কুণ্ড। সরস্বতী কুণ্ডের ভিতরে ছোট ছোট সোনালী রঙের সাপ আছে, কিন্তু কাউকে কামড়ায় না। এক জায়গায় একটা ধুনী জ্বলছে, সবাই সেখানে হোম করে। কতদিনের পুরনো আগুন জানেন?

না।

হরপার্বতীর বিবাহের সময় থেকে এই আগুন জ্বলছে।

সত্যি!

ব্রাহ্মণেরা মিথ্যা কেন বলবে!

আমি দেখলুম, এই ছেলেটি এই কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। তার মনে কো[illegible]সন্দেহ কোনদিন জাগে নি। আমি তার বিশ্বাসে [illegible]ঘাত না দিয়ে বললুম: তারপর?

তারপর কেদারনাথ। এই মন্দির কে তৈরি করে[illegible] জানেন?

না।

পঞ্চপাণ্ডব।

পঞ্চপাণ্ডব এই পথে মহাপ্রস্থানে গিয়েছিলেন জানি, দ্রৌপদী বদরীনাথ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি। বদরীনা[illegible] সহদেবের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু কেদারনাথে এই মন্দির নির্মাণের কথা কোথাও পড়ি নি। বললুম : এত পুরনো মন্দির?

ছেলেটি বলল : বোধ হয় ভেঙে গিয়েছিল, কে[illegible] মেরামত করে দিয়েছেন।

তাই হবে।

কেদারনাথের মন্দির আপনার খুব ভাল লাগবে। একেবারে পিছনেই বরফের পাহাড়, রূপোর মত ঝকঝক করছে। মন্দিরের ভিতরে কিন্তু শিবলিঙ্গ নেই, [illegible]

র্ণের একখানি বিশাল শিলা। যাত্রীরা পূজোর পর আলিঙ্গন করছে, অনেকে কাঁদে মাথা ঠুকে। কেন কাঁদে বুঝি না।

বোধ হয় কষ্টে কাঁদে।

কষ্টের কথা তো কেউ বলে না! পুরাণ কী বলে জানেন? কেদারনাথ মহিষের পিঠের মত, দ্বিতীয় কেদার মধ্য মহেশ্বরের নাভির আকার, তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ ও কল্পেশ্বরে জটা। শীতকালে কেদারনাথের মন্দির বন্ধ থাকে, তাঁর পূজা হয় উখীমঠে।

উখীমঠ থেকে বদরীনাথের পথে তুঙ্গনাথ। খুব উঁচু জায়গা, আর খুব শীত। গাছপালাও বাঁচে না, কিন্তু দোকানদাররা ঠিক আছে। উপর থেকে চারিদিকে চেয়ে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। বরফের পাহাড় এত সুন্দর দেখায় কী বলব! অমৃত কুণ্ড কিংবা আকাশ কুণ্ডে স্নান করে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ দর্শন করে তাড়াতাড়ি নেমে আসবেন।

চামোলিতে এসে আপনি অলকনন্দা পাবেন। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বদরীনাথের পথে এই চামোলি। এইখানে আবার আপনি বাসে উঠবেন। আমরা গোলাপকোটি পর্যন্ত বাস দেখেছিলাম, আপনি এখন যোশীমঠ পৌঁছে যাবেন। হৃষীকেশ থেকে যোশীমঠ এখন একদিনে যাওয়া যায়।

যোশীমঠের নামে আমার শঙ্করাচার্যের কথা মনে পড়ল। প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে কোচিনের এক নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে জাতিস্মর ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আট বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দর্শনাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। কিছুদিন কাশীধামে বাস করে বদরীনাথে চলে যান। ষোল বছর বয়সে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সকল ধর্মের সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করে তাঁর নিজের অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা।

ভারতবর্ষের চারদিকে তিনি যে চারটি মঠ স্থাপন করেন, যোশীমঠ তার অন্যতম। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। হিমালয়কে তিনি প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন। ভালবেসেছিলেন সমুদ্রকেও। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়সে তিনি কোথায় চলে যান, কেউ তা জানে না। তাঁর শেষজীবন আজও রহস্যময় হয়ে আছে।

ছেলেটি বলল: এই যোশীমঠে বদরীনাথজীর গদি আছে। শীতকালে তাঁর চলমূর্তি এখানে এনে পূজো করা হয়। এখানে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে, আছে নবদুর্গা ও গণেশের মন্দির। এক জায়গায় দ্রৌপদীর একটি কালো পাথরের মূর্তিও আছে।

দ্রৌপদী কি তাহলে যোশীমঠে প্রাণত্যাগ করেন? কে জানে!

ছেলেটি বলল: যোশীমঠ থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগ। অলকনন্দা ও ধৌলি গঙ্গার সঙ্গম। কিন্তু সেখানে নামবার চেষ্টা করবেন না। একদিক থেকে নর ও আর একদিক থেকে নারায়ণ পর্বত এসে এইখানে মিলেছে। নদীতে নামবার সিঁড়ি দেখলেই আপনার ভয় করবে। ঘটিতে করে মাথায় জল ঢেলে বিষ্ণুর পূজো করে নেবেন।

তারপরেই বদরীবিশালজী। অলকনন্দার তীরে একটি ছোট শহর। সোনার মন্দিরের ভিতর বদরীনারায়ণের কালো পাথরের মূর্তি, মাথায় মুকুট, কপালে হীরা। দক্ষিণে কুবের ও গণেশের মূর্তি, বামে লক্ষ্মী ও নরনারায়ণ। গরুড় ও আরও অনেক মূর্তি আছে।

আমি কোনও বইয়ে পড়েছিলুম যে শঙ্করাচার্য এই অঞ্চলের নারদকুণ্ডে কতকগুলি দেবমূর্তি দেখতে পান। সেই সময় আকাশ-বাণী হয়। তিনি সেই আদেশ শুনে মূর্তিগুলি কুণ্ড থেকে উদ্ধার করে একটি বদরী গাছের নীচে স্থাপন করেন। বদরী মানে কুলগাছ। এই স্থানের নামই আদি বদরী।

ছেলেটি বলল: শুনে আপনি আশ্চর্য হবেন, কেদারনাথ ও বদরীনাথের সমস্ত পুরোহিত দক্ষিণ-দেশের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ।

আশ্চর্য! শঙ্করাচার্য কি তাঁর আত্মীয়দের এখানে এনেছেন, না তাঁরাই এসেছেন শঙ্করের অন্বেষণে!

খানিকটা পথ নিঃশব্দে অতিক্রম করবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম: তুমি গঙ্গোত্রী গেছ?

না। তবে গঙ্গোত্রীর কথা আমি শুনেছি। গঙ্গার

তীরে খুব বড় মন্দির, সামনে ভগীরথ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। পূজোর বাসনপত্র সব সোনার।

একটু থেমে বলল: গোমুখ গঙ্গোত্রী থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে, খুবই কঠিন পথ। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

পিছন থেকে সাবিত্রী বলল: এত কী গল্প হচ্ছে গোপালদা?

মনোরঞ্জন বলল: ওর লেখার খোরাক যোগাড় করছে।

তারাপদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: এরও নাম স্বর্গাশ্রম নয়? সাধুসন্ত তো দেখতে পাচ্ছি না।

ছেলেটি একটু দাঁড়িয়ে বলল: আছেন সবাই, কিন্তু যাত্রীদের সামনে বড় একটা বেরোন না।

আমার এক প্রাচীন ভ্রমণ-কাহিনীর কথা মনে পড়ল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দুর্গাচরণ রক্ষিত এই সম্বন্ধে লিখেছিলেন: অখিল ভারতে এমন স্থান আমি দ্বিতীয় দেখি নাই। ভারতীয় তীর্থে অধিকাংশ স্থান পবিত্রতাশূন্য। সর্বত্রই লোকালয় হইয়াছে। এখানকার তপোবনে প্রবেশ করিলে সন্ন্যাসীদিগকে প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী বলিয়া ধারণা হয়।

আমরা কোন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেলুম না, বরং আরও খানিকটা এগিয়ে লোকালয় দেখতে পেলুম। ছেলেটি বলল: এইবারে আমরা গঙ্গার ধারে যাচ্ছি।

ডান হাতে একটা ভোজনালয় দেখে আমরা এগিয়ে গেলুম। সামনেই গঙ্গার ঘাট বাঁধানো। আমার কাঁধে ঝোলার ভিতর কাপড় গামছা ছিল, অন্য সকলেরও ছিল দু-তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে খানিকটা ক্লান্তি এসেছিল, ক্ষুধাও পেয়েছিল। স্নান করতে আমরা বিলম্ব করলুম না। কী ঠাণ্ডা কনকনে জল! হাত পা যেন কেটে যাচ্ছে। কিন্তু কয়েকটা ডুব দেবার পর আর কোন কষ্ট রইল না। শরীর সুস্থ হল, স্নিগ্ধ হল, সমস্ত ক্লান্তি গেল দূর হয়ে। গা হাত পা মুছতে মুছতে মনোরঞ্জন বলল: আপনারা আসুন, আমরা এগোচ্ছি।

পাঁচু আমাদের সঙ্গে এল। তারাপদবাবুরা পরে এসে ভোজনালয়ে ঢুকলেন।

বিশুদ্ধ ঘিয়ের খাবার। দেরাদুনের বাঁশমতী চালের ভাত, ঘি মাখানো রুটি, ডাল তরকারী ও দই। খেয়ে সবাই তৃপ্তি পেলুম।

তারপরে আমরা গীতাভবন দেখতে গেলুম। গঙ্গার ধারে ধারে এখন অনেক নতুন সৌধ নির্মিত হয়েছে। গোরখপুরের গীতা প্রেসের মাড়ওয়ারীরা এই গীতাভবন নির্মাণ করেছেন। বাসস্থান ও ধর্মালোচনার জন্য এই গীতাভবন।

সবাই যখন ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখছিলেন, আমি খুঁজছিলুম বাসের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে। এক জায়গায় ঘাসের উপরে কয়েকজনকে দেখতে পেলুম। রোদ্দুরে বসে তাঁরা কিছু আলোচনা করছিলেন। আমি এগিয়ে গেলেই পরিচিত ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলুম।

তিনিও আমাকে চিনলেন। বললেন: কেমন দেখলেন সব?

সংক্ষেপে বললুম: ভাল।

এইখান থেকে কি মসুরি যাবেন?

কেন বলুন তো?

পরক্ষণেই আমার মনে হল, তিনি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন। বোধ হয় সেখানে কোন আত্মীয় কিংবা বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব। জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি কি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন?

ততক্ষণে মনোরঞ্জনও সেখানে এসে পড়েছিল। আমার প্রশ্ন শুনে বিস্ময়ে বুঝি হতবাক হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন: না না, যেতে আমি বলব কেন? আমি এমনিই এ কথা বললাম।

আমাদের নৌকোয় তুলে দিয়ে সেই ছেলেটি বিদায় নিল। আমার কাছে সে বোধ হয় কিছু আশা করেছিল, কিন্তু আমি কিছু দেবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। মনোরঞ্জনের কথায় আমার খেয়াল হল। সে জিজ্ঞাসা করছিল: তুমি কি এবার মসুরি যাবে ভাবছ?

জানি না।

সত্যিই সেখানে কারও সাক্ষাৎ পাব কি না আমি জানি না। আমার আত্মীয় কোথায়? বন্ধুই বা কে? তবে কি স্বাতিরা এখন মসুরিতে আছে?

মনোরঞ্জন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : কপালে অনেক দুঃখ আছে।

দুঃখ তো সুখেরই ভূমিকা।

আটাশ

পরদিন সকাল সাড়ে ছটায় আমি হরিদ্বার ত্যাগ করলুম। তারাপদবাবুরা বিদায় দিয়েছিলেন ধর্মশালার দরজায়, মনোরঞ্জন এল স্টেশন পর্যন্ত। বলল : শুধু শুধু ঝামেলা পোয়াচ্ছ।

বললুম : ঝামেলা আর কী, একটা পাহাড়ে শহর দেখা হয়ে যাবে।

যাচ্ছ যাও, কিন্তু রাত্রিবাস কিছুতেই কর না। সঙ্গে একখানা কম্বল নেই, গায়ে জামা নেই—

এ কথা মিসেস মুখার্জিও বলেছিলেন।

সাবিত্রী আমাকে লুকিয়ে বলেছিল : মাসিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে একটা সোয়েটার কিনে নেবেন।

নেব।

আমার কথা নিশ্চয়ই বলবেন?

পরিমলের কথাও।

আপনি ভারি দুষ্টু। বলে সাবিত্রী পালিয়ে গিয়েছিল।

বিদায় দেবার সময় মিসেস মুখার্জি বলেছিলেন : ফিরে আসতে দেরি হবে না তো? আমরা অপেক্ষা করে থাকব।

আমি বলতে পারি নি যে আমার অপেক্ষা করবেন না, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। স্টেশনে মনোরঞ্জন যখন এই কথা বলল, তখন তাকে জানিয়ে দিলুম : আমাকে রেহাই দাও।

মনোরঞ্জন আশ্চর্য হয়ে বলল : কী বলছ তুমি!

বলছি এই কথা যে ভদ্রলোককে তুমি জানিয়ে দিয়ো ওঁরা যেন আমার অপেক্ষায় না থাকেন।

এই তোমার শেষ কথা?

হেসে বললুম : তোমার সঙ্গে নয়, তোমার সঙ্গে কথা আমার কোনদিন শেষ হবে না।

মনোরঞ্জন কী বলবে বোধ হয় ভেবে পেল না। গাড়ি ছেড়ে দিল।

কাল নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে আমরা বাস পাই নি। বাস সব সময় পাওয়া যায় না। দু-একখানা টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল, আর একখানা স্টেশন-ওয়াগন। একদল মানুষকে লছমনঝুলায় পৌঁছে দিয়ে সেইখানে অপেক্ষা করছিল। আমাদের মত গঙ্গা পেরিয়ে এলে হরিদ্বার ফিরবে। তারা পুরো গাড়িটা ভাড়া করেছিল। এই গাড়ির ড্রাইভার আমাদের হৃষীকেশ পৌঁছে দিতে রাজী হল, বলল : মাথা পিছু দু আনা লাগবে। তথাস্তু বলে আমরা সব উঠে পড়েছিলুম। হৃষীকেশ থেকে হরিদ্বারের বাস পেয়েছিলুম। সবাই যখন বাসের অপেক্ষা করছিলেন, আমি বেরিয়েছিলুম টুরিস্ট অফিসের খোঁজে। কাছেই একটা গলির ভিতর অফিস। সেখান থেকে দেরাদুন ও মসুরির ফোল্ডার সংগ্রহ করে নিয়েছিলুম।

আমি যে মসুরি যাবই এ কথা মনোরঞ্জনই প্রচার করেছিল। বলেছিল : মা মনসাকে শুধু একটু ধুনোর গন্ধের দরকার। হৃষীকেশ থেকে কেদার-বদরীর পথ দেখল, এবারে মসুরি থেকে দেখবে যমুনোত্রী গঙ্গোত্রীর পথ। তারপরেই দেখবে পুরাণসংহিতা—উত্তরাখণ্ড।

বলেছিলুম : ভয় নেই, আর যাই লিখি, এ পথের বর্ণনা লিখব না।

কেন?

মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব থেকে মহাপ্রস্থানের পথের বর্ণনা শুরু হয়েছে, এখনও শেষ হয় নি। কেউ ও পথ দেখে ঘুরে এসেই ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন, কেউ ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার জন্যেই ও-পথে যান। লেখেন সবাই।

তুমি না হয় না গিয়েই লিখবে—ইয়ারো আনভিজিটেড।

সে নজিরও আছে।

তারাপদবাবু বলেছিলেন : সত্যি নাকি?

এ সব শোনা কথা, অনুমানের কথা। পথের ভুল নির্দেশ দেখে অনেকে সন্দেহ করেছেন।

মনোরঞ্জন বলেছিল : একটা কথা কিন্তু সত্যি বলেছ।

মিথ্যাও কিছু বলেছি নাকি?

মনোরঞ্জন বলল : বাংলার ভ্রমণ-কাহিনী সব হিমালয়কে নিয়ে। অন্য স্থানের সম্পূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনী প্রায় না থাকারই মতন। অজন্তা ঘুরে এলাম, আর দেখে এলেম খাজুরাহো, এ সব প্রবন্ধের মত।

গ্রন্থ নেই বল না, সংখ্যায় কম বলতে পার।

ওই হল।

দেরাদুন এক্সপ্রেস যখন স্টেশনের এলাকা ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়ল, তখন আমি মনোরঞ্জনের কথা ভুলে গেলুম। একটা অনিশ্চিত অবস্থার আশঙ্কায় মন আমার দুলে উঠল। সত্যিই আমার সঙ্গে কোন গরম কাপড় নেই। হোটেলে হয়তো কম্বল পাওয়া যাবে, কিন্তু গরম জামা ভাড়া পাওয়া যাবে না। পকেটে এত পয়সাও নেই যে সাবিত্রীর পরামর্শ মত একটা সোয়েটার কিনতে পারি। কাজেই বিকেলের বাসে আমাকে ফিরে আসতেই হবে। মসুরিতে আমি কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় পাব। এই স্বল্প সময়ে আমি কী করতে পারি।

শুনেছি মসুরিতে মাত্র একটি রাজপথ শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি তাই হয়, তাহলে বিকেলবেলায় কোন এক জায়গায় অপেক্ষা করলে হয়তো তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। পাহাড়ে বেড়াতে এসে তারা নিশ্চয়ই ঘরে বসে থাকবে না, পথে বেরলেই দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তো বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। এই ট্রেন দেরাদুনে পৌঁছবে বেলা সোয়া নটায়, তারপরে বাসে চেপে মসুরি। সকাল-বেলায় পৌঁছতে পারলেও কিছু আশা ছিল।

পরক্ষণেই আমার হাসি পেল। আমি কী জন্যে এইসব ভাবছি। একজন অপরিচিত লোকের একটা বেয়াড়া বক্তব্যে আমি এত বিচলিত হয়ে পড়ছি। আমার কি সাধারণ বিচার-বুদ্ধিটুকুও লোপ পেল। আমি সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করলুম।

পার্বত্যভূমির উপর দিয়ে আমাদের ট্রেন চলেছে। তেত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে দু ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে। জীবনের গতির মত এই গাড়ির গতিও মন্থর।

বাইরে সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে আমার ভাল লাগল। একটা মুক্তির আনন্দ এল মনে। সাবিত্রীকে আমি বঞ্চনা করি নি, ছলনা করেছি আর সকলের সঙ্গে। সাবিত্রীর সঙ্গে আমার সহজ ব্যবহার দেখে তাঁরা নিশ্চয়ই অন্য কিছু সন্দেহ করেছেন, এই সন্দেহে দুর্ভাবনার বদলে ছিল প্রচুর আশ্বাস। আমার কাছে তাঁরা কোন প্রস্তাব করেন নি, আমিও সুযোগ পাই নি কোন উত্তর দেবার। মনোরঞ্জন মাঝখানে ছিল, আজ তাকে আমার মনের কথা জানিয়ে বেশ আরাম পাচ্ছি।

অনেকদিন আগে মনোরঞ্জন আমাকে নায়িকা বদলের পরামর্শ দিয়েছিল। এ হল বর্তমান যুগের কথা। পিছনের পায়ের চিহ্ন মুছে মুছে নতুন পথে চল, মনের পাতায় যেন কোন দাগ না পড়ে। অতীত শব্দটা অভিধান থেকে কেটে দাও, পার তো ভবিষ্যৎ শব্দটাও। ওই দুটো বিশ্রী শব্দের উপর দাঁড়িয়ে তুমি বর্তমানকে উপভোগ কর। কালচক্রে ভেসে যাবে জীবন যৌবন ধন মান। তাকে ধরে রাখ, বেঁধে রাখ। ওই কাঙাল মদ আকণ্ঠ পান করে সমাজে গড়াগড়ি দাও। লোকে বাহবা দেবে, লোকে পুজো করবে, জ্ঞান ফিরে না এলে শহীদ নামে অমর হবে।

আর হে অতীত, তুমি তোমার ঐতিহ্যের লজ্জা নিয়ে হিমালয়ের গুহার ভিতর মুখ লুকোও। অনেক শতাব্দীর পরাধীনতার পর ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে, তাকে তার গ্লানি ভুলতে দাও। স্বাধীন দেশের মত সেও পা বাড়াক। শুধু বিবাহের পূর্বে কেন বিবাহের পরেও তার নায়িকা বদলাক। নিজের রংও বদলাক প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

এই সমাজে তো প্রাণ নেই একটা হৃদয়হীন দেহ কোল্ড স্টোরেজে রাখা আছে। স্বাভাবিক আলো-বাতাসের ভিতর টেনে আনলে পচে দুর্গন্ধ বেরবে। হৃদয়হীন দেহকে ভোগের বস্তু ভাবে নির্বোধ প্রাণী। বুদ্ধিকে আমরা সভ্যতার নামে বলি দিয়েছি, হৃদয়কে বাদ দিয়েছি বিজ্ঞানের নামে।

একদিন দিল্লীতে চাওলা একটা পুরনো গল্প বলেছিল। তার এক বন্ধুর গল্প। অনেক চেষ্টায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে আসতে পেরেছিল। যিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি একটা উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, একজন বড় ডাক্তারকে ব্রেনটা দেখিয়ো, তা না দেখালে করে খেতে পারবে না। সে গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তার ব্রেনটা অপারেশন করে বার করে নিলেন।

লেন, দিনকয়েক পরে এসে নিয়ে যেয়ো, এটা পরিষ্কার
র রাখব। চাওলার সেই বন্ধু আর ও-পথ মাড়ালেন
। একদিন অন্যত্র তার দেখা পেয়ে ডাক্তার বললেন,
মার ব্রেনটা নিয়ে গেলে না? বন্ধুটি অপ্রতিভ ভাবে
ন, ওতে আর আমার দরকার নেই, আমি সরকারী
চরি পেয়েছি।

এটি পুরনো গল্প। আর একজনের কাছে একটু
রকম শুনেছিলুম। সে ব্রেন নয়, হার্ট। মগজের
লে হৃদয়। সেটা এই সভ্য সমাজের মানুষের কথা।

দেরাদুন পৌঁছতে বেশী দেরি ছিল না। সেখানে
থেই আমাকে মসুরির বাস ধরতে হবে। যাবার
় দেরাদুন দেখার আমি সময় পাব না। ফেরার
রও পাব কি না জানি না।

দেরাদুনের সম্বন্ধে আমার সামান্য কয়েকটি কথা জানা
ল। শহরটি একেবারে সমুদ্রসমতলে নয়, কিছু
তে। কাজেই আবহাওয়া কতকটা পাহাড়ী শহরের
। দেরাদুনের মিলিটারী অ্যাকাডেমির নাম শুনেছি।
র বছরের বালকেরা ভর্তি হতে পারে। তারপর
ক্ষা সম্পূর্ণ হলে মিলিটারী অফিসারের পদে সরাসরি
ল হয়ে যায়। একটি ছেলের জন্য খরচ যা দিতে হয়,
ন মধ্যবিত্তের পক্ষে তা সাধ্যাতীত। সাধারণ শিক্ষার
় স্কুল আছে, তারও নাম শুনেছি। আর একটি
তিষ্ঠানের কথা শুনেছি, তার নাম ফরেস্ট রিসার্চ
স্টিটিউট। এর জাদুঘরে সাধারণের প্রবেশাধিকার
ছে। কয়েকটি বড় বড় ঘরে নানা রকমের বস্তু দ্রষ্টব্য
র দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই প্রতিষ্ঠানের
নেকগুলি শাখা আছে—সিল্‌ভিকালচার লগিং বটানি
রেস্ট প্যাথলজি এনটমলজি উড অ্যানাটমি। উড
ইব্রেরিটিও নাকি দেখবার মত। সেখানে নানা
তের কাঠ বইয়ের মত সাজানো আছে। এ সমস্ত
মার শোনা গল্প। ফেরার পথে যদি সুযোগ পাই তো
খে যাব।

এইবারে ফোল্ডার খুলে আরও কিছু জানলুম।
য়েক মাইল দূরে একটি সুন্দর পরিবেশে গন্ধকের প্রস্রবণ
াছে। পাহাড়ের কোল দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে,
র গুহার মত একটি স্থান থেকে গন্ধকের জল বেরচ্ছে।
এই জল পেটের পক্ষে বড় উপকারী, চর্মরোগেও।
দেরাদুনের বাসিন্দারা শুধু উপকারের লোভেই আসে না,
আসে পিকনিক করতেও। এই নদীতে স্নান করে বড়
বড় পাথরের উপরে বসে আহার করে। সন্ধ্যার আগে
ফিরে যায়। দেরাদুন শহর থেকে বাস চলাচল
করে। বাসে এলে অনেকটা হাঁটতে হয়। ট্যাক্সি
নিলে নদীর পুল পর্যন্ত চলে আসে, অল্প একটু হাঁটলেই
এই সুন্দর জায়গাটি।

শহরের অন্য ধারে একটি গুহা আছে, তার ভিতর
দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়ে আসছে। উঁচু-নীচু পার্বত্য
পথে অনেকটা হেঁটে গিয়ে এই গুহা। যাঁরা দেখেছেন,
তাঁরা বলেন যে এই পরিশ্রমের মজুরি পোষায় না।

দেখে নাকি তৃপ্তি পাওয়া যায় টপকেশ্বর মহাদেব।
পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা, তার ভিতর মহাদেব।
গুহার ছাদ থেকে মহাদেবের মাথায় অবিরত জল পড়ছে।
এই জল কোথা থেকে আসে কেউ জানে না। অলৌকিক
ব্যাপার বলে যাত্রীদের ভক্তি উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

যাত্রীদের কয়েকজন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যাঁরা
চাদর বিছিয়ে বসেছিলেন, তাঁরা তৎপর ভাবে গুটিয়ে
ফেললেন। জিনিসপত্র সামলাতে লাগলেন সবাই।
বুঝতে কষ্ট হল না যে এবারে আমরা দেরাদুন পৌঁছব।

আবার আমার স্বাতির কথা মনে পড়ল। এবারে
স্বাতিকে আমি খুঁজতে যাচ্ছি। দক্ষিণ-ভারত বেড়াতে
যাবার সময় তারা আমাকে দেখতে পেয়েছিল, রাজস্থানে
আমাকে ডেকে এনেছিল, দিল্লীতে আমি গিয়েছিলুম
তাদের নিমন্ত্রণে। এবারে তার ব্যতিক্রম হবে। এবারে
কেউ আমাকে ডাকে নি, আমি নিজেই যাচ্ছি। দৈবক্রমে
যদি দেখা হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিস্ময়ের সীমা
থাকবে না।

যদি দেখা না হয়?

ফিরে আসব।

হরিদ্বারে?

আর সেখানে নয়। সোজা কলকাতায় ফিরে যাব।

কিন্তু স্বাতির সঙ্গে তাহলে দেখা হবে না। অনেক-
দিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি। স্বাতি কি আমাকে ভুলে
গেল? ভুলে গেলেন মামা মামী? জগতে অসম্ভব

কিছুই নয়। সম্ভবটাই শুধু সম্ভব হয় না।

গাড়ি এসে দেরাদুনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল।

ঊনত্রিশ

দেরাদুন স্টেশনের বাইরে বাসের স্ট্যাণ্ড, ট্যাক্সিও আছে। পনর-কুড়ি টাকা খরচ করলে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। বাসে দু রকমের জায়গা—আপার ক্লাসে দু টাকা টিকিট, এক টাকা ছ আনা লোয়ার ক্লাসে। এর পরে মসুরি প্রবেশের আগে টোল ট্যাক্স লাগবে মাথাপিছু দেড় টাকা। ট্যাক্সিতে গেলে দু টাকা। বড় লোকের মাথার দাম বেশী।

আমি একখানি লোয়ার ক্লাসের টিকিট সংগ্রহ করে পিছনের দিকে জায়গা পেলুম। পিছনে বেশী ঝাঁকুনি লাগে, যাদের মাথা ঘোরে বা বমির ভাব হয় তাদের কষ্ট বেশী। সামনের দিকে কম কষ্ট। মোটরে আরাম। কষ্টবোধ একটা শৌখিনতা। যে যত শৌখিন, তার কষ্টবোধ তত বেশী। গরিবের এই বোধ কম, তপস্বীর একেবারে নেই। বাইশ মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় আর কত লাগবে। চারিদিকের সুন্দর দৃশ্য উপভোগেরই হয়তো সময় পাব না।

আমার পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন, গরম কাপড়ের ভারে তিনি ঝুঁকে পড়েছিলেন। গরম ফ্লানেলের প্যান্ট, গলাবন্ধ কোট পরেছেন সোয়েটারের উপর, কোটের হাতের তলা দিয়ে সোয়েটারের হাত বেরিয়ে আছে। একখানা গরম চাদর মাথায় জড়িয়েছেন। জানলা দিয়ে যে হাওয়া আসছিল, তাতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। প্রথমে উসখুস করছিলেন, তারপর জানলার কাচ তোলবার চেষ্টা শুরু করলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম: আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?

ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশী নয়, মাঝবয়সী মনে হল। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন: কষ্ট হলে আপনি কী করবেন?

আমি ভিতরের দিকে বসেছিলুম, বললুম: কষ্ট হলে আমি আপনার জায়গায় বসতে পারি।

আপনি বসবেন?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম: সরে আসুন।

ভদ্রলোক সরে এলেন। আমি তাঁর জায়গায় জানলার ধারে গিয়ে বসলুম।

একটু সুস্থ বোধ করতেই আমাকে বললেন: কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না।

কেন?

সেধে গিয়ে ওখানে বসলেন, অথচ গায়ে একটা জামা নেই।

এই তো মোটা খদ্দরের জামা গায়ে।

তলায় সোয়েটার নেই?

না।

ভদ্রলোক চমকে উঠে বললেন কি মশাই!

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন: সঙ্গে যথেষ্ট গরম কাপড় আছে তো?

আমার ঝোলা ও চাদর-জড়ানো বালিশটি দেখলুম। তিনি আঁতকে উঠলেন: এ করেছেন কী! প্রাণে যদি বাঁচতে চান তো এইখানে নেমে যান।

তাঁর উদ্বেগ দেখে আমি হাসলুম।

হাসছেন আপনি!

এর পরে ভদ্রলোক কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

আর একটি ঘটনা আমার মনে পড়ল। গত বছর পুজোর সময় আমরা রাজস্থান বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। ভোরবেলায় আবু রোড স্টেশনে নেমে একখানা ট্যাক্সি করে আবু পাহাড়ে উঠছিলুম। মামা-মামীর সঙ্গে স্বাতি পিছনে বসেছিল, আমি বসেছিলুম ড্রাইভারের পাশে। একখানা বাস আমাদের কিছু আগে ছেড়েছিল। সেখানা পেরবার সময় স্বাতি হেসেই আকুল।

মামী ধমক দিয়ে বলেছিলেন, অত হাসছিস কেন!

স্বাতি কোনরকমে যা দেখতে বলল, তা ওই বাসের ভিতর। আমি এক ভদ্রলোককে দেখলুম গলাবন্ধ কোট ও গায়ের চাদরে আপাদমস্তক ঢেকেও ক্ষান্ত হয় নি, মাথায় একটা ব্যালাক্লাভা টুপি পরেছেন। স্বাতি বোধ হয় ওই টুপি দেখেই হাসছে। খানিকটা সংযত হয়ে বলল: শীত দেখ।

মামা নিজেদের গরম জামাকাপড় দেখলেন, বললেন, এগুলো গায়ে দিয়ে নিলেই ভাল হত।

[illegible]মার মন্তব্য শুনে মামীও একটু হাসলেন। জোরে [illegible] বাতাস বইছিল ঠিক, কিন্তু সে বাতাসে কারও শীত [illegible]না। মামা তবু তাঁর আদেশটাকে জারি করবার [illegible] করলেন। বললেন, আমার সোয়েটারটা দাও।

উত্তরে মামী বললেন, এমনিতেই মাথা গরম, আর [illegible] গায়ে দিয়ে কাজ নেই।

[illegible]দিনও আমার কোন গরম জামা ছিল না। মামার [illegible] আমার জন্যে একখানা গরম চাদরের ব্যবস্থা ছিল। আজ আমার সঙ্গে একখানা বিছানার চাদর [illegible]। শীত করলে ওইখানিই ভরসা।

[illegible]নিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমার সহযাত্রী [illegible]লন: আমার কথাটা কি ভেবে দেখলেন?

বললুম, বাস থেকে নামলেও তো মরণ।

কেন?

এই বন জঙ্গলে—

খাবার কথা ভাবছেন? এইতো একটু আগে একটা [illegible] শহর পেরিয়ে এলাম। কী নাম মশাই জায়গাটার?

হিন্দীতে আমাদের কথা হচ্ছিল, একজন হিন্দীতেই [illegible]করলেন: কাকে জিজ্ঞাসা করছেন?

আমার পাশের ভদ্রলোক চটে উঠলেন, বললেন: [illegible]কে তার দরকার কী! জানেন তো বলুন না।

গায়ে পড়ে কথা বলা আমার স্ত্রী পছন্দ করেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করেন তো উত্তর দিই।

সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী তাঁর পাশেই ছিলেন। তিনি [illegible] করে স্বামীর দিকে চাইলেন।

বেশ তো, আপনাকেই বলছি।

তবে জেনে রাখুন, ওই জায়গার নাম রাজপুরা।

এইবারে আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন: শুনলেন [illegible] এইখানে নেমে হেঁটে চলে যান। থামতে [illegible]?

বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: যদি বাঘে খেয়ে ফেলে?

বাঘ! বাঘ কোথায়?

ভদ্রলোক পথের দু ধারে চাইলেন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে।

ও-ধারের ভদ্রলোক বললেন: দিনের বেলা বাঘ থাকে?

এ-ধারের ভদ্রলোক বললেন: আমিও তো তাই বলছি।

আর একজন ভদ্রলোককে দেখলুম একখানা বইয়ের উপর চোখ রেখে হাসছেন।

আমাদের বাস এঁকেবেঁকে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপর উঠছে। দেরাদুন যদি সমুদ্র-সমতল থেকে দেড় হাজার ফুট উঁচু হয় তো আমাদের আরও পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠতে হবে। মসুরির উচ্চতা সাড়ে ছ হাজার ফুট। মাত্র বাইশ মাইল পথে এই পাহাড়ের মাথায় উঠতে হবে।

এক সময় আমার পাশের ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলেন: মসুরিতে কোথায় উঠবেন?

জানি না।

সেকি মশাই, আপনি কোথায় উঠবেন তা কি আমি জানব!

বেশ তো, আমি না হয় আপনার পাশেই উঠব।

সর্বনাশ! আপনি আবার আমার পিছু কেন নেবেন!

ও-ধারের ভদ্রলোক বললেন: দেখুন, গায়ে পড়ে কথা বলা—

স্ত্রীর চোখের দৃষ্টি দেখেই ভদ্রলোক থেমে গেলেন।

কিন্তু আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন: থামলেন কেন, বলুন না কী বলছিলেন।

না না, আপনাদের কথার ভেতরে আমি কেন নাক গলাতে যাই।

নাক গলাবেন কেন, ওইখান থেকেই বলুন।

আজ আমার এই ছেলেমানুষি কথোপকথন মন্দ লাগছিল না। মন বড় হালকা ছিল। মনে হচ্ছিল, মসুরিতে পৌঁছে আমি স্বাতির সাক্ষাৎ পাব। মামা-মামীও হয়তো আমারই অপেক্ষা করছেন।

সেবারে, আবু পাহাড়ে রাণার অপেক্ষা করবার কথা ছিল। দিল্লীর আই. সি. এস. মিস্টার ব্যানার্জির একমাত্র পুত্র রাণা। স্বাতিকে তার ভাল লেগেছিল, আর তাকে ভাল লেগেছিল মামীর। মামী তাকে জামাই করতে চেয়েছিলেন। তাই আগে থেকে ব্যবস্থা করে আবু আসছেন। কয়েকটা দিন একসঙ্গে কাটাবার ইচ্ছা ছিল, একটু ভাল করে জানাশোনা, তারপর

কথাবার্তা। দিল্লীতে ফিরে গিয়েই মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই বিয়ের দিন স্থির করবেন।

আবু পৌঁছে আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। 'হ্যালো গোপালবাবু' বলে চাওলা এসে গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিল। নমস্কার করেছিল ভিতরের সবাইকে।

ড্রাইভার অন্য দিকের দরজা খুলে ধরেছিল মামা-মামীকে নামাবার জন্য। ওঁরা একটু সময় নিয়ে নামলেন। আমি চমকে উঠলুম আর একটি পরিচিত কণ্ঠ শুনে। মিত্রা কথা বলছিল মামার সঙ্গে।

মামী বললেন, রাণা কোথায়?

দাদা! দাদা আসতে পারে নি।

আমি ফিরে দেখেছিলুম, স্বাতির মুখের প্রসন্নতা এতটুকু কমে যায় নি। পাহাড়ের মিঠে রোদে তাকে আরও বেশী খুশী দেখাচ্ছিল।

আজ মসুরিতে আমাকে দেখে কি স্বাতি খুশী হবে না!

মোটর এবারে বড় বেশী পাক খাচ্ছে। আমার পেটের ভিতরটা কেমন ঘুলিয়ে উঠল। মুখ খুলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলুম। বাসের ভিতরে অনেকে বমি করে। কিন্তু এ যাত্রায় সবাইকে সুস্থ দেখছি, স্বাভাবিক ভাবে সবাই বসে আছেন।

আবু পাহাড়ে ওঠবার সময়েও আমার এইরকম মনে হয়েছিল। মামা বলেছিলেন, গোটাকয়েক কমলালেবু সঙ্গে নিলে ভাল হত।

মামী উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলেন, তোমার কি—

মামা বলেছিলেন: আমার একার জন্যে বলছি না। সবারই ভাল লাগত।

এবারে আমাদের এক সহযাত্রীর সঙ্গে কমলালেবু ছিল। কিন্তু তিনি খাচ্ছিলেন না। তাঁকে একজন ভয় দেখিয়েছে যে কমলালেবুর রস বড় মারাত্মক জিনিস, পেটে পড়লেই পাক দিয়ে উঠবে।

পথের দৃশ্য এতক্ষণ ভাল লাগছিল, এইবারে পথ ফুরলেই ভাল লাগবে।

এক সময় সত্যিই পথ ফুরলো। বাস টোল দিতে দাঁড়াল, তারপর মসুরিতে গিয়ে থামল।

মসুরি পৌঁছে গেছি শুনে আমার পাশের ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন: অ্যাঁ, পৌঁছে গেছি!

তাই তো দেখছি!

তা আগে বলেন নি কেন!

বলে ব্যস্তসমস্ত ভাবে পকেট হাতড়ে একজোড়া উলের দস্তানা বার করলেন। সেটি পরে অন্য পকেট থেকে বার করলেন একটি টুপি। সেই টুপি মাথায় দিয়ে কান পর্যন্ত নামিয়ে বললেন: কী কেলেঙ্কারি দেখুন।

তারপরেই আমার মুখের দিকে চেয়ে [illegible] বললেন: আপনি হাসছেন!

ও-ধার থেকে সেই ভদ্রলোক বললেন: গায়ে পড়ে কথা বলা—

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন: উচিত নয়।

ও ভদ্রলোক ধমক দিলেন: বলুন না কী বলছেন, অত ভূমিকার কী দরকার।

মানে, আপনি একটু বেশী সাবধানী।

কেন, বেশীটা কোথায় কী দেখলেন!

সে ভদ্রলোক এ কথার উত্তর দেবার সুযোগ পেলেন না, তাঁর স্ত্রী তাঁকে নামবার জন্য তাড়া দিলেন।

যাত্রীরা সবাই একে একে নামছিলেন। আমরাও নামলুম।

ত্রিশ

যে জায়গায় নামলুম, তার নাম কিনক্রেগ। এই মোটর-বাসের আড্ডা। মাল-চলাচলও হয় এইখান থেকে। রেলের বুকিং অফিস আছে। আউট এজেন্সি বুকিং অফিস। মোটর ও রেলের থ্রু বুকিং হয়।

এইখান থেকে দুদিকে দুটো রাস্তা গেছে। একটা লাইব্রেরির দিকে, আর একটা ল্যাণ্ডুরে। এ দুটি মসুরি শহরের দুই প্রান্ত, একটি প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে যুক্ত। তারই উপর বাজার হাট, হোটেল সিনেমা। যাত্রীরা এই দুই পথে কেউই গেলেন না, সকলে একটা পায়ে-চলা পথ ধরলেন। ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। কুলিরা মাল নিয়ে তাদের পিছনে উঠতে লাগল। আমার ইতস্ততঃ করবার কিছু নেই, জিজ্ঞাসা করবারও নেই কিছু। আমিও তাঁদের অনুসরণ করে পিছনে পিছনে উঠতে লাগলুম।

আমার সঙ্গে মসুরির যে ফোল্ডার ছিল, তাতে আমি ওই স্থানের পরিচয় মোটামুটি দেখে নিয়েছিলুম। একদিকে লালটিব্বা আট হাজার ফুট উঁচু, অন্যদিকে ক্যামেলস্ ব্যাক গানহিলের পিছনের রাস্তা। এই সাত হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর মসুরির জলাধার। বেনোগ নামে সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের চুড়া প্রায় পাঁচ মাইল দূরে, ছ মাইল দূরে কেম্পটি ফলস্। এই জলপ্রপাত ছ শো ফুট উপর থেকে পাঁচটি ধারায় নীচে নেমেছে। মসি ফলস্ আর হিয়ারসে ফলসও সুন্দর দেখতে। মাছের জন্যে যেতে হয় আগলার ভ্যালি। সবই দূরে দূরে, নয়তো পাহাড়ের ওপরে। এ সব দেখবার মত প্রচুর সময় আমার হাতে নেই, উৎসাহও নেই। যে জন্যে আমি ছুটে এসেছি, তার হদিস পাব কেমন করে!

আমি জানি, কোন অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে গাড়ির দেখা পাওয়া যাবে না। মসুরির রৌদ্রে এখন উত্তাপ পাচ্ছি। তারা বেড়াতে বেরিয়ে থাকলেও এতক্ষণে ফিরে গেছে। উত্তাপ তার ভাল লাগে না। ঘরের জানলায় বসে সে উত্তাপ উপভোগ করবে, তার জন্যে বাইরে যাবে না।

তবু ভাবলুম মসুরির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একবার হেঁটে যাব। লাইব্রেরি থেকে ল্যাণ্ডর কিংবা ল্যাণ্ডর থেকে লাইব্রেরি। গানহিলের উপরে উঠব না, উঠব না লালটিব্বাতেও। কেম্পটি ফলস দেখে নেব মনে মনে। শুধু দেখব পথের ধারের বাড়িগুলো, আর হোটেল ও রেস্তোরাঁ। জনতার ভিতর কোন চেনা মুখ আছে কিনা তাই দেখে যাব।

উপরে উঠে আমি বাঁ দিকের পথ ধরলুম। বাঁ দিকে নাকি লাইব্রেরি। শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। পথঘাট দোকানপাট হোটেল ও বাড়ি দেখতে দেখতে একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলুম। কাছে কোন লাইব্রেরি আছে কিনা চিনিয়ে দেবার সঙ্গী নেই, শুধু বাজারই দেখলুম। যে পাহাড়টির নীচে দিয়ে পথ, তাকে বেষ্টন করে আছে ক্যামেল্স ব্যাক। অরণ্যময় নির্জন পথ। মনে হয়, এই পথে অগ্রসর হলে পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে হিমালয়ের অন্য রূপ দেখতে পাব। সে উত্তর দিক। প্রত্যুষ হলে হয়তো বন্দরপুঁছ কিংবা বদরীনাথ পাহাড়ের দর্শন মিলত, তুষারধবল উজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গ। এখন যে সবই মেঘে আচ্ছন্ন তাতে আমার সংশয় নেই।

ছোট ছোট পথ পাহাড়ের গায়ে উঠে গেছে, কতদূর গেছে তা জানি না। ছোট বড় রাজা-মহারাজাদের অনেক বাড়ি আছে। একটি পাহাড়ে পথ নাকি চক্রাতা হয়ে সিমলা গেছে। চক্রাতা পর্যন্ত মোটর বাস চলে, তারপর পায়ে-হাঁটা পথ। চক্রাতা এখান থেকে মাত্র একুশ মাইল।

এ দেশের এটি একটি প্রিয় সেনানিবাস। মসুরির চেয়েও উঁচু। তবে সেখানে যাবার সোজা রাস্তা দেরাদুন থেকে। পথ বাট মাইল হলেও ওই পথেই যাতায়াত বেশী।

চক্রাতা থেকে দুটি ঐতিহাসিক জিনিস লোকে দেখতে যায়। একটি অশোকের শিলালিপি। আর একটি মহাভারতের জতুগৃহ। মাইল তেইশেক দূরে লাখমণ্ডল নামে একটি গ্রামে যে প্রাচীন প্রাসাদ আছে, সেইটিই জতুগৃহ বলে পরিচিত। পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্য কৌরবেরা এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

লাইব্রেরি থেকে আমি রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদ দেখতে গেলুম না, গেলুম না ক্যামেল্স ব্যাকের নির্জন পথে। গানহিলের দিকে চেয়ে উপরে ওঠবার উৎসাহ পেলুম না। তাই আবার ফিরলুম পুরনো পথে।

এক জায়গায় ক্যামেল্স ব্যাকের রাস্তা সমস্ত গানহিলটা ঘুরে আবার এসে বড় রাস্তায় পড়েছে। তারপরে এগিয়ে গেছে ল্যাণ্ডরের দিকে। দু ধারের ঘর-বাড়ি দেখতে দেখতে আমি এগিয়ে গেলুম। এক সময় সরু পথ পেরিয়ে ল্যাণ্ডর পাহাড়েই পৌঁছে গেলুম। বাঁ হাতের পথ ধরে উপরে ওঠবার বাসনা হল না, দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পেলুম। নীলদিগন্তের গায়ে অনেকগুলি ঘরবাড়ি দেখতে পেলুম। একজন যাত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে দূরের ওই জায়গার নাম ঝরিপানি, ওক গ্রোভ নামে রেলওয়ের একটা প্রসিদ্ধ স্কুল। মসুরির উড স্টক হাইস্কুল ও সেণ্ট জর্জেস কলেজেরও নাম আছে।

মনে হল মসুরিতে আর কিছু দেখবার নেই। গা

দেখতে এসেছিলুম, তা দেখলুম না। যা দেখলুম, তা না দেখলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এইবারে ক্লান্তি এল। শুধু তৃষ্ণা নয়, ক্ষুধাও পেয়েছে দেখলুম। পথে অনেক হোটেল রেস্তোরাঁ আছে, কোন একটায় ঢুকে কিছু খেয়ে নিতে হবে। তারপরে বাসস্ট্যাণ্ড। সময়মত পৌঁছতে পারলে টিকিট পাবার আশ্বাস পেয়েছি।

ফেরার পথে আমি হোটেল দেখছিলুম। ছোটখাটো কোন খাবার জায়গায় গিয়ে বসব। জাঁকজমক দেখলেই ভয় হয়, পকেট হালকা থাকলে সকলেই ভয় পায়। ভয় তো গরিবের অলঙ্কার।

শহরের মাঝামাঝি ফিরে এসে একটি পছন্দমত হোটেল পেলুম। একটু নিরিবিলি, অল্প অন্ধকার। ধবধবে পোশাকের তকমা ও পাগড়ির জৌলুসে চোখে ধাঁধা লাগছে না, কানেও তালা লাগছে না অবিশ্রাম বাজনায়। এই হোটেলেই ঢুকব বলে যখন স্থির করলুম, তখনই ঘটনাটা ঘটল।

হ্যালো গোপালবাবু!

বলে লাফিয়ে যে ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে চিনতে আমার একটুও সময় লাগল না।

মিস্টার চাওলা যে!

অত্যন্ত সহজভাবে আমরা জড়িয়ে ধরেছিলুম। কতক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ ছিলুম জানি না। চমক ভাঙল আর একটি পরিচিত কণ্ঠস্বরে। মুক্ত হবার পরেও চাওলা আমার হাতখানা ধরে রইল। তার হাতের উষ্ণতায় আমি নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করছিলুম।

মিত্রা বলল: এখানে যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

বললুম: আমি কিন্তু আপনাদের খোঁজে এসেছিলুম।

সত্যি।

খাঁটি সত্যি।

চাওলা আমাকে সেই হোটেলের ভিতর টেনে আনল। আমার কাঁধের ঝোলা আর চাদর-জড়ানো বালিসটা কেড়ে নিয়ে একখানা চেয়ারের উপর রাখল। তারপর বলল: এস।

তার সঙ্গে আমি ঘরের কোনায় এলুম। তারই নির্দেশে মুখ হাত ধুয়ে মিত্রার কাছে ফিরে এলুম। দু প্লেট খাবার এসেছিল। চাওলা বলল: আর এক প্লেট, বহুত জল্‌দি।

আমার দিকে ফিরে বলল: তুমি শুরু কর। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

সমস্ত ঘটনাটা বুঝতে আমার বেশী সময় লাগল না। ওরা দুজনে এখানে খেতে এসেছিল। চাওলা বসেছিল পথের দিকে মুখ করে। আমাকে দেখতে পেয়েই চিনতে পেরেছে।

চাওলা আমার হাতে কাঁটা চামচে গুঁজে দিয়ে বলল: আর দেরি কেন দোস্ত, সামনে খাবার নিয়ে কি কেউ দেরি করে!

তবু আমি আর এক প্লেট খাবারের জন্য অপেক্ষা করলুম। সেই প্লেট এলে একসঙ্গে হাত লাগালুম।

মিত্রা বলল: এখনও আমার অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

আমারও।

তারপরে আমি হৃষীকেশের সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কথা বললুম। সমস্ত শুনে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল। গম্ভীরভাবে চাওলা বলল: সত্যিই অবিশ্বাস্য।

মিত্রা বলল: তাহলে আরও একটু বলি। কাল দুপুরে আমাদের ফেরবার কথা ছিল। সময়মত বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে জায়গা পাই নি। আজ ট্যাক্সি ভাড়া করেছি।

আমার বুকের ভিতর একরকমের অদ্ভুত বেদনা গুমরে উঠল। কাল দুপুরবেলায় বোধ হয় ঠিক এই সময়েই বাসের সেই ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন—এইখান থেকে কি মসুরি যাবেন?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কেন বলুন তো?

সেই মুহূর্তেই আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন। বোধ হয়, সেখানে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব। জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনি কি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন?

ভদ্রলোক বললেন, না না, যেতে আমি বলব কেন, আমি এমনিই বলছিলাম।

মিত্রা তার রুটির একটা টুকরো নিয়ে খেলা করছিল। চাওলা বলল: খেয়ে নাও।

এতক্ষণে আমিও সম্বিৎ ফিরে পেলুম। তাড়াতাড়ি ত শুরু করে বললুম : এইবারে তোমাদের কথা বল।

আমাদের কথা শুনতে হলে আরও কিছু খেতে হ।

বলে বেয়ারাকে ডেকে বলল : রোগন জুস, সামী বর ওর চিকেন বিরিয়ানি। সুইট ডিশ কী আছে? ই ওর—

বাধা দিয়ে আমি বললুম : ব্যাপার কী বল তো?

চাওলা প্রসন্ন মুখে মিত্রাকে বলল : বল ব্যাপারটা।

মিত্রা এক মুহূর্ত দেরি করল না। বলল : আমরা নমুনে এসেছি।

চামচে ফেলে দিয়ে আমি চাওলার ডান হাতখানা প ধরলুম : কনগ্র্যাচুলেশনস্। কবে বিয়ে হল?

বুক ফুলিয়ে চাওলা বলল : এখানে আসবার আগে। য় করেই এখানে চলে এসেছি।

মিত্রার চোখে আজ কোন ভৎসনা নেই। স্নিগ্ধ মুখে প্রসন্নতা।

চাওলা বলল : তোমার বাবা হয়তো পুলিসে খবর য়েছেন।

কেন?

কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ করেছে। তবে বিবাহটা দ্বারকায় করে দিল্লীতেই সেরে এসেছে। বিধিমতে খাতায় জিস্ট্রি করে। সাক্ষীদ্বয়ের নাম শুনে চমকে যাবে। রার পক্ষে রাণা, আর আমার পক্ষে—

বলে চাওলা থামল। তারপর বলল : কে বল তো?

একটা অসম্ভব প্রশ্ন।

নাম শুনলে আরও অসম্ভব মনে হবে।

মিত্রা জানিয়ে দিল : স্বাতি।

আমার বুকের ভিতর দপ করে উঠল। চাওলা ল : ভয় পেলে নাকি!

মিত্রা হেসে বলল : ভয় নেই। দাদার বিয়ে হয়ে ছে, তার অফিসের একজন স্টেনোগ্রাফারকে বিয়ে রেছে।

আপনার বাবা রাজী হলেন?

চাওলা বলল : পাগল! মিস্টার ব্যানার্জি তাকে গা ধরে বার করে দিয়েছেন।

আমি ভেবে পাচ্ছিলুম না, এত সাহস রাণার কোথা থেকে হল! কানের কাছে মুখ এনে চাওলা বলল : প্রেম।

এই দুটি অক্ষরের ভিতর কত শক্তি নিহিত আছে, তার পরিমাপ আজও হয় নি। গল্পে উপন্যাসে কাব্যে মহাকাব্যে অনেক কাহিনী পড়েছি। দেখেছিও অনেক মানুষকে, রাণাকেও দেখলুম। যে ছেলে বাপের আদেশ অমান্য করে আবু পাহাড়ে এল না স্বাতিকে পাবার লোভে, সেই ছেলেই একদিন এমন দুঃসাহসের কাজ করল।

চাওলা বলল : স্বাতির কথা কিছু জানতে চাইলেন না?

আগে তোমার কথাই শুনে শেষ করি।

চাওলা বলল : মিত্রা আজও স্বীকার করে নি, কিন্তু আমি জানি, স্বাতি এই অসাধ্য সাধন করেছে।

বললুম : ভালবেসে রাণা বিয়ে করল, এর ভিতর অসাধ্য সাধনের কী আছে!

হায় দোস্ত, তুমি দেখছি এখনও আগের মত আছ।

কেন?

তোমার বুদ্ধি হয়তো দৌড়য়, কিন্তু মন দৌড়য় না। রাণার গল্প আমরা অনেকক্ষণ শেষ করেছি, এবারে নিজেদের কথা বলছি। স্বাতির সাহায্য না পেলে আমাদের এই হানিমুনে আসা হত না।

এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

আলবত। তোমার আমার মধ্যে প্রভেদটা তুমি এত শীগগির ভুলে যাচ্ছ?

আমি চুপ করে ছিলুম।

চাওলা বলল : তোমার কথাই আলাদা। আসল দুজন মানুষ এখনও তোমার পক্ষে। মেয়ে আর মেয়ের বাপ।

হেসে বললুম : সত্যি নাকি!

কেন ন্যাকা সাজছ। আমার মত একটা বিজনেস থাকলে মেয়ের মাও ভুলে যেতেন।

আবু পাহাড়েও সে আমাকে এই কথা বলে এমনি করেই হেসেছিল। আমি বললুম : তোমার বেলায় বুঝি স্বাতি তোমার পক্ষে ছিল?

আর রাণা। সে এখন রাজবাড়ি থেকে নিজের কোয়ার্টারে নির্বাসিত হয়েছে। তবে সুখে আছে দেখতে পাই।

গম্ভীর ভাবে মিত্রা বলল : বাবাকে আমরা খুবই দুঃখ দিলাম।

মামার কাছে মিস্টার ব্যানার্জির যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে তার মর্মান্তিক দুঃখ পাবার কথা। রাণা মিত্রার পিতা নীতিশ ব্যানার্জি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে একসঙ্গে পড়েছেন, সেইখানেই সম্বন্ধের শেষ। বি. এ. পাস করে মিস্টার ব্যানার্জি বিলেত গেলেন, ফিরলেন সিভিলিয়ান হয়ে। মামা তাঁর পৈতৃক জমিদারী দেখছেন শুনে বলেছিলেন, ফুল। সম্পত্তি দেখছে, না অধঃপাতে গেছে! আশকারা দিয়ে গভর্মেন্ট এক গুষ্ঠী অপদার্থ পুষছে।

বাংলার জমিদারদের প্রতি এই তাঁর মনোভাব। মামা আমাকে বলেছিলেন, তুমি জান না গোপাল, আমাদের প্রতি কত গভীর ঘৃণা ওরা বুকের ভেতর পুষে রেখেছে। যাদের চালচুলো ছিল না, আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দু দলকেই ওরা ঘৃণা করে। সরকারী প্রতিপত্তিওয়ালা বন্ধুমহলে যা বলে, তাও জানি। সে সব নোংরা কথা আর নাই বা শুনলে।

আজ নীতিশবাবুর সম্বন্ধে মামা কী বলবেন জানি না।

চাওলা বলল : তোমার বাবা দুঃখ পেতেনই, নিজের জন্যেই দুঃখ পেয়েছেন।

নিজের জন্যে কেন ?

গদি হারাবার আগে ইজিপ্টের রাজা ফারুক কী বলেছিলেন মনে আছে ?

না।

বলেছিলেন যে পৃথিবীতে একদিন শুধু পাঁচটি রাজা থাকবে। চারটি তাসের রাজা, বাংলায় তোমরা সাহেব বল ; আর ইংলণ্ডের রাজা, বর্তমানে রানী।

তার সঙ্গে—

সম্বন্ধ আছে দোস্ত, সম্বন্ধ আছে। ব্যানার্জি সাহেব তাঁর ছেলেমেয়ের জন্যে রাজকন্যা আর রাজপুত্র যোগাড় করতে পারতেন না। চেষ্টা চরিত্র করলে হয়তো মন্ত্রীর পুত্রকন্যা পাওয়া যেত। কিন্তু সে যে পাঁচবছরী মন্ত্রী। যাঁদের আসল কায়েমী, তাঁদের জীবনের মেয়াদ ফুরিয়েছে। ছেলে-মেয়ের বদলে নাতি-নাতনী ধরতে হত।

হেসে বললুম : কোটালদের কথা বললে না ?

এ যুগের কোটালরা ব্যানার্জি সাহেবকে আমল দেবে না। তিনি রিটায়ার করছেন কবে ?

মিত্রা বলল : এই বছরেই।

তাহলে বুঝতে পারছ !

বললুম : এইবারে তোমাদের কথা বোঝা দরকার

কাজের কথা। আমাদের কথা বুঝলে তোমাদের কথাও বোঝা হয়ে যাবে।

পরম কৌতুকে মিত্রা বলল : তার আগে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।

খাবার চেয়ে গল্পে আমাদের বেশী মন ছিল। বললুম: বলুন।

মিত্রা বলল : আজ আপনাকেও আমাদের সঙ্গে দিল্লী যেতে হবে।

চাওলা চিৎকার করে উঠল : স্প্লেনডিড আইডিয়া। ঠিক এই জন্যেই তোমাকে বিয়ে করেছিলাম মিত্রা।

তুমি কি ওঁকে ফেলে যাবে ভেবেছিলে ?

কথা না দিলে জোর করেই নিয়ে যাব।

বললুম : কথা দিলে ?

সকৌতুকে মিত্রা বলল : স্ব[illegible]র কথা সব বলে দেব।

এই কথা দেবার সময় স্বপ্নেও ভাবি নি যে আমার জন্যে আরও অনেক বিস্ময় ছিল সঞ্চিত হয়ে। আমার ভাগ্যদেবতা নিজে বাউণ্ডুলে, তাই আমার ভ্রমণের শেষ নেই। বললুম : এতে লাভ হল না ক্ষতি, তা দিল্লী গিয়ে বুঝতে পারব।

চাওলা বলল : লাভ আঠারো আনা নয় দোস্ত, লাভ অমূল্য। আমার লাভের কি পয়সায় হিসেব হয় !

মিত্রার দৃষ্টিতে একটুখানি ভৎর্সনা দেখলুম। তাতে আগের মত তীব্রতা নেই, স্নেহস্নিগ্ধ সুন্দর ভর্ৎসনা। বলল : স্বাতির কথাতেই আমি চাকরি নিয়েছি। [illegible] আমাকে স্বাধীন হবার পরামর্শ দিয়েছিল।

চাওলা বলল : কেন দিয়েছিল বুঝতে পার ?

মিত্রা বলল : তার এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরো[illegible]

। চাকরি নেবে। তবে আমার মত কলেজে নয়, নাল লাইব্রেরিতে সে একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে।

চাওলা বলল: তার ধারণা, এ যুগে একজনের জগারে সংসারের অভাব কোনদিন ঘুচবে না। অন্তত: ম জীবনে। স্বামী স্ত্রী দুজনকেই তখন সমান সংগ্রাম তে হবে।

হেসে জিজ্ঞাসা করলুম: সে কি আজকাল দাম্পত্য ন নিয়ে রিসার্চ করছে?

চশমার ফাঁক দিয়ে মিত্রা আমাকে কটাক্ষ করল, দ: বিয়ের পরে করবে।

খাওয়া আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। উঠে আমরা হাত ধুয়ে নিলুম। চাওলা ম্যানেজারকে বলল: জকের বিলটা তৈরি করে ফেলুন ম্যানেজার সাহেব, জ আমরা সত্যি যাচ্ছি।

প্রসন্ন মুখে ম্যানেজার বললেন: দেখিয়ে।

নিজেদের ঘরে চাওলারা তাদের জিনিসপত্র বেঁধে রেছিল। খানিকটা বিশ্রাম করেই আমরা বেরিয়ে লুম।

যে পথ দিয়ে উঠেছিলুম, সেই পথ দিয়েই নামলুম। ন্ত তখন যা দেখি নি, এখন তা দেখতে পেলুম। প্রায় হাজার ফুট নীচে বিস্তৃত শ্যামল সমতলভূমি। চাওলা ল: ওই সমতলভূমির নাম ডুন প্লেস। পরিষ্কার দিনে া ও যমুনা দুই নদীকেই দেখা যায় রুপোলী ধারার ।

ট্যাক্সিতে করে আমরা মসুরি ত্যাগ করলুম। এখানে উ আমাদের বিদায় দিতে এল না, কেউ বলল না এস। মরা নিজেরাই মসুরির কাছে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে লুম।

খানিকটা পথ অতিক্রম করবার পর মিত্রা বলল: াতি আমাকে কী বলেছে জানেন?

আমি তার মুখের দিকে ফিরে তাকালুম।

মিত্রা বলল: স্বাতি বলেছে যে রাজার ঘরে যতক্ষণ ততক্ষণই রাজকন্তে। সেকালের রাজকন্যারা যখন মুনি-ঋষিকে বিয়ে করতেন তখন কি আর কেউ তাঁদের রাজকন্তে বলত!

কথাটা মিথ্যে নয়।

কিন্তু কেন এ কথা বলেছে জানেন? ওকে আমি কেন বিয়ে করছি না জানতে চেয়েছিল। আপনাকে যা বলেছিলুম, তাই বললুম।—আমাদের মতের মিল নেই। ও ভাবে ঘুঁটে-কুড়োনির দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যার দুঃখ দুঃখ নয়। ওর সমাজ-সচেতন মন একটা মতবাদকে ঝেড়ে দেখতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে।

মিত্রা একটু দম নিল। তারপরে বলল: স্বাতি বলল যে মিস্টার চাওলাই ঠিক বলেন। রাজার ঘরের রাজকন্তের জন্যে আমাদের কোন দুঃখ নেই, যখন তিনি ঘুঁটে-কুড়োনির মত ঘুঁটে কুড়োন, তখন তিনি আর রাজকন্তে নন, তখন তিনি আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ। তাঁরও দুঃখ-বেদনার জন্যে আমরা দায়ী হব।

সপ্লেনডিড।

বলে চাওলা একেবারে চেঁচিয়ে উঠল।

মিত্রা বলল: স্বাতি আমাকে আরও একটা কথা বলেছে। সে কথাটিও আমি সত্যি মনে রেখেছি। সে বলেছিল, মনের মিলনের জন্যে তো কোন উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই, অর্থ প্রতিপত্তি কেন তার প্রতিবন্ধক হবে!

এবারে চাওলা আর চেঁচাল না, নির্বাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তাকালুম তার মুখের দিকে। মিত্রা আরও অস্পষ্ট ভাবে বলল: গোপালবাবু, আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না।

কোনদিন কি আমি তাকে ভুল বুঝেছি!

মনে পড়ে না।

উত্তর-ভারত পর্ব সমাপ্ত

প্রদোষের প্রান্তে

মূল রচনা : The Edge of Darkness—Mary Ellen Chase

অনুবাদ : রাণু ভৌমিক

নোরা ও সেঠ ব্রজেট

মধ্যরাত্রে লুসী নর্টন যখন হন্টের বাড়ি থেকে খবর নিয়ে দোকানে ফিরে গেল তখন উপস্থিত ধীবরদের মধ্যে সেঠ ব্রজেটও ছিল। ওর এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং সাধারণতঃ ও বেশী রাত্রি পর্যন্ত জাগে না। কিন্তু ও অনুভব করছিল যে মিসেস হন্টের সম্মানের জন্য এটা ওর কর্তব্য। ওর দীর্ঘাকার দেহ, ধূসর বর্ণ ঘন চুল, পিঠটা একটু কুঁজো। বড় বড় বাদামী চোখ। সে চোখ এখন ভাবহীন, কারণ ও প্রায় অন্ধ হতে চলেছে। লুসী মধ্যে মধ্যে ভাবত, ছেলেবেলায় সেঠ নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ছিল।

অন্য সকলের সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গেলে স্যাম পার্কার ওকে বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে সিঁড়ির ধাপগুলো পার হতে সাহায্য করল এবং ওর বাড়ি পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল। ওর বাড়ি বেঞ্জামিন স্টীভেনসের ঠিক পরেই রাস্তার উপরে। বেন তাড়াতাড়ি চলে গেল, কারণ হান্না ওর দেরিতে অস্থির হয়ে উঠবে। ঢেউয়ের গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশার নীচে ওর ভারী বুটের শব্দ গভীর আঙুলের করাঘাত ধ্বনির মত শোনা যেতে থাকে।

২

ঠিক হান্না স্টীভেনসের মত না হলেও নোরা ব্রজেট অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে বিছানায় নিজের দিকটায় শুয়ে ভাবছিল, সেঠ ঘরে ঢুকে কি বলবে—যদি ও আদৌ কথা বলে—এবং সেঠের কথার উত্তরে সে কি বলবে! বহু বছরের পরে সে মানসিক কথোপকথন সৃষ্টি করছে—কারণ, এখন ওর স্মৃতি কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে এবং আশাও প্রবল। আজ রাত্রের কথা হওয়া উচিত এই রকম :

—সেঠ, সারা হন্ট কি চলে গেলেন?

—হ্যাঁ, নোরা। প্রায় এক ঘণ্টা আগে উনি মারা গিয়েছেন।

—খুব সহজভাবেই হল তো! কষ্ট পান নি তো?

—বোধ হয় তাই। লুসী তো উল্টো রকম কিছু বলল না।

—উনি এক আশ্চর্য বৃদ্ধা!

—হ্যাঁ। ঠিক কথা।

—ওঁর অভাবে আমাদের খুব কষ্ট হবে।

—হ্যাঁ, তা হবে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—ওঁর মত আর কাউকে দেখব না—বিশেষতঃ এই রকম জায়গায়।

—না। আমরা দেখব না। সে জন্যেই তো খারাপ লাগছে।

—সেঠ, তুমি কি এক পেয়ালা চা খাবে? নিশ্চয়ই তোমার খুব ক্লান্তি লাগছে?

—পেলে তো আমার পক্ষে খুবই ভাল হয়—যদি অবশ্য তুমি খুব ক্লান্ত না হয়ে থাক।

যদিও নোরা মনে মনে এই কথাগুলো সাজাল—কেরোসিন আলোর শিখায় তার ছায়ার কাছে বারবার পুনরাবৃত্তি করল কিন্তু সে জানত এই কথোপকথন কখনই সংঘটিত হবে না। সাধারণ ঘটনা তো নয়ই বিশেষ অদ্ভুত কোন ব্যাপার যেমন প্রচুর পরিমাণে মাছ ভেসে আসা, কার্লটনের নতুন বোট, র‍্যাণ্ডেলদের আগমনও তার এই মানসিক কথোপকথনকে শ্রুতিগোচর আকার দিতে পারে নি। পারলে হয়তো তার ও সেঠের মধ্যের এই দুর্ভেদ্য নীরবতার দেওয়াল ভেঙে যেত। এ অবস্থায় সারা হন্টের মৃত্যু থেকে আর কী আশা করবার আছে।

সে বুঝতে পারে যদি সে কথাগুলো বলেও তাহলে

ন্ত্র শব্দ উচ্চারণই হবে—আর কিছু নয়। াপকথন শব্দধ্বনি ছাড়া আরও কিছু। এর অর্থ ভূতি ও অন্তরঙ্গতা যা কণ্ঠস্বরে ও বলার ভঙ্গীতে ট হয়ে ওঠে। অনেক বছর হল যখনই সে সেঠকে ন্ত প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য কথা বলতে গিয়েছে কণ্ঠে বিরক্তি ও খিটখিটে ভাব ফুটে উঠেছে। চাদরের খুঁটে চোখ মুছে সে নিজেকেই বলে, এই মনোভাবের কোনটাই সে মনে মনে অনুভব করে এরা তার প্রকৃত অনুভূতির মুখোশ এবং কোথা ক সে তার কণ্ঠে এসে বাসা বেঁধেছে তা সে জানে সে এদের ঘৃণা করে, এমন কি এদের উপস্থিতির নিজেকে পর্যন্ত লাঞ্ছিত করে, জয় করতে চেষ্টা করে এরা বিরক্তিকর নীচু কণ্ঠস্বরে এবং নাকী সুরের নপ্যানানিতে তাকে হারিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তার করুণ করুণায় এবং বর্তমানের হতাশা ও ভবিষ্যতের ভরা। তবু করুণা ও ভয় তাদের মধ্যের দেওয়ালের বর্ধমান উচ্চতাকে কমাতে পারে নি। এই দেওয়াল দের উভয়ের মানসিক অস্বস্তি, যৌবন ও আশার শান, বর্তমান জীবনধারণের পরিশ্রমের কঠিন ধূসর রে নির্মিত। এ প্রথমে অদৃশ্য অবিচলভাবে গড়ে ছিল, আর এখন একে ভেঙে ফেলা কিংবা পরিমাণ অভাবনীয় ব্যাপার। কল্পনার তীব্রতম মুহূর্তেই দেখা যায়।

সেই স্বল্পপরিসর ছায়াচ্ছন্ন কক্ষে অপেক্ষা করে সে ল ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র দ্বারা উচ্চ বেলাভূমিকে পণের শব্দ শুনতে থাকে। প্রত্যেকবার গর্জনধ্বনির সঙ্গে বাতিদান নড়ে ওঠে—আলো মিটমিট তে থাকে। মধ্যরাত্রি অতীত হয়ে গেছে। এখন অল্প কয়েক ঘণ্টা পরেই ধূসর সিক্ত ঊষা আর্দ্র শূন্য তে নামবে। তারা সবাই সমুদ্রে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করবে যাতে তারা নিজেদের পথে যেতে রে।

দরজা খোলার এবং সেঠের অসম পদক্ষেপ সে শুনতে । ওর হাত আনাড়ীর মত আলো হাতড়াচ্ছে। দিয়ে সে আলো নিবিয়ে দেওয়ার সামান্য শব্দটুকুও না গেল। গভীর বরফশীতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে লম্ফনকারী যেভাবে শরীর গুটিয়ে নেয় ঠিক সেইভাবে সে নিজেকে ঠিকঠাক করে নিল। সে আবার চেষ্টা করবে। কণ্ঠস্বর সংযত করবে এবং এতদিন পরে অবশেষে কম্পিত কথোপকথন আরম্ভ করবে।

সে পুরনো শার্ট ও কর্ডুরয় পরে প্যান্টের গ্যালিস খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকল। বিছানায় উঠে বসে সেঠের সঙ্গে চোখ মেলাতে চেষ্টা করে, তারপরে হঠাৎই যেন বুঝতে পারে এ অসম্ভব। এই নিষ্ঠুর তিক্ত সত্য তার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করে।

—তিনি কি চলে গেছেন?—সে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ।—সেঠ উত্তর দিল।

সেঠ বিছানায় ঢুকে পড়ে। লোবা ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়। আরও অনেক দূরে সরে যাবার ইচ্ছাকে দমন করে শুয়ে পড়ে। আর একবার সে মিলিয়ে যাওয়া সমগ্র বিশ্বাস একত্রিত করবার চেষ্টা করে।

—তুমি কি একটু চা খাবে?—সে প্রশ্ন করে।

তার কথায় সেঠ স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুহূর্তেরও ভগ্নাংশে ওকে মনে হয় একটি শিশু—চোখের সামনের একটা সাবানের বুদ্বুদকে শূন্যতায় মিলিয়ে যাবার আগে ধরতে চাইছে। তারপরে ও তার দিকে পিছন ফিরে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

—পাগল নাকি?—ও রুদ্ধকণ্ঠে বলে, রাত প্রায় একটা বাজে। আমি এখন ঘুমুতে চাই।

৩

এই কোভ উপনিবেশে গলদা চিংড়ী ও হেরিং মাছ ধরা উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবার পূর্বে সেঠ গ্র্যান্ড জর্জস ব্যাঙ্ক ও ফান্ডি উপসাগরে কড হ্যালিবাট ও হ্যাডক মাছ ধরত এবং অনেক সময়ে অজানা প্রবৃত্তির তাড়নায় অসংখ্য হাজার হাজার নীল-রূপোলী ম্যাকরেলের খোঁজেও যেত। এই রকম কষ্টকর পরিশ্রমে ওর চোখের কষ্ট আরম্ভ হয়। শীতের রাত্রি পাহারার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা যখন মনে হত চোখের তারাগুলো সামনের তাকিয়ে থাকা বরফ বৃত্তের সঙ্গে মিশে জমে যাচ্ছে; প্রখর সূর্যালোক যা সমুদ্রের অসীম উপরিভাগকে

জলন্ত তরল অগ্নিকুণ্ড করে তুলেছে এবং কুয়াশা ও ও রৌদ্রে মিশ্রিত অস্পষ্ট ছায়া যে দিকে এক ঘণ্টা উঁকি দিয়ে দেখতে দেখতে চোখে আর কিছুই দেখা যায় না, কুড়ি বছর পরে এ সবের ফল ফলল। চল্লিশ বছরের কাছাকাছি এসে ও সেই দু-মাস্তুল জাহাজ বিক্রি করে দিল—শেষ পর্যন্ত ও যার মালিক ও চালক দুই-ই হয়েছিল। তখন সে পূর্ববর্তী উপকূল ও উপসাগরের তীরে সহজতর ভাবে জীবনধারণের উপায় খুঁজতে থাকে—যাতে তার অন্তরের সদাজাগ্রত ভীতি—যা তাকে গলা টিপে ধরছে, তাকে শেষ করে দিচ্ছে, তা একদম তাড়িয়ে না দিতে পারলেও শান্ত করে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

সেই সময়ে শক্ত জমির ওপরে একান্তভাবে নিজের ঘর নির্মাণ করবার মত ইচ্ছা ও সময় দুই-ই থাকায় সেঠ নোরা বার্টলেটের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ও তার প্রেমে পড়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছিল। নোরা পার্বত্য জমির মেয়ে, সে তখন সীমানার ঠিক উল্টো দিকের উপকূল নগর নিউ বারুন্সড ইলের গ্রীষ্ম হোটেলে কাজ করত। সে কৃষকগোষ্ঠীর সমুদ্রকে ভাল ভাবে জানত না। যদি সে একটুও বুঝতে পারত যে কত গভীরভাবে সমুদ্রকে তার জানতে হবে তাহলে সে সেঠ ব্রজেটের আকর্ষণ, দৈহিক শক্তিমত্তা ও আন্তরিক আকৃতি সত্ত্বেও আপত্তি করত। সে সেঠের চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিল এবং বিয়ে করে সন্তানসন্ততি নিয়ে ঘর গড়ে তোলবার জন্য সত্যই আগ্রহী ছিল।

পরিবারের আয়তন কিন্তু উভয়কেই হতাশ করেছিল। কোভে আসবার তিন বছর পরে তাদের একমাত্র সন্তান একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা গর্বিতভাবে তাকে নিকটবর্তী স্কুলে চার বছর এবং শিক্ষকতার জন্য আরও দু বছর ট্রেনিং দিয়েছিল। সে রকম শিক্ষা পাবার সুবিধা এই উপকূলে নিতান্তই 'ভাগ্য' বলে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু, মেয়েটি যখন হঠাৎ কার্লটন সোয়ার নামে একটি যুবককে বিয়ে করবে স্থির করল তখন ওরা কেউ অসন্তুষ্ট হয় নি এবং ওর বাবা গোপনে আরাম বোধ করেছিল। যুবকটি একটি খাঁকি জাল-বোটের নাবিক এবং মেয়েটি মাত্র কয়েকবার ওকে দেখেছে—যখন ওর চমৎকার মাথামোটা বোট এবং পশ্চাৎ-অনুসরণকারী ডিঙিগুলো নিয়ে কয়েক রাত্রির জন্য নোঙর করেছে।

বিবাহিত জীবনের প্রথম দশ বছর নোরা বা সেঠে প্রার্থনীয় কিছুই ছিল না। তখন সেঠের চোখের একটু উন্নতি হয়েছে, অন্ততঃ আর খারাপ হয় নি। ও বল এই অবস্থা ওর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার—কারণ ও ওর স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছে। যে কোন জলযান—সার্ডিন বোট, উপকূল রক্ষীর নৌকো, নতুন কেবিন ক্রুজার—কোভে ঢুকলে এবং যারা রসদের জন্য স্টোরে আস তারা প্রত্যেকেই সুবিধে পেলে বারবার নোরার দিকে তাকাত। তখন নোরা ছিল একহারা দীর্ঘাকৃতি অপূ সুন্দরী; তার চোখ চকচকে নীল—ব্যবহারেও এক চমৎকার সহজ স্বচ্ছতা। তাকে নিয়ে স্বামীর গর্বের সীমা ছিল না।

৪

পূর্বে সেঠ অনেক দূরে মাছ ধরত। উদ্গাত শৈলস্তর ছাড়িয়ে বড় আলোর কাছে। ব্যাঙ্কে মাছ ধরবার সময় নিজের অংশে যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল তা থেকে কিছু বাঁচিয়েছিল এবং এখনও অনেক দীর্ঘ জা ফাঁদ পাতত। এ ছাড়া ডেনিয়াল থারস্টনের অংশভা হয়ে ও হেরিং অন্তরীপের মধ্যে জল উঁচু করবা জন্য বাঁধ রচনা করেছিল। ক্রমাগত খণ্ডিত দুটি মাছে ভাল সীজন তার মেসিয়াস সেভিং ব্যাঙ্কের জমা অঙ্ক বাড়িয়ে তুলেছিল। অপরাপর অধিকাংশ জেলের মত ও টাকাগুলো একটা কাপড়ের থলেতে ভরে ঘরে এখানে-সেখানে লুকিয়ে রাখত। একদিন তাড়াতাড়ি বের হবার সময়ে সে নতুন লুকনো স্থান ভুলে গিয়েছি এবং সেই পেটমোটা থলেটা ওর চামড়ার জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ভরে সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছিল। নোরা এখনও মনে পড়ে ঢেউয়ের দোলা ও ঘন কুয়াশার মধ্যে যখন সেঠ দুরন্ত ইঞ্জিন নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন সে কি ভা চেঁচিয়ে উঠেছিল—যদি ইঞ্জিন ফেল করে তাহলে তু এখানে টাকাগুলো সব নিয়েই ডুবে মরবে।

উত্তরে সেঠ ঝড় ও জোয়ারের শব্দ ছাপিয়ে

…চেঁচিয়ে বলেছিল, তুমি তো আমার সঙ্গেই আছ। …মরা যেখানে যাব সেখানেই প্রতিটি পাই খরচ করে …নব।

প্রথম দিন থেকেই সে সেঠের সঙ্গে জাল ফেলেছে। …যে কদিন মেয়েরা ছোট ছিল সে কদিন বাদে। সেই …র্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে ওঠা, খুব কড়া ও বেশী মিষ্টি …ওয়া কফি ও ডোনাট খাওয়া, ডিঙি টেনে আনা কিংবা …টিপে টিপে ডিঙির কাছে যাওয়া, মাছের বোটে উঠে …থম আলোতেই কিছুটা এগিয়ে নোঙর করবার দড়িদড়া …দোলানো ঘণ্টাবাদক বয়ার প্রান্তসীমা পার হয়ে …ওয়া। প্রভাতের পরিষ্কার আলোতে অনেকটা দূর …ন্ত দেখা যাচ্ছে। একদিকে অন্তরীপ, অপরদিকে …দ্বীপ পার হয়ে উন্মুক্ত ঘূর্ণ্যমান সমুদ্র—যার মধ্য …য়ে ওদের 'ভি' আকারে পথ কেটে নিতে হবে। যদিও …খন সে কথা কল্পনা করতেই অবিশ্বাস্য মনে হয় কিন্তু …খন সেঠ দিগন্তরেখায় সূর্য দেখা গেলেই ইঞ্জিন বন্ধ …বে কিংবা কমিয়ে দিয়ে ঢেউয়ের দোলায় দুলত।

—সূর্য উদয়ের সময়ে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে …ভালবাসি।—ও বলত, বাঙ্কের ডিঙিতেই আমি এ রকম …করতাম। ফলে, আমাকে কিছু মাছ হারাতে …ত।

প্রতিবেশীরা স্ত্রীলোকের মাছ ধরবার জাল টানা …সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করত না। ওরা জানত এ জন্য তাকে …রে অনেক শাস্তি পেতে হবে। স্বামীকে অতিরিক্ত …ত্নে নষ্ট করবার বোকামি তো আছেই। কিন্তু তার …নারীচরিত্র এমন ভাবে গঠিত ছিল যে সে শুধু ভবিষ্যৎ নয় বর্তমানের কথাও ভেবেছিল। যদিও তার সেদিনের অন্ধকারতম স্বপ্নচিত্রও এখানকার বাস্তব ঘটনার তুলনায় উজ্জ্বল। সে চিংড়ী মাছ ধরবার সমস্ত কায়দাই জেনে গিয়েছিল এবং দক্ষ হয়েছিল। এমন কি ইঞ্জিনের ওপরেও সে নজর রাখত যদিও তা সেঠের এলাকাভুক্ত। এই … কাজ সহজ ও অল্প আয়াসও, যাতে অভ্যাস প্রয়োজন, যাতে সে কোনদিনই বিশেষ অভ্যস্ত হতে পারে নি তা হচ্ছে অস্পর্শনীয় সেই সব প্রাকৃতিক ব্যাপার—যার ভিতর দিয়ে ওরা সব সময়েই ঘুরত। ও কাজ করত—বরফ শীতল জলের পুনঃপুনঃ আঘাতে বয়া ভাসছে ও দুলছে; দেহ ও মনের ওপরে কুয়াশা ভারী হয়ে চেপে বসেছে; কোন অদৃশ্য বাতিঘর থেকে বিপদের নৈকট্য ও গুরুত্বসূচক শিঙ্গাধ্বনি হচ্ছে। আবার, অকস্মাৎ মুষল-ধারে বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে। জলের মোটা মোটা ফোঁটা জামাকাপড় ভেদ করে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছয়। বিদ্যুৎ ও বজ্র তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অক্ষম অসহায়তা, আশ্রয় ও আচ্ছাদনের অভাব প্রকট করে তোলে। আবার ঝড়ের হাওয়া বা প্রবল জোয়ারের দিনে তারা যখন উদ্ধত শৈলস্তবকের একটা ওপরে চলে যায় যে ছোট ছোট গাছের শাখার ঝাপটা এসে ওদের গায়ে লাগে—তখন এক অজানা অদ্ভুত ভয়ে তার মন অস্থির, পাগল হয়ে যায়।

এই সকল দুর্ভাবনা প্রথম দিকে শুধুমাত্র সংশয়রূপে তার মনে ছিল এবং বন্দরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সে ভুলে যেত। কিন্তু যখন সে দেখল সেঠ সম্পূর্ণ ঝুঁকে ইঞ্জিন দেখছে এবং জাল থেকে মাছ বের করে নেওয়া অথবা পুনরায় ফেলবার সময়ে ওর হাত অনির্দেশ্যভাবে ঘুরছে তখনই সংশয় ভীতিরূপে তার মনে দানা বাঁধে। এবং যেহেতু এই নীরব ভীতির উদ্বেগ সে সেঠের কাছে প্রকাশ করতে বা ভিন্ন রকম ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করতে পারে না তাই বোধ হয় ধীরে ধীরে ও কলহপরায়ণ খিটখিটে ও রাগী হয়ে যায়। একদিন যখন বাতাস ও জোয়ার দুই-ই তার বিরুদ্ধে ছিল এবং সে দোলানো নৌকোয় টেঁটা দিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টা করছিল তখন হঠাৎ ওটা নৌকো থেকে পড়ে যায়। তার অক্ষমতায় সেঠের অবজ্ঞা ও বিরক্তি লুকনো থাকে নি। তার কথার উত্তরে নিজের বক্তব্যের রূঢ়তায় ও নিজেই চমকে গিয়েছিল: মনে রেখ, তোমাকে সাহায্য করবার জন্য আমার এখানে আসবার কথা নয়, বুঝলে?

আর তখনই তীব্র যন্ত্রণায় সে অনুভব করেছিল, কোন ডুবন্ত ঢেউ-ঢাকা উদ্ধত শৈলস্তবক দেখেও তার মনে এত যন্ত্রণা হয় নি যে তার এই অবিবেচনাপ্রসূত কথাগুলো অবিরত প্রতিধ্বনিত হবে এবং আজ থেকেই একটি শোচনীয় উপসংহারের উপক্রমণিকা সূচিত হল।

৫

এখন তারা টাইডাল নদীতে জাল পাতে। তাদের মাছ ধরবার স্থান প্রতিবেশীদের অপেক্ষা নিকটতর। তাই তারা ওদের মত অত ভোরে রওনা হয় না। সমুদ্রতীরে যাবার আগে নোরা ঘরদোর ঠিক করে রাখবার সুবিধে পেত, সে প্রস্তুত হয়ে যাবার প্রায় আধঘণ্টা আগেই সেঠ নির্দিষ্ট স্থানে চলে যেত।

বড় রাস্তা পার হয়ে এই মেঠো পথটি সেঠের খুব পরিচিত। ওর নিজের ফিস হাউসের পাশ দিয়ে চোরকাঁটা ও ফ[illegible]রা বুনো গাছে ঢাকা রাস্তাটি বেলাভূমির কাঁকর ও বালিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। পথের প্রতিটি গর্ত ও বাঁক জানা থাকায় ও সহজেই ভারী ভারী দাঁড় নিয়েও এটা পার হয়ে যেতে পারত। সারা হন্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে নোরা যখন সূর্যোদয়কালে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল তখন সে সেঠকে ওভাবে হাঁটতে দেখে ওর মনের নিরুদ্ধ গর্বের অস্তিত্ব বুঝতে পারল। তারপরে ক্রোধে ও অধৈর্যে সে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলল। চোখে পড়ল একটা উঁচু ভারী পাথরে হোঁচট খেয়ে সেঠ পড়ে গেছে—ওর হাতের দাঁড়গুলি ছিটকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ওকে সে সব খুঁজে নিতে হচ্ছে।

রবারের পা-ঢাকা জুতো ও পুরনো সোয়েটার পরতে পরতে—কারণ, এই চমৎকার সকালেও জলের ওপরটা যথেষ্ট শীতল—সে ভাবতে থাকে—যে কথা অন্তত: হাজারবার সে ভেবেছে, কবে এই দৈনন্দিন দুঃখের শেষ হবে। এখন বোটে ইঞ্জিন ছাড়া আর সবই সে চালায়। সে হাল চালনায় আগের চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র ও কৌশলী হয়ে উঠেছে; তা ছাড়া সবুজ বয়াগুলির কাছে তির্যক পদক্ষেপে যাওয়া, দড়ি ধরে এনে সেঠের হাতে দেওয়া—যাতে ও ভারী জালে টেনে তুলতে পারে—এ সব কাজও আগের চেয়ে ভাল পারে। কিন্তু সেঠ কখনও ইঞ্জিন তার হাতে ছেড়ে দেয় নি—না দেখেও কোনরকমে স্পর্শ দ্বারা ও কাজ চালিয়ে নেয়।

হয়তো প্রকৃত দুঃস্বপ্নের মত এইসব ব্যাপারও একদিন হঠাৎই শেষ হবে। তফাত এই যে, নিজেকে জাগরিত এবং শয্যায় নিরাপদ দেখার পরিবর্তে সে তাকিয়ে দেখবে অচল ইঞ্জিন তাদের বোটটিকে টাইডাল নদীর বুক থেকে গভীর উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রে যা শাগ দ্বীপের গায়ে আছড়ে পড়ছে—সেখানে ছুটে চলেছে। সে খুব ভালভাবেই জানে সমুদ্রের এই দিকটায় এই রকম আকস্মিক বিবরণী যথেষ্ট আছে। কিন্তু এদিকও যা তেমন ধরাছোঁয়ার ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যায় না তা হল হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের শোচনীয়তর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, যেখানে করুণা ও কষ্টে ছিন্ন হয়ে হতাশ মানুষ নিজেদের আনচ্ছা ও ধিক্কার সত্ত্বেও ফিরে যায় নিষ্ঠুর প্রত্যাভিযোগে ও ক্রোধে এবং হয়তো নিষ্ঠুরতর নীরবতায়।

৬

এত বছরের মধ্যেও কোভে সে এমন একটি চমৎকার দিন দেখে নি। বোটে হালের হাতল ধরে টাইডাল নদীর দ্রুত অপসয়মাণ জোয়ারে সাবধানে পথ দেখতে দেখতে নোরা ভাবছিল। পাহাড়ের চূড়া ও উদ্গাত শৈলস্তবকের ফাঁক দিয়ে শাগ দ্বীপের উত্তর কোণের সমুদ্রস্রোত একটু একটু দেখা যাচ্ছিল। এমন কি ছোট দ্বীপগুলি হার্ডটার্ক পামকিন, দিক্যাসেল, ইগল রক—যারা দেশের রক্ষণশীল স্থানের বাইরে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অবস্থিত এবং টাইডাল নদীকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল বলতে গেলে তাদের চারপাশেও ফেনা নেই।

বাঁ দিকে উঁচু মাঠের ওপরে হন্টগৃহ অবস্থিত। পার হয়ে আসবার সময়ে সে দেখতে পেল থেডাস খিড়কী দরজা দিয়ে গোলাঘরের দিকে গেল। এই ঘরটি মাছের ঘর হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। থেডাস ঘরটির সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখা কতকগুলি বয়া সরাতে থাকে। সেগুলি স্তূপীকৃত করবার ভারী গম্ভীর ধ্বনি স্থির বাতাসে অনেকক্ষণ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। নোরা ভাবছিল, থেডাসের মায়ের অন্ত্যেষ্টির দিনে ওকে সুপ্রভাত জানানো উচিত কি না? তার অকথিত প্রশ্নের উত্তরেই বোধ হয় থেডাস হাত তুলে সম্ভাষণ জানাল, সেও মনোরম আনন্দ, বন্ধুত্ব কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে প্রতিসম্ভাষণ করল।

সেই আনন্দের রেশ মন থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই ও ছেলের প্রশ্নে অবাক হয়ে যায়।

—ওরে এত শব্দ কিসের?—সেই প্রশ্ন করে। ওর লায় খিটখিটে ভাব একটুও নেই।

মুহূর্তের জন্য নোরার মনে হয় কে যেন তার গলা চেপে রেছে। সে উত্তর দিতে পারে না।

—থেডাস!—সে কোনরকমে বলে। তার কণ্ঠস্বর স্থ ও মসৃণ শোনায়: থেডাস বয়াগুলো সরাচ্ছে।

তাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা হেরণ পাখী উড়ে য়। রোদে ওর বিস্তৃত ডানার নীল রং চকচকিয়ে ঠে। অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে নোরা াবে, এর চেয়ে সুন্দরতর আর কিছু কখনও সে দেখে না: এই পাখীটার কাছে সে ঋণী।

—থেডাস আমাদের হাত তুলে সম্ভাষণ করল।—নোরা বলে। আবার যোগ করে, সে এখন আমাদের দকে তাকিয়ে আছে।

সে দেখে, সেঠ ইঞ্জিন-বাক্স থেকে উঠে দাঁড়ায় ও তীরভূমির দিকে তাকায়—যদিও ও কিছুই দেখতে াচ্ছিল না। ও থেডাসের দিকে লক্ষ্য করে হাত াড়ল। আমি কাঁদব না, সে ভাবে, সেঠ শুনতে পাবে। সব শুনতে পায়। আবার সে কণ্ঠ সংযত করে।

থেডাস আবার হাত নাড়ল, সে বলে, তোমার দকে।

সেঠ বলে। ইঞ্জিনে ঝুঁকে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে াকে। ও গলা পরিষ্কার করে মাথা সরিয়ে নেয়। তারপরে পাইপের জন্য পকেট হাতড়াতে থাকে। াইপটা জ্বালে না, শুধু দাঁতে চেপে ধরে। কয়েক মিনিট পরে তারা যখন প্রথম বয়াটার কাছে প্রায় পৌঁছেছে তখন সে বুঝতে পারে সেঠ আবার কথা বলবে। সে যেন ওর মনের উৎসুক উন্মুখ সঙ্কোচভরা কথাগুলো প্রায় শুনতে পায়।

—খুব ভাল লোক এই থেডাস।—সেঠ বলে। প্রতিটি কথা ও ধীরে ধীরে যেন চেষ্টার সঙ্গে কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি না ফুটিয়ে উচ্চারণ করে।

নোরা ভাবে—এর চেয়ে বেশী কিছু আর আমার চাইবার নেই।

কিন্তু আরও পেল।

—যাই করুক না কেন থেডাস আমাদের অনেকের চেয়েই ভাল।

সে জামার হাতায় চোখ মুছে ফেলে। সামনেই জলের ওপরের ভাসমান সবুজ বয়াগুলো যেন সে দেখতেই পায় না। নিজের ওপরই কেবল তার রাগ হয়। ও এখানে এসেছে স্বামীর সঙ্গে জাল টানতে, ছোট ছেলের মত কাঁদতে নয়।

—থেডাস খুব ভাল।—সে উত্তর দেয়। চেষ্টা সত্ত্বেও তার স্বর একটু ভাঙা শোনায়। এখন একা একা ওর খুব খারাপ লাগবে।

—হ্যাঁ।—সেঠ বলে।

তীরের কোন লুকনো স্থান থেকে এক ঝাঁক হাঁস পাখার শব্দ করতে করতে সমুদ্রের দিকে চলে যায়।

—হাঁস।—সেঠ পাইপটা কামড়ে শান্তকণ্ঠে বলে, এখানে অনেক হাঁস আছে। তোমার কি মনে পড়ে অনেক বছর আগে হাঁসের জন্য আমরা এখানে কিরকম ছুটে আসতাম!

[ভাদ্র সংখ্যায় ক্রমশঃ-প্রকাশ্য রচনা 'কবিমানসী' প্রকাশিত হইল না। আগামী কার্তিক সংখ্যা হইতে পুনরায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।]

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

[আলোচনা]

'শনিবারের চিঠি'র আষাঢ় সংখ্যায় সাময়িক সাহিত্যের মজলিসে বিক্রমাদিত্য ঠাকুর মহাশয় (ছদ্মনাম সন্দেহ নেই) যা লিখেছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে যা আমি লেখকের দৃষ্টিগোচর করাতে চাই। লেখক (কথাটি বিক্রমাদিত্যবাবু সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে) চিন্তাশীল সাহিত্যিক সন্দেহ নেই, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃত ; সেজন্য অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গেই এ আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। 'বসুধারা' মাসিক পত্রিকার সাম্প্রতিক একটি সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ) বিশ্লেষণ করে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে নবকলেবর 'বসুধারা' একটি সাধারণ বুদ্ধিজীবী বা সাহিত্যমূলক পত্রিকা নয়, দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজনে সাহিত্য-কর্মকে নিয়োগ করার জন্য এটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত দলীয় প্রচারমূলক পত্রিকা। এর প্রতি পাতায় কংগ্রেস-কংগ্রেস খাদি-খাদি গন্ধ ও সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা ধর্ম-গন্ধ। আদর্শহীনতার দেশে আদর্শনিষ্ঠা দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। 'বসুধারা'র বিশেষ করে কাহিনীমূলক রচনার মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন ধর্ম ও ধর্মাশ্রয়ী চিন্তা প্রচুর ভাবে রয়েছে। কংগ্রেসী প্রচারের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠা বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িকে তিনি সন্দেহের চোখেই দেখেন। বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা লেনিনের উক্তি 'Religion is the opium of the people' উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন যে ধর্মের আফিম জনচিত্তকে বাস্তবচিন্তা থেকে বিক্ষিপ্ত করার একটি হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রচলিত দৃঢ়মূল ধর্মবিশ্বাসগুলিকেই নূতন সাজে সাজিয়ে সাহিত্যিকদের কুশলী তুলির স্পর্শে সঞ্জীবিত করে জনচিত্তের সামনে তুলে ধরলে কমিউনিজ্‌ম নামক ধর্মকে প্রতিরোধ করার জন্যই 'বসুধারা' পত্রিকার ধর্ম ও আদর্শ-নিষ্ঠার প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। কমিউনিস্ট দলের মত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও সচেতনভাবে, সুপরিকল্পিতভাবে [illegible] নিয়ন্ত্রণ করে মানবচিত্তের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে কমিউনিস্ট আবিষ্কৃত অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছে এই পত্রিকার মারফত। লেখক অবশ্য প্রবন্ধের শেষে স্বীকার করেছেন যে একটি মাত্র সংখ্যা পড়ে এতখানি অনুমান হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তবে পরবর্তী সংখ্যাগুলো পড়ে যদি মনে হয় তাঁর অনুমান মিথ্যা তাহলে যথাসময়ে তিনি ভুল স্বীকার করবেন। এতে লেখকের মানসিক ঔদার্যের ও সত্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবন্ধটি যদিও 'বসুধারা'কে উপলক্ষ্য করে লেখা তবুও এর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে যে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি, বিশেষ করে 'শনিবারের চিঠি'র মত একটি পুরাতন পত্রিকায় যেখানে অনেক পণ্ডিত ও গুণী লেখক নিয়মিতভাবে সাহিত্য আলোচনা করে থাকেন। প্রশ্নগুলি আমার কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা একে একে জানাচ্ছি।

ধর্মাশ্রয়ী আদর্শনিষ্ঠ নীতিমূলক প্রবন্ধ বা কাহিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হলে প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনার গতিরোধ সত্যিই হয় কি না, এটা একটু বিচার করে দেখার প্রয়োজন নেই কি? লেখক প্রবন্ধের এক জায়গায় নিজেই স্বীকার করেছেন ধর্মমূলক কেন, যে কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম তখনই সাহিত্য হয়ে ওঠে যখন তা লেখকের আন্তর অভিজ্ঞতার সহজ স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসাবে রচিত হয়। 'বসুধারা'য় প্রকাশিত একটি ধারাবাহিক উপন্যাসকে উল্লেখ করে লেখক বলেছেন যে যদিও এর নায়ককে মহাপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (রামকৃষ্ণ ও গান্ধীকে পাঞ্চ করলে যা হয়) তবুও সেটা কৃত্রিম ও সেজন্য প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায়। এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগে যেমন আদর্শাশ্রয়ী ধর্ম বা নীতিমূলক কাহিনী স্বতঃস্ফূর্ত না হলে সাহিত্য হবে না, তেমনি যে কাহিনীতে আদর্শ নেই, ধর্মাশ্রয়ী চিন্তা নেই সেটাও তো সাহিত্য হবে

যদি তা না স্বতঃস্ফূর্ত হয়। তা ছাড়া এটাও বিচার্য লেখকের অন্তরের অভিজ্ঞতার সহজ স্বাভাবিক প্রকাশে অশ্লীল সাহিত্য বা দুর্নীতিমূলক সাহিত্য রচিত হয় বিদেশী সাহিত্যে এর প্রচুর নিদর্শন আছে। সেটা বর্জনযোগ্য কি না। ধর্ম জনচিত্তকে বাস্তব চিন্তা থেকে বিক্ষিপ্ত করে এ কথাটাও নির্বিচারে মেনে নেওয়া যায় কি? এখানে একটা মৌলিক প্রশ্ন জেগে ওঠে—ধর্ম কাকে বলে? তার সংজ্ঞা কি? আমার মনে হয় রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ধর্মের যে ব্যাখ্যা করেছেন সে ধর্ম বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সত্যধর্ম জনচিত্তকে জাগ্রত করে, ঘুম পাড়ায় না বলেই আমার বিশ্বাস। কেবলমাত্র লেনিনের একটা অনেক কালের বাসী পুরনো উক্তিকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ না করে ধর্ম সম্বন্ধে সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লেনিন রাজনৈতিক কারণে ধর্মের অপব্যাখ্যা করেছেন বলে আমরা তা নির্বিচারে মেনে নেব কেন? যুক্তি দিয়ে না বোঝালে এটা স্বীকৃত হবার যোগ্য নয় বলেই আমার ধারণা। তা ছাড়া জারের আমলের রুশীয় চার্চের ধর্ম সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য সেটা আমাদের সনাতন ধর্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য এটাও জোর করে বলা যায় কি? আশা করি লেখক এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে আমাদের সংশয় নিরসন করবেন।

লেখক এক জায়গায় তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে রাজনৈতিক জগৎ যেমন দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে সাহিত্যের জগৎও তেমনি দুই শিবিরে ভাগ হতে চলেছে—নবপর্যায় 'বসুধারা'য় যার সূত্রপাত। এতে সাহিত্যের পক্ষে ভাল হবে না। (লেখকের ভাষায় "ভাল হবে না শুধু ক্ষুদ্র একটি উইপোকার—সাহিত্যের।") প্রসঙ্গতঃ প্রকৃত সাহিত্য কী হওয়া উচিত বলে লেখক যা মনে করেন তা তিনি অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন: "যে সাহিত্য মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, মানুষকে আচমকা দারুণ আঘাত দিয়ে সচেতন করে তোলে, যে সাহিত্য অপ্রিয় সত্যকথা বলে, অসুবিধাজনক তথ্যকে প্রকাশ করে, জীবনের সমাজের অনেক অশোভন অপ্রীতিকর গোপনীয় ঘটনাকে নির্মম নিষ্ঠুর নিরাসক্তির সঙ্গে উদ্ঘাটন করে, সেই সাহিত্য আর সৃষ্টি হবে না। যে সাহিত্য আশ্চর্য, অদ্ভুত, খাপছাড়া, খামখেয়ালী, অনিশ্চয়মতি—কখন সে কাকে আঘাত করে বসবে বলার উপায় নেই; যে সাহিত্য যুগে যুগে সুখের সংসারকে ভেঙে দিয়ে নতুন সংসার রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে, অসুবিধাজনক বলেই যে সাহিত্যকে প্লেটো তাঁর রিপাব্লিক থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, সে সাহিত্য আর লেখা হবে না। তার বদলে যা লেখা হবে তার পরিচয় 'বসুধারা'র পাতায় পাতায় দেখা যাবে। সহজ সুললিত ভাষায় লেখা সহজ মিষ্টি নীতি-উপদেশাত্মক এই কাহিনীগুলিকে দ্বিতীয় ভাগ সাহিত্য নাম দেওয়া চলে। যে পাঠকদের বয়স হয়েছে, অথচ তবু যাদের আমরা চিরশিশু করে রাখতে চাই, এই সাহিত্য পড়ে তারা ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করবে, আর শিখবে কি করে শাসকশ্রেণীর আদেশ নির্বিবাদে পালন করতে হয়।" এখানে কয়েকটি বিষয় বিচার্য আছে বলে আমার মনে হয়। রাজনৈতিক শিবির কি সত্যিই আজ মাত্র দুটি শিবিরে বিভক্ত? একটি জোট-নিরপেক্ষ তৃতীয় শিবির কি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে না? আর প্রধান যে দুটি শিবির আগে ছিল সেখানেও কি পূর্ণমাত্রায় ভাঙন এসে যায় নি? বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে যা বলা হল, ভারতীয় ও বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সুতরাং রাজনীতির ক্ষেত্রে যা সম্ভব হচ্ছে না হঠাৎ বাংলাদেশের সাহিত্যজগৎ মাত্র দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যাবার সম্ভাবনা এসে গেছে এটা ভাববার বিশেষ কি যুক্তি আছে তা দেখানোর প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়। অন্ততঃ যখন দুটি শিবিরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে তখন কমিউনিস্ট জগতের মত একদলীয় কর্তৃত্বের দ্বারা সাহিত্যিকের কণ্ঠরোধের প্রশ্নও আসে না। লেখক বলতে চেয়েছেন যে লেখক-বর্ণিত সংজ্ঞাযুক্ত সাহিত্য আগে প্রচুর সৃষ্টি হয়েছে এখন যার সম্ভাবনা লোপ পেতে বসেছে 'বসুধারা'র মাধ্যমে কংগ্রেসী অভিসন্ধির ফলে। আমার মতে এ ধরনের সাহিত্য বিশেষ সৃষ্টি হয় নি এবং যা সৃষ্টি হয় নি সে সাহিত্য আর সৃষ্টি হবে না বলে আক্ষেপ করবার কি কারণ থাকতে পারে? এখানে লেখকেরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি আমার সপক্ষে। এমন লেখক আজ প্রায়ই চোখে পড়ে না যিনি এই যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে

যন্ত্রণা-জর্জরিত চিত্তে নিজের প্রকৃত উপলব্ধিগত কোন বক্তব্য বা জিজ্ঞাসা বা প্রতিবাদকে হাজির করতে পেরেছেন পাঠকের সামনে (শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৭০)। আর একটা কথা, লেখক সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন সেটা একটা বিশেষ ধরনের সাহিত্যমাত্র নয় কি? সকল প্রকার উৎকৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষণ কি তার মধ্যে পাওয়া যায়? (কেন জানি না লেখক বর্ণিত সাহিত্যের লক্ষণগুলো মেলাতে গিয়ে পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক বিতর্কের কথা মনে এল।)

লেখক কিন্তু অন্যত্র (শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯) প্রকৃত সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন সেটা আরও সুন্দর আরও গভীর আরও ব্যাপক বলে আমার মনে হয়। তিনি লিখেছেন "মেকী সাহিত্যের লক্ষ্য হল চমৎকৃত করা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা—strangeness অথবা excitement। আসল সাহিত্যের লক্ষ্য হল মানব-সত্যকে উদ্ঘাটন করা; হৃদয়ে গভীর দীর্ঘস্থায়ী ভাবাবেশ—ecstasy সৃষ্টি করা।" প্রকৃত সাহিত্যের এই ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে 'বসুধারা' প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি করছে এ কথা না মেনে নিলেও প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনার গতি রোধ করছে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তা ছাড়া সত্যিকার সাহিত্যের গতিরোধ কে করতে পারে! লেখক সাহিত্যের সঙ্গে উইপোকার উপমা দিলেন কেন জানি না, তবু সেই উপমা ব্যবহার করেই বলছি উইপোকার মতই সাহিত্যকে সহজে ধ্বংস করা যায় না, তার উৎস জাতির অন্তরের অনেক গভীরে; সেখানে হৃদয়-রানীর অসংখ্য সৃষ্টির অবিশ্রান্ত স্রোতের গতিরোধ অসম্ভব। এখানে লেখক প্রকৃত সাহিত্যিকের উপরও সুবিচার করেছেন কি? এটা বিচার করে দেখা দরকার,আর পাঠককে feeding bottle-পোষা চিরশিশু ভাবাটাও সব সময়ে সঙ্গত কি?

লেখক প্রবন্ধের প্রথম দিকে ও মাঝে মাঝে বেশ কয়েক জায়গায় কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এখানে লেখকেরই একটি উক্তি মনে করিয়ে দিচ্ছি। কমিউনিজম যেমন একটা মতবাদ, তেমনি কমিউনিস্ট বিরোধিতাও একটা মতবাদ ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র ১৩৬৯)। কমিউনিস্ট বিরোধিতা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, কংগ্রেস বিরোধিতা সম্বন্ধেও এক[ই] কথা বলা যায় কি না যদি লেখকের যুক্তি মেনে নিতে হয়। আর রাজনৈতিক ব্যক্তির সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ [যদি] নিন্দনীয় হয় তবে সাহিত্যিকদের রাজনীতি চর্চা সম্ব[ন্ধে] অনুরূপ মন্তব্য করা অন্যায় হবে কি? আশা করি [এ] বিষয়ে লেখকের সুচিন্তিত মতামত আমরা জানতে পারব।

উল্লিখিত প্রবন্ধে লেখা হয়েছে যে কংগ্রেসী স্বার্থে[র] জন্য এখন থেকে 'বসুধারা'য় সত্যনিষ্ঠা থাকবে ন[া], নির্জলা মিথ্যা পরিবেশনই পত্রিকার মূলমন্ত্র হয়ে উঠবে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে কংগ্রেসবিরোধী [বা] দলনিরপেক্ষ হলেই যে সত্য[নিষ্ঠ] ও কংগ্রেসী মনোভা[ব] থাকলেই মিথ্যাচারী হবে [এমন] কোন বাঁধাধরা নিয়ম [কি] ভাবে আসতে পারে তা ঠিক বোঝা গেল না। লেখ[ক] এই প্রবন্ধে আর একটি [পত্রি]কার সত্যনিষ্ঠার প্রশং[সা] করেছেন অথচ তাদের [সম্পাদ]কদের কংগ্রেস দলভুক্ত [ও] কংগ্রেসের সাহিত্য-উপসমিতির সক্রিয় সভ্য বলেই জা[না] আছে। আর মিথ্যাচার শুধু কি রাজনৈতিক স্বার্থে[র] উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে? রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া আর অনেক স্বার্থও তো রয়েছে যার জন্য সাহিত্যে মিথ্যাচা[র] হতে পারে ও হচ্ছেও অনেক জায়গায়, এটা কি অস্বীকা[র] করা যায়? নির্জলা মিথ্যার বিরুদ্ধে অভিযানে সত্যে[র] মধ্যেও ভেজাল থাকলে চলবে না। সত্যনিষ্ঠার স[ঙ্গে] যুক্তিনিষ্ঠার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।

এই প্রসঙ্গে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা বিষ[য়ে] 'বসুধারা'-সম্পাদকের একটি মন্তব্যের যে [রূ]ক্ষ সমালোচনা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু নিবেদন কর[তে] চাই। এই পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে লেখা হয়েছিল [যে] এতে কিছু লোকের অসুবিধা হলেও একটা সুবিধা হ[বে] যে নিম্নবিত্তদের হাতে কিছু টাকা জমবে যা পরে দুঃসম[য়ে] তাদের খুব কাজে লাগবে। এ বিষয়ে লেখক এক[জন] শ্রমিকের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই শ্রমিক তাঁকে জানিয়েছে যে তার কাছ থেকে মাসে মাসে যে চার টাকা কাটা হবে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী, তার পুরোটাই তাকে কাবুলিওয়ালার কাছে অতিরিক্ত ধার করতে হবে মা[সে] দু আনা সুদে। লেখক আরও বলেছেন যে এই শ্রমিকে[র]

ট ব্যতিক্রম নয়, শতকরা অন্ততঃ পঁচানব্বই জন কেরই এই অবস্থা। 'বসুধারা'-সম্পাদক এ স্থূল সত্যটা নও চেপে গেছেন কারণ তাঁর পক্ষে কংগ্রেস সরকার কে সমালোচনা করা সম্ভব নয়। লেখকের মতে যে ন সাহিত্যপত্র যদি কোন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে তো লের আগে খুন হবেন একজন, তাঁর নাম সত্য। এই র অভিযোগের বিষয়ে একটি তথ্য লেখকের গোচর করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে, শ্রমিকদের কাংশই এই পরিকল্পনার আওতার মধ্যে পড়ে না। কম শ্রমিকেরই মাসিক আয় ১২৫৲ বা তার বেশী, টু খোঁজ করলেই তা জানা যাবে। আর যে শ্রমিকের লেখক উল্লেখ করেছেন তার মাসিক আয় ১৮০৲ তকরা ২½ অংশ যার চার টাকা তার মাইনের অঙ্ক রকমই হবে এটা হিসেব করলে পাওয়া যায়)। রাং যে শ্রমিকের আয় ১৮০৲ অথচ চার টাকার জন্য ক কাবুলিওয়ালার কাছে মাসে মাসে হাত পাততে তার সংখ্যা নগণ্য। অন্ততঃ শতকরা পঁচানব্বই জন য় এটা বিশ্বাস করতে খুব বেশী অসুবিধা হবার কথা । বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অনেক কিছু ভালো যুক্তি আছে কিন্তু লেখক যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন দ্বারা 'বসুধারা'-সম্পাদক সত্যকে খুন বা ক্ষুণ্ণ করেছেন প্রমাণ হয় না। আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন-কিছুর সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা অন্ততঃ নিরপেক্ষ অর্থ নৈতিক আলোচনার পক্ষে ভ্রমাত্মক বলেই আমার ধারণা। এখানে পরিসংখ্যানের গাণিতিক নিয়মকে মেনে চলতে হয়।

সাধারণ সমালোচকের লেখা সম্বন্ধে এই দীর্ঘ আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু লেখক সত্যনিষ্ঠ সমালোচক, তাই তাঁর দ্বারা পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে যে অনিচ্ছাকৃত ভুল বা যুক্তির দিক দিয়ে অনবধানতাপ্রসূত যে ফাঁক রয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়েছে সেগুলি এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা হল। কারণ লেখকের সঙ্গে আমিও একমত যে "নিজস্ব মতামত যাই হোক আলোচনা সত্যভিত্তিক হওয়া উচিত" ('শনিবারের চিঠি' আশ্বিন ১৩৬৯)। কংগ্রেস সম্বন্ধে ও 'বসুধারা' সম্বন্ধে বা উভয়ের মধ্যে একটা কাল্পনিক সংযোগ সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে যা প্রতিবাদযোগ্য, কিন্তু তা করা হল না, কারণ প্রতিবাদের দ্বারা উত্তাপেরই সৃষ্টি হয়—সত্যসন্ধান হয় না। আর প্রতিবাদ করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়,—"পাঠকের বিচার-বুদ্ধিকে সজাগ করা, জাগ্রত করা, সতর্ক করাই আলোচনার উদ্দেশ্য।" এটা লেখকের কথারই পুনরাবৃত্তি ('শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৬৯) ও এই আলোচনা লেখকের সেই আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

শ্রীসুকুমার দত্ত

[লেখকের বক্তব্য]

'সাময়িক সাহিত্যের মজলিস' সম্পর্কে একটি লোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে শ্রীসুকুমার দত্ত মহাশয় কে একটু অসুবিধায় ফেলেছেন। আমি সাধারণতঃ থাও নিন্দাযোগ্য কিছু দেখলে খুব উঁচু-গলায় নিন্দা থাকি এবং আশা করি আমার প্রতিপক্ষ আরও উঁচু-য় তার প্রতিবাদ করবেন। তখন আমি গলা আর পর্দা চড়াতে হলে শব্দরূপ বাণ ধনুকে কী ভাবে যোজন করা দরকার তা চিন্তা করার অবকাশ পাই। পর্যন্ত গলার জোর যার বেশী সেই যে জিতবে এ য় আমি মনে কোন সন্দেহ পোষণ করি না। সত্যি ত কি, আমার গলার জোর বেশী বলেই হোক বা অন্য যে-কারণেই হোক আজ পর্যন্ত কেউ মজলিসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হন নি। বোধ হয় সকলেই মনে করেন যে রাস্তার কুকুরের ঘেউ ঘেউ করাই স্বভাব, আর ভদ্রলোকদের ভদ্রভাবে বাস করতে হলে তা নীরবে উপেক্ষা করা ছাড়া অন্যতর পন্থা নেই। হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি দত্ত মহাশয় রাস্তার কুকুরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভব্যতা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। কুকুরের সঙ্গে কুকুরবাজী করতে তিনি রাজী নন, আবার কুকুর খুশিমত ঘেউ ঘেউ করে পাড়ার শান্তি নষ্ট করে তাতেও তিনি রাজী নন।

সভ্য-ভব্য ভাষায় আলোচনা করার অভ্যেস নেই।

পারব কিনা জানি না। ভাষার মধ্যে যদি মাঝে মাঝে অনভ্যাসবশতঃ কুকুর-কুকুর গন্ধ বেরিয়ে আসে তবে আশা করি শ্রীযুক্ত দত্ত তা ক্ষমা করবেন।

প্রথমেই মজলিসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি কথা বলি। দত্ত মহাশয় ঠিকই অনুমান করেছেন যে কোন বিশেষ পত্রিকা বা কোন বিশেষ লেখক বা কোন বিশেষ রচনা সম্পর্কে বিরূপ বা অনুকূল আলোচনা করাই মজলিসের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আমি মনে করি যে সাময়িক পত্রিকাগুলি মূলতঃ শিক্ষানবীসদের কারখানা বিশেষ। কোন সম্পাদকের পক্ষেই এ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয় যে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত রচনাই সাহিত্যের একটা উচ্চ মানদণ্ড অনুযায়ী সার্থক রচনা বলে গণ্য হবে। সাময়িক পত্রিকায় তরুণ সাহিত্যিকদের কাঁচা অথচ সম্ভাবনা-পূর্ণ লেখা প্রকাশিত হবে, প্রবীণ সাহিত্যিকদের পরীক্ষামূলক ব্যর্থ রচনা প্রকাশিত হবে,—এবং এই ব্যবস্থাটাকেই আমি সঙ্গত বলে মনে করি। তা ছাড়া কোন সম্পাদকের পক্ষেই পাঠকদের সাময়িক রুচি ও ফ্যাশনকেও হয়তো একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অবশ্য সব দেশেই বিশ্বভারতী পত্রিকার মত কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয় যেখানে শুধু প্রথিতযশা পণ্ডিত লেখকেরাই প্রবেশাধিকার পান। কিন্তু এঁদের অনুকরণে সব পত্রিকার সম্পাদকরাই যদি বলতে আরম্ভ করেন যে আগে তোমরা তৈরী লেখক হও, তারপর আমাদের কাছে এস—তা হলে দেশে লেখক তৈরির পথটি অবরুদ্ধ হবে।

কাজেই সাময়িক পত্রিকার ত্রুটিবিচ্যুতি অসম্পূর্ণতার জন্য কঠোর ধ্বংসাত্মক সমালোচনা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। মজলিসের উদ্দেশ্য কখনও সেরকম নয়। বর্তমানকালে সাহিত্যের সুষ্ঠু বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ কতকগুলো অশুভ প্রবণতা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে, এবং মজলিসের একমাত্র উদ্দেশ্য এই প্রবণতাগুলি সম্পর্কে পাঠক ও লেখক-সমাজকে সচেতন করে তোলা। বিশেষ বিশেষ পত্রিকা এবং বিশেষ বিশেষ রচনার ভিতর দিয়েই এই অশুভ প্রবণতাগুলি রূপ পাচ্ছে বলেই আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা এবং রচনাকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বলে নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু কোন বিশেষ ঘটনা নয়, সাধারণ প্রবণতাগুলিই আমার আলোচনার মূল লক্ষ্য এবং স্বভাবতঃই শ্রীদত্ত ঠিকই অনুভব করেছেন,—এর সঙ্গে সাহিত্যের কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন জড়িত।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা দরকার যে মজলিসে যে-জাতের রচনা প্রকাশ করা হয়, তা দ্বারা সাহিত্য সম্পর্কে (বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে) সুশৃঙ্খল সুচিন্তিত যুক্তি ও তথ্য-ভিত্তিক ধারাবাহি[ক] তত্ত্বমূলক সিদ্ধান্তে পৌছনো সম্ভব নয়। প্রত্যেক জাতে[র] রচনারই নিজস্ব সীমাবদ্ধতা থাকে। মজলিসের রচনাগুলি পাঠকদের নতুন জ্ঞান ও নতুন তত্ত্ব-চিন্তা সরবরা[হ] করার পক্ষে খুব অনুকূল [নয়।] পাঠককে শিক্ষা দেও[য়া] আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য পাঠককে সজা[গ] করে তোলা। আমাদের প্রাচ্য দেশবাসীদের ঘুম এক[টু] বেশী গভীর বলে আমি পাঠকদের জাগিয়ে তোলা[র] জন্য কখনও নিঃশব্দ-সঞ্চারী সূক্ষ্মাগ্র হাইপোডার্মি[ক] সিরিঞ্জ ব্যবহার করি, কখনও বা প্রবল শব্দকারী হাতুড়[ি] ব্যবহার করি। স্বভাবতঃই আমার ভাষা যথায[থ] বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনার পক্ষে খুব উপযোগী নয়। আমি অনেক সময় উপমা, রূপক, শ্লেষ, অতিরঞ্জ[ন] ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে থাকি। স্বভাবতঃই কনটেক্সটে[র] সঙ্গে না মিলিয়ে আমার কোন বিচ্ছিন্ন উক্তির আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে আমার প্রতি অবিচা[র] করার সম্ভাবনা আছে।

যে-সব প্রবণতাকে আমি সাহিত্যের সুষ্ঠু অগ্রগতি[র] পক্ষে প্রতিবন্ধক বলে মনে করি, তাদের অনেক শা[খা-] প্রশাখা আছে। কিন্তু মোটামুটিভাবে তাদের [দুই] শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি হল—সাহিত্য-কর্ম[কে] বাণিজ্যের পণ্য বলে গণ্য করা; এবং অপরটির না[ম] দেওয়া যায় শিবির-ভুক্তি (Commercialisation এ[বং] Polarisation)। কিন্তু এই কথাগুলিকে যথাযো[গ্য] অর্থে গ্রহণ না করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। [এ] কথা অবশ্যই ঠিক যে সাহিত্যকর্মমাত্রই যে মুহূ[র্তে] ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে, সে-মুহূর্তেই তা পণ্য[।] বই প্রকাশ করে প্রকাশক অবশ্যই কিছু মুনাফা প্রত্যাশা করেন; এবং লেখকও অবশ্যই বেশী কি[ছু] না হলেও অন্ততঃ বই লেখার শ্রম-মূল্যটুকু দাবি করেন

য় প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী প্রকাশক বা লেখক কখনই য়সা রোজগারটাকেই গ্রন্থ-প্রকাশের একমাত্র লক্ষ্য লে গণ্য করেন না। সৎ প্রকাশক জানেন যে, কোন দেশের (বা সমাজের বা জাতির) সভ্যতার মান রূপণের একটি উপায় হল সে দেশের (বা সমাজের জাতির) প্রকাশিত এবং সংরক্ষিত সাহিত্য-কর্ম। শিকা-ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া মানে একটি বিরাট য়িত্বকে স্বীকার করা এ কথা যিনি মনে রাখেন না র উচিত অন্য কোন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা। কিস্তান থেকে ওষুধ স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করলে যে ভ হবে সিনেমা পত্রিকা প্রকাশ করে তার কাংশও হবে না। এমন কি শীতকালে চাল কিনে কালে বিক্রি করলে মণ-পিছু আঠারো-বিশ টাকা ত করা যায়। যাঁরা সাহিত্যিকে আজকাল লাভ-নক ব্যবসা হিসাবে দেখতে পেয়ে জোঁকের মত হিত্যের পিছনে লেগে আছেন, তাঁরা যদি এই রনের বহু বহু গুণ বেশী লাভজনক ব্যবসার দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করতেন, তাহলে সাহিত্যের কিছু উপকার হত। বং এই একই কথা লেখকদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। রা সাহিত্যে আজকাল বেশ পয়সা পাওয়া যাচ্ছে ধু এই কথা ভেবে বই লেখেন, তাঁদের কাছে আমার বেদন এই যে, একটু চেষ্টা করে পোর্টে বা রেলের ল-গুদামে বা ইনকাম ট্যাক্সের আপিসে চাকরি নিলে নেক কম পরিশ্রমে যা রোজগার করা যায়, এমন ক অচিন্ত্যকুমার 'পরম-পুরুষ' বিক্রি করেও অত পয়সা রাজগার করতে পারেন নি।

বাণিজ্য-সাহিত্যের সংজ্ঞা কি? এ নিয়ে বিভিন্ন ময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অনেক আলোচনা করেছি। খানে তার বিস্তৃত আলোচনা করে দত্ত মহাশয়ের র্যচ্যুতি ঘটাব না। এক কথায় বলা চলে লেখক যখন জের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে ভিত্তি করে হিত্য না লিখে নিম্নতর পর্যায়ের পাঠকদের (যাদের ছে সাহিত্যকর্ম তেলে-ভাজা বা চানাচুরের মতই উপাদেয় য় মাত্র) মনের মাপ অনুযায়ী সাহিত্য রচনা করেন, বে যে জিনিস উৎপন্ন হয় তাই-ই ব্যবসাদারী সাহিত্য। ধু যে পোর্ণোগ্রাফিক বা অশ্লীল সাহিত্যই এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে তা নয়। আপাততঃ যে-সব সাহিত্যকে বেশ নিরীহ, এমন কি প্রচুর আদর্শ-চিন্তা এবং ধর্ম-চিন্তার বাহক হিসাবে দেখা যায়, অনেক সময় সে-গুলোও বাণিজ্য-সাহিত্যের সংজ্ঞার আওতায় পড়বে। লেখকের নিজের মধ্যে যখন আদর্শ-চিন্তা বা ধর্ম-চিন্তার বাষ্প-গন্ধও নেই, অথচ পাঠকদের মনে এই জাতের ভাবালুতা আছে বলেই কোন লেখক যখন এই সব নিয়ে বই লেখেন, তখনই তাঁকে বাণিজ্য-সাহিত্যের লেখক বলে গণ্য করা হয়।

বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর একটি গভীর বিপদ হল সাহিত্যের পোলারাইজেসন বা শিবির-ভুক্তি। এই ব্যাপারে অবশ্য কমিউনিস্টরাই প্রথম পথ-প্রদর্শক। লেনিন এক সময়ে তাঁর পার্টির কাগজে পার্টি নীতির অনুপূরক নয় এমন রচনা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তখন লেনিন যে-কথা বলেছিলেন সে-কথাটা খুব অযৌক্তিক নয়। সেটা জারের আমল; দেশে নানা জাতের পত্র-পত্রিকার প্রকাশ-ব্যবস্থা ছিল। লেনিন বলেছিলেন যে ভিন্ন মত বা রুচি অনুযায়ী রচিত সাহিত্য-কর্ম প্রকাশের জন্য বহু জায়গা আছে, তাঁর পার্টি-কাগজের স্বল্প-পরিসরের মধ্যে মাত্র এক বিশেষ জাতের রচনাই যদি স্থান পায়, তাতে কারও লেখার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। কোন পত্রিকা যদি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা নীতি সামনে রেখে আত্মপ্রকাশ করে, তবে সেটা গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বাভাবিক প্রয়োগ ছাড়া আর কি! কিন্তু লেনিনের এই যুক্তিসঙ্গত দাবির মধ্যে যে কী বিপদ লুকিয়ে ছিল, তা বুঝতে পারা গিয়েছিল বিপ্লব সার্থক হওয়ার পর। দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশালয় যখন একটি পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে গেল, তখন ভিন্ন মত বা রুচি অনুযায়ী রচিত সাহিত্য প্রকাশ করার আর কোন উপায় রইল না।

বাংলাদেশের কথা নিয়ে আলোচনা করি। বিশ-ত্রিশ বছর আগে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট মতবাদের সমর্থকরা কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দিকে নজর দেন। এক বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত রচনা ছাড়া অন্যধরনের রচনাকে তাঁরা প্রশ্রয়

দিতেন না। এমন কি মার্কসবাদসম্মত লেখা হলেও সে লেখায় যদি পার্টির তৎকালীন কর্মপন্থার সঙ্গে গরমিল থাকত তবে তেমন রচনাও তাঁরা প্রকাশ করতেন না। লেখককে পার্টিযান বা দলভুক্ত লেখক হতে হবে। এবং অনুরূপ অনেক উগ্র মতবাদ সেই সময়ে তাঁরা চালু করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময়ে বামপন্থী লেখকদের লেখায় শক্তি আছে, এবং তাদের বাজারদর আছে, এ কথা জানতে পেরে প্রতিষ্ঠাবান পত্রিকাগুলি এবং প্রকাশকরাও তাঁদের রচনা অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করতেন। কমিউনিস্ট মতবাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই বলে স্টালিনের মৃত্যুর পর থেকেই এই শিবিরের লেখকদের মধ্যে ভাঙন শুরু হয়। চীনা আক্রমণের পর এই শিবির প্রায় পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছে এবং সঙ্গত কারণেই। এই শিবিরের সংগঠিত শক্তিটা যদিও আজ বিপর্যস্ত, তথাপি দেশের মধ্যে এখনও যে বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ব্যাপকভাবে রয়েছে এ কথা আমি অস্বীকার করতে চাই না; কিন্তু এদের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। 'পরিচয়' এবং 'গণবার্তা'র মত কাগজে এখন মার্কসবাদের উপযোগিতায় সন্দেহ করে লিখিত প্রবন্ধও প্রকাশ করা হয়।

পক্ষান্তরে এই সময়ে সকলের অলক্ষিতে আর একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। যে সব প্রতিষ্ঠাবান পত্রিকা এবং প্রকাশালয় বাংলাদেশে আছে সেগুলি হঠাৎ কমিউনিস্ট বিপদ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে। তারা আজ কমিউনিস্ট লেখকদের ও বামপন্থী লেখাকে অত্যন্ত সযত্নে সচেতন ভাবে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে। কমিউনিস্টদের ভাষায় যাকে বলে শ্রেণী-সচেতনতা, সেটি যে এমন ভাবে নগ্ন সত্য হিসাবে একদিন আত্মপ্রকাশ করবে তা আমরা মাত্র দশ বছর আগেও কল্পনা করি নি। কয়েক বছর আগেও প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠাবান পত্রিকাতে অন্তত: নামকরা কমিউনিস্ট লেখকেরা লিখতে পারতেন, এবং অনেক অ-কমিউনিস্ট লেখকের বামগন্ধী সাহিত্য তারা প্রকাশ করত। আজকে কিন্তু এইসব লেখক আর লেখার সামনে একে একে সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দত্ত মহাশয় যদি সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত না হন, তবে পর্দার অন্তরালে নিঃশব্দে এই যে একটি বিরাট বিপ্লব ঘটে গিয়েছে তাতে নিশ্চয়ই সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। কাজেই আমি এখানে উদাহরণ দিতে গিয়ে বাজে সময় নষ্ট করব না।

অনেকে বলতে পারেন যে কমিউনিস্ট তন্ত্রকে যখন আমরা অবাঞ্ছিত বলে মনে করছি তখন বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে মুষ্টিমেয়ের উপর কিছু চাপ সৃষ্টি করলে ক্ষতি কি? স্টালিনের বর্বর অত্যাচারের সমর্থকরাও ঠিক এই একই যুক্তি দিয়েছিলেন। বিশ্বমানবের মুক্তিলাভের জন্য কিছু লোকের উপর যদি অবিচার করাও হয় তবে তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু প্রশ্ন হল, আমার বা আপনার ওপর বা স্টালিন এবং মাও-সে-তুঙের ওপর বিশ্ববাসীর মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণ করার পবিত্র দায়িত্ব কে দিয়েছে? কোন্ পথে গেলে মানবজাতির অবশ্যই মঙ্গল হবে এ কথা সংশয়াতীত ভাবে বলতে পারেন এমন লোক কে আছেন? এমন লোকের অস্তিত্ব যখন কল্পনা করা যায় না তখন যার যা মত এবং পথ জানা আছে সে-সব জনতার সামনে উপস্থিত করা হোক। এবং জনতা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নানা ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে। সে জায়গাটি কমিউনিস্ট কংগ্রেসী বা অপর কারও মনঃপূত না হতে পারে; কিন্তু নিশ্চয়ই জনতার পক্ষে সেইটেই অধিকতর উপযোগী। আমার বিশ্বাস এই ধরনের মনোভাবই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি।

কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনায় আমি যেতে চাই না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে পোলারাইজেসন আজকে বাস্তব সত্য তা কি সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর? এ কথা ঠিক, বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট লেখকদের অবদান খুবই অকিঞ্চিৎকর। এ কথাও স্বীকার্য, মতবাদ প্রধান সাহিত্য সাহিত্যকর্ম হিসাবে প্রায়ই সার্থক হয় না। কিন্তু সমস্যাটিকে এ ভাবে দেখলে সমস্যার গুরুত্ব ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। একটু আগে আমি 'বামগন্ধী' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছি। কথাটার সাহায্যে আমি কতকগুলি বিশেষ ধরনের বিষয়-কেন্দ্রিক সাহিত্যকে বোঝাতে চাইছি। যেমন—অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ, অবিচার, বৈষম্য, দারিদ্র্য, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি

আতঙ্ক রোগের মতই কমিউনিজমের আতঙ্ক আজকে চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে কোন সাহিত্য-কর্মে এই ধরনের কোন বিষয়বস্তু থাকলেই সম্পাদকদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। অথচ এগুলি নিতান্তই কতকগুলি সামাজিক ঘটনা; এদের সঙ্গে কমিউনিস্ট-তন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। কমিউনিজম নামক তন্ত্রের যখন কোন অস্তিত্বই ছিল না, তখনও সমাজে এ সব ঘটনা ঘটত এবং তখনকার শিল্পী-সাহিত্যিকরা এ সবের বিরুদ্ধে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—যেমন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আমরা দেখতে পাই। ফরাসী দেশের Existentialistগণ বা অস্তিবাদী লেখকগণ ঘোরতর কমিউনিস্টবিরোধী। কিন্তু তাঁরা অকুণ্ঠিত ভাবে সমাজের নগ্ন বাস্তবকে উপস্থিত করতে ইতস্ততঃ করেন না। সমাজে যা ঘটে তা ঘটনাই, তাকে নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যায়; কিন্তু এ দেশের কমিউনিস্ট-বিরোধীরা এমনই স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন যে এই সাদা কথাটাও বুঝতে পারেন না।

আমাদের দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা জলের মতই তরল; যখন যে পাত্রে ঢালা যায় তখন তাঁরা অনায়াসে সেই পাত্রের আকার গ্রহণ করেন। গজেন্দ্র মিত্রের আগের যুগের লেখা কাহিনীতে অনেক সামাজিক বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের চিত্র থাকত; এখন তাঁর কাহিনীতে যৌন-অবদমনই যে সর্বদুঃখের মূল এই তত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছে। মনোজ বসু আগে বিপ্লবীদের নিয়ে বই লিখেছেন, এখন চোর-বাটপাড়দের চিত্তাকর্ষক জীবন-যাত্রা নিয়ে কাহিনী রচনা করছেন। শৈলজানন্দ এককালে ‘কয়লা কুঠি’ লিখেছিলেন, আজ তিনি রোমাণ্টিক প্রেমের গল্প লিখছেন। প্রায় সব লেখকের ক্ষেত্রেই এই একই ইতিহাস দেখা যাবে, কাজেই উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এঁরা কোনদিনই কমিউনিস্ট ছিলেন না, কমিউনিস্টদের চোখ দিয়ে তাঁরা বাস্তবকে দেখেন নি বা চিত্রিত করেন নি। তবুও কতকগুলো সামাজিক ঘটনাকে আজ তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বর্জন করছেন কেন? একে শুধু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রকাশক এবং সম্পাদকদের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের রচনার ধারাকে পরিবর্তিত করছেন। আজও তাঁরা বাস্তববাদী কাঠামোর মধ্যেই সাহিত্য রচনা করছেন; শুধু তার মধ্যে বাস্তবতা অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে।

যাই হোক, লেখকেরা স্বেচ্ছায়ই হোক বা চাপে পড়েই হোক, নিজেদের অভিজ্ঞতার একটা অংশকে উপেক্ষা করে অপর অংশ নিয়ে সাহিত্য-রচনায় অগ্রসর হচ্ছেন। খণ্ডিত মন নিয়ে যে-সাহিত্য রচিত হয় তা কি উৎকৃষ্ট সাহিত্য হতে পারে? কোন লেখকের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ হতে পারে এবং সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানটুকুকে পুরোপুরি ব্যবহার করে তিনি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করতে পারেন। যেমন কবি জসীমুদ্দিন। কিন্তু যিনি অনেক বেশী জানেন, কিন্তু সেই জ্ঞানের সামান্য অংশমাত্র নিয়ে সাহিত্য লিখতে বসেন, তাঁর সাহিত্যে নিশ্চয়ই কিছু ফাঁক এবং ফাঁকি থেকে যাবে।

আজকাল কতকগুলো বিষয়কে বর্জন করে অপর কতকগুলো বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে। যেমন—প্রেমের বিকৃতি, মনোবিকার, নানাবিধ কাল্পনিক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, সতীত্ব প্রভৃতি কিছু কিছু মধ্যযুগীয় আদর্শ, ক্রাইম বা আধা-ক্রাইমমূলক বিষয়, এবং সর্বোপরি ধর্ম। প্রধান প্রধান সাহিত্য-পত্রগুলি খুলে তাতে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসগুলি বিষয় অনুযায়ী সাজালেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। বলা বাহুল্য, আমি এই সব বিষয়বস্তুর বিরোধী নই। কিন্তু সচেতন ভাবে কতকগুলো বিষয়কে বাদ দিয়ে আর কতকগুলো বিষয়ের উপর নির্বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার মধ্যে কিছু দুরভিসন্ধি আছে।

আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি: ধর্ম বা ধর্মমূলক সাহিত্যের আমি বিরোধী নই। কোন না কোন রকমের ধর্মবোধ ছাড়া মানুষ বাঁচতেই পারে না। ধর্ম হল যা মানুষকে ধারণ করে রাখে। ধর্ম জীবনের কতকগুলি গভীর বিশ্বাস যা আমাদের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে শৃঙ্খলা দান করে, যা জীবনকে অর্থময় করে তোলে। এই অর্থে কমিউনিজমও একটি ধর্ম। কিন্তু ‘বসুধারা’ পত্রিকার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি ধর্ম কথাটাকে আর একটু সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছিলাম। অচিন্ত্যকুমারের ‘পরম পুরুষ’ নামক গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই এক ধরনের

প্যাচপেচে ধর্মীয় ভাবালুতা আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ করছে। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, পরমহংস প্রভৃতি বড় বড় ধর্মীয় নেতাকে একাকার করে আমরা একটা স্পষ্ট রূপ-রেখাহীন নিরবয়ব ভাবালুতা সৃষ্টি করেছি। মদের ফেনার মতই এই অত্যন্ত হালকা জিনিসটি আমাদের মনের অত্যন্ত অগভীর স্তরে বিরাজ করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা চিন্তাধারার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সারাদিন ভোগবাদী জীবন যাপন করে অর্থ ও স্বার্থের জন্য অসংখ্য রকম দুর্নীতিতে নিমগ্ন হয়ে সন্ধ্যেবেলা অচিন্ত্যকুমার বা রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনতে যাই। এই ভাবালুতা আমাদের জাতীয় গর্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে আমাদের অহমিকাকে খানিকটা পরিতৃপ্ত করে। তা ছাড়া এর আর কোন উপযোগিতা নেই। এই ভাবালুতার অসুবিধা এই যে বিভিন্ন ধর্মনেতার মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য আছে তার দিকে নজর না দেওয়ার ফলে এক ধরনের মানসিক অপরিচ্ছন্নতার জন্ম হয়। এই কটিল জগতে অপরিচ্ছন্ন চিন্তার অভ্যাস নিয়ে কোন নাগরিক তাঁর গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।"

লেনিনের অনেক উক্তির মত তাঁর বিখ্যাত উক্তি—Religion is the opium of the people—কথাটিরও পরবর্তী ভাষ্যকারগণ অপব্যাখ্যা করেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। বিপ্লবের পরে তিনি ধর্ম সম্পর্কে যে উদার মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন তা দেখে আমার মনে হয়েছে তিনি ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের বিরোধী ছিলেন না। ধর্ম যখন সুসংগঠিত হয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গণ-মানসকে বাস্তব-চিন্তাবিমুখ করে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেষ্টা করে তখনই তা বিপজ্জনক; এবং লেনিন সেই কথাই বলেছিলেন। আমি পূর্ব প্রবন্ধে কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে এই নীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আমি যতদূর বুঝি, কংগ্রেসের মূল নীতি তিনটি—Secularity, Rationality এবং Democracy। এই নীতিগুলিকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা যে আজ নানাভাবে দেশে একটি ধর্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, এবং সাহিত্যের মধ্যেও যে এই চেষ্টার ক্রমবর্ধমানতা দেখা যাচ্ছে আমি তাকে সন্দেহের চোখে দেখি এবং কেন দেখি তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, আমি কংগ্রেস-বিরোধী নই। কংগ্রেসের যে মূলনীতি—গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া,—আমি সেইটিকেই বর্তমান ভারতের একমাত্র গ্রহণীয় নীতি বলে মনে করি। আমি পরিকল্পনামূলক অর্থনীতিরও পক্ষপাতী। কিন্তু কংগ্রেসের বাস্তব কর্মনীতি সম্পর্কে আমার মনে গভীর সংশয় সন্দেহ ও আশঙ্কা রয়েছে। দত্ত মহাশয় হয়তো এ কথা শুনে খুশী হবেন না, কিন্তু আমি আমার মনোভাব অকপটে প্রকাশ করারই পক্ষপাতী।

কোন লেখক যদি তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অনুযায়ী কোন ধর্মমূলক উপাখ্যান লেখেন তবে তা নিঃসন্দেহে সৎ-সাহিত্য হয়ে উঠবে। কিন্তু [illegible] মিত্রের জীবনে কোন ধর্মমূলক উপলব্ধি নেই। [illegible] ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে কিছু না জেনেও শুধু তাঁর লেখা পড়েই আমি এই মন্তব্য করছি। দত্ত মহাশয় ইচ্ছে করলে আমার উক্তি সত্য কিনা খবর জেনে মিলিয়ে দেখতে পারেন। মাত্র তাঁর লেখা পড়েই আমি এ কথা এত জোরের সঙ্গে বলতে পারছি এই জন্য যে আমি এই লেখাটির মধ্যে ('বসুধারা'য় প্রকাশমান তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাসটির মধ্যে) শুধু কতকগুলো ধার-করা কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র দেখতে পেয়েছি। তাঁর নিজের কোন ধর্মীয় উপলব্ধি থাকলে তার প্রকাশের মধ্যে কিছু মৌলিকতা থাকত। যে কল্পনার ভিত্তি লেখকের অভিজ্ঞতা নয়, যা লেখক ফরমায়েশ অনুযায়ী জনতার চাহিদা অনুযায়ী উদ্‌ভাবন করেন, তা দিয়ে কখনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য হয় না। গিরিশ ঘোষের জনা বা বিল্বমঙ্গল নাটকে আঙ্গিকগত ত্রুটি আছে; কিন্তু তার সহজ আন্তরিকতা হৃদয়কে স্পর্শ করে, কারণ গিরিশ নিজে ধার্মিক লোক ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ বলি, দত্ত মহাশয় আমার সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আছে বলে অনুমান করেছেন তা ঠিক নয়। একটু গভীরভাবে পড়লে দেখবেন যাতে আমি যে সাহিত্য নিছক সেনসেশন সৃষ্টি করে রোমহর্ষক ঘটনাজাল সৃষ্টি করে আমাদের স্নায়ুকে আঘাত দেয়, সে সাহিত্যকে নিছক কমার্শিয়াল

…বলেছি। কিন্তু উৎকৃষ্ট সাহিত্যও সেনসেশন করে, আঘাত দেয়, চমক লাগায় বইকি! কিন্তু সাহিত্যের চমক হল নতুন সত্য আবিষ্কারের বা পুরনো সত্যের মধ্যে নতুন গভীরতায় …র চমক। ডস্টয়ভস্কীর উপন্যাস ডিটেকটিভ …সের মতই চমকপ্রদ। কিন্তু নিশ্চয়ই তার জাত …না। সাহিত্য সব সময় সত্যের অনুসন্ধানী। আমাদের অনেক প্রিয় বিশ্বাসকে ভেঙে দেয়, …অপ্রিয় সত্যকে আমরা গোপন করে রাখতে …কে অনাবৃত করে দেয়। এবং এ কাজ যখন …করে তখন পাঠকের মনে নিশ্চয় দারুণ আঘাত … সেনসেশনাল সাহিত্য আমাদের স্নায়ুকে …দেয়, তার প্রভাব সাময়িক। সৎ সাহিত্য …দের চিন্তার অভ্যাসকে আঘাত দেয়, তার প্রভাব … আমরা যখন লেখকের চোখ দিয়ে নতুন সত্যকে …কন করি তখন যে আনন্দ লাভ করি তারই নাম …রসোপলব্ধি। আমরা যখনই বিষয়বস্তুকে সীমিত করে … অখণ্ড স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করব, যখনই …দেশ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করাতে চাইব, তখন আর …দের সাহিত্য সৃষ্টি হবে না। যাঁদের লেখার অভ্যেস আছে তাঁরা এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে মোটামুটি পাঠযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারবেন হয়তো, কিন্তু তাতে সাহিত্যের দিগন্ত প্রসারিত হবে না।

শ্রীদত্ত, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন একটি থার্ড ফোর্স সৃষ্টির চেষ্টা চলছে এবং তা অন্ততঃ অংশতঃ সার্থক হয়েছে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি থার্ড ফোর্সের প্রসঙ্গ তুলেছেন। এই থার্ড ফোর্স বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আছে কিনা সন্দেহ। থাকলেও তার খুব দুর্বল অবস্থা। কিন্তু সত্যি বলতে কি সাহিত্যে আমিও একটি থার্ড ফোর্স গঠনের পক্ষপাতী। 'মজলিসে'র পাঠকমাত্রই নিশ্চয় এ কথা বুঝেছেন, আমি সাহিত্যকে রাজনীতির দলাদলি থেকে মুক্ত করতে চাই। সাহিত্যেও মত ও বক্তব্য হাজির হবে বইকি। কিন্তু তা সব সময়েই লেখকের ব্যক্তিগত স্বাধীন বক্তব্য—দলীয় বক্তব্য নয়। আর সাহিত্যকর্মকে আমরা দল-নিরপেক্ষভাবে নিছক তার সাহিত্যমূল্যের ভিত্তিতেই বিচার করব। এই ধরনের কোন পরিকল্পনায় যদি শ্রীদত্ত অগ্রসর হন, তাহলে তিনি মজলিসের কাঠবিড়ালী লেখকটির অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাবেন।

বিক্রমাদিত্য হাজরা

নিন্দুকের প্রতিবেদন

চার্বাক

তিবেদনের পৃষ্ঠায় আমরা এতদিন পর্যন্ত যতগুলি পুস্তকের আলোচনা অথবা নিন্দা করিয়াছি, ারের আলোচনায় আমি সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ শ্রেণীর পুস্তক নির্বাচন করিব।

কেবল পুস্তকের শ্রেণীগত পার্থক্য নহে, আলোচনার এবং উদ্দেশ্যও পূর্ব পরিচ্ছেদসমূহ হইতে পৃথক বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে উদ্যত হইব ভাবিতেছিলাম; সময় আমার লেখনীমুখে কী একটা যান্ত্রিক গোল- কালি আটকাইয়া গেল। কলমটি ঘষিয়া ঘষিয়া কাজ চালাইবার উপযোগী করিতেছি তখন কাগজের বিকল লেখনীর ঘর্ষণজাত কর্কশ শব্দের মধ্যে ভাবে শুনিতে পাইলাম : বৎস, উদ্দেশ্য-বিষয়ে যাহা বলিতে পার কিন্তু রচনাভঙ্গির বিষয়ে পূর্বাহ্নে কোন শ্রুতি দিতেছ কোন্ সাহসে? ভাবিয়াছ বুঝি বেদন রচনা তোমার আপন ইচ্ছায় হইয়া থাকে? যে তোমার উপর ভর করিয়া আমি করিয়া থাকি কি তোমার পূর্ববর্তী প্রতিবেদনকার তোমাকে য়া দেন নাই?

শুনিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলাম।

মনে পড়িল বটে রবীন্দ্র ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি জাতীয় কী একটা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিতে চাহেন তাহা ভুলিয়া গিয়া কোন্ এক তুকময়ীর কথা নাকি তিনি অনেক সময়ে বলিয়া তেন। তখন বিশ্বাস করি নাই কিন্তু এখন স্বকর্ণে য়া আর সন্দেহের জো থাকিল না। বুঝিলাম র উপরও সেই একই কৌতুকের তুকতাক শুরু ছে। ভাল কথা, কৌতুকে আমার অদম্য কৌতূহল, ষ যদি তাহা নারীজাতির নিকট হইতে আসে। লাম, সত্যি বলছ, মাইরি?

এই কথা বলিবামাত্র আবার শুনিতে পাইলাম : তোকেও আধুনিকতার ভূতে পাইয়াছে; কাহাকে

হারাইয়া ফেলিয়াছিস! ওরে লেখককুলকলঙ্ক, আমাকে মাতৃসম্বোধন কর্, আমি সরস্বতী!

বিশ্বাস করুন, শুনিয়া সত্যই ঘাবড়াইয়া গেলাম। বাল্যকালে অধ্যয়নে বহুবার ফাঁকি দিয়াছি, যৌবনে সরস্বতী পূজার চাঁদা প্রদানে। সরস্বতী আমাকে পাইলে ছাড়িবেন না। তবু ভয়ে ভয়ে জোড়হস্তে প্রশ্ন করিলাম, মাতঃ, অজ্ঞতার অপরাধ মার্জনা কর। তোমাকে সত্যই চিনিতে পারি নাই। শুনিয়াছি তোমার কণ্ঠস্বর বীণানিন্দিত, তোমার ভাষা কোকিলগুঞ্জিত, তোমার আবির্ভাবে অযুত শ্বেতশতদল প্রস্ফুটনের প্রসন্ন রোমাঞ্চ, তাই—

সরস্বতী বলিলেন, তাই আমার কাংস্যক্রেংকারধ্বনিতে, আমার কাটাছাঁটা স্পষ্টোক্তিতে এবং আমার কেতকীকুঞ্জবৎ আবির্ভাবে তোমার সন্দেহ হইয়াছে। হইবার কথাই বটে। সেজন্য তোমাকে দোষ দিব না। বৎস, আমি দুষ্টসরস্বতী।

ততক্ষণে ভীতি জয় করিয়া ফেলিয়াছিলাম। বলিলাম, মাতঃ, অরিজিন্যাল সরস্বতীদেবীর আপনি কে হন? তিনি কুশলে আছেন তো?

দুষ্টসরস্বতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, তিনি আর নাই! এখন আমরা তাঁহার কয়েকজন ভগিনী মিলিয়া তাঁহার কর্ম যথাশক্তি সম্পাদন করিতেছি। উপন্যাস সরস্বতী আমাদের মধ্যে বর্ষিয়সী, স্থূলাঙ্গে দৃঢ়নিবদ্ধ কামিজ এবং দৃষ্টিকটু চড়া রঙের শাড়ি পরিহিতা হইয়া তিনি এখন তোমাদের বঙ্গদেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ শুরু করিয়াছেন, পূজা সংখ্যার কারণে এক্ষণে তাঁহার বড়ই আদর। আমাদের কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম রম্যরচনা সরস্বতী; সেটা এখনও বয়সে নেহাত বালিকা, কিন্তু রঙে ঢঙে এবং বিলাতী ছাঁটের পোশাকে চমকপ্রদ হইয়া সে এখনও এমন অসভ্যের মত ঘোরাঘুরি করিতেছে যে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাইবার মত। অধিক কী বলিব, তুমি পুত্রতুল্য, রম্যরচনা সরস্বতীকে লেখকরা যা

বলিয়া ডাকিলে নাকি সে রাগিয়া যায় ; কেহ মাসি, কেহ ছোটমাসি, কেহবা আন্টিডিয়ার বলিয়া পর্যন্ত নাকি তাহাকে সম্ভাষণ করে। ইহা ছাড়া আরও—

বাধা দিয়া আমি আবার প্রশ্ন করিলাম, [না হইলে উনি থামিতেন না, দেবী হইলেও মহিলা তো, আপন ভগিনীর নিন্দা শুরু করিলে শেষ হওয়া কঠিন] মাতঃ, তাহা হইলে সৌর মাঘের শুক্লাপঞ্চমীতে আমরা যাঁহার পূজা করিয়া থাকি, যাঁহার পূজায় চাঁদা দিবার জন্য মাঝে মাঝেই আমাকে একখানি একুস্ট্রা প্রবন্ধ লিখিতে হয়, তিনি কে ? তিনিই কি অরিজিন্যাল সরস্বতী নন ?

ও, তুমি বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতীর কথা বলিতেছ ? ও কেহ নয়, আদৌ সরস্বতীই নয়, একটা ইম্‌পস্টার !—বলিয়া দুষ্টা সরস্বতী অন্তর্হিতা হইলেন।

তখন দেখিলাম, আমার বিকল কলম হইতে ঘস্‌ঘস্‌ আওয়াজ বন্ধ হইয়া পুনর্বার মসী নির্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

না মহাশয়, আমি গাঁজা খাই না। তবে চারমিনার মার্কা সিগারেটে মুহুর্মুহুঃ দম দিয়া থাকি বটে। তাহার প্রভাবে এইরূপ দেখিলাম কিনা জোর করিয়া বলিতে পারিব না।

যাহা হউক, সে সকল গবেষণায় আর কালাতিপাত না করিয়া অবিলম্বে প্রতিবেদনের সূত্রপাত করাই সমীচীন।

আমার এ মাসের প্রতিবেদ্য গ্রন্থকারের নাম শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

নামটা পাঠকের অপরিচিত লাগিলে লজ্জিত হইবার কারণ ছিল না। কেন না, শঙ্করীপ্রসাদ সাহিত্যিক নহেন। কিন্তু শঙ্কিত চিত্তে অনুমান করিতেছি বোধ হয় বহু পাঠকের নিকট ইনি তেমন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইবেন না। সেজন্য শঙ্করীবাবু অংশতঃ এই পত্রিকার সম্পাদকের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে পারেন, দুই মাস পূর্বে সংবাদ-সাহিত্যে তিনি পাঠকের সহিত শঙ্করীপ্রসাদকে কিছুটা পরিচিত করাইয়াছেন। কিন্তু 'সংবাদ-সাহিত্যে'র স্বীকৃতি পাইবার পূর্বে শঙ্করীপ্রসাদ পাঠকমহলে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এ কথা বলিলে বাঙ্গালীকে ছোট করা হয়। বাঙ্গালী পাঠক সাহিত্যের খবর নাও রাখিতে পারেন, কথাসাহিত্যে তাঁহারা দিগ্‌গজ না হইতে পারেন, কিন্তু ক্রিকেটের খবর রাখিবেন না ইহা কেমনে সম্ভবে ? বিংশ শতাব্দীর এই ষষ্ঠ দশকে কোন সুসভ্য বাঙ্গালী অর্থাৎ কলকাতিয়া [বাঙ্গালী সভ্য হইলে কলকাতিয়া হইতেই হইবে], ক্রিকেটরসিক হইবেন না ইহা কল্পনার অতীত। আর ক্রিকেটরসিক হইলেই যাঁহাদের নাম আপনার অতিপরিচিত না হইয়া উপায় নাই তাঁহাদের মধ্যে তো শুধু উমরিগড়ই নাই, মেডিকালের হুমড়িগড়ও আছেন [টেস্ট ম্যাচের টিকিট পাইবার জন্য যাঁহার পায়ে হুমড়ি খাইয়া গড় করিতে হয় তাঁহার কথা বলিতেছি], চন্দু সিং পকৌড়িওয়ালা আছেন [শুধু গরম পকৌড়ি নহে, ইডেনের শীতের দুপুরে চুরি হওয়া সীজন টিকিট ইঁহার নিকটেই কিনিতে পাইবেন] এবং শঙ্করীপ্রসাদ বসুও আছেন [একাধারে ক্রিকেট এবং রম্যরচনার ককটেল]।

অতএব শঙ্করীবাবুকে কেহ কাঙাল বলিয়া করিবেন না হেলা। সাহিত্যিক না হইতে পারেন, কিন্তু পিটাইয়া খেলিলে সাহিত্যের মাঠেও সেঞ্চুরি করিয়া বসা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে, বিশেষতঃ যখন প্রমথনাথ 'বিজ্ঞো ক্রাইস্ট' মহাশয় জুটি হইয়া বারবার ইঁহাকে বোলারের মুখে ছাড়িতে ত্রুটি করিতেছেন না এবং একদিকে পক্ষের ও অপরদিকে শশিভূষণ ঘুষ-খাওয়া আম্পায়ারের মত পকেটে হাত ঢুকাইয়া পরমস্নেহে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন।

শঙ্করীবাবু সেঞ্চুরী করুন, তাহাতে আমার সুখও দুঃখ ছিল না। সাহিত্যের ক্রিকেটে তাঁহার সহস্র এম বি ডব্লু মার্জিত হউক তাহাতে আপত্তি ছিল না। আমি সাহিত্য-ক্রিকেটের বিরক্ত দর্শক ; জানি যে শঙ্করীপ্রসাদ আউট বলিয়া ঘোষিত হইলে প্যাভিলিয়ন হইতে পরবর্তী যিনি ক্রিজে আসিয়া দাঁড়াইবেন তিনিও সেই একই বস্তু এ-পিঠের পরিবর্তে ও-পিঠ মাত্র। শঙ্করীই হউক আর শঙ্করই হউক, বাংলা সাহিত্যের টিম সিলেকশন যা হইয়াছে তাহাতে খেলার মান উঁচু হইবার ভরসা করা দুরাশা।

কিন্তু সাহিত্যের মাঠে পর্যন্ত। তাহা অপেক্ষা দৌড়াদৌড়ি করিলে সহ্য করা সত্যই কঠিন।

সাহিত্য সমুদ্রের মত, অসীম তাহার বিস্তৃতি। নিরবধি কাল লইয়া তাহার কারবার। তাহাতে একদা আদিকবি বাল্মিকী মহানদ ব্রহ্মপুত্রের মত আপন হৃদয়-নিঃসৃত শ্লোকমালা অর্ঘ্য দিয়াছিলেন, একদা মহাকবি কালিদাস ও পরবর্তীকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের অমৃত কান্তির মোহানা সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই মহাসাগরের উপকূলে। আবার যুগে যুগে অগণিত নামহীন লেখকের দল সেই সাগরেই আপনাপন মালিন্যের আবর্জনারাশি নিক্ষেপ করিয়াছে, সমুদ্র তাহাতে মলিন হয় নাই।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু সাহিত্যের মহাসাগরে যদৃচ্ছা 'মেক ইট গো আউট সার' করিলেও সাহিত্য-নীলাম্বুধির পবিত্রতার হানি ঘটিবে না। তাই সাহিত্য রচনার নামে তিনি কেবলমাত্র ক্রিকেট খেলা কেন কাবাডিয়ার খেলা প্রভৃতির বিষয়ে রম্যরচনা চালাইলেও আমরা অনায়াসে তাঁহাকে উপেক্ষা করিতাম। বস্তুতঃ, সাহিত্যের মুখ চাহিয়া প্রতিবেদন রচনা করিতে হইলে শঙ্করীপ্রসাদকে সমালোচনা করিতে যাওয়াই একান্ত ভুল; তাঁহাকে অবজ্ঞা করাই অপরাধ।

তথাপি মশা মারিতে কামান দাগিবার আয়োজন করিতেছি, কারণ শঙ্করীপ্রসাদ কেবলমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রকে নর্তন-কুর্দন করিয়াই ক্ষান্ত নহেন; এমন একটি মাটির বাসনকোসনের দোকানে এই শঙ্করবাহনটি ঢুকিয়া পড়িয়াছে যে স্থল হইতে অবিলম্বে ইহাকে না তাড়াইতে পারিলে অপূরণীয় ক্ষতি ঘটিবার সম্ভাবনা।

তাহা হইতেছে শিক্ষার ক্ষেত্র।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নামক একটি অদ্ভুত চিড়িয়াখানা আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া পুষিয়া রাখিয়াছি। একটি প্রতিষ্ঠানে যত প্রকার স্যাঙাতের লালন-পালন হইতে পারে তাহা একসঙ্গে সংগ্রহ করিলে তুলনায় লণ্ডন চিড়িয়াখানায় আর কিছুমাত্র জেল্লা পাওয়া যাইবে না। যত প্রকার বস্তু দ্বারা চেয়ার প্রস্তুত হইবার কথা আমরা ভাবিতে পারি—কাষ্ঠ অথবা ধাতু, মণিমুক্তা, এমন কি ইলেকট্রিক চেয়ার পর্যন্ত—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারগুলি তদপেক্ষা পৃথক উপাদানে প্রস্তুত; সেগুলি স্যাঙাত দ্বারা নির্মিত। কোনও বিশেষ চেয়ারের কথা তুলিয়া ফল নাই, এখানকার প্রত্যেকটি চেয়ার এবং কোন-না-কোন প্রকার স্যাঙাত বাগর্থমিবসম্পৃক্ত।

তথাপি, এই মৌল তথ্য স্মরণ রাখিয়াও, বলিতে হইবে শঙ্করীপ্রসাদের মত একটি মারাত্মক স্যাঙাত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় উর্বর ক্ষেত্রেও অধিক ফলে নাই।

কেন, বলিতেছি।

ইতঃপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলি কেলেঙ্কারি ঘটিয়াছে তাহা—তর্কের খাতিরে বলা চলে—কর্তৃপক্ষের অগোচরে ঘটিয়া বসিয়াছে; এই সব চমৎকারজনক ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষ বলিতে পারেন, এইরূপ হইবে তাহা পূর্বাহ্নে কী করিয়া বুঝিব? বস্তুতঃ ঐ সকল ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী জানিয়া-শুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাবধান হন নাই এরূপ অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন।

কিন্তু শঙ্করী-কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে?

না, শঙ্করীপ্রসাদের কেলেঙ্কারি সমশ্রেণীর নয়, পৃথক শ্রেণীর। কিন্তু নিঃসন্দেহে এইটি অধিকতর মারাত্মক।

একজন অধ্যাপক তাঁহার প্রিয়দর্শিনী তরুণী ছাত্রীকে প্রেমপত্রের পর প্রেমপত্র লিখিয়া যাইতেছেন ইহা যদি শুধু আপত্তিকর বলিয়া মনে করি, তবে অপর একজন অধ্যাপক—খামে বন্ধ চিঠিতে নহে, দস্তুরমত ছাপানো পুস্তকে—এবং তাহা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে—বিপরীত বিহারের বর্ণনা ও আলোচনায় রসোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাকে কী বলিব?

শঙ্করীপ্রসাদ বসু কেবলমাত্র বিপরীত বিহারের বর্ণনায় আপন রমণীয় লেখনী খেলাইয়াছেন ভাবিবেন না, বিহার ছাড়াইয়া ছত্রিশগড়ের গহন অরণ্যেও দুঃসাহসী অভিযান করিতে তিনি ভয় পান নাই—'নিয়দেহের রোমাবলী' শিরোনামায় তিনি প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু এ সকল বিশদ বর্ণনার সময় এখনও আসে নাই; এখন এই সকল কদর্য কর্মের ইঙ্গিতমাত্র দিয়া

আমি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিতে চাই : এইরূপ জুগুপ্সা-উদ্রেকী বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিবার পর—স্মরণ রাখিবেন, এই সকল অপকীর্তিতে হাত পাকাইবার পূর্বে নহে, পরে—বিশ্ববিদ্যালয় যদি শঙ্করীপ্রসাদকে অধ্যাপনার কর্মে নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং অধ্যাপনার বিষয় যদি হয় বিপরীত বিহার, দেহমন্থন, রোমাবলী ইত্যাদি কণ্টকিত উক্ত গ্রন্থটি, তাহা হইলে কোন্ সাহসে আমাদিগের কন্যা কিংবা ভগিনীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইব ?

এ পর্যন্ত আমার প্রতিবেদনে পূর্বাপর্য বজায় রাখিতে পারি নাই : আগের কথা পরে দিয়াছি, পরের কথা আগে ; যুক্তি সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করিয়াছে, সিদ্ধান্ত দণ্ডাদেশকে। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে বিপরীত বিহার।

এইবার বক্তব্যটি একটু গুছাইয়া বলা যাউক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে তরুণতম অধ্যাপক হিসাবে শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ কিছুদিন পূর্বে যোগ দিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠন হইতেছে তাঁহার অধ্যাপনার বিশেষ বিষয়।

অপর যে কোন বিভাগ হইতে বঙ্গসাহিত্য বিভাগের অধ্যাপনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে যদি কোন বিদেশী ব্যক্তি সশ্রদ্ধ কৌতূহল বোধ করেন তবে স্বভাবতঃই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগকে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ অথরিটি বলিয়া জ্ঞান করিবেন। ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ কথা জানিতে হইলে আমরা অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের প্রতি জিজ্ঞাসু চক্ষু ফিরাই ; অর্থশাস্ত্রের জন্য লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সে ; আরবী ভাষার জন্য আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ; উর্দুর জন্য আলিগড় ; তামিল ভাষায় সন্দেহ উপস্থিত হইলে আমরা অবশ্যই পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা মাদ্রাজের মতামতই মানিয়া লইব। সেইরূপ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই চূড়ান্ত মত প্রকাশের অধিকারী।

এই কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠনের জন্য একজন তরুণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তখন আমরা স্বতঃই কল্পনা করিব সেই অধ্যাপক বৈষ্ণ সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন।

শঙ্করীপ্রসাদের বৈষ্ণব-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির কী লক্ষ দেখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচকমণ্ড তাঁহাকে মনোনয়ন করিলেন ? শঙ্করীবাবুর কি কো মৌলিক গবেষণা-কর্ম আছে ? তিনি কি বৈষ্ণ সাহিত্যের গবেষণায় ডক্টরেট উপাধি পাইয়াছেন তিনি কি কোনও উচ্চমানের বৈষ্ণব-সাহিত্য-বিষ প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে না, ইহার কিছুই হয় নাই। তবে কোন্ গুণে শঙ্করীপ্র নির্বাচিত ?

সেই গুণ হইল দুইখানি গ্রন্থ রচনা : মধ্যযুগের ও কাব্য (বৈষ্ণব কবি ও কাব্য), প্রকাশ ১৩৬২ ; চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, প্রকাশ ১৩৬৭।

এই দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশের ফলে বিশ্ববিদ্যাল নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট শঙ্করীপ্রসাদ বৈষ্ণব-সাহি অথরিটি বলিয়া গণ্য হইলেন। তাহা হইলে পুস্তক বড় সহজ বস্তু নহে, বৈষ্ণব-সাহিত্যের সমালোচনা মূল্যায়নে ইহারাই বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত অথরিটি। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত, অতএব তাবৎ সমাজের নিকট ইহারা স্বীকৃতি দাবি করে। চণ্ডী বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস—ইঁহারা শঙ্করীপ্রসাদের সহিত একমত না হন তবে তাঁহা মত লইয়া তাঁহারা ঘুমাইয়া থাকুন, আমরা তাঁহা ভোট দিব না। ইঁহারা কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যা নহেন, যতদূর জানি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোনও ডিগ্রি পর্যন্ত ইঁহারা পান নাই ; দুই-একখানি পুথি হয়তো ইঁ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলা নিতান্তই তালপা পুথি, সাড়ে বার টাকা দামের রেক্সিনে মোড়া ছাপ বই তাঁহাদের কোথায় ? তদুপরি বিদ্যাপতি-চণ্ডী ফ্রয়েড হ্যাভেলক এলিসাদি পাঠ করেন নাই, ফলে কোন্ যৌনাঙ্গের কোন্ কোন্ প্রতীক হইতে পারে বিষয়ে তাঁহাদের ধারণা জন্মিবে কী করিয়া ? অত বৈষ্ণব-সাহিত্য বুঝিতে হইলে চণ্ডীদাস বিদ্যাপ পদাবলী পাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র, শঙ্করীপ্রসাদের যৌনত

ারে আলোকিত গবেষণা পাঠ করিলেই তবে লী-তত্ত্ব বুঝা সম্ভব।

দাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন শঙ্করীপ্রসাদ স্বয়ং ইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি তেছেন:

'গ্রন্থমধ্যে অতি-বিস্তারিত ভাবে বিদ্যাপতির পদ উদ্ধৃত াছি,—আসলে বিদ্যাপতির পদ নয়,—পদের অনুবাদ। দ্ধৃত না করিয়া অনুবাদ এত বেশী পরিমাণে উদ্ধৃত াম কেন, তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত।…আমার বিশেষজ্ঞের মত অবিশেষজ্ঞ রসিক পাঠকের জন্যও ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকেরা বিদ্যাপতির পদ বুঝিতেন না।"

ক্ষণীয়, শঙ্করীবাবু পুস্তকটি বিশেষজ্ঞ পাঠকের জন্যও য়াছেন। এবং অবিশেষজ্ঞ পাঠকের জন্য দয়া- শ হইয়া মূল পদাবলী পাঠের পণ্ডশ্রম হইতে বাঁচাইয়া ছেন।

এইবার ভূমিকা ছাড়াইয়া, [গ্রন্থেরও বটে, প্রতি- নেরও বটে] আমরা গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিব। দেখিব, বিদ্যালয়ের নিকট পদাবলীর ভাষ্য হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের গ্রন্থ দুইটি কোন্ গুণে করিতে পারিল।

প্রথম পুস্তকখানি [মধ্যযুগের কবি ও কাব্য] সম্বন্ধে ক তিরস্কার করিয়া লাভ নাই। গ্রন্থকার ভূমিকাতেই ধূর্ত কৈফিয়ত দিয়া রাখিয়াছেন যে যত কিছু অপরাধ রীপ্রসাদের বিরুদ্ধে সপ্রমাণ করা যাউক না কেন, ফিট অব ডাউট সূত্রে তিনি খালাস পাইবেন।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রহিয়াছে:

"কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের—আমার াপকদেরও—মতের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। চার মতানুগত্যকে আমি ভক্তির নিদর্শন মনে করি।"

এই কথা বলিয়া নির্বিচার প্রলাপোক্তিতে পৌনে শত পৃষ্ঠার পুস্তক প্রকাশ করিয়া অবশেষে াঁচ র পরে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় শঙ্করীবাবু াপি বলিলেন:

"ইতিমধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে আমার মত কিছু বদলাইয়াছে, এবং আমার ভাষাভঙ্গিরও নিশ্চয় কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বক্তব্য ও রচনারীতি এত বেশী সংখ্যক সুধী ও রসিকজনের ভালো লাগিয়াছে যে, সেখানে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় নাই।"

ভাষাভঙ্গির পরিবর্তন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, যথা, ১৩৬২ সালে যাহা ছিল 'কোন কোন', ১৩৬৭ অব্দে তাহাই ও-কার যোগে 'কোনো কোনো' হইয়াছে। ইহা হইতে সাধারণ লোক কোন তাৎপর্য না পাইতে পারে, কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদের মত যাঁহারা ফ্রয়েডীয় শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে এই পাঁচ বৎসরে শঙ্করীপ্রসাদ কিঞ্চিৎ গোল হইয়াছেন, তাঁহার তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হইয়া কিঞ্চিৎ মেদ জমিয়াছে। ও-কার গোলত্বের এবং ভোঁতাত্বের প্রতীক। [এই কথা অবশ্য ফ্রয়েড বলেন নাই, কিন্তু ফ্রয়েডের নামে যাহা ইচ্ছা চালাইয়া দিলে ধরিবে কে?]

কিন্তু ভাষাভঙ্গির পরিবর্তন না হয় বুঝা গেল, মত-পরিবর্তন বুঝিব কী উপায়ে? পরিবর্তিত মত যখন শঙ্করীপ্রসাদ প্রকাশ করেন নাই, তখন প্রকাশিত মত-গুলির কোন্‌টি ১৩৬৭ সালের শঙ্করীপ্রসাদের আর কোন্‌টি বা ১৩৬২র শঙ্করীপ্রসাদের তাহা বুঝিবার উপায় কী? উপায় নাই, এবং ইহাই বেনিফিট অব ডাউট পাইবার জন্য অব্যর্থ ফিকির। যখনই এই পুস্তকের কোন একটি পয়েন্ট তুলিয়া আপনি শঙ্করীবাবুর কাপড় খুলিয়া দিবার উপক্রম করিবেন তখনই তিনি বলিতে পারিবেন, 'রামচন্দ্র, ওই মত তো আমি কবে বদলাইয়া ফেলিয়াছি!'

প্রথম সংস্করণে যে ডেঁপো গ্রন্থকার আপন অধ্যা-পকদের মতের প্রতিবাদ করিবার বড়াই করিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সেই-ই আবার মতানৈক্য সত্ত্বেও আপন পুরাতন বক্তব্যের পরিবর্তন করিল না; কেন? না, সেই ভুল বক্তব্য 'রসিকজনের ভালো লাগিয়াছে।' ইহা সীরিয়াস সাহিত্য-সমালোচনার রীতিতে অশ্রুতপূর্ব; তাহাতে 'ভালো লাগা' অপেক্ষা সত্য-পরায়ণতা প্রয়োজনীয় গুণ। যে রচনায় জরাগ্রস্ত সত্যকে স্ত্রৈণের মত রমণীয়তার আঁচলের আড়ালে লুকাইতে হয় তাহা গবেষণা কিংবা সমালোচনা নহে, তাহার নাম রম্যরচনা।

বস্তুতঃ, শঙ্করীপ্রসাদ সর্বাংশে রম্যরচনার গ্রন্থকার, তদপেক্ষা ভারী মাল তাঁহার মধ্যে আদৌ নাই।

রম্যরচনার শ্রেণীতেও উত্তম সাহিত্য-কর্ম এক-আধটি জন্মিতে পারে। কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদের রম্যরচনার ঢঙ একেবারে পর্যুষিত সিনেমা-পত্রিকার উপযোগী, তাহাতে সাহিত্যের স-ও অসম্ভব। নমুনা দেখুন:

"সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ চিত্র। যমুনার পথে কাল-ননদিনীর সঙ্গে গমনরতা রাধিকার বঙ্ক নয়নের কুঞ্চ-কটাক্ষ যদি পাঠককে তৃপ্ত করিতে না পারে, সে পাঠকের দোষ। [পাঠকের স্বল্পশিক্ষিত পিতা-মাতারও দোষ আছে—তাঁহারা যৌনশাস্ত্র অনুসরণে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করিতে শেখান নাই, ফলে পাঠক শ্রীরাধার কটাক্ষ হইতে তৃপ্তি অন্বেষণ করিতে সাহসী হন নাই।] যা হোক, ওই কটাক্ষের পরিণতি জানাইতে কবি আরো কয়েক পংক্তি যোগ করিয়াছেন,... [অতঃপর ছয় লাইন উদ্ধৃতি আছে।]

কবিতার শেষ। মূল বক্তব্য, অলখিতে শ্যামের আগমন এবং অলখিত চুম্বনের পর প্রস্থান। তাতে ভাবে রাধার তনু অবশ। পাঠকের?"

শেষ প্রশ্নটি শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন অপেক্ষা কম তাৎপর্যময় নহে। রাধার তনু অবশ। এই দৃশ্য কল্পনা করিয়া পাঠকের তনু কী রূপ হইল তাহা শঙ্করীর জিজ্ঞাসা। আমরা ইহার উত্তর দিতে অপারগ [সিনেমা পত্রিকায় নায়ক-নায়িকার ঘনিষ্ঠ পোজের ছবির নীচে এইরূপ প্রশ্নের ক্যাপশন অনেক দেখিয়াছি, তাহারও উত্তর দিতে পারি নাই।] কিন্তু কল্পনা করুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ জ্ঞানদাসের পদাবলী পড়াইতে পড়াইতে একবার ছাত্রদের প্রতি ও একবার ছাত্রীদের প্রতি এই প্রশ্নটি বর্ষণ করিলেন: অলখিত চুম্বনের পর তোমাদের তনু কিরূপ হইয়া থাকে? তখন যদি কোনও উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র [শঙ্করীবাবুর মতই যে নাকি অধ্যাপকের প্রতি নির্বিচার মতানুগত্যের ভক্তিতে বিশ্বাসী নহে] শঙ্করীপ্রসাদকে মহাপ্রসাদ বানাইয়া অবশ করিয়া দেয় তবে আশ্চর্য হইবার কী থাকিবে?

উপরি-উদ্ধৃত অংশের অনতিদূরেই পাইলাম, "লুব্ধ বাসনার মোক্ষম কবি-ভাষা।"

ইহার পূর্বে শঙ্করীবাবুর গুরুচণ্ডালী ভাষার নিন্দা করিব ভাবিতেছিলাম; সাধু ভাষায় রচিত পুস্তকে 'যা হোক' 'সঙ্গে' (সহিত অর্থে), 'তাতে' ইত্যাদি চলিত ভাষার শব্দ প্রয়োগ অসমীচীন হইয়াছে, এই মন্তব্য করিবার পূর্বেই দেখিলাম ওই "মোক্ষম" শব্দ-প্রয়োগ এবং ইহাই ভাষার বিষয়ে আমার যাহা কিছু সমালোচনা তাহার উপর শঙ্করীপ্রসাদের মোক্ষম শঙ্কতাড়না। জ্ঞানদাসের পদাবলীর বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য বিদগ্ধ আলোচনায় 'মোক্ষম' শব্দ যিনি প্রয়োগ করিতে পারেন তাঁহাকে ভাষা শিক্ষা দিবার দুঃসাহস চার্বাকের নাই।

বস্তুতঃ, জ্ঞানদাস সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে শঙ্করীপ্রসাদের কদর্যতাকে নিন্দা করিবার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। বিদ্যাপতি এবং বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে শঙ্করীপ্রসাদ পর্নোগ্রাফির পর্যায় স্পর্শ করিয়াছেন [সে-প্রসঙ্গে অবিলম্বেই আসিতেছি] সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐরূপ বিকার কেবলমাত্র লেখকের মূর্খতা দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তাহার জন্য লেখককে শঠ ভাবিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু জ্ঞানদাসের পদাবলীতে অশ্লীল টীকা প্রয়োগ তো শুধু মূর্খের পক্ষে সম্ভব নহে, তাহার জন্য সেই চরিত্র প্রয়োজন যাহাকে প্রাকৃত বাংলায় বলা হয় 'বোকা বজ্জাত'।

জ্ঞানদাস চৈতন্যপরবর্তী যুগে পদাবলীকার মহাজন। তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব। যে-যুগে তাঁহার আবির্ভাব সে-যুগে চৈতন্যদেবের ভক্তিরসাপ্লুত বৈষ্ণবধর্মের নিষ্কলুষ রূপ দীপশিখার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তখন বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় ভক্তি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন আবেগ নাই।

সেই জ্ঞানদাসের একটি পদের কয়টি চরণ লইয়া শঙ্করীপ্রসাদের বোকা-বজ্জাতি দেখুন:

"একলি মন্দিরে শুতলি সুন্দরি
কোরহি শ্যামর চান্দ।
তবহুঁ তাকর পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমক ধন্দ॥

অর্থ: সুন্দরী মন্দিরে একলা শ্যামচাঁদের কোলে সারারাত্রি ['সারারাত্রি' কথাটি মূল পদে কোথায়?] শুইয়াছিল, কিন্তু তাহার স্পর্শ ঘটে নাই। সখীরা এই ধাঁধায় বিমূঢ়।

বৈষ্ণব পদবিষয়ে সাধারণ অভিযোগ—ইহাতে
লুতার আতিশয্য। জ্ঞানদাস অন্ততঃ এমন একটি পদ
য়াছেন, যেখানে শ্যাম রাধাকে সারারাত্রি কোলে
য়াও মন্থন করেন নাই।…ঐ প্রকার আচরণ যে সম্ভব
থা আমরা চমৎকৃত।…দেহমন্থনে বৈষ্ণবকাব্যে
র ওঠে না,—কিন্তু দেহমন্থনের পূর্ণ সুযোগ সত্ত্বেও,
ক নায়িকা একত্র নির্জনবাস করিয়াও, নিবৃত্ত থাকিতে
—ইহার একটিমাত্র কারণই সম্ভব,—সুখ বা তৃপ্তি
ল দেহেই নাই, দেহেও আছে, দেহের বাহিরেও
চ— এক অপূর্ব ভাবাচ্ছন্নতায় প্রেমিক-প্রেমিকা
ই শয্যায় অমথিত রাত্রিযাপন করিল—এই কল্পনায়
না রসের সত্য!"

ব্যাখ্যার কী পরাকাষ্ঠা! পদে আছে 'পরশ না
কিন্তু শুধু স্পর্শে শঙ্করীবাবুর তৃপ্তি নাই, অতএব
র ব্যাখ্যা হইল "মন্থন করেন নাই"! এক বার দুই
নয়, চারি বার মন্থন-দেহমন্থন-অমথিত ইত্যাদি
র পৌনঃপুনিকতা। ছয় বার 'দেহ' শব্দের পুনরুক্তি!
এক বালিকাকে স্পর্শ না করিলে কী হইবে, শঙ্করী-
ে ছাড়িতে রাজী নহেন। তিনি বারংবার মনে
য়া দিলেন, রাধাকে 'মন্থন' না করিলে কী হইবে,
ে তাহার সহিত এক শয্যায় রাত্রিযাপন করিয়াছেন!
এমন অজ্ঞানদাসদের হাতে পড়িবে বুঝিলে জ্ঞানদাস
বলী রচনা করিতেন মনে হয় না।

জ্ঞানদাসের যদি এই দুরবস্থা তবে বড়ু চণ্ডীদাস যে
রীবাবুর হাতে কী হইবেন ভাবিতে ভয় হয়।

দেখিলাম সত্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এমন ব্যাখ্যা শঙ্করী-
াদ করিয়াছেন যাহাতে সন্দেহ হইবে ইনিই বোধ হয়
নামে বোম্বাই ফিল্মের রক-এন-রোলের সুরকার ও পি.
ার।

সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে ভয় হইতেছে; চার্বাক কলিকাতা
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নহে, বৃন্দাবন-লীলার যেরূপ
কিক বর্ণনা শঙ্করীবাবুর হাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে
া চার্বাকের উদ্ধৃতিতে দেখিলে বৈষ্ণবকুল হয়তো
াকের প্রতিই অভিশাপ বর্ষণ করিবেন। তাই
ক্ষেপে নমুনা দিতেছি:

"কবি রাধা নাম্নী একটি এগার বৎসরের বালিকাকে তাঁহার কাব্যে অবতীর্ণ করাইলেন। বলা বাহুল্য এ রাধা কোন ভাববৃন্দাবনের নয়। সে একেবারেই লৌকিক।… আয়ানহারা অবস্থায় সর্বস্ব খোয়াইয়া কেলিদার মেয়ে সে নয়। রতিই জাগিল না, আরতি কোথায়।…কৃষ্ণ রাধার রূপের কথা শুনিয়া মজিয়াছে…কামাহত কৃষ্ণ ষড়যন্ত্র করিয়া রাধাকে পথে আটকাইল। রাধিকা পসরা লইয়া যাইতেছে, সুতরাং কৃষ্ণের দান চাই।…কৃষ্ণ বলিতেছে, হয় অর্থ, নয় দেহ, যে কোন একটি দাও; তৃতীয় কোন বিকল্প নাই। আবার অর্থ হইতে দেহের প্রতি কৃষ্ণের অধিক আসক্তি। সেই নির্জন গ্রামপথে সহায়হীনা একটি নিতান্ত বালিকা,—অসভ্য বলিষ্ঠ গ্রাম্য যুবক তাহার প্রতি অত্যাচারে উদ্যত।…বালিকার বিরুদ্ধে এক সময় তাহাকে ভাঙিয়া পড়িতে হয়।…বালিকা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—তাহাকে করিতে হইয়াছিল। সে আত্ম-সমর্পণে…বিন্দুমাত্র হৃদয়সম্পর্ক ছিল না।…বালিকা মন বিবর্জিত করিয়া দেহটিকে একটি কামোন্মত্ত জীবের হাতে নিরুপায় বেদনা ও লজ্জায় ছাড়িয়া দিল।"

ইহার পর আর পড়িতে ভরসা পাই নাই। মনে হইয়াছে শঙ্করীবাবু আর বৎসর পঞ্চাশেক পূর্বে কেন জন্মাইলেন না? ইংরাজ রাজত্বের সময়ে খ্রীস্টান মিশনারীরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এমন ব্যাখ্যাতা পাইলে মাথায় করিয়া রাখিত। অবশ্য মিশনারীরা না থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয় আছে, গুণের কদর বুঝিতে সেও কিছু কম যায় না। না হইলে কলুটোলার গলিতে এতগুলি দুষ্ট বন্ধদের সমাচার কী করিয়া দেখিতাম!

প্রতিবেদনের সকল পাঠক বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন পাঠ করিয়াছেন, এরূপ আশা করা সঙ্গত হইবে না। যাঁহারা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের সন্দেহ হইতে পারে, পুঁথিটিতে যদি এই সকল বর্ণনা থাকে তবে শঙ্করী-প্রসাদ কী করিবেন? সেই পাঠকদের নিকট চার্বাকের দু-একটি নিবেদন আছে।

প্রথমতঃ, জ্ঞানদাস-পর্যায়ে পাঠক দেখিয়াছেন পদ হইতে অনুবাদ এবং অনুবাদ হইতে ব্যাখ্যা শঙ্করীপ্রসাদের রমণীয় লেখনীতে কেমন ধাপে ধাপে অশ্লীলতার সিঁড়ি

ভাঙিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তাহাই হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, কাব্যের অতীন্দ্রিয়লোকে যে-ভাব বিশুদ্ধ রসের স্রষ্টা, শ্রদ্ধাহীন অনুবাদকের—তদপেক্ষাও মারাত্মক, বয়স্যরচনার মজাসন্ধানী লঘুচিত্ত ফাজিলের—হাতে পড়িলে তাহাই ইন্দ্রিয়পরায়ণতার উত্তর রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে।

তৃতীয়তঃ, এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শঙ্করাভাষ্য যদি নির্ভুলও হইত তবু তাহা সর্বসাধারণের নিকট প্রচারযোগ্য ছিল কি? সত্য-মিথ্যা জগদীশ্বর জানেন, শুনিয়াছি শঙ্করীবাবু বিবেকানন্দের শিষ্য (বা প্রশিষ্য) এবং রামভক্ত হনুমানের মতই তিনি বিবেকানন্দের প্রচণ্ড ভক্ত। এই সংবাদ সত্য হইলে শঙ্করীপ্রসাদকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে বিবেকানন্দ বৈষ্ণব-কবিতার সাধারণ প্রচারের বিরোধী ছিলেন; তাঁহার মতে সাধারণের শ্রদ্ধাহীন চিত্তে বৈষ্ণব-কবিতা কামুকতার প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিয়া থাকে। মূল পদাবলী সম্বন্ধেই যদি বিবেকানন্দ এতদূর শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইলে এই শঙ্করাভাষ্য দেখিয়া তিনি কী বলিতেন?

যতই ভাবিতেছি, ততই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে যে শঙ্করীপ্রসাদ বাস্তবিকই বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। কেন, বলিতেছি।

বিবেকানন্দ কী ভাবিয়া বলিয়াছিলেন বৈষ্ণব-কবিতা কামুকতার স্রষ্টা তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু চৈতন্যদেবের আশ্চর্য প্রতিভায় বৃন্দাবনলীলার উপর এমন একটি সর্বগ্রাসী ভক্তির জ্যোৎস্না বহিয়া গিয়াছে যে সুস্থমনা পাঠকের অন্তরে বৈষ্ণব-কবিতার সহিত কামপ্রবৃত্তির মৌল বিরোধ ঘটিয়া যাইতে বাধ্য। ইহার অজস্র ব্যতিক্রম আছে অস্বীকার করিব না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া কোন কোন বিপরীত প্রতিভাধর শিশু বিদ্যালয় পালাইবার নীতিশিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে শুনিয়াছি; বৃন্দাবনলীলা হইতেও কেহ কেহ কামুকতার কুপথ্য সংগ্রহ করিলে ব্যথিত হইতে পারি, বিস্মিত হইব না।

তবু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম মাত্র। সাধারণ মানুষের উপর চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম যে-প্রভাব সাধারণতঃ বিস্তার করিয়াছে তাহা কামনার বিশুদ্ধ রূপান্তর—ভক্তি লিবিডোর সাব্লিমেশন।

বৈষ্ণব পদাবলী হইতে সাধারণের কামবৃত্তি প্রবলতর হইবার পরিবর্তে যদি সাব্লিমেটেড হইবার লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে তো বিবেকানন্দের উক্তি মিথ্যা হইয়া গেল! বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ শিষ্য শঙ্করীপ্রসাদ কী করিয়া এতদূর গুরুনিন্দা সহ্য করিবেন। তিনি তাই কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িলেন, ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করিয়া হউক বিবেকানন্দের উক্তি সপ্রমাণ করিতে হইবে বৈষ্ণব-কবিতা হইতে কামুকতা-উদ্রেক হওয়া যে একেবারে স্বতঃসিদ্ধ ইহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত ভক্ত মহারাজের অন্ন বিস্বাদ, নিদ্রা বিশ্রামহীন, এমন কি ক্রিকেট পর্যন্ত অরমণীয়!

অতএব শঙ্করীপ্রসাদ গ্রন্থ রচনা করিতে বসিলেন এমন গ্রন্থ যাহা প্রকাশ্যত বৈষ্ণব কাব্য সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, কিন্তু যাহার 'খোলস ছাড়াইলে'-ই [ফ্রেজটি শঙ্করীবাবুর প্রিয়] দেখা যাইবে পাঠকের সুপ্ত কামবৃত্তিকে উত্তেজিত উদ্বেজিত করিবার জন্য সচেষ্ট উদ্যোগের প্রাণান্তকর পরিচয় ছত্রে ছত্রে কণ্টকিত।

উপরি-উক্ত প্রচেষ্টার প্রমাণ দিবার জন্য চার্বাককে পরিশ্রম করিতে হইবে না। পাঠক যদি এ পর্যন্ত প্রতিবেদন পাঠে ইহা না বুঝিয়া থাকেন তবে পরবর্তী অধ্যায় পাঠে তিনি নিঃসন্দেহ হইবেন।

এইবার আমরা দ্বিতীয় গ্রন্থখানি হাতে লইব। প্রতিবেদনটি সম্ভবত ইতোমধ্যেই আট পৃষ্ঠা ছাড়াইয়া গিয়াছে, আর বেশী কলেবর-বৃদ্ধি করিলে সম্পাদক উভয় সঙ্কটে পড়িবেন। এই কারণে আমি এখানির আলোচনা সংক্ষিপ্ত ভাবে করিব। যদিও বস্তুবিচার করিয়া দেখিলে ইহার আলোচনা সংক্ষিপ্ত ভাবে না করিয়া ক্ষিপ্তভাবে করিলেই সঙ্গত হইত।

প্রথমতঃ ইহা হইতে কয়েকটি ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত উক্তি উদ্ধার করা যাউক। প্রথমে, জয়দেব সম্পর্কে—

পৃ. ১৭৭—জয়দেব দেহেই সমাপ্ত...

পৃ. ১৭৭-৮—জয়দেবের অগভীরতা নিতান্ত বেদনা-

ঞক,—লুব্ধ মনে ও নয়নে···একটি সুন্দর দেহের তিনি র-প্রহরী।

পৃ. ১৭৮—বৈষ্ণবকাব্যের পৃথিবী সত্যই রতিমন্দির-প্তু।

পৃ. ১৭৯—জয়দেবের যাহা কিছু বাধা—ভোগগত,··· রাধা লম্পট নায়কের অন্য গেহে ও দেহে প্রস্থানের··· । ···জয়দেবে আছে শুধু মদনমনোহর বেশে সুখসার গতি, কুঞ্জদ্বারে মেখলার জয়ডিণ্ডিম ধ্বনি এবং ক্ষ করিতে করিতে সুন্দর কুঞ্জভবনে কেলি-শয্যায় রোহণ।

পৃ. ১৮০—জয়দেবে আত্মা তো দূরের কথা হৃদয় য নাই। শুধু দেহ আর দেহ। সজ্জিত, সুপুষ্ট, সমর্থ দুই দেহ। যাহা কিছু সংঘাত—দেহে দেহে। া কিছু সমস্যা—দেহের। যাহা কিছু সমাধান—হই।

অতঃপর মহামান্য বিচারপতি শঙ্করীপ্রসাদের এজলাসে সামী বিদ্যাপতির কী দুরবস্থা হইল দেখা যাউক।—

পৃ. ১৮৭—বিদ্যাপতির প্রেম-পদাবলীকে তিন ভাগে গ করা চলে। প্রথম ভাগ লৌকিক প্রেম। এই মের মধ্যে পড়ে কুটনী, সাধারণী ও পরকীয়া নারীর ম।···রাধাকৃষ্ণের কথায় বা কার্যে এ ক্ষেত্রে কুটনী ও ধারণীর অনুরূপ ইতরতা।

পৃ. ১৮৮—কুটনী একেবারে সাধারণী বনিতা।··· রী কখন ও কেন কুলধর্ম ত্যাগ করে, তাহা সম্পূর্ণভাবে া কঠিন। অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণের একটি হইল, া, যাহা ভাবিতেছেন তাহা নহে, কলিকাতা বিদ্যালয়ে বৈষ্ণবপদাবলী অধ্যয়ন করাকে একটি কারণ প শঙ্করীপ্রসাদ নির্দেশ করেন নাই।] স্বামীর বিদেশ-ন। [শঙ্করীবাবু যে কখনও বিদেশ-যাত্রা করিবেন আমেরিকা হইতে লেকচার টুরের আমন্ত্রণ পাইলেও এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম।]

পৃ. ২২৩—(পরিচ্ছেদের শিরোনামা) অভিসারের না : মন্মথ-প্রণাম। (অতঃপর পরিচ্ছেদ শুরু হইল) োলস ছাড়িয়া তরুণ সর্পটি বাহির হইয়াছে। স ৌতুকে—কৌতূহলে—ক্ষুধায় দংশন করিতে চায়··· খোলস ছাড়া সর্প' বলিতে শঙ্করীবাবু কী বুঝাইতে চাহেন ইহা যে-পাঠক বুঝিলেন না, তাঁহাকে সাহায্য করিতে আমি অক্ষম : ফ্রয়েডীয় কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ কাহাকেও প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লউন—'সর্প' বস্তুটি কোন্ অঙ্গের রূপক।]

পৃ. ২৫২—নায়িকা বয়ঃসন্ধি পার হইয়াছে।··· গজগামিনীকে কবি যুদ্ধে নামাইবেন। আমরা যদি সেই যুদ্ধকাণ্ড দেখিতে চাই যেন মনের জোর রাখি। যুদ্ধে নীতিসঙ্কোচ পরিহার্য।···প্রণয়-সমরেও থাকে না শালতা-অশ্লীলতার বাধাবাধকতা।

পৃ. ২৫৫—বিদ্যাপতি অজ্ঞাতযৌবনার দেহ-থরথর প্রেমকে সংযত লোলুপতার সঙ্গে উপভোগ করিয়াছেন।··· একদিকে আছে ক্ষুধার্ত নায়ক, অন্যদিকে ভীত বালিকা। উভয়ের মধ্যস্থতায় আছে যথারীতি পরিপক্বা দূতী। দূতী···নায়ককে বহুপ্রকারে মুগ্ধা-সম্ভোগে উত্তেজিত করে···উৎসাহ দেয় নানা 'ইরিটেটিং' ['মোক্ষম'-এর পরে আর একটি মোক্ষমতর বিশেষণ।] ভঙ্গিতে,—"কুচ স্পর্শ করিলে যখন সে উহুঁ উহুঁ করিবে, তখন তুমি কত সুখ পাইবে···"।

পৃ. ২৭১-২ দেহের কাব্য লিখিতে গিয়া কবিরা যখন কোনো অবস্থাতেই কলম থামান নাই, সমালোচকও একবার আরম্ভ করিয়া থামিতে পারেন না। মিলনের নির্লজ্জতম অবস্থাটিকেও অকুণ্ঠে বিদ্যাপতি আঁকিয়াছেন। যে আচরণ পুরুষ করিয়াও সাহিত্যে বর্ণিত হইলে নিন্দার সীমা থাকে না, নারীকে সেই পুরুষায়িত ব্যবহারে নিযুক্ত দেখিলে—অবশ্যই ছি ছি। [ইহা কীরূপ বাংলা ভাষা হইল তাহা চার্বাক বুঝিতে পারে নাই। না পারিবারই কথা ; বাংলা ভাষায় চার্বাকের বিদ্যার দৌড় ইন্টার-মিডিয়েট পর্যন্ত : বুঝি ফিফ্‌থ্ ইয়ারে না উঠিলে এইরূপ ইয়ার-জনোচিত বাংলা শিক্ষা করা যায় না।]

পৃ. ২৭৪—পদটি বিপরীত বিহারের।···যে পর্বত উল্টাইয়াছে তাহা কুচপর্বত। ডগমগ দোলায়িত ধরণী আর কিছু নয় অনুরূপ চঞ্চল নিতম্ব।

অবশ্য বিদ্যাপতি সম্বন্ধে মূল বিচার শঙ্করীপ্রসাদ একেবারে শুরুতেই সারিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে বলিয়াছেন :—

"প্রেম-পদাবলীতে মুখ্যতঃ তিনি ইন্দ্রিয়ের রসদদার রহিয়া গিয়াছেন।···কারণ বিদ্যাপতি পরকীয়া প্রেমের কবি।···পরকীয়া প্রেমে হয় সর্বনঙ্কনোত্তর অপার্থিবতা, নয় নীতিদূষিত ইতরতা।"

বিদ্যাপতি কোন্ ফলশ্রুতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, অপার্থিবতা অথবা ইতরতা, তাহা শঙ্করীপ্রসাদ খুলিয়া বলেন নাই ; ঠারে-ঠোরে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

পুনরপি :—

"বিদ্যাপতির কাব্যের নায়ক ও পাঠক উভয়েই নাগরক-স্বভাব।"

'নাগরক' কাহাকে বলে,—লেখক জানাইয়াছেন—তাহা কামশাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যাইবে। কিন্তু আমরা পাঠককে বাৎস্যায়ন পাঠের পরিশ্রম করিতে বলিব না। তদপেক্ষা সহজে আসুন আপনাদিগকে নাগর চিনাই।

বিদ্যাপতির কাব্যের পাঠক নাগরক-স্বভাব। 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' নামক গ্রন্থখানির মধ্যে দেখা যাইতেছে ১০৩ পৃষ্ঠা চণ্ডীদাসের আলোচনায় এবং ৪৪৪ পৃষ্ঠা বিদ্যাপতির আলোচনায় শঙ্করীপ্রসাদ ব্যয় করিয়াছেন। তাহা হইলে শঙ্করীপ্রসাদ অপেক্ষা 'বিদ্যাপতির কাব্যের পাঠক'-এর উত্তম উদাহরণ কোথায় পাইব ?

অথবা, অন্যদিক হইতে দেখুন : শঙ্করীপ্রসাদ বিদ্যাপতির সমালোচক ; সমালোচক কাহাকে বলে ? না, বিদগ্ধ পাঠকেরই বিশেষ সংজ্ঞা সমালোচক। তাহা হইলে শঙ্করীপ্রসাদ বিদ্যাপতির কাব্যের শুধু পাঠক নহেন, বিদগ্ধ পাঠক। এবং স্বীয় বিচারসূত্র অনুযায়ী ইনি তাহা হইলে "বিদগ্ধ নাগরক"!

অতএব, পাঠক! আসুন, আমরা কামশাস্ত্র পাঠ না করিয়াই [যেন যে-দুইখানি পুস্তক আমরা এতক্ষণ পাঠ করিলাম তাহারা কামশাস্ত্র নহে!] নাগরক-চরিত্র অনুধাবন করি।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর পরিচয় হইতে প্রথমে বিদগ্ধ নাগর চিনিয়া লই। অতঃপর সাধারণ নাগর অনুমান [illegible] বুঝিব।

॥ অথ বিদগ্ধ নাগরক লক্ষণম্ ॥

বিদগ্ধ নাগর সাহিত্যিক হইতে না চাহিলে [illegible] ইচ্ছা বাস করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিক হই[illegible] চাহিলে তাঁহাকে হাওড়া নগরীর কাসুন্দিয়া পল্লী[illegible] করিতে হইবে ॥ ১ ॥ (পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।)

বিদগ্ধ নাগর যদি [illegible] মুচি অথবা মুদ্রাকর[illegible] গাঁটকাটা অথবা শুঁড়িখানার মালিক হন তবে [illegible] শুদ্ধ বাংলা লিখিতে পারেন, কিন্তু অধ্যাপক হইতে [illegible] বিশেষতঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক [illegible] হইলে তাঁহাকে ভুল বাংলা লিখিতে হইবে। [illegible] ব্যাকরণ বিশেষতঃ সন্ধিপ্রকরণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ না [illegible] কোনও অধ্যাপক বিদগ্ধ নাগর হিসাবে স্বীকৃত হই[illegible] না ॥ ২ ॥ (পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য।)

বিদগ্ধ নাগর বুদ্ধিমান না হইলে ক্ষতি নাই, [illegible] তাঁহাকে চালাক হইতে হইবে ॥ ৩ ॥

বিদগ্ধ নাগরের সাহিত্যকর্মে বহুমুখী কৌতূহলে[illegible] লক্ষণ থাকিবে ; পরন্তু সেই সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এ[illegible] মৌল সাদৃশ্যের সূত্র বর্তমান থাকিবে ; যথা, বহু[illegible] কৌতূহল—ক্রিকেট এবং পদাবলী ; মৌল সাদৃ[illegible] ক্রীড়া-সাংবাদিকতা এবং কেলি-সাংবাদিকতা ॥ ৪ ॥

বিদগ্ধ নাগরের উচ্চারণভঙ্গি, বৈশিষ্ট্যের চেষ্টা হাস্যকারিতায় বিচিত্র হইবে ॥ ৫ ॥

বিদগ্ধ নাগরের নাম শঙ্করীপ্রসাদ হইলে পদবী [illegible] হইবে ॥ ৬ ॥

পাদটীকা

১। কাসুন্দিয়া-নিবাসী অপর একজন রম্যরচনাবি[illegible] নাম শঙ্করীপ্রসাদের ভূমিকায় উল্লিখিত আছে।

২। বিদগ্ধ নাগরালির কয়েকটি উদাহরণ : ম[illegible] স্বরূপ (পৃ. ১১৩), তপোসিদ্ধি (পৃ. ১৮০), তপোক্লা (পৃ. ২৪৮) ; এইগুলি অবশ্য ব্যাকরণজ্ঞানের অভাব সূচ[illegible] না-ও করিতে পারে ; হয়তো-বা এই শব্দগুলিতে বি[illegible] স্থলে ও-কারের আগমন [ফ্রয়েডীয় সূত্রের বিচারে লেখকের স্থূলত্বের কারণে !

—

খোশনবীসের জবানবন্দি

শ্রীখোশনবীস জুনিয়র

স্পাদক মহাশয়, এ আপনার কী অত্যাচার! লিখিবার আদেশ কেন? আমি গরিব আপনার সুখ-দুঃখ য়া আছি; আপনাদের কাহারও পাকা ধানে কদাপি দিতে যাই নাই, ডালে কাঠি নাড়িবার আকাঙ্ক্ষা নাই; ঈশ্বরেচ্ছায় সকল কিছু এলোমেলো করিয়া দিকে যে-সকল নেপো নেফিউ সাজিয়া পরমানন্দে মারিতেছে, তাহাদের মুখের গ্রাসে কখনও সুখের বসাই নাই। তবে আমার প্রতি বিরূপ কেন? প নির্মম নির্দেশ কেন?

প্রলয়-পয়োধি-জলে ভাসমান অনন্তশয্যাশায়ী যোগ-মুগ্ধ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় আমিও অহিফেন-প্রসাদাৎ য়ানন্দে ভর হইয়া অনন্ত মৌতাত সাগরে পড়িয়া ছি। হেলিতেছি, দুলিতেছি, ডুবিতেছি, ভাসিতেছি। ঘারাম বুঁদ হইয়া ব্রহ্মস্বাদসহোদর মৌতাতের অকুল রে অচিন্ত্য পরমহংসের ন্যায় কেবলই হাবুডুবু তেছে; নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার সহিত নি ক্রীড়া করিতেছে। জগতে আর-কেহ কোথাও , আর-কিছু কোথাও নাই। কুল নাই, কিনারা , সাধ নাই, সাধ্য নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, ভ নাই, বাসনা নাই—এমন-কি আকাদেমী পুরস্কার ভর আশা পর্যন্ত নাই। সম্পাদক মহাশয়, ভাবিয়া ন, বঙ্গীয় লেখক কতদূর নির্লিপ্ত হইলে এইরূপ ঘটা র। বঙ্গীয় লেখক মহাশয়গণ আর-সকল ছাড়িতে রন; কেবল পুরস্কারের লোভ ছাড়িতে পারেন না। গণ অক্লেশে সততা ছাড়িতে পারেন, সম্মান ছাড়িতে রন, সাধনা ছাড়িতে পারেন, এমন-কি আদরের রিণী সর্বেসর্বময়ী তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী পর্যন্ত অকাতরে র্জন দিতে পারেন। কিন্তু পুরস্কারের লোভ পরিত্যাগ? থাকিতে কখনও নহে। পুরস্কারই এক্ষণে বঙ্গীয় কের প্রাণ—শৈশবে মাতৃক্রোড়, যৌবনে চিত্রনটীর লের বাতাস এবং বার্ধক্যে পেনশ্যন। পুরস্কারই ণে লেখকের আশা-ভরসা-হতাশা। পুরস্কারই এক্ষণে লেখকের জীবন-মরণ-শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডীকরণ। চিরকাল আকাশ ঘেরিয়া জাল ফেলিয়া যাঁহাদের তারা ধরা ব্যবসায়, হরেক কিসিমের পুরস্কারের জালে এক্ষণে তাঁহারাই সকলে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। পুরস্কারের ফাঁদে ব্রহ্মা-বিষ্ণু কাঁদে। পুরস্কারের পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া রেস্তোরোগী বঙ্গীয় লেখক এক্ষণে নাজেহাল। (হায়, রেসের মাঠের আরবী ঘোড়াও অত ছুটে না।) সম্পাদক মহাশয়, শুনিয়াছি জনৈক ধুরন্ধর ব্যবসায়ী লেখক পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবার জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। (সময়কালে উহার দু-এক হাজার আপনার ঘরেও আসে নাই কি? না আসিয়া থাকিলে উহার চেষ্টা দেখুন। শুনিতেছি বাঘা-বাঘা বহু সাহিত্যিকই নাকি টাকার থলি হাতে লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন।) আকাদেমী পুরস্কার আবার এই সকল পুরস্কারের সেরা। মাননীয় সরকার বাহাদুর সকলের অপেক্ষা উচ্চ শিকায় উহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। নিচে লেখকরূপী মার্জারগণ উহার প্রতি একাগ্র লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছেন। কেহ জিভ চাটিতেছেন; কাহারও সরস নোলা দিয়া জল গড়াইতেছে। হরেক কিসিমের উৎকোচে-উপচারে খোশামোদে-তোষামোদে যে ভাগ্যবান প্রাতঃস্মরণীয় ক্ষণজন্মা মার্জারের ভাগ্যে কোনক্রমে একবার শিকা ছিঁড়িতেছে, তিনি ধন্য হইতেছেন, আপনাকে এবং আপনার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়, গাধা পিটাইয়া নাকি ঘোড়া বানানো যায় না। কিন্তু পিটাইয়া পারা না গেলেও, আকাদেমী পুরস্কার দিয়া উহা করা যায়। আকাদেমী পুরস্কার লাভ করিলে বেতো গাধাও পক্ষীরাজের ডিরেক্ট ডিস্ক্যানড্যাণ্ট বলিয়া বাজারে চলিয়া যায়। এইরূপ সর্বসিদ্ধিদায়িনী সুখশান্তিবিধায়িনী সর্বপাঠকগ্রাহ্য এবং সর্বলেখককাম্য স্পেশিয়াল বৃহৎ বগলামুখী কবচের ন্যায় দুর্লভ আকাদেমী পুরস্কারের প্রতিও এক্ষণে এই অধমের

কোন আকর্ষণ নাই। এক্ষণে শ্রীখোশনবীসও জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক বিশীদার ন্যায় বলিতে পারে: পুরস্কার দিলেও আমি উহা ফিরাইয়া দিব। এক্ষণে মৌতাতরূপে-সংস্থিতা দেবী মহামায়ার কৃপায় আমার কিবা রাত্রি কিবা দিন। এক্ষণে আমার নিকট সকলই এক হইয়া গিয়াছে;—পুরস্কারে-তিরস্কারে ভেদ নাই। মৌতাতের সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে-খাইতে আত্মারাম কণ্ঠনালীর নিকট আসিয়া ধুক্‌পুক্ করিতেছে। পঞ্চভূতের বাঁধন সম্পূর্ণ কাটে নাই, কিন্তু ষড়রিপুর দাসত্ব পুরাপুরি ঘুচিয়া গিয়াছে। এমত সময়ে আমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য মধুকৈটভের ন্যায় আপনার আবির্ভাব কেন? সাক্ষাৎ আদালতের পিয়াদার ন্যায় আপনার দূত আসিয়া সম্পাদকীয় সমন ধরাইয়া দিয়া গেল কেন?

মৌতাতে বুঁদ হইয়া জগৎ-সংসারের এক জটিল চিরন্তন সমস্যার কথা ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, এ সংসারে কে কার? আমি কার, কে আমার? তুমি কার, কে তোমার? অহিফেন-প্রসাদাৎ দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল, জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছিল। মৌতাতের কৃপায় চক্ষুর সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ সরিয়া গিয়াছিল, অবিদ্যার বন্ধন মোচন হইয়াছিল। এককালে ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম; সকল-কিছুই সত্য স্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলাম। সেই চেতনার বলে বুঝিতে পারিতেছিলাম, জগতে কেহ কাহারও নহে। আমি কাহারও নহি, কেহ আমার নহে। তুমি কাহারও নহ, কেহ তোমার নহে। সকলের ভালবাসাই কেবল আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কার্যোদ্ধারের জন্য। তদ্ভিন্ন ভালবাসা জগতে কোথাও কখনও নাই। সংসারে ইহার কেবল একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। সে মৌতাতরূপী দেবী মহামায়া, সে কালাচাঁদ—গুটিকা-রূপী পরম ব্রহ্ম। সুখেই বল, দুঃখেই বল—তাহার প্রীতির বিকার নাই। অসময়ে-সুসময়ে তাহার সমভাব। জগতের সকলে ছাড়িলেও সে ছাড়ে না। সংসারে সকলের আশ্রয় হারাইলেও তাহার আশ্রয় অটুট থাকে।

ভাবিতেছিলাম, সর্বগ্লানিহর সর্বদুঃখনাশ সর্বসিদ্ধি-দাতা এই মৌতাতরূপী ঈশ্বরের খাসতালুকে আমি যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিয়াছি, তখন আমার আর ভয় কিসে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহাই ঘটুক, জগৎসংসার যাহাই হউক—আমার কিসে কি আসে যায়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, মনে মনে অহিফেনের অনন্ত মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে, তুরীয়ানন্দে তর হইয়া মৌতাতের মহাসমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া যাইব-যাইব করিতেছি, এমন সময়ে আপনার দূত আসিল—সম্পাদকীয় ফরমান শুনাইয়া গেল।

মৌতাত ছুটিয়া গেল, নেশা টুটিয়া গেল।

সম্পাদক মহাশয়, দূত অবধ্য। নতুবা আজিকার এইক্ষণেই ব্রহ্মতেজের প্রলয়ঙ্করী শক্তি দেখিতে পাইতেন। কিন্তু মহাশয়, আপনার এ কী দৌরাত্ম্য! আমার উপর লিখিবার আজ্ঞা জারি কেন?

আদালত ব্যতীত পিয়াদার যেরূপ শ্বশুরালয় নাই, প্রবাদ ভিন্ন যেরূপ ব্যাঙের সর্দি নাই, বাক্য ব্যতীত যেরূপ বঙ্গসন্তানের বীরত্ব নাই, জুয়াচুরি ব্যতীত যেরূপ দালালের ধর্ম নাই, নবেল ভিন্ন যেরূপ বঙ্গীয় লেখকের স্ফূর্তি নাই, সেইরূপ মৌতাত ব্যতীত খোশনবীসের খোশনবীসত্ব নাই। সেই মৌতাত টুটাইয়া খোশনবীসকে লিখিতে বলা কেন?

খোশনবীস লিখিতে পরাঙ্মুখ নহে। এই রত্নপ্রসূ বঙ্গভূমিতে এমন কুলাঙ্গার কে কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে লিখিতে অপারগ, সাহিত্যকর্মে অপটু! সম্পাদক মহাশয়, আপনার জীবনে এমন ব্যক্তির সহিত কদাপি সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে কি, যে পাঁচ মিনিট আলাপ করিবার পর ষষ্ঠ মিনিটে পকেট হইতে গল্প কবিতা অথবা নবেলের পাণ্ডুলিপি বাহির করিয়া প্রচুর পরিমাণ তৈল-সহযোগে আপনাকে গছাইবার চেষ্টা না করিয়াছে? এমন-কোন বঙ্গসন্তানকে কখনও দেখিয়াছেন কি, যিনি সুসাহিত্যিক নহেন, সুসমালোচক নহেন? প্রত্যহ প্রাতঃকালে আপনার গৃহের সম্মুখে পুরাতন কাগজ ক্রেতাগণের যে সকল লরি দাঁড়াইয়া থাকে উহারা প্রতিদিন কী পরিমাণ মাল বহন করে, তাহা আমার ঠিক জানা না থাকিলেও আপনি নিশ্চয়ই উহা জানেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বঙ্গসন্তান মাত্রেই সুলেখক, শিল্পসাহিত্যপারঙ্গম। মাতৃগর্ভ হইতেই বাঙালী সর্ববিদ্যার আকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে; ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সহজাত কবচকুণ্ডলের

...ষড়ঙ্গ শিল্পে অতুলনীয় নৈপুণ্য তাহার আয়ত্ত হয়। ...সহজাত প্রতিভার গুণেই তাহার কিছুই শিখিবার ...জন হয় না, কিছুই পড়িবার প্রয়োজন হয় না, কিছুই ...বার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় কেবল কাগজ ...কালির। কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রতিভা এবং বঙ্গজ-...র গুণে তিনি কলম লইয়া কাগজের বুকে যাহা-ইচ্ছা ...কাটুন না কেন, তাহাই বঙ্গসাহিত্যে অভিনব ...ন বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহাই বিজ্ঞাপনের কৌশলে ...ষ্টি বলিয়া হু হু করিয়া এডিশন কাটে।

সম্পাদক মহাশয়, বঙ্গীয় লেখকের কত গুণ! তাঁহার ...র তুলনা নাই—কেন না তিনি অশেষ জ্ঞানের আকর ...সংবাদপত্র ভিন্ন কিছুই কদাপি পাঠ করেন না। ...র বুদ্ধির তুলনা নাই—কেন না তিনি মুহূর্তেই ...লেটর নিখুঁত হিসাব কষিতে পারেন। আর, ...ভা? প্রতিভায় তাঁহার তুলনা জগতে আর কে ...ছে! তিনি যাহা রচনা করেন, তাহাই সৎ-সাহিত্য, ...ই আকাদেমী পুরস্কারের যোগ্য। যাহা কিছুতেই ...র নহে, তিনি অবলীলাক্রমে তাহা ঘটাইয়া দিতে ...রন। তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি অসাধারণ ...ভাবান;—কেন না প্রতিভা ব্যতীত অঘটনঘটন-...য়সী এ জগতে আর কে আছে। এই অত্যদ্ভুত ...ভাবলে তিনি অনায়াসে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ...াইয়া দিতে পারেন, যদুর পত্নীকে মধুর সহিত মধুর ...র্কে জুড়িয়া দিয়া রসের ফোয়ারা ছুটাইতে পারেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ন্যায় তিনিও নিরঙ্কুশ। তাঁহার যাহা ...তিনি তাহাই করেন, এবং নির্ভেজাল বেলেল্লাপনা ...য়া 'সাহিত্য সৃষ্টি করিলাম' বলিয়া সগর্বে মেদিনী ...ত করিয়া হুঙ্কার ছাড়েন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ন্যায় ...ও চতুর্মুখ। আপন প্রশংসা এবং মুরুব্বীর স্তুতির ...তাহার প্রমাণ মিলে। মহেশ্বরের ন্যায় তাঁহার ...লে প্রতিভার অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ...পুরে আপন অর্ধাঙ্গিনীর কণ্ঠে উঠিতে বসিতে তাহার ...পাওয়া যায়। বিষ্ণুর ন্যায় তাঁহারও অনেক অবতার। ...অবতারে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে ...ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। এই অবতারে ...র বধ্য ছাত্রকুল। বরাহ অবতারে তিনি জনসভার প্রধান বক্তা। এই অবতারে তাঁহার বধ্য জনসাধারণ। কূর্ম অবতারে তিনি কৌন্সিলের মাননীয় নমিনেটেড মেম্বর। এই অবতারে তাঁহার বধ্য বিরোধী পক্ষ। পরশুরাম অবতারে তিনি পত্রিকার সম্পাদক। এই অবতারে তাঁহার বধ্য বালখিল্য লেখককুল। তাঁহার অনেক রূপ, অনেক লীলা। ক্ষুদ্রপ্রাণ অরসিকের পক্ষে তাঁহার মর্ম বুঝা ভার। পাঠকের নিকট তিনি অফিসে সময় কাটাইবার উপায়; পাঠিকার নিকট তিনি দিবানিদ্রার মহৌষধ, পাড়ার যুবকদের নিকট তিনি সভাপতি, পুরস্কারের কর্তাদের নিকট তাঁড়ু দত্ত, অফিসের বড়বাবুর নিকট কিম্পুরুষ, এবং আপন ধর্মপত্নীর নিকট কেবল মুখপোড়া মিন্সে।

এই অশেষ গুণের আকর বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রীখোশনবীসও অন্যতম। কাজেই তাঁহার কোন গুণে ঘাটি নাই। সাহিত্য-রচনায় তাঁহার বিরাগ নাই। ইচ্ছা হইলে সকলই লিখিতে পারি। সম্পাদক মহাশয়, আপনার বোধ করি স্মরণ আছে, পূর্বে এক পত্রে আপনাকে জানাইয়াছিলাম, খোশনবীস কি লিখিতে পারে—তাঁহার প্রতিভার ব্যাপ্তি কতদূর। সেই কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। এই খোশনবীসরূপী কল্পবৃক্ষের নিকট যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন। গল্প বলুন, উপন্যাস বলুন, গদ্য বলুন, পদ্য বলুন—এ কল্পতরুতে সাহিত্যের সকল ফলই ফলিতে পারে। ন্যাকামি, বোকামি, ভণ্ডামি, জ্যাঠামি—ইত্যাদি সকল 'আমি'-ই সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করিতে পারি। কেবলমাত্র বঙ্গজ-জন্মের গুণেই সাহিত্যের সকল বিভাগেই আমার যথেচ্ছ লেখনী চালনার বার্থ রাইট জন্মিয়া আছে। যদি আপনার কবিতা পছন্দ হয়, তবে উত্তম আধুনিক কবিতা রচনা করিয়া দিতে পারি। বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, ইহার একবর্ণও কেহ বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু পণ্ডিত সমালোচকগণ ইহা হইতে প্রভূত সূক্ষ্ম সদর্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন। যদি আপনার প্রবন্ধে রুচি হয় তাহাতেও এই শর্মা পিছপা নহে। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা নৃতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নরতত্ত্ব নারীতত্ত্ব—ইত্যাদি সকল বিদ্যা ও তত্ত্বেই খোশনবীস সমান
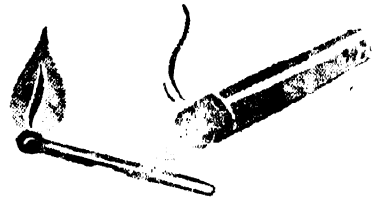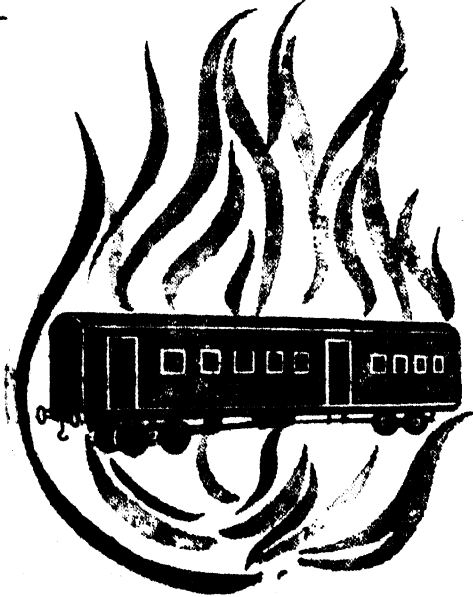
...দর্শী। যাবতীয় বিষয়েই সে আলোচনা ও গবেষণার ... করিয়া রাখিয়াছে। আজ্ঞা করিলেই হয়,— ...বিলম্ব হইবে না। যদি গবেষণাজাতীয় রচনায় ...নের প্রয়োজন থাকে, তবে আমি উহা উত্তম লিখিতে ...। হলফের উপর বলিতে পারি, কলিকাতা ...বিদ্যালয়ের থিসিস অপেক্ষা উহা কোন অংশেই ন্যূন ...বে না। আমাদিগের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ...মেরবৎ প্রাজ্ঞ কর্তৃপক্ষ রচনার যে-সকল সদ্গুণের ...লেখককে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেন, মৎ-প্রণীত ...তে তাহার ভূরিভূরি নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। ... রচনায় একটি বাক্যও সুলিখিত পাইবেন না; কিন্তু ...ক পৃষ্ঠাতেই অসংখ্য ফুটনোট এবং কোটেশ্যন ...তে পাইবেন। এই-সকল রচনায় মনস্বী বঙ্গীয় ...কারগণের চিরস্মরণীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমিও ...কিছু নিজস্ব বক্তব্য হাজির করতঃ মননশীল পাঠকগণের ...রক্তি উৎপাদন করিব না। তবে সগর্বে বলিতে পারি ...ইহাতে দেশী-বিদেশী সদ্গ্রন্থ হইতে আহরিত ...কোটেশ্যনের কোন অপ্রতুলতাই দেখিতে পাইবেন না। ...ও একমাত্র মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য-কোন ভাষাতেই ...আমার অক্ষর-পরিচয় নাই, তথাপি জগতের যাবতীয় ...ভাষা হইতেই কোটেশ্যন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। ...কল সুপণ্ডিত বঙ্গীয় নিবন্ধকারের ন্যায় ইংরেজী ফরাসী ...র্মন রাশিয়ান লাতিন গ্রীক হীব্রু ইত্যাদি সকল সুসভ্য ও ...সভ্য ভাষা হইতেই প্রচুর পরিমাণে কোটেশ্যন আহরণ ...রা আছে। এ বিষয়ে বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের রথী-...মহারথী এবং অগণ্য বালখিল্য বাহিনীর ন্যায় আমারও ...একটি বড় সুবিধা রহিয়াছে। যে-সকল বহি হইতে এই ...মণিকাতুল্য কোটেশ্যনরাজি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার ...একখানিও আমি এ-পর্যন্ত চর্মচক্ষে দেখি নাই। আমি ...হা করিয়াছি স্বদেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত অমূল্য ...নিবন্ধসমূহ হইতে। কাজেই উহাতে কোনরূপ ভ্রান্তি বা ...ত্রুটির অবকাশই থাকিতে পারে না। সংবাদপত্রে যাহা ...প্রকাশিত হয়, তাহা অবশ্যই সত্য। সংবাদপত্রে যিনি ...লেখেন, তাঁহার তুল্য বিজ্ঞ সুপণ্ডিত সুরসিক এবং ...সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভূভারতে বিরল। ...তদ্ব্যতীত এই-সকল কোটেশ্যনের ল্যাজা এবং মুড়া অজ্ঞাত থাকায়, উহার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আমার যেরূপ গভীর ও ব্যাপক অধিকার জন্মিয়াছে, তাহার তুলনা জগতে বড় বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কাজেই যে-কোন কোটেশ্যন আমি বিনা দ্বিধায় যে-কোন স্থানে প্রয়োগ করিতে পারি; এবং এক পংক্তি লিখিলে তৎসহ পাঁচটি কোটেশ্যন এবং তিনটি ফুটনোট অনায়াসেই লাগাইয়া দিতে পারি।

কিন্তু এইরূপ প্রবন্ধ ছাপিতে আমি কাহাকেও পরামর্শ দিই না। সুবিজ্ঞ সম্পাদকগণ প্রবন্ধ বড় একটা ছাপেন না, ছাপিতে চাহেন না, ছাপিয়া কোন ফায়দা হয় না। উহা লেখক স্বয়ং এবং কম্পোজিটর ভিন্ন আর-কেহ কখনও পড়ে না। কাজেই, আমি কাহাকেও কোনরূপ প্রবন্ধ ছাপিতে বলি না। আমি বলি, নবেল ছাপুন। এক্ষণে নবেলরই কাল, নবেলেরই রাজত্ব। নবেলিস্টই বর্তমানে সাহিত্য-সংসারের শিরোমণি। সর্বত্রই তাঁহার আদর; সর্বত্রই তাঁহার চাহিদা। চারিপাশে তাকাইয়া দেখুন, পূজা আসিতেছে, সকলেই উহার জন্য তৈয়ারি হইতেছে। সকল পত্রিকাই নবেল ছাপিতেছে। কেহ পাঁচখানা, কেহ সাতখানা, কেহ দশখানা। সকলেই নবেল লিখিবার জন্য বঙ্গসাহিত্য-সংসারের বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু, ছোটবাবু ইত্যাদি বাবুদিগকে বায়না দিয়াছে। বাবুরা সকলেই নবেল লিখিতেছেন। কেহ পাঁচখানা, কেহ সাতখানা, কেহ দশখানা। কেহ কেহ আবার আপনি লিখিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না বলিয়া সাব-কন্ট্রাক্ট ছাড়িয়াছেন। পুত্র, জামাতা, ভাগিনেয়, নাতনী ইত্যাদি গৃহস্থ সকলেই এইরূপ সাব-কনট্রাক্ট পাইতেছেন। সংবাদ পাইয়াছি, কলিকাতার জনৈক প্রবীণ নবেলিস্টের গৃহের ঠিকা-ঝিও এইরূপ সাব-কনট্রাক্ট লইয়া কর্তার নামে দুইখানি সুবৃহৎ নবেল লিখিয়া দিতেছেন।

কাজেই, আমার বিবেচনায় নবেল ছাপাই ভাল। যে-পত্রিকা একফর্মা ভিন্ন ছাপা হয় না, উহাও প্রতি সংখ্যায় চারিখানি সম্পূর্ণ নবেল দিতেছে। কাজেই, আমার মতে কাগজ সর্বোৎকৃষ্ট করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় একখানি করিয়া নবেল ছাপা উচিত। এই নবেল রচনাতেও খোশনবীস অপারগ নহে। হিস্টরিক্যাল

নবেল বলুন, জিওগ্রাফিক্যাল নবেল বলুন, মেটাফিজিক্যাল নবেল বলুন, ফিজিক্যাল নবেল বলুন—খোশনবীস সকলই লিখিতে প্রস্তুত আছে। খানখানান্ শায়েস্তা খাঁর বাঁদী গুলমনবিবির অমর প্রেমোপাখ্যান লইয়া একখানি হিস্টরিক্যাল নবেল লিখিবার বাসনা আছে। হুঁহাই দ্বীপের ত্রুহাই উপজাতিদের লইয়া একখানি জিওগ্রাফিক্যাল কাম্ অ্যানথ্রোপলজিক্যাল নবেল লিখিবার কথাও ভাবিয়া রাখিয়াছি। সাধক খ্যাপা বাবার জীবনী লইয়া একখানি উত্তম নবেল কাম জীবনী লিখিবার বাসনা আছে। ইহা গুরুগম্ভীর জীবনী বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইলেও কেচ্ছাদার নবেল বলিয়াই বাজারে চলিবে। এইরূপ নবেলের পরিকল্পনা আরও বহু আছে।

কিন্তু হায়, এতক্ষণ বৃথাই বকিলাম। আপনি এ সকল অমূল্য রত্নরাজির কিছুই চাহেন নাই। আপনি কবিতা চাহেন নাই, প্রবন্ধ চাহেন নাই, নবেল চাহেন নাই। আপনি আমাকে জবানবন্দি লিখিতে ফরমাশ দিয়াছেন।

গরীব ব্রাহ্মণসন্তানের প্রতি এই নিষ্ঠুর অবমাননা কেন? নিরীহ খোশনবীসের মৌতাত টুটাইয়া তাহাকে জবানবন্দি লিখিতে বলা কেন?

কেন মহাশয়, খোশনবীস কাহার পাকা ধানে মই দিয়াছে যে তাহাকে জবানবন্দি দিতে হইবে? খোশনবীস চোর নহে, জুয়াচোর নহে, ফাট্‌কাবাজ দালাল নহে। চুরি-জুয়াচুরি করিয়া কাহাকেও সে সর্বস্বান্ত করে নাই; দালালীর কারসাজিতে কাহারও ভরাডুবি ঘটায় নাই। খোশনবীস খুনজখম করে নাই; ব্যভিচার করে নাই; সরকারী তহবিল তছরুপ করে নাই। তবে সে জবানবন্দি লিখিবে কেন?

আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত খোশনবীস জুনিয়র সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় হলফের উপর বলিতেছি, খোশনবীস কখনও কাহারও কানাকড়ি ধারে নাই; ধার দিয়াছে, কিন্তু ধার লয় নাই; উপকার করিয়াছে, কিন্তু উপকৃত হয় নাই। তবে সে জবানবন্দি লিখিবে কোন্ দুঃখে?

আপনি হয়তো বলিবেন, এ জবানবন্দি সে জবানবন্দি নহে। ইহা লেখকের নিজের জবানে নিজেকে বন্দী করা—অর্থাৎ আত্মকথা। কিন্তু মহাশয়, ইহাতেই বা অপমানের কমতি কি হইল? খোশনবীস কেন আত্মকথা লিখিতে যাইবে? সে কি 'শিক্ষিত পতিতা', না জনপ্রিয় প্রবীণ লেখক?

না, মহাশয়, গোলামের গোস্তাকি মাফ করুন—আত্মকথাও লিখিতে পারিব না। ফলাও করিয়া আত্মকথা লিখিবার মত স্থবির খোশনবীস এখনও হইয়া উঠিতে পারে নাই। এদেশে লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা জরাগ্রস্ত হইয়া জরদ্গব হইয়াছেন এবং লিখিবার শক্তি হারাইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই ফেনাইয়া ফেনাইয়া আত্মকথা লেখেন। কিন্তু খোশনবীসের এখনও তাদৃশ জরদ্গব হইতে বহু বিলম্ব আছে। কাজেই, আত্মকথা লিখিবার এক্ষণে তাহার কোন অভিপ্রায় নাই।

সম্পাদক মহাশয়, বুঝিতেছি, আপনি রুষ্ট হইতেছেন কিন্তু কি করিব—খোশনবীস জবানবন্দি দিতে একান্ত অপারগ। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলে [illegible] হউন; গালি দিতে হয় দিউন। রমণীকণ্ঠনিঃ[illegible] না হইলে খোশনবীস গালিকে ভয় করে না। বঙ্গসন্তান মুখ বুজিয়া গালি খাইতে বড় পটু।

কিন্তু মহাশয়, নিয়মিত মৌতাত যোগাইবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা যেন বিস্মৃত হইবেন না। তাহা হইলে বড়ই বিপত্তি ঘটিবে।

না, এতক্ষণে মনে হইতেছে, আপনাকে একেবারে নিরাশ করা উচিত হইতেছে না। ইহা ধর্মে সহিবে না। কাজেই, মত বদলাইয়া লইলাম। লিখিব, আপনার জন্য জবানবন্দিই লিখিব।

এই বৎসরাধিককাল অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া আমি কি করিতেছিলাম, তাহা বোধ করি আপনার জানা নাই। আপনি বোধ করি জানেন না যে এই সময়ে আমি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। এই তীর্থযাত্রার আশ্চর্য উদ্ভট ও রোমহর্ষক বহু ঘটনার মধ্যে আমাকে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। লোকশিক্ষার্থ এক্ষণে আপনার পত্রিকায় তাহার বিবরণ লিখিব। এই সত্য জবানবন্দির ফাঁদে বঙ্গীয় প্রাজ্ঞ পাঠক বন্দী না হইয়া পারিবেন না। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

অলমতি বিস্তরেণ।

—

সংবাদ-সাহিত্য

ণ্ডিত কথন

ষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন কলিকাতায় আসিয়া দুইটি বৃহৎ অনুষ্ঠান সারিয়া গেলেন—বালিগঞ্জে ত্রিকোণ শরৎ স্মৃতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নিখিল বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন সভা। শরৎ ত্র সভায় রাষ্ট্রপতি যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ য়া দিতেছি :

"বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী পরিচালনা রা সমাজের অনেক পাপ সম্পর্কে সমাজচেতনা তে সমর্থ হইয়াছিলেন।...

শরৎচন্দ্র তাঁহার রচনার দ্বারা দেশের জনগণের নৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। হয়তো রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগ নাই। কিন্তু তাঁহার রচনা রাজনৈতিক শৃঙ্খল নে যথেষ্ট সহায়তা করে।...

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই তাঁহার ধ্যান-ধারণার বিষয় ছিল। আমাদের বহুবিধ সামাজিক নীতি ও ব্যবস্থার মধ্যে যে নৈতিক কপটতা নিহিত শরৎচন্দ্র তাঁহার ব্যঙ্গ-প্রধান রচনায় উহার মুখোস দেন। তিনি সমাজের সংস্কার সাধনের চেষ্টা ছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজদ্রোহী, সমাজের আচার প্রগতির শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি দের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন।...

য সব চিন্তাশীল লোক মনে করেন যে, জীবন স্থির হা একটি প্রবহমান ধারা এবং পুরাতন হইতে সব কিছুই পবিত্র নয়, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ন। বাংলা তাহার সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত। যাঁরা জানেন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মত গণের অগ্রদূত সাহিত্যিকরা সাহিত্যিক শিল্প ও ঐতিহ্যে কি অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।...বাংলা সাহিত্যের এই প্রবহমান ধারা যাহা কখনও স্ববিরত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা এই সাহিত্যের উত্তর সাধকেরা বাঁচাইয়া রাখিবেন। তিনি আরও আশা করেন, তাঁহারা সমাজচেতনার আলোকবর্তিকা জ্বালাইয়া রাখিবেন।"

রাষ্ট্রপতির সুচিন্তিত ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বাংলাদেশের কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিকে এত সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রয়োজনীয় বক্তব্য গুছাইয়া বলিতে আমরা দেখি নাই। আমরা ইহাও দেখিলাম এইসব সমিতির সভাপতি সহ-সভাপতি বা কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি ও সানন্দ সাহচর্যে কেহ বা দেঁতো হাসি হাসিয়াছেন, কেহ বা কিঞ্চিৎ প্রমিনেন্সের লোভে ঠেলাঠেলিও শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের, দেশের চাষী মজুরের কাহিনী লইয়াই তাঁহার সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার স্মরণ-সভায় সাধারণ মানুষেরা হুড়াহুড়ি করিবে তাহাতে বিচিত্র কী! ত্রিকোণ পার্কে শরৎচন্দ্রকে কবরস্থ করার পূর্বে এই ত্রিভুজের তিনটা বাহুর মধ্যে দৈর্ঘ্যের ফারাক কতখানি তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ত্রিভুজের বাহুমাত্রেই সমান হইবে এমন কথা নয়—বিশেষতঃ উদ্বাহু হইলে আরও বিপদ।

প্রসঙ্গতঃ আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতির দিনটি হরতাল হিসাবে প্রতিপালিত হইয়াছে এবং তাহা কর ও দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ক্রমবর্ধমানতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থেই হইয়াছে। মহাদার্শনিক রাষ্ট্রপতি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া গেলেন তাহা দর্শনের উপযুক্ত না হইলেও আশা

করিতেছি অচিরেই ভারতীয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কারণ এখন ইহাই আমাদের জীবনদর্শন।

রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব যাঁহার হাতে, রাষ্ট্রের যিনি প্রকৃত কর্ণধার, তিনিই রাষ্ট্রপতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আরব সাধারণতন্ত্র, পাকিস্তান ইত্যাদি রাষ্ট্র আমাদের এই কথাই বলে। ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য লাঞ্ছনা দুর্গতি দেখার সুযোগ পাইলেন না, কেন না, তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার সকল ব্যবস্থা ত্রুটিহীন ছিল। বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সভায় রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন, বাংলা ভাষা সকলের শিখিবার চেষ্টা করা উচিত। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং হয়তো কোনদিন আমাদের এই রচনা পড়িবেন এই ভরসাতে বাংলা ভাষাতেই আমাদের দুঃখের কথাটুকু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

আমাদের বিভূতিভূষণ

"এই আকাশ, এই নির্জ্জন জ্যোৎস্না, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে—সে শব্দহীন বাণী ওই বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠচে প্রতি ক্ষণে—কিংবা গভীর অরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্চে। চুপ করে বসে জলের ধারে আকাশের দিকে চেয়ে, চাঁদের দিকে চেয়ে, বনস্পতি শ্রেণীর জ্যোৎস্নালোকিত শীর্ষদেশের দিকে চেয়ে সে বাণীর জন্য চোখ বুজে অপেক্ষা করো—শুনতে পাবে। সে বাণী নৈঃশব্দ্যের বটে, কিন্তু অমরতার বার্ত্তা বহন করে আনচে। এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েচে এই আরণ্য-শান্তির মধ্যে, বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েচে এখানে—এই সমাহিত স্তব্ধতায়—নগরীর কলকোলাহলের মধ্যে নয়।"

জীবিত থাকিলে গত আটাশে ভাদ্র তারিখে যাঁহার সত্তর বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সারা বাংলাদেশের সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে বিপুল আনন্দের বন্যা বহিত, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় বিমুখ অরণ্যপাগল মানুষ সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা স্মরণ করিতেছি। অরণ্য এবং প্রকৃতির নিঃশব্দ যে বাণী তাহা বিভূতিভূষণের সহৃদয় কবিচিত্তের কাছে ধরা পড়িয়াছিল—প্রকৃতি ও প্রকৃতিলালিত গ্রাম্য মানুষকে একেবারে নিজের করিয়া দেখিতে বিভূতিভূষণের মত আর কেহ পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে যে কৃত্রিমতা ও প্রিটেনশ্যান প্রবেশ করিয়াছে বিভূতিভূষণ সর্বাংশে তাহা হইতে মুক্ত ছিলেন। এই গুণ বোধ করি একমাত্র বিভূতিভূষণেই বর্তমান। অন্যান্য সকলে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সহিত সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত করিলেও পরে প্রতিযোগিতা, পুরস্কার ও অর্থের মোহে স্বধর্মচ্যুত হইয়া নিজ নিজ এক্তিয়ারের বাহিরে চলিয়া গিয়া বাংলা সাহিত্যকে প্রায় পঙ্ককুণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সিনেমালোলুপতা ও পপুলারিটির বিপুল আকর্ষণ ইঁহাদের আরও উন্মার্গগামী করিয়া সাহিত্যকে অধিকতর সর্বনাশের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

আজ আমাদের সাহিত্যের এই দুর্দিনে বাংলার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যস্রষ্টাকে স্মরণ করিতেছি। বিভূতিভূষণের মত খাঁটি বাঙালী সাহিত্যিক আর আমরা পাইলাম না—ইহা আমাদের গভীর দুঃখের কথা। যখন চারিপাশে অর্ধশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লেখকের দল যে যাহা খুশি লিখিতেছেন, পঁয়ষট্টি ও সত্তর বৎসরেও যখন ইঁহাদের লেখনী হইতে অবিরলধারায় নারীচিত্তবিমোচিনী প্রেমকাহিনী প্রায় যাদুকাহিনীর মতই নির্গত হইতেছে, স্রেফ পূজার মরসুমেই তিন চার অথবা পাঁচটি সম্পূর্ণ উপন্যাসের জন্মদান একই গর্ভ হইতে সম্ভব হইতেছে তখন বিভূতিভূষণ আমাদের মধ্যে নাই ভাবিয়া আমরা স্বস্তি পাইতেছি। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি এই জাতীয় অমানুষিক কোনও প্রস্তাব বিভূতিভূষণের নিকট রওয়ানা হইবামাত্র তিনি সারাণ্ডা ফরেস্টে স্বেচ্ছায় শার্দূল কবলিত হইতেন। আমাদের পরম সান্ত্বনা এই যে শাশ্বত কালের সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ পরম সমাদরে

[ ]নে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। [ ]কাল প্রকৃতির ধূলামাটি অঙ্গে মাখিয়াও পরবর্তীকালের [ ]লেবগণের ন্যায় নিজেকে কদাচ ধূল্যবলুণ্ঠিত করেন [ ]। সেই বিভূতিভূষণকে আমরা প্রণাম করি।

[ ]ী বিচার

গত এক দেড় যুগ ধরিয়া সম্পূর্ণ জ্যান্ত অবস্থায় আমরা [ ]র পর দিন যে পিণ্ডি গিলিতে বাধ্য হইতেছি তাহার [ ]র নাম যে রাওয়ালপিণ্ডি তাহা জানিতে পারিয়া [ ]রা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বেলের সরবৎ এবং [ ]পাঁঠার কাবাবে যে আল্লা তুষ্ট হন না তাহার প্রত্যক্ষ [ ]ণ পাইলাম। ২৮শে সেপ্টেম্বরের 'আনন্দবাজার [ ]কা'য় দেখিতেছি :

"অবশেষে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র, এমনকি [ ]ল ইসলামও আয়ুবশাহীর হাত হইতে নিষ্কৃতি [ ]লেন না। "আপত্তিকর এবং অশ্লীল" এই অভিযোগে [ ]স্তানী পুলিশ কুষ্টিয়ার বিভিন্ন বইয়ের দোকানে হানা [ ]বাংলা সাহিত্যের বহু "বই" আটক করে।

[ ]সংবাদটি ঢাকা হইতে প্রকাশিত খোদ "পাকিস্তান [ ]বারভার" ছাপিয়াছেন।

ঐ পত্রিকার কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা আরও জানান যে, [ ]কার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের [ ]সৈয়দ মুজতবা আলি ও বিমল মিত্রের রচনার উপরও [ ]পুলিশের বিষ নজর পড়িয়াছে।

পুলিশের বিবেচনায় অশ্লীল এবং আপত্তিকর [ ]লেও ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ঐ [ ]লির কোন কোনটি অনার্স ক্লাসের পাঠ্যতালিকাভুক্ত [ ]রা রাখিয়াছেন, সংবাদদাতা ইহাও জানান।"

[ ]বৃত বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্র বা [ ]ত নজরুল সম্পর্কে আপত্তিকর বা অশ্লীল যে কোনও [ ] উঠুক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ইঁহারা [ ]রা কিংবা প্রায় মরিয়া বাঁচিয়াছেন। কিন্তু মুজতবা [ ]ী এবং বিমল মিত্র সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের অভ্রান্ত বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। কেওড়াতলা হইতে মাত্র দেড় হাত দূরে বসিয়া বেলের মোরব্বা খাওয়া অথবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে তারল্যের আমদানি করা যতই সহজ হউক না কেন প্রকৃত রাজশক্তি চ্যাংড়ামি ও নোংরামিকে কখনই প্রশ্রয় দেয় না। আমাদের সরকার যদি অন্ততঃ কাগজের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার কথা স্মরণ করিয়া প্রকাশক ও লেখকদের জন্য কাগজের রেশন প্রথা চালু করেন তাহা হইলে অকারণে পেন্‌মোটা বই লিখিয়া কাগজের অপচয় করা বন্ধ হয়। ভেঁদো কথায় দিদি বউদি মাসী ও গণিকাদের কেচ্ছাকাহিনীর গল্প ক্রমাগত শুনাইয়া দেশের যুবকদের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করা যাঁহাদের ব্রত, মুজতবা আলী ও বিমল মিত্রের নাম সেই তালিকার শীর্ষদেশে। এই সব ভুসিমালের আমদানি ও প্রচার বন্ধ করিলে পাকিস্তানের যুবশক্তি অটুট এবং অক্ষুণ্ণ রাখার সহায়ক হইবে ও-দেশের শাসকেরা তাহা বুঝিয়াছেন।

গোপালদার পত্র

"ভায়া হে, কিছুদিন হইতেই একটা বিচিত্র প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে—জগতে সত্য এবং স্থায়ী বলিয়া কিছু আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কী? এ প্রশ্নের সদুত্তর এখনও মেলে নাই, সুতরাং সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছি। ইহা যুগযুগান্তরের প্রশ্ন, এখনও অমীমাংসিত আছে।

তুমি তো জান বহুদিন হইতে উত্তরস্যাং দিশির নগাধিরাজ হিমালয় আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয় সম্পর্কে যতই ভাবিতেছি শ্রদ্ধা ও বিস্ময় ততই বাড়িতেছে। ভায়া হে, হিমালয় অনন্ত, অসীম। এক এক সময় আমার মনে হয় হিমালয়ের মত সত্য আর কিছু নাই। এই হিমালয়ই অতীতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে এবং চিরদিন করিবে। উত্তর সীমান্ত জুড়িয়া পুনরায় চীনা সৈন্য সমাবেশে অত্যন্ত

চিন্তাকুল হইয়া আছি। ভয় হয়, আমাদের ধ্যানের হিমালয় এবার বুঝি টলিল। সত্যই টলিবে কী?

আমি এখন যে জায়গাটায় বাস করি তাহা কাঞ্চনজঙ্ঘার সন্নিকটে। শুইয়া বসিয়া মেঘ রৌদ্র ও চন্দ্রালোকের লুকাচুরির পটভূমিকায় কখনও রূপালী কখনও জ্যোৎস্নাধবল উত্তুঙ্গ গিরিচূড়ার মহিমা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি।

সেদিনও অনেক রাত্রে বসিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্যানমৌন মহামূর্তির দিকে চাহিয়া ছিলাম। অপলকনেত্রে সেই সুউচ্চ চূড়ার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আমার সর্বশরীর একটা গভীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মাথার উপর বঙ্কিম চাঁদ, নীচে খরস্রোতা নদী। কালটা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর, চন্দ্রালোকও পর্যাপ্ত ছিল না। সহসা আমার কানে একটা অদৃশ্য আহ্বান শুনিলাম, মনে হইল যেন বহু যুগ যুগান্তরের আহ্বান শুনিতেছি—আমায় দেখ, আমায় দেখ, আমায় দেখ। আমি প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। আমার চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপালী চূড়াটা যেন নিরুদ্ধ আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

মনে পড়িল চার্লস ইভান্স বলিতেছেন: "...আমরা দুর্ধর্ষ কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের দুই রূপ দেখলাম: একবার সূর্যাস্তের ম্লানায়মান আলোয় বেগুনী এবং ঘোর লাল, আবার সূর্যোদয়ে দেখলাম তার বিচিত্র রূপালী ছবি। জানি, বহু মানুষের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তাদের আকর্ষণ করার মত বিপুল শক্তি এর অটুট আছে। এখন মনে হচ্ছে পুঞ্জীভূত তুষাররাশি এবং অজানা উপত্যকা সমেত সারা জগতের সব গোপন রহস্য তাদের জাদু নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।"

জেম্‌স র‍্যামসে উলম্যানের কথা মনে পড়িল: "হিমালয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হল কাঞ্চনজঙ্ঘা। পৃথিবীর এই তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তার উত্তুঙ্গ মহিমা নিয়ে সগর্বে সারা পৃথিবীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

স্ট্যানলী স্নেথকেও ভুলিলে চলিবে না: "...এই সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা—বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম পর্বত—পৃথিবীর ঊর্ধ্বলোকে যেন আর এক পৃথিবী, অপরূপ অথচ নির্মম, নীরব এবং নিঃসঙ্গ। এখানে চরম শীতে মেরুদণ্ড মুহূর্তে বেঁকে যায়।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়াই ছিলাম। ইভান্স, উলম্যান, স্নেথ, রাটলেজ, সমারভেল, নর্টন, ক্রস, ইয়ংহাজব্যাণ্ড, শিপটন, টিলম্যানের কত কথা একে একে মনে ভাসিয়া উঠিতেছে। পল বাওয়ারের কথা মনে পড়িল: "কাঞ্চনজঙ্ঘাকে জয় করতে যে চায় সে চরম আশাবাদী।" সঙ্গে সঙ্গে ম্যালরী এবং আরভিনের জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। কী করুণ, কী ভয়ঙ্কর!

এক সময় আত্মস্থ হইতেই দেখি কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরদেশ ম্লান চন্দ্রালোকে চকচক করিতেছে। আমার মনে হইল কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঁদিতেছে—সমগ্র হিমালয়ের ক্রন্দন রূপ কাঞ্চনজঙ্ঘার দেহ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। আমি বিষণ্ণচিত্তে শুইয়া পড়িলাম।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। ঘুমের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি সেই [illegible] রাত্রে কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে শুইয়া স্পষ্ট শুনিতে প[illegible]াম কে যেন আমাকে বলিতেছে: আর নয়, সব শেষ হইতে চলিল, এবার ইতিহাসের গতি অন্য পথ ধরিবে।

মনে পড়িতেছে, আমিও গভীর আবেশভরা জড়তার মধ্যেই উত্তর দিয়াছিলাম: না, তাহা কখনই সম্ভব হইবে না। ইতিহাস আমাদেরই হাতে, তাহার পরিবর্তন ঘটিতে দিব কেন?

তখন প্রশ্ন হইল: তোমার পণ কী?

আমি উত্তর করিলাম: পণ আমার জীবনসর্বস্ব।

প্রতিশব্দ হইল: জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

আমি বলিলাম: আর কী আছে? আর কী দিব?

তখন উত্তর হইল: ভক্তি।

অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙিতে আবার সেই কাঞ্চন-জঙ্ঘারই অপরূপ শোভা দেখিলাম।

আজ এইখানেই শেষ করি অনেক কথা বাকি রহিল।—গোপালদা।"

কাগজের ব্যবসায়

অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্রুত অবনতি ও তার পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তাশীল লেখক ও পাঠক মাত্রেই চিন্তিত—এ ভাঙনের স্রোত রোধ করিবার উপায় নাই বলিয়া আপাতত মনে হইতে পারে। যাহা সাহিত্য তাহার পাঠক-সংখ্যাই অধিক—অর্থাৎ বাজারে যাহা রূপে মূল্যবান তাহা সাহিত্য না হইলেও চলে। এই অবস্থা বোধ হয় সকল দেশেই ঘটিয়াছে, কারণ এটা ডেমোক্রেসির যুগ—যাহা কুলি মজুর মিস্ত্রির রস-পিপাসা মিটাইবার যোগ্য তাহাই একালের সত্যকার সাহিত্য। ইহার কোনও তত্ত্ব আর নাই এবং কাব্য-সাহিত্যের অপেক্ষা তাহার মধ্যে পেঁয়াজ রসুন ও লঙ্কার স্বাদ যাই যত কিছু বাগ-বিতণ্ডা ও নিন্দা-প্রশংসা হইয়া থাকে। চোখে জল আসে কিনা, ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় কিনা, বা সিদ্ধির নেশার মত নেশা লাগে কিনা—ইহাই একালকার সাহিত্যের—গল্প উপন্যাস ও কবিতার কর্ম প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ইহা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলা অসঙ্গত, কারণ যাহারা খরিদ্দার তাহাদের পছন্দমত মাল সরবরাহ করিতে হয়, বাজারে কাটতির দিকটা দেখিতে হইবে বৈকি! যাহারা সাত জন্মে সাহিত্যের ধার ধারে না—সিনেমা, রেস্টুরেন্ট ও ফুটবল ম্যাচ যাহাদের রসচর্চার প্রধান সহায়, তাহারাই আজ সস্তা প্রেস ও সস্তা বিদ্যার কল্যাণে সাহিত্য-রসপিপাসু ও সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছে—তাহাতে ব্যবসায়ের সুযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রেসের কাজ বাড়িয়াছে, কাগজওয়ালা দু পয়সা বেশী রোজগার করিতেছে, এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকানের মত বইয়ের দোকান বাড়িয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার বা করিবার কিছুই নাই।

* * *

তথাপি এই অনিবার্য অবস্থাই আমাদের সাহিত্যের দুরবস্থার কারণ নহে। এ যুগে সকল দেশে এইরূপ ব্যবসায় চলিতেছে—চলিবেই। কিন্তু এ দেশের এ জাতির অবস্থা এমনই শোচনীয় যে সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রসার বা প্রচলন বৃদ্ধির কোনও চেষ্টা বা সঙ্কল্প কাহারও নাই। যাঁহারা ভদ্র ও শিক্ষিত তাঁহারাও পুস্তকের ব্যবসায়ে বড় হইলে গতানুগতিক সহজ পন্থার অনুসরণ করেন—মিছরির বদলে মুড়ি, দুগ্ধের বদলে তাড়ি, এবং সন্দেশের বদলে চাটের দোকান খুলিয়া বসেন। এই সকল পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক—যাহাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়বুদ্ধি সর্বদা ধর্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করে, যাহারা জানিয়া শুনিয়া কুপথ্য বিক্রয় করে এবং মনে করে তাহারা উৎকৃষ্ট ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে—তাহারা যে বর্তমান সাহিত্যিক অবনতির জন্য অনেকখানি দায়ী তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও জাতীয় চরিত্রের নিদারুণ দুর্বলতা ঘুচিবার নয় এবং আমাদের সর্ববিধ অবনতির কারণ যে ওই একটি—অর্থাৎ চরিত্রহীনতা বা ধর্মহীনতা—ইহা ভাবিলে সত্যই হতাশ হইতে হয়।

* * *

সাহিত্যের ব্যবসায়ের কথা বলিতেছিলাম। আমাদের দেশে বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম সাহিত্যের ব্যবসায়ে একেবারে লোপ পাইয়াছে। যাহারা ব্যবসায়ী তাহারা প্রায়ই সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—কেবল এক প্রকার ব্যবসায়-নীতিতে অতিশয় সুদক্ষ। নিজেরা যেমন ধর্মহীন বা চরিত্রহীন, তেমনই মানুষের প্রতি, স্বজাতির প্রতিও তাহারা আস্থাহীন। ভাল বইয়ের ব্যবসায় যে সম্ভব—কেবল সম্ভব নয়—একটা বড় ব্যবসায়ের দিক, তাহা ইহারা কল্পনা করিতেও পারে না। তাহার কারণ অনেক। প্রথমত সাধারণের রুচি ও রসবোধ যে উন্নত করা যায় তাহা ইহারা মানে না; দ্বিতীয়ত ইহারা পুস্তক

প্রচার করিতে জানে না—যাহা সহজে বিক্রয় করা যায়, বাজার বুঝিয়া সেই মালই সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে ; পুস্তক ছাপে ও বিক্রয় করে, পুস্তক প্রকাশ বা প্রচারের হাঙ্গামা পোহাইতে চাহে না। ব্যবসায়ে, উদারতর বৃহত্তর নীতির ভদ্রতর পন্থা ইহারা সভয়ে বর্জন করে। ইহারা পুস্তক-বিক্রেতা—প্রকাশক নহে। তৃতীয়ত পুস্তকের মূল্য ইহারা বুঝে না—প্রেসের ব্যয় ও দপ্তরির পাওনাই তাহাদের হিসাবের বস্তু, লেখা বা লেখক গণনীয় নহে। যে জিনিস উৎকৃষ্ট তাহাকে ব্যবসায়ের যোগ্য করিয়া তুলিতে যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের প্রয়োজন এবং মনের যে উৎসাহ অত্যাবশ্যক তাহা ইহাদের নাই। মনের উৎসাহ একটা বড় কথা—মনুষ্যত্ব ও বিবেকবুদ্ধিই ইহার মূল। যে ব্যবসায়ী কেবল সেন্টিমেন্ট বা কল্পনা লইয়া থাকে সে যেমন ব্যবসায়কেই মাটি করে, তেমনই যে কেবল নগদ খুচরা লাভকেই পরমার্থ মনে করে, যাহার ব্যবসায়-বুদ্ধিতে উদারতা নাই, বিদ্যা এবং কল্পনা কোনটারই লেশমাত্র নাই—সাহিত্যের ব্যবসায়কে সে পঙ্গু করিয়া রাখে—এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতিকে মানসিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তোলে।

* * *

অশিক্ষিত ও অনুদারচিত্ত ব্যবসায়ীগণের হাতে আজ বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচারের ভার পড়িয়াছে—গ্রন্থ-সমালোচক নাই, গ্রন্থ-পরীক্ষক নাই, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই, কেবল অশিক্ষিত অল্প-শিক্ষিত জনগণের দুষ্ট ক্ষুধায় খাদ্য সরবরাহ করিয়া যা দুই পয়সা লাভ হয়, তাহাই পুস্তক-ব্যবসায়ের একমাত্র নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুচিহীন ও কুৎসিত ছবির সাহায্যে ক্রেতার মনোহরণ-চেষ্টাও একটা চতুর উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বড় হইতে ছোট, সকল প্রকাশকের ধর্ম এক—মান, লজ্জা, ভয় কাহারও নাই। এমন একটা প্রকাশক নাই যাহার নাম করিলে মনে সম্ভ্রমের উদয় হয়, যাহার প্রকাশিত পুস্তক উৎকৃষ্ট না হউক ভদ্ররুচিসম্মত হইবেই। যে দেশের এত বড় দুর্ভাগ্য সে দেশে সাহিত্য বাঁচিবে কি করিয়া? [শ. চি. অগ্রহায়ণ ১৩৪৩]

পূজা-সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি

শনিবারের চিঠির আশ্বিন সংখ্যাটি পূজা-সংখ্যারূপে ১৮ই অক্টোবর প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যাটি বিভিন্ন লেখকের নানা ধরনের লেখায় সমৃদ্ধ করিবার আয়োজন করা হইতেছে। পূজা-সংখ্যায় আমাদের ধারাবাহিক রচনাগুলি প্রকাশিত হইবে না। নিয়মিত বিভাগগুলি অর্থাৎ সংবাদ-সাহিত্য, নিন্দুকের প্রতিবেদন, সাময়িক সাহিত্যের মজলিস ও খোশনবীসের জবানবন্দি যথারীতি প্রকাশ করা হইবে। এই সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ একটি জীবনী ও একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। ইহা ছাড়া কয়েকটি গল্প কবিতা এবং কিছু সাহিত্য সমালোচনাও এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। পৃষ্ঠাসংখ্যায় বর্ধিত পূজা-সংখ্যা শনিবারের চিঠির দাম হইবে দুই টাকা। রেজেস্ট্রি ডাকে দুই টাকা ষাট নয়া পয়সা। এজেন্টগণ তাঁহাদের চাহিদা শীঘ্র জানাইয়া দিলে ভাল হয়। যেসব ক্রেতা পূজা-সংখ্যাটি লইতে চান তাঁহারা রেজেস্ট্রি ডাকে পত্রিকা লওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে তাঁহাদের টাকা আমাদের হাতে আসা প্রয়োজন।

—

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৭৮

শনিবারের চিঠি
৩৫শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭০

সম্পাদক :
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

জওহরলাল নেহরু

নারায়ণ দাশশর্মা

ভূমিকা

রাসী কবি বোদলেয়রের বহু উৎকেন্দ্রিক উক্তির মধ্যে একটি হচ্ছে : There exist but three ectable beings : the preist, the warrior, poet. To know, to kill, to create. er men are serfs or slaves, created for stable, that is to exercise what are called professions.

অস্থার্থ : শ্রদ্ধার্হ জীব আছে তিনটি মাত্র—পুরোহিত, া, কবি। জ্ঞা, হন্, সৃজ্। আর সব মানুষ দাস ক্রীতদাসের সামিল ; তাদের সৃষ্টি হয়েছে বলের জন্য, অর্থাৎ কিনা সেই সব কাজ করবার জন্য বলা হয় পেশা।

আমরা শুনেছি বোদলেয়র হাশিশ খেতেন। 'হাশিশ' , যার ভারিক্কী চালের লাটিন নাম ক্যানাবিস কা, আসলে আমাদের অতিপরিচিত আদি ও ত্রিম গঞ্জিকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই ঙ্কর মানুষটি গাঁজা খেতেন বলেই এঁর সব উক্তি ত্র গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না। ঃ উপরে উদ্ধৃত উক্তিটি বোদলেয়রের মুখ থেকে র দমে বেরিয়ে থাকলেও আমাদের কৌতূহলী চনা দাবি করে। জ্ঞান, হত্যা এবং সৃষ্টি—এই টি মাত্র শ্রদ্ধার্হ মানবিক অভীষ্ট ; আর সব [illegible]বেলের। এপিগ্রামটি আমাকে এই মুহূর্তে প্রায় অভিভূত করেছে।

ইতিহাসের অমর্ত্য হৃদয়ে চিরদিনের জন্য স্থান পেয়েছে কোটি মানুষের জিজ্ঞাসা, কোটি মানুষের বিজিগীষা। তারপর হারিয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে, নিক্ষিপ্ত হয়েছে বিস্মৃতির আবর্জনাকুণ্ডে। তারই মধ্যে যাঁদের প্রবল পৌরুষের নখরাঘাত যুগে যুগে অঙ্কিত হয়েছে সেই নিষ্ঠুরতার বক্ষস্থলে তাঁদের নাম ভুলতে পারি নি আমরা। তাঁদের নাম নিষ্ফল হয় নি : ঘৃণায়, শঙ্কায়, শ্রদ্ধায় ইতিহাস আপন গর্ভে বহন করেছে তাঁদের বিক্রমকীর্তির চিহ্ন। তাঁরা হুন আটিলা, তাঁরা মোঙ্গল চেঙ্গিস, তাঁরা আলেকজাণ্ডার, হানিবল, তৈমুর। ঘাতকের দল এঁরা—স্বীকার করতে লজ্জা হোক, অস্বীকার করলে হবে অসত্যভাষণের পাপ—ঘাতকের দল আমাদের বিস্ময়বিমূঢ় শ্রদ্ধার পাত্র।

তারও আগে আবির্ভূত হয়েছেন জ্ঞানতাপস জিজ্ঞাসুর দল, জিজ্ঞাসার প্রস্তর আর ধাতুখণ্ড রহস্যের শিলাতলে ঘষে ঘষে যাঁরা তৈরি করেছেন জ্ঞানের অজেয় অস্ত্র, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন অজ্ঞান-অন্ধকারের অসংখ্য বিভূতিকে পদানত করার প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। উদ্গীত হয়েছে সরস্বতী-দৃষদ্বতী-তীরের বেদমন্ত্র, পঞ্চনদের দুই কূলে উপনিষদের সূক্ত। পশ্চিম থেকে পুবে এসেছেন

ঋষি, পূব থেকে পশ্চিমে গিয়েছেন Magi। আত্মানং বিদ্ধি—এই রণহুঙ্কারে অপরিতৃপ্ত তাঁরা নিজেকে জানতে পেরেছেন কিনা কী জানি, কিন্তু নিজেকে জানবার কঠোরতম প্রয়াসে স্তরের পরে স্তর যবনিকা উত্তোলন করে গেছেন বিশ্ববার্তার। তাঁরা হত্যা করেন নি, তাঁরা সৃষ্টি করেন নি, প্রাণলোকের যোগ-বিয়োগে কোন অঙ্কপাত না করেও তাঁরা পরমশ্রদ্ধেয় ; কেন না তাঁরা প্রশ্ন করেছেন এবং তাঁরা উত্তর পেয়েছেন। যা ছিল কিন্তু জানতাম না বলে যাদের অস্তিত্ব ছিল লৌকিকার্থে অসত্য, জ্ঞানের যজ্ঞবেদীতে তারা অস্তিত্বের আলোকে সত্য হয়ে উঠেছে ; যা ছিল না কিন্তু ভ্রান্তির মরীচিকায় সত্যের মত প্রতিভাত হয়েছিল, জ্ঞানের হোমানলে তাদের ছলনাজাল ভস্মীভূত হয়েছে। তাই পুরোহিত ক্ষত্রিয় না হয়েও হন্তা, স্রষ্টা না হয়েও উপস্রষ্টা। তাঁরা আমাদের প্রণম্য।

কিন্তু শুধু কি তাই? মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কি শুধুই পুরোহিত, শুধুই জ্ঞানভিক্ষু? স্রষ্টা নন তিনি? যদি স্রষ্টা নন তবে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ মন্ত্রে অর্থের অতীত একটি প্রাণসঞ্চার করলেন কী করে? ওঁ অর্থ কী? আমি জানি না ; জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানী মাত্র আর কিছু নন, তিনি ওর অর্থ নির্ণয় করতে পারলেও ব্যাপ্তি বুঝবেন না। ভূর্ভুবঃ স্বঃ অর্থ কি শুধু স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সমাহার? না সেই সমগ্রতার ধারণার মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে গোটা সৃষ্টির এক দুর্বোধ ঐক্যস্থাপন? ব্যাহৃতির ধ্যানে নিজেকে চরাচরের কেন্দ্রে স্থাপন, অণুর সঙ্গে সমগ্রের যোগসূত্রে উপলব্ধি, এই যদি অনুরণিত হয়ে ওঠে ভূর্ভুবঃ স্বঃ মন্ত্রে তবে তো মন্ত্র কেবলমাত্র জ্ঞানের সূত্র নয় ; সৃষ্টিরও অভিব্যক্তি।

তর্ক না করেও অনায়াসে বলা চলে : ঋষি যতক্ষণ জ্ঞানভিক্ষু ততক্ষণ পুরোহিত মাত্র, এবং তখনও শ্রদ্ধেয়, আর যখন তিনি স্রষ্টা—শুধু অজ্ঞাতের জ্ঞাপয়িতা নন, যখন অজাতপূর্বের জনয়িতা, অভূতপূর্বের ভবিতা—তখন তিনি কবি। শুধু শ্রদ্ধেয় নন, শ্রদ্ধেয়কুলের বিস্ময়ের পাত্র।

বস্তুতঃ একমাত্র স্রষ্টা বলে যে পরমেশ্বরকে মানুষ সভ্যতার সমুচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে কল্পনা করতে শিখেছে, সেই একমেবাদ্বিতীয়মের ধারণা জ্ঞানী পুরোহিতের মস্তিষ্কে নয়, স্রষ্টা কবির হৃদয়ে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। এবং কবিই একমাত্র স্রষ্টা ; অথবা বিপরীতবিন্যাসে বলতে পারি স্রষ্টাই একমাত্র কবি।

শ্রদ্ধার্হ এই তিনটি সত্তা—যোদ্ধা, পুরোহিত এবং কবি, আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বেই কিন্তু ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। অন্ততঃ আভাস থাকে সেগুলির- আমরা যারা দাসানুদাস ক্রীতদাসের দল, যারা সভ্যতার সার্ফ, যারা জীবনধারণের স্লেভ, যারা পেশাদার, যারা আত্মাবলম্বী করুণার পাত্র—আমরাও সর্বাংশে বঞ্চিত নই মনুষ্যত্বের রেস্‌পেক্‌টিবিলিটি থেকে। তা যদি হতাম তবে যোদ্ধা, পুরোহিত ও কবিকে শ্রদ্ধা করতে শিখতাম না আমরা। আলেক্‌জাণ্ডারকে অভিনন্দন জানায় যে, সে আমার মধ্যেকার অস্ফুট দিগ্বিজয়ী ; গুরুকে প্রণাম জানায় আমার আত্মার উপবাসী জ্ঞান-বুভুক্ষু ; কবিকে আস্বাদ করে আমারই অন্তরের বন্দী সৃজন-তৃষিত।

কিন্তু ওই আভাস মাত্র। তার বেশী নয়। তাই আমরা যোদ্ধা নই, পুরোহিত নই, কবি নই। আমরা ছুতোর, মিস্ত্রি, কেরানী ; আমরা দোকানদার, দালাল, টেক্‌নিশিয়ান ; ডাক্তার, উকিল, সিবিল সার্ভেন্ট ; গুরু নই, মাস্টারী কিংবা প্রোফেসরীর পেশাদার ; যোদ্ধা নই, পুলিস কিংবা মিলিটারির পেশাদার ; কবি নই, পেশাদার গ্রন্থকার পর্যন্ত বড়জোর।

তবু আভাসটুকু আছে বলেই আমরা হয়তো মানুষের মত মানুষ হতেও পারি। আমরা কেউ কেউ অকস্মাৎ সেই শ্রদ্ধেয় মানবতায় উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি—যে মানুষের জন্য পৃথিবীর দিনগুলি বছর হতে থাকে, বছরগুলি নিরর্থক যুগ হয়ে অতীত হয়। কচিৎ কদাচিৎ আমরা, এই আমাদেরই একজন, পেশাদারীর আত্মাবন্ধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ি নির্ভীক উন্মাদনায় ; মনুষ্যত্বের অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণাহুতি হয়ে ওঠে কোন কোন আশ্চর্য মানুষের চকিত আবির্ভাবে। তখন জানতে পারি সম্ভবামি যুগে যুগে এ প্রতিশ্রুতি আমারও প্রতিশ্রুতি ছিল, আমি প্রতিপালন করি নি কিন্তু কেউ একজন করেছেন। তখন আমরা প্রণিপাত করি তাঁকে যিনি ছুতোর জোসেফের ঘরে জন্মেছিলেন, ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বেথলেহেমের

আস্তাবলে, কিন্তু তবু যিনি খ্রীষ্টধর্মের পুরোহিত হলেন এবং হলেন ঈশ্বরের—অর্থাৎ পরম-কবির—আপন পুত্র।

পূর্ব অনুচ্ছেদে যীশুখ্রীষ্টের উদাহরণ উপস্থাপিত করেছি কেবলমাত্র এই কারণে যে কাকতালীয় যোগাযোগে তাঁর জীবন-কাহিনীতে ছুতোর, আস্তাবল এবং পৌরোহিত্য —তিনটি পূর্বকথিত বস্তুর যুগপৎ বিদ্যমানতা রয়েছে। কিন্তু অতঃপর আমি ভারতবর্ষের সীমান্ত ছাড়িয়ে উদাহরণ অন্বেষণ করব না। করব না, কেন না একদা যোদ্ধা-দার্শনিক-কবি এই তিনের অসংখ্য আবির্ভাবে ধন্য এই ভূখণ্ড বর্তমানে অকিঞ্চিৎকর পেশাদারীর লীলাভূমি হিসাবেও আদর্শ উদাহরণ; আস্তাবল হিসাবে আমাদের দেশ আয়তনে ও আদমশুমারিতে পৃথিবীর মধ্যে প্রায় শীর্ষস্থানে রয়েছে।

ভূমিকার এই পরিপ্রেক্ষিত-বর্ণনা শেষ করে আমি যে মানুষটির জীবন ও চরিত্রের প্রতিকৃতি অঙ্কনে প্রয়াসী হব, তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধার্হতার তিন প্রকার সম্ভাবনাই পর্যাপ্ত পরিমাণে নিহিত ছিল। কিন্তু একান্ত সখেদে আমাকে বলতে হবে শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু সে-তিনটির কোনও সম্ভাবনাকেই সার্থকতার চরম স্বর্গে উন্নীত করতে পারেন নি; সম্ভবতঃ তিনি তা করতেও চান নি।

ক্ষত্রিয়ের জয়ধর্ম তাঁর নাড়ীতে প্রবল রক্তস্রোত এনেছে বহুবার। কিন্তু সার্থক যোদ্ধার পক্ষে দার্শনিক হওয়া কঠিন। জ্যা এবং ছন্দ্ যুগপৎ অনুশীলন করা দুরূহ। যোদ্ধা জওহরলালকে জিজ্ঞাসু জওহরলাল নিরস্ত এবং নিরস্ত্র করেছে। ফলে ক্ষত্রিয় জওহরলাল সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যদি এক ব্রাহ্মণ জওহরলাল—যৌবনের সেই অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিকের পরিপক্ব সংস্করণ—জন্মাতেন, তাতেও সার্থকতার স্বর্গে উঠতে পারতেন তিনি। তা কত হয় নি। তিনি যোদ্ধার রথ-বর্ম-আয়ুধ পরিত্যাগ করেন নি আজও; অথচ অস্ত্রচালনায় উদ্যত তিনি কতবার ক্লৈব্যগত হয়ে সাময়িক অস্ত্রত্যাগ করেছেন। এমন কোনও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি ছিলেন না যিনি তেন ভগবদ্গীতার মীমাংসা দিয়ে আবার তাঁকে যুদ্ধে উজ্জীবিত করবেন। পক্ষান্তরে স্বয়ং যুযুধান রয়েছেন বলে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাও তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়। অর্থাৎ দার্শনিকের।

কবিধর্মের আভাসও জওহরলালের জীবনকাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত বিজড়িত।

যে জওহরলাল একদা স্বীকার করেছিলেন, বুদ্ধিবৃত্তির সচেতন অনুশাসনে তিনি বামপন্থী কিন্তু হৃদয়াবেগ তাঁকে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থায় টেনে নিয়ে আসে, তিনি সার্থক রাজনীতিক হতে চান নি; তিনি স্বতোবিরোধের কলধ্বনিতে সৃষ্টির একটি মূল সুর শুনতে পেয়েছিলেন। যে জওহরলাল ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজিকে লিখতে পেরেছিলেন, “we are drifting everywhere and sometimes I doubt if we are drifting in the right direction. We live in a state of perpetual crisis and have no real grip of the situation”—তিনি রাজনীতিকের সন্দিগ্ধতা প্রকাশ করেন নি, দার্শনিকের তর্কও না; তিনি সেদিন অনুভব করেছিলেন সেই বেদনা যা স্রষ্টার চিত্তে উপজাত হয় সৃষ্টির অশক্ততায়, যা কবি সহ্য করেন কল্পনা ও প্রকাশের দুঃসহ তারতম্য উপলব্ধি করে।

কিন্তু কবিও হলেন না জওহরলাল। তার জন্য তপস্যায় একাগ্র হলেন না কোনদিন।

তাহলে কী হলেন জওহরলাল?

সেই প্রশ্নই আসন্ন পরিচ্ছেদ কটিতে উপস্থাপিত হবে। শুধু এই প্রশ্নটি; তার উত্তর নয়, সম্ভবতঃ নয়।

জীবিত ব্যক্তির, জওহরলালের ক্ষেত্রে শুধু জীবিত কেন সক্রিয় জীবনের জোয়ার ভাটায় নিত্য-পরিবর্তনশীল ব্যক্তির, জীবনী-রচনা রীতি-সম্মত নয়। অস্বীকার করব না, এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের পরিচায়ক। তবু তা করতে যাচ্ছি প্রধানতঃ এই বিবেচনায় যে আলোচ্য মানুষের জীবদ্দশায় রচিত জীবনী-চিত্রের অধিকার ও ক্ষেত্র সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ অপেক্ষা পৃথক। জীবিতকালে রচিত চরিত্র-চিত্রণ বহুলাংশে অপূর্ণ, বহুলাংশে খণ্ডিত, বহুলাংশে নৈকট্যের কারণে অ্যাবেরেশন-দোষদুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা যেমন অস্বীকার

করা যায় না, তেমনি আবার এ কথাও অনস্বীকার্য যে জীবদ্দশায় চরিত্র-চিত্রণ অনেক বেশী জীবন্ত হওয়া স্বাভাবিক।

তা ছাড়া যেহেতু জওহরলাল ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত সেই কারণে জওহরলালের জীবনীচিত্রণ বহুলাংশে ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও চিত্রায়ণ। এবং এই প্রসঙ্গে মমসেনের মত অবধেয়: History can neither be made nor written without love or hatred. ভালবাসা এবং ঘৃণা দুই-ই রক্তমাংসের জীবিত মানুষ আমাদের কাছ থেকে যত পরিমাণে দাবি করতে পারেন, মৃত্যুর পরে আর কি ততখানি দেওয়া যায় তা?

॥ এক ॥

জওহরলাল নেহরু একদিন জন্মাবেন এই অস্পষ্ট অবিদিত ও অশ্রুত প্রতিশ্রুতি যে-পথ ধরে গঙ্গা-যমুনার যুক্তবেণী সঙ্গমে এসে পৌঁছেছিল তা বহুযুগের পুরাতন পরিচিত পথ। আর্য ঋষিকুল যে পথে এসেছিলেন যজ্ঞাগ্নি বহন করে সেই একই পথে কাশ্মীরের এক পণ্ডিত ও গার্হস্থ্য সমতলের অভিমুখে যাত্রা করলেন অনেকদিন পরে। কিন্তু তিনি 'পণ্ডিত' হলেও দার্শনিক নন; জিজ্ঞাসার তাড়নায় নয়, জীবিকার আকর্ষণে যাত্রা করেছিলেন তিনি।

তবু নিশ্চয় একটি বীজ বহন করেছিলেন কাশ্মীরের সেই দেশত্যাগী পণ্ডিত; জিজ্ঞাসার বীজ না হোক, একটি জিজ্ঞাসুর বীজ—যা অঙ্কুরিত হয়েছিল আরও দেড়শো বছর পরে। সেই জিজ্ঞাসুর নাম জওহরলাল, পণ্ডিতের বংশে যিনি প্রথম দার্শনিক, প্রথম পুরোহিত।

এই সম্ভবতঃ স্বাভাবিক। আর্য ঋষিরাও প্রথম যখন সিন্ধু উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন, তখন পর্যন্ত তাঁদের জিজ্ঞাসা কোন স্পষ্ট রূপ নেয় নি। বেদে নয়, প্রথম দর্শন পেলাম বেদান্তে। জীবিকার অন্বেষণ আংশিক সাফল্য লাভ না হলে জীবনের অন্বেষণ বুঝি শুরু হতে পারে না। আবার নিশ্চিন্ত জীবনের নিরাপত্তা যখন নিস্তল ঐশ্বর্যে থিতিয়ে পড়ে তখনও দার্শনিকের আবির্ভাবের পক্ষে অকাল। দর্শন একটি বিশেষ সংক্রান্তির ফসল।

উপনিষদের বীজ ছিল বেদের মধ্যে, যাযাবর আর্যদের পথক্লান্ত পর্যটনের মধ্যে; সে বীজ উপ্ত হল সিন্ধুর উর্বর উপকূলে।

জওহরলাল তেমনি ছিলেন কাশ্মীরের নয়নাভিরাম অপ্রাচুর্যের দিনে; জন্মালেন কিন্তু আনন্দভবনের ঐশ্বর্যের মধ্যে।

কাশ্মীর উপত্যকা থেকে যিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁর নাম ছিল রাজ কাউল। তখন খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ, মোগল সাম্রাজ্যের মত্ত রাত্রি প্রায় অবসান হয়েছে অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য—যা পরবর্তীকালে অস্তহীনতার গর্বে অসহ্য হয়ে উঠবে আমাদের—ওঠে নি তখনও, এমন অস্পষ্ট কাক-জ্যোৎস্নায় রাজ কাউল দিল্লীশ্বরের আমন্ত্রণে কাশ্মীর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। সম্রাট ফাররুখসিয়ার তাঁকে জায়গীর দিয়েছিলেন, এক নহরের ধারে ছিল তাঁর নতুন বাস্তুভিটা। নহর থেকে নেহরু।

রাজ কাউল সংস্কৃত ও ফারসীতে পণ্ডিত ছিলেন। দিল্লীর নহরের ধারা কবে একদিন শুকিয়ে হারিয়ে গেল, নেহরুদের ধারায় সংস্কৃত ও ফারসীর চর্চা বজায় রইল তারপরও বহুদিন। সেই সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত। বিদ্রোহে প্রায় সর্বস্বান্ত হলেন নেহরু পরিবার, দিল্লী এবং দিল্লীর সঙ্গে বিজড়িত মোগল-প্রভাব ছেড়ে এবারে সরে এলেন আগ্রা পর্যন্ত; নহর ছেড়ে যমুনার ধারা অনুসরণ করলেন জওহরলালের পিতামহ গঙ্গাধর। আর তখন নেহরু পরিবারে ফারসীর সঙ্গে প্রথম একটুখানি ইংরেজীর মেশাল ঘটল; প্রথম ইংরেজীনবীস নেহরুরা জওহরলালের জ্যেষ্ঠতাত, বংশীধর এবং নন্দলাল নেহরু।

তারপর মাত্র এক পুরুষে পট-পরিবর্তন দেখা দিল আশ্চর্য দ্রুতিতে।

পিতামহ গঙ্গাধরের মৃত্যুর তিন মাস পরে যেদিন পিতা মতিলাল জন্মালেন সেদিন ভারতের পূর্বদেশে একটি মহা জন্মের ক্ষণ: দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথের। অগ্রজ নন্দলালের সঙ্গে শিশু মতিলাল যমুনার আরও

ভাটিতে এগিয়ে এলেন, গঙ্গার সঙ্গমে ঘর বাঁধলেন তাঁরা। ততদিনে গঙ্গাজলে ব্রিটিশ মহারাণীর অভিষেক হয়ে গিয়েছে ভারতের সম্রাজ্ঞী রূপে; যমুনার কালো জলে নিষ্প্রভ হয়ে বিলীন হয়ে গেছে মোগল-যুগের শেষ প্রতিচ্ছায়াটুকু; ইংরেজীয়ানার গঙ্গায় প্রথম জোয়ার এসেছে জঞ্জাল এবং জীবনোচ্ছ্বাস যুগপৎ বহন করে। মতিলাল নেহরু কাশ্মীর উপত্যকার নন, দিল্লীর নহরের নন, আগ্রার যমুনাপুলিনের নন, গঙ্গার আপনা হলেন। বারো বছর বয়সে আরবী আর ফারসী ভাষায় পণ্ডিত বলে নাম করেছিলেন যিনি, সেই মতিলাল তের-চোদ্দ বছরে ইংরেজী পড়া শুরু করলেন। যমুনা থেকে গঙ্গার দিকে চোখ ফেরালেন তিনি।

ভাষা যদি বা আয়ত্ত হতে সময় লাগে, আদবকায়দা হতে চক্ষের পলক।

গঙ্গাধর নেহরুর ছবির দিকে তাকালে মনে হবে মোগল ওমরাহ বুঝি; দরবারী পোশাক পরা, হাতে তাঁর বাঁকা তরোয়াল। তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল আকারে-প্রকারে ইংরেজের মাসতুতো ভাই হয়ে উঠলেন। একটি যুগ নিঃশব্দে পরিবর্তিত হয়ে গেল। নূতন পটভূমিতে দাঁড়ালেন এসে নেহরু-বংশ।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই দিনে জন্মেছেন পর্যন্তই, আসলে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক নন, বরঞ্চ প্রিন্স দ্বারকানাথের সমসাময়িক তিনি।

আত্মজীবনীতে জওহরলাল লিখেছেন, "He was attracted to Western dress and other Western ways. ..He was, of course, a nationalist in a vague sense of the word, but he admired Englishmen and their ways. He had a feeling that his own countrymen had fallen low and almost deserved what they had got....An ever-increasing income brought many changes in our ways of living, for an increasing income meant increasing expenditure. The idea of hoarding money seemed to my father a slight on his own capacity to earn whenever he liked and as much as he desired....Gradually our ways became more and more Westernized." এই চিত্রের মধ্যে দ্বারকানাথের ঈষৎ আভাস ঈষৎ হলেও স্পষ্ট।

পাশ্চাত্ত্য রীতির সাজপোশাকের সঙ্গে মতিলাল "অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতি" কী ধরেছিলেন সে কথা এখানে নেই। কিন্তু অন্যত্র আছে: "একদিন আমি দেখলাম উনি claret অথবা অন্য কোন লাল রঙের মদ খাচ্ছেন। আমি হুইস্কি চিনতাম। তাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে হুইস্কি খেতে আমি অনেকবার দেখেছি। কিন্তু লাল রঙের এই নতুন জিনিসটি দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। দৌড়ে গিয়ে মাকে বললাম,—বাবা রক্ত খাচ্ছেন!"

প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি হয়েছিলেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। নিউটনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সূত্রেরই একটা রকমফের বলা চলতে পারে প্রকৃতির এই নিয়মকে। কিন্তু মতিলালের পুত্র জওহরলাল মহর্ষি হলেন না। পোশাকে এবং রীতিনীতিতে তিনি মতিলালের পুত্রই রইলেন, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা গেল না তরুণ জওহরলালের মধ্যে।

কিন্তু বিদ্রোহ না করেও বিপ্লব আনলেন জওহরলাল। আনন্দভবনের সাহেবী খোলসের মধ্যে একটি প্রবল প্রাণের সঞ্চার করলেন, যে-প্রাণের উত্তাপ থেকে মতিলালও রইলেন না বঞ্চিত। জওহরলাল বিদ্রোহ করলেন না, বরঞ্চ পিতার উত্তরাধিকার সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং সেই সঙ্গে সকলের অজ্ঞাতে পিতাকেও কখন করলেন আপন উত্তরাধিকারী। আনন্দভবনের প্রাসাদ-বিপ্লব নেহরু পরিবারের ঘটনাসঙ্কুল ইতিহাসের শেষ পটপরিবর্তন।

সে বিপ্লবে উত্তেজনা ছিল না।

তখন জওহরলালের বয়স একত্রিশ। মা এবং স্ত্রীকে নিয়ে (বিয়ের পর চার বছর পুরো হয় নি) তিনি মুসৌরীতে এসেছেন বায়ুপরিবর্তনের জন্য। মতিলাল গেছেন বিহারের পাটনা আদালতে মোটা ফিয়ের এক মোকদ্দমা লড়তে, বিরুদ্ধ পক্ষে আছেন চিত্তরঞ্জন দাশ। জওহরলালরা স্যাভয় হোটেলে উঠেছেন। জানেন না যে

সেই একই হোটেলে বাস করছেন, আফগানিস্থান সরকারের একদল প্রতিনিধি—আফগান যুদ্ধের শেষে সন্ধিশর্তের আলোচনা করতে এসেছেন যাঁরা। জওহরলাল না জানলেও সরকার জানতেন এ খবর, এমন ভাল করে জানতেন যে সরকারের চোখে ঘুম নেই। যে হোটেলে আফগান দূত, সেই হোটেলেই মতিলাল নেহরুর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ? মতিলাল অবশ্য নরমপন্থী নেতা কিন্তু তাঁর ছেলে? রক্ত গরম, বয়স কম, তার ওপর হ্যারো আর কেম্ব্রিজের হাওয়া গায়ে মেখে এসেছে। ব্যাপারটা সরকারের ভাল লাগল না।

অতএব পুলিশ সুপার ক্রুস সাহেব জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বন্ধুজনোচিত সৌহৃদ্যে বললেন, লোকাল গভর্মেণ্টের বাসনা যে ক্রুস সাহেব জওহরলালের কাছ থেকে একখানি মুচলেকা নিয়ে নিন যাতে করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে যে নেহরুদের সঙ্গে আফগান দলের কোনরকম যোগাযোগ ঘটবে না। ক্রুস সাহেব কি সন্দেহ করেন জওহরলাল চোরাগোপ্তা কিছু করছেন? আজ্ঞে না। ক্রুস সাহেবের গোয়েন্দা পুলিস কি স্যাভয় হোটেলে সবদা চোখ খুলে বসে নেই? তা আছে। তবে কেন এই মুচলেকা? গভর্মেণ্টের হুকুম।

হুকুম শুনলেন না জওহরলাল। অতএব ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সরকারের চীফ সেক্রেটারী এম. কীন সাহেবের একখানি আদেশপত্র জারি হল: যেহেতু স্থানীয় সরকারের অভিমতে এইরূপ বিশ্বাস করিবার ন্যায্য কারণ রহিয়াছে যে এলাহাবাদের জোয়াহিরলাল নেহরু জননিরাপত্তার পক্ষে অনিষ্টকর ধরণের কর্ম করিতেছেন বা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব উক্ত জোয়াহিরলাল নেহরু দেরাদুন জিলার সওহদ্দের মধ্যে প্রবেশ, বসবাস বা অবস্থান করিবেন না, ইত্যাদি।

মতিলালের নীল রক্ত ক্রুদ্ধ হল গভর্মেণ্টের অবিমৃষ্যকারী দুর্ব্যবহারে। তখনও ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের শৈশব; একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্যত্র রাজনীতির বিস্ফোরক মূর্তি দেখা দেয় নি, শুধু পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তধারা থেকে রক্তবীজ জন্মানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের নূতন অস্ত্র হাতে অবিসম্বাদী নেতৃত্বের বেদীতে শক্ত হয়ে দাঁড়ান নি শীর্ণকায় গান্ধীজী তখনও। তখনও ঝড় শুরু হয় নি। অথচ এমন সময় জওহরলালের ওপর অকারণ বহিষ্কার-আদেশ। মতিলাল চিঠি লিখলেন ছোট লাট হারকুর্ট বাটলারকে।

সে চিঠিতে সবিস্তারে বোঝানো হল, স্যাভয় হোটেলে ঘর নেওয়া নিতান্তই ঘটনাচক্রে; পরিবারের মহিলারা অসুস্থ; জওহরলাল ছাড়া আর কারও পক্ষে দেখা-শোনা করা অসম্ভব। ইত্যাদি।

চিঠিতে কিন্তু কোন অনুরোধ ছিল না, অন্ততঃ প্রত্যক্ষ অনুরোধ। বরঞ্চ মতিলাল লিখলেন, "I need hardly say that I wholly approve of Jawharlal's action. It was indeed the only course open to him. His politics and mine are well known. We have never made any secret of them. We know they are not of the type which finds favour with the Government and we are prepared to suffer any discomfort which may necessarily flow from them."

আনন্দভবনের মতিলাল নেহরু রাজনীতির জন্য "যে-কোনও অসুবিধা ভোগ করতে প্রস্তুত" হলেন কবে থেকে?

এর আগে পর্যন্ত মতিলালের পরিচয় ছিল মডারেট দলের নেতা হিসাবে; বড়দিনের সময় কন্‌ফারেন্স করে বড়লাট বাহাদুরের বরাবর দরখাস্ত পাঠিয়ে পলিটিক্যাল রিফর্মের আবেদন-নিবেদন জানাবার জন্য যে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল, মতিলাল ছিলেন তারই উত্তরাধিকারী। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীও বড়লাটের কাছে তেমনি সুরে আবেদন জানিয়েছিলেন, রাওল্যাট বিল প্রত্যাহার করার জন্য। যথারীতি সে আবেদন বধিরের কানে প্রত্যাহত হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া মডারেটদের মত হল না। তিনি 'সত্যাগ্রহসভা' সংগঠনের ডাক দিলেন। ঘোষণা করলেন—এই সভার সদস্যরা রাওল্যাট আইন মানবে না। মানবে না কোন অন্যায় আইন। তারা জেলে যাবে, অন্যায়ের সঙ্গে করবে না আপস।

খবরের কাগজে জওহরলাল পড়লেন সত্যাগ্রহ সভার

কথা। উদ্দীপনার আগুন জ্বলে উঠল তাঁর মনে। সেই মুহূর্তে গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটে বেরোতে চাইলেন তরুণ জওহর। কিন্তু মতিলাল, মডারেট মতিলাল, ঐশ্বর্যবান মতিলাল, আনন্দভবনের বিলাত-ফেরত মতিলাল কী করে সমর্থন করতে পারেন এই উদ্ভট রাজনৈতিক প্রোগ্রাম—যা গুজরাটের এক অখ্যাত শীর্ণকায় দক্ষিণ-আফ্রিকা-ফেরত বেনিয়ার মাথায় এসে চেপেছে দুর্বুদ্ধির মত? কী হবে কতগুলো লোক দল বেঁধে গিয়ে জেলে ঢুকলে? সরকারের কী আসে যায় এতে?

না। মতিলাল বললেন, ও সবের কোন মানেই হয় না।

জওহরলাল বিদ্রোহ করলেন না, কিন্তু আত্মসমর্পণও করলেন না। বাবার মতের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ নীতি অবলম্বন করলেন জওহরলাল।

এই প্রথম মডারেট মতিলালের নরমপন্থায় একটুখানি চিড় ধরল। দিনের পর দিন পিতা-পুত্রের তর্ক চলতে থাকল, সত্যাগ্রহ সভার পক্ষে ও বিপক্ষে। রাতের পর রাত জওহরলাল বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বিনিদ্র পায়চারি করে খুঁজতে লাগলেন—'কঃ পন্থাঃ'। আর মতিলাল নেহরু—সাহেবিয়ানায় দুরন্ত মতিলাল—সবার চোখের আড়ালে আনন্দভবনের নগ্ন মেঝেতে শুয়ে পরখ করে দেখতে লাগলেন: জেলে গিয়ে জওহরের কতখানি কষ্ট হবে।

মতিলাল নেহরুকে ইংরেজ সরকার জেলে নিয়েছিল অনেক পরে; এবং তখনকার জেলবাসে বিলাসের উপকরণে অপ্রাচুর্য ঘটে নি তত। কিন্তু ইংরেজের আগে জওহরলাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন মতিলালকে। জওহরলালের হাতে মতিলাল আনন্দভবনের নির্জন শয়নকক্ষে যে বিনিদ্র কারাবাসের দুঃখ সহ্য করেছিলেন, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে মডারেট মতিলালের রাজনৈতিক মৃত্যু ছিল অবধারিত।

শেষ পর্যন্ত বাইরের হিসাবে মতিলালের কথাই থাকল। জওহরলাল গান্ধীর স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিলেন না।

কিন্তু মতিলালের সেই যে পরিবর্তন শুরু হল, তার ধারা অব্যাহত হয়ে রইল মৃত্যু পর্যন্ত।

এর পরেই জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘৃণ্য ভূমিকায় নামলেন জেনারেল ওডায়ার। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের জঘন্যতম পৈশাচিকতার পরিচয়ে বিক্ষুব্ধ হল।

মডারেটের দল কিন্তু তখনও মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে। কিস্তিবদ্ধ রাজনৈতিক সংস্কারের আর এক কিস্তি আসছে। এমনি করেই একদিন, কোন একদিন, এক শতাব্দী বা হাজার বছর পরে, আসবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস।

মতিলালের অন্তর থেকে মডারেট ততদিনে বিদায় নিতে শুরু করেছে। মডারেটদের মুখপত্র 'লীডারে'র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে নূতন সংবাদপত্র 'ইনডিপেনডেণ্ট' প্রকাশ করছেন তিনি। ১৯১৯-এর কংগ্রেস-অধিবেশন বসবে জালিয়ানওয়ালাবাগ-খ্যাত অমৃতসরে, তাতে সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করলেন মতিলাল। উদাত্ত আহ্বান জানালেন মডারেট বন্ধুদের। পাঞ্জাবের বিক্ষত হৃদয় আপনাদের ডাকছে—লিখলেন মতিলাল। কিন্তু মডারেটরা যোগ দিল না অমৃতসর কংগ্রেসে। অপমানিত মতিলাল মডারেট দলের সঙ্গে শেষ সম্পর্কও ছিন্ন করে দিলেন।

অমৃতসর কংগ্রেসে প্রথম শোনা গেল—মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

ভারতের রাজনৈতিক দিগন্তে নূতন সূর্যোদয় হল, সে-সূর্যের নাম গান্ধী। আর সেই গান্ধী-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন তার আগের দিন পর্যন্ত যিনি ছিলেন মডারেট সেই মতিলাল নেহরু, যাঁর নয়নের মণি জওহরলালকে আনন্দভবনের আরাম-শয়ন থেকে কারাকক্ষের দুঃখের মধ্যে ডাক দিয়েছিলেন ওই গান্ধী।

We are prepared to suffer any discomfort—ছোট লাটকে লেখা চিঠিতে এই মৃদু ঘোষণার মধ্যে মতিলাল নেহরুর যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত দেখি, তাকেই আমি বলেছি আনন্দভবনের প্রাসাদ-বিপ্লব, যার পুরোহিত জওহরলাল নেহরু। বিদ্রোহী নন, শুধু বিপ্লবী।

॥ দুই ॥

কিন্তু সে কাহিনী পরবর্তী কালের।

আমাদের জওহরলাল এখনও শিশু। এখন পর্যন্ত বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দূরের কথা, বাবার সঙ্গে মতদ্বৈধ জওহরলালের কল্পনার অতীত। মতিলাল জওহরলালের আদর্শ, শক্তি আর সাহস আর বুদ্ধির চরম দৃষ্টান্ত। মতিলাল অট্টহাসি করেন বুক কাঁপিয়ে, সে হাসি সারা এলাহাবাদের জনশ্রুতি। মতিলাল যখন রেগে ওঠেন সারা এলাহাবাদ ভয়ে আঁতকে ওঠে। চাকর-বাকর তটস্থ, কখন কার হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলেন ঠিক নেই।

একদিন জওহরলাল পড়লেন সেই মূর্তিমান ক্রোধাগ্নির মধ্যে। বছর ছয়েক বয়স হবে তাঁর। বাড়িতে সমবয়সী সঙ্গী নেই একটিও, সারাদিন একা একা খুটি খুটি করে সময় কাটে। ঘুরতে ঘুরতে মতিলালের অফিস ঘরে ঢুকলেন জওহরলাল। দেখলেন, টেবিলের ওপর দুটি ফাউন্টেন পেন। তখন ১৮৯৫ সাল—চ আনা দামের ফাউন্টেন পেনের প্রাদুর্ভাব হতে অনেক দেরি। তখনকার ফাউন্টেন পেন বুঝি এখনকার টেলিভিশনের মত আশ্চর্য বস্তু। সেই আশ্চর্য বস্তু বাবার টেবিলে দুটি। আর জওহরলালের নেই একটিও। সোস্তালিস্ট জওহরলালের প্রথম সমাজবাদী কর্মপন্থা অতএব শুরু হল—সেই ছ বছর বয়সে। একটি কলম তিনি 'না বলিয়া লইলেন।'

খানাতল্লাশে অপরাধ সপ্রমাণ হতে দেরি লাগল না। বেশ দিন কতক জওহরলালের সারা গায়ে মলম মালিশ করতে হয়েছিল সেবার কেন না, আবাদী কংগ্রেসের সোস্তালিস্ট ধাঁচের আদর্শে অনুপ্রাণিত তো ছিলেনই না মতিলাল, ননভায়োলেন্সেও পর্যন্ত দীক্ষা নেন নি তিনি।

আনন্দভবনের প্রাসাদে যখন নেহরুরা বাস করতে শুরু করলেন তখন জওহরলালের বয়স দশ বছর। মতিলালের ঐশ্বর্য তখন দু হাতে খরচ করেও সামলানো যাচ্ছে না—উপচে পড়ছে। আনন্দভবনের অট্টালিকায় ধরানো যাচ্ছে না ঐশ্বর্য, উপচে পড়ছে বিস্তীর্ণ উদ্যান হয়ে, সু-অভিরাম সুইমিং পুল হয়ে, এলাহাবাদের প্রথম বিজলী বাতি হয়ে। দশ বছরের জওহরলাল দুদিনেই সাঁতার শিখলেন, অনিচ্ছুক সবাইকে টেনে নামাতে লাগলেন জলে। অনিচ্ছুকদের দলে অবশ্য মতিলাল ছিলেন, ছিলেন তেজবাহাদুর সপ্রু; তাঁদের জলে নামাতে সাহস হয় নি জওহরলালের। তেজবাহাদুর এক হাত গভীর প্রথম ধাপ ছাড়িয়ে সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে নামেন নি কখনও, মতিলাল কষ্টেসৃষ্টে দাঁতে-দাঁত চেপে দমসম হয়ে এপার-ওপার করেছেন এক-আধ দিন। আর জওহরলাল তো সাঁতার পেলে আর কিছু চান না। সুইমিং পুল নয় রাজনৈতিক আন্দোলন যেন—জওহরলাল ঝাঁপ দিতে চান, মতিলাল অগত্যা নেমে পড়েন, সপ্রু থাকেন নিরাপদ কিনারে!

এই সময় জন্মালেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, তখন স্বরূপ নেহরু, মতিলালের দ্বিতীয় সন্তান। খুশিতে [illegible] হলেন জওহরলাল। মতিলাল তখন য়ুরোপে।

বাড়িতেই লেখাপড়া করছেন জওহরলাল। গৃহশিক্ষক ফার্ডিন্যাণ্ড টি. ব্রুকস আধা-আইরিশ, আধা-ফরাসী। ব্রুকস সাহেবের কাছে জওহরলাল বই পড়ার স্বাদ শিখলেন। এলোপাতাড়ি পড়ে ফেললেন অজস্র বই। অ্যালিস ইন্ দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড পড়লেন, জাঙ্গল বুক এবং কিম পড়লেন, পড়ে ফেললেন ডন কুইক্‌সোট। স্কট, ডিকেন্সও বাদ দিলেন না, এইচ জি ওয়েলসের উপন্যাস শেষ করে ফেললেন বেশ কখানা। শার্লক হোমস্ আগেই শেষ হয়েছিল, প্রিজনার অব জেন্দাও পড়া হল। জেরোম কে জেরোমের রসরচনা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন বালক জওহরলাল।

আর পড়লেন কবিতা। অজস্র অজস্র কবিতার দুর্বোধ রহস্যে অভিসার শুরু হল জওহরলালের। সার্থক শিক্ষক ব্রুকস সাহেব—ছাত্রকে দিয়েছিলেন পথের সন্ধান। যে-পথে সার্থকতম হতে পারতেন জওহরলাল সেই পথের সঙ্কেত দেখিয়েছিলেন। কেন না, অসংখ্য ওঠা-পড়া, ঘাত-প্রতিঘাত, জোয়ার-ভাটার শেষে, চুয়াত্তর বছর বয়সের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অন্তরের অন্তস্তলে আজও যে অতৃপ্তি তা কবির অতৃপ্তি। তাঁর অসহিষ্ণুতা, কবির অসহিষ্ণুতা। তাঁর বেদনা কবির বেদনা।

ক্রুক্স বিজ্ঞানেও হাতেখড়ি দিয়েছিলেন জওহরকে। আবার সেই সঙ্গে ভর্তি করেছিলেন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে। বিজ্ঞান ভুলে গেছেন জওহরলাল নেহরু, থিয়োসফি আজ তাঁর কাছে প্রায় অবজ্ঞার বস্তু। কিন্তু কবিতা? জানি না কাব্য হাতে নিয়ে বসার অবসর কোন বিরল মুহূর্তেও আসে কিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর! না এলে তাঁর দুর্ভাগ্য। এবং আমাদেরও।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে—যখন বাংলাদেশ স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ, বঙ্গভঙ্গের সেট্‌লড ফ্যাক্ট আন্‌সেটল্‌ড করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাঙালী যখন বিদেশী পণ্যের বহ্ন্যুৎসব শুরু করেছে, রাখীবন্ধনের পবিত্র ব্রতে বাংলা অঙ্গীকার নিয়েছে যখন—নেহরুরা সেই সময়ে সপরিবারে বিলেত যাত্রা করলেন। লণ্ডন পৌঁছবার ঠিক পরের দিন তাঁরা ডার্বির ঘোড়দৌড় দেখতে গেলেন, বাংলাদেশে তখন বন্দেমাতরম্ মন্ত্র মুখে নিয়ে কত স্বেচ্ছাসেবক পুলিসের মার খেয়ে রাস্তায় মরে যাচ্ছে তার হিসাব নেই। গঙ্গার তরঙ্গ তখনও প্রয়াগ পর্যন্ত পৌঁছয় নি। তখনও নেহরুদের বন্দরের কাল হয় নি শেষ।

বিশ্ববিশ্রুত হ্যারো স্কুলে ভর্তি হলেন জওহরলাল।

তখন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম উড়োজাহাজ তৈরি করেছেন, মানুষের সঙ্কীর্ণ দিগন্ত প্রশস্ত হতে শুরু করেছে। জওহরলাল রোমাঞ্চিত হলেন। এই এক বিস্ময়ের জল যা আজও জওহরলালকে অভিভূত করে। প্রথম যখন সোভিয়েট স্পুটনিক মহাশূন্যে উড়ল তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল জাপানে, সেখানে এক রাজনৈতিক বক্তৃতির মধ্যে জওহরলালের মুখ থেকে মানুষের মহাশূন্য জয়ের আনন্দে যে উত্তেজিত উল্লাস শুনেছিলাম, তাতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল কিশোর জওহরের ওই একই বিস্ময়। হ্যারো থেকে মতিলালকে চিঠি লিখলেন জওহরলাল: শীগগিরই এখান থেকে শনিবার-রবিবার এলাহাবাদে বেড়িয়ে আসতে পারব আমি, আকাশে উড়ে বেড়াবার যুগ এল বলে। অনেক দিন পরে 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে জওহরলাল লিখেছিলেন, "Perhaps I ought to have been an aviator, so that when slowness and dullness of life overcome me, I could have rushed into the tumult of the clouds." কিন্তু বৈমানিক হতে পারলেন কই জওহরলাল? প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ে জীবনের মন্থর একঘেয়েমি যখন তাঁকে ক্লান্ত করে তোলে তখন কুলু উপত্যকায় ছুটে যান তিনি, সোনালী মেঘের জানলায় নয়।

হ্যারো স্কুলে মাত্র দু বছর পড়ে কেম্‌ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে গিয়ে ভর্তি হলেন জওহরলাল। আঠারো বছর বয়স তাঁর তখন। কৈশোরের সবুজ দিন যৌবনের গাঢ় নীলে মিশতে শুরু করেছে। হ্যারোর কঠিন শৃঙ্খলা থেকে ট্রিনিটির মুক্তি—আঃ, বৈমানিক না হয়েও যেন উড়তে লাগলেন জওহরলাল। উড়তে চাইলেন অন্তরিক্ষে। কেম্‌ব্রিজের বাতাস বুক ভরে গ্রহণ করে জওহরলাল বলতে লাগলেন—বড় হয়েছি, আমি বড় হয়েছি।

হ্যাঁ, বড় হতে আরম্ভ করলেন জওহরলাল নেহরু। কেম্‌ব্রিজ হ্যারো নয় যেখানে হাবাগোবা ছেলেগুলো পড়া আর খেলা ছাড়া অন্য কোন খবর রাখে না। কেম্‌ব্রিজে সাহিত্যের আলোচনা হয় উচ্চ কোটির, ইতিহাসের বিতর্ক হয় বৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ, অর্থনীতি আর রাজনীতি যেন বিস্ময়কর উদ্ভাসে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে লাজুক জওহরলালের অবাক চোখের সামনে। কিন্তু বড় হতে আরম্ভ করেছেন জওহরলাল—পিছিয়ে থাকলে চলবে না তাঁর। তাই প্রাগ্রসরদের দলে মিশতে হবে তাঁকেও। আনন্দভবনের নিঃসঙ্গ শিশু নন, নন তিনি আর হ্যারোর মুখচোরা বাচ্চা, জওহরলাল কেম্‌ব্রিজের তরুণ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। পড়তে আরম্ভ করলেন জওহরলাল।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ট্রাইপোজ ছিল পাঠক্রম, রসায়ন ভূবিদ্যা আর উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে; কিন্তু শুধু কেমিস্ট্রি পড়ে নাৎসে নিয়ে আলোচনা করবেন কী করে, জিওলজির বিদ্যা দিয়ে কী করে হবে বার্ণাড শয়ের সর্বাধুনিক গ্রন্থের সুবৃহৎ ভূমিকার বিশ্লেষণ, বোটানির পাঠ্যপুস্তক লোয়েস ডিকিন্‌সনের বই বুঝতে কী সাহায্য করবে? জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে নুড়ি না কুড়োলে সেতুবন্ধ করবেন কী দিয়ে জওহরলাল নেহরু?—কিসের সেতু? না, নিজেকে

জানবার সেতু। সবকিছু সেই সেতুর ওপারে; স্বরাজ ওপারে, মুক্তি ওপারে, মানুষের মানুষ বলে পরিচয়ের চাবিকাঠিটি ওপারে; শান্তি ওপারে, সান্ত্বনা ওপারে, আত্মার পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনাটি ওপারে; এমন কি সত্যিকারের দুঃখ, বৃহৎ দুঃখ, মহৎ বেদনা, পৌরুষের ক্রন্দন, সব কিছু ওপারে; এপারে ইতর সুখ, বামন দুঃখ, এপারে শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি। এত কথা যদিও জানতেন না জওহরলাল। জানতেন না কারণ ভাবেন নি; ভাবতে শেখেন নি জওহরলাল, শুরু করেন নি তখনও চিন্তার জরে আত্মাকে সিদ্ধ করতে, প্রসিদ্ধ করতে। তখন পর্যন্ত চিন্তার জন্য নয়, বৃত্তির জন্য বিদ্যা অর্জনে ব্রতী তিনি; পেশার প্রয়োজনে। অর্থাৎ সেই ভূমিকায় কথিত আত্মবলের দিকে চোখ রয়েছে জওহরলালের।

তবু জওহরলাল নুড়ি কুড়োচ্ছেন। যৎকিঞ্চিৎ পল্লবগ্রাহিতায় অন্ততঃ ততটুকু পড়ে নিচ্ছেন যাতে ট্রিনিটি কলেজের আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট নামে না পড়ে কলঙ্ক। সেক্‌সের আলোচনা উঠলে নেহাত না সেক্‌সপীয়ারের কথা বলে ফেলতে হয়, তার জন্য আইভান ব্লক, হ্যাভেলক এলিস, ক্র্যাফ্‌ট এবিং—এঁদের দু-চারটি রেফারেন্স জেনে নিতে হচ্ছে জওহরলালকে।

বাইরের দিকে বেশ চটপটে হয়ে উঠলেন জওহরলাল, কিন্তু একটু আঁচড় কাটলেই ভেতরে যে লাজুক ছিলেন তাই রইলেন। সেক্‌স নিয়ে যা কিছু বুকনি সে ওই হ্যাভেলক এলিসের থিয়োরিতেই শেষ; বিজ্ঞানের ছাত্র হলে কী হবে ও-বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সুযোগ—অথবা দুর্যোগ—এলেই বুক ঢিব-ঢিব। পাপ-পুণ্যের সংস্কার কমই ছিল জওহরলালের, ওটি পৈতৃক উত্তরাধিকার, কিন্তু লজ্জা কাটাতে গেলেই লজ্জায় মাথা কাটা যায় যেন। কাজেই 'একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি' দিয়ে মনে-মনে ফাল্গুনী রচনা করেই দিন কাটে তাঁর।

এক কথায় কেম্‌ব্রিজের তিন বছর জওহরলাল গুড বয় নামের সর্বাংশে যোগ্য হয়ে উঠলেন। ভারতীয়দের 'মজলিসে' যান কিন্তু পলিটিক্যাল তর্কের মধ্যে মুখ খোলেন না। এমন কি কলেজের ডিবেটিং সোসাইটি—যেখানে একটা পুরো টার্মের মধ্যে একদিনও ডিবেট না করলে জরিমানা দিতে হয়—সেখানেও গুড বয় জওহরলাল জরিমানা দিয়েছেন কয়েকবার।

গুড বয়দের যা হওয়ার কথা তাই হল মোটামুটি—অর্থাৎ সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে পাস করে গেলেন নেহরু। এই প্রথম মতিলালকে অতিক্রম করলেন জওহরলাল। গ্র্যাজুয়েট হলেন।

গ্র্যাজুয়েশনের আগেই প্রশ্ন উঠেছিল কী করবেন জওহরলাল অতঃপর। অর্থাৎ কোন্ বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হবেন। যে সব ছেলে তখনকার দিনে বিলেতে পড়তে যেত তাদের সামনে প্রথমেই যে উচ্চাভিলাষটি ফুটে উঠত তা হল দুনিয়ার সেরা পেশা চাকরি-কুল-চূড়ামণি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। জওহরলালের ক্ষেত্রে প্রথমেই উঠল আই. সি. এস.-এর কথা। কিন্তু বাইশ বছর পূর্ণ না হলে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়া যাবে না, অর্থাৎ আরও দু বছর বসে থাকতে হবে চুপচাপ। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টারি পড়া ঠিক হল। পৈতৃক আইন-ব্যবসায়ে নামবেন জওহরলাল। যে-পেশায় সে মতিলাল ধুলোর মুঠোকে সোনার মুঠো করেছেন আই. সি. এস.-এর চাইতে কম কী তা? ইনার টেম্পলে নাম লেখালেন জওহরলাল। এবং গুড বয়ের মতই পাস করে গেলেন ব্যারিস্টারি পরীক্ষা।

যদিও ততদিনে আর পুরোপুরি গুড বয় ছিলেন কি জওহরলাল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ব্যারিস্টার হতে তেমন কিছু খেটে পড়তে হয় এ কথা ব্যারিস্টাররাও বলেন না। অঢেল সময় তখন নেহরুর হাতে। লণ্ডনের জনসমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগলেন জওহরলাল ব্যারিস্টারি পড়ার দু বছর। এই সময় ফেবিয়ান সোস্যালিস্টদের রাজনৈতিক মত ও আন্দোলন জওহরলালকে আকৃষ্ট করল। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন জোরকদমে চলছে। সিন্‌ফিন দলের প্রথম কার্যকলাপ শুরু হয়েছে। এদিকে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনও চলেছে। সবকিছু দেখে বেড়াতে লাগলেন জওহরলাল।

সব কিছুই দেখে বেড়াতে লাগলেন। অর্থাৎ একুশ বাইশ বছর বয়সের ধনীর দুলাল একটু-আধটু উড়ে

[illegible]া করলেন। জওহরলালের ভাষায়—"Often exceeded the handsome allowance that [illegible]ther made me and he was greatly worried [illegible] my account fearing that I was rapidly [illegible]ing to the devil. But as a matter of fact [illegible] was not doing anything so notable. I was [illegible]erely trying to ape to some extent the [illegible]osperous but somewhat emptyheaded [illegible]nglishman who is called a 'man about [illegible]wn'."

[illegible]াইপোস এবং বারে যেমন মাঝারি শ্রেণীতে উত্তরে [illegible]ছিলেন, শহরে জীবনে একটুখানি উড়ে বেড়াবার [illegible]তেও তার চাইতে বেশী কিছু ভাল ফল করলেন জওহরলাল। সেখানেও মোটামুটি সেকেণ্ড ক্লাস।

১৯১২ সালে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এলেন [illegible]রলাল। আস্তাবলের জন্য প্রস্তুত।

॥ তিন ॥

[illegible]বে যে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন [illegible]রলাল সেকথা দিন তারিখ ঠিক করে বলা যায় না। [illegible] যেমনভাবে এক রাতে অকস্মাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া'র শয্যা [illegible]ড় বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে শ্রীচৈতন্য হবার পথে নেমে [illegible]ছিলেন তেমন করে নয়। তাই দিন তারিখ লেখা [illegible] কোথাও। কিন্তু জওহরলালও নেমেছিলেন। [illegible]দার ব্যারিস্টার থেকে হয়েছিলেন পেশাদার [illegible]নৈতিক নেতা। পেশা থেকে এসেছিলেন ধর্মে। [illegible]নৈমিত্তিকের নহর ছেড়ে বেদনার যমুনায়, তারপর [illegible]দের সমুদ্র-যাত্রী অন্য এক গঙ্গার তরঙ্গে। আনন্দ-[illegible]র কৃত্রিম সন্তরণ-সরোবরের বিলাস বেঁধে রাখতে [illegible] নি দেশরত্ন জওহরলালকে, মানুষের সমুদ্র তাঁকে [illegible] জানিয়েছে শঙ্কাহীন ঝাঁপ দিতে। একদিনে নয়, [illegible] তারিখ লেখা নেই সে-ইতিহাসের।

প্রফেশনের আস্তাবল ছেড়ে ওয়ারিয়র হয়েছেন [illegible]রলাল, প্রিস্ট হয়েছেন, পোয়েট হয়েছেন। সবকিছু [illegible]য়ে শেষে হয়েছেন প্রাইম মিনিস্টার অব ইণ্ডিয়া। কিন্তু তাই কি শেষ পর্যন্ত? ভারতের প্রধানমন্ত্রী—এই যদি হয় তাঁর শেষ পরিচয় তবে কী দরকার ছিল তাঁর জওহরলাল নেহরু হবার? যোদ্ধা এবং পুরোহিত এবং কবি—কোন কিছু না হয়ে কেবলমাত্র পেশাদারির আস্তাবল থেকে প্রধানমন্ত্রী হতে আটকাত নাকি তাঁর? জওহরলালের পর তো সেই আস্তাবল থেকেই আসবে ভারতবর্ষের অগণিত মন্ত্রী এবং প্রধান মন্ত্রীর পাল।

যখন জওহরলাল হ্যারো এবং কেম্ব্রিজের ছাত্র তখন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দুটি নাটকের অভিনয় চলেছে দুই দলের হাতে। বিপিন পাল, গোখেল, লাজপত রায়, লোকমান্য তিলক—এঁরা সব শ্রেষ্ঠাংশের অভিনেতা। কেউ বা নরমপন্থী, কেউ গরমপন্থী। বিপিন পাল প্রভৃতি গরমপন্থীরা গরম বক্তৃতা করেন, লাজপত রায় প্রভৃতি নরমপন্থীরা মিহিসুরের ভজন গান। দু দলই সংস্কার চান, শাসন-সংস্কার।

এ ছাড়া আর যাঁরা রয়েছেন—বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, যাঁরা সংস্কার নয় বিপ্লবের জন্য জীবন পণ করেছেন, জওহরলাল তাঁদের নাম শোনেন নি হয়তো। বিলেতের সংবাদপত্রে তাঁদের নাম ছাপা হয় না। তাঁরা কেম্ব্রিজ মজলিসে বক্তৃতা করতে যান না। যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

জওহরলাল রাজনীতি বলতে জানেন হয় বিপিন পাল, না হয় লাজপত রায়। এবং পৈতৃক পক্ষপাতিত্ব নরমপন্থা লাজপতের দিকে, অতএব জওহরলালেরও মনে হয় বিপিন পাল শুধুই অকারণে চিৎকার পন্থী।

১৯০৭ সনের সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী আর চরম-পন্থী দলের মনকষাকষিতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মডারেটদের হাতে চলে গেল। মতিলাল নেহরু হলেন সেই কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা।

নরমপন্থী নেতা হলে কী হবে মতিলালের মেজাজ ছিল যথেষ্ট পরিমাণে গরম। আনন্দ হলে যেমন অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তেন, রেগে উঠলে তেমনি লোকের মাথা ভেঙে দেবার দিকে ছিল তাঁর ঝোঁক। নিখুঁত সাহেবী পোশাকে মোড়া মতিলালের শিরায় ছিল বাঁকা তলোয়ার হাতে মোগল ওমরাহ গঙ্গাধরের অসহিষ্ণু

রক্তস্রোত। মডারেট দলের ইমমডারেট মুখপাত্র হয়ে উঠলেন মতিলাল, নরম দলের গরম নেতা।

গভর্মেন্টের ওপরে নয়, স্বভাবতঃই। গরম নিঃশ্বাস বর্ষিত হতে থাকল রাজনীতির বিরুদ্ধ দলের ওপরে। বাংলা এবং মহারাষ্ট্রের যে তরুণদল জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, মতিলাল তাদের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনার শর নিক্ষেপ শুরু করলেন। লণ্ডনে বসে জওহরলাল একবার দেখলেন তেমনি একটি প্রবন্ধ—পড়ে তাঁর পিতৃভক্তির বাঁধ উপচে তারুণ্যের বন্যা দুর্বার হয়ে উঠল; মতিলালকে পত্রাঘাত করলেন জওহরলাল। লিখলেন, ব্রিটিশ সরকার নিশ্চয় মতিলালের রাজনৈতিক কার্যকলাপে ভারি খুশি হয়েছেন! সে চিঠি পেয়ে মতিলালের অন্ধ ক্রোধ অনুমেয়, সেই মুহূর্তে ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনেন প্রায়।

রাজনীতি বলতেই তখন ছিল শৌখিন বিশ্রম্ভালাপ। একমাত্র বাংলাদেশ এবং অংশতঃ মহারাষ্ট্র ছিল ব্যতিক্রম; স্বদেশী আন্দোলন (পলিটিক্স কথাটার বাংলা প্রতিশব্দই ছিল—এই সেদিন পর্যন্ত ছিল—'স্বদেশী'; রাজ-নীতি নয়, লোক-নীতি!) বাংলাদেশে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক শ্রমিক সর্বহারা নেমে এসেছিল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে স্বদেশীর যজ্ঞশালায়। কিন্তু ভারতের আর সর্বত্র পলিটিক্স ছিল হাইকোর্টের উকিল, জমিদার আর এই জাতীয় উপরতলার মুষ্টিমেয় মানুষের অবসর-বিনোদনের একটা উপায়। বিলেত-ফেরতার পলিটিক্স। কেম্ব্রিজ মজলিসে যাঁরা বেশী গরম ডিবেট করতেন, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ওকালতি করে ব্রিটিশ শাসনের মুণ্ডপাত করতেন, তাঁদের মধ্যে ভাল ডিবেটার আই. সি. এস. পাস করে ম্যাজিস্ট্রেট সেজে ভারতে ফিরে আসতেন; আর যাঁরা ফেল করতেন আই. সি. এস. পরীক্ষায়, ম্যাজিস্ট্রেট হতে না পেরে তাঁরা হতেন ব্যারিস্টার এবং পার্টটাইম পলিটিক্যাল লীডার। বাংলাদেশের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে (সামান্য পরিমাণে মহারাষ্ট্রের) এই ছিল তখনকার ভারতীয় রাজনীতির চেহারা।

জওহরলাল যখন ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলেন তখন ভারতের রাজনীতিতে ভাটার টান অতি প্রবল। তখন বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেছে, তাৎক্ষণিক সাফল্যের অবসাদে বাংলার অগ্নিসেনারা স্তিমিত। লোকমান্য তিলক কারারুদ্ধ। মর্লি-মিণ্টো শাসনতন্ত্রে পরিতুষ্ট মডারেটের দল লাটসাহেবের কাউন্সিলে আসীন হয়ে পরিতৃপ্ত। কংগ্রেস তখন গাজনের সঙের মত মডারেটদের বৎসরান্তিক উৎসব। বড়দিনের সময় মদ, টার্কি আর কেকের মত এক খাবলা কংগ্রেস অধিবেশনও চাই; না হলে জমে না। লাইফ ইজ সো ডাল!

বাঁকিপুরে কংগ্রেস হল সেবার বড়দিনে। জওহরলাল প্রতিনিধি সেজে গেলেন। দেখেন ভাষা ইংরেজী, পোশাক ইংরেজী, আদব ইংরেজী। সদ্য বিলেত থেকে ফেরা জওহরলালের বড় খেলো মনে হল বাঁকিপুরের কৃত্রিম বিলেতকে।

শুধু কংগ্রেস বলে নয়, চতুর্দিকের সমস্ত পরিবেশ কৃত্রিম লাগে জওহরলালের। কৃত্রিম এবং ভোঁতা। প্রাণ নেই, ধার নেই কোথাও। সীসের মতন ভারী, বোবা, মলিন হয়ে ওঠে জওহরলালের ঘরে ফেরা দিনগুলি। হাইকোর্টে যান, বার লাইব্রেরীতে আড্ডা দেন, বাড়ি ফিরে আসেন। কিছু নেই, জীবনে কিছু যেন নেই।

উত্তেজনা খুঁজতে শিকারে বেরোলেন জওহরলাল। দক্ষ নন মৃগয়ায়, তবু একদিন আন্দাজে গুলি চালিয়ে একটা ভালুক মেরে বসলেন। প্রথম সাফল্যে উত্তেজিত জওহরলাল আবার বন্দুক তুললেন; আর তখন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল ছোট একটা হরিণ। একটুখানি ছোট জন্তুটা শিকারী জওহরলালের পায়ে লুটিয়ে পড়ে চোখ তুলে তাকাল। সেই নিষ্পাপ বড় বড় চোখের মুমূর্ষু মূক ভাষায় কী যেন সে বলে গেল জওহরলালকে। তারপর মরে গেল। মৃগয়াকে বিস্বাদ করে দিয়ে গেল হরিণটা।

বিবর্ণ দিন কাটতে লাগল জওহরলালের। নিঃসঙ্গ দিন। গোখেল প্রতিষ্ঠা করলেন সার্ভ্যাণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি। একবার মনে হয় ঢুকে পড়েন সোসাইটিতে। কিন্তু তা হলে হাইকোর্টের প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতে হবে। ইচ্ছে ত্যাগ করলেন জওহরলাল।

শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতরক্ষা আইন তৈরি

হল। পাঞ্জাব থেকে জোর করে মানুষ ধরে সৈন্য বানাতে লাগল সরকার। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী উপদেশামৃত বিলোতে থাকলেন। জওহরলালের হাই উঠতে থাকল হাইকোর্টের হাইব্রাওদের মধ্যে নিষ্কর্ম নিরুদ্দেশ জীবন-যাপনে।

তারপর লোকমান্যের কারামুক্তি হল। অ্যানি বেসান্ট আর লোকমান্য দুজনেই প্রতিষ্ঠা করলেন হোমরুললীগের। জওহরলাল বেসান্টের লীগে কাজ করতে লাগলেন।

ক্রমে ভাটার টান শেষ হয়ে পলিটিক্সের সমুদ্রে আবার জোয়ারের আভাস দেখা দিল। মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস একসঙ্গে কাজ করা স্থির করল। অ্যানি বেসান্ট অন্তরীণ হলেন। বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন দেখা দিল এবারে। গরমপন্থী যে সব নেতা ১৯০৭ সন থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে বসেছিলেন তাঁরা আবার ফিরতে লাগলেন কংগ্রেসে, সক্রিয় হতে আরম্ভ করলেন। হোমরুল আন্দোলন ছড়াতে লাগল শহর থেকে শহরে।

কিন্তু যত রাজনীতি সব কথার মার প্যাঁচ। বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রস্তাব, চুক্তি। শুধু শব্দব্রহ্মের উপাসনা। কর্মহুতাশনের যজ্ঞবেদীতে চোখ পড়ে না কারও। সেই বাংলাদেশের তিরস্কৃত সংশপ্তকী দল ছাড়া সর্বত্র শুধু বাগাড়ম্বর।

জওহরলাল বলে ফেলেন এই কথা। মতিলালকেই বলেন। মতিলাল নেহরু তখন দস্তুরমত সাকসেসফুল লীডার; শ্রীনিবাস শাস্ত্রী চুপ করে যাবার পর থেকে মডারেটদের নেতা বলতে গেলে মতিলাল নেহরু; আবার গরমপন্থী দলও মতিলালকে মানেন, শ্রদ্ধা করেন। এদিকে মুসলিম লীগের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে মতিলাল তো সবচেয়ে অগ্রণী। মুসলিম লীগ বলতে তখন শুধুই ইউ. পি., না শুধুই আলিগড়। আলিগড়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন মতিলাল নেহরু, আনন্দ-ভবনে বসে সে-চুক্তির খসড়া তৈরি হয়েছে এ. আই. সি. সি.র ঘরোয়া অধিবেশনে, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে পাস হয়েছে সে-খসড়া। পাকিস্তানের বীজ এই প্রথম বপন হয়েছে, আনন্দভবনের উর্বরক্ষেত্রে। এমন সময় জওহরলালের মুখে এ কী কথা? কাজ চায় সে, অ্যাক্‌শন!

অ্যাক্‌শন মানেই তো টেররিজ্‌ম্, বোমা-বন্দুক-ডাকাতি। এলাহাবাদের মতিলালের পুত্র জওহরলাল কি তবে উন্মাদ বাঙালীদের মত টেররিস্ট হতে চায় নাকি!

হয়তো হতে চাইতেন জওহরলাল। যদি রূপোর চামচে মুখে নিয়ে না জন্মাতেন। বা তা সত্ত্বেও হয়তো চাইতেন। নিষ্কর্মা কথামালায় দিন না কাটিয়ে হয়তো আবার শিকারের আহ্বান শুনতে পেতেন তাঁর তরুণ রক্তের উষ্ণ স্রোতে। যদি না তখন একটি শীর্ণকায় খর্ব মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতের মাটিতে এসে দাঁড়াতেন; নিঃশব্দে, সকলের অলক্ষ্যে, নেহাত একটি মামুলী তাৎপর্যহীন ঘটনা হয়ে।

১৯১৬ সনে জওহরলালের জীবনে দুটি ঘটনা ঘটল। দুটিই তাঁর কাছে নেহাত মামুলী ঘটনা ছিল। দিনক্ষণ লিখে রাখতে হবে এমন কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় নি জওহরলালের। কালবৈশাখীর প্রথম বিদ্যুচ্চমকের মত অন্যমনস্কতায় লক্ষ্য না করা দুটি ঘটনা।

প্রথম ঘটনা, জওহরলালের বিয়ে।

দ্বিতীয়, গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

কমলা এবং মোহনদাস, দুটি ইনোসেন্ট হরিণ জওহরলালকে আর মৃগয়ায় যেতে দিলেন না কোনদিন।

॥ চার ॥

প্রায় সাতাশ বছর পূর্ণ হবার সময় ১৯১৬ সনের বসন্ত-পঞ্চমী তিথিতে জওহরলাল ও কমলার বিয়ে হল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে অভিহিত করেছিলেন ঋতুরাজ বলে; বলেছিলেন, তরুণের সিংহাসনে তাঁর অবিসম্বাদী অধিকার, কেন না জওহরলাল অপরাজেয় যৌবনের প্রতীক।

জওহরলাল যদি ঋতুরাজ, কমলা তবে হৈমন্তী। চিরবসন্তের দেশ ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পাণ্ডুর গোধূলি ছিল কমলার চোখের চাওয়ায়। তনুলতায় ছিল তুষারমাখা চিনার শাখার স্মৃতি। 'যাই গো ঝরে যাই'—এই করুণ সুর ছেয়ে ছিল তাঁর কমনীয় রূপের করুণ অপরূপে। কাশ্মীরে নয়, কমলার উপমা আমাদের বাংলার শিউলি-ফুলে, একটি রঙীন বোঁটায় যে-ফুল শুভ্রতার অঞ্জলি

ভরিয়ে তোলে অন্ধকারের অজানিতে—সকাল হবার আগে ঘরে যাবার অভিমান লুকিয়ে রাখে মৃদু সুবাসে।

হৈমন্তী আর ঋতুরাজের মিলন হল শ্রীপঞ্চমীর শিশির-ছেঁচা সন্ধ্যায়। শিউলির গোপন বৃন্তরসে রঙীন হল বসন্তের খ্যাপা উত্তরীয়। তারপর সে গেল কাননে-কাননে, বনে-বনে ছুটে বেড়াল সে।

কাশ্মীরে বেড়াতে গেলেন জওহরলাল।

কাশ্মীরের দ্রাক্ষারস মিশে আছে জওহরলালের পুরুষানুক্রমিক রক্তধারায়। কাশ্মীরের ডাক জওহরলালকে আকুল করে। প্রথম যৌবনে প্রথম ভালুক শিকার করেছিলেন কাশ্মীরের অরণ্যে, প্রৌঢ়ত্বের মধ্যপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে যেদিন দুই পুরুষের রাজনৈতিক ভুলের জবাবদিহি করতে হয়েছিল—সেও ওই কাশ্মীরের আর্তনাদে চমকিত হয়ে। কাশ্মীর ছাড়া আর যে কোন জায়গায় যদি দাঁত বেঁধাত পাকিস্তানের ভালুক তবে আজও হয়তো জওহরলাল ঠিক চিনতে পারতেন না কোন্ বিষবৃক্ষে বীজ বপন করেছিলেন তাঁরা মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত করে।

বিয়ের পরেই প্রথম গ্রীষ্মে কাশ্মীরের ডাক শুনতে পেলেন জওহরলাল। অজানার আমন্ত্রণ, যৌবনের দুর্জয় ক্ষমতার মুখোমুখি দুর্গমের, দুর্জ্ঞেয়ের চ্যালেঞ্জ। জোজি-লা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে এগোতে লাগলেন জওহরলাল। ক্ষুরধার বাতাসের কশাঘাতকে উপেক্ষা করে বন্ধুর গিরিপথ ধরে নির্জনতার তুষারশুভ্র রাজ্যে প্রবেশ করলেন। চরৈবেতি, চরৈবেতি। আরও আরও, আরও উঁচুতে, আরও আরও আরও সামনে। হিমবাহের পর হিমবাহ পার হলেন, হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে এগোতে থাকলেন উত্তরের দেবতাত্মার অন্দরমহলে। অমরনাথ না গিয়ে ফিরবেন না, অমরনাথ ছাড়িয়ে যাবেন আরও সামনে যেখানে তপোমৌন মহেশ্বরের মত তুষারমৌলি কৈলাসের পায়ের কাছে দেবকাঙ্ক্ষিত মানস-সরোবর—ঊর্ধ্বগামী রশ্মির প্রণাম দিয়ে সূর্য যেখানে কনকপদ্মের কুঁড়িটি ফোটায় ভোরবেলাতে।

কিন্তু পারলেন না। দুর্গম পথ নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে ফিরিয়ে দিল তাঁকে। পনেরো-ষোল হাজার ফুট উঁচুতে উঠে তবু তাঁকে পায়ে পায়ে ফিরে আসতে হল প্রতীক্ষমানা কাশ্মীর উপত্যকায়, যেখানে তাঁর নবোঢ়া বধূ নিঃশব্দে দিন গুনছিলেন।

জওহরলাল জানতেন না, যে-অজানার আহ্বান তাঁর রক্তকে উত্তাল করেছিল তা জোজি-লা গিরিসঙ্কটের ওপারে নয়—তা প্রতীক্ষা করে ছিল কাশ্মীর উপত্যকায়। কাশ্মীরের মৌনা দুর্জ্ঞেয়তা তাঁরই ঘরে বসে ছিল: পৌরুষের প্রতি যৌবনের প্রতি চ্যালেঞ্জের আহ্বান হয়ে। সেই মানস-সরোবরের কনকপদ্ম জওহরলাল দেখতে পেলেন না।

না, দেখেছিলেন একদিন; সুইজারল্যাণ্ডের স্যানাটোরিয়ামে বসে একদিন হঠাৎ দেখতে পেয়েছিলেন কাশ্মীরের মানসকন্যাকে। তখন সুইজারল্যাণ্ডের কৃপণ সূর্য কনকপদ্ম নিমীলিত করে বিদায় নিচ্ছে। স্তব্ধবাক একাকীত্ব সঙ্গে নিয়ে ভারতে ফিরে আসতে হঠাৎ মাঝ পথে নেমে লণ্ডনে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু, তাঁর প্রকাশোন্মুখ 'অটোবায়োগ্রাফি' গ্রন্থের প্রকাশককে: Add dedication—To Kamala who is no more।

জীবনে যতটুকু না পেয়েছেন, মৃত্যু দিয়ে জওহরলালকে আশ্চর্য প্রভাবে প্রভাবিত করে গিয়েছেন কমলা নেহরু। অভিমানিনী চিত্রাঙ্গদা তাঁর

সে আরও পরের কথা। তার আগে এলেন গান্ধী। মৃদু পদপাতে এসে দাঁড়ালেন জওহরলালের সামনে, নিঃশব্দে সম্মোহিত করলেন জওহরলালকে।

দ্বারকার রাখাল নন, কাথিয়াবাড়ের বণিক। বাণিজ্যে গিয়েছিলেন সমুদ্র পারের দক্ষিণ আফ্রিকায়। কী নিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিলেন? অকপট সত্য। বিনিময়ে কী পেলেন সমুদ্রপারের বন্দরে? ঘৃণা, অপমান, অন্যায় আর অবিচার। বাণিজ্যে মুনাফা হল কী? কী নিয়ে ফিরে এলেন আপন বন্দরে? একটি অস্ত্র।

কী হবে এ অস্ত্র দিয়ে? কী না হবে! দিগ্বিজয় হবে? দিগ্বিজয় তুচ্ছ, এ অস্ত্রে দিগন্ত বিজয় হবে, মনুষ্যত্বের দিগন্ত।

কী নাম অস্ত্রের ? সত্যাগ্রহ।

কার হাতে তুলে দেবেন নৈরস্ত্রের এই মহদস্ত্র, খুঁজতে খুঁজতে গান্ধীজী পেয়ে গেলেন জওহরলালকে। তাঁর তারুণ্যের উচ্ছল যৌবনের মধ্যে শুনতে পেলেন তপঃসিদ্ধির নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

গুরু শিষ্যের প্রথম সাক্ষাৎ হল ১৯১৬-র শেষ দিকে, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে। দক্ষিণ আফ্রিকায় একাকী যে-সংগ্রাম শুরু করেছিলেন মোহনদাস গান্ধী তার গল্প শুনেছেন জওহরলাল। শুনে শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন মাত্র, আকৃষ্ট বোধ করেন নি। কেমন যেন অদ্ভুত, কেমন খাপছাড়া এই লোকটি। রাজনীতির জগতে কেমন বেমানান, কেমন যেন অসমঞ্জস। হ্যান্‌স্ অ্যাণ্ডার-সনের গল্পে রাজহাঁসের বাচ্চা পাতিহাঁসের দলে যেমন খাপ খাচ্ছিল না, ঢ্যাঙা আর রোগা সেই আগ্লি ডাকলিং-এর মত গান্ধী যেন পলিটিক্যাল পাতিহাঁসদের মধ্যে সৃষ্টিছাড়া একটা ব্যতিক্রম।

তা ছাড়া কংগ্রেসে যোগ দেন নি গান্ধী। শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে ছাড়াছাড়া নয়, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গেই বা কোথায় গান্ধীর যোগ ? রাজনীতিতে আসতে চাইলে দল বেছে নিতে হবে তো। কোন্ দলের তুমি ? কোন্ পলিসির ? নরম দলের না গরম দলের ? দরখাস্ত লিখতে ভাল লাগে, না বক্তৃতা করতে ? হোম রুল, না গভর্নরের কাউন্সিল ?

সে সবের কিছুই ঠিক নেই দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত এই লোকটির। ইণ্ডিয়াতে এসেও সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কথা নিয়েই আছে।

জওহরলাল উদীয়মান নেতা, বাঁকিপুর থেকে শুরু করে প্রত্যেকবার কংগ্রেসের ডেলিগেট, তিনি কেন আকৃষ্ট হবেন ওই লোকটির প্রতি ?

এমন সময় চাম্পারণে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি হল। ভারতের রাজনীতিতে প্রথম সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করলেন গান্ধীজী। এবং শুধু অস্ত্রই নয় অভিনব, সেনাবাহিনীও অভূতপূর্ব—গ্রামের নিরক্ষর চাষী।

রাজনীতি বলতে এতদিন যা বুঝে এসেছ সবাই তার সঙ্গে এর মিল কোথায় ? কোথাও মিল নেই।

ডিবেট। এ আবার কেমন রাজনীতি যাতে ইস্তিরি করা পাৎলুন পরে নি কেউ। কেমন রাজনীতি যাতে ডেলিগেট যায় নি-নির্বাচিত হয়ে।

শুধু কি তাই ? এ রাজনীতির উদ্দেশ্য কী, কর্মপন্থাই বা কেমন, কিছুই বোঝা গেল না। শুধু গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে চাষীরা উল্লসিত হয়ে উঠল : মহাত্মা গান্ধী কি জয় !

মহাত্মা! রাজনীতি হল আত্মার বিরুদ্ধে বুদ্ধির লড়াই, তাতে আবার মহাত্মা কেন ?

স্যার্ রাসবিহারী ঘোষ—আইনজীবী মহলের চিরকালের বিস্ময় ডক্টর ঘোষ, লোকমান্য তিলক সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তাই মনে গাঁথা হয়ে আছে তাঁর প্রিয় জুনিয়র জওহরলালের। কে যেন বলেছিল, লোক-মান্য ঋষিতুল্য ব্যক্তি, saint। স্যার্ রাসবিহারী বজ্রগর্জনে উত্তর দিয়েছিলেন, "I hate saints, I want to have nothing to do with them."

জওহরলালও মহাত্মার পায়ে লুটিয়ে পড়বেন না। তিনি রাজনীতির নেতা, মহাত্মা দিয়ে তাঁর কী হবে !

কিন্তু কোন্ রাজনীতির ? বাক্‌সর্বস্ব রাজনীতিতে হাঁপ ধরে গেছে জওহরলালের। এ যেন সেই কেম্ব্রিজের রাজনীতি রাজনীতি খেলা। অ্যাক্‌শন কোথায়, অ্যাকশন ?

চাম্পারণে গান্ধীজী কথার রাজনীতি করেন নি, অ্যাকশন করেছেন। তা রাজনীতি কি না জানি না, কিন্তু ছেলেখেলা নয়। সত্যাগ্রহ কী বস্তু বুঝি না, কিন্তু তাতে বক্তৃতার চাইতে সারবস্তু আছে। আর যাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন এই সত্যাগ্রহের যাদুমন্ত্রে তারা পলিটিক্স জানে কি না সন্দেহের বিষয়, কিন্তু কাজ জানে। তারা মাটি চাষ করে, ফসল ফলায়, ঋণ করে, উপবাসী থাকে। তারা ফাঁকা আওয়াজে ভোলে না, ফাঁকা আওয়াজ করে না।

জওহরলালের চমক লাগল।

তারপর রাওলাট বিল আইন হতে চলেছে। গান্ধীজী ডাক দিলেন সত্যাগ্রহ সভার। জওহরলাল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এ যে তাঁকেই ডাকছেন গান্ধীজী। গান্ধীজী যেন বলছেন :

আয়, আয়, আয়, ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে॥
সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চ নদীর জল,—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্ত-হৃদয় মিলিছে আমায়,
ভারত জুড়িয়া উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল॥
কোথা যাবি, ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর;
প্রভাতে শুনিয়া,—আয়, আয়, আয়,
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়,
নিশীথে শুনিয়া, আয় তোরা আয়,
ভেঙে যায় ঘুমঘোর॥
যত আগে চলি, বেড়ে যায় লোক
ভরে যায় ঘাটবাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাট॥

জওহরলাল কি সাড়া না দিয়ে পারেন এই জাদুকরী আহ্বানে! ঘর ভাঙার ডাক এসেছে তাঁর, ঘর বাঁধা না হতেই। ঘুচে গেছে সুখালসঘোর, ডাক এসেছে কর্ম-যজ্ঞশালার।

আনন্দভবনের আনন্দভাতি নিবিয়ে দিয়ে জওহরলাল যাবে দুঃখদিনের রাজার আমন্ত্রণে। তখন মতিলাল চিঠি লিখলেন গান্ধীকে। এলেন গান্ধী। কি কথা হল গান্ধী আর মতিলালের! কথার শেষে মতিলালের মুখের হাসি ফিরে এল আবার, গান্ধী তাঁর অনুরোধ রেখেছেন।

মতিলালের অনুরোধ রাখলেন গান্ধী। মুখের হাসি ফিরে এল পণ্ডিত মতিলালের; লক্ষ্য করলেন না, গান্ধীর [illegible]

মতিলাল চাইছেন জওহরলাল আনন্দভবন ছেড়ে না যেন যায় দুঃখলাভের কঠিন তপশ্চারণে। গান্ধী বললেন তথাস্তু। মনে মনে বললেন জওহর কেন যাবে যজ্ঞশালায়, যজ্ঞশালাকে আমি নিয়ে আসব আনন্দভবনের সুরম্য প্রাসাদে। পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি না হয়, এই ছিল মতিলালের অভিলাষ; পূর্ণ হল তা—পিতাপুত্রকে এক-সঙ্গে দুঃখের পথে টেনে নিলেন গান্ধী।

সে কথা জওহর জানলেন না। শুনলেন, গান্ধী বারণ করছেন তাঁকে সত্যাগ্রহ সভায় যোগ দিতে। সময় হয় নি এখনও।—

থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন,
এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গনি গনি
অনিমেষ চোখে পূর্ব গগনে
দেখিতে অরুণোদয়॥
এখনো বিহার কল্প-জগতে,
অরণ্য রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী॥

এল সত্যাগ্রহের দিন। হরতাল, গুলি, সামরিক আইন।

পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া উন্মাদ কোলাহল।

এতদিন রক্ত ঝরেছিল ভারতের পূর্ব দিগন্তে। এবার পশ্চিম তার দ্বার খুলে দিল। বীরগণ জননীরে রক্ততিলক ললাটে পরাল পঞ্চ নদীর তীরে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ।

কাজ, কাজ, কাজ। অ্যাকশন। শেষ হয়ে গেছে ফাঁকা কথার ফুলঝুরি দিয়ে আত্মপ্রতারণার মিথ্যা দিন।

পাঞ্জাব থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হলে কংগ্রেস তদন্ত কমিশন বসল। মতিলাল এবং দেশবন্ধু

-দুই বৃহৎ আইনজ্ঞ তদন্তের ভার নিলেন। গান্ধী যোগ দিলেন তদন্তকমিশনের কাজে, আর এলেন জওহরলাল।

তদন্তকমিশনে গান্ধী যা কিছু প্রস্তাব করেন সেগুলো সবই অভিনব। প্রথমে উড়িয়ে দিতে চান মতিলাল আর দেশবন্ধু। তারপর তর্ক করেন। শেষে কখন তাঁরা গান্ধীর মতে সায় দিয়ে বসেন বুঝতে পারেন না নিজেরাই। তারও চাইতে আশ্চর্য, পরে দেখা যায় গান্ধীর কথাই ঠিক ছিল।

জাদু জানে নাকি কাথিয়াবাড়ের এই শীর্ণকায় বেনিয়া? জওহরলাল ভাবেন।

জাদুই জানে বটে। আর সে-জাদু আমরা সবাই জানি, প্রয়োগ করি না বলে আশ্চর্য লাগে গান্ধীর কাজ দেখে।

সে জাদুর নাম সত্য।

খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছে। গান্ধীজী যোগ দিয়েছেন তাতে।

আন্দোলনের পক্ষ থেকে বড়লাটের কাছে প্রতিনিধি যাবে, গান্ধীজিকে ডাকা হল তাতে, এলেন গান্ধীজী, দিল্লীতে এসে দেখেন প্রতিনিধিদলের খসড়া আবেদন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বড়লাটকে; সে-আবেদনে শব্দের ঘটা যত অর্থের শিলাবৃষ্টি নেই তত; অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন তার ভাষা, অজস্র দাবির উল্লেখে কণ্টকিত কিন্তু সে-দাবির পেছনে প্রতিজ্ঞার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর অনুপস্থিত।

গান্ধী বললেন, খসড়া পালটাতে হবে। প্রয়োজন নেই বাগাড়ম্বরের, প্রয়োজন নেই সহস্র দাবি দিয়ে আশাচ্ছন্ন করার। ন্যূনতম দাবি জানাব দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট ভাষায়—সেই সঙ্গে বলে দেব, এর মধ্যে লুকোচুরি বা দর-কষাকষির স্থান নেই। এই কটি আমাদের ন্যূনতম দাবি, এ থেকে আমাদের পশ্চাদপসরণ নেই।

রাজনীতিতে এমন কথা কে শুনেছে? পলিটিক্সের স্টকমার্কেটে একদরে জিনিস বিকোয় কখনও? রাজনীতি প্রবঞ্চকের বিরুদ্ধে দাবাবোড়ে খেলা; একসঙ্গে দশটা চাল ভেবে বোড়ে টিপতে হবে, এ বোড়েটা তুমি মেরে নাও তবে ও বোড়েটা তোমাকে কিস্তি দেবে। চাইতে হবে পঞ্চাশ তবে যদি পাও পাঁচ। তুমি বলছ পাঁচ পেলে যদি আমার পুষিয়ে যায় তবে পাঁচই চাইব? আরে মূর্খ, পাঁচ চাইলে তো একও দেবে না।

গান্ধী বলেন, না। আমরা প্রবঞ্চকের বিরুদ্ধে নই, আমরা বঞ্চনার বিরুদ্ধে। বঞ্চনা দিয়ে বঞ্চনাকে রুখতে পারে কে? তাকে রুখতে হবে সাধুতা দিয়ে, সত্য দিয়ে। অক্রোধ দিয়ে ক্রোধীকে জিনে, অসাধুকে জিনে সাধুতা। যা আমার চাই, তার বেশী চাইব না; কিন্তু তার কম এক চুল হলে পিছবো না আমরা। আমরা সঙ্কল্পে অটল হব; আর অটল হব বলেই সঙ্কল্প করব দিবালোকের মত স্পষ্টতায়।

জওহরলালের চোখের সামনে নতুন এক মহারাজ্য খুলে ধরছেন গান্ধী। নতুন এক জ্ঞানরাজ্য, কেম্ব্রিজে যার ঠিকানা শোনেন নি জওহরলাল। যদিও জওহরলাল জানতেন না যে গান্ধী তাঁর হাত ধরে যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন সে এক জ্ঞানরাজ্য। জানলে যেতেন না, কখনও যেতেন না, স্বীকার করতেন না তার সার্থকতা।

গান্ধীকে অনুসরণ করেছিলেন জওহরলাল জ্ঞানের তৃষ্ণায় নয়, কর্মের ক্ষুধায়। সত্যাগ্রহ একটি নূতন দর্শন, একটি পরম দর্শন, এ সমাচার যদি গান্ধী একবারও বলতেন জওহরলালকে, তবে গান্ধী ও জওহরলালের পথ হত দুই বিপরীত মেরু-অভিমুখী।

সত্যাগ্রহের দর্শন বিস্ময়কর সারল্যের জন্য দর্শন বলে মনে হয় নি কেম্ব্রিজের ট্রাইপোস পাওয়া জওহরলালের। একটি কর্মপন্থা বলেই মনে হয়েছিল গান্ধীজীর নীতিকে—পলিসি মাত্র, ক্রীড নয়।

॥ পাঁচ ॥

গান্ধী-পলিসির প্রথম বৃহৎ পরীক্ষা এল অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে।

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল কলকাতায়, নন্-কোঅপারেশনের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবে এই বিশেষ অধিবেশন।

লালা লাজপত রায় নন্-কোঅপারেশনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। পুরনো নেতাদের অনেকেই লালাজীর

দিকে। দেশবন্ধুও সমর্থন করলেন না নন্‌কোঅপারেশনের কর্মপন্থা। তাঁর আইনজ্ঞ দৃষ্টি পড়েছে আইন সভার দিকে; আইন সভার ভেতর থেকে সংগ্রাম চালানোর যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে ১৯১৯ সনের ভারত শাসন আইনে তাকে হেলায় হারাতে চান না দেশবন্ধু। বাইরে লড়ব গণ-আন্দোলন দিয়ে, ভেতরে লড়ব শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে—এই সাঁড়াশি আক্রমণের পক্ষপাতী দেশবন্ধু। অসহযোগের অন্য সব কিছু সমর্থনীয়, কিন্তু আইনসভা বয়কট করা রাজনীতি নয়। মতিলালের মতও তাই। উপরন্তু নন্‌-কোঅপারেশন করতে হলে তাঁকে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়; রাজার হালে থাকার অভ্যাস হয়ে গেছে দীর্ঘকাল ধরে, উপার্জন বন্ধ হয়ে গেলে কী করে চালাবেন মতিলাল?

কিন্তু ততদিনে কংগ্রেসের খোল নলচে পালটে গেছে গান্ধীর ভোজবাজিতে। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ কংগ্রেসে এসে ভিড় করছে, তাদের সামনে জীবনের নতুন অর্থ খুলে দিয়েছেন গান্ধীজী। কংগ্রেসে আর ইংরেজী বক্তৃতার জায়গা নেই, আপন মাতৃভাষায় হৃদয়ের কপাট খুলে দিচ্ছে সবাই। ইস্ত্রি-করা কোট প্যান্ট টাই খাপছাড়া হয়ে পড়েছে কংগ্রেসে, খদ্দরের যুগ এসেছে সর্বগ্রাসী বন্যার মত!

জয় হল গান্ধীর।

নন্‌-কোঅপারেশনের যুদ্ধ বিঘোষিত হল। আইন সভাপন্থীরা স্বরাজ্য দল গড়লেন। ওপরতলার নেতৃত্ব থেকে কয়েকটি বৃহৎ নাম খসে গেল কংগ্রেসের। তার বদলে লক্ষ লক্ষ নামহীন মানুষের দুর্বার স্রোত এসে যোগ দিল অসহযোগের অহিংস সৈন্যদলে।

এই সময় যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌। কংগ্রেসের গান্ধীযুগ শুরু হতে জিন্না যে কংগ্রেস ছেড়ে দেবেন এর মত স্বাভাবিক ঘটনা আর কিছু নেই। কেন না রাজনীতির দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারার প্রতীক হলেন গান্ধী এবং জিন্না। পরবর্তীকালে যখন জিন্না সকল বিষয়ে নিজেকে গান্ধীর সঙ্গে সমীকরণ করেছেন এবং সে সমীকরণ গান্ধী মেনে নিয়েছেন, তখন অনেকে গান্ধীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছেন: জিন্না শুধু মুসলিম লীগের আর গান্ধী সারা ভারতের; গান্ধী হিন্দু-মুসলিম মিলিত জনতার নেতা—জিন্নার সঙ্গে তাঁর সমীকরণ কেন হবে?

সমীকরণ হওয়া উচিত। উচিত কারণ জিন্নাও মুসলিম নেতা নন, গান্ধীও নন হিন্দু নেতা। জিন্না ষোল আনা বস্তুবাদী রাজনীতির পূজারী, গান্ধী ষোল আনা আইডিয়াবাদী রাজনীতির প্রবর্তক। জিন্না দৈবাৎ ভারতে জন্মেছেন বলে ভারতীয় পলিটিক্‌সে নেমেছেন, ভারতের চাইতে ইংলণ্ডে রাজনীতির খেলায় নামলে জিন্নার সাফল্য কিছুমাত্র কম হত না। আর গান্ধী যে দেশেই জন্মান না কেন, রাজনীতিতে নামতে হলে তাঁকে এ দেশেই আসতে হত—অ্যানি বেসান্ট ও দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের মত।

জিন্নাকে তাঁর অনুরাগীরা বলেছে cold blooded logician; গান্ধীর ভক্তরা গান্ধীকে বলেন মহাত্মা। জিন্না যুক্তি এবং তর্ককে দক্ষ শিকারীর হাতে রাইফেলের মত যে কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন, বাঘ মারতে এবং মানুষ মারতে। যুক্তির জালে সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য প্রতিপন্ন করার আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তাঁর। গান্ধী সত্যকে আশ্রয় করে যুক্তি অন্বেষণ করেছেন, যুক্তিকে আশ্রয় করে সত্য অন্বেষণ নয়। গান্ধী করেছেন Experiments with Truth, জিন্না করেছেন Experiments with Lies!

কাজেই গান্ধী এবং জিন্নার পক্ষে একসঙ্গে কংগ্রেসে থাকা অসম্ভব। একটা দেশেই কুলোল না দুজনকার।

জওহরলাল তাঁর পঁচিশ বছর পর্যন্ত শিক্ষায় দীক্ষায় পরিবেশে জিন্নারই মত বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। পশ্চিমের প্রতি গাঢ় আকর্ষণে উভয়ে ছিলেন তুল্যমূল্য। এত প্রভূতপরিমাণে মিল ছিল ১৯২০ সন পর্যন্ত জওহরলাল এবং জিন্নার যে কংগ্রেসের অন্য সব ছোটখাট আগাছা সাফ করে এঁরা দুজনে মিলে রাজনীতিতে নতুন রীতির পত্তন করলে আশ্চর্য হবার ছিল না কিছু। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, জওহরলালকে তাহলে দ্বিতীয় আসন নিতে হত, জিন্নাকে প্রথম আসন ছেড়ে দিয়ে।

কিন্তু তা হয় নি। জিন্না কংগ্রেস ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে

চলে গেলেন, জওহরলাল ঝাঁপিয়ে পড়লেন অসহযোগের কর্মস্রোতে।

কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে জিন্নার চোখে যা অসহ্য পীড়াদায়ক লেগেছিল তা হল জনতা। আর জওহরলালের চোখে যা ব্যথিত স্বপ্ন এনেছিল তাও সেই জনতা। জনতার মধ্যে জিন্না দেখলেন অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত শীর্ণ নগ্ন উলঙ্গ অসভ্যতা। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত এক ভিড় জন্তু। আদিম কালের চরখা আর মোটা খদ্দরের কাপড়কে তারা টোটেম বানিয়েছে; হিন্দুস্থানী বাংলা ওড়িয়া তামিল তেলেগু ভাষায় পলিটিক্সের জটিল তত্ত্ব বুঝতে চাইছে। রিডিকিউল্যাস!

জনতার মধ্যে জওহরলাল দেখলেন ভারতবর্ষকে। এরা হয়তো ভাল, হয়তো ভাল নয়, কিন্তু এই ভারতবর্ষ। ভূগোলের নিষ্প্রাণ মানচিত্র যেন জাদুমন্ত্রে প্রাণ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। জনতার মধ্যে ভারতবর্ষের বিশ্বরূপ দর্শন করলেন জওহরলাল।

মুসৌরী থেকে বহিষ্কৃত জওহরলাল দু সপ্তাহ এলাহাবাদে কাটিয়েছিলেন। মা এবং স্ত্রী রয়েছেন মুসৌরীতে, অসুস্থা। বাবা মোকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বাইরের মফস্বল শহরে। এমন সময় প্রতাপগড়ের একদল কিষাণ এলাহাবাদে এল, তাদের দুর্দশার কথা জানাতে। দুদিনের জন্য দেহাতে গেলেন মতিবাবুকা বেটা। দেখলেন, দেখলেন নয় আবিষ্কার করলেন জওহরলাল, গ্রামমাতৃক ভারতবর্ষকে। প্রতাপগড় নেশা ধরিয়ে দিল জওহরলালকে, সে নেশা আর ছাড়তে পারলেন না। তিনদিন পরে ফিরে এলেন এলাহাবাদে, কিন্তু আর আনন্দভবনে মন বসল না তাঁর। ফিরে গেলেন দেহাতে। মুসৌরীতে ফিরে গেলেন যখন স্ত্রী এবং মায়ের কাছে, মন পড়ে রইল প্রতাপগড়, রায় বেরেলী, আর এমনি সব গ্রামে।

রৌদ্র আর বৃষ্টির মধ্যে গ্রাম থেকে গ্রামে পরিব্রজনে জওহরলালের বুদ্ধিজীবী কেম্ব্রিজ মানসের ওপর ভারতবর্ষীয় স্বর্গের গাঢ় বাদামী ছোপ ধরেছিল। জিন্নার তা ধরে নি। শুধু এইটুকু পার্থক্যের জন্য জওহরলাল গান্ধীর সম্মোহনে আকৃষ্ট হলেন আর জিন্নাহ্ গান্ধীকে উপেক্ষা করলেন।

গান্ধীতে আকৃষ্ট হলেন জওহরলাল কারণ গান্ধী হঠাৎ গ্রাম-ভারতের প্রতীক হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জওহরলালের সামনে।

ঠিক বুঝেছিলেন অথবা ভুল, ভাল হল অথবা মন্দ, অবান্তর সে প্রশ্ন। এ অবশ্যম্ভাবী ছিল। গান্ধীর প্রয়োজন ছিল জওহরলালকে, তাই জওহরলাল মনে করলেন গান্ধীকে তাঁর প্রয়োজন।

সর্বাধিনায়ক গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল।

অস্ত্রে দীক্ষা দিলেন তিনি জওহরলালকে। যোদ্ধা জওহরলাল সৃষ্টি হল এই প্রথম।

জওহরলাল লিখছেন, "Many of us who worked for the Congress programme lived in a kind of intoxication during the year 1921. We were full of excitement and optimism and a buoyant enthusiasm. We sensed the happiness of a person crusading for a cause. We were not troubled with doubts or hesitation; our path seemed to lie clear in front of us and we marched ahead, lifted up by the enthusiasm of others, and helping to push on others."

অবিকল যোদ্ধার অনুভূতি। বুকভরা উত্তেজনা, আশা আর উদ্দীপনা। মুজাহিদের উল্লাস। সন্দেহ ও ইতস্ততঃ থেকে মুক্তি। কুচকাওয়াজে এগিয়ে চলা।

"There was no more whispering, no round-about legal phraseology to avoid getting into trouble with the authorities... What did we care about consequences?"

হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি॥

অ্যাকশন চেয়েছিলেন জওহরলাল। গান্ধী তাঁকে অ্যাকশন দিলেন। যোদ্ধা করে গড়ে তুললেন। কিন্তু হায়, থামলেন না সেইখানে। অস্ত্রশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে দীক্ষা দিতে প্রয়াসী হলেন।

ফলিত রাজনীতিতে রণকৌশল হিসাবে সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা সন্দেহ ছিল না জওহরলালের। কিন্তু অহিংসা ও সত্যাগ্রহের দার্শনিক ভিত্তিভূমি অভ্রান্ততায় আস্থা-স্থাপন জওহরলালের পক্ষে দুরূহ। সেই দুরূহ প্রতিজ্ঞা নিলেন গান্ধীজী।

রাজনীতিতে কেন ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্ম জওহরলালকে কোনদিন আকৃষ্ট করে নি। "Religion as I saw it practised, and accepted even by thinking minds, did not attract me." লিখেছেন জওহরলাল, "Essentially I am interested in this world, in this life: not in some other world or a future life. Whether there is such a thing as a soul or whether there is a survival after death or not, I do not know." পরকাল ও পরলোক সম্বন্ধে নিষ্কৌতূহলী এই বস্তুবাদী এ কথাও স্পষ্ট "Spiritualism seemed to me a rather absurd phenomenon."

এবং সেই 'উদ্ভট ব্যাপার' জওহরলালের মাথায় ঢোকাবেনই গান্ধীজী। সোজাসুজি চেষ্টা করলে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করতেন, কিন্তু গান্ধী সোজা ভাষায় কখনও ধর্মের কথা বলেন না জওহরকে। ধর্ম না বলে নীতি বলেন, জওহরলালের মনে হয়—তাই তো, এ তো নীতির কথা। প্রতি সন্ধ্যায় গান্ধীজীর আশ্রমে গীতা পাঠ হয়, জওহরলাল মন দিয়ে শোনেন। ধর্মের কথা নাকি? না না, এ তো চরিত্রগঠনের কথা। সভায় নিয়ে জওহরলালকে, সেখানে গান্ধীজী বক্তৃতা করেন—বলেন রামরাজ কায়েম করতে হবে। রামরাজ কেন? গান্ধীজী উত্তর দেন না জওহরলালের উষ্ণ প্রতিবাদের। কোন্ জাদুমন্ত্রে জওহরলালের অসন্তোষ আপনা থেকেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়; ভাবেন, কথাটা আলঙ্কারিক অর্থে বলা, জনতার সহজবোধ্য করার জন্য পরিচিত শব্দের অলঙ্কার।

ক্রমে এমন দিন এল যখন ধর্মকে ধর্ম বলেই গেলাতে পারলেন গান্ধীজী। ছোট ছোট ডোজে, ধীরে ধীরে।

কিন্তু কেন? জওহরলালকে তন্ত্রের বড়ি খাওয়ানোর দরকার কী ছিল গান্ধীজীর? শুধু কর্মশিষ্যতে খুশী হলেন না কেন? কেন তাঁকে ধর্মশিষ্য করে তোলবার জন্য কঠিন প্রয়াস?

কারণ জওহরলালকে গান্ধীজী আপন উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন।

মানুষের এই এক আশ্চর্য দুর্বলতা। বিপরীত চরিত্রের মানুষকে গড়ে তুলতে চায় আপন ধাঁচে। দিয়ে যেতে চায় পরিপূরক প্রকৃতির উত্তরাধিকারীর হাতে আপন প্রকৃতির পূর্ণতা আনবার ভার।

রামকৃষ্ণ উত্তরাধিকারের জন্য বিবেকানন্দকে খুঁজে বেড়ান। গান্ধী চান জওহরলালকে। ফলে বিবেকানন্দ যা ছিলেন না এমন আশ্চর্য কিছু হয়ে যান; কিন্তু হায়, নরেন দত্ত যা হতে পারতেন তা আর হয় না কোনদিন।

জওহরলাল যা নন তাই করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন গান্ধী। কিন্তু সম্মোহনী বিদ্যায় রামকৃষ্ণের চাইতে গান্ধী ছোট, তাই পুরোপুরি পারলেন না। অর্ধেক মাত্র সম্পন্ন হল—জওহরলাল যা হতে যাচ্ছিলেন তা হতে দিলেন না গান্ধী; যা করতে চেয়েছিলেন তাও হতে পারলেন না জওহরলাল।

॥ ছয় ॥

সত্যাগ্রহের দুই কর্মপন্থা, অহিংস অসহযোগ ও গণপ্রতিরোধ, যুগপৎ চলেছিল ১৯২২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত। সর্বাধিনায়ক গান্ধীর নির্দেশে চলেছিল নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

কত সহস্র মানুষ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল তার লেখাজোকা নেই। জনগণ যখন সাফল্যের বিস্ময় কাটিয়ে আত্মশক্তিতে উত্তেজিত এবং যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ কর্মসূচী ব্যর্থ হবার পর সরকার যখন ভগ্নোদ্যম, তখন গান্ধীজী গণপ্রতিরোধ প্রত্যাহার করলেন। সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস থামিয়ে দিলেন এক মুহূর্তে। জওহরলাল তখন বন্দী। সেই তাঁর প্রথম কারাদণ্ড।

চৌরিচৌরায় জনতা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল, অহিংসার ধর্মচ্যুত হয়ে জালিয়ে দিয়েছিল পুলিস ফাঁড়ি, পুড়িয়ে মেরেছিল ছ জন পুলিসকে। এই হল গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রকাশ্য কারণ।

এ কারণ সত্য বলে আজ পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করে নি। ঐতিহাসিকরা বহু গবেষণায় বহুতর কারণ আবিষ্কার করেছেন। জওহরলালও গবেষণা এবং প্রকৃত কারণ নির্দেশ করেছেন। এত গবেষণা এবং এত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেই আর একটি সিদ্ধান্তেরও অবকাশ নেই, এ কথা মানা যায় না। অন্ততঃ গবেষণার নিশ্চয় আছে অবকাশ।

অহিংসা ও সত্যাগ্রহকে পলিসি হিসাবে গ্রহণ করেছিল কংগ্রেস, ধর্ম হিসাবে নয়। জওহরলালও—গান্ধীজীর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবসত্ত্বেও—গান্ধীবাদের স্পিরিচুয়াল ভিত্তিতে প্রণাম জানান নি তখনও।

অথচ গান্ধীজী উত্তরাধিকারী চান। এবং জওহরলালকেই চান।

অহিংস সত্যাগ্রহ কী শক্তি ধরে তা জওহরলালকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো প্রয়োজন ছিল। অসহযোগ আন্দোলনে তাই দেখালেন গান্ধীজী: সে শক্তি কি সত্যাগ্রহের, অথবা তা গান্ধীর, নাকি সে শক্তির উৎস ছিল ইতিহাসের অন্য কোন কানাচে—সে প্রশ্ন করে নি কেউ। মেনে নিয়েছে। শত্রুমিত্র সবাই সবিস্ময়ে মেনে নিয়েছে সত্যাগ্রহ ও গান্ধীর অমিত শক্তিকে।

কিন্তু প্রথম জোয়ারের উচ্ছ্বাস কেটে গেলে সে-শক্তির ওজন থাকত কি? বুদ্ধিমান গান্ধী সন্দিহান ছিলেন। কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছে দিত অসহযোগ ভারতকে? স্বরাজ আনতে পারত? গান্ধী জানতেন, স্বরাজ আনতে পারত না ১৯২১-২২-এর সত্যাগ্রহ। গান্ধীজী না থামালে আন্দোলন আপনি থামত। তারপর?

থেমে যাওয়া সেই আন্দোলন সত্যাগ্রহের মৃতদেহ হয়ে পড়ে থাকত সরকারী মর্গের অবজ্ঞায়। আর একবারও সত্যাগ্রহের অস্ত্র হাতে তুলতে চাইত না কেউ। মোহনদাস গান্ধী বিস্মৃত হয়ে যেতেন এতদিনে।

গান্ধী বিস্মৃত হতে চান না। তিনি শতায়ু হতে চান, সপাদশতবর্ষ বাঁচতে চান। এবং তারপরও উত্তরাধিকারী চান; জওহরলালকেই চান তিনি।

জওহর সত্যাগ্রহের দার্শনিক তত্ত্ব মানতে চান না। না মানলে কী করে তাঁকে আপন উত্তরাধিকার দিয়ে যাবেন গান্ধীজী? তাই চৌরিচৌরাকে ছুতো করলেন গান্ধী, অহিংসার তাত্ত্বিক প্রয়োগ করলেন উন্মাদনায় জাগ্রত ভারতের অসতর্ক পৃষ্ঠদেশে অহিংসার ছুরিকাঘাতে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে উদ্যত হলেন: সত্যাগ্রহ কী।

সত্যাগ্রহের বিচার নয় তার আপাতসাফল্যে, তার বিচার তাত্ত্বিক পবিত্রতায়। জওহরলাল, ভারত কা জওহর, মেরা লাল, জনসমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তুমি উল্লসিত হয়েছ; তুমি দাম্ভিক, সহস্রকণ্ঠে তোমার জয়ধ্বনি শুনে তোমার নীল ego সুনীল হয়েছে আর ভেবেছ সত্যাগ্রহ শুধু একটা উপায় মাত্র, একটা অস্ত্রই শুধু; ভেবেছ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলে এ উপায়কে এ অস্ত্রকে তুমি রেখে দেবে অতীতের প্রদর্শশালায়; কিন্তু তা নয় জওহরলাল; সত্যাগ্রহ হীন অস্ত্র মাত্র নয়, নয় তুচ্ছ উপায় কেবল, সত্যাগ্রহ একটা নূতন দর্শন; সত্যাগ্রহই সত্যাগ্রহের শেষ; তোমাকে দেব আমি এই নূতন দর্শন, নূতন গীতা, তুমি প্রস্তুত হও।

গান্ধী বললেন: হিমালয়ান ব্লাণ্ডার। কার ব্লাণ্ডার? গান্ধীর নৈব নৈব চ। তোমাদের ব্লাণ্ডার, তোমার ব্লাণ্ডার জওহরলাল। স্বরাজ তুচ্ছ—যদি তার সঙ্গে সত্যের বিরোধ হয়। সত্যাগ্রহীকে যদি সত্যলাভ করতে হয় চৌরিচৌরার ধর্মচ্যুতিকে স্বীকার করে, তবে সে সত্য ভেজাল সত্য। তার অপর নাম মিথ্যা।

জওহরলাল তবু বুঝলেন না। বুঝলেন না অথবা মানলেন না সত্যাগ্রহের নূতন দর্শন। হয়তো বুঝতেন, সেই উদ্দেশ্যেই চলেছিলেন গান্ধীর সকাশে—মুক্তি পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

গিয়ে দেখেন আগের দিন গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করেছে সরকার। যে সরকার এতদিন ভয়ে ছিল শামুক হয়ে, গান্ধীকে গ্রেপ্তার করলে পুলিস এবং মিলিটারীতে বিদ্রোহের আশঙ্কা করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল, সেই সরকারের মনোবল এতদিনে ফিরে এসেছে।

চৌরিচৌরার পাপে অনুতপ্ত গান্ধী তাঁর জনপ্রিয়তার কবচকুণ্ডল যখনই বর্জন করেছেন তখনই আশ্বস্ত সরকার বন্দী করেছেন গান্ধীকে।

॥ সাত ॥

গান্ধী যদি গ্রেপ্তার না হতেন তবে সেই সাক্ষাৎকারে আমাদের পরিচিত জওহরলাল বদলে গিয়ে অন্য কেউ হয়ে গেলে আশ্চর্য ছিল না। সেই জওহরলাল কর্মযোগী থাকতেন না আর, বস্তুবাদী দর্শন ভারতসাগরে বিসর্জন দিয়ে আইডিয়াবাদী দুর্বল এক জওহরলাল জন্ম নিত। হয়তো সে হত দ্বিতীয় এক মোহনদাস করমচাঁদ অথবা হয়তো হত অদ্বিতীয় বিনোবা ভাবে।

কিন্তু গান্ধীকে দেখতে পেলেন না জওহরলাল।

ফলে তিনি গান্ধীকে বাদ দিয়ে গান্ধীবাদ বুঝতে চাইলেন। একা একা গান্ধীদর্শন বিশ্লেষণ করতে চাইলেন জওহরলাল। এবং করলেন।

বস্তুত: গান্ধী দর্শনের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করতে তিনিই মাত্র সক্ষম, যিনি গান্ধীজীকে ব্যক্তি হিসাবে দেখেন নি কখনও। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে যেমন নাকি শান্তিনিকেতনের ছায়া থেকে শতহস্ত দূরে থাকা প্রয়োজন ছিল।

বৃহৎ ব্যক্তিত্ব সূর্যের মত, গ্রহণের সময় ছাড়া তার জ্যোতির্লোকের চরিত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা অসম্ভব।

জওহরলাল সেই পরীক্ষায় রত হলেন।

আর তখনই, বুঝি সেই পরীক্ষার অবসর সৃষ্টি করতে সরকার বাহাদুর তাঁকে দ্বিতীয়বার বন্দী করলেন, প্রথম কারামুক্তির ঠিক ছ সপ্তাহ পরে।

পৌনে দু বছর কারাদণ্ড হল জওহরলালের।

লক্ষ্ণৌ ডিস্ট্রিক্ট জেলে এই নাতিদীর্ঘ কারাবাসের দিনগুলি জওহরলাল আত্মদর্শনে কাটাতে পেরেছিলেন।

প্রথম কিছুদিন তাঁকে সকলের সঙ্গে একত্র ব্যারাকে রাখা হয়েছিল। কী জানি কেন, এই বাধ্যতামূলক যৌথজীবনে হাঁফ ধরে গেল জওহরলালের। দিনের পর দিন এক পরিচিত মুখ, এক মুখস্থ হয়ে যাওয়া রাজনীতির কথা, সহস্রবার পুনরুক্ত রসিকতা—যেন এঁটো টুথব্রাশের মত বিবমিষায় ভরিয়ে তুলেছিল জওহরলালকে।

একাকীত্বের জন্য প্রাণ তাঁর কাঁদছিল।

হায়, এই মানুষকে গান্ধী তাঁর আদর্শ সত্যাগ্রহী করতে চান! এ তো হয় কবি অথবা দার্শনিক, এ কী করে ওয়ারিয়র হবে? কী করে ওয়ারিশান নেবে গান্ধী-পন্থার? জনতার চরিত্রগত স্থূলতা এঁকে পীড়া দেয়, আত্মগত স্থিতধী পুরুষের গজদন্তমিনার খুঁজে বেড়ায় এই মানুষ, এঁকে কেন জনতার রাজনীতির ঘানিগাছে জোর করে বাঁধা?

কারাকক্ষের মধ্যে অখণ্ড অবসর পেলেন জওহরলাল। চিন্তার অবসর। আর সেই অবসরে এক দার্শনিক জন্ম নিল তাঁর মধ্যে। সে এক সন্ধানের দার্শনিক।

জন্মাবধি মেটিরিয়ালিজমের উর্বর ক্ষেত্র যাঁর ক্রীড়াঙ্গন, গান্ধী তাঁকে শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে দু দিনে টেনে নিয়েছিলেন আইডিয়ালিজ্‌মে, স্পিরিচুয়ালিজ্‌মে, রিলিজনে—এমন কি টোটেম-কণ্টকিত এক এক্সক্লুসিভ মিস্টিক-সভায়। বারবার তাঁর বুদ্ধি তাঁকে ভর্ৎসনা করেছে, বিবেক তাঁকে সাবধান করেছে, যুক্তি শুনিয়েছে উপদেশ।

"The sudden suspension of our movement after the Chauri Chaura incident was resented, I think, by all the prominent Congress leaders—other than Gandhiji of course....Our mounting hopes tumbled to the ground...Were a remote village and a mob of excited peasants in an off-the-way place going to put an end...to our national struggle for freedom? If this was the inevitable consequence of a sporadic act of violence, then ***surely there was something lacking in the philosophy and the technique of a non-violent struggle.***"

প্রবন্ধকারের পূর্বোক্ত মন্তব্যের পুনরুক্তি করা যেতে পারে: চৌরিচৌরার দুর্ঘটনা সত্ত্বেও যদি জওহরলাল অহিংস সত্যাগ্রহের দর্শন ও কৌশল সম্বন্ধে এই অভিমত

পোষণ করলেন তবে বিনা-চৌরিচৌরায়, কুত্রাপি অহিংসার নীতিচ্যুতি না ঘটলেও, যখন সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হত তখন জওহরলাল কী মন্তব্য করতেন? তারপরও অহিংসার মন্ত্র গান্ধীর মুখে শুনলে জওহরলালের নিষ্ঠুর জিহ্বা কোন্ কর্কশ মন্তব্য গান্ধীকে উপহার দিত সে কথা কে জানে। চৌরিচৌরার নীতিচ্যুতি সেইজন্য প্রয়োজন ছিল। এ না হলে গান্ধীজী নিরুপায় হয়ে পড়তেন।

কিন্তু something lacking in the philosophy of non-violent struggle সত্ত্বেও জওহরলাল কি সমূলে বর্জন করতে পারলেন সেই ফিলসফি? না। গান্ধীজীর জাদুকরী ব্যক্তিত্ব জওহরলালকে ভূতের মত ভর করেছে যে!

"Gandhiji had pleaded for the adoption of the way of non-violence, of peaceful non-co-operation, ***with all the eloquence and persuasive power which he so abundantly possessed***. His language had been simple and unadorned, his voice and appearance cool and clear and devoid of all emotion, but behind that outward covering of ice there was the heat of a blazing fire and concentrated passion, and the words he uttered winged their way to the innermost recesses of our minds and hearts, and created a strange ferment there."

তাই বুদ্ধি হল বন্ধ্যা, বিবেক হল ত্যক্ত, যুক্তি হল প্রত্যাখ্যাতা—আবেগের তরণী জওহরলালকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল দিগ্‌দর্শনহীন গান্ধীবাদের অকূল সমুদ্রে। হায়!

তবু বারংবার জড়বাদী দর্শনের দাঁড় বেয়েছেন জওহরলাল, পাল তাঁকে যেদিকে নিয়ে চলেছে তার বিপরীতমুখ হাল ধরবার প্রাণান্ত প্রয়াসে ক্লান্ত, ক্রুদ্ধ, বিক্ষত হয়েছেন জওহরলাল; আত্মসমর্পণ করেন নি আবেগের পায়ে।

আবেগ ও বুদ্ধি মিলিয়ে কী তবে হয়েছে জওহরলালের সঙ্করদর্শন?

ব্যর্থ হয়েছে।

যোদ্ধার ভূমিকা বর্জন করেছেন জওহরলাল, এ কথা বললে ভুল হবে। বহু সংগ্রামে নায়ক হয়েছেন তিনি, অস্ত্রাঘাতচিহ্ন গৌরবে বহন করেছেন বুকে। পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাতের কলঙ্কে কলঙ্কিত নন তিনি।

তবু সে-সকল সংগ্রাম সত্ত্বেও ব্যর্থ যোদ্ধা জওহরলাল, কারণ দর্শন নিয়ে যদি বা যুদ্ধ চলে—ভাববাদী নিয়েও, জড়বাদী নিয়েও—দুই বিপরীত দর্শনের সঙ্কর নিয়ে যুদ্ধযাত্রা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অন্তরে দ্বিধা নিয়ে আর সব করা যায়, ওয়ারিয়র হওয়া যায় না।

১৯২৩-এর ৩১শে জানুয়ারি মুক্তি পেলেন জওহরলাল। বাইরে তখন কংগ্রেসের অবস্থা শোচনীয়। জোয়ারের উত্তেজনা শেষ হয়ে গেছে, প্রত্যাহৃতসংগ্রাম ভাটার দিনে কদর্য আর পঙ্কিল আবর্জনা পড়ে আছে একদা-পুণ্যস্রোত-প্রবাহিণীর অভিশপ্ত খাতে। উপদল আর চক্রান্ত এসে স্থান নিয়েছে প্রতিজ্ঞা আর আদর্শের।

দেশবন্ধু ও মতিলাল মিলে গড়েছেন স্বরাজ্য পার্টি, যার ডাক নাম প্রো-চেঞ্জার; নির্বাচনে অংশ নিয়ে এঁরা কাউন্সিল অধিকার করতে চান। তারপর সিনফিন দলের মত বয়কট করতে চান মেকী শাসনতন্ত্রের ভুয়া আইন-পরিষদ। এঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন গান্ধীজীর বৈবাহিক চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী, তাঁর উপদলের ডাকনাম নো-চেঞ্জার; অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পরও যাঁরা পুরাতন অসহযোগের কৌশল পরিবর্তনে নারাজী। এই স্বরাজী আর নারাজীর হাতে কংগ্রেসের বাসুকি দিয়ে চলেছিল পলিটিক্সের সমুদ্রমন্থন—ঝলকে ঝলকে হলাহল উঠেছিল তাতে।

জওহরলাল তখন এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং ইউ. পি. কংগ্রেসের সেক্রেটারি।

কংগ্রেসে তখন স্বরাজী আর নারাজী প্রায় সমান শক্তিধর। দেশবন্ধু ছিলেন প্রেসিডেন্ট—পরবর্তীকালে যে-পদের নাম হল রাষ্ট্রপতি। বোম্বাইতে অখিলভারত

কংগ্রেস কমিটির সভায় নারাজীর দল দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে এমন একজোট হল যে দেশবন্ধু পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অথচ নারাজীর দল থেকে সভাপতি হলে আবার স্বরাজীর দল তাঁকেও পদত্যাগ করিয়ে ছাড়বে। এই অবস্থায় হল কংগ্রেসে প্রথম সংখ্যালঘুর শাসন (এই সেদিন কেরলে যেভাবে প্রজাসমাজতন্ত্রীর মন্ত্রীসভা হয়েছিল)—যে-সংখ্যালঘুরা না-স্বরাজী না-নারাজী। অর্থাৎ মধ্যপন্থী। কখনও স্বরাজী আর কখনও নারাজীর সমর্থন নিয়ে টিকে থাকছিল মধ্যপন্থীরা। ডাঃ আনসারী হলেন সভাপতি আর সম্পাদক হলেন জওহরলাল। সমন্বয়দর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফলিত প্রকাশ এই মধ্যপন্থী রাজনীতি।

দ্বিধাবিক্ষত জওহরলালের পেছনে এতদিন নিঃশব্দ অগোচরে মূর্তিমতী যে জীবনলক্ষ্মী বিরাজ করছিলেন ১৯২৩ সনে প্রথম বুঝি তিনি দেখতে পেলেন তাঁকে। কমলাকে। মনে পড়ল সাত বছর ধরে 'কান্তিহীন যে বাহু দুটি শ্রান্তি দুখ ভুলিয়া গিয়েছে সেবা করি' তাকে বিনিময়ে কী দিয়েছেন জওহরলাল। কী দিয়েছেন জওহরলাল? দুঃখ উপেক্ষা, খামখেয়ালি দম্ভের অকারণ আঘাত, আর অনিঃশেষ বিরহ। যখন কারাগারে ছিলেন জওহরলাল তখন তবু তো কমলার অন্তরে জওহরলালের উপস্থিতি হতে পেরেছিল বাধাহীন; কারার বাইরে এলেই বন্ধ্যা রাজনীতি কলাবতী চন্দ্রাবলীর মত কেড়ে নেয় জওহরলালকে—শুধু সান্নিধ্য থেকে নয়, কমলার কল্পনা থেকেও যেন। জওহর নিজেই ভেঙে দেন কমলার অধৈর্যহীন সহিষ্ণু কল্পনা।

হঠাৎ কেন যে চোখ পড়ল মন পড়ল কমলার ওপর? সংবেদনশীল জওহরলালের অন্তর হঠাৎ মুচড়ে উঠল অব্যক্ত কোন্ বেদনায়। ব্যথাতুরা কাশ্মীরের আত্মা যেন কমলা; উপেক্ষিতা কিন্তু নিরভিমানিনী। "I realised with some shame at my own unworthiness in this respect, how much I owed to my wife for her splendid behaviour since 1920. Proud and sensitive as she was, she had not only put up with my vagaries but brought me comfort and solace when I needed them most."

হঠাৎ জওহরলাল, আনন্দভবনের পণ্ডিত মতিলালের একমাত্র পুত্র জওহরলাল, আবিষ্কার করলেন—তিনি বেকার, নিঃসম্বল, পরমুখাপেক্ষী। কমলার দর্পণে নিজেকে দেখে দাম্ভিক জওহরলাল বড় অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলেন যেন।

বৃথাই ব্যথিত দ্বন্দ্বে উপায় হাতড়ালেন জওহরলাল। মীমাংসা করতে চাইলেন। রাজনীতি এবং মনুষ্যনীতির মধ্যে সাযুজ্য খুঁজলেন। রাজনীতি-চন্দ্রাবলী যদি মুক্তি দিত তবে বুঝি কমলাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারতেন জওহরলাল। যে জওহরলালকে আমরা চিনি সে-জওহরলাল নয়—একটি সংবেদনশীল কবি।

ক্ষমতার মদ প্রথম আস্বাদ করেছেন তখন; ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা-মিনারে প্রথম তিন ধাপ উঠেছেন তারপর এক ধাপ নেমেছেন। ইউ. পি. কংগ্রেসের সেক্রেটারী প্রথম, এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান দ্বিতীয়, এ. আই. সি. সি.র সেক্রেটারি তৃতীয় —এই তিন ধাপ আরোহণ এবং এ. আই. সি. সি.র ধাপ থেকে অবরোহণ (মধ্যপন্থার অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা), এই তিন পেগ মাত্র খেয়েছেন, একবার মাত্র উদ্গিরণ করেছেন। জেদ বাড়ছে, নেশা বাড়ছে জওহরলালের—চন্দ্রাবলীর মোহ জড়িয়ে ধরেছে তাঁর ক্ষুধার্ত যৌবনকে। শীর্ণতনু কমলা কি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে রাজনীতির সঙ্গে? কী আছে তাঁর? শুধু রূপ, শুধু নিষ্ঠা, শুধু একাগ্রতা, শুধু তীব্র তীক্ষ্ণশাণিত অনুভূতি শুধু প্রেম, শুধু সেবা, শুধু আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা, শুধু অনভিমান। তাঁর মধ্যে নেশা নেই, ছলনা নেই, নেই মদির উচ্ছলতা। চন্দ্রাবলী-রাজনীতি জওহরলালকে কটাক্ষে জয় করেছে।

॥ আট ॥

আবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হলেন জওহরলাল।

পাঞ্জাবের নাভা রাজ্যে শিখ-আন্দোলন সমর্থন করতে গিয়ে নাভা-রাজের হাতে বন্দী হলেন।

হাতকড়া পড়ল জওহরলালের হাতে। কটু মদে বুক জ্বলে উঠল তাঁর। আর, সে-জ্বালা প্রশমিত হতে বুঝলেন—এর নেশা আরও বেশী কড়া।

ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আড়াই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন তিনি আর রাজনীতির খেলায় তখনও জওহরলাল যে শিশু এই কথা বুঝিয়ে দেবার জন্য নাভা-কর্তৃপক্ষ এক পৃথক আদেশনামায় দণ্ডাদেশ স্থগিত করলেন। দ্বিতীয় এক আদেশে তাঁকে নাভা থেকে বহিষ্কার করা হল। অর্থাৎ মাথার ওপর আড়াই বছর জেলবাসের হুমকি ঝুলিয়ে রেখে নাভা জওহরলালকে তাড়িয়ে দিল। আর পালিয়ে এলেন জওহরলাল।

যোদ্ধা জওহরলাল দীর্ঘকাল এই ভীরুতার স্মৃতিতে জর্জর হয়েছেন। নাভায় ফিরে না-যাবার সঙ্গত যুক্তি-সঙ্গত কারণের ব্যপদেশ ছিল তাঁর: কিন্তু নিজের কাছে নিজের ফাঁকি চলে না, তাই জানতেন বাস্তব কারণ তাঁর ভীরুতা।

যোদ্ধার পক্ষে যা ভীরুতা, প্রেমিকের পক্ষে তা আদর্শ সেই বা লজ্জা কিসের? সেই মধ্যযৌবনের অলস অপরাহ্ণে এক ফালি কমলা রঙের আলো পড়েছিল জওহরলালের সারা অস্তিত্বে, প্রথম জন্ম নিয়েছিল প্রেমিক। তাই ভীরুতা।

ভারতের রাজনীতি গগনে তখন খিলাফতের ক্ষণিক মিলনোৎসব শেষ হয়ে সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের ঘনঘটা শুরু হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেন জওহরলাল। রাজনীতি তাঁকে হতাশ করে দিচ্ছিল তখন: কলাবতীর পুরাতন ছলা-কলা, ক্ষণে বিকর্ষণ ক্ষণে আকর্ষণের জোয়ার-ভাটায় নিজের মিথ্যা জীবনকে দীর্ঘ সুদীর্ঘ করা খেলা।

ক্লান্ত অবসন্ন জওহরলাল আর একবার পালাতে চাইলেন। নাভা থেকে এলাহাবাদ নয়, পালাতে চাইলেন রাজনীতি থেকে, কোলাহল থেকে, জনতার স্পর্শের পঙ্কিলতা থেকে—গজদন্ত মিনারের উত্তুঙ্গ শিখরে পালাতে চাইলেন জওহরলাল. আপন গভীর চেতনার আরও গভীরে যে রহস্যের অবচেতনা, সেখানে লুকিয়ে থাকতে চাইলেন। ভারত থেকে য়ুরোপে পালাতে চাইলেন তিনি: যে য়ুরোপ একদা ছিল তাঁর দার্শনিক ধ্যানধারণার ভিত্তিভূমি।

কিন্তু কী করে পালাবেন এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির জনপ্রিয় প্রিয়দর্শন চেয়ারম্যান? কী করে পালাবেন চক্রান্তে ছিন্নভিন্ন ষড়যন্ত্রে কুটিল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক? কোন ছুতো নেই, নেই কোন উপায়।

তখন কমলা বুঝি বুঝলেন তাঁর শিশুর মত সরল, শিশুর মত অভিমানী, শিশুর মত সহজে খুশী হওয়া আর সহজে চটে ওঠা স্বামীর বেদনা। কী করে বুঝলেন কী জানি। মনে মনে বললেন, আমি নিয়ে যাব তোমাকে তোমার তীর্থভূমি য়ুরোপে।

> রুদ্ধ কণ্ঠ গীতহারা কিছু কহিয়ো না কথা
>
> কিছু শুধাব না।
>
> নীরবে লইব প্রাণে তোমার অন্তর হতে
>
> অনন্ত বেদনা।
>
> প্রদীপ নিবায়ে দিব
>
> বক্ষে মাথা তুলি নিব
>
> স্নিগ্ধ করে পরশিব সজল কপোল
>
> বেণী মুক্ত কেশজাল
>
> স্পর্শিবে তাপিত ভাল
>
> কোমল বক্ষের তলে মৃদু-মন্দ দোল
>
> নিঃশ্বাস-বীজনে মোর
>
> কাঁপিবে কুন্তল তব মুদিবে নয়ন
>
> অর্ধরাতে শান্ত বায়ে
>
> নিদ্রিত ললাটে দিব একটি চুম্বন।

সেই শেষ চুম্বন, সেই অশেষ চুম্বনের বদান্য ঔদার্যে উদগ্র হয়ে উঠেছিল কমলার বিরহী ওষ্ঠাধর। কমলা বললেন, তুমি য়ুরোপে যাও।

কিন্তু কী করে যাবেন জওহরলাল?

তখন বিজয়লক্ষ্মী আর রঞ্জিত পণ্ডিত মধুচন্দ্রিকা যাপনে য়ুরোপ যাবেন স্থির হয়ে আছে। তাঁদের সঙ্গে গেলেই হয়। কী করে? জওহরলাল কি যাবেন মধুচন্দ্রিমায়? সাঁইত্রিশ বছর বয়সে? বিয়ের দশ বছর পরে? কমলার মধুচন্দ্রিমা কবে শেষ হয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে একাকী শয়নের অনিদ্র অলস কল্পনায় কারারুদ্ধ স্বামীর মঙ্গল কামনা করতে করতে—যখন প্রিয়দর্শন স্বামী তাঁর রাজনীতি-চন্দ্রাবলীর কারা-কুঞ্জে মদোন্মত্ত।

নেবে, তবু কমলাই নেবে জওহরলালকে তাঁর

কৈশোরের স্বপ্নে, যৌবনের উপবনে। মৃত্যুর মন্ত্রে অঘটন ঘটাবে কমলা!

১৯২৫ সনের শরৎকালে কমলা নেহরু ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী হলেন। চিকিৎসকরা বললেন সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে। ১৯২৬-এর মার্চ মাসে জওহরলাল, কমলা আর তাঁদের ছোট্ট মেয়ে ইন্দিরা বোম্বাই থেকে ভিনিস রওনা হলেন।

॥ নয় ॥

য়ুরোপে তখন ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদ কুটিল দংষ্ট্রা বিকাশ করেছে।

অসুস্থ কমলাকে স্বাস্থ্যাবাসে রেখে জওহরলাল য়ুরোপ পর্যটনে বেরোলেন। বরফের ওপর স্কী করে বেড়ালেন জওহরলাল। হায়, জানতেন না সে-বরফ কত পাতলা! আনন্দের তুষারখেলায় তাঁদের আসন্ন গোধূলিকে চিনলেন না জওহরলাল।

চিনলে কি কমলা বেঁচে উঠত নাকি? না, বাঁচত না কমলা। বাঁচত না, তবু বলতে পারত: এই কটি মাস সুধায় দিলে ভরে।

১৯২৭-এর বড়দিনে মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশন আবার মত্ত আমন্ত্রণ পাঠাল জওহরলালকে। ফিরে এলেন জওহরলাল। কমলা রইলেন স্বাস্থ্যাবাসে—মৃত্যুর প্রতীক্ষায় স্মিতমুখী। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর ধূসর গোধূলিতে কমলা বেঁচে ছিলেন আরও সুদীর্ঘ আট বছর। আশ্চর্য জীবনীশক্তি ছিল তাঁর শীর্ণ তনুর রহস্যে। বেঁচেছিলেন, কেন না জওহরলালকে আবার য়ুরোপে নেবার প্রয়োজন ছিল। আরও দ্বন্দ্ব, আরও দ্বিধা, আরও অবসাদ জমেছিল জওহরলালের কবি-দার্শনিক মনে। রাজনীতি-চন্দ্রাবলীর ছলনায় আরও বহুবার "কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে" আসবে প্রিয় তাঁর, সে কথা ... মন করে যেন জানতেন কমলা।

তারপর তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল ক্রমে। এক আইন-অমান্য আন্দোলনের নূতনতর উত্তেজনা। গান্ধীজী দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আবার এলেন তাঁর জাদুদণ্ড নিয়ে, সম্মোহিত করলেন আবার শিশু জওহরলালকে, নতুন ভারত-শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বহাল হবার ব্যবস্থা হল, মহাযোদ্ধা সুভাষচন্দ্র দাঁড়ালেন এক পুরুষকারের প্রবল প্রতিমূর্তি হয়ে, আপসের মুখে থুতু ছিটোলেন তিনি, কত অজস্র চমকপ্রদ ঘটনার মদিরা আকণ্ঠ পান করে জওহরলাল যেদিন যৌবনের প্রত্যন্তে এসে দাঁড়ালেন, তখন কমলা দেখলেন, আর দ্বিধায় জর্জর হয় না জওহরলাল।

শিশু এতদিনে বড় হয়েছে, তাঁর সরল মুখে কুটিল রেখা পড়েছে, চন্দ্রাবলীর প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়েছেন জওহরলাল।

তখন আশ্বস্ত কমলা জওহরলালের বুকে মাথা রেখে শান্তিতে ঘুমোলেন একদিন।

বিদায়-উপহার দিয়ে গেলেন একটি বুভুক্ষু হৃদয়। শেরওয়ানীর বোতামঘরে আঁটা লাল গোলাপের আড়ালে সে-হৃদয়ে একটি বিক্ষত কামনার রক্তস্রোত আজও তৃষ্ণ করে তৃপ্তি খোঁজে ক্ষমতার জ্বালাময়ী মদিরার মধ্যে।

পায় না।

I sometimes think that never blows so red
The rose as where some buried Ceaser bled

কবরে পোঁতা সেই রক্তক্ষরা সীজার, কবরে-পোঁতা তবু জীবন্ত সীজার, জওহরলাল। তাঁর বুকের লাল গোলাপ তাই এত লাল।

[প্রথম পর্ব সমাপ্ত]

এই যুগ

সজনীকান্ত দাস

এ যুগের কথা কহিবে সে কোন্ কবি,
এ যুগের কথা কয়জন বল জানে?
বিদেশী কেতাবী বুকনি প্রয়োগে অতীব 'ক্লেভার' যারা,
তাহারা কহিতে চাহিছে যুগের ভাষা।
কাগজের 'বেডে' ফোটে কাগজের ফুল—
কাগজের ফুলে রঙ শুধু আছে, নাহিক মাটির ভাষা—
রঙ সে নামিয়া আসে না আকাশ হতে,
ড্রইং-রুমের ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত সেই রঙ যে চমৎকার!
যুগমানবের ঠেকিতেছে ঘোর-ঘোর,
যাহা নয় তারা তাহাই সাজিয়া বসিছে রঙের মোহে।

এ যুগের গান গাহিবে সে কোন্ কবি?
যুগ সে নূতন, নূতন মানব, প্রাণ সে চিরন্তন;
ধ্বনিয়া তুলিবে নব-মানবের পুরাতন সেই প্রাণে
লক্ষ যুগের শত অলক্ষ্য সুর,
এ যুগের গান গাহিতে কে বল জানে?
লাঞ্ছিত হয় সুর প্রতিদিন সুরের বিকৃতি মাঝে,
কান্না ফুটিয়া উঠিতেছে তাই অট্টহাসির রোলে,
কান্নার মাঝে শুনি খলখল হাসি।

এ যুগের ভাষা আজো কেহ বলিল না—
অনাদি অসীম ভাষার বারিধি, কল্লোল তার কানে নাহি যায় শোনা।
এ যুগের ভাষা তটে-লেগে-ভাঙা ঢেউয়ের মাথায় ফেন-বুদ্বুদ যেন,
নিমেষে জাগিয়া নিমেষে মিলায়ে যায়;
কাল-বারিধির খরবালুতটে এ যুগভাষার রবে না চিহ্ন কোনো,
এ যুগের কবি আজিও ভাষায় লেখে নি মনের কথা।

যুগগৌরবে গর্বিত যারা, যুগের কবির খ্যাতিলোভ যাহাদের,
তাহারা কহিছে যুগের নকল ভাষা—
শুধু মনগড়া অভিনব ভঙ্গীতে,
ন্যাজের ভঙ্গীতে।

বনের আঁধারে অগভীর ডোবা, সলিলে তাহার নাহি অতলের ভাষা,
পচা পাতা আর পঙ্কবাষ্পে জাগাইছে তারা অবিরাম কোলাহল ;

নগরীর পথে জাগিয়া যেমন আছে চিরদিন হতভাগা উন্মাদ,
উলঙ্গতার উল্লাস ল'য়ে দৃষ্টি সবার করিতেছে অধিকার।
তেমনি যুগের নকল করিয়া সবে
শ্রেষ্ঠ এবং বৃহতে নিত্য করিতেছে উপহাস ;
ফুলেরে বলিছে প্রাচীন মনের ভুল,
হিমালয় হতে বড় বলি মানে ক্ষণিকের কুয়াশায়।
বুক যা বলুক, মুখে বলিতেছে শুধু বিপরীত বুলি,
বিকৃত রুচির বীভৎস চীৎকার!

এ যুগের বাণী নয় নয় তাহাদের।
মিথ্যার মোহে তারা যা জেনেছে যুগের সত্য কভু তাহা নয় নয়।
বিকৃত ক্ষুধার আধুনিক ফাঁদে কভু কাঁদে নাই পুরাতন ভগবান,
মানুষের রূপ কভু শুধু নয় কাম কামনার রূপ।

এ যুগের কথা কবে কে যুগঙ্কর—
যুগের মর্ম কোন্ তপস্বী জানে ?
হুজুগ যে যুগে প্রবল প্রতাপে ধর্মের নামে খেলিছে চরম খেলা,
তুলেছে কি কেউ যুগ-মঞ্চের রহস্য-যবনিকা ?
হৃদয় মেলিয়া দেখেছে কি কেউ পিছনে তাহার চলিছে যে অভিনয়—
আশা-আকাঙ্ক্ষা হাসি ও অশ্রু-আনন্দ-বেদনার !
প্রাচুর্য মাঝে ক্ষুধিত ভোগের বিলাসক্লিষ্ট রূপ,
পীড়িত বাথিত অন্নহীনের অসহায় হাহাকার,
শিশুর কাকলী, জরার মরণশ্বাস,
জীবনমৃত্যু ফেলিছে চরণ পাশাপাশি গলাগলি।
সবারে ছাড়ায়ে নর-মানবের গগনস্পর্শী বিপুল জয়ধ্বনি
শুনিয়া শিহরি সভয়ে সে কোন্ কবি
মরিয়া-অমর যুগ-মানবের র'চয়াছে বন্দনা ?

মহাযুদ্ধের শেল-শক আর মারণ-বাষ্পে জন্ম লভিল যারা,
ধরার-মাটির-প্রথম-পরশ-কান্না যাদের ডুবেছে মেশিন-গানে,
এবং যাহারা ঘুমাইয়াছিল সভাপর্বের বিলাস-ব্যসন মাঝে,
সে ঘুম যাদের ট্রেঞ্চ-শয্যায় তিমিররাত্রে ভেঙেছে আচম্বিতে,
এবং যাহারা গৃহে অনশনে প্রতিদিন পেল প্রিয়-বিয়োগের ব্যথা,

ছিন্নহস্ত ভগ্নচরণ জাগিল যাহারা হস্‌পিটালের 'বেডে',
রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় আজো বহে যারা মৃত্যুর যন্ত্রণা,—
উত্তেজনায় উন্মাদ হ'ল যারা,
মৃত্যু যাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিয়া গিয়াছে, হে বন্ধু, আমি আছি,
মৃত্যুর ভয়ে জীবনে লইয়া ছিনিমিনি খেলা যারা খেলে সুতরাং—
আমরা তাহারা নহি—সেই কথা এযুগের কবি স্মরণে কি রাখিয়াছে।
মোদেরে পিষিয়া চাহে না মারিতে ওদের ঘরের শত সমস্তাভারে।

আমরা তাহারা নহি।
তাহাদের ঢেউ আকাশ-সাগর ডিঙায়ে যদিও লেগেছে মোদের গায়ে—
ড্রইং-রুমের টেবিলে মোদের চা-র পেয়ালায় তরঙ্গ তুলিয়াছে;
চুমুকে চুমুকে কথায় কথায় মোরা কয়জন সে ঢেউ করেছি পান,
মোদের উদরে সে ঢেউ পেয়েছে লয়;
পারে নি নড়াতে অনড় মোদের জগন্নাথের রথে—
বিপুল বিরাট ঘুমন্ত রথ চলে নাই এক তিল।

আমাদের যুগ আজো যে মধ্যযুগ—
সিনেমা-রেডিও-টেলিভিশনের 'কোটিং' যদিও পড়েছে তাহার গায়ে;
'কোটিং' উঠিতে লাগে বা কতক্ষণ!
পোড়া-মাটি আর বালু-পাথরের জড়-রূপটাই মোদের সত্য রূপ।
অনড় মাটির কে গাহিবে জয়গান!
মোদের মুক্তি? আধখানা তার পীরদরগায় এখনো সিন্নি মাগে,
পাদোদক আর তাবিজ-মাদুলি, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে;
বাকি আধখানা গ্যালেনোর ফিজিক্স, চরকসংহিতায়।
বিজ্ঞান আর দৈবে মিলিয়া প্রায় মাঝামাঝি বিংশ শতাব্দীতে
ঘরে ও বাহিরে অদ্ভুত খেলা খেলিছে বঙ্গদেশে—
এ যুগে মোদের প্রত্যেক ঘরে অহরহ চলে সেই দাড়ি-টানাটানি—
কভু বিজ্ঞান কভু দৈবের জয়।
অতি-বিচিত্র কোলাকুলি কভু আদিমে ও আধুনিকে—
জ্ঞানে সংস্কারে মধুর সমন্বয়!

কোথা সে চারণ, এই দ্বন্দ্বের যে গাহিবে ইতিহাস,
গাহিবে এবং ভাসিবে চোখের জলে?

অতি-পুরাতন ঘুম-জড়া চোখে লেগেছে কখন খর টর্চের আলো,
বিস্ময়ে ভয়ে শয্যায় জেগে ভাবিতেছি কাজে বাহির হইতে হবে।

জড়তা রয়েছে জড়ায়ে অঙ্গখানি,—
কর্মবাতুল বংশী অদূরে আকাশ চিরিয়া ডাকিছে মুহুর্মুহু,
পঞ্জিকা-পুথি খসিয়া পড়েছে কম্পিত হাত হতে ;
হঠাৎ চাবুকে রূঢ় পদাঘাতে স্মরণ হতেছে কারাগারে আছি শুয়ে,
ডাকিছে প্রহরী, ভোর হ'ল, জাগো জাগো ;
ঘানির গর্ভে সরিষা কাঁদিছে, আমারে মুক্তি দাও,
পারি না বহিতে এ দেহে তৈলভার ;
এ আধ-আঁধারে জাগিয়া চকিতে প্রায়নিরন্ধ্র কারাকক্ষের মাঝে
অনভ্যাসের প্রথম আবেগে কঠিন দেয়ালে কপাল গিয়াছে ঠুকে ;
সেই ব্যাকুলতা এ যুগের কবি বুঝিতে পারিয়া লিখেছে সাহস করি,
বলেছে, বন্ধু, এই তো মুক্তিপথ ?

আমরা সহজ নহি—
স্কন্ধে অতীত ভর করিয়াছে, ভূতের প্রকোপে জটিল মোদের মন ;
ভবিষ্যতের ওঝারা আসিয়া নির্মম করে করিতেছে কশাঘাত,
বর্তমানের হতাশাপঙ্কে আমরা পড়িয়া শুধু খাইতেছি মার,
অতীত কখনো প্রবল, কভু বা প্রবল ভবিষ্যৎ—
দুয়ের দ্বন্দ্বে মোদের বর্তমান।
সহজ মনের অনুভূতি দিয়ে বর্তমানেরে দেখেছে সে কোন্ কবি
আপন চোখের সহজ দৃষ্টি দিয়ে—
পাউণ্ড লরেন্স হাক্সলির চোখে নয় !

এ যুগের কথা কহিবে কোথায় সে কবি উদার-প্রাণ,
স্থূল হিমালয় আকাশ বাতাসে নিন্দা না করি নূতনত্বের মোহে—
পতনোত্থানে, প্রেমে ও দ্বন্দ্বে গাবে মানুষের জয়—
বন্দী মানুষ, ব্যর্থ মানুষ, পীড়িত মানুষ—তবু মানুষের জয়।

[মানস-সরোবর]

—

বঙ্গজননী

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষজাতির শুভসাধনায় নিত্য তীর্থভূমি,
ভুবনমোহিনী মহাকল্যাণী বঙ্গজননী তুমি।

সৃষ্টির শুরুতে দাক্ষিণাত্যের উত্তরে ছিল মহাসাগর। ক্ষিণভারতের মালভূমি মহাসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে র্ঘদিন অপেক্ষা করেছিল আর্যাবর্তের উদয়ের আশায়। নেক প্রতীক্ষার পরে পয়োধির অনল উদ্গিরণে প্রকৃতির চণ্ড আলোড়নে আবির্ভূত হয়েছিল হিমালয়। বিধাতা ঙ্গসাগর ও আরবসমুদ্রের একাকার বারিরাশিকে বচ্ছিন্ন করে জন্ম দিয়েছিল উত্তরভারতের। রচয়িতার ষ্টিতি পূর্ণতা পেয়েছিল বাংলার অভ্যুদয়ে। গঙ্গা বার ব্রহ্মপুত্র হিমাচলের পদধূলি পলে-পলে আহরণ করে ঞ্জলি দিতে আরম্ভ করেছিল অনন্তকালের দিকে। শিমায়ের প্রসন্ন হাসিতে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদেশ।

স্রষ্টা কুশী-কোয়েল-কালাবদর-মেঘনা-মধুমতী-ময়ূরাক্ষী-স্তা-অজয়-বৈতরণী-আত্রাই-সুবর্ণরেখা-কর্ণফুলী-মহানন্দা-শিয়ারা-দামোদর-রূপনারায়ণের সমাবেশ ঘটিয়েছিল ভূমিতে। নদনদীর জোয়ার-ভাটার আগমনে এবং র্গমনে অববাহিকায় পলি জমে বদ্বীপে পরিণত হয়। নদীগুলি পলিপ্রবাহ বয়ে এনে অতীতে গড়েছে, নও রচনা করছে; জলদেবতার পুণ্যকন্যারা ভুবনমাতার ভি আশীর্বাদ বাংলাদেশের উদ্দেশে।

বিশ্বকর্মা গোটা জগতে হাত পাকিয়ে সর্বশেষে ষ্মের গাঢ়তার, বর্ষার গূঢ়তার, শরতের গৌরবের, মন্তের সৌরভের, শীতের সৌন্দর্যের, বসন্তের সম্মোহনের মিলিত পরিপূর্ণতা সারা পৃথিবীতে একমাত্র বিতরণ রাছেন বাংলায়, ষড়ঋতুর সংমিশ্রণে বঙ্গদেশ সমগ্র নে অতুলনীয়।

ষ্জনের আদিতে একদা গিরিরাজের দুহিতা গৌরীদেবী ভূমির মূর্তিধারণ করে বঙ্গসাগরে সমুদ্রস্নানে বসেছিল, রীর মনের নাড়ী গঙ্গা, প্রাণের নাড়ী ব্রহ্মপুত্র, লাবদর বাংলাদেশের বাঁ পায়ের মল; বৈতরণী ডান পায়ের তোড়া। কুশিয়ারা বাম হস্তের আয়ুধ, মহানন্দা দক্ষিণ হাতের প্রহরণ। মেঘনা বাংলার বাম কানের দুল; অজয় ডান কর্ণের কুণ্ডল। মধুমতী বাম হস্তের বালা, দামোদর দক্ষিণ হাতের বলয়। কর্ণফুলী বঙ্গদেশের বাঁ পায়ের নূপুর; সুবর্ণরেখা ডান পায়ের পাদুকা। ময়ূরাক্ষী কটিবন্ধ, আত্রাই কণ্ঠহার। তিস্তা বঙ্গভূমির আদরধারা; রূপনারায়ণ সোহাগ-স্রোত। নদ-নদী সমূহের প্রবল প্রবাহে শিরানী ধাবমান সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোন স্থায়ী বিধানে বঙ্গজননীকে সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব নয়। নিত্যই নবীন হওয়া জীবনময়ী বাংলাদেশের শাশ্বতের সাধনা।

পলিমাটিতে গঠিত বলে পুরাতনের পাষাণভার সয় না বাংলা। সত্যের জিজ্ঞাসা প্রতিযুগে জেগেছে বঙ্গদেশে। মানবাত্মার ধর্মবোধের চিরন্তনের অপেক্ষা রয়েছে বঙ্গভূমিতে। গঙ্গা এনেছে বাংলাদেশে ভারতের প্রীতি, ব্রহ্মপুত্র নিয়ে এসেছে এশিয়ার প্রেম। বিপুল ভারতের প্রাণবোধনের দারুণ দায়; বিশাল এশিয়ার জীবন-শোধনের গুরুত্ব দায়িত্ব ইতিহাস চিরদিন বঙ্গসন্তাকে প্রদান করেছে। বঙ্গআত্মার বাসনা হল বঙ্গতীর্থে মানুষজাতির সকল আমলের তপস্যার সামঞ্জস্য ঘটুক। বিশ্বময় বিস্তৃত লোক বঙ্গধ্যান। বুদ্ধিবাদের বাহ্যিক দাবিতে শুভমিলন অসম্ভব। বিবেকবুদ্ধির আত্মিক অধিকারে শুভসমন্বয় সুসম্ভব। বঙ্গপ্রকৃতির সমস্ত উপলব্ধিতে তাই হৃদয়ের আবেদন।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পুণ্যে কেরল থেকে কাশ্মীরে সর্বকালে বঙ্গমন্ত্র উচ্চারিত। হিমালয় আর বঙ্গসাগরের পবিত্রতায় নিত্যযুগে জাভা হতে জাপানে বঙ্গপূজা পরিবেশিত। বাংলা ভারত মহাদেশের মনোবেদী এবং এশিয়া মহাদেশের প্রাণমণ্ডপ, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র হিমাচল-বঙ্গসমুদ্র প্রাচ্যগোলকের জীবনশোভা বিরাট-ব্যাপক-বিচিত্র বাংলাদেশের ভৌগোলিক সৌভাগ্য।

LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

ছদ্মরাগ

শ্রীদেবব্রত রেজ

চরিত্রলিপি

শ্রীঅতুল (প্রৌঢ় গাণিতিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক)

শ্রীশমীজিৎ (ধনী, শখের সাইকো অ্যানালিস্ট)

শ্রীদেবেশ (অতুলবাবুর একমাত্র পুত্র)

শ্রীঅলকানন্দ (চন্দ্রার জ্যেষ্ঠ সহোদর)

ডাঃ রাহা (ধনী চিকিৎসক)

শ্রীমতী চন্দ্রা (অতুলবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী)

শ্রীমতী সুরমা (ডাঃ রাহার স্ত্রী)

শ্রীমতী রুমা (ঐ কন্যা)

শ্রীঝরনা (নার্স, চন্দ্রা ও দেবেশের সহপাঠী)

মঞ্চনির্দেশ

মঞ্চকে সম্মুখ থেকে গভীর পর্যন্ত তিনটে অংশে বিভক্ত প কল্পনা করা হয়েছে। সবচেয়ে সম্মুখে যে অংশ তা স্টেজ (সম্মুখমঞ্চ)। এর পিছনে মিড স্টেজ (মধ্যমঞ্চ), স্টেজ থেকে এক ধাপ উঁচু। মিড স্টেজের পিছনে ষ পর্যন্ত আরও এক ধাপ উঁচু ডীপ স্টেজ (গভীর)। স্টেজকে সম্মুখ থেকে গভীরে এইভাবে তিনটি ল বিভক্ত করে ঘটনা এবং চেতনার তিনটি স্তরকে কতে রূপায়িত করা হয়েছে।

সবচেয়ে সম্মুখের তল, ফ্রন্ট স্টেজ, আপাতঃ-ঘটনার ক। এই তল আবার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শের , তথা Perception-এর তল। এর পেছনে যে মিড স্টেজ—মধ্যমঞ্চ, তা ঘটনার মধ্যে অন্তর্গত নিয়মের তল। এই তল আবার সঙ্গে সঙ্গে সজ্ঞান মনের তল, Conception-এর তল, লজিকের তল। এর পেছনে যে ডীপ স্টেজ—গভীর মঞ্চ, তা একদিকে একাধারে মগ্নচৈতন্য ও অবচৈতন্যের তল এবং অপরদিকে ঘটনার পশ্চাতে 'অদৃষ্ট' বা 'নিয়তি'র তল।

ফ্রন্ট স্টেজ ও মিড স্টেজের মধ্যে স্বল্পালোকিত ধূসর বর্ণের পর্দা—ফ্রন্ট স্টেজের পটভূমি। মিড স্টেজ ও ডীপ স্টেজের মধ্যে গাঢ় এক বর্ণের পর্দা—মিড স্টেজের পটভূমি। আর, সবশেষে ডীপ স্টেজের পটভূমিতে ঘন নীলোজ্জ্বল পর্দা—ডীপ স্টেজের পটভূমি।

ফ্রন্ট স্টেজ

[সন্ধ্যার কাছাকাছি। চন্দ্রা বধূবেশে নিজের ঘরের বাইরে বারান্দায় পায়চারি করছেন, থাকতেও পারছেন না যেতেও পারছেন না এই ভাব। যেন কারও জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। সিঁড়িমুখে শমীজিতের প্রবেশ। শমীজিৎকে দেখে কুণ্ঠিত হয়ে উঠলেন চন্দ্রা। কুণ্ঠিত হয়ে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন]

শমীজিৎ। অপূর্ব!

[চন্দ্রা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে রয়েছেন তখনও]

শমীজিৎ। অপূর্ব! শুনছ? অপূর্ব! এই মুখ চোখের দিকে তাকালো সমস্তলোক আকর্ষণ করেছিল। উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল বুদ্ধকে তপোবনে।

চন্দ্রা। (অনুত্তেজনাহীন ভাবে) আজও বুঝি তোমার সাহিত্যের নেশা?

শমীজিৎ। আমার কথা শুনছ না যে!

চন্দ্রা। আজকের মত ওকে রেহাই দাও।

শমীজিৎ। উনি তো নিজের হাত থেকে নিজের রেহাই চাইছেন, নিজের মধ্যে নিজের পুনর্জন্ম চাইছেন। আমি ধাত্রীর কাজ করছি।

চন্দ্রা। (বিদ্রূপের ভঙ্গীতে) গাছ হলে কাটা গুঁড়ি থেকেও নতুন পল্লব বেরুতে পারত শমীজিৎ। ও মানুষ। লোল চর্মের উপর ভেদ করে নতুন যৌবন কোনদিন বেরুবে না।

শমীজিৎ। তোমার কাছে দুঃখিত। সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর, আজ আসতে আসতে পথের ধারে দেখলাম একটা গাছ—কি গাছ চিনি না, গাছে ফুল ধরেছে। মনে পড়ে গেল তোমার কথা। একটা আমগাছে দেখি মুকুল ধরেছে, ছুঁচলো মুকুলগুলো তীরের মত বুকে বিঁধে গেল, মনে পড়ল তোমার কথা—থাক্ ও কথা। আজ তোমার কি হল।

চন্দ্রা। কিসের কি হল?

শমী। ভালই হয়েছে, ও লজ্জা তুমি আর খুলে রেখ না। ওটাই তোমার স্বাভাবিক লজ্জা।

চন্দ্রা। (ক্রুদ্ধ) স্বাভাবিক? ঘুরিয়ে বলতে চাও এটা আমার লজ্জা?

শমী। লজ্জা তোমার নয় চন্দ্রা, লজ্জা আমার, মেয়েদের, সবার—সারা মনুষ্য সমাজের। এই ক্লেশক্লিষ্ট পৃথিবীতে অকর্ষিত ভূমি যেমন লজ্জা—তেমনি।

চন্দ্রা। (অসহায় ভঙ্গীতে) প্রকৃতির কি অদ্ভুত সৃষ্টি তুমি শমীজিৎ, সমস্ত অশ্লীলকে তুমি শ্লীল করে তুলেছ, আর শ্লীলকে অশ্লীল! আরও অদ্ভুত, আমি! আমিই তোমাকে ডেকে এনেছি এখানে আমার ভাগ্য বদলে দিতে। আমি চেয়েছিলাম আমার স্বামীর আর আমার মনের নিভু-নিভু প্রদীপ দুটোর সলতে উসকে দিতে—ডাকলাম তোমাকে, ভেবেছিলাম তুমি ঝুলকালি সরিয়ে আবার জ্বালিয়ে দেবে—কিন্তু—

শমী। কিন্তু?

চন্দ্রা। কিন্তু, তুমি দুজনের চোখে পরিয়ে দিলে ঘন কালো কাচ—যে কাচ পরলে আগুনের শুধু ধোঁয়াটাই যায় দেখা। জানি না এ তোমাদের কি অদ্ভুত পদ্ধতি!

শমী। আমি বৈজ্ঞানিক, আমার দৃষ্টিতে মানুষের মনটা দেহটা। ডাক্তার যেমন দেহের সুস্থতা বিচারের জন্য সব পরীক্ষা করে, কিছুকেই ঘৃণ্য বলে ফেলে দেয় না, তেমনি আমিও মনের সমস্ত কিছুকেই বিচার্য বলে গ্রহণ করেছি। দেহের সর্বপ্রকার ময়লায় যেমন তার গুপ্ত প্রক্রিয়ার হদিস মেলে তেমনি মনের ময়লায়ও মনের গুপ্ত প্রক্রিয়ার ঠিকানা পাওয়া যায়। এতে অবাক হবার, আহত হবার, ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই।

[চন্দ্রা পায়চারি করছেন; মাঝে মাঝে দূরের দিকে চেয়ে দেখছেন]

কী হয়েছে? অভিসারে বেরিয়েছ? কোথায় যাবে ভামিনী, সমস্ত পথ যে কাদায় ভরে গেছে! সমস্ত পথ যে পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। চারদিকে সাপেরা কিলবিল করছে। কোথায় যাবে?

চন্দ্রা। (জোর করে) আমি আমার স্বামীর কাছে যাচ্ছি।

শমী। (অবাক) স্বামী! মানে, অতুলবাবু! অবাক করলে আমাকেও। সত্যিই বিচিত্র তোমাদের মেয়েদের মন।

চন্দ্রা। হ্যাঁ, তাঁর কাছেই।

শমী। অসুস্থ মহিষের মত কাদার জলায় গড়াচ্ছেন তিনি। তাঁর কাছে তুমি? এই বেশে?

চন্দ্রা। আজ আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী।

শমী। থাম, ভাবতে দাও। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। বিয়ে! ক্যালিবানের সঙ্গে মিরান্দার বিয়ে হয়েছে, মিরান্দা তাকে আদর করছে···ভাবতে দাও ঘটনার তাৎপর্য।

চন্দ্রা। তোমার ভাবনা মনের বড় রাস্তায় বেরুতে পারবে না। ঘুরে ঘুরে মরো তার অলিতে-গলিতে। আমি চলি। (শমীজিতের সামনে গিয়ে) তুমি? তুমি আগলে রাখবার কে?

শমী। (গম্ভীরভাবে) আমি যুক্তি।

চন্দ্রা। (অবাক) যুক্তি? যুক্তি নেই আমার এই চাওয়ার? আছে, যুক্তি আছে, সে যুক্তি তুমি আজও খুঁজে পাও নি শমীজিৎ। ছাড়। কী যে কর। সত্যিই আজ আমার এ সব ভাল লাগছে না।

শমী। তিনি রোগী ভুলে যেয়ো না। তোমাকে বেশে গ্রহণ করার মত তাঁর মনের প্রস্তুতি নেই। তিনি ভাববেন—

চন্দ্রা। কি ভাববেন?

শমী। তুমি অন্য কারও অভিসারে বেরিয়েছ। আবার তাঁর পাগলামিতে ফিরে যাবেন তিনি, কাঁদবেন—যেমন শিশু কাঁদে মাকে একাকী সাজসজ্জা করে উৎসবে যেতে দেখলে।

চন্দ্রা। কার অভিসারে?

শমী। আমি তার কী জানি চন্দ্রা দেবী, জানে তোমার মন।

চন্দ্রা। (ভেবে) কই, জানে না তো!

শমী। জানে, জানে, তোমার মন জানে; কিন্তু নিজের কাছে কিছুতেই স্বীকার করতে পারছে না। আমি জানি।

চন্দ্রা। আচ্ছা, সবারই মন জেনে তুমি কী করে স্থির হয়ে আছ?

শমী। স্থির? কই স্থির আছি? দেখছ না, অস্থির মনের দরজা আগলে রেখেছি।

চন্দ্রা। তোমার নিজের মনে কী আছে?

শমী। জানি। নিজের কাছে সেই জানাটা লুকোতে পারি নি।

চন্দ্রা। (কঠিন হয়ে) কী জান নিজের মনের? খুলে বলতে পারতে যদি মেনে নিতাম তোমার নিজেকে। মেনে নিতাম তুমি আমার মনকে আমার চেয়েও ভাল করে জান।

শমী। আর একদিন বলব। সময় হলে বলব। আমি তো জেনে বসে আছি। কিছুটা জ্ঞান কিছুটা অজ্ঞান মিশিয়ে যে ঘোলা চেতনা মানুষকে পীড়ন করে সেই ঘোলা চেতনা আমার নেই।

চন্দ্রা। তোমার মন তোমাকে যদি পীড়ন না করছে তবে তুমি আমাকে পীড়ন করছ কেন? পথ ছাড়, আর একদিন শুনব—ছাড়। (দরজায় দেবেশের আবির্ভাব। দেবেশকে দেখে চন্দ্রা আরও উত্তেজিত হয়ে) ছাড়ো!

শমী। তোমায় ধরে রেখে কথা বলে অপেক্ষার উদ্বেগ থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম। আচ্ছা আমি চলি।

[দেবেশ যেদিক দিয়ে প্রবেশ করেছে তার বিপরীত দিক দিয়ে শমীজিৎ বেরিয়ে গেলেন]

[দেবেশ মাথা হেঁট করে পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল]

চন্দ্রা। এলেই বা কেন? যাচ্ছই বা কোথায়?

দেবেশ। বাবার ঘরে যাচ্ছিলাম।

চন্দ্রা। মাথা হেঁট করে কেন?

দেবেশ। আমি কিছু দেখতে চাই নি।

চন্দ্রা। তুমি তো আমাকে দেখতে এসেছিলে।

দেবেশ। (বিস্মিত) আপনাকে! না।

চন্দ্রা। আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।

দেবেশ। জানি।

চন্দ্রা। তাই চোখ নামিয়ে তুমি চলে যাচ্ছিলে? কি দেখছিলে? পা?

দেবেশ। (মাথা তুলে পূর্ণদৃষ্টিতে চন্দ্রাকে দেখে—কিছুক্ষণ পরে) না। (আনমনে আবার) না।

চন্দ্রা। ওই তো দেখছ? কাকে দেখছ? মাকে?

দেবেশ। (সম্বিৎ ফিরে পেয়ে) নিজেও পাগল হয়ে যাবেন, আমাকেও পাগল করবেন!

চন্দ্রা। পাগল হবার বাকী কি আছে আর? তোমরাই পাগল করেছ আমায়। পিতাপুত্রে পাগল করেছ।

দেবেশ। বুঝলাম না।

চন্দ্রা। পিতা আমাকে এড়িয়ে চলেছেন মানুষ যেমন ভূতকে এড়িয়ে চলে তেমনি। আর পুত্র ছায়ার মত অনুসরণ করছে—যেমন দুঃস্বপ্ন অনুসরণ করেছে ঘুমকে। একজন আমাকে জাগতে দিচ্ছে না, অপরজন দিচ্ছে না ঘুমোতে। একজনের কাছে আমি অসহ্য—অপরজন আমার অসহ্য। এ কী জীবন বল তো?

দেবেশ। এ জীবন তো আপনি নিজে হাতে গড়ে নিয়েছেন।

চন্দ্রা। তাহলে আমি যা বললাম তা সত্যি? তুমি আমাকে সর্বদাই অনুসরণ করছ ছায়ার মত?

দেবেশ। ওটা আপনার সন্দেহ। ও আমি করতে পারি না, করা অনুচিত।

চন্দ্রা। মন কি উচিত অনুচিত মানে?

দেবেশ। মানে নিশ্চয়ই।

চন্দ্রা। জেনে যদি মন অনুচিত কাজ করে?

দেবেশ। তাকে শাসন করে ফেলতে হবে।

চন্দ্রা। তুমি তাই নিজেকে শাসন করছ?

দেবেশ। যদি করিই তাতে আপনার কি যায় আসে?

চন্দ্রা। (প্রবল অনুভূতির সঙ্গে) না না, কিছুই যায় আসে না। কিছুই যায় আসে না। কেন যাবে আসবে আমার? তুমি কে? সত্যিই তো আমার সন্তান নও। এই অলীক সামাজিক সংস্কার যা—

দেবেশ। শমীজিতের সঙ্গে মিশে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী এমন বেঁকে গেছে যে যা স্বাভাবিক তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

চন্দ্রা। স্বাভাবিক? তুমি আমি একদিন সহপাঠী ছিলাম। আজ তুমি ছেলে, আমি মা। এটাকে স্বাভাবিক বল?

দেবেশ। যে জলে শিলা ডোবে সেই জলে তো ইস্পাত ভাসছে। এটা নির্ভর করে মানুষের ওপর।

চন্দ্রা। আমিও তাই ভেবেছিলাম একদিন। আজ থেকে দশ বছর আগে। ভেবেছিলাম জীবনটাকে অঙ্কের মত কষে বাঁচব। বিয়ে করলাম গাণিতিককে।

দেবেশ। আপনি তো লজিকের কৃতী ছাত্রী।

চন্দ্রা। ভেবেছিলাম যোগ করা যাবে হৃদয়ে বুদ্ধিতে, চেতনে অবচেতনে—যোগ করা গেল না। আমিই বিযুক্ত হয়ে গেলাম জীবন থেকে। দেখেছ তো, তখন নিজের সঙ্গে কিছুই যোগ করি নি। না ছিল সজ্জার আড়ম্বর, না ছিল আভরণের প্রতি মোহ। আর আজ দেখছ তো দেবেশ, আজ এই পোশাক পরেছি। কেন? কেন জান?

দেবেশ। আজ আপনাদের বিয়ের দিন।

চন্দ্রা। না না, ওটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে বদলে গেছি, না—ভেঙে গেছি—দু টুকরো হয়ে গেছি। একদিন ভাবতাম আমি বুদ্ধির পূজারী। ভেবেছিলাম বুদ্ধির দ্যুতিতে বুঝি সারা চেতনা উজ্জ্বল হয়ে যাবে। ভেবেছিলাম বুদ্ধির রশ্মির মুখে সব মনটাই স্বচ্ছ। দেখি—দেখলাম অন্তঃকরণের তলায় প্রকাণ্ড একটা অস্বচ্ছ অংশ রয়ে গেছে—সমস্ত যন্ত্রণার বিচিত্র জন্মভূমি।

দেবেশ। শমীজিৎকে এড়িয়ে চলুন। বাবার চিকিৎসার নামে সে নতুন ধরনের শবসাধনায় বসেছে। ভাবছে মনের পাঁকোদ্ধার হচ্ছে, উদ্ধার হচ্ছে না কিছুই, সমস্ত পাঁকের স্তরটা গেছে ঘুলিয়ে—শুদ্ধ চিন্তা ভাবনাও মরে যাচ্ছে মলিন জলে শ্বাসরুদ্ধ মাছের মত। তা ছাড়া—

চন্দ্রা। তা ছাড়া?

দেবেশ। শমীজিৎ এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যেখানে ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায়ের চেহারায় কোন পার্থক্য ধরা পড়ছে না। ওর আসল উদ্দেশ্য—

চন্দ্রা। কি?

দেবেশ। আপনি জানেন। ওই তো আপনার দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিল। আপনি ওকে ডেকে ভুল করেছেন। ও চিকিৎসার নামে ধ্বংস করছে—বাবাকে, আপনাকে, সবাইকে।

চন্দ্রা। তোমার ধ্বংসে যদি আমার কিছুই না এসে যায় তো আমাদের ধ্বংসে তোমার কী?

দেবেশ। এমন কে আছে যে চোখের ওপর খুন দেখতে পারে নিরুদ্বেগে? তা ছাড়া আমাদের পরিবারের হৃৎপিণ্ড আপনি।

চন্দ্রা। এই হৃৎপিণ্ড আর চলছে না, দেখতে পাচ্ছ

হৃৎপিণ্ড চলতে গেলে রক্তের যোগান চাই। ...না) রক্ত—রক্ত—রক্ত! রক্তে কী জ্বালা! আমি ...। আমাকে খুন করে কেউ এই জ্বলন্ত রক্তকে আমার ...উপশিরা থেকে বের করে দিক।

...বেশ। ও কি, অমন করছেন কেন! স্থির হোন। ...থরথর করে কাঁপছেন। দেবেশ পিছন থেকে তাঁকে ...র করে ধরে রাখল। চন্দ্রা বসে পড়লেন মাটিতে]

...দ্রা। আঃ, মাটিটা কী ঠাণ্ডা! তুমি খুব ভয় ...েছ, না দেবেশ? (হেসে) তোমার ভয় ...আমার ভয়টা কেটে গেল। কী আশ্চর্য! নিজের ...র দিকে চেয়ে দেখলাম যেন তোমার চোখের ...য়। তোমার প্রতি সব রাগ আমার শরতের ...র মত কেটে গেল। কেন বল তো? (সহসা ...বিৎ ফিরে পেয়ে) এ কী! তুমি এখনও আমার ...কে নিয়ে রয়েছ! (আবেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন।) ...শিগগির চলে যাও।

[চন্দ্রা ...লতে ...লতে বেরিয়ে গেলেন। দেবেশ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।]

[ঝরনার প্রবেশ]

ঝরনা। এই যে দেবেশ! এইটে তোমাদের বাড়ি?

দেবেশ। হ্যাঁ, এইটাই। কেন বল তো?

ঝরনা। আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম।

দেবেশ। বুঝলাম না।

ঝরনা। আমি প্রায়ই স্বপ্নে একখানা বাড়ি দেখি। ...ছিলাম সেই রকম বাড়ি।

দেবেশ। তোমারও এসব মোহ আছে ঝরনা?

ঝরনা। (হেসে) না থাকলে বাঁচি কি করে বল?

দেবেশ। কিন্তু তুমি তো অঙ্কের ছাত্রী—

ঝরনা। হ্যাঁ, অঙ্কের। আঃ, দেখেছ কাণ্ড! যাঁর ...ই এসেছি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তোমার বাড়ির ...য় আটকে গেলাম। চল, আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে ...। আগে কর্তব্য।

দেবেশ। কর্তব্য তো অঙ্ক।

ঝরনা। হ্যাঁ, কর্তব্য করে বাঁচাই তো জীবন। ...ছাড়া জীবনের মানে কোথায়? চল তোমার বাবার কাছে, আমায় দেখলেই চিনতে পারবেন। এক-দিন পড়িয়েছিলেন। সেদিনের চেহারাটা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। কোন্ ডাক্তার দেখছেন বল তো?

দেবেশ। ডাক্তার শমীজিৎ রায়, সাইকো-অ্যানালিস্ট।

ঝরনা। (অবাক হয়ে) সাইকো-অ্যানালিস্ট! এ রকম চিকিৎসা-ব্যবস্থার মিল আছে কিন্তু এই বাড়িটার সঙ্গে।

দেবেশ। (অবাক হয়ে) বাড়ির সঙ্গে চিকিৎসার মিল?

ঝরনা। আমার দশ বছরের নার্সিং-জীবনে অনেক দেখে দেখেছি রোগীর সঙ্গে তার ঘর-বাড়ি-আসবাব-পত্রের মিল থাকে। কেন থাকে বুঝি না। (হেসে) বোধ হয় প্রকৃতির অঙ্ক। আচ্ছা, চল। সেদিন দেখা হলে বললে তোমার সৎমা আছেন। কোথায় তিনি? রোগীর ঘরে?

দেবেশ। জানি না। চল, দেখি।

ঝরনা। (চারদিকে চেয়ে ও কান পেতে শুনে—বাইরে কে যেন খুব চাপা স্বরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে) অদ্ভুত এই বাড়িটা!

দেবেশ। অদৃষ্টের চক্রান্তে তুমিও এখানে এসে পড়েছ। আমি তোমার মত একজনের সাহায্য চাইছিলাম মনে মনে। তুমি যখন বললে, তুমি স্বেচ্ছায় আসবে, তখন ভাবলাম ভাগ্য অঙ্ক কষে আমার রক্ষার জন্য পাঠালে তোমাকে। তখন ভাবি নি, কোথায় কোন অন্ধকার কূপে তোমায় ডেকে আনছি। ক্ষমা কর আমায়।

ঝরনা। আমি তো স্বেচ্ছায় এসেছি।

দেবেশ। (আনমনে) সেও একদিন স্বেচ্ছায় এসেছিল।

ঝরনা। কে?

দেবেশ। চন্দ্রা।

ঝরনা। মানে, আমাদের চন্দ্রা?

দেবেশ। হ্যাঁ।

ঝরনা। কি করে এল?

দেবেশ। আমার মা হয়ে।

[দুজনের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অতুলবাবুর ঘরের সম্মুখে বসবার বারান্দা। বাইরে রাত্রির কুয়াশা নামছে। একখানা টেবিলের ওপর ফুলের একটা প্রকাণ্ড ডাঁস ফুলগুচ্ছ]

অতুল। কেন? এ প্রশ্ন আমি নিজেকেই করেছি বহুবার।

শমীজিৎ। কি উত্তর পেয়েছেন নিজের কাছ থেকে?

অতুল। দেবেশের মা মারা গেলেন সহসা। শুধু যেন আশ্বস্ত হলাম। তিনি এত নির্বোধ ছিলেন যে আমার মানস-জীবনের ধারণা একেবারেই বুঝতেন না। বুঝতেন না বলে অত্যাচার করতেন।

শমী। তাঁর কাছ থেকে সরে থাকতেন না কেন?

অতুল। পারতাম না। তাঁর প্রতি আমার কেমন অদ্ভুত নেশা ছিল নিতান্ত দৈহিক আকর্ষণ। যে ক্ষুধার তিনি পরিপূর্ণ নিবৃত্তি করতেন, সেই ক্ষুধাটা পীড়া দিতে লাগল। অনেকদিন পরে এই পীড়া বোধ করলাম। তারপর এল জীবনের নিদারুণ অসাফল্য। বহু বৎসরব্যাপী একটা গবেষণার কাজ ব্যর্থ হয়ে গেল। জগৎ সংসার যেন অন্ধকার হয়ে এল। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর ভরসা হারিয়ে ফেললাম।

শমী। চন্দ্রা কি করে এল আপনার জীবনে?

অতুল। চন্দ্রা আসত তার গবেষণার কাজে সাহায্য নিতে। আমার চূড়ান্ত অসাফল্যের পরে সে কেন জানি না আমাকে বেশি শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। সে বোধ হয় বুঝতে পারল আমার জীবনের শূন্যতা। আমিও ধীরে ধীরে বুঝলাম সে বুঝেছে। তারপর সরলা তার করুণা উদ্রেকের চেষ্টায় মেতে উঠলাম। সে ধরা পড়ল। আমার আকাঙ্ক্ষার জালে ধরা পড়ল। দুজনেই ভুল করলাম। আমি ভাবলাম অবচেতনকে, কামনার সমুদ্রকে—মন্থন করলেই বুঝি উঠে আসবে জ্ঞানলক্ষ্মী। মনে করলাম কামনার সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে প্রজ্ঞার দ্বীপে উঠব।

শমী। তারপর?

অতুল। তারপর তন্ত্র পড়তে আরম্ভ করলাম।

শমী। স্বাভাবিক।

——— [illegible] সমিতির অধিবেশন। তিব্বতী গুপ্ত আচারবিধি। নতুন জ্ঞান প্রয়োগ করলাম চন্দ্রার ওপর।

শমীজিৎ। যে ক্ষুধা মানুষের মনের অতলে গোপনে স্বাভাবিকভাবে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে থাকে, তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দিলেন। জিইয়ে তুললেন। মন্ত্র পড়ে দেহকন্দর থেকে জিন রাক্ষসকে জাগিয়ে তুললেন, কিন্তু যথাযোগ্য আহার দিতে পারলেন না।

অতুল। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে শরীরকে ভেঙে ফেললাম দিনরাত নেশার কুয়াশায় রইল ভরে। চন্দ্রার [illegible] নষ্ট হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তারও দেহমনে ক্লান্তি দেখা দিল। আমি যা যতই বুঝতে পারলাম ততই আমার দাবি বেড়ে যেতে লাগল তার ওপর। অতৃপ্তির আগুন ও জ্বলতে আরম্ভ করল। ও জ্বলতে আরম্ভ করল আর আমি নিভে গেলাম।

শমী। আদম আর ঈভের পুরনো কাহিনী কুণ্ডলী কামনার পাপ বললে ফিসফিস করে কানে কানে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে দেখ!

অতুল। জ্ঞান?

শমী। হ্যাঁ, জ্ঞান। অদ্ভুত আদিম জ্ঞান। দেহ দিয়ে জানা। মনের যখন ভাষা ফোটে নি সেই অবস্থার [illegible] দুটি প্রাণীর মধ্যে। কিন্তু তার ফল [illegible] তাই দেখি আপনার মধ্যে।

অতুল। দেখ দেখ, অন্যকে সাবধান করে দিয়ো।

শমী। তারপর?

অতুল। নষ্টের নেশা আমাকে পেয়ে বসল [illegible]। সব বিক্রি করে দিলাম। চাকরি ছেড়ে দিলাম। চন্দ্রাকে বিয়ে করেছিলাম এ বাড়ি বাঁধা দিয়ে। সেই বন্ধকের টাকা যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সব উবে গেল।

শমী। দেবেশ তো পাস করেছে অনেকদিন। [illegible] কাজে লাগল না কেন? ও তো ভাল ছেলে লেখাপড়ায়!

অতুল। দেবেশ বুঝি এই সব দেখেশুনে কেমন হয়ে গেল। কী একটা অদৃশ্য বিরোধ পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে উঠল আমাদের মধ্যে। ধীরে ধীরে অনুভব করলাম চন্দ্রা ওই পাহাড়টার ওদিকে—দেবেশের দিকে চলে যাচ্ছে। ভূভাগের পরিবর্তন হলে নদীরও তো গতি পরিবর্তন হবে। কি বল?

। হ্যাঁ, কিন্তু চন্দ্রা ও দেবেশ দুজনেই শুনেছি শ্রদ্ধা করত আপনাকে।

ুল। দুজনেই আমাকে দেবতা ভেবে প্রথম পূজো করত। ওদের দেবতার যে মাটির পা তা খে নি। দেবতা তা নিজেও জানত না। সেই পা গুঁড়িয়ে গেছে, দেবতা তার পীঠ থেকে পড়ে র্ণ হয়ে গেছে। আজ আমার আশ্রয় নেই—না , না ইঁটকাঠের ইমারতের। (হঠাৎ উদভ্রান্ত হয়ে) শমীজিৎ, আমার মনে হয়—

মী। থাক্, আর ভাববেন না।

র বিস্রস্তভাবে প্রবেশ। চন্দ্রা দূর থেকে অতুলবাবুকে উদ্দেশ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানালেন।

তুল। (ব্যাকুল হয়ে) এস চন্দ্রা, কাছে এস।

চন্দ্রা এলেন না, দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হেসে) থাক, দূরেই থাক। প্রথমে কাছে ভুল করেছিলে!

মী। দূরে দাঁড়ালে কেন চন্দ্রা, কাছে যাও।

রা প্রাণপণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, পারলেন দু পা এগিয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

তুল। (অদ্ভুত হেসে) যাও তুমি। আর এসো না, যাও। (চন্দ্রা যেন কাঁপছেন, দেওয়ালে ঠেস দাঁড়ালেন) যাও, তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। সব থেকে মুক্তি দিলাম। এই বিবাহের বন্ধন থেকেও।

তুল। (উঠে দাঁড়িয়ে) যযাতি নহুষ! যযাতি ! কি উপাখ্যান সৃষ্টি করেছে মানুষ! উঃ।

পতে কাঁপতে ভিতরে (ডীপ স্টেজে) নিজের ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

চন্দ্রা। (মুখ ঢেকে ক্রন্দনরত অবস্থায়) মুক্তি কোথায়?

মীজিৎ চন্দ্রার হাত ধরে তাঁকে নিয়ে এলেন পূর্বের বারান্দায়—চন্দ্রার ঘরের সামনের বারান্দায়।

[ফ্রন্ট স্টেজ। চন্দ্রার ঘরের সম্মুখের সেই বারান্দা।]

শমীজিৎ। ভয় নেই চন্দ্রা, ভয় নেই। মুক্তিকে ভয় কেন?

চন্দ্রা। বাড়িটা ছেড়ে চলে গেলে কোথায় দাঁড়াব?

শমী। শুধু কি বাড়িটার জন্তে আটকে গেছ এখানে? যদি বাড়িটা যায় তা হলে কি তুমি এই পরিবার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?

চন্দ্রা। (সন্দিগ্ধভাবে) পারব না?

শমী। কে জানে! তুমিই জান।

চন্দ্রা। কোথায় যাব?

শমী। আমার বাড়িতে।

চন্দ্রা। তোমার কাছে? তুমি আমায় কি দেবে?

শমী। যা চাইবে। ঘর, বাড়ি, সম্মান, প্রতিষ্ঠা—সবার ওপর আমাকে।

চন্দ্রা। তোমাকে, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব?

শমী। (আঘাতে যেন মুষড়ে পড়ে) কি করবে? আমায় তুমি এমন আঘাত দিতে পারলে?

[চন্দ্রার হাত ছেড়ে দিলেন।]

চন্দ্রা। কি আঘাত?

শমী। কি করে জানলে তুমি?

চন্দ্রা। কি জানলাম?

শমী। না, গোপন করে লাভ নেই। আমি… কি বলব?…আমি বৈজ্ঞানিক…আমাকে বলতেই হবে। তোমাকে আমি প্রতারিত করব না। আমি তোমাকে ভালবাসি চন্দ্রা। যে নারী সন্তান চায়…তুমি সন্তান চাও?

চন্দ্রা। না।

শমী। যে নারী সন্তান চায়, তার কাছে আমার দেহের কোন মূল্য নেই। কিন্তু বিনিময়ে আমি সমগ্র মনটা দেব।

চন্দ্রা। (মুহূর্ত ভেবে হঠাৎ যেন উল্লসিত হয়ে) ধন্যবাদ তোমাকে শমীজিৎ, অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। তুমি আমাকে বাঁচালে শমীজিৎ। আমি যাকে ভয় পাই… তা ছাড়া তোমার সব আছে। সব আছে। হ্যাঁ, ভয় কি, ভয় কি আমার? যাক এ বাড়ি, আমার আশ্রয়ের আর অভাব নেই। (কৌচের মাথায় শমীজিতের হাত দুটো ধরলেন)

শমীজিৎ। ছাড়, কে আসছে! (শমীজিৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যেন ছুটে বেড়িয়ে গেলেন)

[চন্দ্রা স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝরনার প্রবেশ]

ঝরনা। সেই মুখপানাই!

চন্দ্রা। কোন্ মুখখানা?

ঝরনা। যে মুখখানাকে যৌবনে ভালবেসেছিলাম সামাজিক স্তরের প্রকাণ্ড ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও।

চন্দ্রা। তুমি অক্ষজনের ভালবাসাকে ভালবেসেছিলে!

ঝরনা। (বিস্মিত) দেবেশ ভালবাসত বলে?

চন্দ্রা। (হেসে) সম্ভবতঃ তাই।

ঝরনা। তা জেনেও তুমি অতুলবাবুকে বিয়ে করলে?

চন্দ্রা। (কঠিন হয়ে) হ্যাঁ। জেনেও।

ঝরনা। (অসহায় ভাবে) কেন? কেন? কেন এমন করলে তুমি?

চন্দ্রা। ঠিকই করেছিলাম।

ঝরনা। ভালবেসে বিয়ে করেছিলে?

চন্দ্রা। তোমাদের সংস্কার যে ভালবাসা তাতে আমি বিশ্বাস করি না।

ঝরনা। ভুল। ভুল। নিজের কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ তুমি করে বসে আছ ভাই।

চন্দ্রা। কি সর্বনাশ?

ঝরনা। সেই সর্বনাশ কাচের আচ্ছাদনের মত তোমার মুখের ওপর নেমেছে।

চন্দ্রা। (আবেগে) ভেঙে ফেলব, এই কাচখানাকে ভেঙে ফেলব। আমি হার মানব না।

ঝরনা। ভেঙে ফেলবে নিজেকে।

চন্দ্রা। (উচ্চৈঃস্বরে পাগলের মত হেসে) ভাঙা তো টুকরোগুলোর হীরের দ্যুতি দিয়ে যাবে। বুঝলে?

[অলকানন্দের প্রবেশ]

অলক। বাঃ, খুব খুশী আছিস তো! আমি ভেবেছিলাম—

চন্দ্রা। কি ভেবেছিলে? ভেবেছিলে বুঝি কাঁদব? আমার ভাবতে অবাক লাগে দাদা, তোমরা সকলের কাছ থেকে একই ধরনের আচরণ আশা কর কেন?

[অলক কিছু না বলে ঝরনার দিকে চেয়ে রইল। ঝরনা চলে গেল]

চন্দ্রা। উনি ঝরনা দেবী। আমার সহপাঠিনী। এখন পেশায় নার্স। ওঁর সেবা করতে এসেছেন। স্বেচ্ছায় এসেছেন।

অলক। উনিও স্বেচ্ছায় এসেছেন?

চন্দ্রা। (হেসে) ও ভাবছে স্বেচ্ছায়। আমি জানি ও এসেছে জীবনের এমন একটা প্রচ্ছন্ন নিয়মের বশে যা তোমরা এখনও আবিষ্কার করতে পার নি।

[একখানা কাগজ হাতে করে দেবেশের প্রবেশ]

ওটা কি?

দেবেশ। একখানা কাগজ।

চন্দ্রা। দেখি।

দেবেশ। থাক্, পরে দেখবেন। ভাল আছেন অলকবাবু?

অলক। আমি সর্বদাই ভাল। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা ছিল।

দেবেশ। আসুন আমার ঘরে। অনেক কাজ আছে হাতে।

অলক। বেশ, বেশ।

চন্দ্রা। কই দেখি, কি কাগজ?

দেবেশ। পরে দেখবেন।

চন্দ্রা। (কাগজখানা দেবেশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়ে) ও! এই! তারপর?

অলক। চেহারা দেখে যেন সমন মনে হচ্ছে?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, দেনার দায়ে এ বাড়ি যাচ্ছে।

অলক। মামলা করেছেন ডাক্তার দাশ?

চন্দ্রা। হ্যাঁ। এখন?

অলক। আরে, আজকেই তো আর মামলার তারিখ নয়? ভেবেচিন্তে পরে একটা জবাব ঠিক করা যাবে।

চন্দ্রা। জবাব? জবাব নেই। জবাব দিতে গেলে (নিজের গায়ের অলঙ্কারগুলির দিকে নির্দেশ করে) এগুলোকে দিয়েই জবাব দিতে হবে।

অলক। তুই সর্বদা এগুলো গায়ে পরে থাকিস বুঝি?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, পাছে হারিয়ে যায় ভেবে।

দেবেশ। ওটা আমাকে দিন।

চন্দ্রা। তোমাকে? এটা আমার সমন। তোমার কি?

দেবেশ। ওটা বাবাকে দেখাতে হবে।

চন্দ্রা। আমিই দেখাব। তুমি যাও।

অলক। না না, তোমার দেখিয়ে কাজ নেই চন্দ্রা

দেবেশকে ফিরিয়ে দাও। আমরা পুরুষমানুষ। র আমাদের কাজ।

চন্দ্রা। (পাগলের মত হেসে) পুরুষ? দূর দূর, সে বল!

অলক। দেখ্ চন্দ্রা, এমনি ভাবে বেশীদিন থাকলে পাগল হয়ে যাবি।

চন্দ্রা। পাগল! দূর, পাগল হবে কে? এত লোক রায় আগলে রয়েছে, আমাকে পাগল হতে দেবে কেন? ল হলে তো বাঁচতাম। যা খুশি তাই করতাম।

দেবেশ। দিন না আমাকে। কেন এ সব নিয়ে ছেন—

চন্দ্রা। (গম্ভীর হয়ে) আমিই এঁকে যথাস্থানে ছে দিচ্ছি, তুমি যাও।

[দেবেশ বেরিয়ে গেল]

া, তুমি কি জন্যে এসেছ বল তো? বিনা প্রয়োজনে আস না কখনও।

অলক। আমাকে প্রয়োজন হয়েছে তোদের— ই এসেছি।

চন্দ্রা। আমাদের প্রয়োজন?

অলক। হ্যাঁ, তোদের।

চন্দ্রা। তোমার ধর্মকথার প্রয়োজন এখানে কারুরই ই দাদা।

অলক। বিষয়-কথা নিয়ে এসেছি।

চন্দ্রা। বিষয় কথা?

অলক। এই বাড়িটাকে বাঁচানোর একটা উপায় র করেছি। সেইটাকে কার্যে প্রয়োগ করতে চেষ্টা ছি। তোর জন্যে এসেছি।

চন্দ্রা। আমার কিন্তু ভয় করছে দাদা। ছেলেবেলায় মার মধ্যে এমন ভাল তো কিছু দেখি নি।

অলক। এ কথা তুই আমায় বলতে পারলি? ষের কি পরিবর্তন হয় না?

চন্দ্রা। হয় শুনেছি। দেখি নি।

অলক। আমাকে বিশ্বাস কর্। এই গেরুয়া মিথ্যে । আমার সব থেকেও কিছু নেই। এটা তো ফ্যাক্ট। শ্বাস কর্ আমাকে।

চন্দ্রা। সবাই বলছে, 'আমাকে বিশ্বাস কর'। আচ্ছা, আমি কি সকলের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি?

অলক। নিজের ওপর বিশ্বাস নেই তোর, তাই।

চন্দ্রা। তাই হবে, তাই হবে। কি উপায় পেয়েছ?

অলক। এক্ষুণি দেখতে পাবি। চল্, অতুলবাবুর ঘরে। সব জানতে পারবি।

চন্দ্রা। সব কাজ তোমার ষড়যন্ত্রের মত। তুমি কোনদিন সোজা পথে চলতে পারলে না দাদা।

অলক। আমার ওপর বিশ্বাস রেখে আয়।

[দুজনের প্রস্থান]

মিড স্টেজ

[অতুলবাবুর বসবার ঘর। অতুলবাবু তাঁর ডেকচেয়ারটা থেকে অতি কষ্টে উঠে কাঁপতে কাঁপতে অতি সন্তর্পণে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন]

অতুল। যাক, এবার কুয়াশা পাতলা হয়ে আসছে।

[দেবেশের প্রবেশ]

দেবেশ। বাবা? (অতুলবাবু পিছনে চেয়ে দেখলেন না) ডাক্তার রায় আমাদের এই বাড়ি থেকে উৎখাত করার জন্যে মামলা রুজু করেছেন। দিন পড়েছে পরের সপ্তাহে।

অতুল। (ফিরে না চেয়ে) মামলা? বেশ করেছে। আমরা এ মামলা লড়ব না। যাক এ বাড়িটা, এটা বাড়ি নয় দেবেশ, এটা একটা ঢাকা বাক্স। আমাকে বন্ধ করে রেখেছে, নিশ্বাস নিতে পারছি না।

[চন্দ্রা ও অলকের প্রবেশ]

আমি এই বাড়িটা থেকে মুক্তি চাই। এর চেয়ে খোলা পথ সে অনেক ভাল।

চন্দ্রা। আমার এইটুকু আশ্রয়ও তুমি ভেঙে দিতে চাইছ? আমি এটুকু নিয়েই তুষ্ট থাকব—এই ইঁটকাঠের পুরনো আশ্রয়টা নিয়ে। যে বৃহৎ আশ্রয় চেয়েছিলাম— দেহ, মন, আত্মা তিনটে একসঙ্গে নিয়ে বাঁচতে তা যখন পেলাম না, তখন এইটুকুই আমার শেষ সম্বল।

অতুল। (চন্দ্রার দিকে না চেয়ে) এটা গেলে তুমি তোমার পথ পাবে চন্দ্রা। যে পথ তোমার অন্তরাত্মা খুঁজে মরছে।

অলক। কি সব আবোলতাবোল বকছ তোমরা? স্পষ্ট জিনিসকে স্পষ্ট করে দেখ না বলে তোমাদের জীবনে এত গণ্ডগোল। থাক্, ও সব বাজে কথা থাক্...আমি আবার এ সব ধোঁয়াটে কথার মধ্যে দম আটকে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ি।

দেবেশ। আপনার ভাবরাজ্যটাও কম ধোঁয়াটে নয়।

অলক। থাক, দু তরফেই যে ধোঁয়া এটা অন্ততঃ তুমি বুঝেছ দেবেশ। তবে কি জান, আমার ঘরে অন্যের উনুনশালের ধোঁয়া সইব কেন? এ তেমনি। (একটা চেয়ার টেনে বসে) এখন ব্যাপারটার কি করা যায় বলুন তো অতুলদা?

অতুল। কোন্ ব্যাপারটার?

অলক। এই বাড়িটাকে বাঁচানোর ব্যাপারটা।

অতুল। (নিস্পৃহভাবে) উপায় দেখছি না। উপায় খোঁজার মত মনও নেই আমার অলক। আমি...আমি সুস্থ...হ্যাঁ, সুস্থ হবার চেষ্টা করছি। এখন এসব বালাই!

[চন্দ্রার প্রস্থান]

অলক। আমার মনে হয় একটা উপায় হয়তো আছে। (বাইরে মোটরের শব্দ) ওই কারা এলেন। দেবেশ, দেখ না একবার বেরিয়ে। তেমন কেউ হলে বিদায় কর।

[দেবেশের প্রস্থান]

অলক। শুনুন মিস্টার গুপ্ত, আমি একটা প্রস্তাব করি।

অতুল। বল।

অলক। ডাক্তার রাহার মেয়ের সঙ্গে দেবেশের বিয়ে দিয়ে দিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। অনুমতি করেন তো আমিই ঘটকালি করি।

অতুল। ওঁরা রাজী হবেন কেন?

অলক। রাজী—আলবত রাজী হবেন। সে ভার আমার।

অলক। (অতুলবাবুর দিকে চেয়ে) আপনি রাজী তো?

অতুল। আমি তো কোন পক্ষই নই ভাই। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? এ বিয়ের যারা পক্ষ তাদের মতটাই মত। (সহসা অন্যমনস্ক হয়ে) কুয়াশাটা হঠাৎ কেমন উবে গেল দেখেছ? আজ রাতটা খুব পরিষ্কার হবে, না?

[ডাক্তার রাহা ও রুমীর প্রবেশ]

অলক। এই যে, কি ভাগ্য! আসুন আসুন! আমি ভাবতেই পারি নি। এখন যে আপনার ভিজিটিং আওয়ার্স ডাক্তার রাহা! (ডাক্তার রাহা রোগীর বিছানাতেই বসে পড়লেন। রুমী মাটিতেই বসে পড়ল)

অলক। (রুমীর দিকে) ও কি! ওই চেয়ারে বস।

রুমী। (ম্লান হেসে) না থাক্, বেশ আছি।

[আচ্ছন্নের মত দেবেশের দিকে চেয়ে রইল]

ডাঃ রাহা। হ্যাঁ, ভিজিটিং আওয়ার্স বটে। তবে কি জানেন অলকবাবু, সব সময় মানুষের কি টাকা কুড়োতে ভাল লাগে? স্নেহ প্রীতি কুড়োবার জন্যে মাঝে মাঝে হাত খালি রাখতে তো

অলক। বাঃ, কি সুন্দর বলেছেন আপনি। (অলক উঠে নিজের চেয়ারটা ডাঃ রাহাকে বসতে দিয়ে, রুমীর দিকে চেয়ে) চল, তোমাকে ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখাই।

[রুমী আচ্ছন্নের মত উঠে অলকের সঙ্গে বেরিয়ে গেল]

দেবেশ। (ডাঃ রাহার দিকে চেয়ে) আজ সকালে কিছুক্ষণ আগে আপনার সমন পেয়েছি।

ডাঃ রাহা। (বিস্মিত হয়ে) সমন? কিসের সমন?

দেবেশ। (গম্ভীর হয়ে) আমাদের বাড়ি থেকে উঠিয়ে দিয়ে আপনি দেনার দায়ে এই বাড়ি দখল করতে চান বলে যে মামলা করেছেন সেই মামলার সমন—

ডাঃ রাহা। (অবাক হয়ে) ও হোঃ দেখ, অদৃষ্টের কি পরিহাস! আমি তো উকিলকে মামলা রুজু করতে বলি নি। বণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে কবে তা জানি না। হয়তো মেয়াদ শেষ হয়েছে বলে তিনি রুজু দিয়েছেন মামলা। এসব যন্ত্রের মত চলে বুঝলে বাবাজী সংসারের চাকারও তো মোমেণ্টাম আছে। এসব তারই ফল। (মৃদু হেসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, মুহূর্ত পরে) দুঃখ কর না বাবাজী, সংসারের ব্যাপারগুলো কানামাছির মত কে কোন্‌দিকে ওড়ে তার ঠিক নেই। তারা কখনো

বেঁধে ওড়ে না একদিকে। তা যাক, কে চিকিৎসা ছেন ?

অতুল। তুমি ওকে ভুল বুঝো না দেবেশ। ডাক্তার আমার শৈশবের সহপাঠী, যৌবনের বন্ধু—হ্যাঁ, বন্ধু। ...জনের সময় এত টাকা বন্ধু বলেই দিয়েছিলেন। ...জন কথাটা বললাম বলে লজ্জা পেয়ো না। লজ্জাটা ...র, তোমার নয়। তুমি রুমীর সঙ্গে আলাপ কর ...। ওকে দেখেছিলাম আজ বিশ বছর আগে। ... ও সবে জন্মেছে। একমাথা চুল নিয়ে জন্মেছিল— মনে আছে।

[দেবেশের প্রস্থান]

অতুল। তুমি যা বললে তা সত্যিই রণেন ? তোমার ...ল রুটিন মাফিক মামলা করেছে ? তোমার বুঝি ...ক মামলা ? নিজে দেখার সময় পাও না ?

ডাঃ রাহা। হ্যাঁ, অনেক মামলা। অনেক বাড়ি, অনেক মামলা, তা ছাড়া ছোটখাটো কল-কারখানা, ...জমিও আছে। উকিলকে বরাবরের জন্যে মোক্তারনামা দেওয়া আছে। তোমার কেসটা নিছক ... বিশ্বাস কর আমায়।

অতুল। আমি কাউকে কোনদিন অবিশ্বাস করি নি ...। নিজেকেও না। দেখেছ তার পরিণতি !

ডাঃ রাহা। কি হয়েছে তোমার ? দাঁড়াও, আমি ...র দেখি।

অতুল। তোমার ফীস্ দেবার ক্ষমতা নেই আমার।

ডাঃ রাহা। ফীস্ ? এসব তুমি বল না অতুল। ...হ—এই বাড়িটা যখন তুমি জোর করে বাঁধা রাখলে ...থেকে আমি আসি নি। সময় পাই নি। সেদিনই ...ছলাম বাড়ি বাঁধা রেখ না। শুধু হাতেই নিতে ...ছলাম টাকা। তুমিই তো ছাড়লে না—তুমিই ...লে না, তা হয় না। জোর করে দস্তু তৈরি করালে ... কিছু বাঁধা না রেখে নিতে তোমার আত্মসম্মানে ...ছল, তাই না ?

অতুল। হ্যাঁ। আচ্ছা, একবার দেখ তো ভাই ... করে রোগটা কী। (ডাঃ রাহাকে মেডিক্যাল ...উগুলো দিলেন) কি দেখলে ?

ডাঃ রাহা। এ...থেকে আমি তো কিছুই পাচ্ছি না। ...চাপ একটু বেশী মনে হচ্ছে। কে দেখছেন ?

অতুল। পাড়ার ডাক্তার, আর—আর ডাক্তার শমীজিৎ রায়—

ডাঃ রাহা। কে তিনি ?

অতুল। সাইকো-অ্যানালিস্ট।

ডাঃ রাহা। উঃ, ওই এক শয়তান !

অতুল। ভদ্রলোক খুব ভাল। টাকাও নেন না। বরং ভেতরে ভেতরে সাহায্যই করেন। জমিদার লোক। দেশে প্রচুর সম্পত্তি। এটা ওঁর শখ। তা ছাড়া একটু যেন কমেওছে মনে হচ্ছে।

ডাঃ রাহা। জানি না বাপু। আমার ওসব সহ্য হয় না। থাক্ সে কথা। তাই যদি হয়—যদি তোমার মনেরই রোগ হয়, তা হলে তা সারাতে গেলে সংসারে তো শান্তি চাই।

অতুল। ঠিক বলেছ। কিন্তু পাচ্ছি কোথায় বল ?

ডাঃ রাহা। শান্তির কংক্রীট ভিত চাই। শান্তি তো দখিনা হাওয়ার মত সময় হলে ঘরে ঢোকে না।

অতুল। আমি তো ভেবে পাই না কি করে কি হবে ?

ডাঃ রাহা। ছেলের বিয়ে দাও।

অতুল। কিন্তু তোমার মামলা—আর দেবেশের বিয়ে। এ দুটোর মীমাংসা একসঙ্গে কি করে হবে ?

ডাঃ রাহা। মামলা ? আরে ও তো অটোমেটিক ব্যাপার। কল টিপলেই থেমে যাবে।

অতুল। দেবেশের বিয়ে ! কি করে জানব ও বিয়ে করবে কি না। তা ছাড়া, আমি তো অক্ষম। চেষ্টা করব কী করে, কখন, আর কোথায় ?

ডাঃ রাহা। (গভীর চিন্তার ভান করে) তাই তো। (কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন) হয়েছে, ব্যবস্থা হয়েছে। বিয়ে দেবে রুমীর সঙ্গে ? তাহলে এক ঢিলে দু পাখি মারা পড়বে। বিয়েটাও হয়ে যাবে, দেনার দুশ্চিন্তা থেকে তুমিও নিশ্চিন্ত হবে।

অতুল। সত্যিই তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম আমি। আমার আপত্তি থাকবে কেন ? এটা তোমার উদারতা। কিন্তু ওরা পরস্পরকে তো চেনেই না, বিয়ে করবে কি ?

ডাঃ রাহা। চে-চে-চে, চেনা ! আজকালকার ছেলে-মেয়েদের আবার চেনা ! আজকাল ছেলেরা অক্সিজেন

আর মেয়েরা অ্যাসিটিলিন গ্যাস—এক জায়গায় এলেই ফ্লেম!

অতুল। (মৃদু হাসলেন) তা হবে। আমি কিন্তু দেবেশকে রুমীর সঙ্গে আলাপ করতে পাঠিয়েছি এ সব না ভেবেই। ওকে সরাতে চেয়েছিলাম আমাদের আলোচনা থেকে।

ডাঃ রাহা। আরে, সে কি বলছি আমি। আমি ডাক্তার। আমি সংসারের অনেক দিকের অনেক হদিস রাখি। তুমি বিদ্বান লোক—বিদ্যার সমুদ্রে ভাসছ। তোমার এসব দেখবার মত কি মনের অবস্থা? তা যাক, তাহলে রাজী?

অতুল। ওরা যদি পরস্পরকে এড়িয়ে না যেতে চায় তো নিশ্চয়ই।

ডাঃ রাহা। উপযুক্ত ক্যাটালিস্ট দরকার। তা হলেই রসায়ন পর্বটা—যাক—(ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আজ উঠি। দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। রুমী কিছুক্ষণ থাক। তোমাদের সকলেরই সঙ্গে পরিচয় হোক ওর। পরে গাড়িখানা পাঠিয়ে দেব। দেখি, উকিলকে ধমক দিয়ে পাঠাই। তার জানা উচিত ছিল অতুলবাবু আমার বন্ধু।

অতুল। তার কি দোষ বল? সে তার কর্তব্য করেছে।

ডাঃ রাহা। কর্তব্য? কর্তব্য যন্ত্রের মত করা যায় না। যন্ত্রের কর্তব্য আছে? আচ্ছা আসি আজ। আবার দেখা হবে।

[ডাঃ রাহার প্রস্থানের পর]

অতুল। ভেবেছিলাম আজ পরিষ্কার রাতে একবার আকাশটা ভাল করে দেখব। মাথার ওপর যে আকাশটা ছড়িয়ে রয়েছে সেই আকাশটাকে দেখব একা একা। কিন্তু ঘুম পাচ্ছে।

[অতুলবাবু তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন]

[রুমী আর অলক ফিরে এল]

রুমী। পারব না।

অলক। পারতেই হবে।

রুমী। ওঁকে দেখার পর আর ওঁকে ঠকাতে ইচ্ছে করে না।

বলেছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে আজ না হোক, ছ মাস সাত মাস পরে কি হবে ভাব দেখি? বাঁচতেই হবে তোমাকে। এটা আত্মরক্ষা। আত্মানম্ সততং রক্ষেৎ।

রুমী। দেব ভাষাটার অপমান করো না। বলিহারি অভ্যাস! দুটো মানুষ কি করে একই দেহে নির্বিবাদে বাস করছে। যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি।

অলক। সবাই দুটো রুমঝুম। তুমিও, আমিও। একই গাড়িতে দুটো ভিন্নপথগামী ঘোড়া। দুজনকে একসঙ্গে জুতে তবে জীবনের গাড়িটাকে চালাতে হয়। কি দেখছ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে?

রুমী। এখন ভাবছি কেন তোমাকে দেখি নি এতদিন!

অলক। (বিরক্ত ভাবে) কী সব বলছ প্রলাপের মত?

রুমী। না, দেখি নি। সত্যিই বলছি দেখি নি।

অলক। (বিদ্রূপ করে) দেখ নি?

রুমী। না। আজ যেমন সকালবেলায় দেবেশকে দেখলাম। মনে হচ্ছে খুব কাঁদি। হাউ হাউ করে কাঁদি। মনে হচ্ছে ওকে আগে দেখলাম না কেন? (মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল খুব নিম্নস্বরে)

অলক। ভালই তো, ওর সঙ্গেই তো বিয়ের ব্যবস্থা করছি। কাঁদছ কেন?…ও কি, থামছ না কেন? এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে। চোখ মোছ। দেখ দেখি তোমার জন্যে কতদূর পর্যন্ত জাল বিছিয়ে দিয়েছি। এটা জালিয়াতি নয়। এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে সকলেরই ভাল। দেবেশের ভাল, চন্দ্রার ভাল, অতুলবাবুর ভাল, এখন দেখছি তোমারও ভাল। তাতেও মন উঠছে না তোমার?

রুমী। না না না, ওকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

অলক। পাগলামি কর না রুমী। তোমার বাবা জেনেছেন তোমার অবস্থা রীতিমত ডাক্তারী পরীক্ষা করে।

রুমী। জানি।

অলক। এ অবস্থায় আপত্তি করলে তিনি উন্মাদের মত কী যে করে বসবেন তা ভাবতেও আমার ভয় হয়।

রুমী। তোমার ভয় নেই সাধুপুরুষ। তোমার

লক। করলেও কেউ বিশ্বাস করত না।

ন্মী। করত করত, আমি বললে করত। আমি ার নাম ইচ্ছে করে করি নি। ঘৃণায় করি নি। ; টের পেলাম সেদিন তোমার দিকে চেয়ে আমার ল। তারপর থেকে দিনরাত্রি ভাবছি—ঘুমের মধ্যে দেশে আমি কোন্ দেবতার সঙ্গে মিলিত চলাম!

লক। (তিক্ত কণ্ঠে) বেশ তো, সেই দেবতার বসাও দেবেশকে।

রুমী। ওকে আমি অপমান করতে পারব না।

অলক। বাঃ! এর মধ্যেই? কি দেখলে ওর মধ্যে? র মধ্যে যা দেখেছিলে তাই?

রুমী। কিচ্ছু দেখি নি তোমার মধ্যে। তোমাকে দেখি নি। আজও আমার চোখ দেখতে চাইছে মাকে। ভেবেছিলাম শ্লীলতার গণ্ডীটা ছাড়িয়ে না। তাই যাব তোমাকে স্পষ্ট কথাটাই বলতে আমায়। তোমাকে দেখেছিলাম নেশায় আচ্ছন্ন শুধু একটা···ছিঃ ছিঃ, পশু। পশু!

নেপথ্যে দেবেশের কণ্ঠস্বর—"অলকবাবু—"]

অলক। (একবার শিউরে উঠে) "দ্যাবা পৃথিব্যো া.পৃথিব্যো···মনে পড়ছে না···বিদ মন্ত্রং ছি···ছি ছি —ব্যাপ্তংত্বয়ৈ···কেন···কেন দিশশ্চ সর্বাঃ···রূপমুগ্রম ং—ভবে···ত্বদেদং···দৃষ্ট্বা···

[দেবেশের প্রবেশ]

অলক। (দেবেশকে দেখে) এই যে এসে গেছ! ং, বাঁচলাম। আমার আবার আহ্নিকের সময় হয়ে । আমি যাই। তোমরা আলাপ কর।

দেবেশ। (হাসতে হাসতে) এখানেও সেই তন্ত্র-স্যা চলেছে আপনার?

অলক। (যেন দেবেশের কথা শুনতে পায় নি এমনি ন করে) শোন রুমী, মলিন থেকে শুদ্ধতে পৌঁছতে ব। এটাই তন্ত্রের পথ।

রুমী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে রইল। দেবেশ কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না যেন। ঝরনার প্রবেশ]

ঝরনা। তোমরা সব কী বল তো? বাড়িময় খুঁজে বেড়াচ্ছি। চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

দেবেশ। এই অপকৃষ্ট সাধনার পথে তুমি নিজেই নিজেকে টেনে এনেছ।

ঝরনা। কোথায় কি বলতে হয় তা তুমি কিছুতেই শিখবে না দেবেশ।

দেবেশ। (রুমীর দিকে চেয়ে) আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই—ঝরনা দেবী, বাবার বন্ধুর একমাত্র মেয়ে রুমী।

ঝরনা। নমস্কার। একবার যখন এ বাড়ির পথটা চিনেছেন, তখন নিশ্চয়ই আর ভুলে যাবেন না।

রুমী। (ভাবের ঘোরে) ভুলব? না না, ভুলব কেন? এই পথটাই তো খুঁজছিলাম এতদিন।

[ঝরনা দেবেশের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল]

দেবেশ। (ঝরনার দিকে চেয়ে নিম্নস্বরে) তোমার আর একজন রোগী মনে করছ নাকি?

ঝরনা। (নিম্নস্বরে দেবেশের দিকে) দেখ, সাবধানে কথা বল। কথা শেষ করেই এস ওকে সঙ্গে নিয়ে।

দেবেশ। কথা আপনা থেকেই শেষ হয়। মানুষ তাকে শেষ করতে পারে?

ঝরনা। পারে অনেক সময়, পারতেই হয়। দেরি করো না, বুঝলে? (রুমীর দিকে স্পষ্টস্বরে) আপনারা আলাপ সেরে আসুন। (হেসে) ততক্ষণ আমার ধৈর্য থাকবে। আমি নার্স। ধৈর্যই আমার ধর্ম।

[প্রস্থান]

রুমী। নার্স? তবে তো এ বাড়িতে আমার আর আসা চলবে না।

দেবেশ। না রুমী দেবী, ও সে নার্স নয় যে নার্সকে আমরা সবাই চিনি। ও সেই নার্স যাকে আমরা জীবনে সতত খুঁজে বেড়াই।

রুমী। (তখনও ঘোরে আচ্ছন্ন) আপনি বুঝি ওকে ভালবাসেন?

দেবেশ। প্রশ্নটা আমার পছন্দ হল না রুমী দেবী। আমি প্রথম আলাপেই এ ধরনের কথা আশা করি নি।

রুমী। ক্ষমা করবেন, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। আমার শরীরটা ভাল নেই, মনটাও বশে নেই, ভাষাটা তো নয়ই। (কাঁদ-কাঁদ হয়ে) আমায় ক্ষমা করুন।

দেবেশ। আমায় আর লজ্জা দেবেন না রুমী দেবী।

কুমী। দেবী নয়, দেবী নয়, আমি কুমী। আমায় আপনি পাগল ভাবছেন, না? আমি পাগল নই। আপনাকে দেখার পর থেকে আমার মনের রাশ নেই। কিছুতেই নিজেকে গুছিয়ে তুলতে পারছি না। যত বার সভ্যভব্য হবার চেষ্টা করছি তত বারই ঘুমের হাতে বেসামাল কাপড়চোপড়ের মত আমার ভব্যতা যাচ্ছে খসে। শুনেছি আপনি গুণী লোক। মার্জনা করুন আমার অপরাধ।

দেবেশ। (যেন বুঝতে পেরে, সস্নেহে) না না, পাগল ভাবব কেন? স্বাভাবিক তো স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড, যা কিছু স্ট্যাণ্ডার্ডে পড়বে না, তাকেই কি আমরা পাগল বলে উড়িয়ে দেব?

কুমী। একটা কথা বলতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। যদি খারাপ না ভাবেন তো বলি।

দেবেশ। বলুন, খারাপ ভাবব কেন?

কুমী। (কিছুক্ষণ থেমে) আচ্ছা, আমি যদি এখানে বসে পড়ি তাহলে অভদ্রতা হবে?

[ভেঙে পড়তে যাচ্ছিল, দেবেশ হাতটা ধরে ফেলল]

দেবেশ। চলুন, ঘরে বসবেন। আপনি অসুস্থ।

কুমী। এইখানে একটু দাঁড়াই। আপনি হাত ধরলেন—সঙ্গে সঙ্গে কি অনুভব করলাম জানেন!

দেবেশ। গায়ে হাত দেবার জন্যে বেয়াদবি মাপ করবেন। আমি অসুস্থ ভেবেছিলাম।

কুমী। হাঁ, আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি। কিংবা হঠাৎ আমার অসুস্থতা কেটে যাচ্ছে। কি হচ্ছে বুঝছি না ঠিক। আপনি যখন হাত ধরে আমাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালেন··· বাঁচালেন (খুব ধীরে ধীরে) তখন···তখন··· মনে হল···আমি আমার ঘাটে···পৌঁছে···গেছি—

[প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেল]

ডীপ স্টেজ

[জ্যোৎস্না রাত্রি। দেবেশ বাড়ির বারান্দায়। সামনে আকাশ]

দেবেশ। (স্বগতঃ) কিন্তু কেন? জোর করে নিজের ইচ্ছায় আমি চলতে পারি না কেন?···কেন পার না? তুমি পুরুষ। তোমার বিদ্যা আছে, স্বাস্থ্য আছে, বুদ্ধি আছে। তবে?

পারি না। চন্দ্রা সামনে এলেই আমার সব শক্তি যেন কোন্ অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। নির্জীব হয়ে পড়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে মন। ও যত আঘাত দেয় ততই মন তার পিঠ বাড়িয়ে দেয় যেন আরও আঘাতের লোভে। আঘাত হেনে যখন ও চলে যায় তখন আমি নিজের ব্যবহারে নিজেই অবাক হয়ে যাই। ও ইচ্ছে করলে আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারে। চুপ চুপ, নিজেকে আর জানতে চেয়ো না। এখানেই থাম। আর এগিয়ো না। তোমার প্রতি রোমকূপে আকাশের চাঁদ ভেঙে চূর্ণ হয়ে রজত ধূলির মত প্রবেশ করেছে। আকাশের চাঁদ নয়—চন্দ্রা।

না না না, তা হবে কেন? কেন ওকে ভয় করি। কিসের ভয়? বুঝি না। অদ্ভুত ভয়!

শুধু ভয়? অন্য কাউকে ভালবাস না কেন? ঝরনাকে তো ভালবাসতে পার।···পারি। এক একবার মনে হয় নিজেকে ওর হাতে তুলে দিই। তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ব্রতচারিণী পূজার ঘরে প্রদীপের যেমন যত্ন করে তেমনি ও সযত্নে আমাকে জ্বালিয়ে রেখে দেবে। জানি। শুধু পারছি না। ঝরনা যদি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত এই অদৃশ্য নোঙরের রশিটাকে ছিঁড়ে দিয়ে! যদি ভাসিয়ে নিয়ে যেত! ভেঙেচুরে উদ্দাম নেশার ঝড়ে! কিন্তু ও তা নয়। ও স্থির হয়ে সেবার হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বসে রয়েছে। ধরতে জানে না জোর করে।

[চন্দ্রার প্রবেশ]

চন্দ্রা। একটা কথা রাখবে দেবেশ?

দেবেশ। কি, বলুন।

চন্দ্রা। কুমীকে তুমি বিয়ে কর দেবেশ।

দেবেশ। আমার জীবনে নারীর প্রয়োজন বুঝি নি এখনও।

চন্দ্রা। মিথ্যে বলো না দেবেশ। তোমার সমস্ত দেহ-মন নারীর জন্যে আকুল।

দেবেশ। মিথ্যে কল্পনা।

চন্দ্রা। আমি জানি বলেই বলছি। কুমীকে বিয়ে তোমায় করতেই হবে।

দেবেশ। পারব না।

চন্দ্রা। পারতেই হবে। আমি বলছি পারতেই হবে। আর তো এই মাসের মাঝে। দরকার হলে কালই।

বেশ। আবার স্বাধীনতায় কেন অযথা হস্তক্ষেপ ।?

া। ও সব ছেঁদো কথা দিয়ে তুমি আমাকে । করতে পারবে না। এ বিয়ে তোমাকে করতেই

বেশ। না—না—না।

া। (সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে) মুক্তি—মুক্তি। আমায় ।ও।

বেশ। (বিভ্রান্ত, শঙ্কিত, পীড়িত)···সব গুলিয়ে আমার। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

া। (মায়াকোমল স্বরে) রাগ করো না দেবেশ এসে নৌকোটা ডুবে যাবে? বিয়ে কর। আমি াই। সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাক। কেন মিছিমিছি চ্ছ নিজেকে। তুমি সংসার পাত, আমি সব গুছিয়ে দেখে আনন্দ করব। তুমি সুখী হবে। সেই কে শক্তি পাবে কাজে। (স্বপ্নাতুরের ভঙ্গীতে) র খ্যাতি হবে। গৌরব বাড়বে দেশের তোমার তে। সেই খ্যাতি ছড়িয়ে যাবে দেশ পেরিয়ে । সেই গৌরবের প্রতিবিম্ব দেখব আমি সকলের । দেখে তৃপ্তি পাব। তুমি রাজী হও দেবেশ। শ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে। অপসৃয়মাণ র দিকে চেয়ে) এ বিয়ে তোমাকে করাবই। র তোমাকে ভেঙে চুরমার করে দেব। (দেবেশ । দ্রুত দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল) কিন্তু কেন? কেন বয়ে করবে না রুমীকে? রুমীকে বিয়ে করার ্তি আছে। যুক্তি মানবে না? কেন অন্ধ—অন্ধ র জলায় ডুবে মরছ? কেন? আমি নিজে ায় ডুবেছি আকণ্ঠ। তোমাকে ডুবতে দেব না।

[প্রস্থান]

ফ্রণ্ট স্টেজ

াহার বাড়ির বারান্দা: সুরমা (রুমীর মা) রুমীর পেক্ষা করছেন। অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন কখনও। কখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভা ছেন। ডাঃ রাহার প্রবেশ]

: রাহা। আমি কাজ এগিয়ে দিয়েছি। আমি কম চান্স নিই না। প্রথম সমনে ওরা কোর্টে হাজির হয় নি। সঙ্গে দ্বিতীয় সমন পাঠানো হয়। সাতদিন পরে তার তারিখ ছিল। রায় বেরিয়ে গেছে। আগামী মাসের প্রথম দিকে ওদের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আগেই তারিখটা করিয়ে নিতে পারতাম। এ মাসের ৩১শে একটা বিয়ের দিন আছে।

সুরমা। এতটা করতে গেলে কেন?

ডাঃ রাহা। আমি ওদের এ ব্যাপারে বেশীদিন ভাববার অবকাশ দিতে পারি না। যত দেরি হবে—(বিরক্ত হয়ে) তুমি ন্যাকার ভান করছ কেন? জান না?··· ৩০ তারিখে নোটিশ যাবে। ৩১শে বিয়ের দিন। না হয় ১লা গেট্ আউট।

সুরমা। তুমি এতটা অধীর হয়ে উঠলে কেন?

ডাঃ রাহা। অধীর হব না? মনে কর যদি বিয়ে না হয়!

সুরমা। না হয় না হবে—মেয়ে আর নতুনটাকে নিয়ে যেমন সংসার করছি আমি তেমনিই সংসার করব, এখানে না থাকতে দাও, তোমার কালিম্পঙের বাড়িতে চলে যাব।

[প্রায় টলতে টলতে রুমীর প্রবেশ]

ডাঃ রাহা। শাট আপ। রুমী, দেবেশের মত পেয়েছিস তুই? (রুমী চুপ করে রইল) অসহ্য, চুপ করে কেন?

সুরমা। তুমি কী? ও কি জবাব দিতে পারে এ প্রশ্নের?

ডাঃ রাহা। কে পারবে? আমি? যে একজনকে ভোলাতে পারে সে অন্যকেও ভোলাতে পারে।

সুরমা। চল রুমী, আমরা বেরিয়ে যাই।

ডাঃ রাহা। যেখানে যাবে যাও—কিন্তু আমি বড়জোর আর এক সপ্তাহের সময় দিতে পারি। তার বেশী নয়। (তিক্ত কণ্ঠে) বড় অপরাধ করছি না? সুন্দর শিক্ষিত পাত্র যোগাড় করে দিচ্ছি। লজ্জা ঢেকে দিচ্ছি। বিস্ত দিচ্ছি না। তার ওপর সুদসমেত বারো হাজার টাকার পণ দিচ্ছি বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে—সব খুব অপরাধ হচ্ছে না? নেমকহারাম। যাক গে, তোমরাই থাক ঘরে, আমি যাচ্ছি। শুধু জেনে রাখ, সাতদিনের মধ্যে ঠিক না করতে পারলে আমি ভয়ঙ্কর কিছু করে বসব।

সুরমা। পাগল হয়ে গেছ নাকি?

ডাঃ রাহা। পাগল! হব না? কে জানত আমার নিজের পরিবারে এমন ঘটবে? ওকে আমি বুকে করে মানুষ করেছি সুরমা। যদিও ও চিরকাল আমার থেকে দূরে রয়ে গেছে। (আপন মনে) না না, আমি তা পারব না। পারব না। তার চেয়ে (জ্বলে উঠে) খুন করব ওকে।

[দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল]

রুমী। (ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে) আমি মরতে চাই না মা। কিছুদিন আগে হলে মরতে ভয় হত না। ওকে—দেবেশকে দেখার পর আর আমার মরতে মন সরে না। জানি বিয়ে হবে না। শুধু বেঁচে থাকলে দেখতে পাব। ওকে দেখবার জন্যেই আমার বাঁচা। আমাকে বাঁচাও মা।

সুরমা। ঠিক তোকে ভালবাসবে ও। দেখিস, আমার মন বলছে। এত ভাল তুই রুমী—এ কাজ তুই কি করে করলি? কে তোর সর্বনাশ করলে! নাম বল্ তার। না হয় তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। তা সে যেই হোক না কেন। বল্ মা—তোর কষ্ট আর যে দেখতে পারি না।

রুমী। আমি তাকে চাই না। তাকে ভাবতে চাই না, মনে রাখতে চাই না। নিজেকে আমি দিনরাত বোঝাচ্ছি মা, আমি তাকে জানি না, দেখি নি—কোনদিন যেন দেখি নি তাকে। সত্যিই কোনদিন আমি চেয়ে দেখি নি তাকে।

সুরমা। (স্থির হয়ে চেয়ে) মাঝে মাঝে তোর ওপর ঘৃণা হয় রুমী। যদি নিজে মরে তোর এই কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত হত তো তাই নিজেই মরতাম।

[নেপথ্যে ডাঃ রাহা। বেরোও সামনে থেকে, বেরোও। কত বয়েস? ষোল? বেরোও শীগগির, বেরোও। আমি আর এসব কাজ করি না। করি না, বুঝলে? দশ হাজার টাকার বিনিময়েও করি না। বেরোও—]

সুরমা। পড়ে পড়ে কাঁদ্। সময় বয়ে যাক। দিন বয়ে যাক—মাস বয়ে যাক। তারপর? কাঁদ, কাঁদ, পড়ে পড়ে শুধু কাঁদ! (দু হাতে মুখ ঢেকে প্রস্থান। [illegible]।)

[রুমী চলে যাচ্ছে এমন সময় অলকের প্রবেশ]

অলক। কথাগুলো একটু দাঁড়িয়ে শোন।

রুমী। (দাঁড়িয়ে) বল।

অলক। তাড়াতাড়ি দেবেশের মত করাতে হবে। তাড়াতাড়ি ওর কথা আদায় করতে হবে। তোমার বাবা এই বাড়ির মামলাটাকে বেশীদিন ঝুলিয়ে রাখবেন না। কত কাণ্ড করে এসব ব্যবস্থা করলাম। এ বিয়েতে কত সমস্যার সমাধান হবে। তুমি বাঁচবে, তোমার বাবার ইজ্জত বাঁচবে। অতুলবাবু বাঁচবেন। চন্দ্রা বাঁচবে।

রুমী। (বিদ্রূপের স্বরে) আর তুমি?

অলক। আমি তো এত সব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারতাম।

রুমী। ভগবানের নাম নিয়ে?

অলক। হ্যাঁ, ভুল কে না করে! একবার পদস্খলন হলে কি আর মানুষ সে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না? পারতেই হবে। আমি পারব।

রুমী। (মুগ্ধের মত) আমি পারব না। আমি ওঁকে ভালবেসেছি।

অলক। (বিস্মিত) তার মানে?

রুমী। যখন ওঁকে জানতাম না, যখন দেখি নি তখন তোমাকেও আমি জানতে পারি নি, দেখতে পাই নি। আজ ওঁকে জেনেছি, দেখেছি। তাই তোমাকে জেনেছি, তোমাকে দেখেছি। নিজেকে জানছি, নিজেকে দেখছি।

অলক। (শঙ্কিত) 'পারব না' বললে যে একুল ওকুল কি পারবে না?

রুমী। আমি ওঁকে বিয়ে করতে পারব না।

অলক। (দারুণ বিরক্ত হয়ে) তার মানে?

রুমী। তার মানে ওঁর সঙ্গে কোন কপট আচরণ আমার চিন্তার বাইরে।

অলক। কি বলছ আবোলতাবোল? ওর মত তোমাকে করাতেই হবে। তা ছাড়া ও তো নিজেই কপট। নিজের ভাবকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। জান না ও কার প্রতি আকৃষ্ট?

রুমী। ও আমাকে ঠেলে ফেলে দেবে সে আমি সইতে পারব না।

অলক। একটু গায়ে পড়লে ও তোমাকে ঠেলে [illegible]তে পারবে না।

রুমী। তুমি ঠেলতে পারলে কি করে?

অলক। আমি সন্ন্যাসী। আমি কি বিয়ে করব?

রুমী। তুমি বিয়ে করতে চাইলেও আমি তোমাকে [illegible]বলে স্বীকার করতে পারতাম না। ওকে ভালবেসে [illegible] তোমাকে ঘৃণা করতে শিখেছি।

অলক। ঘৃণা! এই আমাকেই তো—

রুমী। তখন সব দৃষ্টি বিলুপ্ত ছিল দু জোড়া চোখেরই—[illegible]াইরের, কি ভিতরের। যেন ভূমিকম্পের রাত্রে শুধু [illegible] বাড়িয়ে একটা মানুষ চেয়েছি, সে যেই হোক। [illegible]না, আমি চাই নি। আমি চাইতে পারি না। [illegible]কে অন্ধ করে দিয়ে আমার ভেতরের যে মৃত্যু সে [illegible]ছে। আমার ভেতরের যে শত্রু সে চেয়েছে। [illegible]কে ধ্বংস করতে চেয়েছে। আমি আর নিজেকে [illegible]হতে দেব না। আমি সৃষ্টিকে দেখেছি।

অলক। তোমার মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। [illegible] ভেবেচিন্তে কাজ কর। মাথা জিনিসটাকে আলগা [illegible] সে গড়গড় করে যেদিকে গড়িয়ে যাবে, বুঝলে!

রুমী। (অবহেলায়) হুঁ।

[এগিয়ে যাচ্ছে]

অলক। কোথায় যাচ্ছ?

রুমী। তাঁর কাছে।

অলক। কার কাছে?

রুমী। তিনি একজনই আছেন।

[বেরিয়ে গেল]

অলক। (অসহায় ভঙ্গীতে) স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্! যাক দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।

মিড স্টেজ

তুলবাবুর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় দেবেশ বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চন্দ্রার প্রবেশ]

চন্দ্রা। শেষ কথা বলে দিয়েছ?

দেবেশ। ও বুঝেই গেছে। আমাকে বলতেও [illegible]নি।

চন্দ্রা। তুমি আমাকে মুক্তি দেবে না?

দেবেশ। এ ব্যাপারের সঙ্গে আপনার মুক্তিটা কি করে জড়িত, বুঝতে পারলাম না।

চন্দ্রা। আমি জানি যে তুমি এত নির্বোধ নও যে আমার কথা বুঝতে পার না।

দেবেশ। (মুখ নীচু করে) আপনার কথা আমি কোনদিনই বুঝি নি, আজকেও না।

চন্দ্রা। দেখ আমার দিকে চেয়ে। সোজা স্পষ্ট করে বল, আমাকে তুমি মুক্তি দেবে কি না।

দেবেশ। (তেমনি অবস্থায়) আপনার কিসে মুক্তি, কিসে বন্ধন, সে খোঁজে আমার প্রয়োজন নেই। এ বিয়ে আমি করতে পারব না।

চন্দ্রা। আমি না বলেছিলাম রুমীকে বিয়ে তোমাকে করতেই হবে?

দেবেশ। (মুখ তুলে দৃঢ়কণ্ঠে) আমার ওপর এতটা আপনার প্রভাব এ ধারণা জন্মাল কেমন করে? আমার ওপর কারও প্রভাব নেই। আমি স্বাধীন।

চন্দ্রা। তুমি এমন কিছু অমূল্য সম্পদ নও যে তোমার উপর অবাধ প্রভুত্ব করে তৃপ্তি হবে কারও। পৌরুষের বড়াই করছ! বিয়ে না করলে তুমি এই বাড়ি বাঁচাতে পারবে?

দেবেশ। যাক বাড়ি, তবুও আপনার আদেশ অন্যায় জেনে আমি পালন করব না। আপনি দেখছেন শুধু স্বার্থটা। এতটা নেমে গেছেন যে গোপনে আসবাব বিক্রি করে দিচ্ছেন। আপনি আমাকে বলি দিয়ে বাড়িটা বাঁচাতে চান? এই কুটিল বিষয়-বুদ্ধির চক্রান্তে আমি আপনার কথা শুনতে রাজী নই।

চন্দ্রা। (স্তম্ভিত হয়ে) বিষয়বুদ্ধি!

দেবেশ। বিষয়বুদ্ধি ছাড়া আর কি? যখন মানুষের চেয়ে বড় হয় সম্পত্তি, বড় হয় সামগ্রী, তখন তার মধ্যে কোন্ মহৎ বুদ্ধি কাজ করে? তা ছাড়া—

চন্দ্রা। (ক্রোধে জ্বলে উঠে) তা ছাড়া কি?

দেবেশ। আমাকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছেন আপনি আপনার গুপ্ত জীবনের ধারাকে নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে।

চন্দ্রা। চুপ কর। গুপ্ত জীবন? কি জান তুমি আমার গুপ্ত জীবনের?

দেবেশ। জানি, সবাই জানে—বাবা ছাড়া। যাক, সে লজ্জার কথা নাই বা প্রকাশ করলাম। ঢাকা থাক্।

চন্দ্রা। যদি তাই হয়, তারও কারণ আছে। সে দোষ তোমাদের, আমার নয়। কিন্তু—কিন্তু তোমার হিংসা কেন?

দেবেশ। হিংসা! তার মানে?

চন্দ্রা। তার মানে তুমি আমাকে চাও। আমি তোমাকে চাই না। তুমি আমার দুর্গ্রহের মত, বিশ্বগ্রাসী গ্রহণের ছায়ার মত তুমি আমাকে সর্বদা ঘিরে রয়েছ। তুমি আমাকে এই পাতানো সংসার থেকে পথে বের করে দিতে চাও। তুমি আমার আদর্শ থেকে—যে আদর্শের জন্যে তোমার বাবাকে বিয়ে করেছিলাম—সেই আদর্শ থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে চাও। জাগরণে ঘুমে তুমি আমাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছ না। ছায়ার মত চতুর্দিকে ভেসে বেড়াচ্ছ। আমি তোমার এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা—হাঁ। ক্ষুধার অন্ন দিতে চেয়েছিলাম। পরিত্রাণ, আমি পরিত্রাণ চেয়েছি। পরিত্রাণ! পরিত্রাণ! (ছুটে বেরিয়ে গেলেন)

দেবেশ। না না না, মিথ্যে। মিথ্যে। সমস্ত মিথ্যে।

[দুজনেরই প্রস্থান]

ফ্রন্ট স্টেজ

[চন্দ্রা নিজেদের বাড়ির সম্মুখের পথে। পিছনে শমীজিৎ। শেষ রাত্রি]

শমীজিৎ। কোথায় যাচ্ছ?

চন্দ্রা। আমার বাড়িতে।

শমী। কাল থেকে তো সে বাড়ি আর থাকবে না তোমার?

চন্দ্রা। আজ ভোর পর্যন্ত তো আমার।

শমী। কাল? কাল কি হবে?

চন্দ্রা। কালকের কথা ভাবব কাল।

শমী। কালকের কথা আজ ভাববে না তাই বলে?

চন্দ্রা। আমার জীবনের কি কোন বাঁধাধরা ছক আছে শমীজিৎ? আমার এই মুহূর্ত পরমুহূর্তকে জানে না। জীবনের যতটুকু আয়ু তাকে ভেঙে টুকরো জীবনের পঙ্‌ক্তিতে অর্থসঙ্গতিহীন পদের সন্নিবেশ নিয়েছি মেনে—হিংটিংছট্।

শমী। আমার জীবনেই থাক তুমি চন্দ্রা। একবার যখন এসেছ কুল ভেঙে তখন আমার এই জীবনের কূলকেই সরস করে দাও। থাক চন্দ্রা, আমার গগনে জ্যোৎস্নার মত। কথা শোন আমার, চন্দ্রা, একবার এসেছ যখন তখন থাক।

চন্দ্রা। (ম্লান হেসে) কূলভাঙা বান কি দাঁড়ায় কোথাও?

শমী। তবে কেন আমার কূলের বাঁধনকে দিলে ভেঙে? আমার এই দীর্ঘজীবনে কোনদিন আমার বাঁধন ভাঙে নি। আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। চিত্তের অতলে যে অনন্ত সমুদ্র দোল খাচ্ছিল তাই তোমার আকর্ষণে শতসহস্র ঢেউয়ের বাহু তুলে তোমার দিকে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। কি করে তাদের ঠেকাব আমি? আমি তোমাকে ভালবাসি চন্দ্রা। এই ভালবাসাই জীবন। এই ভালবাসার অনুভবই জীবনের প্রমাণ। এই ভেতরে ভেতরে দল মেলে দেওয়া তোমায় ভালবাসি চন্দ্রা।

চন্দ্রা। আমি পরস্ত্রী শমীজিৎ।

শমী। কে বললে তুমি আমার স্ত্রী নও?

চন্দ্রা। কেমন করে?

শমী। অবাক করলে! তাও অস্বীকার করছ?

চন্দ্রা। (অসহায় ভাবে) তবু কিছু রয়ে গেল যে দেওয়া গেল না।

শমী। আশ্চর্য! এর মধ্যে ফুরিয়ে গেলাম আমি এইটুকু মাত্র ছিল আমার?

চন্দ্রা। কি দেখছ অবাক হয়ে মুখের দিকে?

শমী। দেখছি রহস্যময়ীকে। যার রহস্য কবির যুগ যুগ ধরে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তুমি শুনছ না

চন্দ্রা। আমাকে একলা যেতে দাও।

শমী। কেন যাবে? কেন ঘুরবে পথে পথে আমি তোমাকে যা চাইবে তাই দেব। সম্মানও দেব সংসার দেব। আমাকে একেবারে দিয়ে দেব।

চন্দ্রা। তুমি যাও—(চলতে শুরু করলেন)

...াম না। আমি জানতাম তোমার দেহ ও মন
...ঙ্গে চলে। ভাবতেই পারি নি তুমি এমন।

[চন্দ্রা চলে যাচ্ছেন]

...মী। থাম। (সামনে গিয়ে)
...দ্রা। আটকাবে নাকি?
...মী। তোমাকে আটকাবে কে? যে পিতাকে
...করে…
...দ্রা। চুপ। সীমা ছাড়িয়ো না।
...মী। বহু যৌনবিকার সম্বন্ধে পড়েছি, এরকম
...নি কোথাও। যেখানে দেহে মনে একেবারে একটা
...দেশের পার্থক্য।
...দ্রা। ছাড় ছাড়।
...মী। বলে যাও, তুমি সত্যিই কী।
...দ্রা। জানি না, ছাড়।
...মী। না, ছাড়ব না, আমি পুরুষ, তুমি নারী। তুমি
...ক কপিথবৎ মনের মলের সঙ্গে আমার স্মৃতিকে,
...পৌরুষকে ধুলোয় ফেলে চলে যাবে, তা আমি
...না। আমি জানতে চাই এটাই কি তোমার
...বিক জীবনধারা? ছাড়ব না। তোমাকে দেব না
... তোমাকে ভেঙেচুরে পেষণ করে কাদা করে
...দেব।
...দ্রা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) ছাড়, আমাকে ছাড়।
...হয়ে আসছে। সকাল হয়ে আসছে।
...ঞ্চিৎ জোর করে তাঁর হাত দুটো ধরলেন। চন্দ্রা
...ক ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে এগিয়ে গেলেই নিজের
...াড়ির দরজার কপাটে জোরে ধাক্কা খেলেন।
...মী। আমি তোমাকে ভালবাসি চন্দ্রা।
...দ্রা। আমি বাসি না।

[চন্দ্রা মিড স্টেজে চলে গেলেন]

[প্রস্থান]

মিড স্টেজ

...র। শেষ রাত্রি। অতুলবাবু টলতে টলতে বাইরে
...রান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঝরনার
প্রবেশ]

...না। এ কি! আপনি উঠে এসেছেন কেন?
...ুল। কোথায় এসেছি?

ঝরনা। বাড়ির দোতলার বারান্দায়।

অতুল। নীচেই তো রাস্তা, না?

ঝরনা। হ্যাঁ।

অতুল। এই রাস্তা দিয়ে সে চলে গেল।

ঝরনা। কে চলে গেল?

অতুল। তুমি দেখ নি?

ঝরনা। না, কাউকে তো এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখি নি এ রাত্রে।

অতুল। ঘুমের ঘোরে ঠিক টের পেলাম ও চলে গেল। নীচের সদর দরজাটায় ঈষৎ গোঙানির শব্দ জাগল। দরজাটা ওকে যেতে দিতে চায় নি। পথের ওপর খুটখুট আওয়াজ হল। পথটাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বুঝলাম। আমি যে ওর পায়ের শব্দ চিনি। তাই বুঝলাম ও চলে গেল। কাল থেকে এ বাড়িটা তো আমাদের থাকবে না, তাই বুঝি চলে গেল সকাল হবার আগেই।

ঝরনা। কে?

অতুল। চন্দ্রা। তাই আমিও বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে দেখলাম আমি মহাশূন্যে এসে পড়েছি।

ঝরনা। মহাশূন্য কেন হবে? বাড়ির দোতলার বারান্দায়।

অতুল। ছেলেমানুষ তুমি, বুঝতে পারছ না। আমার এই বুকের সীমা থেকেই মহাশূন্য শুরু হয়েছে। শূন্যে বেরিয়ে এসে দিশা হারিয়ে ফেললাম। কোন্ দিকে সে গেছে বুঝতে পারছি না। ও হারিয়ে গেল ঝরনা, চিরকালের মত হারিয়ে গেল। ওকে খুঁজতে বেরিয়ে আমিও হারিয়ে গেলাম। শূন্যে কোন পথ নেই ঝরনা, এখানে দিক বলে কিছু নেই। আসলে জীবনেরও কোন দিক নেই—না দেহের, না মনের। সব একাকার সব অনুভূতি। আচ্ছা, ওই যে আলো জ্বলছে, ওটা কি রাস্তার আলো?

ঝরনা। হ্যাঁ।

অতুল। কিসের আলো?

ঝরনা। ইলেকট্রিকের।

অতুল। ইলেকট্রিক! পদার্থই আলো; আলোই পদার্থ। জান ঝরনা, সমস্ত পদার্থ আলো দিয়ে তৈরি— তুমি, আমি, চন্দ্রা, সব। আকাশটাকে দেখেছ?

ঝরনা। হ্যাঁ, ঘন অন্ধকার।

অতুল। ওটাও আলোর সমুদ্র।

ঝরনা। (সংশয়ে) তা হবে। একখানা চেয়ার এনে দেব ?

অতুল। না না, বেশ আছি, তা ছাড়া এখন যেয়ো না। এক মুহূর্তের জন্যেও সরে গেলে ভীষণ একলা হয়ে পড়ব। এই মহাশূন্য ভয়ঙ্কর। কি বলছিলাম বল তো ? খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

ঝরনা। বলছিলেন শূন্যটা আলোর সমুদ্র।

অতুল। হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমাদের মানুষের চোখ বিশেষ ভাবে তৈরি, তাই মনে হয় শূন্যটা অন্ধকার। আসলে শূন্য বলে কিছু নেই—শূন্যটা সব আলোয় ভরপুর। শুধু জমাট অদৃশ্য বস্তু—অদৃশ্য আলো। এই দেহ মন আত্মা দিয়ে যে অব্যক্তটাকে টের পাচ্ছি অহরহ সেও এই জমাট আলোর ঘন সান্নিধ্য। আমি গা দিয়ে মন দিয়ে অনুভব করছি ঝরনা, একটা অন্তহীন অনুভূতি। এই অনুভূতি অন্তহীন অদৃশ্য আলোকপুঞ্জের গায়ে ঠেস দিয়ে আকার অনুভূতি, তার মধ্যে মগ্ন আকার অনুভূতি··· (ধীরে ধীরে বসে পড়লেন মাটিতে)

ঝরনা। কি হল ? (চীৎকার করে) দেবেশ ! দেবেশ।

দেবেশ। কি হল ? (অতুলবাবুকে ধরল)

ঝরণা। চল, দুজনে মিলে ধরে ধরে নিয়ে যাই। সাবধানে ধর।

ড্রপ স্টেজ

[শেষ রাত্রি। রুমীর কক্ষ। রুমী বিছানায় ঘুমন্ত। শিয়রে মা সুরমা নিদ্রাকাতর। রুমীর বাঁ পাশের জানলার কাচ স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। ওপাশের কয়েকটা লতা মৃদু মৃদু সেই কাচের ওপর হাত বুলোচ্ছে যেন। রুমী হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে জানলার দিকে চেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে মাথার উপর ঘোমটার মত কাপড় তুলে দিল। সুরমা জেগে উঠলেন। জেগে উঠে অবাক হয়ে রুমীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন]

সুরমা। রুমী !

রুমী। (ঘোমটা দীর্ঘতর করে টেনে) সে কোথায় [illegible]

সুরমা। কে রে ?

[রুমী চুপ করে রইল]

সুরমা। কথা বলছিস না যে ?

রুমী। কথা বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠে গেছে। দেখ তো মা, ওর জরির জুতোটা দরজার কাছে রয়েছে নাকি ?

সুরমা। কি হল মা তোর ?

রুমী। ওই তো তার জরির জুতোটা পড়ে রয়ে দরজার কাছে।

সুরমা। কি বলছিস ?

[রুমী পাশ-বালিশটাকে কোলে নিয়ে মুখ গুঁজে রইল]

সুরমা। কি হল !

রুমী। কি সুন্দর আতর মা ! কি সুন্দর গন্ধ (মুখ তুলে জানলার দিকে চেয়ে রইল উদ্‌ভ্রান্তের ম দূর থেকে ভৈরবীর সুর ভেসে আসছে কোনও বি বাড়ি থেকে) কি দুষ্টু তুমি, চাদর [illegible] নিয়ে পালিয়েছ মনে করেছ গাঁটছড়াটা লুকিয়ে ফেলবে। (কেমন যে হাসল দরজার দিকে চেয়ে) শোন, দাঁড়াও। কে পালাচ্ছ ? ভুলতে পারছ না ? ভুলতে পারছ না তাকে কি হবে তার কথা ভেবে ? তুমি যে হয়ে গেছ আমার আগুন সাক্ষী করে গ্রহণ করেছ আমায়···মনে নেই গত রাত্রে সেই যে যজ্ঞের আগুন জ্বালা হল এই মার্বেলে মেঝেতে···জান জান, (কেঁদে ফেলে) আমার বুকের ও সেই যজ্ঞের আগুন জ্বালা হয়েছিল। মনে পড়ছে সেই মন্ত্র। যদিদম্ হৃদয়ম্ মম তদিদম্ হৃদয়ম্ তব তবে ? কোথায় যাচ্ছ ? শোন, শোন। একটুখা দাঁড়াও। সকাল হয়ে গেছে বুঝি ? তোমার পায়ে জরির জুতো জ্বলছে—আমার হৃদয়ের মত জ্বলছে।

সুরমা। রুমী ! রুমী !

রুমী। কে, মা। কি বলছ ?

সুরমা। কি বলছিস কাকে ?

রুমী। (ঘোমটা দীর্ঘতর টেনে ঘাড় ঘুরিয়ে) ও তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সুরমা। (অবাক হয়ে) কে ?

রুমী। যাঃ, নাম ধরব নাকি !

[সুরমা উঠে গেলেন]

ী। চলে গেলে? চলে গেলে তুমি?

নায় অজ্ঞান হয়ে এলিয়ে পড়ল। ডাঃ রাহার

প্রবেশ দিনের পোশাকে]

: রাহা। কি হয়েছে?

মা। বেশ ঘুমোচ্ছিল রাতটা। একটু আগে
ম ভেঙে উঠে যেন সামনে কাউকে দেখে কথা
শুরু করল। একবার দেখ তো।

: রাহা। (দেখে গম্ভীরভাবে) বুঝতে পারছি না।
র পায়চারি করতে করতে) সব মিথ্যে হয়ে গেল
। সব মিথ্যে হয়ে গেল। পরশু দিন পর্যন্ত ভেবে-
সব ঠিক হয়ে যাবে। হঠাৎ গতকালের মধ্যে
সব ঘটে গেল যে আমার সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে গেল।

রমা। তুমি যা কর তার চেহারাই হয় ষড়যন্ত্রের
সোজা পথে গেলে হয়তো মেয়েটা বাঁচত। কি
র ছিল দেবেশের? যার হাতে ও নিজেকে তুলে
হল না ভেবেচিন্তে, তার হাতেই ওকে দিলে হত।
ছিল তোমার।

[রুমী আবার উঠে বসেছে]

াঃ রাহা। ধর ধর। এক্ষুনি হার্টফেল করতে
।

র মধ্যে এক ঝলক আলো প্রবেশ করল। রুমী
র দিকে চেয়ে রইল উদ্ভ্রান্তের মত, কয়েক নিমেষ
রইল—তারপর দরদর করে চোখ বেয়ে নামল অশ্রু

মী। আর এক পা—আর এক পা! দেবেশ!
শ! আর এক পা! আর এক পা! আমি উঠতে
ছ না। আর এক পা এস! আর এক পা!
ার কাছে মার্বেলের মেঝেতে নতুন সূর্যের আলো
ছ) জরির জুতোটা পরেই এস। ওখানকার ওই
পনার ওপর দিয়েই এস। ওটা আমিই এঁকেছি।
জুতোটা পরেই এস।

[ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল সুরমার কোলে]

াঃ রাহা। (হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায়) ও, কে
একটা চিঠি বাক্সে রেখে গেছে! পোস্ট-অফিসের ছাপ
। বোধ হয় দেবেশের চিঠি। (পকেট থেকে চিঠিটা
করলেন। তাঁর হাতটা থরথর করে কাঁপছে। খুলে
বিরক্তিতে সুরমার দিকে চেয়ে)···তুমি পড়।

[চিঠিখানা দিয়ে দিলেন সুরমাকে]

সুরমা। (পড়ছেন) রুমী প্রাণাধিকাসু, আমি চললাম। আমার পাপ তোমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। সে দুঃখ আমাকে সাপের মত জড়িয়ে রয়েছে। ঈশ্বরের দিকে উঠতে হলে সব ভার কমাতে হবে—কি সুখের কি দুঃখের। তোমার ছেলে যদি বাঁচে, কোনও আশ্রমে দিয়ো। তুমি যার মা তার পিতার অভাব হবে না কোন-দিন। ইতি

অলকানন্দ

ডাঃ রাহা। (ক্ষিপ্তের মত) দেখলে? দেখলে? ভগবানের দালালের কাণ্ডখানা দেখলে!

সুরমা। (চিঠি পড়ছেন পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে) ইতি—অলকানন্দ।

ডাঃ রাহা। (ছটফট করতে করতে) আমার চোখে ধুলো দিলে! এত চেষ্টা করছিল শুধু নিজের পাপ ঢাকবার জন্যে? আর ওই মেয়েটা! কি ও! শেষে ওই—ছিঃ···ভালই হয়েছে, ভুল হয়েছে ইনজেকশনে। জাস্টিস। জাস্টিস। জাস্টিস।

[দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। সুরমা চিঠিখানা হাতে গুটিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে রইলেন। রুমীর মাথা গড়িয়ে পড়ে গেল তাঁর কোল থেকে]

রুমী। (তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসে) দেখতে পাচ্ছি না! দেখতে পাচ্ছি না! তোমায় দেখছি না!

[মাথা ঘুরিয়ে দেখছে চার দিকে। জানলার দিকে চেয়ে দেখল। কাচের ওপর কুয়াশায় লতার ডগাটি যেন কাচের গায়ে হাত বুলোচ্ছে]

ওই তো! ওই তো! ওই তো তোমার আঙুল! ধর ধর, আমায় ধর। আমি পড়ে গেলাম। ধর—

[গড়িয়ে পড়ে গেল বিছানা থেকে জানলার নীচে]

ফ্রন্ট স্টেজ

[অতুলবাবুর ঘরের সম্মুখ। ধূসর পর্দাটা দুদিকে ঈষৎ সরে গিয়ে দরজার মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি করেছে। শচীজিৎ ও ঝরনা]

ঝরনা। এ কী! এত ভোরে?

শচী। এ কদিন আমার দিনরাত্রির বোঝাটা কোপ

পেয়েছে। ওলটপালট হয়ে গেছে। চন্দ্রা আছে এ বাড়িতে?

ঝরনা। না, গত রাত থেকে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভেবেছিলাম আপনি জানেন।

শমী। আমার কাছে কিছুক্ষণ ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের মত ঘরে ঢুকেছিল একবার। ঘরের মধ্যে, মনের মধ্যে ঘূর্ণি সৃষ্টি করে সব তছনছ করে আবার কোথায় বেরিয়ে গেল। সেই থেকে আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। (স্বগতঃ) মিথ্যে বলছি, তবু এইটাই সত্যি।

ঝরনা। সে কী! কোথাও নেই?

শমী। আছে কোথাও। আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছি না এই যা। আমি ভেবেছিলেম সে বুঝি এখানে এসেছে।

ঝরনা। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার এখানে আসবে কেন?

শমী। (ম্লান হেসে) ধূমকেতু বলতে আমরা একটা কক্ষহীন জ্যোতিপুঞ্জ বুঝি। কিন্তু আসলে জ্যোতি-বিজ্ঞানের হিসাব মত তারও কক্ষ আছে, একটা এমন কিছু আছে যার কোল ঘেঁসে সে বারবার আসে। চন্দ্রার সেই বিন্দুটা রয়েছে এখানে, তাই ভেবেছিলাম।

ঝরনা। কে সেই বিন্দুটা?

শমী। আপনি এখনও বোঝেন নি।

ঝরনা। না।

শমী। থাক, বোঝাবার সময় নেই আমার। খুঁজে দেখি চন্দ্রা কোথায় গেল। (বেরিয়ে যেতে উদ্যত)

ঝরনা। আপনার রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। একবার দেখবেন না?

[শমী কিছু মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল]

শমী। কি করছেন?

ঝরনা। ঘুমোচ্ছেন।

শমী। ওঁকে ঘুমোতে দাও। ঘুম ভাঙিয়ো না।

[সহসা দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন]

ড্রাপ স্টেজ

[অতুলবাবুর কক্ষ। অতুলবাবু সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন। ঝরনা রয়েছে। পাশের খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন অতুলবাবু। সকাল হচ্ছে। দেবেশের ঘর থেকে ভৈরবী রাগে বেহালার সুর ভেসে আসছে]

অতুলবাবু। (আপন মনে) ভেবেছিলাম সারা রাত হয়তো ঘুমোতেই পারব না। আজকের পর এ বাড়ি পরের বাড়ি। গত রাত থেকে চন্দ্রাকে পাওয়া যাচ্ছে না। দুটোই আপাততঃ ভয়ানক খবর। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম ঝরনা, তবু ঘুম এল। হয়তো অন্য দিনের তুলনায় ভালই ঘুমোলাম।

ঝরনা। নিজেকে আপনি যতটা দুর্বল ভাবেন আপনি ঠিক ততটা দুর্বল নন।

অতুল। তুমি ভুল বললে নার্স। আমার ফুরিয়ে আসছে। সময় সময় সব ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। একাকার হয়ে যাচ্ছে কাল—ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ। একাকার হয়ে যাচ্ছে স্থান। সময় সময় মনে হচ্ছে, এই স্থান কাল বস্তু সব মিলে হয়ে আসছে একটা অখণ্ড সীমাহীন ছায়া। ভোরের দিকে যেন খোলা চোখেই দেখলাম ছায়ারা সামনে সঞ্চরণ করতে শুরু করল। কত ছায়া এল যে তার ইয়ত্তা নেই।

ছায়া হয়ে এল ... মেনে আমার পুরনো বন্ধু সুব্রহ্মণ্যম। জীবনের দীর্ঘ পঁচিশ বছর গবেষণা করলে গাছের পাতার যে রসায়নে সূর্যের তেজে অজৈব পদার্থ জৈবে পরিণত হয় তাকে আয়ত্ত করে মানুষের খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে চিরকালের জন্যে। অনেক দূর এগোল, নিজের আসন্ন সাফল্যের আনন্দে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠল, হঠাৎ একদিন ঘরে স্ত্রীকে দেখতে পেল অন্যের অঙ্কশায়িনী। নিজের মাথার মধ্যে গুলি চালিয়ে দিল। কার সর্বনাশ করল বল তো? তোমার, আমার, সবারই। সমস্ত মানুষ জাতের। দেখেছ, এতবড় পর্বতপ্রমাণ প্রজ্ঞা ঈর্ষার একটা সুতোর টানে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

ছায়া হয়ে এল গিরীন্দ্র। মন পড়ে থাকত তার আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যে বহির্ভুবন থেকে বিচ্ছুরিত আয়নিত অণুদের প্রবাহপথের জ্যামিতি নিয়ে। অসুস্থ হয়ে পড়ল হঠাৎ। গেল হাসপাতালে, ফিরে এলে দেখলাম সে আর সে নেই। সে অন্য কারুর হয়ে গেছে। বিয়ে করল এক প্রৌঢ়া নার্সকে। সেই যে সে ডুবে গেল—সরে গেছে তার আন্তঃনাক্ষত্রিক লোক থেকে—আর

না। সেদিন দেখলাম আমার অসুখের আগে
র পোশাক-পরা তার ছোট্ট মেয়েটির হাত ধরে
। পা তার পথ চিনে চিনে চলেছে। দেখে না
। জানলাম, ব্যাধি—যৌনব্যাধি। তবু তার ভতর
ম গ্রহ নক্ষত্র সূর্য সমন্বিত মহিমান্বিত আকাশের
না ছবি। আরও দেখলাম আমার ছায়াকে।

[বেহালার সুর আরও করুণ হয়ে উঠল]

) দেখ, দেখ ঝরনা, সূর্য উঠছে। দেখতে পাচ্ছ ?

না। দেরি আছে।

ল। না না, দেরি নেই, এই উঠল বলে।
, পেয়েছি—

না। কি পেয়েছেন।

ল। বুঝতে পেরেছি।

না। কি ?

ল। সূর্যের সঙ্গে এই মুখোমুখি সাক্ষাৎই জীবনের
উদ্দেশ্য।

[আলুথালু বেশে চন্দ্রার প্রবেশ]

। আমি আবার এসেছি।

ল। সূর্য, সূর্য, সূর্য। তারপর প্রাণী চোখ
খল সেই সূর্যকেই। সূর্য নিজেকে দেখল নিজেই।

। (সামনে ছুটে এসে) আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা

ল। দেখতে দাও। সময় বেশী নেই। দেখতে

। (পূর্বের মত) ক্ষমা কর আমায়।

ল। কেন পালিয়েছিলে ? বাড়ি ছাড়তে হবে
আমার বাড়ির দরকার নেই। সূর্যের কি
ছে।

। কি রয়েছে আমার মধ্যে—আমায় ঠেলে
নচ্ছে পথে-বিপথে। কখনও কান্নায়, কখনও
আমি স্বাধীন নই। আমি যে কিসের অধীন
ক পাই না।

[ঝরনা বেরিয়ে গেল]

[অতুল ও চন্দ্রা উভয়েই যেন নিজেকে নিজের
। যাচ্ছেন আচ্ছন্নের মত। যেন দুজনে দুটি
বিভিন্ন ধরনের স্বগতোক্তি করছেন]

অতুল। সময় নেই, সময় নেই। এই সূর্যকে দেখব আজ। এই আলো আজ সারা আকাশে বাজনার মত উঠেছে বেজে। শুনতে দাও আমায়—শুনতে দাও শেষবারের মতন।

চন্দ্রা। কী আমাকে শিকার করে বেড়াচ্ছে আমার ভেতরে বসে বসে। কখনও মনে হয়—বুকের মধ্যে সাপের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। কখনও জ্বলে ওঠে ঝকঝকে শিখায়। কখনও ভাসিয়ে দেয় কান্নায়, কখনও পুড়িয়ে দেয় জ্বালায়।

অতুল। এর পর মিলিয়ে যাব অণুতে-পরমাণুতে। আবার সেই অণুপরমাণু জুড়ে জুড়ে নতুন পদার্থ হয়ে উঠবে। রূপ নেবে নতুন প্রাণে। আবার দেখব সূর্যকে। এমনি ভাবেই চলব। এক দেখা থেকে আবার নতুন দেখায়।

চন্দ্রা। আমি কখনও দেহকে ছাড়পত্র দিই, কখনও মনকে বলি ডানা মেলে দে মন, জ্বলে ওঠ, জ্বলে ওঠ। যদি সেই আগুনে তোর জালের বাঁধন কাটে।

অতুল। সোনালী রোদ পড়েছে গাছের মাথায়। আকাশের নীল আর সবুজের ব্যবধানে সোনার সীমানা লেগেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি।

চন্দ্রা। ভেবেছিলাম কয়েকটা দিন। গড়ে তুলব নতুন সংসার।...হল না। যেদিকে চাই সেদিকেই দেখি একজোড়া নিষ্ঠুর চোখ যেন আমাকে পুড়িয়ে দেবে বলে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে আমার নিজের ভেতরে।

অতুল। আমার রোগ নেই কোন। ভুবনে কোন রোগ নেই, রোগ নেই সূর্যের। রোগ রোগ করে মিথ্যে ভুল কষ্ট পাও কেন! শুধু আছে সূর্য আর আমি। আমি আর তুমি। আর সবাই।

চন্দ্রা। নাম নেই আমার রোগের। ভেবেছিলাম কাম, তাও নয়। ভেবেছিলাম হিংসা, তাও নয়। তোমাকে অপমান করেছি। তবু আমার চিত্তের সার অংশটুকুতে আমার মনের কপালে তোমার ছোঁয়াটুকু মোছে নি। বুঝলে না আমায় ?

অতুল। বোঝা ? হ্যাঁ, বোঝাই তো জীবন। সূর্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বুঝে চলেছে নিজেকে। ভুবন নিজেকে

বুঝছে। তুমি ভুবনের টুকরো। তুমিও বোঝ ভুবনকে পারবে না একা। সবাই মিলে বোঝ, এই বোঝাই জীবন। শুধু দেখা নয়, শুধু দেখা নয়—বোঝা বোঝা।

চন্দ্রা। আমায় বোঝ?

অতুল। হ্যাঁ, শুধু দেখা নয়—বোঝা। ফুল তো চেয়ে দেখল সূর্যকে, সূর্যকে চেয়ে দেখল পশু, সিংহ আর পাখী দূর আকাশের শ্যেন। কিন্তু বুঝলে না তো? তাই মাশুল এল।

চন্দ্রা। তুমি কোন কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? বল ক্ষমা করেছ আমায়?

অতুল। আলোর সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। ঢেউ উঠল আগুনের পাহাড়ের মত। ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমায়। ভাসি—য়ে…

[বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। একটা বিচিত্র গোঙানির শব্দ উঠল তাঁর গলা থেকে, ছুটে এল ঝরনা ও দেবেশ। দেবেশ আর চন্দ্রা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দেখল]

ফ্রন্ট স্টেজ

[দেবেশ ও ঝরনার প্রবেশ। রাত্রি। শহরের পথ]

দেবেশ। ছায়া! ছায়া! সব ছায়া! এই শহরটা একটা ভাঙা জাহাজ। সমুদ্রের তীরে উলটে পড়ে রয়েছে। আমরা সব সেই সমুদ্রের তীরে অন্তঃসারশূন্য মরা শাঁখ কিংবা ঝিনুক। এত ঝকমকানি, এত কম্বুধ্বনি সব ফাঁপা ঝিনুক আর শাঁখের নিঃশ্বাস। তোমার ঘর আছে, তোমার বাড়ি আছে, তোমার জীবনের ধারা আছে, উদ্দেশ্য আছে। তোমার শাঁখে এখনও জীবন্ত শাঁস আছে। তুমি জীবন-সমুদ্রে নামতে পার। তার তলায় বাসা বাঁধতে পার। কূলে কূলে দিক্‌বিদিকে যেতে পার। আমরা পারি না—আমরা মরা শাঁখ।

ঝরনা। ভুল করছ। ঘর কি মানুষের জায়গাতে, না জমিতে? না ইঁট-কাঠের কঙ্কালের মধ্যে? মানুষের ঘর তার কাজের মধ্যে, উদ্দেশ্যের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, সাধনার মধ্যে। এস না আমার বাড়িতে।

দেবেশ। তোমার ভার বাড়াবে কেন এই মরা পদার্থটাকে নিয়ে। জীবন্ত থাকলে যেতাম তোমার সঙ্গে। থাকত পা তো তোমার সঙ্গে চলতে পারতাম। থাকত হাত তো তোমার কাজে করতাম সহায়তা। কি হবে এই হস্তপদহীন শবদেহের মত নিতান্ত একটা কবন্ধ নিয়ে।

ঝরনা। ভুল। জলের মধ্যে হাত-পা ডুবিয়ে রেখেছ আর দেখছ জলের তলা দিয়ে তোমার হাত-পা কাটা পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে—তোমার হাত-পা নেই। এই জল থেকে হাত-পা তুলে দেখ, গোটাই আছে সেগুলো এটা তোমার ভুল।

দেবেশ। জলের মধ্যে? এটা শূন্য উপমা ঝরনা ওরকম কিছুই ঘটে নি আমার।

ঝরনা। ঘটেছে, ঘটেছে। আমি বলছি ঘটেছে তুমি তোমার হাত-পা সব নিথর কালো জলের মধ্যে ডুবিয়ে বসে আছ।

দেবেশ। কোন্ জল?

ঝরনা। চন্দ্রা—চন্দ্রা—চন্দ্রা। তুমি চন্দ্রার মধ্যে অর্ধমগ্ন হয়ে রয়েছ। ডুব দিতেও পারছ না। আবার ঝেড়ে উঠেও আসতে পারছ না।

দেবেশ। তুমি কি করতে বল?

ঝরনা। (যেন জোর করে গভীর আবেগে) তুমি চন্দ্রাকে খুঁজে বের কর। তুমি পারবে না। তাকে চেতনা থেকে তুমি উপড়ে ফেলতে পারবে না। সে তোমার চেতনার ক্ষেত্রে অণুপরমাণু হয়ে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। বোনা সরষে কে কবে কুড়িয়ে আবার জড়ো করতে পেরেছে? যাও, তুমি তার কাছেই যাও। তাকেই চাও—

দেবেশ। (ভীত বিভ্রান্ত) এ তুমি কি বলছ ঝরনা! তুমি বলছ, না আড়াল থেকে আর কেউ বলছে?

ঝরনা। (হেসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে) তোমার অবচেতন বলছে হয়তো!

দেবেশ। সত্যি হলে এর পরিণাম কি জান?

ঝরনা। পরিণাম? ভয় পেলেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এই পরিণাম! এই ভয়ঙ্করকে এড়ানোর একমাত্র উপায় হল সত্যকে স্বীকার করা, স্পষ্ট মরুভূমির প্রখর আলোয় দেখা। স্বীকার করা। (নিজের মধ্যে)…না না, অন্যায় কি, কি যায় আসে পৃথিবীর! কি যায় আসে বিশ্বভুবনের

মরা যদি দুজনে সমস্ত বাধা ভেঙেচুরে এক হয়ে যাও ! যায় আসে ! কারু কিছু যায় আসে না। এই দুটো নের তিল তিল করে দগ্ধ হওয়ার চাইতে তাও ভাল। নেই। কোথায় পাপ ! সত্য যা তার মধ্যে পাপ যায় ! হাজার বছর পরে কে তোমার এই পাপের প্রচার করতে যাচ্ছে ! হয়তো ভালই হবে। যদি কে পরিচ্ছন্ন করে চন্দ্রাকে বরণ করতে পার তা হলে তা মুক্তি পাবে। হয়তো তোমার জীবনের অন্তসন্ধান পথে চলবে। তা না হলে এই অবরুদ্ধ কামনার এই অন্ধকারে সঞ্চরমাণ শ্বাপদের পায়ের চিহ্ন সন্ধান করে মরবে। কোনদিন পারবে না তার মুখোমুখি। কোনদিন এই শিকার তোমার শেষ হবে না। কে শিকার করবে রাত্রিদিন তাকে শিকার করতে। (বাইরে প্রকাশ্যে) যাও যাও, তাকে খুঁজে কর।

দেবেশ। (যেন নিজের মনে) তার চেয়ে তোমার যদি নিজেকে ছেড়ে দিই !

ঝরনা। তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি কে যত বেশী তোমার কাছে বিলিয়ে দেব তুমি ততই চল হয়ে উঠবে তার জন্যে। এভাবে তোমার সঙ্গে করব কি করে ! আমি ভেবেছিলাম অসুস্থকে তার স্বাদ দিলে সে আর অস্বাস্থ্য চাইবে না, তার চর মধ্যে স্বাস্থ্যের উৎকণ্ঠা জেগে তার অস্বাস্থ্যকে করে দেবে। দেখলাম তা হয় না। অস্বাস্থ্যও এক র জীবনপ্রণালী। হয়তো বা আমারই ভুল। যাকে অস্বাস্থ্য মনে করছি তা হয়তো অন্য ধরনের যাচ্ছা। তাই আজ স্বীকার করে নিয়েছি তোমার স্থাকে। কিন্তু···কিন্তু···দেবেশ···নায়মাত্মা···(কথা য়ে গেল) আমি চললাম দেবেশ। (প্রস্থানোদ্যত)

দেবেশ। (অসহায়ভাবে) কোথায় !

ঝরনা। চন্দ্রাকে খুঁজে বের করতে।

ত্রি। সব পর্দা উঠে গেছে। ফ্রন্ট স্টেজের পথ। ওধারে একটা গেট। গেটের ওপর আর্চ। আর্চের ঘন সবুজ লতায় লাল ফুল ফুটে আছে। গেট য়ে মীড স্টেজের ধার ঘেঁষে একটা বাড়ি। অস্পষ্ট যাচ্ছে। গভীরে ডীপ স্টেজে রাত্রির আকাশ। লা নীল রঙের। চন্দ্রা পথে এসে পড়লেন। পিছনে এল ঝরনা। দেবেশও গেল তার পিছু পিছু ?

ন্দ্রা। (চমকে উঠে) কে !

রনা। আমি, ঝরনা।

ন্দ্রা। এখনও আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছ ! দেবেশ কে এ কাজে লাগিয়েছে বুঝি ! ও কি আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না ! ওর হাত থেকে কি আমার পরিত্রাণ নেই !

ঝরনা। দেবেশ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চন্দ্রা।

চন্দ্রা। আজ ওর খোঁজাটা নতুন নাকি !

ঝরনা। (আগ্রহ ভরে) তুমি কি জানতে ও সারা জীবন তোমাকে খুঁজেছে !

চন্দ্রা। দেবেশকে আমি কোনদিনই ভালবাসি নি ও কেন খুঁজছে আমাকে ? আমি ? না, আমি ওকে খুঁজি নি। আমি যা খুঁজেছিলাম তা পেয়েও ছিলাম। নিতে পারি নি, সহ্য করতে পারি নি। (আপন মনে) পার তুমি হাজার বাতির আলোর সামনে চেয়ে থাকতে ? আমি একেবারে সোজা চেয়েছিলাম। যা পারি না তাই পারতে চেয়েছিলাম। আমার বুদ্ধির সঙ্গে প্রবৃত্তির কোন সামঞ্জস্য ছিল না। দুটো ভিন্ন স্তর একসঙ্গে মাখামাখি করে বাস করত আমার মধ্যে। ওর জন্যে—দেবেশের জন্যে—আমার কোন তাগিদ নেই। না দেহে, না মনে।

ঝরনা। দেবেশ তোমার অসম্মান করতে পারে না। ও কর্তব্য করতে চেয়েছে। তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে।

চন্দ্রা। বাঃ, ভারী কর্তব্যপরায়ণ তো ! খুঁজে খুঁজে কর্তব্যপালন করে ! (ম্লান হাসলেন) ওর মায়ের জায়গায় আমি আর বসতে পারব না। পারব না আমি। দেবেশের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে আমার।

ঝরনা। ও সেই সম্পর্কের জের ধরে খুঁজছে না।

চন্দ্রা। তুমি কি করে জানলে ?

ঝরনা। জেনেছি, যেমন করেই হোক জেনেছি। আমি আমার ভেতর থেকে জেনেছি। ও সেই সম্পর্কের জের টেনে খুঁজছে না তোমাকে।

চন্দ্রা। তবে, প্রতিশোধ নেবার জন্যে ?

ঝরনা। (অবাক হয়ে) কিসের প্রতিশোধ ?

চন্দ্রা। ভালই হবে। আমাকে এখানেই দেখবে, শচীজিতের বাড়ির সামনে। সাক্ষী থাকবে তুমি।··· (হঠাৎ দুর্বল হয়ে) বড় নরম ও ঝরনা, ও বড় নরম। একেবারে শিশুর মত। তেমনি তুলতুলে মন, তেমনি তুল-তুলে দেহ। ও যদি কঠিন হত ! শাবলের মত বাহু দুটো হত ওর ! এক চাঙ পাথরের মত হত ওর মাথা ! হঠাৎ এসে এক ঘায়ে আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিত ! শাবলের মত দু হাত বেঁকিয়ে এই টুঁটিটা চেপে (নিজেই *নিজের টুঁটি চাপতে যাচ্ছিলেন, ঝরনা ধরে ফেলল)* আমাকে শেষ করে দিত !···তা না এসে সামনে দাঁড়াবে, চোখ ছলছল করবে—পারি না, আমি আর সহ্য করতে পারি না। ওকে আমি দেখতে পারি না স্থির হয়ে। ওকে আঘাত করেছি—কত, কত, কতবার। তারপর কেঁদেছি, নিজেকে নিজেই ভেঙেচুরে টুকরো

টুকরো করতে চেয়েছি। ইচ্ছে করে কলঙ্ক মেখেছি—তবু আমার ভেতরে কি একটা রয়ে গেছে যা ধ্বংস হল না। ···কলঙ্ক মেখেছি, নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে—কেন? কেন? কেন? প্রশ্ন করি নিজেকে বারবার। তুমি যাও ঝরনা, আমি যা হোক একটা ঠিক করে ফেলব। তুমি যাও ঝরনা, দেবেশকে বিয়ে কর। যদি পৃথিবীতে সুখ বলে কিছু থেকে থাকে তো সেই সুখে তোমরা সুখী হও।

ঝরনা। না না চন্দ্রা, তুমি নষ্ট করো না নিজেকে। আমাকে ভুল বুঝো না।

চন্দ্রা। (হেসে) আমি নিজেকেই পারি নি বুঝতে ঝরনা, তা তোমাকে বুঝব!

ঝরনা। (গম্ভীর হয়ে) আমি নার্স চন্দ্রা। মানুষের বেদনা দেখলেই তার উপশম করবার জন্যে আমি আকুল হয়ে উঠি। আমায় ছুটি দাও। দেবেশকে তুমি গ্রহণ কর।

চন্দ্রা। (ভয়ে) কি বললে? দেবেশ আমাকে গ্রহণ করবে? কোন্ সম্পর্কে? ছিঃ, ঘৃণা, ঘৃণা!

ঝরনা। (অবাক হয়ে) ঘৃণা? কেন?

চন্দ্রা। বুঝবে না। সে ঘৃণার পরিমাণ, তুমি তাকে ভালবাস, তুমি কি করে বুঝবে?···যাও, দেবেশকে বল, চন্দ্রা তোমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না,···বল, চন্দ্রা সারা জীবন পথে-বিপথে ঘুরবে কিন্তু তোমার আশ্রয় নেবে না। চন্দ্রা রসাতলে তলিয়ে যাবে তবু তোমাকে আশ্রয় করবে না।···যাও যাও, এখন অনেক রাত্রি। আমাকে ভুলে যাও তোমরা।

[দেবেশের প্রবেশ। দেবেশ চন্দ্রার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ে রইল]

দেবেশ। শোন।

চন্দ্রা। (বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে) "শোন!" আপনি বললে না?

দেবেশ। (কিছু না শুনে মুগ্ধ হয়ে যেন শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করছে) শোন, আমি একরকম ভাবে এই সমস্যাটার সমাধান খুঁজে পেয়েছি। আমি তোমাকে গ্রহণ করব···একটা অদ্ভুত সাঙ্কেতিক সম্পর্কে—যার নাম নেই, যার ব্যাখ্যা নেই। তবু যা আছে রহস্যের মত, আকাশের মত, সমুদ্রের মত—চন্দ্র তারা সূর্যের মত—প্রকৃতির মত, ব্যাখ্যা নেই তবু আছে। সবার উপরে আছে—তোমার আমার সমস্ত চোখে দেখা সম্পর্কের ওপর আছে, তোমার আমার পাপপুণ্যের ওপর আছে, তোমার আমার চাওয়া না পাওয়ার ওপর আছে—আছে!

চন্দ্রা। (বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হয়ে) কি বলছ পাগলের মত।

দেবেশ। (আচ্ছন্নের মত) আমিও মরব, তুমিও—রুমীর মত, বাবার মত। ওই কালটা জলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। এই সমাজটা মিলিয়ে যাবে স্বপ্নের মত। মানুষের রীতিনীতি বদলে বদলে সুদূর কোনকালে এমন হবে যার সঙ্গে আজকের দিনের রীতিনীতির মিল থাকবে না কোন। তবু আমাদের এই সম্পর্কটা ব্যাখ্যার অতীত কোন প্রতীকের মত থাকবে।

[চন্দ্রার চোখ বেয়ে দরদর ধারে অশ্রু ঝরতে লাগল]

চন্দ্রা। (ফুঁপিয়ে কেঁদে) উন্মাদ। পাগল তুমি। রীতিমত ইডিয়ট তুমি। আমার ঘৃণার এই হল উত্তর? এই বলে নিলে প্রতিশোধ? আমার এ ঘৃণা তোমার সব প্রতিশোধের চেয়ে বড়। এ ঘৃণায় আমার চরম তৃপ্তি: পরম তৃপ্তি। (ছুটে চলে যাচ্ছিলেন, কি ভেবে থমকে দাঁড়ালেন, আর একবার দেবেশের দিকে তাকালেন ফিরে, চোখে জল) জান তুমি···তোমাকে আমি লালন করেছি বুকের মধ্যে, তোমার স্বপ্নকে···যাও যাও, মানুষ হও—নরম নরম হাত দুটোকে কঠিন কর কঠিন কাজ দিয়ে। শিশুর মত মুখখানায় পড়ুক জগতের প্রাচীনতম আলো—যে আলো ঋষিদের, মহাত্মাদের, শিবের পিছনে চাঁদের মত জলে। তুমি এবার যাও দেবেশ। আমি ফিরে যাব না।

[চন্দ্রা পিছন ফিরে দেখলেন শমীজিৎ গেটের ওপারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন]

(হঠাৎ শমীজিৎকে লক্ষ্য করে) চল শমীজিৎ।

শমী। আসবে তুমি? সময় হয়েছে?

চন্দ্রা। হ্যাঁ।

[চন্দ্রা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝরনা ও দেবেশকে একবার দেখলেন, চোখের জলে ভাসা তাঁর মুখখানায় কোথা থেকে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। তারপর দ্রুতপদে শমীজিৎকে টানতে টানতে নিয়ে এসে ডীপ স্টেজে বিচিত্র আলো-মেশানো অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। ঝরনা দু হাত তুলে চন্দ্রার উদ্দেশে নমস্কার করল]

ঝরনা। এস, আমরা যাই।

দেবেশ। যাচ্ছি।

ঝরনা। কি দেখছ অমন করে? কি ভাবছ?

দেবেশ। দেখছি এই গেটের ওপর ফুলগুলোকে। ভাবছি এই ইলেকট্রিক আলোতেও তো ওদের কাজ চলে যেতে পারে কাল যদি সূর্য না ওঠে। (অধীর হয়ে) কাল যদি সূর্য না ওঠে ঝরনা! কাল থেকে যদি সূর্য না ওঠে!

[দু হাতে মুখ ঢাকল]

[ডীপ স্টেজের পটভূমিতে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত নানা রঙের বিচিত্র এক আলোর ঝলক উঠল মুহূর্তের জন্য। তারপর সমস্ত স্টেজ অন্ধকার]

য ব নি কা

মাস্টারমশায়

শ্রীঅমলা দেবী

কটা বড় নদীর ধার থেকে মাইলখানেক দূরে একটি গ্রাম। নেহাত ছোট গ্রাম। প্রায় একশো ঘর কের বাস। তেলী-তামলী প্রায় পঞ্চাশ ঘর, কয়েক ব্রাহ্মণ, বাকি সব বাউরী, বাগদী ও লোহার। তেলী-লীদের অবস্থা ভাল। জমি-জায়গা আছে। চাষ-বাস ই বরাবর জীবিকা নির্বাহ হয়েছে তাদের। আজকাল তরকারির চাষে খুব মন দিয়েছে তারা। প্রত্যেকদিন লে তাদের অনেকে তরিতরকারি বোঝাই বাঁকা ায় নিয়ে গ্রামের বাইরে বিস্তৃত কঙ্করময় মাঠটার বুকে য়ে-চলা পথটা দিয়ে চলে যায় মাইল দেড়েক দূরে ন গড়ে-ওঠা শহর কালিকাপুরের বাজারে। সেখানে ক্রি শেষ করে বিক্রয়-লব্ধ টাকা-পয়সা গামছার খুঁটে ধে বিকেলে বাড়ি ফেরে। ব্রাহ্মণদের অবস্থাও মাঝামাঝি। জমি-জায়গা আছে। তা ছাড়া তেলী-মলীদের বাড়িতে পুরোহিতের কাজ করে তারা। উরী, বাগদী, লোহারদের পুরুষ ও মেয়েরা অনেকে লিকাপুরের কাছে যে সব বড় বড় কারখানার কাজ ছে, সেখানে কুলী-কামিনের কাজ করতে যায়। রাদিন কাজ করে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরে সব।

প্রত্যেক দিন ভোরে এই গ্রাম থেকে দুজন বৃদ্ধ ড়াতে বেরোন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি, জরা-জীর্ণ তারা। বয়সের ভারে দেহের উপরিভাগ সামনের কে ঝুঁকে পড়েছে। মাথার চুল সব সাদা—রুক্ষ, লোমেলো। চোখে পুরু চশমা। পরনে খাটো ধুতি, য়ে ফতুয়া। হাতে লাঠি। দুজনে পোড়ো মাঠের বুকে য়ে-চলা পথটা দিয়ে পাশাপাশি ধীরে ধীরে কালিকা-রের দিকে যেতে থাকেন। এঁদের একজনের নাম বু মুখুজ্জে, লোকে ডাকে 'পণ্ডিতমশায়' বলে। আর কজনের নাম যদু চাটুজ্জে, লোকে ডাকে 'মাস্টারমশায়' লে। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি এই গ্রামেই। মাস্টার-মশায়ের বাড়ি এই গ্রামটার সামনের দিকে কতকটা দূরে যে গ্রামটা আছে, সেখানে। দুজনেই এক সময়ে কালিকাপুরে যে ছোট একটা স্কুল ছিল, সেখানে কাজ করতেন। যদু চাটুজ্জে ছিলেন হেড মাস্টার, আর শিবু মুখুজ্জে ছিলেন পণ্ডিত। তখন থেকেই এ তল্লাটের লোকের কাছে তাঁরা 'মাস্টারমশায়' ও 'পণ্ডিতমশায়' বলেই পরিচিত। অবশ্য স্কুলের চাকরি থেকে দুজনেই বহুদিন আগেই বিদায় নিয়েছেন। এই গ্রামের তেলী-তামলীদের পাড়ায় যে একটি পাঠশালা আছে, সেখানে দুজনেই এখন পণ্ডিতের কাজ করেন।

দুজনে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। মাইলখানেক এসে মাস্টারমশায় থমকে দাঁড়ান। রাস্তার ডান পাশে কতকটা দূরে একটা উঁচু পাড়ওয়ালা চার দিকে তালগাছ দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর। পুকুরটা থেকে কতকটা দূরে একটা ছোট গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দারা সবাই চাষী ও মজুর নয়। দু-চারজন অবস্থাপন্ন লোকেরও বাস আছে ওখানে। ছোট ছোট খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরগুলোর মাঝে মাঝে দু-চারটে পাকা বাড়িও দেখা যায়। মাস্টার-মশায় গ্রামের দিকে মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। শিবু-পণ্ডিত বলে ওঠেন, আর কেন, চল।

মাস্টারমশায় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, চল।

আরও কতকটা এগিয়ে গিয়ে রেল লাইন—পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। রেল লাইন পার হয়ে কতকটা গিয়ে বড় রাস্তা—রেল লাইনের সমান্তরালে চলে গিয়েছে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে। বড় রাস্তা ধরে তাঁরা পশ্চিম দিকে—কালিকাপুরের দিকে হাঁটতে থাকেন। দু পাশে তাকান আর অতীত দিনের স্মৃতি-কণাগুলো মানস-চক্ষের সামনে ভেসে বেড়াতে থাকে। পুরনো দিনের কত কথা বলতে থাকেন দুজনে। নতুন দিনের সম্বন্ধেও নানা মন্তব্য করতে থাকেন।

কালিকাপুর ছিল একটা বড় গ্রাম। কায়স্থ ব্রাহ্মণ ছিল প্রায় একশো ঘর। তেলী-তামলী, ময়রা, আগুরী, শুঁড়ি ইত্যাদি জল-চল জাতির লোক ছিল প্রায় দুশো ঘর। বাউরী, বাগদী, লোহার, মুচী ইত্যাদি জল-অচল জাতির লোকও ছিল প্রায় দুশো ঘর। কায়স্থরাই ছিলেন গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন। তাঁদের মধ্যে রায়-বাবুরা ছিলেন সব চেয়ে অবস্থাপন্ন। তাঁরা ছিলেন গ্রামের জমিদার। ব্রাহ্মণদের অবস্থাও মন্দ ছিল না। তেলী-তামলী ইত্যাদি জাতির লোকেরা চাষ-বাস, দোকানদারী করে জীবিকা নির্বাহ করত। গ্রামে বাজার বলতে কিছু ছিল না; কয়েকটা ছোটখাটো দোকান ছিল। মিষ্টি, তেলেভাজার দোকানই বেশি, কাপড়ের দোকান দুটো। গ্রামের অন্যান্য জাতির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বালাই ছিল না। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের ছেলেরা কিছু কিছু লেখাপড়া করত। তাদের জন্য গ্রামে একটি মাইনর স্কুল ছিল। রায়-বাবুদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্কুলটি। কালিকাপুরের স্টেশনটি বহুদিন আগে থেকেই ছিল। নেহাত ছোট স্টেশন। স্টেশনের পেছনে বড় রাস্তার অপর পাড়ে কয়েকটা ছোট ছোট পাকা বাড়ি ছিল। স্টেশনের বাবুরা থাকতেন সেখানে। কাছাকাছি দু-একটা খাবারের দোকানও ছিল। বাকি সব জায়গাটা ছিল ফাঁকা মাঠ। স্টেশন থেকে গ্রামের ভিতর পর্যন্ত একটা অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা ছিল, সেখান দিয়েই লোকে স্টেশনে যাওয়া-আসা করত। স্টেশন থেকে কতকটা দূরে পোড়ো মাঠটার পূর্বাংশে ছিল গ্রামের স্কুল—লম্বা একটা ঘর, মাটির দেওয়াল, খড়ে ছাওয়া; পাঁচটা কুঠরি ছিল, চারটেতে ক্লাস বসত, বাকিটা ছিল অফিস ঘর। সামনে ছিল চওড়া বারান্দা। সেখানে ছোট-ছোট ছেলেরা তাদের পণ্ডিতমশায়কে ঘিরে বসত, পণ্ডিত মশায় হাতের ছড়ি নাচিয়ে নাচিয়ে তাদের পড়াতেন।

কয়েক বছরের মধ্যে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। ছোট স্টেশনটা কত বড় হয়েছে। স্টেশনের বাবুদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাদের জন্য আরও অনেকগুলো বাড়ি তৈরি হয়েছে। স্টেশনের পিছনে গ্রামাভিমুখী সরু কাঁচা রাস্তাটা এখন চওড়া পাকা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। রাস্তার দু পাশে পাশাপাশি কত দোকান বসে গেছে। কাপড়ের দোকানই হয়ে গেছে চার-পাঁচটা। রাস্তার দু পাশে কত বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে। রায়বাবুদের বাড়ি ঢাকা পড়ে গেছে তাদের পিছনে। স্টেশনের পশ্চিমদিকে যেখানটা অনেক মাইল ধরে পোড়ো জমি ও জঙ্গল ছিল, সেটার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পাশাপাশি বড় বড় কারখানা বসেছে সেখানে। কারখানার কর্মচারীদের থাকবার জন্য ছোটবড় কত বাড়ি তৈরি হয়েছে। সারা দিনরাত কাজ চলছে। দিনের বেলায় চিমনির ধোঁয়ায় উপরের আকাশটা কালো হয়ে থাকে। রাত্রে হাজার হাজার বৈদ্যুতিক আলোর আভায় সারা আকাশটা জলজল করতে থাকে। স্টেশনের পূর্বদিকে কতকটা দূরেই নতুন স্কুলের বাড়ি। অনেকখানি জায়গা, চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। সমস্ত বাড়িটায় ছেলেদের স্কুল। সামনে লোহার গেট। স্কুলবাড়ির পূর্বদিকে ছেলেদের বোর্ডিং। ছোট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একতলা বাড়ি। পাশাপাশি একই ধরনের তিনটে বাড়ি। বোর্ডিং পার হয়ে ছেলেদের খেলার মাঠ। কী ছিল আগে। কী হয়েছে এখন!

বড় রাস্তা ধরে দুজনে অতীত ও বর্তমানের নানা গল্প করতে করতে ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকেন। কতকটা গিয়েই রাস্তার ডান পাশে একটা পোড়ো জমি, আগাছার ছোট-ছোট ঝোপে ছেয়ে গেছে। সেই মাঠটার মাঝখান দিয়ে, ঝোপগুলোর পাশে পাশে তাঁরা এগিয়ে যান। কতকটা গিয়েই সামনে একটা মাটির স্তূপ, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। এখানে-সেখানে দু-চারটে ভাঙা মাটির দেওয়াল এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্রামের পুরনো ছোট স্কুলটি ছিল এখানে। এই স্কুলেই তাঁরা দুজনে শিক্ষকতা করতেন। এই স্তূপটার আশেপাশে দুজনে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেন। তারপর রাস্তায় ফিরে এসে সামনের দিকে এগিয়ে চলেন। পুরনো স্কুলের পরই ছেলেদের খেলার মাঠ। তারপরই সারি সারি ছেলেদের বোর্ডিং। তারপর কতকটা গিয়েই স্কুলের প্রকাণ্ড লোহার গেট। স্কুলটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন দুজনে, কথাবার্তাও চলতে থাকে। মাস্টারমশায় হয়তো বলে ওঠেন, লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছেন সরকার।

পণ্ডিতমশায় বলেন, আমাদের সময় একশো টাকা হলে কত কাঠখড় পোড়াতে হত, আর আজকাল! মাস্টারমশায় জবাব দেন, এখন দেশের লোকের শাসনভার এসেছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির তাঁরা দরাজ হাতে খরচ করবেন না?

পণ্ডিতমশায় বলেন, সব গাঁয়ের ভাগ্যে জোটে না। খুঁটি থাকা চাই।

মাস্টারমশায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে তাকাতেই পণ্ডিতমশায় বলে ওঠেন, রায়মশায়ের ছেলে শিক্ষা-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী, জানেন তো?

মাস্টারমশায় ঘাড় নেড়ে বলেন, জানি, অজয় তো। আমাদের স্কুলে পড়ত।

পণ্ডিতমশায় বললেন, তা ছাড়া রায়বাবুদের আর একজন শাসন-সভার সদস্য। নেহাত হাত-তোলা বেশ প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রীদের সঙ্গে, এমন কি মন্ত্রীর সঙ্গেও বেশ খাতির আছে। এরা ছিলেন বলেই এ সব হয়েছে—না হলে হত না। দেখ না, আমাদের গাঁয়ে একটা প্রাইমারী স্কুল করবার জন্য কতবার এদের কাছে আনাগোনা করলাম, কিছুই হল না।

এমনই কিছুক্ষণ নানা আলোচনা করেন দুজনে স্কুলটার সামনে ঘোরাফেরা করতে করতে। বেলা একটু বেড়ে উঠতেই মাস্টারমশায় বলেন, এবার ফেরা যাক। আমার আবার দু মুঠো ফুটিয়ে নিতে হবে তো!

ধীরে ধীরে তাঁরা গ্রামে ফিরে আসেন।

গ্রামে ঢুকতেই তেলী-তামলীদের পাড়া। একটি অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা। দু পাশে তাদের ছোট ছোট খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর। কতকটা গিয়ে রাস্তাটা ডান দিকে বেঁকেছে। আরও কতকটা গিয়ে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। এইখানে একটি ছোট মন্দির। ইঁটের দেওয়াল, মাটি দিয়ে গাঁথা। খড়ের ছাউনি। সামনে নাট-মন্দির, মেঝেটা ইঁট দিয়ে বাঁধানো। খড়ের চাল। এইখানেই প্রতিদিন পাঠশালা বসে, বেলা দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত। মন্দিরের পিছনেই ব্রাহ্মণপাড়া। মন্দিরের পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে খানিকটা গেলেই ডান পাশে একটা উঁচু পাড়ওলা পুকুর। আরও খানিকটা গিয়ে রাস্তাটা বাঁ দিকে বেঁকে ব্রাহ্মণপাড়ায় ঢুকেছে। পাড়ায় ঢুকতেই পণ্ডিত-মশায়ের বাড়ি। কয়েকটা মাটির ছোট ছোট খড়ে-ছাওয়া ঘর। চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পণ্ডিতমশায় ঢুকে পড়েন বাড়িতে। আর একটু এগিয়ে ডান দিকে একটা বাড়িতে ঢুকে পড়েন মাস্টারমশায়। এটা পণ্ডিতমশায়ের খামার-বাড়ি। কতকটা জায়গা, চারদিকে উঁচু মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এক পাশে একটা ছোট মাটির ঘর। খড়ে ছাওয়া। সামনে একটু দাওয়া। দাওয়ার একটা পাশে দেওয়ালের আড়াল। এইখানে রান্না করেন মাস্টারমশায়। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বেশী নেই। একপাশে একটা দড়ির খাটিয়া। খাটিয়ার উপরে একটা ময়লা শতরঞ্চি পাতা। মাথার দিকে একটা ময়লা বালিশ। খাটের নীচে একটি ছোট টিনের বাক্স। এক পাশের দেওয়ালে দড়ির আলনা থেকে ঝুলছে খানদুই মলিন ধুতি, একটা গামছা, ও একটা ফতুয়া। আর এক পাশে মেঝের ওপর কয়েকটি বাসন, একটা জল-ভরা বালতি। ঘরের একটা কোণে একটা মাটির কলসীতে খাবার জল। ঘরে ঢুকে মাস্টারমশায় ফতুয়াটা খুলে ফেলে রান্নার জন্য প্রস্তুত হন। উনোনটা ধরিয়ে একটা ছোট পেতলের হাঁড়িতে চাল সেদ্ধ করতে দেন। তার সঙ্গে গোটাকয়েক আলু ও ঝিঙে সেদ্ধ হতে থাকে। দুবেলা রান্না করেন না মাস্টারমশায়। ও-বেলার রান্না এ-বেলাতেই সেরে রাখেন। রান্না হয়ে গেলে পুকুরে স্নান করে এসে খেতে বসেন। এঁটো বাসন নিজেকে মাজতে হয় না। তেলীদের একটি গরীব বিধবা মেয়ে শিবু পণ্ডিতমশায়ের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। সেই-ই প্রত্যেকদিন সকালে ও বিকালে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে যায়। মাসে দুটি টাকা মাত্র দিতে হয় তাকে। চালটা মাস্টারমশায়কে কিনতে হয় না। তেলী-তামলীরা সবাই মিলে মাসে মাসে কিছু চাল সিধে দেয়। তাতেই চলে যায় মাস্টারমশায়ের। বাকি যা প্রয়োজন হয় ওই মেয়েটিই মাঝে মাঝে কিনে এনে দিয়ে যায়।

আহার শেষ করেই মাস্টারমশাই পাঠশালায় যান। সেখানে বেলা চারটে পর্যন্ত কাজ করে বাড়ি ফিরে

আসেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন, গোটাকয়েক বাতাসা চিবিয়ে কতকটা জল খেয়ে, বৈকালিক জলযোগ শেষ করেন। তারপর সন্ধ্যের কিছুটা আগে আবার বেড়াতে বেরোন। এ বেলায় পণ্ডিতমশায় ওঁর সঙ্গী হন না। একাই যান।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে কালিকাপুরের দিকে এগোতে থাকেন। এই সময়ে গ্রামের অনেক লোক—মেয়ে-পুরুষ কালিকাপুরে কাজ সেরে গ্রামে ফিরতে থাকে। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা হলে তারা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়। মাস্টারমশায় মৃদু হেসে তাদের প্রতি-নমস্কার জানিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের গ্রামের কাছে এসেই মাস্টারমশায় থমকে দাঁড়ান। গ্রামের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে তালগাছ-ঘেরা পুকুরটার দিকে এগিয়ে যান। পুকুরটার পূব পাশে কিছুটা দূরে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ান মাস্টারমশায়। পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। যতদূর দৃষ্টি যায় মাঠের পর মাঠ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। কতকটা দূরে গ্রামের কাছ ঘেঁসে একটা ছোট পুকুরকে ঘিরে কতকটা পোড়ো জমি। ওইখানেই গ্রামের শ্মশান। ওইখানেই তাঁর বাবার, মায়ের ও স্ত্রীর দেহ তাঁর চোখের সামনে চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিল। চোখের কোণ থেকে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুক খালি করে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। অন্তর দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, আমাকে আমার প্রিয়জনদের কাছে নিয়ে যাও প্রভু। আর কতদিন একা একা থাকব!

তারপর মাটির উপর বসে পড়েন, সামনের দিকে তাকিয়ে নিজের অতীত জীবনটার কথা ভাবতে থাকেন।

দুই

কালিকাপুরের কাছে ছোট গ্রামটায় বাড়ি তাঁর। গ্রামটার নাম নবগ্রাম, লোকে বলে, নগাঁ। প্রায় দেড়শো ঘর লোকের বাস। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, বাকি সব তেলী, তামলী, বাউরী, লোহার ইত্যাদি জাতির। তেলী-তামলীরা চাষ-বাস করে; বাউরী, লোহাররা দিন-মজুরের কাজ করে। ব্রাহ্মণ কায়স্থদের জমি-জায়গা আছে। তার উপর নির্ভর করেই তাদের জীবিকা-নির্বাহ হয়। আজকাল দু-চারজন কালিকাপুরে চাকরি করে। তাঁর ছেলেবেলায় কিন্তু তাঁদের গ্রামের একজন মাত্র পরের চাকরি করতেন। তিনি তাঁর বাবা, কালিকা-পুরের রায়বাবুদের জমিদারীর নায়েব ছিলেন। এর জন্য এ তল্লাটে তাঁকে সকলে খুব খাতির করত। মাইনে আজকালকার হিসাবে খুব বেশী ছিল না। তবে তাঁদের জমিজায়গা মন্দ ছিল না; সস্তা-গণ্ডার দিনও ছিল তখন, কাজেই তাঁর বাবা মাসে মাসে যা পেতেন তাতেই গ্রামের সকলে তাঁদের অবস্থা সচ্ছল বলে স্বীকার করত। তাঁদের গ্রামে লেখাপড়া করার রেওয়াজ ছিল না তখন। কিন্তু তিনি ছিলেন তাঁর বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তা ছাড়া তাঁর মায়ের বাপের বাড়ি ছিল জেলা-শহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে। তাঁর ভায়েদের ছেলেরা শহরে লেখাপড়া করত, হাই স্কুল থেকে পাস করে কলেজেও পড়ত দু-এক-জন। কাজেই মায়ের জেদাজেদিতে বাবা কালিকাপুরের উচ্চ-প্রাইমারী পাঠশালায় তাঁর পড়বার ব্যবস্থা করলেন। প্রথম কিছুদিন বাবাই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পাঠশালায় পৌঁছে দিয়ে আসতেন। বাড়িও নিয়ে আসতেন। শিবু পণ্ডিতের বাবাও রায়বাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। বাবার কাছে তাঁর পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার খবর শুনে তিনিও তাঁর ছেলেকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। তারপর থেকে তিনি আর শিবু দুজনে একসঙ্গে পাঠশালা যেতেন ও একসঙ্গে পাঠশালা থেকে বাড়ি ফিরতেন।

পাঠশালার পড়া শেষ হবার পরেও মা তাঁকে রেহাই দিলেন না। নিজে সঙ্গে করে তাঁকে বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়ে শহরের স্কুলে তাঁর পড়ার ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরলেন। যথা সময়ে স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভালভাবেই তিনি পাস করলেন। যখন পরীক্ষার ফল বেরল তখন তিনি বাড়িতে। তাঁর এক মামাতো ভাই খবর নিয়ে এল। বাবা-মার কি আনন্দ। সারা গাঁয়ে, পাশাপাশি গাঁয়েও খবর ছড়িয়ে পড়ল। তখন এ তল্লাটে, এমন কি কালিকাপুরেও কেউ ম্যাট্রিকুলেশন পাস ছিল না। পাড়ার মুরুব্বীরা চণ্ডীমণ্ডপে তাঁদের

দিন আড্ডায় তাঁর পাস করার সম্বন্ধে আলোচনা তে লাগলেন, তিনি যে একদিন জজ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট ন, তাও দু-একজন ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগলেন।

পুকুরঘাটে স্নানের সময়ে মেয়েদের মধ্যেও এ লোচনা চলতে লাগল—যে-সে ছেলে নয়। পাস-করা লে। এ গাঁয়ের খুব ভাগ্যি যে এমন একটা ছেলে জন্মেছে।

রায়বাবুদের বড় কর্তা পরাশরবাবু একদিন তাঁকে খতে চাইলেন। বাবা একদিন তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে লেন তাঁর কাছে। কর্তাবাবু তাঁকে মাথায়-পিঠে হাত লিয়ে আদর করলেন, বললেন, পড়াশুনা চালিয়ে যাও বা। ভাবছি গ্রামে একটা মাইনর স্কুল করব, তোমাকে ডমাস্টার করে দেব।

কলেজে ভর্তি হলেন, বছরখানেক পড়লেন। এই য়ে হঠাৎ বাবার মৃত্যু হল। মা শোকের ভারে য্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। বাড়িতে তাঁকে দেখবার কেউ ল না। বাধ্য হয়ে পড়াশুনায় ইতি করে দিয়ে বাড়িতে সে বসতে হল তাঁকে।

মা বিছানায় পড়ে থেকেও খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, ই কলেজের পড়া শেষ করবি, পড়া ছেড়ে দিয়ে এসে তা ভাল করলি না বাবা।…তিনি তাঁকে জানালেন, য়বাবুদের বড় কর্তা ওঁদের গাঁয়ে মাইনর স্কুল করছেন। মাকে হেডমাস্টার করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

খবরটা জেনে মা কতকটা আশ্বস্ত হলেন।

বছরখানেকের মধ্যেই কালিকাপুরে মাইনর স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল। পরাশরবাবু হেডমাস্টারের কাজের ভার তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

স্কুলটিকে বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলতে লাগলেন মাস্টারমশায়। শিবু পণ্ডিতও তার কিছুদিন পরেই ওই স্কুলে পণ্ডিতের কাজে ঢুকেছিলেন। তিনিও মাস্টার-মশায়কে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলেন। ক্রমে স্কুলটি মহকুমার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুল হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেক বছর জেলা-বোর্ডের বৃত্তি পরীক্ষায় স্কুলের দু-একটি ছেলে প্রথম-দ্বিতীয় হয়ে বৃত্তি পেত। রায়-বাবুদের বাড়ির কয়েকটি ছেলে তাঁদের স্কুলের পড়া শেষ করে বড় স্কুলে গিয়ে খুব ভালভাবে পাস করেছিল। বড় স্কুলের শিক্ষকদের কাছে ছেলেরা খুব প্রশংসা অর্জন করেছিল। তারা সে প্রশংসা নিজেরা নেয় নি। মাস্টারমশায়কেই উৎসর্গ করে দিয়েছিল।

স্কুলের কাজে যোগ দেবার বছর কয়েক পরে তাঁর বিয়ে হল। মা নিজে দেখে পছন্দ করে তাঁর বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে একটি মেয়েকে বউ করে ঘরে আনলেন। বউও ঘরে এসেই সংসারের কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। মায়ের সেবা-যত্ন ত্রুটিহীন-ভাবে করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মায়ের কাছ থেকে একটি মেয়ের জন্য যে স্নেহ-সঞ্চয় তাঁর বুকের এক কোণে লুকনো ছিল, তার সবটুকু আদায় করে নিলেন। বছর কয়েকের মধ্যে একটি কন্যা ও পুত্র হল তাঁদের। মায়ের নয়ন-মণি হয়ে উঠল তারা। সারাদিন তাদের নিয়েই কাটত মায়ের। রাত্রেও তাদের দুজনকে দু পাশে নিয়ে তিনি ঘুমোতেন। বাবার মৃত্যুর পর থেকে যে কালো আঁধার নেমেছিল মায়ের মনে, তা কেটে গিয়ে আলোময় হয়ে উঠেছিল তাঁর সারা মন। সেই আলোর আভা তাঁর চোখেমুখে ফুটে থাকত সারাদিন।

খোকা জন্মাবার বছর চার পরে মা চলে গেলেন। সংসারের ভার—এর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের ভারও তাঁর স্ত্রীর ঘাড়ে পড়ল। তিনি নীরবে সব ভারই বহন করতে লাগলেন।

তাঁর স্কুলের কাজ একই ভাবে চলতে লাগল। সকাল নটায় স্নান করে কোনমতে আহার সেরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দশটায় স্কুলে পৌঁছতেন। যাবার সময় শিবু পণ্ডিতও সঙ্গে থাকতেন। বেলা চারটে পর্যন্ত স্কুলের কাজ চলত। স্কুলের ছুটির পর সব বাড়ি চলে যেত, মাস্টারমশায়কে তারপর অফিসের কাজ করতে হত। সন্ধ্যার কিছু আগে স্কুল থেকে বেরিয়ে, স্টেশনের কাছে একটা খাবারের দোকানে কিছু জলখাবার খেয়ে নিয়ে রায়বাবুদের বাড়ি যেতেন। ওখানে কয়েকটি ছেলে তাঁর কাছে 'প্রাইভেট পড়া' পড়ত। তাদের পড়ানো শেষ করতে রাত আটটা বেজে যেত। তারপর ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনবার দরকার থাকলে তা শেষ করে, মেঠো পথ দিয়ে একা বাড়ি ফিরতেন।

গৃহিণী খুঁতখুঁত করতেন, এত রাতে মাঠে দিয়ে একা

বাড়ি ফেরা। কি যে হবে কে জানে!…তিনি বাড়ি ঢুকবামাত্র ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরত। মা এসে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছাড়িয়ে নিতেন। যেদিন দুজনের জন্য কোন খেলনা নিয়ে যেতেন, সেদিন খেলনা দেখবামাত্র তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তারা খেলনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। তিনি তারপর কাপড় জামা ছেড়ে, মুখহাত ধুয়ে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে, ছেলেমেয়েদের কাছে টেনে নিতেন। তাদের আদর করতেন, তাদের সারাদিনের গল্প শুনতেন; তাদের গল্প শোনাতেন। তারা একটু বড় হয়ে ওঠবার পর তাদের পড়াতেন।

অনেকদিন কেটে গেল। কালিকাপুরের অনেকগুলো ছেলে উচ্চশিক্ষিত হয়ে বড় বড় চাকরিতে ঢুকল। তাদের সমবেত চেষ্টায় ছোট স্কুলটি ক্রমে বড় হয়ে উঠে উচ্চ-ইংরেজী স্কুলে পরিণত হল। অনেকগুলো নতুন নতুন শিক্ষক কার্যে নিযুক্ত হল। নীচের ক্লাসের শিক্ষক হিসাবে মাস্টারমশায়ের চাকরি বজায় রইল। স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক হলেন, তিনি মাস্টারমশায়ের পুরনো ছাত্র ছিলেন। কাজেই তিনি মাস্টারমশায়কে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে কার্পণ্য করতেন না।

মাস্টারমশায় তাঁর কাজ ত্রুটিহীন ভাবেই করে যেতে লাগলেন। তাঁর ছেলেমেয়ে দুটি ক্রমে বড় হয়ে উঠল। মেয়েটি পনেরোয় পা দিতেই গৃহিণী তার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রায়ই বলতে লাগলেন, হ্যাঁ গো, স্কুলের কাজ নিয়ে থাকলেই হবে? মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে না?

তিনি জবাব দিতেন, কখন করি বল? একটা ছুটিছাটা হোক, তখন যাব।

গৃহিণী বলতেন, স্কুলের ছুটি হলেও তোমার ছুটি হয় কি? তখনও তো ছেলে পড়াতে থাক।

তিনি হয়তো জবাব দিতেন, কি করব বল? যা দিনকাল পড়ছে, বাইরে থেকে কিছু না আনতে পারলে উপোস করতে হবে যে।

গৃহিণী বলতেন, সবই তো বুঝি। কিন্তু এতবড় মেয়ে আইবুড়ো করে ঘরে বসিয়ে রাখা কি ভাল? লোকে বলবে কি? তোমার দ্বারা কিছু হবে না, আমি জানি। আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কিছুদিন পরে তিনি বাপের বাড়ি গিয়ে তাঁর দাদাকে ধরলেন। তিনি তাঁদের পাশের গাঁয়ে তাঁর এক বন্ধুর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ফেললেন।

গৃহিণী ফিরে এসে সব পরিচয় দিলেন, চমৎকার ছেলে। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। বি. এ. পাস। ওখানকার বড় স্কুলে মাস্টারী করে। অবস্থা বেশ ভাল। জমি-জমা পুকুর-বাগান বিস্তর। ছেলের দাদা ডাক্তার। মাসে অনেক টাকা রোজগার। খুকীর অদৃষ্ট খুব ভাল যে এমন ঘরে পড়ছে, ওরকম ছেলে জোটানো তোমার সাধ্যিতে কুলতো না। ভাগ্যে দাদা ছিলেন তাই জুটল।

তিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, পণ কত লাগবে?

গৃহিণী একটু চুপ করে থেকে বললেন, ওরকম ঘরে ওরকম ছেলেকে মেয়ে দেবার জন্যে চারদিকের মেয়ের বাপেরা ছোটাছুটি শুরু করেছে, মোটা টাকা পণ দেবে বলছে, চিঠির গাদা হয়ে গেছে বাড়িতে, দাদা নিজের চোখে দেখে এসেছেন।

তিনি বললেন, সবই তো বুঝছি। তোমার দাদা কততে থই পেলেন?

গৃহিণী বললেন, ছেলের দাদা চেয়েছিলেন ছ হাজার টাকা। দাদা অনেক বলে-কয়ে চার হাজারে রাজি করেছেন।

টাকার অঙ্ক শুনে মাথা ঘুরতে শুরু করল তাঁর, গলা শুকিয়ে গেল। কোনমতে বললেন, অত টাকা কোথায় পাব?

গৃহিণী বললেন, যেমন করে হোক যোগাড় করতে হবে, না হলে দাদার মান থাকবে না।

মাস্টারমশায় মুখে কিছু বললেন না, মনে মনে বললেন, তোমার দাদার মান রাখতে গিয়ে যে আমাকে সর্বস্ব ঘুচিয়ে পথের ভিখিরী হতে হবে।

টাকার যোগাড় হল। তাঁদের বাড়ির পাশে মুখুজ্জেদের বাড়ি। ওই বাড়ির একজন—নাম মদ… মুখুজ্জে—সম্প্রতি ঝরিয়া অঞ্চলে কোন একটি কোলিয়ারিতে কণ্ট্রাক্টরি করে বহু টাকার মালিক হয়েছে। গ্রামে মাটির বাড়ি ভেঙে দোতলা দালান তুলেছে। পুজো সময়ে বাড়ি আসতেই মাস্টারমশায় তাকে ধরলেন। সে মাস্টারমশায়ের জমি-জায়গা যা ছিল কিনে নিয়ে মূ…

হিসাবে সাড়ে চার হাজার টাকা দিল। যথাসময়ে মেয়ের বিবাহ সুষ্ঠভাবেই হয়ে গেল। তবে ভাঙা মেটে বাড়িটি ছাড়া মাস্টারমশায়ের নিজের বলতে কিছুই আর রইল না।

খুকীর বিয়ের পরের বছর খোকা কালিকাপুরের স্কুলের পড়া শেষ করল। কালিকাপুরের স্কুলটি তখনও মাইনর অবস্থা ছাড়িয়ে উচ্চ-ইংরেজীতে পরিণত হয় নি। কাজেই খোকাকে অন্যত্র কোন উচ্চ-ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মাস্টারমশায় ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে জেলা-শহরের স্কুলে ভর্তি করালেন। স্কুলের বোর্ডিং থেকে ছেলেটি ওই স্কুলে পড়তে লাগল। মাস্টারমশায় টিউশনির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে ছেলের পড়ার খরচ চালাতে লাগলেন।

ছেলেটি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভালভাবে পাস করল। কলেজে পড়বার ঝোঁক ধরল। ছেলের মাও তাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। মাস্টারমশায়ের ইচ্ছা ছিল মদন মুখুজ্জেকে ধরে ছেলেকে কোলিয়ারীর কোন চাকরিতে ঢোকাবার। কিন্তু ছেলে ও গৃহিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারলেন না। ছেলেকে কলেজে পড়াবার সব ব্যবস্থা করলেন।

ছেলে কলেজে পড়তে লাগল। কলেজে পড়ানোর খরচ খুব বেশী। মাসের রোজগারে কুলোত না। মাসে মাসে কিছু দেনা করতেই হত। দেনা করতেন মদন মুখুজ্জের ভাই সুদন মুখুজ্জের কাছে। সুদন তখন তার দাদার পয়সায় গাঁয়ে ও পাশাপাশি গাঁয়ে তেজারতি, মহাজনী শুরু করেছিল। ছেলেবেলায় মাস্টারমশায়ের ছাত্র ছিল সে। মাস্টারমশায়কে খাতির করত। মাস্টার-মশায়ের যা প্রয়োজন হত, দিতে কুণ্ঠাবোধ করত না। তবে তার হিসাবের খাতায় মাস্টারমশায়কে শুধু প্রাপ্তি-স্বীকার করে নাম সই করে দিতে হত।

ছেলেটি ভালভাবেই বি. এস-সি. পরীক্ষায় পাস করল। কলেজে একটি ছেলের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। কোন কোন ছুটিতে সে বাড়িতে মা-বাবার কাছে না এসে বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়ে সারা ছুটিটা কাটিয়ে আসত। ছেলেটির বাবা খুব বড়লোক। দু-তিনটে কোলিয়ারীর মালিক। তাঁদেরই স্বজাতি। ছেলে বাড়ি এলে গৃহিণী তাকে তার বন্ধুর বাড়ির লোকেদের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করতেন, কেমন মানুষ সব? তোকে খুব আদর-যত্ন করে তো? আমাদের পালটা ঘর, না? তোর বন্ধুর বোন-টোন নেই?

আছে।

কেমন দেখতে?

ভাল।

আমাদের বাড়িতে মেয়ে দেবে?

ছেলে যা যা জানাবার মাকে সবই জানাত। গৃহিণীও মাস্টারমশাইয়ের কাছে এ সম্বন্ধে নানা গল্প করতেন। বলতেন, খোকা বলছিল, খুব বড়লোক ওরা। মস্ত বড় বাড়ি। দু-তিনটে বড় বড় মোটর গাড়ি আছে। খোকার বউ হবার মত একটি মেয়ে আছে বাড়িতে। খুব ভাল চেহারা। খোকার যদি বিয়ে হয় ওখানে তো খোকার জন্যে আমাদের আর ভাবতে হবে না।

বি. এস-সি. পাস করার পর ছেলের বন্ধুর বাবা পরেশবাবু তাঁর একটা কোলিয়ারীতে তার খনি-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। গৃহিণীর মনে আশা-আনন্দের হাওয়া বইতে লাগল। প্রায়ই বলতে লাগলেন, খুব বড় চাকরি হবে খোকার। দাদা বলছিলেন, হাজার দু হাজার মাসে মাসে রোজগার, মদনবাবুদের মত লোকেরাও হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে সামনে।

বছর দুই পরে পরেশবাবু তাঁর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করে চিঠি লিখলেন। গৃহিণী সানন্দে মত দিলেন। তবে দু-একবার খুঁতখুঁত করলেন, এত বড়লোকের মেয়ে আমাদের মত গরীবের বাড়িতে এসে থাকতে পারবে!

মাস্টারমশাই মনে মনে বললেন, এ বাড়িতে সে কোনদিন আসবে না, ভয় নেই তোমার। মুখে বললেন, তোমার ছেলে তো বড় চাকরি করবে একদিন। এখানে মাটির বাড়ি ভেঙে মদন মুখুজ্জের মত ইমারত তুলবে। তখন তোমার বউয়ের থাকতে কষ্ট হবে কেন!

গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বললেন, সত্যি! তাহলে চিঠি লিখে দাও, তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাক।

বিয়ে হল। বউমাটি দেখতে-শুনতে চমৎকার।

গৃহিণী সাদন্দে বলতে লাগলেন, পাড়ার সেরা বউ হয়েছে আমার।

পাড়ার গিন্নীদের পরিচয় দিতে লাগলেন, এত বড়লোকের মেয়ে—কেমন চমৎকার ব্যবহার। মুখে কথাটি নেই। হবে না কেন? লেখাপড়া জানা মেয়ে যে! ইংরেজী জানে।

বউমা বিয়ের পর দু-একবার বাড়িতে এসেছিল। দিনকয়েক করে ছিল। তারপর আর আসে নি। বিয়ের কয়েক বছর পরে পরেশবাবু তাঁর ছেলেকে ডাক্তারী পড়বার জন্য ও জামাইকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার জন্য বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে ছেলে যথাসময়ে ফিরে এল। এখন সে একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার। সরকারী চাকরি, বাংলাদেশের বাইরে একটা শহরে থাকে। বিলেত থেকে ফিরে কয়েকবার বাড়ি এসেছিল। তারপর আর আসে নি। গৃহিণী প্রায়ই সখেদে বলতেন, বড়লোক শ্বশুর-শাশুড়ী পেয়ে খোকা আমাদের ভুলে গেছে।

অনেকদিন কাটল। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি হল। এই সময়ে কালিকাপুরের কাছে কারখানার কাজ শুরু হল। কয়েক বছরের মধ্যেই পর পর বড় বড় অনেকগুলো কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। হাজার হাজার নতুন মানুষ এসে কাজ করতে লাগল। পুরনো বাসিন্দারা পিছনে কোণঠাসা হয়ে রইল। দেশ-বিদেশের কত লোক কন্ট্রাক্টারী করে কত বড় বড় বাড়ি করল। পাশাপাশি গাঁয়েরও কয়েকজন কন্ট্রাক্টারী করে বড়লোক হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কালিকাপুরের স্কুলটাও বেড়ে উঠতে লাগল। একটা সুবিধাও ঘটে গেল। রায়বাবুদের বাড়ির একজন শিক্ষা-বিভাগের প্রধান-পরিচালকের পদে উন্নীত হল। আর একজন শাসন-সভার একজন মাতব্বর সভ্য হয়ে উঠল। তাদের চেষ্টায় গ্রামের উচ্চ-ইংরেজী স্কুলটি উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত হল।

বাইরে থেকে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ অনেক নতুন নতুন শিক্ষক এসে কাজে যোগ দিল। একজন প্রধান শিক্ষক, বাকিগুলি সহকারী শিক্ষক। পুরনোরা একে একে বিদায় নিয়ে অন্যান্য ছোট ছোট স্কুলে চাকরি জুটিয়ে চলে গেল। স্কুলের আবহাওয়া বদলে গেল। আগে যে কোন শিক্ষক পদমর্যাদায় তাঁর উপরে হলেও তাঁকে বয়সের সম্মানটা দিতে কার্পণ্য করত না। নতুন যারা এল, তারা মাস্টারমশায়ের ছেলের বয়সী হলেও তাঁর সামনে সিগারেট খেতে লাগল। তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, পাঠশালার পণ্ডিতদের আধুনিক স্কুলে শিক্ষাদানের কাজ থেকে বিদেয় করে দেওয়া উচিত।

ষাটের কোঠায় পা দিতেই প্রধান শিক্ষকমশায় তাঁকে চাকরি থেকে বিদেয় করে দিলেন। নবীন শিক্ষকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

গৃহিণীকে খবরটা জানান নি কিছুদিন। সকাল সকাল ভাত খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তেন। কালিকাপুরে গিয়ে স্কুলের আশেপাশে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াতেন। তারপর স্কুল থেকে অনেকটা দূরে, পোড়ো মাঠের মধ্যে একটা ছোট পুকুরের ধারে একটা বড় বট-গাছের নীচে বসে থাকতেন। কাছেই রাখাল-বালকেরা গরু-মহিষ মাঠে ছেড়ে দিয়ে খেলা করত। তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত তাঁর দিকে।

হঠাৎ তাঁর জ্বর হল একদিন। বাড়ি থেকে বেরুতে পারলেন না কয়েকদিন। গৃহিণী বললেন, হ্যাঁ গো, স্কুলে খবর দেবে না?

তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, দেবেন।

জ্বর ছাড়তে চাইল না। গৃহিণী চিকিৎসার জন্য না হোক, চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন আচ্ছা, খবর দেবার কি হবে! বল তো পাড়ার যারা ওখানে কাজে যায়, তাদের কাউকে ডেকে আনি। তুমি একটা চিঠি লিখে রাখ, যাবার পথে স্কুলে দিয়ে দেবে।

পাড়ার একটি ছেলে রমাপতি কালিকাপুরে এক ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে কম্পাউণ্ডারি করে; সাইকেলে যাতায়াত করে রোজ; তারই কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, আজ থাক কাল দেব।—একটু চুপ করে থেকে বললেন, এতদিনের চাকরি কি এত সহজে যায়!

গৃহিণী বললেন, তা তো জানি। তবু বুড়ো অথর্ব হলে সে কথা কি আর ভাবে কেউ। বিদেয় করে দেয়।

তাঁর এ সম্বন্ধে কোন চাড় না দেখে, গৃহিণী পরে

দিন রমাপতিদের বাড়ি গিয়ে তাকে বললেন, ওর জর। মাথা তুলতে পারছেন না। স্কুলে খবর দিতে পারেন নি। একটু সামলে উঠে চিঠি দেবেন। তুমি হেডমাস্টার মশায়কে খবরটা দিয়ো।

রমাপতি বড় ভাল ছেলে। কোন অনুরোধ করলে কখনও না বলে না। স্কুলে গিয়ে খবর দিয়ে এল; আসল খবর নিয়েও এল। শুনে গৃহিণী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন: তাই নাকি! চাকরি নেই! আমাকে তো কিছু বলেন নি! এখন কি হবে আমাদের!

স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার চাকরি নেই আমাকে বল নি তো?

মাস্টারমশায় চুপ করে রইলেন, গৃহিণী বললেন, বাকি দিনগুলো কাটবে কি করে আমাদের?

মাস্টারমশায় চুপ করে রইলেন। গৃহিণী বললেন, হ্যাঁ গো, কেটে নেওয়া টাকাটা ফেরত দিয়েছে তো?

মাস্টারমশায় ঘাড় নাড়লেন।

কোথায় রেখেছ?

মাস্টারমশায় মুখের ইঙ্গিতে টিনের ছোট বাক্সটা দেখালেন। গৃহিণী তাড়াতাড়ি বাক্সটার কাছে গিয়ে বাক্সটা খুলে একটা ছোট বাণ্ডিল বার করে বললেন, এটা, না? কত আছে?

মাস্টারমশায় ধীরে ধীরে বললেন, বেশী নয়, পাঁচ শো টাকা।

গৃহিণী বললেন, মাত্র! একটা বছরও চলবে না যে! ছেলে পড়ানো তো বন্ধ হয়ে যাবে। আর কি কোন ছেলে তোমার কাছে পড়বে!

মাস্টারমশায় ঘাড় নেড়ে জানালেন, পড়বে।

বিনা চিকিৎসায় অসুখ সারতে চাইল না। গৃহিণী রমাপতিকে ধরলেন। সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। চিকিৎসায় খরচ হল বেশ। গৃহিণী আর্তনাদ করতে করতে দুটি দশ টাকার নোট রমাপতির হাতে তুলে দিলেন।

সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠতে মাস দুই লাগল। তারপর যাদের পড়াতেন, তাদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে খোঁজ নিলেন। কেউ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে নি, নতুন মাস্টারমশায়দের কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

এই সময়ে সুদন তাঁকে খুব সাহায্য করল। তেলী-তামলীদের অনেকেই তার খাতক ছিল। কাজেই ও পাড়াতে তার খাতির ছিল খুব। সে পাড়ার মুরুব্বীদের ডেকে আজকাল লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিল। আজকাল তেলী-তামলী ইত্যাদি জাতির ছেলেরাও যে লেখাপড়া করছে, স্কুলে নয় কলেজেও—কত ছেলে লেখাপড়া শিখে বড় বড় পাস করে বড় বড় চাকরি করছে, নাম-ধাম উল্লেখ করে তার অনেক উদাহরণ দিল। সেই সব শুনে পাড়ার মুরুব্বীরা পাড়ায় একটি পাঠশালা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। ফলে অচিরে পাড়ার চণ্ডী-মণ্ডপে জন ত্রিশেক ছাত্র নিয়ে একটি পাঠশালা বসল। মাস্টারমশায় পণ্ডিতের কাজ করতে লাগলেন।

কিন্তু মাসের শেষে যা হাতে পেলেন তা গৃহিণীর হাতে দিতেই তাঁর চোখ কপালে উঠল। বললেন, এই! এতে কি করে সারা মাস চলবে! তোমার ফাণ্ডের টাকায় হাত পড়বে যে!

মাস্টারমশায় বললেন, কি করব বল! চেষ্টা তো করছি নানা রকমে।

একদিন গৃহিণী বললেন, খোকাকে চিঠি লিখলে হয় না?

মাস্টারমশায় বললেন, অসুখের সময় তো চিঠি লিখিয়েছিলে, একদিন এসেছিল কি?

গৃহিণী ম্লান মুখে চুপ করে রইলেন। সত্যি! রমাপতিকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলেন ছেলেকে, অসুখের খবর দিয়ে কিছু টাকার জন্যও। ছেলে আসে নি, একটা জবাবও দেয় নি।

এমনই করে বছর দুই কাটল। হাতের টাকা ক্রমে শেষ হয়ে এল। মাস্টারমশায় এবং তাঁর গৃহিণীর মনে ও মুখে আঁধার নামল—দিন দিন ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

সুদন মুখুজ্জের হাতের মুঠো খোলাই রইল। মাস্টারমশায়ের সংসার-খরচের টাকা যোগাতে লাগল সে। তবে জেলা-আদালতে মাস্টারমশায়কে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিয়ে বাড়ি-বন্ধকী দলিলে নাম-সই করিয়ে নিল।

বছর খানেক পরে সুদন একদিন মাস্টারমশায়কে ডেকে পাঠাল। মাস্টারমশায় যেতেই আপ্যায়ন করে

বসিয়ে চা খাবার খাইয়ে, কিছুক্ষণ নানা গল্প করে আসল কথাটা পাড়ল, আপনার তো অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে মাস্টারমশায়? আমি একটা কথা আপনাকে বলতে চাইছি—অবশ্য আমার নিজের কথা নয়। দাদা চিঠি লিখেছেন আপনাকে বলবার জন্য।

ভয়ে মাস্টারমশায়ের মুখ শুকিয়ে উঠল, বুক ধড়ফড় করে উঠল, কিছু বললেন না; জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন সুদনের মুখের দিকে। সুদন একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগল, দাদা লিখেছেন যে আমাদের যে বাড়ি তৈরি হয়েছে, তাতে দু ভায়ের কুলোবে না, আর একটা বাড়ি তুলতেই হবে। দু ভাইয়ের বাড়ি দুটো কাছাকাছি হওয়াই ভাল তো। মাস্টারমশায় যদি ওঁর পৈতৃক বাড়িটা তাদের বিক্রি করে দেন, তা হলে খুব সুবিধে হয়।

এই কথাটাই একদিন শুনতে হবে বলে মাস্টারমশায় অনেক দিন থেকেই মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। তবু এই কথাটা শোনা মাত্র তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। মনে হল এর পর স্ত্রীর হাত ধরে তাঁকে পথে পথে ভিক্ষে করতে হবে। শেষে একদিন রাস্তার ধারে কোথাও শিয়াল-কুকুরের মত মরে পড়ে থাকতে হবে।

সুদন বলতে লাগল, আমি বলি কি, দাদা যা বলছেন আপনি তাই করে ফেলুন। আপনার বাড়ির ন্যায্য দাম দাদা দিতে প্রস্তুত আছেন। কাজেই আজকাল জায়গার যা দর যাচ্ছে, সে হিসাবে আপনার যা পাওনা হবে, তাতে আপনার সব দেনা শোধ হয়েও প্রায় হাজারখানেক টাকা নগদ পাবেন।

মাস্টারমশায়ের গলা শুকিয়ে উঠেছিল। কোনমতে বললেন, আমরা থাকব কোথায়?

সুদন বলল, আপনার ছেলে এত বড় সরকারী চাকুরে! তা ছাড়া কত বড় লোকের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে কি আর পাড়াগাঁয়ে কোনদিন বাস করবে! মস্ত বড় কোন শহরে মস্ত বড় বাড়ি করে বাস করবে। আপনারাও বুড়ো হয়েছেন দুজনে। এখানে এ ভাবে পড়ে থাকবার দরকার কি? ছেলে-বউয়ের কাছে থাকুন গে।

মাস্টারমশায় জবাব দিলেন না।

সুদন বলতে লাগল, যদি গাঁয়ের মায়া কাটাতে না চান তো একটা কথা বলি, যতদিন আপনারা বেঁচে থাকবেন, ততদিন আমরা ওখানে কিছুই করব না; আপনারা ওই বাড়িতেই থাকবেন। আপনাদের অবর্তমানে যা করবার করা হবে। এ বিষয়ে দাদাকে বুঝিয়ে বললে দাদা গররাজী হবেন না বলে আমার বিশ্বাস।

গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে জবাব দেবেন বলে মাস্টারমশায় বিদায় নিলেন।

বাড়িতে এসে গৃহিণীকে কথাটা বলতেই তিনি আঁতকে উঠে বললেন, সে কি গো! পৈতৃক ভিটে বিক্রি করে দেবে! পিতৃ-পুরুষরা মনে করবেন কি! খোকাই বা কি বলবে! তা ছাড়া যে কদিন বাঁচব, থাকব কোথায়?

সুদন যা বলেছিল মাস্টারমশায় সব জানালেন স্ত্রীকে। হাজার টাকা নগদ দেবে শুনে গৃহিণী অনেকটা ঠাণ্ডা হলেন, শেষে রাজী হয়ে গেলেন।

মাসখানেক পরে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। নগদ টাকাটা কালিকাপুরের পোস্ট-অফিসে জমা করে দিয়ে এলেন মাস্টারমশায়। সুদন যা কথা দিয়েছিল তা রাখল। তার দাদাকে বলে-কয়ে মাস্টারমশায়দের বাড়িটাতে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত বাস করতে দেবার ব্যাপারে রাজী করাল।

দিন চলতে লাগল কোন রকমে। হঠাৎ গৃহিণী অসুখে পড়লেন। রমাপতি দেখল, ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করল। পাঠশালার কাজে মাস্টারমশায়কে প্রায় সারা-দিন বাইরে থাকতে হয়। দুটো ভাত না হয় নিজে ফুটিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা কি হবে! ছেলেকে লিখে কোন ফল হবে না। মেয়েকে চিঠিতে সব জানালেন। চিঠি পেয়েই মেয়ে মাকে দেখতে এল। কিছুদিন মায়ের সেবা-যত্ন করল। কিন্তু বেশিদিন মায়ের কাছে থেকে সেবা করবার উপায় ছিল না তার। ভাসুরের মস্ত বড় সংসার। তাদের একটি ছেলে, একটি মেয়ে। বড়-জা চিররুগ্না। কাজেই সংসারের সব ভার তার ওপর পড়েছিল। নেহাত মায়ের অসুখ, তাই কোনমতে বড় জাকে রাজী করিয়ে সে মাসখানেকের জন্যে

এসেছিল। কিন্তু মার অসুখ সহজে সারবে বলে মনে হল না। মাসখানেক পরে মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেল। রান্নাবান্না ও রোগীর সেবা, তার আর সব কাজ মাস্টারমশায়ের হাতে পড়ল। পাঠশালার কাজ বন্ধ করে দিতে হল মাস্টারমশায়কে।

মাস দুই কাটল। রমাপতি বলল, ভাল করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার, না হলে—

মাস্টারমশায় বললেন, তুমি আজই তার ব্যবস্থা কর বাবা।

রমাপতি তাদের ডাক্তারবাবুকে এনে রোগী দেখাল। ডাক্তারবাবু পাঁচ টাকা ফি নিলেন, দামী দামী ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। রমাপতিই টাকার ব্যবস্থা করল। মাস্টারমশায় পোস্ট-অফিস থেকে টাকা তুলে তার দেনা শোধ করলেন।

গৃহিণীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। রমাপতি জেলা-শহরের একজন বড় ডাক্তারকে দেখাবার পরামর্শ দিল। বলল, মোটা টাকা ফি নেবে অবশ্য, তবু একবার দেখালে অনেকটা সুবিধে হবে মনে হয়।

মাস্টারমশায় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। রমাপতি সব ব্যবস্থা করল। বড় ডাক্তার এসে গম্ভীর মুখে রোগীর রোগ পরীক্ষা করলেন। অনেকক্ষণ দেখেশুনে বাইরে এসে বললেন, খুব আশা দিতে পারছি না, তবে ভগবানের ওপর নির্ভর করে চেষ্টা করতে হবে।

ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে ও মোটা ফি নিয়ে বিদায় হলেন।

কিন্তু কোন ফল দেখা গেল না। মাসখানেক পরে গৃহিণী চলে গেলেন। যাবার আগে একটি কথা বলতে লাগলেন বার বার—তোমার কি হবে? আমি যে মরেও শান্তি পাব না।

শ্রাদ্ধশান্তি কোনমতে চুকল। রমাপতিই সব ব্যবস্থা করল। মেয়ে এসেছিল খবর পেয়ে। কাজ-কর্ম শেষ হলে চলে গেল। ছেলেকেও মাস্টারমশায় চিঠি লিখেছিলেন। এক মাস পরে চিঠির জবাব এল। ছেলে লেখে নি, লিখেছিল বউমা; শাশুড়ীর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছিল, আর জানিয়েছিল যে, সরকারী কাজে ওঁকে বিলেত যেতে হয়েছে। বছরখানেক পরে ফিরবেন।

তিন

দুঃখের দিনও কাটে। মাস্টারমশায়েরও দিন কোন রকমে কাটতে লাগল। হাতে কাজ ছিল না। কারণ গৃহিণীর অসুখের জন্য তিনি পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করতেই তেলী-তামলী পাড়ার মুরুব্বীরা নদীর ওপারের এক গ্রাম থেকে একজন পণ্ডিতের ব্যবস্থা করেছিল। যে বাড়িতে এতদিন দুজন একসঙ্গে কাটিয়েছেন সেখানে একা একা কাটাতে তাঁর মন চাইছিল না। এর চেয়ে মাঠের মধ্যে মুক্ত আকাশের নীচে জীবন কাটানো ভাল মনে হচ্ছিল। সকালে উঠে কোনমতে দু মুঠো চাল ফুটিয়ে নিয়ে, নাকে-মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়তেন, কালিকাপুরে গিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে, সেই মাঠের মধ্যে পুকুরের পাশে বট-গাছটার নীচে ঘুমিয়ে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরতেন। রাত্রে ঘুম আসতে চাইত না। সারারাত উঠোনে বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে কাটিয়ে দিতেন।

একদিন শিবু পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কালিকা-পুরের বাজারে। শিবু পণ্ডিত তাঁর খবর জিজ্ঞাসা করতেই মাস্টারমশায় সব খবর জানিয়ে শেষে বললেন, পরের দয়ার উপর নির্ভর করে পরের বাড়িতে আর একা-একা কাটাতে পারছি না ভাই। একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও না।

শিবু পণ্ডিত বললেন, আমাদের গাঁয়ে একটা পাঠশালা গড়ে তুলেছিলাম স্কুলের কাজ থেকে বেরিয়েই। এতদিন বেশি ছেলে ছিল না। একাই চালাচ্ছিলাম। এখন ছাত্রের সংখ্যা ষাটের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। একা আর পেরে উঠছি না। তা ছাড়া কতকগুলো ছাত্র আবার ইংরেজী পড়তে চাইছে। তা তো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। তাই ভাবছিলাম, একজন কিছু ইংরেজী-জানা সহকর্মী সংগ্রহ করতে হবে। কতদিন ধরে এখানে ঘোরাঘুরি করছি তার সন্ধানে। তোমার সঙ্গে দেখা হল ভালই হল। তোমাকে যদি পাই তাহলে সবচেয়ে ভাল হবে। তুমি কি আমাদের পাঠশালায় কাজ করবে?

মাস্টারমশায় সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। এবং কয়েক দিন পরেই তাঁর সামান্য যা কিছু জিনিসপত্র ছিল, সব নিয়ে শিবু পণ্ডিতদের গাঁয়ে গিয়ে হাজির হলেন। শিবু পণ্ডিত তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

সেই থেকে বছর কয়েক ধরে মাস্টারমশায় এ গাঁয়ে বাস করছেন, গাঁয়ের পাঠশালার কাজ চমৎকার ভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য গ্রামের লোকদের কাছ থেকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তবে কিছুদিন হল দেহটা ভাল যাচ্ছে না। চোখের দৃষ্টি তো অনেকদিন থেকেই কমতে শুরু করেছে। কালিকাপুরের একজন ডাক্তারকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়েছিলেন। তিনি নতুন চশমার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। চশমা বদল করেও কোন ফল হয় নি। কাজেই আজকাল মনে হচ্ছে আর বেশিদিন কাজ করতে পারবেন না। কিন্তু তারপর চলবে কি করে! পৃথিবীতে মাথা গুঁজে থাকবার মত একটা কুঁড়েঘরও নেই। পোস্ট-অফিসে আমানত রাখা টাকাও মাসে মাসে কিছু কিছু করে নিতে নিতে সব ফুরিয়ে এসেছে। কাজটা গেলে একদিন খাবার মত সম্বল নেই। কি করে বেঁচে থাকবেন। এই সব প্রায়ই মনে হচ্ছে আজকাল। আর মৃত্যুকে ডাকছেন—এস, কোলে তুলে নাও—

শিবু পণ্ডিতের সঙ্গে প্রত্যেক দিন সকালে মাস্টারমশায় কালিকাপুরে বেড়াতে যান। তাঁদের পুরনো স্কুলের মাটির ঘরটা ভেঙে মাটির স্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। সেখানটায় ঘোরাঘুরি করেন দুজনে। ভাবেন নিজেদের কথা। মাটির স্তূপটার দিকে তাকিয়ে আগের দিনের কত কথা মনে হয় মাস্টারমশায়ের। কি ছিল, কি হয়ে গেছে! কেউ একবার ফিরেও তাকায় না। তাঁর জীবনও তো মাটিতে একদিন মিশে যাবে। কেউ কি তাঁর কথা মনে রাখবে! এই তো জগতের নিয়ম। গাছে প্রতি বছর নতুন পাতা গজায়, পুরনো পাতারা ঝরে যায়। নতুনদেরই লোকে দেখে, তারিফ করে, পুরনোদের কথা কি কেউ মনে করে!

নতুন স্কুলটার কাছেও ঘোরাঘুরি করেন। কত বড় হয়ে উঠেছে স্কুলটা। কত বড় বড় বাড়ি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন সরকার। অথচ এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে একটা পাঠশালা পর্যন্ত নেই। অবশ্য গ্রামের লোকদের প্রয়োজনবোধও নেই। তাদের সেই বোধ জাগিয়ে তুলবে কে? দেশের নেতারা। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি তো তাঁদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছয় না, শাসন-সভার সভ্য নির্বাচনের সময়ে ভোট আদায়ের সময় ছাড়া।

এই রকম নানা জিনিস দেখতে দেখতে, নানা কথা ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে গ্রামে ফিরে আসেন।

ভাদ্র মাসের শেষাশেষি। একদিন সকালে শিবু পণ্ডিত ও মাস্টারমশায় বেড়াতে বেরুলেন। যতদূর দৃষ্টি যায় ধানের মাঠ কচি ধানের চারায় সবুজ হয়ে উঠেছে। পোড়ো মাঠগুলোও ঘাসে সবুজ হয়ে উঠেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে কাঁকরে জমিগুলো বড় বড় টাকের মত দেখাচ্ছে। পায়ে চলা পথটার দু পাশে ঘাসের মধ্যে নীল-লাল-সাদা রঙের ছোট ছোট অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। মাস্টারমশায় বললেন, কেমন চমৎকার ফুলগুলো! কিন্তু কেউ তাকিয়ে দেখে না। পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়।

শিবু পণ্ডিত বললেন, ঠিক বলেছ।

মাস্টারমশায় বলতে লাগলেন, এদের অবস্থা আমাদের দেশের ছোট ছোট শিক্ষকদের মত। যত গুণই থাক, কেউ তাদের পোঁছে না।

শিবু পণ্ডিত বললেন, এত নীচুতে যারা পড়ে থাকে তাদের লোকে দেখতেই পায় না, তো গুণের মর্যাদা দেবে কি করে? যাদের উঁচু ডালে ফোটবার সৌভাগ্য হয়, তাদের মর্যাদা দেয়, সাদরে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখে, ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখে ঘরের শোভা বাড়ায়।

চলতে থাকেন দুজনে। বড় রাস্তায় পৌঁছে কালিকাপুরের দিকে হাঁটতে থাকেন। রাস্তার দু ধারে মাঠের মধ্যে বাবলা গাছগুলো হলদে ফুলে ভরে উঠেছে। রাস্তার দু পাশে ঝোপঝাপগুলো অজস্র ছোট ছোট লাল ফুলে ভরে উঠেছে। পুরনো স্কুলের মাঠটাতে গিয়ে পৌঁছলেন। মাঠের ঝোপগুলোতে কত হলদে ও সাদা সাদা ফুল। মাটির স্তূপটার কাছে প্রতিদিনকার মত কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলেন। তারপর নতুন স্কুলের দিকে চললেন। খেলার মাঠটার কাছে এসে দেখলেন, মাঠে সভার আয়োজন হচ্ছে। সভামঞ্চে সভা-মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। স্কুলের ছেলেরা ঘোরাঘুরি করছে। আজকালকার ছেলেদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন দেখে বিস্ময়ে

চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন দুজনে। ভাবেন, কেমন ছিল আগে, এখন কেমন দাঁড়িয়েছে! অবশ্য তাঁদের কার্যকালেই অনেকটা পরিবর্তন তাঁরা দেখে গিয়েছিলেন ; এখন একেবারে বদলে গেছে। তখন কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে, কোন শিক্ষককে পথে দেখলে কত নম্রভাবে তারা পাশ কাটিয়ে পথ ছেড়ে দিত ; আর আজকাল ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যায়। আজকাল ছেলেরা রাস্তায় বেরোয় চোখে-মুখে আধুনিকতার রোশনাই জ্বালিয়ে, মুখে আধুনিক বুলির পটকা ফাটাতে ফাটাতে পথ চলতে থাকে ; প্রবীণ ব্যক্তিদের সামনে সিগারেট টানতে বাধে না তাদের। সত্যি, কত পরিবর্তন হয়েছে আজকাল! আরও কত হবে কে জানে!

স্কুলের সামনে আসতেই কয়েকটি ছেলে তাঁদের কাছে এগিয়ে এল। একটি ছেলে মাস্টারমশায়ের সামনে আলপিন লাগানো কাগজের তৈরি একটা ছোট পতাকা এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা নিন।

মাস্টারমশায় সাগ্রহে হাত বাড়াতেই ছেলেটি বলল, আট আনা পয়সা দিন।

মাস্টারমশায় সভয়ে হাত গুটিয়ে নিতেই ছেলেটি বলে উঠল, আজ 'শিক্ষক-দিবস', জানেন না? তাঁদের কথা স্মরণ করে দেশের প্রত্যেক মানুষকে আজ কিছু দান করতে হবে।

মাস্টারমশায় বললেন, এত তো সঙ্গে নেই বাবা।

ছেলেটি বলল, বেশ, দু আনা দিন।

মাস্টারমশায় পকেট থেকে বারো নয়া পয়সা বার করে ছেলেটির হাতে দিলেন। পতাকাটি মাস্টারমশায়ের হাতে দিল ছেলেটি। শিবু পণ্ডিতকেও বারো নয়া পয়সার বদলে একটি পতাকা গছিয়ে ছেলেটি বলল, সভায় যখন আসবেন তখন পাতাকাটি বুকের সামনে জামায় এঁটে আসবেন।

মাস্টারমশায় বললেন, সভা কখন আরম্ভ হবে?

ছেলেটি বলল, বেলা সাড়ে পাঁচটায়। কলকাতা থেকে শিক্ষামন্ত্রী আসছেন, অনেক বড় বড় লোক আসছেন। সভাশেষে মাননীয় অতিথিদের ও শিক্ষকদের সংবর্ধনা জানানো হবে।

শুনে চুপ করে রইলেন মাস্টারমশাই।

বিকেল হতেই মাস্টারমশায় ও শিবু পণ্ডিত দুজনে বেরিয়ে পড়লেন। কালিকাপুরের স্কুলের খেলার মাঠের সামনে এসে দেখলেন লোকে লোকারণ্য সভামণ্ডপে বসবার স্থান নেই—স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রেরা, নতুন শহরের বহু লোক—কালিকাপুরের ও পাশাপাশি বহু গ্রামের বহু লোক আগে থেকে জায়গা জুড়ে বসে গিয়েছে। যারা বসতে পারে নি তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতা থেকে মান্য অতিথিরা এখনও এসে পৌঁছন নি। সকলে সাগ্রহে তাঁদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। মাস্টারমশায়রা দুজনে এক পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিন-চারটে বড় বড় মোটরে করে অতিথিরা এলেন। মাস্টারমশায়েরা দূর থেকে দেখতে পেলেন না। তবে সকলে অতিথিদের নাম করতে লাগল। শুনে বুঝলেন তাঁদের ভূতপূর্ব ছাত্র রায়বাবুদের বাড়ির ছেলে অজয়বাবু এসেছেন।

যথাসময়ে সভার কাজ শুরু হল। বড় বড় বক্তৃতা হল। বক্তারা শিক্ষকদের প্রচুর প্রশংসা করলেন। প্রত্যেকেই বললেন, শিক্ষকরা জাতির পক্ষে, রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ; তাঁদের হাতে জাতির ভবিষ্যৎ গঠিত হচ্ছে ; যারা সমগ্র জাতিকে একদিন হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে, রাষ্ট্রকে ক্রমোন্নতির পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে—জাতির সেই সব ভাবী নায়কদের ও রাষ্ট্রের ভাবী চালকদের গড়ে তোলবার ভার শিক্ষকদের হাতে ; সারা জাতি তাঁদের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে, চিরদিন তাঁদের শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখবে।

মাস্টারমশায় মনে মনে বললেন—সবই হবে, যারা উচ্চ স্তরের শিক্ষক তাদের সম্বন্ধে দেশের লোক কোনদিন কোন ত্রুটি করবে না ; কিন্তু যারা নীচু স্তরের তাদের কথা দেশের লোক কেউ কোনদিন ভেবেছে কি! ভাবে, বা ভাববে কি! যখন একটা বাড়ি তৈরি হয়, যে সব শিল্পী শেষের কাজ করে, নানা চারু-শিল্প কাজ দিয়ে বাড়িটিকে সাজিয়ে মনোরম করে তোলে, তাদেরই কাজের প্রশংসা করে সবাই। কিন্তু যারা বনেদ খোঁড়ে, ভিত গড়ে তাদের কথা কি কেউ কোন দিন বলে! যে শিল্পী প্রতিমা গড়ে, পূজার সময়ে

তার কি ডাক পড়ে কখনও? পূজার আসনে বসবার যাদের সৌভাগ্য হয়, তাদেরই যত সম্মান!

সভার কাজ শেষ হল। সকলে ভিড় করে বেরিয়ে এল সভামণ্ডপ থেকে। সবশেষে বেরিয়ে এলেন মান্য অতিথিরা ও তাঁদের পিছনে শিক্ষকরা। ছাত্রেরা তাঁদের সসম্মানে স্কুলের দিকে নিয়ে গেল।

মাস্টারমশায় ও শিবু পণ্ডিত রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। সবাই চলে গেলে রাস্তা যখন ফাঁকা হয়ে গেল, ওঁরা ধীরে ধীরে স্কুলের দিকে চললেন। স্কুলের গেটের সামনে বড় বড় মোটরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শিবু পণ্ডিত বললেন, কি মতলব তোমার বল দেখি? ভাবছ একপেট ভাল-মন্দ খেয়ে যাবে?

মাস্টারমশায় চুপ করে রইলেন।

শিবু পণ্ডিত বললেন. রাত হয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে ভাববে।

মাস্টারমশায় বললেন, তুমি যাও ভাই, আমি ভাবছি অজয় রায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব।

শিবু পণ্ডিত বললেন, বেশ, তা হলে একটু অপেক্ষা করাই যাক। যদি দেখা হয়ে যায়, তা হলে আমারও কিছু বলবার আছে তাকে।

মাস্টারমশায় ভাবতে লাগলেন, তাঁর ছাত্র কি চিনতে পারবে তাকে। যদি চিনতে পারে, বলবেন, যে ক'দিন বাঁচি দু বেলা দু মুঠো খাবার ব্যবস্থা করে দাও; আর তো বেশীদিন নেই আমার। ভাল করে গুছিয়ে বুঝিয়ে বলবেন, বর্তমানে যখন শিক্ষকদের কাজের মূল্য নির্ধারণ হচ্ছে, জাতির ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হচ্ছে, তখন আমাদের মত যারা সারাজীবন শিক্ষকের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে—

হঠাৎ একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন স্কুলের ভিতর থেকে। অপরিচিত, হয়তো নতুন শহরের দিকের লোক। মাস্টারমশায়ের চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল। এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, অজয়বাবু কি আজ থাকবেন?

ভদ্রলোক বললেন, পাগল হয়েছেন! তাঁদের থাকলে চলে! কত কাজ তাঁদের!

মাস্টারমশায় একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হবে কি?

ভদ্রলোক বিস্ময়মাখা স্বরে বললেন, কে আপনি, যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান!

মাস্টারমশায় বললেন, একসময়ে ছাত্র ছিলেন আমার—যখন স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়তেন।

ভদ্রলোক শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, ওঃ! তাই নাকি। কিন্তু মশায়, সে তো অনেক নীচের ধাপে। তারপর ধাপে ধাপে আপনার চেয়ে অনেক বড়—বড় শিক্ষকের ছাত্র হয়েছেন। তারপর তাঁদেরও ছাড়িয়ে আরও কত ওপরে উঠেছেন। এখনও আপনার কথা তাঁর মনে আছে কি! তা থাকা সম্ভব নয়। মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? বাড়ি যান।

শিবু পণ্ডিত বললেন, মাত্র দু-চারটে কথা বলব, দু-চার মিনিটের বেশী সময় নেব না।

ভদ্রলোক বললেন, দু-চার মিনিটও বাজে নষ্ট করা চলবে না তাঁদের। ফিরতি পথে জেলা-শহরে বিশেষ কি কাজ আছে। সেখানে অনেকক্ষণ লাগবে। তারপর কলকাতা ফিরবেন। আপনারা বাড়ি যান।—বলে ভদ্রলোক স্টেশনের দিকে চলে গেলেন।

শিবু পণ্ডিত বললেন, চল ভাই।

মাস্টারমশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, চল।

দুজনে ধীরে ধীরে বড়রাস্তা ধরে চললেন। আকাশে এখানে-সেখানে মেঘের জমাট; তাদের ফাঁকে ফাঁকে তারার দল মিটমিট করে তাকিয়ে আছে। পূর্বদিকের আকাশটা পরিষ্কার। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার বড় চাঁদ উঠেছে আকাশে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। জ্যোৎস্নার আলোতে পথ দেখে দেখে তাঁরা পথ ছেড়ে রেললাইন পার হয়ে, মেটে রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে চললেন। এতক্ষণ মাস্টারমশায় কোন কথা বলেন নি। ভাবছিলেন, সকালে সভার কথা শুনে পর্যন্ত মনে একটি আশা জেগে উঠেছিল, হয়তো আজ একটা উপায় হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই হল না। হয়তো ভবিষ্যতে অসহায় শিক্ষকদের জন্য কোনও সরকারী ব্যবস্থা হবে, কিন্তু ততদিন তিনি বাঁচবেন না। যে কটা দিন বাঁচবেন কি করে চলবে! রেল-লাইন পার হবার সময়ে শিবু

পণ্ডিতকে বললেন, তুমি বাড়ি যাও ভাই। আমি এখানটায় বসি।

শিবু পণ্ডিত বিস্ময়ের স্বরে বললেন, সে আবার কি! অজয়ের দেখা না পেয়ে মাথা খারাপ হল নাকি! এখনি ট্রেন আসবে।

মাস্টারমশায় শুকনো হাসি হেসে শিবু পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, জানি। সেইজন্যেই তো বসতে চাইছি, এবার মরতে ইচ্ছে করছে, আর বেঁচে থাকতে ভাল লাগছে না।

শিবু পণ্ডিত তাঁর হাতটা চেপে ধরে বললেন, চল চল, পাগলামি করতে হবে না।—একটু চুপ করে থেকে বললেন, মৃত্যুর জন্যে ভাবনা নেই। যখন সময় হবে, সঙ্গে সঙ্গে এসে নিয়ে যাবে।

মাস্টারমশায় বললেন, মৃত্যুও আমাদের ভুলে যায় ভাই। যতই ডাকাডাকি কর, কান দেয় না। না হলে রোজই তো বলছি, নিয়ে যাও আমাকে এবার, যারা আমাকে ফেলে চলে গেছে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দাও।

শিবু পণ্ডিত সান্ত্বনার স্বরে বললেন, তোমার অবস্থা বুঝছি ভাই কিন্তু ওসব কথা ভেবে কি হবে। ভগবানকে ডাক, তিনি যা ব্যবস্থা করবার করে দেবেন।

ধীরে ধীরে মেঠো পথ দিয়ে তাঁরা গ্রামে পৌঁছলেন।

শিবু পণ্ডিত ঠিক কথাই বলেছিলেন। ভগবান যথা-সময়ে ব্যবস্থা করে দিলেন। দিনকয়েক পরেই মাস্টার-মশায়ের জ্বর হল। সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা উপদ্রব দেখা দিল। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হল না। হাতে টাকা ছিল না, কি করে হবে। শিবু পণ্ডিত রোজ দু বেলা খবর নিতে লাগলেন। একজন গ্রাম্য কবিরাজ ডেকে ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে উঠতে লাগল। মাস্টারমশায়ের মন থেকে ভবিষ্যতের ভাবনার কালো মেঘ কোথায় মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু অতীতের আলো-ছায়ার খেলা চলে। মনের পটে কখনও মা-বাবার মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে, মনে হয় যেন ডাকছেন তাঁকে—আয় বাবা—চলে আয়; কখনও গৃহিণীর মুখের ছবি ভেসে ওঠে। ওঁর সেই যন্ত্রণা-কাতর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কানে আসে—তোমাকে ফেলে রেখে যেতে মন চাইছে না যে! কি হবে তোমার!

শিবু পণ্ডিত রোজই দেখতে আসেন তাঁকে। একদিন শিবু পণ্ডিত বললেন, তোমার ছেলেকে একটা চিঠি দেওয়া দরকার। ঠিকানাটা আমাকে বলে দাও দেখি।

মাস্টারমশায় ধীরে ধীরে বললেন, ঠিকানা জানি না—বিলেত থেকে ফিরে আমাকে চিঠি লেখে নি।

শিবু পণ্ডিত বললেন, বিলেত যাবার আগে যেখানে ছিল সেখানেই আছে তো?

মাস্টারমশায় বললেন, কি করে জানব বল!—একটু থেমে বললেন, আগের ঠিকানা আমি বলে দেব, চিঠি লিখো।

শিবু পণ্ডিত তার পরদিন মাস্টারমশায়ের সব খবর জানিয়ে তাঁর ছেলেকে চিঠি দিলেন।

আরও কয়েকদিন কাটল। চিঠির কোন জবাব এল না। মাস্টারমশায়ের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে এল। শিবু পণ্ডিত একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, পোস্ট-অফিসে তোমার আর কিছু টাকা আছে নাকি?

ঘরে কিছু টাকা আছে।—বলে মাস্টারমশায় মুখের ইঙ্গিতে ভাঙা বাক্সটা দেখিয়ে দিলেন।

শিবু পণ্ডিত বাক্স খুলে দেখলেন, প্রায় তিরিশটা টাকা রয়েছে, দেখে একেবারে দমে গেলেন, হতাশার সুরে বললেন, এই সামান্য টাকা! তাহলে কি করে হবে?

মাস্টারমশায় জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই শিবু পণ্ডিত বললেন, ভেবেছিলাম, জেলা-শহরের কোন বড় ডাক্তারকে দিয়ে দেখাব, তা এ টাকাতে তো হবে না।

মাস্টারমশায় ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, থাক্ না ভাই, তাড়াতাড়ি যাবার যদি ব্যবস্থা করতে পার তো কর।

মেয়ে খবর পেয়েই ছুটে এল। বলল, এভাবে একা পড়ে আছ—আমাকে একটা খবর দাও নি কেন?

মাস্টারমশায় নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়ে বাবার কাছে থেকে তাঁর সেবা করতে লাগল।

ক্রমে মাস্টারমশায়ের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। সকালে কিছুক্ষণ বেশ কথাবার্তা বলেন, কিন্তু বাকী সারাদিন ও সারারাত অঘোরে পড়ে থাকেন। একদিন সকালে মেয়েকে ডেকে বললেন, কাল তোর মাকে দেখলাম। বললেন—এস আমার সঙ্গে, হাত ধরে নিয়ে যাই। সব লাগছির, কান্নাকাটি করিস না, মা-বাপ চিরদিন কার থাকে বল।

সেদিন সকালে শিবু পণ্ডিত আসতেই মাস্টারমশায় বললেন, আমার ডাক এসে গেছে ভাই! যাবার আর দেরি নেই। একটা অনুরোধ—আমাদের গাঁয়ের শ্মশানেই আমার শেষ কাজটা করে দিয়ো ভাই।

সেইদিনই শেষরাত্রে মাস্টারমশায়ের সব শেষ হয়ে গেল।

—

ইজ্জত

মায়া বসু

নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি এলাকাটা সমস্ত দিন চেঁচামেচির পর এতক্ষণে নিঃসাড় হয়েছে। মাটকোঠার খুপরি খুপরি ঘরগুলোতে কেরোসিনের টিমটিমে বাতিগুলো আর জ্বলছে না। সমস্ত দিন ঘরের সঙ্গে সংস্রব চুকিয়ে কলে-কারখানায় দোকানে-সনড্রিতে অথবা পথে পথে ছিটকাপড়, সাড়ে ছ-আনার মাল ফিরি করে বেড়ানো কর্মক্লান্ত মানুষগুলো ও ঘুমে এখন অচেতন।

উপচে-পড়া ডাস্টবিনটার পাশে শুয়ে-থাকা, সারা গায়ে ঘা ভর্তি নেড়ি কুকুর দুটো জেগে জেগে খস্ খস্ করে গা চুলকোলেও, ত্রস্ত পায়ে নিশাচর চোরের মত অতি সন্তর্পণে যে দু-একজন মেয়ে-পুরুষ অন্ধকারে গা ঢেকে ঢেকে আদিম অভিসারে পথে বেরিয়েছে, তাদের দেখেও এতটুকু সাড়াশব্দ করে নি। সমস্ত দিন খাঁ-খাঁ রোদে পুড়ে ওরা এখন ঠাণ্ডা হয়ে জিরোচ্ছে।

প্রথম ঋতুর প্রচণ্ড উত্তাপে গলে-ওঠা পিচ-ঢালা পথ রাত্রির নির্জনতায় অনেক সহনীয়। তেতে পুড়ে খাক্ হয়ে যাওয়া ইঁট কাঠ সিমেন্ট মাটির ঘরদোরগুলো এখন অনেক শীতল। রোদ-ঝলসানো দুপুরবেলার ঝড়ো বাতাস এখন অনেক শান্ত। জ্বালা-ধরানো শরীরে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবার মত অনেক আরামের, আয়েসের, সুখের।

তবু ঘুম নেই তারাপদর চোখে।

সমস্ত দিন দুঃসহ গরমে ছটফট করা সত্ত্বেও ওর দু-চোখের পাতা এই শান্ত শীতল পরিবেশে ঘুমে জড়িয়ে আসছে না একবারের জন্যও!

অথচ ওর এই শোবার ঘরখানা পাশের ছোট্ট খুপরিটার চেয়ে অনেক বড়। অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নড়বড়ে ভাঙা তক্তাপোশটাকে কালই বিনোদিনী গোকুল মিস্ত্রীকে ডেকে সারিয়ে ঠিক করে দিয়েছে। শক্ত কাঠে রাতদিন শুয়ে থেকে গা-হাত-পা ব্যথা করে বলে ছেঁড়া তোশকটার তলায় শীতকালের জন্যে তুলে রাখা লেপটা পেতে দিয়েছে। নতুন একটা শীতলপাটি কিনে সেটা বিছিয়ে দিয়েছে সবার উপরে।

এমন কি তুলো-ওঠা বালিশটা সেলাই করেছে নিজের হাতে। তেলচিটচিটে ছেঁড়া ওয়াড়টা ফেলে দিয়ে নতুন ওয়াড় পরিয়েছে।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই সব কাজ করবার সময় মুখরা বিনোদিনীকে একবারের জন্যেও গজগজ করতে শোনে নি তারাপদ।

অথচ এই বিছানায় পড়ে থাকা নিয়ে কত কথাই না শুনিয়েছে দিনের পর দিন, তারাপদ অনন্ত শয্যা নিয়েছে বলে?

একদা সুস্থ সবল ইলেকট্রিক মিস্ত্রী তারাপদর বৃহত্তর জীবনের পরিধি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে হতে ক্রমে ক্রমে এই ঘর আর বিছানাটুকুর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। শুধু নিদারুণ শ্বাসকষ্টই নয়, মাঝে মাঝে জ্বর সর্দিকাশি আর অপুষ্টি-জনোচিত হৃতস্বাস্থ্য হীনবল অক্ষম অশক্ত লোকটা দিন দিনই যেন ভাল হবার বদলে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। আনুষঙ্গিক আরও কিছু আধি-ব্যাধি নিয়ে তারাপদ সত্য সত্যই যেন বিনোদিনীর ভাষায়, অনন্ত শয্যা পেতেই পড়ে আছে দিনের পর দিন।

দক্ষিণ দিকে, তারাপদর মাথার শিয়রে একটা মাত্র জানলা। কিন্তু তা দিয়ে অজস্র বাতাস আসছে। ওর উত্তেজিত উত্তপ্ত মস্তিষ্কে, দুর্বল শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। খোলা জানলার ভিতর দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে আসা ম্লান বিবর্ণ তির্যক্ আলোর রেখা দেওয়ালে অস্পষ্ট ছায়া ফেলেছে। সেই আলোয় নিমগাছের ছায়াটা আন্দোলিত হচ্ছে হাওয়ায়।

দেওয়ালটা কাঁপছে, ছায়াটা নড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে যেন এই ঘুপসি খুপরি ঘরটাও দুলছে তারই সঙ্গে তাল দিয়ে।

সহসা তারাপদর মনে হল, এই কাঁপুনিটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর

য়ে যদি একটা ভূমিকম্পের মত দুলে ওঠে, যদি এই রদোর সবকিছু একাকার হয়ে ভেঙেচুরে খান-খান হয়ে রাপদর অথর্ব শরীরটাকে চাপা দেয়, তারাপদ যদি প্রাণপণে চীৎকার করেও ওঠে, তবু—তবু বিনোদিনী জেগে উঠবে না। সাড়াও দেবে না।

অথচ মাত্র কয়েক হাত দূরে এই ঘরের লাগোয়া র্টিশন করা খুপরিটাতেই তো ও শুয়ে আছে।

কী ঘুমই না ঘুমোচ্ছে বিনোদিনী!

ও ঘরটা এ ঘরটার চেয়ে অনেক ছোট। খুপসি। ঘর লাও চলে না ওটাকে। কাপড়-চোপড় ছাড়বার জন্যে, জিনিসপত্র রাখবার জন্যে, এই ঘরটা থেকেই খানিকটা রি করে পার্টিশন করে নিয়েছিল বিনোদিনী। ওদের সারের সবকিছু মালপত্রে ও-ঘরটা একেবারে বোঝাই।

চাল ডালের হাঁড়ি-সরা, কৌটো-বাটা, তোরঙ্গ। ড়া কাপড়ের পুঁটলি। তাকের উপর আয়না চিরুনি দুরের কৌটো। জলের কুঁজো। আরও সব কত কি। ই সব মালপত্রের জন্যে হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেটায় ভাল রে শোবারও উপায় নেই। অথচ ওরই মধ্যে কাঠি-র-করা পুরনো মাদুরটা বিছিয়ে নিয়েই শুয়ে পড়েছে নোদিনী। মাথার বালিশটা নিতেও এ ঘরে ঢোকে। হাতপাখাটাও এ ঘরেই পড়ে আছে, আজ বুঝি নোদিনীর সেটাকেও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

অথচ ও ঘরে জানলা নেই। এক কোঁটা হাওয়া ই। বাইরের দাওয়ার দিকে একটা মাত্র দরজা। টা সর্বদাই বন্ধ থাকে। প্রচুর মশা। আরশোলা র ইঁদুরের উৎপাতে ও-ঘরে একটা দিন বা রাতও খনও কাটায় নি বিনোদিনী। এই ঘরের মেঝেতে, রের সামনের বারান্দাটায় পড়ে থাকে, তবুও না।

আরশোলাকে কী ঘেন্নাই না করে ও!

ইঁদুরকে কী ভয়ই না করে বিনোদিনী!

আজ ওর সব ভয় সব ঘেন্না ঘুচে গেছে; সে কি ও াজ সব লাজলজ্জা ঘুচিয়ে এসেছে বলে না কি!

তারাপদ উৎকর্ণ হল। স্তব্ধ রাত্রির নিঃশব্দে এ ঘর কে স্পষ্ট শুনতে পেল বিনোদিনীর সুস্থ সবল নিঃশ্বাসের ন। আর অন্ধকারের মধ্যেই মনশ্চক্ষুতে দেখতে েল ওর শুয়ে থাকার অত্যন্ত অশ্লীল নির্লজ্জ ভঙ্গিটাকে।

একটু বেঁকে, একটু কুঁকড়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে বিনোদিনী। গরমকালে রাত্রে ও কোন দিনই জামা রাখে না গায়ে। পায়ের কাপড় উঠে গেছে অনেকখানি, বোধ হয় জানু ছাড়িয়ে। বুকের আঁচলটাও সরে গেছে গা থেকে। অসভ্য অসংস্কৃত সজ্জায় সমস্ত দেহটায় একচোখো বিধাতার পক্ষপাতদুষ্ট অজস্র স্বাস্থ্য আর যৌবনের উচ্ছলতাকে পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত করে নষ্ট মেয়ে-মানুষটা কী সুখ আর পরিতৃপ্তি নিয়েই না অঘোরে ঘুমোচ্ছে!

নষ্ট মেয়েমানুষ!

হঠাৎ অন্ধকারে অতর্কিতে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়া যন্ত্রণায় তারাপদর গলা দিয়ে অস্পষ্ট গোঙানির মত একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। রোগজীর্ণ কাঠ-কাঠ শরীরটা আরও শক্ত হয়ে উঠল। শীর্ণ শুকনো ঠোঁট দুটো ঘৃণায় আরও বঙ্কিম হয়ে গেল। শির বার করা কঙ্কালসার হাত দুখানা নির্দয় শক্তিতে কাকে যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার জন্যে শীতলপাটির দু ধারের অগাধ শূন্যতায় বিস্তৃত হল।

তারপর অবলম্বনহীন অসহায়তায় প্রাণপণে দুটো ধাক্কা দুমড়ে মুচড়ে আবার একসময় ব্যর্থ শান্ত স্তব্ধ হয়ে গেল।

• • •

ইলেকট্রিক ফেল করেছিল ওদিককার সমস্ত এলাকাটায়। ওভার-হেড তার রিপেয়ার করতে গিয়ে মাথা ঘুরে বেসামাল হয়ে হঠাৎ একসময় পায়ের নীচেকার কাঠের সিঁড়িটা খুঁজে পায় নি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি তারাপদ সরকার। জ্ঞান যখন হল, তখন সিঁড়ির বদলে মাটির উপরেই শুয়ে ছিল। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। তাকে ঘিরে আতঙ্কিত সঙ্গীদের কোলাহল।

তারপর একসময়ে হাসপাতালে পৌঁছল। হাড়-গোড় ভাঙা শরীর মেরামত হতে ছ মাসের ধাক্কা। তবু উঠে দাঁড়াতে পারল না সোজা হয়ে। ভাঙা কোমর জোড়া লাগে নি।

তারপরেই বাধে ছুঁলে আঠারো ঘায়ের মত পুরনো পৈতৃক হাঁপানিটা ঠেসে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গে সর্দি কাশি জ্বর আনুষঙ্গিক ব্যাধি।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের চাকরিটাও গেল তারই কয়েক মাস বাদে।

প্রথম কটা মাস চুপচাপ করেই সংসার চালাচ্ছিল বিনোদিনী। শুধু সংসার নয়। হাসপাতাল, রোগীর ওষুধ-পথ্য চিকিৎসা পত্র—সব কিছুর খরচ। তারপরই হাসপাতাল থেকে ফিরে আসা ছাড়া-পাওয়া স্বামীর কাছে এসে শুকনো মুখে প্রশ্ন করেছিল, এবার কি হবে?

সবকিছু চোখে দেখে, সবকিছু জেনেশুনেও অবুঝের মত, নির্বোধের মত তারাপদ উত্তর দিয়েছিল, কিসের কি হবে?

কিসের জান না?

ভিতর থেকে ঠেলে ওঠা ঝাঁজটা প্রাণপণে চেপে রেখে শান্ত গলায় জবাব দিয়েছিল বিনোদিনী, সংসার চলবে কি করে? দু দুটো পেট। দুটোই বা বলি কি করে? তোমার একলারই তো দুটো। তার ওপর মালিশ ওষুধ পথ্য। দোকানে ধার। ডাক্তারখানায়।

আমি তার কী করব শুনি?—অকারণেই খিঁচিয়ে উঠেছিল তারাপদ: আমি কি শখ করে বিছানায় পড়ে আছি নাকি? সময় অসময় বলে কথা আছে মানুষের। এমন অবস্থায় পড়লে লোকে ধার কর্জ ভিক্ষে করেও সংসার চালায়।

ধার কর্জ ভিক্ষে!—বিদ্রূপের হাসিতে বিনোদিনীর পুরন্ত ঢলঢলে মুখখানা বেঁকে গিয়েছিল: তুমি পথে বসে ভিক্ষে চাইলে বরং তোমার চেহারা দেখে দয়া করেও লোকে দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে যাবে। আমাকে দেবে না। এতদিন ধরে লুকোনো জমানো যা টাকাকড়ি ছিল, দু-এক কুচো সোনাদানা ছিল, সব গেছে। তার ওপর আরও অনেক ধার হয়ে গেছে এর ওর তার কাছে—সে কথাও তুমি জান। বার মাস কেউ শুধু হাতে ধার দেয় না। বদলে অনেক কিছু চায়। বুঝলে?

বিষাক্ত দৃষ্টিতে তারাপদ ওর মুখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়েছিল। শুধু মুখ নয়—ওর সমস্ত শরীরময়। তারাপদর হিংস্র দৃষ্টি ওর প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ধারাল হয়ে উঠেছিল। কী উদ্ধত কী অনমনীয় স্বাস্থ্য এই মেয়েমানুষটার! এত বয়সেও এত প্রাণপ্রাচুর্য এত যৌবন! কখনও এতটুকু মাথা পর্যন্ত ধরে না! কখনও গাটাও গরম হয় না। পিছল কলতলায় সেবার কী ভয়ানক আছাড় খেয়ে পড়ল, একটা আঙুলও ব্যথা হল না! সেদিন সমস্ত দিন ধরে বৃষ্টিতে ভিজল, এতটুকু সর্দি পর্যন্ত হল না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি খাটুনিটাই না খাটে, এতটুকু শরীর খারাপ হয় না! নিজের চোখেই তো দেখেছে তারাপদ এই ছটা-সাতটা মাসের ওপর দু বেলা ও পেট ভরে খেতেও পাচ্ছে না তবু ওর নিঃসন্তান যুবতী শরীর একটুও হেলে পড়ছে না! টসকাচ্ছে না!

বরং দিন দিন সুন্দর হচ্ছে। উথলে উঠছে। ভরা বর্ষার নদীর মত উচ্ছল জোয়ার এসেছে যেন ওর সর্বাঙ্গে। তারাপদর নাগালের বাইরে গিয়ে ও যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে! ওর সঞ্চিত যৌবন এতটুকু ক্ষয় হবার বদলে সুদে আসলে আরও বেড়ে উঠছে। ওর যৌবনের জোয়ারে ভাটার চিহ্নমাত্রও নেই।

ওই বিনোদিনী কি সত্য সত্যই তারাপদর পরিবার। ঘরণী?

ওই মেয়েটাকে কি চেনে তারাপদ! ওই মানুষটাকে নিয়ে সাত আট বছর সুখেদুঃখে ঘর সংসার করেছে। ওকে ছুঁয়েছে কখনও!

আর ওর ওই অদ্ভুত সুন্দর গড়নের শরীরটাকে নিয়ে এই তারাপদ কি কখনও এক বিছানায়—

ঈষৎ বেঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে কথা বলছিল বিনোদিনী। ওর পরনের শাড়িটা অনেক জায়গায় সেলাই করা। আঁচলটা অসংবৃত হয়ে বেসামাল হয়ে সরে গিয়েছিল। হুঁশ ছিল না বিনোদিনীর। কতকটা আত্মগত ভাবেই আবার বলল, কি করে যে কি করব! চার দিকে ধার। এমন ভাবে আর চলে না।

এমন ভাবে চলে না। ধার! ধার!—নির্মম ভাবে মুখ ভেংচে উঠল তারাপদ; বলতে লজ্জা করে না? আট বছর ধরে আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোকে খাওয়াই নি, পরাই নি? যা হোক শাড়ি গয়না দিই নি? বাপের বাড়ি তো হাঁড়ি চড়ে না এমন দুর্দশা, মাঝে মাঝে টাকা পাঠাই নি তোর কথা মত? তোর মা দায়ে পড়ে রাঁধুনীগিরি করে নি তোর বাপ মারা যাবার পর? অতখানি ধুমসো গতর নিয়ে ঘরে বসে না

থেকে একটা কাজকর্ম করলে চলে না? এঘর ওঘরের মেয়ে বউরা করছে না দরকার হলে? কালীপদ কানাই ফটিক ওদের বউরা বাবুদের বাড়ি কাজ করছে না? জাত গেছে ওদের? তবু তো ওদের কোলে কচিকাচা আছে। তোর তো সে বালাইটুকুও নেই। কালীপদর বউ অত করে বললে ইস্কুলের কাজটা নিতে, তা নবাব-নন্দিনীর মানের হানি হল!

তারাপদ এত বড় নিষ্ঠুর হবে, বিনোদিনীর সবচেয়ে গোপন দুর্বল জায়গাটায় এমন নির্মমের মত আঘাত করবে, ভাবতেও পারে নি ও। ওর দু চোখের কোলে প্রায় জল এসে গেল। কিন্তু কান্নার চেয়েও বেশী একটা ঘৃণার বেগকে কোনমতে গলার মধ্যে চেপে রেখে ক্লান্ত অসহায় ভাবে জবাব দিল, অভাব-অনটনে পড়েই না হয় বস্তিতে উঠেছি, তা বলে ওদের মত ঝিয়ের কাজ করব! ভদ্দর লোকের মেয়ে হয়ে বাসন মাজা কাপড় কাচা ঘর মোছা!

ওর ফ্যাকাশে বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে এতটুকু নরম হল না তারাপদ। আরও নিষ্ঠুর ভাবে বিনোদিনীর কথার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ল: ওরে আমার ভদ্দর লোকের মেয়ে রে! ভদ্দর লোকের পাড়ার ষাট টাকার ঘর ছেড়ে মাটকোঠার কুড়ি টাকার বস্তির ঘরে উঠে এসেও, একবেলা উপোস দিয়েও তোর তেজ মরল না! ভদ্দর লোকের মেয়ে! যখন যেমন তখন তেমন। তুই যদি বিছানায় পড়ে থাকতিস, আমি তোকে খাওয়াতুম না? চিকিৎসা করাতুম না? চাকরি থাক চাই না থাক, যেমন করেই হোক সংসার চালাতুম না? আর তুই? নেমকহারাম মেয়েমানুষ কোথাকার! কদিন ধরে ওষুধটা পর্যন্ত আসছে না। দুবেলা মাছের ঝোল ভাত দূরে থাক, একবেলার ভাত ওবেলা ধরে দিচ্ছিস। তোর মত—

তারাপদর কথাগুলো শেষ হবার আগেই ওখান থেকে ছিটকে সরে গিয়েছিল বিনোদিনী।

আর তার কয়েকদিন পরেই কালীপদর বউয়ের খবর আনা ইস্কুলের কাজটা নিয়েছিল। নিজের ঘর-সংসারের বাইরের জগতে প্রথম পা বাড়িয়েছিল বিনোদিনী। প্রচণ্ড অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

ইস্কুলের কাজ বলতে এমন কিছুই নয়। পাড়ায় একেবারে ছোট ছোট কটা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে সকাল-বেলায় নার্সারীতে পৌঁছে দেওয়া। বেলা বারোটা নাগাদ আবার ওদের বাড়ি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসা—সাবধানে রাস্তা পার করিয়ে।

বাসন মাজা নয়, কাপড় কাচা নয়—বস্তির ঝিয়েদের মত কোন কাজই নয়। সুখের চাকরি। হালকা স্বাধীন কাজ। বাচ্চাদের একটু মিষ্টিমুখ আর যত্ন আত্তির ভান দেখাতে পারলেও তাদের বাড়ি থেকে বকশিশ বা দু-একটা শাড়ি সহজেই মেলে বইকি।

কিন্তু সে কাজ আর কটা দিনই বা করল বিনোদিনী!

হঠাৎ একদিন রাত্রে তারাপদ দেখল বিনোদিনী ঘরের মেঝের বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। একবার উঠছে, বসছে—বাইরে যাচ্ছে। জল খাচ্ছে। কি একটা কথা বলবার জন্যে ছটফট করছে, বলতেও পারছে না।

তারাপদ একটু আগেই কেশে কেশে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মাথা উঁচু করে আধশোয়া অবস্থায় দম নিচ্ছিল। বিনোদিনীকে অমন ঘরবার বিছানা করতে দেখে বিরক্তিভরে প্রশ্ন করল, কী হয়েছে? অমন ছুটোছুটি করছিস কেন এই রাত্তিরবেলা? তোর তো সুখের শরীর। পড়বি আর ঘুমোবি। একচোখো ভগবান—তোর অতখানি গতর।

থাম থাম। রাতদিন আমার গতরের খোঁটা দিয়ো না বলে দিচ্ছি।—ঝঙ্কার দিয়ে উঠল বিনোদিনী: উনি বারো মাস অনন্তশয্যায় পড়ে থাকবেন, আর আমি ঘরে বাইরে গতর খাটাব! আমি বাইরে কাজ করতে পারব না। ইস্কুলের কাজে জবাব দিয়ে এসেছি। কাল থেকে আর যাব না।

ধুম করে বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল বিনোদিনী আর তারাপদর মনে হল ওর সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে।

এত সুখের এত আরামের পরিশ্রমের চেয়েও অনেক ভাল মাইনের কাজটায় জবাব দিয়ে এসেছে বিনোদিনী! এই অসময়ে—এই অবস্থায়। কাল কি খাবে কেমন করে চলবে না ভেবেই।

ও কি পাগল, না মাথাখারাপ! নিজের ভালমন্দ কিছুই কি বোঝে না ও!

না কি অক্ষম তারাপদকে জব্দ করার ফন্দি।

তারাপদকে উত্তর না দিতে দেখে, একটা প্রশ্ন পর্যন্ত না করতে দেখে বিনোদিনী অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে নিজেই বলল আবার, ওখানে কোন ভদ্দর ঘরের মেয়ে কাজ করতে পারবে না।

কেন? কী হয়েছে?—তারাপদ মিনমিন করে এবার সাড়া দিল: কেউ কিছু বলেছে?

ওই ইস্কুলের কেরানীবাবুটি ভাল লোক নয়। কদিন থেকেই আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ারকি শুরু করেছিল।

ঠাট্টা ইয়ারকি—তা তুই হেডমিস্ট্রেসকে নালিশ করলেই তো পারতিস।

করেছিলাম। বড়দিদিমণি বিশ্বাস করলেন না। বললেন, তোমার যদি অতই মানসম্মান, চাকরি ছেড়ে দিলেই তো পার।

এই সামান্য কারণে তুই এমন কাজটা ছেড়ে দিলি? এত মান তোর?—নিরুপায় ক্রোধে ক্ষোভে তারাপদ চিৎকার করে উঠল: এতগুলো টাকা—

কী বলতে চাও শুনি? মুখিয়ে উঠল বিনোদিনী: সামান্য কটা টাকার জন্যে ইজ্জত খোয়াব! তার চেয়ে ঘরে উপোস করে মরব সেও ভাল।

* * *

তার পরের কাজটা তারাপদই জুটিয়ে দিয়েছিল। ভদ্রলোকের, বড়লোকের বাড়ির সৌখীন আয়ার কাজ। বড্ড খুঁতখুঁতে ওঁরা। যেমন-তেমন ঝি হলে চলবে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাল আয়া না হলে ছেলে দিয়ে শান্তি হয় না ওঁদের।

মোড়ের মাথায় মস্ত লাল রঙের তেতলা বাড়িটায় ওয়্যারিং করতে গিয়ে বাবুদের সঙ্গে যথেষ্ট জানাশোনা হয়েছিল তারাপদর। ভদ্রলোকের ছেলেটির এই নিদারুণ অবস্থা বিপর্যয়ে, তারাপদর অনুনয় বিনয়ে তাঁরা বিনোদিনীকে বেশ খাতির করেই ডেকে নিয়ে গেলেন।

এবারের কাজ আরও অনেক ভাল। বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে না। দুপুরবেলা বাড়িতে চলে আসতে পারবে। নিজেদের ঘরদোরের, কাজকর্মেরও কোন অসুবিধা হবে না। শুধু ছোট গিন্নীর কোলের ছেলেটিকে পেরাম্বুলেটরে বসিয়ে সকালে-বিকেলে বাড়ির সামনের পার্কটায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবে। তাকে স্নান করাবে। টাইমমত খাওয়াবে। দেখাশোনা করবে। আর দু-একটি খুচরো কাজ মাত্র।

মাস দুই কাটল কি কাটল না আবার বিপত্তি ঘটল। দুপুরবেলা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে বিকেলে আর কাজে গেল না বিনোদিনী।

বিস্মিত তারাপদ চেয়ে চেয়ে দেখল। থমথমে মুখে কাজ সারল বিনোদিনী। তারপর ভর সন্ধ্যেবেলায় যত রাজ্যের ময়লা কাপড়চোপড়ের ডাই নিয়ে সাবান দিতে বসল উঠোনের মাঝখানে।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তক্তাপোশের উপর থেকেই তারাপদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর করল ছটফট করছে বিনোদিনী। এপাশ ওপাশ। ওঠবোস। ঘর থেকে বাইরেও ঘুরে এল বারকতক।

চুপ করে আর থাকা গেল না। সংশয়ে সন্দেহে আশঙ্কায় তারাপদ ঘাড় উঁচু করে প্রশ্ন করল, কাজে গেলি না যে বিকেলবেলায়? কী হয়েছে?

দেখতে পাচ্ছ না শরীর খারাপ হয়েছে। গতরটাই না হয় গেছে, চোখের মাথাও খেয়েছ নাকি? মেলা বকর বকর কর না। ঘুমোতে দাও।

ঝঙ্কার দিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল বিনোদিনী।

এবার আশ্চর্য হবার পালা তারাপদর।

বিনোদিনীর শরীর খারাপ হয়েছে! ও-বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পর থেকে ওকে তো শুতে দূরে থাক, একবার বসতেও দেখে নি তারাপদ। জলজ্যান্ত ওর দুটো চোখের সামনে ভিজে কাপড়ে বসে বসে রাজ্যের ময়লা কাপড় চাদর ওয়াড় লুঙ্গিতে সাবান দিল দু ঘণ্টা ধরে। ওবেলাকার জল-দেওয়া ভাতও তো বেশ একমুঠো।

আট বছর ধরে ওকে নিয়ে ঘর করছে, বিনোদিনীর শরীর খারাপ হওয়াটা যে কেমন বস্তু, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তা টের পর্যন্ত পায় নি তারাপদ। রোগের কাছ থেকে বহু দূরে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে বিনোদিনী। যেমন নিজেকে রেখেছে লোভী পুরুষের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে। রোগে ধরলেও ওকে যেন অন্য পুরুষে ছোঁবে। পরপুরুষ। ইজ্জত যাবে ওই ঘরকুনো মেয়েমানুষটার।

তবু আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস হল না তারাপদর। এখনি ওর গলাবাজির চোটে পাশের ঘরের ফটিকদের ঘুম ভেঙে যাবে। দরকার নেই রাতটায় ঘাঁটাঘাঁটি করে। বিনোদিনীর মেজাজ বড় বিচ্ছিরি।

সে রাতে ভাল করে ঘুম হল না তারাপদর। আর ও বেশ বুঝতে পারল—বিনোদিনীও ঘুমের ভান করে কাঠ হয়ে পড়ে থাকলেও জেগেই আছে।

পরদিন সকালবেলায় আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। সকালের রোদ যখন উঠোনে ছড়িয়ে পড়ল তখনও বিনোদিনীকে নিশ্চিন্ত মনে ঝাঁটা নিয়ে খুপরি ঘরটার মধ্যে ঢুকতে দেখল তারাপদ। শব্দ পেল, মেজের ধুলোবালি পরিষ্কার করছে ও। মাল বোঝাই খুপরিটার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বাস করা ইঁদুর আরশোলা তাড়াচ্ছে।

রাত্রেও বোধ হয় জ্বর হয়েছিল একটু। শরীরটা আরও অচল বলে মনে হচ্ছে। উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তবু তক্তাপোশ থেকে নেমে কোনমতে ঘসতে ঘসতে দরজার কাছে এসে তারাপদ বিস্বাদ তেতো গলায় সেই মোক্ষম প্রশ্নটা করল, এতটা বেলা হয়ে গেল, বাবুদের বাড়ির কাজে গেলি না বিনো?

প্রশ্নটা যেন কানেই যায় নি, অথবা সম্পূর্ণ অবান্তর এমনভাবে উপেক্ষা করে বিনোদিনী তোরঙ্গটার তলায় খুখর্ করে ঝাঁটা চালাতে লাগল একমনে।

শীর্ণ রেখাসঙ্কুল মুখটা বিকৃত করে, গলাটা আরও খানিকটা চড়িয়ে তারাপদ খিটখিট করে উঠল, বলি কথাটা কি কানে যাচ্ছে না নবাব-নন্দিনীর? একেবারেই গরাহ্যি নেই যে দেখছি!

ও মাগো!—সভয়ে চিৎকার করে উঠে এলোমেলো বেশে আঁচল লুটোতে লুটোতে ছুটে এল বিনোদিনী ঘর থেকে: কত বড় ইঁদুরটা, বাব্বাঃ! কী আরশোলা বাগোঃ!

বিনোদিনীর আতঙ্কিত আরক্ত ঘর্মাক্ত চোখমুখ, কাপড় সরে যাওয়া স্বাস্থ্যোন্নত উচ্ছ্বিত বক্ষ, দ্রুত ছুটে আসার ফলে সমস্ত শরীরের লোভনীয় ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই অবচেতন ঈর্ষা আর অক্ষম দাহে জ্বলে উঠল তারাপদ: আরশোলা ইঁদুর তো হয়েছে কী? তোর ও ধুমসো গতর সাতটা বাঘেও খেতে পারবে না, আরশোলা ইঁদুর তো দূরের কথা। ঢঙ দেখ!

ফের গতরের খোঁটা দিচ্ছ?—আঁচল সামলে ঘাড় বেঁকিয়ে সাপিনীর মত ফোঁস করে উঠল বিনোদিনী: নিজে তো মাসের পর মাস অনন্তশয্যায় শুয়ে আছ। লজ্জা করে না পরিবারের রোজগার শুয়ে বসে খেতে? বাড়ি বসে বসে অসুখের দোহাই দিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে না থেকে একটু নড়েচড়ে এ ঘরের আরশোলা ইঁদুরগুলোকেও তো মারতে পার। বেহায়া বেটাছেলের আর কিছু না থাক মুখের বহর আছে।

কথায় কথা বাড়ল। মুখরা বিনোদিনী এমনিতে চুপচাপ। কিন্তু একবার মুখ খুললে তারাপদর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার না করে ছাড়ে না।

তুমুল ঝগড়ার পর একসময় রোগজীর্ণ তারাপদর চিঁচিঁ করা গলার জোর একেবারেই কমে গেল। ওকে একেবারে থামিয়ে তারপর চুপ করল বিনোদিনী।

সমস্ত দিন বিনোদিনী কাজেও গেল না, কথাও বলল না। আবার রাত এল। অনুতপ্ত ভীত তারাপদর অনেক কাকুতি-মিনতি অনুনয়-অনুরোধে কঠিন হৃদয় গলল বিনোদিনীর। আর তখনই জানতে পারল তারাপদ ওবাড়ির মাথায় চুলে পাক ধরা বিপত্নীক মেজবাবুর অশোভন আচরণ, ঘনিষ্ঠতার কথা। এক-আধদিন নয়—অনেকদিন ধরেই তাঁর এ প্রচেষ্টা চলছিল। সম্প্রতি বাড়াবাড়িটা অসহ্য হয়ে উঠেছে বিনোদিনীর কাছে। বড়গিন্নিকে বলে কোন ফল হয় নি। একেই তো তিনি বিনোদিনীকে ভাল চোখে দেখতে পারেন না। তার ওপর ওর নালিশ শুনে ক্যাট ক্যাট করে বেশ কতকগুলো কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। স্পষ্ট মুখের ওপর বলে দিয়েছেন, সোমত্ত বয়স আর অমন যৌবন নিয়ে বাবুদের বাড়ি কাজ করতে গেলে মেয়েমানুষকে অমন একটু-আধটু সইতে হয়। দু-চারটে ভালমন্দ কথাও শুনতে হয়। এতে যদি বিনোদিনীর গায়ে ফোস্কা পড়ে, তবে ও যেন নিজের বাড়িতে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। কাজ করতে না বেরোয় কোথাও। অথবা এমন বাড়ি কাজ খুঁজে নিক, যেখানে পুরুষমানুষ নেই।

সত্যিকথা বলতে কি, বড়গিন্নীর বচন চুপচাপ হজম

করে নি বিনোদিনী। তাঁর মুখের উপরেই বাবুদের চরিত্রের সমালোচনা করে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিয়ে সেও কাজে জবাব দিয়ে চলে এসেছে তৎক্ষণাৎ।

অন্ধকার ঘর আরও অন্ধকার হয়ে উঠল তারাপদর চোখের সামনে: এই তুচ্ছ কারণে তুই কাজে জবাব দিয়ে এলি বিনো! একবার ভেবে দেখলি না কাল কি খাওয়া হবে? বাড়িতে তিন-তিনজন গিন্নীবান্নি মেয়েমানুষ। তাদের চোখের ওপর মেজবাবু তোকে কি আর করত? বড়জোর দু-চারটে কথা। তাতে কি সত্যিসত্যিই তোর গায়ের চামড়ায় ফোস্কা পড়ত? নিজেদের এই অবস্থা। ভালমন্দ বুঝিস না? অতগুলো টাকা মাইনে, দুবেলা দু থালা ভাত, কাজকর্ম নেই, এমন সুখের কাজ—

ঝাঁটা মারি অমন সুখের কাজের মুখে।—উত্তেজিত গনগনে গলায় ঝলসে উঠল বিনোদিনী: আমাকে তেমন তেমন বস্তির ঝি পায় নি যে অকথা কুকথা বলবে, গায়ে হাত দেবে, আর আমি মুখ বুজে তাই সহ্য করব। ভদ্দর ঘরের মেয়েবউ আমি। সন্তোষপুরের পাঠশালার মাস্টার যদুনাথ মণ্ডলের মেয়ে আমি, অমুক সরকারের ছেলের বউ। না হয় আজ ভাগ্যের দোষে বস্তিতে উঠেছি, কাজে নেমেছি। তাই বলে এই সব সহ্য করব! পরপুরুষের হ্যাংলামি সহ্য করব! কিসের জন্যে শুনি?

• • •

না, এই শেষ নয়।

আরও কটা কাজ ধরেছে বিনোদিনী। ছেড়েছেও কিছুদিন বাদে। বাবুদের অতিরিক্ত অনুগ্রহের উৎপাতে।

সাধারণ ঠিকে-ঝিদের কাজ ওর পছন্দ নয়। ছোট-খাটো কাজও ও করবে না। ভদ্দর লোকের মেয়ের উপযুক্ত কাজ ওর জোটেও বার বার। কিন্তু তা ছাড়তেও হয় অতি স্বাভাবিক কারণে।

কারণটা সেই পুরনো। নিয়মটা সেই সেকেলে।

যে নিয়মে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে রূপমুগ্ধ পতঙ্গ অগ্নিশিখার দিকে ছোটে, ফোটা ফুলের মদির সুগন্ধে মৌমাছি আর প্রজাপতি ছুটে আসে মধুর লোভে, সেই নিয়মের হাত এড়াতে পারল না বিনোদিনীও। সুশ্রী যুবতী প্রখর যৌবনা বিনোদিনীর কোন বাড়িতেই মতিস্থির করে মনস্থির করে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। যে কোন পুরুষ ওর দিকে এক হাত এগিয়ে এলো ও সাত হাত পিছিয়ে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি বসে থাকবেই।

আর যত বারই কাজ ছাড়ে, তারাপদর মেজাজ খারাপ হয়ে সপ্তমে ওঠে। কাজ ছাড়ার পরই অনিবার্য নিয়মে আসে অভাব অনটন অনশনের পালা। বিনোদিনী খেল কি না খেল জানবার দরকার নেই তারাপদর। কিন্তু ওর পঙ্গু শরীর, অনেক দিনের রোগে ভোগার ফলে অসুস্থ বিকৃত মন এই সবকিছু দুঃখ-কষ্টের জন্যে দায়ী করে ওকেই। সময়মত ভাত জল ওষুধ না পেলেও যা মুখে আসে তাই বলে গাল[illegible] দেয় বিনোদিনীকে।

বিনোদিনী যেন ইচ্ছে করে ওকে বঞ্চিত করছে। ইচ্ছে করে ওকে এমন ভাবে জ্বালাচ্ছে পোড়াচ্ছে [illegible] দিচ্ছে। নিয়মমত ওষুধ পথ্যটুকু না দিয়ে মজা দেখছে।

মোড়ের মাথার ক্লিনিকের বুড়ো ডাক্তারবাবু অনেকদিন ধরেই দেখছেন ওকে। মানুষটি বড় ভাল। গরীবের দুঃখ বোঝেন। তেমন অবস্থা হলে ফি-ও নেন না। শুধু ইনজেকশন আর ওষুধের দাম।

সেদিন তারাপদকে ভাল করে পরীক্ষা করে ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, দেখ তারাপদ, এতদিনে তোমার শরীর কিছুটা ভাল হয়ে যাবার কথা। রোগ দেখাও, প্রেসক্রপশন করাও অথচ ওষুধগুলো ঠিকমত খা[illegible] না। ইনজেকশনগুলোও তো নিলে না। ভাল হ[illegible] উঠবে কি অমনি অমনি?

বিমর্ষ ভাবে মিনমিন করে তারাপদ বলেছিল, কি করে কি করি ডাক্তারবাবু! জানেন তো সবই—মাঝে মাঝে ওষুধ খাই। তবে বারো মাস নিয়ম করে—

কথার মাঝখানেই অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দিয়ে মাথা নেড়ে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, ওসব তবে টবে নয়। নিয়ম করে দুটো মাসও তোমাকে ওষুধ খেতে হবে। কয়েক ফাইল ইনজেকশন নিতে হবে। নইলে স্প[illegible] বলে দিচ্ছি বাপু এ রোগ তোমার সারবার নয়। এর প[illegible] বিছানা থেকে উঠতেও পারবে না। অবহেলা ক[illegible] পুরনো রোগটা অনেক বাড়িয়ে ফেলেছ।

কি জবাব দেবে তারাপদ!

পুরো দু তিনটে মাসও ওকে নিয়মিত ভাবে ওষুধপথ্য খেতে দেবে না, ভাল হয়ে উঠতে দেবে না, প্রতিজ্ঞা করে বসেছে বিনোদিনী।

কোন জায়গায় ও ছটা মাস স্থির হয়ে যদি কাজ করত! এত স্পর্শকাতর, এত বদমেজাজী হলে চলেই বা কি করে!

সেই স্পর্শকাতর, পরপুরুষের ছোঁয়াবাচানো তেজী জেদী বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত এ কী করে বসল।

ইজ্জত বাঁচিয়ে, এত বাছবিচার করে, এত জায়গায় ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে দিয়ে শেষকালে কিনা কে একজন লাহাবাবুর কাজটাকেই ও আঁকড়ে ধরে বসল!

সে বাড়িতে তো একজনও মেয়েমানুষ নেই যে পাহারা দেবে! নজর রাখবে ওদের ওপর! যে একজন মাত্র আছে, অর্থাৎ লাহাবাবুর স্ত্রী, তার জন্যেই বিনোদিনীকে রাখা হয়েছে। নিয়াঙ্গের পক্ষাঘাতে, আরও নানা রকম অসুখে শয্যাশায়িনী স্ত্রীকে রাতদিন দেখাশোনা করার জন্যেই লাহাবাবুর ওকে রাখা। সুস্থ সমর্থ ঝঞ্ঝাট ঝামেলাহীন স্ত্রীলোক।

যে মানুষটা বিছানা ছেড়ে নড়তেই পারে না, সে কি করে সোমত্ত বয়সের বিনোদিনীর উপর নজর রাখবে!

কঙ্কালসার ক্ষীণজীবী ফড়িংয়ের মত চেহারা তারাপদ প্রথম দিন লাহাবাবুকে দেখে চমকে উঠেছিল। কী ভয়ঙ্কর দুর্দান্ত স্বাস্থ্য লোকটার! পেশীবহুল শক্তসমর্থ লম্বাচওড়া চেহারা। বয়সও বেশী নয়। বছর চল্লিশ কি তার চেয়ে আর কিছু বেশী হবে। গায়ের রঙ বেশ কালো। চকচকে দাঁত। লোকটাকে প্রথম দর্শনেই খারাপ লেগেছিল তারাপদর। এমন গুণ্ডার মত যার চেহারা, যার বউ পক্ষাঘাতে পঙ্গু, জেনেশুনে বিনোদিনী তার বাড়ি কাজ নিল কি বলে!

তারাপদ অবশ্য বারণ করে নি। তবে প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল, আর বোধ হয় ও কাজে যাবে না। ঝাঁটা নিয়ে আরশোলা ইঁদুর তাড়াতে ঢুকবে পাশের ঘরটায়। সাবান কাচতে বসবে কাজে না গিয়ে। আর তারাপদর ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে মুখঝামটা দিয়ে বলে উঠবে, যে কাজে ইজ্জত থাকে না, ঝাঁটা মারি তেমন কাজের মুখে। আমি কাজে জবাব দিয়ে এসেছি।

না:, কিছুই হল না। দিনের পর দিন কাটল, মাসের পর মাস। বিনোদিনীর কাজ অটুট রইল।

শুধু যে কাজটাই বজায় রাখল এমন নয়, বাড়ি ফেরার ব্যাপারেও ওর বেশ গোলমাল দেখা দিল।

সেদিনও বেশ রাত হয়েছিল। প্রায় দশটা। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল তারাপদ। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলল: এত রাত হল? কি এত কাজ তোর?

ঘুমোচ্ছিলাম পড়ে পড়ে।—মুখঝামটা দিয়ে উঠল বিনোদিনী: যে বাড়ির গিন্নী তোমার মত অনন্তশয্যায় পড়ে থাকে, যে বাড়ির বাবুর বদমেজাজ তোমার চেয়েও দশকাঠি চড়া, সে বাড়ি আর কাজ কিসের বল।

অত চটে যাস কেন কথায় কথায়?—গলা নরম করল তারাপদ: আমার জন্যে তোর খাটুনি হচ্ছে, তা কি বুঝতে পারি না আমি। এত রাতে একলা এলি, পথেঘাটে যত সব মাতাল বদমাশ ঘুরে বেড়ায়। তুই আবার যা ভীতু। তাই বলছিলাম।

একলা আসি নি। বাবু নিজেই পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

বাবু! মানে ওই গুণ্ডার মত চেহারার লাহাবাবু তোকে এত রাতে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

বিস্ময়ে উত্তেজনায় তারাপদ কোনমতে হাতে পায়ে ভর দিয়ে বিছানায় উঠে বসল: বাবুটার মতলব কি? অন্য লোক ছিল না? চাকরবাকর? নিজে একলা এই রাতে তোকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দিতে আসে, আর তুই তাই সহ্য করিস বিনো?

সহ্য না করে উপায় কি বল? যা বদরাগী মানুষ, বাপরে বাপ! এত বাড়ি কাজ করতে গেছি, এত বাবু দেখেছি, লাহাবাবুর মত একটা লোকও আমার নজরে পড়ে নি।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল বিনোদিনী: ঠিক তোমার উলটো স্বভাব।

না, তারাপদকে বেশীক্ষণ বিমূঢ় বিহ্বল অবস্থায় রাখে নি বিনোদিনী। হাসতে হাসতে সব কথা, অনেক কথা খুলে বলেছে। আর শুধু সেই রাত্রেই নয়—আরও, আরও অনেক রাত্রে। অনেক দিনের বেলাতেও। লাহাবাবর বিচিত্র চরিত্রের একটা সম্পূর্ণ ছবি বিনোদিনীর

কথার মধ্যে দিয়ে তারাপদর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

লাহাবাবুর বাড়ির বাজার সরকার অল্পবয়সের সুদর্শন ছোকরা যতীন নাকি বিনোদিনীকে ওবাড়িতে দেখা অবধিই বেশ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আচারে আচরণে ভাবে ভঙ্গিতে বিনোদিনীর প্রতি তার প্রেম নিবেদন বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল। বাড়াবাড়ি হতেই নাকি লাহাবাবুর তীক্ষ্ণ নজরে কি করে পড়েছিল কে জানে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর চাকরি খতম।

তার পরের ঘটনা লাহাবাবুর খোদ শয্যাগত স্ত্রীর ভাইকে নিয়ে। দিদিকে দেখতে ভদ্রলোক আগে আগে মাঝে মাঝে আসতেন। কিন্তু যেদিন থেকে বিনোদিনী তাঁর বোনের সেবায় লাগল, তারপর থেকেই এ বাড়ি আসাযাওয়ার পর্বটা ওর বেশ বেড়ে গেল। আর থাকার স্থায়িত্বকালটাও। পানটা জলটা চা-জলখাবারটা দিতে আসতে হত বিনোদিনীকেই। না এলে ভদ্রলোকই ওকে ডাকাডাকি করতেন দিদির কাজের অছিলা করে। লাহাবাবু কদিন নজর করেই বিনোদিনীকে আড়ালে ডেকে যৎপরোনাস্তি গালমন্দ করেছেন। কড়া হুকুম দিয়েছেন, তাঁর শালার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। সে এ বাড়ি এলে কোনক্রমেই যেন বিনোদিনী তার সামনে না যায়। ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি যতই করুক না কেন, আরও দু-তিনজন লোক আছে, তারাই যাবে।

শুধু এই নয়। বাড়িতে অন্য কোন পুরুষ আত্মীয়-স্বজন এলেও ও যেন চট করে কারও সামনে বার না হয়। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনের দোকানে হঠাৎ দরকার হওয়াতে নিজের জন্যে দুটো পান কিনতে গিয়েছিল বিনোদিনী। লাহাবাবু অফিস ফেরতা দেখে ফেলে বাড়ি ঢুকেই ওকে আবার বকুনি দিয়েছেন। বিনোদিনীর বাড়ির বার হবার দরকারটা কিসের? দোকানে যেতে হয়, বাড়ির ছেলেমানুষ চাকরটা রয়েছে কি করতে? ঠাকুর? ওসব বাইরে বেরুনো, বাইরের লোকের সামনে হুট্ বলতে বার হওয়া—এখানে একেবারেই চলবে না। লাহাবাবু পছন্দ করেন না। সহ্য করবেন না।

বলতে গেলে লাহাবাবু যেন বিনোদিনীকে পাহারা দিয়ে রেখেছেন। নজরবন্দী করে। কারও সঙ্গে এতটুকু হাসিগল্প করার উপায় নেই। একেবারে জ্বলে উঠবেন। গালমন্দ শুরু করবেন।

যেদিন স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ হয়, বিনোদিনীর ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আসতে রাত হয়ে যায়, সেদিন বাবু ওর সঙ্গে ছোঁড়া চাকরটাকেই দিতেন ওকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু কদিন ধরে কটা রকবাজ ছোকরা ওকে উদ্দেশ করে অশ্লীল ইঙ্গিত করেছে হেসেছে ঠাট্টা করেছে শুনে লাহাবাবু রেগে আগুন হয়ে নিজেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। এতটুকু ভয়ডর পর্যন্ত ওর নেই। ঝি বলে সঙ্কোচটুকুও নেই। বিনোদিনীর ইজ্জতের দাম আছে, তার এতটুকু ক্ষতি তিনি সহ্য করবেন না।

লাহাবাবু বিনোদিনীর মানমর্যাদা, সম্মানরক্ষার ভার, সবকিছুই যেন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। যেমন চেহারা, তেমনই অসুরের মত শক্তি। বিনোদিনী এতদিনে নিশ্চিন্ত হয়েছে। পাঁচটা আজেবাজে লোভী লম্পট পুরুষের হাত থেকে ওকে বাঁচিয়েছেন লাহাবাবু। বিনোদিনীর আর ভয় নেই। ওর এতদিনের ভাবনা ঘুচেছে।

এত দরদ। এতদূর গড়িয়েছে

অসহায় অক্ষম ক্রোধে জলেপ[illegible] মরা ছাড়া তারাপদর আর কি করবার ক্ষমতা আছে?

যে রক্ষক, সেই যে শেষ পর্যন্ত ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়, এ কথাটা বার বার ওকে বলে হয়রান হয়ে গেছে মাত্র।

তবু বিনোদিনীর হুঁশ হয় নি। তবু বিনোদিনী কাজ ছাড়ে নি। কে জানে বিনোদিনীর কোন্ নেশা ধরেছে!

তারপর দু একটা দিন বাদ দিয়েই বিনোদিনী আবার অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল।

খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার ক্ষীণ আলোয় যতদূর যায় দৃষ্টি প্রসারিত করে সন্দেহে সংশয়ে ছটফট করছিল তারাপদ। হাসিমুখে বিনোদিনীকে লাহাবাবুর লোহাপেটানো অসুরের মত চেহারাটার পাশেই দেখতে পেল। পাশাপাশি গল্প করতে করতেই আসছিল দুজনে।

বিনোদিনীর পরনের নতুন ডুরে শাড়ির ঝলক যেন এতদূর থেকেই তারাপদর দৃষ্টিটাকে অন্ধ করে দিল।

কেরোসিনের লণ্ঠনটা ঘরে মিটমিট করে জলছিল। বিনোদিনী ঘরে ঢুকল। ওর খুশী খুশী মুখ, জলজলে চোখ, সর্বাঙ্গের সতেজ শ্যামলতায় খুপরি ঘরখানা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাবে তারাপদর সমস্ত সত্তা একটি প্রচণ্ড আঘাতে নড়ে উঠল। বিনোদিনীকে এ ঘরে মানাচ্ছে না।

আজও বাবু পৌঁছে দিল!

তারাপদর গলায় কী ছিল, চমকে ওর পাংশু রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকাল বিনোদিনী। চোখের দৃষ্টিতে কী ছিল, চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল বিনোদিনী। অস্পষ্টভাবে জবাব দিল, হ্যাঁ।

দরদ যে একেবারে উথলে পড়ছে!

তারাপদর হিংস্র বিকৃত প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিনোদিনী নিঃশব্দে ঘরের মেঝেতে নিজের বিছানাটা পাততে লাগল।

এত রাতই বা হয় কেন রোজ রোজ? অ্যাঁ?

তারাপদর কোটরগত দৃষ্টি কুটিল। চোয়াল শক্ত। গলা আরও চড়া।

এবার বিনোদিনী জবাব দিল, কেন রাত হয় জান না? মাস মাস এতগুলো টাকা এমনি দেন না বাবু। তোমার মত যে বাড়ির গিন্নী রাতদিন শয্যা নিয়ে পড়ে থাকেন, সে বাড়ির সব ভাল আমাকেই সামলাতে হয়। আর তোমাকেও বলি, এত রাত অবধি ওই রোগা শরীর নিয়ে জেগে বসে থাকবারই বা দরকারটা কিসের? সমস্ত দিন খেটেখুটে এসে এসব কথা আমার ভাল লাগে না।

দুম দুম করে পা ফেলে পাশের খুপরিটার মধ্যে চলে গেল বিনোদিনী কাপড় ছাড়তে বা অন্য কিছু করতে।

কিন্তু বিনোদিনীর ভাল না লাগলেই যে তারাপদ চুপ করে থাকবে, এমন কোন কথা আছে!

বিকৃত বীভৎস মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যাসক্যাসে গলায় চেঁচাতে থাকে তারাপদ: এতে তোর ইজ্জত যায় না? তোকে আগলে বেড়াচ্ছে! পাহারা দিচ্ছে! ওই গুণ্ডাটা তোর সর্বনাশ করবে বিনো, ওর মতলব ভাল নয়, এ আমি বলে দিলাম। পাড়ার লোক ছি ছি করছে। কানের মাথা, চোখের মাথা, লাজলজ্জার মাথা সব একেবারে খেয়ে বসেছিস, তোর গলায় একগাছা দড়িও জোটে না? ছি ছি ছি!

গলায় দড়ি দেব পাড়ার লোকের কথায়!—ও-ঘর থেকে বিনোদিনীর ব্যঙ্গের হাসি শাণিত ছুরির মত তারাপদর কথাগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে উড়িয়ে দেয়: তবু যদি তোমার পাড়ার লোকেদের হাড়ে হাড়ে না চিনতাম। এই বিনোদিনীকে রাজরাণী করে রাখবার জন্যে ওদের সে কি আকুলি-বিকুলি। হাতে-পায়ে ধরে সাধাসাধি। একজন তো আবার পালিয়ে যেতেও সাধাসাধি করেছিল তার সঙ্গে। নামটা যে তুমি জান না, তাও নয়।

শীর্ণ গলার বার-করা শিরগুলো দড়ির মত পাকিয়ে ওঠে। দাঁত কিড়মিড় করে তারাপদ: না, লাহাবাবুর বাড়ি তোকে কাজ করতে হবে না। ঢের সহ্য করেছি, চোখের ওপর তোর এই বেলেল্লাপনা আমি আর সহ্য করব না। খবরদার বলছি, কাল ফের যদি তুই কাজে যাস তবে তোর একদিন কি আমার একদিন।

ধারাল চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণার বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। নরম লালচে ঠোঁটের ওপর মুক্তোর মত শক্ত দাঁতের চাপ পড়ে। কঠিন বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বিনোদিনী জবাব দেয়, তবু যদি মুরোদ থাকত! তবু যদি পরিবারের ইজ্জত বাঁচানোর ক্ষমতা থাকত!

মিটমিটে লণ্ঠনটাকে একবার দপ্ করে বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ নিভিয়ে দিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বিনোদিনী জলন্ত অগ্নিশিখার মত।

শুধু লণ্ঠনটাই নিভে যায় না—সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় পঙ্গু অক্ষম অপদার্থ তারাপদও।

• • •

কী ভয়ঙ্কর রকমের দুর্বোধ্য এই মেয়েমানুষটা! বাবুদের সামান্য মুখের কথায় যার ইজ্জত যায়, সমস্ত রাত ছটফট করে কাটায়, চাকরি না ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত যার শান্তি হয় না, স্বস্তি হয় না, সে আজ ইজ্জত খুইয়ে এসেও কেমন করে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ডুবে গেছে ওই জঘন্য খুপরিটার মধ্যে!

রাত নটা নয় দশটা নয়, একেবারে সাড়ে বারোটায় ফিরে এসেছে বিনোদিনী। সেই লম্বাচওড়া দৈত্যের মত, অসুরের মত চেহারার লাহাবাবু নিজের হাতে বিনোদিনীর হাত ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন গলির মোড়ে। স্বচক্ষে দেখেছে তারাপদ। অনড় অচল একটা মৃতদেহের মত শুয়ে শুয়ে। ওর পায়ের শব্দ শুনেছে। সঙ্কুচিত ভীত সন্ত্রস্ত। চোরের মত। অপরাধীর মত।

সদর দরজা দিয়ে ঢোকে নি। বাইরের দাওয়া দিয়ে নিঃশব্দ পটু হাতে খুপরি ঘরটার দরজা খুলেছে। তারপর আলোটা পর্যন্ত না জেলে ছেঁড়া মাদুরটা পেতে শুয়ে পড়েছে। তারাপদর ঘর নয়, মাথার বালিশও নয়—আজ ওর আর কোন কিছুরই দরকার হয় নি।

মনে ভেবেছে টের পাবে না তারাপদ।

অসুস্থ রুগ্ন তারাপদকে ফাঁকি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লাহাবাবুকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখবে।

যে স্বপ্ন একটু আগেই ও সফল করে এসেছে।

নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকার!—দাঁতে দাঁত ঘষল তারাপদ। চোয়াল শক্ত হল। কোনমতে ভাঙাচোরা রেখায় এঁকে-বেঁকে তক্তাপোশ থেকে নামল। শ্বাসরুদ্ধ উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঘষতে ঘষতে এগিয়ে যেতে লাগল পার্টিশনের ওধারের খুপরিটার দিকে।

সব বাবু খারাপ! সব বাবু মন্দ! লাহাবাবু তোকে ঘরের বউ বানিয়ে মুঠোয় পুরে রেখেছে, তাই তুই একেবারে গলে গেছিস। লাহাবাবুর শরীর দেখে, গায়ের জোর দেখে তুই মজে গেছিস। ভেবেছিস তোকে ধরতে পারব না, তোর নাগাল পাব না। ভেবেছিস বিছানায় পড়ে আছি বলে তোকে খুন করবার ক্ষমতাটুকুও আমার নেই, তোকে নষ্ট হতে না দেবার শক্তিটুকুও আমার নেই, না?

শব্দহীন ঘন অন্ধকার রাত্রে একটা হিংস্র নিষ্ঠুর রক্ত-লোভী নিশাচর শ্বাপদের মত তারাপদ অতি সন্তর্পণে এ ঘরে ঢুকল।

অসহ্য ঘৃণায়, অসহ্য যন্ত্রণায় ওর শির বার করা হাত দুটো লোহার মত কঠিন হয়ে উঠল। কোটরগত চোখ দুটো মৃত্যু-ক্ষুধায় ঠেলে বেরিয়ে এল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি দ্রুত হল।

জানলাহীন খুপরিটায় কী অসহ্য গরম। পার্টিশনের ওপাশ দিয়ে তির্যক্ অস্পষ্ট একটু আলোর রেখা এই সঙ্কীর্ণ মালপত্র ঠাসা ঘরটাকে আরও কুশ্রী অন্ধকার করে তুলেছে। দুঃসহ উত্তাপ-ভরা পরিবেশে অপরিসর মেঝেটুকুতে কোনমতে কুঁকড়ে শুয়ে আছে বিনোদিনী—উঁচু নীচু ঢেউ-তোলা যুবতী শরীরটার বিষাক্ত নেশাভরা ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত করে, ঠোঁটের কোণে পরিতৃপ্ত সুখের হাসির রেখা এঁকে।

ঠিক যেমনটি তারাপদ একটু আগেই ও ঘরে শুয়ে কল্পনা করেছিল, তেমন ভাবেই।

সর্বনাশী! শয়তানী! নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকার!

তারাপদর মনে হল ওর শরীর মন আত্মা—সবকিছু মিলিয়ে নির্মম নিষ্ঠুর অদৃশ্য একটা শক্তি নৃশংস ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে ওই রমণীয় লোভনীয় দেহটার ওপর। ওকে টুকরো টুকরো করে ছিন্নভিন্ন করে একেবারে শেষ করে দিতে চাইছে।

হিংস্র জানোয়ারের থাবার মত তারাপদর হাত দুটো সাঁড়াশীর মত এগিয়ে এল বিনোদিনীর গলা লক্ষ্য করে। আর সেই মুহূর্তে নজরে পড়ল অনাবৃত গলার নীচে উত্তুঙ্গ গিরিচূড়ার ঠিক পাশেই নতুন শাড়ির আঁচলের কোনায় গিঁঠ দেওয়া।

আগ্নেয়গিরির লাভা প্রবাহটাকে কোনমতে উদ্‌গিরণের অবস্থা থেকে স্থগিত রেখে গিঁঠটা খুলে ফেলল তারাপদ।

দশ টাকার নোট। একখানা দুখানা নয়—পাঁচ খানা। পঞ্চাশ টাকা!

তারাপদ নিঃসন্দেহ। নিঃসংশয়। অসতী কুলটা স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষার ভার এবার তার হাতে। তারপর এই ঘৃণ্য অশক্ত অপদার্থ রুগ্ন দেহটাকে বইবার ভার এ ঘরের পালঙ্ক কড়িকাঠগুলোরও আছে। মরেই যে আছে, তার আর মরবার ভয় কোথায়! গলার দড়ি না জুটুক, বিনোদিনীর শাড়ির অভাব এখন আর নেই।

হঠাৎ বুকের মধ্যে সেই যন্ত্রণা। সেই শ্বাসকষ্ট।

ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড চৌচির হয়ে যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। হাওয়া নেই—এক ফোঁটা বাতাসও টানতে পারছে না তারাপদ। তারাপদর প্রাণদণ্ডাদেশের ঘণ্টা কি বেজে উঠল! কিন্তু তার আগে বিনোদিনীকে শেষ করে রেখে যেতে হবে যে!

সেই অবস্থায় হাত দুটো তুলতে গেল তারাপদ। যে পাঁচখানা নোটের কর্কশ অমসৃণ স্পর্শ ওর হাত দুখানাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অবশ অনড় করে তুলেছিল এক মুহূর্ত আগে, সহসা সেই হাত দুখানায় বিদ্যুৎ-গতিতে উত্তপ্ত তরল রক্ত সঞ্চারিত হয়ে উঠল। সেই তরল অগ্নিস্রোত হাত থেকে সমস্ত শরীরের কোষে শিরায় স্নায়ুতে ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ল। কোথা থেকে হাওয়া এল। সহজ হয়ে এল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। শ্বাস কষ্টটাও। হঠাৎ এত কমে গেল কি করে! আর সেই অসহ্য বুকের যন্ত্রণাটা! সেটাই বা হঠাৎ কী মন্ত্রে কী সুখে মিলিয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি।

···ওষুধ পথ্য ইনজেকশন।

দু মাস—মাত্র দুটি মাস ভাল ভাবে নিয়মিত চিকিৎসা। পুনর্জীবন···ডাক্তারবাবু···টাকা···

স্বাস্থ্য শক্তি সামর্থ্য।

হঠাৎ আসা উত্তেজনার জোয়ার স্তিমিত। হাত দুখানা থর থর করে কাঁপছে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে। রোগজীর্ণ দুর্বল শরীরটাও কাঁপছে সেই সঙ্গে। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ।

সেই অন্ধকারের মধ্যে এদিক ওদিক বাঁচিয়ে অতি সন্তর্পণে হাঁটু দুটোকে দুমড়ে মুচড়ে আহত অশক্ত পশুর মত হাঁপাতে হাঁপাতে একটা ভয়-পাওয়া জানোয়ারের মত ঘষটে ঘষটে পালিয়ে এল তারাপদ ও ঘর থেকে।

দশ টাকার পাঁচখানা নোট ওর হাতের কঠিন মুঠোর মধ্যে ধরাই ছিল।

এক বিচিত্র কাহিনী

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের স্টেশনে নামলাম অনেক দিন পর। ছোট ভাই ছিল স্টেশনে। মোটঘাট কুলির মাথায় চাপিয়ে তাদের রওনা করে দিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের পথে ঢুকলাম। অনেক দিন পর গ্রামে আসছি, পথে যারই সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই-ই একমুখ হেসে প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, ঐ, এ কে গো! কখন এলে?

হাসিমুখে উত্তর দিই, এই আসছি

তারপর যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার প্রীতিবিনিময়ের পর শুনি, তা, ভাল আছ তো?

হাসিমুখে জবাব দিই, হাঁ।

তারপরেই প্রশ্ন, তা এখন থাকা হবে তো?

আছি দু-চার দিন।—বলতে বলতে এগিয়ে চলি।

এই ক বছর গ্রামে অনেক পাকা ইমারত হয়েছে কাঁচা বাড়ির জায়গায়। এগোতে এগোতে এসে পড়লাম কালীবাবুর বাড়ির সামনে। কালীবাবুর বাড়ির পিছনেও পাকা বাড়ি করেছে তাঁর বড় ছেলে। সে ভাল চাকরি করে। কিন্তু বাড়ির সামনেটায় একচালা মেটে ঘরখানা ঠিক তেমনি আছে।

কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে বিস্মিত হলাম। কালীবাবু বারান্দায় বসে নেই। অথচ এর আগে আগে যতবারই এসেছি, কালীবাবুর সঙ্গে আসবার এবং যাবার সময় ঠিক এই দাওয়াতেই দেখা হয়েছে।

তাঁর বাড়িটা ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতেই প্রশ্ন করলাম ভাইকে, কালীবাবুর কি হল?

ভাই ঠিক যেন বুঝতে পারল না। সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, কালীবাবু? কোন্ কালীবাবু?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কোন্ কালীবাবু কি! এই বাড়ির কালীবাবু।

ভাই সহজ হাসি হেসে বলল, ওঃ, তুমি যে একেবারে শহুরে মানুষ বনে গেলে দেখছি। ওকে কালীবাবু বললে বুঝব কি করে! 'বসা-কালী' বললে বুঝতে পারতাম।

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালাম। অকস্মাৎ একটা উপলব্ধি হল। কালীবাবুর বয়স এখন আশির ওপর হবে। কিন্তু ওকে সকলেই জানে বসা-কালী বলে। মানুষটা যেন একটা খণ্ড কালে বেঁচে থেকেও কালাতীত হয়ে গিয়েছেন। উনি শুধু বসা-কালী!

জিজ্ঞাসা করলাম, উনি আছেন কেমন?

ভাই বলল, এই দিনকয়েক আগে মারা গিয়েছেন।

শুনে কিছুই হল না মনে। না দুঃখ, না শোক, না কিছু। এ শুধু একটা সংবাদ। উনি তামাক টিকে আনতে বাড়ির ভিতরে গিয়েছেন এ যেমন একটা সংবাদ, এও তেমনি একটা সংবাদ। তার অতিরিক্ত কিছু নয়। তার মানে আমাদের জীবনের সঙ্গে ওঁর জীবনের অন্তরে বাহিরে কোথাও কোন যোগ ছিল না।

কান পেতে শুনলাম, ওঁর বাড়িতেও কান্নার কোন শব্দ নেই। একটি মানুষ যেন তার আশপাশ বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত না করে কোন এক মুহূর্তে নিঃশব্দে সরে গিয়েছে। যেন যেতে গিয়ে নিজেও ব্যথা পায় নি, অন্যকেও ব্যথা দেয় নি। এ যেন কখন কোন্ মুহূর্তে গাছ থেকে সকলের অলক্ষ্যে একটা পাকা পাতা ডালের বোঁটা থেকে চ্যুত হয়ে খসে পড়ল টুপ করে।

কথাটা মনে হতেই কেমন যেন নীরব হয়ে গিয়েছিলাম। কোনও বেদনায় নয়, নিজের ভাবনার মধ্যেই বোধ হয় কয়েক মুহূর্তের জন্য মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। ভাই পাশেই অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল, তার একটাও কানে আসছিল না। অকস্মাৎ ভাইয়ের প্রশ্নে চমকে তার দিকে ফিরে তাকালাম, বললাম, কি বলছিলি?

ভাই হেসে বলল, না, কিছু বলছি না। তুমি বসা-কালীর কথা শুনে তার মত তন-কালা হয়ে গেলে!

আমি শুধু একটু হাসলাম।

ভাবনার ঘোরটা তখনও আমার যায় নি।

সেই অবস্থাতেই বাড়ির দরজায় এসে কখন দাঁড়িয়েছি।

নিজের ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললাম, মা! মা গো!

মা একমুখ হাসি নিয়ে ছুটে এলেন।

গ্রামে কয়েকদিন থাকতে থাকতেই একদিন দেখা হল সুরেশ্বরবাবুর সঙ্গে। জমিদার সুরেশ্বরবাবু। এখনও বেশ শক্ত আছেন। এখনও নিজের জমিদারী, তেজারতির সেরেস্তায় বসেন, কাজকর্ম দেখেন নিয়মিত। সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে পূজা-অর্চনাও করেন। তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় আবার কথা উঠল কালীবাবুর কথা। প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, কালীচরণবাবু তো প্রায় আপনারই সমবয়সী ছিলেন?

আমার ভাইয়ের মতই সুরেশ্বরবাবু অবাক হয়ে গেলেন, কালীচরণবাবু! কে কালীচরণ?

আমি সসঙ্কোচে হেসে বললাম, কালীচরণবাবু মানে আমাদের বসা-কালী আর কি।

হা হা করে হেসে উঠলেন সুরেশ্বরবাবু। বললেন, তাই বল। আমাদের বসা-কালী! তা বসা-কালীকে কালীচরণবাবু বললে বুঝব কি করে? সে বাবুও ছিল না, চরণও ছিল না। সে শুধু কালী। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে বসা-কালী।

তারপর হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের সময়ে আমাদের সমবয়সী অনেক কালী ছিল, বুঝলে। বেঁটে-কালী, কালো কালী, খুনে কালী, গাঁদা কালী আর এই তোমার বসা-কালী। তা সব কালীই পরে 'বাবু' উপাধি পেয়েছে। পায় নি শুধু আমাদের বসা-কালী। সে কারও সঙ্গে মেশে নি যে বাবু হবে, কেউ যে তাকে আন্তরিক সম্মান দেখিয়ে ডাকবে তাও ঘটে নি ওর জীবনে। ওই-ই সবার কাছে চিরকাল বসা-কালী রয়ে গেল।

বলে চুপ করলেন সুরেশ্বরবাবু। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তা দোষে-গুণে বেশ মানুষ ছিল বসা-কালী।—বলেই হা হা করে হাসতে লাগলেন তিনি। আমি হাসির কারণ সঠিক না বুঝে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

উনি আমার মুখ দেখে আমার বিস্ময় উপলব্ধি করে হাসি থামিয়ে বললেন, হাসছি দেখে অবাক লাগছে, না? হাসছি নিজে যা বললাম তার ভুল বুঝে।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার ভুলটা ধরতে পারলে না?

না তো!

দেখ, দোষে-গুণে বেশ মানুষ ছিল আমাদের বসা-কালী। বলাটা মস্ত ভুল হল বাবা। কেন জান? কালীর আমাদের দোষও ছিল না, গুণও ছিল না। নির্গুণ ব্রহ্মের মত আর কি! চিরটা কাল একরকম করেই কাটিয়ে দিলে।

আমি এতক্ষণে বুঝলাম সুরেশ্বরবাবুর কথাটায় সত্যিই ভুল হয়েছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, ওঁর নাম বসা-কালী হল কেন?

হাসলেন সুরেশ্বরবাবু। হাসতে হাসতেই বললেন, কে ওর নামটা দিয়েছিল জানি না বাবা। কিন্তু আচ্ছা নাম দিয়েছিল। যেন কালীর সম্পর্কে অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিল। লোকটা সারা জীবন, তা সে জীবন খুব নেহাত কম দিনের নয় বাবা, সারা জীবনটাই বাড়ির দাওয়ায় বসে কাটিয়ে দিলে। যে লোকটা সারা জীবন বাড়ির দাওয়ায় এক জায়গায় ঠায় বসে কাটায় কোনও মানুষের সঙ্গে না মিশে, তার নাম বসা মানুষ ছাড়া আর কি হতে পারে!

বুঝলাম, বুঝে একটু হাসলাম।

সুরেশ্বরবাবুই আগের কথার জের টেনে বললেন, তা কালী আমাদের বেশ মানুষ ছিল বাপু। কারও সাতে নয়, পাঁচে নয়, কারও কোন সংস্রবে ছিল না। না ভাল, না মন্দ, ওই এক ধারার মানুষ আর কি।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, জান বাবা, অনেকে বলত, কালী আসলে জড়-বুদ্ধি। আবার আমাদের দেশ তো! অদ্ভুত কিছু দেখলেই লোকে সিদ্ধপু

আরোপ করে। তাই অনেকে আবার বলত, বসা-কালী সিদ্ধ হয়েছে, এই নাকি ওর শেষ জন্ম, ও নাকি জড়-ভরতের মত।

আমি হেসে প্রশ্ন করলাম, আপনি নিজে কি বলেন? আপনি বিচক্ষণ বহুদর্শী মানুষ। আপনি তো আর পাঁচ-জনের মত নন!

সুরেশ্বরবাবু তৃপ্তির হাসি হাসলেন। বললেন, আমি ও দুটোর কোনটাই বলি না বাবা। হতে পারে দুটোর একটা বা দুটোই। আমি বলি ওই এক ধারার মানুষ আর কি। ভগবান তো কত রকমের মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আমি আরও গভীরে যাবার চেষ্টায় বসা-কালী সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলাম। প্রথম প্রথম আমার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে শেষে নিজেই আপনা থেকেই তার সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলেন। আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাঁর সবকিছু শুনেছিলাম।

• • •

বসা-কালীর পুরো নাম কালীচরণ মুখোপাধ্যায়।

সচ্ছল অবস্থার সংসারে এখন থেকে আশি বছর আগে যখন সে জন্মেছিল, তখন দেশের চেহারা অন্য রকম ছিল; ভূমি-প্রকৃতির হয়তো কিছু সামান্য বদল হয়ে থাকবে, কিন্তু তা মানুষের চোখে পড়ে না। কিন্তু মানুষ আর গ্রামের চেহারা অন্য রকম ছিল। গ্রামে তখন তিনটি মাত্র পাকা বাড়ি ছিল। তার একটি সুরেশ্বরবাবুর বাবার তৈরি পাকা ইমারত, অন্য দুটি দেবতার মন্দির। লোকের গায়ে তখন এত জামা-জোড়া ছিল না। খালি গা, বড় জোর উড়ুনী।

কালী মা-বাপের মেজ ছেলে। কালীর বড় ভাইয়ের উপরে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে মারা যাবার পর ওর বড় ভাই বঙ্কিমের জন্ম হল। সেই জন্যে বঙ্কিমের প্রচুর সমাদর ছিল সংসারে। বঙ্কিমের পর দুই বোন, তারপর কালীর জন্ম। সেই কারণে কালী সমাদরও পায় নি, অনাদরও পায় নি।

কালীর বাবা গঙ্গাচরণবাবু ঘোর বিষয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি পৈতৃক জমিজমা যা পেয়েছিলেন তাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছিলেন সামান্য পঞ্চাশ বছরের জীবনে।

কালীর মা কিন্তু বড় ভাল মানুষ ছিলেন। শান্ত, নির্বিরোধ মানুষ ছিলেন। সংসারে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করতেন একটানা। মুখে একটুও শব্দ করতেন না। সন্তানদের মা হয়েই তিনি সন্তানদের সম্পর্কে কর্তব্য শেষ করেছিলেন। সন্তানদের খোঁজও করতেন না দিনে একবার। কেবল রাত্রিতে শোবার সময় একবার দেখে নিতেন ছেলেমেয়েরা তাঁর পাশে সারি সারি নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন কি না।

সেই কারণেই ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল, এক কালী ছাড়া। কালীই ছেলেবেলা থেকে কেমন যেন ধাত-ছাড়া। সে স্বাবলম্বী দূরের কথা, নিজে যেন খেতেও জানত না। মা কাজ করে যেতেন আর কালী সারাটা ক্ষণ তাঁর কাছে ঘুরঘুর করত, কথা বলত না, শুধু নিঃশব্দে মাঝে মাঝে মায়ের আঁচলটা ধরত।

কালীর মা-ও বিচিত্র মানুষ ছিলেন। তাঁর কাজের ফাঁকে বুঝতে পারেন নি কালী কখন তাঁর আঁচল ধরেছে। আঁচলে টান পড়ায় ফিরে দাঁড়িয়ে দেখেছেন কালী এসে আঁচল ধরেছে। তিনি বিব্রত বোধ করতেন, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলতেন, ও কি রে, কি করছিস? আঁচল ধরে টানছিস কেন?

কালী কথা সম্ভব কম খরচ করত। ওই তার স্বভাব। সে কথা বলত না। মাঝেমাঝে মা ওই কথা বললে আঁচলটা আরও জোরে আকর্ষণ করত।

মা একবার চারপাশটা চট করে দেখে নিয়ে সকলের অগোচরে ছেলেকে ছোঁ মেরে কোলে নিতেন। তারপর ছেলেকে আদর করতেন, বাবা আমার, চাঁদ আমার, ধন আমার!

অনেক আদর করে ছেলের দুই গালে দুটি আবেগতপ্ত চুম্বন দিয়ে তাকে নামিয়ে দিতেন। দিয়ে বলতেন, যাও, এইবার খেলা কর গিয়ে আমার লক্ষ্মী সোনা!

ছেলে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। মা আপনার কাজে যেতেন।

কিছুক্ষণ পরে মা কাজ সেরে বাইরে এসে দেখতেন কালী ঠিক দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

মা বোধ হয় মনে মনে সঠিক জানতেন কালী বারান্দা

থেকে যায় নি। তবু বিস্ময়ের সঙ্গে বলতেন, কি রে, খেলতে গেলি না ?

কালী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকত, কথা বলত না।

মা হেসে বলতেন, আচ্ছা, অন্য কোথাও খেলতে যেতে হবে না, এইখানেই খেলা কর্।

মা আবার নিজের কাজে চলে যেতেন। কালী সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকত। আবার কিছুক্ষণ পর গিয়ে মায়ের আঁচল ধরত।

মায়ের হাত ছাড়া সে কারও হাতে খেত না। বাপের কাছে, বড় ভাই বঙ্কিমের কাছে এই নিয়ে মার খেয়ে তার পিঠ ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু তবু সে অন্য কারও হাতে খায় নি। অসম্ভব কঠিন একটা নীরব জেদ ছিল ছেলেটার মধ্যে। ওই এক অদ্ভুত ধরনের জেদ।

মায়ের কাছে সব সময় ঘুরঘুর করা নিয়েও বঙ্কিমের কাছে এবং বোনেদের কাছে মায়ের চোখের আড়ালে সে অনেক তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। কিন্তু তাতেও তার বিচিত্র মাতৃবৎসল বালক-স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় নি। মা দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতেন হাঁ হাঁ করে। তিনি ক্রোধ প্রকাশ করতে কি কটু কথা বলতে জানতেন না। তিনি সকাতর অনুরোধ নিয়ে আসতেন, তাকে দু হাতে আগলে নিয়ে মিনতি করে বলতেন, ও তো কারও কোন সাতেপাঁচে থাকে না। ও একান্ত নিরীহ, ওকে কেন মারধোর করছিস বাবা ?

সেই মা একদিন মারা গেলেন দু দিনের জ্বরে। আকস্মিক ভাবে।

সবাই বুক ফাটিয়ে কাঁদল। পাঁচ বছরের ছেলেটার দিকে কেউ নজর দেয় নি। কালী কাঁদে নি, সে চুপ করে স্থাণুর মত মায়ের বিছানার পাশে বাবা আর ভাই-বোনদের দিকে শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখেছিল। কি দেখেছিল, কি বুঝেছিল—সেই জানে!

তারপর কিছুদিন সে কেমন হয়ে গেল যেন! বরাবরই সে চুপচাপ থাকে, অন্যের সঙ্গে মেশে কম, কথা বলে কম। সেটাও যেন তার চলে গেল। সে কেবল ঘুর-ঘুর করে ঘুরে বেড়ায় রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, বাড়ির দাওয়ায়—যে সব জায়গায় মা সারাদিন কাজ করে ফিরতেন।

মনে হয় সে মাকেও খুঁজে বেড়াত। বোধ হয় মনে মনে প্রত্যাশা করত মা আবার ফিরে আসবে। অথবা মায়ের স্মৃতি গাঢ়তম ভাবে রোমন্থন করবার জন্যেই মায়ের সঞ্চরণের ক্ষেত্রেই ঘুরত।

সেটাও একদিন বন্ধ হল।

সেই থেকে বোধ হয় তার চিত্ত আর কোন মানুষের চিত্তের স্নেহের অঞ্চলের জন্য লালায়িত হয় নি।

আর ছিল মানুষের সঙ্গ।

আর একটু বড় হলে বাইরের বিশ্বসংসার ও প্রকৃতি মানুষকে যে অনিবার্য টানে টেনে এনে পৃথিবীর বুকে দাঁড় করিয়ে দেয় সেই টানেই সে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

পাঠশালায় ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে বাইরের পৃথিবী তার সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-আকর্ষণ-জর্জরতা নিয়ে তাকে বেষ্টন করে ধরল।

পাঠশালায় সে আরও একটা বিচিত্র আকর্ষণ অনুভব করল। পাঠশালার যতীন পণ্ডিত কেমন করে যেন আবিষ্কার করলেন—গঙ্গাচরণের ছেলে কালীটা অসাধারণ মেধাবী। তাকে কোন কিছু একবারের বেশী দুবার বলতে হয় না। একবার বুঝিয়ে দিলেই যেটা বোঝবার সে বোঝে, তার অতিরিক্তও বুঝতে পারে। ছেলেটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল।

যে কারণে ছেলেটা তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল সেই কারণে তার অন্য সহপাঠিদের বিরূপতার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল সে। তার মেধার বিশেষত্ব দেখে অনেক সহপাঠীও তার বন্ধুত্বের ভাগ নিতে এগিয়ে এসেছিল। তার মধ্যে গ্রামের আজকের প্রতিষ্ঠাবান সুরেশ্বরও সেদিন ছিল দলে। বন্ধুত্বের ভাগ নিতে গিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে সেও দেখেছিল—ভাগ নেবার মত কিছুই ছেলেটার মধ্যে নেই, অথবা ছেলেটা কাউকে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা জীবনের কোনটারই ভাগ দেবে না। তার সঙ্গে ভাব করতে গিয়ে তারা ঠকেছিল। দেখেছিল ছেলেটা লেখাপড়ায় যে পরিমাণ উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ জীবনে সেই পরিমাণ বোকা।

আজকের সুরেশ্বর যে কথাটা প্রকাশ করে প্রত্যক্ষ ভাবে বলেন নি, কেবল পরোক্ষভাবে বলেছিলেন, তার ভিতর থেকেই আমি কথাটার ইঙ্গিত পেয়েছিলাম।

কালীর পার্থিব সম্পদের ওপর সহপাঠী সুরেশ্বর কেমন করে যেন একটা কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। সুরেশ্বর ধনীর ছেলে, কালীও সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান। সুরেশ্বরের কালীর বস্তুগত ঐশ্বর্যের উপর লোভ থাকার কথা নয়। কিন্তু সেটা ছিল। কালীর বন্ধুত্বের অংশীদার হতে গিয়ে সে দেখেছে তার বন্ধুত্ব পাবার নয়।

সুরেশ্বর তার বন্ধুত্ব পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে প্রথম প্রথম। বলেছে, চল কালী, দীঘির পাড়ে কাঁচামিঠে আম পেড়ে আনি।

কালী হ্যাঁও বলে নি, নাও বলে নি। যেতে বলেছে সুরেশ্বর, সে সঙ্গে গেছে।

সুরেশ্বর বলেছে, গাছে উঠে আয়।

কালী বলেছে, আমি গাছে উঠতে জানি না।

সুরেশ্বর গাছে উঠেছে; সে গাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরেশ্বর তাকে আমের ভাগ দিয়েছে, সে হাতে করে নিয়েছে কিন্তু খায় নি।

সুরেশ্বর অনুরোধ করেছে তাকে, খা।

সে বলেছে, আমি আম খাই না।

তার পর মারামারি। মারামারি মানে সুরেশ্বর মেরেছে, সে মার খেয়েছে। মার খেয়ে সে কাঁদে নি, আবার ঝগড়াও করে নি।

আবার অন্য সময় তার কাছ থেকে জোর করেই হোক অথবা কৌশল করেই হোক যখন কোন জিনিস সুরেশ্বর নিয়েছে তখনও সে বিনা বাক্যব্যয়ে জিনিসটি দিয়ে দিয়েছে।

ওই সুরেশ্বরই শেষে তার নাম দিল 'কুনো'। তাকে আর কালী বলে না ডেকে কুনো বলে ডাকতে লাগল।

ওই ডাকটা মাথায় এসেছিল তার কালী সম্পর্কে একটা গল্প শুনে।

সেও তার বেশ বছর কয়েক আগের কথা। তখন কালীর মা বেঁচে।

কালী তার বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। সামাজিক নিমন্ত্রণ, মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ।

তখন তরকারী সব পড়ে গেছে। মাছ পড়তে আরম্ভ করেছে। কালী অকস্মাৎ কাঁদতে লাগল। কালীর বাবা, কি কালীর দাদা বঙ্কিম তার কান্না লক্ষ্য করে নি। সামনের সারির এক প্রবীণ তার বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, ওহে গঙ্গা, তোমার ছেলে কাঁদছে যে!

সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত বিব্রত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে গঙ্গাচরণ বলেছিলেন, কি হল রে? কাঁদছিস কেন?

কালী কোন জবাব দেয় নি। সে কাঁদছিল, তার কান্নার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল।

এবার বিরক্ত হয়ে গঙ্গাচরণ বলেছিলেন, কি রে, কি হল বলবি তো? কি হয়েছে, পেট ব্যথা করছে? না অন্য কিছু?

কালী সজোরে ঘাড় নেড়েছিল। জানিয়েছিল, না, সে সব কিছু নয়।

তবে কি হল?

আর কথা বলে না ছেলে, কিন্তু সমানে কাঁদে। গঙ্গাচরণ প্রহারের জন্য হাত উদ্যত করে বলেছিল, এই আবার আর এক মজা। ছেলে কথা বলে না। কি হয়েছে বল্, না হলে মারব এক চড়।

এবার ছেলে বলেছিল, বাড়ি যাব মায়ের কাছে।

খানিকটা নিশ্চিন্ত, খানিকটা বিস্মিত হয়ে গঙ্গাচরণ বলেছিলেন, বাড়ি যাবি?

আবার ঘাড় নেড়েছিল কালী।

নিশ্চিন্ত গঙ্গাচরণ বলেছিলেন, খাওয়া শেষ হোক, ভোজ খা, খেয়ে বাড়ি যাবি। আগে কি উঠতে আছে?

তাতে আরও কান্না ছেলের।

তাতে আর সহ্য হয় নি গঙ্গাচরণের। তিনি উদ্মুক্ত বাঁ হাত দিয়ে ছেলেকে প্রহার আরম্ভ করেছিলেন সেই সামাজিক ভোজনের পঙ্‌ক্তির মধ্যেই। মুখে সমানে বকেছিলেন, হারামজাদা, পাজী, মায়ের জন্যে বুক উথলে উঠল। না, যেতে পাবি না। খা, খেয়ে সকলের সঙ্গে যাবি। চুপ কর্।

ছলে তাতেও মানে নি।

শেষ পর্যন্ত বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুমোদনক্রমে তাকে একা তুলে দিয়েছেন খাবার পঙ্‌ক্তি থেকে। এক মুহূর্তে চোখের জল মুছে সহজভাবে উঠে চলে গিয়েছিল ছেলেটা।

সবাই ছেলেটার বিচিত্র ব্যবহারে হেসেছিল। কিন্তু গঙ্গাচরণ আরও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হারামজাদা ছেলে কুনোর একশেস! কেবল মায়ের আঁচল ধরে থাকবে। আজ বাড়ি গিয়ে ওকে আমি বাড়ির এক কোণে পুঁতে দেব যেমন বাড়ি বাড়ি করে।

এ গল্পটা সে সময় গ্রামে ছড়িয়ে গিয়েছিল বিচিত্র কৌতুক-কাহিনী হিসেবে।

সেই গল্পের কথাটা কোথা থেকে সংগ্রহ করে সুরেশ্বর তার নাম দিয়েছিল কুনো।

ওই নামটা আবার বদলে গেল। বদলাল সুরেশ্বরই।

তখন ওরা বেশ খানিকটা বড় হয়েছে। কালী ও সুরেশ্বর তখন মাইনর স্কুলের শেষ শ্রেণীতে পড়ছে। কালী বরাবরই লেখাপড়ায় ভাল ফল করেছে। কিন্তু বাইরে বন্ধুমহলে সে বিচিত্র উপহাসের পাত্র।

খেলার সময় সকলে খেলে, সে চুপ করে দূরে বসে থাকে। কোনদিন যদিও বা খেলতে নামে তবে অল্প খানিকটা খেলে খেলার মাঝখানে খেলা ছেড়ে চুপ করে বসে পড়ে।

এই রকম একদিন খেলার মাঝখানে তার আকস্মিক-ভাবে বসে পড়ার জন্যে দু পক্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। তখন সকলে পড়ল তাকে নিয়ে।

সেইদিনই সকলের সমবেত বিদ্রূপের মধ্যে সুরেশ্বর তার 'কুনো' নাম বদল করে তার নাম দিলে বসা-কালী। সেই নামই শেষ পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে গেল। হয়ে যেন নামে শেষ পর্যন্ত একটা কালাতীত মহিমা লাভ করল।

আবার এক বিচিত্র কাণ্ড করল কালী।

বিচিত্র এইজন্যে যে তার সঠিক অর্থ কিছু বোঝা যায় না।

মাইনর পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হল, বৃত্তি পাবে সে। তার বাবা বিষয়ী গঙ্গাচরণ তখন ছেলেকে শহরের স্কুলে পড়াবার জন্যে কার বাড়িতে বিনা পয়সায় রাখা যায়, কি করে কম খরচ হয় এই সব চিন্তা করছেন।

কালী কিন্তু বলে বসল, আমি আর পড়ব না।

বাবা আশ্চর্য হল, বলল, পড়বি না? পড়বি না মানে? তবে কি মুখ্যু হয়ে বসে থাকবি?

আর কোন জবাব নেই।

গঙ্গাচরণ বললেন, আমি তো সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। শহরের উকীল বৃন্দাবনবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। বিয়ের পর শ্বশুর-বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করবি।

কালী চুপ করে গেল।

এই একবার হেরে গেল কালী।

মুখে যাই বলুক, সেবার বোধ হয় কালী ইচ্ছে করেই হেরেছিল। জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ ও পিপাসা মানুষের অন্তরে, অন্তরকে অতিক্রম করে দেহের প্রতি কোষে কোষে লক্ষ কোটি কণ্ঠে বাস করে, পরস্পরের সঙ্গে ঠেলা-ধ্বাধ্বি করে লক্ষ জনতার সম্মিলিত কণ্ঠে চীৎকারের মত 'চাই' 'চাই' ধ্বনি তোলে গভীর নীরবতার মধ্যে, সেই আকর্ষণ ও পিপাসাই ওকে হারিয়ে দিল। হেরেই সে বোধ হয় পরম তৃপ্তি লাভ করেছিল।

তখন ওর বয়সই বা কত। বছর পনের, তার বেশি নয়। তখন সদ্য ওর গোঁফের রেখা দেখা দিচ্ছে।

সেই সময়ে জুড়ি-গাড়িতে চেপে মাথায় টোপর এবং মালা-চন্দন ধারণ করে সে শহরে গেল বিয়ে করতে। কন্যাটির বয়স তখন মাত্র ন বছর।

বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে থেকেই সে লেখাপড়া করতে লাগল।

বিয়ের সময় গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরা পর্যন্ত বরযাত্রী গিয়ে বধূর সুন্দর মুখখানি এবং বধূর পিতার ঐশ্বর্য দেখে গঙ্গাচরণের বৈষয়িক বিচক্ষণতার প্রশংসা করেছিলেন। সাবাস গঙ্গাচরণ! পরোক্ষে গঙ্গাচরণের কূট বুদ্ধিজাত দূরদর্শিতারও তারিফ করেছিলেন সকলে। সবাই বুঝেছিল কালীচরণ শুধু সুন্দরী স্ত্রীই পায় নি, উকীল হয়ে ভবিষ্যতে শ্বশুরের গদিতে বসার আশ্বাসও পেয়েছে।

কিন্তু কালীচরণ সমস্ত ব্যাপারটা কি চোখে দেখেছিল

তা অন্যে কেউ বুঝতে পারে নি। সবাই ভেবেছিল কালী খুশীই হয়েছে। অন্ততঃ সুরেশ্বর প্রত্যাশা করেছিল কালীর এবার চেহারা-বদল হবে; খানিকটা অহঙ্কার আসবে তার মধ্যে অন্ততপক্ষে; আর সে অহঙ্কারটুকু, কালী যতই বোকা-হাবা হোক, তার বাক্যে-ব্যবহারে প্রকাশ পাবেই।

গরমের আর পুজোর দুটো লম্বা ছুটিতে কালী শহর থেকে গ্রামে আসে মাঝে-মাঝে দু-চার দিনের ছুটিছাটায়ও আসে। যারা ভেবেছিল কালী বদলাবে এবার তারা কালীকে দেখে ও তার সঙ্গে কথা বলে অবাক হয়, খানিকটা নিরাশও হয়। শহরে শ্বশুরবাড়িতে থেকে লেখাপড়ার ফলে কালীর বাহ্যিক পোশাকে একটা চিক্কণতা ও খানিকটা ঐশ্বর্যের ছাপ লেগেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার বেশী গভীরে আর ছোপ ধরে নি। কালী যে বোকা-হাবা সেই বোকা-হাবাই রয়ে গেছে। সাতটা চড় মারলেও একটা কথা বলে না।

কেবল একটা পরিবর্তন হয়েছে তার। সে তামাক খেতে শিখেছে।

দেখে সুরেশ্বর খুশী হল। তামাক খাওয়ার ভিতর দিয়ে চিরকালের বন্ধুত্বকে সে গভীর করার জন্য আবার একবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না, তাকে নিরাশ হতে হল। তামাক খেয়ে কালী গভীর তৃপ্তি পায় বটে, কিন্তু সে তৃপ্তি হয়তো ভাল জামা-কাপড় পরার তৃপ্তির মত। ভাল ধোপদুরস্ত জামা খুলে রাখলেই তৃপ্তির শেষ, তেমনই যতক্ষণ তামাক খায় ততক্ষণই আরাম, তারপর আর কোন চিহ্ন থাকে না।

তামাক খেয়ে হুঁকোটা সুরেশ্বর কালীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, কালী, তুই চিরকালই একটা বোকা-হাবা রয়ে গেলি।

কালী প্রশ্নও করে না, উত্তরও দেয় না, বড়জোর তার কড়া গোঁফের আড়ালে একটু মাত্র হাসে।

সেই কালী আবার এক গণ্ডগোল পাকাল।

তখন সে এনট্রান্সের সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ছে।

পুজোর ছুটিতে সে বাড়ি এল। সে একাই এসেছিল। তার স্ত্রী আসে নি। সে তো এখনও একান্ত কচি মেয়ে।

পুজোর ছুটির কিছুদিন পরেই পরীক্ষা। কালীর বাবা গঙ্গাচরণ এবং দাদা বঙ্কিম দুজনেই তাকে শহরে চলে গিয়ে লেখাপড়া করবার জন্যে তাগিদ দিচ্ছে। বঙ্কিমের লেখাপড়া হয় নি। কিন্তু সে বাপের বিষয়বুদ্ধিটুকু ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা পেয়েছে। সে সাত মাইল দূরে রেলস্টেশনের গায়ে কয়লার গুদাম করেছে। এখন তার সঙ্গে একটা কাঠের ব্যবসাও জুড়েছে সে। সে ব্যবসা ভালই করছে। এখন বাপ এবং দাদা দুজনেরই ইচ্ছে কালী লেখাপড়া শিখে উকীল হয়, জেলাজোড়া নাম, পসার আর প্রচুর পয়সা হয়। দুজনেই জানে কালীর যা বুদ্ধি তাতে ব্যাপারটা কালীর পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।

বারবার শহরে যাবার তাগিদ দিতে দিতে কালী একদিন বাপ-দাদা দুজনকেই পরিষ্কার বলল, আমি আর পড়ব না।

দুজনেই একেবারে যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়লেন। বিস্ময়ে এবং ক্রোধে গঙ্গাচরণের মুখ দিয়ে কথা বেরল না।

বঙ্কিমই বাপের হয়ে বলল, সে কি রে! পড়বি না তার মানে?

কালী চিরকাল কথা এক রকই বলে, তার বেশী বলে না। সে আর জবাব দিল না, চুপ করে রইল।

বঙ্কিম বলল, তোর কি ধারণা তোর শ্বশুর তোকে দেখে বিয়ে দিয়েছেন তাঁর মেয়ের? তোর বাপের সম্পত্তি দেখে দিয়েছে, তার ওপর বেশী করে বুঝেছে তুই আইন পাস করে তাঁর গদিতে বসে ওকালতি করবি। তুইও সুখে থাকবি, তাঁর মেয়েও সুখে থাকবে। তা তুই লেখাপড়া না করে করবি কি?

আর কোন উত্তর নেই।

জবাব না পেয়ে গঙ্গাচরণ রাগে লাফিয়ে পড়লেন ছেলের ওপর। তার চুলের মুঠো চেপে ধরলেন। চুল ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বললেন, তুই ভেবেছিস কি! তুই মুখ্যু হয়ে বাড়িতে বসে থাকবি বিধবা মেয়ের মত, আর আমি বসে বসে তোকে গেলাব? তা হবে না এ তুই জেনে রাখিস।

বঙ্কিম মাঝে পড়ে বাপের হাত থেকে ওর চুলের মুঠি ছাড়িয়ে দিল।

বাপ প্রায় কেঁদে ককিয়ে উঠলেন, ওরে হতভাগা, ার মনে যদি এই ছিল তবে তুই অত বড়লোকের য়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিলি কেন? তুই রাঁধুনী মুন হবি জানলে অতবড় নাম-করা মানুষটা কি ার মত ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিত? এখন ামি তোর শ্বশুরের সামনে দাঁড়াব কি করে?

কালী নিরুত্তর। মাথা হেঁট করে মূর্তির মত চুপচাপ ড়িয়ে রইল।

অনেক তর্জন-গর্জন, প্রহার-অত্যাচার, অনুনয়-বিনয় রলেন গঙ্গাচরণ। কিন্তু আর দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ রল না কালী। গঙ্গাচরণ ছেলেকে খুব ভাল করেই নেন। চেনেন বলেই তাঁর উদ্বেগটা বেড়েছে। এ সেই লে যে চার বছর বয়সে বাড়ি আসার জন্যে বায়না রেছিল, কিন্তু যাকে প্রহার করেও থামানো যায় নি। ই অবস্থাতেই বাড়ি যেতে দিতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। ই ছেলেই আজ তিন বছর আগে একবার বলেছিল ড়ব না। যে তিন বছর আগে পড়ব না বলেছিল সেই-ই াজ আবার বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

ছেলেকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন গঙ্গাচরণ, কেন ড়বি না তুই? কি হয়েছে তোর? শ্বশুরবাড়িতে কউ কি তোকে অপমান করেছে?

কালী এত কথার পর শুধু একবার ঘাড় নেড়ে ানাল, না, তাকে কেউ অপমান করে নি।

তবে? তবে কেন যাবি না তুই?

আর কথা বলল না কালী।

শেষ পর্যন্ত নিজে না পেরে বৈবাহিককে সমস্ত জানিয়ে ত্র লিখলেন গঙ্গাচরণ।

নামকরা, বাঘা উকীল ছুটে এলেন মেয়ের শ্বশুর-াড়িতে। বুদ্ধি করে মেয়েকেও নিয়ে এলেন।

এসে অনেক বোঝালেন জামাইকে। জামাই বুঝল কনা সেই ই জানে, কথা সে একটাও বলল না।

শ্বশুর পরদিন মেয়েকে ও জামাইকে নিয়ে যেতে াইলেন। গঙ্গাচরণও সানন্দে রাজি হলেন। যাবার ময় কিন্তু কালীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। শুর নিজের কপালে করাঘাত করে শুধুমাত্র কন্যাকে নিয়ে ফিরে গেলেন।

তিনদিন পরে কালী ফিরে এল। কিন্তু সে আর স্কুল বা শহরমুখো হল না।

ওইখানেই তার লেখাপড়া এবং লৌকিক প্রতিষ্ঠার সব আশার সমাপ্তি ঘটল।

এর পর থেকে বাপ ছেলের মুখের দিকে বড় একটা তাকাতেন না। তাকালে সে মুখে শুধু একটা গভীর আশাভঙ্গের অভিব্যক্তি ফুটে উঠত। এই অদ্ভুত ছেলেটাকে তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না কোনদিন। এই ছেলেটা তাঁকে যে দাগা দিল জীবনে সে রকম দাগা তিনি কখনও কারও কাছে পান নি।

কালী কিন্তু নির্বিকার। সে খায়দায় আর বাড়িতেই বসে থাকে চুপচাপ।

কালী যে বয়ে গিয়েছে এ তিরস্কার করবারও উপায় নেই গঙ্গাচরণের। কোন খারাপ কাজ জীবনে করে না কালী। দোষের মধ্যে তার মাত্র একটি দোষ আছে। সে তামাক খায় খুব। কিন্তু তামাক খাওয়াটা তো তখনকার দিনে বড় একটা দোষের ছিল না।

এই সময় তামাক খাবার সূত্রে মাঝে মাঝে দেখা হত সুরেশ্বরের সঙ্গে।

কথায় কথায় তার স্ত্রী আর শ্বশুরবাড়ির কথা এনে ফেলত সুরেশ্বর। জিজ্ঞাসা করত, তোর মত ছেলে পড়াশুনো ছেড়ে চলে এলি রে কালী! কেন এলি?

জবাব দিত না কালী। তামাক টেনে যেত আপন মনে।

বার বার জিজ্ঞাসা করলে এক-আধটা কথায় জবাব দিত। সুরেশ্বরের কথার উত্তরে সেই সময় একদিন বলেছিল, ভাল লাগল না।

সুরেশ্বরের কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল। সে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন করেছিল, কি ভাল লাগল না?

এবার মাত্র একটি কথা বলেছিল সে, পড়তে।

পড়তে যদি ভাল না লাগে তবে কি ভাল লাগে তোর?

জানি না।

তা বললে তো হবে না। কিছু একটা তো তোকে করতে হবে। কি ভাল লাগে বলবি তো?

কিছুই না।

তা হলে কি করবি?

জানি না।

ওই একদিনই অনেকগুলো কথার জবাব দিয়েছিল কালী। তারপর আর কথা বলত না।

সুরেশ্বর তাকে অনেক দিন জিজ্ঞাসা করেছে তার স্ত্রী সম্পর্কে, শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে। কিন্তু কোনদিন একটা কথার জবাব সে পায় নি কালীর কাছ থেকে।

প্রায় সকলের সঙ্গচ্যুত হয়ে কালী কিছুদিন বসে কাটাল বাড়িতে। বাড়ির লোকজনও তার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। খাবার সময় সে একবার রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। ভাত দিলে খায়, তারপর একসময় খাওয়া শেষ করে নিঃশব্দে উঠে যায়। বাস্, আর কোন সম্পর্ক নেই বাড়ির লোকের সঙ্গে।

এমনি করেই বছর দুয়েক কেটে গেল।

আবার একসময় কালীর জীবনে একটু চাঞ্চল্য এল। আনল সে নিজেই।

একদিন একখানা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ নিয়ে সে সুরেশ্বরের পিতামহীর নামে প্রতিষ্ঠিত টোলের পণ্ডিত-মশাইয়ের কাছে গিয়ে হাজির হল।

দূর থেকে ব্যাপারটা দেখে গঙ্গাচরণ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি আপনমনেই বললেন, মরুক, জাহান্নামে যাক। যার উকীল হয়ে কত মান-খাতির, ধন-দৌলত রোজগার করবার কথা সে গেল টোলে পড়তে। কি হবে? টোলে পড়ে ঠাকুরবাড়িতে এক টাকা মাস-মাইনেতে দেবতার সেবা করবে। কপাল আর কাকে বলে!

কদিন যেতে না যেতে ছেলেকে এই অজুহাতে আর একবার তিরস্কার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। একদিন টোল থেকে ফিরতেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই যে নতুন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কিনলি, টাকা পেলি কোথায়?

কালী নীরবে মাথা হেঁট করে হাতের আঙুলগুলো নিজের চোখের সামনে মেলে ধরেছিল।

গঙ্গাচরণ ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন উপায়হীন অপরাধীর মত কালী উত্তর দিতে অপারগ হয়ে মাথা হেঁট করেছে।

তিনি সুযোগ বুঝে তর্জন করে উঠেছিলেন, বইখানার দাম কত?

চার টাকা।

টাকা তুই কোথায় পেলি? চুরি করেছিস?

তখন একবার কালী মুখ খুলেছিল। বলেছিল হাতখানা প্রসারিত করে দিয়ে, বিয়ের আংটিটা বিক্রি করে কিনেছি।

গঙ্গাচরণ আকাশ থেকে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, সেই দামী মুক্তো-সোনো আংটিটা, তোর বিয়ের আংটি তুই বিক্রি করে দিয়েছিস? কাকে বিক্রি করলি? কত টাকায় বিক্রি করলি?

তিনি ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে আংটির উদ্দেশে ছুটলেন। ছেলে নিশ্চিন্ত হয়ে টোলে পড়তে লাগল।

নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ তার জীবন।

ঠিক এই সময়।

আগে থেকে কোন খবর না দিয়েই একদিন ঘোড়ার গাড়িতে চেপে, গাড়ির মাথায় জিনিসপত্র বোঝাই করে গঙ্গাচরণের বৈবাহিক, কালীর শ্বশুর এসে হাজির হলেন তাদের বাড়ি। তিনি একা আসেন নি, সঙ্গে কন্যাকেও নিয়ে এসেছেন।

গাড়ি থেকে নেমে হাত জোড় করে কালীর শ্বশুর বেয়াইকে বললেন, আপনার বউমাকে আপনার শ্রীচরণে নিয়ে এলাম বেয়াইমশাই। দুঃখ অভিমান করে কি করব, মেয়ের কথা ভেবে আর বসে থাকতে পারলাম না অভিমান করে।

গঙ্গাচরণ বেয়াইকে অবাধ্য, আর নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞানহীন পুত্রের শ্বশুরকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করবেন ভেবে মনে মনে বিব্রত বোধ করছিলেন। তিনি লজ্জিত হাসি হেসে বেয়াইয়ের হাত দুখানা ধরে তাঁকে আহ্বান জানালেন। পুত্রবধূকে বরণ করবার জন্যে জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

বেয়াই হাসিমুখে বললেন, কালীচরণ কোথায়?

গঙ্গাচরণ বললেন, বাড়িতে তো নেই দেখছি। সে তো বাড়ি থেকে কোথাও বেরয় না বড় একটা। যায় একবার করে দু বেলা টোলে।

বেয়াই হেসে বললেন, তাইতো খবর পেলাম।

ী আজকাল টোলে পড়ছে। ব্যাকরণ আর স্মৃতি
হ বুঝি!

কি জানি মশাই, আমি কোন খবর-টবর রাখি না।
ন হয় করুক। বললে তো কিছু শুনবে না।

বেয়াই যেন অবস্থাটা মেনে নিয়েই এসেছেন।
লন, তা মন্দের ভাল। শাস্ত্র চর্চা করছে, ওতে
াল পরকাল দু কালেরই কাজ হবে।

গঙ্গাচরণ ইহকালের কথা ভাল করে বোঝেন, পর-
লর কথা তাঁর ভাববার সময় নেই ইহকালের চাপে।
বললেন, জানি না মশাই, কি করছে। তবে বসে
থেকে একটা কিছু যে করছে সেই ভাল। তা আপনি
মুখ ধুয়ে ফেলুন, সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে একটু জলযোগ
করুন। আমি একবার বউমাকে দেখি।

গঙ্গাচরণ খুশী মনে উঠে গেলেন। তাঁর মাথায়
া কল্পনা এসে গিয়েছে এরই মধ্যে।

রাত্রিতে নববধূর সঙ্গে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে
কটা বিব্রত হয়ে হেসেছিল কালী।

বধূ এখন আর সেই কচি মেয়েটি নেই, এখন সে
যুবতী, সুন্দরী। সে স্বামীর দিকে অভিমানভরে
বলেছিল, তুমি তো আমাকে ভুলেই গিয়েছ!
-মা জোর করতে লাগল, মা কান্নাকাটি করছিল,
তোমাদের বাড়ি এলাম। নইলে আসতাম না।
র টানে আসব? তুমি আমাকে ভালও বাস না।
নিজের ভবিষ্যৎটাও নষ্ট করলে।

এইবার মুখ খুলেছিল কালী, বলেছিল, আরে না
তোমাকে—তোমাকে কী বলব—খুব ভালবাসি।
আমার কেমন লেখাপড়া করতে ভাল লাগছিল না,
চলে এলাম।

তা তুমি নাকি টোলে ভর্তি হয়েছ?

একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে কালী বলল, তা
হ।

ভাল। এও ভাল। তুমি ভাল করে সংস্কৃত পড়ে
ত হয়ে টোল কর। আমার দিদিমা এক
আছেন কাশীতে। তিনি একজন মহামহোপাধ্যায়
। তুমিও তেমনি পণ্ডিত হও, তা হলেও আমার
দুঃখ ঘুচবে।

কালী একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল অকস্মাৎ। জীবনে তার উচ্ছ্বাস আসে না। যে সামান্য ক বার এসেছিল এ তার ভেতর একবার। সে হেসে বলেছিল স্ত্রীর হাত ধরে, তা হলে তুমি খুশী হবে?

স্ত্রী হাসিমুখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বলেছিল, হব।

অকস্মাৎ এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছিল কালী, বলেছিল, ঠিক আছে, তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি সংস্কৃত ভাল করে পড়ে পণ্ডিত হয়ে টোল করব।

এরপর পরম আনন্দে দুজনেরই কাছে আসতে আর বাধা থাকে নি। উভয়েই উভয়ের কাছে বাঁধা পড়েছিল, সেই সঙ্গে দুজনে দুজনের বাহু-বন্ধনের মধ্যেও কখন পরম তৃপ্তিতে বাঁধা পড়েছিল।

তার পরদিনই এক নতুন ছাঁদে গিঁঠ বাঁধতে চেয়েছিলেন তার বিষয়ী বাবা।

মেয়ের সঙ্গে সকালে একান্তে একবার সাক্ষাৎ করে মেয়ের মুখে চোখে আনন্দের স্পর্শ দেখে পরম পুলকিত হয়েছিলেন কন্যার বাপ। তিনি সেটুকু দেখে যেন লক্ষ্য না করে গম্ভীরভাবে কন্যাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কি রে, কি ঠিক করলি? এখানে থাকবি না আমার সঙ্গে যাবি?

মেয়ে একবার বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বলেছিল, আমি এখানে থেকেই যাই বাবা। মাকে বলো আমি এখন এখানেই থাকব।

বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষটির দু চোখ জলে একবার ঝাপসা হয়ে এসেছিল। তিনি মনে মনে নিজের জামাইয়ের আধময়লা কাপড়জামা, মস্তবড় বেখাপ্পা গোঁফ আর খোঁচা খোঁচা দাঁড়িওয়ালা বাক্যহীন মুখখানা কল্পনা করে বিস্ময় অনুভব করেছিলেন এই ভেবে যে ওই আধ-ক্ষ্যাপা মানুষটা তাঁর মেয়েকে কেমন করে এই কয়েক ঘণ্টায় কি করে বশ করে ফেলল!

তিনি হাসিমুখে বাইরের ঘরে এসে বসে জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, কি পড়ছ এখন?

ব্যাকরণ আর সামান্য স্মৃতি।

স্মৃতি পড়ে আর লাভ নেই। স্মৃতির কাল গেছে। এখন স্মৃতি গিয়ে উঠেছে সরকারী এজলাসের আওতায়। তবে পড়, পড়া ভালই। পড়া কিছু খারাপ নয়।

কালী নীরব।

শ্বশুর আবার বললেন, আর কি পড়বে?

এবার পরীক্ষাটা দিই। দিলে কাব্য আর বেদান্ত আরম্ভ করব ব্যাকরণের সঙ্গে।

অত পারবে?

কালী হেসেছিল, বলেছিল, পণ্ডিত মশাই-ই বলেছেন নিজে তুমি পারবে।

বেশ ভাল। এখানে পড়া শেষ কর। কাশীতে আমার এক মামা আছেন, মস্ত পণ্ডিত। এখানকার পড়া শেষ হলে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দোব। সেখানে পড়ে আসবে।

উৎসাহিত হয়ে তার শ্বশুর বলেছিলেন।

এই সময়েই গঙ্গাচরণ এসে বসেছিলেন সেখানে। তাঁদের কথা তাঁর খুব ভাল লাগে নি। ওই টোল আর সংস্কৃতের উপর তাঁর নিজের কোন আস্থা নেই। তিনি সেই মুহূর্তে অন্য একটা কথা পেড়েছিলেন, বলেছিলেন, ও হতভাগা আপনার কথা শুনে ওকালতির রাস্তায় গেল না। এখন টোল ধরেছে। টোলে পড়ে কি লাভ হবে? ক পয়সা উপায় করবে? ওতে কিছুই হবে না। আমি একটা কথা বলছিলাম।

কালী যেমন নিরুত্তর থাকে তেমনিই নিরুত্তর বসে রইল। বেয়াইকে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে গঙ্গাচরণের মুখের দিকে তাকাতে হল শেষ পর্যন্ত।

গঙ্গাচরণ বললেন, আমি বলছিলাম কালী বরং ব্যবসাপাতি করুক। আমার বড় ছেলে তো ব্যবসা করছে, ভালই ব্যবসা করছে। তার সঙ্গেই বরং ধান চালের কেনাবেচা করুক। ইচ্ছে হয় আলাদাও করতে পারে। আমি ওকে কিছু মূলধন দিই, আপনিও কিছু দিন—তাতে বেশ বড় করে ভাল করে ব্যবসা করতে পারবে।

বেয়াইয়ের মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। তিনি একবার কালীর মুখের দিকে তাকালেন। কালী সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বেয়াই বুদ্ধিমান মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে মুখে আবার হাসি এনে বললেন, আমার আর আপত্তি কি! কালী কিছু করলেই আমি খুশী। তা কালী তো টোলে পড়ছে। কালী যদি টোলের পড়া ছেড়ে ব্যবসা করতে চায়, আমি ওর মূলধন খানিকটা করে দেব বইকি। কি কালী, ধানচালের ব্যবসা করবে?

কালী কোন কথা না বলে সেখান থেকে উঠে পড়ল।

ছেলেকে অমন ভাবে চলে যেতে দেখে গঙ্গাচরণ বিব্রত ও অপ্রস্তুত হয়ে তাকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, এই কালী, শুনে যা। যা বলবার বলে যা এই সময়।

কালী ফিরল, কিন্তু বসল না। মাথা নীচু করে কো[illegible] ক্রমে বিড়বিড় করে বলল, আমি ব্যবসা-ট্যাবসা কর[illegible] না, ও সব হবে না আমার। দাদা তো করছে, দাদা করুক।

বলে আর অপেক্ষা না করে কালী চলে গেল।

এবার অপ্রস্তুত হলেন গঙ্গাচরণ। সমান অপ্রস্তুত হলেন তাঁর বৈবাহিক। বেয়াইয়ের জন্যেই হলেন।

কিন্তু বৈষয়িক গঙ্গাচরণ সব হেসে উড়িয়ে দিলেন, বললেন, তবে থাক। আমি ওর ভবিষ্যৎ ভাল ভেবে কথাটা বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলে কথা না নি[illegible] আর কি হবে! ও নিজে যা ভাল বোঝে করুক। আ[illegible] আর কিছু বলছি না।

অপ্রস্তুত বৈবাহিক বললে[illegible]—ব্যাপারটাকে [illegible] করবার জন্যেই বললেন, আপন[illegible] ছেলের মাথায় গোলম[illegible] আছে বেয়াইমশাই। কি যে ওর কাছে ভাল, আর কি মন্দ, সেটা ও যে কি হিসেব করে ঠিক করে তা আপনি জানেন না, আমিও জানি না। তা যদি জানতাম বুঝতাম তাহলে ও হয় ওকালতি করবার জন্যে লেখাপ[illegible] করত, না হয় আপনার কথা শুনে ব্যবসা করত। ও কি বোঝে ওই জানে। আমরা ঠিক ওর মনের [illegible] ধরতেও পারি না, বুঝতেও পারি না। এখনকার মত যা করছে করুক। পরে যদি ওর ব্যবসাপাতি কর[illegible] মন হয় তখন দেখা যাবে, বোঝা যাবে।

গঙ্গাচরণ চুপ করে গেলেন।

বেয়াইও সেইদিন চলে গেলেন আশ্বস্ত হয়ে, [illegible] পেয়ে। জামাই যা হোক ভদ্র একটা কিছু করছে [illegible] মুখে হাসি নিয়ে মেয়ে স্বামীর ঘর করতে আরম্ভ করে[illegible]

এমনি ভাবে দুটো বছর কাটতে না কাটতে ক[illegible]

্যাকরণের দুটো পরীক্ষা পাস করল ভাল করে। কাব্যের ্কটা পরীক্ষাতে সে প্রথম হল। সে তখন বেদান্তও ্ড়তে আরম্ভ করেছে।

অন্যদিকে সে একটি কন্যার জনক হল। রাত্রিতে স্ত্রীর ঙ্গে অল্পস্বল্প কথা বলে সে, কন্যার সঙ্গে গল্প করে প্রদীপের আলোতে। স্ত্রী সকৌতুক বিস্ময়ের সঙ্গে তাকে দেখে আর ভাবে, এই মানুষটা, যে কারও সঙ্গে একটা ্থা বলে না মুখ ফুটে, যে তার সঙ্গেও একটা কথা শেষ লে আর দুটো কথা বলতে চায় না, সেই মানুষ কচি ময়েটার সঙ্গে অবিরাম কথা বলে চলে প্রদীপের মৃদু ্যালোয়। কন্যার সমস্ত রাত্রির সেবাটুকু সেই-ই করে ্রম যত্নে। কতদিন পরিমাপহীন রাত্রির অন্ধকারে জেগে ্ঠে দেখেছে, ম্লান প্রদীপের আলোয় কালী ক্রন্দনরত ময়েকে কোলে করে আস্তে আস্তে দোল দিচ্ছে। তাকে জগে উঠতে দেখে হাসিমুখে মেয়েকে তার কোলে তুলে দতে উদ্যত হলে সে তাকে তিরস্কার করে বলেছে, তুমি ক পাগল, না কি বল দেখি? তোমার ঘুম পায় নই? এই দুপুর রাতে মেয়েকে কোলে করে দোল দয়ে কান্না থামাচ্ছ!

কালী কোনদিন এ কথার কোন জবাব দেয় নি। ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে খালি হেসেছে।

এমনি করেই যদি দিনগুলো চলত আরও কিছুকাল ্াহলে কালীর পক্ষে অন্তত: অত্যন্ত সুখের হত। কিন্তু ্া আর ঘটল না।

যে স্ত্রীর কাছ থেকে টোলে পড়া নিয়ে গভীর ্যানুভূতি পেয়েছিল, সেই স্ত্রীর কাছ থেকেই ভিতরে ভতরে বিরোধিতা আসতে লাগল। বাইরে বাবার কাছ ্থকে তো আসছিলই। এতদিনে বাইরের বিরোধিতার ্ঙ্গে ভিতরের বিরোধিতা যুক্ত হয়ে তাকে বোধ হয় ্াবিয়ে তুলল।

বাবা তো তার টোলে পড়া নিয়ে মধ্যে মধ্যে ্রকাশ্যেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। বলতেন, টোলে ্যাকরণ কাব্য পড়ে ছেলে আমার জগন্নাথ তর্কালঙ্কার ্বেন, মহাপণ্ডিত হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন। ্তদিন তা না করছেন ততদিন বিধবা মেয়ের মত আমি তাকে অন্ন যোগাই। শুধু তাকে কেন, তার স্ত্রী, কন্যা সবাইকে অন্ন যোগানোর দায় আমার। আমি যে ছেলের বিয়ে দিয়ে এনেছিলাম!

সেদিন ঘোমটার আড়ালে পুত্রবধূর মুখে অন্ন ওঠে না, চোখের জলে তার মুখ ভেসে যায়। সে অভুক্ত ভাতের থালার সামনে থেকে উঠে গিয়ে কারণে অকারণে নিজের কন্যাকে নির্যাতন করে।

কালী থাকলে কালী প্রতিবাদ করতে চায়, প্রতিরোধ করে কন্যাকে আগলাতে চায় অকারণ প্রহারের হাত থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে।

তীব্র চাপা কণ্ঠে স্বামীকে তিরস্কার করে, কেঁদে তার পায়ের সামনেই দুম দুম করে মাথা ঠোকে।

কালীর আর তখন কোন উপায় থাকে না, সে পালিয়ে বাঁচে।

সেবার এই ধরনের ঘটনাটাই প্রবল হয়ে উঠল। অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে, অনেক অশ্রুপাত করে, মাথা ঠুকে কপালে কালশিটে পাড়িয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তার স্ত্রী মেয়েকে কোলে করে, ভাইকে চিঠি লিখে আনিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় ক্রোধে এবং বেদনায় স্বামীকে বলে গেল, যদি রোজগার করতে পার আমাকে আর মেয়েকে আনতে যেয়ো, আসব। না হলে আর ওদিকে যেয়ো না।

যাবার সময় তাদের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কালী।

তার স্ত্রী ছিল মুখ ফিরিয়ে। সে কালীর মুখের দিকে একবারও ফিরে তাকায় নি—অভিমানভরেই বোধ হয়।

কালীর মুখের দিকে কে-ই বা কবে তাকিয়েছে! না তার স্ত্রী, না তার বাবা।

শুধু কচি মেয়েটাকে আদর করবার জন্যে একবার তার মনটা লালায়িত হয়ে উঠেছিল।

এই যাওয়াটাই কালীর জীবনে আবার একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করল।

সে টোলে যাওয়া বন্ধ করে দিল, বইপত্র সব কাপড়ে

বেঁধে শোবার ঘরে বাঁশের মাচায় তুলে রেখে দিল। বিষয়ী সংসারী পিতার সামনে এসে দাঁড়াল মাথা হেঁট করে।

কালী কখনও কোন প্রার্থনা নিয়ে, কোন কথা নিয়ে বাপের কাছে এসে দাঁড়ায় নি। আজ ছেলেকে এমন ভাবে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে একান্ত বিস্মিত হলেন গঙ্গাচরণ।

তবু সে বিস্ময় গোপন করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোমল কণ্ঠে, কি রে কালী, কিছু বলছিস না কি?

কালী ঘাড় নাড়ল।

বল, কি বলবি?

আমার একটা কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে দিন আপনি।

কালীটা যেন একটা ছোট শিশুর মত। একান্ত অসহায়ের মত বাপের কাছে এসে এক অসম্ভব বস্তু প্রার্থনা করছে। সেই কথাই বললেন গঙ্গাচরণ। বললেন, রোজগারের ব্যবস্থা চাইলেই কি করা যায় বাবা! আমি এক্ষুনি কোথা থেকে কি করব? তখন ব্যবসা করতে বলেছিলাম; ব্যবসা করবি তোর দাদার সঙ্গে?

কালী মাথা নেড়ে ঝটপট জবাব দিল। আজ সে শুধু মাথা নেড়েই থামল না, মুখেও বলল, ব্যবসা আমাকে দিয়ে হবে না। তাতে যে মূলধন দেবেন তাও নষ্ট হয়ে যাবে আমার হাতে। আপনি অন্য কিছু ব্যবস্থা করে দিন।

গঙ্গাচরণ বিব্রত বোধ করলেও তৃপ্তির হাসি হাসলেন। হেসে বললেন, তুই একটা পাগল রে! ব্যবস্থা করে দিন বললেই কি ব্যবস্থা করে দেবার ক্ষমতা আমার আছে? আচ্ছা, ভেবে দেখি। তা তোর টোলের পড়ার কি হবে?

আর পড়ব না আমি। সব বই তুলে রেখে দিয়েছি তাকের ওপর। সে আর নামাব না।

জীবনে একসঙ্গে বোধ হয় নিজের মেয়ে ছাড়া আর কারও সঙ্গে কোনদিন এত কথা বলে নি কালী।

সে চলে গেল।

পরদিন সকালে তার বাবাই তাকে ডাকলেন।

সে সুবোধ বালকের মত বাবার কাছে এসে দাঁড়াল এক ডাকেই।

গঙ্গাচরণ বললেন, চল্ আমার সঙ্গে।

সে একবার প্রশ্নও করল না, কোথায় যেতে হবে, গিয়ে কি হবে, যাবার উদ্দেশ্যটা কি। সে বিনা বাক্যব্যয়ে বাবার পেছনে পেছনে গেল।

গঙ্গাচরণ তাকে নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলেন গ্রামের জমিদারের কাছারিতে।

সুরেশ্বরের বাবা নরেশ্বরবাবু তখন বেঁচে। তিনিই সম্পত্তি, বিষয়কর্ম, তেজারতি সব দেখাশোনা করেন। সুরেশ্বরও তখন বাপের পাশে বসে বিষয়কর্ম দেখাশোনা করছে।

গঙ্গাচরণ ছেলেকে নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

জমিদারী সেরেস্তার আদব-কায়দা, চালচলন, কথাবার্তা সব ভিন্ন ধরনের। অনেক বাঁকাচোরা কথার রাস্তা দিয়ে শেষে আসল কথায় এসে পৌঁছলেন গঙ্গাচরণ। তার আগে তাঁর সঙ্গী অপদার্থ পুত্রের অপদার্থতার কথা, সংসার-বুদ্ধিহীনতার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করে ভূমিকা করেছেন তিনি। শেষে বললেন, হতভাগাকে শেষ পর্যন্ত আপনার চরণে নিয়ে এসে ফেললাম কর্তা। আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।

কৈতববাদে তুষ্ট নরেশ্বর তৃপ্ত হয়ে বললেন, আমি সামান্য মানুষ, আমি তোমার ছেলের কোন্ কাজে লাগব? আমি ওর কি করব বল।

আপনি ইন্দ্রতুল্য মানুষ। আপনার ইচ্ছে হলেই সব হবে।

চুপ করে রইলেন নরেশ্বরবাবু।

গঙ্গাচরণ বললেন, আমার ছেলেকে আপনার এস্টেটের কাজে নিন আপনি।

বিব্রত নরেশ্বরবাবু বললেন, এখানে কি কাজ করবে তোমার ছেলে?

গঙ্গাচরণ বললেন, এখানে আমলা হিসেবে নেবার কথা আমি বলি নি। আমি বলছি, আপনার এই পাশের মহাল ঘোষগাঁয়ের গোমস্তা করে নিন ওকে।

নরেশ্বরবাবু বললেন, তোমার ছেলে তো শুনেছি ঠাণ্ডা বোকা-হাবা মানুষ, সে কি এই কঠিন পাটোয়ারী কাজ পারবে? আর তা ছাড়া আমি তো এখন নিয়

রেছি খাজনা আদায় হোক চাই না হোক গোমস্তাকে য়ের দেয় কালেক্টরীর টাকা দিতে হবে। সে আদায় রে দেবে, না ঘর থেকে দেবে তা আমি বুঝব া।

গঙ্গাচরণ হাসলেন। তিনি তো এই কথাই শুনতে য়েছিলেন।

গঙ্গাচরণ বললেন, আপনার এই যদি শর্ত হয় বাবু, তা মি মাথা পেতে নিলাম। আপনার কালেক্টরীর কা আমি ঠিক ঠিক সময়ে, কালেক্টরীর ঠিক তিন দিন গে কাছারিতে দাখিল করে দিয়ে যাব।

নরেশ্বরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, ভাল। আমি রাজী। ন্তু তোমার ছেলে কি আদায় করতে পারবে?

গঙ্গাচরণ হেসে বললেন, ছেলে কি আর কিছু করবে বু? আমিই কাজের ভারটা নিচ্ছি ছেলের নাম দিয়ে। মিই করব সব, ছেলে সঙ্গে থাকবে, শিখবে। তারপর জকর্ম শিখলে তখন নিজে করবে। এখন আপনি া বলেই হয়।

একদিন ভাল দিন দেখে কালীকে দিয়ে একশো কা নগদ নজর নিবেদন করিয়ে শুভকর্ম আরম্ভ লেন গঙ্গাচরণ। সেদিন নরেশ্বরবাবু বলেছিলেন, গঙ্গাচরণ, এখনও ভাল করে ভেবে দেখ। এই জে অনেক বুদ্ধি ও কূট ছলনার দরকার হয়। এ মার বা তোমার ছেলের দ্বারা সম্ভব হবে তো?

গঙ্গাচরণ একশো টাকা নজর দিয়ে যেন জোরে রের অধিকার অর্জন করেছিলেন। তিনি হা হা র হেসে বলছিলেন, বাবু, আপনি কিছুদিন আপনার য়েবকে ছুটি দিয়ে আমাকে বসিয়ে দিন। দেখুন য় হয় কিনা।

তারপর সে কি রবরবা গঙ্গাচরণের।

ছেলে কালীচরণকে নিয়ে গঙ্গাচরণ আদায়ে বের তন। ছেলেকে শেখাতেন কি করে প্রজার কাছ থেকে জনা আদায় করতে হয়। সব প্রজার সঙ্গে এক হার চলে না। কোথাও ধমক-টমক দিয়ে, কোথাও-বা ই কথায় তুষ্ট করে জমিদারের প্রাপ্য, নিজের প্রাপ্য দায় করতে হয়।

প্রাপ্যই বা কত রকমের। প্রাপ্যের খানিকটা আসে পয়সায়, খানিকটা আসে বস্তুর চেহারা নিয়ে। সে বস্তুর মধ্যে কী নেই! ফল-ফুলুরি, বাঁশ-কাঠ, মাছ-পাঁঠা, চাল-আনাজ থেকে আরম্ভ করে চিন্তনীয় সম্ভব অসম্ভব সবকিছু। কিন্তু এ সবের অতিরিক্তও কিছু আছে।

সে হল সম্মান!

গঙ্গাচরণের জমি-জমা, টাকা-পয়সা সবই ছিল। টাকা-পয়সা, জমি-জমা থাকার জন্যে এক ধরনের সম্মানও ছিল। ছিল না কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সেই প্রতিষ্ঠা এল গঙ্গাচরণের জীবনে এতদিনে। সেই মস্তুতাতেই গঙ্গাচরণ মশগুল। এর স্বপ্নই তো তিনি দেখেছিলেন এতকাল ধরে।

কালীচরণের জীবনেও কি সেই মত্ততার স্পর্শ লেগেছিল?

এর জবাব দেওয়া খুব কঠিন।

কালীচরণ চিরদিনের নির্বাক মানুষ। অন্য পক্ষ দশটা কথা বললে সে একটা কথা বলে কিনা সন্দেহ। তার মনোভাব বোঝা কঠিন। তবু কালীচরণ নিত্য-নিয়মিত বাবার সঙ্গে আদায়ে বেরিয়েছে। বাবার কথামত প্রজার খাজনার হিসেব করেছে, সুদ পাওনা থাকলে তা যোগ করেছে, খাজনা আদায়ের সময় গোমস্তার পাওনা হিসেবে তহুরীর পয়সা নির্ভুলভাবে টাকার অঙ্কে যোগ করেছে। আবওয়াব খরচা যোগ করেছে। তারপর পরিচ্ছন্ন অক্ষরে চেক লিখেছে। তার বাবা সেই অনুযায়ী টাকা আদায় করেছে।

পরিবর্তে গঙ্গাচরণ মাসের শেষে তাকে কুড়িটি করে নগদ টাকা তার পারিশ্রমিক হিসেবে তার হাতে তুলে দিয়েছেন।

এই অবস্থায় সে ভাল ছিল কি মন্দ ছিল তা কেউ কোনদিন জানতে চায় নি। চাইলেও জানতে পারত কিনা সন্দেহ।

আবার একদিন এই সংবাদের পথ ধরেই বধূ হ বছরের কন্যাকে নিয়ে এসে হাজির হল।

এবার আর তার মুখে হাসি নেই, মনে কোন ভরসা নেই। সে আশাহীন হয়ে নিজের জীবনকে মেনে নিয়ে স্বামীর ঘর করতে এল।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কালী হাসলও না, অথবা তার চোখ সজলও হয়ে এল না। সে চুপ করেই রইল। কেবল একসময় সে উঠে গিয়ে নিজের পৈতেতে লাগানো চাবিটি দিয়ে নিজের ট্রাঙ্ক খুলে নিজের কাপড়-চোপড়ের তলা থেকে একটি ছোট পোঁটলা এনে স্ত্রীর কাছে নামিয়ে দিল।

কি!—অবাক হয়ে স্ত্রী তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

টাকা! আমার দু বছরের রোজগারের টাকা! চারশো নব্বুই টাকা আছে ওতে। এই দু বছরে জমেছে।

স্ত্রী পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে টাকার পোঁটলাটি তুলে নিয়ে হাসিমুখে একবার তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু কালীর সুখ-দুঃখ, তৃপ্তি-অতৃপ্তি কোন কিছুরই কোন চিহ্ন সে দেখতে পায় নি।

স্ত্রী একটু অবাক হয়েছিল। প্রশ্ন করেছিল, তুমি এ থেকে কিছুই খরচ কর নি?

না। তবে—

বলে একবার চকিতে একটু হেসেছিল কালী।

কি তবে?

দশ টাকা খরচ করেছি। খুকীর জন্যে দুটো ভাল জামা কিনে রেখেছি সাত টাকা দিয়ে। আর নিজের জন্যে বারকয়েক গয়ার তামাক কিনেছি টাকা দুই আড়াই। বাকি আট আনা কাছেই আছে। তামাকের জন্যে রেখেছি।

কই, জামা কই?

বাক্সের ভিতর থেকে জামা দুটি বের করে এনে দিয়েছিল কালী। জামা দুটি হাতে নিয়ে স্ত্রী খুশীই হয়েছিল।

তারপর কিছুকাল আনন্দেই কেটেছিল কালীর। বাবা খাজনা আদায় করত, সে সঙ্গে থাকত। গঙ্গাচরণ জমিদারের গোমস্তা হলেও জমিদারের প্রতিভূর সমস্ত শক্তিটুকু কাজে ব্যবহার করতেন। কালী মাসের শেষে বাবার কাছ থেকে কুড়িটি টাকা পেয়ে স্ত্রীর হাতে তার পুরোটি তুলে দিত। স্ত্রী তার তামাক খরচের জন্যে দিত একটি করে টাকা। কাজের অবসরে কালী মেয়েকে নিয়ে খেলা করত, গল্প করত, মেয়ের খেলাঘরে ছেলে হয়ে খেলার ভাগ নিত।

এমনি করে যদি দিনগুলো কাটত তো বড় সুখের জীবন হত কালীর।

কিন্তু নিজের চেতনার আড়ালে দুঃখের মেঘ ঘনিয়ে উঠছিল। প্রথমেই মারা গেলেন নরেশ্বরবাবু। তাতে অবশ্য খুব কিছু অসুবিধা হয় নি কালীর। বাবা দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

অকস্মাৎ বাবা তিন দিনের জ্বরে বিষয়-সম্পত্তি সব ছেড়ে ভিন্ন দেশে অজ্ঞাত কারও আহ্বানে প্রস্থান করলেন।

কালীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সে এখন কি করবে!

সেই মুহূর্তে তাকে বাঁচাবার জন্যে এসে দাঁড়াল তার স্ত্রী তার পাশে। তাকে বলল, কোন ভয় নেই, আমি আছি।

বাপের শ্রাদ্ধের পর সম্পত্তি ভাগের সময় যখন তার বিচক্ষণ দাদা তাকে তার মতামত জিজ্ঞাসা করল তখন ঘোমটার আড়াল থেকে তার স্ত্রী তার হয়ে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল।

সে কেবল বলবার মধ্যে বলেছিল, বসত বাড়ির সামনের বারান্দাসমেত ঘরখানা যেন তাকে দেওয়া হয়।

আর তার কোন প্রার্থনা ছিল না। তারই অগোচরে অথচ তারই চোখের সামনে সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল তার স্ত্রীর প্রতিনিধিত্বে। তার কোন উদ্বেগ নেই।

সে সারাটা সকাল খাজনা আদায় করে বেড়ায় আর দিনের বাকি সময়টা তামাক খায় আর মেয়েকে নিয়ে খেলা করে।

এই সময় অকস্মাৎ একদিন তার ডাক পড়ল সুরেশ্বরবাবুর দরবারে।

সেখানে উপস্থিত হতেই সুরেশ্বরবাবু তাকে নিজের খাস-কামরায় ডেকে পাঠাল। নিরাসক্ত, নির্বিকার ভাবে বলল, কালী, গত চার বছরের যে হিসেব দিয়েছ তুমি, সেটা একবার নায়েববাবুর কাছে বসে চেক-মুড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

কালীর মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল।

হিসেবের তো কালী কিছুই জানে না। হিসেব তৈরি করছিলেন তার বাবা, সে খালি বাবার হুকুমমত সবের তলায় নিজের নাম দস্তখত করেছে। তার বেশে তো কিছু জানে না।

হিসেব নিয়ে বসতে হল তাকে নায়েবের সঙ্গে। সব মিলিয়ে দেখা গেল, যে পরিমাণ টাকা চেকে দায় হয়েছে তার দস্তখতী হিসেবে তার চেয়ে সাড়ে শো টাকা কম দেখানো আছে। তার মানে সে ড় চারশো অতিরিক্ত আদায় করে জমিদার দপ্তরে দেয় নি। সোজা কথায় সে সাড়ে চারশো টাকা আত্মসাৎ করেছে।

সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর একবার হিসেবের কাগজগুলো আদ্যপান্ত দেখল। নাঃ, হিসেবে কোনে কোন গোলমাল নেই। তারপর সে চেক-গুলো নিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ চেকগুলো দেখতে দেখতে সে প্রায় চেকের মধ্যেই ডুবে গেল।

সুরেশ্বরবাবু হঠাৎ তিক্ত কণ্ঠস্বরে বলল, তা হলে কি তুমি আমাদের কেবল চেক-বই আর হিসেব দেখবে? আর দেখারই বা কি আছে!

কালী বলল, আমাকে কি করতে হবে বলুন।

সুরেশ্বর বলল, টাকা পরিশোধ করতে হবে আর কি!

হতাশভাবে কালী বলল, আমি সামান্য মানুষ, আমি এত টাকা কোথায় পাব বলুন।

অত্যন্ত শান্তস্বরে সুরেশ্বর বলল, তা হলে তিন বিঘে ঐ নোনামাঠের জমি আমাকে লিখে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল কালী। ঘাড় নেড়ে বলল, তাই দোব। দলিল তৈরি করে রাখুন। যেদিন বলবেন জমি রেজেস্ট্রি করে দিয়ে যাব। আর সেইদিন থেকে কাজে ইস্তফা দোব।

ভাল।

তা হলে অনুমতি করুন, আমি এখন যাই।

এস।

আমি চেক-মুড়িগুলো নিয়ে চললাম। এর পর দেখে বাবার ফেরত দোব।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে সুরেশ্বর বলল, তা কি করে হয়?

কেন হবে না? ওর সমস্ত জায় আপনার কাগজে তোলা আছে। জমি যেদিন রেজেস্ট্রি হবে সেদিন ইস্তফার চিঠির সঙ্গে এগুলো ফেরত দোব।

কালী চেক-বইয়ের বাণ্ডিল নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সুরেশ্বর তারস্বরে আপত্তি করলেন। নায়েব তার হাত থেকে চেকগুলো কেড়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু কালী এমন একটা চেহারা নিয়ে সেগুলো হাতে করে বেরিয়ে গেল যে কেউ কিছু করতে পারল না।

তারপর স্ত্রীর প্রচুর গালাগাল অগ্রাহ্য করে, কালী একদিন তার উৎকৃষ্ট তিন বিঘে জমি সুরেশ্বরবাবুকে রেজেস্ট্রি করে বিক্রি করল। রেজেস্ট্রি অফিস থেকে বেরিয়ে এসে একান্তে সুরেশ্বরবাবুকে সে ডাকল, সুরেশ্বর, শোন।

সেই পুরনো বাল্যকালের সম্বোধন! আজ আর সে সুরেশ্বরের আমলা-গোমস্তা নয়। সুরেশ্বরের ডাকটা খুব খারাপ লেগেছিল, কিন্তু তার চেয়েও সে বিস্মিত হয়েছিল।

তবু সুরেশ্বর কালীর সেদিনের ডাক অস্বীকার করতে পারে নি। কালীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল ভ্রূকুঞ্চিত করে। নায়েব, কালীর দাদা এরা দলিলে সাক্ষী ছিল। তারা দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

সুরেশ্বরকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কালী বলেছিল, তোমাকে একটা কথা বলবার জন্যে ডাকলাম।

ভ্রূকুঞ্চিত করে সুরেশ্বর সক্রোধে বলেছিল, বল, কি বলছ। আমার বেশী সময় নেই।

কালী হেসে বলেছিল, আমারও তোমার সঙ্গে বেশী কথা বলতে ইচ্ছে করছে না সুরেশ্বর। কথাটা কি জান? তোমার ব্যাপারটা সব আমি বুঝেছি। ওই যে জমিটা তোমাকে রেজেস্ট্রি করে দিলাম এখনি, ওটা যে তুমি দাদাকে কালই দ্বিগুণ দামে বিক্রি করবে তা আমি জানি। তা কর, তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। তোমাকে একটা কথা বলি। জমিটা তোমাকে রেজেস্ট্রি না করে দিলেও চলত। কারণ আমি দেখেছি বাবা আমার হিসেবে গোলমাল করে যান নি। যদি হিসেবে কোন গোলমালই তিনি করতেন সে ধরবার ক্ষমতা তোমাদের হত না। সে যাক। তবে আমি চেক-বইগুলো দেখেছি। তার মধ্যে কিছু জাল সই আছে। বাবার সই তুমি জাল

করিয়েছ। সেগুলো আমি রেখে দিয়েছি। ভবিষ্যতে আমাকে যদি জ্বালাতন করবার চেষ্টা কর তবে সেগুলোর আশ্রয় নেব। আমার শ্বশুরকে তো তুমি জান। তা তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ও তিন বিঘে জমি নিয়ে আমি কোন কথা তুলব না। তা হলে তো তোমাকে রেজেস্ট্রি করেই দিতাম না। ওটা তোমার সঙ্গে সম্পর্ক চোকানোর খেসারত হিসেবে তোমাকে দিয়েছি।

সুরেশ্বরের হাত-পা তখন কাঁপছে ঠক ঠক করে। রাগে না ভয়ে সে কথা কে বলবে! মুখখানা সাদা, চোখ দুটো,বড় বড় আর বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

কালী তার দিকে আর ফিরে তাকাল না। হনহন করে নিজের পথ ধরল।

বাড়ি ফিরে এসে স্নানাহার সেরে, স্ত্রীর কোন কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে মেয়েকে নিয়ে পরম আনন্দে খেলা করতে লাগল। সেই একদিন সে হেসেছিল হা হা করে।

পরদিন স্ত্রীর তীব্রতর গালাগালির মধ্যে সে শুনতে পেল সুরেশ্বরবাবু জমিটা দ্বিগুণ দামে তার দাদাকে বিক্রি করেছে।

তাতে সে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে নি। হাসিমুখে মেয়েকে নিয়ে খেলায় তার বিন্দুমাত্র বিরাম আসে নি।

কিন্তু একদিন তাকে থামতে হল।

তখন তার প্রথম ছেলেটি সদ্য হয়েছে।

তার স্ত্রীর তখন আর অন্য কোন কাজ নেই। স্ত্রীই সম্পত্তি দেখাশোনা করে ঘরে বসে। তার নিজের হাতে যে নগদ টাকা সঞ্চিত ছিল তাই দিয়েই নিজে সে তখন সুদী-কারবার আরম্ভ করেছে। সব দিক থেকে তার স্ত্রী তাকে অব্যাহতি দিয়েছিল। তার তখন একমাত্র অবলম্বন ছিল কন্যা।

সেই কন্যা কয়েকদিনের জ্বরে মারা গেল। যাবার সময় সে নিয়ে গেল দুটো জিনিস। কালীর সংসারের আকর্ষণ, আর তার মুখের হাসি।

কালীর বয়স আর তখন কত! বছর সাতাশ।

সেই থেকে কালীর সংসারের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

আর কোন কাজ করে নি কালী। নিজের বাড়ির রাস্তার ধারের বারান্দায় শুধু চুপ করে বসে থেকেছে। কখনও উবু হয়ে পাশে হুঁকো তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থেকেছে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে, কি কিছুই দেখে নি রাস্তার। আবার কখনও কখনও পায়ের উপর পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থেকেছে আর নিজের একখানা হাত দিয়ে একটা পায়ের তালুতে অবিরাম হাত বুলিয়েছে। যে কোন অবস্থাতেই দেখলে মনে হত যেন সে গভীর ভাবে কিছু ভাবছে।

প্রথম প্রথম রাস্তা দিয়ে পথচারী যেতে যেতে তাকে জিজ্ঞাসা করত—শুধুমাত্র লৌকিক ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করত, কি করছ গো কালী?

একান্ত লৌকিকতার খাতিরেই বোধ হয় সে একবার এক মুহূর্তের জন্য একটু মৃদু হাসির সঙ্গে উত্তর দিত, এই বসে আছি।

বাস্, তারপর আর কোন কথা নেই।

পথচারী তাকে পার হয়ে চলে গেল। তার আগেই তার মুখের হাসি ফুরিয়ে গেল। তার দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ হল যথাস্থানে।

শেষ পর্যন্ত সেটুকুও গেল।

তার মুখের হাসিও ফুরোল। মানুষজনের প্রশ্নও ফুরোল। কালীর স্থির, শূন্যদৃষ্টির সামনে দিয়ে পথচারী চলে গেল তার দিকে না তাকিয়েই। তবু যাবার সময় অনুভব করে গেল মনে মনে, কালী পাশের বারান্দাতেই বসে আছে।

এ যেন দুটো ভিন্ন জগৎ। একটা অন্যটাকে দেখে এই পর্যন্ত। কিন্তু কোন যোগাযোগ নেই।

এমনি করেই একটা একটা করে পঞ্চাশটার উপর বছর পার হয়ে গেল। অর্ধ শতাব্দী!

পৃথিবীতে, গ্রামে, কালীর সংসারে কত পরিবর্তন ঘটে গেল। সে অচল, অনড়। তার 'বসা-কালী' নামটা প্রথমটায় চালু হয়েছিল কৌতুক করে। তারপর লোকে সেটাকে সহজভাবে নিল। তারপর জীবনের একটা স্থায়ী ঘটনার মত সেটা সহজে জেনেও ভুলে রইল। গ্রামে কখনও-সখনও মাঝেসাঝে তাকে নিয়ে আলোচনা হত।

দল বলত, বসা-কালী সাধনা করছে জড়-ভরতের। আর একদল বলত, দূর দূর, সাধনা না ছাই! এই এক ধরনের গবেট-মার্কা মানুষ। দু দলের দৃষ্টি তাদের একেবারে দুই চরম প্রান্তের।

মাঝেমাঝে কৌতূহলী কোন পথচারী চলতে চলতে থেমে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করেছে হাসিমুখে, কি ছেন?

কালী যেন এটা প্রত্যাশা করে নি যে কেউ তার কথা বলবে, তাকে কারও কোনও প্রয়োজন আছে। যেন কোন গভীর মগ্নতা থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যদৃষ্টিতে র অঞ্জন মাখিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উত্তর দিয়েছে, মাকে বলছ?

প্রশ্নকর্তা হাসিমুখে নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেছে, করছেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।

কালী নির্বিকারমুখে, আবেগহীন কণ্ঠে উত্তর দিয়েছে, বসে আছি।

এইখানেই প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন শেষ হয়ে যাবার কথা। ধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওইখানেই শেষ হয়ে গেছে। ছু আরও কৌতূহলী কেউ কখনও কখনও তার চেয়েও সের হয়ে প্রশ্ন করেছে, আচ্ছা, এই যে দিনরাত চুপচাপ সময় বসে থাকেন এ ভাল লাগে?

এক মুহূর্তের জন্য বিস্ময় ফুটে ওঠে তার চোখে। সে একটা মুহূর্তই।

পরক্ষণেই বিস্ময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে সহজ নির্বিকার ঠে সে উত্তর দেয়, বেশ লাগে। বসেই তো আছি।

বাইরের পৃথিবী এমনি করেই তাকে চিরটা কাল ল অনড় দেখে গেল।

কিন্তু তার নিজের সংসারের ভিতরের পৃথিবী এত জে তাকে নিষ্কৃতি দেয় নি।

স্ত্রী যতদিন বেঁচেছিল ততদিন তাকে নিষ্কৃতি দেয় নি দিনও। সে বাইরের বারান্দায় বসে থেকেছে আর ঝেমাঝে তামাক খেয়েছে; কিন্তু অবিরাম গালাগাল নেছে স্ত্রীর কাছ থেকে। সে কত অপদার্থ, কত বিষয়-বুদ্ধিহীন, কত জড়ভরত, কত বোকা এই কথাই স্ত্রীর গালাগালের মধ্যে শুনেছে টিকা-টিপ্পনী সমেত।

তারপর যতদিন সে বেঁচেছিল ততদিন দিনে দুবার করে তার খাবার সময় গালাগাল না দিয়ে সে খেতে দেয় নি। বলেছে, বামুনের ষণ্ডের অন্ন।

স্ত্রী মারা যাবার পর জুটেছে ছোট পুত্রবধূ। সেই এখন সংসারের কর্ত্রী। সে ভাল করে খেতেও দেয় না, আবার শাশুড়ীর মতই সমানে গালাগাল দেয়।

স্ত্রী বলত মাঝেমাঝে, স্নান করে কালীর পটে একবার পেণাম করলে তো পার!

এ তার কোন খোঁজখবর রাখে না, সংসারে যে কালী অসুবিধা ঘটায় সেইটুকুই তার গালাগালির প্রতিপাদ্য।

কালী কোন জবাব দেয় না। চুপ করে তামাক খায়।

শেষের দিকে তার একটা বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। তার এক সহচর জুটেছিল। তার এক নাতি, ছোট ছেলের ছোট ছেলে। কাজেই কালীকে আর তামাকের জন্যে আগুন সংগ্রহ করতে উঠতে হয় না। রান্নাশালায় মায়ের কাছ থেকে সেই-ই আগুন চেয়ে নিয়ে আসে। মা আগুন তুলে দিতে দিতে বলে, কবে এমনি বুড়োর মুখে আগুন দিবি তাই ভাবি!

দাওয়ায় বসে সব শুনতে পায় কালী। শুনতে শুনতে একান্ত নিশ্চিন্তে তামাক সাজে।

পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি সময় দাওয়ায় বসে থেকে একদিন চোখ বুজল কালী।

কদিন জ্বর হয়ে দাওয়ার গায়েই নিজের ঘরে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিল সে। মৃত্যুশয্যার কাছে কেউ ছিল না এক সেই ছোট ছেলেটা ছাড়া। সেই-ই তাকে প্রয়োজন-মত জল দিয়েছে। মারা যাবার কিছুক্ষণ আগে সে বলেছিল কালীর ছবিটা পেড়ে দিতে। ছেলেটা নাগাল পায় নি। সে সেইদিকে তাকিয়েই চোখ বন্ধ করেছিল।

কাঁদল শুধু ছেলেটা। বিশ্বসংসারের সঙ্গে সেই-ই তো তার একমাত্র যোগসূত্র ছিল!

—

এমার্জেন্সি কেস

কুমারেশ ঘোষ

মাতৃ-মন্দিরের লোহার গেটটা দিনে বা রাত্রে কখনই বন্ধ করা হয় না। গেটের পাল্লা দুখানা তৈরি না করলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু গেটটা মানায় না, তাই তৈরি করা।

পাল্লা দুটো বন্ধ করা হবে কখন? দিন নেই, রাত নেই, রিক্শায়, ট্যাক্সিতে, প্রাইভেট মোটরে প্রসূতি তো প্রায়ই আসে মাতৃ-মন্দিরে। সঙ্গে সঙ্গে গেটের দরওয়ানটা উঠে সেলাম ঠোকে। কিন্তু সে সেলাম লক্ষ্য করবার অবস্থা থাকে না প্রায় প্রসূতিরই। তখন গর্ভযন্ত্রণায় সাদা হয়ে যায়, নীল হয়ে যায়, কালো হয়ে যায় তারা। পাশে মা, দিদি, দিদিমা বা ওই ধরনের কোন অভিজ্ঞ কারোর কাঁধে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে প্রাণপণে যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টা করে। অনেকের চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। দাঁত মুখ চেপে চোখ বন্ধ করে গেটের মধ্যে ঢোকে তারা।

ডাঃ দে-কে আগে দু-একবার দেখানোই নিয়ম। তাঁর প্রেসক্রিপশন মত কটা মাস কেটেছে প্রসূতির এবং সেজন্য ভিজিটও দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রসূতির ভর্তি হবার কোন বাধা নেই, ফিরে যাওয়ার কোন কথাই ওঠে না। নইলে সাধারণ হাসপাতাল আর এই মাতৃ-মন্দিরের তফাতটা রইল কোথায়? তা ছাড়া যত্ন-আত্তিটাও পাওয়া যায়। ডেলিভারিতে ডাঃ দের হাতও ভাল। অন্ততঃ যে সব প্রসূতি আগে এই মাতৃ-মন্দিরে প্রসব হতে এসেছিল, তাদের মুখেই শোনা। এবং পাঁচ কানে সে কথা ছড়িয়ে পড়াতেই মাতৃ-মন্দিরের এত নাম, মানে সুনাম।

আর প্রসূতি যখন কোলে নবজাত সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন আবার গেটের বাইরে, তখন গেটের দরওয়ানটা আবার ঠোকে সেলাম। এবার লম্বা সেলাম। সে সেলাম তখন দেখতে পায় নতুন মা। মনে মনে বলেও হয়তো: তোমরা আশীর্বাদ কর আমার নতুন পাওয়া চাঁদটুকুকে। করেও হয়তো তারা—মাতৃ-মন্দিরের নার্স, আয়া, ঠাকুর, চাকর, আর ওই দরওয়ানটা। হাত পেতে বকশিশ নিলে হাত তুলে আশীর্বাদ করতে হয় নবজাতককে. সেটুকু তাদের না জানার কথা নয়।

তবে মা হতে গিয়ে যে দু-একজন খালি কোল নিয়ে আবার আসে এই মাতৃ-মন্দিরের গেটের বাইরে, তাদের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকে এই অর্থপ্রত্যাশীরা। তবে দরওয়ানটা তাদেরও জানায় সেলাম। কিন্তু তখন সে সেলাম তাদের চোখেই পড়ে না। চোখ তাদের ঝাপসা তখন।

বিরাট তিনতলা বাড়িখানায় ছোট ছোট ঘর, দরজা-জানলায় ধবধবে সাদা পরদা ঝোলানো। ঘরে একটা করে কট, তাতে ডানলোপিলোর গদি, পাশে ছোট টেবিল, চেয়ার, বেসিন আর ড্রেসিং-টেবিল। সামনে বারান্দা, মোজেক করা, ঝকঝকে তকতকে। সিঁড়িতে শিশুদের ছবি ঝোলানো।

নীচের প্রথম ঘরটাই যা একটু বড়। সেখানে সোফা সেট সাজানো। বুক-কেসে সব ডাক্তারী বই। মাঝখানে টেবিলটায় ফ্লাওয়ার-ভাসে রজনীগন্ধা আর কতকগুলো ইংরেজী সচিত্র পত্রিকা। ভিজিটার্স রুম।

পাশের ঘরটা ডাঃ দের চেম্বার। একটা পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা। ও পাশটা একজামিনেশন রুম। লম্বা উঁচু টেবিল পাতা। আর দোতলায় সিঁড়ির পাশে ডেলিভারি রুম বা লেবার রুম। ডেলিভারি রুমে কী আছে জানা নেই। প্রসূতিরা জানে। হয়তো আছে নানা রকমের যন্ত্রপাতি, ডেলিভারির জন্যে উঁচু টেবিল, জোরাল আলো, ওষুধপত্র, গজ ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি।

আর তেতলায় যে দুখানা ঘর, সেখানে থাকেন ডাঃ দে আর তাঁর স্ত্রী সুধামাখা দেবী। ডাক্তারের কোয়ার্টার। কখন কোন্ প্রসূতির ডেলিভারি করাতে হবে ঠিক নে

াজেই মাতৃ-মন্দিরে থাকা ছাড়া উপায় কি! আর াজ কি কম! কোন্ দিক দিয়ে যে ডাঃ দের সময় ়টে যায় তার ঠিক নেই। কিন্তু সুধামাখার অঢেল ময়। তাঁর সময় কাটে কি করে! একটা যদি ছেলে মেয়ে থাকত, তা হলেও না হয় খানিকটা সময় কাটত। ন্তু আশা নেই, নেই বোধ হয় আর। বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি, দেহে মেদের প্রাচুর্য। কোন ক্তারই আশা দেন নি। হলে এতদিন···

যে বাড়িতে এ-ঘরে সে-ঘরে প্রতিদিন দুটি-একটি নব-ন্মের সরব স্বাক্ষর, সেই বাড়িরই একটি ঘর আজ কত-ন হয়ে আছে নিষ্ফলা, অজন্মা। সুধামাখা প্রায়ই ানমনা হয়ে যান, কী যেন ভাবেন, অভিমানে ভরে ঠেন বিধাতার নির্মম বিধানে।

এক এক সময় মাতৃ-মন্দিরের বাড়িটা যেন অসহ্য মনে য় সুধামাখার কাছে। তবু থাকতে হয়, সহ্য করতে হয় ামীর জন্যে, তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যে। সারা সকাল দুপুরটা কতলা আর দোতলায় ডিউটি করে ক্লান্ত দেহে যখন াঃ দে ওপরে উঠে আসেন তখন দেখলে মায়া হয়। ান করে খেতে বসেও শান্তি নেই। কতদিন হঠাৎ নার্স সে খবর দিয়েছে, তিন নম্বর ঘরের পেসেন্টের এখুনি াধ হয়···। তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয় ডাঃ দে-কে। াত্রেও তাই। হয়তো ডাঃ দে সবে চোখ বুজেছেন, থার কাছে ইনটারনাল ফোনটা বেজে ওঠে। নার্সের লা—ডাঃ দে, শীগগির আসুন, দশ নম্বর ঘরের পেসেন্টের চ্চার মাথা— হেড শোয়িং···

তাড়াতাড়ি পড়ি-মরি করে ছুটতে হয় নীচে ডাঃ ে-কে। আর সুধামাখা দু চোখ মেলে কড়িকাঠের কে চেয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন। কখনও কখনও ঘুম াসে না আর। মাথার কাছে বেড-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে র্ধেক-পড়া উপন্যাসটা খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করেন। াবার কখনও বা সবে তন্দ্রায় চোখ দুটো তাঁর ভারি হয়ে জে এসেছে, এমন সময় এক বীভৎস চিৎকারে আচমকা েগে সটান উঠে বসেন বিছানায়—দোতলায় কোন সূতির যন্ত্রণার আর্তনাদ।

আর্তনাদ বটে, তবে কোন অনাগতের স্বাগতম্ ানি।

না:, আর পারা যায় না! অসহ্য! আবার এলিয়ে পড়েন বিছানায় সুধামাখা দেবী।

ডাঃ দে তখন হয়তো লেবার রুমে কোন নবজাত শিশুকে ভূমিষ্ঠ করাতে ব্যস্ত।

বিকেলটা তবু এক রকম কাটে সুধামাখার। ডাঃ দের তো বেরনো হয় না প্রায় দিনই। কাজেই তিনি ড্রাইভারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, কোন দিন বাপের বাড়ি, কোন দিন সিনেমায়, কোন দিন কোন বান্ধবীর বাড়ি আর কোন দিন বা মার্কেটে। সময় কাটাতে হবে তো কোন রকমে!

আর ওই বিকেলটায় মাতৃ-মন্দিরে যেন থাকাও যায় না। সারা বাড়িটা ভিজিটারদের আগমনে সরগরম হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে বসে যায় আনন্দের মেলা। হাসিঠাট্টা আর গল্পের ছড়াছড়ি। প্রায় ঘরেই নতুন মায়েদের মুখে সাফল্যের হাসি, নবজাতকদের জয়যাত্রার প্রথম চাঞ্চল্য। অভ্যাগতদের কৌতূহল আর কৌতুক। কান পাতা দায়। ডাঃ দে তাঁর চেম্বারে কোন নতুন মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওলটাতে থাকেন ইজি-চেয়ারটায় আধশোয়া হয়ে।

সন্ধ্যায় মুখে সুধামাখা যখন ফেরেন, তখন সঙ্গে থাকে ছোট-বড় প্যাকেট বাক্স অনেকগুলো। জিনিস কেনা যেন একটা নেশা তাঁর। একটা কিছু চাই তো! রাত্রে ডাঃ দে দেখেন জিনিসগুলো, হাসেন, প্রশংসা করেন তাঁর পছন্দের। আর তিনিও ভাবেন একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

ভিজিটাররা চলে যাওয়ার পর বাড়িটা প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে যায়। জিনিসপত্রগুলো চাকরের হাতে তেতলায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে কতকগুলো হাতে নিয়ে সুধামাখা দোতলায় প্রতি ঘরে ঘরে একবার করে উঁকি মারেন। খবর নেন পেসেন্টদের: কেমন আছেন? বাচ্চা ভাল তো? কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? লজ্জা করবেন না, কিছু দরকার হলে বলবেন, ইত্যাদি।

ভদ্রতা। কর্তব্য। স্বামীর ব্যবসায়ে একটু মৌখিক সাহায্য।

বাস্, তারপর সোজা তেতলায় গিয়ে কাপড় জামা

বদলে শোবার ঘরের পাশে ছোট্ট ফালি ঘরটার তালা চাবি খুলে ঢোকেন সুধামাখা। তখন কারোর ডাকবার হুকুম নেই।

ঠাকুর, চাকর, ঝি সবাই জানে মা এখন পূজোর ঘরে। তখন তাঁকে ডেকে বিরক্ত করার সাহস কারোর নেই।

রান্নাঘরে বসে ওরাও তখন জটলা পাকায়—সত্যিই তো একটা কিছু নিয়ে কাটাতে হবে তো।

ঝিটা নীচু গলায় বলে, সত্যি বাপু, যার বাড়িতে এসে এত লোক ছেলে কোলে নিয়ে চলে যায়, সেই বাড়ির গিন্নীরই কোল খালি। ভগমান যেন চোকের মাতা খেয়ে বসে আচে।

মেদিনীপুরী ঠাকুরটা বলে, পূব্বো জন্মের পাপে হয়তো!

চাকরটা বলে, আমাদের দেশে এক ফকিরের দরগা আছে। সেখানে ঢিল বাঁধলে— কিন্তু কে বলবে সে কথা?

কেউ-ই কিছু বলতে পারে না সাহস করে।

বলতে পারেন না ডাঃ দে-ও। কয়েকদিন তিনি তেতলায় এসে দেখেন সুধামাখা ঠাকুরঘরে। দরজা বন্ধ দেখে দরকারী কথাটা তখনকার মত না বলেই আবার নীচেয় নামেন। • ভাবেন হয়তো, যাক, দরকার নেই বিরক্ত করে। পূজো-আচ্চা নিয়ে থাকাই ভাল।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল।

কোন প্রসূতির আর্তনাদ!

না তো? আওয়াজটা এল যেন ঠাকুরঘরটা থেকেই।

ঝি ছাদ ঝাঁট দিচ্ছিল। আবার আর্তনাদ। ওই ঠাকুরঘর থেকেই তো!

তাড়াতাড়ি ঝাঁটা ফেলি দিয়ে ছুটে গেল ঝি ঠাকুরঘরের কাছে। বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল—মা মা, কী হল?

কিন্তু আর কোন শব্দ নেই।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেল [illegible]ঃ দের কাছে: ডাক্তার বাবু, মার কি হয়েছে যেন। শীগগির আসুন।

ডাঃ দে ছুটলেন উপরে। সঙ্গে এল দুজন নার্স। ঠাকুর চাকর আয়া দু-তিনজন খবর পেয়ে ছুটে গেল সবাই।

ডাঃ দে ততক্ষণে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন জোরে জোরে। শেষে লাথির পর লাথি। শেষে মড়মড় করে ভেঙে গেল পাতলা কাঠের এক পাল্লা দরজাটা।

সর্বনাশ! সুধামাখা অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় পড়ে আছেন।

আর ঘরে কোথায় ঠাকুরের মূর্তি বা ছবি? একটা বড় আলুর পুতুল সুধামাখার কোলের কাছে পড়ে। চারিদিকে ছড়ানো চুষি, ঝুমঝুমি, বেলুন, রঙীন মোজা, ছোট্ট এক জোড়া জুতো, ফিডিং বটল, কাজললতা। কত কি!

সবাই থমকে গেল দেখে।

ডাঃ দে তাড়াতাড়ি সুধামাখার মাথাটা কোলের উপর রেখে একজন নার্সকে বললেন, জল আন, পাখা আন, ওষুধের ব্যাগটা আন কেউ।

সবাই ছুটল এদিক-ওদিক, কেউ বা নীচেয়।

ডাঃ দের হঠাৎ নজর পড়ল সুধামাখার তলপেটটায়। সভয়ে হাত বাড়িয়ে দেখেন, একটা তুলোর বাণ্ডিল! অদ্ভুত এক প্রসূতি!

ডাঃ দে-র চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল।

ততক্ষণে ওষুধের ব্যাগ জল পাখা সব এসে গেছে।

ডাঃ দে তাড়াতাড়ি ওষুধের বাক্স খুললেন।

এমার্জেন্সি কেস! না, ডেলিভারি কেস নয়!

—

রোবট

রাণু ভৌমিক

ওরা নামতে বাধ্য হল। যদিও গ্রহটি সম্পূর্ণ অজানা এবং ওদের পরিদর্শন-সূচীতে পড়ে না, তবুও য়ের নীচে শক্ত নির্ভরযোগ্য স্থান তো বটে।

অনেকক্ষণ থেকেই ওদের মহাকাশযানে যান্ত্রিক ালযোগ দেখা যাচ্ছিল। এজন্যই ওরা নিজেদের রিক্রমা-পথ থেকে অচেনা পথে সরে এসেছে—আর খন তো মহাকাশযান প্রায় অচল।

ওই গ্রহের আবহাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোন খোঁজ-বর না নিয়েই ওরা দুজনে নেমে পড়ে। নেমেই বিস্মিত । পৃথিবীর মত আবহাওয়া।

ইস্, যদি যন্ত্রযানটা ঠিক করতে পারতাম তা হলে ন একটি গ্রহ আবিষ্কারের কৃতিত্ব হত।—ওদের একজন ল।

এখানে, হয়তো মানুষের মত বুদ্ধিজীবী কোন জীব াছে।—অপরজন উত্তর দেয়।

ওরা এগিয়ে যায়। পায়ের নীচে ভুসভুসে বালি—াকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব—কিন্তু স্থানটি জনপ্রাণীশূন্য। হঠাৎ কজন চেঁচিয়ে ওঠে, একি!

ছোট একটি পাহাড়ের কোলে বালিতে সদ্য-পতিত ায়ের ছাপ। সে ছাপ মানুষের অথচ মানুষের নয়।

সেই ছাপ ধরে ওরা এগিয়ে চলে। একটা গুহায় গিয়ে ই ছাপ শেষ হয়েছে।

গুহা আবছা অন্ধকার। টর্চ জ্বালিয়ে হাতের ায়েয়াস্ত্র তুলে নিয়ে ওরা ভেতরে ঢোকে। কোন নপ্রাণী নেই। এক কোণে একটি রুমাল পড়ে আছে। াশে একটা বই। বইটা তুলতে গিয়েই পড়ে গিয়ে ড়ো হয়ে গেল। শুধু এইটুকু বোঝা গেল সেটা তিনশো ছর আগের কোন আকাশযানের লগ-বই।

তিনশো বছর আগে কোন আকাশযান বিকল য়ে এখানে এসে পড়েছিল। এই লোকটি—মনে হচ্ছে জাহাজের ক্যাপ্টেন—কোনরকমে রক্ষা পেয়েছিল। তারপরে হয়তো অনাহারে কিংবা কাল পূর্ণ হলে এ মারা গেছে।

তাই কঙ্কালের হাড়গুলো সাদা। কিন্তু গুহার বাইরে ওই সদ্য-পতিত পায়ের চিহ্নগুলো কার?

পরীক্ষা উত্তর মেলে। একটা রোবট (যন্ত্রমানব)। প্রকৃতপক্ষে ওই মহাকাশযানে এক প্যাকিং বাক্স ভর্তি রোবট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য এখানে নামতে বাধ্য হয়। একটি রোবট চালু ছিল। এই তিনশো বছর সে ভাঙা রোবটগুলোর অংশ নিজের অকেজো স্থানে লাগিয়েছে।

অসীম মহাশূন্যের একটি ছোট্ট গ্রহে একটি রোবট নিজের শরীরের যন্ত্র বদলে বদলে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে—ভাবতে গিয়ে খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছিল। তিনশো বছর ধরে সে ক্রমাগত এই করে যাচ্ছে।

গল্পটা পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠলাম—তাকিয়েই মনে হল কিছু একটা ঘটেছে। পৃথিবী যেমন ছিল সে রকম নেই। লোকগুলো যেন একটু বদলে গেছে। তবে কি রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মত আমি অনেকদিন ঘুমিয়েছি!

দুটি লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে—অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বুঝলাম ওদের মধ্যে একটি মেয়ে। আমার পাশে কয়েকটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজন বলে ওঠে, ওরা বিয়ে করে ফিরছে

অবাক হয়ে গেলাম। ফুলের মালা, মুকুট নাই বা হল—তা বলে কি মুখভাবেও সামান্য প্রকাশ পাবে না।

হঠাৎ মেয়েটি একটা চিৎকার করে পড়ে গেল।

স্ট্রোক।—আমার পাশের লোকটিই বলে, আমাদের এই আণবিক যুগে এই স্ট্রোকটা খুব বেশী হচ্ছে। এর কোন প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি।

আমি অবাক হলাম মেয়েটির স্বামীর ব্যবহারে। সে একবার ফিরেও তাকাল না। বরং দ্রুততর পায়ে চলে গেল।

কি ব্যাপার? স্বামীটি অমন ছুটে পালিয়ে গেল কেন?—প্রশ্ন করি।

ওকে এখনই চাঁদে যেতে হবে। ওদের দুজনের একসঙ্গে যাবার কথা ছিল।

আহা, ওর স্ত্রী মারা গেল—তাতেও ও যাবে!

সেজন্যই তো ওকে ছুটে যেতে হচ্ছে। যেভাবেই হোক ওর স্ত্রীর আসনটির জন্য উপযুক্ত যাত্রিণী যোগাড় করতে। নইলে মহাবিশ্ব-কমিটির কাছে ওকে শাস্তি পেতে হবে।

কি নিদারুণ ব্যাপার! ওর মনে না জানি কত কষ্ট হচ্ছে!

মন? মন কাকে বলে?—লোকটি অবাক হয়ে তাকায়।

সে কি!

আমি তো কখনও 'মন' শব্দটি শুনি নি। আচ্ছা, ওই প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করছি। উনি পুরনো যুগের ভাষা নিয়ে রিসার্চ করেন। প্রফেসর, মন কি?

প্রফেসর মাথা নেড়ে বলেন, হ্যাঁ, মন বলে একটা পদার্থ ছিল বটে আগেকার যুগে কিন্তু তা ভীষণ বিরক্তিকর ও অসুবিধেজনক বলে আমরা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাদ দিয়ে দিয়েছি।

বিরক্তিকর?

নয়?—প্রফেসর বিরল লোম ভ্রূ দুটো ওপরে তোলেন। ধরুন, কারও একটা হাত নষ্ট হয়ে গেল, সমস্ত শরীরটা কিন্তু রয়েছে তবু [illegible]র মনে কষ্ট হবে। এই যে ঘটনাটি ঘটল, আগেকার যুগ হলে কি স্বামীর মনে কষ্ট হত না?

কষ্ট কি? লোকটি যেতেই পারত না।

প্রফেসর শিউরে ওঠেন: বাপ রে! ওরকম ঘটনা ভাবতেই পারি না। বর্তমান জগৎ গণিতের সূক্ষ্ম হিসেবে চলছে—একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ।

আর এই মেয়েটার কি হবে?—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি।

ওসব ব্যবস্থা করবার লোক আছে।—পাশের লোকটি নাক সিঁটকে জবাব দেয়।

ও এমন হেলাভরে কথা বলে যে মনে হয় যেন রাস্তায় পড়ে থাকা কোন বেওয়ারিস কুকুরের লাশের কথা বলছে।

মানুষ কি যন্ত্র-মানব হয়ে গেছে?

মানুষ তো যন্ত্রই।—প্রফেসর এবং লোকটি একই সঙ্গে বলে ওঠে।

আমি চুপ করে যাই। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য—নিঃসীম মহাশূন্যে একটি রোবট নিজের অকেজো অংশগুলি বদলে বদলে নিজেকে চালু করে রেখেছে। তার আহার নেই, তৃষ্ণা নেই, প্রেম নেই, প্রতিহিংসা নেই—কিছুরই তার প্রয়োজন নেই, সে শুধু টিকে থাকতে চায়।

মানুষও কি আজ এই টিকে থাকার সাধনাতে মেতেছে?

—

স্বর্ণকমল

জগদীশ ভট্টাচার্য

কদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়া দেখেছিলাম—
প্রভাত-সূর্যের আলোয় স্বর্ণকমলের মত বিকশিত ॥

তারপর নেমে এসেছি
সমতল মাটির শ্যামল শুশ্রূষায়।
নদীর কলধ্বনি আর প্রান্তরের পদাবলী
আমার মন ভুলিয়েছে ॥

ঘর বেঁধেছি শহরের অনভিজাত পাড়ায়।
সিমেন্ট-কংক্রিটের স্তূপে আকাশ পড়েছে ঢাকা।
পিচ-ঢালা রাজপথে-পথে
নাগর-বিহঙ্গের অভিশপ্ত ক্রেংকার
আমার রক্তে জাগিয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণা ॥

সংসারচক্রে বদ্ধজীব আমি।
কলুর চোখঢাকা বলদের মত
কাঁধে বয়ে চলেছি বাসনার পাহাড়।
জীবনের অন্ধগলিতে সূর্যের মুখ দেখা যায় না ॥

তবু কোনো-কোনো দিন
বিনিদ্র রাতের তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনায়
ভেসে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া:
প্রভাত-সূর্যের আলোয় স্বর্ণকমলের মত বিকশিত ॥

—

অন্তরাল

উমা দেবী

মধ্যে এক পর্দা থাকে স্বচ্ছ ও কঠিন,
স্বচ্ছ—মনে হয় দুজনার অন্তরের গূঢ়তম সত্তার আশ্রয়
হতে পারে। অথচ কঠিন তাও ব্যক্তিত্বের অটল সীমায়।
কাছে আসি, কথা বলি, মন মেলে ধরি
দুই সহযাত্রী একই জীবনপথের—
ফাঁক থাকে। হৃদয়ের বর্ষা অভিসার
সেখানে প্রহত হয়,
নাকিণ্যের স্পর্শরস করি না সঞ্চয়।

সেই সঞ্চয়ের ফাঁকি হৃদয়কে কাঁদায় নীরবে,
করি সে ফাঁকি নিশীথের নির্জন ছায়ায়—
নিরালার নীল মধু ঝরে যায় তারায় তারায়।
নিশীথ শৈত্যের গর্ভে বাসনার রূপ
ধরে না ফলের রূপ নিটোল রসাল।

তবু—তবু প্রভাতের আলোক-সভায়
মনে হয় এও সত্য—এরও ছিল প্রয়োজন যেন।
এই অন্তরালপুষ্ট ফল্গুধারা তুমিই শীতল
সকল পিপাসা-নাশা স্বচ্ছ পেয় জল
রূপ নেবে কবিতার ধাতব ভৃঙ্গারে
নিষ্কলুষ প্রেমে আর স্বচ্ছ অশ্রুধারে।

তোমার আলোক-স্পর্শ ভেদ করে অন্তরাল—স্বচ্ছ ও কঠিন
এ অস্তিত্বে রূপ নেয় আশ্চর্য নবীন।

—

পঞ্চাশোর্ধ্বের চিত্র-নায়িকাকে

শ্রীকৃষ্ণধন দে

খুলো নাকো সখি বাঁধানো ও-দাঁত,
দিও না কলপ তুলিয়া,
গালের ভিতরে রবারের বল
ফেলো নাকো সখি, খুলিয়া !
পেণ্ট্-করা দু'টি গালের লালিমা
এখনো যে আঁকে যৌবন-সীমা,
শ্লথ বক্ষের লুপ্ত মহিমা
উঠুক বডিসে ফুলিয়া !

বেল্টে বাঁধিও স্থূল কটিখানি,
তবু কিছু হবে ক্ষীণা যে ;
ঠোঁটের উপরে লিপস্টিক্ দিয়ে
করে দিও লাল-মীনা যে !
আহ্লাদী সুরে কহিও বচন,
বিনিয়ে বিনিয়ে রোমান্স-রচন,
কাজলে আঁকিও হরিণী-লোচন,
হাসিতে বাজায়ো বীণা যে !

করতলে নিও গোলাপ-গুচ্ছ
শ্লথ অঙ্গুলি ঢাকিতে,
জরির নাগ্‌রা পরো সযতনে
চরণের শোভা রাখিতে,
হাল্‌ফ্যাশানের মিহি হাওয়া-শাড়ি
পরে' হোয়ো তুমি বাইজী পিয়ারী,
ব্লাউজের ভুজে ফুল সারি সারি
দিও হরতন আঁকিতে !

মধুর কণ্ঠে বল তুমি মোরে—
"এ' তো ভাগ্যের হাত,
আমরা ছুটিতে পেরেছি লুটিতে
নন্দন-পারিজাত !
এক ঘণ্টার ঘর ভাড়া করি'
হোটেলে কাটাব মধু-বিভাবরী
ক্ষণ-যৌবন আনিব আহরি'
যাপিতে মিলন-রাত !"

বয়স তোমার যতই বাড়ুক,
তাতে দমিবে না প্রেম,
বাইশ না পাও, অঙ্গে সাজায়ো
চোদ্দ ক্যারেট্ হেম !
পড় আধুনিক কাবিতা-গল্প,
বয়স কমিয়া দাঁড়াবে অল্প,
পরকীয়া-প্রেমে এ কায়-কল্প
মিলনে দেবে . . শেম্' !

প্রদীপ নিভায়ে হও সখি, আজ
উর্বশী, কি হেলেন,
ক্লিওপেট্রা, কি রূপবিলাসিনী
কীলার, চিত্রা সেন !
বয়স লুকাবে নিবিড় আঁধারে,—
তরুণী প্রৌঢ়া তফাত কোথা রে !
শুধিব আমরা দেহের আধারে
পৃথিবীর লেন-দেন।

—

বন্দে মাতরম্

[অতি-আধুনিক সংস্করণ]

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অজলাম্ অফলাং হীনাঙ্গবিকলাম্
শান্তিরহিতাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্॥
স্বস্তি তিরোহিতগৃহসুখগ্রাসিনীম্
রুক্ষফলহীন দ্রুমতলবাসিনীম্
বিষাদিনীং বিভ্রম-গামিনীম্
কর্ষিতাং ধর্ষিতাং মাতরম্।

ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ খল খল হাস্য ভয়ালে,
বুভুক্ষাশঙ্কিত অরিভয়-কম্পিত ভালে,
উতলা হলে কী এতকালে?

হীনবল-ভরণীং
কৃশ-তনু-করণীং
সচ্ছিদ্র তরণীং মাতরম্।

নাহি ইচ্ছা নাহি কর্ম
নাহি ধৃতি নাহি ধর্ম—
ত্বং হি লুপ্তা শরীরে—
বাহুতে নাহি মা শক্তি
হৃদয়ে নাহি মা ভক্তি,
ঢক্কানিনাদ করি প্রচার মন্দিরে।

ত্বং হি ধন্যা এরণ্ডদলধারিণী
অতলা অতলতল বিহারিণী,
চৌর্যবিদ্যাধারিণী, নমামি ত্বাম্—
নমামি অবলাং অচলাং বিফলাং
বঞ্চিতাং কুঞ্চিতাং মাতরম্।

উষরাং ধূসরাং
দুর্নীতাং দুঃস্থিতাং
মহতীং জরতীং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।

—

মা, তুমিও—

প্রভাত বসু

শিয়রে ড্রাগন, চরণে করের বেড়ি—
জরুরী হাওয়ায় উঠেছে নাভিশ্বাস :
তবু আঙিনায় বাজিল পূজার ভেরী,
বেড়িল সবায় খরচের নাগপাশ।

বাড়ন্ত চাল, মৎস্য সে মায়ামৃগ,
গোদের উপর 'সি-ডি-এস' বিষফোড়া—
এ সব খবর রাখ না জননি, কি গো?
পড় নি কাগজে—বাঙালী কপাল-পোড়া?

কোন্ লজ্জায় এলে মাগো, পূজো নিতে—
তাও দু দুবার আশ্বিনে-কার্তিকে!
সন্দেহ হয়—ব্যবসায়ী ফন্দিতে
যোগ আছে, তাই দৃষ্টি ট্যাঁকের দিকে।

ভাসায় যাহারা নাকের ও চোখের জলে—
তাই ভাবি মাগো, তুমিও তাদের দলে!

—

জীবন যন্ত্রণা নয়

রণজিৎকুমার সেন

জীবন যন্ত্রণা নয়, জীবন মধুর : এই বাণী পুনর্বার উচ্চারিত হোক,
তবে তো হৃদয় পাবে সদয়ের স্পর্শ কিছু, পাবে প্রাণ এই বিশ্বলোক !
জীবনের দুঃখ সেও আনন্দেই আচ্ছাদিত, বিজড়িত হাসি আর গানে,
নইলে সঙ্গীত বুঝি কোনদিন গান হয়ে ধ্বনিত না মানুষের প্রাণে !

তোমার শব্দকোষে যন্ত্রণা কথাটা তাই দীর্ঘকাল উহ্যই থাক্,
জীবন সে কোনদিন কারাগারে বন্দী নয়, যত কেন থাক্ দুর্বিপাক ।
স্বর্ণখনি পেতে যদি অতল মাটির নীচে লক্ষ হাত প্রসারিত হয়,
প্রাণের আনন্দ-খনি সেই মত খুঁড়ে খুঁড়ে হয় তবে মধু সঞ্চয় ।

প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ, এবারে তোমার কাজ তিলে তিলে সেই মাটি খোঁড়া,
অকস্মাৎ তবে বুঝি আনন্দ-রত্নখনি পেয়ে যাবে সারা দেশজোড়া ॥

—

যে নামে যখনি ডাকি

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

যে নামে যখনি ডাকি, সেই নাম তখনি তোমার
নবজন্ম এনে দেয়, আমার নয়নে তুমি তাই
নূতন নূতন রূপে দেখা দাও শত শত বার,
এক তুমি, কিন্তু আমি শতরূপে তোমাকেই পাই ।

যখন মেঘের ছায়া নেমে আসে ম্লান দুটি চোখে,
গৌরবর্ণ তনু মনে হয় তমালের শাখা
শ্রাবণবর্ষণক্লান্ত, চেয়ে আছে দূর মেঘলোকে ।
বনশ্রী নামেই তাই তখন তোমাকে যায় ডাকা ।

অথবা বনশ্রী নামে যখনি তোমাকে আমি ডাকি,
মনে হয় মেঘপুঞ্জ নেমে আসে তোমার শরীরে ;
সেদিকে দু চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি,
অনেক কল্পনামেঘ জমে ওঠে তোমাকেই ঘিরে ।

তুমি, নাম অবিচ্ছিন্ন ; তোমাকে দেখেই দিই নাম,
অথবা তোমার নামে সত্যিকার তোমাকে পেলাম

—

আলোক-বন্দনা

শ্রীশান্তি পাল

দূরে, অতি দূরে
কৃষ্ণমেঘ প্রকম্পিত অরুণের অশ্বপদ খুরে
উদয় অচল শিরে
ধীরে ধীরে
সহসা জাগিয়া ওঠ রজনী প্রভাতে—
জ্যোতির সংঘাতে :
সঞ্জীবনী সুধাধারা ঢালো।
আলো—
তোমারে যে বাসিয়াছি ভালো॥
মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড উত্তাপে
নারিকেল কুঞ্জ যবে থর-থর কাঁপে,
তিলে তিলে পলে পলে যাও দূরে সরি,
মৃত্যুরে বিস্মরি।
পশ্চিম গগন তলে
নির্নিমেষ চাহি কুতূহলে—
তব উচ্ছ্বাসটুকু ঢালো।
আলো—
তোমারে যে বাসিয়াছি ভালো॥
বিদায়ের শেষ ক্ষণে
প্রশান্ত লগনে
অস্তাচল পারে
সহসা ঢুইয়া পড় আপনার ভারে—
পশ্চাতে আঁকিয়া রক্তলিখা
গোধূলির সমুজ্জ্বল শিখা।
অপূর্ব সে সৌন্দর্যের ছবি
আমি কবি
মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকি আকাশের পানে—
শঙ্খ-ঘণ্টা মুখরিত সন্ধ্যার বন্দনা-গানে
নক্ষত্রের দীপমালা জ্বালো।
আলো—
তোমারে যে বাসিয়াছি ভালো॥

—

ঘুড়ি ওড়ে

শিবদাস চক্রবর্তী

ঘুড়ি ওড়ে।
অনুকূল হাওয়া তাকে ওড়ায় ওঠায়
মাটির আঙিনা থেকে শূন্যে প্রায় আকাশ-সীমায়।
সব বাধা, সব পিছুটান
দুরন্ত হাওয়ার বেগে মুহূর্তে নিঃশেষে অবসান।
ঘুড়ি ওড়ে।
মাটিতে আপন জন জোর হাতে সুতো থাকে ধরে।
ওঠে আর নীচে ফিরে চায়—
মাটির মানুষ আর কেউ তার নাগাল না পায়।
কিছু অহমিকা, কিছু দুরাশায় মেশা
ওঠার সে নেশা,
অলীক ভাবনা জালে ঘিরে ফেলে সারা মন তার—
আকস্মিক এ উত্থান—এ যেন আজন্ম অধিকার।
যারা রয়ে গেল নীচে
তাদের ওঠার দাবি তার কাছে মনে হয়ে মিছে।
মনে হয়—পেয়ে গেছে, তারা যা পাবার ;
কে আছে এ দুনিয়ায় সমকক্ষ তার ?
ঘুড়ি ওড়ে, ঘুড়ির এ ভুল
ভাঙতে হয় না দেরি হাওয়া যবে বয় প্রতিকূল।
সময়ের খেয়ালী খেলায়
যে-হাওয়া উঠিয়েছিল, সে-ই তাকে আবার নামায়।
ঘুড়ি নামে—
নামে আর মাঝে মাঝে থামে।
তখনো ওঠার নেশা জুড়ে থাকে মন,
ধাপে ধাপে নেমে-আসা আসন্ন যখন।
ঘুড়ি-জীবনের সেই চাপা বেদনার ইতিহাস
মাটি-ই স্মরণে রাখে, রাখে না আকাশ।

—

আশার আকাশ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

প্রতিদিন ভেবে রাখা যায়
প্রভাতের আলো মেখে আগামী আশায়,—
আসন্ন-আনন্দধারা প্রবাহিত অবন্ধ্য আশ্বাসে
ভাবনার প্রাত্যহিক অনুভূতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।

কাজ আর কাজ নিয়ে চলা
জীবনের গতিচ্ছন্দ নিত্যলীলা শোভন চঞ্চলা,
জাগ্রত আত্মার আলো দূর হতে দূরে শুধু দূরে
মরীচিকা সন্ধানীর কথা শুনি পরিচিত সুরে।

আলোর আকাঙ্ক্ষা ভালো জানি—
নিয়ে আসে কালো রাত শেষে শুভ-বাণী ;
মেঘলা সময়ে যেন হঠাৎ আলোক ঝলকায়
মনের দিগন্ত ছোটে কেন যেন কোন অলকায়।

একটু আশার তীরে তীরে
ক্ষণিক মায়াবী মনে সব ছেড়ে চলে ধীরে ধীরে,
আজ নয় কাল হবে—এইটুকু বিশ্বাসে বিলাস ;
প্রাণের প্রশান্ত চিন্তা জানে মাত্র আশার আকাশ।

নিদানের বিধান

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ধন্বন্তরি বদ্যি দিলেন মন্বন্তরের বড়ি
নাকের বদলে নরুন পেলুম আহা মরি মরি
জলতেষ্টায় বেল পথ্য, বিষম পেটের কামড়
জ্বরকম্পে থরহরি, দোলান অঙ্গে চামর
মাসীপিসী বনবিলাসী বনে বসে টিয়া
মাসী গেছেন বৃন্দাবন কুনকে হাতে নিয়া
হাঁড়ি ঠনঠন নাড়ী টনটন শূন্য দুধের বাটি
ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমার দেশের মাটি
চেটেচুটে শেঠবাবাজী পাত্র করেন খালি
গিন্নীরা সব ভেবে মরেন—শুড়ে কেন বালি
হাত-পা ছোঁড়ে খোকাখুকু আঙুলে নাই রস
লেবু আনতে পান্তা ফুরোয়—কেমনে হবে বশ
পিঠ ঢাকে তো মুখ ঢাকে না বউরা লাজে মরে
উলটু পুরাণ খুলে বদ্যি নাড়ী টিপে ধরে
ইড়া ও পিঙ্গলা থেকে সুষুম্নাতে হাত
তিন তিরিক্ষি যমের সাক্ষী—রোগী হলেন কাৎ
নিদানকালের বিধান শেষে বদ্যি মশাই ছাড়েন
অম্লরোগের ধন্বি দাওয়াই গমবটিকা ঝাড়েন।

হৃদয়ের জ্বর ছেড়ে গেলে

দেবব্রত ভৌমিক

হায়, হৃদয়ের জ্বর
ছেড়ে যায়, তারপর
শুধু পড়ে থাকে দেহ
ক্লান্ত মন শূন্য ঘর।

হাওয়া দেয় জানালায়
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়
চারিপাশে শূন্যে শুধু
অন্ধকার বাঙ্ময়।

ছেঁড়া চিঠি, ক্যালেণ্ডার
পুরনো কাগজ আর
বই আঠা আলপিন
জমে টেবিলের 'পর।

অন্ধকারে বারে বারে
পাতা নড়ে ক্যালেণ্ডারে,
ছেঁড়া খাম পোস্টকার্ড
জমে টেবিলের 'পরে।

হায়, হৃদয়ের জ্বর
ছেড়ে গেলে তারপর
শুধু পড়ে থাকে দেহ
ক্লান্ত মন শূন্য ঘর।

বাঙালীর সংস্কৃতি

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্ধু বললেন, আর সব দিকে মার খেলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী আজও অদ্বিতীয়।

আমি বললাম, কথাটা শুনতে ভাল ; কিন্তু তোমার স্বীকার করে নেবার আগে দুটো বিষয়ের একটু করণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ বাঙালী বলতে কাদের য় এবং দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতির অর্থ কি ?

মুখে একটু অনুকম্পার হাসি ফুটিয়ে বন্ধু বললেন, লী কথাটিরও ব্যাখ্যা করতে হবে ? কেন, তুমি —আমরা সবাই বাঙালী।

আমি বললাম, বাংলাদেশে যে কয়েক লক্ষ ভিন্ন বাসী একাদিক্রমে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস ছন তাদের যদি তোমার হিসাব থেকে বাদও দাও লেও বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা যে কয়েক লক্ষ লী ও ভুটানী রয়েছেন, এঁদের তুমি বাঙালী বে ? এদের সংস্কৃতিকে বাঙালী সংস্কৃতি মনে তার জন্য গর্ব অনুভব করবে ?

বন্ধু কয়েক মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে গেলেন। পর বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললেন, না, তা কি ধরব ?

এর পর আমি বললাম, তাহলে বাংলার বাসিন্দা ক লক্ষ রাভে সম্প্রদায়ের লোক যাঁদের উত্তরবঙ্গের দিম বাসিন্দা বলা যায় অথবা বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুর জেলা ও তার আশেপাশে যে লাখ ক সাঁওতাল আছেন তাঁরা তোমার বাঙালীর হিসাবে চন কিনা বলতে পার ? একটা কথা, এঁদের কেবল া-গুনতিতে বাঙালী বলে স্বীকার করে নিলেই না, এঁদের সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার নিয়ে গর্ব করার মত মানসিকতা তোমার আছে কি না টাই এ ক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন। খেয়াল রেখ, বাংলা-শে এই সব উপজাতীয়দের মোট সংখ্যা পনের ক্ষর বেশী।

বন্ধু বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। বুঝলাম স্তিকর নীরবতা। তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন —না।

আমি বললাম, জানতাম তুমি 'না' বলবে। আচ্ছা, যার বল বাংলাদেশের বাসিন্দা বাংলাভাষী হাড়ী বাগদী ডোম বাউরী মুচি মেথর ইত্যাদি তপশীলীভুক্ত জাতির লোকদের সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য। রাভে অথবা সাঁওতাল উপজাতীয়দের মত এঁদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ নয়—সমগ্র বাঙালী সমাজের একটা মোটা অংশ, শতকরা প্রায় সতের ভাগ হলেন এই সব তপশীলী জাতিভুক্ত সম্প্রদায়েরা। মাথা-গুনতিতে অথবা অন্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করার সময় এঁদের বাঙালী বলে স্বীকার করলেও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের তুমি বাঙালী বলবে, না এঁদের আচার-ব্যবহার, সঙ্গীত-শিল্প ইত্যাদিকে বাঙালীর গর্বের বস্তু বলে মনে করবে ?

বন্ধু এবার ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, বুঝেছি তোমার উদ্দেশ্য। তোমার কাছে লুকব না। হ্যাঁ, বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্কৃতিকেই আমি বাঙালীর সংস্কৃতি বলেছি। এতে লজ্জা বা সংকোচের কি আছে ? বাদবাকি অন্যান্য সম্প্রদায়েরা এই উচ্চতর সংস্কৃতির অনুবর্তী হবে।

প্রাথমিক বিহ্বলতার পর এবার বন্ধুর কণ্ঠে আত্ম-প্রত্যয়ের সুর ফুটে উঠেছে।

আমি বললাম, ধীরে বন্ধু, ধীরে। শুধু এই নয়। পঁয়ষট্টি লক্ষ বাঙালী মুসলমান, আড়াই লক্ষ বাঙালী খ্রীষ্টান ও বাঙালী বৌদ্ধরাও বাঙালীর সংস্কৃতির বিচারের সময় আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে থাকে না। তা ছাড়া বাংলা-দেশের অগণিত চাষী ("চাষাভূষো") এবং শ্রমিকও ("কুলি মজুর" বা "কুলি কাবাড়ী") সংস্কৃতি-বিচারে এখনও ব্রাত্য। আর মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি বলে আমরা যেটুকু বিনয় প্রকাশ করছি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাও অলীক। কারণ যে সংস্কৃতির গর্ব আমরা করি তা মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি নয়—এ আসলে সমাজের উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি। বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জে এবং ঘোষ বোস মিত্র ইত্যাদি ইংরেজী শিক্ষিত তথাকথিত বাবুদের কালচার এ। আর্থিক কারণে এই সব রোদ জল ও ধুলোকাদার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলা সম্প্রদায়ের অনেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হয়ে পড়লেও সামাজিক কাঠামোর শীর্ষবিন্দুতে এঁদের অবস্থান এবং তাই তথাকথিত মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি বস্তুতঃ বাঙালীদের এক মুষ্টিমেয় সংখ্যক ধোপধুরস্ত

পোশাকধারী পরের শ্রমে জীবন নির্বাহকারী "ভদ্র-লোক"দের কালচার।

বন্ধু বললেন, এই তো তোমার দোষ। রাজনীতি কপচাতে শুরু করলে এবার।

আমি বললাম, ঘাট হয়েছে। পেলব রায় আর দোদুল দে-দের কাছে সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা করা অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা, যেতে দাও ও প্রসঙ্গ। এবার বল দেখি সংস্কৃতি বলতে তুমি কি বোঝ?

কেন, শিক্ষা—

বন্ধু একদমে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝপথে তাঁকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, আচ্ছা, শিক্ষার কথাই প্রথমে ধরা যাক। জান তো বাংলাদেশে শতকরা উনত্রিশ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ জন-গণনা বিভাগের কর্তাদের হিসাবে শিক্ষিত। এই শিক্ষিতরা সবাই যদি সংস্কৃতিসম্পন্ন হন তাহলে যাঁরা 'শিক্ষিত' নন, তাঁরা সংস্কৃতিবিহীন—এ কথা তুমি স্বীকার করবে?

না না, তা কেন হবে?

'শিক্ষা'র প্রসার যে সংস্কৃতির নিদর্শন নয়, তার আর একটা নমুনা দিই। কাল বাসে যখন আসছিলাম আমাদের সহযাত্রী ছিলেন এক শিখ ভদ্রলোক। চোখে দেখে আর নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। বেশ ফিটফাট পোশাক-পরা এবং নিঃসন্দেহে 'শিক্ষিত' দুই বাঙালী তরুণ সেই ভিড়ের মধ্যে ভদ্রলোককে ব্যঙ্গ করার জন্য 'বাঁধাকপি,' 'সিঙাড়া' বলে তাঁর শ্রুতিগোচর স্বরে চেঁচাচ্ছিল। এমন কি কয়েক স্টপেজ পরে তরুণ দুটি বাস থেকে নেমে গিয়েও ভদ্রলোককে রেহাই দিল না। বাস ছাড়ার পরও আমরা তাদের ওই অসভ্য চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। 'শিক্ষিত' বাঙালীর অপর প্রদেশবাসীর প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক উক্তি—খোট্টা, ছাতু, উড়ে, ম্যাড়া, তেঁতুল ইত্যাদি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। অপরকে হেয় করার এই নিন্দনীয় বৃত্তি কি সংস্কৃতিসম্পন্নের কাজ?

বন্ধু স্বীকার করলেন যে এ সব সংস্কৃতির লক্ষণ নয়। তবে তারপরই বললেন, কিন্তু শিল্প সাহিত্য চারুকলা সঙ্গীত ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো বাঙালীর প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে। অন্ততঃ এই সব সুকুমারবৃত্তির অনুশীলনের জন্য তো বাঙালীকে সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে মেনে নিতে হবে।

আমি বললাম, এ সব সংস্কৃতির অপরিহার্য নিদর্শন নয়, বড় বেশী হলে সংস্কৃতির বাহ্যপ্রকাশ মাত্র। কারণ একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী ঝগড়াটে স্বভাবের হতে পারেন, সাহিত্যিকের পক্ষে ইন্দ্রিয়াসক্ত লম্পট হওয়া অসম্ভব নয়, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতবিশারদও হয়তো সামান্য স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলতে পারেন। চিত্রশিল্প, সাহিত্য রচনা অথবা সঙ্গীতের টেকনিক আয়ত্ত করলেই তাকে সংস্কৃতিসম্পন্ন বলতে হবে—এর কোন অর্থ নেই। আর তা ছাড়া এই সব সুকুমারকলার অনুশীলনই যদি কেবল সংস্কৃতির পরিচায়ক হয় তাহলে জনসাধারণের যে সামান্য ভগ্নাংশ এ সবের অনুশীলন করেন তাঁদের বাদ দিয়ে অন্য সকলকেই সংস্কৃতিবিহীন আখ্যা দিতে হয়।

বন্ধু এবার হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, মহা মুশকিল তোমাকে নিয়ে। সব সময়েই তুমি উলটো-পালটা কথা বলবে। আচ্ছা বেশ, সংস্কৃতির আমার দেওয়া ব্যাখ্যা যখন তোমার পছন্দ নয় তখন সংস্কৃতি বলতে তুমি কি বোঝ শুনি এবার। অভিধানে সংস্কৃতি শব্দটা যখন আছে তখন এর বাস্তব অস্তিত্বও নিশ্চয় রয়েছে।

অভিধানের কথাই যখন তুললে তখন বলি শোন। বড় বড় অভিধান আর এনসাইক্লোপিডিয়া ছেড়ে হাতের কাছের অক্সফোর্ডের সংক্ষেপিত অভিধানের মত নেওয়া যাক। অক্সফোর্ড অভিধানের মতে বর্তমান আলোচনার পটভূমিকায় সংস্কৃতি বা কালচারের অর্থ হল মনের অনুশীলন দ্বারা লভ্য জ্ঞান ও বৃত্তি। আমাদের রাজশেখর বাবুও 'চলন্তিকা'য় বলেছেন যে সংস্কৃতি হল শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি শিল্প কলা রুচি নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ। সংস্কৃতির সর্বজনমান্য সংজ্ঞার্থ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পূর্বোক্ত পরিভাষার আধারে এ কথা বলা যায়: সংস্কৃতি হল জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট মানসিকতা—দৃষ্টিভঙ্গী। শিল্প সাহিত্য চারুকলা সঙ্গীত ইত্যাদি এর সবের মধ্যে কয়েকটি প্রকাশের মাধ্যম। মূল কথা হল ওই বিশিষ্ট মানসিকতা।

বন্ধু প্রশ্ন করলেন, এই মানসিকতার ভিত্তি কি?

আমি বললাম, ভাল প্রশ্ন করেছ। এর ভিত্তি হল মানবীয় মূল্যবোধ। দয়া মায়া মমতা করুণা প্রেম প্রীতি বন্ধুত্ব সহানুভূতি শ্রদ্ধা ভক্তি উপাসনা ধর্মনিষ্ঠা নীতিনিষ্ঠা আদর্শনিষ্ঠা পরার্থপরতা দেশাত্মবোধ ও আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি সঙ্কীর্ণ অহং-এর ঊর্ধ্বে ওঠার যে সব বৃত্তি মানুষকে পশু থেকে ভিন্ন করেছে তার নাম মানবীয় মূল্যবোধ। নিজের ও সমাজ-জীবনে এই সব বৃত্তির উত্তরোত্তর বিকাশের নামই সংস্কৃতি চর্চা।

বন্ধুর সংশয় কিন্তু গেল না। তিনি বললেন, তাহলে বাঙালীর সংস্কৃতি—

আমি বললাম, কথাটা একটু রূঢ় শোনালেও সত্য বাঙালীর সংস্কৃতি বলে কোন কিছু নেই। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে—তার পৃথক সংস্কৃতি নেই। সমস্ত পৃথিবীতে মাত্র একটিই সংস্কৃতি আছে আর তার নাম মানবীয় সংস্কৃতি।

—

খোশনবীসের জবানবন্দি

শ্রীখোশনবীস জুনিয়র

॥ ঘুঘুচরিত ॥

ঘুঘুচরিতের কথা অমৃতসমান।
শ্রীখোশনবীস ভনে শুনে পুণ্যবান॥

ঘুঘু মহাশয়কে দিয়াই জবানবন্দি শুরু করা যাউক। ...কীর্তি বঙ্গগৌরব ঘুঘু মহাশয়ের অলোকসামান্য ...ভালোকের বিচ্ছুরণে প্রথমেই পাঠকের চক্ষু ধাঁধাইয়া ...ওয়া যাউক। প্রথমেই চতুর বঙ্গীয় পাঠককে অক্লান্তকর্মা ...জন্মা ঘুঘু মহাশয়ের অভূতপূর্ব চাতুর্যের ফাঁদে হাত-পা ...দিয়া বিমূঢ়বৎ নিক্ষেপ করা যাউক।

কিন্তু কেন? প্রথমেই এতাদৃশ মহাশয় ব্যক্তিকে ...সরে নামানো কেন? প্রথমেই নিরীহ বঙ্গজ পাঠকের ...াটে এই নিরেট থান-ইট মারা কেন? সার্কাসের ...ম খেলাতেই ক্লাউনের আমদানি কেন? নর ছাড়িয়া ...মেই বা-নর লইয়া টানাটানি কেন?

এই কেনর জবাব দিতে হইলে কিছু নিগূঢ় বঙ্গীয় ...তাতত্ত্ব বুঝাইতে হয়। এই নিগূঢ় তত্ত্বের জটিল রহস্য আপনাদের অনেকেরই বোধ করি জানা নাই। ...ব আমারও জানা ছিল না, আমিও উহা জানিতাম ...। জনৈক সুবিজ্ঞ সুপণ্ডিত সুরসিক প্রাচীন জনপ্রিয় ...সাহিত্যিক উহা আমাকে বুঝাইয়াছিলেন। তিনি ...া বুঝাইয়াছিলেন, অগ্রে তাহার কথাই বলি।

আমি অভিজাত ভদ্রলোক;—মৌতাত এবং ...ত্যসেবা ব্যতীত অন্য কর্ম নাই। কাজেই, প্রাণ ...া চায় তাহাই করিয়া বেড়াই, যখন যেখানে খুশি ...খানেই আড্ডা জমাই। সেদিনও এইরূপ আড্ডা ...িবার জন্য সর্বজনপ্রিয় প্রবীণ কথাসাহিত্যিক মহাশয়ের ...ে পদার্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম কিঞ্চিৎ ...শগল্পে কিছুকাল নিরুদ্বেগে কাটাইয়া আসিব। ...ন্তু তাহা হইল না। সাহিত্যিক মহাশয় খোশগল্পের ...র দিয়াও গেলেন না। তিনি আমাকে পাইয়াই ...ী দিতে শুরু করিলেন। অনেক বচন ঝাড়িলেন, অনেক উপদেশ দান করিলেন। আমি সকল নীরবে শুনিলাম; কোন কথা কহিলাম না; কোন বাধা দিলাম না—দিয়া কোন লাভ হইত না। এদেশে যিনি বৃদ্ধ তিনিই বিজ্ঞ; যিনি জনপ্রিয় তিনিই গুণবান; এবং এরূপ ব্যক্তিমাত্রেই যথেচ্ছ বাণী দানের অধিকারী। তাহা ছাড়া, সাহিত্যিক মহাশয় হয়তো পরোপকার প্রবৃত্তির মহৎ তাড়নায় বিচলিত হইয়াও থাকিবেন। হয়তো ভাবিয়া থাকিবেন যে মূঢ় মৌতাতগ্রস্ত খোশনবীসকে বিনা ব্যয়ে বাণী দিয়া তিনি না বাঁচাইলে আর কে বাঁচাইবে। তাই, আমাকে কায়দায় পাইয়াই তিনি বচন ঝাড়িতে লাগিলেন। প্রাণপণে উপদেশামৃত দান করিতে লাগিলেন। (কেবল উপদেশামৃত বলিলে মিথ্যা বলা হইবে, উদারচরিত প্রবীণ সাহিত্যিক মহাশয়ের অকুণ্ঠ দানশীলতার প্রতি অন্যায় অবিচার করা হইবে। বস্তুতঃ উপদেশামৃতের সহিত তিনি প্রচুর পরিমাণ মুখামৃতও ত্যাগ করিয়াছিলেন। সাহিত্যিক মহাশয় যথার্থই প্রবীণ, অর্থাৎ জরাগ্রস্ত জরদ্গব। তাঁহার দু-পাটি দন্তই বহু পূর্বে পরিপাটিরূপে উৎপাটিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অনর্গল পথে অনর্গল মুখামৃত বর্ষিত হইতেছিল। কোন বাধা ছিল না, কোন দ্বিধা ছিল না। অহো:, কী উদারতা! কী ত্যাগ!) সাহিত্যিক মহাশয় কি বলিয়াছিলেন, কি বলেন নাই—আমি সকল শুনি নাই। কেন না, সে সময় পথিপার্শ্বে তৃণভোজনরত একটি নধরকান্তি ছাগশিশু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই বিজ্ঞ অজনন্দন গম্ভীরবদনে কিয়ৎকাল চতুষ্পার্শ্বস্থ কচি কচি তৃণ ভোজন করিবার পর বেড়ার ফাঁক হইতে মুখ গলাইয়া সাহিত্যিক মহাশয়ের পুষ্পোদ্যানে আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণের পর একটি মনোরম প্রস্ফুটিত পুষ্পময় ক্ষুদ্র বৃক্ষকে আপনার নাগালের মধ্যে পাইয়া সুচতুর ছাগ উহাকে নিঃশেষে মুড়াইয়া খাইল, এবং অতঃপর আপনার বুদ্ধিতে আপনি মোহিত হইয়া লাফাইতে লাফাইতে ব্যা ব্যা রবে সঙ্গীত জুড়িয়া দিল।

দেখিয়া বুঝিলাম, এই ছাগ অতীব বিজ্ঞ, সুরসিক, সুসাহিত্যিক এবং সুসমালোচক। নতুবা, সকল আগাছা ছাড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া প্রস্ফুটিত পুষ্পশোভিত মনোহর বৃক্ষটিকে মুড়াইবে কেন? আর, এবংবিধ কর্মকে আপনার অসামান্য বিজ্ঞতার পরিচায়ক মনে করিয়া উল্লাসে কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের ন্যায় অশ্রুতপূর্ব মনোহর সঙ্গীতই বা পরিবেশন শুরু করিবে কেন? বিস্মিত হইয়া মনে মনে এই-সকল ভাবিতেছিলাম। এই সময়ে বিজ্ঞবর ছাগ সঙ্গীত থামাইল। উহার শেষ রেশ কানে বাজিতে লাগিল।

শুনিলাম সাহিত্যিক মহাশয় বলিতেছেন, খোশনবীস, তোমার কিচ্ছু হইবে না।

শুনিয়া পুলকিত হইলাম। বলিলাম, আজ্ঞা, যাহা বলিয়াছেন।

সাহিত্যিক: কি হইবে না বল তো?

আমি: আজ্ঞা, কিচ্ছু হইবে না।

সাহিত্যিক: আহা, তাহা নহে। বিশেষভাবে কি হইবে না?

আমি: কিচ্ছু হইবে না।

সাহিত্যিক: কী গেরো। আমি উহা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, তোমার সাহিত্যে কি হইবে না?

আমি: আজ্ঞা, কিচ্ছু হইবে না।

সাহিত্যিক রীতিমত জ্বালাতন হইলেন। ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, আমি বলিতেছি—তুমি কদাপি জনপ্রিয় লেখক হইতে পারিবে না।

আমি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িলাম। কহিলাম, আজ্ঞা, যাহা বলিয়াছেন।

সাহিত্যিক মহাশয়ের ভ্রূ অধিকতর কুঞ্চিত হইল। যুগলনেত্র ঈষৎ বক্র করিয়া কিয়ৎকাল আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বোধ করি দেখিতে চাহিলেন যে আমি তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছি কি না। কহিলেন, বল দেখি, তুমি কেন জনপ্রিয় লেখক হইতে পারিবে না।

আমি: আজ্ঞা, মরিয়া ভূত হইয়া গেলেও কদাপি আপনার ন্যায় লিখিতে পারিব না বলিয়াই।

উত্তর শুনিয়া সাহিত্যিক মহাশয় প্রীত হইলেন। তাঁহার ভ্রূরেখা সরল হইল, মুখে বিগলিত হাস্য ফুটিল। কহিলেন, না না, হতাশ হইয়ো না। লাগিয়া থাক; তোমারও হইবে।

আমি কহিলাম, হতাশ হই নাই। লাগিয়াই আছি; কিন্তু আপনার ন্যায় জনপ্রিয়তা লাভের কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।

এতক্ষণে সাহিত্যিক মহাশয়ের দন্তহীন মাঢ়ী... পূর্ণবিকশিত হইল। কণ্ঠ হইতে জড়িত আনন্দধ্বনি উদ্‌গারিত হইতে লাগিল—হে হে হে...।

আমি: আপনার ভক্ত কে না? ওপাড়ার ফেক্টিপদি, রাজাবাজারের কোচোয়ান ছন্নু মিঞা, এপাড়ার রকফেলার অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যগণ, ভানুমতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ প্রমুখ সকলেই আপনার একান্ত ভক্ত। ঠাকুর-চাকর-ঝি-মুচি-মুদ্দাফরাশ ইত্যাদি আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই আপনি প্রিয় লেখক। এতাদৃশ জনপ্রিয়তা অর্জন এ জন্মে আমার দ্বারা হইয়া উঠিবে না।

হইবে, হইবে। ঘাবড়াইও না; তোমারও হইবে।—সাহিত্যিক মহাশয় আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাহিলেন। কহিলেন, তোমার রচনা মন্দ নহে। তুমি মন্দ লিখ না। তবে কি জান, সাহিত্যের কিছু গুহ্যতত্ত্ব তোমার ঠিকমত জানা নাই। উহা জানিতে হইবে।

আমি: গুহ্যতত্ত্ব?

সাহিত্যিক: হাঁ, গুহ্যতত্ত্ব, অতীব গুহ্যতত্ত্ব। এই গুহ্যতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে যে-কেহ রাতারাতি অসাধারণ জনপ্রিয় এডিশান-কারবারী সাহিত্যিক হইয়া যাইতে পারে। ইহাই এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে কী টু সিওর সাক্‌সেস্।

আমি হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। কথা কহিতে পারিলাম না।

সাহিত্যিক মহাশয় কহিলেন, খোশনবীস, তোমার খোশামোদে আজি আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। তাই আজি তোমার নিকট এই গুহ্যতত্ত্ব ব্যক্ত করিব, তোমাকে এই সিওর সাক্‌সেসের অব্যর্থ 'কী' দিব।

আমি করজোড়ে কহিলাম, প্রভু, দয়া করিয়া দিন। দয়া করিয়া উপদেশ করুন।

প্রভু তখন সহাস্য-হাস্যে ধ্যাননিমীলিতনয়নে রাসভ-

...নদমন্দ্রকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন, খোশনবীস, ...। কিসে রচনা জনপ্রিয় হয়? কি লিখিলে ...-বিড়িওয়ালা-ভুজাওয়ালা সকলেই উহা পরম ...গরম ফুচকার ন্যায় গোগ্রাসে গিলে? রচনা ...লে উহা সাড়ে-বত্রিশভাজার ন্যায় মজাদার ...লুমের সহিত কম্‌পিট্‌ করিতে পারে? বৎস ..., উহার জন্য চাই ক্যারেকটার—মজাদার ...র, কেচ্ছাদার ক্যারেকটার, ইন্‌টারেস্টিং ...র। সকল ক্ষেত্রেই রচনা শুরু করিবার সঙ্গে ...টি ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার ধরিতে হইবে। ...ং বলিতে কি বুঝায়, আশা করি তাহা বুঝ। ...ং ক্যারেকটার বলিতে বুঝায় মিষ্টি দিদি, টক ...ল মাসী, ছুরি বেগম, তিরি বাদী ইত্যাদি। রূপবতী যুবতী নারী অপেক্ষা ইন্‌টারেস্টিং আর ...ছ—বিশেষতঃ যদি সে আপনার গৃহিণী না হয়! ...জনপ্রিয় করিতে হইলে গোড়াতেই এইরূপ ...ন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার ধরিতে হইবে,—এবং ...রে তাহাকে খেলাইয়া-খেলাইয়া তীরে তুলিতে ...তাহা হইলেই বাজিমাত। জনপ্রিয়তা রোখে ...খাশনবীস, জনপ্রিয়তার এই বি. টি. রোড। ...প্রিয় হইতে চাও, এই পথ ধর।

...ম কহিলাম, আজ্ঞা যাহা বলিয়াছেন। ভবিষ্যতে ...রিব।

...নবন্দি লিখিতে বসিয়া সেই কথা আমার মনে ... ভাবিলাম, বি-সি. মার্কা প্রবীণ সাহিত্যিক ...যাহা বলিয়াছিলেন, উহাই যথার্থ। মহাজন ...গমন করেন, উহাই পথ। ভাবিলাম, এই ...প্রদর্শিত পন্থাই অনুসরণ করিব। আবালবৃদ্ধ-...পাগলছাগল সকলেরই প্রিয় হইতে পারে এরূপ ...চনা লিখিব।

...ঃ গোড়াতেই গোলমাল বাধিল। শুরু করিবার ...সমস্যা উপস্থিত হইল। জনপ্রিয় রচনা তো ...—কিন্তু গোড়াতেই কাহাকে ধরি, কাহাকে ...মারম্ভ করি? প্রবীণ সাহিত্যিক মহাশয় তাঁহার ...দেশে প্রেস্‌ক্রাইব্‌ করিয়াছিলেন: গোড়াতেই ...ন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার ধরিতে হইবে। ধরিতে হইবে উহা ঠিক। আমিও ধরিতে গররাজী নহি। (ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার বলিতে কি বুঝায়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।) কিন্তু ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার পাই কোথায়? চারিপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকাইয়া দেখিলাম। কিন্তু ধরিবার মত মিষ্টি দিদি, টক বৌদি, নোনতা মাসী, ছুরি বেগম, তিরি বাদী ইত্যাদির চিহ্নমাত্র কোথাও দেখিতে পাইলাম না। চারিপাশে কোথাও এমন একটি রসবতী রূপবতী যুবতী নারীর সাক্ষাৎ মিলিল না, যিনি স্ত্রী নহে সম্মত; যাহাকে নবেলী প্রেমের খেলা খেলিতে বলিলে, তাড়াইয়া তাড়াইতে না আসেন।

না, ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার মিলিল না। তবে কাহাকে ধরি? প্রথম কাহাকে জবাই করিয়া রচনা শুরু করি? কি করিয়া জনপ্রিয় রচনা লিখি?

আপন মনে বিরস মুখে এই-সকল সাত-পাঁচ ভাবিতেছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ ঘুঘু মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। মনে মনেই উল্লাসে লাফাইয়া উঠিলাম। ইউরেকা! ইউরেকা! পাইয়াছি। যাহা খুঁজিতেছিলাম তাহা পাইয়াছি। ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার পাইয়াছি।

না, ঘুঘু মহাশয় রসবতী রূপবতী যুবতী নহেন। তিনি নিতান্তই পুং জাতীয়। যুবক নহেন, কিন্তু যুবক সাজিবার বড় শখ। নিত্য উত্তমরূপে ক্ষৌরকর্ম করিয়া, ভাঙা গালে স্নো ঘষিয়া, পাউডার বুলাইয়া, পাকা চুলে পরিপাটি কাঁপা টেরি কাটিয়া যখন তিনি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়ান, তখন আপনাকে দেখিয়া আপনিই মোহিত হন; আপনাকে দেখিয়া আপনারই নবযুবকটি বলিয়া ভ্রম হয়; আপনাকে দেখিয়া আপনারই মজিতে ইচ্ছা করে। পোশাকেরই বা তাঁহার কত বাহার। কোনদিন চুড়িদার পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি; কোনদিন উত্তম বিলাতী কাপড়ের ওপ্‌ন্‌-ব্রেস্ট আচকান; কোনদিন যাত্রার দলের নবাবজাদার ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে-ফিতা-বাঁধা চাপকান; আবার কোনদিন-বা ডোরাকাটা আঁটসাট নেপালী কুর্তা। এই-সকল অপরূপ জোকাজাব্বা আঁটিয়া সাজিয়া-গুজিয়া দামী সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ঘুঘু মহাশয় যখন পথে বাহির হন, তখন—আহাঃ, রূপ দেখিয়া ভুবন মুরছায়! নোটন পায়রাটির মত ফিটবাবু ঘুঘু মহাশয়

যখন ঝোটন নাড়িতে নাড়িতে অর্থাৎ ঘাড় ঝুলাইয়া হেলিতে-দুলিতে গজগমনে পথ হাঁটেন, তখন মনে হয়—ঢলঢল পাকা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়। মহাশয় ঘুঘু যখন ঢলিয়া-ঢলিয়া চলিতে চলিতে আড়ে-আড়ে চোরা চাহনিতে পথচারিণী মহিলাবৃন্দের দিকে তাকাইয়া মুচকি মুচকি হাসেন, তখন মনে হয়—আহাঃ, ঈষৎ হাসির অমিয়া হিল্লোলে মদন মুরুছা পায়। বস্তুতঃ, ঘুঘু মহাশয় বড় রূপবান। তাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া একটি যাত্রার দল একদা তাঁহাকে বিন্দেদূতীর ভূমিকায় নামাইবার জন্য বড় ধরাধরি করিয়াছিল, বড় সাধাসাধি লাগাইয়াছিল। তাঁহার বয়সের কথা কেহ কখনও ভাবে নাই, কেহ কখনও ভাবে না। যে তাঁহাকে বুড়া বলে, সে নিতান্তই পাষণ্ড পামর দুর্বৃত্ত, সে নিশ্চিতই কোন ভর্তৃখাদিকার সন্তান। বস্তুতঃ ঘুঘু মহাশয় বৃদ্ধ নহেন :—তিনি স্থিরযৌবন নবযুবক। বয়স লুকাইবার জন্য তাঁহার কত প্রয়াস। কত স্নো-পাউডার লেপন, কত লোমা ঘর্ষণ, কত রসায়ন সেবন,—সন্ধ্যাকালে আপনার কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কত ঢালিঢালি ঢুকুঢুকু।

কিন্তু এজন্য তাঁহাকে আমরা ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার মনে করি না। কেবল রূপযৌবনই যদি খুঁজিব, তবে তো সুবিখ্যাত কাঞ্চনপাদপ পল্লীতেই যাইতে পারিতাম। রূপযৌবন অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যেই সেখানে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যাইত। তবে কি ঘুঘু মহাশয়কে আমাদের কোনক্রমে রমণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে? খোশনবীসের মৌতাতের চক্ষে কি কখনও তাঁহাকে রসবতী রূপবতী যুবতী বলিয়া ঠেকিয়াছে? না, তাহাও নহে। যে বঙ্গবিশ্রুত কমলাকান্ত শর্মা পূর্ণিমার চন্দ্র দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য মাতিত, সাক্ষাৎ সেই মৌতাতসাগরের পরমহংস মহাপুরুষের শিষ্য হইলেও খোশনবীসের ঘুঘু মহাশয়কে কখনও চন্দ্রবদনা বলিয়া মনে হয় নাই। তবে তাঁহাকে ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার ভাবিলাম কেন? জবানবন্দি লিখিতে বসিয়া প্রথমেই তাঁহাকে জবাই করিবার উপযুক্ত খোদার খাসী মনে করিলাম কেন? উহার কৈফিয়ত দিতে হইলে গোপনে চুপিচুপি স্বীকার করিতে হয় যে পূর্ব-উল্লিখিত প্রবীণ সাহিত্যিক মহাশয়ের বক্তব্য আমরা সকল পুরাপুরি মানি না। ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেক্‌টারের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদিগের কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য আছে। কেচ্ছাদার না হইলে যে ইন্‌টারেস্টিং হয় না, তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল রূপবতী রসবতী রমণীই যে কেচ্ছাদার ক্যারেকটারের অধিকারিণী—আমরা এমত মনে করি না। আমাদিগের বিবেচনায় কেচ্ছাদার কীর্তিকলাপের প্রতিযোগিতায় কোন কোন পুরুষও নিতান্ত কম যান না,—এবং এই দিক দিয়া তাঁহারাও অগ্রে জবাই হইবার দাবি করিতে পারেন বটে। আমাদিগের বিবেচনায় এই-সকল রঙদার ব্যক্তির মজাদার কাহিনীও সর্বজনমোহন রমণীয় রমণী-কুৎসা অপেক্ষা কম ইন্‌টারেস্টিং নহে।

এই-সকল সাত-পাঁচ ভাবিয়াই অগ্রে ঘুঘু মহাশয়কে ধরিলাম। ঘুঘু মহাশয় বড় সম্ভ্রান্ত পুরুষ। জন্মে সম্ভ্রান্ত, কর্মে সম্ভ্রান্ত, বচনে সম্ভ্রান্ত, ফেরেববাজিতে সম্ভ্রান্ত। সামান্য দু-দশ টাকা, একটু বিলাতী পানীয় অথবা এক-আধখানি চপ-কাটলেটের লোভে কাহারও আনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, প্রস্তরমুকুর কাষ্ঠ কাচ কার্পেটাদিতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত; তাঁহার সোনাবাঁধা সিগারেট কেস, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হ্যাণ্ডনোটে বাঁধা খাদক, তাড়াবাঁধা কাগজ, কৌশলে বাঁধা মোয়াক্কেল এবং খোশামোদে বাঁধা মুরুব্বী। তাঁহার অভাব কিসে! ঘাটতি কোথায়! রূপে-গুণে-ধনে-মানে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে-দালালিতে-ধূর্তামিতে তাঁহার তুলনা মেলা ভার। এরূপ সর্বগুণযুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে অগ্রে জবাই হইবার হকদার; তাহাতে আশা করি আপনাদের কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

জন্মসূত্রেও ঘুঘু মহাশয় বঙ্গদেশের দুই প্রাচীন বিখ্যাত বংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহার পিতৃকুল আসিয়াছে মহামতি ভাঁড়ু দত্তের বংশ হইতে, এবং মাতৃকুল [illegible] ঠকচাচার ধারাবলম্বী। এই সুপ্রাচীন স্বনামধন্য [illegible] কুলের রক্তই ঘুঘু মহাশয়ের শরীরে অতি বেগবতী; [illegible] পাতিলেই উহার কুলুকুলুধ্বনি শোনা যায়। [illegible] তাঁহার অসামান্য প্রতিভার বলে অনন্যসাধারণ [illegible] দ্বারা এই উভয় কুলকেই ধন্য করিয়াছেন, [illegible] পুরুষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কাজেই, তাঁহা[illegible]

আসরে নামাইয়া খোশনবীস যে কোনরূপ অন্যায় করে নাই, আশা করি তাহা আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ঘুঘু মহাশয় বড় পরোপকারী। পরের সেবাতেই তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কোথাও কোন গর্দভের ভার বহন করিতে কষ্ট হইতেছে দেখিলে তিনি সবাগ্রে তথায় ছুটিয়া যান, এবং আপনি স্বয়ং বহু প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার বোঝা মোচন করিয়া অবোলা জীবটিকে ভারমুক্ত করেন। এক্ষেত্রে তাঁহাকে ভূভারহরণের নূতন সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলের সকল ভার হরণ করাই মহাত্মা ঘুঘু মহাশয়ের জীবনের ব্রত। এই ব্রত পালনে তিনি যেরূপ নিষ্ঠাবান, সেইরূপ অক্লান্তকর্মা। এই ব্রত পালনে তাঁহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিচার নাই, বিবেচনা নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, ভয় নাই, ভ্রান্তি নাই। এই ব্রতপালনে তিনি সম্পূর্ণরূপেই নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ। কাহারও প্রতি পক্ষপাতমূলক কোন আচরণ তাঁহার দ্বারা কদাপি সম্ভবে না। ভার দেখিলেই তিনি হরণ করিতে আগাইয়া যান, দায় দেখিলেই তিনি মোচন করিতে কোমর বাঁধেন। ভার কোন ব্যক্তির স্কন্ধেই থাকুক, কোন প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারেই থাকুক অথবা কোন সমিতির কোষাগারেই থাকুক—সর্বক্ষেত্রেই ঘুঘু মহাশয় সমান তৎপর। ব্যক্তিতে-প্রতিষ্ঠানে তাঁহার কোন ভেদ নাই। ভার দেখিলেই তিনি মোচন করেন। বস্তুতঃ এইরূপ অসাধারণ উদারতা এবং অলোকসামান্য পরোপকার প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া ঘুঘু মহাশয় যে এ পর্যন্ত কত ব্যক্তিকে ভারমুক্ত করিয়া মুক্তি দিয়াছেন এবং কত প্রতিষ্ঠানকে হালকা করিয়া অডিট রিপোর্টের ঝামেলা চুকাইয়া দিয়াছেন, তাহার আর অন্ত নাই। এইরূপ পরোপকারী উদারহৃদয় সদাশয় মহাপ্রাণ ও [illegible] ঘুঘু মহাশয়কে যে আমরা ইম্‌টাবেলিটি [illegible] তালিকায় টপ প্রায়রিটি দিব, উহাতে [illegible] কোন কারণ দেখি না। পাঠক, আপনার কি এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ আছে? ঘুঘু মহাশয় যে ক্ষণজন্মা প্রতিভাবান পুরুষ, তাহাতে আপনার কোন সংশয় আছে কি?

কি বলিলেন?—আপনি ঘুঘু মহাশয়কে চিনেন না? কখনও দেখেন নাই?

অসম্ভব! মহাশয়, আপনি হয় বাতুল, না হয় ঘুঘুর মাতুল—অর্থাৎ রামঘুঘু! এ বঙ্গরঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া রঙ্গাচার্য ঘুঘুকে না চিনে কে? হাড়ে হাড়ে না চিনিয়া থাকিবার জো আছে কাহার? ঘুঘুকে সকলেই চিনে, সকলেই জানে। আপনিও তাঁহাকে দেখিয়াছেন, নিয়তই দেখিতেছেন। কিন্তু বুঝিতে পারিতেছেন না, তাঁহার স্বরূপ ধরিতে পারিতেছেন না। ধরিতে পারা অত সহজ নহে। ধরিতে পারিলে আপনিও স্বয়ং ঘুঘু হইতেন, আপনার ভিটায় অন্য কেহ চরিত না, আপনিই অন্যের ভিটায় চরিতে পারিতেন। ঘুঘু মহাশয় পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবী বিনয়ে তিনি আপনাকে সর্বদা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চলেন, আপনার কীর্তির গৌরব আপনি কখনও দাবি করেন না। তাই, তাঁহাকে চিনিতে পারা বড় কঠিন, বড় দুরূহ। সাধনবল না থাকিলে তাঁহাকে কদাপি চিনিতে পারা যায় না। গুরুবলে বলীয়ান হইয়াই আমি তাঁহাকে চিনিয়াছি। আসুন, এক্ষণে আপনাদিগের নিকটেও তাঁহাকে চিনাইয়া দিই।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঘুঘু মহাশয় ক্ষণজন্মা কর্মী পুরুষ, তাঁহার কর্মক্ষেত্র বহুধাবিস্তৃত। তিনি সর্বকর্মে সমান পারদর্শী, সর্বকর্মে সমান তৎপর, সর্বঘটে সমান বেল-পাতা। কাজেই, আপনি সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার সন্ধান পাইতে পারেন।

আপনার যদি সোস্যাল ওআর্কে রুচি হয় তবে দেখিবেন ঘুঘু মহাশয় সেখানে বিরাজিত। সমিতিতে-কমিটিতে ঘুঘু মহাশয়ের নামই সর্বাগ্রে। যদি কোন কার্যোপলক্ষে মোটা রকম সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়, তবে দেখিবেন ঘুঘু মহাশয়ই সেখানে সর্বেসর্বা। এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহাকে [illegible] নিঃস্বার্থভাবে একা একশোর কার্য করিতে দেখিবেন, বুঝিবেন তিনিই ঘুঘু।

আপনার যদি রাজনীতিতে উৎসাহ থাকে, আপনি যদি মণ্ডল-কংগ্রেসের সদস্য হন, তবে সেখানেও ঘুঘু মহাশয়কে দেখিতে পাইবেন। সভাপতির পদে যে মহাত্মাকে বিরাজিত দেখিবেন, বুঝিবেন তিনিই ঘুঘু। না, মণ্ডল-কংগ্রেস দেখিয়া ঘুঘু মহাশয়ের রাজনৈতিক

কর্মকে ক্ষুদ্র ভাবিবেন না। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান অতি বিরাট। উহা সকল আপনাদের জানা নাই, জানিবার কোন সুযোগ ঘটে নাই। উহা আপনাদিগকে আমি চুপিচুপি জানাইয়া দিতেছি। ইহা সকল স্বয়ং ঘুঘু মহাশয়ই আমাকে শুনাইয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পশ্চাতে তাঁহার হাত অনেকখানি। তিনি না থাকিলে ভারতবর্ষ এত শীঘ্র স্বাধীন হইতে পারিত না। বাঘা-বাঘা নেতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত এক পাও কখনও চলেন নাই। তাহা ছাড়া, স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি আর-একটি বিরাট কার্য করিয়াছিলেন। একদা বিপ্লবী দলের একটি পট্‌কা তিনি আপনার গৃহে একদিনের জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব পাঠক, বুঝিতে পারিতেছেন রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘুঘু মহাশয়ের অবদান কী বিরাট, কী মহৎ! কিন্তু দেখিবেন, এই গোপন তত্ত্ব যেন সাধারণ্যে কখনও প্রচার করিবেন না। কেন না, ঘুঘু মহাশয় আত্মপ্রচারে বড় পরাঙ্মুখ, আত্মপ্রশংসা শ্রবণে বড় লজ্জিত।

কিন্তু এ-সকল বাহ্য। ঘুঘু মহাশয়ের আসল কীর্তির ক্ষেত্র হইতেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্র—শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে ঘুঘু মহাশয় স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপূত চিহ্নিত ব্যক্তি। (এ কাহিনীও আমার স্বয়ং ঘুঘু মহাশয়ের নিকটেই শোনা।) ঘুঘু কৈশোরে শান্তিনিকেতনে পড়িতে গিয়াছিলেন। সেখানে একদা গুরুদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। দিব্য চালাক-চতুর ছেলেটিকে দেখিয়া গুরুদেব কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার নাম কি?' উত্তরে ঘুঘু সুমিষ্ট আধো-আধো স্বরে বলেন, 'ঘু···ঘ্···ঘু।' শুনিয়া গুরুদেব প্রীত হন। স্মিত মুখে আশীর্বাদ করিয়া বলেন, 'বেশ বেশ। তোমার নাম সার্থক হউক। দেশীয় সংস্কৃতির ভিটায়-ভিটায় তুমি নির্বিবাদে চরিয়া বেড়াও।'

সেই হইতে ঘুঘু মহাশয় বঙ্গসংস্কৃতির স্বয়ং-নিযুক্ত রক্ষক সাজিয়াছেন, বঙ্গদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার গুরুভা আপনার মস্তকে তুলিয়া লইয়াছেন। না, ঘুঘু মহা আপনি কখনও কিছু লিখেন নাই। তবে উহাতে কিছু আসে-যায় না। তিনি লিখিলে লিখিতে পারিতে উহাতেই প্রমাণিত হয় যে সাহিত্যে-শিল্পে তাঁহার ক অগাধ দখল, কী প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য! উহা ছাড়া অ প্রমাণও আছে। বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের কাহার জন্মদিনে, পুত্রের বিবাহে, নাতনীর অন্নপ্রাশনে অথ অন্য-কোন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে কখনও যদি যা তবে গৃহকর্তার পক্ষ হইতে যিনি আপনাকে অভ্যর্থ জানাইবেন, বুঝিবেন তিনিই ঘুঘু। গৃহস্থ আপনজনে ন্যায় যাঁহাকে মুরুব্বী সাজিয়া ছুটাছুটি করিতে দেখিবে বুঝিবেন তিনিই ঘুঘু।

ঘুঘু মহাশয়ের এত গুণের কথা শুনিবার পরে কাহারও যদি তাঁহাকে ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার বলি বোধ না হয়, তবে আমি নাচার। আমি বলিব, ব্যক্তি অতিশয় অরসিক, অতি ভোঁদা। এরূপ অর ভোঁদা পাঠকে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এ র তাঁহার জন্য নহে। এ খোশনবীসী জবানবন্দি তি যেন কদাপি না পড়েন। কিন্তু যে-পাঠক ঘুঘু মহাশ চরিত্র-মাহাত্ম্যে মজিয়াছেন, তাঁহাকে জানাইয়া রাখি পরবর্তী সংখ্যায় ঘুঘু মহাশয়ের সহিত আমার পরিচ সুমধুর বিবরণ এবং দেশবিখ্যাত কার্য-নাশা-শ্যা সমিতির মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রকাশ করিব। রসিক পা ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারেন।

কিন্তু তাহার পূর্বে আপনারা একবার আমাদি ঘুঘু মহাশয়ের নামে জয়ধ্বনি করুন। এরূপ মহা নামে জয়ধ্বনি না করিলে আর কাহার না করিবেন!

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

লেখাটি সকালে লিখতে বসার আগে দৈনিক খবরের কাগজের উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। কাগজের খবর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চালের দাম বিয়াল্লিশ থেকে আটচল্লিশে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে শারদীয় সংখ্যার জন্য একটি সরস সাহিত্যালোচনামূলক রচনা তৈরি করার জন্য আমি যে পরিকল্পনা করেছিলাম তা একটা প্রচণ্ড উত্তাপ হয়ে আমার ব্রহ্মতালু দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় এই সময় আমি বোকারোতে থাকলে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারতাম।

এক ধরনের অনুভূতিকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নাম দেওয়া যায়। সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি একটা প্রবল আতঙ্কের আকারে আমার সারা শরীরে মনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। আমার মনে হচ্ছে চালের দামের এই ঊর্ধ্বগতি অন্ততঃ বাহাত্তর টাকা পর্যন্ত পৌঁছনোর আগে কিছুতেই অবরুদ্ধ হবে না। মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য বিতর্কের সময় কোচবিহারের যে উদাহরণটি উল্লেখ করেছিলেন তা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বলেছিলেন যে সেবার কোচবিহারে চালের দাম বাহাত্তর টাকায় উঠেছিল, সেবার কংগ্রেস সেখানে পাঁচটি আসন লাভ করেছিল। এটি লজিক শাস্ত্রের বিষয় লজিক বলে, একই কারণ যতবার বিদ্যমান থাকবে ততবারই একই কার্য সংঘটিত হবে। এবং তাই এটি ধরে নেওয়া যায় যে কলকাতায় চালের দাম অন্ততঃ বাহাত্তর টাকায় উঠবেই, এবং তার ফলে আগামী ইলেকসানে কংগ্রেস এই শহরের প্রায় সবগুলি আসন লাভ করবেই।

এই বাজারে ঘরে বসে সাহিত্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করাটা আমার কাছে প্রহসনের মত মনে হচ্ছে। যেখানে ঘরে ঘরে অর্ধাশন এবং অনশন শুরু হয়ে গেছে, যেখানে শূন্য দরজার দিকে তাকিয়ে পূজার বাজারের প্রত্যাশী কাপড়ের দোকানদাররা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, সেখানে কবিগুরুর মতই বলতে ইচ্ছে করছে : সাহিত্যের বিমল বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

তবুও সাহিত্য তো বাদ দেওয়া যায় না। সাহিত্য বাদ দেওয়ার অর্থ পরাজয়কে স্বীকার করে নেওয়া। জীবজগতে মানুষই একমাত্র জীব যারা অন্ন-সমস্যার পুরোপুরি দাস নয়। সাহিত্যচর্চা বন্ধ করতে অস্বীকার করে আমরা প্রমাণ করি যে নিছক ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বৃহত্তর কোন লক্ষ্য মানুষের সামনে আছে।

তার মানে এই নয় যে চালের দর বাড়ার সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নেই। সাহিত্য এমন একটি ঘর যার চারদিকই খোলা; জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই বা এমন কোন সামাজিক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা নেই যার সঙ্গে সাহিত্যের কোন না কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে চারদিক খোলা হলেও সাহিত্যের ঘরটি সাহিত্যের নিজের ঘর। যে কোন সমস্যাকেই যদি সাহিত্যের ঘরে ঢুকতে হয় তবে তাকে সাহিত্যের রীতিনীতি অনুযায়ী রূপান্তরিত হতে হবে। সাহিত্য একদিকে যেমন খুবই উদারনৈতিক, অন্যদিকে আবার তেমনি খুবই রক্ষণশীল। সাহিত্য

একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বয়ং-শাসিত রাষ্ট্র। যে কোন বিদেশী নাগরিক এ রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারেন। কিন্তু ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডোমিসাইলড্ হতে হবে। বর্তমানে চালের দরের সমস্যাটিও সাহিত্যের ঘরে ঢুকতে পারে, কিন্তু ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি আর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্যা থাকবে না; এটা তখন হয়ে দাঁড়াবে সাহিত্য-সৃষ্টি বা রস-সৃষ্টির উপাদান মাত্র। দৈনন্দিন জীবনে আটচল্লিশ টাকা চালের মণ একটি জীবন-মরণ সমস্যা; কিন্তু সাহিত্যিকের একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হল—এই তথ্যটি কি এমন কোন তথ্য যা দিয়ে প্রকৃত রস-সৃষ্টি করা সম্ভব? এবং স্বভাবতঃই এই উপাদানটিকে যখন সাহিত্যকর্মের বিষয়ে পরিণত করা হবে তখন আর তা নিছক বাস্তবের একটি সমস্যা বা তথ্য থাকবে না; তা পরিবর্তিত হয়ে আর কিছুতে পরিণত হবে। সাহিত্যের এই অটোনমিকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। না নিলে যে জিনিস সৃষ্ট হবে তার ঝুড়ি ঝুড়ি দৃষ্টান্ত সোভিয়েট সাহিত্যে এবং বাংলা বামপন্থী সাহিত্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে।

তা হলে প্রশ্ন এই যে—আটচল্লিশ টাকা চালের মণের সমস্যাটা বাংলা সাহিত্যে কী ভাবে উপস্থাপিত হতে পারে? এ বিষয়ে নিছক সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে কোন আলোচনা করে লাভ নেই। কী হতে পারে এই আলোচনার চেয়ে কী হবে বা হচ্ছে এই আলোচনার মূল্য অনেক বেশী। আমি কটা রসগোল্লা খেতে পারি এই তত্ত্বমূলক আলোচনা না করে, কেউ যদি আমার সামনে কয়েক সের রসগোল্লা উপস্থিত করে আমার খাওয়ার শক্তিটা হাতেকলমে পরীক্ষা করেন তবে সেইটেই অনেক বিচক্ষণতর পন্থা হবে না কি?

বাংলাদেশে যে কয়েকজন প্রকৃতই খ্যাতনামা লেখক আছেন তাঁরা কেউ চালের দাম বর্তমানে কত এ খবরটা রাখেন কিনা সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। পূজার মরসুম হল বাংলা সাহিত্যের বাজারের সবচেয়ে বড় মরসুম। সারা বছর ধরে সর্বমোট যে সাহিত্য-ফসল উৎপন্ন হয় তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই মা দুর্গার আবির্ভাব উপলক্ষে রচিত হয়ে থাকে। মা দুর্গা মাত্র তিনদিন বাপের বাড়িতে থাকেন; এবং এ তিনদিন মাইকের আওয়াজ দেখতে দেখতে এবং আলোকসজ্জা শুন[illegible] শুনতেই কেটে যায়। সুতরাং লেখকদের বহু আয়া[illegible] রচনা যে তাঁর পড়া হয় না এ কথা বলাই বাহুল্য। [illegible] শ্রদ্ধা নিবেদনে বাঙালী লেখকদের কার্পণ্য নেই।

পূজার বাজারের অজস্র নিরলস কলম নামক কোদা[illegible] চালানোর পর সব লেখক এখন ইজি-চেয়ারে শুয়ে [illegible] বিশ্রাম করছেন আর রেলওয়ে টাইম-টেবলের পা[illegible] ওলটাচ্ছেন। মুসৌরী, নৈনিতাল, ডাল হ্রদ, আলে[illegible] জান্দ্রিয়া, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি জায়গাগুলির কো[illegible] একটিকে নির্বাচিত করে তাঁরা শীঘ্রই পূজাবকাশ যা[illegible] করতে বেরিয়ে পড়বেন। চালের দামের খবর শোনা[illegible] মত মনোভাব কি এই সময়ে [illegible]রও থাকতে পারে?

খ্যাতনামা লেখকেরা পূজার মরসুমে সাধারণতঃ [illegible] থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করে থাকেন। [illegible] আমি নিছক অনুমান করে বলছি, কাজেই কোন লেখকে[illegible] আয় যদি এই সীমা অতিক্রম করে যায় তবে আশা ক[illegible] আমার অজ্ঞতাজনিত অপরাধের জন্য তিনি আমার গর্দা[illegible] নেবেন না। বলা বাহুল্য, এই ষোল আনা টা[illegible] সম্পাদকদের হাত থেকে আসে না। সম্পাদকদের পিছ[illegible] পিছনে আসেন প্রকাশকরা, এবং তাঁদের পিছনে পিছ[illegible] চিত্র-প্রযোজকরা।

সারা বছরের মধ্যে এক পূজোর সময়টাতেই বাঙা[illegible] লেখকেরা মনে করেন যে তাঁরা আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি[illegible] মেঘ-মেদুর আকাশে যখন বর্ষার ঘন-ঘটা তখন [illegible] কাঠুরিয়ার একদিনের বাদশাগিরি লাভের মত বাঙা[illegible] লেখকেরা তাঁদের এক ঋতু-কাল স্থায়ী মসনদে আরো[illegible] করেন। ঠিক যে কারণে সদ্য-দুগ্ধবতী গাভীর প্র[illegible] গৃহস্থের গো-ভক্তি হঠাৎ বেড়ে যায়, সেই কারণেই এ[illegible] কি লেখক-পত্নীরাও এই সময়টা লেখকদের প্রতি স[illegible] ব্যবহার আরম্ভ করেন। এই সময়ে এমন কি অসম[illegible] এক কাপ চা চাইলেও গৃহিণীরা রেগে আগুন হ[illegible] ওঠেন না।

এই সময়ে সম্পাদকেরা লেখকদের যে ভাবে খুঁজে[illegible] আরম্ভ করেন এ ভাবে খুঁজলে পরশপাথরও মিলে যে[illegible] পারে। বাড়িতে দেখা করতে গেলে গৃহিণীরা সাধারণ[illegible] বাড়ির গভীর অভ্যন্তরে লেখকদের হাতে একটি কা[illegible]

গুঁজে দিয়ে টেবিলের সামনে বসিয়ে রেখে বাইরে এসে মিষ্ট মধু-স্রাবী গলায় জানিয়ে দেন : 'উনি তো বাড়িতে নেই। কোথায় গিয়েছেন আড্ডা দিতে। আড্ডা আমার সবচেয়ে বড় সতীন জানেন না ?' অতএব সম্পাদককে অন্য পন্থা গ্রহণ করতে হয়। লেখকদের পিছনে তিনি ফেউ মোতায়েন করেন ; এবং ফেউয়ের মারফত হয়তো খবর পান যে লেখক অমুক সময় তাঁর শ্বশুর বা শ্যালক বা বিবাহিতা শ্যালিকার বাড়ি যাচ্ছেন। তক্ষুনি তিনি নিজের গাড়িখানা বার করে রুমালে একটু বেশী করে এসেন্স ঢেলে নিয়ে লেখককে নিধন করতে বেরিয়ে পড়েন। শ্যালক-শ্যালিকা পরিবৃত লেখক মুরগির রোস্টে কামড় দিতে দিতে হঠাৎ সম্পাদককে দেখতে পেয়ে বরবধূর মতই সলজ্জ হাসি হাসেন এবং অকাতরে লেখার প্রতিশ্রুতি দেন।

কত রকম ভাবে যে সম্পাদকেরা লেখকদের হস্তগত করেন, তার বিবরণ ডিটেকটিভ উপন্যাসের চেয়েও বেশী রোমাঞ্চকর। কোন লেখক হয়তো কোন সম্পাদককে অকপটে জানিয়ে দিলেন যে তিনি এই কটি উপন্যাস এবং এই কটি ছোট গল্প লেখার প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই দিয়ে বসে আছেন। এর বেশী আর রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। সম্পাদকও সঙ্গে সঙ্গে হয়তো জানাবেন যে, তা ছাড়া অমন চাপ দিয়ে লেখালে লেখা ভাল হয় না। তাঁর পত্রিকার একটা প্রিন্সিপল্ আছে : নাম-করা লেখকদের লেখা নয়, ভাল লেখারই তাঁরা পক্ষপাতী। প্রথম সাক্ষাৎকার এই ভাবে শেষ হওয়ার পর সম্পাদক খবর নিয়ে জানতে পারেন কোন্ পত্রিকার জন্য লেখকটি এবারের সবচেয়ে বড় উপন্যাসটি লিখছেন এবং সেটা সরবরাহের তারিখ কত। নির্দিষ্ট তারিখে খুব সকালে তিনি লেখকের কাছে হাজির হন এবং বিনা ভূমিকায় বলেন যে লেখাটির জন্য তিনি পাঁচশো টাকা বেশী দিতে রাজী আছেন এবং চেক-বই তাঁর সঙ্গেই আছে। লেখক আর কী করতে পারেন ! তিনি অবলা দুর্বলা (আ-কার-গুলো ছাপার ভুল নয়) লেখক মাত্র, আর সম্পাদক একজন জাঁদরেল পুরুষ-সিংহ। নীতির উচ্চ মান তিনি কী করে বজায় রাখবেন ? সম্পাদককে এই লেখাটি দিয়ে দেওয়ার ফলে লেখককে অবশ্য রক্তমাংসের শরীরের সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করতে হয়। কারণ পূর্ববর্তী পত্রিকার কাছে প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য তাঁকে আরও একটি বড় উপন্যাস লেখায় হাত দিতে হয়।

সম্পাদকেরা আরও নানারকম পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। শুনেছি একজন সম্পাদক কোনক্রমেই জনৈক চতুর লেখককে আয়ত্তে আনতে না পেরে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম-চর্চা শুরু করে দিয়েছিলেন। জানেন নিশ্চয়ই একজন অভিজ্ঞ পুরুষ যে কোন পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম জমিয়ে তুলতে পারেন। দরকার শুধু তিনটি জিনিসের—শাড়ি, সিনেমা এবং স্যাণ্ডুইচ। কাজেই লেখককে তখন বাধ্য হয়ে স্ত্রীর মুক্তি-পণ হিসাবে একটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাস লিখে দিতে হয়। অবশ্য এই ঘটনার জন্য স্ত্রী পরে একটুও লজ্জিতবোধ করেন না। তিনি সোজাসুজি ঘোষণা করেন যে অবৈধ প্রণয়ে তাঁর স্বাভাবিক অধিকার আছে : কারণ যদিও তিনি কখনও স্বামীর ছাইভস্ম লেখা পড়েন না, কিন্তু তিনি জানেন স্বামীর ঝুড়ি ঝুড়ি লেখার একটাই মাত্র বিষয়বস্তু—অবৈধ প্রণয়।

আর একজন সম্পাদক তাঁর প্রিয় লেখককে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে তাঁকে রাস্তায় পেয়ে গ্রেপ্তার করেন। তিনি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে নিজের একটি ঘরে কয়েদ করে দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। তিনদিন ধরে চব্বিশ ঘণ্টা লিখে লিখে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস শেষ করে তবে লেখকটি অব্যাহতি লাভ করেন। অবশ্য সম্পাদক তাঁকে আগেই ভরসা দিয়েছিলেন : 'যা তোমার কলমে আসবে তাই তুমি লিখে যাও। তোমার নামটা শুধু আমার দরকার। তুমি মনের আনন্দে যত খুশি বাজে লেখা আমার জন্য লিখতে পার।'

দেড় মাসের মধ্যে একজন নাম-করা বাঙালী লেখক পাঁচটি উপন্যাস এবং পঁচিশটি গল্প লিখে ফেলেন। মোটামুটি হিসাবে ছাপার অক্ষরের সাড়ে সাতশো পাতা। বাঙালী লেখকদের লেখার এই অদ্ভুত স্পীডের কথা শুনে একজন জার্মান নৃতত্ত্ববিদ্ কৌতূহলী হয়ে এ দেশে এসেছিলেন। বাঙালী লেখকদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে তিনি জানিয়েছেন যে দৃষ্টির অন্তরালে প্রকৃতির

কারসাজিতে এ দেশে মানুষ নামক স্পিসিজের একটি সাব-স্পিসিজ জন্মলাভ করেছে। ইভলিউশনের নিয়ম অনুযায়ী এরাই হয়তো কোনকালে মাদার স্পিসিজকে হটিয়ে দিয়ে পৃথিবীর মালিক হয়ে বসবে।

কাজেই এই সম্পাদক-তাড়িত মানবজাতির নতুন সাব-স্পিসিজের সভ্যদের পক্ষে চালের মূল্য বৃদ্ধি বা বাজার থেকে চিনি উধাও হওয়ার মত তুচ্ছ সামান্য অকিঞ্চিৎকর খবরে কান দেওয়ার অবকাশ কোথায়?

সম্পাদকদের পালা চুকলে প্রকাশকদের ছুটোছুটি শুরু হয়। এবার আর একটু মোটা অঙ্কের টাকার লেনদেনের ব্যাপার। লেখকেরা নতুন সাব-স্পিসিজই হোন আর যাই হোন, বড় বড় প্রকাশকেরা গভীর সমুদ্রের জীব, তাঁদের কাছে অত ট্যাঁ ফুঁ চলে না। লেখকের বাড়িতে তাঁরা কখনই পদধূলি দেন না, লেখকরাই সাঁতরাতে সাঁতরাতে এসে চুম্বকের দ্বারা আকর্ষিত লোহার টুকরোর মতই তাঁদের বিরাট উন্মুক্ত মুখ-গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যান। পুজোর ঢাক যখন বাজি বাজি করবে, তখন হয়তো বড় প্রকাশক বড় লেখকের বাড়িতে ফেউ পাঠাবেন। ফেউটি এসে এক হাজার টাকার একটি চেক পায়ের উপর রেখে লেখককে প্রণাম করবেন। লেখক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবেন: 'কী ব্যাপার হে? যতদূর মনে পড়ছে আমার তো কোন টাকা পাওনা নেই।' ফেউটি বিনীত হেসে বলবে: 'দেনা-পাওনার ব্যাপার নয় স্যার্। পুজোর প্রণামী।' প্রণামী কেন তা লেখক বুঝতে পারেন এবং শিকলে বাঁধা কুকুর যেমন গলায় টান পড়লেই নড়েচড়ে ওঠে তেমনি করে বিকেল আসতে আসতেই প্রকাশকের অফিসের দিকে ছোটেন।

তরুণ গরিব প্রকাশকদের কথা অবশ্য আলাদা। তাঁরা লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি না পেয়ে লেখকের স্ত্রীর কাছে যাতায়াত করেন দু-চার মাস ধরে। সঙ্গে বাচ্চাদের জন্য লজেন্স এবং বাচ্চাদের মার জন্য পাঁপড় বা আচাড়ের প্যাকেট নিতে ভোলেন না। চার-ছ মাস পরে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি মেলে।

যদি কখনও কোন লেখক প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা অগ্রিম নিয়ে ডুব মারেন এবং প্রতিশ্রুত পঁচিশ ফর্মার পাণ্ডুলিপির বদলে আড়াই বছর পরে বার ফর্মার একটি পাণ্ডুলিপি তুলে ধরে ঠোঁটজোড়াকে টেনে সাড়ে তি[illegible] ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা করে হাসেন তবে আমি একটু দুঃখিত হই না। গান্ধী-নীতি বিঘ্নিত হল বলেও শঙ্কি[illegible] হই না। কারণ আমি জানি পৃথিবীতে যে-সব ক্ষে[illegible] মানুষ মানুষকে সবচেয়ে বেশী অপমান করে, তরু[illegible] লেখকদের প্রতি প্রকাশকের অপমান সেইসব ঘটনা সমতুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এইসব বাঙাল[illegible] লেখক বড় হওয়ার পর তাঁদেরই অতীত জীবনে অপমান অবহেলা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে ইতিহাসটা ভুলে যান। যৌনবিকৃতি আর মানসি[illegible] বিকৃতি আর প্যাচপেচে ভাবাবেগ-সর্বস্ব ধর্ম নিয়ে তাঁ[illegible] হাজার হাজার গল্প লেখেন। দেশে যে লক্ষ লক্ষ অত্যাচার অবিচারের মূক ঘটনা তাঁদের কলমে ভা[illegible] লাভের জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করছে তা তাঁরা ভুলে যান।

প্রকাশকদের পর আসবেন চিত্র-প্রযোজকরা। তাঁদের পদ্ধতি আবার আর একরকমের। প্রযোজক খবর রাখেন যে তাঁর লক্ষ্যীভূত লেখক পুজোবকাশ যাপন করতে কোথায় যাচ্ছেন। কাশ্মীরে, না কাঠমাণ্ডুতে না কান্দাহারে। লেখক কোন্ হোটেলে উঠছেন সে খবরও যোগাড় করেন। তারপর সেই হোটেলে বা কাছাকাছি আর কোন হোটেলে তিনি স্বয়ং যথাসময়ে গিয়ে হাজির হন। এইভাবে চেষ্টাকৃত সাক্ষাৎকার হঠাৎ ঘটে গিয়েছে বলে ভান করে তিনি প্রচুর আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশ করেন। আনন্দটাকে সেলিব্রেট করার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ দু-চার পেগ হুইস্কি বা রামের অর্ডার দিয়ে ফেলেন। মদের টেবিলে বসে লেখকের গল্পের চিত্রস্বত্ব যথারীতি দলিল দস্তখত ইত্যাদির সাহায্যে বিক্রি হয়ে যায়। প্রযোজক যে অত দূর দেশে গিয়ে লেখককে পাকড়াও করেন তার একটু কারণ আছে। ওখানে গিয়ে প্রযোজককে অন্যান্য প্রযোজকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয় না। অতদূর থেকে লেখকের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয় যে আর কোন প্রযোজক গল্পটার জন্য আরও বেশী টাকা দিতে রাজী আছেন কি না।

এইখানেই শেষ নয়। এরপর আসবে পুরস্কার। আকাদমী পুরস্কার থেকে শুরু করে আনন্দবাজার পত্রিকা

পুরস্কার পর্যন্ত বাংলা দেশে প্রায় ডজনখানেক পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। পুরস্কার-দাতারা টোপ ফেলে চুপচাপ বসে থাকেন। আর লেখক-মৎস্যরা জগৎসংসার ভুলে গিয়ে সেই টোপের চারপাশে চরকির মত ঘুরতে থাকেন। বাংলাদেশের বিচারকদের একটা মস্ত গুণ এই যে তাঁরা খুব নরম মনের অধিকারী বলে সব সময় কৃপাপ্রার্থীদের কৃপা করেন। যে লেখক যত বেশী বিচারকদের বাড়ি যাতায়াত করতে পারবেন সে লেখকের তত বেশী পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অক্ষম ও বাজে রচনাই যে পুরস্কার লাভ করে তা দেখে উপরোক্ত অনুমান ছাড়া আর কিছু অনুমান করা যায় না।

কাজেই বাংলাদেশের লেখকেরা ক্রমাগত ছোটা-ছুটির মধ্যে আছেন। হয় তাঁদের পেছনে লোকেরা ছুটছে, নয়তো তাঁরা লোকেদের পেছনে ছুটছেন। বছরের মধ্যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই তাঁরা কলুর বলদের মতই গোলাকার রৌপ্যচক্রের চারপাশে ঘুরে মরছেন। কখন তাঁরা পাঁচ-রকমের সাহিত্য পড়বেন, বা সমাজের নানা স্তরের মানুষদের সঙ্গে মিশবেন এবং দেশ বা সমাজ সম্পর্কে খবরাখবর রাখবেন? চালের দাম বাড়ল কি কমল তা নিয়ে লেখক-পত্নীরা কিছু মাথা ঘামালেও ঘামাতে পারেন, কিন্তু লেখকেরা সে কথা নিয়ে কখন ভাববেন?

যদিও খুব মুষ্টিমেয় লেখকই কিছু কিছু টাকা পাচ্ছেন, সে সেটাও খুব আনন্দের কথা। আমাদের সমাজে অনেক রকমের অনেক লোক লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে; তাদের সঙ্গে তুলনায় লেখকেরা কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে যা রোজগার করছেন তাকে নিশ্চয়ই সংভাবে রোজগার বলে গণ্য করতে পারা যায়। এ কথা ঠিক, যখন দেখি অক্ষম লেখকেরাই সাধারণতঃ বেশী রোজ-গার করেন, যে লেখক যত অক্ষম সে লেখক তত বেশী রোজগার করেন, তখন মনে একটু ঈর্ষা বোধ হয় বইকি! কিন্তু আমি সব সময় চেষ্টা করি ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে কোন কিছু না লিখতে। অক্ষম লেখকেরা পয়সা রোজগার করছেন এর মধ্যেও ক্ষোভের কিছু নেই। কিন্তু ঘটনাটা পরিতাপের দুটি কারণে। প্রথমতঃ তাঁরা তরুণ লেখকদের উদাহরণস্থল হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের মধ্যে যেটুকু প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল তা লোপ পাচ্ছে। লেখকেরা পয়সা পাচ্ছেন এটা দুঃখের বিষয় নয়; দুঃখের বিষয় এই যে সামান্য পয়সার মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বেসামাল হয়ে পড়ছেন। তাঁরা খুব অনায়াসে মতলববাজ প্রকাশক ও পত্রিকার মালিকদের কাছে নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

কাজেই যে প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেই প্রশ্নে ফিরে আসি। সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে সাম্প্রতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট কতটুকু প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব? উপরে আমি খ্যাতনামা লেখকদের জীবন-লিপির যে সামান্য পরিচয় দিয়েছি তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁদের কোন রচনায় সমাজ-বাস্তবের কোন প্রতিফলন ঘটবে না। তাঁরা শুধু অবসর-বিনোদনের সাহিত্যই রচনা করবেন, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। বহুকাল আগে থেকেই তাঁরা প্রকৃতঅর্থে জীবন যাপন করা ছেড়ে দিয়েছেন; তাঁরা সমাজ থেকে সরে দাঁড়িয়ে কেবল আত্মস্বার্থ ছাড়া আর কোন বিষয় নিয়ে চিন্তার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছেন। মামুলী গতানুগতিক লেখার জন্যই যখন যথেষ্ট পয়সা পাওয়া যাচ্ছে, তখন কী দরকার অনাবশ্যক পরিশ্রম করে? কিন্তু অভিজ্ঞতার সীমা সম্প্রসারিত না হলে লেখক কী করে প্রকৃত নতুন উন্নত ধরনের সাহিত্য রচনা করবেন? অভিজ্ঞতাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন তা লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিত্তি-ভূমি ছাড়া কী করে প্রকৃত সাহিত্য রচিত হবে? লেখকের জীবন-যন্ত্রণাই সাহিত্য-কর্মের ভিতরে আনন্দে রূপান্তরিত হয়, জীবনের কুৎসিতই সাহিত্যের সৌন্দর্য রচনার উপাদান।

আমি এমন কথা বলছি না যে গত ৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় চাল কাপড় প্রভৃতি নিয়ে যে ধরনের সাহিত্য রচিত হয়েছিল, এখন আবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক। (যদিও সে জাতের দু-চারটে গল্প লেখা হলেই বা আপত্তির কী আছে!) এমন লেখক থাকতে পারেন যিনি বাস্তববাদী বা প্রাকৃতবাদী নন। কিন্তু বর্তমানের অর্থনৈতিক সংকটের ঘটনাগুলি অবশ্যই তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে সঞ্চিত থাকা প্রয়োজন। তা যদি থাকে, এবং তিনি যদি তাঁর সমগ্র অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যকর্মে নিয়োগ

নিন্দুকের প্রতিবেদন

প্রীতিভাজনেষু,

আজ ১৯ই অক্টোবর সকাল সওয়া দশটার সময় কেরল রাজ্যের অপরূপ রাজধানী ত্রিবান্দ্রম থেকে আপনাকে চিঠি লিখতে বসে অকস্মাৎ সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ নগণ্য বস্তুটি সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন অবজ্ঞায় আমার মন উদার হয়ে গেছে, যাকে আপনারা বলেন 'সাহিত্য'। কাল যখন ইতিহাসের চাইতে পুরাতন প্রবীণতায় গম্ভীর সহ্যাদ্রির কোল বেয়ে আঁকা-বাঁকা সর্পিল গতিতে চলেছিল আমার ট্রেন, কোশাবধি দীর্ঘ তার অন্ধকার গুহায় ঢুকে মৃত্যুর মত নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বিলীন হয়েছিল

করেন, তবে তিনি যা-ই লিখবেন তার মধ্যেই যন্ত্রণাবোধ হিসাবে এই অভিজ্ঞতা তার স্বাক্ষর রেখে যাবে। সে সাহিত্যের আবেদন অনেক সুদূরপ্রসারী হবে।

সাহিত্যে বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন প্রত্যক্ষও হতে পারে, পরোক্ষও হতে পারে। এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে বর্তমানের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই; অনেক আগের যুগের একটি মিথকে ভিত্তি করে কাব্যটি রচিত। তবুও এ-যুগের যন্ত্রণা-জর্জর অভিজ্ঞতাই যে এ কাব্যের প্রেরণা তা কাউকে বলে দিতে হয় না। আবার স্টেইনবেকের উপন্যাসের আপেল-তুলুনীদের জীবন-চিত্র বাস্তব থেকে সংগৃহীত; তাকে সমাজজীবনের নির্ভরযোগ্য দলিল বলে গণ্য করা চলে। এই উভয় জাতের সাহিত্যই সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছে; কারণ তারা বাস্তব-সত্যের উপলব্ধি-জনিত গভীর আবেগ সঞ্চার করে।

যে সাহিত্যের মধ্যে চিরকালের আবেদন আছে, সে সাহিত্যের মধ্যে সমকালের বাস্তবতা আছে। এমন কি রূপ-কথার মধ্যেও রূপ-কথা রচনাকালের বাস্তবতা আছে। যে-কোন রচনাই নিজের কালের কাছে সত্য হয়েই সর্বকালের কাছে সত্য হয়। আমাদের অধিকাংশ নাম-করা লেখকেরাই আজকাল যা লিখছেন তাকে রূপ-কথা নাম দেওয়া চলে। তবে তার মধ্যে এ-কালের বাস্তবের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপান্তরিত চিত্র নেই।

মাঝে মাঝে, আর মাঝে-মাঝে পাহাড়তলির বৈচিত্রা ক্ষেতের কিনার ছুঁয়ে নাম-না-জানা সূর্যাস্ত রঙে বুনো ফুলের অনিঃশেষ প্রসার অনুভব করে নারকেল কাননে সবুজ প্রশান্তির দেশ কেরলের দিকে ছু আসছিল আমার ট্রেন, তখন—ধিক আমাকে, অ কাগজের ওপর ঘাড় গুঁজে কলমের দাসত্ব করতে কর নিজেকে মিথ্যা সান্ত্বনায়, মিথ্যা গর্বে, মিথ্যা তৃপ্তি প্রতারিত করছিলাম, বলছিলাম: আমি সাহিত্য রচন করছি।

আজ সারাদিন নিশ্ছিদ্র কর্মের লোহার বাসরঘ

তা নিছক পুনরাবৃত্তি, নতুন রঙে সাজিয়ে বিগতযৌব বারবনিতাকে হাজির করার চেষ্টা। আমরা মাইয়োপিয় রুগী বলে তার মুখের ছোট ছোট ভাঁজগুলো দেখ পাই না। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়ি না লিখলে নতুন জিনিস লেখা যায় না। কারণ অ পদ্ধতিটা হচ্ছে নকল করার পদ্ধতি, এর থেকে ওর থে কিছু কিছু মেরে দিয়ে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পদ্ধ কিন্তু যে ছাত্র নকল করে তার লেখা পড়েই অ মাস্টারমশাই তাকে চিনতে পারেন।

আমি অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। অভিজ্ঞতা আ খবর এক নয়। আধুনিক লেখকেরা এ যুগের দু-চার খবর রাখেন বইকি; এমন কি চালের দাম যে আটচা টাকা হয়েছে এ খবর কোন নামকরা লেখকের কা গিয়ে পৌঁছে থাকলে সেটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় সন্দে নেই, কিন্তু তাকেও আমি অসম্ভব ঘটনা বলব ন কাজেই এ কালের অনেক খবর আধুনিক লেখকদে অনেক রচনায় থাকে বইকি। কিন্তু তা অভিজ্ঞতা ন খবর যখন মানুষ সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে তার সমস্ত তাৎ সমেত অনুভব করে, যখন তা জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞত সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি অখণ্ড ভাববস্তুতে পরিণত হ তখনই তাকে বলব অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার পরি এবারের শারদীয় সাহিত্যে পাব না বলেই আ করছি।

—

কাটিয়েছি আমি (কেন না সওয়া দশটার সময় শুরুই করেছিলাম শুধু, প্রথম চল্লিশটি শব্দ লেখার পরেই কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল, দুদিনের জন্য বাঁধা ক্ষণিকের বাসায় ফিরেছি এখন—ঘড়িতে রাত সাড়ে এগার), আবার কাল সকাল নটায় রওনা হব আরবসমুদ্র-তটে আলেপ্পি বন্দর লক্ষ্য করে, তারপর সন্ধ্যায় পৌঁছব মাত্তেনচেরির আড়াই হাজার বছরের পুরনো ইহুদি উপনিবেশে। পরশু প্রত্যূষে আমার ঠিকানা কোচিন বন্দর, সেখান থেকে দুপুর বেলা দাক্ষিণাত্য উপত্যকার বুক চিরে আমার রেলগাড়ি ছুটবে মাদ্রাজের দিকে—সহ্যাদ্রি আর মলয়াদ্রির গিরিবর্ত্ম দিয়ে, সুন্দরী উটির কটাক্ষে পনের মিনিট মাত্র উচাটন হবে সে। এর আগেই মাদুরাইয়ে ছুঁয়ে এসেছি মীণাক্ষী দেবীর পদপ্রান্ত, এক ঝলক টেনে নিয়েছি কোদাইকানালের চিরবসন্তের নিশ্বাস, তিরুচিরাপিল্লি, ভেল্লুপুরম আর আরও কত বিচিত্র জনপদ রেলস্টেশনের হলদে সাইনবোর্ড হয়ে আঁকা হয়েছে আমার মরামাছের চোখের মত ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে। কন্যাকুমারীর অনন্ত অন্তরীপকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে রেখে চৈত্রের ঘূর্ণিবায়ু আমি উড়ে চলেছি, দূরে চলেছি, ফিরে চলেছি সেই কলকাতায়—নর্দমায় মশা আর সাময়িক পত্রে সাহিত্য যেখানে প্রতিদিন লক্ষাধিক বংশবৃদ্ধিতে আমাদের গুঞ্জরিত কণ্টকিত শিহরিত করে তোলে।

কণ্ডাক্টেড টুরও নয়, ততোধিক রোমাঞ্চহীন সরকারী কর্মচারীর অফিসিয়্যাল ভ্রমণ। সওয়া তিন হাজার মাইল। সময় দশদিন। আমাকে ঈর্ষা করবেন না?

যে ঈশ্বর হয়তো নেই সেই ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ঈর্ষা করুন। সরকারী অর্থের নিশ্চিন্ত আরামে প্রথম শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করে আমি সওয়া তিন হাজার মাইল পথ—কত ইতিহাসবিশ্রুত কত ইতিহাস-বিস্মৃত পুণ্যভূমি অতিক্রম করে চলেছি। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ঈর্ষা করুন, যাতে একটু আনন্দ পাই। আপনাদের ঈর্ষা ছাড়া এ ভ্রমণে আর কোন আনন্দ খুঁজে পাব না যে।

প্রীতিভাজনেষু, আমার এই ভ্রমণই তো হুবহু সাহিত্যের মত। তৃপ্তি নেই, প্রাণ নেই, বিশ্রাম নেই, শুধু অভ্যস্ত পথের অতিক্রমণ। চোখ চেয়ে দেখা নেই, কান পেতে শোনা নেই, মন দিয়ে জানা নেই, শুধু সময় এবং দূরত্বের নিষ্ফল ক্লান্তি আছে। আমাকে ঈর্ষা করুন, ঈশ্বরের দোহাই, কেন না আমি সাহিত্যিক, কেন না আমি পর্যটক।

অথবা আমাকে করুণা করুন ভাই। কেন না আমি সাহিত্যিক, আমি পর্যটক। কাগজের গায়ে কলম চালিয়ে, লৌহবর্ত্মের বুকে বাষ্পশকট চালিয়ে আমি অর্থহীন শ্রুতিকটু অসুন্দর ঘর্ঘরধ্বনি তুলেছি। আমি সংখ্যাতত্ত্বে প্রলুব্ধ—সওয়া তিন সহস্র মাইল পর্যটন অথবা সওয়া তিন সহস্র 'সাহিত্য'-রচনার কীর্তিতে আমি গর্বান্ধ, এত অন্ধ যে ইতিহাসের চাইতে প্রবীণ সহ্যাদ্রির বুকে অকারণে ফুটে ওঠা সূর্যাস্ত রঙের বুনো-ফুলের অযুত যোজন মহোৎসব দেখতে পাই নি আমি।

তখন আমি সাহিত্য-রচনা করছিলাম। আপনার পত্রিকার পূজাসংখ্যায় প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই সূর্যাস্তের রঙ ঢাকা মূঢ়তায় স্ফীতকায় সাহিত্যের। এবং, প্রীতিভাজনেষু, সে-বাবদে পঞ্চনটা ফল আগামও দিয়েছিলেন আপনি।

সেই সঙ্গে, মনে পড়বে কি ভাই, একটি লাল গোলাপও দিয়েছিলেন আপনি? তার বোঁটায় কাঁটা ছিল, পাপড়িতে আবেগ?

সেই গোলাপের মূল্যে এই অকিঞ্চিৎকর পত্র হোক অনুতপ্ত নিন্দুকের শারদীয় প্রতিবেদন!

নারায়ণ দাশশর্মা

সংবাদ-সাহিত্য

কৈফিয়ত

আমাদের গ্রাহক পাঠক পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি একটি নিবেদন আছে—তাহা পেশ করিতেছি। ঠিক নিবেদন নহে, ইহাকে কৈফিয়তই বলা উচিত। শতকরা নিরানব্বইখানা কাগজের মত আমরাও যখন পূজা সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি তখন উপন্যাসকে তো বটেই, ছোট গল্পকেও প্রায় বর্জন করিলাম কেন? অন্যান্যদের মত দুই হইতে সাতটি 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' এবং তৎসহ এককুড়ি দেড়কুড়ি ছোট বড় গল্প দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? আমরা কি উপন্যাস-গল্পকে বাদ দিয়াই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য প্রচার করিতে চাহিতেছি?

লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি তাহা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। পূজা সংখ্যা সম্পর্কে যখনই মস্তিষ্কে চিন্তার উদয় হইল তৎক্ষণাৎ একটি 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' দেওয়াও স্থির করিয়া ফেলিলাম। অত:পর উপন্যাসের অর্ডার দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই বাংলাদেশের পয়লা সারির একজন পেশাদার উপন্যাস লিখিয়ের নিকট গেলাম। প্রস্তাব শুনিয়া তিনি দর যাহা বলিলেন তাহাতে আমাদের চক্ষুস্থির। তাঁহার বক্তব্য—তিনি স্বয়ং উপন্যাসটি লিখিলে মজুরী পড়িবে দুই হাজার বা তদূর্ধ্বে। পুত্র বা পৌত্র কেহ লিখিয়া দিলে দেড় হাজারের মধ্যেই কুলাইয়া যাইবে। বক্তব্যের শেষে খানিকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিলেন, অত টাকা দিতে রাজী আছ তো?

অরিজিন্যাল সম্পূর্ণ উপন্যাসের চুক্তি দুই হাজারেই নির্ধারিত করিয়া সেদিন বিদায় লইলাম। পরদিন অগ্রিম বায়নার টাকা লইয়া গিয়া হতাশ হইতে হইল। ভয়সা ঘিয়ের বিখ্যাত কারবারী নাড়ুবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র একটি পূজা সংখ্যা প্রকাশে উদ্যোগী ছিলেন জানিতাম—তিনিই পনেরো মিনিট আগে দুই হাজারের উপর আরও আড়াই শত যোগ করিয়া সম্পূর্ণ টাকাটাই বায়না করিয়া গিয়াছেন। এইটি লেখক মহাশয়ের পঞ্চম উপন্যাসের চুক্তি। নতুন অর্ডার লওয়ার আর ইচ্ছা তাঁহার নাই।

দুসরা জনের কাছে গেলাম। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া দেড় হাজারে রাজী হইলেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ উপন্যাসটি লেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না জানাইয়া দিলেন। আরম্ভের দশ পৃষ্ঠা তিনি লিখিবেন, তাহার পর বাকিটা যত বড় বা যত [illegible] ইচ্ছামত আমাদেরই লিখিয়া দিতে হইবে। শে[illegible] চার-পাঁচ পৃষ্ঠাও তিনি লিখিবেন—কারণ ঈশ্বর এ[illegible] [illegible]জনীতির কথা ঢুকাইয়া রচনাটিকে জনপ্রিয় করিয়া তোলাই তাঁহার ইচ্ছা।

তৃতীয় নভেল লেখক বলিলেন, জহাঙ্গীর বাদশাহ ও কুইন এলিজাবেথের মধ্যে যে নিবিড় প্রণয় জন্মিয়াছিল তাহা লইয়া একখানি মধুর উপন্যাস লিখিয়া দিতে পারি। বারো শত পচাত্তর টাকা খরচ পড়িবে।

চমৎকৃত হইয়া সরিয়া আসিলাম।

সুতরাং সম্পূর্ণ উপন্যাস বর্জন করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। ফরমায়েশী উপন্যাসের চাপে ছোটগল্প প্রায় মরিতে বসিয়াছে। লেখকেরা আর গল্প লিখিতে চাহেন না, মুমূর্ষু ছোটগল্পের বাজারে এখন আকাল চলিতেছে অতএব গল্পের সংখ্যাও কম হইল।

তখন ভাবিয়া স্থির করিলাম নাটক এবং জীবনী—যে সব ধরনের লেখা অন্য কেহ ছাপিতে চায় না, আমরা ছাপিব। 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' পড়িতে পড়িতে পাঠকের ক্লান্তি আসিলে এই নাটক এবং জীবনী পড়িতে পারেন কিছুটা আরাম হইবে। বলা বাহুল্য, জওহরলাল নেহরু

জীবনকথা এই সময়ে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে নিশ্চয়ই।

নেহরুর নর্ম ও কর্মজীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটা আলোচনা করিতে বসিয়া শ্রীনারায়ণ দাশশর্মা কিঞ্চিৎ বিপাকে পড়িয়াছেন, আমাদেরও ফেলিয়াছেন। সম্পূর্ণ রচনাটি কত বড় হওয়া সম্ভব পূর্বাহ্ণে তাহার সঠিক আন্দাজ করিতে না পারায় এই পূজা সংখ্যায় আমরা বাধ্য হইয়া প্রথম পর্ব মাত্র প্রকাশ করিলাম। পরে আরও কয়েকটি কিস্তিতে রচনাটির পরবর্তী অংশ প্রকাশিত হইবে। বাকি অংশ কোন্ সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে তাহা যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত করিব।

পূজা সংখ্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ কৈফিয়ত দিলাম। আমাদের বঞ্চিত পাঠকগণের অন্যবিধ তুষ্টিসাধনের জন্য উৎকৃষ্ট গল্প-উপন্যাসের সন্ধানে রহিলাম। সুযোগ পাইলেই তাহা পরিবেশন করিব। এখন পাঠকগণ আমাদের পূজা সংখ্যা সম্পর্কে সত্যকার মতামত জানাইলে কৃতার্থ হইতে পারি।

* * *

বাংলাদেশের সাধারণ পাঠক এবং শনিবারের চিঠির পাঠকের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের ভিতরে অন্নবস্ত্রের নিদারুণ অভাব, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং বাহিরে পররাজ্যলোভী শত্রু কর্তৃক আক্রমণের আসন্ন বিপদের মধ্যে সাধারণ পাঠকেরা নিরুদ্বেগে চলতি পূজা সংখ্যাগুলির পাঁচ-সাতখানি ছেলেভুলানো সম্পূর্ণ উপন্যাসের আশ্রয়ে তন্ময় হইয়া আছেন দেখিয়া আমাদেরই তাক লাগিয়া যাইতেছে। কিন্তু আসলে ইহা কামুফ্লেজ মাত্র।

সকলেই জানেন যে নটনটীদের সচিত্র জীবনী ও কেচ্ছাকাহিনী অধিকাংশ পত্রিকার ব্যবসায়-সাফল্যের মূল কারণ। পূজা সংখ্যায় ওইসব পদার্থ বহুগুণে বর্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং পাঠক সম্পূর্ণ উপন্যাসের আড়ালে মুখ লুকাইয়া তাহা গিলিতেছে। ইতিপূর্বে ওগুলি আনাড়ী হাতেই রচিত হইত। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত লেখকেরাও তারকাদের জীবনী রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন। ফলে ওইসকল রচনা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া সাধারণ পাঠকের নিকট মহৎ সাহিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এজন্য রসপিপাসু পাঠককে দায়ী করিয়াই বা ফল কী!

লেখকদেরও দোষ দিব না। তাঁহারা এই সময়টায় দক্ষ পরামাণিকের মত ক্ষুর-কাঁচি হাতে বসিয়া থাকেন—যে কয়টা মাথা বানাইতে পারেন তাহাই লাভ। সুতরাং ক্ষুরঘর্ষণ ও সাহিত্যধর্ষণ একযোগে চলিয়াছে।

সবার উপরে আছে আগে পূজা সংখ্যা প্রকাশ করার একটা হাস্যকর প্রতিযোগিতা। একমাস দেড়মাস আগেই কাহারও কাহারও পূজা সংখ্যা স্টলে চিত হইয়া পড়িয়া থাকে। তবে এবার সকলকে টেক্কা মারিয়াছেন বিবেকানন্দ রোডের গোপালবাবু। তিনিই সর্বাগ্রে পূজা সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন—তাহার আওয়াজ কী! বোধ করি শতখানেক সম্পূর্ণ উপন্যাস উহার মধ্যে লুকাইয়া আছে। ভবিষ্যতে দেখা যাইবে।

মোটের উপর দেখিতেছি পিণ্ডদানের অধিকার সকলেরই জন্মিয়া গিয়াছে। কিন্তু পিণ্ডি গিলিবে কে তাহা বলা মুশকিল।

গোপালদার কবিতা

"ভায়া হে,

এবার শারদীয় পূজায় একটি কবিতা পাঠাইতেছি। কবিতাটি তোমাদের ভাল লাগিলে সুখী হই। সম্ভব হইলে টেলিফোনে—কিন্তু থাক্। ইতি গোপালদা"

মাপব গো

হাসির ঝরনাধারা চেয়ে দেখ ঝরে পড়ে
সীমাহীন মহাকাশ হতে
আমলকি ডালে দোলা দেয় এলোমেলো হাওয়া
দিবানিশি আঁধারে আলোতে।
চাল নেই, চুলো জলে ঝরিয়ার কয়লায়,
পিসী বলে সেঁকে নাও রুটি

জোয়ার এসেছে তাই, সাঁতরাই সুখে মোরা
প্রতাপ-শৈবলিনী জুটি।
পরিমল লোভে অলি চিরকাল আসে ছুটে
এই কথা শুধু জানিতাম,
ভাতের ভাতার নয় তবুও মারে যে কিল
গোঁসাই তাহার বুঝি নাম।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কাম-
মোহিতং মনে মনে স্মরি,
তুমিও আইস দেবি, দাসে দেহ পদছায়া
সে বেটার মুণ্ডপাত করি।
গতরে নাহিক কিছু ছাতি ঠেকে হাঁটু যার
সেও হেসে বলে কাছে নাও
ছায়াতে যে মায়া ছিল, ভেঙে দিল কোন্ জন
ছায়া কাঁদে, মায়া যে উধাও।
দাদু দিদিমারা সব নভেল লেখেন বসে
নাতি ঠারে ঠোরে মারে চোখ
নাতিনী পোয়াতী হলে নিতম্বে আসে ঢ়ধ,
পুলকিত দেখে যত লোক।
বেশি কিছু বলিব না, যুগটাই চজুগের
ঐরাবত ভেসে যায় স্রোতে,
হাসির ঝরনাধারা অঝোর ধারায় ঝরে
সীমাহীন মহাকাশ হতে।

বেচাল

আজ বাংলা ৩০শে আশ্বিন ১৩৭০ সাল, ইংরাজী ১৭ই অক্টোবর ১৯৬৩, শকাব্দ ২৫শে আশ্বিন ১৮৮৫, সংবৎ ১৫ই কুয়ার (বাদী) ২০২০, হিজরী ২৮শে জমাদিয়ল-আউয়ল ১৩৮৩···প্রাচীন মতে শুভ মহালয়া—প্রাতঃকালে বসিয়া স্তম্ভিতনেত্রে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার দিকে চাহিয়া আছি। সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাপী চালের খবর, প্রত্যাশী বুভুক্ষু মানুষের ছবি—মুখ্যমন্ত্রীর বিমূঢ় প্রতিকৃতি সেখানে শোভমান। বিংশ শতাব্দীর টেলিভিশন-রকেট-স্পুটনিকের ক্রমবিকাশের সহিত একভাবে পাল্লা দিয়া ক্ষুধার্ত দরিদ্র লাঞ্ছিত মানুষ আজও সেই আদিযুগের হাহাকার করিতেছে, সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। শুধু হাহাকার নহে, সবিস্ময়ে দেখিতেছি মানুষ এবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

ভাবিতেছিলাম, কেন এমন হয়! বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি একদিকে যেমন মানুষকে ভোগ ও বিলাসের রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া দিতেছে, অন্যদিকে চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিষ্ঠা দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে। তবে সেই মানুষেরই এত দুর্গতি চোখের সামনে দেখিতেছি কেন? জ্ঞান ও বিজ্ঞান কি পেটের অন্ন ও দেহের বস্ত্রকে উপেক্ষা করিবার জন্যই?

আসল কথা, বিজ্ঞান মানুষকে হৃদয়হীন ও জ্ঞান মানুষকে স্বার্থপর করিয়া তুলিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নহিলে মানুষের দুঃখে মানুষ সমবেদনা জানাইবে না, মানুষের দারিদ্র্যে মানুষ হস্ত প্রসারিত করিবে না, মানুষের লাঞ্ছনা দেখিয়া মানুষ আগাইয়া আসিবে না, এমন হইবার নহে। দেশের ও রাষ্ট্রের যাঁহারা নেতা—সে রাজনীতিকই হউন বা মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীই হউন মানুষকে ভালবাসিয়া তাহার দুঃখে কাঁদিবেন না কেন?

গত কয়দিন ধরিয়া পশ্চিমব[ঙ্গে] চাউল সংকট লই[য়া] যে অমানুষিক ব্যাপার ঘটিয়া [গেল] আমাদের জীবনে সমাজে তাহার একটা সুদূরপ্র[সারী] প্রতিক্রিয়া দেখা দি[বে] নিশ্চয়ই। সমগ্র দেশে জেলায় জেলায় নিরন্ন নিপীড়িত জনগণের কাতর আর্তনাদ যখন কর্তাদের মন টলাইতে পারিল না, দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের যখন প্রা[ণ] নাভিশ্বাস উঠিবার উপক্রম তখনও কর্তাদের চোখের উপরেই চালের দর ত্রিশ হইতে চল্লিশ-পঞ্চাশে বাড়িয়া চলিয়াছে। বিহার যুক্তপ্রদেশ ও রাজস্থান হইতে আগ[ত] আমাদের ভাইয়েরা এই কৃত্রিম দর বাড়াইয়া লাভবা[ন] হইতেছিলেন নিশ্চয়ই কিন্তু ইঁহাদের অভ্রভেদী লো[ভ] সরকারের বৈষ্ণবসুলভ বিনয়ের সুযোগে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যাহার পর বিদ্রোহ করা ছাড়া উপায় ছিল না। বিদ্রোহ হইয়া[ছে] সংবাদপত্রে নানাভাবে চাউলের দোকান ও গুদাম লুঠ হওয়ার খবর পাওয়া যাইতেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ

[illegible]লার সুযোগে বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম অনুসারে ইহার লক্ষ্য যে শাসকশ্রেণী তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ফরাসী বা রুশ বিপ্লব অপেক্ষা ইহার অভ্যুদয় কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

সরকার বা শাসকসম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা অতীব কলঙ্কের কথা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার নহেন, ভারত সরকারের পক্ষেও কলঙ্কের বিষয়। আমাদের দূর ও দূরতম প্রদেশগুলি হইতে সামান্য লোটাকম্বল মাত্র সম্বল করিয়া মানুষ নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য কতকগুলি জীব দিনের পর দিন এই বাংলাদেশে আসিয়া জুটিতেছে এবং আমাদের অন্যমনস্কতা ও নীতি-ভ্রষ্টতার সুযোগে নিজেদের অধ্যবসায় মাত্র মূলধন করিয়া অচিরাৎ ধনাঢ্য হইয়া নৃশংসভাবে আমাদেরই বুকের উপর জাঁকিয়া বসিতেছে। ইহাও নির্বিবাদে সহ্য করিতাম, যদি লালবাজারের নাকের ডগায় ভয়াবহ কালোবাজারের অপর্যাপ্ত সুবিধা ইহাদের দেওয়া না হইত। আগরওয়ালা ঝুনঝুনওয়ালারা আর কতকাল [illegible] কশাইবৃত্তির সুযোগ পাইবে? সারা ভারতবর্ষের [illegible] একমাত্র বাংলা অথবা পশ্চিম বাংলাতেই বারংবার [illegible]ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটিতেছে কেন? "গেল গেল" [illegible]র্তনাদ শুনিতে শুনিতে আমরা যে গেলাম!

বসিয়া বসিয়া দেশের যাঁহারা নেতা, নানা দলের [illegible]হারা দলপতি তাঁহাদের কথাই ভাবিতেছিলাম। আজ [illegible]তে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বেকার বঙ্গদেশের আর এক [illegible]যুগের করুণ এবং ভয়ঙ্কর চিত্র স্মরণপথে উদিত [illegible]তেছে।—

"...কেহ আমাকে এক মুঠা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" এক জন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। "চাল দাও", "চাল দাও", ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা রূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগি[illegible], কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম।... দলপতি দুই এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল কুকুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।" তখন সকলে "জয় কালী!" বলিয়া, উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। "বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব!" এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্তিসকল অন্ধকারে খল খল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য এক জন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল।

জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মানুষকে ইহার অধিক আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই। দুর্দিনের অন্ধকার ভেদ করিয়া শরতের প্রসন্ন রৌদ্র আবার আপন মহিমায় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, আমাদের শাসকবর্গের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হউক। কঠোরহস্তে অন্যায়কে দমন করিতে যদি না পারিলেন, তবে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করুন। দোহাই তাঁহাদের—আর এই গরীব হতভাগ্যদের লইয়া ছিনিমিনি খেলিবেন না। দেশসেবার নাম লইয়া ইহাদের প্রতারিত করিবেন না। শাসনের ছলে ইহাদের শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিবেন না। ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলার দিন আসিয়া গিয়াছে। এবার সত্যকার মূর্তি ধারণ করিয়া আমাদের সামনে আবির্ভূত হউন প্রভু।

পুরাতনী

[এক]

"এই ১৩৫০ বঙ্গাব্দের সূত্রপাত হইতে যে মহামন্বন্তর বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে দেখা দিয়াছে, তাহার চরম পরিণতি আমরা এখনও প্রত্যক্ষ না করিলেও এই ব্যাপক মৃত্যু, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে

আজ পর্যন্ত আমরা কি দেখিলাম? দেখিলাম—ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের শুভপ্রভাবে ভারতীয় জনগণের মহনীয় অহিংসরূপ। প্রাচীন উপনিষদ, বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের পার্শ্বনাথ মহাবীর প্রমুখ জিনগণের বাণী, উড়িষ্যা-বাংলার চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম এবং বিংশ শতাব্দীর মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ ভারতের সাধারণ নিম্নস্তরের লোককেও প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের এমন একটি উচ্চ স্তরে উন্নীত করিয়াছে, যাহা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি সম্ভব হয় নাই। এখানেই ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব। আমাদের সাধনা অতীত ও অজ্ঞাত, কিন্তু বর্তমান সিদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া পৃথিবীর আধুনিক সকল সভ্যজাতিই বিস্ময়বিমূঢ় হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে সকল সুসভ্য জাতি পার্থিব শক্তিতে অপরিমেয় শক্তিশালী হইয়া অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাতের মধ্যে নিমগ্ন আছে, তাহারা ভবিষ্যৎ শান্তির কামনাতেই এরূপ করিতেছে। তাহাদের চরম লক্ষ্য পরিণামে পরস্পর অহিংসা। যে নিদারুণ জাতি-বৈরের প্রদাহে তাহারা নিরন্তর জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, তাহা কল্যাণকর তো নহেই; পরন্তু ঘৃণ্য, হেয় ও বর্জনীয়—এ কথা তাহারা কাজে স্বীকার না করিলেও মুখে স্বীকার করিতেছে ও যে তত্ত্বকে সত্য জানিয়াও জীবনে মানিতে পারিতেছে না, তাহাকে সম্মান দিবার জন্য তাহারা লীগ অব নেশন্‌স প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কবি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকের মত শান্তিমন্ত্রের উপাসকেরাও নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। বারংবার সমবেত প্রাণ-বলিদানের দ্বারা শান্তি-প্রতিষ্ঠায় অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত ইহারা করিতেছে এবং হিংসামূলক মৃত্যুর মধ্যে অহিংসাবাদকে ইহারা জয়যুক্ত করিতেছে। মনীষী টলস্টয়, কার্ল স্পিট্‌লার ও রম্যা রলাঁ হিংসার নিরর্থকতা প্রচার করিয়া খ্যাত হইয়াছেন। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, ভারতেতর জগতে হিংসা অনুসৃত হইলেও অহিংসাই আদর্শ।

* * *

ভারতবর্ষের কথা স্বতন্ত্র, এখানকার অহিংসাবাদের বনেদিয়ানা বিরাট, ভিত্তি সুগভীর। নিখিল জগতের কাম্য অহিংসা আমাদিগকে সকল প্রলোভনের মধ্যেও শুদ্ধ শান্ত অপাপবিদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে। পৃথিবীর কুত্রাপি এমনটি আর ঘটে নাই। গত মাসাধিককাল মধ্যে বাংলা দেশে তাহার সহস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অন্য সকল দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত, জ্ঞানী অজ্ঞানী, স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর মানুষ ক্ষুধার্ত হইলে পরদ্রব্যে লোভ করে, উত্তেজিত এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্মত্ত হইয়া হাঙ্গামা বাধায়, তাহাদিগকে ঠেকাইতে গিয়া রক্তপাত অনিবার্য হইয়া উঠে। কিন্তু এই মহামন্বন্তরের মধ্যেও বাংলা দেশে আমরা কি দেখিলাম! অহিংসার অপূর্ব অভাবনীয় মহিমা! ধন্য আমাদের মহাপুরুষগণের শিক্ষা, ধন্য আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি! ক্ষুধায়, অনাহারে, এক-আধজন নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ তিলে তিলে নির্জীব ও অসাড় হইয়া পড়িতেছে, মৃত্যু আসিয়া পদনখ হইতে অতি মৃদুগতিতে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে, হাত বাড়াইলেই আহার্য অর্থাৎ জীবন—নিরাবরণ প্রহরীহীন গৌরবে আশেপাশে সর্বত্রই তাহা থরে থরে বিরাজ করিতেছে—লক্ষ লক্ষ মানুষ মরিয়া গেল, রাজপথে বাজারে হাটে আহার্য দ্রব্যের মনোহারী মাধুর্যের ব্যত্যয় হইল না, কিন্তু সেই ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের উপযুক্ত বংশধরগণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই; শীর্ণ করাঙ্গুলি ললাট পর্যন্ত উঠিয়াছে, কিন্তু সহজলভ্য আহার্যপাত্রের দিকে ভ্রান্তিবশেও তাহা উত্তোলিত হয় নাই।

* * *

এ যে কত বড় অ্যাচিভ্‌মেণ্ট, যুগান্তব্যাপী সাধনার কত বৃহৎ ফল, না দেখিলে ভারতে সমবেত বৈদেশিক জাতিরা তাহা উপলব্ধিই করিতে পারিত না। মুখে যাহাই বলুক, মনে মনে তাহারা ধন্য ধন্য করিতেছে। তাহারা কি অনুভব করিতেছে না, তাহাদের পার্থিব শক্তিমদমত্ততা এই অলৌকিক শক্তির কাছে কত ক্ষুদ্র, কত হেয়? প্রাণ? যে প্রাণ রক্ষার জন্য এত সংগ্রা

এত আয়োজন, এত দরখাস্ত, এত টেস্টিমোনিয়াল, এত সুপারিশ, এত ঘুষ, সেই প্রাণ ম্যাক্‌সুইনী যতীন দাসের মত নিতান্ত ইচ্ছাশক্তির জোরেই দেহকে নিষ্ক্রিয় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল! দেহের একটু আক্ষেপ-বিক্ষেপ হইলেও হাতটা অজ্ঞাতসারে খাবারের থালায় গিয়া পড়িতে পারিত—তাহাও হইল না, ইহা কি কম শক্তি, কম সংযমের কথা! আত্মপ্রশংসা করিতে লজ্জা হইতেছে, নতুবা আরও অনেক বলিতে পারিতাম।

• • •

হইবে না বা কেন? আমরা কাহাদের সন্তান! আমাদের পূর্বপুরুষ পৃথিবীর আদি কবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটিকে হিংসিত হইতে দেখিয়া কবিতার জন্ম দিয়াছিলেন, নিজে উইয়ের ঢিবির তলায় চাপা পড়িয়াও উই-হিংসা করেন নাই—আমরা অহিংস হইব না তো কে হইবে? আমাদের উপনিষদের ঋষিশিষ্যেরা গুরু কর্তৃক যাবতীয় সম্ভব অসম্ভব আহার্যে বারিত হইয়াও আকন্দের আটা খাইয়া কি চক্ষু নষ্ট করিতে দ্বিধা করিয়াছিলেন? প্রাচীন কালের ঋষিদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, আমাদের বাংলা দেশের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাল্যবয়সে ঈশোপনিষদের একটি ছেঁড়া পাতায় নির্লোভ ও অহিংস হইবার উপদেশ পাইয়া কি জীবনের গতি পরিবর্তিত করেন নাই? বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মানুষ আমাদের এই মহিমান্বিত চিরন্তন শিক্ষা ভুলাইয়া বিপথে লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন স্বরচিত উপন্যাস—'আনন্দমঠে' কাড়িয়া খাওয়ার অ্যাড্‌ভোকেসি করিয়া এবং অন্যজন ধর্মচর্চার পূর্বে উদরপূর্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া এই শাশ্বত শান্তির মধ্যে একটু বেয়াড়া সুর তুলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এত সাংখ্য-চেষ্টা সত্ত্বেও "বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া" যায় নাই কি? রাজসিক সন্ন্যাস সাত্ত্বিক বাবাজিয়ানায় কি বিলুপ্ত হয় নাই?

[দুই]

বকরূপী ধর্মের "আশ্চর্য কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, জীবগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে ইহা দেখিয়াও মানুষেরা যে নিজেদের অমর ভাবে ইহাই আশ্চর্য। মহাভারতের পাঠকেরা জানেন, যুধিষ্ঠির এই উত্তর দিয়া ফুল মার্কস পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্যের চরমতম প্রকাশ বর্তমানকালে আমাদের চারিদিকে যেমন দেখিতেছি, তেমনটি আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। গবর্মেণ্ট স্বীকার না করিলেও আমরা অনুভব করিতেছি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ভয়াবহ মূর্তিতে প্রতিদিন আত্মপ্রকাশ করিতেছে; অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা প্রত্যহ বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছিলাম, দেশের অবস্থা যেরূপ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয় ১৩৫০-৫১ সালের মন্বন্তর ভয়াবহতায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও ছাড়াইয়া যাইবে। আকাশে বাতাসে তাহার আভাস পাইতেছি—মৃত্যুদূতেরা তাহাদের করালদংষ্ট্রা বাহির করিয়া আমাদেরই আশেপাশে ওত পাতিয়া আছে; আমাদেরই অন্ততঃ শত-করা পঁচিশজন যে তাহাদের কবলে পড়িব, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। চেতাবনী-কথিত কলিযুগসমাপ্তি এবং সত্যযুগাবির্ভাব লইয়া যতই হাস্যপরিহাস করি না কেন, অপরিমিত মৃত্যুস্নানের মধ্যে যে একটা যুগশোধন হইতে চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • •

রূঢ় নগ্ন সত্য যাহাই হউক, যে আশ্চর্যের কথা যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন তাহাই এই ভীষণ বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদিগকে মুগ্ধ রাখিয়াছে। দীর্ঘদিন রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট সেবাপরায়ণা জননী সন্তানের শবদেহের পার্শ্বেই যেমন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় সুখস্বপ্নে নিমগ্ন হইতে পারে, আসন্ন মৃত্যুর মুখেও আত্মবিস্মৃত মানুষ তেমনই পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হয়। এই অস্বাস্থ্যকর উল্লাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। নন্দনকাননে অমরনন্দনেরা অমৃতের প্রভাবে মৃত্যুকে যেভাবে উপহাস করিয়া চলে, সরকারী ছাপা-অমৃতের বাহুল্যে আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় তেমনই মদোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। যখন সমস্ত দেশ মহা-দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়া আতঙ্কগ্রস্ত, তখনই ইহারা বস্ত্র বস্ত্রমূল্য ও

বিনিময়ের অস্বাভাবিক খেলায় মাতিয়া উৎসব জুড়িয়া দিয়াছে। কয়েকজন বিজাতীয় ছালদারের বুদ্ধিকৌশলে প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির সম্মুখে প্রোথিত যূপকাষ্ঠে বলি হইবার জন্য বাধ্য হইয়া সমগ্র দেশের ছাগসমাজ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, নিবারণ করিবার কেহ নাই। শ্মশানকালীর পূজা নানাকারণে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং কর্তাবাহাদুরও চোখ বুজিয়া ভ্যা-ভ্যা রব শুনিয়া ইষ্টনাম জপিতে জপিতে পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন। ছাগেদের সান্ত্বনা এইমাত্র যে, যুধিষ্ঠির-প্রোক্ত জীবধর্মবশে যজমান আজ মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকিলেও তাহাদের যূপকাষ্ঠ অন্যত্র প্রস্তুত আছে। এই সত্যটা তাহাদিগকে সম্যক উপলব্ধি করাইতে পারিলে মরিয়াও ছাগেদের সুখ।

[তিন]

লোভী স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হইলে কোনও গ্রাম বা নগরের কি দুরবস্থা হয়, বহু শতাব্দী পূর্বে মনস্বী প্লেটো তাঁহার 'রিপাব্লিকে' তাহা বলিয়া গিয়াছেন—

Whether shall the city which is tyrannized over [by such people] be necessarily rich or poor ?

Poor.

Must not such a city be full of fear ?

In great measure.

Do you imagine you will find more lamentations and groans and weepings and torments in any other city ?

By no means.

আমরা বর্তমান অবস্থায় একটিমাত্র আশার বাণী অ্যারিস্টটলের *A Treatise on Government* হইতে পাইতে পারি, তাহা এই—

Governments also sometimes alter without seditions by a combination of the meaner people...

Mean এবং meaner people-এর এমন বিচিত্র সমন্বয় ইতিপূর্বে এদেশে আর কখনও ঘটে নাই। এখন আমরা শাসনপদ্ধতির পরিবর্তন আশা করিতে পারি না কি ?"

[সংবাদ-সাহিত্য]

গ্রাহকগণের প্রতি

আশ্বিন সংখ্যায় শনিবারের চিঠির ৩৫শ বর্ষ পূর্ণ হইল। আগামী কার্তিক সংখ্যা হইতে ৩৬শ বর্ষের যাত্রা শুরু হইবে। প্রকৃতপক্ষে শনিবারের চিঠির জন্ম (সাপ্তাহিক আকারে) ১৯২৪ সনে। সেই হিসাবে বয়স অনেক বেশী হয়, মধ্যে কিছুকাল প্রকাশের বিরতি ঘটায় এই সময়কে হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। আশ্বিন সংখ্যায় যে সকল গ্রাহকের চাঁদার মেয়াদ শেষ হইল তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া কার্তিক সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই তাঁহাদের নূতন চাঁদা আমাদের নিকটে পাঠাইয়া দেন। ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা ১২৲ বা ষাণ্মাসিক চাঁদা ৬৲ অথবা ভি. পি. পাঠানো সম্মতিপত্র আমাদের হাতে আসা প্রয়োজন। যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে চান না তাঁহারাও ওই সময়ের পূর্বে আমাদের তাহা জানাইয়া দিবেন। ভি. পি-তে পত্রিকা লইতে খরচ ও হাঙ্গামা অনেক বেশী, মনিঅর্ডারেই সুবিধা হয়—একথা গ্রাহকেরা স্মরণে রাখিবেন। ভি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহাও আশা করি তাঁহারা মনে রাখিবেন।

—

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮